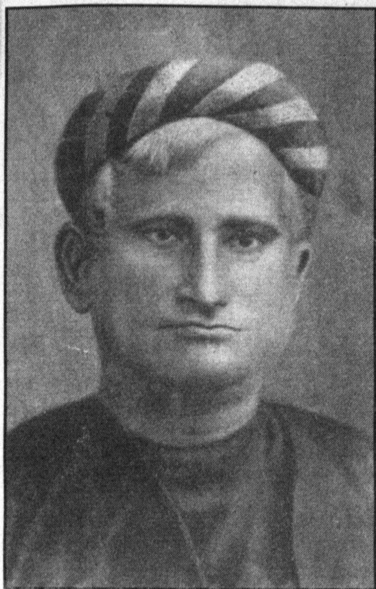
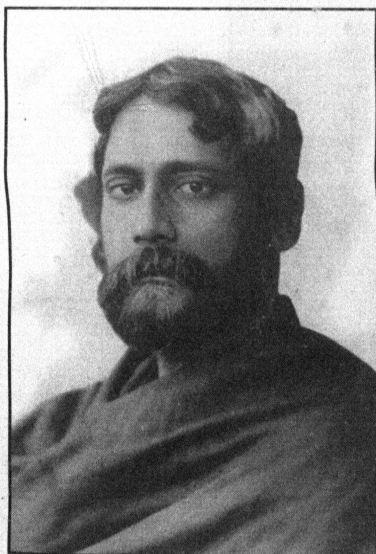


বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়



স্বামী বিবেকানন্দ



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ভগিনী নিবেদিতা

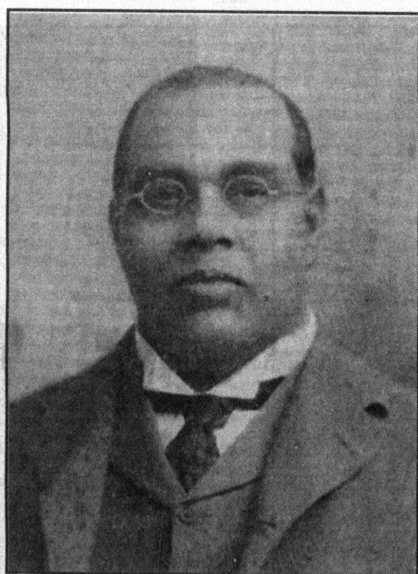
বঙ্গভঙ্গ
ও সমকালীন বঙ্গসমাজ

কমল চৌধুরী
সংগৃহীত • সম্পাদিত

ভারবি
১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩



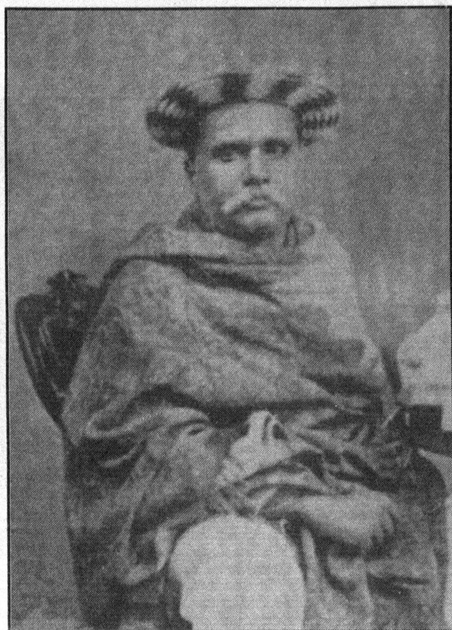
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়



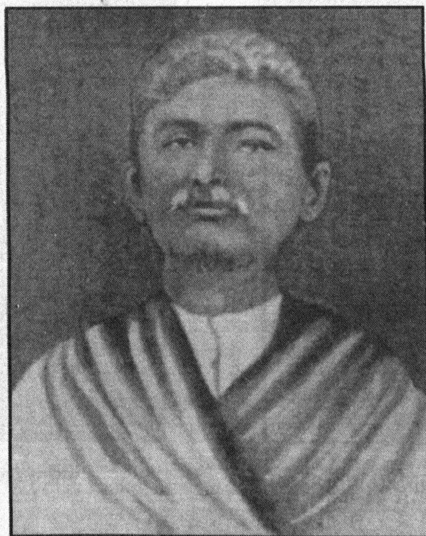
রমেশচন্দ্র দত্ত

প্রথম প্রকাশ : পৌষ ১৪০৭, ডিসেম্বর ১৯৯৯

প্রকাশক : গোপীমোহন সিংহরায়। ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট।
অক্ষর-বিন্যাস : ভারবি। ১৩।১ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রিট। কলকাতা-৭৩।
: দি ক্রিয়েশন। ২৪বি।১বি ডাঃ সুরেশ সরকার রোড। কলকাতা-১৪



রাজনারায়ণ বসু



নবগোপাল মিত্র

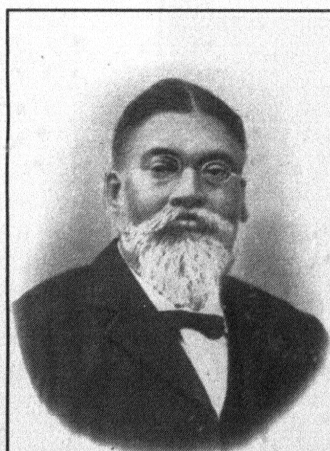
যাঁর সহযোগিতায় গ্রন্থটি পূর্ণাঙ্গ রূপ নিতে পেরেছে
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-এর গ্রন্থাগারিক
শ্রীমতী অরুণা চট্টোপাধ্যায়
এবং
যাঁর অকুণ্ঠ সহযোগিতায় গ্রন্থটি পরিচ্ছন্নরূপ পেয়েছে
শ্রীযুক্ত অজয় গুপ্তকে



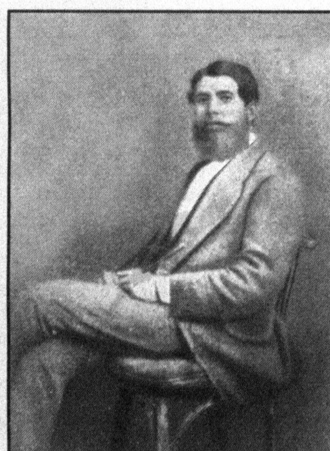
সুবোধচন্দ্র মল্লিক



ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী



সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী



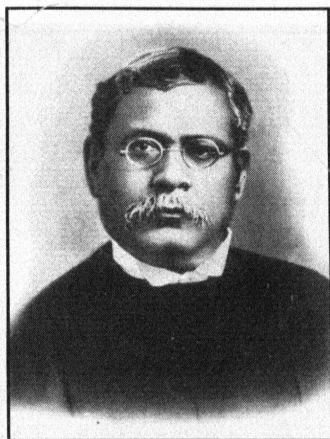
তারকনাথ পালিত

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

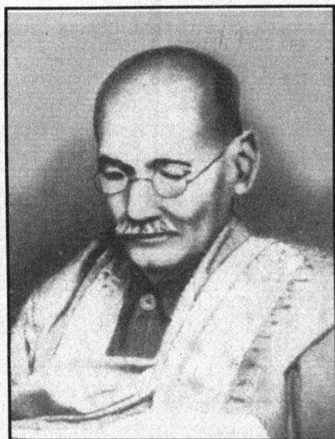
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলকাতা

বাংলা আকাদেমি, ঢাকা

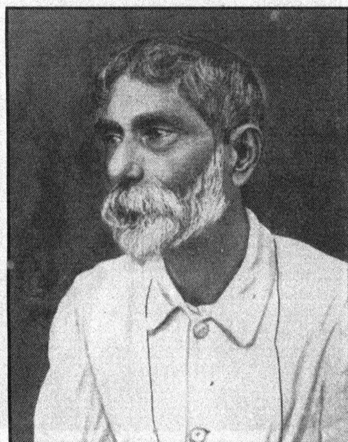
Sri Aurobindo Ashram, Pondichery



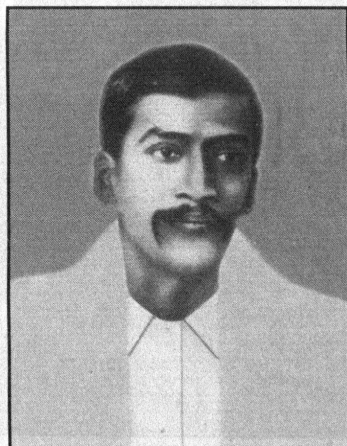
রাসবিহারী ঘোষ



হীরেন্দ্রনাথ দত্ত



প্রফুল্লচন্দ্র রায়



অরবিন্দ ঘোষ

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

আমাদের ইতিহাস আছে। ঐতিহাসিকের অভাব নেই। চিন্তাধারার বিকাশ ঘটেছে নানান দিকে। কিন্তু নতুন চিন্তাধারার আলোকে প্রাচীন ধ্যানধারণার বিশ্লেষণের গুরুত্ব তেমনভাবে আধুনিক ইতিহাসকাররা উপলব্ধি করেছেন বলে, মনে হয় নি। দেশ বদলেছে, মানুষ বদলে গেছে, আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার আমাদের ঘরে ঘরে অফুরন্ত ঐশ্বর্য নিয়ে উপস্থিত। সেখানে আমাদের ঘরের কথা কৈ? মাটির গর্ভে নয় মাটির ওপর, সূর্যের আলোকে, সুন্দরী পৃথিবীর বুক জুড়ে যে সভ্যতার বিকাশ, দীর্ঘ পরাধীনতার রক্তাক্ত ইতিহাস জড়িয়ে আছে, তাকে নিয়ে গভীরতর অনুসন্ধান স্তিমিত হয়ে গেছে অনেক আগেই। পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকে নতুনভাবে লেখার প্রয়োজন পড়ে। ব্যবসায়িক ভাবধারায় আবৃত চেতনালোকে তমসাচ্ছন্নতার আবরণ উন্মোচন করা খুবই প্রয়োজন। এ কারোর বিরুদ্ধে অভিযোগ নয়, নিজের দেশকে নিয়ে ভাবতে বসলেই, কথাগুলো মনে ভেসে ওঠে।

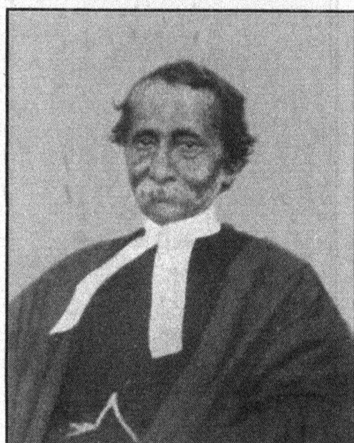
ভেসে ওঠা অস্বাভাবিক নয়। কোন ছাত্রছাত্রী বা শিক্ষিত যুবক যুবতীকে 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী' আন্দোলন প্রসঙ্গে কোন প্রশ্ন করলে, সঠিক উত্তর পাওয়া কঠিন। ইতিহাসের পাতায় সংক্ষিপ্ত কয়েক পংক্তির বিবরণেই তার জ্ঞান সীমিত এবং অধুনা প্রায় বিস্মৃত। অথচ এই আন্দোলন বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতব্যাপী যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত করেছিল, তার ধারাবাহিক কোন বিবরণ নেই। না থাকার বহুবিধ কারণের অন্যতম হল, বাংলার এই স্বদেশি আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেসের কোন ভূমিকা ছিল না। দেশভাগ পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের যে ইতিহাস রচিত হয়েছে কংগ্রেস আমলে, সেখানে বহুরাজ্যের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত গণ-অভ্যুত্থানের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। এমন কী, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে যে ধারাবাহিক বিদ্রোহ কোম্পানি ও ব্রিটিশ শাসনকে অস্থির করে রেখেছিল, তার ইতিহাসও থেকে গেছে প্রায় অবহেলিত।

এরকমই একটি দৃষ্টিভঙ্গি, সতত ইতিহাস জিজ্ঞাসার অন্তরালে সক্রিয়। বহুদিন ধরেই বিবিধপ্রসঙ্গে নানান প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছি। আমরা এখনও জানিনা মুসলমান আগমনের পূর্ববর্তীকালে বঙ্গভূমি হিসাবে চিহ্নিত ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের সার্বিক জীবনধারার স্বরূপ কেমন ছিল? মানুষের দৈনন্দিন জীবনধারার চালচিত্র অঙ্কিত হয়নি কোন ঐতিহাসিকের নিপুণ অনুসন্ধানের আলোয়। বরং ইতিহাস নিয়ে গল্প ফাঁদা হয়েছে নানা রকম। এই ধারাই আমাদের ইতিহাস সম্পর্কিত ধ্যানধারণাকে স্ব-তথ্য নির্ভর পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে।

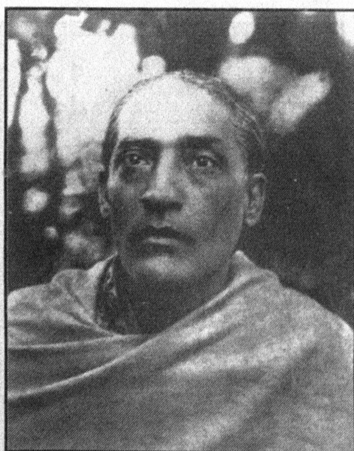
এমন কী স্বদেশি আন্দোলনের তথ্যনির্ভর ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা এখনও অসম্পূর্ণ। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিপ্লবীরা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। ব্রিটিশ শাসকদের অনুসরণে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে সন্ত্রাসবাদ (Terrorism) হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এদেশের অধিকাংশ লেখকও। আজও এই ধারা অব্যাহত। বিপ্লবী কর্মধারা সচল রাখতে অর্থের প্রয়োজনে ব্যাপক রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু হয়েছিল। অত্যাচারী শাসক এবং পুলিশের গুপ্তচরদের নির্মমভাবে খুন করা হত। এইসব বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল বিদেশি শাসক। বৃহৎ বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে সন্ত্রাসবাদ অপরিহার্য। কিন্তু সেই কর্মকাণ্ডকে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদ হিসাবে আমাদের চিহ্নিত করা অনুচিত। গোপাল হালদারের মত একে বলা যায় Militant Nationalism.



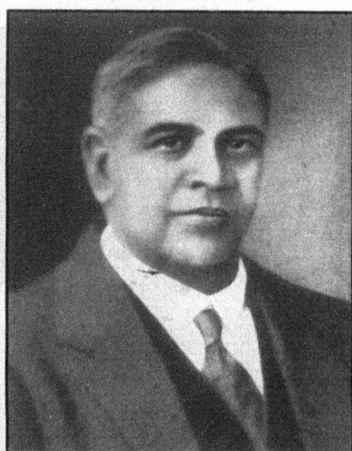
আশুতোষ চৌধুরী



গুরুদাস ব্যানার্জী



ব্যোমকেশ চক্রবর্তী



নীলরতন সরকার

স্বদেশি আন্দোলন বাঙালিকে সচেতন করেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সেদিন লিখেছিলেন :

"... আমাদের দীর্ঘ ঘুমের পর এই নবজাগরণ, আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে।..." কেবল দৈহিক নয়, মনন জগতও আলোড়িত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন তৈরি করেছিল এক বৃহত্তর রাজনৈতিক সংগ্রামের পটভূমি। জীবনেব সার্বিক ক্ষেত্রে তার গভীর রেখাপাত ঘটে। সঙ্গীত, সাহিত্য, সংবাদ, চিত্রকলা, ক্ষুদ্র-শিল্প, বিনিয়োগ সংস্থা—সর্বক্ষেত্রে বাংলার মানুষের উজ্জ্বল ভূমিকার বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ রয়েছে। হয়ত সাময়িক উত্তেজনায় যেসব শিল্প সংগঠন গড়ে ওঠে, তাব সবকিছু বৃহত্তর রূপ পায় নি। কিন্তু একটি জাতিকে আত্মনির্ভর হওয়ার পথে কয়েক ধাপ এগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জোয়ার।

ইতিহাস পাঠে জানা যায়, উনিশ শতকে বাংলায় কৃষকরা বিদ্রোহ করেছিল, নীলচাষের বিরুদ্ধে। সে বিদ্রোহ ইংরেজশাসকেব বুকেব রক্ত হিম করে দেয়। হাজার হাজার কৃষক মাটি থেকে লাঙল তুলে নিয়েছিল। গ্রামে গ্রামে প্রতিরোধেব প্রাচীর গড়ে উঠেছিল। অবশেষে সরকাব নীল চাষ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। সেই সংগ্রামের বীরগাথা ইতিহাসেব পাতায় আজও জীবন্ত হয়ে আছে। বাঙালির প্রথম সফল বিদ্রোহ।

পাবনার প্রজারা জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে, সরকার জমিদারদের পক্ষে দাঁড়ায়। তীব্র সংঘাতের পব সে বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হলেও, প্রজার স্বার্থরক্ষায় আইন প্রণয়নে বাধ্য হয়েছিল সরকাব।

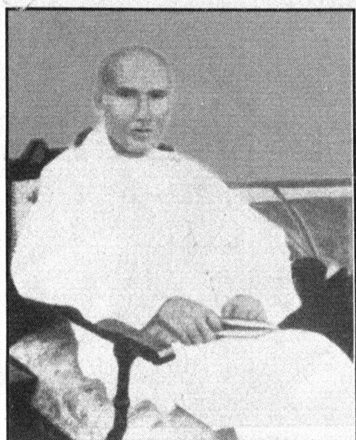
দুদু মিঞা ও তিতুমীরের বিদ্রোহও অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচারিতের তীব্র বিদ্বেষের বিস্ফোরণ। সাফল্য না এলেও, গুরুত্বহীন ছিল না এই বিদ্রোহ।

তারপব অনেক ব্যাপক আকারে ঘটে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন। অস্ত্রহীন বাঙালিব প্রতিবাদের ধ্বনিতে সেদিন জেগে উঠেছিল গোটা বাংলা। সেই সংগ্রাম কাহিনি বাঙালির উত্থানেব এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ইংরেজ সবকারকে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত অবশেষে প্রত্যাহার করাতে হয়।

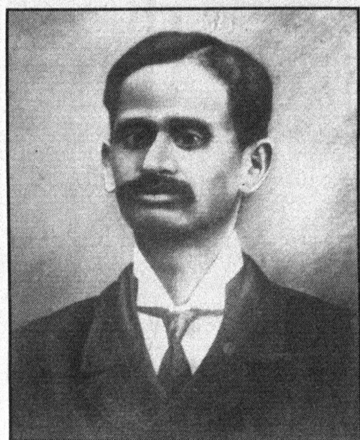
বাংলার গণমানসের দুই বিস্ফোরণ নীলচাষেব বিরুদ্ধে এবং বঙ্গভঙ্গেব বিরুদ্ধে, যে বিস্ময়কব সাফল্যের নজির স্থাপন করেছিল, তার অন্তরালে সর্বভারতীয় নেতৃত্বের কোন অবদান ছিল না। কিন্তু হিন্দু মুসলমানেব সম্মিলিত যে রাজদ্রোহিতা তাকে দ্বিধা-বিভক্ত করতে ইংরেজ শক্তিকে পরবর্তীকালে আর বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। একদিকে রাষ্ট্রশক্তির বাঙালিবিদ্বেষ, অপরদিকে, জাতীয় কংগ্রেসে বাঙালি আধিপত্য খর্ব করতে অবাঙালি ভারতীয় নেতৃত্বেব কূটকৌশল, বাংলার ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে বীর্যহীন করে ফেলেছিল।

কিন্তু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে থেকেই বাঙালি যুব সমাজেব মধ্যে যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছিল, তা ক্রমশ শক্ত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে। বুড়ি বালামেব তীব থেকে চট্টগ্রামের যুব বিদ্রোহের মধ্যে তার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে আছে। হিন্দু বাঙালিকে সান্ত্বনা দিতে বঙ্গভঙ্গ রদ হল, রাজধানী সরে গেল কলকাতা থেকে দিল্লিতে। মুসলমান বাঙালিকে সান্ত্বনা দিতে ঢাকায় স্থাপিত হল বিশ্ববিদ্যালয়। নির্মীয়মাণ রাজধানী ঢাকা নগরীর যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ হয়ে গেল। ততদিনে সাম্প্রদায়িকতার বীজ ছড়িয়ে গেছে গোটা বাংলায়। হিন্দু বাঙালি আর মুসলমান বাঙালি কেউ আর কারো বিশ্বাসী থাকল না। অবশেষে '৪৭ সাল বাঙালি জীবনে এক অভিশপ্ত অধ্যায়েব সূচনা করল।

কার্জনের সাম্রাজ্যবাদী ঔদ্ধত্যের জবাব দিতে সর্বস্তরের, সর্বশ্রেণির বাঙালি শুরু করেছিল ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। কেমন ছিল সেদিনের বাংলার জনজীবন, শহর থেকে গ্রাম গ্রামান্তরে, প্রতিবাদের যে আগুন জ্বলেছিল, সমসাময়িককালেব দেশনায়ক ও বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণে মেলে



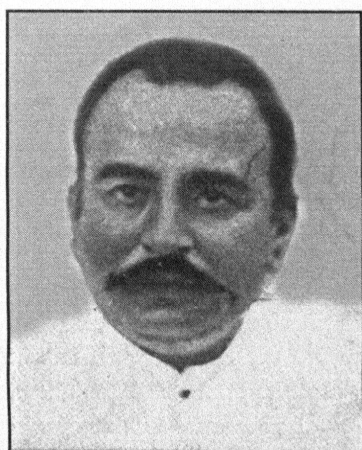
প্রমথনাথ বোস



আবদুল রসুল



বিপিনচন্দ্র পাল



সখারাম গণেশ দেওস্কর

তারই প্রতিচ্ছবি। এক্ষেত্রে সমকালীন পত্র-পত্রিকার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। বর্তমান গ্রন্থে এইসব উপকরণ ব্যবহার করা হয়েছে। যা ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে।

একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন। বাংলা ও ভারতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের দীপশিখা যাঁরা প্রজ্বলিত করেছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ। বিপ্লবী অরবিন্দ ছিলেন ধর্মীয় চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি ইংরেজের হাতে বন্দি হওয়ার থেকে, দেশত্যাগই মঙ্গলজনক মনে করে চলে যান পন্ডিচেরি। কারো কারো রচনায় এই ঘটনাকে পলায়ন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু পন্ডিচেরিতে অবস্থান করেও, তিনি বাংলার বিপ্লবীদের সঙ্গে কিছুকাল সংযোগ রেখেছিলেন। কিন্তু ক্রমশ ধর্মচিন্তায় নিবিষ্ট হয়ে ওঠায়, সেই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বর্তমান গ্রন্থে অরবিন্দ ঘোষ 'বিপ্লবী', এখানে তিনি 'ঋষি অরবিন্দ' নন। "বন্দেমাতরম" পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন রচনায় তাঁর বৈপ্লবিক ভাবনা ও যুক্তিপূর্ণ মননশক্তির পরিচয় স্পষ্ট হয়ে আছে।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের মুহূর্তে একটি অপ্রিয় প্রসঙ্গের অবতারণা ঘটেছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যতম স্তম্ভ বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার নায়ক কার্জন। বাংলার মানুষকে দ্বিধাবিভক্ত করার গোপন ষড়যন্ত্র বাস্তবরূপ দিয়েছিলেন এই মানুষটি। অথচ এই মুহূর্তে তাঁর মূর্তি স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া, যে-কোন বাঙালির পক্ষেই ঘৃণার। এমনকি তার সুদৃশ্য আলোকচিত্রে গ্রন্থের পৃষ্ঠাকে সুশোভিত করতেও কারো মনে দ্বিধা জাগে না। বঙ্গভঙ্গের কালিমা লিপ্ত হলেও, একজন পুরাতত্ত্বের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে কার্জনের ভূমিকায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে আজকের শিক্ষিত বাঙালি বুদ্ধিজীবীর মনে কোন সংকোচ বোধ হয় না। আমাদের পক্ষে এই হীন মানসিকতাকে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। কয়েকটি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, আধুনিক চিকিৎসার ব্যবস্থার প্রসার, যোগাযোগ পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, এরকম অনেক ঘটনারই উল্লেখ করা যেতে পারে, যার দ্বারা ভারতবাসী মাত্রেই উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু সে সব সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থই পরিপুষ্ট করেছে। ভারতীয়দের প্রতি মমতায় বা অনুগ্রহে এসব বিদেশি শাসকের উপহার নয়। এসব ছিল শোষণের ছদ্মবেশ। আর সৃষ্টি হয়েছিল একশ্রেণির উচ্চমূল্যের ভারতীয়, যারা ইংরেজ শাসনের অন্তিম মুহূর্ত এবং পরবর্তীকালেও ইংরেজ প্রশস্তিতে উদ্দীপ্ত। এদের শেষ শিখাটুকু এখনও যে টিকে রয়েছে, তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। বঙ্গভঙ্গের সময় বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলে : " ইংরেজ রাজনীতি ও ইংলন্ডের ইতিহাসের কতগুলি বাঁধাগত্‌ সাধিয়াসাধিয়া আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা, আলোচনা ও চেষ্টার মৌলিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" সেই মৌলিকতা আজও অর্জিত হয়নি।

"বঙ্গভঙ্গ ও সমকালীন বঙ্গসমাজ" কোন মৌলিক গ্রন্থ নয়। সমকালীন পত্রপত্রিকার প্রতিবেদন, দেশনায়ক ও বিপ্লবীদের স্মৃতিচারণ থেকেই গ্রন্থের যাবতীয় তথ্য যথাযথ ব্যবহার করা হয়েছে। ব্যবহৃত গ্রন্থ ও পত্রপত্রিকার উল্লেখ আছে যথাস্থানেই। একই বিষয় এসেছে বিভিন্ন জনের রচনায় ও সংবাদ প্রতিবেদনে। যার ফলে কোন ঘটনার একাধিকবার উল্লেখ মনে হতে পারে।

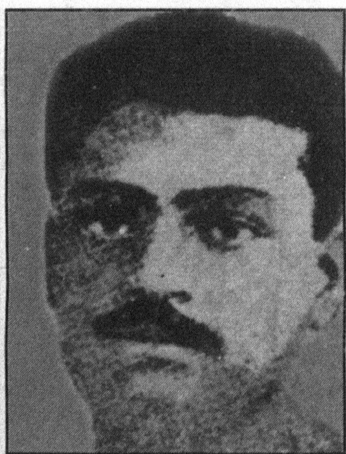
গ্রন্থের অধিকাংশ উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগার থেকে। বহু প্রাচীন গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকার সন্ধান পাওয়া যায়নি। আবার কোন কোন গ্রন্থ বা পত্রপত্রিকা ব্যক্তি বিশেষের সংরক্ষিত থাকায়, সেগুলি হাতে পাওয়ার সুযোগ ঘটে নি। সেগুলি হাতে পেলে বইটিকে আরও মূল্যবান করে তোলা সম্ভব ছিল। সাহিত্য পরিষদের কর্মীদের অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে বিশেষ কয়েকজন আমার যাবতীয় কাজের সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। তাঁরা হলেন--গ্রন্থাগারিক স্বয়ং এবং অরুণচাঁদ দত্ত, পারমিতা গোস্বামী, প্রশান্তকিশোর রায়, রতনরাম কাহার, অমল কয়াল, হাবল দাশ, আরতি ভট্টাচার্য এবং মালতি ধাওয়া। পাণ্ডুলিপি রচনায় শ্রীমতী



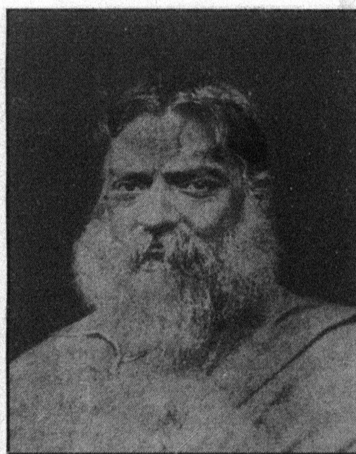
রাসবিহারী বসু



বিনয়কুমার সরকার



শচীন্দ্রনাথ সান্যাল



কৃষ্ণকুমার মিত্র

শুক্লা সরখেলেব সহযোগিতা না পেলে এই গ্রন্থ আদৌ প্রকাশিত হত না।

বহু গ্রন্থের উপকরণ ব্যবহৃত হয়েছে। সেইসব গ্রন্থের লেখক, উত্তরসূরী এবং প্রকাশন সংস্থার কাছে আমরা অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। জাতীয় উন্মাদনার এক বিশেষ সন্ধিক্ষণের আবরণ উন্মোচনে এইসব উপকরণ অপরিহার্য। বঙ্গভঙ্গ সমকালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত "ঢাকা প্রকাশ" পত্রিকার উপকরণ মুনতাসীর মামুনের সম্পাদনায় বাংলা আকাদেমি (ঢাকা) থেকে প্রকাশিত হয়েছে। যথাস্থানে তার স্বীকৃতি থাকলেও একথা অবশ্যই স্বীকার্য বাংলা সংবাদ সাময়িকপত্র চর্চার ক্ষেত্রে মুনতাসীর দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। লুপ্তপ্রায় পত্রপত্রিকা থেকে অপরিমিত মূল্যবান উপকরণ তিনি উদ্ধার করেছেন।

'অমৃতবাজার পত্রিকা'-র সংবাদগুলি সংগ্রহ করে দিয়েছেন শ্রীসুবোধ বসু। তাঁর এই সহযোগিতায় আশাতীত উপকার হয়েছে।

স্বদেশি আন্দোলনের যে বিষয়গুলি অনালোচিত থেকে গেছে, সে সম্পর্কে সামান্য তথ্য আছে পরিশিষ্টে। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির কারণে, বহু তথ্য ও বিবরণ অব্যবহৃত থেকে গেল। সম্ভব হলে, পরবর্তী সময়ে তা প্রকাশিত হবে।

গ্রন্থে ব্যবহৃত বানান সম্পর্কে একটি নিবেদন আছে। বাংলা বানানের আধুনিক রীতিকেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে লেখকের মূল বানান, যা একালে অব্যবহৃত তা বর্জন করা হয়েছে।

তাছাড়া, বিভিন্ন ব্যক্তির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যকে স্থূল অক্ষরে চিহ্নিত কবা হয়েছে। মূল লেখায় তা ছিল না।

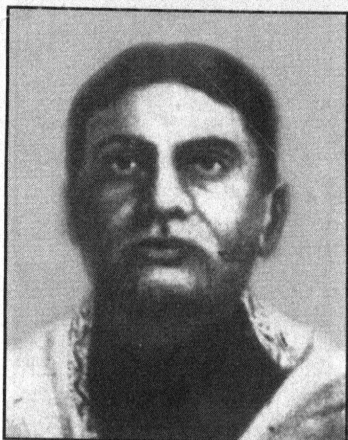
পাঠকদের উদ্দেশে একটি নিবেদন, গ্রন্থের ত্রুটি বিষয়ে এবং প্রাসঙ্গিক অব্যবহৃত তথ্যের বিষয়ে জানালে পববর্তী সংস্করণে তা সংশোধিত ও সংযোজিত হবে। বিশ্বাস করি, এই জাতীয় গ্রন্থ প্রতিটি সংস্করণেই পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হয়। সেকারণে, পাঠকের সহযোগিতা অবশ্য জরুরি।

গ্রন্থের প্রকাশক দে'জ পাবলিশিং-এর অন্যতম কর্ণধার সুধাংশুশেখব দে, সুভাষচন্দ্র দে এবং শ্রীমান শুভংকব দে-ব উৎসাহ ও আগ্রহে কাজটি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হল। তাদেব কাছে অপবিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদেব ছোট করব না।

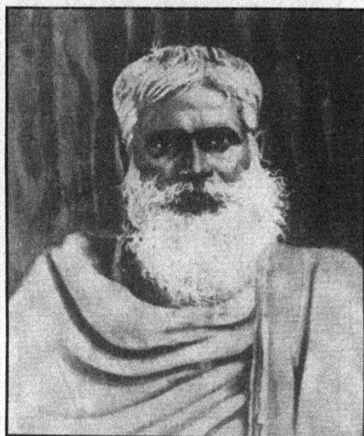
আমার মত অগোছালো মানুষেব পাণ্ডুলিপি নিয়ে বিব্রত হয়েছেন লোকনাথ লেজারোগ্রাফেব শ্রীমান সুমন রায়। কিন্তু কোন সময়েই তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। এজন্য তাঁর প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর মঙ্গল হোক।

নমস্কারান্তে

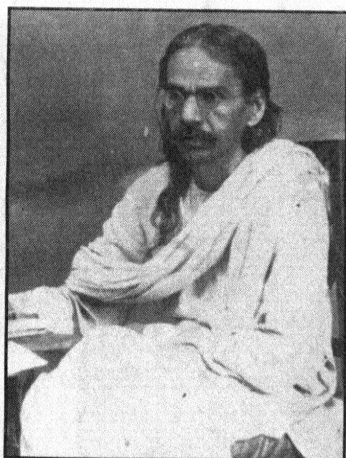
কমল চৌধুরী



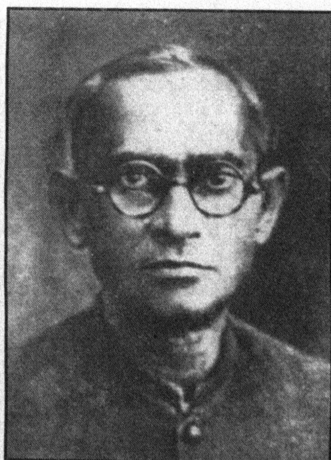
যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ



শ্রীশচন্দ্র ঘোষ

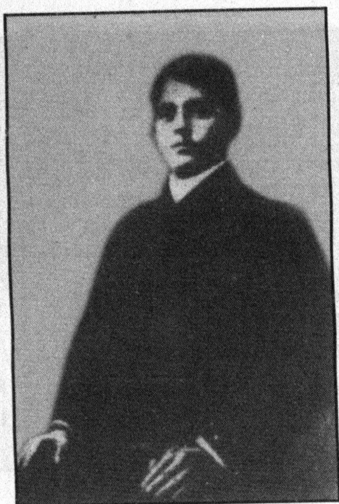


বারীন্দ্রকুমার ঘোষ



জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

সূচি



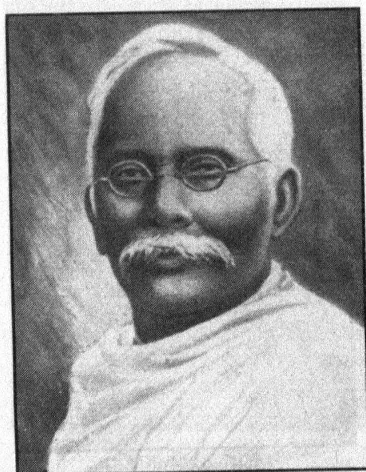
যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
(বাঘা যতীন)



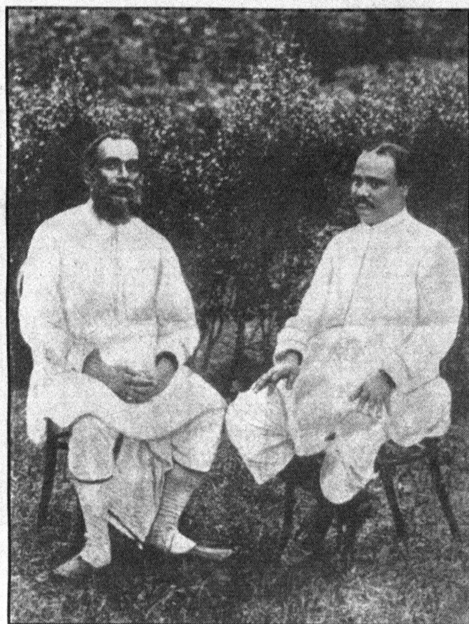
যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
(নিরালম্ব স্বামী)



ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়



অশ্বিনীকুমার দত্ত



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

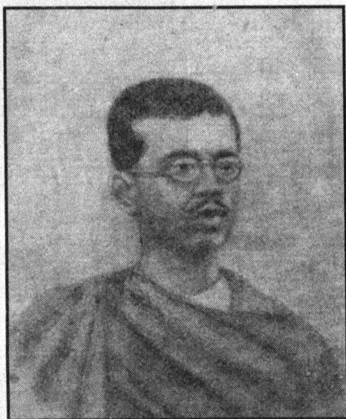


সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

স্বদেশি গান ৬১৭–৫৪



উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



কানাইলাল দত্ত

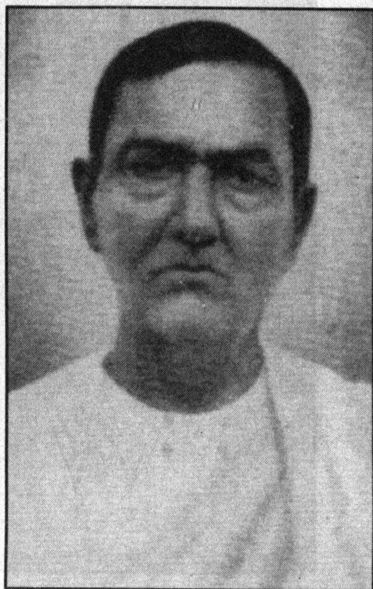


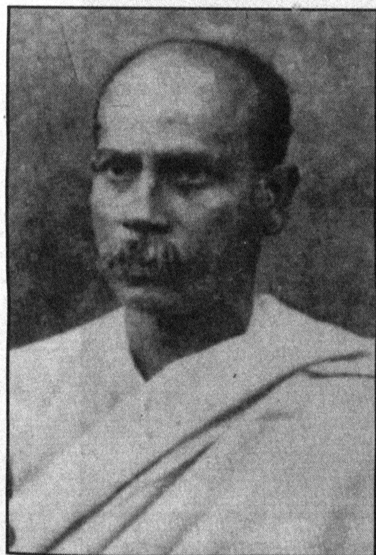
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

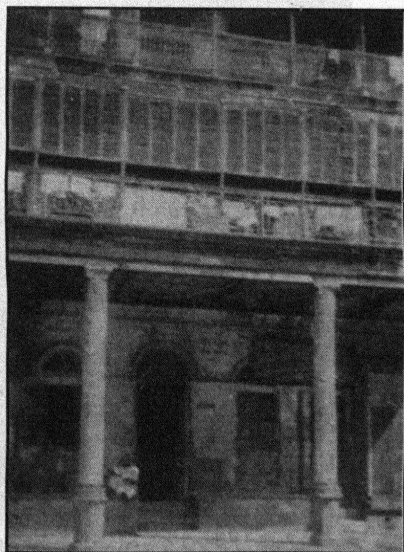


ক্ষুদিরাম


পি. এন. মিত্র

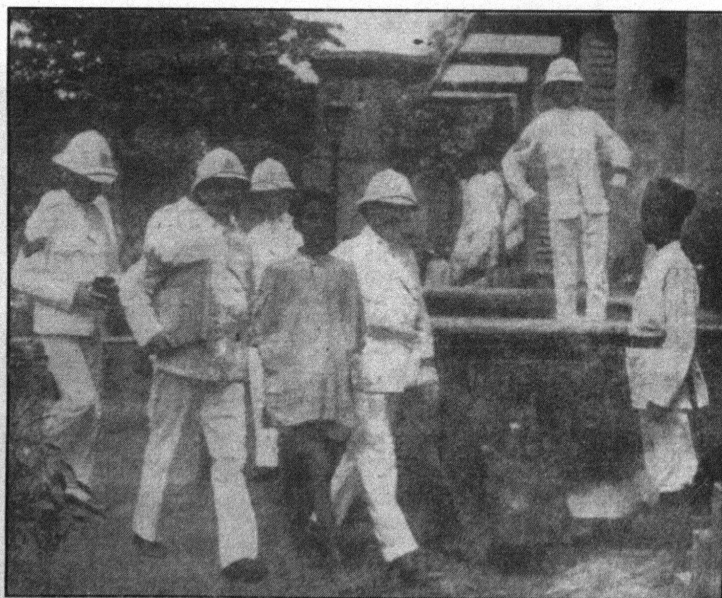

সতীশচন্দ্র বসু


পুলিনবিহারী দাস


অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রস্থল



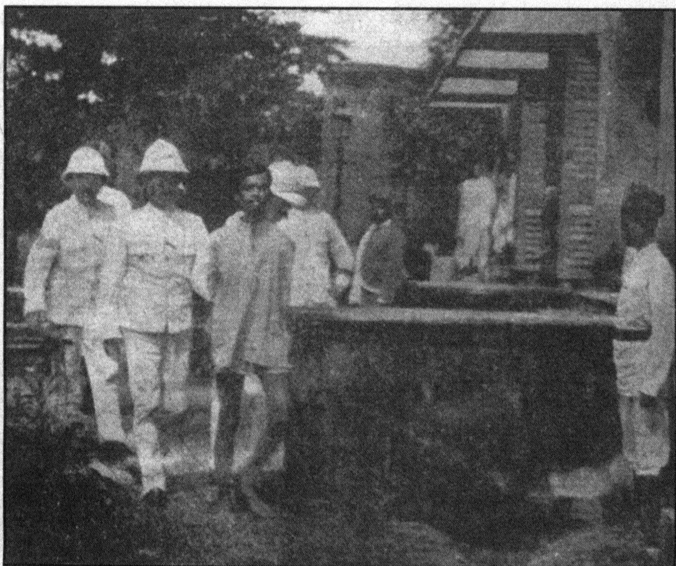
আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের প্রিজন ভ্যান থেকে নামিয়ে সেশন কোর্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে



নরেন গোঁসাইকে হত্যার অভিযোগে সত্যেন্দ্রনাথ বোসকে আলিপুর সেশন কোর্টে বিচারের জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। —১৯০৮



অভিযুক্ত উল্লাসকর দত্তকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আলিপুর সেশন কোর্টে



নরেন গোঁসাইকে হত্যার অভিযোগে কানাইলাল দত্তকে নিয়ে
যাওয়া হচ্ছে আলিপুর সেশন কোর্টে

ইতিহাসের ধারা



মানিকতলার মুরারিপুকুর বাগানবাড়ি যেখানে প্রথম তৈরি হয়



মুরারিপুকুরে এই গাছের গুঁড়িতে বিপ্লবীদের লক্ষ্য পরীক্ষা চিহ্ন



য়ুরোপীয় বিভিন্ন দেশের বণিক এদেশে এসেছিল ব্যবসা করতে। প্রথমে আসে পর্তুগিজ। তারপর একশ বছর বাদে ডাচ। ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ও ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আসে আরও পরে।

অন্যান্য পশ্চিম য়ুরোপীয় দেশের বণিকরাও এসেছিল। এদের মধ্যে ছিল প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কৌশল ও বুদ্ধিতে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বজায় ছিল শেষ পর্যন্ত। সতের শতকের প্রথমে তারা হুগলি, কাশিমবাজার ও ঢাকায় কুঠি স্থাপন করে। মালপত্র পাঠাবার শুল্ক ছিল খুবই বেশি। আর এ নিয়ে মুঘল কর্মচারীদের সঙ্গে কোম্পানি কর্তৃপক্ষের বিরোধ বাধে। বাংলার নবাব তখন শায়েস্তা খাঁ। মুঘল সৈন্যদের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ইংরেজ সৈন্যরা হুগলি ত্যাগ করে। কোম্পানির সুচতুর প্রতিনিধি সম্রাট আওরঙজেবের কাছ থেকে বাংলায় বাণিজ্য সনদ লাভ করে। বিনা শুল্কে বাংলায় বাণিজ্য করার অধিকার পায়। ইংরেজ কুঠির অধ্যক্ষ জব চার্ণক ১৬৯০ খ্রিঃ সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও ডিহি কলকাতা—এই তিনটি গ্রাম নিয়ে পত্তন করেন শহর কলকাতার। এই কলকাতায় হেস্টিংস-এর আমলে ইংলন্ডের রাজার নামে নির্মিত হয় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ। আঠার শতকের প্রথমে বাংলায় ও ভারতে ইংরেজরা বাণিজ্য ব্যাপারে বহু সুবিধা পেয়েছিল। আওরঙজেবের মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রিঃ। তারপর দিল্লির বাদশাহদের কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়তে থাকে। বাংলার নবাবরা প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন হয়ে ওঠে। মুর্শিদকুলী খাঁ, সুজাউদ্দীন, সরফরাজ খাঁ, আলীবর্দি খাঁ—কেউ প্রসন্ন ছিলেন না ইংরেজ কোম্পানির ওপর। সিরাজদৌলার সিংহাসন আরোহণের পর কোম্পানির উদ্ধত আচরণ বেড়ে যেতে থাকে। সিরাজের মাসি ঘসেটি বেগম এবং তাঁর সেনাপতি মীরজাফর ইংরেজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এ সংবাদ সিরাজের জানা ছিল। ইংরেজ ও ফরাসিরা নবাবের অনুমতি ছাড়াই কুঠি নির্মাণ করছিল। সিরাজদৌলা উভয়পক্ষকে কুঠি নির্মাণ বন্ধের আদেশ দিলে ফরাসিরা কুঠি নির্মাণ বন্ধ রাখলেও, ইংরেজরা আদেশ অমান্য করে। এমন কি ইংরেজরা ভবিষ্যৎ যুদ্ধের জন্য কলকাতা দুর্গকে সুরক্ষিত করে চলে। ক্রুদ্ধ সিরাজ ১৭৫৬ খ্রিঃ কাশিমবাজারে ইংরেজ কুঠি লুঠ করে, কলকাতা অধিকার করেন। কলকাতার বেশ কিছু ইংরেজ ফলতায় পালিয়ে যায়, অনেকে আশ্রয় নেয় গঙ্গায়। আবার কেউ কেউ ডুবে মরে গঙ্গায়। কলকাতার বিপন্ন ইংরেজদের উদ্ধার করতে মাদ্রাজ থেকে সৈন্য ও যুদ্ধ জাহাজ নিয়ে এগিয়ে আসেন রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন। ১৭৫৭ খ্রিঃ ২ জানুয়ারি ইংরেজরা দখল করে ফোর্ট উইলিয়াম। নবাবও হাজির সসৈন্যে। চতুর ক্লাইভ নবাবকে অতর্কিত আক্রমণে বিপর্যস্ত করে ফেলেন। আলিনগরের সন্ধি অনুসারে কোম্পানিকে বেশ কিছু বাণিজ্য সুবিধা ও কলকাতায় দুর্গ নির্মাণের অধিকার ও ক্ষতিপূরণ দিয়ে নবাব সিরাজদৌলা ফিরে গেলেন মুর্শিদাবাদ। কিন্তু অমীমাংসিত ব্যাপার থেকে গেল বেশি। আলিনগরের সন্ধি ছিল ক্ষণস্থায়ী। মুর্শিদাবাদে তখন ষড়যন্ত্র বেশ দানা বেঁধে উঠেছে। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রাজবল্লভ, মহাতাপ রায় প্রভৃতির সঙ্গে ক্লাইভের এক গোপন চুক্তি হয়। এই ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন মীরজাফর। চুক্তির শর্ত ছিল সিরাজকে সরিয়ে বাংলার নবাব করা হবে মীরজাফরকে। এর বিনিময়ে তিনি ইংরেজদের দেবেন অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ। ক্লাইভ সব কিছু গুছিয়ে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। মুর্শিদাবাদের পঁচিশ মাইল দক্ষিণে পলাশীর প্রান্তরে সৈন্য সমাবেশ করে ক্লাইভ। তাদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিন হাজার। আর নবাব পক্ষে ছিল পঞ্চাশ হাজার পদাতিক এবং আঠার হাজার অশ্বারোহী ও ওলন্দাজ। অপরিণামদর্শী



লর্ড কার্জন ভাইসরয় নিযুক্ত—১৯০০— ব্যঙ্গচিত্রের চোখে



মিথ্যাবাদী কার্জন—ব্যঙ্গচিত্রের চোখে

নবাব আস্থা রেখেছিলেন মীরজাফর ও রায়দুর্লভের ওপর। তারা সৈন্য নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। মীরমদন ও রাজা মোহনলাল বীরত্বের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে রক্ষা করতে ব্যর্থ হন বাংলার স্বাধীনতা। যুদ্ধ ছিল সম্পূর্ণ ইংরেজের অনুকূলে। পরাজিত সিরাজ মুর্শিদাবাদ ছেড়ে পালালে ধরা পড়লেন রাজমহলের কাছে। তাকে নিয়ে আসা হয় মুর্শিদাবাদ। মীরজাফরের পুত্র মীরণের আদেশে কারাগারে সিরাজকে নৃশংসভাবে হত্যা করে মহম্মদী বেগ।

বাংলা স্বাধীনতা হারায় ১৭৫৭ খ্রিঃ ২৩ জুন।

সিরাজের মৃত্যুর পর বাংলায় রাজনৈতিক ইতিহাস বদলে গেল আমূল। সিরাজের ত্রুটি যতই হোক না কেন, বিদেশিশক্তি প্রতিরোধ করে বাংলার স্বাধীনতা রক্ষায় তার প্রয়াস ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। সিরাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার প্রায়শ্চিত্ত বাঙালিকে শোধ দিতে হয়েছে দুশ বছর ধরে।

কূট বুদ্ধি ও দুঃসাহসিকতা মানুষকে যে কতখানি সহায়তা করে, তার উজ্জ্বল নিদর্শন ক্লাইভ। মাদ্রাজ কুঠির সামান্য কেরাণি থেকে পলাশী যুদ্ধের নায়ক, তারপর বাংলার ভাগ্যবিধাতা। ক্লাইভ বাংলায় ইংরেজ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন পলাশী যুদ্ধের পর। তারপর তিনি দেশে ফিরে গেলেও কোম্পানির ডিরেকটররা তাকে গভর্নর জেনারেল করে আবার বাংলায় পাঠান। ক্লাইভ কোম্পানির স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালান। কোম্পানির দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণও করেন।

ইতিহাসে দুর্লভ বিশ্বাসঘাতক চরিত্র মীরজাফরকে বাংলার পুতুল নবাব করে কোম্পানি। নবাবী লাভের বিনিময়ে কোম্পানিকে বিপুল পরিমাণ অর্থ পারিতোষিক দিতে গিয়ে তিনি নিজেই বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন অর্থাভাবে। ইংরেজদের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক ক্রমশ তিক্ত হয়ে ওঠে। চুঁচুড়ার ওলন্দাজদের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হলেন মীরজাফর। ১৭৫৯ খ্রিঃ ক্লাইভ ওলন্দাজদের পরাস্ত করেন। বাংলার গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট মীরজাফরকে সরিয়ে দিলেন অরাজকতা সৃষ্টি ও কুশাসনের অজুহাতে। এবার নবাব হলেন মীরজাফরের জামাই মীরকাসিম। কিন্তু এই নির্বাচন ইংরেজদের পক্ষে সুখকর হয়নি। স্বাধীনচেতা মীরকাসিমের সঙ্গে সদ্ভাব ছিল না ইংরেজদের। তাদের অমতে মীরকাসিম রাজধানী মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে সরিয়ে নিয়ে যান। বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপার নিয়ে নবাবের সঙ্গে কোম্পানির সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। ১৭১৭ খ্রিঃ-এর বাদসাহী ফরমান লঙ্ঘন করায় কোম্পানির লাভ হলেও, নবাবের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছিল এবং দেশীয় ব্যবসায়ীরা প্রচন্ড অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিল। মীরকাসিম এই ব্যবস্থা বন্ধের অনুরোধ জানালে কোম্পানি তা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেনি। তারপর নবাব ঘোষণা করলেন সব শ্রেণির ব্যবসায়ী বিনাশুল্কে ব্যবসা করবে। কোম্পানির স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় পাটনা অধিকার করতে এগিয়ে আসেন পাটনা কুঠির অধ্যক্ষ এলিস। শুরু হয়ে যায় প্রত্যক্ষ সংগ্রাম। কাটোয়া, গিরিয়া, উদয়নালা এবং আরো কয়েকটি স্থানের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হন। দিল্লির সম্রাট সাহ আলম এবং অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার সহযোগিতায় মীরকাসিম ইংরেজদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হলে ১৭৬৪ খ্রিঃ বকসার যুদ্ধে সেনাপতি মনরোর কাছে পরাজিত হন। তের বছর পরে মীরকাসিম মারা যান দিল্লিতে।

বকসারের এই যুদ্ধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পলাশী যুদ্ধের পরও কোম্পানির আশা অপূর্ণ থেকে যায়। বকসারের যুদ্ধের পর তার পূর্ণতা প্রাপ্তি ঘটে। অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে ইংরেজদের আর যুদ্ধ করতে হয়নি। যে সব যুদ্ধে তারা জড়িত হয়েছিল পরবর্তী সময়ে, তার কারণ ছিল প্রভুত্ব বিস্তার। ১৭৮৫ খ্রিঃ রবার্ট ক্লাইভ দিল্লির সম্রাট সাহ আলমের সঙ্গে এক চুক্তিতে আবদ্ধ হন। কোম্পানিকে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ান নিযুক্ত করেন সম্রাট সাহ আলম। কোম্পানি



বঙ্গভঙ্গ : হিন্দিপাঞ্চ, জুলাই ১৯০৫

এই অঞ্চলে রাজস্ব আদায় করবে। এই রাজস্ব থেকে দিল্লির সম্রাট ও বাংলার নবাব পাবেন যথাক্রমে ছাব্বিশ লক্ষ ও তিপ্পান্ন লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি। চতুর ইংরেজ বাংলার সর্বময় কর্তা হয়ে গেল। সামরিক শক্তি, ধনসম্পদ, শাসনক্ষমতা সব কিছুরই অধিকারী হল তারা। বাংলার নবাবের কোন ক্ষমতাই আর থাকল না। বলা যায় এই সময় থেকেই বাংলায় ইংরেজ শাসনের শুরু। কয়েক বছরের মধ্যে সম্রাটের বার্ষিক বৃত্তি বন্ধ হয়ে যায়। আর নবাবের বৃত্তি কমে যায় একুশ লক্ষ টাকা।

কোম্পানি দেওয়ানি লাভ করলেও, দেওয়ানির কাজ চালাত মুহম্মদ রেজা খাঁ ও সিতাব রায় নামে দুই কুখ্যাত ব্যক্তি। এরা প্রজাদের ওপর নির্মম অত্যাচার চালাত রাজস্ব আদায়ের জন্য। ফলে ১৭৬৯-৭০ খ্রিঃ বাংলায় এক ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। দুর্ভিক্ষটি 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে পরিচিত। এই কৃত্রিম দুর্ভিক্ষ মানুষের ইতিহাসে জঘন্যতম ঘটনা— যার তুলনা নেই। বাংলার একতৃতীয়াংশ মানুষ মারা পড়ে অনাহারে। অধিকাংশ কৃষিজমি পরিণত হয় জঙ্গলে। এই দুর্বিষহ অবস্থায় কোম্পানি কর্মচারীরা সমস্ত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করতে থাকে। পরে চড়া দামে বিক্রি করে। দয়াপরবশ হয়ে সেদিন দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের খাজনা মাত্র পাঁচ শতাংশ হ্রাস করা হয়েছিল। অবশ্য পরের বছরই খাজনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শতকরা দশ টাকা।

ইংলন্ডে কোম্পানির ডিরেকটর ওয়ারেন হেস্টিংসকে বাংলার গভর্নর করে পাঠায় ১৭৭২ খ্রিঃ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব স্বয়ং কোম্পানি গ্রহণ করে। হেস্টিংস বুঝেছিলেন জমিই হল এদেশের সম্পদ। রাজস্বের উৎস সেখানেই। রাজস্বের জন্য জমি নিলামে ওঠাবার ব্যবস্থা হল। সর্বোচ্চ রাজস্ব দিতে সম্মত ব্যক্তি পাঁচ বছরের জন্য এবং আরো এক বছরের জন্য জমি লাভ করত। ফল ভাল হল না। রাজস্ব আদায়ের জন্য প্রজাদের ওপর অত্যাচার চলতে থাকে, কিন্তু জমির উৎকর্ষ বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা ছিল না।

নতুন গভর্নর হয়ে এলেন কর্ণওয়ালিশ ১৭৮৬ খ্রিঃ। তিনি পুরোন ব্যবস্থা বাতিল করে জমিদারদের জমির স্বত্ব দিয়ে দিলেন বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে। এটি ছিল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ফলে সরকারের আয় নির্দিষ্ট হল এবং দেশের মধ্যে ফিরে এল কিছুটা শৃঙ্খলা। কিন্তু প্রজাসাধারণের অবস্থার কোন পরিবর্তন হল না। তাদের ওপর অত্যাচার ও অবহেলা অব্যাহত থাকল। ছোট ছোট জমিদাররা মারা পড়ল। রাজস্ব পরিমাণ স্থির থাকায় জমির দাম বেড়ে গেলেও রাজস্ব বেশি দাবি করতে পারত না সরকার।

পলাশী যুদ্ধের পরবর্তী পঞ্চাশ বছরে বাংলায় ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হলেও, বাঙালির ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তনই সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু তার পরবর্তী একশ বছরে জীবনের রূপটা বদলে গেল আমূল। সরকারি কাজের সুবিধার জন্য চলল ইংরেজি শিক্ষার বিস্তার। সেই সঙ্গে চলল খ্রিস্ট ধর্ম প্রচার। বাংলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা নিয়ে এল যুগান্তর—অবশ্য বিশেষ এক শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এই পরিবর্তনের স্রোত। ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালি ফরাসি বিপ্লবের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হল। চিন্তার মুক্তি ও স্বাধীনতার চিন্তা বাঙালিকে নাড়া দিল প্রচন্ড ভাবে। স্বদেশ প্রেম, জাতীয়তাবাদের উন্মেষ এবং রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রেরণায় বাঙালি সেদিন পথ দেখিয়েছিল সমগ্র ভারতকে।

পাশ্চাত্য শিক্ষা জড়ত্বপ্রাপ্ত জাতির বন্ধনমুক্তি ঘটায়। ইংরেজি শিক্ষায় সঙ্কীর্ণ চিন্তা আত্মস্বাতন্ত্র্যে উদ্দীপ্ত হয়ে স্বাধিকার কামনায় প্রমত্ত হয়ে ওঠে। ধীরে ধীরে দেশপ্রেমিক মানুষের মনে অখন্ড ভারতের স্বপ্ন জীবন্ত হয়ে উঠতে থাকে। ইতালির স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনি, ফরাসি বিপ্লবের বজ্রকঠিন কণ্ঠস্বর, আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস এদেশের বুদ্ধিজীবী সমাজকে বিচলিত করে। কিন্তু প্রথম লগ্নে রাষ্ট্রীয় শাসন অধিকারের সংগ্রামে তখনও জাতীয় মানস ছিল অপ্রস্তুত। জাতীয়তাবোধ ক্রমশঃ উল্লেখযোগ্য রূপলাভ করে উনিশ শতকের শেষে।



বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জন্ম নেয় বৃহৎ স্বদেশি আন্দোলন, হিন্দি পাঞ্চ ১৯০৫ অক্টোবর

সিপাহী বিদ্রোহ, নীলকর বিরোধ আন্দোলন, হিন্দুমেলা, সংবাদপত্রের অভ্যুদয়, রোমান্টিক কাব্যের বিকাশ, মধ্যবিত্ত শ্রেণির আত্মপ্রকাশ, ব্রাহ্মসমাজ, জাতীয় মঞ্চ, নাট্যাভিনয়, ইন্ডিয়ান লিগ, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, জাতীয় কনফারেন্স, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ, থিওসোফিক্যাল সোসাইটি—জাতীয় চিন্তায় নবভাবনার উন্মেষ ঘটায়। সমগ্র দেশব্যাপী যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয়, বাঙালির স্থান সেখানে নগণ্য ছিল না। দেশাত্মবোধের মহান মন্ত্র উজ্জীবনে রামমোহন রায়, রামগোপাল ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোমোহন বসু, নবগোপাল মিত্র, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতির দান সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য।

সমকালীন বাংলায় পরিবর্তিত স্রোত ধারার কয়েকজন দিকপাল পুরুষ নিয়েছিলেন অসামান্য ভূমিকা। আঠার শতকের কুসংস্কারাচ্ছন্ন বাঙালির সামনে নতুন জীবনের সন্ধান নিয়ে আসেন রামমোহন রায়। অসামান্য ব্যক্তিত্ব, অতুলনীয় পান্ডিত্যের অধিকাবী রামমোহনের ছিল বিশাল হৃদয় আর উদার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছিল তাঁর জীবনাদর্শ। ধর্মের নামে ভন্ডামিরত বাক্‌সর্বস্ব সমাজপিতাদের মুখোশ খুলে দিয়ে তিনি হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও মূর্তি পূজার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিলেন। বাঙালির জীবন থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামি, জাতিভেদ প্রথা, সতীদাহ, বাল্যবিবাহ, কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস—বলা যেতে পারে সামগ্রিক অমানবিক প্রথাগুলি উচ্ছেদের জন্য তিনি যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন তার জন্য রামমোহনকে সামাজিক প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হয়েছিল। তাঁরই প্রয়াসে সতীদাহ নিরোধক আইন বিধিবদ্ধ হয়। নতুন ধর্মীয় 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসার, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি আন্দোলনের তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ।

রামমোহনের জন্ম ১৭৭২ খ্রিঃ। আর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮১৭ খ্রিঃ। রামমোহন মারা যান ১৮৩৩ খ্রিঃ। দেবেন্দ্রনাথ মারা যান ১৯০৫ খ্রিঃ। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম আদি পুরুষ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রামমোহনের ব্রাহ্মসমাজকে পৌত্তলিকতা মুক্ত করে পুনরুজ্জীবিত করেন এবং সারা ভারতে ব্রাহ্মধর্ম ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার ইতিহাসের ধারাপথে দেবেন্দ্রনাথেব 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

রামমোহনের প্রায় পঁচিশ বছর পরে জন্ম বিদ্যাসাগরের। দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর স্বদেশ ও স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁর অসামান্য মানসিক ও চারিত্রিক দৃঢ়তা, বিশাল হৃদয়, গভীর পান্ডিত্য বাঙালিকে দেয় নতুন জীবনের সন্ধান। রামমোহনের পর বিদ্যাসাগরই ছিলেন অন্যতম সমাজসংস্কারক। বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন জাতির জীবনের সর্বস্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিয়ে অন্ধতা, ক্ষুদ্রতা ও মালিন্য দূর করতে। ইংরেজি শিক্ষা প্রসারের জন্য ১৮৫৯ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন। বালবিধবা পুনর্বিবাহের জন্য তাঁর সংগ্রাম ও বহুবিবাহ বিরোধী ভূমিকা বাংলার সমাজজীবনের অমানবিক চরিত্রকে ভেঙে গুড়ো গুড়ো করে দিয়েছিল। স্বাদেশিকতার প্রতিমূর্তি বিদ্যাসাগর বাংলাসাহিত্যেরও অন্যতম কৃতী পুরুষ।

উনিশ শতকের নবজাগরণের বিশিষ্ট চরিত্র রাজনারায়ণ বসুর জন্ম ১৮৩৬ খ্রিঃ। জাতীয়তাবোধের উন্মেষে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী। সমাজসংস্কারক ও স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের অনুপ্রেরণায়, ঠাকুরবাড়ির সহযোগিতায় এবং নবগোপাল মিত্রের চেষ্টায় ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের উন্মেষের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় হিন্দুমেলা।

এই সময়ে কেশবচন্দ্র সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, আনন্দমোহন বসু, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রমুখ বাঙালি জীবনের নতুন প্রবাহে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় কেশবচন্দ্র 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৬৭ খ্রিঃ কেশবচন্দ্র সেনের চেষ্টায়



মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট ব্যামফিল্ড ফুলার
শিল্পী : গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রার্থনাসমাজের প্রতিষ্ঠা এবং ১৮৭৫ খ্রিঃ দয়ানন্দ সরস্বতীর চেষ্টায় আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে পরিবর্তন নিয়ে আসে। থিয়োসোফিক্যাল সোসাইটির কর্মপ্রচেষ্টায় প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ছিল অন্যতম সহায়ক।

তারপর এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস। তাঁর জন্ম ১৮৩৬ খ্রিঃ। হিন্দুধর্মের পুনরুজ্জীবন ও জাতিভেদ দূরীকরণে রামকৃষ্ণের অবদান অসামান্য। এ সময়ের উল্লেখযোগ্য ঘটনা রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠা। ১৮৯৭ খ্রিঃ বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠা করেন রামকৃষ্ণ মিশন। উনিশ শতকের নবজাগরণে রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের প্রভাব ছিল গভীর। নবজাগরণের কেন্দ্রভূমি বাংলাদেশ রামকৃষ্ণের বাণী ও শিক্ষায় নবভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতের ধর্মজীবন ও পাশ্চাত্যের প্রগতিশীল শিক্ষাধারার সমন্বয়সাধনে প্রয়াসী। অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এবং নিপীড়িত জনগণের উন্নতির জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠাই বিশ্বে সনাতন ভারতীয় সভ্যতার যোগ্য স্থান লাভে সহায়তা করেছিল। বেদান্তের আদর্শ প্রচার করে ভারতের তরুণ সমাজকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন এবং প্রাণহীন হিন্দুধর্মে নতুন প্রাণসঞ্চার করেন।

বাংলাসাহিত্যের দিক্‌পাল পুরুষ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অসামান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। ধর্মীয় গোঁড়ামিকে তীব্র কষাঘাত করে জাতিভেদপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক প্রথার বিরোধিতা করেছিলেন। বাংলার কৃষককে নতুন চোখে বিশ্লেষণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। স্বদেশপ্রেমিক ও জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বাঙালি ও বাংলাদেশে নবজাগরণের অন্যতম পথিকৃৎ।

নীলকর বিরোধী আন্দোলনে, দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বলিষ্ঠ সাংবাদিকতা বাংলার মানুষের মনে নতুন চিন্তার প্রবাহ এনে দেয়। 'নীলদর্পণে'র অভিনয় বন্ধ করে দেয় সরকার।

১৮৫১ খ্রিঃ প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের নেতা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল এবং আরো অনেকে। ইন্ডিয়ান লিগ বা ভারতসভা অনেকটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর চেষ্টায়। এর সেক্রেটারি ছিলেন আনন্দমোহন। দেশীয় সরকারি কর্মচারীদের দাবি-দাওয়া সম্পর্কে আন্দোলন করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এই সংগঠন গড়ে ওঠে।

এর আগে বাংলাদেশে স্বাদেশিক আন্দোলনের সূচনা হয় ঠাকুর পরিবারে। তাদের পুরোধা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র প্রভৃতিকে নিয়ে রাজনারায়ণ 'স্বদেশিকদের সভা' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৬৫ খ্রিঃ। জাতির সামগ্রিক জীবনে দেশপ্রেমবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে এঁরা হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠান করেন ১৮৬৭ খ্রিঃ ১২ এপ্রিল। জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের হিন্দুমেলার ভূমিকা ছিল ঐতিহাসিক। বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে দেশাত্মবোধের বাণী প্রচারে এর অবদান অনন্য। হিন্দুমেলার ন্যায় জাতীয় সংস্থা এর আগে আর কোথাও গড়ে ওঠে নি। দেশের সর্বশ্রেণির মানুষ তাদের আহ্বানে এসে মিলিত হয়েছিল। হিন্দুমেলার কর্মসূচি ছিল :

> "১৭৮৮ সালের চৈত্র সংক্রান্তিতে যে একটি জাতীয় মেলা হইয়াছিল, স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ দ্বারা স্বদেশের উন্নতিসাধন করাই তাহার উদ্দেশ্য।"
>
> "উদ্দেশ্য সাধনোপায় ছয় শ্রেণিতে বিভক্ত হয়—"
>
> "১। এই মেলাভুক্ত একটি সাধারণ মন্ডলী সংস্থাপিত হইবে। তাহারা হিন্দু জাতিকে উপরোক্ত লক্ষ্য সকল সংসাধনের জন্য একদলে অভিভুক্ত এবং স্বদেশীয় লোকগণ মধ্যে পরস্পর বিদ্বেষ ভাব উন্মূলন করিয়া উপরোক্ত সাধারণ কার্যে নিয়োগ করত এই জাতীয় মেলার গৌরববৃদ্ধি করিবেন।"



মর্লের ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল বিলে কার্জনের বিরোধিতা ১৯০৯—ব্যাঙ্গচিত্রের চোখে

"২। প্রত্যেক বৎসর আমাদিগের হিন্দুসমাজের কত দূর উন্নতি হইল, এই বিষয়ের তত্ত্বাবধানের জন্য চৈত্র সংক্রান্তিতে বৃত্তান্ত পাঠ করা হইবে।"

"৩। অস্মদ্দেশীয় যে সকল ব্যক্তি স্বজাতীয় বিদ্যানুশীলনের উন্নতিসাধনে ব্রতী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের উৎসাহবর্ধন করা যাইবে।"

"৪। প্রতি মেলায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির লোকের পরিশ্রম ও শিল্পজাত দ্রব্য সংগৃহীত হইয়া প্রদর্শিত হইবে।"

"৫। প্রতি মেলায় সঙ্গীতনিপুণ ব্যক্তিগণের উৎসাহবর্ধন করা যাইবে।"

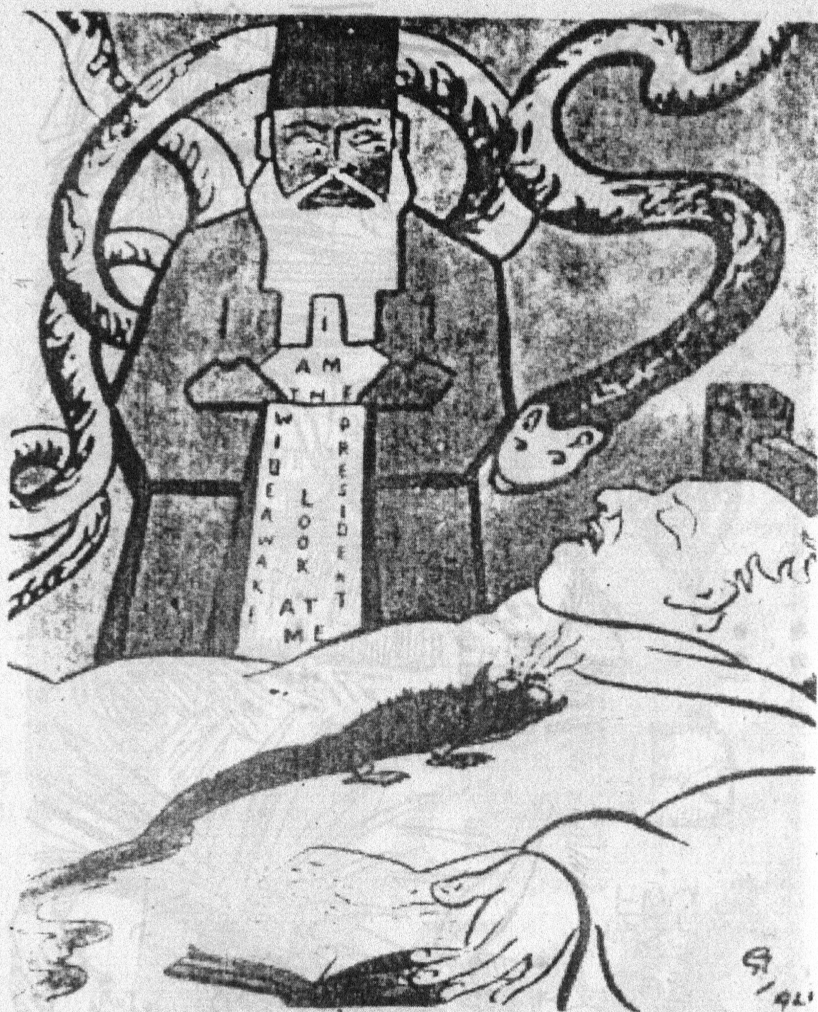
"৬। যাঁহারা মল্লবিদ্যায় সুশিক্ষিত হইয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছেন, প্রতি মেলায় তাঁহাদিগকে একত্র করিয়া উপযুক্ত পারিতোষিক বা সম্মান প্রদান করা যাইবে এবং স্বদেশীয় লোক মধ্যে ব্যায়ামশিক্ষা প্রচলিত করিতে হইবে।"

রাজনারায়ণ বসু লিখেছিলেন ঃ "শিল্প ও বাণিজ্যের প্রতি অমনোযোগের জন্য দিন দিন আমরা দুর্বল হইয়া পড়িতেছি। ইংলন্ডের উপর আমাদেব নির্ভর দিন দিন বাড়িতেছে। কাপড় পরিতে হইবে, ইংলন্ড হইতে কাপড় না আসিলে আমরা পরিতে পাই না। ছুরি, কাঁচি ব্যবহার করিতে হইবে, বিলাত হইতে প্রস্তুত না হইয়া আসিলে আমরা তাহা ব্যবহার করিতে পাই না। এমন কি বিলাত হইতে লবণ না আসিলে আমরা আহার করিতে পাই না। দেশলাইটি পর্যন্ত বিলাত হইতে প্রস্তুত হইয়া না আসিলে আমরা আগুন জ্বালিতে পারি না। দেশ হইতে কিছুই হইতেছে না।....ইংরেজি শিক্ষার দ্বারা আমাদিগের হৃদয়ে উচ্চ উচ্চ বাসনার উদ্রেক হইতেছে, কিন্তু রাজপুরুষেরা আমাদিগের সেই সকল বাসনা পূর্ণ করিতেছেন না। আমরা গভর্নমেন্টের দোষ সকল বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আমাদিগের হাত-পা বাঁধা, সে সকল দোষ সংশোধন বিষয়ে আমাদের কোন কথাই চলে না।"

প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও সে সময়ে দেশে কয়েকটি গুপ্ত সমিতি গড়ে ওঠে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রাজনারায়ণ বসু প্রতিষ্ঠিত 'সঞ্জীবনী সভা' ছিল এমন একটি সংগঠন। এ দলের আদর্শ ছিল ইতালির গুপ্ত বৈপ্লবিক সংগঠনগুলি।

পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার বাঙালি শিক্ষিত সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমাদের হীনতাকে, দীনতাকে। য়ুরোপীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আমদানি ভারতের সমাজ জীবনে নিয়ে আসে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ধর্মীয় ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে ওঠে। সতীদাহ প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথার বিলোপের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের জনসাধারণের রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটে। বৃহত্তর জীবনে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। বন্দিনী নারী অর্থনৈতিক কারণে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে বাধ্য হল। রাজনৈতিক ও শিক্ষার জগতে মহিলাদের অবদান কম নয়। সমাজ ও ধর্মসংস্কারের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতির চেষ্টায় ভারতের সামাজিক অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন ও উন্নতিসাধিত হয়। বহুকাল ধরে এদেশের জনসাধারণের মনে ধর্মের বিরুদ্ধে একটি অসহিষ্ণুতার ভাব বর্তমান ছিল। সুতরাং পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে নতুন জাতীয়তাবোধ বা মানবতার সুর শোনা গেল। এদেশের জনগণের মধ্যে, তা অবশ্য আকস্মিক নয়। স্তিমিত অগ্নিকণা উপযুক্ত উপাদানে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। কুসংস্কার, কূপমন্ডূকতা, আত্মবিরোধ। নির্জীবতার বেড়াজাল উত্তীর্ণ হয়ে প্রস্ফুটিত হল প্রগতিশীল চিন্তাধারার অভিনব অধ্যায়।

অবশ্য তখনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা দেশবাসীর মনে জাগেনি। ধর্ম ও সমাজের বন্ধনমুক্তিই ছিল কাম্য। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই এই সংগ্রামের সূচনা। তখনকার বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা মনে করতেন, ইংরেজ দিয়েছে মানবতার বাণী, স্বাধীনতার চিন্তা--তাই ইংরেজ শাসনকে মঙ্গলের প্রতীক বলে মেনে নেওয়া হয়েছিল। তারা মনে করতেন ব্রিটিশ শাসন ছিল তখন প্রয়োজন। প্রথমে তারা চেয়েছিলেন দেশের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শিক্ষার বিস্তার, জাতীয়



বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাপর্বে মুসলিম লিগের জন্ম : শিল্পী গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাবের উন্মেষ। তারপর রাজনৈতিক স্বাধিকার, সরকারি কর্মে ভারতীয় নিয়োগ, শিল্প প্রসারকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। কিন্তু ধর্ম ও শিক্ষার স্বাধীনতার মধ্যে যে বাসনা জেগে উঠেছিল, যে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নতুন আলোকের সন্ধান পেয়েছিল—ধর্ম ও সমাজকে ভেঙে নতুন রূপ দিয়েছিল—তাই-ই পরবর্তীকালে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা কামনায় প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে। যে সত্যের প্রেরণায় বাঙালি ধর্মের বন্ধনকে পরাজিত করেছিল, তাই-ই তাকে পথ দেখাল রাষ্ট্রদ্রোহিতার-স্বাধীনতার।

সনাতন সভ্যতার ঐতিহ্য ভেঙে পড়েছে; অথচ বিশ্বসংস্কৃতির দরবারে আমরা নিঃস্ব নই। আমাদের জড়ত্ববোধকে দূর করবার জন্য জাতির নেতারা বলিষ্ঠ কণ্ঠে আহ্বান জানালেন। আমাদের পরাধীনতা সুপ্ত স্বদেশপ্রেমকে—সংগ্রামী মনোভাবকে জাগিয়ে তুলল। তীব্র বেদনানুভবের মধ্য দিয়ে জন্ম নিল স্বদেশি আন্দোলন। স্বদেশপ্রেমের মহান মন্ত্রে জাতির প্রাণে এল নবজীবনের জোয়ার।

বিদেশি শাসন ভারতের সমাজজীবনে এনেছিল বিপ্লব। আমাদের জড়ত্ব, পল্লীসমাজ, কুটির ও কৃষিকর্মকে বিধ্বস্ত করে সমগ্র জীবনভূমিকে পাল্টে দিয়েছিল। ইংরেজ আমাদের জীবনকে বিনষ্ট করেছে। পারিপার্শ্বিক বা ইতিহাসের ধারায় যে শিল্পবিপ্লব ঘটেছিল তাকে বলা যায় অনিবার্য। ইংরেজ তার সাম্রাজ্যবিস্তারের স্বার্থেই ভারতকে শোষণ করেছিল—ভারতের প্রতি প্রেমবশত শিল্পায়নের বিপ্লব ঘটায়নি। সাধারণ মানুষের নিঃসীম দুর্গতি—ব্রিটিশভৃত্য ভারতীয়ের আত্মসন্তোষ প্রভৃতির চিত্র রয়েছে রামপ্রসাদের গানে ঃ

করুণাময়ি! কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা (ওগো তারা)
আমার এমনি দশা, শাকে অন্ন মেলে কই॥
কারে দিলে ধন-জন, মা, হস্তী-অশ্ব-রথ-চয়
ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর,
আমি কি তোর কেউ নয়?
কেহ থাকে অট্টালিকায়, মনে কবি তেমনি হই,
মাগো, আমি কি তোর পাকা খেতে
দিয়েছিলাম মই?

কোম্পানির শাসনের প্রথম দিক থেকে যে বিদ্রোহের সূচনা হয় তাতে বাংলাদেশের ভূমিকা ছিল অগ্রণী। এই বিদ্রোহ ছিল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যাব্যাপী। বাংলাদেশের অত্যাচারিত তাঁতিরা কোম্পানির নির্দেশে কাজ করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করে, তাঁতের কাজ ছেড়ে দিয়ে কৃষি কাজে মন দেয়। শান্তিপুরের তাঁতিরা কারাবরণ করেছে। তমলুক, হিজলি প্রভৃতি অঞ্চলের লবণ কারখানায় কর্মীরা দাবিদাওয়া নিয়ে আন্দোলন শুরু করে ১৭৯৪ খ্রিঃ। ১৭৮২-৮৩ খ্রিঃ দিনাজপুরে কৃষক বিদ্রোহ ঘটে। বাঁকুড়ায় দীর্ঘকাল ধরে যে বিদ্রোহ চলেছিল তার প্রভাব সমস্ত বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরের ১৭৯৯ খ্রিঃ যে বিরাট আকারে চোয়াড়দের বিদ্রোহ দেখা দেয়, তার প্রভাব বীরভূম ও ধলভূমেও পড়েছিল। ১৭৬০ খ্রিঃ যে সন্ন্যাসীবিদ্রোহের সূচনা তা ১৮০০ খ্রিঃ পর্যন্ত চলেছিল। ইংরেজশক্তি এই বিদ্রোহ দমনে বিব্রত হয়ে ওঠে। মানভূমের জমিদার গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে চোয়াড়দের বিদ্রোহ ঘটে ১৮৩২ খ্রিঃ। ১৮৩৩ খ্রিঃ ময়মনসিংহ জেলায় আদিবাসীদের এক বিদ্রোহ ঘটে। দক্ষিণ বাংলায় তিতুমীরের নেতৃত্বে যে বিদ্রোহ ঘটে তা দীর্ঘকাল স্থায়ী ছিল। ১৮৫৫-৫৬ খ্রিঃ সাঁওতালবিদ্রোহই কোম্পানিকে সব থেকে বেশি বিব্রত করে।

নানাদিক থেকে বিচার করে বলা যায় ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের মধ্যে জাতীয় অভ্যুত্থানের অঙ্কুর নিহিত ছিল। ১৮৫৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি বহরমপুরে মঙ্গল পান্ডের আত্মাহুতির

মধ্য দিয়ে এই বিদ্রোহের সূচনা। সিপাহীদের মধ্যে উদ্দীপ্ত চেতনা ১৮৫৭ সালের ১০ মে মিরাটে প্রচন্ড বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর বিদ্রোহ করে ফিরোজপুর ও মজফরনগরের সিপাহীরা। লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, ফতেপুর, কানপুর, অযোধ্যা, উত্তরপ্রদেশ, মথুরা, রুড়কি, ফতেগড়, ফৈজাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ চরম রূপলাভ করে। বাহাদুর সাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। বাংলাদেশে ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, যশোহর, বীরভূম, বর্ধমান, নদীয়া, নোয়াখালি প্রভৃতি অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে যায়। বিদ্রোহী অঞ্চলগুলিতে সিপাহীরা জনসমর্থন লাভ করেছিল বিপুলভাবে। দেশীয় রাজা মহারাজাদের ইংরেজ-আনুগত্য তাদের সার্থক সংগ্রামের অন্যতম প্রতিবন্ধক ছিল। এই বিদ্রোহ জাতিধর্ম-নির্বিশেষে প্রতিটি ভারতবাসীকে বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করেছিল পরবর্তী কালে। ১৮৫৮ খ্রিঃ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে
চায় হে, কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্বশৃঙ্খল বলো কে পরিবে
পায় হে, কে পরিবে পায়?

—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ জাতীয় মুক্তি-আন্দোলন এবং ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় সূচিত করে।

বিপিনচন্দ্র পালের একটি কথা এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য—

"বাংলার নবযুগের ইতিহাসে মুষ্টিমেয় ইংরেজি-নবীশদের মধ্যে যে ধর্ম ও সমাজ-দ্রোহিতা জাগিয়া উঠিয়াছিল, তাহার সঙ্গে দেশের জনসাধারণের একটা অতি নিগূঢ় যোগ ছিল না এরূপ কল্পনা করা যায় না। ফলতঃ এই ধর্ম ও সমাজদ্রোহিতাকে যাঁহারা বিদেশি অনুচিকীর্ষার ফলে একটা আগন্তুক ও আকস্মিক উৎপাত বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের সিদ্ধান্ত মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিচারে প্রতিষ্ঠিত হয় না।"

বিশ্ব ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষ ভাগ হল সাম্রাজ্যবাদের বীভৎসতম আত্মপ্রকাশের সূচনা। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা তখনও ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে পূর্ণ অসহযোগিতাব নীতি গ্রহণ করেন নি। দেশের উদ্দীপ্ত যুবসমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কংগ্রেসের এই মোহনিদ্রার জন্য। তখন বাংলার যুবশক্তি অধীর ও অশান্ত। জাপানের বলিষ্ঠ আত্মপ্রকাশ তাদের বিস্মিত করেছে। দেশ-বিদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাদের মনোভাবকে করে তুলেছিল চঞ্চল। এমন সময় দুঃস্বপ্নের মত এল কার্জনের 'বঙ্গভঙ্গ' প্রস্তাব। তারপর যে স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হয়, তার ক্ষেত্র দীর্ঘকাল ধরে প্রস্তুত হয়েই ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ জাতির জীবনে নব নব চিন্তার উন্মেষে স্বাজাত্যভিমান এবং স্বাদেশিকতা বোধকে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। ১৯০৬ খ্রিঃ বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় লিখলেন :

"Our ideal is freedom, which means absence of all foreign control Our method is passive resistance, which means organised determenation to refuse, to render any voluntary or honourary service to the Government."

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রাসবিহারী ঘোষ প্রমুখ চেয়েছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অধীনে উপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে বৈপ্লবিক সংগ্রামের সূচনা করেন অরবিন্দ, নিবেদিতা, বিপিনচন্দ্র, বারীন ঘোষ প্রমুখ। এঁদের আন্দোলনের ধারা ছিল গুপ্ত-বিপ্লবের পথ। বিদেশি দ্রব্য বয়কট করে বাংলা, সমগ্র ভারতের স্বদেশি শিল্পোন্নয়নের পথকে প্রশস্ত করেছিল। স্বদেশি শিল্পের বিকাশে বাংলার ভূমিকাকে অস্বীকার করলে ইতিহাস তার বিরোধিতা করবে। স্বদেশ সংস্কৃতিতে শিল্প, ধর্ম, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য প্রভৃতির দরবারে বাংলাদেশ তখন ভারতের আদর্শ। এই যুগের বাংলাসাহিত্য জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতা বোধকে এগিয়ে এনেছিল সব থেকে বেশি। জাতীয়তাবাদী সাহিত্যিকদের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র,

রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের নাম সর্বাগ্রে স্মরণযোগ্য। এঁদের রচনা জাতীয় আন্দোলনে নতুন প্রাণাবেগ সঞ্চার করেছিল। বিশ্ববিদ্যালয়, টেকনিক্যাল স্কুলের প্রতিষ্ঠা, জাতীয় শিক্ষাবিস্তারের পথকে প্রশস্ত করে। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে স্বাদেশিকতা ব্যাপকভাবে প্রকাশ পায়। বঙ্কিমের বন্দেমাতরম, রবীন্দ্রনাথের জনগণমন ভারতের কোটি কোটি মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে প্রাণবন্ত করে তোলে। স্বদেশি বাণী প্রচারের অন্যতম পুরোহিত ছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস।

স্বদেশপ্রেমকে তীব্রতর রূপদানের জন্য কলকাতায় যে 'শিবাজী উৎসব' ও 'বীর পূজার' প্রবর্তন হয়, তার গুরুত্ব অপরিসীম। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সরলা দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯০৪ খ্রিঃ শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। মহারাষ্ট্র নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এই উৎসবে যোগ দেওয়ার জন্য পুণা থেকে কলকাতায় এসেছিলেন। শিবাজী উৎসবের অন্যতম অঙ্গ ছিল শক্তিরূপিণী ভবানীর পূজা। ১৯০৬ খ্রিঃ শিবাজী উৎসব ও স্বদেশি শিল্পমেলায় নবপ্রাণ সংযোগ করেছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে কংগ্রেসের তখনও গভীর সংযোগ গড়ে ওঠেনি। কংগ্রেস সম্মেলনগুলিতে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তদের ভিড় ছিল খুবই কম। বুদ্ধিজীবী, উচ্চবিত্ত, অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী, ব্যারিস্টার, ডাক্তার, উকিল—এঁরাই ছিলেন কংগ্রেসের সেবক। জনজীবনের সঙ্গে সংযোগ গড়ে তোলার কোন প্রয়াসই ছিল না কংগ্রেসের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ তাই স্বদেশিসমাজ গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোন উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার সেই স্বকৃত মীমাংসা কখন কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না।"

রবীন্দ্রনাথ একটা স্বাধীন সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথের এই গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাধারার যথাযোগ্য মূল্যায়ন ঘটেনি।

স্বদেশিসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্র ঃ স্বদেশিসমাজ

[পাঠক দয়া করিয়া নিজের অভিপ্রায় মত এই নিয়মাবলীর পরিবর্তন পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করিয়া জোড়াসাঁকোয় ৬ নং দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে শ্রীযুক্ত বাবু গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ইহা সর্ব সাধারণের নিকট প্রকাশ্য নহে। বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে যাঁহারা এই কার্যে যোগ দিতে ইচ্ছুক আছেন তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা এইসঙ্গে পাঠাইলে বাধিত হইব।]

আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েকজনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব।

আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাবমোচন ও কর্তব্যসাধন আমরা নিজেরা করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে একান্ত বাধ্যভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজবিহিত দণ্ড স্বীকার করিব।

সমাজের অধিনায়ক ও তাঁহার সহায়তাকারী সচিবগণকে তাঁহাদের সমাজ-নির্দিষ্ট অধিকার অনুসারে নির্বিচারে যথাযোগ্য সম্মান করিব।

বাঙালি মাত্রেই এ সমাজে যোগ দিতে পারিবেন।

সাধারণত ২১ বৎসর বয়সের নীচে কাহাকেও গ্রহণ করা হইবে না।

এ সভার সভাগণের নিম্নলিখিত বিষয়ে সম্মতি থাকা আবশ্যক :

১। আমাদের সমাজের ও সাধারণত ভারতবর্ষীয় সমাজের কোন প্রকার সামাজিক বিধিব্যবস্থার জন্য আমরা গবর্নমেন্টের শরণাপন্ন হইব না।

২। ইচ্ছাপূর্বক আমরা বিলাতি পরিচ্ছদ ও বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না।
৩। কর্মের অনুরোধ ব্যতীত বাঙালিকে ইংরেজিতে পত্র লিখিব না।
৪। ক্রিয়াকর্মে ইংরেজি খানা, ইংরেজি সাজ, ইংরেজি বাদ্য, মদ্যসেবন এবং আড়ম্বরের উদ্দেশ্যে ইংরেজ—নিমন্ত্রণ বন্ধ করিব। যদি বন্ধুত্ব বা অন্য বিশেষ কারণে ইংরেজ নিমন্ত্রণ করি, তবে তাহাকে বাঙলা রীতিতে খাওয়াইব।
৫। যতদিন না আমরা নিজে স্বদেশি বিদ্যালয় স্থাপন করি ততদিন যথাসাধ্য স্বদেশিচালিত বিদ্যালয়ে সন্তানদিগকে পড়াইব।
৬। সমাজস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে যদি কোনো প্রকার বিরোধ উপস্থিত হয়, তবে আদালতে না গিয়া সর্বাগ্রে সমাজ-নির্দিষ্টবিচার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার চেষ্টা করিব।
৭। স্বদেশি দোকান হইতে আমাদের ব্যবহার্য দ্রব্য ক্রয় করিব।
৮। পরস্পরের মধ্যে মতান্তর ঘটিলেও বাহিরের লোকের নিকট সমাজের বা সামাজিকের নিন্দাজনক কোন কথা বলিব না।"

পরবর্তীকালে গান্ধীজি উদ্ভাবিত অসহযোগ আন্দোলনের সূত্র যেন এই 'স্বদেশিসমাজ' থেকেই আহৃত।

বঙ্কিমের যুগ থেকে যে হিন্দু জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় ঘটে রবীন্দ্রনাথ তার প্রভাবমুক্ত না হতে পারলেও, তাঁর চিন্তাধারা এক মহান মানবপ্রেমবোধকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদকে তিনি স্বীকার করে নিতে পারেননি। কিন্তু ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও জাতীয়তার উন্মেষে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা স্বদেশের অধিকাংশ দেশনায়ক যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে মেনে নেন নি।

১৮৮৫ খ্রিঃ বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে। কংগ্রেস প্রথমে উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের সমর্থন লাভ করে। অনেক পরে সরকাব এই সংগঠনকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে।

১৯০৩ খ্রিঃ কংগ্রেস সভাপতি লালমোহন ঘোষ বলেন : 'আমরা সবাই ব্রিটিশ রাজ্যের একান্ত অনুগত প্রজা, কিন্তু সরকারকে সমালোচনা করার যে অধিকার ব্রিটিশ প্রজার আছে তারই ব্যবহার করে কি প্রশ্ন করতে পারি : যারা বহুদিন আগে এদেশের শিল্পকে ধ্বংস করেছে, যারা সেদিনও উদার শাসনের নামে আমাদের দেশে তৈরি কাপড়ের উপর কর বসিয়েছে, যারা প্রতি বৎসর এখান থেকে অন্তত দুই কোটি পাউন্ড দেশে নিয়ে যায়, যারা চাষীর পিঠে ভারী বোঝা চাপিয়ে বার বার এমন প্রচন্ড দুর্ভিক্ষ ঘটিয়েছে যার তুলনা আমাদের পূর্ব ইতিহাসে নেই, তাদেরই শাসন করুণাকর ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ বিধান বলে বিশ্বাস কি আমাদের করতে হবে?'

কার্জন ভারতের গবর্নর হয়ে আসেন ১৮৯৯ খ্রিঃ। তখন বাঙালিজাতি কোন একটি সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত। তার বিস্ফোরণ ঘটাবে যে কোন মুহূর্তে! জ্বলে উঠবে সারা ভারত! এই জাতীয় শক্তি ভেঙে ফেলতে ১৯০৩ খ্রিঃ সরকারি ঘোষণায় চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ জেলা আসামের সঙ্গে যুক্ত করার যে পরিকল্পনা হয়, তার প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলনের সূচনা। ঢাকার নবাব সলিমুল্লা স্পষ্ট বঙ্গবিভাগের পক্ষে দাঁড়ান। দু' হাজারেরও বেশি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ভারত সচিবের কাছে পূর্ববঙ্গ থেকে স্বাক্ষরিত প্রায় সত্তর হাজার আবেদনপত্র পাঠান হলেও, সমস্ত আবেদন নিবেদন অগ্রাহ্য করে ১৯০৫ খ্রিঃ ১৬ অক্টোবর পূর্ববঙ্গ ও আসাম নামে নতুন প্রদেশ গঠনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হল। অন্য বিবিধ কারণে দেশবাসীর বিক্ষুব্ধ চেতনা বঙ্গভঙ্গের উত্তপ্ত প্রবাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠল। বঙ্গভঙ্গকে উপলক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করা যায়। বঙ্গভঙ্গের দিন সমস্ত বাংলাব্যাপী হরতাল ও অরন্ধন পালিত হয়েছিল।

জাতির সমগ্র দায়িত্বভার স্বহস্তে তুলে নেওয়ার জন্য আহ্বান জানান জাতির নেতৃবৃন্দ—অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আনন্দমোহন বসু, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ,

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আবদুল রসুল প্রমুখ। রবীন্দ্রনাথ জাতিকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মানুষ লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, পাঞ্জাবের লালা লাজপত রায় সেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এই সংগ্রামী জনতার পাশে। কার্জন সমগ্র দেশবাসীর মনে স্বাজাত্যবোধ, স্বদেশপ্রেম আরও অধিকমাত্রায় উদ্দীপ্ত করেছেন তার স্বৈরাচারের দ্বারা। তার মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ইউনিভার্সিটিজ অ্যাক্ট দেশবাসীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। জনসাধারণের বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তরূপে ফেটে পড়ে বঙ্গভঙ্গের বিরোধ সংকল্পে। ঐতিহাসিক স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা হল বিদেশি দ্রব্যবর্জন, অসহযোগিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। কবি রজনীকান্ত সেদিন লিখেছিলেন :

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই।
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।

বাঙালি জাতির শক্তি খর্ব করাই ছিল এই হীন চক্রান্তের উদ্দেশ্য। ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি বিল ও বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রচন্ড আন্দোলনের সূচনা করে, জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশে প্রেমের প্রাণবন্যা বয়ে যায় সমগ্র দেশে। রবীন্দ্রনাথ উদ্দীপ্ত হয়ে লিখলেন :

"বঙ্গবিভাগ ও শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশি লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতাদিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, দাম লইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। কংগ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বার বার দুই কূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। এবার কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা কথা কহিয়াছেন"।

১৯০৭ খ্রিঃ ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশন চরম দলাদলি ও আত্মসংঘর্ষে ভেঙে যায়। নরমপন্থীদের উদ্দেশ্য ছিল নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তাদের আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া। রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি নির্বাচন করা ছিল তাদের উদ্দেশ্য। চরমপন্থীরা সভাপতি নির্বাচন করতে চাইলেন লালা লাজপৎ রায়কে। নরমপন্থীরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। গোলমালের ফলে চরমপন্থীর অনেকটা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এলেন। দুটি স্বতন্ত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। চরমপন্থীরা অরবিন্দ ঘোষকে সভাপতি করে সভা অনুষ্ঠান করল। বিপিনচন্দ্র তখন কারাগারে। অরবিন্দ আন্দোলনের পক্ষে। তিলক ছিলেন নরমপন্থীদের সঙ্গে আপোসকামী। লাজপৎ রায়ও নরমপন্থীদের দলে। বাংলার দলে তখন একাকী অরবিন্দ। রাসবিহারী ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির মনোভাব বাংলাদেশের জনগণ হৃদয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিতে পারল না। উভয়পন্থীর মধ্য দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটল। পাবনায় কংগ্রেসের প্রাদেশিক অধিবেশনে সভাপতি রবীন্দ্রনাথ বললেন :

"সমস্ত বৈচিত্র্য ও বিরোধকে একটা বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে বাঁধিয়া তোলাই আমাদের পক্ষে অসম্ভব হইবে। যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অধীনে মতবৈচিত্র্য দলিত হয় না, সকল মতই আপনার যথাযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া লয় এবং বিরোধের বেগেই পরস্পরের শক্তিকে পরিপূর্ণরূপে সচেতন করিয়া রাখে।"

—বাংলাদেশের জনগণ বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রভৃতি চরমপন্থীদের নেতৃত্বে পূর্ণস্বরাজ লাভের উদ্দেশ্যে বয়কট এবং অসহযোগিতার আন্দোলন চালাচ্ছিল। গুপ্তভাবে অরবিন্দ সরকারি শাসনকার্য উৎখাতে লিপ্ত ছিলেন। তিনি উদ্দীপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন :

"Foreign rule can never be for the good of a Nation... Foreign rule is

inorganic and therefore, tends to disintegrate the subjects body-politic by destroying its proper organs and centres of life ..."

বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দের অন্যতম সহযোগী ছিলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। জাতীয়তাবাদী ইংরেজি দৈনিক প্রকাশের দায়িত্বভার নিয়েছিলেন তিনি। পরে সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন অরবিন্দ। উপাধ্যায় 'সমাজ' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক নিবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় ব্রহ্মবান্ধবকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার লিখিত বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ

"I do not take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the God-appointed mission of Swaraj, I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarily be in the way of our true national development."

—নির্ভীক স্বদেশপ্রেমের এই যোদ্ধা বাংলাদেশে একদা তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন।

বৈপ্লবিক আন্দোলনের চরম রূপ নেয় ১৯০৮ খ্রিঃ-এর পর। চারদিকে ইংরেজ শাসক ও পুলিশের গুপ্তচর বিপ্লবীদের হাতে নিহত হতে থাকে। গ্রেপ্তার হলেন বারীন্দ্র-উপেন্দ্র-কানাই-সত্যেন, নরেন গোঁসাই-অরবিন্দ এবং আরো অনেকে। সমগ্র বাঙালি তখন নব প্রাণস্পন্দনে চঞ্চল। বাংলা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল। তিলক 'কেশরী' পত্রিকায় আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে গিয়ে ছয় বৎসর কারারুদ্ধ হলেন। স্বদেশিযুগের শেষার্ধে বাংলার এই নব অভ্যুত্থান প্রবীণ কংগ্রেসকর্মীদের মুখে এবং নানা পত্র-পত্রিকায় অনাদৃত হল। কিন্তু আন্দোলন দেশের অভ্যন্তরে ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করতে থাকে।

স্বদেশি আন্দোলনের এক নীরব সাধক ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ খ্রিঃ থেকে যে স্বদেশি আন্দোলনের আরম্ভ সতীশচন্দ্র তার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'ডন সোসাইটির' মধ্য দিয়ে। ভারতীয় শিক্ষাক্ষেত্রে যুগান্তর আনে 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদ'—সতীশচন্দ্র ছিলেন তার কেন্দ্রমণি। আত্মশক্তিবিকাশে তাঁর অনন্যসাধারণ ভূমিকা সুরেন্দ্রনাথ-বিপিনচন্দ্র-অরবিন্দের মত সোচ্চার না হলেও, কোন অংশে কম ক্রিয়াশীল ছিল না। তাঁর জীবন ও কর্মের সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলন মিশ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

ইংরেজের কঠিনতম অত্যাচারকে অগ্রাহ্য করে সশস্ত্র আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাংলার যুবসমাজ। তারা ত্যাগ করল আবেদন নিবেদনের পথ। গীতার আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর দল'। ইতালি ও আয়ারল্যান্ডের বিপ্লবীদের অনুসরণে এরা দেশের বাইরে থেকে বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করতে থাকে। ইংরেজ শাসনের ভিত্তিমূল কাঁপিয়ে দিয়েছিল এই বিপ্লবী দল।

ইংরেজ শাসকদের চোখের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন রাসবিহারী বসু। অনুশীলন সমিতির একটি উপদলের নেতা রাসবিহারী। তখন দুটি রাজনৈতিক হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতি ঘটে বাংলায়। সরকার এ ব্যাপারে মাথা ঘামায়নি। কিন্তু ১৯১২ খ্রিঃ ২৩ ডিসেম্বর বোমায় মারাত্মক আহত হলেন হার্ডিঞ্জ। একজন নিহত হলেন। শঙ্কিত শাসকগোষ্ঠী রাসবিহারীর খোঁজে ব্যাপক তল্লাসী চালালেও, তাঁর কর্মকেন্দ্র তখন বারাণসীতে। সেখানে তিনি যে সৈনিক বিদ্রোহের পরিকল্পনা করেন, শেষ পর্যন্ত তা ফাঁস হয়ে যায়। দেশে থাকা নিরাপদ নয়, এই সম্ভাবনায় পি এন ঠাকুর ছদ্মনামে ১৯১৫ খ্রিঃ জাপান চলে যান। সেখান থেকে শুরু করেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের কাছে পরাজিত হয়ে ইংরেজশক্তি ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। তাদের ফেলে আসা ভারতীয় সৈন্যরা বন্দি হয় জাপানীদের হাতে। এই ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে রাসবিহারী গঠন করেন আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ। পরে সুভাষচন্দ্র সিঙ্গাপুর গেলে এই সঙ্ঘের ভার দেন তাঁর ওপর। সঙ্ঘের নতুন নাম হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। রাসবিহারী বিদেশে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু ইংরেজ সরকারের শক্তির দম্ভকে তিনি প্রচন্ডভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছিলেন।

বজ্রশিখার উন্মেষ

বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব সরকারিভাবে প্রচারিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের ৬ জুলাই। ১৯ জুলাই গেজেটে সরকারি প্রস্তাব প্রকাশিত হয়। ৬ জুলাই প্রস্তাব ঘোষণার পর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়ে উঠতে আহ্বান জানান। রাজা, মহারাজা, স্যর উপাধিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ—রাজনৈতিক নেতা, জননেতা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠতে থাকে। জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। বিভিন্ন ব্যক্তির উদ্যোগে আয়োজিত সভায় মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য, মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী এবং অন্যরা সভাপতিত্ব করেন। কলকাতায় মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যের বাড়িতে একটি সভায় বয়কটের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িও মিলন মন্দিরে পরিণত হয়েছিল।

বর্তমান পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের দিকে তাকিয়ে উনিশ শতকের বাংলার মানচিত্র উপলব্ধি সম্ভব নয়। সে সময়ে বাংলাপ্রদেশের অন্তর্গত ছিল, বঙ্গ, বিহার, ছোটনাগপুর, উড়িষ্যা ও আসাম—এই পাঁচটি উপপ্রদেশ। আসাম বাংলাপ্রদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার হয় ১৮৭৪ সালে। এই বিচ্ছিন্ন আসামপ্রদেশ ছিল একজন চীফ কমিশনারের অধীন। সেই সময়েই বাংলা ভাষাভাষী শ্রীহট্ট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে বাংলাকে বিভক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯০১ সালে। মধ্যপ্রদেশের চীফ কমিশনার স্যর এনড্রু ফ্রেজার প্রস্তাব করেন উড়িষ্যাকে মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। বড়লাট কার্জনও প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলা বিভাগ মেনে নিয়েছিলেন। তারপর এনড্রু ফ্রেজার বাংলার ছোটলাট হয়ে আসবার পর ১৯০৩ সালে বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। তখন স্বরাষ্ট্রবিভাগের সেক্রেটারি রিজলী। আলোচনার পর ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর প্রস্তাব নেওয়া হয় চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকে কিছু কিছু আঞ্চলিক পরিবর্তন সহ যুক্ত করা হবে আসামের সঙ্গে। বলা হয়েছিল এই প্রস্তাব কার্যকরি হলে পূর্বাঞ্চলের জেলাগুলি কলকাতার অনিষ্টকর প্রভাব মুক্ত হবে এবং পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা ন্যায্য বিচার পাবে। এই প্রস্তাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় ১২ ডিসেম্বর। কিন্তু সংবাদ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে শুরু হয়ে যায় প্রবল বিরূপ প্রতিক্রিয়া। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে তা ছিল সম্পূর্ণ অভাবিত। ১৯০৩-এর ডিসেম্বর থেকে ১৯০৪-এর জানুয়ারির মধ্যে প্রায় ৫০০ প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয় পূর্ব বাংলায়।

এই ব্যাপক জনবিক্ষোভে বিব্রত বড়লাট দ্রুত ফেব্রুয়ারি মাসে পূর্ববঙ্গ সফরে গিয়ে চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহের বিভিন্ন স্থানে জনসভা করে জনসাধারণের সম্মতি লাভের চেষ্টা করেন। ভয়, প্রলোভন সব পক্ষই তিনি নিয়েছিলেন। ময়মনসিংহে তিনি পরিকল্পনার ব্যাখ্যা করে জনগণকে জানান, দার্জিলিং বাদে এবং মালদহসহ সমগ্র রাজসাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ নতুন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হবে। ঢাকায় ভাষণ দেওয়ার সময় তিনি উল্লেখ করেছিলেন : "...to invest the Mohammedans in Eastern Bengal with a Unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroy's and Kings" এইভাবে পূর্ববাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষ বপন করেছিলেন। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ সহ বেশকিছু নেতৃস্থানীয় মুসলমান এই মুসলিম প্রদেশ গঠনের দাবিকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু কার্জন, এনড্রু ফ্রেজার এবং আসামের চীফ কমিশনার ব্যামফাইল্ড ফুলারের অশুভ ষড়যন্ত্র এক বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হল। কলকাতার টাউনহলে ১৯০৪ সালের ১৮ মার্চ রাজা প্যারীমোহন

মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় এত মানুষ সমবেত হয়েছিল যে, তিনটি স্বতন্ত্র সভার আয়োজন করতে হয়েছিল আয়োজকদের।

চারদিক থেকে প্রবল জনবিরোধিতার সমাচার এসে পৌঁছালেও কার্জন কর্মে অটল হয়ে রইলেন। গোপনে গোপনে সরকারি ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকল। ১৯০৫-এর ৭ জুলাই সিমলা থেকে ঘোষিত হল—আসাম, ঢাকা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা এবং রাজসাহী বিভাগ (দার্জিলিং বাদে) নিয়ে গঠিত হবে নতুন জেলা "পূর্ববঙ্গ ও আসাম"। একজন ছোটলাটের অধীনে থাকবে লেজিসলেটিভ কাউন্সিল এবং বোর্ড অফ রেভিনিউ।

ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে শুরু হয়ে গেল প্রবল জনবিক্ষোভ। সমকালের উল্লেখযোগ্য 'দি বেঙ্গলী' ও 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় প্রবল প্রতিবাদ জানানো হয়। অমৃতবাজার পত্রিকা 'প্যাসিভ রেজিস্ট্যান্স'-র মাধ্যমে আসন্ন সর্বনাশরোধে জনগণকে সচেতন করেছিল। (১০ জুলাই, ১২ জুলাই, ১৮ জুলাই ১৯০৫)। কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় বয়কটের আহ্বান জানালেন।

সরকারের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। সব প্রতিরোধ, প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে ১৯ জুলাই সরকার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন এবং ২০ জুলাই তা প্রকাশিত হল প্রভাতী 'সংবাদপত্রে'। পরিকল্পনা যথারীতি আছে। নতুন প্রদেশের রাজধানী ঢাকা, দ্বিতীয় সদর চট্টগ্রাম। নতুন প্রদেশ আয়তনে ১,০৬,৫৪০ বর্গ মাইল। জনসংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ। এর মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান এবং হিন্দু ১ কোটি ২০ লক্ষ। কিন্তু প্রধান আদালত থাকল কলকাতাতেই।

৭ আগস্ট কলকাতা টাউনহলে আয়োজিত বিশাল সভা সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকা লেখেঃ The historic hall never witnessed before a gathering so vast, so representative and so enthusiastic with so sober before any time of its hundred years existence (August 8, 1905)। ঘোষিত হল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সংকল্প। সাংবাদিক নরেন্দ্রনাথ সেন 'বয়কট' বিদেশি দ্রব্য বয়কটের প্রস্তাব পাঠ করলে, তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। উপস্থিত জনতার কণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকে 'বন্দেমাতরম্'।

> "This meeting fully, sympathises with the resolutions adopted at many meetings held in the mofussil to abstain from the purchase of British manufactures, so long as the Partition Resolution is not withdrawn as a protest against the indifference of the British public in regard to Indian affairs and consequent disregard of Indian public opinion by the present government." (A.B Patrika August 8, 1905)

ঘটনা দ্রুত বদলে যেতে থাকে। ১ সেপ্টেম্বর সিমলা থেকে বঙ্গবিভাগের সরকারি ঘোষণা হল। জানা গেল বঙ্গবিভাগ কার্যকর হবে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর। নতুন প্রদেশের ছোটলাট হবেন আসামের চীফ কমিশনার জোসেফ ব্যামফাইল্ড ফুলার। অত্যাচারী ও ষড়যন্ত্রকারী ফুলারকে অবশেষে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

বাংলার প্রায় সমস্ত জেলার মানুষ বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জেলায় জেলায় অগণিত মানুষের জমায়েত ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। এই সভায় বিদেশি দ্রব্য বর্জন,আদালত ও কোর্ট বর্জনের অনুরোধ জানান হত। ২৬ জুলাই বরিশালে আয়োজিত সভায় অশ্বিনীকুমার দত্তের বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছিল। ৭ আগস্ট কলকাতা সহ বিভিন্ন জেলায় বয়কট প্রস্তাবে জনগণ সমর্থন জানায়। কলকাতায় টাউন হলে আয়োজিত সভায় সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। দ্রুত সমগ্র প্রদেশের চিত্র বদলে যেতে থাকে।

'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় ১৩ জুলাই লেখা হয় :

> "বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙ্গালীর চিরাশৌচ হইবে। যতদিন বঙ্গদেশের ছিন্ন অঙ্গ পুনরায়

একত্র না হয় ততদিন বাঙ্গালী শোকচিহ্ন ধারণ করিবে। বাঙ্গালী আমোদ-প্রমোদ পায়ে ঠেলিয়ে সমস্ত বঙ্গ এক করিবার মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইবে। যতদিন সাধনায় সিদ্ধ না হইবে ততদিন তপশ্চর্যা করিবে। জাতীয় অশৌচের সময় সমস্ত বাঙ্গালী বিদেশী দ্রব্য স্পর্শ করা মহাপাতক মনে করিবে। করকচ খাইবে, তবু বিদেশী লবণ খাইবে না। গুড় খাইবে, তবু বিদেশী চিনি খাইবে না। জাতীয় অশৌচের সময় বাঙ্গালী আর মিউনিসিপাল কমিশনার, জেলা বোর্ড বা লোকাল বোর্ডের সভ্য, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট থাকিতে পারিবে না। জাতীয় অশৌচের সময়, ছোটলাট, কমিশনার ম্যাজিস্ট্রেটের অনুরোধে কোন কাজের জন্য আর অর্থ দান করা হইবে না। যতদিন জাতীয় শোকের অবসান না হয়, ততদিন রাজপুরুষদের আবির্ভাব ও তিরোভাবে আমাদের কেহ যোগ দিতে পারিবে না।"

"লর্ড কার্জন বাঙ্গালীর সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যদি তিনি উদ্যত খড়্গ সম্বরণ না করেন, বাঙ্গালী আর রাজপুরুষদিগের সংস্রবে যাইতে পারিবে না।"

বিদেশি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাবে লেখা হয় 'সঞ্জীবনী'তে ঃ

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে আমাদের স্বদেশভক্ত, শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা প্রতিজ্ঞা করেন যে তাঁহারা আর বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানীতে জীবনবীমা করিবেন না। আমাদিগের নিজের পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে হইবে; ঠেকনা দিয়া কোনদিন কোনও ব্যক্তি বা জাতিকে কেহ কখনও দাঁড় করাইয়া রাখিতে পারে না।"

স্বদেশি মন্ত্রে জনসাধারণকে দীক্ষিত করার এই প্রতিজ্ঞাপত্র 'সঞ্জীবনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ঃ

"আমরা স্বদেশের কল্যাণের জন্য মাতৃভূমির পবিত্র নাম স্মরণ করিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা অতঃপর দেশজাত দ্রব্য পাইলে কোন বিদেশীয় দ্রব্য ক্রয় করিব না। এই কার্য করিতে যদি আর্থিক বা অন্য কোন প্রকার ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আমরা করিতে প্রস্তুত হইব। আমরা এরূপ কার্য কেবল নিজেরাই করিয়া ক্ষান্ত হইব না। বন্ধুবান্ধব ও অন্যান্য লোকদিগকেও এইরূপ করিবার যথাসাধ্য যত্ন ও চেষ্টা করিব। ভগবান আমাদের শুভ সংকল্পে সহায় হউন।"

সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণার পর সমকালীন পত্রপত্রিকায় তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে। প্রথমে উল্লিখিত হল 'ভারতী' পত্রিকার মন্তব্য :

বঙ্গবিভেদে বাঙালিদের মৌখিক আন্দোলন

ভারতের বর্তমান রাজ-প্রতিনিধির প্ররোচনায় ভারত-সচিব বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে যে সম্মত হইয়াছেন তাহাতে বঙ্গবাসীগণ একেবারে মর্মাহত হইয়াছেন এবং তাহাদের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তি সুবিধা ও সুযোগ পাইলেই এ বিষয়ে আপন আপন হৃদগত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রাজপুত্রের অভ্যর্থনাকল্পে কি করা আবশ্যক স্থির করিবার নিমিত্ত টাউন হলে যে সভা হয় তাহাতে শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয় এ বিষয় উল্লেখ করেন এবং মান্যবর শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার ও মান্যবর শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গীয় সদস্য সভায় বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে জ্বলন্ত ভাষায় আপন আপন অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন। ভূপেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, মোগল কিম্বা পাঠানদিগের রাজত্বকালে এমন ভয়ানক বিপদ এদেশের অদৃষ্টে ঘটে নাই, স্বর্গগতা মহারানী ভিক্টোরিয়া সিপাই-বিদ্রোহের পর যে সদয় অনুশাসন প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা যদি আজ রহিত করিয়া দেওয়া হয় তাহাও ইহার তুলনায় অতি সামান্য বলিয়া ধারণা হইবে। আজ হইতে নিত্য দুঃখ আমাদের জীবনের সঙ্গী হইল এবং আমাদের প্রাণপণ শক্তি দ্বারা সম্মুখে যে বিচ্ছেদকারী মহা সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে তাহার প্রতিকার করিতে হইবে। শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বলেন, অদৃষ্টের একি বিভ্রাট। ঠিক যে সময়ে, রাজপুত্র আসিতেছেন বলিয়া আনন্দ উৎসবের আয়োজন হইতেছে, ঠিক সেই সময়ে তাহার প্রজাদিগের একান্ত অসহায় দুর্বলতা স্মরণ করাইয়া এবং তাহাদের মতামত, ইচ্ছা অনিচ্ছা রাজপুরুষদিগের নিকট কত তুচ্ছ এবং মূল্যহীন ইহাই নিতান্ত নিষ্ঠুরতার সহিত প্রমাণ করিয়া এই অভিনব অনুজ্ঞা প্রচার করা হইল। রাজপুত্র ও পুত্রবধূ আসিবেন এবং চলিয়া যাইবেন।

তাহাদের ভবিষ্যৎ প্রজাবর্গ তাঁহাদের আশীর্বাদ করিবে সত্য কিন্তু তাহাদের মর্মান্তিক দুঃখ এবং কাতর অশ্রুজলে উৎসবের শুভ আলোক ম্লান করিবে তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। অসহায় দুর্বল প্রজার ব্যাকুল চেষ্টার এতদিনে শেষ হইল—রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আজ যে অঙ্কের যবনিকা পতন হইল ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের অভিনয় কোন দেশে কোন কালে হয় নাই এবং হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন বঙ্গদেশের মানচিত্র বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিলে কোন ক্ষতি নাই; কেননা শতাব্দী পরে আর তাহার কোন আবশ্যক হইবে না।" "অসহায় প্রজার চেষ্টার অন্তের" কথা শুনিলে "যে জাতি যে ব্যবহারের যোগ্য ভগবান তাহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটাইয়া দেন" এই প্রবাদ বাক্যটি স্মরণ হয়। যদি চেষ্টার অন্তের সময়ই আসিয়া থাকে তবে বঙ্গের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছে তাহা উচিতই হইয়াছে। চেষ্টার অন্তের কাল না আসিয়া এখনি চেষ্টার আরম্ভের কাল আসিয়াছে ইহা আমাদের বিশ্বাস! এক সময় শোনা গিয়াছিল, এই বিষয় আন্দোলন করিবার জন্য বঙ্গদেশ হইতে প্রতিনিধিগণ ইংলন্ডে প্রেরিত হইবেন সে প্রস্তাবের কি হইল? অমৃতবাজার পত্রিকায় একটি সুন্দর প্রশ্ন আছে; পত্রিকা বলেন, 'রাজপুত্রের অভ্যর্থনায় বিবিধ উৎসবাদির জন্য ৬৮,৭৩৬ টাকা চাঁদা সংগ্রহ হইয়াছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত করিবার আন্দোলনের জন্য বঙ্গবাসী কত টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন? বঙ্গদেশবাসী বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধ আন্দোলনের অপেক্ষা রাজপুত্রের অভ্যর্থনার জন্য যদি অধিকতর উৎসুক থাকেন তবেই এ দুর্দিনে রাজপুত্র রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে পদার্পণ করিতে ভরসা পাইবেন।" *(ভারতী ১৩১২ সালের ভাদ্র সংখ্যায় সাময়িক কথা বিভাগে প্রকাশিত)।*

'প্রবাসী' পত্রিকায় সম্পাদকীয়তে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় লেখেন :

"লর্ড কার্জনের মত খারাপ শাসন কর্তার আগমন অনেকে ভারতের দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করেন। আমরা ঠিক তাহা মনে করিতে পারিতেছি না। অত্যাচারী, অনিষ্টকারী রাজা ব্যতিরেকে কোথায় কবে প্রজাদের স্থায়ী মঙ্গল, স্থায়ী স্বাধীনতালাভ ঘটিয়াছে। আমরা ক্ষণিক উত্তেজনার বশে এ কথা বলিতেছি না। ইংলণ্ডের অন্যতম প্রধান ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Growth of the English Constitution নামক গ্রন্থে কি বলিতেছেন দেখুন—

"Strange it may at first sight seem that the founder of the later liberties of England was not an Englishman. Simon of Montfort a native of France, did for the land of his adoption what even he might not have been able to do for the land of his birth. And why? Thy land of his birth was—shall I say flourishing or suffering? Under the fateful virtues of the most righteous of Kings. Saint Lewis reigned in France. Saint Lewis the just, and holy, the man who never swerved from the path of right, the man who sware to his neighbour and disappointed him not, though it were to his own hindrance. Under his righteous rule there could be no ground for revolt or disaffection. By surrounding the crown with the reflected glory of his own virtues, he did more than any other man to strengthen its power. He thus did more than any other man to pave the way for that foul despotism of his successors whose evil deeds would have daily vexed his righteous soul. In England, on the other hand, we had the momentary curse, the lasting blessing of a succession of evil kings. We had kings who had no spark of English feeling in their breasts, but from whose follies and necessities our fathers were able to wring their freedom, all the move lastingly because it was bit by bit that it was wrung. A Latin poet once sang that freedom never flourishes more brightly than it does under a righteous king. And so it does while that righteous king himself tarries among men. But to win freedom as an heritage for ever, there are times when we have more need of the vices of kings than of their virtues. The tyranny of our Angevin masters woke up English freedom from its momentary grave." (Pp. 69-71)

"সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অত্যাচারী রাজারা শাপরূপী বর। কারণ অপরের, ভাল রাজার,

প্রদত্ত অধিকার নিজস্ব জিনিস নয়, তেমন স্থায়ীও নয়; যাহা নিজে যুঝিয়া জিনিয়া লওয়া হয়, তাহাই নিজস্ব সম্পত্তি। তবে একথা মানিতেই হইবে যে মানুষের জন্মগত অধিকার জিনিয়া লইতে হইলে পৌরুষ চাই, তেজ চাই, সাহস চাই, স্বার্থত্যাগ চাই, সকল সুখ, সুবিধা, সম্পদের চেয়ে মনুষ্যত্বকে, আত্মমর্যাদাকে বড় মনে করা চাই। আমাদের সে তেজ, সে পৌরুষ, সে সাহস, সে স্বার্থত্যাগ আছে কি? আমরা মনুষ্যত্বকে সর্বোপরি স্থান দিতে পারিব কি? যদি পারি, তাহা হইলে লর্ড কার্জনের মত বন্ধু আর কোথায় পাইব? তিনি বাঙালিকে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করিতে গিয়া বাঙালির একতার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছেন। যদি আমরা জাতীয় জীবনের মালমসলা সম্বন্ধে একান্ত নিঃস্ব না হই, যদি আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ ও ঈর্ষা-বিদ্বেষ বিসর্জন দিতে পারি, তাহা হইলে জাতীয়তার মন্দির গড়িয়া তুলিয়া তন্মধ্যে যথার্থই বঙ্গমাতার পূজা করিতে পারিব। বঙ্গ বিভাগের আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়া, উহার সমর্থন করিয়া এ পর্যন্ত যে সকল সরকারি কাগজপত্র বাহির হইয়াছে, তাহা আমাদের খবরের কাগজগুলিতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমালোচিত হইয়াছে। গবর্নমেন্টের কোন যুক্তিই প্রবল বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই, বরং সম্পূর্ণ অসার বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। একই কারণে গভর্নমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন রকম কাজ করিতে চাহেন। যেমন, এক ভাষাভাষী লোকদিগকে একত্র করিবার জন্য গবর্নমেন্ট মধ্যপ্রদেশের ওড়িয়াদিগকে ও বাংলার লেফটেনান্ট গবর্ণরের অধীনস্থ ওড়িয়াদিগকে এক প্রদেশে আনিতেছেন, কিন্তু যাহারা বাঙলা বলে ও একই শাসনকর্তার অধীনে, এক প্রদেশে বাস করিতেছে তাহাদিগকে দ্বিখণ্ডিত করিতেছেন। অনেক দিনের পুরাতন সম্বন্ধ ও সংশ্রব এবং তজ্জনিত মনোভাবের ও মায়া মমতার (Old associations) দোহাই দিয়া (অবশ্য সত্য কারণ ইহা নয়) দার্জিলিংকে বঙ্গের ছোটলাটের অধীনে রাখিতেছেন, কিন্তু পূর্ব ও উত্তর বাংলাকে এ সকল কারণ সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছেন! তর্ক যুক্তিতে গবর্নমেন্টের হার হইয়াছে; তবু গবর্নমেন্ট নিজের গোঁ ছাড়িতেছেন না। এটা কি একটা অকারণ জিদ মাত্র। না, তা নয়। এরূপ একগুঁয়েমির গূঢ় কারণ আছে। সে গূঢ় কারণ প্রকাশ্য সরকারি কাগজে নাই, হয়ত কোন গোপনীয় কাগজে আছে। যেমন, নানা শুভ ইচ্ছা বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের কারণ বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু আসল কারণ উচ্চ শিক্ষা যথাসম্ভব বন্ধ করিবার ইচ্ছা, তজ্জন্যই লর্ড কার্জন একটি গোপনীয় মন্তব্যে লিখিয়াছিলেন— "I have always thought that Dr. Gooroo Das Banerji held a brief for his unworthy client, the Bengali student, whom it is our desire politely to suppress. যাক সে কথা। আমরা বলিয়াছি, বঙ্গ-বিভাগের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত কারণগুলি প্রকৃত কারণ নহে; গূঢ় কারণ আছে। কারণ রাজনীতিজ্ঞ ও ইতিহাসজ্ঞ লোকেরা জানেন যে রাজপুরুষেরা দরকার মত খুব মিথ্যা কথা বলেন। আমরা ভয়ে বা ভদ্রতার খাতিরে প্রায়ই তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলি না; কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদিগকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিলে যে কোন অধর্ম হয় না, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে। সরকারি কাগজপত্রে অনেক সময় মিথ্যা কথাই থাকে, অবশ্য তৎসমুদয় হইতে সত্য বাহির করা যায় বটে, কিন্তু রাজপুরুষেরা মিথ্যাবাদী, এইরূপ সন্দেহ করিয়া অগ্রসর হইলে তবে সত্যের দেখা পাওয়া যাইতে পারে। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ফ্রীম্যান তাঁহার Methods of Historical Study নামক গ্রন্থে বলিয়াছেন—

"But when we come to manifestos, proclamations, deplomatic documents which have not yet reached the stage of treaties, the case is wholly different. Here we are in the very chosen region of lies; they are lies told by people who know the truth; truth may even, by various processes, be got out of the lies; but it will not to be got out of them by the process of believing them. He is of childlike simplicity indeed who believes every royal proclamation or the preamble of every act of Parliament, as telling us, not only what certain august persons did but the motives which led them to do it ;..........(Pp. 258-59)

"ফ্রীম্যান প্রকারান্তরে বলিতেছেন যে সরকারি কাগজপত্রকে মিথ্যা কথা পূর্ণ বলিয়া ধরিয়া লইলে তবে তাহা হইতে সত্য কথা বাহির করা যায়। বাস্তবিক, যখন দার্জিলিঙের পক্ষে ও মধ্য প্রদেশের ওড়িয়াদিগের পক্ষে যে যুক্তি দুটি খাটিল, পূর্ববঙ্গের বেলা তাহা না খাটিতে দেখিয়াই আমাদের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এক ভাষাভাষী, প্রাচীন কালাগত সম্বন্ধে মায়া-মমতায় আবদ্ধ একটি জাতিকে দুই ভাগে বিচ্ছিন্ন করিয়া চিরকালের জন্য শক্তিহীন করাই গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য।"

"এই জন্য আমাদের ধারণা, বাঙালিরা (অর্থাৎ কার্যতঃ বাঙালি হিন্দুরা) রাজনৈতিক বিষয়ে সামান্য যে একটু শক্তিশালী হইয়াছে, বাঙালিদিগকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া সেই শক্তি নাশ করা, তাহা বাড়িবার সম্ভাবনা লোপ করা, বঙ্গ-বিভাগের আসল উদ্দেশ্য। পূর্ববঙ্গে ও বিহারে বাঙালি, বিহারী অপেক্ষা অনেক কম। সুতরাং উভয় প্রদেশেই হিন্দু বাঙালির দাবি-দাওয়া মত গবর্নমেন্ট অগ্রাহ্য করিবার বেশ একটা কারণ পাইবেন। আমাদের ইহা বলা উদ্দেশ্য নয় যে দেশটা কেবল হিন্দু-বাঙালিদের মত অনুসারে শাসিত হউক, বা কেবল তাহাদেরই ক্ষুদ্র স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা হউক। আমরা হিন্দু-বাঙালির ও মুসলমান বাঙালির স্বার্থ পৃথক, এ রকম মনে করিয়া একথা লিখিতেছি না। জাতীয় স্বার্থ উভয়েরই এক; ইংরাজের পদে উভয়েই দলিত, ইংরাজ মুখে মুসলমানের আদর করিলেও, হিন্দুকে যেমন নিজের কোন স্বার্থ বা একচেটিয়া চাকরি ছাড়িয়া দেন না, মুসলমানকেও তেমনি দেন না। বাঙালি হিন্দুর মুখ বন্ধ হইলে, তাহার প্রভাব কমিলে হিন্দু মুসলমান উভয়েরই অমঙ্গল; এই জন্য আমরা এরূপ লিখিতেছি। আমরা দেখিতেছি যে, বেহারী ও মুসলমান বাঙালিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার অপেক্ষাকৃত কম; এই জন্য তাহারা স্থানিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থে যে পরিমাণ অন্ধ, হিন্দু শিক্ষিত বাঙালিরা ততটা নয়। সমস্ত দেশের মঙ্গলামঙ্গল হিন্দু বাঙালি নেতারা যতটা বুঝেন, চান ও দাবি করেন, তাহা যদি সামান্য হয়, তাহা হইলেও উহা মুসলমান-বাঙালি ও বিহারীরা যাহা চান, তদপেক্ষা অনেক বেশি। বাঙালি মুসলমান ভ্রাতারা অপর সকলের সঙ্গে থাকিয়া সুশিক্ষিত হউন, সমস্ত দেশের, সমগ্র জাতির মঙ্গল উত্তরোত্তর অধিক পরিমাণে বুঝিতে ও দাবী করিতে থাকুন; স্বার্থান্বেষী ইংরাজ রাজপুরুষদের দ্বারা তাহাদের সম্মুখে ধৃত ক্ষুদ্র প্রলোভন উপেক্ষা করিতে শিখুন, ইহাই আমাদের অভিলাষ। সমস্ত বাঙালির একত্র থাকা হিন্দু-মুসলমান, খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম, বৌদ্ধাদি সকলেরই মঙ্গলের কারণ হইবে। এইরূপ কিছুদিন চলিতে থাকিলে যখন বাঙালি মুসলমানগণ শিক্ষাগুণে হিন্দু বাঙালিরই মত জাতীয় অধিকার চাহিয়া রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইবেন, তখন ইংরাজের ভেদনীতি হয় ত ভিন্ন আকার ধারণ করিবে। তখন আর স্থান বিশেষে হিন্দু ও মুসলমান বাঙালির প্রাধান্য অপ্রাধান্যের কথা লইয়া কোন জাতীয় অমঙ্গলের ভাবনা ভাবিতে হইবে না।"

"বাংলা দেশে অন্যান্য কোন কোন প্রদেশের মত হিন্দু মুসলমানে ঝগড়া ও ঈর্ষা বিদ্বেষ নাই। এই জন্য তাহাদের সম্বন্ধে এই ভেদনীতি অবলম্বিত হইতেছে। কিন্তু এই অশুভ নীতি এখানেই থামিবে না। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গেও ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা হইবে। পূর্ববঙ্গবাসী পশ্চিমবঙ্গে এবং পশ্চিমবঙ্গবাসী পূর্ববঙ্গে চাকরি পাইবে না, এরূপ নিয়ম নিশ্চয়ই হইবে এবং তাহা হইলে একই জাতির দুই শাখায় রাজপুরুষদের চিত্ততোষক বেশ ঈর্ষা বিদ্বেষ জন্মিবে।"

"বহু সংখ্যক লোক সমবেত চেষ্টা ও শক্তি প্রয়োগে, সকলের টাকা একত্র ব্যয় করিয়া, মঙ্গলের পথে যেরূপ অগ্রসর হইতে পারে, অল্পসংখ্যক লোকে তাহা পারে না, সুতরাং দ্বিখণ্ডিত বাঙালি জাতির উন্নতি যে অতঃপর কম হইবে, তাহা নিশ্চয় বলা যাইতে পারে।"

"তাহার পর আর এক কথা। স্বাধীন দেশেও দেখিতে পাই, প্রজাদিগকে নিজেদের অধিকার ও সুবিধাগুলি বজায় রাখিবার জন্য সর্বদাই সজাগ থাকিয়া চেষ্টা করিতে হয়। এই চেষ্টার জন্য অনেক টাকা, অনেক লোকের উৎসাহ ও পরিশ্রম, অনেক লোকের মতের ঐক্যের প্রভাব, আবশ্যক

হয়। বাঙালি জাতি দুই প্রদেশে দুই শাসনকর্তার অধীনে বাস করিলে, এই জাতির দুই শাখার অভাব, অভিযোগ ভিন্ন ভিন্ন রকমের হইবে। সুতরাং চেষ্টাও ভিন্নমুখে হইবে। যে অর্থ, যে উৎসাহ যে পরিশ্রম, যে একই কেন্দ্রে ঘনীভূত মতের প্রভাব, একমাত্র চেষ্টাকে সফল করিতে পারিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত হওয়ায় ব্যর্থ হইবে।"

"আমরা চাই এক হইতে, গবর্নমেন্ট আমাদিগকে বিভিন্ন আইন, শিক্ষাবিভাগ প্রভৃতির অধীনে আনিয়া দুই ভিন্ন জাতিতে পরিণত করিতে চাহেন।"

"সাহিত্য জাতীয় চরিত্রকে গড়িয়া তুলে। যে সাহিত্য যত বেশি লোকে পড়ে, যাহার রস ও বল যত বেশি মানুষের হৃদয় হইতে আহৃত ও সঞ্চিত, তাহার প্রভাব ও শক্তি তত বেশি। পূর্ববঙ্গের ও পশ্চিমবঙ্গের চলিত ভাষায় কিছু প্রভেদ আছে। বঙ্গদেশ বিভক্ত হইয়া গেলে, গবর্নমেন্ট আপাততঃ যে ভাষাভেদ কার্য হইতে বিরত আছেন, তাহা অবাধে দ্বিগুণ উৎসাহে সম্পাদন করিতে পারিবেন। মিশনারীরা ও স্বার্থান্ধ স্কুলপাঠ্য পুস্তক রচয়িতারা এবং হয়ত কোন কোন মুসলমান লেখক গবর্নমেন্টের এই কার্যের সহায় হইবেন। বাঙালি সমাজের যদি মাথা থাকে, এবং সেই শীর্ষস্থানীয় লোকদের বুদ্ধি ও হৃদয় প্রকৃতিস্থ থাকে, তাহা হইলে স্কুলপাঠ্য পুস্তক সম্বন্ধে-যাহাই হউক, উচ্চ সাহিত্যের বড় বেশি ক্ষতি বোধ হয় হইবে না। কিন্তু মোটের উপর বাংলা সাহিত্যের কিছু ক্ষতি যে হইবে, উহার শক্তি যে কিছু কমিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

"সংবাদপত্রগুলিরও অবস্থা বিবেচ্য। এগুলি গবর্নমেন্টের চক্ষুশূল। ইহাদের উৎকর্ষ ও ক্ষমতা কতকটা গ্রাহকসংখ্যার উপর নির্ভর করে। গ্রাহকেরা স্বভাবত নিজের প্রদেশের, নিজের জেলার, নিজের শহর ও গ্রামের অভাব অভিযোগের কথা পড়িতে অধিক ভালবাসেন। আমরা দেখিতেছি, কলিকাতার একটা হত্যাকাণ্ডের কথা কলিকাতার দৈনিক ও সাপ্তাহিক কাগজগুলির যত জায়গা অধিকার করে, আগ্রা অযোধ্যা প্রদেশের শিক্ষা বা অন্যবিধ গুরুতর সমস্যা তাহার সিকি স্থানও পায় না। এই হেতু বঙ্গ-বিভাগ হইলে কলিকাতার শক্তিশালী কাগজগুলি পূর্ববঙ্গের কথা তত আলোচনা করিতে না পারায় অনেক গ্রাহক হাবাইয়া আয়ের ন্যূনতা বশতঃ তেমন সুপরিচালিত হইবে না। সুতবাং অপেক্ষাকৃত শক্তিহীন হইবে। পক্ষান্তরে ঢাকায় শক্তিশালী কাগজের আবির্ভাব হইতে অনেক বৎসর লাগিবে। এই প্রকারে গবর্নমেন্টের পথের এক প্রধান কন্টক সংবাদপত্রে কিছুদিনের জন্য ভোঁতা হইয়া থাকিবে।"

"কিন্তু আমরা প্রাণে প্রাণে এক হইলে গবর্নমেন্টের সাধ্য কি যে ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই করেন? তাই এখন আমাদিগকে আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, আমাদের হৃদয়, আমাদের ঘর ঠিক আছে কিনা। আমাদের এক হওয়া সোজা নয়। গবর্নমেন্ট ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের (Caste) উচ্চতা নিচতার একটা ধূয়া তোলায় বুদ্ধিমান বৈদ্য কায়স্থ প্রভৃতিও ঝগড়া লাগাইয়া দিয়াছিলেন। আশা করি এখন সে ঝগড়াটা থামিয়াছে। তাই এখন বৃহত্তর সম্প্রদায়ের কথা বিবেচ্য। ভাই হিন্দু, ভাই মুসলমান, তোমাদের মধ্যে ঈর্ষা-বিদ্বেষ আছে কি? থাকিলে তাহা পরিত্যাগ কর। হিন্দু-মুসলমানকে একই ভগবান একই দেশের জলবায়ু ও খাদ্যে পুষ্ট করিতেছেন, তাহাদের পৃথক হইয়া কোন লাভ নাই। ইংরাজের লেখা ইতিহাস পড়িয়া হিন্দু-লেখকেরা মুসলমানদের উপর অনেক অবিচার করিয়াছেন। মুসলমান তাহা ক্ষমা করুন। হিন্দু পুরাকালে মুসলমান কর্তৃক উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া থাকিলে তাহা ভুলিয়া যাউন। হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে এখন কোমর বাঁধিতে হইবে। হিন্দু মুসলমানের যাহার যে শক্তি আছে, তিনি তাহা প্রদান করুন। মুসলমানের যে বীরত্ব, উৎসাহ ও একাগ্রতা এক দিন তাহাকে এশিয়া হইতে ইউরোপের শেষ সীমায় লইয়া গিয়াছিল। তাহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয় নাই। সম্ভবতঃ মুসলমান বাঙালিদিগকে লক্ষ্য করিয়াই হন্টর সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে বাঙালি এক প্রবল সমুদ্র চর জাতি হইতে পারে। শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতা ও ভগিনীগণ তাহাদের অমুসলমান ভ্রাতা-ভগিনীদের হিতার্থ মুসলমান ইতিহাসের উজ্জ্বল পৃষ্ঠা

উদঘাটিত করুন। মুসলমান পুরুষ নারীদিগের মহৎ কার্যের বৃত্তান্ত লিখুন। শুধু তাহাদের সাম্প্রদায়িক কাগজে লিখিলে হইবে না। দুরূহ ফরাসি আরবি কথা বাদ দিয়া অন্য কাগজেও লিখুন। তাহা হইলে হিন্দু-মুসলমানে প্রীতি ও শ্রদ্ধা বাড়িবে। শিক্ষিত লোকেরাই সমাজের নেতৃত্বের উপযুক্ত; এই জন্য শিক্ষিত লোকদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই সব কথা বলিতেছি। তা ছাড়া, কারণ যাহাই হউক শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষ দেখা যায়, অশিক্ষিতদের মধ্যে তাহা নাই।"

"কলিকাতা ও তন্নিকটবর্তী স্থান সকলে এখনও অনেক শিক্ষিত অর্ধ শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ছোট লোক আছে, যাহারা পূর্ববঙ্গের লোকদিগকে বাঙাল বলিয়া হীন মনে করে। তাহাদিগকে মনের ময়লা সাফ করিতে হইবে।"

"কিন্তু সর্বোপরি আমাদিগকে সকল বাঙালির হিতকর কোন মহৎ কার্যে হাত দিতে হইবে; কারণ কেবল সরকারের বিরোধিতা রূপ যে বাহ্য চাপ, তাহাতে আমাদের মধ্যে আশা ও প্রয়োজনের অনুরূপ একতাবন্ধন জন্মিতে পারে না। সদনুষ্ঠানে এক প্রাণতা হইতে পরস্পরের প্রতি যে আকর্ষণ অনুভূত হয়, সেই প্রাণের টানই আমাদিগকে প্রকৃত একতা দিতে পারে। শিল্প বিজ্ঞান সমিতি যে বিদেশে ছাত্র পাঠাইতেছেন, ইহা উক্তরূপ একটি কার্য। বিদেশি জিনিস ব্যবহার করিব না, এই প্রতিজ্ঞা অনুসারে কার্য করা আংশিক ভাবে আর একটি তদ্রূপ অনুষ্ঠান। আংশিক ভাবে বলিতেছি এই জন্য, যে শুধু এরূপ প্রতিজ্ঞায় লাভ নাই। বাংলা দেশে যে সব জিনিস খুব ভাল হইতে পারে, বাঙালির তাহা উৎপাদন ও প্রস্তুত করিতে পারা চাই। কিন্তু সকলের চেয়ে বড় কাজ প্রত্যেকে বাঙালি পুরুষ ও রমণীকে শিক্ষাদান, জ্ঞানদান। নতুবা কোন চেষ্টাই আশানুরূপ সফল হইবে না। কারণ দেশের মঙ্গল বুঝা, নিজের সংকীর্ণ স্বার্থ ভুলিয়া মহত্তর স্বার্থসিদ্ধিতে নিযুক্ত হওয়া শিক্ষাসাপেক্ষ। একদিনে জাতি তৈয়ারি হয় না, জাতীয় আকাঙ্ক্ষা অচিরে পূর্ণ হয় না। আশা, ধৈর্য, সাহস, একাগ্র সাধনা চাই। বাঙালিকে এই মহা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে।"

"আমরা লুপ্ত পৌরুষ ও নিরস্ত্র বলিয়া লর্ড কার্জন ও তাঁহার [illegible]লের ইংরাজেরা আমাদিগকে কীটেরও অধম মনে করিয়াছেন। তাঁহারা মনে রাখিবেন জড় পদার্থ-নির্মিত অস্ত্রই একমাত্র অস্ত্র নহে; মনে রাখিবেন, সব দিন সমান যায় না ; মনে রাখিবেন Vengeance sleeps long but never dies; মনে রাখিবেন ন্যায়বান ভগবান আছেন, মনে রাখিবেন, পূর্বেকার পরপদানত ইংলণ্ডের ন্যায় বর্তমানকালের পরপদানত ভারতবর্ষ বিধাতার বরে আবার জাগিবে, উঠিবে।"

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সেই গৌরবময় দিনগুলিকে "বঙ্গবিপ্লব" নামে অভিহিত করেছিলেন বিনয় সরকার। তাঁর সেই বিখ্যাত বিশ্লেষণে আছে :

লেখক—এই ধরনের বিপ্লব আর যুগ বা যুগান্তর কি আপনি ১৮৯৩, ১৯০৫ ইত্যাদি বৎসরের সংগে জুড়ে রেখেছেন?

সরকার—হ্যাঁ, ঠিক তাই। বাঙালীর বাচ্চা আমি, বাঙালীর চোখে দুনিয়া দেখি। আমার কাছে ১৯০৫ হ'চ্ছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম বৎসর। এই সময় শুরু হয় গৌরবময় বঙ্গ-বিপ্লব। এ একটা খাঁটি যুগান্তর। এই বঙ্গ-বিপ্লব শেষ হ'লো কবে? এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সোজা নয়। গভীরভাবে দেখ্‌লে ব'লতে হবে যে, এই বিপ্লব বা যুগান্তর আজও সমে এসে ঠেকে নি অর্থাৎ শেষ হয় নি। আর নেহাৎ ভাসা-ভাসাভাবে দেখ্‌লে ১৯০৫-এর **"স্বদেশী", "বয়কট" "স্বরাজ" আর "জাতীয় শিক্ষা"র আন্দোলন মাস দুয়েক বা বৎসর দেড়েকের ভেতরই খতম হ'য়ে গিয়েছিল।**

আমি বঙ্গ-বিপ্লবকে সম্প্রতি অতি লম্বা মেয়াদেও রূপ দিচ্ছি না আবার নেহাৎ ছোট বহরেও দেখ্‌ছি না। কয়েক বৎসর ধরে কতকগুলা ভিন্ন ভিন্ন রকমের মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল। সেই সবগুলাকে স্বদেশী, স্বরাজ ইত্যাদি আন্দোলনের সংগে জুড়ে দেওয়া আমার দস্তুর। কাজেই ১৯০৫-এর পর অনেকদিন পর্যন্ত সেই বিপ্লব বা যুগান্তরের মেয়াদটা টেনে আনা যায়।

লেখক—আপনি ঐ যুগের কয়েকটা বড় বড় ঘটনা উল্লেখ করবেন যার জন্য আপনি স্বদেশী যুগের মেয়াদ বাড়িয়ে দিচ্ছেন? ("বঙ্গ-বিপ্লব কী?" ডিসেম্বর ১৯৪২)

সরকার—প্রথম, ১৯১১ সনে গবর্নমেন্ট দু-টুকরো করা বাংলা দেশকে পুনরায় জুড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। এই কাজের ভেতর যুবক বাংলার রাষ্ট্রিক জয়-জয়কার মূর্তি পেয়েছিল। এ একটা বিপ্লব বা যুগান্তর। আর একটা ঘটনা ১৯১৩ সালের। রবীন্দ্রনাথ পেলেন নোবেল প্রাইজ। তামাম্ দুনিয়ায় জারি হ'য়ে গেল বঙ্গ বিপ্লবের সার্থকতা। জগতের লোক দেখ্‌লো বাঙালীর আত্মিক দিগ্বিজয়। এই ঘটনাও দুনিয়ায় বিপ্লব বা যুগান্তরের সামিল। এই সকল কারণে আমি বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ বললে ১৯০৫ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত সাত-আট বছর বুঝে থাকি।....

লেখক—তা হ'লে বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ শেষ ক'রছেন ১৯১৩ সনে?

সরকার—করতে আপত্তি নেই। আরও কিছু মহত্ত্বপূর্ণ ঘটনা এসে জুটেছে। সে হচ্ছে ১৯১৪ সন হ'তে ১৯১৮ পর্যন্ত মহালড়াই। তাকে আমি বলি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুরুক্ষেত্র। এই লড়াইয়ের সঙ্গে সঙ্গে বা ফলস্বরূপ বাংলাদেশে ওলট-পালট সাধিত হয়েছে অনেক। শিল্পকর্ম, ব্যবসা-বাণিজ্য, সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, রাষ্ট্রিক আন্দোলন—সবই নানাদিকে এগিয়ে গেছে বিস্তর। কাজেই বঙ্গবিপ্লবের জের এই লড়াইয়ের শেষ সীমা পর্যন্ত টেনে আনা আমার দস্তুর। তা হ'লে শেষ বৎসর হয় ১৯১৯ (ভার্সাই সন্ধি)। অতএব বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ বললে আমি বুঝি ১৯০৫ থেকে ১৯১৯।

লেখক—বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে ডন সোসাইটির যোগাযোগ কেমন?

সরকার—ডন সোসাইটি কায়েম হ'ল ১৯০২ সনে আর খতম হ'ল ১৯০৬ সনের মাঝামাঝি। এই কয়বছরের সতীশবাবু সংশ্লিষ্ট সব-কিছুই বঙ্গ-বিপ্লবের সঙ্গে সুজড়িত। বয়কট জারি হ'ল ১৯০৫-এর আগস্ট মাসে আর জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ কায়েম হ'ল ১৯০৬-এর মার্চ মাসে। জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ দাঁড় করিয়ে দেওয়াই ডন সোসাইটির শেষ কাজ।

লেখক—আপনার চিন্তার বঙ্গ-বিপ্লব তাহ'লে কী?

সরকার—বিলাতী মালের বয়কট ঘোষণা (৭ই আগস্ট ১৯০৫) বঙ্গ-বিপ্লবের সূত্রপাত। ১৯১১-এর শেষ পর্যন্ত বাংলার নরনারী যা কিছু ক'রেছে সবই বঙ্গ-বিপ্লবের অন্তর্গত। ("বঙ্গ-বিপ্লবের যুগ" ৭ নভেম্বর ১৯৪২)

লেখক—১৯১১ সনের শেষ দিকটায় দাঁড়ি টানছেন কেন?

সরকার—সেই সময়ে ব্রিটিশ-রাজ বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করতে বাধ্য হয়। দুটুক্‌রো-করা বাংলায় আবার জোড়া লাগে। বঙ্গ-ভঙ্গের বিরুদ্ধেই বাংলার নরনারী বিলাতী বয়কট জারি ক'রেছিল। সুতরাং বঙ্গ-ভঙ্গের রদ হওয়াটা বঙ্গ-বিপ্লবের অন্যতম মস্ত সার্থকতা। এই ঘটনাকে বঙ্গ-বিপ্লবের বড়ো খুঁটা বিবেচনা করা উচিত।

লেখক—১৯০৫ হ'তে ১৯১১ পর্যন্ত পাঁচ-বছর কি একটানা ভাবে আন্দোলন চ'লেছিল? এতদিন ধ'রে এই বিপ্লবের মেয়াদ টান্‌ছেন কেন?

সরকার—বিপ্লবের মেয়াদ বাস্তবিক পক্ষে আজ ১৯৪২ পর্যন্ত টানা চল্‌তে পারে। সফলতা লাভের 'ডোজ' বা মাত্রা আছে। ছোট হিসাবে ১৯১১ সনে মাত্র এক "ডোজ" সফলতা দেখ্‌ছি। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বঙ্গ-বিপ্লবের "আসল" সফলতা যা-কিছু তা ১৯২০-৪২ সনের মাল। কিন্তু আরও বড় হিসাবে ১৯৪২ সনেও সফলতার মাত্রা বেশী নয়। কাজেই মেয়াদের বহর বা পরিমাণ নানারূপ কল্পনা করা সম্ভব। ১৯৪২ সনের পরেও বঙ্গ-বিপ্লবের মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়ার দরকার হ'তে পারে। অন্যান্য জিনিসের মতন বিপ্লব, যুগান্তর ইত্যাদি চিজও আপেক্ষিক।

লেখক—সঙ্কীর্ণতর হিসাবে বঙ্গ-বিপ্লবের কোন পরিচয় দিতে পারেন?

সরকার—৭ই আগস্ট (১৯০৫)-এর বয়কট অথবা ছোট-মেয়াদের বঙ্গ-বিপ্লব বল্‌লে বুঝি মাত্র ১৯০৫-০৬ সনের চিন্তা ও কর্মরাশি। সেই ঘটনাবলীর প্রথম পারিভাষিক বয়কট, দ্বিতীয় স্বদেশী, তৃতীয় স্বরাজ, আর চতুর্থ জাতীয় শিক্ষা। এই চার শব্দের অন্তর্গত বস্তুগুলা নানা উপায়ে

পাকড়াও করবার চেষ্টা হয়েছিল ১৯০৫-এর আগস্ট হ'তে ১৯০৬-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ের ভিতর। সফলতা লাভ হ'য়েছিল অতি-সামান্য। ১৯০৫-এর কংগ্রেস বসে কাশীতে আর ১৯০৬-এর বসে কলকাতায়। কলকাতার কংগ্রেস পর্যন্ত দেড় বৎসরের সময়টা সঙ্কীর্ণ অর্থে বঙ্গ-বিপ্লবের সময়। এই মাস আঠার'র ভেতর বাঙালী জাত্ ঐ চারটা পারিভাষিক শব্দ সৃষ্টি ক'রেছিল। গোটা ভারতে আর খানিকটা দুনিয়ার ভেতরও এই শব্দ ক'টা ছড়িয়ে প'ড়েছিল বাঙালীর অথবা ভারতবাসীর নয়া সৃষ্টি হিসাবে। সমস্ত পৃথিবীর সংস্কৃতি এই নয়া-নয়া শব্দের সম্পদে নবীনীকৃত হচ্ছিল।

লেখক—১৯০৫-৬-এর ঘটনাবলীকে বিপ্লব বলছেন কেন? বিপ্লব কী?

সরকার—১৯৪২-এর আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসের ভারতীয় ঘটনাবলীকে বিলাতের চার্চিল এমেরি হ'তে ভারত-গবর্নমেন্টের বড়-কর্তারা পর্যন্ত সকলেই বিদ্রোহ, বিপ্লব ইত্যাদি ধরনের অবস্থা রূপে বিবৃত ক'রেছে কেন? দুই ক্ষেত্রেই এই বিবরণের কারণ একরূপ। নয়া অবস্থার সৃষ্টি অথবা অবস্থা-পরিবর্তন হচ্ছে বিপ্লবের প্রাণ। বিপ্লবের কয়েকটা প্রধান লক্ষণ দেখাচ্ছি। প্রথমত, পরিবর্তনগুলা একদম নতুন ঢঙের হওয়া চাই। পূর্ববর্তী অবস্থা হ'তে নতুন অবস্থাটার ফারাক বেশ মালুম হওয়া আবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ পরিবর্তনগুলা আকারে, বহরে, পরিমাণে যথেষ্ট, ভারী বা পুরু হওয়া চাই। এই হ'ল বিপ্লবের আসল লক্ষণ। তৃতীয়তঃ, পরিবর্তনগুলা বহুসংখ্যক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজের ফলে সাধিত হওয়া চাই। আর চতুর্থতঃ, পরিবর্তনগুলা সোজা দৃষ্টিতে যেন খানিক্‌টা আকস্মিক বা হঠাৎ সাধিত হ'লো এইরূপ ধারণা হওয়া চাই।

লেখক—এইসব লক্ষণ বঙ্গ-বিপ্লবের ছিল?

সরকার—নিশ্চয়। প্রথমতঃ, বয়কট, স্বদেশী, স্বরাজ আর জাতীয় শিক্ষা এই চার বস্তু ১৮৫৭ সনের পরবর্তী বাঙালী জাত কল্পনা করতেও পারত না। এই বস্তু-বাচক শব্দগুলাও বাঙালীর অভিধানে পাওয়া যেত না। কাজেই ১৯০৫ সনের ৭ই আগস্ট বিলকুল নয়া অবস্থার উৎপত্তি হ'ল। আর ঘটনাগুলা যেন একদম হঠাৎ এসে হাজির হ'য়েছিল। এরি নাম বঙ্গ-বিপ্লব। এই নয়া ঢঙের বঙ্গ-জীবন বিদেশীদেরও মগজে নয়া খেয়াল পয়দা করেছিল। এ-সব দস্তুর মাফিক "যুগান্তর" ছাড়া আর কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ, বয়কট-স্বদেশী-স্বরাজ-জাতীয় শিক্ষা নামক কর্ম-চতুষ্টয় বা চিন্তা-চতুষ্টয় কোনো নামজাদা বাঙালী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, পল্লী বা শহরের কল্পনা বা কার্য মাত্র ছিল না। এই কর্ম ও চিন্তারাশির প্লাবনে তামাম বাংলার নরনারী ভেসে গিয়েছিল। কাজেই রবিকণ্ঠে বেরিয়েছিল—"মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা ব'লে ভাসা তরী"। শব্দই হ'ক আর বস্তুই হ'ক,—দুইয়েই ছিল লাখ-লাখ মানুষের স্বার্থ, আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন ও ভাবুকতা আর কৃতিত্ব, কর্মদক্ষতা, চরিত্রবত্তা ও স্বার্থত্যাগ মাখানো। এরি নাম আন্দোলন। বহরটা রীতিমত পুরু। অসংখ্য বাঙালীর সুরৎ বদলে গেল। মেজাজ বদলে গেল। তা না হ'লে বঙ্গ-বিপ্লব বা বাংলার যুগান্তর এই পারিভাষিকটা চালানো যেত না।

লেখক—সেই যুগে আপনি সমসাময়িক ঘটনাগুলাকে "যুগান্তর" বা "বিপ্লব" মনে করতে পেরেছিলেন? আপনার কোন রচনায় তার চিহ্ন আছে?

সরকার—১৯০৭ সনের জুন মাসে মালদহে জাতীয় শিক্ষা-সমিতি প্রতিষ্ঠার উপলক্ষে "বঙ্গে নব-যুগের নূতন শিক্ষা" প্রবন্ধ পাঠ করি। তার দু-এক লাইন মনে আছে। এই শোন :—"আমাদের এত আশার কারণ কী? হ'তে পারে,—আমাদের দেশের বিপ্লবের সময়েই জন্মেছি ব'লে বোধ হয় আমরা ভবিষ্যতের অন্ধকার দেখি না। সবই যেন সুস্পষ্ট, দু-দুগুণে চারের মতো,—জলবৎ তরল,—যা ভাবি তাই করতে পারি। হ'তে পারে জাতীয় জীবনের কোনো বিষয়ে নিষ্ফলতা দেখিনি ব'লে হতাশ বা ভগ্নোদ্যম হওয়া তো দূরের কথা এসব কাকে বলে তাও জানি না। কিছু দিন আগে জন্মগ্রহণ ক'রলে হয়ত আগাপাছা ভাবতে শিখ্‌তাম,দেশের লোককে গাল দিতাম, আর দেশের ও ধর্মের উন্নতিকে "মেলাঙ্কলি ড্রীম" (বিষাদপূর্ণ স্বপ্ন) বিবেচনা করতাম......... কিন্তু যখনই

চক্ষু উন্মীলন করিলাম তখনই দেখিলাম আমাদের জাতীয় জীবনের নূতন প্রভাতে অরুণিমা চারিধারে হাসিতেছে। সেই তরুণ রবির অরুণ কিরণচ্ছটায় সকলের মন প্রফুল্ল। কবিদের এখন গাইবার সখ হ'য়েছে। দাতাদের দানের ইচ্ছা হ'য়েছে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা আবার যজ্ঞ আরম্ভ ক'রেছেন। আমরাও তাই প্রকৃতির সঙ্গে এক হ'য়ে মিল্‌বার জন্য মন খুলে বেড়াতে শিখেছি। আমরা এই নূতন হাওয়া নূতন আলোর সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাতে চাই।" ("১৯০৮ সনের বাঙালী", ২৪শে ডিসেম্বর ১৯৪২)

১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অ্যালান অক্টাভিয়ান হিউম ছিলেন মুখ্য ব্যক্তি। উনিশ শতকের শেষপর্বে সারা ভারতেই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। দেশে তখন ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব বিকাশোন্মুখ। জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে সেই দুঃসহ দুর্যোগ প্রতিহত করতে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল তৎকালীন ব্রিটিশ শাসকবর্গ। তাদের মানসিক অবস্থা বোঝা যায় হিউমের বক্তব্য থেকে। তিনি লিখেছিলেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পাওয়া সংবাদে এই ধারণাই বদ্ধমূল হচ্ছে, আমরা একটা ভয়ঙ্কর অভ্যুত্থানের মুখোমুখি। এই সব সংবাদ হল দেশের অধিকাংশ নিম্নতম শ্রেণীর মানুষদের সম্পর্কে। এর থেকে আমরা বেশ বুঝতে পেরেছিলাম দেশের প্রচলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণ সম্পূর্ণ হতাশ। তাদের এমনই ধারণা জন্মেছিল, একমাত্র পরিণতি অনাহারে মৃত্যুই অবশ্যম্ভাবী। এই মৃত্যু থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যই তারা উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। আর সেই উৎকণ্ঠার নিরসনে একমাত্র সশস্ত্র অভ্যুত্থানই অনিবার্য।

সে সময়ে ইংরেজ শাসকের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেছিল এ দেশীয় ইংরেজের অনুগ্রহ প্রাপ্ত সুবিধাভোগী সম্প্রদায়। এদের মধ্যে ছিল ম্যাজিস্ট্রেট, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, উকিল, আমলা, ভূস্বামী সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশ। সমাজ বিপ্লবের আতঙ্ক ও কৃষক আন্দোলনের সম্ভাবনায় তৎকালীন বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ইংরেজ শাসকের প্রতিকূলে প্রচার চালিয়েছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের "নীলদর্পণ" নাটক উনিশ শতকের শেষপর্বে কৃষক বিদ্রোহের ইন্ধন জুগিয়েছিল। তারপর আসে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'। গড়ে ওঠে নানান সংগঠন, প্রকাশিত হয় পত্র-পত্রিকা। যা স্বাদেশিকতার উন্মেষে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

সম্প্রতিকালের ইতিহাসকার সমকালীন পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেছেন :

> "উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে শ্রেণীসংঘাত অর্থাৎ ভূস্বামী-শ্রেণীর বিরুদ্ধে কৃষকের সংগ্রাম এরূপ একটা স্তরে উন্নীত হইয়াছিল যে, ভূস্বামী শ্রেণীর পক্ষে কোনরূপ প্রগতিশীল ভাবধারা, সংগ্রামী কৃষকের প্রতি কোন সমর্থন, এমনকি সাহিত্যে সেই সংগ্রামের প্রতিফলনও সহ্য করা সম্ভব ছিল না। সুতরাং এই ভূস্বামিশ্রেণী ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের মুখপাত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে সাহিত্যে বাস্তবতার পরিহার করিয়া চলিতে হইয়াছিল এবং সকল প্রকার প্রগতিশীল বাস্তবমুখী সাহিত্যের বিরোধিতা করিতে হইয়াছিল। কারণ, বাস্তবমুখী সাহিত্যের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। ইহার মধ্যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা, বিভিন্ন শ্রেণীর ভাবধারা, জীবনসংগ্রাম সমস্ত কিছুই স্পষ্টরূপ লাভ করে। সাহিত্য হইয়া ওঠে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর জীবন-সংগ্রামের এক শক্তিশালী হাতিয়ার। "নীলদর্পণ"ও "জমিদার-দর্পণে"র মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল সমসাময়িক কালের কৃষক জনসাধারণের অবস্থা, তাহাদের উপর জমিদার ও নীলকর গোষ্ঠীর অমানুষিক শোষণ-উৎপীড়ন এবং কৃষকের সংগ্রাম—সমাজ বিপ্লবের দিকে কৃষক জনগণের দৃঢ় পদক্ষেপ।....." (ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম—সুপ্রকাশ রায়। পৃ. ১৯৯)

অনেকদিনের ধুলো জমে, বাঙালির সেই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ আজ ধূলিমলিন। ভারতের গবর্নর জেনারেল কার্জনের ঔদ্ধত্যকে অগ্রাহ্য করে বাংলার মানুষ শহর ও গ্রামের পথে পথে উত্তাল হয়ে উঠেছিল মাতৃভূমির মর্যাদা রক্ষায়। গঙ্গা-পদ্মার কূলে কূলে যে জাতীয়তার উন্মেষ ঘটেছিল, যাবতীয় সংকীর্ণতাকে নিশ্চিহ্ন করে তার বুকে জন্ম নিয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রের "স্বদেশি আন্দোলন।" যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল স্বতন্ত্র। ১৮৮৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের জন্মের

পর থেকে কংগ্রেসের এক অনুজ্জ্বল ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠছিল, তার বুকে প্রচণ্ড আঘাত হানে বাঙালির নতুন চেতনার (New Spirit) উন্মেষ। এর বিকাশ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত—যুগোপযোগী এই ভাবনা সমগ্র বাংলা জুড়ে জন্ম দিল এক নতুন মানসিকতার। স্বদেশি আন্দোলনে উত্তাল সেই মুহূর্তের দিকে তাকিয়ে ভগিনী নিবেদিতা বলেছিলেন—"An upsurge of the peoples spirit in Bengal." বাংলার ক্ষুব্ধ জনমানসের বিক্ষোভে দেশ যখন উত্তাল, তখন অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, অরবিন্দ ঘোষ, এরকম বিখ্যাতদের দেখা যায় অগ্রবর্তী পরিচালকের ভূমিকায়। আগেই এসে গেছেন আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল স্রোতধারায় প্রবীণ-নবীন দেশপ্রেমিক ও মনীষীদের উপস্থিতি ঘটে একই বেদীমূলে। রবীন্দ্রনাথ, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, আবদুল রসুল, সখারাম গণেশ দেউস্কর, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত—এরকম বিশিষ্ট বাঙালিদের ভূমিকা সেদিন ছিল ধ্রুবতারার মত।

সভা সমিতি, শোভাযাত্রা, শহর ও মফঃস্বলের প্রান্তিক অঞ্চলকে নতুন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করল। দেশপ্রেমের গানে গানে ভেসে গেল বাঙালি। বাঙালির অন্তর্নিহিত শক্তি জেগে উঠল—যাকে কবিগুরু সেদিন অপূর্ব শব্দ মালায় গেঁথেছিলেন—

আজি বাংলা দেশের হৃদয় হতে কখন আপনি—
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী!

কংগ্রেসের ব্রিটিশ তোষণ নীতি ধীরে ধীরে পথ বদল করছিল। যা সাম্রাজ্যবাদী শাসকের আরও আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। কংগ্রেসকে বৃহৎ রাজনৈতিক আন্দোলনের প্লাটফর্ম হিসাবে ব্যবহারের সুযোগ দেওয়ার আগেই একটা কিছু করা দরকার, এমনই ছিল তাদের চিন্তাধারা। জর্জ নাথানিয়েল কার্জন বড়লাটের পদে (১৮৯৯-১৯০৫) যোগ দেওয়ার আগেই এই বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন। ১৯০০ সালের শেষ দিকে তিনি ভারত সচিবকে লিখেছিলেন : "My own belief is that the Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambitions, while in India, is to assist it to a peaceful demise". —কিন্তু ভারতের জনগণের জাগ্রত রাজনৈতিক চেতনাবোধ উপলব্ধি করার মত কোন ক্ষমতাই ছিল না কার্জনের। ভারতে পদার্পণের পর কার্জন কংগ্রেসকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়ে দৃষ্টি ফেরালেন বাংলার দিকে। বাংলার জনগণকে দ্বিধাবিভক্ত করার গুপ্তবাসনাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন ১৯০৩ সালের দিল্লি দরবারে।

বঙ্গভঙ্গের এই পরিকল্পনাকে সর্বভারতীয় রাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে রাজশক্তির প্রতিহিংসাপরায়ণ রাষ্ট্রনীতির বিশ্লেষণ করেছেন ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস" গ্রন্থে। ক্ষমতাসীন ব্রিটিশ আমলাদের একাংশের আনুকূল্যে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয়েছিল। ইংরেজ প্রভুদের প্রতি আনুগত্যের সংগুপ্ত ইঙ্গিত ছিল এর মধ্যে। কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যে সব বদলে গেল। কংগ্রেসের নবনির্ধারিত নীতির প্রতি শাসককুলের বিরূপ মনোভাবে সৃষ্টি হল নতুন পরিস্থিতি। বিভিন্ন চরমপন্থী সংগঠনের ভূমিকা স্বদেশি ও স্বরাজের গৃহীত কার্যক্রম ইংরেজ শাসকের প্রতিশোধস্পৃহাকে বাড়িয়ে দিতে থাকে। সরকার প্রথম থেকেই দমনপীড়ন নীতি অনুসরণ করে কিছু নেতার ওপর নির্যাতন চালিয়ে অঙ্কুরেই আন্দোলনকে বিনাশ করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের জন্মের আগেই সুরেন্দ্রনাথ আর তিলককে কারাগারে ঢুকতে হয়েছিল। কংগ্রেসের আন্দোলন দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ায় সরকারি কর্তাব্যক্তিরা ক্ষিপ্ত হয়ে নতুন পথ ধরলেন। যার অন্যতম পদক্ষেপই হল বঙ্গ বিভাগ পরিকল্পনা। বাংলাকে বেছে নেওয়ার কারণ, এই প্রদেশই চরমপন্থী কার্যক্রম গ্রহণ ও তার বিনাশের অন্যতম উৎসভূমি। বিশেষ করে কলকাতা ও পূর্ববাংলার জেলাগুলি। মারাঠী ভাষী ও বাংলাভাষী চরমপন্থীরা অনেক কাছাকাছি চলে এসেছিল। সেই একতাবদ্ধ রাজনৈতিক কার্যকলাপকে সমূলে ধ্বংস করতেই বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা। প্রশাসনিক

সৌকর্যের কথা বলা হলেও, অন্তরালে ছিল রাজনৈতিক অভিসন্ধি। বাংলা ভাষাভাষী তিনটি জেলাকে জুড়ে দেওয়া হল অসমের সঙ্গে। অন্যান্য বাংলাভাষী জেলাগুলি, বিহার, ওড়িশা ও ছোটনাগপুর নিয়ে বঙ্গ প্রদেশ।

কিন্তু কার্জন এবং অন্যান্য ব্রিটিশ প্রশাসনিক কর্তাদের চিঠিপত্র এবং আনুষঙ্গিক নোট থেকে জানা যায়, অন্তরালে ছিল ভিন্নতর উদ্দেশ্য। তাদের তথ্যে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে, ভারত ব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনে ইন্ধন জোগাচ্ছিল বাংলার নেতৃবৃন্দ, বাংলা সংবাদপত্রে নানারকম লেখালেখি প্রকাশ এবং ভাষণের মধ্য দিয়ে সাধারণ জনগণকে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে ক্ষিপ্ত করে তুলছিল। কার্জন এই বাঙালি নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে বিধ্বস্ত করতে চেয়েছিলেন। বাঙালি জাতিসত্তাকে, তাদের একাত্মতাকে বিনষ্ট করে, সাম্প্রদায়িকতার বিষবৃক্ষ বপন ভারতের জনগোষ্ঠীকে নতুন সংকটের আবর্তে নিমজ্জন এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী শক্তিগুলির মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করতে বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থাকেই তৎকালীন বিদেশি শাসকরা গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদি প্রশাসনিক সৌকর্য লক্ষ্য হত, তবে তো বাংলা থেকে হিন্দি ও ওড়িয়া ভাষীদের ও তার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে নেওয়া যেত। আর অসমের বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চলকে আলাদা করে নিয়ে বাংলার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া যেত। কিন্তু বঙ্গ ব্যবচ্ছেদে পরিকল্পনায় যে নতুন প্রদেশ সৃষ্টি হল সেখানে অসমের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হল পূর্ব বাংলাকে। কিন্তু হিন্দি ও ওড়িয়াভাষী অঞ্চল ও জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি বাংলার সঙ্গে থেকে গেল যথারীতি। নতুন গঠিত দুটি প্রদেশের একটি হবে অসমিয়া বাংলা ও বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে। অপরটি হবে বাংলা-হিন্দি-ওড়িয়া আর উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নিয়ে। ভবিষ্যতে যা এক ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করত স্বাভাবিক ভাবে। আবার, নবগঠিত অসম-পূর্ববঙ্গের রাজধানী ঢাকা। ঐ অঞ্চলে মুসলিমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং অবিভক্ত বাংলার হিন্দু আধিপত্য থেকে মুসলিমরা ভবিষ্যতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে নিত।

ইংরেজের এই পরিকল্পনা সার্থক রূপ নিতে পারে নি। বঙ্গভঙ্গের বার্তা গোটা বাংলাকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল। সারা বাংলা জুড়ে বিক্ষোভ, ধর্মঘট, হরতাল, ছাত্রদের ক্লাসবর্জন, সর্বশ্রেণীর মানুষের সেই উত্তাল বিস্ফোরণ শাসকগোষ্ঠীর কাছে ছিল সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তারা আরও দেখেছিলেন, জাতীয় কংগ্রেসে নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই ভাগ থাকলেও, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সেখানে প্রস্তাব গ্রহণ করা হচ্ছে। অন্য প্রদেশের রাজনৈতিক কর্মীরা বাঙালি ভাইদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিদেশি বর্জন বয়কট একটি রাজনৈতিক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। সারা দেশে এখন সংগ্রামের অন্যতম হাতিয়ার হয়ে উঠেছে বয়কট।

এই পরিস্থিতির সংকটজনক মুহূর্তকে সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন ই. এম. এস. নামবুদিরিপাদ। তিনি লিখেছেন : "....চরমপন্থী দল সমেত জাতীয়তাবাদী নেতাদের হিন্দু-মানসিকতা এবং মুসলিম সম্প্রদায় থেকেও উদ্ভূত নতুন প্রজন্মের রাজনৈতিক কর্মীদের ঐসলামিক মানসিকতা এবং—এই দুটো জিনিসই সম্প্রদায় দুটোর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির আর পারস্পরিক অবিশ্বাসের, পারস্পরিক আস্থাহীনতার জন্ম দিয়েছিল। এই দুর্বলতা শেষকালে ভারতের গোটা রাজনীতিটার সর্বনাশ ঘটিয়েছিল, আর এই দুর্বলতারই সুচতুর সদ্ব্যবহার করেছিলেন কার্জন আর তার ইংরেজ উত্তরসূরীরা —বাংলাদেশটাকে ভাগ করে দিয়ে। শাসকচক্র খুব হিসেব-টিসেব করেই মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে এই ধারণাটা ঢুকিয়ে দিতে উঠে পড়ে লেগে গেলেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়-অধ্যুষিত নতুন প্রদেশটায় তারাই তো সর্দারি করতে পারবেন। আর ইংরেজদের এই চেষ্টাটা বহুল পরিমাণে সফলও হয়েছিল। ঢাকার নবাব এবং মুসলিম সম্প্রদায়ের অভিজাত শ্রেণির অন্য সব হোমরাচোমরা নেতা, যারা আগে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে এসে জুটেছিলেন, তারাই শেষকালে সেখান থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বঙ্গভঙ্গের সমর্থকদের দলে গিয়ে ভিড়ে পড়লেন। মুসলিম সম্প্রদায়ও ভারতের রাজনীতিতে নিজস্ব অধিকার ও সুযোগ সুবিধার হিস্যা পাওয়ার নিশ্চয়ই হকদার ; অতএব এই সম্পর্কে দাবি তুলে ধরতে তাদের নিজস্ব নতুন সংস্থা মুসলিম

লিগ গড়ে তুলতে ইংরেজ শাসকচক্র পেছন থেকে খুব উসকানি দিয়েছেন, উৎসাহ উদ্দীপনা জুগিয়েছেন মুসলিম অভিজাত শ্রেণির ব্যক্তিদের।

"কংগ্রেসের মধ্যে দুটি বিরুদ্ধভাবাপন্ন গোষ্ঠী থাকলেও. আর, কংগ্রেস দল এবং শাসকদের প্যাঁচে গড়ে ওঠা মুসলিম লিগ—এই দুই-এর মধ্যে মতের বেবাক গরমিল হলেও সরকার ১৯১১ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ রদ করে দিয়ে ভাঙা বাংলাকে আবার জোড়া লাগিয়ে একটা প্রদেশে পরিণত করতে বাধ্য হলো। অর্থাৎ এবার ব্রিটিশ শাসককুল হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলেন, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে যে ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ ভাবাবেগে জনমানস টৈটুম্বুর দেখা গেছে, তা ন্যায়সঙ্গত এবং তাকে দমন করা সম্ভব নয়।*

কেবল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের জন-জোয়ারই নয়, শতাব্দী সূচনাতেই এমন কিছু কিছু ঘটনার উন্মেষ হয়েছিল, যার প্রভাব পড়তে থাকে এশিয়ার বিদেশি পদানত জনগণের চিন্তাধারায়। একটি ঘটনা হল ১৯০৪-০৫ সালের রুশ-জাপান যুদ্ধ। সাম্রাজ্যলোলুপ রাশিয়াকে পরাস্ত করেছিল এশিয়ার ক্ষুদ্রশক্তি জাপান। এর তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটে এশিয়াবাসীদের ওপর। নিপীড়িত পরাধীন দেশের মানুষ নতুন করে ভাবতে শুরু করলেন। সেদিন ভারতবন্ধু এন্ড্রুজ লিখেছিলেন :

> "At the close of the year 1904 it was clear to those who were watching the political horizon that great changes were impending in the East. Storm clouds had been gathering thick and fast. The air was full of electricity The war between Russia and Japan had kept the surrounding people on the tiptoe of expectation. A stir of excitement passed over the North of India. There has been nothing like it since the Mutiny."

জাপানের জয়লাভ ভারতবাসীকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়ে যায়। ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে যে এই ঘটনা উদ্দীপ্ত করেছিল, সে বিষয়ে কোন সংশয় থাকতে পারে না।

অ্যানি বেশান্ত ১৯১৭ সালে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে উল্লেখ করেছিলেন :

> "In a conversation I had with Lord Minto, soon after his arrival as Viceroy, he discussed the so-called "unrest in India", and recognised it as the inevitable result of English Education, of English ideals of Democracy, of the Japanese victory over Russia, and of the changing conditions in the outer world. I was therefore not surprised to read his remark that he recognised, frankly and publicily that new aspirations were stirring in the hearts of the people that they were part of a larger movement common to the whole of a larger movement common to the whole East, and that it was necessary to satisfy them to a reasonable extent by giving them a larger share in the administration."†

জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা তখন পর্যন্ত ছিল, ব্রিটিশের অনুগ্রহ মুখাপেক্ষী। বার্ষিক অধিবেশন তর্কবিতর্ক, পারস্পরিক বিদ্বেষ প্রচার, নিন্দাবাদের ঝড় বয়ে যায়। কংগ্রেসের এই ভূমিকার পাশাপাশি, বয়কট, স্বাদেশিকতার স্রোত যেমন প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনি ভারতের প্রায় সর্বত্র বিপ্লবীরা আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছিল। বিশেষ করে বাংলার নানা স্থানে ছিল তাদের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে। সরকারি উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরা আদৌ নিরাপদ ছিলেন না। তিনি দেশি-বিদেশি যেই হোন না কেন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন এবং তার প্রতিক্রিয়া প্রমাণ করে এই ঘটনাবলীর কিছুই কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল না।

* ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম—ই.এম.এস নাম্বুদিরিপাদ। পৃ: ১৫৯-১৬০

† Congress Presidential Speeches P 82

হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গবিপ্লব

বাঙালি জাগলো কবে? ঘুম ভেঙে দেখলো একদিন হাত পা বাঁধা! ঘরে অন্ধকার। জমিদারি, মনসবদারি, গোমস্তাগিরি, দালালি, মুৎসুদ্দিগিরি করে শরীরে বাত ধরে গিয়েছিল। মুষ্টিমেয় এক শ্রেণির মানুষ বিত্তশালী হলেও বিত্তপেটিকার স্থায়িত্ব ছিল ক্ষণিকের। "বৈকুণ্ঠের" নিদারুণ যন্ত্রণাভোগে বিভ্রান্ত! একদিন চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩) একে নাড়া দিয়েছিলেন। তারপর যে কে সেই! একটা অসুস্থ পঙ্গু মানসিকতার ঘেরাটোপের মধ্যেই জন্ম নিয়েছিলেন রামমোহন (১৭৭২-১৮৩৩), বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১), বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮-৯৪) আর স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। ১৭৫৭ থেকে ১৮৫৭ পর্যন্ত বাঙালির নিজেকে নিয়ে ভাববার অবসর ছিল না। মাঝখানে বিদেশি মিশনারিরা নিজেদের ধর্মপ্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশীয়দের লেখাপড়া শেখাতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। খুবই ধীরে ধীরে হলেও, একটা নতুন আলোর রেখা ঢুকে পড়তে থাকে বাঙালির জংধরা জীবনে। ঐ তিন পুরুষের কণ্ঠস্বর চমকে দিয়েছিল বাংলার মানুষকে। রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জগতে নতুন প্রতিঘাতে জেগে উঠতে থাকে জাতি। ঐ ক্ষুদ্রায়তনের মানুষটি বাংলার ঘরে ঘরে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালাতে চেয়েছিলেন। এবার পরিবর্তনের হাওয়া বইতে থাকে দ্রুত। বাংলা হরফ তৈরি হয়েছে। ছাপাখানা বসেছে কলকাতা জুড়ে। ছাপা হচ্ছে বইপত্তর। জন্ম ঘটেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের। জন্ম নিয়েছে সাময়িকপত্র। পৌঁছে গেছে মানুষের ঘরে ঘরে। অনেক আগেই ব্রাহ্মধর্ম নতুন ধর্মচিন্তার পরিবেশ তৈরি করেছে। নীলকরদের বিরুদ্ধে সাধারণ কৃষিজীবী মানুষের সফল প্রতিরোধ নতুন মানসিক বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে। এবার যেন বাঙালির ভাবনার জগৎটাই বদলে যাচ্ছে।

সেদিনের বাঙালি কী ভাবছিল?

নিজের ও দেশের সম্পর্কে তাদের ভাবনাচিন্তা যে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল, সাময়িকপত্রের পাতায় মেলে তারই প্রতিধ্বনি। যেমন—

> বিদেশি শাসন থেকেও মর্মবিদারক বিদেশি জিনিসের ওপর নির্ভরশীলতা। নিজেদের বোধ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়। প্রশাসনিক অবস্থার পরিবর্তন হলে সব কিছুর পরিবর্তন হবে একথা মানতে আমরা রাজি নই। অহরহ অভিযোগ তুলে বা বক্তৃতা বা কাগজে লিখে কিছুই হবে না। শিক্ষিতজনের উচিত কৃষি ও শিল্পে আত্মনিয়োগ করা। *রাজসাহী সমাচার ১৮৭৬ জানুয়ারি ২১*
>
> ম্যানচেষ্টারের কাপড় দেশের তাঁতিদের দুর্ভাগ্য ডেকে এনেছে। দেশীয়দের উচিত ঐসব কাপড় না পরে দেশীয় কাপড় পরে তাঁতিদের উৎসাহিত করা। *হিন্দুহিতৈষী ১৮৭৬ জানুয়ারি ২৬*
>
> অনেকদিন ধরে ইংরেজ ও দেশীয়রা একত্রে বাস করছে কিন্তু তাদের পার্থক্য ঘুচেনি। ভারতে এসেছিল প্রথমে তারা বণিকপুত্র এবং আমরাও মুসলমানদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে তাদের আনুগত্য স্বীকার করেছি। কিন্তু দুশো বছরেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গির কোন পরিবর্তন হয়নি। তারা শুধু দেখে নিজেদের স্বার্থই এবং নেটিভদের গ্রহণ করে খুবই হালকাভাবে। এখন যেদিকে তাকাই, সেদিকে দেখি শুধু অত্যাচার আর অবিচার। *সুহৃদ ১৮৭৬ জুন ২৭*
>
> ইউরোপিয়ানদের মত, নেটিভদেরও ডিফেন্স অ্যাসোসিয়েশন থাকা উচিত। কারণ, ইউরোপিয়ানরা যেভাবে অত্যাচার করছে, তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের সহায়তার জন্যে এই ধরনের সংস্থা সহায়তা করতে পারে। *ঢাকা গেজেট ১৮৯০ অক্টোবর ৮*

১৯০২ - ৩ সালে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে উঠতে থাকলেও, এর

সূচনা অনেক আগেই। কিন্তু সংগঠিত রূপ পায়নি উদ্যোগ নেওয়া সত্ত্বেও। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ধারাবাহিক একটা প্রবাহ ছিল বাংলায় বিপ্লববাদ বিকাশের। এ বিষয়ে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেছেন :—

"বিপ্লববাদের ইতিহাসের উৎপত্তির কথা জানিতে হইলে বাংলার বিগত ৮০ বৎসরের ইতিহাসের চর্চা করিতে হইবে। বাংলার বিপ্লববাদের ইতিহাস বর্তমান বাংলার ইতিহাস হইতে বাদ দেওয়া যায় না ; কারণ ইহা বিদেশ হইতে আমদানি করা নহে। ইহা 'বেঙ্গল-'এর (নব্য বঙ্গের) অভ্যুদয়। তৎপরে ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব ও বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজের চিন্তার উপর তাহার প্রভাব; রাজনারায়ণ বসুর বৈপ্লবিক মত ও নবগোপাল মিত্রের জাতীয় বা হিন্দু-মেলা, ন্যাশনাল পেপার-এর সংস্থাপনা ; ন্যাশনাল থিয়েটার-এ বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বদেশ প্রেমমূলক নাটকসমূহের অভিনয়; তৎপরে হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানকারীদের অভ্যুদয়; বঙ্কিমচন্দ্র, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ প্রভৃতির বৈপ্লবিক চেষ্টা ও তদনুসারে হুগলীর চারিদিকে লাঠিখেলার আখড়া স্থাপনা, শিবনাথ শাস্ত্রীর দেশ-সেবার উদ্যম, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বৈপ্লবিক চেষ্টা ও স্টুডেন্টস্ এসোসিয়েশন স্থাপনা এবং শেষে 'ইণ্ডিয়ান-এসোসিয়েশন' ও কংগ্রেসের কার্য; শিশিরকুমার ঘোষের বৈপ্লবিক জল্পনা-কল্পনা, তৎপরে স্বামী বিবেকানন্দের আক্রমণশীল হিন্দুধর্মের মতবাদ এবং শেষে বিপ্লববাদীদের দলস্থাপনা ও কর্ম — এইগুলি বাংলার জাতীয় জীবনের ক্রমবিকাশের পর পর স্তর, একটাকে বাদ দিয়া অন্যটাকে ধরা যায় না।......

আজ ইহা শুনিলে অনেকে আশ্চর্যান্বিত হইবেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বঙ্গীয় বৈপ্লবিক সমিতির প্রথম সভ্যদের অনেকের উপর বিশেষভাবে ছিল। তৎকালে একবার আমরা হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলাম যে বাছাবাছা বৈপ্লবিক কর্মীদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্ম-সমাজভুক্ত বা ব্রাহ্ম-সমাজের ছায়াশ্রিত ছিলেন এবং বর্তমান ভারতের রাজনীতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে ইহা দেখা যায় যে, যে-প্রদেশে ব্রাহ্ম-সমাজ প্রার্থনা সমাজ বা আর্য সমাজ...... একটা নূতন চিন্তাস্রোত আনিয়াছে, সেই সব জায়গায় আজ জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা-স্পৃহা বিশেষভাবে ধারণ করিয়াছে।"*

এই বিবর্তনের ধারাপথের অন্যতম পথিকৃত রামমোহন রায় বিপ্লবী চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন 'ফরাসী বিপ্লবের' ভাবধারায়। দেশের সমাজক্ষেত্রে তিনি যুগান্তর সৃষ্টির উদ্যোগ নিলেও রাজনীতি ক্ষেত্রও তাঁর চিন্তামুক্ত ছিল না। তার সপক্ষে কিছু নথিও পাওয়া যায়।

রামমোহনের পর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগও বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'আত্মপরিচয়ে' লিখেছেন :—

"জ্যোতি দাদা এক পোড়ো বাড়িতে এক গুপ্তসভা স্থাপন করেছেন। একটা পোড়ো বাড়িতে তার অধিবেশন, ঋগ্‌বেদের পুঁথি, মড়ার মাথার খুলি আর খোলা তলোয়ার নিয়ে তার অনুষ্ঠান, রাজনারায়ণ বসু তার পুরোহিত। সেখানে আমরা ভারত-উদ্ধারের দীক্ষা পেলাম।"

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'-তে আমরা পাই ঃ—

"বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশী প্রথার চলন ছিল কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত, সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে-পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।

* ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম — ড. ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত। পৃ ৬-৭।

আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। নবগোপাল মিত্র মহাশয় এই মেলার কর্মকর্তারূপে নিয়োজিত ছিলেন। ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সংগীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তবগান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।

লর্ড কার্জনের সময় দিল্লি দরবার সম্বন্ধে একটি গদ্যপ্রবন্ধ লিখিয়াছি—লর্ড লিটনের সময় লিখিয়াছিলাম পদ্যে। তখনকার ইংরেজ গবর্নমেন্ট রুসিয়াকেই ভয় করিত, কিন্তু চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সের বালক-কবির লেখনীকে ভয় করিত না। এই জন্যে সেই কাব্যে বয়সোচিত উত্তেজনা প্রভূত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও তখনকার প্রধান সেনাপতি হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিসের কর্তৃপক্ষ পর্যন্ত কেহ কিছুমাত্র বিচলিত হইবার লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই। টাইম্‌স্ পত্রেও কোনো পত্রলেখক এই বালকের ধৃষ্টতার প্রতি শাসনকর্তাদের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া ব্রিটিশ রাজত্বের স্থায়িত্ব সম্বন্ধে গভীর নৈরাশ্য প্রকাশ করিয়া অত্যুষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করেন নাই। সেটা পড়িয়াছিলাম হিন্দুমেলার গাছের তলায় দাঁড়াইয়া। শ্রোতাদের মধ্যে নবীন সেন মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। আমার বড়ো বয়সে তিনি একদিন একথা আমাকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

জ্যোতিদাদার উদ্‌যোগে আমাদের একটি সভা হইয়াছিল, বৃদ্ধ রাজনারায়ণবাবু ছিলেন তাহার সভাপতি। ইহা স্বাদেশিকের সভা। কলিকাতার এক গলির মধ্যে এক পোড়ো বাড়িতে সেই সভা বসিত। সেই সভার সমস্ত অনুষ্ঠান রহস্যে আবৃত ছিল। বস্তুত, তাহার মধ্যে ওই গোপনীয়তাটাই একমাত্র ভয়ংকর ছিল। আমাদের ব্যবহারে রাজার বা প্রজার ভয়ের বিষয় কিছুই ছিল না। আমরা মধ্যাহ্নে কোথায় কী করিতে যাইতেছি, তাহা আমাদের আত্মীয়রাও জানিতেন না। দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি—ইহাতেই সকলের রোমহর্ষণ হইত, আর বেশি-কিছুই প্রয়োজন ছিল না। আমার মতো অর্বাচীনও এই সভার সভ্য ছিল। সেই সভায় আমরা এমন একটি খ্যাপামির তপ্ত হাওয়ার মধ্যে ছিলাম যে, অহরহ উৎসাহে যেন আমরা উড়িয়া চলিতাম। লজ্জা ভয় সংকোচ আমাদের কিছুই ছিল না। এই সভায় আমাদের প্রধান কাজ উত্তেজনার আগুন পোহানো। বীরত্ব জিনিসটা কোথাও বা সুবিধাকর কোথাও বা অসুবিধাকর হইতেও পারে, কিন্তু ওটার প্রতি মানুষের একটা গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই শ্রদ্ধাকে জাগাইয়া রাখিবার জন্য সকল দেশের সাহিত্যেই প্রচুর আয়োজন দেখিতে পাই। কাজেই যে অবস্থাতেই মানুষ থাক্ না, মনের মধ্যে ইহার ধাক্কা না লাগিয়া তো নিষ্কৃতি নাই। আমরা সভা করিয়া কল্পনা করিয়া, বাক্যালাপ করিয়া, গান করিয়া, সেই ধাক্কাটা সামলাইবার চেষ্টা করিয়াছি। মানুষের যাহা প্রকৃতিগত এবং মানুষের কাছে যাহা চিরদিন আদরণীয়, তাহার সকলপ্রকার রাস্তা মারিয়া, তাহার সকলপ্রকার ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে একটা যে বিষম বিকারের সৃষ্টি করা হয় সে-সম্বন্ধে কোনো সন্দেহই থাকিতে পারে না। একটা বৃহৎ রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে কেবল কেরানিগিরির রাস্তা খোলা রাখিলে মানবচরিত্রের বিচিত্র শক্তিকে তাহার স্বাভাবিক স্বাস্থ্যকর চালনার ক্ষেত্র দেওয়া হয় না। রাজ্যের মধ্যে বীরধর্মেরও পথ রাখা চাই, নহিলে মানবধর্মকে পীড়া দেওয়া হয়। তাহার অভাবে কেবলই গুপ্ত উত্তেজনা অন্তঃশীলা হইয়া বহিতে থাকে—সেখানে তাহার গতি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং পরিণাম অভাবনীয়। আমার বিশ্বাস সেকালে যদি গবর্নমেন্টের সন্দিগ্ধতা অত্যন্ত ভীষণ হইয়া উঠিত তবে তখন আমাদের সেই সভার বালকেরা যে-বীরত্বের প্রহসন মাত্র অভিনয় করিতেছিল, তাহা কঠোর ট্রাজেডিতে পরিণত হইতে পারিত। অভিনয় সাঙ্গ হইয়া গিয়াছে, ফোর্ট উইলিয়মের একটি ইষ্টকও খসে নাই এবং সেই পূর্বস্মৃতির আলোচনা করিয়া আজ আমরা হাসিতেছি।

ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে। এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানা

প্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন। ধুতিটা কর্মক্ষেত্রের উপযোগী নহে অথচ পায়জামাটা বিজাতীয়, এইজন্য তিনি এমন একটা আপস করিবার চেষ্টা করিলেন যেটাতে ধুতিও ক্ষুণ্ণ হইল, পায়জামাও প্রসন্ন হইল না। অর্থাৎ, তিনি পায়জামার উপর একখণ্ড কাপড় পাট করিয়া একটা স্বতন্ত্র কৃত্রিম মালকোঁচা জুড়িয়া দিলেন। সোলার টুপির সঙ্গে পাগড়ির সঙ্গে মিশাল করিয়া এমন একটা পদার্থ তৈরি হইল যেটাকে অত্যন্ত উৎসাহী লোকেও শিরোভূষণ বলিয়া গণ্য করিতে পারে না। এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোশাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল। রবিবারে রবিবারে জ্যোতিদাদা দলবল লইয়া শিকার করিতে বাহির হইতেন। বরাহূত অনাহূত যাহারা আমাদের দলে আসিয়া জুটিত তাহাদের অধিকাংশকেই আমরা চিনিতাম না। তাহাদের মধ্যে ছুতার কামার প্রভৃতি সকল শ্রেণীরই লোক ছিল। এই শিকারে রক্তপাতটাই সবচেয়ে নগণ্য ছিল, অন্তত যেরূপ ঘটনা আমার তো মনে পড়ে না। শিকারের অন্য সমস্ত অনুষ্ঠানই বেশ ভরপুরমাত্রায় ছিল—আমরা হত-আহত পশুপক্ষীর অতি তুচ্ছ অভাব কিছুমাত্র অনুভব করিতাম না। প্রাতঃকালেই বাহির হইতাম। বউঠাকুরানী রাশীকৃত লুচি তরকারি প্রস্তুত করিয়া আমাদের সঙ্গে দিতেন। ওই জিনিসটাকে শিকার করিয়া সংগ্রহ করিতে হইত না বলিয়াই, একদিনও আমাদিগকে উপবাস করিতে হয় নাই।

মানিকতলায় পোড়োবাগানের অভাব নাই। আমরা যে-কোনো একটা বাগানে ঢুকিয়া পড়িতাম। পুকুরের বাঁধানো ঘাটে বসিয়া উচ্চনীচনির্বিচারে সকলে একত্র মিলিয়া লুচির উপরে পড়িয়া মুহূর্তের মধ্যে কেবল পাত্রটাকে মাত্র বাকি রাখিতাম।

ব্রজবাবু আমাদের অহিংস্রক শিকারিদের মধ্যে একজন প্রধান উৎসাহী। ইনি মেট্রোপলিটান কলেজের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট এবং কিছুকাল আমাদের ঘরের শিক্ষক ছিলেন। ইনি একদিন শিকার হইতে ফিরিবার পথে একটা বাগানে ঢুকিয়াই মালিকে ডাকিয়া কহিলেন, "ওরে ইতিমধ্যে মামা কি বাগানে আসিয়াছিলেন।" মালি তাঁহাকে শশব্যস্ত হইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আজ্ঞা না, বাবু তো আসে নাই।" ব্রজবাবু কহিলেন, "আচ্ছা, ডাব পাড়িয়া আন।" সেদিন লুচির অন্তে পানীয়ের অভাব হয় নাই।

আমাদের দলের মধ্যে একটি মধ্যবিত্ত জমিদার ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান হিন্দু। তাঁহার গঙ্গার ধারে একটি বাগান ছিল। সেখানে গিয়া আমরা সকল সভ্য একদিন জাতিবর্ণনির্বিচারে আহার করিলাম। অপরাহ্ণে বিষম ঝড়। সেই ঝড়ে আমরা গঙ্গার ঘাটে দাঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে গান জুড়িয়া দিলাম। রাজনারায়ণবাবুর কণ্ঠে সাতটা সুর যে বেশ বিশুদ্ধভাবে খেলিত তাহা নহে কিন্তু তিনিও গলা ছাড়িয়া দিলেন, এবং সূত্রের চেয়ে ভাষ্য যেমন অনেক বেশি হয় তেমনি তাঁহার উৎসাহের তুমুল হাতনাড়া তাঁহার ক্ষীণ কণ্ঠকে বহুদূরে ছাড়াইয়া গেল ; তালের ঝোঁকে মাথা ঝাড়িতে লাগিলেন এবং তাঁহার পাকা দাড়ির মধ্যে ঝড়ের হাওয়া মাতামাতি করিতে লাগিল। অনেক রাত্রে গাড়ি করিয়া বাড়ি ফিরিলাম। তখন ঝড়বাদল থামিয়া তারা ফুটিয়াছে। অন্ধকার নিবিড়, আকাশ নিস্তব্ধ, পাড়াগাঁয়ের পথ নির্জন, কেবল দুইধারের বনশ্রেণীর মধ্যে দলে দলে জোনাকি যেন নিঃশব্দে মুঠা মুঠা আগুনের হরির লুট ছড়াইতেছে।

স্বদেশে দিয়াশালাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল। এজন্য সভ্যেরা তাঁহাদের আয়ের দশমাংশ এই সভায় দান করিতেন। দেশালাই তৈরি করিতে হইবে, তাহার কাঠি পাওয়া শক্ত। সকলেই জানেন, আমাদের দেশে উপযুক্ত হাতে খেংরাকাঠির

মধ্য দিয়া সস্তায় প্রচুর পরিমাণে তেজ প্রকাশ পায় কিন্তু সে-তেজে যাহা জ্বলে তাহা দেশালাই নহে। অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশালাই তৈরি হইল। ভারত সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে-খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা-ধরানো চলিত। আরো একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।

খবর পাওয়া গেল, একটি কোনো অল্পবয়স্ক ছাত্র কাপড়ের কল তৈরি করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত; গেলাম তাহার কল দেখিতে। সেটা কোনো কাজের জিনিস হইতেছে কি না তাহা কিছুমাত্র বুঝিবার শক্তি আমাদের কাহারও ছিল না,—কিন্তু বিশ্বাস করিবার ও আশা করিবার শক্তিতে আমরা কাহা চেয়ে খাটো ছিলাম না। যন্ত্র তৈরি করিতে কিছু দেনা হইয়াছিল, আমরা তাহা শোধ করিয়া দিলাম। অবশেষে একদিন দেখি ব্রজবাবু মাথায় একখানা গামছা বাঁধিয়া জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত। কহিলেন, 'আমাদের কলে এই গামছার টুকরা তৈরি হইয়াছে।' বলিয়া দুই হাত তুলিয়া তাণ্ডব নৃত্য—তখন ব্রজবাবুর মাথার চুলে পাক ধরিয়াছে।

অবশেষে দুটি-একটি সুবুদ্ধি লোক আসিয়া আমাদের দলে ভিড়িলেন, আমাদিগকে জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাওয়াইলেন এবং এই স্বর্গলোক ভাঙিয়া গেল।

ছেলেবেলায় রাজনারায়ণ বাবুর সঙ্গে যখন আমাদের পরিচয় ছিল তখন সকল দিক হইতে তাঁহাকে বুঝিবার শক্তি আমাদের ছিল না। তাঁহার মধ্যে নানা বৈপরীত্যের সমাবেশ ঘটিয়াছিল। তখনই তাঁহার চুলদাড়ি প্রায় সম্পূর্ণ পাকিয়াছে কিন্তু আমাদের দলের মধ্যে বয়সে সকলের চেয়ে যে ব্যক্তি ছোটো তাহার সঙ্গেও তাঁহার বয়সের কোনো অনৈক্য ছিল না। তাঁহার বাহিরের প্রবীণতা শুভ্র মোড়কটির মতো হইয়া তাঁহার অন্তরের নবীনতাকে চিরদিন তাজা করিয়া রাখিয়া দিয়াছিল। এমন-কি, প্রচুর পাণ্ডিত্যেও তাঁহার কোনো ক্ষতি করিতে পারে নাই, তিনি একেবারেই সহজ মানুষটির মতোই ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত অজস্র হাস্যোচ্ছ্বাস কোনো বাধাই মানিল না—না বয়সের গাম্ভীর্য, না অস্বাস্থ্য, না সংসারের দুঃখকষ্ট, ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন, কিছুতেই তাঁহার হাসির বেগকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে নাই। একদিকে তিনি আপনার জীবন এবং সংসারটিকে ঈশ্বরের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদন করিয়া দিয়াছিলেন, আর একদিকে দেশের উন্নতিসাধন করিবার জন্য তিনি সর্বদাই কতরকম সাধ্য ও অসাধ্য প্ল্যান করিতেন তাহার আর অন্ত নাই। রিচার্ডসনের তিনি প্রিয় ছাত্র, ইংরাজি বিদ্যাতেই বাল্যকাল হইতে তিনি মানুষ কিন্তু তবু অনভ্যাসের সমস্ত বাধা ঠেলিয়া ফেলিয়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহ ও শ্রদ্ধার বেগে তিনি প্রবেশ করিয়াছিলেন। এদিকে তিনি মাটির মানুষ কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ সে তাঁহার সেই তেজের জিনিস। দেশের সমস্ত খর্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক আর না লাগুক সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।

এই ভগবদ্‌ভক্ত চিরবালকটি তেজঃপ্রদীপ্ত হাস্যমধুর জীবন, রোগে শোকে অপরিম্লান তাঁহার পবিত্র নবীনতা, আমাদের দেশের স্মৃতিভাণ্ডারে সমাদরের সহিত রক্ষা করিবার সামগ্রী তাহাতে সন্দেহ নাই।"*

১. সঞ্জীবনী সভা—সংক্ষেপে বলা হত — হা ম্‌ চু পা মু হা ফ।

২. রাজনারায়ণ বসু ১৮২৬-৯৯।

সঞ্জীবনী সভার সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর একটি নিজস্ব গুপ্ত সমিতি ছিল। দুটি সমিতি একসঙ্গেই পরিচালিত হত। এই দলের সদস্য ছিলেন ডা. সুন্দরীমোহন দাস, নবগোপাল মিত্র। নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ মিলে বার্ষিক "হিন্দুমেলা" প্রবর্তন করেন। বাঙালি যুবকদের বৈপ্লবিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ করাই ছিল, এই মেলার উদ্দেশ্য। "আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম-কর্মের জন্য নহে, কোন বিষয়ে সুখের জন্য নহে, কোন আমোদ-প্রমোদের জন্যও নহে. ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত ভূমির জন্য।" (গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর)।

সে সময়ে বাঙালি শিক্ষিত যুবকের লক্ষ্য ছিল সরকারি চাকরি। কিন্তু সেই চাকরির মোহমুক্ত স্বদেশপ্রেমিক বাঙালি যুবক সৃষ্টিতে তৎপর হয়েছিল শিবনাথ শাস্ত্রী। দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, ড. সুন্দরীমোহন দাস—এরকম কিছু যুবককে নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি তিনি স্থাপন করেন।

এই সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রে লেখা থাকত : "স্বায়ত্তশাসনই আমরা বিধাতৃনির্দিষ্ট শাসন বলিয়া গ্রহণ করি। তবে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ মঙ্গলের মুখ চাহিয়া আমরা বর্তমান সরকারের নিয়ম-কানুন মানিয়া চলিব। কিন্তু দুঃখ-দারিদ্র-দুর্দশার দ্বারা নিপীড়িত হইলেও কখনই এই সরকারের অধীনে দাসত্ব স্বীকার করিব না।"

সদস্যদের স্বাক্ষরিত প্রতিজ্ঞাপত্র যজ্ঞাগ্নিতে নিক্ষেপ করতে হত। যুবসমাজকে দেশ-সেবার কাজে অনুপ্রাণিত করা, নারীমুক্তি, সমাজ-সংস্কার, জাতীয়তাবোধে মুক্ত উদ্দীপ্ত কর্মকাণ্ডের সঙ্গে স্বায়ত্তশাসন ও রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পরিকল্পনা ছিল সমিতির। আনন্দমোহন বসু, মনোমোহন ঘোষ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতিতে জড়িত ছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ দেশে ফিরে এসে ছাত্র সমিতি গঠিত করেন। পরে শিবনাথ শাস্ত্রীর বৈপ্লবিক দলের সঙ্গে যুক্ত হন। ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্র (পি. এন. মিত্র) ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রমথনাথের অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ যুক্ত ছিলেন। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ভিন্নমত পোষণ করলেও গুপ্তসমিতি তাঁর আর্থিক সহযোগিতা লাভে বঞ্চিত হয়নি।

ভারতে বৈপ্লবিক চেতনার উন্মেষে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, সখারাম গণেশ দেউস্করের ভূমিকা কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরানী, হেমচন্দ্রের ভারত সঙ্গীত, ভূদেবচন্দ্রের 'স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস', যোগেন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী, সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা'—বাংলায় বিপ্লববাদের প্রসারে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। স্বামী বিবেকানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা এবং অধ্যাপক ওকাকুরা বাংলার বৈপ্লবিক চেতনা প্রসারের ধারাকে প্রাণবন্ত রূপ দিয়েছিলেন। তাঁদেরই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিনী নিবেদিতা, হেমচন্দ্র মল্লিক (সুবোধ মল্লিকের কাকা) একটি কমিটি গঠন করেন।

এসবই হল প্রাথমিক প্রয়াস। প্রমথনাথ শতাব্দীশেষের আগে কয়েকবার উদ্যোগী হয়েও সফল হতে পারেননি। অবশেষে প্রমথনাথ মিত্রের উদ্যোগে (মিঃ পি মিত্র নামে পরিচিত ছিলেন) অনুশীলন সমিতির জন্ম কলকাতায় ১৯০২ সালে। পি. মিত্র ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সহ-সভাপতি ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ এবং সি. আর. দাশ। সম্পাদক ছিলেন যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। প্রধান পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে ছিলেন সরলাদেবী, বিপিন চন্দ্র পাল, সিস্টার নিবেদিতা প্রমুখ। পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য ১৯০৫ সালে পি. মিত্র. অরবিন্দ ঘোষ এবং বিপিন চন্দ্র পাল বিভিন্ন জেলা পরিক্রমা করেন। এই সময়ে তাঁরা ঢাকা অনুশীলন সমিতির নেতৃত্বভার অর্পণ করেছিলেন পুলিনবিহারী দাশের ওপর। ক্রমশ পুলিন বিহারী তাঁদের এমন আস্থাভাজন হয়ে ওঠেন যে, তাঁকে কলকাতায় পি. মিত্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হয়েছিল। পুলিনবিহারীও সংগঠন গড়ে তুলতে থাকেন নিষ্ঠার সঙ্গে। ধীরে ধীরে এটি সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত হয়ে ওঠে। এমনকী

বিদেশে অবস্থানকারী ভারতীয়রাও এদের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

অনুশীলন সমিতির পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম নেতা অরবিন্দ ঘোষের ছোট ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। এক্ষেত্রে তাঁর উৎসাহদাতা ছিলেন ভাই অরবিন্দ। কিন্তু পি. মিত্রসহ সংগঠনের অন্যান্য নেতারা উপযুক্ত সময় পর্যন্ত অপেক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এর ফলে বারীন্দ্রকুমার এবং তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে সমিতির অন্যান্যদের মতবিরোধ ঘটে। তাঁরা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। বারীন্দ্র এবং তার অনুগামীরা ছিলেন 'যুগান্তর' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশের আড়ালে। মানিকতলায় একটি পোড়ো বাড়িতে ছিল তাদের বোমা তৈরির কারখানা। সাধারণ মানুষকে বিপ্লবী ক্রিয়াকর্মে আত্মনিবেদনে 'যুগান্তর' সেসময়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কিন্তু বারীন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীরা এটুকুতে সন্তুষ্ট ছিল না। তাদের কাজকর্মের প্রতি জনগণকে আকৃষ্ট করতে এবং তাদের ভূমিকা যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ছিল, তা প্রমাণের জন্যই মজফরপুরে ক্ষুদিরাম বসু এবং প্রফুল্ল চাকী বোমা নিক্ষেপ করে প্রাণ বিসর্জন করে। দেশজুড়ে সাড়া পড়ে যায়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রচিত গান গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে। এই বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে ওঠে পুলিশ। তারা মানিকতলায় বোমার কারখানা আবিষ্কার করে অরবিন্দ, বারীন্দ্র এবং অন্যান্যদের গ্রেপ্তার করে। ১৯০৮ সালে তাদের আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার আসামী হিসাবে আদালতে উপস্থিত করা হয়। এর মধ্যে একমাত্র অরবিন্দ ব্যতীত আর সকলের শাস্তি হয়। অরবিন্দের পক্ষে আইনজীবী হিসাবে আদালতে দাঁড়িয়েছিলেন সি. আর. দাশ। এই বিচারের রায় প্রায় সকল সমকালীন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

'যুগান্তর' পত্রিকা মুখপত্র হওয়ায় গুপ্ত সংগঠনও যুগান্তর নামে পরিচিত হয়েছিল। কিন্তু আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার পর যুগান্তর দল অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কিন্তু সেই মৃতপ্রায় দলকে আবার সজীব করে তোলেন যতীন মুখার্জি। যতীন মুখার্জি শহিদ হওয়ার পর বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন জনের নেতৃত্বে যুগান্তর দল সঞ্জীবিত ছিল। কিন্তু প্রতিটি দলই ছিল পরস্পব বিচ্ছিন্ন। কোন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছিল না। প্রতিটি দলই ছিল একই নামে পরিচিত। কোন সময়ে নেতারা বিশেষ কোন কর্মসূচীতে একত্রিত হয়ে কাজ করতেন। এরকম কয়েকটি দলের নেতার কথা জানা যায়—বিক্রমপুরে জীবনলাল চ্যাটার্জির গ্রুপ, ময়মনসিংহে সুরেন্দ্রমোহন ঘোষের গ্রুপ, ফরিদপুরে পূর্ণদাসের গ্রুপ, বরিশালে মনোরঞ্জন গুপ্ত ও অরুণ গুহর গ্রুপ, হাওড়ায় বিপিন গাঙ্গুলির গ্রুপ।—এছাড়াও ছিল যুগান্তরের বহু শাখা।

কিন্তু 'অনুশীলন সমিতির' ভাগ্যে এমন বিপর্যয় ঘটেনি। দল ছিল সুগঠিত এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কালেও দলের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। পুলিনবিহারী দাস তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :—

"এ সময়ে বঙ্গ-ভঙ্গ প্রতিবাদ আন্দোলন, বিলাতি-বর্জন, পিকেটিং প্রভৃতি তীব্র ভাবে আরম্ভ হইল। পিকেটিং ও সভা সমিতিগুলিতে সুশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছাত্রগণের উপরেই ন্যস্ত হইল। শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় (শ্যামাকান্তের সর্ব কনিষ্ঠ ভ্রাতা) ও আমার বন্ধু ভূপেশ নাগ,—ছাত্রগণে গঠিত স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত হইল। শীতল বিশেষ কোনও দক্ষতা দেখাইতে পারিল না; ভূপেশ নাগ প্রতিদিন কার্যস্থল ও সময় নির্দেশ করিয়া স্বেচ্ছাসেবকগণকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া দিত; কিন্তু সর্বদাই তাহার জ্যৈষ্ঠ ভ্রাতা সুরেশ নাগ ও আমার পরামর্শ অনুসারেই কার্য করিত।"

"এই সময়ে আমি ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের পদের জন্য এক আবেদন করিয়াছিলাম। সে সময়ে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা (Competitive Examination) রদ করিয়া গবর্ণমেন্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছিল যে, গবর্ণমেন্টভুক্ত (loyal) উচ্চ রাজকর্মচারিদিগের বংশ হইতেই নূতন ডেপুটি মেজিস্ট্রেট নিযুক্ত করা হইবে। পদ-প্রার্থী আন্ডার-গ্রেজুয়েট হইলেও চলিবে। আমাদের বাড়ির

নাম ডেপুটি বাড়ি, এবং বংশও রাজ ভক্ত বলিয়াই পরিচিত ছিল। বংশে বহু ডেপুটি মেজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য উচ্চ রাজ-কর্মচারীও ছিল। সে সময়ে যাহার ঢাকার ডেপুটি মেজিস্ট্রেট ছিলেন, তাহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই (পারিবারিক সম্বন্ধ কিম্বা বন্ধুত্ব থাকা হেতু) আমাকে অনুমোদন পত্র দিয়াছিলেন। ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যক্ষ রাজকুমার সেন ও কালীপদ বসু (কে. পি. বসু), বিজ্ঞানের অধ্যক্ষ বি. এন. দাস, রসায়নের অধ্যক্ষ কিরণ দে, ইংরাজীর অধ্যক্ষ স্বনামখ্যাত হরিনাথ দে, এবং কলেজের প্রিন্সিপাল (ইংরাজি) প্রত্যেকেই আমাকে প্রশংসাপত্র সহ অনুমোন করিয়াছিলেন,—এবং আমার বাবার বন্ধু ও সহপাঠী জাস্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষও আমাকে এক অনুমোদন পত্র দিয়াছিলেন। যে দিন আমি আমার আবেদন পত্র রাজদ্বারে সমর্পণ করিয়াছিলাম, ঠিক তাহার পনেরো দিন পরেই ভূপেশ নাগ আমাকে জানাইল যে, পিকেটিং-এর সময় ছাত্রগণের মধ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষা হেতু, এবং যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ না হয়, কিম্বা ঢাকার নবাবের প্ররোচনায় বিরুদ্ধবাদী মুসলমানগণ কোন রূপ মারামারির সূচনা করিতে না পারে,—সে জন্য স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে আমাকেও থাকিতে হইবে। আমিও সম্মত হইলাম। এদিকে গবর্ণমেন্ট হইতে তদন্ত করিতে আসিয়া জানিয়া গেল যে, আমি ঘোরতর "স্বদেশি"—এবং আমিও স্বদেশিতে মত্ত হইয়া ডেপুটি মেজিস্ট্রেটের পদ লাভ হেতু আবেদনের কথা একেবারে ভুলিয়াই গেলাম।"

"কিছুদিন ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে কার্য করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে আমার প্রভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। কোনও সমস্যার উদ্ভব হইলে ভূপেশ নাগও আমার উপদেশ মতই কাজ করিত। প্রথমত **কতিপয় মুসলমান ছাত্রও আমাদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিল এবং আমার উপদেশ সন্তুষ্ট চিত্তে পূর্ণভাবেই প্রতিপালন করিত;—স্থানে স্থানে দ্বিধাভাব যুক্ত মুসলমানগণের সঙ্গে আমাদের তর্ক বিতর্ক হইত,—পরিশেষে বহু মুসলমান আমাদের যুক্তিগুলি মানিয়া লইত। বহু মুসলমানই বিশ্বাস করিত যে, যে সমস্ত বিদেশী জিনিষ আমরা ক্রয় করি, তাহা যদি আমাদের দেশেই উৎপন্ন হওয়ার ব্যবস্থা হয়, তবে বহু মুসলমান শিল্পীও যথেষ্ট রূপেই উপকৃত হইবে।**"

"কিন্তু নবাব-বাড়ির লোকজন আসিয়া আমাদিগকে বাধা দিত; তাহাদের সঙ্গে গুণ্ডাও থাকিত, —তাহারা মারামারি বাধাইবার বিবিধ প্রকার প্রচেষ্টাও করিত; কিন্তু আমরা সংযতভাবে সর্বদাই নিরস্ত থাকিতাম। **ক্রমে নবাব-বাড়ির লোকজনের প্রভাবে ও ভীতি-প্রদর্শনের ফলে, মুসলমান ছাত্রগণ সরিয়া পড়িল,—এবং সাধারণ মুসলমানগণও ক্রমেই হিন্দু-বিরোধী ও হিন্দু-বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইতে লাগিল। আমরাও মুসলমানগণের সহযোগিতার আশা পরিত্যাগ করিলাম।** কিন্তু হেদায়েৎ মাস্টার প্রভৃতি কতিপয় সদাত্মা মুসলমান, নবাব বাড়ির ভয়ে ভীত না হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী মুসলমানগণের লাঞ্ছনা-গঞ্জনা প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া, বিভিন্ন সভা সমিতিতে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া মুসলমানগণকে তাহাদের ভুল বুঝাইয়া দিয়া, স্বদেশিব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত মুসলমানগণ তৎকালীন কাবুলের আমীরের অনুকরণে অগ্রগামী হইয়া হিন্দু শাস্ত্র ও মুসলমান শাস্ত্র হইতে বিভিন্ন যুক্তি দেখাইয়া,—অধিকন্তু দেশের কল্যাণ হেতু গোরক্ষার সবিশেষ প্রয়োজন বুঝাইয়া দিয়া,—একটি গো-রক্ষিণী সমিতিও গঠন করিয়াছিলেন; দুঃখের বিষয় হিন্দুগণ এ বিষয়ে তাহাদের ন্যায় উৎসাহী কিম্বা অগ্রগামী হন নাই,—তাই ঐ গো-রক্ষিণী সমিতিটি ক্রমে লুপ্ত হইয়া গেল।"

"যাহারা ইহকাল অপেক্ষা পরকালেরই প্রাধান্য দিয়া থাকেন, তাহারা হয়ত মুখে প্রচার করিতে পারেন "অর্থমনর্থম ভাবয় নিত্যম্"—কিন্তু কার্যতঃ তাহারাও অর্থাগম হেতু ছল, বল, কল, কৌশল প্রয়োগ করিতে কিম্বা পরপদ লেহন করিতেও দ্বিধা বোধ করেন না; ফলে,—মনে, মুখে, কার্যে ভাবনায় কোনই সামঞ্জস্য থাকে না,—তাই আমাদের দেশে কেহই কাহাকেও প্রাণ ভরিয়া বিশ্বাসও করিতে পারে না;—সুতরাং সঙ্ঘবদ্ধভাবে কোনও শ্রেষ্ঠ কর্মেই সফলতাসহ অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে না।—কিন্তু আমাদেরই শাস্ত্রে আছে যে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্বর্গ ধর্মসাধন

ব্যতিরেকে প্রকৃত মোক্ষ ও মুক্তি সম্ভব কিম্বা সহজসাধ্য হয় না। প্রথমতঃ সদাচারাদি ধর্মসাধন দ্বারা দেহ, মন ও প্রাণের বিশুদ্ধতা রক্ষা; তৎসঙ্গে ধর্মের ব্যভিচার না করিয়া অর্থ সঞ্চয় ও অর্থের সদ্ব্যবহার,—(ন্যায়েনার্জনস্য বদ্ধনম্ পালনং তথা সৎপাত্রে বিনিয়োগশ্চ এষ ধর্ম সনাতনঃ); ধর্ম ও অর্থে অপব্যবহার কিম্বা বৃথা অপচয় না করিয়া কামভোগ—অর্থাৎ দেহ, মন, প্রাণ, লোকসমাজ প্রভৃতির কোনরূপ গ্লানির কারণ না জন্মাইয়া পবিত্রভাবে বিভিন্ন বাসনা কামনার তৃপ্তি সাধন ; সঙ্গে সঙ্গে আত্মার বিভিন্নমুখী বিকাশহেতু ধ্যান-ধারণা প্রভৃতি সহযোগে বিভিন্ন উপলব্ধি-লব্ধ জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা জগতের কল্যাণ-সাধন করিতে পারিলেই মানব-আত্মা আনন্দময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ ও মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। কিন্তু আমাদের শাস্ত্রের কথা ক'জনেই বা জানে, এবং ক'জনেই বা জানিতে চায় কিম্বা প্রতিপালন করে!!

"কিন্তু লোকসমাজে সমষ্টিগতভাবে ব্যভিচার, অবিচার, অত্যাচার, অপচয়াদির প্রতিরোধ করিয়া জনগণের রক্ষাবিধান ও হিতসাধন মানসে চতুর্বর্গ ধর্মের সামঞ্জস্য রক্ষা হেতুই রাজশাসন ও রাজনীতির প্রয়োজন হইয়া থাকে। রাজশাসন ও রাজনীতি সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলেই সর্বরূপে শক্তিশালী হইতেই হয়। শক্তিশালী হইতে হইলেই সমগ্র ঐশ্বর্য, সমগ্র বীর্য, সমগ্রজ্ঞান, সমগ্র বৈরাগ্য সর্বরূপ আসক্তি ও বিরক্তি হইতে মুক্ত থাকিয়া কেবলমাত্র কর্তব্য বিষয়েই অনুরক্তি সমগ্র যশ নিপুণতা সহ সুকৌশলে সর্বকর্ম সুসম্পন্ন করিবার যোগ্যতা ও সমগ্র শ্রী সর্বরূপ সুশৃঙ্খলা *এই ষড়ৈশ্বর্য লাভ করিতেই হয়। যাহাদের এই ষড়ৈশ্বর্য নাই, তাহারা নামতঃ স্বাধীন হইলেও* কার্যতঃ নিশ্চয়ই কাহারও না কাহারও পরাধীন। কারণ ষড়ৈশ্বর্য না থাকিলে অভাব, অশান্তি ও আতঙ্ক (ভয়) হইতে মুক্ত হওয়া যায় না; যাহারা মুক্ত নয়, তাহারা স্বাধীনও নয়। সাধারণভাবে বিচার করিলেও বুঝিতে পারা যায়, যে জাতিগুলি বর্তমানে প্রকৃত স্বাধীন, তাহারা অপেক্ষাকৃতভাবে অন্যান্য জাতিগুলি অপেক্ষা অধিকতর ষড়ৈশ্বর্যশালী। ঐশ্বর্য এবং ঐশ্বর্যশালী ধনী ব্যক্তিগণের সহায়তা ব্যতিরেকে কোন কার্যই সফলতা সহ অগ্রসর হইতে পারে না। ইহাই আমাদের দেশের বর্তমান পরিস্থিতি। আমাদের দেশের বর্তমান যুগের কমিউনিস্ট নেতাগণ প্রত্যেকেই ধনী কিম্বা ধনিকের অথবা কোনও ধূর্ত কূটনৈতিক রাজশক্তির বাহন,—**কংগ্রেস নেতাগণ প্রত্যেকেই ধনী; —তাই বর্তমান যুগেও যেরূপ ১৯০৫ সনের স্বদেশী যুগেও সেইরূপ; অন্ততঃ কতিপয় ধনিকের সহযোগিতা ব্যতিরেকে কোন আন্দোলনই অগ্রসর হইতে পারে নাই।** প্রথমতঃ ঢাকার ব্যবসায়ীগণও স্বদেশি আন্দোলনে গুরুতর বাধা জন্মাইল; কারণ তাহাদের বিপণিগুলি সমস্তই বিদেশি পণ্যে পূর্ণ ছিল; বিদেশি দ্রব্য বিক্রয় না হইলে তাহাদের গুরুতর ক্ষতি। কিন্তু ঢাকার বিখ্যাত কূটবুদ্ধিসম্পন্ন আইনজ্ঞ ধনী উকিল জমিদার আনন্দ রায় এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন ইহা শুনিয়াই ঢাকার ব্যবসায়ীগণ আপনা হইতেই কিঞ্চিৎ বিহ্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়িল,—এবং আমাদের সঙ্গে আপোষ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিল (যদিও মৌখিক) যে, আর তাহারা নূতন বিলাতি দ্রব্যের আমদানি করিবে না,—কিন্তু যাহারা অশিক্ষিত এবং এখনও স্বদেশি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হয় নাই, তাহাদের নিকট কিছু কিছু বিলাতিদ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবে। ফলে পিকেটিং কিছু কিছু শিথিল হইল, কিন্তু ব্যবসায়িগণ ইংলন্ডে প্রস্তুত দ্রব্যাদিও জাপানি মাল বলিয়া বিক্রয় করিতে লাগিল।

"শ্রেষ্ঠ উকিলের গৌরব এবং অর্থ ও সম্পত্তি লাভ ব্যতিরেকে আনন্দ রায় অন্য কোন বিষয়েই কখনও মনোযোগ দিতেন না; একবার কোনও এক সাধারণ সভায় সভাপতিত্ব করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু যখন তাঁহাকে সভাস্থলে আনয়নের জন্য লোক গমন করিল তখন তিনি পরিষ্কার বলিয়া ফেলিলেন "আমাদের কি আর এই সমস্ত ছেলেমানুষী করিবার সময় আছে হে!" কিন্তু তিনি যে আপনা হইতেই স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন তাহার প্রধান কারণ এই যে, আনন্দ রায় ওকালতি করিয়া বিপুল অর্থসঞ্চয়ের সঙ্গে বিশাল জমিদারিও করিয়াছিলেন, **—এবং সকলের মনেই আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে বঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গেই জমিদারি প্রথা, তথা**

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চিরতরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, তাহাতে জমিদারগণই সর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত হইবে,—তাই আনন্দ রায় প্রভৃতি সমস্ত জমিদারগণ নিজেদের স্বার্থের জন্যই স্বদেশি আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। এদিকে আনন্দ রায়কে নেতা স্বরূপ পাইয়া ঢাকার সাধারণ লোকও পূর্ণ উদ্যম ও পূর্ণ উৎসাহের সহিত আন্দোলনে মত্ত হইয়া গেল; কতিপয় মুসলমান ব্যতিরেকে বাধাপ্রদানের কেহই আর রহিল না।

"কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র ব্যানার্জী, হেরম্ব মৈত্র, জে. চৌধুরী (যোগেশ চৌধুরী, সুরেন্দ্র ব্যানার্জীর জামাতা), গজনবি প্রভৃতি নেতাগণ ঢাকাতে পদার্পণ করিলেন; বিপুলভাবে তাহাদের অভ্যর্থনা হইল; বহু জনতা পূর্ণ সভার মধ্যে তাহা এবং হেদায়েৎ মাস্টার প্রভৃতি কতিপয় স্থানীয় মুসলমান এবং জমিদারগণ বক্তৃতা দিলেন। সকল বক্তার একই কথা—"বঙ্গ-ভঙ্গ চাই না", "হিন্দু-মুসলমান ভাই-ভাইকে ভিন্ন হইতে দিব না", "বিলাতি ব্যবহার করিব না" ইত্যাদি ইত্যাদি। ছাত্রগণ ঘোড়া খুলিয়া দিয়া নিজেরা টানিয়া লইয়া সুরেন্দ্র ব্যানার্জী প্রভৃতির গাড়ি জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গণ হইতে আনন্দ রায়ের বাড়ি লইয়া গেল। উদ্দীপনা, উৎসাহ ও উদ্যমের বন্যা ছড়াইয়া পড়িল। পরে কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থান হইতেও অপরাপর বক্তা আসিয়াছিলেন।"

কিন্তু অনুশীলন সমিতির লক্ষ্য ছিল আরও বৃহৎ। দেশব্যাপী সশস্ত্র বিপ্লবের উদ্দেশ্যে পি. মিত্রের নেতৃত্বে ও পরিচালনায় অনুশীলন সমিতি ক্রমশ শক্তি-সঞ্চয় করতে থাকে। সংগঠনের কাজকর্ম হত অতি সংগোপনে, শৃঙ্খলার সঙ্গে। পুলিশ তাদের ক্রিয়াকর্ম বিষয়ে কোন সংবাদই সংগ্রহ করতে পারত না। কিন্তু সমিতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এ কারণে দুটি পত্রিকা গোপনে প্রকাশিত হতে থাকে। বাংলায় 'স্বাধীন ভারত' এবং ইংরেজিতে 'লিবার্টি'।

অনুশীলন সমিতির ছিল যেমন কঠোর গোপনতা, তেমনি ছিল উন্নত নৈতিক মানসম্পন্ন কর্মীদল। দলের কর্মীদের কাছে নাম বা খ্যাতির কোন মোহ ছিল না। জনগণ ও দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করায় উদ্বুদ্ধ ছিল তারা।

কলকাতার কাছে ফরাসি অধিকৃত চন্দননগরে অনুশীলন সমিতির একদল কর্মী ছিল সক্রিয়। নেতা ছিলেন মতিলাল রায়। তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী রাসবিহারী বসু। ঢাকা ও অনুশীলন সমিতির সদস্যারা ধীরে ধীরে একটি সংগঠনে পরিণত হয়। এবং প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল চন্দননগরে। ঢাকা অনুশীলন সমিতির কর্মী গিরিজাবাবু ক্রমশ রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ততা অর্জন করেন এবং উত্তর ভারতে সমিতির কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রাসবিহারী ১৯১৫ সালে অনুশীলন সমিতির আর্থিক আনুকূল্যে জাপানী জাহাজে দেশ ছাড়েন। রাসবিহারীর গুরুদায়িত্ব পড়ে গিরিজবাবু এবং শচীন্দ্রনাথ সান্যালের ওপর। পুলিনবিহারী দাস গ্রেপ্তার হওয়ার পর তাঁকে পাঠানো হয় আন্দামান জেলে। সে সময়ে সমিতির দায়িত্ব বহনে এগিয়ে আসেন নরেন্দ্রনাথ সেন এবং প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি। প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি ১৯২৩ সালে উত্তর প্রদেশে সমিতির কাজে পাঠান যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জিকে।

অনুশীলন সমিতির কুমিল্লা শাখাটিও ছিল সুগঠিত। পুলিনবিহারী দাসের কনিষ্ঠ সহযোগী বিশ্বেশ্বর চ্যাটার্জী কুমিল্লার শাখা দায়িত্বে ছিলেন। কুমিল্লার সুপরিচিত জনদরদী মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রতিষ্ঠা করেন ঈশ্বর পাঠশালা। পাঠশালার প্রধান শিক্ষক ছিলেন জানকীনাথ সরকার। কুমিল্লায় অনুশীলন সমিতি গঠনে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং প্রধান শিক্ষকের ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। কুমিল্লা জেলা সংগঠকের ওপর ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম এবং নোয়াখালি জেলার দায়িত্ব ছিল। কুমিল্লাসহ এই তিনটি জেলায় তারা সুশৃঙ্খলভাবে জেলা সংগঠকের নির্দেশ অনুসারে কাজ করত। ডাকাতি ও অস্ত্র ভাণ্ডার লুঠে তাদের কর্মদক্ষতা ছিল অসাধারণ। জেলা সংগঠক ছিলেন পূর্ণ চক্রবর্তী। সমিতির প্রতিটি সদস্যই ছিল যেন লৌহমানব—অসাধারণ মানসিকতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী।

পরে এদের অনেকে সন্ন্যাসী হয়ে যায়, কেউবা সমাজ সেবার কাজে যোগ দেয়, কেউ কেউ রামকৃষ্ণ মিশনে যোগ দিয়েছিল।

কুমিল্লার বেলোনিয়া এবং উদয়পুর ফার্মের দুটি গোপন কেন্দ্রে সমিতির কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হত। তাছাড়া পলাতক কর্মীদের গোপন আশ্রয় কেন্দ্র ছিল এখানে। গ্রামের বহু পরিবার বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপে আস্থাশীল ও জড়িত থাকার অপরাধে ভয়ঙ্করভাবে নির্যাতিত হত। তাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করায়, তারা দুর্গতির চরমসীমায় পৌঁছায়। কিন্তু কোনরকম বিশ্বাসঘাতকতার পথে তারা যায় নি। শহরের মাঝামাঝি জায়গায় জেলা সংগঠক পূর্ণ চক্রবর্তীর বাড়ি ছিল দুর্গের মত সুরক্ষিত। জেলার বাইরের নেতৃবৃন্দ এবং জেলার দায়িত্বশীল কর্মীরা নিয়মিত যাতায়াত করলেও, পুলিশের কোন গুপ্তচরের পক্ষে তা জানা সম্ভব হয়নি। টাউন হলের বিপরীত দিকে কাদিরপাড়ে একটি হোমিওপ্যাথি দোকান ছিল বিপ্লবীদের গোপন মিলন কেন্দ্র। বহু লোক প্রতিদিন সেখানে যাতায়াত করলেও, পুলিশ এই কেন্দ্রটির কোন সন্ধান পায়নি।

সমিতির কর্মী দেবেন ঘোষের বিশ্বাসঘাতকতায় রমেশ ব্যানার্জী সহ আরো ১০ জন পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। ১৯৭২ সালে তাদের শাস্তি হয়। কিন্তু দেবেন ঘোষ এই বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি পেয়েছিল। একদিন সন্ধ্যায় বিপ্লবী বীরেন চ্যাটার্জীর হাতে তার মৃত্যু হয়। ১৯১৩ সালে কুমিল্লায় প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার বি. চক্রবর্তী। সুরেন্দ্রনাথ কুমিল্লায় পৌঁছাবার পর যুবক ও ছাত্ররা তাঁকে গাড়িতে বসিয়ে, সেই গাড়ি টেনে নিয়ে যায় সাময়িক আবাসে।

কুমিল্লার অন্যতম বিপ্লবী যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি তাঁর স্মৃতিচারণায় লিখেছেন :—*

Revolutionary ferver in India started from Bengal and gradually engulfed the entire country. A real fight for freedom began Bengal Partition–a settled fact– was unsettled. The revolutionaries had their first real success.

Divide and rule is a common maxim and that became the objective of Lord Curzon ever since he became the Governor General of India and as early as 1903 he gave vent to his voice against it and next in 1904 in Bombay also emphatically advocated for the partition of Bengal. The announcement of the 3rd December, 1903, was condemned by the entire population of Bengal, Hindus and Muslims alike. In July 1905 it was announced that the partition was to take effect from the 16th October that year. Swadeshi and Boycott were decided upon in the public meeting of Calcutta on the 7th August, 1905.

This was the turning point in the history of the freedom movement in India. Three British observers of Indian affairs foresaw the activities which were brewing inside Bengal in particular and India in general. Wrote Andrew Carnegie in June 1906 that the home rule sentiment was in recent years growing rapidly and commenting on Lord Kitchner's activities in strengthening the British military position in India, this shrewed observer of Indian affairs commented thus "If all were known, it is not Russian or any foreign attack that the militiary officials dread. It is the growing home rule sentiment they consider dangerous to British control. It is against the people of India not against the foreigner, that the legions are to be moved. It is within, not without India, that the wolf turns".

Sir Henry Cotton wrote, "There is now a party of Indian Nationalists who despair of constitutional agitation advocate the establishment of an absolutely free and independent form of national Government. These men are the shadow of a

*In Search of Freedom - Jogesh Chandra Chatterjee. P. 36-40

cloud which casts itself over the future. A few years ago there was no prospect of the rise of such a party. They are the product of a policy of reaction, which has led to discontent and unrest and impatience of the British connection with the country. Their numbers are increasing, but they are not yet in a position of popular leaders. The recognized leaders of Indian thought and the original pioneers of the national movement, are still unaffected by these symptoms of alienation from the British Government. They are men of moderate views."

Sir Valentine Chirol wrote, "The question of Partition itself receded into the background, and the issue until then successfully veiled and now openly raised, was not whether Bengal should be one unpartitioned province or two partitioned provinces under British rule, but whether British rule itslef was to endure in Bengal or, for the matter of that anywhere in India."

The partition agitation was a unique expression of Bengal's disapproval to this act of dividing and disintegrating the province. Once the lead was given from Calcutta it was taken up by the entire population. It was confronted from every angle of public opinion and total condemnation was expressed through meetings, processions, writings and songs in every nook and corner of Bengal.

This was the occasion when the idea of composite nationalism came into being. As Dr. S. C. Roy observes. "In fact between Aurobindo, Bipin chandra and Brahmabandhab, they created a new nationalist movement and philosophy in the country to which Rabindranath supplied the genius of his poetic muse. Before this there was no ideal of composite nationalism, and it is the one special contribution of the Bengal School of Political thinkers, who made their mark in 1905."

When the partition did not yield the desired result of dividing Hindus and Muslims, the Governor of Bengal and the Nawab of Dacca tried to create artificial communal hatred, by provoking the Muslim masses against the Hindus. As a result there was communal riot in Comilla in 1907. The beginning of the riot is a sordid story. The Nawab of Dacca visited Comilla. One morning while the Nawab was passing through the market and a big number of Muslims were following him, a Himdu merchant's servant was sweeping the shop. The passing sight attracted the servant and he stood at the door of the shop with the broom in his hand. Some one of the Nawab's followers shouted that the Hindu was showing a broom to the Nawab to insult him (a customary insult in Bengal). At once the shop was attacked and it turned into a big communal riot. A Muslim was shot down and the riot subsided.

At Jamalpur, district Mymensingh, the agitated Muslim mob attacked the Hindu Goddess Basanti's image and broke it. Basanti Puja is one of the biggest ceremonies of the Hindus in Bengal and attack on the image extremely enraged the Hindus. And it resulted in a large scale communal riot. A Muslim was fired at and the riot stopped. Later it was known that this shooting was done by revolutionaries who came from Calcutta.

As the result of these communal riots and Government repressions the Hindu youths became very much excited and the more zealous among them added to the number and strength of the secret activities of the revolutionaries. These riots like the anti-Partition movement indirectly helped to accentuate the underground anti-British activities. Thus the motive behind the Partition as well as the riots miserably failed.

বাংলার অন্যতম বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো 'যুগান্তর' পত্রিকা ও যুগান্তর গোষ্ঠী সম্পর্কে লিখেছেন :—

আমাদের বারীনও এই সময় বাংলায় ফিরে এসেছিল। আবার সে গুপ্তসমিতি গঠনে উঠে পড়ে লেগে গেল। তার প্রধান কাজ হয়েছিল উল্লিখিত সংবাদপত্র বের করা। প্রথমে অতি সামান্যভাবে 'যুগান্তর' নাম দিয়ে একখানা সাপ্তাহিক প্রকাশ করা হল। ভাষা ও ভাবের নতুনত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব দেখে অনেকে 'যুগান্তরের' পক্ষপাতী হতে লাগলেন। কলকাতায় চাঁপাতলার কানাই ধরের লেনে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে 'যুগান্তর' অফিস খোলা হল। প্রথমে 'যুগান্তরে' যারা লিখতেন, তারা বিলেতি শিক্ষায় স্বাধীন আবহাওয়ায় অভ্যস্ত, কিন্তু বোধ হয়, বাংলা খবরের কাগজ পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন না। কাজেই সে কালে এ দেশের বাংলা কাগজে যে ধরনের প্রবন্ধাদি লিখিত হত, তা থেকে 'যুগান্তরের' লেখবার ধারা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল। তাদের লিখিত যে সকল বাংলা প্রবন্ধ 'যুগান্তরের' জন্য দিতেন, তা প্রায়ই ইংরেজী বাংলা শব্দ মিশিয়ে লেখা হত। দেবব্রতবাবু, সখারামবাবু, ভূপেনবাবু ও অন্য দু-একজন ইংরেজী শব্দগুলির বাংলা অনুবাদ দিয়ে ঐ প্রবন্ধগুলির ভাষাকে প্রাঞ্জল করতেন। দেবব্রতবাবু ও সখারামবাবু নিজেরাও সুন্দর লিখতেন। অন্যান্য লেখকদের ওপরও তাঁদের প্রভাব যথেষ্ট ছিল। গ্রাহক-সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে লেখকও অনেক বাড়তে লাগল।

প্রথম প্রথম 'যুগান্তরের' লেখার মধ্যে হিন্দুয়ানীর ভাব খুব বেশি না থাকলেও, একেবারে secular বা ধর্মসম্পর্কবিহীন ছিল না। প্রথমেই সম্পাদকীয় স্তম্ভের ওপর গীতার একটি শ্লোক থাকত, তার পর ক্রমে হিন্দুর ধর্মশাস্ত্র হতে মাঝে মাঝে উপমা, quotation, allusion, প্রবন্ধ প্রভৃতি থাকত। প্রচ্ছদে একটি পতাকা, তাতে খড়্গাধারিণী কালীর হাতের ছবি ছিল। এতে মনে হয়, এর পরিচালক নেতারা মুসলমান-সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করেননি।

বিপ্লববাদ সমর্থন করে যে সকল প্রবন্ধাদি বের হত তা খুব মনোজ্ঞ হত এবং সে জন্য লোককে বিপ্লবপন্থীর দলে টেনে আনার সুবিধা হত। দেশের লোক ধারণাই করতে পারত না যে, এই নির্জীব শান্তিপ্রিয় বাঙালি, যারা যুদ্ধের নামে মূর্ছা যায়, তারা কি রকম করে হঠাৎ দলে দলে ইংরেজ পল্টনের বন্দুক-কামানের সামনে লড়বে। বন্দুক, গোলাগুলি, বারুদই বা কোথা হতে আসবে? এত টাকাই বা কে দেবে? এই রকম সকল অসম্ভব কেমন করে সম্ভব হতে পারে, নানাভাবে 'যুগান্তরে' তাই লিখে দেশের লোকের ধারণা বদলে দেবার চেষ্টা হত।

'যুগান্তরে' স্বদেশ-প্রীতির চাইতে ইংরেজ-বিদ্বেষ বাড়াবার চেষ্টা বেশি হত। 'আনন্দমঠের' যুদ্ধ-বিগ্রহের লক্ষ্য ছিল কেবল সনাতন ধর্মের উদ্ধার। ইংরেজ তাড়িয়ে ভারতকে স্বাধীন করবার উদ্দেশ্য যে সনাতন ধর্মের পুনরুদ্ধার ছাড়া আরও কিছু এবং সে কিছু যে কি, তা কোন রকমে স্পষ্ট করে দেশকে বোঝাবার চেষ্টা 'যুগান্তরে' হয়েছিল বলে মনে হয় না। তবে দেশ স্বাধীন হলে যে নুনের ট্যাক্স, চৌকিদারি ট্যাক্স বা আরও অনেক ট্যাক্সের মধ্যে কোনটা বা একেবারে দিতে হবে না, আর কোনটা কম দিতে হবে, বড় বড় চাকরিগুলো সব আমরাই পাব, আবশ্যক দ্রব্যের মূল্য ইচ্ছামত কমিয়ে দিতে পারব ইত্যাদি মামুলী স্তোকবাক্যগুলি 'যুগান্তরে'ও স্থান পেত।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসের প্রথমে 'যুগান্তর' বেরিয়েছিল। সে সময় প্রায় অন্য সকল গুপ্তসমিতি 'ক' বাবুর দলে অল্প-বিস্তর যোগ দিয়েছিল। এক বছরের মধ্যেই ঐ সকল দলের নেতারা বারীনের আধিপত্যপ্রিয়তার জ্বালায় ও বারীনের প্রতি 'ক' বাবুর পক্ষপাতিতায় সরে পড়তে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রায় এক বছর পরে 'যুগান্তরের' যখন বেশ আয় হচ্ছিল, তখন 'ক' বাবুর দলের হাত থেকে 'যুগান্তরের' ভার ব্যবসায়বুদ্ধিসম্পন্ন অন্য এক দলের হাতে গেছল। তখন 'যুগান্তরের' প্রথম সম্পাদক ভূপেনবাবু জেলে।

ঐ 'যুগান্তর' অফিসেই তখনকার গুপ্তসমিতির আড্ডা ছিল। এইটেই বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠের'

বা দেবব্রতবাবুর ভবানী মন্দিরের স্থানীয় ছিল বললেও হয়। কিন্তু ভবানী মূর্তি এতে ছিল না। নিচের তলায় ছিল প্রেস। ওপরের তলায় অফিস, শোবার ঘর আর একটি ছোট্ট কুঠরীতে একটি কাঠের সিন্দুক ছিল। তাতে থাকত না-কি অস্ত্রশস্ত্র। তার সারানো ও পর্যবেক্ষণের ভার ছিল একটি অজাতশ্মশ্রু বালক নেতার ওপর। এর কাছে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের একটু বেশি রকম লম্বা-চওড়া বচন শুনে, একদিন গোটাকতক রিভলবার কিনতে গেছলাম! দেবব্রতবাবু সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সেই অস্ত্রগারে তিনি আমায় খুব ভারী চালে, অন্তত আধ ঘণ্টা অনেক রকম বচন দিলেন। আমি রিভলবারের কথা তুলতে, তিনি সেই বালক নেতাকে ডেকে রিভলবার দেখাতে আদেশ দিলেন। একটা সেকেলে রিভলবার আমায় দেখান হল। আমি নগদ মূল্যস্বরূপ কয়েকখানা নোট বার করে তিনটে কি চারটে রিভলবার চেয়ে বসলাম। তাতে বুঝলাম, সেই একটি মাত্র সম্বল। আর বুঝলাম, অস্ত্রাগারের শূন্যতা পূরণের জন্য ছিল এত বচন। শীঘ্র পাঠিয়ে দেবার কড়ারে মূল্য জমা নিলেন। তার পর অনেক তাগাদা করে দু'মাস পরে একটা মাত্র ভাঙা পুরানো রিভলবার আদায় করতে পেরেছিলাম। তাও সারাবার জন্য পাঠিয়ে আর ফেরত পাইনি।

এই চাঁপাতলার আড্ডাতেই প্রথম নরেন গোঁসাই-এর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তার সুন্দর সুঠাম দেহে গৈরিক ছিল। অনুসন্ধানে জেনেছিলাম, তখন সে যোগসাধনা কচ্ছিল। তাদের বাড়ির অবস্থা সম্বন্ধে পূর্ব হতেই জানতাম। তার স্ত্রী ছেলেপিলেও ছিল। ঐ অবস্থায় সে আগে গৃহত্যাগী বৈরাগী হয়েছে, তার ওপর গুপ্তসমিতির মরণমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছে, ভেবে যেমন অবাক হয়েছিলাম, তেমনই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধাও গজিয়ে উঠেছিল।*

তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী লিখেছেন : 'সন্ধ্যা' পত্রিকার সমসাময়িক সময়েই 'যুগান্তর' পত্রিকার আবির্ভাব। এই সময় অনুশীলন সমিতির সভাপতি পি. মিত্রের সহিত তাঁহার সহকর্মীদের মধ্যে দেশে বিপ্লব আন্দোলনের কর্মপন্থা লইয়া মতবিরোধ দেখা দিল। মিত্র মহাশয় যখন বিপ্লব আন্দোলনের মূলসূত্র হিসাবে দেশের যুবকদের মধ্যে লাঠি, ফুটবল খেলা, বক্সিং, কুস্তি প্রভৃতি শরীরচর্চার আন্দোলন যাহাতে বিস্তারলাভ করে তাহার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছিলেন তখন বারীন্দ্র, দেবব্রত, অন্নদা কবিরাজ, মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কর্মিগণ দেশকে সশস্ত্র অভিযানের মর্মকথা উপলব্ধি করাইবার জন্য 'যুগান্তর' নাম দিয়া বিপ্লবতন্ত্রের কাগজ বাহির কবিবার জন্য মনস্থ করেন। যাহারা প্রচারে বিশ্বাস করিতেন তাহারা একত্রিত হইলেন এবং ইহাদের সহিত 'আত্মোন্নতি সমিতি' রাজনৈতিক কার্য্যে সহায়তা করিত। যুগান্তর দল পৃথক হওয়ার মূলে অন্য একটা কারণ ছিল, তাহা হইতেছে দলের নেতৃত্ব লইয়া মতবিরোধ। অনুশীলন দল প্রমথ মিত্রের অধিনায়কত্ব বজায় রাখার পক্ষপাতী ছিলেন, আর যুগান্তর দল অরবিন্দ ঘোষকে অধিনায়করূপে দেখিতে চাহেন। এই বিভেদের ফলে কলিকাতার অনুশীলন সমিতি, ঢাকার অনুশীলন সমিতি এবং ময়মনসিংহের সুহৃদ্ সমিতি ও তাহাদের শাখাসমূহ প্রমথ মিত্রের দলে থাকিয়া কার্য করিতে লাগিল। তাহা ছাড়া বঙ্গে যে-সব বৈপ্লবিক কেন্দ্র ছিল তাহারা সকলে অরবিন্দ ঘোষের নেতৃত্বাধীনে আসিল। যুগান্তর পৃথক্ ভাবে গড়িয়া উঠিলেও অনুশীলন, আত্মোন্নতি প্রভৃতির কয়েক জন প্রধান এই দলের সহিত যুক্ত ছিলেন এবং শিথিল হইলেও এই যোগের দ্বারা পরস্পরের মধ্যে একটি সংযোগ-সূত্র বরাবরই ছিল। বিপ্লবীদের বাৎসরিক যে সম্মেলন হইত তাহার সভাপতিত্ব করিতেন প্রমথনাথ মিত্র।

পত্রিকার নামকরণ সম্পর্কে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, "যুগান্তর" নাম আমার মনোনীত। দেবব্রত বসুর সঙ্গে অনেক আলোচনা করিয়া এই নাম নির্ধারিত করিয়াছিলাম। এই নামটি 'শিবনাথ শাস্ত্রীর "যুগান্তর" নামক সামাজিক উপন্যাস হইতে ধার লওয়া হয়। আমরা

* বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা—হেমচন্দ্র কানুনগো। পৃ. ৬৮-৭০

অনেকেই ব্রাহ্ম সমাজের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হই, সেই জন্য এই নামটি আমার বিশেষ পছন্দ হয়। শাস্ত্রী মহাশয় যেমন সামাজিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইয়াছেন, আমরাও সেইরূপ রাজনৈতিক যুগান্তরের চিত্র দেখাইব এবং বৈপ্লবিক মনোভাব দেশে আনিব ইহাই আমাদের ইচ্ছা ছিল। যুগান্তর-দলের কাগজ ছিল। টাকা সংগ্রহ, মতামত, প্রবন্ধ লেখা, সমস্ত কর্ম পার্টির অভিপ্রায় অনুসারেই হইত। কাগজ সম্বন্ধে আমাদের মাথার উপর ছিলেন—অরবিন্দ ঘোষ, সখারাম গণেশ দেউস্কর এবং অবিনাশ চক্রবর্তী। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল, একবার এই বাংলাকে তাহার চক্ষুতে অঙ্গুলি দিয়া সত্য কথা বলিয়া যাইব। গুপ্ত ভাবে কথা চিরকাল চলিবে না। বৈপ্লবিক কার্য করিতেই হইবে ও সেই সঙ্গে কাগজও চালাইতে হইবে। টাকার টানাটানি চিরকালই ছিল। কাগজের কোষাধ্যক্ষ ছিলেন অবিনাশ ভট্টাচার্য, টাকার খবর তিনি ও অরবিন্দ ঘোষ জানেন; টাকার খবর টাকার অনটন হইলে অরবিন্দ ঘোষ ও চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নিকট যাইতাম। যদিও টাকার অনটন সর্বদাই ছিল, কিন্তু কার্যের সময় টাকা পাওয়া যাইত। এই প্রকারে হাতে-চলা প্রেস হইতে আরম্ভ করিয়া শেষে আমরা ইলেকট্রিক মেশিনের ছাপাখানা করি।"

ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সম্পাদকতায় 'যুগান্তর' পত্রিকা ৩৬নং বনমালী সরকার ষ্ট্রিটের কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামক ছাপাখানা হইতে প্রথম প্রকাশ হয় ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মার্চ মাসে। ২৭ নং কানাই ধর লেনে ইহার কার্যালয় স্থাপিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় পত্রাকারে একটি উত্তেজনাপূর্ণ অর্থ-সাহায্যের আবেদন জানাইয়া কয়েকটি জেলা-কেন্দ্রে পাঠানো হইল। হকারদের নিকট কাগজ বিক্রয় করিবার জন্য দেওয়া হইলেও উহা মোটেই বিক্রয় হইল না। 'যুগান্তর'কে অন্তর দিয়া চিনিতে বাঙালির কয়েকমাস লাগিয়াছিল।

কমলা প্রিন্টিং ওয়ার্কসের মালিক বীরেশ্বর সেন পত্রিকার মতবাদে ভীত হইয়া দুইমাস পরেই প্রেসে উক্ত পত্রিকা মুদ্রণ করিতে অস্বীকার করেন। তখন হরিশ্চন্দ্র ঘোষের সাধনা প্রেস হইতে উক্ত পত্রিকা মে মাস হইতে প্রকাশ হইতে থাকে। 'যুগান্তর' প্রতি বুধবারে একহাজার ছাপা হইত। ইহার মধ্যে কলিকাতায় মাত্র ১৪ খানা বিক্রয় হইত। 'যুগান্তরে'র গরম লেখা কয়েকমাস বাহির হইবার পর জোড়াসাঁকো থানার পুলিশ ইন্সপেক্টার বিনোদ গুপ্ত ভূপেন্দ্রনাথকে থানায় ডাকাইয়া লইয়া নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। সম্পাদকের মুখে ঐ কয়খানি নগদ বিক্রয়ের কথা শুনিয়া বলেন, "হ্যাঁ, এই কাগজ ত বাজারে দেখিতে পাই না।" যাহা হউক, ময়মনসিংহের জামালপুরের হাঙ্গামা বিষয়ে নানা সংবাদ বাহির হইলে পত্রিকার নগদ বিক্রয় কয়েক সহস্র পর্যন্ত উঠে। প্রায় এক বৎসরের কিছু বেশি দিন কাগজ বাহির হইবার পর মুদ্রাকর, প্রকাশক ও সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে রাজদ্রোহের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়। কিংসফোর্ডের আদালতে বিচারের পর ভূপেন্দ্রনাথের কারাবাস ও সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্ত হয়। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে হাইকোর্টে আপিলের ফলে সাধনা প্রেস বাজেয়াপ্তের আদেশ নাকচ হইলে প্রেসের মালিক হরিশ্চন্দ্র ঘোষের পরিবর্তে অবিনাশ ভট্টাচার্য মালিকরূপে ডিক্লেরেশন লন। হরিশের নামে ওয়ারেন্ট বাহির হইলে তিনি পলাতক হন। রাজদ্রোহের অপরাধে ভূপেন্দ্রনাথের জেল হওয়ার ফলে 'যুগান্তরে'র খ্যাতি চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হয় এবং পত্রিকার বিক্রয় সংখ্যা সপ্তাহে ২০,০০০ পর্যন্ত উঠিয়াছিল।

উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'যুগান্তরে'র আদিপর্বে ছিলেন না। তিনি অনেক পরে আসিয়া যোগদান করেন। উপেন্দ্রনাথ প্রথমে 'বন্দেমাতরমে'র সম্পাদকীয় দলে কার্য করেন। মায়াবতীর আশ্রম ফেরত উপেন্দ্রনাথ তখন মুণ্ডিতশির, নগ্নপদ, গৈরিকধারী ব্রহ্মচারী। তাঁহার কথায় বলিতে গেলে 'ব্রহ্মের পশ্চাদ্দেশে কিরূপে মায়া ঢুকলো' তারই সন্ধানে ঘুরিয়া বিফলকাম হইয়া উপেন্দ্রনাথ নাস্তিক হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন।

'যুগান্তরী' আড্ডার সম্বন্ধে প্রথম অভিজ্ঞতার কথা উপেন্দ্রনাথ এক অপূর্ব বর্ণনায় বলেন—"১৯০৬ খৃষ্টাব্দের তখন শীতকাল। কলিকাতায় 'যুগান্তর' আফিসে আসিয়া দেখিলাম—৩/৪ জন যুবক

মিলিয়া একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপর বসিয়া ভারত উদ্ধার করিতে লাগিয়া গিয়াছে। যুদ্ধের আসবাবের অভাব দেখিয়া মনটা একটু দমিয়া গেল বটে, কিন্তু সে ক্ষণেকের জন্য। গুলিগোলার অভাব তাহারা বাক্যের দ্বারাই পূরণ করিয়া দিলেন। দেখিলাম, লড়াই করিয়া ইংরাজকে দেশ হইতে হটাইয়া দেওয়া যে একটা বেশি কিছু বড় কথা নয়, এ বিষয়ে তাহারা সকলেই একমত। কাল না হয় দু'দিন পরে 'যুগান্তর' অফিসটা যে গবর্ণমেন্ট হাউসে উঠিয়া যাইবে, সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই। ... দেবব্রত 'যুগান্তরে'র সম্পাদকতায় লাগিয়া গিয়াছেন। স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই ভূপেনও সম্পাদকদের মধ্যে একজন। অবিনাশ এই পাগলদের সংসারে গৃহিণীবিশেষ। বারীন্দ্র তখন ম্যালেরিয়ার জ্বালায় দেওঘরে পলাতক। ... পরে বারীনের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তিন কথায় সে আমাকে বুঝাইয়া দিল যে, দশ বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবে। ভারত উদ্ধারের এমন সুযোগ ত আর ছাড়া চলে না। আমিও বাসা হইতে পুঁটলি পাঁটলা গুটাইয়া 'যুগান্তর' আফিসে আসিয়া বসিলাম।"

"কিছু দিন পর দেবব্রত 'নবশক্তি' আফিসে চলিয়া গেল। ভূপেনও পূর্ববঙ্গে ঘুরিতে বাহির হইল। সুতরাং 'যুগান্তর' সম্পাদনের ভার বারীন্দ্র ও আমার উপরেই আসিয়া পড়িল।... হু হু করিয়া দিন দিন 'যুগান্তরে'র গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এক হাজার হইতে পাঁচ হাজার, পাঁচ হইতে দশ, দশ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিশ হাজারে ঠেকিল।

"ঘরের কোণে একটা ভাঙা বাক্সে 'যুগান্তর' বিক্রয়ের টাকা থাকিত। তাহাতে চাবি লাগাইতে কখনও কাহাকে দেখি নাই। কত টাকা আসিত, আর কত টাকা খরচ হইত, হিসাবও কেহ লইত না।

"একদিন সরকার বাহাদুরের তরফ হইতে একখানা চিঠি আসিয়া হাজির হইল যে, 'যুগান্তরে' যেরূপ লেখা বাহির হইতেছে তাহা রাজদ্রোহসূচক। ভবিষ্যতে ওরূপ করিলে আইনের কবলে পড়িতে হইবে। আমরা ত হাসিয়াই অস্থির! আইন কি রে বাবা! আমরা ভারতের ভাবী সম্রাট্, গবর্ণমেন্ট হাউসের উত্তরাধিকারী—আমাদের আইন দেখায় কেটা?"

'যুগান্তরে'র বহুল প্রচার বৃদ্ধি ও আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে 'যুগান্তর' আফিস কানাই ধর লেনের বাড়ি হইতে চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে স্থানান্তরিত হয়। চাঁপাতলাই তার পূর্ণ শ্রীবৃদ্ধির কাল এবং ঐখানেই আরম্ভ হইল ঘন ঘন পুলিশের হানা, অনুসন্ধান ও সম্পাদক গ্রেপ্তার। কেশব গুপ্ত নামক একজন পরম উৎসাহী কর্মী ছিলেন; উত্তর কলিকাতায় কেশব প্রিন্টিং ওয়ার্কস নামে তাহার মামার ছিল একটি বড় প্রেস। এইখানেই 'যুগান্তর' দলের অনেক কাজ হইত। কেশবের মামার নিকট হইতে হ্যাণ্ড-প্রেসটি ক্রয় করিয়া সুমতি প্রেস নামে চাঁপাতলা ফার্স্ট লেনে বসান হয়। এই জন্য কেশব প্রিন্টিং পরে পুলিশের হস্তে নির্যাতিত হয়। মানিকতলা বোমার মামলার সময় কেশব গুপ্ত আত্মগোপন করে। নিরুদ্দিষ্ট অবস্থায় তিনি খ্রিস্টান ধর্ম লইয়া পাদরী বেশে পাহাড়ীদের মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র প্রচার করেন। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা উৎসবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন।

'যুগান্তর' পত্রিকার আদর্শ ছিল—মেরুদণ্ডহীন বাঙালিকে সোজা হইয়া দাঁড়াইবার জন্য উদ্বুদ্ধ করা। তজ্জন্য প্রাচীন বাংলার ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, রাজনীতিক সমস্যা সমূহের বিশ্লেষণ, ইউরোপে কি প্রকারে রণনীতি শিক্ষা প্রদান করা হয় সেই বিষয়ে নানা পুস্তক হইতে আলোচনা, বৈদেশিক সংবাদসমূহ ইত্যাদি নানা প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হইতে থাকে। এই পত্রিকার সর্বোচ্চ সুর ছিল আত্মনির্ভরশীলতা। তখনকার লোকসমাজে প্রচলিত নাসিকা ক্রন্দনের সুর পরিত্যাগ করিয়া 'যুগান্তর' গুরুগম্ভীর স্বরে বলিত, "মা ক্লৈব্যং গমঃ, উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্নিবোধত।" 'যুগান্তর' ছিল ঐতরেয় ব্রাহ্মণোক্ত "চরৈবেতি" মন্ত্রের উপাসক। পরাজিত মনস্তত্ত্ব ত্যাগ করিয়া বাঙালি যাহাতে আক্রমণশীল মনস্তত্ত্ব পায় তাহার জন্যই ছিল 'যুগান্তরে'র সাধনা।

যুগান্তরের প্রকাশিত অগ্নিস্রাবী লেখনীর অনুপম ভাষা ও টঙ্কার আজ কালের গর্ভে নিমজ্জিত হইলেও সরকারি নথীপত্রে যাহা পাওয়া যায় তাহা বিশ্বের স্বাধীনতাকামীদের মনে সঞ্জীবনী মন্ত্রের কার্য করিবে। ১৯০৭ সালের ১১ এপ্রিল "এসো অরাজকতা" শীর্ষক এক প্রবন্ধ বাহির হয়। এই প্রবন্ধে বলা হয়—"অরাজকতার সৃষ্টি করতে হবে, সুতরাং সেই অরাজকতাকে আহ্বান করি—ইতিহাসে যার নাম বিপ্লব।......ইংরাজের অধীন ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে স্বাধীনতার মন্ত্র সন্তর্পণে প্রচার করিতে পারিলে আমাদের কাজ এগিয়ে যাবে। তা'হলে শাসক শক্তির সঙ্গে কার্যতঃ সংঘর্ষ বাধলে বিপ্লবীরা এই সৈন্যদের বিদ্রোহীদলে শুধু যে পাবে তা নয়, শাসক প্রদত্ত তাদের অস্ত্র-শস্ত্রও বিপ্লবের কাজে পাওয়া যাবে।"

এই সকল লেখাতে প্রমাণিত হয় 'যুগান্তর' কি প্রকার প্রকাশ্য ভাবেই বিপ্লবের বীজ দেশের সর্বত্রই ছড়াইতেছিল। দেশে বিপ্লবের জন্য কি ভাবে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করা যায় ও গোপনতা রক্ষা করিয়া বিস্ফোরক তৈয়ারি করা যায়। ১৯০৭ সালের ১২ আগস্টের 'যুগান্তরে' দেবব্রত বসু 'যোগাক্ষ্যাপার' ছদ্মনামে এক পত্রে লেখেন—'আর এক উত্তম উপায়ে দেশের বিপ্লবীর অস্ত্রবল বৃদ্ধি করা যায়। রুশীয় বিপ্লবে দেখা গেছে—রুশ সম্রাট্ জারের সৈন্য দলে বহু বিপ্লবী অনুরাগী লোক ছিল। সময়ে বহু অস্ত্র-শস্ত্র নিয়া এই-সব সৈন্য বিপ্লবী দলে যোগ দেয়। ফরাসী বিপ্লবেও এই নীতি সুফল প্রসব করেছিল। এদেশে রাজশক্তি বিদেশি হওয়ায় আমাদের আরও সুবিধা; কারণ বিদেশি শাসককে দেশবাসীর মধ্য থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করতে হয়।

"সম্পাদক ভায়া আমি শুনতে পাই তোমার কাগজ বাজারে হাজারে হাজারে বিক্রি হচ্ছে, যদি অন্ততঃ সপ্তায় ১৫,০০০ সংখ্যা বিকায় তা' হ'লে মাসে ৬০,০০০ তা লোক পড়ছে। এই ষাট হাজার পাঠককে গুটি কতক কথা বলার লোভ সামলাতে না পেরে অকালে লেখনী ধারণ করছি। আমি পাগল, অধাতস্থ ও হুজুগে মানুষ। আমার আনন্দের পাত্র উপছে ভরে ওঠে যখন আমি চারিদিকে অরাজকতা দেখি নামতে, তখন আর অন্ধ মূক হ'য়ে থাকতে পারি নে। চারি দিকে লুটতরাজের খবর আসছে, আর আমি স্বপ্ন দেখছি—যেন ভাবী গরিলা যোদ্ধার দল অর্থ লুণ্ঠনে লেগে গেছে আর আগামী মুক্তির যুদ্ধ যেন আরম্ভ হ'য়ে গেছে ঐ লুটতরাজের আকারে।... হে লুণ্ঠন, আমি তোমায় পূজা করি আজ আমাদের সহায় হও। এতদিন তুমি পুষ্প কীটের মত গুপ্ত থেকে দেশের অন্তর ক্ষয় ক'রে আনছিলে। এখন এসো সর্বত্র জাগিয়ে তোল ক্ষাত্র-বীর্য্য মানুষের বুকে। তুমি সেদিন আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে, ভারতবাসী যেদিন আবার তোমাকে স্মরণ ও পূজা করবে সেইদিন তুমি আনবে তাদের সশস্ত্র করার অর্থ, তুমি আনবে রণ কৌশলের শিক্ষা। সেইজন্য আজ আমি তোমাকে পূজা করি।"

'যুগান্তরে' উগ্রপন্থী ও প্রবন্ধ লেখা ক্রমান্বয়ে বাহির হইবার ফলে পর পর রাজদ্রোহের মামলার ধুম পড়িয়া গেল। একে একে অনেকেই রাজদ্রোহের অপরাধ কারাবরণ করেন। তখন বারীন্দ্রকুমার বলিলেন, "এরূপ বৃথা শক্তিক্ষয় করিয়া লাভ নাই, বাক্যবাণে বিদ্ধ করিয়া গবর্ণমেন্টকে ধরাশায়ী করিবার কোন সম্ভাবনা দেখি না। এত দিন যাহা প্রচার করিয়া আসিলাম, তাহা এইবার কাজে দেখাইতে হইবে। ১৯০৭ সালে আগস্ট মাসে আমরা নিখিলেশ্বর রায় মৌলিকের তরুণ দলের হাতে 'যুগান্তর' পরিচালনার ভার দিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের কার্যকরী আয়োজন ও ব্যবস্থার জন্য মুরারিপুকুর বাগানে গোপনচক্র রচনা করিয়া বসি।"

'যুগান্তর' যখন পাঁচ মাসের তখন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও হরিদাস হালদার প্রভৃতির চেষ্টায় দৈনিক ইংরাজি 'বন্দেমাতরম' বাহির হয়। এই 'বন্দেমাতরমে'র স্তম্ভে বারীন্দ্রকুমার ও 'যুগান্তরে'র কর্মীদল 'যুগান্তর' ত্যাগের ঘোষণা করিয়া সশস্ত্র বিপ্লবের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

মানিকতলা বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে 'যুগান্তর' দেশের ভাবী সংগ্রামে

দেশবাসীকে চরম আত্মাহুতির আহ্বান জানাইয়া আবেগপূর্ণ একটি কবিতায় বলা হয় :—

"সেদিনের তরে করলি কি?
যেদিন আসবে আহ্বান ওরে সন্তান,
চাইবে মা পূজার বলি।
পথঘাট সব রাখিস্ চিনে
বলির পাঁঠা রাখিস্ গুনে
হাঁকডাক করে মরতে যেন হয় নারে সেদিন!
ওরে লুটতরাজে নানান কাজে শক্ত করিস্ বুক,
নইলে কাঁপবে হাত, হবি চিৎপাত ধরিলে বন্দুক।"

বোমার কারখানা আবিষ্কৃত হইবার পরে উক্ত পত্রিকায় যে কবিতাটি বাহির হয় তাহা বিপ্লব সাহিত্যে অপূর্ব সম্পদরূপে সর্বকালের জন্য পরিগণিত হইবে।

"না হতে মা বোধন তোর
ভাঙ্গিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট,
জাগো রণচণ্ডী জাগো মা আবার
আবার পূজিব চরণ তট।
ঐ বিল্বদল র'য়েছে পড়িয়া
পূজার ফুল যায় মা শুকাইয়া,
'জাগো মা জাগো মা সময় নিকট
রক্তাম্বুধি করিয়া মন্থন
তুলিয়া আনিব স্বাধীনতা ধন।"

'যুগান্তরে'র শেষ পর্যায়ে কর্মকর্তা ছিলেন তারানাথ রায়চৌধুরী। এই পত্রিকার শেষ অধ্যায়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, 'যুগান্তর' হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে আমারই ডাক পড়িল, 'যুগান্তরে'র ভার গ্রহণ করিতে। আমি কিন্তু ঐ দায়িত্ব লইতে রাজি ছিলাম না। ... উপায়ান্তর না দেখিয়া কতকগুলি সর্তে 'যুগান্তরে'র ভার গ্রহণ করিলাম। কাগজের ভার গ্রহণ করিয়া ২৮ নং মির্জাপুর স্ট্রিটের দরজা খুলিলাম; অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, হ্যারিসন রোড পোস্ট অপিসে 'যুগান্তরে'র নামে বহু সহস্র টাকা আসিয়া পড়িয়া আছে। উক্ত টাকা যাহাতে কাহাকেও না দেওয়া হয় পুলিশ সতর্ক ও গোপনে পোস্ট অফিসের কর্তৃপক্ষকে ঐ ভাবে নির্দেশ দিয়াছে বলিয়াও সংবাদ পাইলাম। তখন ঐ বিভাগের পোস্টাল ইনস্পেক্টার ছিলেন নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি তখনই তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি 'যুগান্তরে' কর্মকর্তা হিসাবে আমায় টাকা ছাড়িয়া দিতে রাজী হইলেন, আমি দস্তখত করিয়া টাকা তুলিয়া আনিলাম এবং পানিহাটির ফণীন্দ্রনাথ মিত্র ভায়াকে তখন প্রিণ্টার ও পাবলিশার করিয়া 'যুগান্তর' প্রকাশ করিলাম। মাণিকতলা স্ট্রিটে তখন সুমতি প্রেস—ঐ প্রেস 'যুগান্তরে'রই ছিল। নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক প্রেস ম্যানেজার ও পরিচালকের পদ গ্রহণ করেন।

"যুগান্তরে"র দ্বিতীয় পর্য্যায়ে লেখক শ্রেণীর মধ্যে ক্ষীরোদচন্দ্র গাঙ্গুলী, নারায়ণচন্দ্র গাঙ্গুলী, সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি ছিলেন। আমারই লেখা প্রবন্ধের জন্য বৈকুণ্ঠ আচার্য, ফণীন্দ্রনাথ, বীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি দীর্ঘ দিনের জন্য কারাগারে গমন করেন: 'যুগান্তর' যেমন একটা বিশাল ভাবধারাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়াছিল, তেমনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২২ মে আমার পলায়নের পর হইতেই 'যুগান্তর' চিরদিনের জন্য বন্ধ হইয়া যায়। ইহার পর দুই-চারি দিন বেনামী 'যুগান্তর' প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাদের সহিত আমাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না।"

'সন্ধ্যা' ও 'যুগান্তরে'র সমসাময়িক সময়েই 'বন্দেমাতরমে'র জন্ম হয় ৭ আগস্ট ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে। তখনও অরবিন্দ বরোদার চাকুরিতে ইস্তফা দিয়া বাংলা দেশে আসেন নাই।

'বন্দেমাতরম্' প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায়। কালীঘাটের হরিদাস হালদার এই প্রচেষ্টায় অন্যতম অগ্রণী। তাহার দেওয়া ৫০০্ টাকা লইয়া বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের নেতৃত্বে এই দৈনিকের জন্ম। পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করার পর সুবোধচন্দ্র মল্লিক মহাশয় অর্থ সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি অরবিন্দ বাংলায় আসিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষরূপে যোগদান করেন এবং বরোদার চাকুরি পরিত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে অরবিন্দ রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। সশস্ত্র বিপ্লব বিরোধী লেখার জন্য পত্রিকার পরিচালকদের সহিত মতভেদের ফলে ১৮ অক্টোবর বিপিনচন্দ্রের নাম সম্পাদক হিসাবে বাতিল করা হয়। পরে আলিপুর বোমার মামলায় অরবিন্দ গ্রেপ্তার হইবার পর ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত পুনরায় প্রধান সম্পাদক বিপিনচন্দ্র পাল পরিচালনা করেন। তখন বিপ্লবমুখী বাংলার প্রাণকেন্দ্রে ভাবী নেতারূপে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন শ্রীঅরবিন্দ। দৈনিক 'বন্দেমাতরমে'র স্বল্পকাল পরমায়ু দুই মাস ও তিন সপ্তাহ। লেখক গোষ্ঠীর মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ও ব্যারিস্টার বি. সি. চ্যাটার্জী।*

যুগান্তরে নির্ভীক ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপের নিদর্শন হিসাবে কয়েকটি সম্পাদকীয় রচনা উদ্ধৃত হল :

মিথ্যা ভয়

"কাণাকে কাণা বলিলে কাণার আর রাগের সীমা থাকে না ; যাহার যেখানে ব্যথা সেখানে হাত পড়িলে সে একেবারে জ্ঞানহারা হইয়া পড়ে ; জগতের সম্মুখ হইতে আপনার ক্ষতস্থান লুকাইয়া রাখিতে সকলেই সচেষ্ট। ভারতে ইংরাজ সরকারেরও সেই দুর্দশা। ইংরাজ রাজত্বের ভিত্তি যে এদেশে কত ক্ষীণ তাহা ইংরাজ প্রাণে প্রাণে বেশ বুঝে; আর বুঝে বলিয়াই সে প্রকাণ্ড আড়ম্বরের মধ্যে আপনার দুর্বলতা লুকাইয়া রাখিতে চায়; গোটাকত ফৌজ, তোপ, লাল পাগড়ির ভড়ং দেখাইয়া দেশের লোককে স্তম্ভিত করিতে চেষ্টা করে। ঐ যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গবর্ণমেন্ট প্রাসাদ. ঘন ঘন পাহারা, আজানুলম্বিত দারোয়ান, বড় বড় গোরা বারিক, ও সমস্ত কেবল একটা জাদু করিবার কল মাত্র। লোকে বিস্ফারিত নয়নে দেখিতেছে আর হাঁ করিয়া ভাবিতেছে—ইংরাজ সরকার কি দোর্দণ্ডপ্রতাপ! ইংরাজ জানে যে লোকের এই অজ্ঞানতাই ভারতে তাহার রাজত্বের ভিত্তি। তাই সে নানা কৌশলে এই অজ্ঞানতা বজায় রাখিতে চায়, লোকে যেদিন সন্দেহ করিবে যে এ তাসের ঘর সমগ্র ভারতবাসীর এক ফুৎকারও সহ্য করিতে সমর্থ নয়, সেদিন ইংরাজ রাজত্বের অবসানের সূত্রপাত। আজ অনেক দিনের পরে লোকের মনে সেই সন্দেহ আসিয়াছে; তাই কি তাহার এত আস্ফালন?

সেদিন ইংরাজ সরকারের পরাক্রমের কথা প্রসঙ্গে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারী একজন দেশীয় রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন—এদেশের লোকের ইংরাজ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কিছু করিবার কি ক্ষমতা?—রাজা কিছু না বলিয়া তাঁহার একজন কর্মচারীকে এক গামলা কালো কলাই ও গোটা কতক সাদা মটর আনিতে বলেন। সাদা মটরগুলিকে কালো কলাইয়ের উপর ছাড়াইয়া দিয়া গামলাটা নাড়িতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শ্বেত মূর্তিগুলি কোথায় অন্তর্হিত হইল। ইংরাজ কর্মচারীকে দেখাইয়া রাজা বলিলেন—ভারতে তোমাদের ঐরূপ অবস্থা, গোটাকতক মাত্র সাদা সাদা প্রাণী ভারতবর্ষে প্রভুত্ব করিয়া বেড়াইতেছে। শুধু একবার জাতীয় শরীরকে নাড়াচাড়া দেওয়ার অপেক্ষা।

* বিপ্লবী বাংলা—তারিণীশংকর চক্রবর্তী। পৃ: ১০১-১৪০

তবে এই যে দেড়শত বৎসর ধরিয়া "জনকতক শ্বেত প্রহরী পাহারা" আমাদের নয়নে ধাঁধাঁ লাগাইয়া দিয়া রহিয়াছে তাহার কারণ কি? কারণ আর কিছুই নয়; আমরা আত্মশক্তিতে বিশ্বাসহীন। সমগ্র ভারতবাসীর তুলনায় দেশে ইংরাজ কয়জন? আর তাহাদের বেতনভোগী স্বদেশদ্রোহীর সংখ্যাই বা কত? দেশের লোকে যেদিন বুঝিবে যে বিদেশির কেবল পরের দেশে আসিয়া পরদেশবাসীর মুখের গ্রাস কাড়িয়া খাওয়াই উদ্দেশ্য, সেইদিন আবার এই বিরাট জাতির মৃতপ্রায় দেহে প্রাণের স্পন্দন দেখা দিবে; কাঙালের মত ভারতে আসিয়া কুড়ানো রাজমুকুট মাথায় দিয়া ইংরাজ আজ ভাবিতেছে বুঝি সে সত্য সত্যই ভারতের সম্রাট হইয়া পড়িয়াছে—এই জাতীয় শরীরে প্রাণের প্রথম স্পন্দনে সে ভ্রান্ত বিশ্বাস কোথায় উড়িয়া যাইবে। দেশের লোক যদি আপনার পরাধীনতা নির্বিবাদে স্বীকার করিয়া না লয়, দেশের লোক যদি একযোগে খাজনা ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করে তাহা শত সহস্র ইংরাজ জাতি আনিলেও ভারতের পায়ে আর শৃঙ্খল বাঁধিতে পাবে না।

যাহারা আত্মশক্তিতে অনাস্থাবান্ হইয়া বিশ্বাসহীনের মত এখনও চুপ করিয়া পড়িয়া আছে আর বৃথা বাক্যজালে দেশের লোককে বুঝাইতে চাহিতেছে 'এখনও সময় হয় নাই' তাহারা ঐ অলস ভাবেই দিন কাটাইবে। কিন্তু যাহাদের কাণে স্বাধীনতার মন্ত্র পশিয়াছে তাহাদের আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই। অনন্যকর্মা হইয়া তাহাদিগকে ব্রত উদ্‌যাপনেব জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। যাহারা এখনও বুঝে নাই তাহাদিগকে কর্তব্যের পথ দেখাইয়া দিতে হইবে ; যাহারা কর্তব্যের পথ দেখিয়াছে তাহাদিগকে লইয়া মৃত্যুমুখে ছুটিতে হইবে।

ভয় নাই। বহু দিনের পর আজ মূর্চ্ছাভঙ্গের প্রথম লক্ষণ দেখা দিয়াছে। দেখিতেছ না আজ জননীর কাতর ক্রন্দন দেবলোকে গিয়া পৌঁছিয়াছে ; ঐ লক্ষ লক্ষ ধৃতাস্ত্র দেবশিশু ধর্মরাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য জননীর ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়া পুণ্যভূমিতে জন্মগ্রহণ করিতেছে। আবার ভারতে গীতার যুগ আসিয়াছে ; আজ যাহারা শিশু তাহারাই ঐ আগতপ্রায় কুরুক্ষেত্রের মহারণে দ্রোণ, কর্ণ, ভীষ্ম হইয়া দাঁড়াইবে, তাহারাই হৃদপিণ্ড তর্পণ করিয়া পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন করিবে, তাহারাই অমৃতধারা সিঞ্চনে মৃতদেহে প্রাণ আনিয়া দিবে। অমরজাতি আমরা;—আমাদেব আবার কিসের ভয়?"

মিথ্যার পূজা

"ভূপেন্দ্রনাথকে জেলে দিয়া ফিরিঙ্গি সরকার ভাবিয়াছিল এইবার তাহারা যুগান্তরের উত্থানশক্তি একেবারে রহিত করিয়া দিয়াছে। কিন্তু যুগান্তর আবার বাহির হইল। মরিল না ত বটেই; অধিকন্তু আবার ভবিষ্যতে যে মরিবে তাহার আশা পর্যন্ত দিল না। ইহাতে সরকারের ত রাগ হইবারই কথা!

ইংলিশম্যান ও ডেলি নিউস 'হা হুতাশ' করিয়া শেষে আশা দিল—"ভয় নাই; ছোটলাট আবার যুগান্তর সম্পাদককে জেলে দিবার ব্যবস্থা করিতেছেন।" ছোটলাট নাকি বলিয়াছেন যে, তিনি যুগান্তরের কতগুলা সম্পাদক আছে একবার দেখিয়া লইবেন; সব কটাকে জেলে পাঠাইবেন।

যুগান্তরের আবার সম্পাদক কে? যুগান্তর ত জাতীয় ভাবসমষ্টি মাত্র। লোকের প্রাণের ভিতর দিয়া যে ভাবস্রোত ছুটিয়াছে তাহার এক একটা কণা মাত্র যুগান্তরে আসিয়া ধাক্কা লাগে। সম্পাদক ত তাহা অভিব্যক্তির যন্ত্র মাত্র। যন্ত্রকে ধরিলে যন্ত্রী ত ধরা পড়ে না; যন্ত্রী যে অশরীরী। ঐ যে পালে পালে উন্মাদ বালকের দল "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া অজানা লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়াছে, ঐ যাহারা নৃমুণ্ড মালিনীর খর্পর তলে আত্মবলিদান দিয়া অমরত্ব লাভের জন্য উৎসুক—তাহারাই দেশে যুগান্তর আনিবে; তাহারাই যুগান্তরের সম্পাদক। গর্বস্ফীত অন্ধ! তাহাদের সংখ্যা জানিতে চাও! একদিন জানিবে। তাহাদের সকলকে কারাগারে পুরিতে পার এতবড় কারাগার ত আজও তোমরা গাঁথিয়া তুলিতে পার নাই।

আপনাকে আপনি যে গোলাম না সাজায়, তাহাকে গোলাম সাজাইতে পারে এতবড় বীর এ ত্রিভুবনে কেহ নাই। তুমি আমায় কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোমার অধীনতা স্বীকার করাইবে; আমি যদি 'ও দুঃখ নয় মা দয়া তোমার' বলিয়া সহাস্য মুখে কারাগৃহে প্রবেশ করি—তবেই ত তোমার দমনের চেষ্টা ব্যর্থ! তুমি আমায় ফাঁসী কাঠে ঝুলাইবে?—আমি মরিবার সময়েও ক্ষমতা তুচ্ছ করিয়া মরিব। একদিকে মাতৃমন্ত্র অপর দিকে ইংরাজের পরাধীনতা স্বীকার করাইতে চাও। মোঘল সম্রাট যখন একদিন তোমাদেরই মত মদগর্বে অন্ধ হইয়া শিখগুরুকে ধর্মত্যাগ করিতে বলিয়াছিল, তখন শিখগুরু হাসিতে হাসিতে আপনার মাথা দিয়াছিলেন; ধর্ম দেন নাই। আমরাও তাহাই করিব। ভারতে আবার ধর্মের বন্যা আসিয়াছে। মোঘল সিংহাসন যেখানে ভাসিয়া গিয়াছিল, তোমার পলাসীতে কুড়ান সিংহাসন সেখানে ভাসিয়া যাইবে। আমরা রাখি বলিয়া তোমরা আছ, বাঁচাই বলিয়া তোমরা বাঁচ। আমরা তোমাদের মুখে অন্ন তুলিয়া দিই বলিয়াই তোমরা আমাদের উপর পৈশাচিক অত্যাচার করিতে সাহসী হও; আমরা তোমাদের মাথায় তুলিয়া রাখিয়াছি বলিয়াই তোমরা সত্যই মাথার মণি; যেদিন নিষ্ঠীবনের মত তোমাদের ঘৃণার সহিত দূরে নিক্ষেপ করিব—সেদিন তোমরা নিষ্ঠীবন অপেক্ষা অধিক মূল্যবান নহ। আমরা ভ্রান্তির ঘোরে মিথ্যার পূজায় প্রবৃত্ত বলিয়াই মিথ্যা আজ সত্যের আসনে বসিতে সাহস পাইয়াছে। পরমহংস দেব বলিতেন—মায়াকে মায়া বলিয়া চিনিলে মায়া পলাইয়া যায়। যেদিন আমরা বুঝিব যে আমরা কতকগুলা অন্নদাস, ভবঘুরেকে ধরিয়া স্বহস্তে তাহাদের কপালে রাজটীকা পরাইয়া দিয়াছি, যে দিন বুঝিব আমরা বাস্তবিক কাণা নহি, শুধু স্বেচ্ছায় চোখ বুজিয়া অন্ধকার দেখিতেছি মাত্র, যেদিন বুঝিব আমরা দুর্বল নহি, অপারগ নহি, শুধু আলস্যের ঘোরে, অজ্ঞানের ঘোরে পড়িয়া আছি মাত্র—সেইদিন আমাদের দুর্দশার নিবৃত্তি। সে দিন আর "আমরা স্বাধীনতার উপযুক্ত নহি" বলিয়া জগতের সম্মুখে হাস্যাস্পদ হইতে ছুটিব না। অনন্ত শক্তির আধারভূতা, রন্ধ্রে রন্ধ্রে চৈতন্যময়ী আমাদের জননী—আমরা আবার কাহার দাস?

প্রতিজ্ঞা কর দেখি আর মিথ্যার সংস্পর্শে আসিব না, ইংরাজের বিশ্ববিদ্যালয়রূপ যাদুগৃহে পাণ্ডিত্যের তক্‌মা পাইয়া ভেড়া বনিয়া থাকিব না; ছোটলাট বড়লাট বাহির হইলে অভিনন্দন পত্র লইয়া চিরদাসত্ব স্বীকার করিবার জন্য তাহাদের পাছু পাছু ছুটিব না—তখন মায়ের যথার্থ স্বরূপ বুঝিবে; দেখিবে মা চির স্বাধীনা। একবার চোখের ঠুলি খুলিয়া ফেলিয়া মায়ের অভয়পদ দেখ দেখি; বুঝিতে পারিবে এ ইংরাজ রাজত্ব একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা মায়াপুরী

একথা বলিলে ইংরাজ রাগিয়া উঠিবে; কিন্তু আমাদের সহিত ইংরাজের মিলনের ত কোন সম্ভাবনাই নাই। একস্থানে বসিয়া সত্য মিথ্যা উভয়ে ত নির্বিবাদে ঘর করিতে পারে না। ইংরাজের বিরোধ ধর্মের সহিত—সত্যের সহিত। আর যাহার সত্যের সহিত বিরোধ তাহার মরণ অবশ্যম্ভাবী।"*

দেশে লোক কই

আমাদের দেশে অনেকের একটা ধারণা আছে যে, স্বাধীন দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে যেরূপ শক্তিশালী ও মনীষী ব্যক্তির সর্বদাই প্রাদুর্ভাব হয়, সেইরূপ ব্যক্তি আমাদের দেশে যত দিন না জন্মগ্রহণ করেন, ততদিন আমরা স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য উপযুক্ত হইব না। তাহারা বলেন যে, আজই যদি আমরা স্বাধীন হই, তবে স্বাধীন দেশের বিবিধ শাসনযন্ত্র পরিচালন করিবার লোক কোথায় পাইব? —এমন প্রতিভাশালী ব্যক্তি কি সকল প্রদেশে পাওয়া যাইবে, যাহারা ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের একতা সংরক্ষণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরে ও বহির্ভাগে নানা সমস্যার সুচারুরূপে মীমাংসা করিবে?—আমাদের মধ্যে যুদ্ধ নীতিজ্ঞ ব্যক্তিই বা কোথায়? ইত্যাদি, ইত্যাদি।

---

* স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়। পৃ: ১৭৫-১৭৯

এই সকল প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিতে হইলে প্রথমতঃ প্রকৃত স্বাধীনতা-বস্তু কি তাহা একটু বিচার করিয়া দেখা উচিত। আমাদের দেশে অনেকেরই একপ্রকার অদ্ভুত স্বাধীনতার জন্য একটা বিষম ব্যাকুলতা দেখা যায়; তাহাদের পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে মনে হয় যে, পরে আসিয়া স্বাধীনতা-অন্ন তাহাদিগকে পরিবেশন করিয়া না দিলে যেন তাহাদের কোন মতেই রুচিবে না। প্রকৃত স্বাধীনতা পরপ্রদত্ত হইতে পারে না ; কারণ, স্বাধীনতার সহজ অর্থ 'নিজের অধীনতা' কিন্তু পূর্বে নিজ বস্তুটির প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ, আত্মপ্রতিষ্ঠা না হইলে গেলে 'স্ব স্ব অধীনতা' কিরূপে আসিবে? যদি পরেই বাঞ্ছিত বস্তু আনিয়া দিল, তবে আত্মশক্তি কার্য হইল কোথায়? অতএব স্বাধীনতা বলিলেই বুঝিতে হইবে, আত্মশক্তির উদ্বোধনে ও প্রয়োগে লব্ধ স্বাধীনতা।

যদি স্বাধীনতা পরপ্রদত্ত হয়, তবে ইহা ভাবিবার কথা বটে যে, আমরা সেই স্বাধীনতা সংরক্ষণ করিবার জন্য দেশে উপযুক্ত লোক পাইব কোথায়? আমরা পরাধীনতার যে গভীর পঙ্কে মগ্ন হইয়া আছি, এই পঙ্ক হইতে উদ্ধার করিয়া অপর কেহ যদি মুখ্য সমাজে আমাদিগকে উত্তোলন করিয়া দেয়, তবে আমরা অল্পক্ষণও সেই স্থানে দণ্ডায়মান হইয়া থাকিতে পারিব না, ইহা সুনিশ্চিত। কিন্তু হে বাঙালি, একবার আত্মশক্তি দ্বারা লব্ধ স্বাধীনতার বিষয় কল্পনা করিয়া দেখ। যে স্বাধীনতা অর্জন করিতে পারে, সে নিশ্চয়ই উহাকে সংরক্ষণও করিতে পারে। যে দেশ আত্মশক্তি দ্বারা লাভ করা হয়, সে দেশের কর্মক্ষেত্রে কখনও লোকাভাব হয় না। বর্তমান ও স্বাধীন অবস্থার মধ্যে যে ঘটনা বৈচিত্র্যময় ব্যবধান, তাহার ধারণা আমাদের নাই, সেই জন্যই মনে করি যে আমরা স্বাধীন হইলে দেশে লোক পাইব কোথায়, এবং একতাই বা হইবে কিরূপে। আয়ার্ল্যাণ্ড যে আপনাকে আত্মশক্তি দ্বারা শাসিত দেখিতে চায়, জন্ মরলি বা গ্লাডস্টোন্ বা লর্ড রবার্টসের মত লোক নিজ দেশে দেখিতে পাইতেছে না বলিয়াই কি সেই নিরাশ হইয়া বসিয়া থাকিবে? সে জানে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামই উপযুক্ত মানুষ প্রস্তুত করিবার সুন্দর কারখানা। আর প্রথম অবস্থায় আত্মশাসন যদি সর্বসুন্দর নাই হয়, তবে দোষ কি? সর্বাঙ্গসুন্দর শান্তিপ্রদ পরকীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষা কদর্য আত্মশাসনতন্ত্র সহস্রগুণে লোভনীয় একথা কি বাঙালি আজও স্বীকার করিবে না?

যাহারা দেশে সর্বত্র উপযুক্ত লোকের আবির্ভাব না দেখিলে হৃদয়ে স্বাধীনতার আশা পোষণ করিতে বিমুখ, তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি যে, মনুষ্যত্বের চরমোন্নতিই যদি মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হয় এবং পরাধীন অবস্থাই যদি দেশে সমুন্নত মনুষ্যের আবির্ভাব হইয়া মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হইতে থাকে, তবে স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুল হইবার ত প্রয়োজনই কখনও হইবে না। পরাধীন জাতির মধ্যে প্রকৃত মনুষ্যত্ব বিকাশের আশা একান্ত প্রত্যাশার ন্যায় দেবতার দুষ্পৃহণীয়।

যে রোগী ঔষধ খাইতে নিতান্ত নারাজ তাহার আচরণের সহিত আমাদের আচরণ অনেকটা মিলে। যখন সেই রোগীর কাছে তিক্ত ঔষধের শিশিটা আনা হয়, তখনও যে যেন শিশিটিকে দেখেও দেখে না, কিন্তু ঔষধ খাইবার পর যে সমস্ত মুখরোচক দ্রব্যাদি মুখে দিতে হইবে সেইগুলি লইয়া কত সযত্নে নাড়াচাড়া করে, সাজিয়ে রাখে। দেশে প্রকৃত মানুষের বা মনুষ্যত্বের অভাব যে তিক্ত ঔষধ সেবনে দূরীভূত হইবে, তাহার প্রতি আমাদের লক্ষ্য নাই (—বাপরে রক্তদান!—) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যত্ব-বিকাশের সরঞ্জামগুলিকে কত যত্নের সহিত আমরা গুছাইতে চেষ্টা করিতেছি—আজ বিদেশে শিল্পবিজ্ঞান শিখাইতে দলে দলে ছাত্র প্রেরণ করিতেছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার আয়োজন করিতেছি, দেশের শিল্পবাণিজ্য স্বহস্তগত করিবার চেষ্টা করিতেছি ইত্যাদি। অবশ্য এই সকল সরঞ্জাম পূর্ব হইতেই গুছাইয়া রাখা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, কিন্তু ঔষধের শিশিটি ভুলিলে চলিবে না। প্রকৃত ঔষধ সেবন না করিলে সমস্ত আয়োজন সরঞ্জাম নিষ্ফল হইয়া যাইবে, ব্যাধির প্রতিকার হইবে না, দেশে উপযুক্ত মনুষ্যের অভাব কিছুতেই পূরণ হইবে না।

স্বদেশের চারিদিকে চাহিয়া দেখ, সর্বত্রই পরাধীনতার মন্ত্র ঘুরিতেছে—চিন্তায়, কার্যে, শিক্ষায়, জীবিকানির্বাহে, মন্ত্রণায়, উপদেশে, আশায়, নিরাশায়। এই সর্বব্যাপী মন্ত্র হইতে উন্নততর মনুষ্যত্বের

প্রত্যাশা করা কি বিড়ম্বনা। এদেশে এই মন্ত্রের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই সাধারণ ক্ষেত্রে একমাত্র সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব ব্যঞ্জক কার্য। এদেশে যদি কোথায়ও মনুষ্যত্ব গঠন করিবার উপায় বিদ্যমান থাকে তবে সে বিরোধাত্মক সাধনায়। এদেশে যদি উপযুক্ত দেশহিতকারী ব্যক্তির আবির্ভাব হইবার বিধাতৃনির্দিষ্ট কোনও পথ থাকে, তবে সে এই পরাধীনতা যন্ত্রের ধ্বংসে চেষ্টাতেই নিহিত আছে। নান্যপন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

যাহা সত্য তাহার সেবাতেই শক্তি পাওয়া যায়। তাহার অনুশীলনেই মনুষ্যত্ব ফুটে। আমাদের দেশের বর্তমান সাধন-ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ সত্যের সেবা দেখিতে পাওয়া যাইতেছে কি? আমাদের সকল সাধনার মূলে একটি বিষয় মিথ্যা, একটি উজ্জ্বল ভ্রান্তি বিরাজ করিতেছে। জ্যামিতির সকল প্রতিজ্ঞার মূলে যেমন কতকগুলি স্বতঃসিদ্ধের ভিত্তি বিদ্যমান, তেমনি আমাদের আধুনিক সকল সাধনার মূলে পরাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু যেমন বৈদান্তিকের মতে অহংপ্রাপ্তি সকল সংস্কার ও জ্ঞানের মূলে থাকিয়া আমাদের বুদ্ধিকেও মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তেমনি এই বিষয়ে পরাধীনতাকে স্বতঃসিদ্ধরূপে আমাদের সকল চেষ্টার মূলে রাখিয়া আমাদের সমাজকে ও সকল সাধনাকে আমরা দূষিত করিয়া ফেলিয়াছি, তাই এই সকল সাধনক্ষেত্র হইতে প্রকৃত শক্তি বা মনুষ্যত্বের বিকাশ দেখা যাইতেছে না। কিন্তু আজ এই সাধনক্ষেত্র হইতে মিথ্যাকে বহিষ্কৃত করিয়া দাও এবং তাহার আসনে স্বাধীনতা লিপ্সাকে উপবিষ্ট করাও, আজ এই বিষতুল্য পরাধীনতা-স্বীকারকে অমান্য করিয়া, বর্জন করিয়া, তীব্র স্বাধীনতা লিপ্সার উপর সমাজের সকল শক্তিকে, সকল অনুষ্ঠানকে, সকল সাধনাকে প্রতিষ্ঠিত কর, দেখিবে সত্যের অপূর্ব মহিমায় মনুষ্যত্ব বিকশিত হইবেই হইবে, অনুষ্ঠানের আহ্বানে শত শত কর্মীর জীবন উৎসর্গ করিতে আসিবে। মিথ্যা দ্বারা সাধন পথকে সুগম করিলেই, সাধক মিলে না—মিলে ত বেশি দিন টিকে না। কিন্তু সত্যের দ্বারা সেপথ অত্যন্ত দুর্গম হইলেও মানবহৃদয় বহ্নিমুখে পতঙ্গের ন্যায় পুঞ্জীকৃতভাবে অনিবার্যরূপে সেই পথেই আকৃষ্ট হয়। কারণ মানুষের জন্য প্রকৃত মনুষ্যত্বের আস্বাদন এই পথে।

কৃষক যেমন জমিতে লাঙল দিয়া মাটি পরিষ্কার করিতে যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া বীজ বপন করিয়া এই বিশ্বাসে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হয় যে তাহার যাহা করিবার সে করিয়াছে, বাকিটুকু ভগবানের প্রসাদ. সেইরূপ দেশের সর্বত্র স্বাধীনতা লিপ্সাও আত্মবিশ্বাসকে উদ্দীপিত করিয়া সর্বজনচিত্তকে স্বাধীনতার জন্য আত্ম-বলিদান দিতে উৎসাহিত করিয়া, সর্বত্র সুমহৎ সংকল্পের বীজ বপন করিয়া আমরা এইখানে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি যে আমাদের যাহা কর্তব্য তাহা করিতেছি, এখন উপযুক্ত লেখক প্রেরণ করা ভগবানের হাত, তাঁহা পাই প্রসাদ ও দান। আমাদের যাহা কর্তব্য তাহাতে বিমুখ বা অলস হইয়া যদি কেবলমাত্র উপযুক্ত লোকাভাবের প্রতিযোগ শব্দে রসনা পূর্ণ করিয়া দেশে বিচরণ করি, তবে আমরা ভগবানের নিকট অপরাধী, জন্মভূমির নিকট অপরাধী। আমাদের সর্বদা মনে রাখা উচিত যে যে ক্ষেত্রে প্রকৃত কর্মীর মনুষ্যসকল উৎপন্ন হইবে সেইক্ষেত্রে মিথ্যা ও ভ্রান্তির আশঙ্কায় আমরা কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছি। আমরা পরাধীনতাকে কেন্দ্র বা মধ্যবিন্দু করিয়া যখনই জাতীয়-জীবন গোলকটি নির্মাণ করিতে যাইব, তখনই আমাদের উন্নতির পথ চিরকালের জন্য অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিব।

আজি বুঝিবার দিন আসিয়াছে। বিধাতার আদেশ, যে ভারতবাসী সত্যকে ভুলিয়া, সত্যকে সভয়ে সাধনক্ষেত্র হইতে সরাইয়া রাখিয়া, মিথ্যার কুহকে মজিয়া আর দিন কাটাইতে পারিবে না। সত্যকে নির্ভয়ে আশ্রয় কর, দেখিবে ভাগবতশক্তি সমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইবে। মুহূর্তের মধ্যে লোকাভাব ঘুচিয়া যাইবে, বীর প্রসবিনী ভারত জননী জগতের কল্যাণদাত্রীরাজরাজেশ্বরীবেশে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হইবে।*

---

* মেদিনীপুরে স্বদেশী আন্দোলন— সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ৪২ ৪৩

সুভাষচন্দ্র বসু সমকালীন বিশ্বরাজনীতির পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে বলেছেন : "বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় বিদেশি গবর্নমেন্ট ভারতের মাটিতে আরও শিকড় গাড়িয়া বসিতে সমর্থ হইলেন।...... বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দেখা গেল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের স্বাধীনতাসংগ্রাম, অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সহিত নবজাগ্রত জাপানের লড়াই এবং খাদ্য ও স্বাধীনতার দাবিতে সর্ব-শক্তিমান জারের সহিত রুশ জনসাধারণের সংগ্রাম। প্রায় এই সময়ে শাসকদিগের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য চরম সীমায় গিয়া পৌছিল এবং গুরুতর রাজনৈতিক অশান্তির লক্ষণসমূহ দেখা দিল বাংলা দেশে; উহাকে অঙ্কুরে বিনাশ করিবার জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করিবার আদেশ জারি করিলেন। ইহা ছিল দেশব্যাপী বিদ্রোহের ইংগিত এবং সর্বত্র লোকে অনুভব করিতে লাগিল যে, নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই যথেষ্ট নহে। বঙ্গ-ভঙ্গকে দেশের লোকসংগ্রামের আহ্বান রূপেই ধরিয়া লইয়া উহার জবাবে বৃটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম বৃটিশদ্রব্য বর্জনের এক আন্দোলন শুরু করিয়াছিল। এই রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য ললিতকলা ও কারিগরি—শিল্পের উন্নতিতে গভীর উৎসাহ প্রদান করিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষাপ্রদান ও নূতন নূতন শিল্প গড়িয়া তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যুবকদিগকে প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইল। এই নূতন আন্দোলনকে গবর্নমেন্ট স্বভাবতঃই সুদৃষ্টিতে দেখেন নাই এবং উহাকে দমন করিবার জন্য সকল ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছিল। সরকারি নির্যাতনের প্রত্যুত্তরে বহু যুবক বোমা ও রিভলভারের আশ্রয় গ্রহণ করে এবং প্রথমে বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৭ সালে। বিংশ শতাব্দীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত এবং ইহা দমনের জন্য গভর্ণমেন্ট ১৯০৯ সালে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়া বাঙালী যুবকদিগকে দৈহিক কসরৎ শিক্ষাদানের কারণে এই সকল প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলিকে বে-আইনি বলিয়া ঘোষণা করেন।"

তারপর সুভাষচন্দ্র বলেছেন বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্য ঘটে। বামপন্থী নেতারা (জাতীয়তাবাদী বা চরমপন্থী নামেও অভিহিত) বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে আদৌ সন্তুষ্ট ছিলেন না। তারা চাইলেন ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করা হোক। এদের মধ্যে ছিলেন অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল এবং বালগঙ্গাধর তিলক আর দক্ষিণপন্থী নেতারা, যেমন বোম্বাইয়ের স্যর ফিরোজ শা মেন্টা, পুণার গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং বাংলার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্যর উপাধিপ্রাপ্ত) অধিকতর মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন। এদের দু'পক্ষের মাঝামাঝি অবস্থান করছিলেন পঞ্জাবের লালা লাজপত রায়। কিন্তু ১৯০৭ সালের সুরাট কংগ্রেসে বামপন্থীদের পরাজয়ের পর কংগ্রেস সংগঠন সম্পূর্ণ দক্ষিণপন্থীদের করায়ত্ত হয়। কিছুকাল বাদে রাজদ্রোহের অভিযোগে তিলকের ছয় বৎসর কারাদণ্ড হল। অরবিন্দ ঘোষ রাজনীতি থেকে নির্বাসন গ্রহণ করলেন। আর চরমপন্থী রাজনীতির পথ ত্যাগ করলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ১৯১৫ সাল পর্যন্ত বামপন্থী বা চরমপন্থীরা তাদের কোন আকাঙ্ক্ষাই পূরণ করতে পারেনি। কিন্তু ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে কংগ্রেসের দুটি পক্ষ অনেক কাছাকাছি আসে। তাছাড়া ভারতীয় মুসলিম লিগের সঙ্গে একটি আপোষ রফা হয়। এর মাঝে ১৯১৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে এসে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয় রাজনীতির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করেছেন। সংগ্রামের রূপও বদলাতে থাকে। তারপর মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টকে কংগ্রেস প্রত্যাখ্যান করে। কিন্তু এই রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই ভারত সরকার ১৯১৯-এর গবর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট পাশ করিয়ে নেন। ভারতবাসীকে নতুন করে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার ব্যবস্থা করেন। নতুন আইনে সরকার রাজনৈতিক কারণে কোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে আটকের ব্যবস্থা করে। অবিলম্বে তার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গান্ধীর নেতৃত্বে বৃহত্তর আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। সেই আন্দোলনের একটি বিয়োগান্ত চিত্র জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস

হত্যাকাণ্ড। ভারতীয় গণমানসে তার প্রতিক্রিয়া ঘটে তীব্রভাবে। ভারতীয় মুসলমানরা সে সময়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে মিত্র শক্তিবর্গের তুরস্ক বিভাগের চক্রান্তে। ঐস্লামিক জগতের ধর্মগুরু বা খলিফা তুরস্কের সুলতানকে সমর্থন জানিয়ে ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় শুরু করে খিলাফৎ আন্দোলন। খিলাফৎ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে কংগ্রেস নেতারা একটা বোঝাপড়ায় আসেন। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে নতুন শাসনতন্ত্রের প্রতি অসহযোগিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল। এর কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছিল : পাঞ্জাবের নৃশংস হত্যাকাণ্ড, তুরস্কের প্রতি ব্রিটেনের মনোভাব এবং "নূতন সাংবিধানিক সংস্কারের অপ্রতুলতা"। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সমসাময়িক কালে, বিশ শতকের সূচনায় আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করে সুভাষচন্দ্র মন্তব্য করেছেন : "......গঠনমূলক দিক হইতে বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় আন্দোলনের একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে। অন্যত্র যেমন, ভারতেও তেমনই ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা গুরুত্বপূর্ণ একটা কালের সীমা নির্দেশ করিতেছে। ১৮৪৮-এর বিশ্ব বিপ্লবের পরে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সম্ভব হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় এমন এক সময়ে যখন বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রান্তেও একই রকমের অভ্যুত্থান ঘটিতেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ সালের আন্দোলন হয়। এবং উহা ছিল ১৯০৫-এর রুশ বিপ্লবের সমসাময়িক। মহাযুদ্ধ চলিবার সময় যে বিপ্লবের চেষ্টা হয়, সারা বিশ্বে প্রায় একই সময়ে উহাই বৈশিষ্ট্য ছিল। শেষে উল্লেখ করিলেও ইহাও কম অনস্বীকার্য নয় যে, ১৯২০-২১ সালের আন্দোলন, আয়ার্ল্যান্ডের সিনফিন বিপ্লব, তুর্কীদিগের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা, এবং যে সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা পোলান্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মত দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়,সেগুলি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়াছিল। অতএব, গত এবং বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যে সকল অভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল তাহার সহিত মূলগত ভাবে ভারতের এই জাগরণের নিঃসন্দেহে একটা সম্বন্ধ রহিয়াছে।*

অধিকাংশ ইতিহাস লেখকের মতে গান্ধীর আবির্ভাবের পর ভারতের জাতীয় আন্দোলন এর নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। যার সঙ্গে আগেকার আন্দোলনের কোনরূপ সংযোগ ছিল না, এমন অভিমত তাদের। ইতিহাসের এ হল এক সহজ বিশ্লেষণ। জালিয়ানওয়ালাবাগের আইন অমান্যকারীরা আগেকার আন্দোলনের ধারাকেই অব্যাহত রেখেছিল, গান্ধী প্রদর্শিত পথ তারা অনুসরণ করেনি। রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ তখন সারা ভারত জুড়ে। বিপ্লবীদের সশস্ত্র কার্যকলাপ ১৯০৮ থেকে ১৯১৮ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সেই বিক্ষোভ দমন করতেই রাউলাট আইন। এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাতেই জনতা জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হয়েছিল। আর সেখানে যে বীভৎস হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়, সারা ভারত তখন তার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। গান্ধী সেই জটিল সন্ধিক্ষণে নিজের বুদ্ধি কৌশল কাজে লাগিয়ে অসহযোগ আন্দোলনকে এক নতুন মাত্রা দেন। যার ফলে, জাতীয় আন্দোলন অসহযোগের পথ ধরে এগিয়ে যেতে থাকে। একথাও স্বীকার করা অন্যায় হবে না, কংগ্রেসীদের এক বৃহৎ অংশ এবং বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত দেশপ্রেমিকরা গান্ধীর আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিল না। অহিংসার পথে একদিন স্বাধীনতা আসবে এই মতে তাদের কোনরকম আস্থাই ছিল না। তারা জনসংযোগের জন্য কংগ্রেসের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিল। তারা বিশ্বাস করত অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে জন বিক্ষোভ যখন উত্তাল হয়ে উঠবে, তখন সেই বিক্ষুব্ধ জনতার সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব হবে। সন্ত্রাস আসে বিপ্লবের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে।

" ..বিপ্লব আন্দোলনে সন্ত্রাসবাদের যে কোন প্রয়োজনীয়তা নেই তাও নয়। সন্ত্রাসবাদ দ্বারা

*ভারতের মুক্তিসংগ্রাম — সুভাষচন্দ্র বসু। পৃ. ২৩ - ২৭

স্বাধীনতা না এলেও ব্যাপক প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেও একে গ্রহণ করা চলে। অত্যাচারী শাসককে হত্যা করে সংগঠন এ পথে জনসাধারণের অনুরাগ ও আস্থা ভাজন হতে পারে। এজন্য ভারতীয় বিপ্লবীরা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক হত্যায় লিপ্ত হত। আসলে তাদের উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র ভারতব্যাপী এক সশস্ত্র অভ্যুত্থান। শিবাজী কর্তৃক অনুষ্ঠিত পদ্ধতিতে দীর্ঘদিন ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে গেলে বৃটিশ শক্তিকে শেষ পর্যন্ত এদেশ ছাড়তে বাধ্য করা যাবে, এই ছিল তাদের বিশ্বাস। গান্ধীজীর অহিংস আন্দোলনের ফলে জনসাধারণ ইংরেজ বিরোধী হয়ে দাঁড়ালে, তখন সহজেই তাদের সশস্ত্র আন্দোলনের মধ্যে টেনে আনা সম্ভব হবে। এই বিশ্বাস নিয়েই তারা গান্ধীজীর আন্দোলনের মধ্যে এবং সমান্তরাল ভাবে ভারত ব্যাপী সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। অনেকে মনে করেন যে তাদের আন্দোলন অঞ্চল বিশেষে আবদ্ধ ছিল এবং সন্ত্রাসবাদ তাদের নীতি ছিল। কিন্তু এ ধারণা ভুল। তবে কংগ্রেস আন্দোলন যেমন প্রতিটি গ্রামে পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল, বিপ্লবী সংগঠন কখনও তা হয়নি। বাংলাদেশে ছোটবড় সমস্ত শহরে, এবং যে সমস্ত গ্রামে স্কুল আছে সেখানে বিপ্লবী সংগঠন কিছু না কিছু ছিল। অন্যান্য প্রদেশে বিপ্লবী সংগঠন শহরেই অবস্থিত ছিল। তবে গান্ধীর আন্দোলনকে এই সংগঠন সাহায্যেই সশস্ত্র বিপ্লবান্দোলনে পরিণত করা চলবে, বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ এ আশা পোষণ করতেন। তাদের এ ধারণা যে ভুল নয়, তা ১৯৪২ সালের বিদ্রোহ যারা দেখেছেন, তারাই বুঝবেন। বিপ্লবীরা ১৯৪২-এর বিদ্রোহের ভারতব্যাপী রূপই স্বাধীনতার জন্য পরিকল্পনা করতেন। তাছাড়া বহির্বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে বাইরের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রশক্তির সাহায্যে সময়ও পাওয়া যাবে এও তাদের আশা ছিল। বাইরের ও ভিতরের এই সংগ্রামী শক্তি এক হলে সশস্ত্র বিপ্লবের পথে ভারতের স্বাধীনতা সম্ভব হবে, এই ছিল তাদের আশা।*

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে ১৯১৪ সাল নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। শুরু হয় মহাসমর। ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়ে বিব্রত। ভারতে বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ড ক্রমশ ব্যাপক রূপে নিতে থাকে। ভারতীয় বিপ্লবীরা সেনাবাহিনীর সহযোগিতাকে গুরুত্ব দিয়েছিল বিপ্লবের স্বার্থে। এ ব্যাপারে গোপন কার্যকলাপও চলতে থাকে। সারা ভারতের বিপ্লবীরা সংঘবদ্ধ হওয়ার চেষ্টা চালিয়েছিল। ভারতীয় বিপ্লবীদের অনেকেই তখন য়ুরোপ ও আমেরিকায় বসবাস করছে। বার্লিনে তৈরি হল ভারতের স্বাধীনতা লিগ। ব্রিটেনের শত্রু জার্মানির সহযোগিতায় অর্থ, অস্ত্রশস্ত্র ও বিবিধ সাহায্য গ্রহণ করে, বিদেশী শাসককে চরম আঘাত হানার উদ্যোগ নেওয়া হয়। বিদেশে অবস্থানকারী স্বাধীনতা প্রেমিক ভারতীয়রা স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার শুরু করে য়ুরোপ, আমেরিকা, দূর ও মধ্যপ্রাচ্যে। এজন্য বিদেশে যাবতীয় নির্যাতন তারা উপেক্ষা করে গেছে। তাদের সেই অবদানকে অত্যন্ত অবহেলার সঙ্গে পরবর্তীকালে রচিত স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান দেওয়া হয়েছে।

সেই সময় বিদেশে অবস্থানকারী বিপ্লবীদের কথা উল্লেখ করেছেন নলিনীকিশোর গুহ**। তাঁদের অন্যতম কয়েকজন হলেন :—

১৯০৫ থেকে ১০ সালের মধ্যে

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা (রাজপুতানা)	বীরেন চট্টোপাধ্যায় (হায়দরাবাদ প্রবাসী বাঙালি সরোজিনী নাইডুর ছোট ভাই)।
মাদাম কামা (বোম্বাই)	
সর্দার সিংজী রাণা (কাথিওয়াড়)	তারক দাস (বাংলা)
বিনায়ক সাভারকর (বোম্বাই)	ডা. ভূপেন দত্ত (বাংলা—স্বামী বিবেকানন্দের ছোট ভাই)।

* বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার — ক্ষীরোদকুমার দত্ত। পৃ. ১৯০ - ৯১

** বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ

ওবেদুল্লা (যুক্তপ্রদেশ)	সুধীন বসু (বাংলা)
রামচন্দ্র (পঞ্জাব)	খগেন্দ্র চন্দ্র দাস (বাংলা)
হরদয়াল (পঞ্জাব)	অধর নস্কর (বাংলা)
বরকতুল্লা (যুক্তপ্রদেশ)	মীর্জা আব্বাস (বিহার)
পাণ্ডুরং কানকোজি	

১৯১৪ - ১৯১৮ সালের মধ্যে এবং পরবর্তী সময়ে

ডা. বিষ্ণু সুখতনকর (মহারাষ্ট্র)	বীরেন চট্টোপাধ্যায়
অজিত সিংহ (পঞ্জাব)	ধীরেন সরকার (বাংলা)
পাণ্ডুরং কানকোজি	প্রমথ দত্ত (বাংলা)
বরকতুল্লা	ডা. ভুপেন দত্ত
খান চাঁদ বর্মা (যুক্তপ্রদেশ)	তারক দাস (বাংলা)
রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ (যুক্তপ্রদেশ)	হেরম্ব গুপ্ত (বাংলা)
লালা লাজপৎ রায় (পঞ্জাব)	বীরেন দাশগুপ্ত (বাংলা)
	রাসবিহারী বসু (বাংলা)
শিবপ্রসাদ দত্ত (যুক্তপ্রদেশ)	মানবেন্দ্র রায় (বাংলা)
জাফর আলি খাঁ (যুক্তপ্রদেশ)	হেমেন্দ্র কিশোর রক্ষিত (বাংলা)
হৃষীকেশ লট্টো (পঞ্জাব)	ধনগোপাল মুখার্জি (বাংলা)
ডা. হাফিজ (যুক্তপ্রদেশ)	শৈলেন ঘোষ (বাংলা)
হোরমনজী ফারশাপ (বোম্বাই)	সুরেন কর (বাংলা)
রজবলী (পঞ্জাব)	সত্যেন সেন
নন্দরকার (বোম্বাই)	ত্রিতেশ লাহিড়ী
চম্পুয়া (মাদ্রাজ)	সুরেন বসু
ওয়াহিদ (বিহার)	অবনী মুখার্জি (বাংলা)
পিংলে	রামচন্দ্রজি
হরনাম সিং	ভগবান সিং (পঞ্জাব)
ডা. মনসুর (যুক্তপ্রদেশ)	হরদয়াল (পঞ্জাব)
চম্বক রাম পিল্লাই (ত্রিবাঙ্কুর)	সর্দার ওমরাও সিং (পঞ্জাব)

নির্বাসিত ভারতীয় বিপ্লবীদের তৎপরতায় জার্মান সরকার ভারতীয় বিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। স্থির হয়েছিল ভারতীয় বিপ্লবীরা একটি নির্দিষ্ট দিনে বিদ্রোহের সূচনা করবে। এর নেতৃত্বে ছিলেন রাসবিহারী বসু ও যতীন মুখার্জি। সেই উদ্দেশ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রচারও চলেছিল। ভারতে তখন বৃটিশ সৈন্যসংখ্যা সীমিত। অধিকাংশ চলে গেছে মহাযুদ্ধের বিভিন্ন প্রাঙ্গণে। জার্মান অস্ত্র এসে পৌছালে দ্রুত তা ছড়িয়ে দেওয়া হবে সারা ভারতে বিপ্লবীদের মধ্যে। তাদের পক্ষে স্বল্পসংখ্যক অনুগত বৃটিশ সৈন্যের মোকাবিলা অসম্ভব হবে না।

কিন্তু ভারতীয় বিদ্রোহের জন্য আগত অস্ত্র-বাহী যুদ্ধ জাহাজ 'ম্যাভারিক' ধরা পড়ল জাভার উপকূলে। অপর একটি জাহাজ 'অ্যান লুই'ও ভারতের উপকূলভাগ স্পর্শ করতে পারল না। ক্রমে সেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল। চরম বিশ্বাসঘাতকতায় বিপ্লবীদের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

রাসবিহারী বসুকে খুঁজে বের করতে বিদেশি সরকার সেদিন সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাঁকে ধরিয়ে দিতে পারলে বিপুল অঙ্কের পুরস্কার মিলবে। কিন্তু তা অসম্ভবই থেকে গেল। কারণ, ১৯১৫ সালের ১২ মে পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে রাসবিহারী পালিয়ে গেলেন জাপানে।

তার আগেই ঘটে গেছে জাপানি জাহাজ 'কোমাগাটামারু'-কে কেন্দ্র করে অপর একটি মারাত্মক ঘটনা। কানাডা সরকার নতুন এমিগ্রেশন আইন জারি করায় সেখানে বসবাসকারী হাজার চারেক পঞ্জাবী নিতান্ত সংকটের সম্মুখীন হয়। সিঙ্গাপুরের ব্যবসায়ী গুরদিৎ সিং 'কোমাগাটামারু' জাহাজটি ভাড়া করেন। এই জাহাজ ৩৭২ জন শিখ যাত্রী নিয়ে কানাডা অভিমুখে যাত্রা শুরু করে ১৯১৪ সালের ৪ এপ্রিল। ইয়াকোহামা ও অন্যান্য বন্দর হয়ে জাহাজটি ভ্যাংকোবারে পৌঁছায়। কানাডা সরকার তাদের সে দেশে নামতে দিল না। যাত্রীদের মধ্যে দেখা দিল তীব্র অসন্তোষ। ঘটিবাটি বিক্রি করে তাদের অনেকেই চলেছিল ভাগ্যের সন্ধানে। তখন তারা ক্ষুধার্ত ও সম্বলহীন। জাহাজ ফিরে চলল। এল হংকং বন্দরে। সেখানেও তারা বিতাড়িত হল। কাউকে নামতে দেওয়া হল না। এমন কি জাহাজে কোন খাবারও পর্যন্ত তুলতে দেওয়া হয়নি। অবশেষে ভারত সরকারের নির্দেশে জাহাজে সামান্য খাবার দেওয়া হয়। আবার সেই জাহাজ চলল কলকাতায়। পথে তাদের সিঙ্গাপুরেও নামতে দেওয়া হল না।

জাহাজের ৩৭২ জন যাত্রী ততদিনে সম্পূর্ণ বৃটিশ বিদ্রোহীতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন বন্দরে তারা পেয়েছে গদরপার্টির ইস্তাহার ও অন্যান্য প্রচারপত্র। সে সব তাদের চোখ খুলে দিয়েছে।

জাহাজটি বজবজ পোতাশ্রয়ে এসে পৌঁছায় ১৯১৪ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর। সরকার শিখ যাত্রীদের সরাসরি পঞ্জাবে পাঠাবার জন্য একটি ট্রেন সেখানে আগে থেকেই রেখে দিয়েছিল। কিন্তু জাহাজ থেকে নেমে যাত্রীরা পায়ে হেঁটে চলল কলকাতা। তারা ট্রেনে উঠতে নারাজ। তাদের বাধা দিল রাইফেলধারী পুলিশ। শিখদের অনেকের কাছে ছিল আমেরিকান পিস্তল। শুরু হয়ে গেল গুলির লড়াই। ১৮ জন ফেরৎ যাত্রীকে পাঠান হল পঞ্জাবের ট্রেনে চাপিয়ে। গুরদিৎ সিং এবং তাঁর ২৮ জন সঙ্গী পালিয়ে যায়।

'টোসামারু' নামে আর একখানি জাহাজ ১৯১৪ সালের ২৯ অক্টোবর অধিকাংশ শিখযাত্রী নিয়ে আমেরিকা, ম্যানিলা, চীন, সাংহাই ও হংকং ঘুরে এল কলকাতায়। অধিকাংশ শিখযাত্রী। তাদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু দুর্ধর্ষ বিপ্লবী কর্মী। অপর একটি জাহাজ 'এস্-এস্-সালামি'তে বহু শিখযাত্রী এসে পৌঁছায়। যাদের মধ্যে মিশেল ছিল বিপ্লবীরা। এরা নিরাপদে উত্তর ভারতে চলে যায়। কেউ কেউ ধরা পড়ে বন্দিও হয়েছিল।

সারা দেশ জুড়ে তখন বিপ্লবের তপ্ত আগুন। গদরপার্টির নেতৃবৃন্দ রাসবিহারী বসুর নেতৃত্ব মেনে নেওয়ায়, পরিবেশ বিপ্লবের অনুকূল হয়ে উঠতে থাকে। উত্তর ভারতের গুপ্ত সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দ তখন রাসবিহারীর পাশে। পারস্পরিক সহযোগিতার দৃঢ়বন্ধনে জড়িত তারা। 'কোমাগাটামারু'র ঘটনায় ক্ষিপ্ত পঞ্জাব রেজিমেন্ট। এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের রাত নেমে আসছিল ইংরেজ শাসকদের চোখের সামনে।

কিন্তু বিশ্বাসঘাতকের জঘন্য ভূমিকা ব্যর্থ করে দিল ১৯১৫ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারির ভারতব্যাপী বিদ্রোহের পরিকল্পনা।

দেশজুড়ে তখন ব্যাপক পুলিশী নির্যাতন চলছে। ব্যাপক ধরাপাকড়ে উন্মাদ পুলিশ। বিপ্লবীদের গোপন আস্তানায় পুলিশের তল্লাসী শুরু হয়ে গেছে। কাপতিপোদায় যতীন্দ্রনাথের সাময়িক আবাসে হামলা করেও পুলিশ তাঁকে ধরতে পারল না। বিপ্লবীদের গোপন আড্ডা 'বালেশ্বর ইউনিভার্সাল এম্পোরিয়াম' এবং বিপ্লবী নেতা হরিকুমার চক্রবর্তীর হ্যারি অ্যান্ড সন্সেও পুলিশ তল্লাসি চালায়।

বাংলার বিপ্লবীদের সামনে চরম সংকটের দিন। এই অবস্থার জন্য তারা প্রস্তুত ছিলেন না। দীর্ঘ দিনের প্রস্তুতি কী অবশেষে অন্ধকারে বিলীন হয়ে যাবে। সেদিন বাংলার বিপ্লবীকর্মীদের সামনে এক দুর্ধর্ষ রক্তাক্ত চালচিত্র রেখে গেলেন নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি—বাঘা যতীন। বালেশ্বর যুদ্ধ স্মৃতি হয়ে থাকল ইতিহাসের পাতায়। "যতীন্দ্রনাথও ভবিষ্যতের সফলতর বিপ্লব-সম্ভাবনার জন্যে পালিয়ে অপেক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। তিনি দেখলেন যে, বিপ্লব

আপাতত ব্যর্থ হয়েছে। বিরাট ষড়যন্ত্র সকলের অজ্ঞাতে সংঘটিত হয়ে সকলেরই অজান্তে ফেঁসে গেছে। জাতির সম্মুখে তুলে ধরার মত আদর্শ ও প্রত্যয় কিছু রেখে না গেলে এই ব্যর্থতায় দেশ অবসন্ন হয়ে পড়বে, মুক্তি সংগ্রামের সম্ভাবনাও পিছিয়ে যাবে। এ ব্যর্থতার মূলে দলের কতকগুলো লোকেরই দুর্বলতা ও নিচ বিশ্বাসঘাতকতা বর্তমান। তাকে অতিক্রম করে এমন বলিষ্ঠ কীর্তি প্রতিষ্ঠিত করা দরকাব যার আলোয় সকল নৈরাশ্যবাদ দূর হয়ে যাবে। কাজেই মৃত্যুহীনের ভৈরব-গীত শোনাতে হবে আগামী দিনের সংগ্রামী তরুণ-ভারতকে।

"যতীন্দ্রনাথকে কেউ থামাতে পারলেন না। তিনি সর্ববরেণ্য নেতা। তিনি শক্তিধর পুরুষ। অন্ধকারে তাঁর মত নেতাই তো পথ দেখাবেন। তাঁকে পথ বাত্‌লে দেবার স্পর্ধা কারো হতে পারে না। তবু একটি প্রিয়জনের সে-স্পর্ধা হয়েছিল। তাতে বিজড়িত ছিল বন্ধু ও নেতাকে দুর্দিনে আরো কাছে পাবার আকুতি। 'বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, কোন শুভানুধ্যায়ীর সাবধান-বাণীর উত্তরে পলাতক যতীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "খালি প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার জন্য কি লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াব? আজ আমরা নিজেদের পরিচয় দিয়ে যাব।" এই উক্তি তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যাঁর জ্যেষ্ঠা ভগ্নীও দূর থেকে কানে কানে বাণী পৌঁছে দেন প্রাচ্যের বীরাঙ্গনারই মত— "দেখো, যেন শুনতে না হয় সিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ।"

"চিত্তপ্রিয় রায়, নীরেন দাশগুপ্ত, মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও জ্যোতিষ পাল সহ যতীন্দ্রনাথ বুড়ি বালামের তীরে গোবিন্দপুর গাঁয়ে এসেছিলেন। তখন ভাদ্র মাস। ভরা নদী পার হলেন। বনের দিকে পথ চলতেই গাঁয়ের লোকেদের সন্দেহ হলো। কারণ দেশে দেশে, শহরে শহরে, গ্রামে গ্রামে পুলিশ ঢোল সহযোগে জানিয়ে দিয়েছে যে, কতকগুলো জর্মান ও দেশী ডাকাত ঘুরে বেড়াচ্ছে খুব গোপনে গৃহস্থদের টাকা-পয়সা লুটবার জন্যে। অবশ্য তাদের ধরিয়ে দিতে পারলে সরকার বিস্তর পুরস্কার দেবে।

"গ্রামের লোকেরা যতীন্দ্রনাথের পেছন নিল। তাদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বিপ্লবীরা অনেক করে বোঝাতে চেষ্টা করলেন যে, অহেতুক আগ্রহ নিয়ে তাদের ভিড় করা উচিত নয়। ভিড়ের মধ্যে পুলিশের লোকও এসে গেছে। তারা জনতাকে উস্কানি দেওয়ায় অনেকে বিপ্লবীদের পশ্চাতে ধাওয়া করল। বাধ্য হয়ে বিপ্লবীরা গুলি ছুঁড়লেন। ধারেপাশে তখন আর কেউ রইল না। 'চাষখন্দে'র কাছে সাঁতরে আবার নদী পার হতে হল। পঞ্চ বীর বসলেন একটি উইয়ের ঢিবির পাশে। ক্ষুধায় ও তাড়নায় সবার দেহ শ্রান্ত। তারপর কি করে পল্লীর অবোধ জনতা এবং পুলিশবাহিনী কর্তৃক দু'দিক থেকে ঘেরাও হয়ে ১৯১৫ সনের ৯ সেপ্টেম্বর বীরশ্রেষ্ঠ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি ও তাঁর সুযোগ্য সতীর্থ চতুষ্টয় সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হন তা ইতিহাস প্রখ্যাত হয়ে আছে। সেখানে পঞ্চ-বীরের অপূর্ব শৌর্য প্রদর্শন এবং যতীন্দ্র-চিত্তপ্রিয়ের মৃত্যুবরণ বিপ্লবী ভারতকে বহ্নিস্নানে শুদ্ধ করে দিয়েছিল।

"বালাসোরের যুদ্ধে পাঁচটি মাউজার পিস্তল বিপ্লব নেতা যতীন্দ্রনাথের বীর্যমন্ত্রে ও তার তরুণ শিষ্য চিত্তপ্রিয়-মনোরঞ্জন-নীরেন-জ্যোতিষের অসহ্যসাধনায় কী দুর্জয় শক্তি ধারণ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইংরেজ রাইফেল-এর প্রত্যুত্তরে প্রচণ্ডতম আঘাতে দিয়ে যাচ্ছিল তার সংবাদ ভারতবাসী সেদিন জেনেছিল। এই খণ্ডযুদ্ধে অগ্নিস্বাক্ষরে জাতির শৌর্যময় এক ঐতিহ্য রচিত হল। পশ্চাতে পড়ে রইল তাদের কলঙ্কবার্তা, যাদের বিশ্বাসঘাতকতায় 'বিপ্লব' সেদিন সার্থক হতে পারে নি।"*

বাংলার সশস্ত্র বিপ্লববাদের প্রবর্তক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (স্বামী নিরালম্ব) সম্পর্কে তাঁর শিষ্য জীবনতারা হালদার লিখেছেন : "ভারতবর্ষকে বিদেশি শাসন হইতে মুক্ত করিতে রীতিমত অস্ত্রশস্ত্র লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে, এই পরিকল্পনা যাঁহার মনে প্রথম উদয় হইয়াছিল তাঁহার নাম

---

* সবার অলক্ষে-১ম খণ্ড। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়। পৃ. ২৭-২৮

প্রায় অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। গার্হস্থ্য জীবনে তাঁহার নাম ছিল যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। পরবর্তীকালের প্রসিদ্ধ বিপ্লবী-যতীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামের সহিত তাঁহার নামের সাদৃশ্য থাকায় তাঁহার প্রকৃত পরিচয় অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ বাঘা যতীন শৌর্যে, বীর্যে জনসাধারণের মধ্যে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। পরন্তু যতীন্দ্রনাথ সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হন এবং স্বামী নিরালম্ব নাম পরিগ্রহ করিয়া নির্জনে সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করেন।

"প্রকৃতপক্ষে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই বাংলার বিপ্লববাদের প্রবর্তক-ব্রহ্মা প্রপিতামহ। সুখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর হইতে তাঁহার পরিচয় জনসাধারণের সম্মুখে প্রকাশিত হইতেছে। তাঁহার সহকর্মী ও সহযোগীরা প্রকাশ্যে তাঁহার যথোপযুক্ত সম্মান দিতে সক্ষম হইয়াছেন।.....

"মাতৃভূমিকে শৃঙ্খলমুক্ত করিতে হইলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইতে হইবে—এই উদ্দেশ্য কোথায় সিদ্ধ হইবে, যৌবনকালে যতীন্দ্রনাথ তাহাই অনুসন্ধান করিতে থাকেন। তখন বাঙালিকে সকলেই ভয় করিত, কোন প্রদেশে সৈন্যদলে ভর্তি করা হইত না। (অবশ্য বাঙালি ভারতের সর্বত্র গৌরবের সহিত চাকরি করিয়াছে)। অনুমান ১৮৯৭ খ্রিঃ তিনি দেশীয় রাজ্য বরোদায় গমন করেন এবং নিজের নাম বিকৃত করিয়া "যতীন্দর উপাধ্যায়" নামে তথাকার অশ্বারোহী বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। দৈবযোগে সেই সময় শ্রদ্ধেয় শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ মহাশয় সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (কেবলমাত্র অশ্বারোহণে) উত্তীর্ণ না হইয়া বরোদা রাজ্যে শিক্ষামন্ত্রী নিযুক্ত হন। এই সুযোগে যতীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দের সহিত মন্ত্রণা করেন যে বিদেশে পড়িয়া থাকা বৃথা শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয়—বাংলায় ফিরিয়া বিপ্লবের আয়োজন করিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের ইহাই প্রকৃষ্ট উপায় স্থির করিয়া তাঁহারা অনুমান ১৯০২ সালে বাংলায় ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা কলিকাতায় আসিয়া ৪নং শ্যামপুকুর লেনে যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের বাড়ি মিলিত হইলেন—একটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করিলেন এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত কর্মী সংগ্রহ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পরে ১৯০৫-৬ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করিবার জন্য যে "স্বদেশি আন্দোলন" হইয়াছিল, তাহাতে তাঁহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল।..

ইহারই ফলে মানিকতলা মুরারিপুকুরে বোমার কারখানার উদ্ভব ও বৈপ্লবিক কর্মের প্রসার। এই বোমার কারখানায় বারীন্দ্রনাথ ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত প্রমুখ অনেক বিপ্লবী সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তখন বাংলার বিপ্লবীদের কার্যকলাপে বিদেশি গবর্নমেন্ট সন্ত্রস্ত হইলেন ও শাসনকার্য প্রায় অচল হইল। বাংলার সহিত বিভিন্ন প্রদেশের যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে যতীন্দ্রনাথ ভারত ভ্রমণ করেন। বিশেষত এইজন্য তিনি পঞ্জাব যান এবং তথায় বিপ্লবীদের এক শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সূত্রে প্রসিদ্ধ "গদর পার্টির" নাম উল্লেখযোগ্য। "কোমাগাটামারু" খ্যাতির বাবা গুরুদিৎ সিংও যতীন্দ্রনাথের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সৈন্যদলের সহযোগিতা করিবার প্ররোচনার জন্য তিনি প্রথম হইতেই সচেষ্ট ছিলেন।"*

"বারীনবাবুর সময়ে 'যুগান্তর' ছিল তাঁদের সাপ্তাহিক পত্রিকার নাম। সেই দিনে যুগান্তর কোন দলের নাম ছিল না। যারা যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁরা সকলেই ছিলেন কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য। যুগান্তর দলের নেতৃস্থানীয় বলে যাদের আমরা জানি—যেমন যাদুগোপাল মুখার্জি, মানবেন্দ্রনাথ রায়, অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী প্রভৃতি, এরা সকলেই কলিকাতা অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। যতীন মুখার্জী ও বারীনবাবু দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না। তিনি অনুশীলন সমিতিতেও ছিলেন না। যদিও উভয় দলের সঙ্গেই তাঁর সম্বন্ধ ছিল। অতএব যুগান্তর দলের লোক বলে যাঁদের বলা হয়, তাঁরা যে যুগান্তর পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই নব-সংগঠন, একথা বলা চলে না। বারীনবাবু ও তার সঙ্গী-সাথীরা জেলে চলে যাওয়ার পরে তাঁদের দলটা

* অনুশীলন সমিতির ইতিহাস—জীবনতারা হালদার। পৃ. ৪৭-৪৮

সম্পূর্ণভাবেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। সেই দলের বাকি যাঁরা ছিলেন, তাঁরা আর কখনো নূতন করে দল গড়ার চেষ্টা করেন নি।

"প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময়ে জার্মানদের সহায়তায় যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর নেতৃত্বে গঠিত কমিটি দল দেশব্যাপী এক বিদ্রোহ সৃষ্টির আয়োজন করেছিল। তখন তারা বাংলা দেশের সবগুলি বিপ্লবী দলকে এক সংগঠনের ভিতরে আনিবার চেষ্টা করেছিল। ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও কলিকাতার বিপিন গাঙ্গুলি মহাশয়ের দল ছাড়া বাংলা দেশের অন্যান্য দল তাদের সে ডাকে সাড়া দিয়ে মোটামুটি এক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ঢাকা অনুশীলন ও বিপিনবাবুর দলও অবশ্য পুরোপুরি সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু এই দুটি দল ছাড়া অন্যান্য দলগুলি বহুদিন একযোগে এবং নেতৃত্বে কাজ করার ফলে এইসব দলের মধ্যে এমন একটা একতাও একপ্রাণতার সৃষ্টি করেছিল যে ভবিষ্যতে এরা এক দলের অন্তর্ভুক্ত বলে নিজদিগকে মনে করতে কোন অসুবিধা অনুভব করেনি। যারা এক সংগঠনের মধ্যে এসে মিলেছিল, তারা কারা?

"এক কথায় বলা যায় যে, ১৯১৫ সালের প্রথম দিকে বরিশালের দলের সঙ্গে যতীন মুখার্জির দলের যোগ স্থাপিত হওয়ায়, পূর্বে উল্লেখিত দুটি দল ছাড়া বাংলা দেশের বাকি দলগুলি — যারা তখন কার্যক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল—তারা সকলেই এক সংগঠনের মধ্যে এসে গেল। বরিশাল দলের নিজস্ব শাখা সংগঠন ছিল—নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, ফরিদপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায়। তারপর ময়মনসিংহের মণি চৌধুরী ও ক্ষিতিশ চৌধুরীর আগ্রহে ও চেষ্টায় ১৯১৪ সালে বরিশাল দলের নরেন ঘোষ চৌধুরী ও সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ময়মনসিংহে চলে গিয়ে সাধনা সমিতির সর্বপ্রধান নেতা হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলে উভয় দলের মিলে মিশে এক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এরপর থেকে উভয় দল কার্যত ও প্রত্যক্ষত এক হয়ে চলতে থাকে। আর ১৯১৪ সালেই হাইকোর্টের উকিল ও ভূতপূর্ব মুনসেফ অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়ের চেষ্টায় ও আগ্রহে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় অবস্থিত যতীন রায় মহাশয়ের দলের সঙ্গে বরিশাল দলের প্রায় এক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার মত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। এছাড়া ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের দল বরিশাল দলের পূর্বে যতীন মুখার্জীর দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।

"এই মিলিত দলের নেতা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কার্যতঃ যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি, যদিও তাঁকে কেউ ভোট দিয়ে নেতা বানায়নি। এই মিলিত দল কতকগুলি উপদলের সমষ্টি, যাদের নিজস্ব পৃথক পৃথক ইতিহাস আছে, ঐতিহ্য আছে—পৃথক পৃথক নেতৃত্ব ও শাসন-শৃঙ্খলা আছে। কিন্তু বৃহত্তর প্রয়োজনে তারা একযোগে কাজ করে একসূত্রে গ্রথিত হয়েছে। এই উপদলগুলি হচ্ছে—

(১) বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, শ্রীহট্ট জেলার শাখা সংগঠন নিয়ে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী ও নরেন ঘোষ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বরিশাল দল,

(২) ময়মনসিংহের হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ, আনন্দ রায়, মণি রায়, ক্ষিতিশ চৌধুরী, নরেশ চৌধুরী প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত সাধনা সমিতির দল,

(৩) উত্তরবঙ্গের যতীন রায়, যোগেশ দে সরকার, কালী বাগচী, বাদল দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন রায় মহাশয়ের দল,

(৪) ফরিদপুরের পূর্ণচন্দ্র দাস, চিত্তপ্রিয় রায়, মনোরঞ্জন সেন, নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত পূর্ণদাস মহাশয়ের দল।

(৫) ইদিলপুরের নিখিল গুহ রায়ের দল ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ছড়ানো যতীন মুখার্জি, যাদুগোপাল মুখার্জী, নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), অতুলকৃষ্ণ ঘোষ, হরিকুমার চক্রবর্তী, সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী, সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের দ্বারা পরিচালিত যতীন মুখার্জি

মহাশয়ের দল। একসময়ে ঢাকার হেম ঘোষ মহাশয়ের দল ও চট্টগ্রামের সূর্যসেন মহাশয়ের দল যোগ দিয়েছিল। কিন্তু সে অনেক পরের কথা।*

ঢাকা অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে নলিনীকিশোর গুহ লিখেছেন : "১৯০৫ সালে পি. মিত্র ও বিপিনচন্দ্র পাল ঢাকা গমন করেন। তথায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপন করেন এবং পুলিনবিহারী দাসের উপর উহার পরিচালনার ভার দেন। সেই উপলক্ষে এক বৈঠকে পি. মিত্র বলেন, কেবল স্বদেশি ও বয়কটে ইংরেজ দেশ ছাড়িবে না। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, কিসে যাইবে? মিত্র মহাশয় দৃপ্ত কণ্ঠে বলেন—"মেরে তাড়াতে হবে। আমাদের অসি কোষমুক্ত হয়েছে আর পেছলে চলবে না।" পুলিনবাবুর উপর পূর্ব বাংলার সমিতি-সংগঠনের ভার প্রদত্ত হইল। কলিকাতার ভার রহিল সতীশবাবুর উপর। বলাবাহুল্য, পি. মিত্র সর্বাধিনায়ক। এই সময় পি. মিত্রের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হইতেছিল। তাহা উভয়ের ব্যক্তিগত সম্পর্ক না হউক উভয়ের অনুরাগীদের দ্বারা ঘটিতেছিল। প্রকৃতপক্ষে মুরারিপুকুরের গুপ্ত আড্ডার অস্ত্রসংগ্রহ, বিপ্লবাত্মক কর্মপ্রয়াস, মজঃফরপুর অভিযান — বারীনবাবুর নেতৃত্বেই হইয়াছিল, সতীশবাবু বা মিত্র মহাশয়ের সাক্ষাৎ সম্পর্ক উহাতে ছিল না এবং দুইটি দল যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িল। পরবর্তী কালে কলিকাতার মূল অনুশীলন সমিতির কর্মপ্রবণতা দেখা যায় না। পি. মিত্রের মৃত্যুর পরে ক্রমশ সংস্থা হিসাবে উহা স্তিমিত হইয়া আসে। কিন্তু এই মূল সমিতির শাখা হিসাবে ঢাকা অনুশীলন সমিতি সুবিস্তৃত হইয়া পড়ে। পরবর্তীকালে অনুশীলন সমিতি বলিতে ঢাকার এই অনুশীলন সমিতিকেই সাধারণত বুঝাইত। এই অনুশীলনই পূর্ব ও উত্তর বাংলায়, কলিকাতায় এবং বাংলার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ে।

"এক উত্তর কলিকাতায়ই অনুশীলনের ৪০/৫০ টি আখড়া ছিল বলিয়া জানা যায়। বস্তুত পুলিশ কলিকাতার বিপ্লবী কর্মী ও নেতাদের পিছনে লাগিয়া ঐ সময়ে তাহাদেরও ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। ঢাকার অনুশীলন, ময়মনসিংহের সুহৃদ ও সাধনা (হেমেন্দ্র আচার্যের দল), বরিশালের স্বদেশ-বান্ধব ও ফরিদপুর ব্রতী সমিতির উপরই ১৯০৯ সালে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। তবে বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাসে অনুশীলন ব্যতীত আর চারটি সমিতির নামই ক্রমে তলাইয়া যায়।"

"১৯১২ সালেই অনুশীলনের সঙ্গে চন্দননগরের মতিলাল রায় ও রাসবিহারী বসুর বিপ্লবী দলের যোগাযোগ ঘটে। অনুশীলনের মাধ্যমেই কাশীর শচীন্দ্রনাথ সান্যালের সহিত রাসবিহারীর পরিচয় ঘটে। ১৯১৩ - ১৪ - ১৫ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে অনুশীলন ও কাশীর দল সম্পূর্ণ মিশিয়া যায়। রাসবিহারীর উত্তর ভারতের সংস্থার সঙ্গে এই সূত্রেই ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটে। ভারতব্যাপী বিপ্লব সাধনের জন্য এই মিলিত দলের প্রয়াসে নেতৃত্ব করেন বিপ্লবী নায়ক রাসবিহারী। এই মিলিত দল সম্পর্কে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল তাঁহার 'বন্দীজীবনে' লিখিতেছেন : — পুলিনবাবু ১৯০৭ সালে নির্বাসিত হন। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভ করেন। মুক্তির অল্পকাল পরেই ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় ধৃত ও দণ্ডিত হইয়া দ্বীপান্তরে ৭ বৎসর আবদ্ধ থাকেন। ১৯১০ সালের পরে পুলিনবাবুর সাক্ষাৎ নেতৃত্ব থাকে না। যাহারা ঢাকা সমিতির নেতৃত্ব স্থানীয় ছিলেন (এই সময়ের নেতৃস্থানীয় নরেন্দ্র সেন, ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, প্রতুল গাঙ্গুলী, অমৃত হাজরা প্রভৃতি) তাহারা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে দেশের বিভিন্ন দল মিলিয়া সম্পূর্ণ একমত হইতে না পারিলে দেশের মঙ্গল নাই। তাই তাহারা দেশের সকল দলের সহিতই মিলিতে ইচ্ছুক হইলেন। সেইজন্যই ঢাকা সমিতি চন্দননগরের দলের সহিত মিলিত হইয়া যায়। কাশীর দলও এই ঢাকা সমিতির মারফতেই রাসবিহারীর উত্তর ভারতের দলের সহিত পরিচিত হয়। এইরূপে আমাদের দল পূর্ব বাংলা হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া একযোগে কাজ করিতে থাকে। লাহোর, দিল্লী, কাশী,

*জয়ন্তী উৎসর্গ : যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ৮০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত।

চন্দননগর ও ঢাকার বিপ্লবী দল এইরূপে সর্বাংশে এক হইয়া যায়। একথা কিন্তু বাংলার অবশিষ্ট বিপ্লবী দল ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারে নাই।'*

বাংলার কয়েকটি গুপ্ত সমিতি :

১. আত্মোন্নতি সমিতি (১৮৯৭)	২৬ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। মধ্য কলকাতার প্রধান কেন্দ্র—ওয়েলিংটন স্কোয়ার। যুক্ত ছিলেন বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি, ইন্দ্রনাথ নন্দী, গিরীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাস চন্দ্র দেব, অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নিবারণ ভট্টাচার্য, হরিশ শিকদার প্রমুখ। দলটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চললেও, বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে 'যুগান্তরে'র সঙ্গে মিলিত হত।
২. সুহৃদ সম্মিলনী (১৯০১)	ময়মনসিংহ ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী। সদস্য ছিলেন কেদারনাথ চক্রবর্তী, ব্রজেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি, অনাথবন্ধু গুহ, হরচন্দ্র চক্রবর্তী, মনোমোহন নিয়োগী, বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রমুখ।
৩. অনুশীলন সমিতি (১৯০২)	কলকাতা ব্যারিস্টার পি. মিত্র—সভাপতি। সতীশচন্দ্র বসু, যাদুগোপাল মুখার্জি, পুলিনবিহারী মুখার্জি, যতীন্দ্রনাথ শেঠ। কবি রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। তিনি এঁদের যুবসংগঠনে উপস্থিত হয়ে স্বদেশি গান পরিবেশন
৪. ফ্রেন্ডস ইউনাইটেড ক্লাব (১৯০২)	কলকাতা রাধিকামোহন রায়
৫. ডন সোসাইটি (১৯০২)	কলকাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
৬. বান্ধব সম্মিলনী (১৯০২)	গোন্দল-পাড়া, চন্দননগর বসন্তকুমার ব্যানার্জি, উপেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, শ্রীশচন্দ্র ঘোষ, অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল।
৭. স্বাস্থ্যকেন্দ্র (১৯০৪)	চিংড়িপোতা, ২৪ পরগণা (দঃ) চিংড়িপোতা গ্রুপ (হরিনাভি) হরকুমার চক্রবর্তী, সাতকড়ি ব্যানার্জি, নরেন্দ্রনাথ

* বাংলায় বিপ্লববাদ—নলিনীকিশোর গুহ

	ভট্টাচার্য (এম. এন. রায়), ভূষণ মিত্র, কালীচরণ ঘোষ, শৈলেন্দ্র নাথ বসু।
৮. ছাত্র ভাণ্ডার (১৯০৪)	কলকাতা ইন্দ্রনাথ নন্দী, নিখিলেশ্বর রায় ভৌমিক।
৯. অনুশীলন সমিতি (১৯০৫)	ঢাকা পি. মিত্র, বিপিনচন্দ্র পালের সহযোগিতায় গঠিত। পুলিন দাসের নেতৃত্বে বৃহৎ সংগঠনে পরিণত হয়। এদের ছিল ৫০০ শাখা। পুলিন দাসের কারাদণ্ডের পর দল পরিচালনা করতেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, নরেন সেন, প্রতুল গাঙ্গুলি ও অমৃত হাজরা।
১০. মুক্তি সংঘ (১৯০৫)	ঢাকা হেমচন্দ্র ঘোষ 'আত্মোন্নতি সমিতি' ও যুগান্তর দলের সঙ্গে সংযোগ ছিল। পরে 'বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স' ও 'শ্রী সংঘ' নামে পরিচিত হয়।
১১. স্বদেশ বান্ধব সমিতি (১৯০৫)	বরিশাল অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, সারদাচরণ সেন, উপেন্দ্রনাথ সেন (জমিদার), গোপালচন্দ্র মহলানবিশ (জমিদার), ডা. নিশিকান্ত বসু, বরিশাল হিতৈষী সম্পাদক দুর্গামোহন সেন, বিরাজমোহন রায় চৌধুরী (জমিদার), শশীকান্ত গুপ্ত। গ্রামাঞ্চলে এদের ১৫৯টি শাখা ছিল।
১২. সেবক সমিতি (১৯০৬ - ০৭)	কুষ্টিয়া, নদীয়া। নবদ্বীপ, নদীয়া। গোয়ারি, নদীয়া। শান্তিপুর, নদীয়া।
১৩. স্বদেশ সেবক সমিতি (১৯০৭)	কলিকাতা ললিতমোহন ঘোষাল
১৪. শক্তি সমিতি (১৯০৭)	রাণাঘাট, নদীয়া
১৫. সাধনা সমাজ (১৯০৭)	ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতি থেকে বেরিয়ে এই দলটি গড়ে তোলেন হেমেন্দ্র আচার্য, কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত, অনাথবন্ধু গুহ,

মোহিনীশঙ্কর রায়, হরেন্দ্রকিশোর আচার্য, যোগেন্দ্র ভট্টাচার্য, কুলচাঁদ দে, পুলিনচন্দ্র ঘোষ এবং কিরণ চন্দ্র বসু।

১৬. যুবক সমিতি (১৯০৮)	কলকাতা
১৭. ব্রতী সমিতি (১৯০৮)	ফরিদপুর অম্বিকাচরণ মজুমদার, কৃষ্ণকুমার মিত্র, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ও ললিতমোহন ঘোষাল।
১৮. সন্তান সম্প্রদায় (১৯০৮)	নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ
১৯. শান্তি সমিতি (১৯০৮)	হেলোড়, মুর্শিদাবাদ
২০. শক্তি সমিতি	আলিপুর ব্রতী সমিতির শাখা
২১. শক্তি সমিতি	কালনা, বর্ধমান
২২. জয়দেব সেবক সম্প্রদায়	রাণীগঞ্জ, বর্ধমান
২৩. জয়দেব সাধক সম্প্রদায়	কেন্দুলি, বীরভূম দামোদর ব্রজবাসী মোহান্ত।
২৪. ইস্ট ক্লাব	সার্কুলার রোড, কলকাতা যতীন্দ্রনাথ ব্যানার্জি (নিরালম্বস্বামী)
২৫. বন্দেমাতরম সম্প্রদায়	কলকাতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, চিত্তরঞ্জন দাস, সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
২৬. পাবনা সম্মিলনী	রঙপুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানে শাখা ছিল। উড়িষ্যাতেও শাখা ছিল। প্রধান উদ্যোগী অবিনাশ চক্রবর্তী, অন্নদা কবিরাজ। প্রথমে পি. মিত্র. পরিচালিত অনুশীলন সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত থাকলেও, পরে অরবিন্দ-বারীন্দ্র-ভূপেন্দ্রনাথের সমিতি'র অন্তর্ভুক্ত হয়।
২৭. মাদারিপুর সমিতি (১৯১২)	ফরিদপুর অনুশীলন সমিতি থেকে বেরিয়ে গঠিত হয়।

এরকম গুপ্ত সমিতির সংখ্যা আরও ছিল। তাছাড়া প্রকাশ্যে বেশ কিছু সংগঠন গড়ে ওঠে যেখানে শরীর চর্চা হত, জনসেবামূলক নানারকম কাজে সারাবছর তারা জড়িয়ে থাকত। এইসব ক্লাব বা সংগঠন গড়ে ওঠে বয়কট আন্দোলনের সূচনাপর্বে। পুলিশ রিপোর্টে বেশ কিছু নাম পাওয়া যায়। কলকাতা'র কয়েকটি সংগঠনের নাম দেওয়া হল :—

১. আহিরীটোলা শক্তি সমিতি	৩৫ আহিরীটোলা স্ট্রিট ললিতমোহন ঘোষাল, অঘোরলাল শীল।
২. অ্যাথলেটিক ক্লাব	২৭ বলরাম মজুমদার স্ট্রিট
৩. বেঙ্গল ইউনাইটেড ক্লাব	৮ জগন্নাথ সেন লেন
৪. রায়বাগান ক্লাব	৩৬/৬ হোগল কুড়িয়া লেন।
৫. মডেল অ্যাথলেটিক অ্যাসোসিয়েশন	৩৯/৫ ছিদাম মুদি লেন।
৬. হরিদাস দত্তের আখড়া	১০২/২ মেছুয়াবাজার স্ট্রিট; কলকাতা।
৭. কালিদাস সিংহের আখড়া	কালিদাস সিংহ লেন; কলকাতা।
৮. বন্দেমাতরম সম্প্রদায়	১২১/১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট; কলকাতা।
৯. শক্তিসমিতি	১৫ নন্দরাম সেন লেন; কলকাতা।
১০. ব্রতী সমিতি	৬ কলেজ স্কোয়ার; কলকাতা।
১১. স্বদেশ সেবক সমিতি	৩৬ আহিরীটোলা স্ট্রিট; কলকাতা।
১২. যুবক সমিতি	২৩/১ নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রিট; কলকাতা।
১৩. আত্মোন্নতি সমিতি	১১৩/১ বহুবাজার স্ট্রিট; কলকাতা।
১৪. অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি	৪/১ কলেজ স্কোয়ার; কলকাতা।
১৫. ফিল্ড অ্যান্ড আকাদমি	১৬ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট; কলকাতা।
১৬. অনুশীলন সমিতি	৪৯ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট; কলকাতা।
১৭. আর্যকুমার সমিতি	৪ মল্লিক লেন, ভবানীপুর—ব্যারিস্টার পি. মিত্র; কলকাতা
১৮. শান্তি শিক্ষা সমিতি	রসা রোড, কালীঘাট; কলকাতা। *

এ তো গেল কলকাতার সংগঠন প্রসঙ্গ। কলকাতার বাইরে, বিভিন্ন জেলাগুলির বহু সংগঠনের উল্লেখ আছে পুলিশ রিপোর্টে। সেগুলির ওপর চোখ বোলালে বোঝা যাবে, পরিস্থিতি তখন কতটা জটিল হয়ে উঠেছিল।

হাওড়া

এই জেলায় বহু আখড়া সমিতি গড়ে ওঠে। তার মধ্যে সব থেকে সক্রিয় ছিল উলুবেড়িয়ার অনুশীলন সমিতি শাখা। ভবানীপুর সেবক সম্প্রদায়ের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য।

চব্বিশ পরগণা

জেলার আয়তন ছিল যেমন বিশাল, সংগঠন সংখ্যাও ছিল যথেষ্ট। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সমিতি ছিল :

সুহৃদ সমিতি — আলমবাজার	শান্তি সখা সমিতি—বারাকপুর
যুবক সমিতি — মাদারহাট	পল্লি সমিতি, ডায়মন্ডহারবার
সর্বজনিক হিতকারী সভা—ডায়মণ্ডহারবার	অন্নপূর্ণা সমিতি — বারুইপুর

* ইতিহাস নানাবিধ—লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

আর্য শক্তি সভা — খড়দহ সন্তান সমিতি — সরিষা

চব্বিশ পরগনার যে ২০টি সমিতির নাম পাওয়া যায়, তার কয়েকটি ছিল অনুশীলন সমিতি অনুমোদিত। শান্তিসখা সমিতি ছিল কালিঘাটের শান্তিসখা সমিতির শাখা।

হুগলি

কলকাতার বিভিন্ন সমিতির অনুমোদনে বেশ কয়েকটি সমিতি ও আখড়া গড়ে ওঠে। তার কয়েকটি ছিল এইসব স্থানে :

বালি চুঁচুড়া
চন্দননগর কোন্‌নগর
রিষড়া শ্রীরামপুর
তারকেশ্বর খানাকুল

পুলিশ রিপোর্টে প্রায় ২০টি সমিতির উল্লেখ থাকলেও তা আলিপুর বোমা মামলার পরে সবই প্রায় বন্ধ হয়ে যায়।

মেদিনীপুর

জেলায় সব থেকে বেশি সমিতি ও আখড়া ছিল তমলুক ও কাঁথিতে। তার কয়েকটি হল :

বন্দেমাতরম সভা
স্বদেশী সভা — ঝিনুকখালি, মোহাটি
শক্তি সমিতি — চণ্ডীবাটি

মেদিনীপুর শহরে ছিল ৪টি সমিতি :

শালোটি সমিতি
বসন্ত মালতী
শেখর
সন্তান সমিতি
সন্তান সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

যশোহর

পুলিশ রিপোর্টে ২৮টি পল্লী সমিতি ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের উল্লেখ আছে। সব থেকে সক্রিয় তিনটি সমিতি ছিল .

স্বদেশি সমিতি — লোহাগড়
সন্তান সম্প্রদায় — ব্রাহ্মণডাঙা
সেবক সমিতি — বলরামপুর

খুলনা

কলকাতার অনুশীলন সমিতির কয়েকটি শাখা ছিল এই জেলায়। এদের উদ্যোগে কয়েকটি জাতীয় বিদ্যালয় ও জাতীয় পাঠশালা স্থাপিত হয়। এই জেলায় শরীর চর্চার জন্য ১১টি আখড়া গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কয়েকটি হল :

প্রতাপ সমিতি — মহেশ্বরপাশা
অলকা সমিতি — ফুলতলা
স্বদেশি সমিতি — নোয়াপাড়া
স্বদেশি দল — মূলঘর।

পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বরিশালে ১৫টি, ময়মনসিংহে ৪টি এবং ফরিদপুরে ১৭টি

সমিতি গড়ে ওঠে। ওপরের তালিকা থেকে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় পূর্ব বাংলায় সংগঠনগুলি ছিল অনেক শক্তিশালী এবং রাজনীতি সচেতন। *

ওপরে যে সমিতির নামোল্লেখ করা হয়েছে এদের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা, ব্যাপক জনসংযোগ এবং সক্রিয়া ভূমিকা ইংরেজ সরকারের আতঙ্কের কারণ হয়ে উঠেছিল। তারা এতটাই ভীত হয়ে ওঠে যে, ১৯০৯ সালে আইন করে পূর্ব বাংলার পাঁচটি সমিতিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

শরীর চর্চাকে সামনে রেখে, সমিতি বা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলি ছিল বহু উদ্দেশ্যসাধক। সদস্যদের কঠোর নিয়মানুবর্তিতার মধ্য দিয়ে নিজেদের সংগঠনের উপযোগী কর্মী হিসাবে গড়ে তুলতে হত। আর সেই নিয়মানুবর্তিতা ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালনীয়। এই ধর্মীয় প্রভাবের অন্যতম কারণ মূল সংগঠনের উদ্যোক্তা বা প্রতিষ্ঠাতাদের অনেকেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ মানুষ। সাধারণ মানুষও তখন ছিল ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান। আজকের মত ধর্মীয় চেতনামুক্ত রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ছিল না। দেশসেবাকে তখনকার সাধারণ মানুষ ধর্মাচরণের অঙ্গ হিসাবে উপলব্ধি করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনেও তার কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতেন। গীতা, উপনিষদ, আনন্দমঠের প্রভাব ছিল সব থেকে বেশি।

লাডলীমোহন রায়চৌধুরী তাঁর আলোচনায় পুলিশের গোপন ফাইলে নথিবদ্ধ বিবরণ থেকে ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও ফরিদপুরের ব্রতী সমিতির সদস্যপদ গ্রহণের সময়কার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের উল্লেখ করেছেন। সদস্যপদ গ্রহণের সময় স্বেচ্ছাসেবীদের ঈশ্বরের নামে শপথ করতে হত, তাঁরা মাদক দ্রব্য গ্রহণ করবেন না। ধর্ম ও বর্ণাশ্রম নিয়ম শাসিত সমাজবিধি অক্ষুণ্ণ রাখবেন। তারা দুঃস্থ, আতুর ও নারীদের সেবার মাধ্যমে জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন লাভে সচেষ্ট থাকবেন। নিজেদের ও ব্যক্তিগত সম্পদ ও সম্পত্তি স্বদেশের সেবায় উৎসর্গ করবেন। উপার্জনের এক চতুর্থাংশ চাঁদা দিতে হত সমিতির তহবিলে। ময়মনসিংহের সাধনা সমাজে সদস্যপদ গ্রহণের আগে সদস্যদের ব্যক্তিগত সদাচারের শপথ নিতে হত। ডায়েরি থাকত প্রতিটি সদস্যদের কাছে। ডায়েরিতে প্রতি দলের কাজের হিসাব নথিবদ্ধ করতে হত। ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতির সভ্যদের স্বদেশ চিন্তা ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ নিয়মিত পাঠ করতে হত। প্রতি শনিবার হত আলোচনা সভা। সেখানে দেশ ও জাতির সমস্যা নিয়ে সমিতির সদস্যরা এবং বহিরাগত বক্তারা বক্তব্য রাখতেন।

বিভিন্ন সমিতির নানাবিধ সমাজসেবামূলক কর্মসূচী ছিল। তার অন্যতম ছিল দুর্গত ও আর্ত মানুষের সেবা। বন্যা, খরা দুর্ভিক্ষের সময় তাদের সহায়তায় বহু মানুষের প্রাণরক্ষা হত। এ ব্যাপারে অনুশীলন সমিতির কর্মোদ্যোগ ছিল উল্লেখযোগ্য। এর ফলে ব্যাপক জনসংযোগ ঘটত। কোন কোন সমিতি দাতব্য চিকিৎসালয়ের দুঃস্থ ও আতুর মানুষদের মধ্যে বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণ করত। সেখানে ডাক্তার ও নার্স থাকত। রোগীদের বাড়িতেও তারা যেত চিকিৎসার প্রয়োজনে। বিভিন্ন পেশায় আগত অসংখ্য মানুষের সেবা কাজে নিযুক্ত হত সমিতির স্বেচ্ছাসেবীরা। গ্রামাঞ্চলে শিক্ষার প্রসারে বিভিন্ন সমিতি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। এমনকী তারা জাতীয় শিক্ষার কর্মসূচী-গ্রহণ করে। বহু গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল। সাধারণ শিক্ষার্থী প্রাপ্তবয়স্ক ও শ্রমিক শ্রেণির জন্য নৈশ বিদ্যালয় এবং বয়স্ক শিক্ষা শিবির পরিচালনা করত কোন কোন সমিতি।

স্বদেশি আমলে বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। স্বদেশি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়ে অর্থনৈতিক জীবনধারার নবায়নে বিভিন্ন সমিতি উদ্যোগ নিয়েছিল। মাটির নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি, মাদুর, কাঁসার বাসন, বস্ত্রাদি তৈরি, সুতাকাটা, সেলাই শিল্প, ছুরি, কাঁচি, সাবান, জুতো, নানাবিধ দ্রব্য উৎপাদনে সহায়তা করা হত। স্বদেশি পণ্যের প্রসার এবং যোগান অব্যাহত রাখতে

* ইতিহাস নানাবিধ—লাডলীমোহন রায়চৌধুরী

সমিতিগুলি নজরদারিও করত। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছিল সমিতি। গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দেওয়া জমিতে একটি কৃষিখামার তৈরি হয়েছিল।* সেকালে মামলা মোকদ্দমায় বিস্তর টাকা পয়সা খরচ হত। গ্রামাঞ্চলে সালিশী ব্যবস্থার প্রবর্তন করে বিভিন্ন সমিতি এবং তা যথেষ্ট কার্যকরী হয়েছিল। যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরাই বিচার করতেন এবং সকলে তা মেনেও নিত। পুলিশ রিপোর্ট থেকে জানা যায় ১৯০৮ সালে স্বদেশি বান্ধব সমিতির তত্ত্বাবধানে ৮৯টি সালিশী কমিটি ৫২৩ টি বিবাদের মীমাংসা করেছিল। বিদেশি আদালত পরিহার করে, সাধারণ মানুষ সেদিন উপকৃত হয়েছিল। স্বদেশি শিল্প বিকাশের যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা বাঙালি মানসিকতায় এক বিরাট পরিবর্তন ঘটায়।

কিন্তু বিভিন্ন জেলায় যে সব সমিতি গড়ে উঠেছিল, তার সদস্যপদ কারা গ্রহণ করত? শিক্ষক, অধ্যাপক, পুরোহিত, আইনজীবী, ডাক্তার, কবিরাজ, দোকানদার, ছোট খাট ব্যবসায়ী, স্থানীয় জমিদার, সরকারি কর্মচারী, স্কুল ছাত্র, কংগ্রেস কর্মকর্তা, ব্রাহ্ম কিছু কর্মী এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও জননেতা এইসব সমিতিতে যুক্ত ছিলেন। ছাত্র সমাজের ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল স্বদেশি আন্দোলনে। সমিতিগুলির সঙ্গে স্থানীয় স্কুল-কলেজের সংযোগ থাকত। যে কারণে, সেইসব শিক্ষায়তন থেকে ছাত্রদের সদস্য হিসাবে গ্রহণ করা হত। বিদ্যালয়ের ৮ বছর বয়স্ক বালকদেরও কোন কোন সমিতি দলের কর্মী হিসাবে গ্রহণ করত। পুলিশ রিপোর্টে আছে বিভিন্ন অঞ্চলের কয়েকটি সমিতির সঙ্গে স্থানীয় শিক্ষায়তনের যোগাযোগের কথা। দেখা গেছে, একসময় যাদের সমাজের নিচুতলার মানুষ হিসাবে গণ্য করা হত, অর্থাৎ সে হিন্দুমুসলমান যেই হোক না কেন সমিতির সদস্য পদ তারা বিশেষ কেউ গ্রহণ করে নি, অথবা তাদের দলে নেওয়া হয়নি। একমাত্র ভদ্রলোক বাড়ির ছেলেদের জায়গা হত সমিতিতে।

প্রতিটি সমিতির উদ্দেশ্য ছিল মহৎ। স্বদেশের মুক্তিযজ্ঞে তাদের ভূমিকা অনুল্লেখ্য নয়। কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এই সব সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, তা পুরোমাত্রায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। এর অন্যতম কারণ, তাদের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ছিল না। যে যার মত কাজ করত। কিন্তু সম্মিলিত উদ্যোগে যে বৃহৎ সাফল্যের সম্ভাবনা, তা কখনও বাস্তবায়িত হয়নি। একই জেলায় একাধিক সমিতি কাজ করত। কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন ছিল না। এ হল স্বদেশি আন্দোলনে অন্যতম দুর্বলতম দিক।

স্বদেশি ভাবনা ও স্বদেশি আন্দোলন প্রসঙ্গে গোপাল হালদারের আত্মচরিতে উল্লেখ আছে: "স্বদেশীর দলে ঢুকলাম — না হল দীক্ষা, বা বিশেষ কোন অনুষ্ঠান।

"এ প্রসঙ্গেই আর দু-একটা কথা বলা দরকার। বাংলা দেশে একটা কথা বিশেষ প্রচলিত। মনে পড়ে, রাউলাট কমিশনের রিপোর্টেও সে মর্মের কথা পড়েছি। সাম্যবাদ পত্র-পত্রিকাতেও একালে কথাটা অকাট্য বলে অধিক প্রচারিত। যথা, 'টেররিস্ট' দলগুলো তাদের সদস্য সংগ্রহ করত কালীপূজা করে। নানা রূপ ক্রিয়া-প্রক্রিয়াও ছিল তার অঙ্গ—রক্তের ফোঁটা কপালে এঁকে মন্ত্র পড়ে সদস্যদের হত দীক্ষা। — হয়তো তা হত কোনো কোনো দলে, কোনো এক কালে। আমি কিন্তু দলে যে গৃহীত হলাম তা ফোঁটা-চন্দন, পূজা-হোম কিছু করে নয়। কোনো অনুষ্ঠান আয়োজনই ছিল না। প্রতিজ্ঞাপত্রেও সই করতে হয় নি, শপথও না। বরং একথাই একবার শুনেছিলাম বড়োদের মুখে, অনুষ্ঠান দিয়ে মানুষকে বাঁধা যায় না। বন্ধন-স্বদেশপ্রীতির, নীতিবোধের, ধর্মবোধের।" হয়তো যে-বিশেষ দলে আমি অন্তর্ভুক্ত হই তাঁদেরই ওই বিশেষ মত ও বিশেষ নিয়ম। দলটা ছিল বরিশালের শঙ্কর মঠের সঙ্গে যুক্ত। স্বামী প্রজ্ঞানন্দ সরস্বতী তাঁর প্রতিষ্ঠাতা—এখন 'সরস্বতী প্রেস', 'সরস্বতী লাইব্রেরী' তাঁরই নামাঙ্কিত। ধর্মের ঝোঁক এ দলেও ছিল প্রবল,

* সরলা দেবী চৌধুরাণীর লেখা পড়ুন। পৃ. ৫২৫

দেব-দেবীতে অনাস্থা নেই, পূজা-হোমেও না। কিন্তু স্বামীজী অদ্বৈতবাদী, 'বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস' তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রমাণ। তাঁর শিষ্যরাও ওই কারণেই অনেক আনুষ্ঠানিক উৎকটতায় আস্থাহীন। কথাটা তাই এই—ও রূপ একান্ত সাম্প্রদায়িক দীক্ষা স্বদেশি দলে সর্বগ্রাহ্য বা সর্বত্র প্রচলিত ছিল না। বিপ্লববাদের ইতিহাস লেখকদের সে কথাটা বলা উচিত। আলোচকদেরও জানা প্রয়োজন। অবশ্য, গীতার ওপর শ্রদ্ধা প্রচলিত হত; তা পাঠ ছিল বাধ্যতামূলক না হলেও প্রায় সার্বজনীন। বিবেকানন্দের কর্মযোগ ও সেবাধর্মের সঙ্গে নব্যহিন্দুত্বের হাওয়াও স্বদেশিচক্রে প্রবল বইত। স্বাস্থ্য, সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা প্রভৃতি চর্চার জন্য আবার জোর দেওয়া হত ব্রহ্মচর্য, সাদাচার, ভগবদ্‌ভক্তির ওপর। 'সম্পূর্ণ সেক্যুলার' নয়, বরং একটু বেশি রকমেই হিন্দু ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত; তবে সে হিন্দু-ঐতিহ্য বিবেকানন্দ-মার্কা।

"দ্বিতীয় কথাটাও সত্য : 'ডাকাতি' ও 'হত্যা' এই বিশেষ 'টেররিস্ট' কর্মপদ্ধতি বিপ্লবীদের পেয়ে বসেছিল। শুনেছি স্বয়ং অরবিন্দ প্রথম 'টেররিস্ট' উদ্যোগের পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু পি. মিত্র প্রভৃতি গোড়ার অনুশীলনবাদীরা তা চাইতেন না। পরে সব ওলট-পালট হয়ে যায়। তবু কোনো কোনো দলের উদ্দেশ্য ছিল, গুপ্ত আয়োজন সম্পূর্ণ হলে প্রথম বিদ্রোহ, ক্রমে গেরিলাযুদ্ধ। যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের মত এ সম্বন্ধে ছিল সুদৃঢ়। নিজেদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও তবু কার্য পরম্পরায় ডাকাতি গুপ্তহত্যা প্রভৃতির গ্রাসে গিয়ে পড়েছে সকল স্বদেশি দলগুলো। বার বার তা থেকে নিবৃত্ত হতেও চেয়েছে। কিছুদিনের মতো হয়েছে, আবার পথ না পেয়ে সেই পদ্ধতির শরণ নিতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু স্বদেশি গুপ্ত আন্দোলন সমগ্রভাবে কোনো একটি কেন্দ্রীয় সমিতির দ্বারা চালিত হয়নি—ভারতবর্ষেও না, বাংলায়ও না। এমন কি শুধু দুটি সমিতি—'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' — তা চালিয়েছে, এমনও নয়। কাজেই কার্যধারায়ও ছিল বিভিন্নতা। দীর্ঘ ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বছরে পর্বে পর্বে সে-সবের পরিবর্তনও হয়েছে। সদস্য বদল হয়েছে। দলের চরিত্র পরিবর্তিত হয়েছে। আদর্শ বিবর্তিত হয়েছে। কার্যপদ্ধতিও একরূপ থাকে নি। ''রিভোল্যুশনারি ন্যাশনালিজম'' থেকে সোসালিজম-এর দিকেই বিবর্তন— মোটামুটি কাজেই শুধু 'টেররিজম্' বললেও তার নীতির প্রতি সুবিচার হবে না। এ আন্দোলনের কথা বলতে হলে—বলা উচিত—''জাতীয় বিপ্লববাদ', 'মিলিট্যান্ট ন্যাশানালিজম্', 'বিপ্লবী গুপ্ত আন্দোলন',—এরূপ কিছু বলাই সমীচীন—'টেররিজম্' নয়।'*

*রূপনারানের কূলে—১ম খণ্ড—গোপাল হালদার। পৃ ৮৭-৮৮

সন্ধিক্ষণের মুহূর্তে : ১৯০৫

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। নিয়মতান্ত্রিক স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদি রূপকারদের অন্যতম সুরেন্দ্রনাথ সমকালীন ঘটনাবলীর ও রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের (১৮৭০ থেকে ১৯২০) বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাঁর আত্মচরিত "A Nation in Making" গ্রন্থে। বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলন, অসহযোগ ও স্বরাজ আন্দোলনের সূচনাকালের আকর্ষণীয় বিবরণ নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ। সংক্ষেপে তাঁর রচনা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশে এখানে উল্লেখ করা হল, সমকালীন পরিবেশ ও পরিস্থিতি উপলব্ধিতে যা আজও অপরিহার্য।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

১৯০৫ সাল। বঙ্গভঙ্গের বছর। কিছুদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল, একজন শাসনকর্তার পক্ষে বঙ্গদেশ আয়তনে যথেষ্ট বড়। এর আগে ১৮৭৪ সালে একই কারণে বাংলাদেশ থেকে আসামকে বিচ্ছিন্ন করে স্বতন্ত্র প্রশাসন ব্যবস্থা হয়, একজন চীফ কমিশনারের অধীনে। এর সঙ্গে বাংলা ভাষা-ভাষী সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়া যুক্ত হয়েছিল। তখন জনসাধারণ সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ না হওয়ায় এই পৃথকীকরণ-বিরোধী আন্দোলনও দানা বাঁধে নি। নিজের স্বার্থের কারণে, আসামের মানুষ এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যে দেশভাগের পরিকল্পনাকে আরও বিস্তৃত রূপ দানের উদ্যোগ দেওয়া হল। আসাম প্রদেশকে আরও বড় প্রদেশ তৈরির উদ্দেশ্যে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরাসহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বাংলার জনমত প্রবল বিরোধিতা শুরু করে। কিন্তু ব্যাপক জনবিরোধিতায় প্রস্তাবটিকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হলেও বাতিল করা হল না। সরকার থাকল সময় ও সুযোগের অপেক্ষায়।

এমন সময় লর্ড কার্জন নিজস্ব প্রশাসনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিতে উদ্যোগী হয়ে ভারতের মানচিত্র বদলে দিতে চাইলেন। আগের সেই অমীমাংসিত প্রস্তাব চট্টগ্রামকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার বিষয়টিকে তিনি সজীব করে তুললেনই কেবল নয়, তার সঙ্গে যুক্ত করলেন ঢাকা ও ময়মনসিংহ সহ সমগ্র চট্টগ্রাম বিভাগ, যা যুক্ত হবে আসামের সঙ্গে। বাংলার হিন্দুমুসলমানসহ সব শ্রেণির মানুষ এই প্রস্তাবের বিরোধিতায় সোচ্চার হয়ে উঠল। সরকার সতর্ক হল। পূর্ববাংলার নেতাদের বেলভেডিয়ারে কনফারেন্স ডেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন ছোটলাট স্যার এন্ড্রু ফ্রেজার। কনফারেন্সের আয়োজক ছিল নবগঠিত ভূম্যধিকারী সমিতি। এই সমিতির প্রধান ছিলেন মিঃ এ. চৌধুরী। পরে তিনি স্যার উপাধি পেয়েছিলেন। মিঃ চৌধুরী আমাকে কনফারেন্সে যোগদানের প্রস্তাব করলেও, আমি ঐ সমস্ত আলোচনায় অংশগ্রহণ করিনি। কোন দায়িত্বও নেইনি।

আমার ধারণা ছিল সরকার জনমতের কাছে নতিস্বীকার করবেন। কিন্তু তা হল না। এই সময় লর্ড কার্জন পূর্ববাংলা ভ্রমণে গেলেন। জনমত যাচাই নয়, তার আসল উদ্দেশ্য ছিল জনগণকে ভীতিপ্রদর্শন। তিনি বুঝতে পারেন নি, তার নীতিই জনগণের মধ্যে এক নবশক্তির উদ্বোধন ঘটিয়েছিল। পূর্ববঙ্গের নেতাদের তিনি স্বমতে আনতে পারলেন না। ময়মনসিংহের জমিদার সূর্যকান্ত আচার্যের তিনি আতিথ্য নিয়েছিলেন। সূর্যকান্ত তাঁকে যথাযোগ্য সমাদর করলেও, বঙ্গভঙ্গ

বিরোধী বক্তব্যকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন এবং বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে স্বমতে স্থিরপ্রজ্ঞ ছিলেন।

কিন্তু কার্জন দেশ বিভাগ পরিকল্পনা আরও সম্প্রসারিত করলেন। সমগ্র উত্তরবঙ্গসহ ফরিদপুর ও বরিশাল জেলাকে পরিকল্পনাভুক্ত করলেন। কিন্তু সব ব্যবস্থাই জনগণের কাছ থেকে গোপন রাখা হল। বেলভেডিয়ারে যে সমস্ত সম্মেলন হয়েছিল, সেখানে জনমতকে মর্যাদা দেওয়ার কথা বলা হলেও, কার্যত তা হয়নি। আসলে জনমতকে স্বীকৃতি জানাবার কোন অভিপ্রায় তাদের ছিল না। লর্ড কার্জন ও এন্ড্রু ফ্রেজার আশা করেছিলেন, তারা নেতাদের স্বমতে আনতে পারবেন। কিন্তু তা হয়নি। এই কাজে ব্যর্থ হয়ে একটি গোপন দলিলে তা লিপিবদ্ধ হল। জনগণ কিছুই জানতে পারে নি। লর্ড কার্জন পূর্ববঙ্গ থেকে ফিরে আসবার পর বঙ্গভঙ্গের পরিকল্পনা ব্যাপারে সরকারি নীরবতায় ধারণা হয়েছিল, সম্ভবত সরকারিভাবে পরিকল্পনাটি পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন গভীর সংগোপনে সব কাজ সমাধা হয়েছিল।

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল, বাংলাদেশ বিভক্ত হচ্ছে। জনসাধারণ এই প্রথম জানতে পারল, যাবতীয় ঐতিহ্যসহ সমগ্র উত্তরবঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এই ঘোষণায় ঘটল ব্যাপক জনবিস্ফোরণ। নেতৃবৃন্দ হতভম্ব হলেও নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর প্রতিরোধে সচেষ্ট হলেন। পরিকল্পনা রদ করা সম্ভব না হলেও, সংশোধনে সচেষ্ট হওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আমরা বুঝতে পেরেছিলাম আমাদের সঙ্গে চালাকি করা হয়েছে, ইচ্ছাকৃত ভাবে আঘাত হানা হয়েছে। বাংলা ঐক্যবদ্ধ ও আত্মসচেতন জনগণকে ধ্বংস করাই ছিল তাদের লক্ষ্য। প্রশাসনিক গুরুত্ব থেকে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই প্রাধান্য পেয়েছিল। ফলে ভবিষ্যৎ বিপর্যস্ত হবে, রাজনৈতিক উন্নয়ন বিধ্বস্ত হবে। হিন্দু-মুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতের উন্নতির অপরিহার্য অঙ্গ। তা ধ্বংস হবে। কারণ, সরকারিভাবে বলা হয়েছিল পূর্ববঙ্গ ও আসাম হবে একটি মুসলমান প্রদেশ। নবগঠিত প্রদেশে এই ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্যই প্রাধান্য পাবে।

নেতারা সময় নষ্ট না করে, পাথুরিয়াঘাটায় যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রাসাদে আলোচনায় সম্মিলিত হলেন। আলোচনা সভায় মহারাজ স্বয়ং যোগ দেন। আসতেন কলকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার এইচ. ই. এ. কটন, স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদক মি. র‍্যাটক্লিফ এবং ইংলিশম্যান পত্রিকার সম্পাদক মি. ফ্রেজার ব্রেয়ার। কলকাতায় অ্যাংলোইণ্ডিয়ান সম্প্রদায় প্রথম দিকে দেশ বিভাগের নিন্দা করলেও, পরবর্তী সময়ে তা বদলে যায়। মহারাজার বাড়ির সম্মেলনে স্থির হয়, মহারাজা ভাইসরয়কে টেলিগ্রাফ করে দেশ-বিভাগ পুনর্বিবেচনার অনুরোধ জানাবেন। দেশ বিভাগ যদি একান্তই অপরিহার্য হয়, তবে বাংলা ভাষাভাষী জনগণ সেই প্রশাসনিক ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ হবে। বাংলা ভাষাভাষীদের এক প্রদেশে এবং অন্যদের স্বতন্ত্র প্রদেশে রাখলে এতো জটিলতার সৃষ্টি হত না। কিন্তু একথা মেনে নেওয়ার মানুষ ছিলেন না কার্জন।

সম্মেলন মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্তের বাড়িতেও বসত। সেখানে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ৭ আগস্ট টাউন হলে দেশ-বিভাগ বিরোধী আন্দোলনের সভা হবে। মফস্বলে প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য নিমন্ত্রণপত্রও পাঠান হয়। ব্যাপক সাড়া পড়ে গেল। ৭ আগস্ট কী কী প্রস্তাব নেওয়া হবে সে বিষয়ে কয়েকটি বৈঠক হয়। বৈঠকে পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের নেতৃবৃন্দ যোগ দেন। আলোচনায় একটি মত বিশেষভাবে দানা বাঁধে, তা হল এরকম জনসভা থেকে কোন সুফল পাওয়া যাবে না। কার্জন জনসাধারণের ধ্যানধারণায় অবজ্ঞা প্রকাশ করেছেন। প্রকাশ্যভাবেই তিনি যে জনগণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, তার বিরুদ্ধে এমন কিছু করা দরকার যার মধ্যে জনগণের ঘৃণা ক্ষোভ সঠিকভাবে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তখন ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের বাড়িতে প্রতিদিন সভা হত।

২. বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলন

এরকম আলোচনার মধ্য দিয়ে বয়কট আন্দোলনের জন্ম। কিন্তু বর্জন আন্দোলনের উদ্ভাবক

কে তা বলা কঠিন। পাবনা জেলার একটি জনসভায় প্রথম বিলেতি দ্রব্য বর্জন কথাটি প্রকাশ পাওয়ার পর, অন্যান্য মফঃস্বল শহরেও তার প্রতিধ্বনি শোনা যায়। বর্জন আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্ব পায় শিল্প-আন্দোলন। আগেই গড়ে উঠেছিল স্বদেশি আন্দোলন। এই ব্যাপারে আমার দুর্বলতার দিকটি ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। সুতরাং বয়কট আন্দোলন যেমন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবে, তেমনি শিল্প-বিকাশের পথটিও প্রশস্ত করবে।

'বয়কট' নিয়ে আমাদের আলোচনা চলতে থাকে। আমরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত হয়েছিলাম, জনমন যেভাবে প্রজ্বলিত হয়েছে, তাতে বয়কট আন্দোলন জনসমর্থন লাভ করবে। আন্দোলনের পরিণতি প্রমাণ করে আমাদের পূর্ব ধারণা ছিল যুক্তিযুক্ত। এই আন্দোলন সম্পর্কে আমাদের ইংরেজ বন্ধুরা কী ভেবেছেন, কতখানি সমর্থন করবেন—তা যাচাই করে দেখার ভার পড়ে আমার ওপর। আমি আগে থেকেই জানতাম কলকাতায় এমন অনেক ইংরেজ আছেন, যারা দেশ বিভাগকে সমর্থন করেন নি। তারা আমাদের পরামর্শ দিয়েছেন, নৈতিক সমর্থন জানিয়েছেন। তারা বিরূপ হতে পারেন, এমন কাজ আমরা করব না। কারণ তাদের সহানুভূতি আমাদের উপকার করেছে। আমরা ভারত সরকারের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ জনমতের কাছে আবেদন করতে যাচ্ছি, এটা আমাদের মাথায় ছিল। সুতরাং আন্দোলনকে ব্রিটিশ জনগণ কী চক্ষে দেখছেন, তাও আমাদের একটি প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ছিল। অবশ্য প্রথম দিকে আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী ছিল না। আন্দোলন যখন ক্রমবর্ধমান তখনও তা ব্রিটিশ বিরোধী রূপ পায়নি। কিন্তু সরকার আন্দোলনকে ব্রিটিশ বিরোধী রূপ দিতেই তৎপর ছিল। সে কারণে ব্রিটিশ জনমতের মতামত জানার ওপর আমরা গুরুত্ব দিয়েছিলাম। এ ব্যাপারে সংগঠকরা সাবধানতা ও সতর্কতার পথে এগিয়েছিলেন। আমি কলকাতার ইংরেজ বন্ধুদের সঙ্গে গোপনে দেখা করে মতামত জেনেছিলাম এবং তারা প্রস্তাবিত কার্যক্রম গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। শেষ বৈঠক হল মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্যর বাড়িতে। সেখানে চূড়ান্ত ভাবে প্রস্তাবের খসড়া তৈরি হল। প্রস্তাব ছিল :—

> "যে পর্যন্ত দেশ বিভাগ সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার না করা হচ্ছে, সে পর্যন্ত ব্রিটিশ জনগণের ঔদাসীন্যের এবং তারই ফলে ভারতীয় জনমতের প্রতি ভারত সরকারের উপেক্ষা প্রদর্শনের প্রতিবাদে মফস্বলের নানা স্থানে ব্রিটিশ পণ্যসামগ্রী বর্জনের গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রতি এই সভা তার পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করছে।"

বোঝা যাচ্ছে, বয়কট ছিল একটি সাময়িক কর্মপদ্ধতি। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হলেই তা প্রত্যাহৃত হবে। এই আন্দোলনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল বাংলার মানুষের অভিযোগের প্রতি ব্রিটিশ জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। দেশ বিভাগের পরিকল্পনা সংশোধিত হলে বয়কট প্রত্যাহার করা হবে। অবশ্য অঙ্গীকার পালন করা হয়েছিল। বয়কটে কখনো কখনো যে বাড়াবাড়ি ঘটেছিল, তার পিছনে ছিল নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা।

বয়কট প্রস্তাবটি উত্থাপনের ভার দেওয়া হয়েছিল "ইণ্ডিয়ান মিরর" সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর ওপর। এই মানুষটি দীর্ঘ দিন দেশের জন্য সংগ্রাম করে সকল শ্রেণীর মানুষের সম্মান অর্জন করেছিলেন। কিন্তু সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি ছিল তার উদ্বেগ ও আতঙ্ক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অন্যতম প্রবক্তা দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশের মুহূর্তে সরকারি অর্থ গ্রহণ করে স্বদেশবাসীর নিন্দাভাজন হয়েছিলেন।

আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নামে সরকার সমস্ত পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছিল। সরকারি সিদ্ধান্তে গভীরভাবে চঞ্চল হয়ে উঠেছিল ছাত্রসমাজ। জাতীয় আন্দোলনে সহযোগিতার জন্য আমি যুবসমাজের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলাম। তাদের তীব্র উত্তেজনার কথা আমি জানি। দেশ-বিভাগ তাদের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। বঙ্গ-ভঙ্গ রদ আন্দোলন অপেক্ষা তারা অবশ্য "স্বদেশি" আন্দোলন গড়ে তুলতে গভীর মনোযোগী হয়ে পড়েছিল। তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা ছিল অসীম।

স্কুল বা কলেজের ক্লাশে বিদেশি কোন কাপড় পরে যাওয়া ছিল খুবই ভয়ের ব্যাপার। বিদেশি কাগজে তৈরি পরীক্ষার খাতা তারা গ্রহণ করত না। রিপন কলেজিয়েট স্কুলে চতুর্থ শ্রেণীর একটি ছাত্র বিদেশের কাপড়ে তৈরি জামা গায়ে স্কুলে আসে। অন্য ছাত্ররা পিছন দিক থেকে তার জামা ছিঁড়ে দেয়। রিপন কলেজে একবার বিদেশি কাগজে তৈরি উত্তরপত্র দেওয়া হলে ছাত্ররা তা গ্রহণ করে নি। ছাত্রদের উগ্র মনোভাব দেখে, দেশি কাগজের ব্যবস্থার পর, পরীক্ষা যথারীতি চলতে থাকে।

ছাত্রদের এই মানসিকতা সাধারণ মানুষের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এমন কী মেয়েদের হৃদয়ও প্রভাবিত হল ব্যাপক ভাবে। ছাত্ররাই ছিল এই নৈতিক পরিবর্তনের স্রষ্টা। আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেল 'স্বদেশি'! 'স্বদেশি'! 'স্বদেশি'—এই মনোভাবে। চারদিকে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর পরিস্থিতি। গণচেতনার বিরাট পরিবর্তন উত্তেজনায় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, বৃদ্ধ, যুবক, ধনী, দরিদ্র, শিক্ষিত, অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর মানুষ। এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে যেন তারা আন্দোলিত। কোন যুক্তি, বিচার-বিবেচনার বালাই ছিল না, একটা প্রবল শক্তিশালী আবেগে সমাজ জীবন ভেসে গিয়েছিল।

একথা মনে রাখা দরকার, স্বদেশি আন্দোলন বঙ্গ-ভঙ্গ রদ অভ্যুত্থানের মধ্য থেকে জন্ম পায় নি। আমাদের জাতীয় জাগরণের সূচনা থেকেই, এর বিকাশ। মানুষের মন একটা সজীব যন্ত্রের মত। কোন নতুন আবেগ অনুভূত হলে, সমস্ত যন্ত্রেই তার প্রভাব পড়ে। আমাদের জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ সংস্কার, শিল্পের পুনরুজ্জীবন, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সূচিত হতে থাকে। কোনটিই পরস্পর বিচ্ছিন্ন নয়। একটির সঙ্গে আর একটি সম্পৃক্ত। পরস্পর নির্ভরশীল ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই একটি আর একটিকে শক্তিশালী করে তোলে। পাশ্চাত্য ভাবনার প্রভাবও ছিল সক্রিয়। পাশ্চাত্যের সঙ্গে সংযোগ, তার বৈশিষ্ট্য রীতিনীতি ও ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নতুন নতুন রাজনৈতিক গোষ্ঠী জন্ম নিতে থাকে। সনাতন ধ্যানধারণার পথ থেকে সরে গিয়ে তার কর্মক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়ে পড়ে। শিক্ষিত সমাজ ও জনসাধারণের ওপর তাঁর প্রতিক্রিয়ায় নতুন চিন্তা, নতুন আদর্শ ও কর্মপদ্ধতিতে আলোড়িত হয় যুগ মানস। এক তীব্র গতিবেগে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট হয় নানান কর্মপ্রয়াসের সাফল্য।

এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই শিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটতে থাকে। স্বদেশ প্রেমিক নিষ্ঠবান কর্মীরা দেশীয় শিল্পের উন্নয়নে আত্মনিয়োগ করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের বেশ আগে থেকেই স্বদেশি আন্দোলনের ভিত তৈরি হয়েই ছিল। দেখা গেল, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন যে নতুন রাজনৈতিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করে, তা স্বদেশি শিল্প উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। স্বদেশি আন্দোলন আমাদের ধ্বংসপ্রাপ্ত শিল্পকে বিকাশের পথ খুঁজে দেয়। কোন রকম আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আমাদের ছিল না। তার জন্য আইনসভার নির্দেশের প্রয়োজন ছিল। তাই জনসাধারণের দৃঢ় সংকল্পের শুল্কপ্রাচীর গড়ে তোলার দরকার হয়েছিল।

য়ুরোপীয় পত্র-পত্রিকায় সমস্ত ব্যাপারটি একটি চমক বলেই প্রচারিত হয়। যা মিলিয়ে যাবে অল্প দিনেই। কিন্তু ওদের যাবতীয় প্রচারকে আগ্রহ্য করে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনের ছ' বছর ধরে স্বদেশি শিল্প বিকাশের ধারা অব্যাহত রইল। পাশ্চাত্যের যে সমস্ত মানুষ সে সময়ে এসেছিলেন, তাঁরাও বিস্মিত হয়ে যান এই বিশাল কর্মকাণ্ড অবলোকন করে। কম দামের বিদেশি জিনিস না কিনে, বেশি দামে স্বদেশে উৎপন্ন জিনিস ক্রয় করে নিজেদের আত্মত্যাগকেই তুলে ধরেছিল সেদিনের বাঙালি।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল ভাবাবেগে কোন নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধতা ছিল না। জীবনের সর্বক্ষেত্রেই তার ব্যাপক অনুপ্রবেশ ঘটে। "স্বদেশি" আন্দোলন পরিণত হয় এক সামাজিক শক্তি রূপে। যার প্রভাব দ্রুত সামাজিক ও গার্হস্থ্য জীবনকে প্রভাবিত করে যায়। বিবাহে কোন বিদেশি দ্রব্য যৌতুক

দেওয়া হত না। দেবতার কাছে উৎসর্গ দ্রব্যাদির মধ্যে কোন বিদেশি দ্রব্য থাকলে, পুরোহিত তা উৎসর্গ করতেন না। কোন অনুষ্ঠানে বিদেশি চিনি ও লবণ ব্যবহার করলে, নিমন্ত্রিতরা সেই অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না। জনমতের উদ্বেল আবেগে প্রভাবিত কোন বাঙালিই বিদেশি ধুতি বা শাড়ি কিনতেন না। সস্তায় কোন বিদেশি দ্রব্য কিনতে আগ্রহী হলে তা তাকে করতে হত গোপনে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

৩. স্বাদেশিকতা ও বন্দেমাতরম্

আমাদের গণ-আন্দোলনগুলি প্রাণহীন এমন কথা কখনও কখনও বলা হয়ে থাকে। এর কারণ আমরা নাকি সব সময় জনসাধারণকে সঙ্গী করি না। এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ এখানে নেই। তবে, তাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত না হলে জনগণ কোন আন্দোলনে সক্রিয় সহযোগিতা করে না। সাধারণত বড় বড় আন্দোলন সৃষ্টি হয় বুদ্ধিজীবীদের নেতৃত্বে ও নিয়ন্ত্রণে। জনসাধারণ সেই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেও সমর্থন জানায়। কোন বৃহৎ ঘটনা যখন তাদের হৃদয়ে গভীর অনুভূতির আলোড়ন তোলে তখন তারা সোচ্চার হয়ে ওঠে। তারা নেমে যায় বিক্ষোভে, যা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব। 'স্বদেশি' আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে ছিল ব্যক্তিগত স্বার্থবোধ। তারা একথা বুঝেছিলেন, আন্দোলন সফল হলে, তাদের বৈষয়িক সুযোগ-সুবিধা লাভের সম্ভাবনা।

একজন "স্বদেশি" কর্মীর অভাবে "স্বদেশি" কাজকর্ম কখনও ব্যাহত হয় না। যে কোন বৃহৎ আন্দোলন কোন ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও প্রতিভার ওপর যতই নির্ভরশীল হোক না কেন,কোন প্রতিভাশালী ব্যক্তির ওপর তা নির্ভরশীল নয়। তারা যে বীজবপন করে যান, বীজ থেকে সৃষ্টি হয় নতুন মানুষ। তারাই কাজের ভার গ্রহণ করে এগিয়ে নিয়ে যায় আন্দোলন। জনজাগরণের উত্তাল প্রবাহে শঙ্কিত সরকার দমননীতির পথ গ্রহণ করায় জনগণ আরও উদ্বেল হয়ে ওঠে। অসীম ক্ষমতার অধিকারী আমলাতন্ত্র অভূতপূর্ব ঘটনার মোকাবিলা করতে এগিয়ে আসে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। দমননীতি প্রয়োগ কোন কঠিন ব্যাপার নয়। সাময়িকভাবে সাফল্য লাভ ঘটলেও ভবিষ্যতের অশান্তির বীজ বপন হয়ে যায়; যা ভবিষ্যৎ অনিষ্টের সৃষ্টি করে। একটা নৈতিক বিপর্যয় ঘটায়।

স্বদেশি আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা ছিল ছাত্র ও যুব সমাজের। তাদের বিশেষ ভূমিকায় আতঙ্কিত সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর ফতোয়া জারি করে স্কুল ও কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং শিক্ষকরা ছাত্রদের স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বয়কট ও পিকেটিং থেকে নিবৃত্ত করবে। তা না হলে স্কুল কলেজে সরকারি সাহায্য বন্ধ হবে, স্কলারশিপের প্রতিযোগিতার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে ছাত্ররা। এমনকী বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদনও প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে। সরকারি সার্কুলার পাঠানো হয় মফস্বলের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। কিন্তু এই সার্কুলারে উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। সরকারি নীতির সমর্থক সংবাদপত্রও এই সার্কুলারের নিন্দায় মুখর হয়ে ওঠে। এমন কী স্টেটসম্যান পর্যন্ত বলেছিল, সরকার এক ছেলেমানুষী নীতির দ্বারা ভুল পথে চলেছে। এর ফলে একমাত্র কিছু শহিদের সৃষ্টি হবে। কিন্তু সরকার নিরস্ত না হয়ে সার্কুলারের পর সার্কুলার জারি করতে থাকে। উত্তেজনাও চরম রূপ নেয়।

মারাত্মক কাণ্ড করেছিল পূর্ববঙ্গ সরকার। তারা একটি সার্কুলারে প্রকাশ্যে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি দেওয়া বে-আইনি ঘোষণা করে। একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিটিকে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, 'বন্দেমাতরম্' হল কালীমায়ের কাছে প্রতিহিংসা গ্রহণের জন্য প্রার্থনা। এমন ধারণা কী ভাবে গড়ে উঠল তা বোঝা কঠিন। একটা কদর্থ করা হল। আমরা আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ করলাম। ঐ সার্কুলার যে আইনসম্মত নয়, তা স্থির হল। স্বদেশি আন্দোলনে 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতের ভূমিকা ছিল বিরাট।

৪. "স্বদেশি" আন্দোলনের আনুষঙ্গিক ঘটনাবলী

স্বদেশি আন্দোলন সব রকম কাজেই উৎসাহের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। সাহিত্য, রাজনীতি ও শিল্প ক্ষেত্রে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে যুগান্তর আসে। বাংলা ভাষায় বক্তৃতা বাগ্মিতা ক্ষেত্রে এক বিরল নজির সৃষ্টি করে।

স্বদেশি আন্দোলনে বহুমুখি উন্নয়নের অন্যতম হল :

১. সাবানের কারখানা
২. দিয়াশলাই কারখানা
৩. কাপড়ের কল

এতদিনে তাঁত শিল্প প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা। ম্যাঞ্চেস্টারের বস্ত্রাদি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিল। আবার তা পুনরুজ্জীবিত হল। শিল্পোন্নয়নের আন্দোলনে সরকার সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় নি। সরকার যদি পরামর্শ ও বুদ্ধি দিয়ে সহযোগিতা করত তাহলে শিল্প সমস্যার সুরাহা হত, অগ্রগতি ঘটত; এমন কী রাজনৈতিক উত্তেজনাও প্রশমিত হত। কিন্তু আন্দোলন সম্পর্কে তারা ছিল উদাসীন, সবকিছুকে তারা শত্রুতার চোখে দেখতে শুরু করে। কিছু কিছু উত্তেজনামূলক কাজকর্মের দরুন যুবকদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ায় অসন্তোষ বাড়তে থাকে। যার ফলে হিংসাত্মক কাজকর্ম ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এসব সত্ত্বেও স্বদেশি আন্দোলন ছিল অব্যাহত।

স্বদেশি আন্দোলনের সময় বোম্বের কাপড় কলগুলি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। হুগলি নদীর তীরে একটি মৃতপ্রায় কাপড় কল কিনে নেওয়া হয় ১৮ লক্ষ টাকায়। আবেদন প্রচার করে নেতৃবৃন্দ এই টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। বেশির ভাগ টাকা এসেছিল মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় থেকে। তাদের মধ্যে মহিলারাও ছিল। এই কাপড় কলটির নাম দেওয়া হয় বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল।

য়ুরোপীয় ব্যাঙ্কগুলি থেকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা চাহিদা মত সাহায্য পেত না। যে কারণে দেশীয়দের নিজস্ব ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন পড়ে। স্থাপিত হল বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক। ভারতীয়দের দ্বারা পরিচালিত ভারতীয় ব্যাঙ্ক। স্থাপিত হয় ন্যাশন্যাল এবং হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানি। এরা আশাতীত সাফল্যলাভ করেছিল।

স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৭ আগস্ট। বঙ্গভঙ্গ রদের প্রথম বিক্ষোভের দিন। মি. জে. চৌধুরীর নেতৃত্বে যুব সমাজ শোভাযাত্রা করে পৌঁছায়, কলেজ স্কোয়ার থেকে টাউন হলে। ভারতীয়দের সব দোকান বন্ধ ছিল। ভারতীয়দের বসতি এলাকা পরিত্যক্ত জনপদের রূপ পায়। কেবল টাউন হলই ছিল প্রাণচাঞ্চল্য ও উৎসাহে উজ্জীবিত। বিশাল জনতার সমাবেশ সেখানে। সকলেই টাউন হলের ওপরে উঠতে চায়। ওপর নিচ সব মানুষে একাকার। তখন স্থির হল মোট তিনটি সভা হবে। টাউন হলের ওপরে ও নিচে দুটি এবং বেন্টিঙ্ক মূর্তির পাদদেশে একটি। এই ঘোষণা শুনে উপস্থিত জনতা নিজেরাই তিনটি স্বতন্ত্র স্থানে জমায়েত হয়।-

অসীম উৎসাহ মানুষের মনে। তিনটি বিক্ষোভ সভার সাফল্য জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের জন্ম দেয় এবং জাতীয় চেতনা বৃদ্ধি পায়। বঙ্গ বিচ্ছেদ বাঙালিকে এমন তীব্র আঘাত করে, যা আগে কখনো পায় নি তারা। ঐক্যবদ্ধ অবিভাজ্য বাংলার দাবিতে তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ। কলকাতার সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিরা ফিরে গেল এই দাবি নিয়ে। তারা বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে যেমন আন্দোলন অব্যাহত রাখবে, তেমনি স্বদেশিকে সমর্থন জানাতে একতিলও পিছনে ফিরবে না। দুটি আন্দোলনই তীব্র গতিতে এগিয়ে চলল পরিণতির দিকে।

৫. স্থির চূড়ান্ত ব্যবস্থা

সামনে সেই দিন। ১৬ অক্টোবর—বঙ্গভঙ্গ সরকারি নির্দেশে কার্যকরী হবে। দিনটিকে শোক দিবস হিসাবে পালন করা হবে এবং শোক মিছিল বেরোবে। দেশ জুড়ে সাড়া পড়ে গেল এই

আহ্বানে। মফঃস্বলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনার পর কার্যক্রম স্থির করে তা প্রচারিত হল সর্বত্র। কার্যক্রমে ছিল—

১. রাখিবন্ধন—এই প্রাচীন প্রথাকে নতুন করে সঞ্জীবিত করা হল। অবিভক্ত বাংলাকে এক সূত্রে আবদ্ধ রাখতে প্রতীক স্বরূপ সকলের হাতে বেঁধে দেওয়া হবে রাঙা সুতো।

২. অনশন দিবস— কোন গৃহে রান্না হবে না; আগুন জ্বলবে না। কেবল মাত্র রুগ্ন ও অসমর্থ ব্যক্তিদের জন্য রান্না হবে।

৩. দোকানপাট বন্ধ থাকবে ;

৪. কাজকর্ম বন্ধ থাকবে ;

৫. সকলকে খালি পায়ে চলতে হবে ;

৬. দেহ মন পরিশুদ্ধির জন্য প্রাতে সকলে গঙ্গাস্নান করবে।

—সকলে সাড়া দিল এই আহ্বানে। তাছাড়া স্থির হয়, দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে গ্রহণ করা হবে একটি গঠনমূলক প্রস্তাব। একটি মিলন মন্দির বা ফেডারেশন হল স্থাপনের প্রস্তাব করা হবে—যা হবে অবিভক্ত বাংলার মিলন কেন্দ্র। সুরেন্দ্রনাথের এই প্রস্তাবে সমর্থন জানান স্যার তারকনাথ পালিত এবং ভগিনী নিবেদিতা। তারকনাথ ছিলেন দেশ-বিভাগ রদ করার আন্দোলনে অন্যতম নায়ক। ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হবে।

তাঁত শিল্পে সহযোগিতার জন্য গড়ে তোলা হবে একটি অর্থভাণ্ডার।

১৬ অক্টোবর। প্রভাত হল।

কলকাতার রাস্তায় অগণিত মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসছে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি। দলে দলে মানুষ এগিয়ে চলেছে গঙ্গার দিকে। মাঝে মাঝে পথচারীদের হাতে বেঁধে দিচ্ছে রাখি। কোথাও কোথাও রয়েছে সংকীর্তনের দল। তাদের কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ বা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। স্নানের ঘাট জনতাপূর্ণ। সকলের হাতেই রাখি।

বিকাল তিনটায় ফেডারেশন হলের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠান। সমবেত মানুষ উপচে পড়ছে। সামনের রাস্তাও ভরে উঠল মানুষে। সেখানে তখন ৫০ হাজারের মত সুশৃঙ্খল জনতা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের জন্য আনন্দমোহন বসুকে নিয়ে আসা হল একটি চেয়ারে। তিনি গুরুতর অসুস্থ। তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করেন সুরেন্দ্রনাথ। অসাধারণ ভাষণ দেন স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের মঙ্গলাচরণ করেন শিখ পুরোহিত বাবা কাউর সিং। স্যার আশুতোষ চৌধুরী ঘোষণাবলি পাঠ করেন ইংরেজিতে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঘোষণাবলির বাংলা অনুবাদ করে সকলকে জানিয়ে দেন :

> "যেহেতু সমগ্র জাতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট বাংলা দেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করা যুক্তিসঙ্গত বলে মনে করেছেন, সেইহেতু আমরা এতদ্দ্বারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হচ্ছি ও ঘোষণা করছি যে জাতি হিসাবে আমরা আমাদের প্রদেশকে বিচ্ছিন্ন করার কুফলকে সাধ্যমত সর্বপ্রকারে প্রতিরোধ করব এবং আমাদের জাতির অখণ্ডতা রক্ষা করব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হোন। এ. এম. বোস।

বাঙালি জাতির অখণ্ডতা রক্ষার প্রতীক হিসাবে হল-ঘর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। পরে হলঘর নির্মাণের জন্য ফেডারেশনের জমি কিনে নেওয়া হয়। দেশবিভাগ ব্যবস্থার সংশোধনের পর সেই স্মৃতিমন্দিরের আর প্রয়োজন থাকে নি।

অনুষ্ঠান শেষে বিশাল জনতা খালি পায়ে রায় পশুপতিনাথ বোসের বাড়িতে সমবেত হয়েছিল। আগেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, দেশীয় শিল্পে সহযোগিতার জন্য জাতীয় অর্থভাণ্ডার গঠিত হবে। সেই উদ্দেশ্যে ঐ স্থানে খালি পায়ে হেঁটে উপস্থিত হলেন স্যার আশুতোষ চৌধুরী, জে. চৌধুরী, অম্বিকাচরণ মজুমদার, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরো কয়েকজন। সেখানে তখন বিশাল

জনতা। এখানে সংগৃহীত হয়েছিল ৭০ হাজার টাকা। এর বেশির ভাগই ছিল মধ্যবিত্ত সমাজের দান। রাজা মহারাজারাও সামান্য কিছু দিয়েছিলেন। এই দান ছিল স্বতঃস্ফূর্ত। কোন প্রচার করতে হয়নি। তাঁত ও গৃহশিল্প উন্নয়নে এই অর্থ ব্যয় হবে, স্থির হয়েছিল। একটি তাঁত শিল্প বিদ্যালয়ে কিছু টাকা দেওয়া হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি পরে বন্ধ হয়ে যায়। উদ্বৃত্ত টাকা ট্রাস্টি বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। এই টাকার সুদ থেকে লেডি কারমাইকেল স্মৃতি হোম ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন এবং ভারতীয় নারীদের একটি শিল্প শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছিল।*

৬. বঙ্গ-বিভাগ রদ

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর সম্রাট দিল্লিতে বঙ্গ বিভাগ সিদ্ধান্ত সংশোধন করেন। এই ঘোষণায় ব্যথিত হয়েছিলেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ। তিনি ছিলেন বঙ্গ বিভাগের অন্যতম সমর্থক এবং পূর্ববঙ্গে ইসলাম সমর্থন আদায়ে সরকারের দক্ষিণে হস্তস্বরূপ। ইংরেজ শাসকদের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন জি. সি. আই. ই. উপাধি। সলিমুল্লাহ আশাহত হয়েছিল। তিনি ছিলেন যথেষ্ট চতুর, বুদ্ধি ভাণ্ডার ছিল অগাধ। সমর্থক ছিল তাঁর অগণিত।

সম্রাট ঘোষিত সিদ্ধান্তের খবর এসে পৌঁছল। কলেজ স্কোয়ারে জমল অগণিত জনতা। চার দিকে প্রবল উত্তেজনা। বেঙ্গলি অফিস থেকে বন্ধুরা এসে নিয়ে গেলেন সুরেন্দ্রনাথকে কলেজ স্কোয়ারের সমাবেশে। অভিভূত সুরেন্দ্রনাথ লিখেছেন, সাফল্য সম্পর্কে আমাদের প্রত্যয় ছিল দৃঢ়। আমরা সবরকম অবৈধ পন্থা এড়িয়ে গেছি। পুলিশের দ্বারা আক্রান্ত হয়েও আমরা প্রতিশোধ গ্রহণ করিনি। আমরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনি থেকে নিরত হইনি। পুলিশের লাঠির আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি তুলেছি। আদালতে আইনের সাহায্যে প্রতিবিধানের চেষ্টা করেছি। আমরা পরোক্ষ প্রতিরোধ নীতি যেমন অনুসরণ করেছি, তেমনি আত্মশক্তিতে ছিল অগাধ আস্থা। বাংলা জুড়ে যে অরাজক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তার মূলে ছিল সেনাবিভাগ ও সেই বিভাগ সমর্থনে সরকারি নীতি। আন্দোলন যখন তীব্র এবং উত্তেজনা যখন চরম পর্যায়ে, তখন যদি দেশ বিভাগ সিদ্ধান্ত সংশোধিত হত, তাহলে বাংলা বা ভারতের রাজনীতির পরিস্থিতি এতখানি অরাজক হতে পারত না। সংশোধন হল অতিবিলম্বিত সময়ে।

সুরেন্দ্রনাথ দেশভাগ বিরোধী কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার কথা বলেছেন, স্বদেশি আন্দোলনে তাঁদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যতম হলেন আনন্দমোহন বসু, সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী, অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং ভূপেন্দ্রনাথ বসু। ময়মনসিংহের সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ছিলেন একজন সাহসী পুরুষ, অসাধারণ পৌরুষ এবং দৃঢ় মনোবলের মানুষ। এই ধনী মানুষটি ছিলেন বিখ্যাত শিকারি। দেশভাগবিরোধী আন্দোলনের আগে রাজনীতির সঙ্গে তাঁর তেমন সংযোগই ছিল না। তাঁর ময়মনসিংহের বাড়িতে লর্ড কার্জন গিয়ে আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সূর্যকান্ত বঙ্গভঙ্গ বিরোধী মনোভাব সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন। পরবর্তী সময়ে তার থেকে একবারও সরে আসেননি।

বরিশালে ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, পূর্ববঙ্গের অবিসম্বাদী নেতা। তিনি ছিলেন শিক্ষক। পিতার নামে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রজমোহন কলেজ। এই কলেজে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি। অশ্বিনীকুমার ছিলেন অসামান্য মানুষ। সেবা কার্য করেছিলেন জেলা জুড়ে। তাঁরই উদ্যোগে বরিশাল স্বদেশি আন্দোলনের পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসক এই মানুষটির ওপর নির্যাতনও কম করেনি। তাঁকে নির্বাসিতও করা হয়েছিল।

ঢাকার উকিল আনন্দচন্দ্র রায় দেশ বিভাগ বিরোধী আন্দোলনে একজন প্রথম সারির নেতা।

* কৃষ্ণকুমার মিত্রের রচনায় এ সম্পর্কে আরও তথ্য আছে।

স্বদেশি আন্দোলন ও দেশবিভাগ সংশোধনের জন্য তিনি আপ্রাণ সংগ্রাম করে গেছেন। ঢাকা রাজধানী হলে, শহরের অনেক সুযোগ-সুবিধা বাড়বে—এই সম্ভাবনা সত্ত্বেও আনন্দচন্দ্র স্বস্থান ত্যাগ করেননি।

ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ ছিলেন একজন কৃতী উকিল এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি। শাসকগোষ্ঠীর সুনজরে তিনি ছিলেন না। তাঁকে নির্বাসনে পাঠানো না হলেও, তাঁর ওপর ফৌজদারী আইনের ১১০ ধারা প্রয়োগ করা হয়েছিল, যা ছিল যথেষ্ট অসম্মানজনক।

ফরিদপুরের অম্বিকাচরণ মজুমদার জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে যুক্ত ছিলেন। প্রথমে ছিলেন বিদ্যালয় শিক্ষক। অসাধারণ বাগ্মী হিসাবে সুপরিচিত হন। দেশ বিভাগ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। দেশবিভাগ সম্পর্কে তার ধারণা ছিল প্রবল। একবার তিনি সুরেন্দ্রনাথকে বলেছিলেন, দেশ-বিভাগে প্রস্তাব সংশোধন না হলে, তিনি ঘরবাড়ি জমিজমা বিক্রি করে পশ্চিমবঙ্গে চলে যাবেন।

ফরিদপুর জেলায় স্বদেশি ও বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে তিনি ছিলেন পরিচালক। অসাধারণ প্রভাব ছিল তাঁর। একবার ছোটলাট ফরিদপুর গিয়ে দেখেন, স্টেশনে একজনও কুলি নেই। তখন পুলিশই তাদের মালপত্র বহন করে নিয়ে গিয়েছিল। স্থানীয় মানুষের সঙ্গে ছিল তাঁর স্নেহের সম্পর্ক। সবাই তাঁকে বলত বুড়োদাদু। ফরিদপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন বেশ কয়েক বছর। তাঁরই উদ্যোগে ফরিদপুর শহরে জলসরবরাহের ব্যবস্থা হয়। ফরিদপুরে একটি কলেজ স্থাপনেও তিনি ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী।

১৯০৫ সালের ২০ জুলাই লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। প্রতিবাদে ৭ আগস্ট টাউন হলে বাংলার সর্বস্তরের মানুষের সমাবেশে সুরেন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ ভাষণে খণ্ডিত বাংলার জনগণের মনোবেদনা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সেই ভাষণে তিনি বলেছিলেন :

বন্ধুগণ, লর্ড কার্জনের হাত থেকে বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের উদ্যত খড়্গাঘাত নেমে এসেছিল ১৯০৩ সালের ৩ ডিসেম্বর। এই সময়ে, আপনারা জানেন বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব গবর্নমেন্ট প্রথম উত্থাপন করেছিলেন। আমরা তখন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছিলাম এবং বাংলার সর্বত্র বহু সভা-সমিতি হয়েছিল। এমন কি ১৯০৩ সালের মাদ্রাজ কংগ্রেসের সভাপতি রূপে লালমোহন ঘোষ এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করেন। কিন্তু লর্ড কার্জন প্রতিবাদ শুনবার মতন লোক ছিলেন না। তিনি মনে মনে ঠিক করেছিলেন ভারতের মানচিত্রটা পালটিয়ে দেবেন এইভাবে।

কিন্তু ইতিহাসের নেপথ্য বিধান ছিল অন্যরকম। বিপরীতে হিত করেছিলেন কার্জন--বাঙালির নব-উন্মেষিত জাতীয়তাকে ধ্বংস করতে গিয়ে তিনি একে আরও উস্কিয়ে দিয়েছিলেন। সেই উস্কানিতে আমাদের জাতীয়তার দীপটি যেন আরও বেশি করে জ্বলে উঠেছিল। স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম বৎসর ১৯০৪ সাল শেষ হয়ে আরম্ভ হয়েছে ১৯০৫ সাল। উনিশশো থেকে উনিশশো চার—এই পাঁচ বছর আমাদের জাতীয় জীবনের মহাসন্ধিক্ষণ। এই পাঁচ বছরে একটা যুগান্তর এসে গিয়েছে—বাংলাদেশ যেন এক শতাব্দীর পথ অতিক্রম করেছে এই পাঁচ বছরে।

তারপর আপনারা জানেন, সকলের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে এখন বিলাত থেকে সংবাদ এসেছে, ভারত-সচিব লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। এবার আইন পাশ হতে দেরি হবে না। আমরা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি আমাদের সমস্ত প্রতিবাদ নিষ্ফল হলো। হাজার হাজার সভা আর ভারত-সচিবের কাছে আশি হাজার হিন্দুমুসলমান বাঙালির সই করা আবেদন—সবই ব্যর্থ হল। সেই ঐতিহাসিক আবেদনের মুসাবিদা করার দায়িত্ব আমারই ওপর দেওয়া হয়েছিল, আপনারা তা জানেন।

প্রথম বাঙালি উপলব্ধি করেছে আবেদন-নিবেদন নীতির অসারতা—ইংল্যান্ডের সদিচ্ছার

ওপর আমাদের আর কোন আস্থা নেই। আবার আমরা প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করব। ইতিহাসের বিধানে কার্জনের কঠিন আঘাতের ফলে জেগে উঠেছে বাংলা। জেগে উঠেছে ভারতবর্ষ। বাঙালির মাথায় এই খড়্গাঘাত ভারতবাসীর মাথাতেই পড়েছে মনে করতে হবে। এই প্রস্তাবকে শীঘ্রই আইন করে ঘোষণা করা হবে। কিন্তু আমাদের নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলে চলবে না। স্বদেশি আন্দোলন এইবার ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করে প্রজ্বলিত অবস্থায় উপনীত হবে। এটাই নিয়ম। সকল দেশেই প্রতিক্রিয়াশীল রাজপুরুষগণ এইভাবে ইতিহাসের হাতে যন্ত্রস্বরূপ হয়ে থাকেন। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কার্জনী শাসননীতি দেবতার আশীর্বাদের মতন কাজ করেছে। আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ মন্ত্র নিয়ে দুর্জয় পণ করেছি—বঙ্গভঙ্গ আমরা রদ করেছি। আমি এই সভায় দাঁড়িয়ে ভারতের উদ্ধত বড়লাটকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি : "I will unsettle the settle fact" এবং আমার শরীরের শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমি এই প্রতিজ্ঞা পালন করব।

আমি আহ্বান করি দেশের যুবকদের। তারা দলে দলে এগিয়ে এসে এই বিরাট জাতীয় আন্দোলনে সাহায্য করুক। স্বদেশি আন্দোলন ও বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদ দেশব্যাপী করবার জন্য আমি ছাত্র সম্প্রদায়কেও আহ্বান করছি। আমার কণ্ঠকে আশ্রয় করে বঙ্গজননী এই আহ্বান পাঠাচ্ছেন তাদের কাছে। আমি আজীবন ছাত্রদের দেশসেবাব্রতে উদ্‌বোধিত করে এসেছি। যারা ছাত্রসমাজকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চান আমি সে দলের নই। আমি যে ছাত্রসভা গঠন করেছিলাম তা এই উদ্দেশ্য নিয়েই। ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়। যদি সঠিকভাবে এবং ব্যাপকভাবে এই দেশে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ সাধন করতে হয়, তবে তার বনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে দেশের তরুণ ছাত্রদের এবং তাদের মধ্যেই সর্বপ্রথম জাগিয়ে তুলতে হবে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই আমি ছাত্রসভা গঠন করেছিলাম আজ থেকে ত্রিশ বছর আগে আমার বন্ধু আনন্দমোহন বসুর সহায়তায়। সেই ছাত্রদের আজ আমি আবার নতুন করে নিয়মানুগ আন্দোলনের পথে আহ্বান জানাচ্ছি। মাফ করবেন, ধান ভানতে কিছুটা শিবের গীত গাইলাম বলে।

যে কথা বলছিলাম। সকল দিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে যে, এই দেশের ইতিহাসে ১৯০৫ সালটি সত্যই নবযুগের বার্তা বহন করে এনেছে। কার্জন-বিধান ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে যে একটা বড় রকমের প্রেরণা দিয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কার্জন, আমি বলছি, চালে ভুল করেছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন কেবলমাত্র বাংলা ও বাঙালির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। কিন্তু তাঁর এই ভুল ভেঙে গেছে—বিষয়টি এখন একটি সর্বভারতীয় রূপ নিতে চলেছে।

আমি এইখানে দাঁড়িয়ে দিব্য নেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে, ঘটনার স্রোত দ্রুত আবর্তিত হয়ে চলবে। আমাদের এই স্বদেশি আন্দোলন ধূমায়িত অবস্থা অতিক্রম করে প্রজ্বলিত অবস্থায় এসে পৌঁছেছে। সেই শিখা অচিরেই দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়বে। নব-জাগরণের প্রাণ-সংগীতে বাংলার আকাশ-বাতাস ভরে উঠবে। দেশের তরুণ চিত্ত দেশপ্রেমে উদ্‌বোধিত হয়ে উঠবে। বিশ্বাস করুন, আমি দেখতে পাচ্ছি, অপ্রত্যাশিত গতিতে আরও অনেক ঘটনা একটির পর একটি ঘটে যাবে এবং আমার চ্যালেঞ্জ মিথ্যা হবে না—বঙ্গবিভাগ রদ হবেই। পূর্বের সূর্য যদি পশ্চিমে উদিত হয় তথাপি আমার বাক্য মিথ্যা হবে না।

এখানে, এই মঞ্চের ওপর আমার পার্শ্বে সৌম্যমূর্তি যে কবিকে আপনারা দেখছেন তিনি এই স্বদেশি আন্দোলনের চারণ কবির ভূমিকা নিয়েছেন। এঁর নাম আপনারা সবাই জানেন। ইনিই গানে গানে এঁকেছেন আন্দোলনের একটি মহিমান্বিত রূপ আর বাঙালির হৃদয় বীণাকে বেঁধে দিয়েছেন একটি সুরে যা কোনকালে আমরা দেখিনি। আমি তো মনে করি বাঙালির এই স্বদেশি আন্দোলন আন্দোলন নয়, এ একটা সর্বজনীন অভ্যুদয়। অনেকের সঙ্গে মিলিত হয়ে আমিও এই

পবিত্র আন্দোলনের আভ্যুদয়িক রচনা করেছি। বন্দেমাতরম্।*

পরবর্তীকালে বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন : "....**মনে রাখা দরকার যে স্বদেশি আন্দোলনের কারণ শুধু বঙ্গভঙ্গ নয়; কার্জনী আমলে দেশে যে বহুবিধ বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তাই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটা কেন্দ্র খুঁজে পেয়ে ফেটে পড়ল।**... জাতির জীবনে যে নবপ্রবাহ এসেছিল, কবি যাকে 'মরা গাঙ্গে বান' আসার সঙ্গে তুলনা করেছেন, তা শুধু বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নয়, জাতিকে আত্মশক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উন্মাদনা সেদিনের সবচেয়ে বড় কথা। বিদেশি দ্রব্য, ও বিশেষ করে বস্ত্র 'বয়কট'-এর আন্দোলন দেশময় দৃপ্ত রব তুলেছিল—"বিদেশি বাণিজ্যে করি পদাঘাত"—কিন্তু স্বদেশি সমর্থিত হলেও 'বয়কট' সম্পূর্ণ সমর্থন পায় নি ; কিন্তু ১৯০৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসে দারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল—যাতে কোন অঘটন না ঘটে, সেজন্য লন্ডন থেকে সর্বজনমান্য বর্ষীয়ান নেতা দাদাভাই নৌরজীকে সভাপতি পদে বরণ করে আনা হয়। তাঁর ভাষণে প্রথম 'স্বরাজ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছিল; **বিদেশি পণ্য বর্জন, স্বদেশি বাণিজ্য বর্ধন, জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন, এই হল স্বরাজলাভের জন্য কংগ্রেসের কার্যক্রম।** **

অরবিন্দ ঘোষ

সেদিন অরবিন্দের বাণী বাঙালি ছাত্র ও যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। নতুনজীবন গড়ার উদ্দীপনায় তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল এক অসম যুদ্ধে। অরবিন্দ যুব সমাজের উদ্দেশে বলেছিলেন :

"ভাবী কাল তরুণের।

"এক নবীন তরুণ পৃথিবী গ'ড়ে উঠতে চাইছে। তরুণকেই গ'ড়ে তুলতে হবে সে-পৃথিবী। কিন্তু পুরাতনের মত হ'লে তা একেবারেই চলবে না। সে পৃথিবী হবে সত্যের, সাহসের আর ন্যায়ের; সে পৃথিবী হবে বলিষ্ঠ উন্নত আশার, আর তার অবাধ পরিপূরণের। সেই পৃথিবীই আমরা গড়তে চাই!

"স্বার্থান্বেষী কাপুরুষ আর বাক্যবাগীশের দল, যারা গোড়ায় এগিয়ে আসে তারপর বিপদকালে সঙ্গীদের পরিত্যাগ করে, কোনও স্থান নেই তাদের সে-ভবিষ্যতে। যারা নির্ভীক, সরলমনা,অম্লান অকলুষ হৃদয়ের অধিকারী, সেই দুর্জয় স্পৃহাবান্ তরুণেরাই হবে একমাত্র বনিয়াদ, যার ওপর ভাবী জাতি গ'ড়ে উঠবে।

"যদি আদৌ আমরা বাঁচতে চাই, তা হ'লে ভারতের ব্যাহত মহান আত্মপ্রয়াসকে আমাদের আবার শুরু করতে হবে। সাহসের সঙ্গে বীর্যের সঙ্গে সে-কর্মের ভার তুলে নিতে হবে। ভারতের সর্বোচ্চ ভাব ও জ্ঞানের পূর্ণ অপরিসীম অর্থকে পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে প্রয়োগ করতে হবে ব্যক্তির জীবনে আর সমাজে। প্রয়োগ করতে হবে তাকে আমাদের সাধারণ জীবন চর্চায়, আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনে, আমাদের ধর্মে, দর্শনে, শিল্পে, সাহিত্যে, চিন্তায় ও তত্ত্বে। আমাদের তাবৎ ক্রিয়া কর্মে, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতির প্রতিটি রূপায়ণে প্রতিফলিত করতে হবে সেই গভীর সত্যগুলিকে। আর যদি আমরা তা করি, তা হ'লে দেখতে পাব পাশ্চাত্য ভাবধারার পোশাকে যা-কিছু আমাদের মৌল আদর্শের দাবিদার হয়ে এসেছে তার যা শ্রেষ্ঠ তা পূর্ব থেকেই আমাদের প্রাচীন জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত রয়েছে। আর তার পিছনে আছে আরও সুগভীর এক সত্য, আর গূঢ় এক মর্ম এবং আত্মজ্ঞান। আমরা খুঁজে পাব সেখানে এক অপরাজেয় ইচ্ছার, সামর্থ্য, যা আরও উন্নত এক আদর্শকে রূপ দিতে সক্ষম। আমাদের কেবল দরকার, যেটি আমরা চিরকাল আত্মার গভীর উপলব্ধিতে জেনেছি, তাকে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা জীবনে। আমাদের

*বক্তৃতাশতক—মণি বাগচী। পৃ. ১৯০-৯২। ** ভারতবর্ষের ইতিহাস—২য় খণ্ড।

প্রাচীন সভ্যতা সংস্কৃতির সারমর্ম আর ভবিষ্যৎ জীবন—পরিবেশের দাবি—এ দুটিকে মেলাবার গোপন রহস্য শুধু এইখানেই পাব, অন্য কোথাও নয়।

"আমাদের সকল চেষ্টা হবে এক বিরাট্ আর মহৎ পরিবর্তনকে নিয়ে আসার, তার পথ তৈরি করার। আমরা বিশ্বাস করি, সেই পরিবর্তনই আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ রচনা করবে, ভারতের ভবিষ্যৎকে রূপ দান করবে। সেই কাজটি নিষ্পন্ন করাই আমাদের চরম লক্ষ্য।

"আমাদের আদর্শ মানবতার এক নবজন্ম তার আত্মায়। এই মহৎ নবজন্ম ও নব সৃষ্টিকে সফল করার জন্য আমাদের জীবন আত্মার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করবে এক প্রবল কর্মশক্তি।

"আধ্যাত্মিক আদর্শই সকল যুগে ভারতের চরিত্রগত ভাব ও তার সকল মহদাকাঙ্ক্ষার আশ্রয় হয়ে থেকেছে। কিন্তু কালের গতি এবং মানুষের প্রয়োজন চাইছে এক নূতন দিশা, আদর্শের এক অন্যতর রূপ। পুরাতন রীতি আর পদ্ধতি কালপুরুষের প্রয়োজন মেটাতে আর পর্যাপ্ত নয়। ভারতকে ভবিষ্যতে যে বিরাট কাজগুলি করতে হবে, যে দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোতে হবে, কোন সঙ্কীর্ণ সীমারেখায় আবদ্ধ থেকে তা সিদ্ধ হবে না। আমাদের আধ্যাত্মিকতা কোন সময়েই একটা জরাগ্রস্ত জগৎ বিমর্ষ জীবনের তত্ত্ব নয়, যা ভগবানের এই প্রচণ্ড সৃষ্টিকে একটা মিথ্যা মায়া বা শোচনীয় ব্যর্থতা ব'লে মনে করে। আমাদের আধ্যাত্মিকতা জীবন থেকে পিছু হটে আসা নয়, তা আত্মার দুর্বার শক্তিতে জীবনকে জয় করা। আমাদের আদর্শ জগৎকে মেনে নেয় ভগবানেরই আত্মরূপায়ণের প্রয়াস বলে, কিন্তু তা চায় মানবতাকেও সমূহ রূপান্তরিত করতে; এবং তা করতে হবে এ পর্যন্ত যতখানি আত্মবিকাশের চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে, তার চেয়ে বহুগুণ চেষ্টার দ্বারা। সে এমনই এক রূপান্তর—যার ফলে মানুষ আর ভগবানের মাঝখানে আবরণটা খসে পড়বে, যে দিব্য মনুষ্যত্বকে আমরা বহন করতে সমর্থ, তার জন্ম হবে আমাদের জীবনে এবং আমাদের জীবন নূতন ছাঁচে গড়ে উঠবে, আত্মার সত্য জ্যোতি আর শক্তিতে বিকাশ হয়ে উঠবে। আমাদের যাবতীয় কর্ম হবে যিনি সকল কর্মের প্রভু তাঁকে উৎসর্গ করা। আর তা হবে মানুষের বৃহত্তর সত্তার অভিব্যক্তি। সমস্ত জীবন হবে যোগ।

"পাশ্চাত্য তার আদর্শ করেছে মানুষের বুদ্ধি হৃদয়াবেগ, প্রাণ আর দেহসত্তার উন্নতিকে। কিন্তু তার আধ্যাত্মিক জীবনের আরও বৃহত্তর সম্ভাবনাকে সে অবহেলা করেছে। তার সব চেয়ে বড় মাপকাঠি হল স্বাধীনতা, সাম্য আর ভ্রাতৃত্বের আদর্শ, যুক্তি আর বিজ্ঞান, সর্ব বিষয়ে দক্ষতা ও কুশলতা ; এক উন্নততর রাজনৈতিক, সামাজিক আর অর্থনৈতিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা ; জাতির একতা আর ইহজাগতিক সুখের বিধান। এগুলি অবশ্যই বিরাট আর মহৎ প্রচেষ্টা। কিন্তু পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে দেখা গেছে যে কেবল মনের সদিচ্ছা আর মতবাদের দৌলতে তা যথার্থ রূপে কিছুতেই অর্জন করা সম্ভব নয়। তাদের সত্যকার বাস্তব উপলব্ধির কেবল মাত্র সম্ভব হবে, যদি তা আধ্যাত্মে প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য তার পূর্ণ আস্থা স্থাপন করেছে তার বিজ্ঞান আর যন্ত্রপাতির শিল্প কৌশলে। সেই বিজ্ঞানই আজ তাকে ধ্বংস করতে উদ্যত। সেই যন্ত্রপাতির ভারেই আজ সে গুঁড়িয়ে যাবার উপক্রম। এই সহজ কথাটি সে কিছুতেই বুঝতে পারেনি যে, তার মহৎ আদর্শগুলিকে ফলিত করতে হ'লে একটি আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সর্বাগ্রে দরকার। প্রাচ্যের জ্ঞানে আছে সেই আধ্যাত্মিক পরিবর্তনের গোপন তত্ত্বটি, কিন্তু সে সুদীর্ঘকাল পৃথিবী থেকে তার দৃষ্টিকে ফিরিয়ে রেখেছে। এখন সময় এসেছে সেই বিচ্ছেদকে ঘুচিয়ে দেবার, জীবন ও আত্মার মিলন সেতু রচনা করার।

"কি ক'রে তবে সেই মহামিলন ঘটবে? সেই গুপ্ত রহস্যটিও ভারতের জানা ছিল, যদিও তার যথেষ্ট চর্চা হয়নি। 'যোগাৎ কুরু কর্মানি' গীতার এই মহান নির্দেশে আমরা পাই সেই রহস্যের সারমর্ম। এর মূল কথা হ'ল, সকল কর্মই যোগ যুক্ত হয়ে নিষ্পন্ন করতে হবে। আমাদের সর্বোচ্চ আত্মপ্রকৃতিই হবে তার ভিত্তি। আমাদের সত্তার প্রতিটি অংশ-মন, প্রাণ, দেহ, হৃদয়, বুদ্ধি, ইচ্ছা,

অনুভূতি,—সব কিছুর উপর আত্মার প্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি যে মানুষের পক্ষে নিতান্তই কষ্টসাধ্য শুধু তাই নয়; আমরা বিশ্বাস করি, এইটিই তার যত কিছু সমস্যা আর দুর্ভোগের একমাত্র প্রকৃত সমাধান।

"এই তাহ'লে আমাদের পরমবাণী। এই বাণীই আমরা স্মরণ করব অহরহ। এই মন্ত্রই জপ করব : তরুণ উদীয়মান ভারতের সামনে এই আদর্শই তুলে ধরব, এক অধ্যাত্মমুখী জীবনই মানুষের সমস্ত কর্মের নিয়ামক হবে আজ যে, মহাযুগের আবির্ভাব হতে চলেছে—জগতকে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করবে। যে-ভারত সুপ্রাচীন কাল হ'তে এই মহৎ রহস্যকে বুকে ক'রে বেড়িয়েছে, সে-ই কেবল জগতকে নিয়ে যেতে পারে এই মহারূপান্তরের পথে। পুরাতন যুগের এই সান্ধ্য লগ্ন সেই প্রভাতেরই অগ্র-পথিক।

"এই তবে হোক মানবতার মধ্যে তার সেবা ও তার প্রচার : যে ভারত একবার ব্যক্তির জীবন ক্ষেত্রে আবিষ্কার করেছিল এক অন্তরস্থ অধ্যাত্ম জীবনের বিকাশ, তেমনি জাতির জীবন ক্ষেত্রে আজ তাকে পুনরায় আবিষ্কার করতে হবে সেই আধ্যাত্মিকতারই পূর্ণ সমষ্টিগত রূপটিকে। নিখিল মানব জাতির জন্যে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে হবে এক নূতন আধ্যাত্মিক এবং সামাজিক তন্ত্র।

"আমাদের সর্বপ্রথম কাজ হবে তা হলে এই আদর্শকে ঘোষণা করা। সকলের আগে চাই একটা পুরাপুরি আধ্যাত্মিক পরিবর্তন, সর্বাধিক জোর দিতে হবে তাতে। এবং যারা সে আদর্শকে গ্রহণ করবে, তাকে সফল করতে প্রাণপাত চেষ্টা করবে, তাদের সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। আমাদের দ্বিতীয় কাজ হবে, এই ভাবধারাকে কেবল ব্যক্তিজীবনে নয়, সমষ্টির জীবনেও পূর্ণরূপ দেওয়া। বাহিরের জীবন কর্মের সঙ্গে ঘটাতে হবে ভিতরের পরিবর্তন। আর যুগপৎ তা হবে যেমন একদিকে আধ্যাত্মিক প্রয়াস, তেমনই শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ আর অর্থনীতির ক্ষেত্রেও হবে একই সঙ্গে ব্যক্তি ও সম্প্রদায়, অঞ্চল এবং জাতি। আর পরিণামে তা শুধু জাতির গণ্ডীতেও সীমাবদ্ধ না থেকে ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বমানবতার মধ্যে।

"এর অব্যবহিত প্রত্যক্ষ ফল হবে এক নূতন সৃষ্টি। এক অধ্যাত্মমুখী শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ; আরও ঘনিষ্ঠ আরও বর্ধিত এক সমাজবোধ, যার ভিত্তি মানুষের বর্তমান বিভেদ নয়—একতা। ব্যক্তির পূর্ণ স্বাতন্ত্র্য আর বিকাশ সার্থকতা লাভ করবে অপরের সঙ্গে জীবন যোগ। সে-জীবন উৎসর্গ করবে আপনাকে জাতি ও মানবতার বৃহত্তর সত্তায়, তার সেবায়। অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা হবে পশ্চিমী সভ্যতার অনুকরণে নয়—তা করতে হবে ভারতের নিজস্ব সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক মৌল-নীতি অনুসারে।

"তরুণ ভারতকে আমরা আহ্বান করি। এই তরুণের দলকেই হ'তে হবে নব পৃথিবীর নির্মাতা। যারা ব্যক্তি-স্বার্থের উৎকট দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতায় বিশ্বাসী—তারা নয়। ধনতন্ত্র বা জড়বাদী কম্যুনিজমও সে আদর্শ নয়—পাশ্চাত্য থেকে আমদানি হয়ে যা আজও ভারতের ভবিষ্যৎ আদর্শের দাবিদার হয়ে উঠেছে। কিম্বা যারা অন্ধ ধর্মীয় সংস্কারের ক্রীতদাস ক'রে রেখেছে নিজেদের, কিছুতেই যারা আত্মার পূর্ণ প্রগাঢ় সত্যে জীবনের সমূহ রূপান্তরকে মেনে নিতে রাজি নয়, ভারতের ভবিষ্যতের ভার তাদের হাতেও নেই। কেবল তারাই—যাদের মন প্রাণ অবাধ মুক্ত, যাদের হৃদয় উদার উন্নত, যারা প্রস্তুত এক দ্বিধাহীন জীবনের অপরিসীম সত্যকে অর্জন করার জন্য অকাতরে পরিশ্রম করতে — তারাই গড়ে তুলবে সে-ভবিষ্যৎ। তারা হবে সেই বলিষ্ঠ মানুষ, যারা অতীতের বা বর্তমানের দিকে চেয়ে থাকবে না। কেবলমাত্র ভবিষ্যতের জন্যই আত্মোৎসর্গ করবে। তারা নিজেদের তুচ্ছ ক্ষুদ্র সামান্য সত্তাকে বহুগুণে ছাপিয়ে জীবনাহুতি দেবে, আপনার মধ্যে আর সর্ব মানবের মধ্যে ভগবানকে উপলব্ধি করবে, সর্বান্তঃকরণে অক্লান্ত সেবা করবে জাতি ও মানবতার। এই আদর্শ এখন অবধি হয়তো মাত্র একটি বীজ। আর যে-জীবন সেই বীজকে বহন করছে তা হয়তো মাত্র একটি সৃষ্ট কেন্দ্র। কিন্তু আমাদের ধ্রুব আশা এই বীজই একদিন বিরাট মহীরুহে পরিণত

হবে। আর এই কেন্দ্রই হয়ে উঠবে নিত্য প্রসারমান নবসৃষ্টির প্রাণকেন্দ্র।

"বিনাশোন্মুখ এক পৃথিবীর সংকল্পের ভিতর দিয়ে যে তরুণ মানব জাতি জন্ম নেবার দুঃসহ প্রয়াস করছে, সেই নব-মানবতার পতাকাবাহীদের মধ্যে আমরা আমাদের স্থান গ্রহণ করি দৃপ্ত আশায় আর আত্মার অবিচলিত বিশ্বাসে আর অটল প্রত্যয়ে চেয়ে দেখি ভারতের ভবিষ্যতের দিকে—যে মহাভারতের পুনর্জন্ম আদি জননীর মহাতেজা জীর্ণ শরীরকে নবযৌবন সঞ্চারে পুনরুজ্জীবিত করবে।"

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তখন পূজাবকাশে দার্জিলিঙে। বাংলার রাজনীতি ক্ষেত্রে তখনও তার সক্রিয় ভূমিকা ছিল না। কিন্তু চিত্তরঞ্জন স্বদেশি আন্দোলনে ক্রমবর্ধমান উত্তাপ তিনি অনুভব করেছিলেন। তাই এক দশক পরে চিত্তরঞ্জনকে দেখা গেল স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ নেতা হিসাবে। তিনি যখন দার্জিলিঙে (১৯০৬) ছুটি কাটাতে গেছেন, তখন নিবেদিতাও সেখানে। ১৬ অক্টোবর স্থানীয় হিন্দু হলে বঙ্গ বিভাগের বিরুদ্ধে দু'জনেই একটি জনসভায় ভাষণ দেন। দেশবন্ধুর ভাষণের মধ্যে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারার সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি সম্ভব। তিনি বলেছিলেন—

"আমাদের দেশে আজকাল অল্প সংখ্যক বিজ্ঞ লোকের মত ছাড়িয়া দিলে প্রায় সকলেই মনে করেন যে, এই যে নূতন জীবন সঞ্চার—যাহাকে আমাদের সংবাদপত্র সকল স্বদেশি আন্দোলন নামে অভিহিত করিয়াছেন—ইহাই অচিরে আমাদের এই অধঃপতিত দেশের মুক্তির একমাত্র কারণ হইয়া উঠিবে। অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, **আমাদের সমস্ত দেশব্যাপী দারিদ্র্য বিনাশ করিতে হইলে এই স্বদেশি আন্দোলনই একমাত্র উপায় এবং সেই কারণেই এই আন্দোলন অবশ্য বাঞ্ছনীয়**। এই কথা আজকাল আমাদের দেশের অনেক কথার মত একেবারে মিথ্যা না হইলেও সম্পূর্ণভাবে সত্য নহে। জাতীয় দাবিদ্র্য সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের অঙ্গমাত্র। সমস্ত জাতীয় অধঃপতনের সঙ্গে ইহার একটা অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ আছে, এবং একথা অতি সত্য যে, সমস্ত জাতির উন্নতি না হইলে এ দারিদ্র্য কিছুতেই ঘুচিবে না; কিন্তু এই যে নবজীবন সঞ্চারিণী আশা—যাহা আমাদের সমস্ত দেশটাকে সচকিত করিয়া তুলিয়াছে, ইহা কি একমাত্র দারিদ্র্য-বিনাশের কারণ? ইহার মধ্যে কি গভীরতর সত্য নিহিত নাই? ইঁহা কি আমাদের চক্ষে আঙুল দিয়া মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতেছে না? ইহা কি সমস্ত বাঙালি জাতির শ্রবণ-বিবরে এক আশ্চর্য অপূর্ব স্বাধীনতা-সঙ্গীত ঢালিয়ে দিতেছে না?

আমার কাছে এই নব আন্দোলন যে যে কারণে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় তাহার মধ্যে সর্বপ্রধান কারণ এই যে, ইহা ফলত ও মূলত **বাঙালি জাতির আত্মনির্ভরতার পথে প্রথম পদক্ষেপ**। এই কারণেই আমার ধ্রুব ধারণা যে, **এই আন্দোলনের সফলতার উপরেই আমাদের জাতীয় উন্নতির আশা নির্ভর করিতেছে**। জগতের ইতিহাস বারে বারে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, এক জাতিকে অন্য কোন জাতি হাতে ধরিয়া স্বাধীনতা তুলিয়া দিতে পারে না। প্রত্যেক ব্যক্তির যেমন আপনার মুক্তির আন্দোলন আপনাকেই সাধন করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ প্রত্যেক জাতির মুক্তিও সেই জাতিকেই সাধন করিয়া লইতে হয়। সহস্র বৎসর ধরিয়া অন্য জাতির মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলেও প্রকৃত মুক্তির পথ কখনো মিলিবে না।

আমরা এতদিন ধরিয়া ইংরাজের মুখাপেক্ষী হইয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, ইংরাজ আমাদের অনেক দৈন্য ঘুচাইবে, ইংরাজ আমাদিগের সকল লজ্জা নিবারণ করিবে এবং আমাদিগকে হাতে ধরিয়া মানুষ করিয়া তুলিবে। এখন সে কথা যদিও স্বপ্নের মত মনে হয়, কিন্তু ইহা অবশ্য সত্য যে একদিন আমরা ইংরাজের বাক্‌চাতুরীতে মুগ্ধ হইয়া শুধু মাত্র তাহার মুখের কথার উপর আমাদের মনে আশা-ভরসার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলাম। এমনি করিয়া ক্রমে ক্রমে আমরা ইংরাজদের ক্ষমতা দেখিয়া আত্ম-প্রভাব হারাইয়াছিলাম, ইংরাজের ছলাকলায় প্রতিনিয়তই প্রতারিত হইয়াছিলাম, ইংরাজের কথার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিয়াছিলাম। মহারাণীর যে ঘোষণা (Proclamation)

লইয়া আমরা এত গর্ব করি, তার মধ্যে যে আমাদের সকল আশা-ভরসাকে উপেক্ষা করিবার জন্য 'so far as it may be' —এই মারাত্মক বাক্যটি লুক্কায়িত ছিল। তাহা একবারও অনুভব করিতে পারি নাই। কার্জন বাহাদুরকে ধন্যবাদ, তিনি আমাদের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন। আমরাও এখন ভাল করিয়া মহারাণীর ঘোষণার এই গূঢ় তত্ত্ব মর্মে মর্মে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি। ভগবান আমাদের সহায় হউন, এই সত্য জ্ঞান যেন চিরদিন আমাদের জাতীয় জীবনকে সচেষ্ট ও সচকিত করিয়া রাখে।

এক শ্রেণীর লোকের ধারণা এই যে, Pax Britanica-র প্রসাদে ভারতে এখন মহাশান্তি বিরাজ করিতেছে। হায় রে ব্রিটিশ রাজ্যের শান্তি, হায় আমরা অভাগ্য! আমরা এতদিন বুঝিতে পারি নাই যে, এই দেশব্যাপী নিছক শান্তি আমাদের জীবনকে আড়ষ্ট করিয়া রাখিবার উপায়মাত্র। ইহা যদি শান্তি হয়, আমি বলিব ইহা মৃত্যুর শান্তি। ইহার উপরে কোনদিন কোন কালে জীবনের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না।

ঈশ্বরের প্রসাদে আমাদের জাতীয় জীবন হইতে মরণ-ছায়ারূপী এই কুহেলিকা অপসৃত হইয়াছে। এই নব-উন্মেষিত জাতীয়তার প্রভাতালোকে আমাদের জাতীয় জীবনের সত্য অবস্থা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সুন্দর পরিষ্কার রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই নব-আন্দোলন আমাদের কাছে সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় ; ইহাই আমাদের আত্মনির্ভরের প্রথম পদক্ষেপ। আজিকার দিনে এই দেশব্যাপী আন্দোলনে শত লক্ষ কণ্ঠে উচ্চারিত বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যেও যে মাতার আহ্বান শুনিতে পায় নাই, সে নিতান্ত হতভাগ্য।"

অরবিন্দের 'বন্দেমাতরমে' প্রকাশিত তিনটি রচনা এখানে উদ্ধৃত হল। তাঁর স্বদেশ ভাবনা, রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং জাতীয়তার উদ্বোধনে গভীর চিন্তা চেতনার পরিচয়কে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরে।

Swaraj

NATIONALISM was filled at the Pabna conference with a new spirit unlike anything yet known to us. Whatever resoulutions were passed or steps taken, were taken in a spirit of practical utility, which has been hitherto absent from our Congresses and Conferences. We have hitherto been engaged in dispute about ideals and methods. We are confident that the country, at least Bengal. has now reached a stage when this dispute is no longer necessary. Whatever we may say out of policy or fear, the whole nation is now at one. **Swaraj is the only goal which the heart of Bengal recognises, Swaraj without any limitation or reservation.** Even the President in his second and closing speech was so much moved by the spirit in the air that he forgot the feeling of caution which obliged him in his opening address to deprecate ambitious ideals, and out of the galdness of his heart there burst from him a flood of inspiring eloquence which made the whole audience astir with feelings of impassioned aspiration. Swaraj was the theme of his eloquence and to anyone listening carefully it was evident that 'Swaraj', unlimited and without reservation, was the ideal enthroned in the heart of the poet. Even Surendranath or those who voted for colonial Swaraj knew well in their heart of hearts that their ideal was not the ideal of the nation. Long havit and apprehension were the only obstacles in their way which prevented them from throwing themselves into the current. But the rest of the audience were visibly moved by the passionate eloquence which flowed from the lips of Rabindanath. What matters it what resolutions may be passed or rejected? Swaraj is no longer a mere word,

no longer an ideal, distant and impossible, for the heart of Bengal has seized upon it, and the intellect of Bengal has acknowledged it. We hold no brief for anyone, but we believe that Srijut Manoranjan Guha was an inspired speaker when he told the Conference never to lose sight of God in the movement. Mighty aspirations are in the heart of the people and he is false to the inspiration within him who tries to dwarf them. Let us work practically at the smallest details, but let us never forget that the work is not for its own sake but for the sake of Swaraj. We shall be false to our inspiration if we forget the goal in the details; we shall condemn ourselves to the fate of the man who in the eagerness of picking up pebbles on the seashore threw away the alchemic stone, which God had for a moment given into his hands. **Swaraj is the alchemic stone, the Parash-Pathar, and we have it in our hands. It will turn to gold everything we touch. Village Samitis are good, not for the sake of village Samitis but for the sake of Swaraj. Boycott is good, not for the sake of Boycott but for the sake of Swaraj. Swadeshi is good, not for the sake of Swadeshi but for the sake of Swaraj. Arbitration is good, not for the sake of arbitration but fo the sake of Swaraj. If we forget Swaraj and win anything else we shall be like the seeker whose belt was turned indeed to gold but the stone of alchemy was lost to him for ever.**

Never should we forget that but for the hope of Swaraj we should never have done what we have done during the last three years. No lesser hope, no ideal of inferior grandeur could have nerved us to the tremendous efforts, the great sacrifices, the indomitable persistence in the face of persecution which has made these three years ever memorable as the birth-time of a nation. Who could have borne what we have borne for the sake of some petty object? No good can result from denying what God has revealed to us. When Peter denied his master, half of his virtue went out of him Let not our people have to repent as Peter had to repent, and shed tears of bitter sorrow because the divinity has been expelled by their own folly from their bosom. When a light has been revealed, folly alone will try to shut it out behind a screen. When a mighty power has entered into the heart, madness alone can wish to forfeit it. Swaraj is the direct revelation of God to this people,— not mere political freedom but a freedom vast and entire. freedom of the individual, freedom of the community, freedom of the nation, spiritual freedom, social freedom, political freedom. Spiritual freedom the ancient Rishis had already declared to us ; social freedom was part of the message of Buddha, Chaitanya, Nanak and Kabir and the saints of Maharashtra, political freedom is the last word of the triune gospel. Without political freedom the soul of man is crippled. Only a few mighty spirits can rise above their surroundings, but the ordinary man is a slave of his surroundings and if those be mean, servile and degraded, he himself will be mean, servile and degraded. Social freedom can only be born where the soul of man is large, free and generous, not enslaved to petty aims and thoughts. Social freedom is not a result of social machinery but of the freedom of the human intellect and the nobility of the human soul. A man who follows petty ends cannot feel his brotherhood with his fellows, for he is always striving to raise himself above them and assert petty superiorities. If caste makes him superior or money makes him superior, he will hug to his bosom the distinctions of caste or the distinctions of wealth. If political freedom is absent, the community has no great ends to follow and the individual is confined within a narrow circuit in which the superiority of caste, wealth or class is the

only ambition which he can cherish. If political freedom opens to him a wider horizon, he forgets the lesser ambitions. Moreover a slave can never be noble and broad-minded. He cannot forget himself in the service of his fellows; for he is already a slave and service is the badge of his degradation, not a willing self-devotion. When man is thus degraded, it is idle to think that society can be free.

So too spiritual freedom can never be the lot of many in a land of slaves. A few may follow the path of the Yogin and rise above their surroundings, but the mass of men cannot ever take the first step towards spiritual salvation. We do not believe that the path of salvation lies in selfishness. If the mass of men around us is miserable, fallen, drgraded how can the seeker after God be indifferent to the condition of his brothers? Compassion to all creatures is the condition of sainthood, and the perfect Yogin is he who is *sarvabhutahite ratah*, whose mind is full of the will to do good to all creatures. When a man shuts his heart to the cries of sufferings around him, when he is content that his fellow-men should be sorrowful, oppressed, sacrificed to the greed of others, he is making his own way to salvation full of difficulties and stumbling-blocks. He is forgetting that God is not only in himself but in all these millions. And for those who have not the strength, spiritual freedom in political servitude is a sheer imposibility. When India was free, thousands of men set their feet in the stairs of heaven, but as the night deepened and the sun of liberty withdrew its rays, the spiritual force inborn in every Indian heart became weaker and weaker until now it burns so faintly that aliens have taken upon themselves the role of spiritual teachers, and the people chosen by God have to sit at the feet of the men from whose ancestry the light was hidden. God has set apart India as the eternal fountain-head of holy spirituality, and He will never suffer that fountain to run dry. Therefore Swaraj has been revealed to us. By our political freedom we shall once more recover our spiritual freedom. Once more in the land of the saints and sages will burn up the fire of the ancient Yoga and the hearts of her people will be lifted up into the neighbourhood of the Eternal.

February 18, 1908.

Palli Samiti*

THE resolution on which I have been asked to speak is from one point of view the most important of all that this Conference has passed. As one of the speakers has already said, the village Samiti is the seed of Swaraj. What is Swaraj but the organisation of the independent life of the country into centres of strength which grow out of its conditions and answer to its needs, so as to make a single and organic whole? When a nation is in a natural condition, growing from within and existing from within and in its own strength, then it develops its own centres and correlates them according to its own needs. But as soon as for any reason this natural condition is interrupted and a foreign organism establishes itself in and dominates in the country, then that foreign body draws to itself all the sources of nourishment and the natural centres, deprived of their sustenance, fail and disappear. It is for this reason that foreign rule can never be for the good of a

* This is a lecture delivered by Sri Aurodindo speaking on the Palli Samiti resolution. Kishoregunj.

nation, never work for its true progress and life, but must always work towards its disintegration and death. This is no new discovery, no recently invented theory of ours, but an ascertained truth of political science as taught in Europe by Europeans to Europeans. It is there laid down that foreign rule is inorganic and therefore tends to disintegrate the subject body politic by destroying its proper organs and centres of life. If a subject nation is ever to recover and survive, it can only be by reversing the process and establishing its own organic centres of life and strength. We in India had our own instruments of life and growth; we had the self-dependent village; we had the Zemindar as the link between the village units and the central governing body and the central governing body itself was one in which the heart of the nation beat. All these have been either destroyed or crippled by the intrusion of a foreign organsim. If we are to survive as a nation we must restore the centres of strength which are natural and necessary to our growth, and the first of these, the basis of all the rest, the old foundation of Indian life and secret of Indian vitality was the self-dependent and self-sufficient village organism. If we are to organise Swaraj we must base it on the village. But we must at the same time take care to avoid the mistake which did much in the past to retard our national growth. The village must not in our new national life be isolated as well as self-sufficient, but must feel itself bound up with the life of its neighbouring units, living with them in a common group for common purposes. Each group again must feel itself a part of the life of the district, living in the district unity, so each district must not be engrossed in its own separate existence but feel itself a subordinate part of the single life of the province, and the province in its turn of the single life of the country. Such is the plan of reconstruction we have taken in hand, but to make it a healthy growth and not an artificial construction we must begin at the bottom and work up to the apex. The village is the cell of the national body and the cell-life must be healthy and developed for the national body to be healthy and developed. **Swaraj begins from the village.**

Take another point of view. Swaraj is the organisation of national self-help, national self-dependence. As soon as the foreign organism begins to dominate the body politic, it compels the whole body to look to it as the centre of its activities and neglect its own organs of action till these become atrophied. We in India allowed this tendency of alien domination to affect us so powerfully that we have absolutely lost the habit and for sometime had lost the desire of independent activity and became so dependent and inert that there can be found no example of such helplessness and subservience in history. The whole of our national life was swallowed up by this dependence. Swaraj will only be possible if this habit of subservience is removed and replaced by a habit of self-help. We must take back our life into our own hands and the change must be immediate, complete and drastic. It is no use employing half-measures, for the disease is radical and the cure must be radical also. Our aim must be to revolutionise our habits and leave absolutely no corner of our life and activities in which the habit of dependence is allowed to linger or find refuge for its insidious and destructive working ; education, commerce, industry, the administration of justice among ourselves, protection, sanitation, public works, one by one we must take them all back into our hands. Here again the village Samiti is an indispensable instrument, for as this resolution declares, the village Samiti is not to be a mere

council for deliberation, but a strong organ of executive work. It is to set up village schools in which our children will grow up as good citizens and patriots to live for their country and not for themselves or for the privilege of dependent life in a dependent nation. It is to take up the work of arbitration by which we shall recover control of the administration of justice, of self-protection, of village sanitation, of small local public works, so that the life of the village may again be self-reliant and self-sufficient, free from the habit of dependence rooted in the soil. Self-help and self-dependence, the first conditions of Swaraj, depend for their organisation on the village Samiti.

Another essential condition of Swaraj is that we should awaken the political sense of the masses. There may have been a time in history when it was enough that a few classes, the ruling classes, the learned classes, at most the trading classes should be awake. But the organisation of the modern nation depends on the awakening of the political sense in the mass. This is the age of the people, the millions, the democracy. If any nation wishes to survive in the modern struggle, if it wishes to recover or maintain Swaraj, it must awaken the people and bring them into the conscious life of the nation, so that every man may feel that in the nation he lives, with the prosperity of the nation he prospers, in the freedom of the nation he is free. This work again depends on the village Samiti. Unless we organise the united life of the village we canot bridge over the gulf between the educated and the masses. It is here that their lives meet and that they can feel unity. The work of the village Samiti will be to make the masses feel Swaraj in the village, Swaraj in the group of villages, Swaraj in the district, Swaraj in the nation. They cannot immediately rise to the conception of Swaraj in the nation, they must be trained to it through the perception of Swaraj in the village. The political education of the masses is impossible unless you organise the village Samiti.

Swaraj, finally is impossible without unity. But the unity we need for Swaraj is not a unity of opinion, unity of speech, a unity of intellectual conviction. Unity is of the heart and springs from love. The foreign organism which has been living on us, lives by the absence of this love, by division, and it perpetuates the condition of its existence by making us look to it as the centre of our lives and away from our Mother and her children. It has set Hindu and Mahomedan at variance by means of this outward outlook; for by regarding it as the fountain of life, however, we are led to look away from our brothers and yearn for what the alien strength can give us. The Hindu first fell a prey to this lure and it was the Mahomedan who was then feared and held down. Now that the Hindu is estrange, the same lure is held out to the Mahomedan and the brother communities kept estranged because they look to the foreigner for the source of prosperity and honours and not to their own Mother. Again, in the old days we did not hear of this distress of the scarcity of water from which the country is suffering now so acutely. It did not exist and could not exist because there was love and the habit of mutual assistance which springs from love. The Zemindar felt that he was one with his tenants and could not justify his existence if they were suffering, so his first thought was to meet their wants and remove their disabilities. But now that we look to a foreign source for everything, this love for our countrymen, this habit of mutual assistance, this sense of mutual duty has disappeared. Each man is for himself

and if anything is to be done for our brothers, there is the government to do it and it is no concern of ours. This drying up of the springs of mutual affection is the cause which needs most to be removed and the village Samiti is again the first condition of a better state of things. It will destroy the aloofness, the separateness of our lives and bring us back the sense of community, the habit of mutual assistance and mutual beneficence. It will take up the want of water and remove it. It will introduce arbitration courts and, by healing our family feuds and individual discords, restore the lost sense of brotherhood. It will seek out sick and give them medical relief. It will meet the want of organisation for famine relief. It will give justice, it will give protection and when all are thus working for the good of all, the old unity of our lives will be restored, the basis of Swaraj will have been laid in the tie which binds together the hearts of our people.

This is therefore no empty resolution,it is the practice of Swaraj to which you are vowing yourselves. Bengal is the leader of Indian regeneration, in Bengal its problems must be worked out and all Bengal is agreed in this—whatever division there may be among us—that the recovery of our self-dependent national life is the aim and end of our national movement. If you are really lovers of Swaraj, if you are not merely swayed by a blind feeling, a cry, but are prepared to work out Swaraj, then the measure of your sincerity shall be judged by the extent to which you carry out this resolution. Before the necessity of these village Samitis was realised there was some excuse for negligence, but now that the whole of Bengal is awakened to the necessity, there is none. You have assembled here from Kishoregunj, from all quarters of the Mymensingh district and on behalf of the people of Mymensingh are about to pass this resolution. If by this time next year you have not practically given effect to it, we shall understand that your desire for Swaraj is a thing not of the heart but of the lips or of the intellect at most. But if by that time Mymensingh is covered with village Samitis in full action, then we shall know that one District at least in Bengal has realised the conditions of Swaraj and when one district has solved the problem, it is only a question of time when over all Bengal and over all India, Swaraj will be realised.

April 26, 1908.

Swaraj and the Coming Anarchy

WHOEVER tries to read the sings of the time, will be no little perplexed at first by their complexity. The beginnings of a great revolution which is destined to change the whole political, social, and economic life of a great country, are always full of ebb and flow, perplexing by the multitude of details and their continual interaction. The struggle going on at Tuticorin exemplifies this remarkable diversity and intermingling of numerous tendencies each of which would, in ordinary times, be a separate movement. Society is full of anomalies which clash and jostle together in an inextricable chaos of progress and reaction; economic India is in the throes of a violent transition from the old mediaeval basis of life to the modern; politics is at a parting of the ways. All these various and independent activities of the Indian body politic unite into a huge and confused movement which the man impulse is political and the others are largely inspired, if not motived, by the passions which are at the root of the political upheaval. Great issues of economics wear the guise of a political conflict; immense political

aspirations become mixed up with a purely industrial struggle between indigenous labour and foreign capital. So also in society the old reform movement which was a separate and ineffectual attempt to transform our society according to European ideas, has given place to disquiet and aspiration in the society itself. So long the educated men of the upper castes debated among themselves about the better ordering of society, and outside Bengal and the Punjab it was no better than an academic dispute on the Social Conference platform or between the reforming and orthodox Press. Even in Bengal and the Punjab, the movement was sectional, a revolt of a small minority of the educated few, and did not touch the heart of the people. So far as society as a whole was affected, it was by the new environments of the nineteenth century bringing an irresistible pressure to bear on its outworks, and sometimes by the force of economical necessity born of the modern conditions of India under British rule. The change was from outside and therefore injurious rather than beneficial, for an organism is doomed which, incapable of changing from within, answers only to the pressure of environment. But this immobile state of Hindu society has now begun to pass away and we see the beginning of a profound and incalculable life in the heart of the great organism. Yesterday we hardly needed to reckon with the lower strata of society in our political life ; today they are beginning to live, to move, to have a dim inarticulate hope and to grope for air and room. That is a sign of coming social revolution in which neither the conservative forces of society nor the liberal sympathies of the educated few will have much voice.The forces that are being unprisoned will upheave the whole of our society with a volcanic force and the shape it will take after the eruption is over does not depend on the wishes or the wisdom of men. These social stirrings also are mingling with the political unrest to increase the confusion. The question of the Namasudras in Bengal has become a political as well as a social problem and in other parts of the counry also the line between politics and social questions is threatened with oblieration.

The future is not in our hands. When so huge a problem stares us in the face, we become conscious of the limits of human discernment and wisdom. We at once feel that the motions of humanity are determined by forces and not by individuals and that the intellect and experience of statesman are merely instruments in the hands of the Power which manifests itself in those great incalculable forces. In ordinary times, we are apt to forget this and to account for all that happens as the result of this statesman's foresight or that genius' dynamic personality. But in times like the present we find it less easy to shut our eyes to the truth. We do not affect to believe, therefore, that we can discover any solution of these great problems or any sure line of policy by which the tangled issues of so immense a movement can be kept free from the possibility of inextricable anarchy in the near future. Anarchy will come. This peaceful and inert nation is going to be rudely awakened from a century of passivity and flung into a world-shaking turmoil out of which it will come transformed, strentened and purified. There is a chaos which is the result of inertia and the prelude of death, and this was the state of India during the last century. The British peace of the last fifty years was like the quiet green grass and flowers covering the corruption of a sepulchre. There is another chaos which is the violent reasertion of life and it is this chaos into which India is being hurried today. We cannot repine at the

change. but are rather ready to welcome the pangs which help the storm which purifies, the destruction which renovates.

One thing only we are sure of, and one thing we wear as a life-belt which will buoy us up on the waves of the chaos that is coming on the land. This is the fixed and unalterable faith in an over-rulling Purpose which is raising India once more from the dead, the fixed and unalterable intention to fight for the renovation of her ancient life and glory. Swaraj is the life-belt, Swaraj the pilot, Swaraj the star guidance. If a great social revolution is necessary, it is because the ideal of Swaraj cannot be accomplished by a nation bound to forms which are no longer expressive of the ancient and immutable Self of India. She must change the rags of the past so that her beauty may be readorned. She must alter her bodily appearance so that her soul may be newly expressed. We need not fear that any change will turn her into a second-hand Europe. Her individuality is too mighty for such a degradation, her soul too calm and self sufficient for such a surrender. If again an economical evolution is inevitable, it is because the fine but narrow edifice of her old industial life will not allow of Swaraj in commence and industry. The industrial energies of a free and perfect national life demand a mightier scope and wider channels. Neither need we fear that the economic revolution will land us in the same diseased and disordered state of society as now offends the nobler feelings of humanity in Europe. India can never so far forget the teaching which is her life and the secret of her immortality as to become a replica of the organised selfishness, cruelty and greed which is dignified in the West by the name of Industry. She will create her own conditions, find out the secret of order which Socialism in vain struggles to find and teach the peoples of the earth once more how to harmonise the world and the spirit.

If we realise this truth, if we perceive in all that is happening a great and momentous transformation, necessary not only for us but for the whole world, we shall fling ourselves without fear or misgivings into the times which are upon us. India is the *guru* of the nations, the physician of the human soul in its profounder maladies ; she is destined once more to new-mould the life of the world and restore the peace of the human spirit. But Swaraj is the necessary condition of her work and before she can do the work, she must fulfil the condition.

March 5, 1908.

"....আমাদের জাতীয়তার ইতিহাসে স্বদেশি আন্দোলনের স্থান খুবই উচ্চে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির তলোয়ারকে যে আমরা ভোতা করে দিতে পারি নি, তা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাছাড়া শীঘ্রই নরমপন্থী-গরমপন্থী বলে ভেদাভেদও দেখা দিল—একদিকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাসবিহারী ঘোষ, অম্বিকাচরণ মজুমদার অপর দিকে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষের মতো ব্যক্তির নেতৃত্বে বাংলায় দ্বিধারা স্পষ্ট হতে লাগল। .... ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে দুই পক্ষে তুমুল বিবাদ হল, মঞ্চে আসীন নরমপন্থী নেতাদের লক্ষ্য করে পায়ে জুতা ছোড়া পর্যন্ত ঘটল। 'মডারেট' বা নরমপন্থীরা কোনক্রমে কংগ্রেসে প্রাধান্য বজায় রাখতে তখন ব্যগ্র; বাংলা, মহারাষ্ট্র এবং কতকটা পঞ্জাবে ছাড়া গরমপন্থী (যাদের ১৯০৮ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত Extremists বলা হত) প্রভাব ছিল কম। .... উনিশ শতকের শেষ দিকে মহারাষ্ট্রে যেমন বিদেশি শাসনের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তেমনই বাংলা দেশে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বিপ্লবী মন সন্ত্রাসবাদের দিকে আকৃষ্ট হয়। কাপুরুষ বলে বাঙালির যে অখ্যাতি ছিল, তারা ইংরেজি শিক্ষা আয়ত্ত করে ইংরেজেরই অনুগত সহচর, এই বলে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের

যে দুর্নাম হয়েছিল, যেন সেই অখ্যাতিকে চিরতরে বিলীন করার জন্য অসমসাহসী বাঙালি বিপ্লবীরা সন্ত্রাসবাদ অবলম্বন করে।"

অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথের উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সরকারি নিষ্পেষণ সত্ত্বেও বিপ্লবী কার্যকলাপ ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছিল। কেবলমাত্র সরকারি কার্যকলাপই নয়, রাজনীতিকদের ক্রিয়াকাণ্ডও যুব মনে হতাশার সৃষ্টি করে। যা ক্রমশ সন্ত্রাসবাদকেই একমাত্র সমাধানের পথ হিসাবে বেছে নিয়েছিল। অনুশীলন সমিতি, যুগান্তর দল দু-বাংলার রাজনৈতিক পরিবেশ বদলে দিয়ে প্রশাসনকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে। বিদেশেও ভারতীয় কার্যকলাপ ব্যাপকরূপ পেতে থাকায় শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল ইংরেজ শাসকদের প্রতিনিধিরা। অরবিন্দ আদালতে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন : **"স্বাধীনতা আমার জাগরণের চিন্তা, আমার নিদ্রার স্বপ্ন।"** উল্লাসকর দত্ত বলেছিলেন : "ইংরেজ রাজত্বের উচ্ছেদ সাধন আমার জীবনের ব্রত। এই মহাকার্য সম্পাদনের জন্য জীবন বিপন্ন করে আমরা বোমা বানিয়েছি।" বাংলার অভ্যন্তরে তখন মিন্টো-মর্লি শাসন সংস্কারের প্রলোভনে পড়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী নেতারা আইন সভায় ঢোকার জন্য উন্মুখ। ইংরেজ বাধ্য হয়ে বঙ্গভঙ্গ রদ করল ১৯১১ সালে। কিন্তু পরাধীনতার গ্লানিতে যুব সমাজের ক্ষোভ ক্রমশ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের রূপ পেতে থাকে। কংগ্রেসের অনুরূপ ভিক্ষা ঝুলি নিয়ে ফেরার মত মানসিকতা তাদের ছিল না। তাদের দুঃসাহসিক ক্রিয়াকলাপ দেশের যুব সমাজ নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করল। অকুতোভয় মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে সেদিনের বিপ্লবীদের কার্যকলাপই প্রধান ভূমিকা নিয়েছিল। কোন আপোষকামী মনোভাবের ধারে কাছে তারা ছিল না। বিদেশি সরকারের অনুগ্রহে রাজতিলকও তারা বরণ করে নেয়নি। মৃত্যু, দ্বীপান্তর,জেলখানার নির্মম অত্যাচার তাদের এক মুহূর্তও পথ বিচ্যুত করে নি। তাদের কর্ণে প্রতিধ্বনি তুলেছে বিপিনচন্দ্র পালের আহ্বান **"Our ideal is freedom which means absence of foreign control"— বিদেশি কর্তৃত্ববিহীন স্বাধীনতাই আমাদের লক্ষ্য।**

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়

স্বদেশি আন্দোলনে যে মানুষটির ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য, যার অবদানকে অনেকেই লঘু ভাবে গ্রহণ করেছেন, তিনি হলেন ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। তাঁর 'সন্ধ্যা' পত্রিকা সমকালের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। দুর্বল জাতিকে সাহসী ও সংগ্রামমুখী করতে তার প্রয়াস ছিল আমৃত্যু। যখন তিনি ক্যাম্বেল হাসপাতালে রোগশয্যায় তখনও তাঁর নামে আদালতে মামলা ঝুলছে। আবার নতুন মামলায় জড়ানো হয়েছে। কিন্তু মামলার রায় নিজেই দিয়ে গেলেন। ১৯০৭ সালের ২৭ অক্টোবর ঐ হাসপাতালেই তিনি মারা যান।

> ......গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ছোট বড় ঘাঁটি ও থানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত।....... কেহ কেহ মনে করেন, এই আত্মরক্ষার আয়োজন লুকাইয়া করা উচিত। আমরা ত লুকাইবার কোন কারণ দেখি না। আইন বা বিধিভঙ্গের জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না। বে-আইনি বা বিধিভঙ্গের জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না। বে-আইনি অত্যাচার হইতে লোকরক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই উহার প্রয়োজন। তাই ইহার লুক্কায়িত অনুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই। হইতে পারে ফিরিঙ্গিরা অন্যায় করিয়া এই উদ্যোগে বিঘ্ন ঘটাইবে। তাহা হইলে ত ভালই হয়। যত অন্যায় হয় তত মঙ্গল—দেশের লোকের চৈতন্য হইবে, সাড় হইবে, শক্তি বাড়িবে......'

বয়কটের মর্ম বোঝাতে গিয়ে ব্রহ্মবান্ধব দ্বিধাহীন ভাবেই লিখেছিলেন :

> ......কোন রকমেই সখ করিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল ঢালিব না। লাট মজলিসে সখের নকিরি করিতে যাইব না—অনাহারী কাজিগিরি করিব না—ফিরিঙ্গি আমাকে ঠেঙ্গাইল আর আমি

ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা বন্ধ করিয়া ফিরিঙ্গির আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ আঁটিব না....... বয়কট অর্থে আইনভঙ্গ নহে........যাহা সাধারণ সর্বজনসম্মত বিধিব্যবস্থা—ব্যবস্থাপক দেশিই হউন বা বিদেশিই হউন — তাহা মানা চাই .... কিন্তু যদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা ফাটাইবার বন্দোবস্ত করে—বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার মাথার উপরে গুণ্ডামি করিয়া লাঠি চালায় তাহা হইতে আমার লাঠির বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকাব। যদি দেশীয় রাজার অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয় তাহা হইলেও আমার ঐরূপ প্রতিকার করিবার অধিকার আছে, ফিরিঙ্গি রাজার অধীনের কথা। তাই যখন লাঠির বদলে লাঠি বলা যায় তখন ইহা বলা হয় না যে সব আইন ভাঙিয়া ফেল। ইহাই বলা হয় যে যদি কেহ তোমাকে ঠেঙাইতে আসে কিম্বা তোমার বে ইজ্জৎ করিতে আসে—তা সে ফিরিঙ্গিই হউক বা তার চৌদ্দপুরুষ হউক—তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়ম, সকল নিয়মের চেয়ে বড়।.... ফিরিঙ্গি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কর্তামি জুড়িয়া দিয়াছে......তাহার ঐ কর্তামি ঘুচাইতে হইবে। তাহাকে অতিথি অভ্যাগত রূপে বাড়ির বাহিরে স্থান দিতে হইবে। এই পরকে ঘর হইতে বাহির করাকে বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও...... ।"

কিংসফোর্ডের আদালতে সন্ধ্যার মামলা ওঠে ১৯০৭ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর। ব্রহ্মবান্ধবের কৌঁসুলি চিত্তরঞ্জন দাশ ব্রহ্মবান্ধবের এই বিবৃতি পাঠ করেন :

"I accept the entire responsibility of the publication, management and conduct of the newspaper Sandhya and I say I am the writer of the article Ekhan Theke Gechi Premer Daiwhich appeared in the Sandhya of the 13th august 1907, being one of the articles forming the subject matter of this prosecution But I do not want to take any part in this trial because I do not believe that in carrying out my humble share of the god-appointed mission of Swaraj I am in any way accountable to the alien people who happen to rule over us and whose interest is and must necessarilly be in the way of our true national development"

ব্রহ্মবান্ধব আকস্মিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ইংরেজের আদালতকে তিনি ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। ইংরেজদের কারাগারের বাইরে অন্তিম শয়ানে শায়িত মানুষটির দিকে তাকিয়ে মৃত্যুর পরদিন বন্দোমাতরম পত্রিকায় লেখা হয়েছিল .

"The man of faith speaks uncommon things–he speaks strange truths– for he is a pprophet. He knows the will of providence as whose instrument he works. The messengers of liberty have a despot defying strength which knows no compromise–no defeat. All who work in the train of despotism, hangman, priest, tax-gatherer, soldier, lawyer, lord, jailor and sycophant try to rivet their iron chains on the Messiah of human emancipation, but he eludes their grasp and travel to spheres where kings have little power. The passing away of Upadhyaya Brama bandab when the bureaucrat was pursuing him, with the most unedifying vindictiveness proves beyond the shadow of a doubt that when the infidel supposes that he can very well triumph with the prison, scaffold, Garret, hand cuffs, iron necklace and lead balls at his command. Faith twits him with his audacity and takes his victim far out of his reach."

এই সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী মানুষটির চরিত্র ছিল অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। তিনি ছিলেন বৈদান্তিক, রাজনীতি সচেতন এবং বিপ্লবী। তিনি বুঝেছিলেন, বিদেশি মোহ থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করে আত্মসচেতন করতে হবে। এক্ষেত্রে তাঁর অন্যতম সহযোগী ছিলেন ডন সোসাইটির সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ১৯০৫ সালে স্বদেশি আন্দোলনের এই দু'জন ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলেন। ১৯০৪ সালের নভেম্বর মাসে ব্রহ্মবান্ধব 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। এক পয়সা দামের পত্রিকা

বেরোত প্রতিদিন সন্ধ্যায়। সাধারণ গ্রাম্য ভাষায়, সর্বজনবোধগম্য ভঙ্গীতে লিখিত আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয় ভাব প্রচারে অগ্রণী হয়েছিলেন। ইংরেজ সভ্যতার স্বরূপকে দেশবাসীর সামনে উন্মোচিত করা তমোভাবাচ্ছন্ন বাঙালি জাতির মোহভঙ্গ করা এবং স্বদেশপ্রেম উদ্দীপ্ত করে বাঙালিকে সংগ্রামমুখী করে তুলতে ইতিহাসের এই পর্বে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। "......উপাধ্যায় ছিলেন ভারতীয় স্বরাজ আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। এ স্বরাজ শুধু শিক্ষানীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রেই সীমিত ছিল না। এর মধ্যে রাষ্ট্রিক স্বাধীনতার সুরও ছিল সুস্পষ্ট। তিনি ভারতের জন্য স্বরাজ কামনা করেছিলেন এই কারণে যে, স্বরাজের মধ্য দিয়েই ভারত আবার জগৎসভায় স্বীয় গৌরবের আসন অধিকার করতে পারবে। ইংরেজ সামাজ্যভুক্ত পরাধীন ভারতের কোনো আশা নেই, কোন ভবিষ্যৎ নেই বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। .... মডারেটপন্থী দেশনায়কদের কল্পিত "স্বরাজ" থেকে উপাধ্যায়বাঞ্ছিত "স্বরাজ" ছিল ভিন্ন বস্তু। .... তাঁর দৃঢ় ধারণা ছিল যে, পরাধীন জাতির পক্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব আপোষহীন সংগ্রাম ও চরম আত্ম-বলিদানের দ্বারা। তাই তিনি গতানুগতিক আবেদন-নিবেদনের পথ পরিত্যাগ করে কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করলেন "নিরস্ত্র প্রতিরোধ" বা বয়কটের পথ। বয়কট দর্শনের মূল কথা ছিল বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে জাতীয় জীবনের সকল কর্মক্ষেত্রে ভারতবাসীর নিষ্ঠুর ও বিরামহীন অসহযোগ। ১৯০৫-৬ সনে বাংলার রাজনীতিতে বয়কট দর্শনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা ছিলেন উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব।"*

দে কালীবাড়ী একশ পাঁঠা

অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি
আর কি কারো ভয় রেখেছি?

আমরা যে সেই ভগবানের অভয় পদে প্রাণ সঁপেছি—তিনি কি আমাদিগের মুখের দিকে না তাকাইয়া থাকিতে পারেন। আমরা যে স্বাবলম্বনের পথ ধরিয়াছি—তিনি কি আমাদিগের সহায়তা না করিয়া থাকিতে পারেন? আজ বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা দেখিয়া তাঁহার সিংহাসন টলিয়াছে—তিনি তাই তাঁহার বিচিত্র উপায়ে আমাদিগের চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করিতেছেন। আমরা যে ভাল ধরিতেছি সেই ভালই তিনি ভাঙিয়া দিতেছেন, আর পরোক্ষভাবে এই উপদেশ করিতেছেন যে পর প্রত্যাশীদিগকে আমি এইরূপ কশাঘাত দ্বারাই সৎপথে আনিয়া থাকি। "অভাগা যদ্যপি চায়, সাগর শুকায়ে যায়।" বাঙালি তুমি যত দিন অভাগা থাকিবে, ততদিন মর্লী এলিস ত দূরের কথা—সেই দীনবন্ধু ভগবান পর্যন্ত তোমার প্রতি বিমুখ থাকিবেন। যাহার আত্মপ্রত্যয় নাই আপনার শক্তিতে যে বিশ্বাস করে না, কেবল পরের অনুগ্রহ পরের মহানুভবতা যাহার সম্বল কেহই তাহার সহায় হইবে না। আজ আমরা বিলাত আপিলে দাঁড়াইয়া হটিয়া আসিলাম, আজ সেই উদারতার অনন্ত প্রস্রবণ মূর্তিমান্ সাম্যমৈত্রী মর্লী আমাদিগকে অর্ধচন্দ্র দিলেন। ইহাতে যে আমরা কি পর্যন্ত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তবে কি বঙ্গভঙ্গে আমাদের প্রাণে ব্যথা লাগে নাই? তবে কি বানরিপাড়ার** পিটুনী পুলিসের অত্যাচারে তবে কি সেখানকার পুরনারীর আর্তনাদে আমাদের হৃদয় ভাঙিয়া যায় নাই? তবে কি বরিশালে গুর্খার গুঁতায় আমরা সহানুভূতির অশ্রু বিসর্জন করি নাই? তা নয় আমরা এত দিনে ফিরিঙ্গির স্বরূপ চিনিব।

এত দিন ভগবান স্বহস্তে আমাদিগের চোখের ঠুলি খুলিয়া দিলেন। এত দিনে আমরা ভাঙা বাংলা জোড়া দিবার প্রকৃত পথ বাহির করিতে পারিব এই ভাবিয়া ত আমাদের আর আনন্দ

* উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ—হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়, পৃ. ১০৬ - ১১১

** বানরিপাড়া বরিশাল শহর হইতে কুড়ি মাইল দূরের একটি গ্রাম, ১৯০৫ সনে নভেম্বরের মাঝামাঝি গুর্খা পুলিস দ্বারা গ্রামবাসীর উপর নির্মম অত্যাচার সাধিত হয়।

ধরিতেছে না। পূর্ববঙ্গ! কে বলে তুমি পশ্চিমবঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছ? আমরা ত তোমাকে আরও বেশি করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছি। বরিশালের বানরিপাড়ার সংবাদ কে রাখিত। আর আজ কলিকাতার আবাল বৃদ্ধ বনিতার মুখে সেই বানরিপাড়ার কথা। দক্ষিণেশ্বরের কালী মন্দিরে রামকৃষ্ণ উৎসবে ঐ বানরিপাড়ার নিগৃহীত লোকদিগের জন্য টাকা উঠিতেছে। আজ বরিশালের অশ্বিনীকে, মাদারিপুরের কালীপ্রসন্নকে, বল্লার স্বদেশি বীরদিগকে, জলপাইগুড়ির আদ্যনাথকে, ভবানীপুরের সুরথকুমারকে সমস্ত বঙ্গদেশ সম্মান করিতেছে। ভাঙা বাংলা আর কেমন করিয়া জোড়া লাগাইতে হয়। যাহাদিগের সহিত আমাদের কোন পরিচয় ছিল না,‍ তাহাদিগকে আমরা প্রাণের বন্ধু হৃদয়ের দেবতা বলিয়া আলিঙ্গন করিতেছি, তাহাদিগের বেদনায় দুঃখ জানাইতেছি—যথাসাধ্য সাহায্যের চেষ্টা করিতেছি। এরূপ সৌহার্দ্য কি আর কোন উপায়ে সম্ভব হইতে পারিত! ফুলার যতই ঘা মারিবেন, ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। মিন্টো মর্লী যতই পায়ে ঠেলিবেন ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। ফিরিঙ্গি যতই নিজ মূর্তি পরিগ্রহ করিবেন—ততই ভাঙা বাংলা জোড়া লাগিবে। ছাত্রদিগের প্রতি যতই নির্যাতন হইবে—ততই ভাঙাবাংলা জোড়া লাগিবে। মৃত্যুতে জীবন! আমাদের এই মিথ্যা রাজনৈতিক আন্দোলনের, এই অস্বাভাবিক ফিরিঙ্গি প্রীতির, এই ঘৃণাকর পরমুখাপেক্ষিতার এই বিজাতীয় শিক্ষা সংস্কারের মৃত্যু না হইলে, আমরা জীবনলাভ করিতে পারিব না। আমাদিগের দৃষ্টি, আমাদিগের কাজ কর্ম সব বহির্মুখীন হইয়া রহিয়াছে। আমরা আপনাতে আপনি নাই। সাধক বলিয়াছেন,—

আপনাতে আপনি থাকো
যেও না মন কোনখানে
যা চাবে তাই খুঁজে পাবে,
খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে।

বাহিরের মায়া একেবারে না কাটিলে আমরা অন্তর্মুখীন হইতে পারিব না। বাহ্য বস্তুতে আসক্তির—সামান্য মাত্র কারণ থাকিলে আমাদের আত্মদৃষ্টির উন্মেষ হইবে না। তাই নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয় রাজা রামকৃষ্ণ যেই শুনিতেন যে তাঁহার জমিদারি এক এক করিয়া লাটে উঠিতেছে অমনি জয়কালীর বাড়ি একশ করিয়া বলি দিতেন। আমরাও সেই মহাজনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলি—আজ আমাদের ভুয়া রাজনৈতিক আন্দোলন লাটে উঠিয়াছে, আজ আমাদের মরলী-প্রীতি ঘুচিয়া গিয়াছে, আজ বাহিরে আমরা সব শূন্য দেখিতেছি, আজ ইংলণ্ডের কুয়াশাবৃত-অম্বরে ভারতবাসীর আশাসূর্য একেবারে ডুবিয়া গেল, আজ ইংলন্ডের মহাসভার উদারনীতিক মন্ত্রী সমাজের উদারতম সদস্য মরলী আমাদিগের দরখাস্ত নামঞ্জুর করিলেন—তাই আজ যদি আমাদের চৈতন্য হয় আজ যদি আমরা স্বাবলম্বনের মহিমা বুঝিতে পারি, আজ যদি আমরা আমাদের সামাজিক শক্তি চিনিতে পারি, আজ যদি আমরা মানুষ হইবার পথ খুঁজি, তাই বলি দে জয়-কালীর বাড়ি একশ পাঁঠা।

সন্ধ্যা ১৯০৬ ফেব্রুয়ারি ২৮

অমৃতং মতি ভাসিতম্

প্রিয় "অমৃত" বলিতেছেন, এত দেশ থাকিতে বরিশালে কন্‌ফারেন্স করিবার কারণ কি? বাস্তবিক, কারণ কি? প্রতিধ্বনি জিজ্ঞাসা করিতেছে, কারণ কী?

আমরা বলিতেছি, এবারকার কন্‌ফারেন্স কামস্কট্‌কায় করিলে হানি কি? কামস্কট্‌কা কিঞ্চিৎ কটমট বলিয়া যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে এযাত্রা সিংহলে সমবেত হইলে ক্ষতি কি? বিজয় বাহুর পর আর কোন প্রবল প্রতাপশালি বাঙালি সিংহলে জয়পতাকা প্রোথিত করেন নাই। এবার সিংহল বিজয় করিলে হয় না? রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনায় কালিদাস বলিয়াছেন,—

"প্রতাপোঽগ্রে ততঃ শব্দঃ"

বাঙালির প্রতাপ "বন্দে মাতরম্" কন্যাকুমারীর পথে লঙ্কায় উপনীত হইয়াছে, সংবাদপত্রে পড়িয়াছি। এইবার সেখানে কণ্ঠযন্ত্র সহযোগে "শব্দ" করিলেই তা দিগ্বিজয়ের অর্ধেক ফতে হইয়া যায়? আর সিংহল যদি মনঃপূত না হয়, হিন্দুর প্রাচীন উপনিবেশের ফর্দেও দেশের অভাব নাই। যবদ্বীপ অর্থাৎ যাভা, বলিদ্বীপ অর্থাৎ বালি প্রভৃতি সমুদ্রোর্মিচুম্বিত দেশে কনফারেন্স হইল না কেন? হনোলুলু ও চন্দ্রকোণা, ফিলিপাইন ও তারকেশ্বর, উত্তর মেরু ও ফরেসডাঙা—সব পড়িয়া রহিল, আর বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদে লাট ফুলারের দুটি চক্ষুর বিষ, গুর্খা-বুটমর্দিত বরিশালেই কন্‌ফারেন্স?

এ নির্বাচন কে করিল?

"অমৃত" বলিতেছেন, দুর্দান্ত বরিশালী পুলিস রাঘব বোয়ালের মত বদন ব্যাদান করিয়া আছে। এই যমের মুখে বাংলার বাছা বাছা নায়কদের নিক্ষেপ করিবার দুষ্ট কল্পনা কাহার? বাহিরের লোকে, অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া বরিশালের নেতাদের পুলিসের গ্রাসে সমর্পণ করিবার দুরভিসন্ধিতে এই টোপ্ ফেলে নাই ত? বরিশালের অধিবাসীরা বিভীষিকায় ভয় করে না, ফুলারের মনে এই কাল্পনিক সংস্কার বদ্ধমূল করিবার বৃথা চেষ্টায়, বরিশালে কন্‌ফারেন্স চণ্ডীমণ্ডপের পত্তন হয় নাই ত? "অমৃত" শেষে প্রায় মুক্তকচ্ছ হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন বলি, বরিশালে এবার কন্‌ফারেন্স হইবে ত? যদি বা হয়, সেখানে নামজাদার বদলে বেকার নামহীন নগণ্য প্রতিনিধিদের ভিড় হইবে না ত?

বলা বাহুল্য, এ সব "অমৃতের" প্রশ্ন—অমৃতায়মান অচল অটল সিদ্ধান্ত নয়। কেন না, তাহার পরই অমৃতবাজার বলিতেছেন, এসো, আমরা এক লহমার জন্যেও ধরিয়া লই যে, বরিশালবাসীর হৃদয়ে বল দিবার জন্য, প্রাণে শক্তিসঞ্চার করিবার জন্যই কন্‌ফারেন্স হইতেছে। বরিশাল অনেক সহিয়াছে, এখনও তাহার ক্ষতমুখে রুধির ঝরিতেছে, অতএব, বরিশালই কনফারেন্সের একমাত্র যোগ্য ক্ষেত্র। আমরা বলি সাধু!

অমৃতে আমাদের কোনও কালে অরুচি নাই! বিশেষত সংপ্রতি অত্র দেশে মতান্তর ঘটিলেই মনান্তর, এবং মনান্তর ঘটিলেই একতা নষ্ট হইতেছে। এক্ষেত্রে যত দিন এই একতার জোড়-কলম বেশ জুড়িয়া না যায়, তৎদিন আর মতান্তরের ঝঞ্ঝা তুলিয়া কাজ নাই। অগত্যা আমরা প্রসন্নচিত্তে কামস্কটকা, হনোলুলু যবদ্বীপ প্রভৃতির কন্‌ফারেন্স বক্ষে ধরিবার দাবী তুলিয়া লইতেছি। বরিশালেই কন্‌ফারেন্স বসুক।

এখন দেখা যাক, ভাবী প্রতিনিধিদের অবস্থা। "অমৃতে"র ভাণ্ড হইতেই আমরা কন্‌ফারেন্স সম্বন্ধে এত তথ্য, প্রশ্ন, সম্ভাবনা বিভীষিকা সংগ্রহ করিতেছি। আর এক পশলা অমৃত ধারায় অভিষিক্ত হইতে, বোধ করি, কাহারও আপত্তি নাই। আর, যখন এহাটে কোনও আপত্তিই তুলিবার রীতি নাই, তখন আর ভয় কি? "অমৃত" সংস্কৃত নাটকের কঞ্চুকীর ন্যায় "আকাশে" জিজ্ঞাসা করিতেছেন—"ধর্মক্ষেত্রে বরীশালে সমবেতা যুযুৎসবঃ", সুরেন্দ্র ও নরেন্দ্র ও মতিদাদার ন্যায় নায়কদের ধরিয়া বরিশালের জেল-নামক জঘন্য খাঁচায় পুরিবে না ত? বরিশালের কন্‌ফারেন্সের পাণ্ডা ও নেতাদের আবার অনাহারী কন্‌ষ্টেবল করিবে না ত?

আমরা বলি, একটু ইংরেজী করিয়াই বলি, সে সব এখন ভবিষ্যৎ গর্ভিনীর গর্ভে। যখন দৈবজ্ঞ ঠাকুর এত খড়ি পাতিয়াও ফিরিঙ্গির অভিসন্ধি নির্ণয় করিতে পারিলেন না, তখন আমাদের বিশ্বাস, উত্তরের আশা নাই।

এবার ত বরিশালে দুর্ভিক্ষ। শুনিয়াই একটু দমিয়া গিয়াছি। "অমৃত" ভুলিয়া যান, কিন্তু আমাদের মনে আছে,—বরিশালে কন্‌ফারেন্সের কথা পূর্ব্বেই স্থির হইয়াছিল। তখন স্বদেশিও ছিল না, সুতরাং মালক্ষ্মীর অন্নক্ষেত্র বরিশাল হইতে পেলার হিসাবে মনে করিয়াছিলাম, কিঞ্চিৎ বালাম সংগ্রহ করিয়া আনিব। দুর্ভিক্ষ বরিশালে মানুষ খাইতেছে—সঙ্গে সঙ্গে আমার সে আশারও মাথা

খাইয়াছে। পেলা চুলায় যাক, খোরাকীর ভাবনায় ঘুম হইতেছে না। অশ্বিনী বাবুকে জিজ্ঞাসা করি, দক্ষিণ হস্তের বন্দোবস্ত কিরূপ? রসদের উপরই যুদ্ধের জয় পরাজয় নির্ভর করে। রসদের পরিপাটী ব্যবস্থা সর্বাগ্রে আবশ্যক। যার যেখানে ব্যথা তার সেখানে হাত। তাই অমৃতের কেবল নেতাদের চিন্তা, আর আমরা প্রতিনিধিদের ভাবনায় অস্থির।

যদি পোলাও কাবাব না থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বরিশালই কারাগার। গজৎ একেই জীর্ণারণ্য, তার উপর কন্‌ফারেন্সে যদি আলুভাতে ভাতই সম্বল হয়, তাহা হইলে জেলে যাইতেই বা হানি কি? বরিশালের জেলে দাদখানি চাউলের অন্ন, একটু ঝোল ও কিঞ্চিৎ বল্‌কা দুধ পাইব ত? হরিনামের ঝুলিটি হাতে রাখতে দিবে ত?

এবারে "অমৃতে"র হ্যামলেট-ভাবের অনুধ্যান করুন। To be or not to be, that is the question. ইহার বাঙ্গলা অনুবাদ বোধ করি কোনও মহিলাকবি এইরূপ করিয়াছেন, "হয় কি না হয় প্রশ্ন ইহাই এখন।" প্রশ্ন গুরুতর। যাই কি না যাই একদিকে চক্ষুলজ্জা, লোকের উপহাস, ফিঙ্গের উপদ্রব। ওদিকে গুর্খার গুঁতার আশঙ্কা, নিদারুণ জেলের ভয়, ফিরিঙ্গির প্রেম-সাধে বাদ, তার উপর দুর্ভিক্ষ, সুতরাং রসাভাব। কি করি। যাই কি না যাই! "অমৃত" বলিতেছেন, এবার সকলেই চল। পূর্ব হইতে পশ্চিম ও উত্তর হইতে দক্ষিণ চৌহদ্দী করিয়া ভাঙা ও অভাঙা, সমগ্র বাংলার নায়ক বা নেতা মনুষ্যদের একটা ফর্দ কর। তাঁহাদের শপথ করাইয়া লও যে, এবার বরিশালের কন্‌ফারেন্সে নিশ্চিত হাজিরা দিব। অবশ্য যাঁহারা 'ইন্‌ভ্যালিড্' অর্থাৎ শয্যাগত তাঁহাদের ছুটি। আমরা আবার বলি সাধু!

প্রতিজ্ঞা করিয়াছি প্রতিবাদ করিব না, কিন্তু একটু ত্রুটির উল্লেখ না করিলে নয়। তাই ভয়ে ভয়ে বলিতেছি, এই পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ ঘিরিয়া বাংলা জুড়িয়া যে জাল ফেলিলেন, ইহাতে এত বড় একটা ছিদ্র রাখিয়া দিলেন কেন? ঐ যে শয্যাগত—মহারন্ধ্র, ঐ পথে ত বাংলার যত রুই কাতলা, মৃগেল বাহির হইয়া যাতে পারে! তখন কি পঙ্কচারী রোগা কই সিঙ্গি, চ্যাং ছাঁকিয়া তুলিয়া বরিশালের রাজনীতি দীর্ঘিকায় ছাড়িয়া দিবেন? অমৃত দাদা আপনি যে বলিতেছেন—স্বয়ং যাইবেন, তাহাই কি এই "ইন্‌ভ্যালিড" ছিদ্র থাকিতে ঘটিয়া উঠিবে? কন্‌ফারেন্সের প্রসঙ্গে আপনার বাজারে যেরূপ "হা হতোস্মিন" রব উঠিতেছে, তাহাতে মনে হয়, আপনার স্নায়ুর অবস্থাও শঙ্কাজনক। আপনি যদি ইন্‌ভ্যালিডের খাতে পড়িয়া যান, তাহা হইলেই ত সব মাটি! নভেলের ভাষায় বলিতে গেলে, বাগবাজারের গগনমণ্ডলের এক কোণে একটু ভয়ের একটু সন্দেহের কালো মেঘ দেখা দিয়াছে।

কাশীরাম দাসের মহাভারতে আছে,

> "পুনঃ পুনঃ ধৃষ্টদ্যুম্ন ডাক দিয়া বলে,
> লক্ষ্য বিঁধিবারে যত ক্ষত্রিয় সকলে।"

ইহার অর্থ যে নিশ্চেষ্ট দেখিলেই ডাক দিয়া লক্ষ্য বিঁধিতে বলিতে হয়। ধৃষ্টদ্যুম্নও ডাক দিয়াছিলেন, "অমৃত" ও দিতেছেন। ধৃষ্টদ্যুম্নের আওয়াজ ভরাট, অমৃতের গলা একটু কাঁপিতেছে। কালের প্রভাব।

আমাদের পরামর্শ, শুধু ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির কর্ম নয়। যদি কন্‌ফারেন্স সফল করিতে চান, তাহা হইলে যেমন রোগ সেই ঔষধের ব্যবস্থা করুন। প্রথমতঃ ফুলার-ভয় নিবারণের প্রার্থনা করিয়া মিণ্টোর নিকট দরখাস্ত ও মরলীর নিকট 'তার' করুন। এই দরখাস্ত দুইখানির ও মহারাণীর সেই মামুলি ঘোষণাপত্রের লিখো প্রতিলিপি করিয়া বড় বড় তাম্রময় কবচে রক্ষা করুন। সেই কবচ একটু স্থূল রজ্জুসহযোগে গলদেশে ধারণ করিয়া বরিশালে গমন করুন, আর ফুলার-ভয় থাকিবে না। অবশ্য নেতাদের জন্য একটু বিশেষ রামকবচ আবশ্যক। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের দিন নেতাদের পক্ষ হইতে প্রজাদের যে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহাদের কবচে তাহাও

থাকিবে। গলায় দিবার দড়ি যেমন একটু মোটা ও মজবুৎ হয়, নতুবা ছিঁড়িয়া পড়িবার সম্ভাবনা। তাহা হইলে দুঃখের সীমা থাকিবে না। *সন্ধ্যা ১৯০৬ মার্চ ২৯*

বয়কটের মর্ম

"বারে বারে বলিয়াছি যে শুধু নুন-চিনি-কাপড়ের স্বদেশি হইলে চলিবে না। বিলাতি-বর্জনের অর্থ—কেবল ফিরিঙ্গির মালপত্র বয়কট নহে—কিন্তু খাস ফিরিঙ্গিকে বয়কট করা চাই। সে কি রকম।—ফিরিঙ্গি আমাদের শাসন করে। ঐ শাসনকার্যে আমরা যাচিয়া সহায়তা করিব না। যেখানে পেটের দায় বা ইজ্জতের দায় সেখানে করিতেই হইবে। দায়ে পড়িয়া যখন ফিরিঙ্গির সহায়তা করিতে হইবে—তখন যেন এই ভাবটি মনে থাকে—পড়েছি মোঘলের হাতে—খানা খেতে হবে সাথে। কিন্তু কোন রকমেই সখ করিয়া গিয়া ফিরিঙ্গির শাসনচক্রে তৈল ঢালিব না। লাটমজলিশে সখের নকিবি করিতে যাইব না—আনাহারী কাজাঁগিরি করিব না।—ফিরিঙ্গি আমাকে ঠেঙ্গাইল — আর আমি ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা বন্ধ করিয়া ফিরিঙ্গির আদালতে আশ্রয় গ্রহণ করিবার পরামর্শ আঁটিব না।

কেহ কেহ বলিতে পারেন—যদি ফিরিঙ্গিকেই বয়কট করিতে হয় ত ফিরিঙ্গির আইন পর্যন্ত মানা উচিত নয়। একজন আমার নামে মিথ্যা মিথ্যা নালিশ করিয়াছে ও ফিরিঙ্গি আদালত হইতে শমন বাহির হইয়াছে। আমি নির্দোষী—তার উপর আবার বয়কটকারী। আমার ঐ ফিরিঙ্গি আদালতের শমন অগ্রাহ্য করা উচিত।

একটু স্থির হইয়া ভাবিলে—মনকে চোখ না ঠারিয়ে সোজাসুজি দেখিলে বুঝা যায়—যে বয়কট অর্থে আইন-ভঙ্গ নহে। আমি নির্দোষী বা দোষী—তাহাতে কী আসে যায়। যে নালিশ করিয়াছে—সেও ভাবিতে পারে যে সে নির্দোষী। আইনের সাহায্যে বিচার করিয়া ওই সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে—দোষীকে দণ্ড দিতে হইবে। যদি আমাদের রাজা দেশি হইতেন—তবুও আমাকে ঐ আদালতের আইন মানিয়া লইতে হইত। আইন বস্তুটিকে মানিতেই হইবে।

যাহা সাধারণ-সর্বজনসম্মত বিধিব্যবস্থা—ব্যবস্থাপক দেশিই হউন বা বিদেশিই হউন—তাহা মানা চাই। হইতে পারে যে কোন দোষের জন্য বিদেশি আইনে কম বা বেশি দণ্ড হয়—আর স্বদেশী আইনে সেই দোষেই বেশী বা কম হয়—কিন্তু আইনের বশ্যতা তোমাকে সকল দেশে সব কালে স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু যদি সিপাহীরা শমন ধরাইতে আমার মাথা ফাটাইবার বন্দোবস্ত করে—বা আমি চলিয়া যাইতেছি আর আমার উপরে গুণ্ডামি করিয়া লাঠি চালায়—তাহা হইলে আমার লাঠির বদলে লাঠি ধরিবার অধিকার আছে। ইহা বিধাতার দেওয়া অধিকার। যদি দেশীয় রাজার অধীনে এইরূপ অত্যাচার হয়—তাহা হইলেও আমার ঐরূপ প্রতীকার করিবার অধিকার আছে—ফিরিঙ্গি-রাজার অধীনে—কা কথা।

তাই যখন লাঠির বদলে লাঠি বলা যায়—তখন ইহা বলা হয় না যে সব আইন ভাঙিয়া ফেল। ইহাই বলা হয় যে যদি কেহ তোমাকে ঠেঙ্গাইতে আসে কিংবা তোমার বে-ইজ্জত করিতে আসে —তা সে ফিরিঙ্গিই হউক বা তাহার চৌদ্দপুরুষ হউক তাহাকে ঠেঙ্গার বদলে ঠেঙ্গা দেখাইবে। ইহা বিধাতার নিয়ম—সকল নিয়মের চেয়ে বড়।

অবশ্য—ইহার ভিতরে অনেক কথা আছে। ফিরিঙ্গি ঘরের ভিতরে ঢুকিয়া কুর্তামি জুড়িয়া দিয়াছে—তোমার প্রাণের দায় মানের দায় অর্থের দায় শিক্ষাদীক্ষার দায় সে নিজের ঘাড়ে লইয়াছে—আর তুমি তার মুখের পানে চাহিয়া হাতযোড় করিয়া বসিয়া আছ। তাহার ঐ কুর্তামি ঘুচাইতে হইবে। তাহাকে অতিথি-অভ্যাসগতরূপে বাড়ির বাহিরে স্থান দিতে হইবে। এই পরকে ঘর হইতে বাহির করাকেই বয়কট বলে। ভাবের কথা ভাবে বুঝিয়া লও। আইনভাঙ্গাকে বয়কট

বলে না। যাহাতে সেই সনাতন-তন্ত্রের অধীনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতে পারি—এস—তাহারই সাধনা করি—ফিরিঙ্গিকে বয়কট করি।" *সন্ধ্যা ১৯০৬ নভেম্বর ২৩*

বিপিনচন্দ্র পাল

বিপিনচন্দ্রকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রথম দেখা যায় ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে। সেই অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন : I was a democrat, a democrat of the democrats, a radical of radicals, yet I said that neither my democracy nor my radicalism took away in the least measure from my loyalty to the British Government." এই মানুষটি বিদেশ থেকে ফেরার পর ১৯০১ সালে প্রকাশ করেন "নিউ ইন্ডিয়া" পত্রিকা। পত্রিকার পাতায় সরকারের জনবিদ্বেষী- নীতির বিরুদ্ধে নানাবিধ মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ রচনার মধ্য দিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে থাকেন। মডারেটপন্থী বিপিনচন্দ্র তখনও মনে করতেন, বিদেশি সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু ১৯০৩ সালের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব তাঁর চিন্তাধারাকে আমূল বদলে দেয়। নিউ ইন্ডিয়ায় সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। তিনি বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনকে দেখেছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে। ১৯০৬ সালে বিপিনচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'নিউ ইন্ডিয়া' ও 'বন্দেমাতরম' দুটি পত্রিকা একসঙ্গে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৯০৬ সালে স্থায়ীভাবে কলকাতায় চলে আসবার পর, তিনি বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীতে যোগ যেন। অরবিন্দ ছিলেন চরমপন্থী গণঅভ্যুত্থানে আস্থাশীল। বিপিনচন্দ্র এই মতের সমর্থক ছিলেন না। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকার সংস্রব ত্যাগ করেন বিপিনচন্দ্র। কিন্তু ১৯০৮ সালে অরবিন্দ পুলিশের হাতে ধরা পড়ার পর, বিপিনচন্দ্র আবার বন্দেমাতরমে যোগ দেন। কোনরকমের হিংসাত্মক কার্যকলাপে বিপিনচন্দ্র ও তাঁর অনুগামীদের কোন সমর্থনই ছিল না।

তবুও অস্বীকার করা যায় না, বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অন্যতম নেতা ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল। ইংরেজের আধিপত্যকে তিনি অস্বীকার করে দেশের যুবসমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তিনি ছিলেন সর্বজন শ্রদ্ধেয়। তাঁর বক্তৃতাবলী অধুনা দুষ্প্রাপ্য এবং অনালোচিত। কিন্তু ১৯০৫ থেকে পরবর্তী কালের রাজনৈতিক আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা অস্বীকার করা যাবে না। বিপিনচন্দ্র বলেছিলেন : "...স্বাধীনতার প্রেরণা বা মুক্তির বাসনা মানুষের অন্তরে একবার জাগিলে তাহার সমগ্র চিত্ত ও চরিত্রকে অধিকার না করিয়া ছাড়ে না। যে একবার জীবনের কোনও বিভাগে সত্যকার মুক্তির আস্বাদ পাইয়াছে, সে কোন বিশেষ বিষয়ে কোন প্রকারের বন্ধন বহিতে পারে না। এইজন্য নবযুগের বাংলায় ধর্ম ও সমাজদ্রোহিতার আকারে যে মুক্তি-বাসনা প্রথমে আপনাকে সফল করিতে চাহিয়াছিল, অতি অল্পকালের মধ্যে তাহা আমাদের আধুনিক রাষ্ট্রীয় জীবনেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা জাগাইয়া তুলিল। ধর্মে ও সমাজে স্বাধীন হইব, অথচ রাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা সম্বন্ধে একটা বিজাতীয় প্রভুশক্তির অধীন হইয়া রহিব, সহা সম্ভব নহে। ইংরাজিনবীস বাঙালি ব্রাহ্ম সমাজের আশ্রয়ে আসিয়া প্রথমে সমাজ-ভয়কে জয় করিয়াছিলেন। সত্যের প্রেরণায়, শাস্ত্র ও সমাজ শাসন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ইহারা রাষ্ট্রীয় শাসনের বন্ধন কাটিবার জন্য সহজে বদ্ধপরিকর হইয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপে বাংলার নবযুগের স্বাধীনতার সংগ্রামে শাস্ত্রদ্রোহিতা ও সমাজদ্রোহিতায় রাষ্ট্রদ্রোহিতা জাগ্রত হয়।

'ইংরাজি শিক্ষা ও য়ুরোপীয় সাধনা কেবল ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের আদর্শের প্রতিষ্ঠা করে নাই,

আমাদের অন্তরে একটা নূতন স্বাজাত্যভিমান বা স্বদেশ হিতৈষিতা কিম্বা patriotism-এর আদর্শও জাগাইয়া তুলে। ইংরাজি শিক্ষার প্রভাবে প্রাচীন ও আধুনিক মনুষ্য-সমাজের জ্ঞানলাভ করিয়া আমরা নিজেদের হীনতা বোধ করিতে আরম্ভ করিলাম। দুনিয়ার সম্মুখীন হইয়া দেখিলাম—

চীন, ব্রহ্মদেশ অসভ্য জাপান
তারাও স্বাধীন তারাও প্রধান
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।

কেবল আমরাই এত বড় একটা প্রাচীন সভ্যতা ও সাধনার উত্তরাধিকারী হইয়াও পরাধীন ও হেয় হইয়া রহিয়াছি। জগতের স্বাধীন দেশের তুলনায় নিজেদের রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা আমাদের অন্তরে এক অভিনব বেদনা জাগাইয়া তোলে। এই বেদনার ভিতর দিয়া আমাদের আধুনিক স্বাদেশিকতা এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম হয়।*

বিপিনচন্দ্রের মধ্যে যে তেজস্বিতার প্রকাশ স্বদেশি আন্দোলনের প্রথম পর্বের সূচনায় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল, পরবর্তী সময়ে তা অনেক স্তিমিত হয়ে আসে। রাজনীতির সঙ্গে তাঁর সংযোগও ক্ষীণ হয়ে যায়। তবুও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে অস্বীকার করলে ইতিহাসেরই অমর্যাদা হবে।

পরবর্তীকালে গোপাল হালদার বিপিনচন্দ্র পাল সম্পর্কে বলেছেন :

"রাষ্ট্রচিন্তায় ও রাষ্ট্রসাধনায় বিপিনচন্দ্র স্বদেশিয় যুগে উগ্রপন্থী (Extremist) বলেই পরিচিত ছিলেন, চরমপন্থী (Moderate) বা উদারপন্থী ছিলেন না। জাতীয়তাবাদী হিসাবে তিনি সে সময়ে পূর্ণ স্বাধীনতাকে আমাদের রাষ্ট্রাদর্শরূপে স্থাপন করতে চান। সংস্কার অপেক্ষা সংগ্রামকেই করেন রাষ্ট্রীয় সাধনার নীতি। আবার উদারনীতিক যুক্তিবাদ ও ব্যবহারিক বুদ্ধিও তিনি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তাই পরবর্তীকালে তিনি আবার বলেছেন, স্বাধীনতা অর্থ বিচ্ছিন্নতা নয় সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ আত্মাধিকার লাভ। স্বাধীনতার এই ব্যাখ্যা কংগ্রেসের গ্রাহ্য, কিন্তু দেশের স্বীকার্য নয়। অবশ্য বিপিনচন্দ্রের পক্ষে তা ছিল একটা যুক্তিমাত্র। তাঁর যুক্তি বাস্তবকে মেনে চলত। তাই সংগ্রাম-পন্থী হলেও তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের ও গুপ্ত ষড়যন্ত্রের পথ-অনুমোদন করতেন না। অরবিন্দের সঙ্গে তার এই দিকে ছিল পার্থক্য। নিরস্ত্র প্রতিরোধ (Passive Resistance) ও জাতীয় আত্মগঠনের পদ্ধতিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনাই ছিল বিপিনচন্দ্রের অনুমোদিত পদ্ধতি (Swaraj Its ways and Means, 1907)।...বাংলার নবযুগের সাধনায় কিন্তু গণতান্ত্রিক বোধ প্রবল বা পরিষ্কার ছিল না—মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী জাতির জীবন ও জনসাধারণের থেকেও অনেকাংশে বিচ্ছিন্ন ছিল। বিপিনচন্দ্রের জাতীয়তাবাদ কেন, সমগ্র জীবনদর্শনই ছিল এই বিচ্ছেদের বিরোধী। তাঁর রাষ্ট্রসাধনায় জনশক্তিই শক্তির প্রধান উৎস হয়, তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় ও গণতান্ত্রিক আদর্শকে তিনি প্রাধান্য দান করেন।...ভারতীয় ঐতিহ্য আজ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট। তার মূল সূত্র 'বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা'—রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মহামনস্বীদের কৃপায় আজ আমরা তাকে স্বতঃসিদ্ধ প্রতিজ্ঞারূপে গ্রহণ করি। বিপিনচন্দ্র ভারতেতিহাসের এই মূল সত্য স্বয়ং উপলব্ধি করে আমাদের রাষ্ট্রচিন্তায় তা প্রতিষ্ঠিত করতে কম সাহায্য করেন নি। ভারতীয় জাতীয়তার ব্যাখ্যায় তিনি বারবারই বলেছেন—সকল সম্প্রদায়, সকল জাতির সমবিকাশেই তার প্রকাশ, সকলের স্বাধীন অধিকারেই তার বিকাশ (Composite Patriotism ; The Nationalist view, 1905), সংযুক্তরাষ্ট্র (United States) ও সম্মিলিত মহাজাতি এই আমাদের জাতীয়তার রূপ। ...সেদিনকার জাতীয় উন্মাদনার দিনে সবাই যখন চাইছিল 'ম্যাজিক' তখন বিপিনচন্দ্র লজিক নিয়েই আরও বাড়াবাড়ি করতে লাগলেন। তিনি যুক্তি আশ্রয় করলেন, ঠিক কিন্তু গণ আন্দোলনের বিপুল স্রোত থেকেও বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, ক্ষুদ্রতর বাধায় কন্টকিত হয়ে রইলেন। তাঁর নবযুগের যুগদৃষ্টি

* বাংলার নবযুগ—বিপিনচন্দ্র পাল। পৃ. ২৬৯-৭০

'অভিযানের যুগ' পেরিয়ে যে গণ-বিপ্লবের আভাষ একবারের মতো প্রত্যক্ষ করেছিল, তা আর প্রসারিত হতে পারল না, সীমাবদ্ধ হয়ে রইল—এটি তাঁর রাজনৈতিক ট্র্যাজেডি।...*

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন কেবলমাত্র রাজনৈতিক বক্তৃতা ও সভা সমিতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গঠনমূলক দিকটিও ধীরে ধীরে দানা বেঁধেছিল। বিশেষ করে শিক্ষার ক্ষেত্রে। বাংলার শিক্ষার ক্ষেত্রটি পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশি সমাজ" গঠনের পরিকল্পনা দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করে। ছাত্ররা তখন স্কুল কলেজের বাইরে জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বৃহৎ জাতীয় আন্দোলনের শরিক হয়ে উঠেছে। তারা সরকারি শিক্ষায়তনের মোহমুক্ত। আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠলেন। অরবিন্দ সে সময়ে লিখেছিলেন :

A National University**

THE idea of a National University is one of the ideas which have formulated themselves in the national consciousness and become part of the immediate destiny of a people. It is a seed which is sown and must come to its fruition, because the future demands it and the heart of the nation is in accord with the demand. The process of its increase may be rapid or it may be slow, and when the first beginnings are made, there may be many errors and false starts, but like a stream gathering volume as it flows, the movement will grow in force and certainty, the vision of those responsible for its execution will grow clearer, and their hands will be helped in unexpected ways until the purpose of God is worked out and the idea shapes itself into an accomplished reality. But it is necessary that those who are the custodians of the precious trust, should guard it with a jealous care and protect its purity and first high aim from being sullied or lowered.

There have been many attempts before the present movement to rescue education in India from subservience to foreign and petty ends, and to establish colleges and Schools maintained and controlled by Indians which would give an education superior to the Government-controlled education. The City College, the Ferguson College and others started with this aim but they are now monuments of a frustrated idea. In every case they have fallen to the state of ordinary institutions, replicas of the Government model, without a separate mission or nobler reason for existence. And they have so fallen because their promoters could not understand or forgot that the first condition of success was independence—an independence jealously preserved and absolute. In other words there can be no national education without national control.

A certain measure of success has been secured by two institutions of a later birth, the Benares Hindu College and the Dayanand Anglo-Vedic College. These are successful institutions, but isolated. They have not developed into centres of a network of schools affiliated to them and forming one corporate body. They have not in themselves the makings of Universities. So far as they give religious teaching they are a wholesome departure from the barren official form of education, but that is only one part of education on national lines. National

* নবযুগ ও বিপিনচন্দ্র—গোপাল হালদার। পরিচয়। ১৩৬৫ মাঘ। পৃ. ৫০৩-৫০৫

** BandeMataram, February 24, 1908

education cannot be defined briefly in one or two sentences, but we may describe it tentatively as the education which starting with the past and making full use of the present builds up a great nation. Whoever wishes to cut of the nation from its past is no friend of our national growth. Whoever fails to take advantage of the present is losing us the battle of life. We must therefore save for India all that she has stored up of knowledge, character and noble thought in her immemorial past. We must acquire for her the best knowledge that Europe can give her and assimilate it to her own peculiar type of national temperament. We must introduce the best methods of teaching humanity has developed, whether modern or ancient. And all these we must harmonise into a system which will be impregnated with the spirit of self-reliance so as to build up men and not machines—national men, able men, men fit to carve out a career for themselves by their own brain-power and resource, fit to meet the shocks of life and breast the waves of adventure. So shall the Indian people cease to sleep and become once more a people of heroes, patriots, originators, so shall it become a nation and no longer a disorganised mass of men.

National education must therefore be on national lines and under national control. This necessity is the very essence of its being. No one who has not grasped it can hope to build up a National University. Mrs. Besant has recently begun a campaign in favour of national education and in a recent speech has outlined her idea of a National University. We have every respect for this great orator and organiser, but we are bound to point out that an university organised by Mrs. Besant will not be a National University. In the first place the future University must be one built up by the brain and organising power of India's own sons. It shall never be said that the first national University in India was the creation of a foreigner and that the children of the Mother were content to follow and imitate but could not lead and originate. Such a charge would be fatal to the very object of the University. Secondly, Mrs. Besant has forgotten that the basis of a National University has already been laid. The National Council of Education in Bengal has already commenced the great work on lines which have only to be filled in, and their work has received the blessing of God and increases. But Mrs. Besant has omitted to make any mention of their work and speaks as if she intended to have the Benares College as the basis of the National University. But the Benaras College has shown itself unfit for so huge a task. It has been obliged to rely on foreign funds and to court Government patronage. Even the Dayanand Anglo-Vedic College is a more robust growth, for it has been built up by the munificent self-sacrifice of the Arya Samaj. No institution which cannot rely on the people of India for its support and built itself up without official support or patronage, can be considered to have established its capacity of developing into a National University. Finally, Mrs. Besant shows by her scheme that she is not in possession of the true secret of the movement. She wants a Charter from England. We are aware that she talks of organising the University with the help of Indian talent and keeping it as a preserve for Indian control, but when she asks for a Charter it is evident that she has not realised what national control implies. No Government will give a Charter which excludes them from all control. There may be no provision for control in the Charter itself, but the power that gives the Charter can at any moment insist on seeing that the University

merits the Charter. Once this constructive possibility of control is allowed to overshadow the infant institution, goodbye to its utility, its greatness, its future. It will follow the way of other schools and colleges and become a fruitless idea, a monument of wasted energy and frustrated hopes.

ব্যারিস্টার স্যর আশুতোষ চৌধুরী বাংলার নেতৃবৃন্দকে একটি সমাবেশে আমন্ত্রণ জানান, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারে আলোচনার উদ্দেশ্যে। ১৯০৫ সালের ১৬ নভেম্বর বাংলার বিশিষ্ট চিন্তানায়করা পার্ক স্ট্রিটে বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনের হলে মিলিত হলেন। তাদের আলোচনার বিষয় ছিল জাতীয় শিক্ষার একটা বাস্তবসম্মত রূপ দেওয়া। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ঃ

> That in the opinion of this conference it is desirable and necessary that a National Council of Education should be at once established to organise a system of Education – Literary, Scientific and Technical – on National lives and under National control, and that the following gentlemen should be appointed, as a Provisional Committee to take immediate steps to further this object and that the committee be instructed to submit their report within three weeks :

ড. রাসবিহারী ঘোষ, এম. এ. ডি. এল, সি. আই. ই.
শ্রী গুরুদাস ব্যানার্জি, কেটি. এম. এ., ডি. এল.
শ্রী টি. পালিত, বার-অ্যাট-ল
রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি, এম. এ., বি. এল
শ্রী পি. মিত্র, বার-অ্যাট-ল
শ্রী এ. কে. ঘোষ, বার-অ্যাট-ল
মি. এ. রসুল, এম. এ., বি. সি. আই, বার-অ্যাট-ল
শ্রী যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, এম. এ., বার-অ্যাট-ল
শ্রী এন. ঘোষ, বার-অ্যাট-ল
শ্রী নরেন্দ্রনাথ সেন
শ্রী মতিলাল ঘোষ
শ্রী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি
শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রী সুবোধচন্দ্র মল্লিক
শ্রী কালীনাথ মিত্র
শ্রী গোনেশচন্দ্র চন্দ্র
শ্রী ক্ষুদিরাম বোস, বি. এ.
শ্রী হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, এম. এ.
শ্রী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, এম. এ.
শ্রী গিরীশচন্দ্র বোস, এম. এ., এম. আর. এ. এস.
শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, এম. এ.
শ্রী এন. সি. দাস, এম. এ.
শ্রী মোহিতচন্দ্র সেন, এম. এ.
শ্রী বি. চক্রবর্তী, এম. এ., বার-অ্যাট-ল
শ্রী সি. আর. দাশ, বার-অ্যাট-ল
শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম. এ., বি. এল.
রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, এম. এ., বি. এল.
শ্রী সতীশচন্দ্র মুখার্জি, এম. এ. বি. এল.
মৌলভী সৈয়দ মহম্মদ করিম আগা
ড. আর. জি. কর, এল. আর. সি. পি.
ড. শশীভূষণ মিত্র, এম. বি., বি. এস. সি. (লন্ডন)
ড. অমৃতলাল সরকার, এল. এম. এস.
ড. প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, এম. এ., এম. বি.
ড. দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, এম. এ., বি. এল.
ড. মোহিনী মোহন চ্যাটার্জি বি. এ., বি. এল.
ড. বনওয়ারীলাল চৌধুরী, বি.এ., বি. এসসি.
ড. মনোমোহন ভট্টাচার্য, এম. এ.
শ্রী যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, এম. এ., বি. এল.
শ্রী বিপিনচন্দ্র পাল
শ্রী ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এম এ., বি. এল.
শ্রী এ. চৌধুরী এবং
ড. নীলরতন সরকার (সম্পাদক)

—সম্মেলন একটি অস্থায়ী ট্রাস্টি গঠন করা হয় দাতাদের অর্থ গ্রহণের জন্য। এই ট্রাস্টি বোর্ডে ছিলেন :

রাজা পিয়ারীমোহন মুখার্জি
মি. টি. পালিত,
শ্রী সুবোধচন্দ্র মল্লিক
শ্রী গোনেশচন্দ্র চন্দ্র
শ্রী কাশীনাথ মিত্র

কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট পান্তির মাঠে (এখন যেখানে বিদ্যাসাগর কলেজের হোস্টেল) এক বিশাল সমাবেশে ১৫০০০ হাজার মানুষ সমবেত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ছিল ছাত্র। সমাবেশে পূর্ব দিনে গৃহীত সিদ্ধান্ত জনসাধারণকে জানাবার পর ঘোষণা করা হয় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে এক লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে প্রচণ্ড উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে জনগণই তাঁকে "রাজা" উপাধিতে ভূষিত করে। উৎসাহী ছাত্ররা ঘোড়াহীন একটি গাড়িতে চাপিয়ে তাঁকে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িতে নিয়ে যায়।

কয়েকদিনের মধ্যে ময়মনসিংহের গৌরীপুরের ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৫ লক্ষ টাকা এবং ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের গঠনকল্পে। অস্থায়ী কমিটি যে খসড়া পরিকল্পনা রূপায়ণ করে, আর একটি কমিটি সেই পরিকল্পনার বেশ কিছু পরিবর্তন করার পর তা গৃহীত হয় ১৯০৬ সালের ১১ মার্চের সভায়। বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশনে এই সভা হয়। বলা যায়, এই সভায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠিত হয়। এ সম্পর্কে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

The first great constructive effort of the Swadeshi Movement – the first fruit of that Partition which was designed by its sponsors to weaken our political importance........the eldest and the first born progeny of the Swadeshi cause, এবং "the foundations of a National University have been laid broad and deep."

১৮৬০ সালের XXI আইন অনুসারে কাউন্সিল ১৯০৬ জুনে রেজিস্ট্রি হয়েছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ দিতে এর নিয়মকানুন ও পাঠক্রম ধীরে ধীরে রূপায়িত হতে থাকে। নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের নিয়ে প্রথম গভর্নিং বডি গঠিত হয় :

১. ড. রাসবিহারী ঘোষ—প্রেসিডেন্ট- এম. ডি. এল, অ্যাড়ভোকেট।
২. ড. পি. কে. রায় — ভাইস প্রেসিডেন্ট - অধ্যক্ষ, প্রেসিডেন্সি কলেজ।
৩. রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী — কোষাধ্যক্ষ - এম. বি. এল, জমিদার, সুপরিচিত ব্যক্তি।
৪. শ্রী আশুতোষ চৌধুরী — এম. এ., বি. এ. (ক্যানটাব) ব্যারিস্টার, হাইকোর্টের বিচারপতি।
৫. শ্রী হীরেন্দ্রনাথ দত্ত—সলিসিটর, থিওসোফিক্যাল সোসাইটির অন্যতম নেতা, পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে সুপরিচিত।
৬. শ্রী গুরুদাস ব্যানার্জি—এম.এ., বি. এল, কলকাতা হাইকোর্টের অবসর প্রাপ্ত বিচারপতি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য।
৭. মি. আবদুল রসুল—এম. এ., বি. সি. এল (অক্সন), ব্যারিস্টার, রাজনৈতিক নেতা।
৮. শ্রী দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী — এম. এ., বি. এল. সলিসিটর। পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
৯. ড. নীলরতন সরকার — এম. এ., এম. ডি., পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য।
১০. শ্রী অরবিন্দ ঘোষ — জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ।
১১. শ্রী মনোমোহন ভট্টাচার্য — এম. এ., গৌরীপুর স্টেটের ম্যানেজার, সুসংগঠক।
১২. শ্রী রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — এম. এম., রিপণ পরে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের অধ্যক্ষ।

১৩. শ্রী সতীশচন্দ্র মুখার্জি -- ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক।

এই ১৩ জন সদস্যের মধ্যে একমাত্র অরবিন্দই বরোদার শিক্ষা ক্ষেত্রে জড়িত ছিলেন। এবং স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগও ছিল। অন্য কেউই স্বদেশি আন্দোলন বা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন না। আন্দোলনে আবদুল রসুল সমর্থন জানালেও সক্রিয়ভাবে জড়িত হন নি। বাঙালি সমাজের ৯৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল পরিষদ। প্রত্যেকেই স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কৃতী ছিলেন। সমসাময়িক রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গে জড়িত নন, এমন মানুষদের পরিষদে গ্রহণ করা হয়েছিল ইচ্ছাকৃতভাবে। এর ফলে তাঁরা বাঙালি সমাজের সার্বিক উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রেখে উপযুক্ত শিক্ষাক্রমে নির্ধারণ করতে পারবেন। সে সময়ে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র পাল বা অন্য কাউকেও পরিষদের পরিচালকমণ্ডলীতে নেওয়া হয়নি। একটা জিনিস লক্ষ্য করবার মত সদস্যদের কারো বাড়ি ছিল পূর্ববঙ্গে, কারো পশ্চিমবঙ্গে। বাংলার মানুষের সাংস্কৃতিক ও জীবনকে মূর্ত করে তোলা এবং আবেগের সমন্বয় সাধন ছিল মূল লক্ষ্য।

পরিষদের বিদ্যালয় পাঠক্রম ছড়িয়ে পড়ে মফস্বল অঞ্চলে। তাছাড়া কলেজও স্থাপিত হয়েছিল। পড়াশোনার ব্যবস্থা ছিল এ রকম :

১. প্রাথমিক : ৬ বছর বয়স থেকে ৩ বছরের পাঠক্রম।

২. মাধ্যমিক : ৯ বছর বয়স থেকে ৭ বছরের পাঠক্রম।

৩. মহাবিদ্যালয় : ১৬ বছর বয়স থেকে ৪ বছরের পাঠক্রম।

শিক্ষায়তনে বিভিন্ন সময়ে এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা নানা সময়ে ভাষণ দিতেন :

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — সাহিত্য
এ. কে. কুমারস্বামী — শিল্প
গুরুদাস ব্যানার্জি — অঙ্ক
হীরেন্দ্রনাথ দত্ত — উপনিষদ
মোহিনীমোহন চ্যাটার্জি — ইতিহাস
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী — প্রাকৃতিক বিজ্ঞান
সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি — ইতিহাস
চন্দ্রকান্ত ন্যায়ালঙ্কার — রাষ্ট্রবিজ্ঞান
ইন্দুমাধব মল্লিক — জীববিজ্ঞান
পিয়ারীমোহন মুখার্জি — অর্থনীতি

জাতীয় বিদ্যালয় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন : "আমাদের এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে যখন চিন্তা করিবে, তখন এই কথা ভাবিয়া দেখিয়ো যে, যে-দেশে জলাশয় নাই সে-দেশে আকাশের বৃষ্টিপাত ব্যর্থ হইয়া যায়। জল ধরিবার স্থান না থাকিলে বৃষ্টিধারার অধিকাংশ ব্যবহার নষ্ট হইতে থাকে। আমাদের দেশে যে জ্ঞানী গুণী ক্ষমতাসম্পন্ন লোক জন্মগ্রহণ করে না তাহা নহে—কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞান গুণ ও ক্ষমতা ধরিয়া রাখিবার কোনো ব্যবস্থা আমাদের দেশে নাই। তাঁহারা চাকরি করেন, ব্যবসা করেন, পরের হুকুম মানিয়া চলেন, তাহার পরে পেনশন লইয়া ভাবিয়া পান না কেমন করিয়া দিন কাটিবে। এমন প্রত্যহ কত রাশি রাশি সামর্থ্য দেশের উপর দিয়া গড়াইয়া বহিয়া উবিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহা আমরা নিশ্চয় জানি, বিধাতার অভিশাপে আমাদের দেশে যে শক্তির চিরন্তন অনাবৃষ্টি ঘটিয়াছে তাহা নহে, দেশের শক্তিকে দেশের কাজে ব্যবহারে লাগাইবার, তাহাকে কোথাও একত্রে সংগ্রহ করিবার কোনো বিধান আমরা করি নাই। এইজন্য, যে-শক্তি আছে সে-শক্তিকে প্রত্যক্ষ করিবার, অনুভব করিবার কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই। যদি আমাদের প্রতি কেহ শক্তিহীনতার অপবাদ দেয়, তবে রাজ সরকারের চাকরির ইতিবৃত্ত

হইতে রায়বাহাদুরের তালিকা খুঁজিয়া বেড়াইতে হয়, নিতান্ত তুচ্ছ সাময়িক প্রতিপত্তির উঞ্ছ খুঁটিয়া নিজেদের সামর্থ্য সপ্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে হয়, কিন্তু তাহাতে আমরা সান্ত্বনা পাই না এবং নিজেদের প্রতি বিশ্বাস আন্তরিক হইয়া উঠে না।

"এমন দুর্দশার দিনে এই জাতীয়বিদ্যালয় আমাদের বিধিদত্ত শক্তিসঞ্চয়ের একটি উপায় স্বরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। দেশের মহত্ত্ব এইখানে স্বভাবতই আকৃষ্ট হইয়া বাঙালি জাতির চিরদিনের সম্বলের মতো এই ভান্ডে এই ভান্ডারে রক্ষিত ও বর্ধিত হইতে থাকিবে। অতি অল্পকালের মধ্যেই কি তাহার প্রমাণ আমরা পাই নাই। এই বিদ্যালয়ে দেখিতে দেখিতে দেশের যে-সকল প্রভাবসম্পন্ন পূজ্য ব্যক্তিগণকে আমরা একত্রে লাভ করিয়াছি তাঁহাদের প্রচুর সামর্থ্য কি কেবলমাত্র আহ্বানেরই অভাবে, কেবলমাত্র যজ্ঞক্ষেত্রেরই অবর্তমানে ক্ষীনভাবে বিক্ষিপ্ত হইয়া যাইত না। এ কি আমাদের কম সৌভাগ্য! দেশের গুরুজনেরা যেখানে স্বেচ্ছাপূর্বক উৎসাহের সহিত সমবেত হইতেছেন সেইখানেই দেশের ছাত্রগণের শিক্ষালাভের ব্যবস্থা হইয়াছে, এ কি আমাদের সামান্য কল্যাণ। উপযুক্ত দাতা সকলে শ্রদ্ধার সহিত দান করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতেছেন, উপযুক্ত গ্রহীতারাও শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিবার জন্য করজোড়ে দাঁড়াইয়াছেন, এমন শুভযোগ যেখানে সেখানে দাতাও ধন্য, গৃহীতাও ধন্য এবং সেই যজ্ঞভূমিও পুণ্যস্থান।"*

জাতীয় পরিষদ প্রতিষ্ঠার পর গোটা বাংলা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়ে যায়। জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য বিভিন্ন স্থান থেকে আবেদনপত্র আসতে থাকে। ১৯০৬ - ০৭ সালে পরিষদের অনুমোদনক্রমে এই সব স্থানে বিদ্যালয় স্থাপিত হয় : রঙ্‌পুর, ঢাকা, দিনাজপুর, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, চাঁদপুর, মাগুরা, মাজপাড়া, খুলনা, যশোহর এবং বরবাসালিয়া। ১৯০৭ সালে ৯ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছিল বিভিন্ন বিদ্যালয়ে। কলকাতার বহুবাজার স্ট্রিটের জুবিলি আর্ট আকাদেমিকে অনুমোদন দেওয়া হয়। এখানে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ ও বিদ্যালয়ের ১০ জন ছাত্র বিনা বেতনে শিক্ষার সুযোগ পায়। ১৯০৬ সালের জুলাই মাসে পরিষদের প্রাথমিক ও মাধ্যমিক টেকনিক্যাল কোর্সের পঞ্চম ও সপ্তম মানের প্রথম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল : কলকাতা, ঢাকা, রঙ্‌পুর, কুমিল্লা, বাঁকিপুর এবং লাহোরে। যে ৭২৯ জন পরীক্ষা দিয়েছিল তাদের মধ্যে বিভিন্ন স্তরের ৪১১ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল।

মফস্বলের জাতীয় বিদ্যালয়গুলির নিজস্ব জমি-বাড়ি ছিল।

ধর্ম, কৃষি, ইঞ্জিনিয়ারিং, কারিগরি — নানান বিষয়ে ছাত্রদের শিক্ষার ব্যাপক আয়োজন চলতে থাকে। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে পরিচালক মণ্ডলীতে মতপার্থক্য দেখা দেওয়ায়, একদল সদস্য বেরিয়ে গিয়ে সোসাইটি ফর দি প্রোমোশন অফ টেকনিক্যাল এডুকেশন গঠন করে। ৯৩ আপার সারকুলার রোডে তারকনাথ পালিতের বাড়িতে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শেখানো হত (১) ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (২) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, (৩) ফলিত রসায়ন এবং (৪) ভূবিদ্যা। অধ্যক্ষ হন প্রমথনাথ বসু। হাতে কলমে ড্রাফটস্‌ম্যানের কাজ, ইঞ্জিন চালানো, সাবান তৈরি, চামড়ার এবং কাঁচ ও মৃৎশিল্পের কাজ শেখাবারও ব্যবস্থা হয়। রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি এবং নীলরতন সরকার সম্পাদক হন।

দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ১৯১০ সাল পর্যন্ত কোনক্রমে টিঁকে ছিল। ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে যেতে থাকে। দু-তরফেরই তখন আত্মরক্ষার প্রয়োজন। ১৯২০ সালের মে মাসে ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল আসে ৯২ আপার সারকুলার রোডের বাড়িতে এবং একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। অধ্যাপক বিনয় সরকার এবং ড. রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ত্রিশ হাজার টাকা দান করেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদে। সাতটি ছেলেকে আমেরিকায় বিজ্ঞানে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পাঠাবার উদ্দেশ্যে এই টাকা দেওয়া হয়েছিল।

* শিক্ষা-জাতীয় বিদ্যালয়-রবীন্দ্রনাথ

বঙ্গভঙ্গ রদ হল ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর। তারকনাথ পালিত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাঁর বাড়ি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ ১৯১২ সালে উঠে যায় মানিকতলার মুরারিপুকুরে পঞ্চবটি ভিলায়। কিন্তু ছাত্র সংখ্যা ক্রমশ কমে যেতে থাকায় ১৯১৭ সালে কলেজ বিভাগ এবং ১৯২০ সালে স্কুল বিভাগ বন্ধ হয়ে যায়।

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের ছাত্র সংখ্যা কখনও বাড়ছিল, কখনও কমছিল। রাসবিহারী ঘোষ ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মারা যান। তিনি কাউন্সিলকে আলিপুরে তাঁর বাড়ি সহ তের লক্ষ টাকা দান করেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হন স্যর আশুতোষ চৌধুরী এবং সম্পাদক হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের উদ্যোগে যাদবপুরে ১৯২ বিঘা জমি কাউন্সিলকে স্থায়ী লিজ দেয় কলকাতা কর্পোরেশন। ১৯২১ সালে ভবানীপুরের গোপালচন্দ্র সিংহ কাউন্সিলকে বার্ষিক সাড়ে চার হাজার টাকা আয়ের একটি সম্পত্তি দান করেন। ইনস্টিটিউটের নতুন ভবনের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ১৯২২ সালের ১১ মার্চ। ১৯২৪ সালে ইনস্টিটিউট নিজস্ব ভবনে উঠে এলেও, তখনও বাড়ি নির্মাণের কাজ শেষ হয়নি। কাজে শেষ হয় ১৯২৮ সালে। ১৯২৭ সাল থেকে কর্পোরেশনের বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা সাহায্য আসা শুরু হয়েছিল। পরবর্তীকালে ইউনিভার্সিটি এডুকেশন কমিশনের রাধাকৃষ্ণ কমিশন রিপোর্ট থেকে জানা যায় (১৯৪৯) :

> Of all the undertakings of the National Council of Education of a few decades ago, the College of Engineering and Technology is the only one to survive. Founded in about 1910, it has had a long and bitter struggle. Its teachers lived on very meagre salaries and were compelled to add to their income by outside work. Since the institution had no university affiliation and could not confer academic degrees, its graduates were excluded from responsible positions in the government service, where the holding of such a degree was a prerequisite to appointment. However, the educational work of the college was of such a high order that among the industries of Calcutta, the diploma of the college came to be held as in no way inferior to a university degree......with a well-established reputation for high quality, the Jadavpur College of Engineering and Technology seems to have a promising future. We understand that its governing body prefers that it remains independent and unattached to the Calcutta University, free to continue to work out of its own programme.
>
> We believe that such freedom to pioneer is a valuable resource for our country. Therefore we approve of the attitude of the governing body and we hope that substantial support will continue to be given by the Government, but without infringing on the freedom of the institution.

আগেই এই শিক্ষায়তন সম্পর্কে আগ্রহী হয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। ১৯৪৫ সালে জেল থেকে ছাড়া পেয়ে এসেছিলেন সমাবর্তন অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশনের কার্যক্রমে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, ভবিষ্যতে সুযোগ পেলে এই মহৎ প্রতিষ্ঠানকে যোগ্য সম্মান দেবেন। সে কথা তিনি ভুলে যান নি। দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী কর্মব্যস্ততার মধ্যেও মনে রেখেছিলেন এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে। তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। ন্যাশনাল কাউন্সিলকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হতে তাঁরা নিয়েছিলেন মুখ্য ভূমিকা। ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বরে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল আকারে উপস্থাপিত হয়। ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় বিল গৃহীত হওয়ায় ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন তার যোগ্য স্বীকৃতি লাভ করে।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়[১]

যে সময় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের মন্তব্যপাঠে দেশময় একটা আতঙ্কের ছায়া পড়ে যে লর্ড কার্জন ছলে বলে কৌশলে উচ্চশিক্ষার পথ রুদ্ধ করিতে উদ্যত, সেই সময়ে বঙ্গবাণীর প্রিয়সন্তান শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তৎপ্রসঙ্গে বঙ্গদর্শনে লিখিয়াছিলেন যে আমাদের এখন কর্তব্য দেশের শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া। তাহাতে যে শুধু আমাদের পরমুখাপেক্ষিতা দোষ নিষ্কৃত হইবে তাহা নহে, আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা না করিলে কখনই প্রকৃত শিক্ষার ফল ফলিবে না। বিদেশি ও বিধর্মী ও বিজেতা জাতির নিকট আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুকূল শিক্ষা আমরা কখনই আশা করিতে পারি না। নূতন বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আইনে দেশীয় সভ্য (Fellow) সংখ্যার সঙ্কোচ হওয়াতে এই আশা আরও ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে। পরে যখন পাঠশালার নিম্নশ্রেণিতে পঠিতব্য পুস্তক প্রাদেশিক ভাষায় লিখিবার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত হয়, তখনও তিনি সেই কথাটা তুলিয়াছিলেন এবং দেখাইয়াছিলেন যে সরকার বাহাদুরের এই সকল নূতন নূতন প্রস্তাব হইতেই আমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমাদের শিক্ষার ভার আমরা নিজে না গ্রহণ করিলে আর নিস্তার নাই! আবার যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ উপলক্ষে তুমুল প্রতিবাদের ঝড় উঠে, তখনও তিনি সেই এক কথা আরও বিশদভাবে বুঝাইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত আরও কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি এই কথা পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। আজ স্বদেশি আন্দোলনের দিনে বঙ্গের উভয় খণ্ডেই ছোটলাট বাহাদুর যে ভাবে ছাত্র ও শিক্ষক নির্যাতন ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার দরুন জাতীয় শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে লওয়া উচিত, এই কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে।

চাণক্য পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন —"...... বিদ্যা পর হস্তগতং ধনম্। কার্য্যকালে ন সা বিদ্যা কার্য্যকালে ন তদ্ধনম।" আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের বিদ্যা পুস্তকস্থা ত বটেই, আবার পরহস্তাগতাও।

পরের প্রসাদে বিদ্যালাভ করা অগৌরবের বিষয় বটে ; কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাহা অনিবার্য। ইংরেজের নিকট বা য়ুরোপেব নিকট আর আমরা বিদ্যা চাহিনা, একথা বলিবার সময় আজও আসে নাই। 'স্বদেশি' সাজিব বলিয়া ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদিগের অমূল্য শাস্ত্রগ্রন্থের অতিরিক্ত আর কিছুই চাহি না, এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলে আমাদের নিতান্ত মতিভ্রম হইয়াছে বলিতে হইবে। যে জাপানের উদীয়মান প্রতিভা দেখিয়া আমরা আবার প্রাচ্যভূমির বিজয় ঘোষণা করিতেছি, সেই জাপান আজও শত শত যুবককে জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য য়ুরোপ ও আমেরিকায় পাঠাইতেছে। বাণিজ্যদ্রব্যের আদান-প্রদান বন্ধ করিয়া যদি দেশের ধনবৃদ্ধি হয়, অন্ততঃ দেশের টাকা দেশেই থাকে, তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাণিজ্য কি তাই বলিয়া বন্ধ করিতে হইবে? আমাদের শাস্ত্রে আছে, দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্রও অসুরগুরু শুক্রাচার্যের নিকট মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিখিতে গিয়াছিলেন। নবদ্বীপের রঘুনাথ শিরোমণি (কানাভট্ট) মিথিলার ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি উক্ত বিদ্যা আয়ত্ত করার পর আর কাহাকেও মিথিলা যাইতে হয় নাই, খাস বাংলাতেই ন্যায়শাস্ত্রের অধ্যাপনা আরম্ভ হইয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, সর্বকালের প্রয়োজন হইলে বিদেশির নিকট, এমন কি শত্রুর নিকটও বিদ্যাগ্রহণ করার নজির আছে। য়ুরোপের কাছে, ইংরেজের কাছে, এখনও আমাদের অনেক শিখিবার আছে, যখন আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে গুরুর আসন গ্রহণ করিতে পারগ হইব, তখন স্বচ্ছন্দে শিক্ষা বিষয়ে ইংরেজের সংস্পর্শ ছাড়িতে পারি। আজকাল বাঙালি কর্তৃক পরিচালিত শুদ্ধ বাঙালি অধ্যাপকমণ্ডিত কলেজের অভাব নাই, তথাপি ছাত্রগণ সরকারি বা মিশনারি কলেজে শিক্ষালাভ করিতে উৎসুক, ইহার কারণ কী? ইংরেজের কাছে ইংরেজি জ্ঞান-বিজ্ঞান

ভালরূপ শিক্ষা হইবে এই জন্যই ত আমরা তথায় যাই, স্বজাতির উপর অশ্রদ্ধা বা বিজেতাজাতির উপর অন্ধ অনুরাগবশত তাহারা কি এই পথ অবলম্বন করে? অতএব এভাবে প্রশ্নটি আলোচনা করিতে হইলে এদেশে উচ্চশিক্ষার ভার এদেশীয় লোকের লওয়ার সময় এখনও আসে নাই।

আর এক কথা, যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রসঙ্গে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কথাটা নূতন করিয়া উঠিয়াছে, সেদিক হইতে প্রশ্নটির বিচার করিতে হইলে মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অপেক্ষাও অত্যাবশ্যকীয় কর্তব্য আছে। এখন আমাদের সমস্ত উৎসাহ, সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ একটি কাজে লাগাইতে হইবে। কাপড়ের কল ও তাঁত সংস্থাপন ও তদানুষঙ্গিক সূতা প্রস্তুতের বন্দোবস্ত ও কাপাসের চাষ। এই বিষয়ে আমাদিগকে ভিন্ন দেশীয়দিগের যেরূপ মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয় এমন আর কিছুতেই নহে। একেবারে সব কাজে হাত দিলে চলিবে না, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া হইয়া দাঁড়াইবে! ইংরাজিতে একটা প্রবাদবাক্য আছে —Rome was not built in a day. আমাদের দেশটাকে আমাদের মত করিয়া ভাঙিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িয়া লইতে সময় লাগিবে। শনৈঃ পন্থাঃ। ফরাসী বিপ্লবে বার বার নাম পর্যন্ত বদলান হইয়াছিল, আমাদের দেশে সেরূপ ঢালিয়া সাজাইবার সময় এক্ষণে আসে নাই। একেবার সব দিক দেখিতে গেলে কোন দিকই হইবে না। ....তবে অবশ্য দাতার স্বাধীন ইচ্ছার উপর কাহারো হাত নাই। যদি কোন বাঙালি কার্নেজী কাপড়ের কলের জন্য অর্থব্যয় করিতে পরাঙ্মুখ হইয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যেই অজস্র টাকা ঢালেন তাহাকে নিবারণ করিতে পারি না। ভাবিবার প্রধান বিষয়, টাকা (the sinews of war)। এক্ষেত্রে নাকি সে ভাবনা নাই। অনেক বিদ্যোৎসাহী স্বজাত্যানুরাগী ধনকুবের এই সাধু উদ্দেশ্যে লক্ষ লক্ষ মুদ্রা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন শুনিয়াছি।

কিন্তু এ প্রশ্নের আর একটা দিক আছে ; ছাত্রগণ স্বদেশি আন্দোলনে অথবা তথাকথিত রাজনৈতিক সভাসমিতিতে যোগ দিলে যদি তাহাদিগকে কর্তৃপক্ষ এইভাবে নির্যাতন করিতে থাকেন, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে আমাদের কর্তব্য কি? আমরা কি আমাদের পুত্র, জামাতা, ভ্রাতা, ভাগিনেয়দিগকে কর্তৃপক্ষের ভয়ে দেশহিতকর অনুষ্ঠান হইতে বিরত থাকিতে বলিব, না তাহাদিগকে পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়া দেশের মঙ্গলের জন্য প্রাণমন উৎসর্গ করিতে উৎসাহিত করিব? যাহার কিছুমাত্র আত্মসম্মানবোধ বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ বা মনুষ্যত্ব আছে, তিনি অবশ্যই এ প্রশ্নের উত্তরে, মুক্তকণ্ঠে বলিবেন, বরং আমাদের বালক বা যুবকগণ যাবজ্জীবন মূর্খ হইয়া থাকে তাহাও ভাল, তবু তাহাদিগকে দেশের কার্য হইতে ফিরাইব না। এই সকল নির্যাতন আরম্ভ হইতেই দেশের আপামর সাধারণ সেই উত্তরই দিয়াছে। এখন, দেশের ও সমাজের যাঁহারা অগ্রণী, তাঁহাদের চেষ্টা করা কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারস্থ হইতে না দিয়া ইহাদিগের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা। তাহারই ফল এই প্রস্তাব। তবে, এখনও সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর আমাদিগের জাতক্রোধ হইবার সময় আসে নাই। বিশ্ববিদ্যালয় এই ছাত্রনির্যাতন ব্যাপারে কোনও রূপ সহায়তা করেন নাই। ভবিষ্যতে করিতে পারেন এই আশঙ্কা। সে আশঙ্কা অমূলক কি সমূলক বলা যায় না। সরকার বাহাদুর বিশ্ববিদ্যালয়কে যাহা করিতে অনুরোধ করিবেন, বিশ্ববিদ্যালয় তাহাই যে করিবেন তাহা এখনও ঠিক বুঝা যায় না। এখনও পর্যন্ত সরকার বাহাদুরের আজ্ঞাধীন সভ্যগণ ও দেশীয় সভ্যগণের মধ্যে বলপরীক্ষার কোনও সুযোগ উপস্থিত হয় নাই। অতএব বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর বিরূপ হওয়া একটু যেন অবিবেচনার কার্য হইতেছে! তাহার পর, আসল কথা, আমাদের স্বাধীন শিক্ষাগারে প্রকাশ্যভাবে রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে, ছাত্রদিগকে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করিতে উৎসাহ দেওয়া হইবে, অন্তত এইরূপ যে হইবে না তাহার কোনও guarantee নাই, ইত্যাদি অপবাদ দিয়া যদি কর্তৃপক্ষ আমাদের সমস্ত উদ্যোগ পণ্ড করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি করিতেছি তাহা কেহ ভাবিয়াছেন কি? যখন বেসরকারি বিদ্যালয়ের উপরও কর্তারা চোখ রাঙাইতেছেন, তখন এ ক্ষেত্রেই বা আমাদের ভরসা

কী? স্বাধীন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিলেই কি আমরা নিষ্কণ্টক হইব?

যাহা হউক, যদি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করাই স্থিরসঙ্কল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে কোন্ আদর্শে তাহা গঠিত হইবে এ প্রশ্নের বিচার আবশ্যক। ছাত্রগণের বোধ হয় ধারণা, যেমনটি ছিল, ইহাও ঠিক তেমনটি হইবে। সেখানেও সেই এফ. এ., বি. এ., এম. এ., সেই খাড়া বড়ি থোড়, থোড় বড়ি খাড়া, উল্‌টাইয়া-পাল্‌টাইয়া সেই 'রমাকান্ত কামার', আমরা এইরূপ বিশ্বামিত্রের সৃষ্টির পক্ষপাতী নহি। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠিক প্রতিরূপ আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় খাড়া করিলেই যে আমাদিগের অনিষ্টের সদ্য সদ্য প্রতীকার হইবে এমনও নহে, কেন না........বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি প্রভৃতি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির তুল্যমূল্য হইতে পারে না। তাহাতে দেশের ও সমাজের কোনও চিরস্থায়ী লাভ নাই। যদি এই সাধু উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত হয়, তবে দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায় আমাদের জাতীয় প্রকৃতির অনুরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করাই উচিত। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত ত্রুটি আছে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেগুলির সংশোধন করিতে হইবে। নিম্নে আমাদের প্রস্তাব লিপিবদ্ধ করিলাম। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কোনও বিরোধ বা প্রতিদ্বন্দ্বিতাও হইবে না। চাই কি, এ পথে গেলে কর্তৃপক্ষ আমাদের এই উদ্যমে বাধা দি'বেন না। আজকাল রাজায় প্রজায় যেরূপ সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে এ কথাটাও ভাবিবার বিষয়।

আমাদের প্রথম কথা, সুধীসমাজের মত —বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য উচ্চশিক্ষা দেওয়া ও মৌলিক গবেষণার সহায়তা করা ; ইহা অতি অল্পসংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্য, যাহাকে তাহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থান দিলে উচ্চশিক্ষার আদর্শ খর্ব হইয়া পড়ে ; বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ শিক্ষাগার নহে ; বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত স্বরূপ না জানাতেই আমাদের দেশে উচ্চশিক্ষার দুর্দশা ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধঃপতন ঘটিয়াছে। অতএব, আমরা বিবেচনা করি, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ অন্যরূপ হওয়া উচিত ; সাধারণের উপকারার্থ জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার করা, শিক্ষার্থী মাত্রেরই জ্ঞানতৃষ্ণা প্রশমিত করা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ও প্রকৃত কর্তব্য হওয়া উচিত। ইহা Research Institute হইবে না, অক্সফোর্ড কেমব্রিজের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া ডিগ্রি দিবে না। University Extension নামক অধিষ্ঠান ও Mechanics Institute নামক মন্দিরের ন্যায় কার্য করিবে। কোনও বিদ্যার্থী এখানে বঞ্চিত হইবে না ; যাহার প্রতিভা নাই, সে উচ্চ শিক্ষার অধিকারী নহে বলিয়া বিতাড়িত হইবে না। যাহার যেমন শক্তি সে ততখানি বিদ্যা শিখিবে। এখানে শুধু কেতাবীবিদ্যা শিখান হইবে না, কার্যকরীবিদ্যা শিখাইবারও বিশিষ্ট আয়োজন থাকিবে। শিক্ষাদান ইহার প্রকৃত উদ্দেশ্য হইবে ; পরীক্ষাগ্রহণ একটা আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র হইবে। সম্ভব হইলে, প্রাচীন ভারতের আদর্শ অনুসারে এই শিক্ষা অবৈতনিক হইবে। এরূপ একটি শিক্ষাগার আমাদের দেশে নাই। এতদিন বিশ্ববিদ্যালয় সাক্ষাৎভাবে উচ্চ শিক্ষার, এবং পরোক্ষভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের ভার লইয়া আসিতেছিলেন, তাহাতে কোন উদ্দেশ্যই প্রকৃতরূপে সিদ্ধ হইতেছিল না। হাল আইনে বিশ্ববিদ্যালয় তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য (উচ্চশিক্ষাদান) অনুসারেই পরিচালিত হইবে এইরূপ ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়। এ অবস্থায় জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রচার উদ্দেশ্যে একটি নূতন শিক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা হইয়াছে। অতএব আমাদের এই পথ অবলম্বন করাই যুক্তিযুক্ত। ইহার ভাবিফলও বিবেচনা করা উচিত ; শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহিত জনসাধারণের যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান জন্মিয়াছে, ইহার প্রভাবে তাহা দূরীভূত হইবে।

আমাদের দ্বিতীয় কথা, প্রস্তাবিত জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ও পরীক্ষাগ্রহণের ব্যবস্থা হইবে। বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বলিয়া দেওয়া আছে যে, ইংরাজি ভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইবে ও জ্ঞানপরীক্ষা করা হইবে। ছাত্রগণকে বিদেশি ভাষায় অবলীলাক্রমে মনের ভাব ব্যক্ত করিতে হইবে। যাহারা ভবিষ্যতে সরকারি কার্য করিবে বা এমন ব্যবসায় (যথা ওকালতী) অবলম্বন করিবে, যাহাতে, সাহেবদের সঙ্গে সর্বদা মাখামাখি করিতে হইবে, তাহাদিগের পক্ষে

ইংরাজি জ্ঞান দরকার বটে। কিন্তু ইংরেজের অধিকারে বাস করিতে হইলেই যে ইংরাজিতে মনের ভাব অবলীলাক্রমে প্রকাশ করিতে হইবে, নতুবা জীবন সংগ্রামে পরাজিত হইতে হইবে, ইহার কোনও অর্থ নাই। প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজি Second Language স্বরূপ পঠিত হইবে, শিক্ষকগণ ইংরাজি ভাষায় সুপণ্ডিত হইবেন, কিন্তু শিক্ষা ও পরীক্ষায় মাতৃভাষার প্রচলন থাকিবে। বহুকাল হইতে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যে কথা বলিয়া আসিতেছেন, তাহার প্রচলনের প্রকৃত স্থান এই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। বলা বাহুল্য ছাত্রকে অধীতবিদ্যা বিদেশীয় ভাষায় প্রকাশ করিতে হইবে এই অস্বাভাবিক ব্যবস্থা থাকাতে মুখস্থ বিদ্যার অবাধ প্রচলন ঘটিয়াছে এবং শিক্ষার সবিশেষ অন্তরায় হইয়াছে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলি আশানুরূপ উন্নতি লাভ করে নাই, বলিয়া লর্ড কার্জন আক্ষেপ করিতেন। সম্ভবত পূর্বোক্ত অস্বাভাবিক ব্যবস্থাই উন্নতির অন্তরায় হইয়াছে। এই বাধা দূরীভূত হইলে ছাত্রেরা অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে অনেক অধিক শিখিতে পারিবে। এবং ইহাতে জাতীয়তার বন্ধনও দৃঢ় হইবে। ইতিহাস, গণিত, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা ত মাতৃভাষার সাহায্যে হইবেই, ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যয়ন অধ্যাপনাও মাতৃভাষায় হইবে। ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই। ইংরেজ যে প্রণালীতে ফরাসি, জার্মান বা ল্যাটিন গ্রীক পড়েন; আমরাও সেই ভাবে ইংরাজি পড়িব। বর্তমান প্রণালীর বিড়ম্বনা—বাঙালি শিক্ষক বাঙালি ছাত্রকে বুঝাইতেছেন বিদেশি ভাষায়, পরের শিল পরের নোড়া দিয়া ঘরের ছেলের দাঁতের গোড়া ভাঙিতেছেন। শিক্ষক বিশদরূপে বুঝাইলেও তাহারা যে তিমিরে সে তিমিরেই থাকিয়া যাইতেছে।

এদেশে উচ্চ শিক্ষার প্রথম প্রচলন সময়ে অবশ্য অনেক বাগ্‌বিতন্ডার সৃষ্টি হইয়াছিল, এদেশীয় ভাষার সাহায্যে শিক্ষাদান চলিবে না, ইংরাজির সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে। তখন দেশের ও দেশভাষার যে রূপ অবস্থা ছিল তাহাতে এই ব্যবস্থা বোধ হয় অন্যায় হয় নাই। কিন্তু এখন বাংলা প্রভৃতি ভাষার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে, শব্দসম্পদ ও ভাবপ্রকাশেব শক্তি অনেক বাড়িয়াছে। এখন দেশভাষার সাহায্যে মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষাদান অনায়াসেই চলিতে পারে। উপযুক্ত এদেশীয় শিক্ষকেরও অভাব নাই। তখনকার দিনে সাহেব শিক্ষক ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না, কাজেই ইংরাজির সাহায্যে শিক্ষাদানও একপ্রকার অনিবার্য ছিল।

আমাদের তৃতীয় কথা, রাজপুরুষগণ নিরপেক্ষতা আশ্রয় করিয়াছেন বলিয়া বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা নাই। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশিক্ষার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। হিন্দুদিগের মধ্যে শাক্ত, বৈষ্ণব, দ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি নানা সম্প্রদায় থাকিলেও হিন্দুধর্মের মূলতত্ত্বগুলি সার্বভৌমিক ভাবে শিখান বোধ হয় অসম্ভব হইবে না। মনস্বিনী আনি বেসান্ট বেনারস হিন্দু কলেজে এরূপ সার্বভৌম হিন্দু-ধর্মসূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। মুসলমান সমাজ সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে।

আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের একটা দোষ আছে তাহাও বলিয়া রাখি। আজকাল জাতীয় ঐক্যসাধন করিবার জন্য কি হিন্দু কি মুসলমান কি ব্রাহ্ম কি খ্রিস্টান, কি বাংলাভাষী কি হিন্দি কি উর্দুভাষী কি উড়িয়া ভাষী সমস্ত বাঙ্গালীকে এক করিবার সঙ্কল্প হইয়াছে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা ও ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করিলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির ব্যাঘাত হইবে। তবে সেই ভয়ে ধর্মভেদ ও ভাষাভেদ উঠাইয়া দিয়া সর্বজাতির একীকরণ মানসে এখনকার মত ধর্মহীন শিক্ষা ও বিদেশিভাষার সাহায্যে বিষয়শিক্ষার ব্যবস্থা বাঞ্ছনীয় কি? ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও ভাষার জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিভাগ খুলিলে বোধ হয় এই আপত্তি খণ্ডিত হইতে পারে। যাহা হউক, এই বৈষম্যের সমীকরণের ভার বিজ্ঞ নেতাদিগের উপর দিয়া আমরা অবসর গ্রহণ করিলাম। ভরসা করি, উদ্যোগিগণ সত্বর একটা খসড়া খাড়া করিয়া সমালোচনার জন্য শিক্ষিত সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবেন।

ভারতী ১৩১২ অগ্রহায়ণ

(২)[১]

প্রথম প্রবন্ধে বলিয়াছি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরেই বিষয়শিক্ষা বিদেশীয় ভাষায় না দিয়া দেশভাষার সাহায্যে দেওয়া উচিত এবং ইংরাজি ভাষা দ্বিতীয় ভাষাস্বরূপ পঠিত হওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে যে সমস্ত যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়াছি তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে কিরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত, এক্ষণে তাহার বিচার করিব। বাঙালি প্রধানতঃ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই জাতিতে বিভক্ত। 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' এই গৌরবান্বিত নাম দিয়া যে প্রতিষ্ঠান সৃষ্টির কল্পনা হইতেছে, তথায় এই দুই জাতির নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্য (হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত ও মুসলমানের পক্ষে আরবি ও পারসি) কিভাবে স্থান পাইবে, এই প্রশ্ন সমাধান করা চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্তব্য।[২]

সরকারি বিদ্যালয়ে ব্যবস্থা আছে, এক এফ. এ. পরীক্ষা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায়ই প্রাচীন ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় (compulsory) নহে, এফ্. এ. পরীক্ষায়ও ভারতীয় প্রাচীন ভাষার পরিবর্তে য়ুরোপীয় প্রাচীন ভাষা লওয়া চলে। প্রবেশিকা ভিন্ন অন্য কোনও পরীক্ষায় ছাত্রদিগকে (ছাত্রীদিগের ব্যবস্থা একটু স্বতন্ত্র) মাতৃভাষা লইতে দেওয়া হয় না। নবসংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিধিব্যবস্থার পাণ্ডুলিপি প্রণীত হইয়াছে, তাহাতেও নাকি ভারতীয় প্রাচীন ভাষার আদর বিশেষ বাড়ে নাই, বরঞ্চ কিঞ্চিৎ কমিয়াছে। সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীন ভাষার ত এই হাল। ভবিষ্যতের আশাস্থল আধুনিক ছাত্রগণের হৃদয়ে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করিবার জন্য, জাতীয়তার বন্ধন দৃঢ় করিবার উদ্দেশ্যে, জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া, এখন যাহারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়িতে বসিয়াছেন, তাহারা ভারতীয় প্রাচীন ভাষা সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করিবেন, তাহা জানিবার জন্য সমগ্র সমাজ ব্যগ্রভাবে প্রতীক্ষা করিতেছে। শুধু সরকারি সাহায্য বর্জন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনা করিলেই তাহা 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' পদবাচ্য নহে, তথায় জাতীয় আদর্শে জাতীয় চরিত্রগঠনের অনুকূল শিক্ষা দিলেই ঐ নাম সার্থক হইবে। এ কথাটা যেন ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ স্মরণ রাখেন।

ভারতীয় ছাত্রগণের শিক্ষাবিধানের জন্য ভারতবাসিগণ কর্তৃক স্থাপিত বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় প্রাচীন ভাষা অবশ্য শিক্ষণীয় (compulsory) হওয়া উচিত। কথাটা এত সহজ যে, কথাটা পড়িবা মাত্র সকলেরই ত ইহা স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইতে প্রবৃত্তি হয়। প্রমাণ প্রয়োগ চাহিতে কিছুমাত্র আশঙ্কা হয় না। কিন্তু দৈববিড়ম্বনায় সহজ কথাটাও আমাদের কাছে জটিল হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষ যদি ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে কথাটার মীমাংসা করিতে বেগ পাইতে হইত না। কিন্তু আজ পরাধীন ভারতবর্ষকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, সভ্যতা-ভব্যতার মালমসলা বিদেশ হইতে আহরণ করিতে হইতেছে। এ অবস্থায় সুসভ্য ইংরাজের ভাষাই আমাদের শিক্ষার প্রধান বিষয় হওয়া উচিত, অনেকের এইরূপ মত। এ কথাটার বিস্তারিত আলোচনা প্রবন্ধের শেষাংশে করিব। আপাততঃ কি কি কারণে হিন্দুর পক্ষে সংস্কৃত শিক্ষা (ও মুসলমানের পক্ষে আরবি ও পারসি) প্রয়োজনীয় তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করি।[৩]

প্রথম, এই এই ভাষায় উভয় জাতীয় ধর্মশাস্ত্র লিখিত। জাতীয় ধর্ম, জাতীয় সমাজ, জাতীয় আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকাণ্ড প্রভৃতির প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞান আবশ্যক। তদুদ্দেশ্যে

---

১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

২. এই প্রবন্ধে হিন্দুজাতির দিক্ হইতে সংস্কৃত শিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, মুসলমান জাতির দিক্ হইতে আরবি, পারসি শিক্ষা সম্বন্ধে সেই সব কথা বলা যায়। সংস্কৃত ভাষার সহিত বাংলা (হিন্দি, উড়িয়া) ভাষার যে সম্পর্ক, আরবি ও পারসি ভাষার সহিত উর্দুর সেই সম্পর্ক।

৩. গত বৎসরের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে এ বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছি।

প্রাচীন ভাষা, শিক্ষা প্রয়োজনীয়। শিক্ষা ধর্মসাধনের সহায়, প্রাচীন ভারতে ধর্মজ্ঞান উন্মেষিত করিবার জন্যই শিক্ষা দেওয়া হইত, শিক্ষার উদ্দেশ্য অতি মহৎ ছিল। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মহীন শিক্ষা দেওয়া অনুচিত, ইহা পূর্ব প্রবন্ধে বলিয়াছি। যে ভাষায় ও যে সাহিত্যে ধর্মাচারের ও সমাজতত্ত্বের প্রকৃত মর্ম নিহিত আছে, তাহার সহিত শিক্ষার্থিগণের পরিচয় স্থাপন না করিলে, তাহারা কিরূপে ভবিষ্যৎ জীবনে শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিতে পারিবে? প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিলে কৃতবিদ্য ছাত্রগণ নিজের ধর্ম ও সমাজের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে যত্নশীল হইবেন এবং সনাতন আচার পদ্ধতি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন। অবিচারিত ভাবে সামাজিক বিধিব্যবস্থা ও ধর্মানুমোদিত ক্রিয়াকাণ্ড মানিয়া লইতে হইবে ও জড়ভাবে তাহা পালন করিতে হইবে, এরূপ জবরদস্তির কথা এখনকার দিনে চলিবে না; এরূপ জবরদস্তির ফলে হয় অসাড়তা, না হয় উচ্ছৃঙ্খলতা, না হয় কপটাচার (Hypocrisy), উপস্থিত হইবে। অতীতের দৃষ্টান্তে আমরা তাহা বিলক্ষণ বুঝিতেছি। বিশেষতঃ এখনকার দিনে ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষার হিড়িকে সমাজে নানা রূপে আচারভ্রংশ ঘটিতেছে এবং বিলাতি রীতি-নীতি আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ সবেগে চলিতেছে। এক্ষেত্রে হিন্দু সন্তানের সংস্কৃতশিক্ষা, এই অনুচিকীর্ষা প্রবৃত্তির কতক পরিমাণে প্রতিষেধক হইবে। সংস্কৃত শিক্ষার ফলে প্রকৃত জাতীয়তার ভাব বিকশিত হইবে এবং নিজের জাতির প্রাচীন গৌরবের দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে আত্মসম্মান বোধ জন্মিবে ও তাহার ফলে বিলাতি সমাজের প্রতি অন্ধ অনুরাগ ঘুচিবে। অতএব জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করিতে হইলে সংস্কৃত (বা আরবি, পারসি) ভাষা ও সাহিত্য ছাড়িলে চলিবে না।

দ্বিতীয়ত, প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বনে গবেষণা, প্রত্নতত্ত্বালোচনা, কাব্যসৌন্দর্য বিশ্লেষণ প্রভৃতি কার্য শিক্ষিত ভারতবাসীর অবশ্য কর্তব্য। এ যাবৎ এ সকল কার্য বৈদেশিক পণ্ডিতগণই করিয়া আসিতেছেন; দুই চারিজন মাত্র ভারতবাসী সামান্যরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। শিক্ষিত ভারতবাসির এই কলঙ্ক অপনোদন করিতে হইলে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় প্রাচীন ভাষা শিক্ষার রীতিমত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যাহাতে ভবিষ্যতে এই বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় প্রাচীনভাষা অনুশীলনের কেন্দ্রস্বরূপ হয়। সে দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। প্রস্তাবিত মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে Theodore Morison সাহেব যাহা বলিয়াছেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপকগণের সে কথাগুলি যেন মনে থাকে।

তৃতীয়ত, মাতৃভাষার উন্নতি করিতে হইলে, কাব্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি অঙ্গের পুস্তকাদি প্রণয়ন করিয়া মাতৃভাষার সাহিত্যের কলেবর পুষ্টি করিতে হইলে, মাতৃভাষার ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষাজ্ঞান নিতান্ত প্রয়োজনীয়; কেন না দেশভাষাগুলি প্রাচীন ভাষার নিকট শব্দসম্পত্তির জন্য পদে পদে ঋণী। এমনকি, সাধুভাষায় লিখিত পুস্তকাদি বুঝিতে হইলে, অথবা সাধুভাষায় ব্যবহৃত শব্দের এবং অপভ্রষ্ট শব্দের বর্ণবিন্যাসের নিয়ম আয়ত্ত করিতে হইলে, প্রাচীন ভাষার ব্যাকরণের দ্বারস্থ হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। বাংলা ভাষার ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে পার্থক্য থাকিলেও ইহাদের মধ্যে যে পরিমাণ সৌসাদৃশ্য আছে, তাহা বুঝিবার জন্য সংস্কৃতভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি থাকা চাই, শুধু 'খাঁটি বাংলা'র সেবা করিলে কিছুতেই চলিবে না। এই প্রসঙ্গে ইংরাজি নবীশেরা একটা ভ্রান্ত সংস্কার মন হইতে দূর করিবেন। ভাষা হিসাবে আধুনিক ইংরাজি ভাষার সহিত অ্যাংলোস্যাক্সন, এবং ল্যাটিন ও গ্রীক্ ভাষার যেরূপ সম্বন্ধ বাংলা ভাষার সঙ্গে সংস্কৃত ভাষার তদপেক্ষা অনেক নিকট সম্বন্ধ। আর ইংরাজেরা তাহাদের ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা এবং সভ্যতা যেমন য়িহুদী, গ্রীক, রোমক, অ্যাংলো-স্যাক্সন প্রভৃতি নানা জাতি হইতে পাইয়াছেন, আমরা সেরূপ সর্বদ্বারী নহি।

আমরা এ পর্যন্ত যাহা বলিলাম, তাহা যদি পাঠকবর্গ সমীচীন বলিয়া মনে করেন, তবে প্রাচীনভাষা শিক্ষা যে জাতীয় শিক্ষার পক্ষে অপরিহার্য, তাহা প্রমাণ হইল।

যাহারা কাজের লোক, Sentiment-এর ধার ধারেন না, তাঁহারা হয়ত বলিবেন—'সবই ত বুঝিলাম, কিন্তু গণিত, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি অসংখ্য শিক্ষণীয় বিষয় রহিয়াছে, ইহার উপর যদি ভাষার 'ত্র্যহস্পর্শ' ঘটাও, তাহা হইলে যে ছাত্রদিগের জীবনের ভার দুর্বহ হইয়া উঠিবে। কথাটা খুব চটকদার (Plausible) বটে; কিন্তু ইহার উত্তরটাও অত্যন্ত সোজা। সকলকেই যে সব বিষয় শিখিতে হইবে এমন কোনও 'মাথার দিব্য' দেওয়া নাই, যে শিল্প শিখিবে তাহার দর্শন শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে ইতিহাস শিখিবে তাহার বিজ্ঞান শিখিবার প্রয়োজন নাই, যে গণিত শিখিবে তাহার ইতিহাস শিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু উচ্চ শিক্ষার্থী ছাত্রমাত্রেরই স্বজাতির প্রাচীন ভাষা শিক্ষার প্রয়োজন আছে। কেন আছে, তাহার উত্তর প্রবন্ধের পূর্বভাগে দিয়াছি। বিজ্ঞ ব্যবস্থাপকগণ ভুলিবেন না, ইতিহাস, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ই বিলাতি শিক্ষার অঙ্গ, কেবলমাত্র ভারতীয় প্রাচীনভাষাই আমাদের বিশেষভাবে নিজস্ব সম্পত্তি। অতএব জাতীয় শিক্ষার হিসাবে, অন্য সমস্ত বিষয় একত্র করিয়া তাহাদের যে গুরুত্ব, একা প্রাচীন ভাষার সেই গুরুত্ব, অথবা তদপেক্ষা বেশি গুরুত্ব। সুতরাং, জাতীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে বরং অপর পাল্লা (Scale) হইতে দুই একটা বিষয় সরাইয়া হাল্কা করা চলে, তথাপি ভারতীয় প্রাচীনভাষার দিক্‌টা কমান চলে না।

যাহা হউক, তিনটি ভাষা শিক্ষা যখন অপরিহার্য, তখন অনর্থক তাহা লইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা না করিয়া, কি প্রকারে তিনটিরই স্থান হইতে পারে অথচ প্রকৃত শিক্ষার ব্যাঘাত না ঘটে, তদ্বিষয়ে বিচার করা সঙ্গত। তিনটি ভাষা শিখিতে হইলে তিনটিই যে সমপরিমাণে ও একই প্রণালীতে শিখিতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া সঙ্গত ব্যবস্থা করিতে হইবে।

(১) বাংলা[৪] ভাষা ও সাহিত্যের স্থান

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, মাতৃভাষার সাহায্যে বিষয় শিক্ষা দেওয়া ও ছাত্রদিগকে মাতৃভাষায় ভাব প্রকাশ করিতে দেওয়াই স্বাভাবিক ব্যবস্থা এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সেইরূপ ব্যবস্থাই সঙ্গত। এমন কি, ইংরাজি ও সংস্কৃত ভাষার পঠন পাঠনও মাতৃভাষার সাহায্যে হইবে; ইংরাজেরা যে ভাবে ফরাসি, ল্যাটিন বা অপর কোনও বিদেশি ভাষা শিক্ষা করেন, এস্থলে তাহারই অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। সংস্কৃত ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষাকালে মাতৃভাষা হইতে তত্তৎ ভাষায় ও তত্তৎ ভাষা হইতে মাতৃভাষায় অনুবাদের ব্যবস্থা থাকিবে। এই সকল উপায়ে মাতৃভাষার প্রসার খুব বাড়িবে। ইহার উপর মাতৃভাষায় প্রবন্ধ রচনার রীতিমত ব্যবস্থা থাকিবে। এই পর্যন্ত গেল ভাষা শিক্ষা। বাঙ্গলা সাহিত্য পাঠেরও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করিতে হইবে। সচরাচর যে সকল বাংলা সাহিত্য পুস্তক নিম্নশ্রেণিতে পঠিত হইয়া আসিতেছে (যথা কথামালা, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, বোধোদয়, চারুপাঠ, নীতিবোধ ইত্যাদি) সেগুলি ইংরাজির অনুবাদ এবং বিদেশি দৃষ্টান্তে ও বিলাতি ভাবে পরিপূর্ণ। ইহার ফলে, প্রথম হইতেই স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণা ও বিদেশির উপর ভক্তি জন্মে; জাতীয়ভাবের উদ্দীপনা, স্বজাতীয় মহাপুরুষদিগের উপর শ্রদ্ধা, সমাজ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে না। ইহাই হইল প্রকৃত পরাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকার সঙ্কোচ অপেক্ষাও ইহা বিষম। জাতীয় আদর্শে শিক্ষা দিতে হইলে এই সকল পুস্তকে চলিবে না। (আজকাল বিজ্ঞান রিডার নামধেয় সে সমস্ত পুস্তক চলিতেছে, সে সকল ত খাঁটি সাহিত্যই নহে, কাজেই সেগুলির স্বতন্ত্র নির্দেশেরই প্রয়োজন নাই)। জাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করিয়া শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইলে কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত সংক্ষিপ্ত করিয়া বাল্যাবস্থার অনুপযোগী অংশগুলি বাদ দিয়া পাঠনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। ইহা অপেক্ষা

৪. প্রবন্ধের এই অংশে বাংলা ভাষা সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, হিন্দি ও উড়িয়্যা ভাষা সম্বন্ধেও তাহা খাটে।

সুন্দর ও সংগত ব্যবস্থা হইতে পারে না। বালকগণের গদ্য অপেক্ষা পদ্যেই বেশি অনুরক্তি দেখা যায়, কবির উক্তি হৃদয়ে গভীরভাবে উচ্চভাবগুলি মুদ্রিত করে, অতএব এইরূপ ব্যবস্থাই উপযুক্ত। পদ্য পুস্তক পাঠ্যতালিকাভুক্ত করিতে হইলেও চরিতমালা, চরিতাষ্টক, আর্যকীর্তি প্রভৃতি স্বজাতীয় মহাপুরুষগণের জীবনী সম্বলিত আখ্যানগুলিই লইতে হইবে, নতুবা স্বজাতিপ্রেম জাগিবে না; গ্রন্থকারগণ উৎসাহ পাইলে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা পূর্ণ পুস্তক রচনা করিবেন।

(২) সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের স্থান

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে নিম্নশিক্ষা (Primary education) ও উচ্চশিক্ষা (high education) এই তিনটি স্তর থাকিবে আশা করা যায়। নিম্নস্তরে কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যেরই ব্যবস্থা থাকিবে। কিন্তু মধ্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষার স্তরে বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত সাহিত্যের স্থান করিতে হইবে। যতই উচ্চদিকে উঠিবে, ততই বাংলা সাহিত্যের ভাগ কমাইয়া সংস্কৃত সাহিত্যের ভাগ বাড়াইতে হইবে। ইহাতেই পরোক্ষভাবে বাংলা সাহিত্যের অধিক উপকার হইবে, কেন না উচ্চ অঙ্গের বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য দ্বারা সম্যক্‌রূপে অনুপ্রাণিত। আমাদের সমাজ ও ধর্ম ভালরূপে বুঝিতে হইলে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যই অধিক প্রয়োজনীয়, তাহা পূর্বেই দেখাইয়াছি। সাধারণ লোকে অবশ্য আবহমানকাল কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত পড়িয়া এবং যাত্রা, কীর্তন, পাঁচালী, কথকতা শুনিয়া ধর্ম ও আচার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া আসিতেছে। (Mass education) লোকশিক্ষার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট। কিন্তু যাহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষালাভ করিতে অগ্রসর, তাহাদের পক্ষে এ ব্যবস্থা যথেষ্ট নহে। মনে রাখিতে হইবে, এই কৃতবিদ্য যুবকেরাই এক কালে সমাজের নেতা হইবে। সমাজের উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্টভাবের আধিপত্য না হইলে, সংস্কৃত শিক্ষার সম্যক্ ব্যবস্থা না করিয়া কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যের ব্যবস্থা রাখিলে, সমাজের অবস্থা নিতান্ত হীন হইয়া পড়িবে।

'দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোনও জন।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণ।।'

শ্রীচৈতন্যদেবের বর্ণিত ধর্মের ঐরূপ বিকৃত আদর্শ প্রচলিত হইবে। ভাবী সাহিত্যেরও যৎপরোনাস্তি দুর্দশা ঘটিবে।

অতএব সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত ব্যবস্থা করিতে হইবে। আবার, সংস্কৃত ভাষা শুধু ভাষা হিসাবে পড়িলে চলিবে না, সাহিত্য হিসাবে পড়িতে হইবে, ব্যাকরণ-বিচারে উদ্যম পর্যবসিত করিলে চলিবে না। সাহিত্যপাঠে সাক্ষাৎ ও পরোক্ষভাবে যে সমস্ত উপকার পাওয়া যায়, তাহা আমাদিগকে সংস্কৃত সাহিত্য হইতেই আদায় করিতে হইবে। সাহিত্যের ভিতর দিয়া কাব্য-কলা (Literary art), রচনাশিল্প বুঝিতে হইবে, ধর্ম ও নীতি, সামাজিক ও জাতীয় প্রকৃতি বুঝিতে হইবে, উচ্চ উচ্চ ভাব আয়ত্ত করিতে হইবে। নিজেদের সাহিত্য অবলম্বনে এই ভাবে শিক্ষালাভই সহজ, স্বাভাবিক ও কল্যাণকর।

সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রণালীও কতকটা পরিবর্তিত করিতে হইবে। মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দিতে হইবে, তাহা কার্যতঃ এক্ষণেও হইয়া থাকে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এই নিয়ম। উপরন্তু মাতৃভাষার প্রকৃতির সঙ্গে পদে পদে তুলনা করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে যে শুধু দুরূহ ভাষা শিখিবার সুবিধা হইবে তাহা নহে; এই উপায়ে মাতৃভাষার সঙ্গেও সম্যক্ পরিচয় ঘটিবে। সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগরীতির সঙ্গে মাতৃভাষার প্রয়োগরীতির কতটা মিল ও কতটা অমিল, কোন সংস্কৃত শব্দটির বাংলায় কি অপভ্রংশ ঘটিয়াছে ইত্যাদি সন্ধান দিতে হইবে। এই প্রণালীতে শিক্ষিত যুবকগণের পক্ষে ভবিষ্যতে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান সঙ্কলন ও ভাষাবিজ্ঞান প্রণয়ন যে কতদূর সুগম হইবে তাহা বলা বাহুল্যমাত্র। এই প্রণালীতে শিক্ষাই প্রকৃত জাতীয় শিক্ষা।

(৩) ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্যের স্থান

দুইটি কারণে ইংরাজি শিক্ষা আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়। প্রথম, ইংরাজি আমাদের রাজ-ভাষা, রাজভাষায় অল্প-বিস্তর দখল না থাকিলে বিষয়কর্ম চালানোর অসুবিধা হইবে এবং বিশাল ভারত সাম্রাজ্যের নানা প্রদেশের অধিবাসিগণের সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদানে অন্তরায় ঘটিবে। দ্বিতীয়তঃ, কালচক্রের আবর্তনে জ্ঞানের জন্মভূমি ভারতবর্ষ আজ সভ্য য়ুরোপের নিকট কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভিক্ষার্থী, এ অবস্থায় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারস্বরূপ ইংরাজি (বা তত্তুল্য অপর কোন য়ুরোপীয় ভাষা) না জানিলে জ্ঞানলাভের পথ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িবে। এ দুইটা কথার কোনওটাই চাপা দিয়া 'স্বদেশি' গোলামি করিতে গেলে বাতুলতা ও নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ পায়। পূর্বোক্ত দুই কারণে ইংরাজি শিক্ষার যে প্রয়োজন, তাহার পক্ষে ভাষা হিসাবে ইংরাজি শিখিলেই যথেষ্ট হইবে। ইংরাজি হইতে মাতৃভাষার অনুবাদ, ও মাতৃভাষা হইতে ইংরাজিতে অনুবাদ এই দ্বিবিধ প্রণালীর দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ইংরাজিতে চিঠিপত্র লেখা, বিস্তৃত বিষয়ের সংক্ষিপ্ত সঙ্কলন, (abstracts, summaries, precis writing) বড়জো'র প্রবন্ধ রচনা পর্যন্ত শিখিলেই এই দুইটি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। এইরূপ শিক্ষালাভ করিলে ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে ইংরাজি ভাষায় লিখিত শিল্প, বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের মূলগ্রন্থগুলি পড়িতে ও বুঝিতে পারিবে। ইহার জন্য সাহিত্য হিসাবে ইংরাজি পাঠনার তত প্রয়োজন দেখি না।

বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে ভাবে ইংরাজি সাহিত্য পাঠনার ব্যবস্থা আছে, অনেকে সেই প্রণালীর পক্ষপাতী। তাহারা বলেন, সাহিত্যে সভ্যতার পূর্ণ বিকাশ। ইংরাজি সাহিত্য অধ্যয়ন করিলে বর্তমান যুগের সভ্যতার সারতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় ও তাহার ফলে প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ (ইহাকেই কি Culture বলিব?) ঘটে। ইংরাজি সাহিত্য আমাদের সমাজে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে, তাহার ফলে নানারূপ কু-সংস্কার ও কদাচার, অপধর্ম ও বিকৃত রুচি তিরোহিত হইয়াছে, খ্রিস্টিয় ধর্মের উচ্চ আদর্শে সদ্ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা হইয়াছে, আমাদের আধুনিক সাহিত্যের উন্নতি ও বিকাশ হইয়াছে। এ কথা কেহই অস্বীকার করিবে না। কিন্তু ইহার 'সু' ও 'কু' দুইটা দিক্ আছে। আমাদের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম ইংরাজের জাতীয় প্রকৃতি, সমাজ, নীতি ও ধর্ম হইতে সম্পূর্ণ পৃথক; প্রত্যেক জাতির কাব্যনাটকাদি খাঁটি সাহিত্য, (Pure Literature) সেই সেই জাতির জাতিগত, সমাজগত, নীতিগত ও ধর্মগত প্রকৃতির পরিপূর্ণ ছায়া। প্রথম বয়সে মনোবৃত্তি সকল এত কোমল ও নমনীয় (Plastic) থাকে যে তৎকালে যে সমস্ত ভাব ও আদর্শ মনে অঙ্কিত হয়, তাহা কস্মিন্‌কালেও বিলীন হয় না। এ হিসাবে দেখিতে গেলে, কিশোরবয়স্ক ছাত্রগণকে নির্বিচারে ইংরাজি কাব্য নাটকাদি পাঠ করিতে দেওয়া কি সঙ্গত? এই সকল বিজাতীয় আদর্শ দ্বারা যে আমাদের সামাজিক নৈতিক এবং সাহিত্যিক আদর্শ কলুষিত ও বিকৃত হয় নাই,ইহা কি কেহ সাহস করিয়া বলিতে পারেন? এই প্রসঙ্গে একটি ক্ষুদ্র ঘটনা মনে পড়িল। Graik's Pursuit of Knowledge under Difficulties কি এইরূপ একখানা ইংরাজি কেতাবে লেখা আছে যে, এক দরিদ্র বালক বিড়াল মারিয়া সেই চামড়া বিক্রয়ে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বিদ্যালয়ের বেতন দিত। ইংরাজ গ্রন্থকার এই দৃষ্টান্ত দিয়া কিশোরবয়স্ক পাঠককে কত উৎসাহ দিয়াছেন এবং প্রবল জ্ঞানলিপ্সার জন্য বালকটির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু এতদ্দেশীয় একজন ব্রাহ্মণপণ্ডিত স্বকীয় বালক পুত্রটিকে বিদ্যালয়ের পাঠ্য পুস্তকে এই গল্পটি পড়িতে শুনিয়া সেই দিনই তাহাকে স্কুল হইতে ছাড়াইয়া লইয়াছিলেন ; এরূপ অপকর্ম দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করা তাহার এতই বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, এবং তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয় আত্মজকে sweet Portia-র Speechless messages of love বুঝাইতে বাধা হইয়াছেন। বাস্তবিক, গুরুজনের অনভিপ্রেত পূর্বরাগ ও বিবাহ, নরহত্যা দ্বারা গৌরব লাভের উৎকট অভিলাষ, প্রভৃতি জিনিষ খাঁটি ইংরাজি সাহিত্যে আক্‌সার মেলে। ইংরাজি বালকের রাজসিক

চরিত্রগঠনে ইহাই উৎকৃষ্ট উপাদান সন্দেহ নাই। কিন্তু সত্ত্বপ্রধান হিন্দুর পুত্র-কন্যাদিগের পক্ষেও কি এইগুলি কল্যাণকর? অবশ্য ইংরাজি উপাখ্যানাদিতে বিশুদ্ধ আদর্শেরও অভাব নাই। কিন্তু ভিন্ন দেশীয় মহাপুরুষগণের জীবনী হইতে সৎশিক্ষা লাভ করিলে তাহাতেও দোষ আছে। তাহার দরুণ ভিন্ন জাতির উপর শ্রদ্ধাভক্তি এবং স্বজাতির উপর বিতৃষ্ণা জন্মে; নিজের সমাজের উচ্চ আদর্শ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মিতে পায় না, জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হয় না। মানসিক দাসত্বশৃঙ্খল হাড়ে হাড়ে বসিয়া যায়, এসব কথা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলিয়াছি। পক্ষান্তরে হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, কথা সরিৎসাগর প্রভৃতি কথাগ্রন্থে এবং রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদি শাস্ত্রগ্রন্থে যে সমস্ত নরনারী চরিত্রের আদর্শ বর্তমান, যে সমস্ত সামাজিক রীতিনীতি, দার্শনিক মত (যথা, অদৃষ্ট, কর্মফল, জন্মান্তর রহস্য), ধর্মানুষ্ঠান (দানধর্ম, অতিথিসৎকার, আর্তত্রাণ, প্রভুভক্তি) ইত্যাদি বিষয়ক প্রসঙ্গ রহিয়াছে, সেগুলি যে আমাদের জাতীয় শিক্ষার বিশেষভাবে অনুকূল। এ বিষয়ে বোধ হয় কোনও ধীরবিবেচক ব্যক্তিই দ্বিরুক্তি করিবেন না। Addison, Johnson, Goldsmith, Campbell প্রভৃতি যে সমস্ত সুলেখকগণের এবং যে সমস্ত অসংখ্য অজ্ঞাতনামা লেখকগণের রচনা প্রবেশিকা ও এফ্. এ. পরীক্ষার্থীদিগকে সচরাচর সাহিত্যস্বরূপ পড়িতে হয়, তাহাতে এমন কোনও উচ্চ বা মহৎভাব অথবা উৎকৃষ্ট সাহিত্যকলা বা রচনাকৌশল নাই, যাহার সমতুল্য জিনিষ হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্রে মেলে না, ইহা আমি স্পর্ধা করিয়া বলিতে পারি। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাদির ত কথাই নাই। তবে কিজন্য মনুষত্বলাভ বা উন্নত আদর্শলাভের জন্য বৈদেশিক সাহিত্যের সেবা করিব? কৈশোরে সকলেই হিতোপদেশ পঞ্চতন্ত্র পড়িয়াছেন, কিন্তু তখন সকলেই দুরূহভাষা আয়ত্ত করিবার ব্যাকুলতায় ও ব্যাকরণের দৌরাত্ম্যে, ভাবের মাধুর্য ও ঔদার্য এবং রচনার সরসতার দিকে দৃষ্টি করিতে পারেন নাই। প্রবন্ধ লেখকের অনুরোধে এখন একবার নূতন করিয়া পড়িয়া দেখিবেন কি?

ইহা অবশ্য স্বীকার করি, স্বদেশি বিদেশি সকল সাহিত্যেই উৎকৃষ্ট কাব্যনাটকাদিতে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক ভাব ছাড়া, একটা বিরাট সার্বভৌম ভাব আছে। ইহাও স্বীকার করি, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে থাকিলে মনুষ্যত্বের পূর্ণবিকাশ হয় না। কিন্তু সে (Broad Catholicity) বসুধাব্যাপিনী কুটুম্বিতা স্থাপনের সময় কিশোর বয়স নহে। আগে জাতীয়ভাবে বনিয়াদটা গড়িয়া লইয়া পরে ভিন্ন জাতির ভিন্ন আদর্শের সম্মুখীন হইলে ভয়ের কারণ থাকে না, নতুবা আদর্শ বিকৃতি ও চরিত্রস্খলন অবশ্যম্ভাবী। স্থপতি-বিদ্যায় পিরামিড গঠনে যেমন নিচেটা চওড়া এবং উপরটা ক্রমে ক্রমে ছুঁচলো হইয়া উঠে, চরিত্র গঠনের বেলায় সেরূপ প্রথম বয়সে সার্বভৌম ভাব ও পরিণত বয়সে সঙ্কীর্ণতা আনিলে চলিবে না। ইংরাজি ও অন্যান্য য়ুরোপীয় সাহিত্যে সাহিত্যকলার নূতন নূতন রীতি দেখা যায়। যাহা কালিদাসাদির অগোচর ছিল। সেগুলিও শিক্ষা করা প্রয়োজনীয়, কেন না তাহাতে ভাবী বাংলা সাহিত্যের পরিসর বৃদ্ধি হইবে। আশৈশব ইংরাজি চর্চা করিয়া এবং পঞ্চদশবর্ষকাল ইংরাজি সাহিত্যের অধ্যাপনা কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ইংরাজি বিদ্বেষের ভাব পোষণ করা সঙ্গতও নহে, সম্ভবও নহে। তবে একথা অবশ্য মুক্তকণ্ঠে বলিব যে, সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশ হইতে আমদানি নব নব রীতির পরিচয় পাইবার পূর্বে আমাদের নিজস্ব প্রাচীন সাহিত্যে সাহিত্যকলার (Art) যে বিশুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট রীতি বর্তমান তাহা আগে বুঝিতে হইবে, কেন না তাহাই সহজ, স্বাভাবিক এবং কল্যাণকর উচ্চশিক্ষার স্তরে, যে সকল ছাত্র বিজ্ঞান বা শিল্প বাণিজ্যের দিকে না ঝুঁকিয়া Arts Course লইবে, তাহারা বি. এ., এম্. এ-র ন্যায় উচ্চ পরীক্ষায় স্বজাতির প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বৈদেশিক সাহিত্য অধ্যয়ন করুক, ইহাতে আমাদের কোনও আপত্তি নাই।

ভারতী ১৩১২ চৈত্র

স্বদেশ



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. অত্যুক্তি

দিল্লি-দরবারের উদ্‌যোগকালে লিখিত

পৃথিবীর পূর্বকোণের লোক, অর্থাৎ আমরা, অত্যুক্তি অত্যন্ত ব্যবহার করিয়া থাকি; আমাদের পশ্চিমের গুরুমশায়দের কাছ হইতে ইহা লইয়া আমরা প্রায় বকুনি খাই। যাঁহারা সাত সমুদ্র পার হইয়া আমাদের ভালোর জন্য উপদেশ দিতে আসেন তাঁহাদের কথা আমাদের নতশিরে শোনা উচিত। কারণ, তাঁহারা যে হতভাগ্য আমাদের মতো কেবল কথাই বলিতে জানেন তাহা নহে, কথা যে কী করিয়া শোনাইতে হয় তাহাও তাঁহাদের অবিদিত নাই। আমাদের দুটো কানের উপরেই তাঁহাদের দখল সম্পূর্ণ।

আচারে উক্তিতে আতিশয্য ভালো নহে, বাক্যে ব্যবহারে সংযম আবশ্যক, এ কথা আমাদের শাস্ত্রেও বলে। তাহার ফল যে ফলে নাই তাহা বলিতে পারি না। ইংরেজের পক্ষে আমাদের দেশ শাসন সহজ হইত না, যদি আমরা গুরু উপদেশ না মানিতাম। ঘরে বাহিরে এত দিনের শাসনের পরেও যদি আমাদের উক্তিতে কিছু পরিমাণাধিক্য থাকে তবে ইহা নিশ্চয়, সেই অত্যুক্তি অপরাধের নহে, তাহা আমাদের একটা বিলাসমাত্র।

আসল কথা, সকল জাতির মধ্যেই অত্যুক্তি ও আতিশয্য আছে। নিজেরটাকেই অত্যন্ত স্বাভাবিক ও পরেরটাকেই অত্যন্ত অসংগত বোধ হয়। যে প্রসঙ্গে আমাদের কথা আপনি বাড়িয়া চলে সে প্রসঙ্গে ইংরেজ চুপ, যে প্রসঙ্গে ইংরেজ অত্যন্ত বেশি বকিয়া থাকে সে প্রসঙ্গে আমাদের মুখে কথা বাহির হয় না। আমরা মনে করি ইংরেজ বড়ো বাড়াবাড়ি করে, ইংরেজ মনে করে প্রাচ্যলোকের পরিমাণবোধ নাই।

আমাদের দেশে গৃহস্থ অতিথিকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'সমস্ত আপনারই—আপনারই ঘর, আপনারই বাড়ি।' ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ তাহার নিজের রান্নাঘরে প্রবেশ করিতে হইলে রাঁধুনিকে জিজ্ঞাসা করে, 'ঘরে ঢুকিতে পারি কি?' এ একরকমের অত্যুক্তি।

স্ত্রী নুনের বাটি সরাইয়া দিলে ইংরেজ স্বামী বলে, 'আমার ধন্যবাদ জানিবে'। ইহা অত্যুক্তি। নিমন্ত্রণকারীর ঘরে চর্বচোষ্য খাইয়া এবং বাঁধিয়া এ-দেশীয় নিমন্ত্রিত বলে 'বড়ো পরিতোষ লাভ করিলাম', অর্থাৎ 'আমার পরিতোষই তোমার পারিতোষিক', তদুত্তরে নিমন্ত্রণকারী বলে 'আমি কৃতার্থ হইলাম'—ইহাকে অত্যুক্তি বলিতে পারো।

আমাদের দেশে স্ত্রী স্বামীকে পত্রে 'শ্রীচরণেষু' পাঠ লিখিয়া থাকে, ইংরেজের কাছে ইহা অত্যুক্তি। ইংরেজ যাহাকে-তাহাকে পত্রে 'প্রিয়' সম্বোধন করে—অভ্যস্ত না হইয়া গেলে ইহা আমাদের কাছে অত্যুক্তি বলিয়া ঠেকিত।

নিশ্চয়ই আরো এমন সহস্র দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু এগুলি বাঁধা অত্যুক্তি, ইহারা পৈতৃক। দৈনিক ব্যবহারে আমরা নব নব অত্যুক্তি রচনা করিয়া থাকি, ইহাই প্রাচ্যজাতির প্রতি ভর্ৎসনার কারণ।

তালি এক হাতে বাজে না, তেমনি কথা দুজনে মিলিয়া হয়। শ্রোতা ও বক্তা যেখানে পরস্পরের ভাষা বোঝে সেখানে অত্যুক্তি উভয়ের যোগে আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। সাহেব যখন চিঠির শেষে আমাকে লেখেন yours truly, সত্যই তোমরাই, তখন তাঁহার এই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার সত্যপাঠটুকুকে তর্জমা করিয়া আমি এই বুঝি, তিনি সত্যই আমারই নহেন।

বিশেষত বড়ো সাহেব যখন নিজেকে আমার বাধ্যতম ভৃত্য বলিয়া বর্ণনা করেন তখন অনায়াসে সে কথাটার ষোলো-আনা বাদ দিয়া তাহার উপরে আরো ষোলো-আনা কাটিয়া লইতে পারি। এগুলি বাঁধা দস্তুরের অত্যুক্তি, কিন্তু প্রচলিত ভাষাপ্রয়োগের অত্যুক্তি ইংরেজিতে ঝুড়িঝুড়ি আছে। immensely, immeasurably, extremely, awfully, infinitely, absoultely, ever so much, for the life of me, for the world, unbounded, endless প্রভৃতি শব্দপ্রয়োগগুলি যদি সর্বত্র যথার্থভাবে লওয়া যায় তবে প্রাচ্য অত্যুক্তিগুলি ইহজন্মে আর মাথা তুলিতে পারে না।

বাহ্য বিষয়ে আমাদের কতকটা ঢিলামি আছে এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে। বাহিরের জিনিসকে আমরা ঠিকঠাক-মতো দেখি না, ঠিকঠাক-মতো গ্রহণ করি না। যখন-তখন বাহিরের নয়কে আমরা ছয় এবং ছয়কে আমরা নয় করিয়া থাকি। ইচ্ছা করিয়া না করিলেও এ স্থলে অজ্ঞানকৃত পাপের ডবল দোষ—একে পাপ তাহাতে অজ্ঞান। ইন্দ্রিয়কে এমন অলস এবং বুদ্ধিকে এমন সাবধান করিয়া রাখিলে পৃথিবীতে আমাদের দুটি প্রধান নির্ভরকে একেবারে মাটি করা হয়। বৃত্তান্তকে নিতান্ত ফাঁকি দিয়া সিদ্ধান্তকে যাহারা কল্পনার সাহায্যে গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করে তাহারা নিজেকেই ফাঁকি দেয়। যে-যে বিষয়ে আমাদের ফাঁকি আছে সেই-সেই বিষয়েই আমরা ঠকিয়া বসিয়া আছি। একচক্ষু হরিণ যে দিকে তাহার কানা চোখ ফিরাইয়া আরামে ঘাস খাইতেছিল সেই দিক হইতেই ব্যাধের তীর তাহার বুকে বাজিয়াছে। আমাদের কানা চোখটা ছিল ইহলোকের দিকে—সেই দিকে ঘা খাইয়া আমরা মরিলাম। কিন্তু স্বভাব না যায় ম'লে।

নিজের দোষ কবুল করিলাম, এবার পরের প্রতি দোষারোপ করিবার অবসর পাওয়া যাইবে। অনেকে এরূপ চেষ্টাকে নিন্দা করেন, আমরাও করি। কিন্তু যে লোক বিচার করে অন্যে তাহাকে বিচার করিবার অধিকারী। সে অধিকারটা ছাড়িতে পারিব না। তাহাতে পরের কোনো উপকার হইবে বলিয়া আশা করি না—কিন্তু অপমানের দিনে যেখানে যতটুকু আত্মপ্রসাদ পাওয়া যায় তাহা ছাড়িয়া দিতে পারিব না।

আমরা দেখিয়াছি, আমাদের অত্যুক্তি অলস বুদ্ধির বাহ্য প্রকাশ। তা ছাড়া সুদীর্ঘকাল পরাধীনতাবশত চিত্তবিকারেরও হাত দেখিতে পাই। যেমন আমাদিগকে যখন-তখন, সময়ে-অসময়ে, উপলক্ষ থাক বা না থাক, চিৎকার করিয়া বলিতে হয়—আমরা রাজভক্ত। অথচ ভক্তি করি কাহাকে তাহার ঠিকানা নাই। আইনের বইকে, না কমিশনার-সাহেবের চাপরাশকে, না পুলিসের দারোগাকে? গবর্মেন্ট আছে, কিন্তু মানুষ কই? হৃদয়ের সম্বন্ধ পাতাইব কাহার সঙ্গে? আপিসকে বক্ষে আলিঙ্গন করিয়া ধরিতে পারি না। মাঝে মাঝে অপ্রত্যক্ষ রাজার মৃত্যু বা অভিষেক উপলক্ষে যখন বিবিধ চাঁদার আকারে রাজভক্তি দোহন করিয়া লইবার আয়োজন হয় তখন ভীতচিত্তে শুষ্ক ভক্তি ঢাকিবার জন্য অতিদান ও অত্যুক্তির দ্বারা রাজপাত্র কানায় কানায় পূর্ণ করিয়া দিতে হয়। যাহা স্বাভাবিক নহে তাহাকে প্রমাণ করিতে হইলে লোকে অধিক চিৎকার করিতে থাকে—এ কথা ভুলিয়া যায় যে, মৃদুস্বরে যে বেসুর ধরা পড়ে না চিৎকারে তাহা চার-গুণ হইয়া উঠে।

কিন্তু এই শ্রেণির অত্যুক্তির জন্য আমরা একা দায়ী নই। ইহাতে পরাধীন জাতির ভীরুতা ও হীনতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই অবস্থাটায় আমাদের কর্তৃপুরুষদের মহত্ত্ব ও সত্যানুরাগের প্রমাণ দেয় না। জলাশয়ের জল সমতল নহে এ কথা যখন কেহ অম্লানমুখে বলে তখন বুঝিতে হইবে, সে কথাটা অবিশ্বাস্য হইলেও তাহার মনিব তাহাই শুনিতে চাহে। আজকালকার সাম্রাজ্যমদমত্ততার দিনে ইংরেজ নানাপ্রকারে শুনিতে চায় আমরা রাজভক্ত, আমরা তাহার চরণতলে স্বেচ্ছায় বিক্রীত। এ কথা জগতের কাছে তাহারা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিতে চাহে।

এ দিকে আমাদের প্রতি সিকি-পয়সার বিশ্বাস মনের মধ্যে নাই; এত বড়ো দেশটা সমস্ত

নিঃশেষে নিরস্ত্র; একটা হিংস্র পশু দ্বারের কাছে আসিলে দ্বারে অর্গল লাগানো ছাড়া আর কোনো উপায় আমাদের হাতে নাই—অথচ জগতের কাছে সাম্রাজ্যের বল-প্রমাণ উপলক্ষে আমাদের অটল ভক্তি রটাইবার বেলা আমরা আছি। মুসলমান সম্রাটের সময় দেশনায়কতা-সেনানায়কতার অধিকার আমরা হারাই নাই; মুসলমান সম্রাট যখন সভাস্থলে-সামন্তরাজগণকে পার্শ্বে লইয়া বসিতেন তখন তাহা শূন্যগর্ভ প্রহসন মাত্র ছিল না। যথার্থই রাজারা সম্রাটের সহায় ছিলেন, রক্ষী ছিলেন, সম্মানভাজন ছিলেন। আজ রাজাদের সম্মান মৌখিক, অথচ তাহাদিগকে পশ্চাতে টানিয়া লইয়া দেশে বিদেশে রাজভক্তির অভিনয় ও আড়ম্বর তখনকার চেয়ে চার-গুণ। যখন ইংলন্ডের সাম্রাজ্যলক্ষ্মী সাজ পরিতে বসেন তখন কলোনিগুলির সামান্য শাসনকর্তারা মাথার মুকুটে ঝলমল করেন, আর ভারতবর্ষের প্রাচীনবংশীয় রাজগণ তাঁহার চরণ-নূপুরে কিংকিণীর মতো আবদ্ধ হইয়া কেবল ঝংকার দিবার কাজ করিতে থাকেন—এবারকার বিলাতি দরবারে তাহা বিশ্বজগতের কাছে জারি হইয়াছে। হায় জয়পুর! যোধপুর! কোলাপুর! ইংরেজ-সাম্রাজ্যের মধ্যে তোমাদের কোথায় স্থান তাহা কি এমন করিয়া দেশে বিদেশে ঘোষণা করিয়া আসিবার জন্যই এত লক্ষ লক্ষ টাকা বিলাতের জলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিলে? ইংরেজের সাম্রাজ্য-জগন্নাথজির মন্দিরে যেখানে কানাডা নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া দক্ষিণ-আফ্রিকা স্ফীত উদর ও পরিপুষ্ট দেহ লইয়া দিব্য হাঁকডাক-সহকারে পান্ডাগিরি করিয়া বেড়াইতেছে সেখানে কৃশজীর্ণতনু ভারতবর্ষের কোথাও প্রবেশাধিকার নাই—ঠাকুরের ভোগও তাহার কপালে অল্পই জোটে—কিন্তু যেদিন বিশ্বজগতের রাজপথে ঠাকুরের অভ্রভেদী রথ বাহির হয় সেই একটা দিন রথের দড়ি ধরিয়া টানিবার জন্য ভারতবর্ষের ডাক পড়ে। সেদিন কত বাহবা, কত করতালি, কত সৌহার্দ্য— সেদিন কার্জনের নিষেধশৃঙ্খলমুক্ত ভারতবর্ষীয় রাজাদের মণিমাণিক্য লন্ডনের রাজপথে ঝল্‌মল্‌ করিতে থাকে এবং লন্ডনের হাঁসপাতালগুলির 'পরে রাজভক্ত রাজাদের মুষলধারে বদান্যতাবৃষ্টির বার্তা ভারতবর্ষ নতশিরে নীরবে শ্রবণ করে। এই ব্যাপারের সমস্তটা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি। ইহা মেকি অত্যুক্তি, খাঁটি নহে।

প্রাচ্যদিগের অত্যুক্তি ও আতিশয্য অনেক সময়েই তাহাদের স্বভাবের ঔদার্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। পাশ্চাত্য অত্যুক্তি সাজানো জিনিস, তাহা জাল বলিলেই হয়। দিল-দরাজ মোগল-সম্রাটের আমলে দিল্লিতে দরবার জমিত। আজ সে দিল নাই, সে দিল্লি নাই, তবু একটা নকল দরবার করিতে হইবে। সংবৎসর ধরিয়া রাজারা পোলিটিকাল এজেন্টের রাহুগ্রাসে কবলিত; সাম্রাজ্য-চালনায় তাহাদের স্থান নাই, কাজ নাই, তাহাদের স্বাধীনতা নাই—হঠাৎ একদিন ইংরেজ সম্রাটের নায়েব পরিত্যক্ত-মহিমা দিল্লিতে সেলাম কুড়াইবার জন্য রাজাদিগকে তলব দিলেন, নিজের ভূলুণ্ঠিত পোশাকের প্রান্ত শিখ ও রাজপুত রাজকুমারদের দ্বারা বহন করাইয়া লইলেন, আকস্মিক উপদ্রবের মতো একদিন একটা সমারোহের আগ্নেয় উচ্ছ্বাস উদ্‌গীরিত হইয়া উঠিল—তাহার পর সমস্ত শূন্য, সমস্ত নিষ্প্রভ।

এখনকার ভারতসাম্রাজ্য আপিসে এবং আইনে চলে—তাহার রঙচঙ নাই, গীতিবাদ্য নাই, তাহাতে প্রত্যক্ষ মানুষ নাই। ইংরেজের খেলাধুলা, নাচগান, আমোদ-প্রমোদ সমস্ত নিজেদের মধ্যে বদ্ধ সে আনন্দ-উৎসবের উদ্‌বৃত্ত খুদকুঁড়াও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জন্য প্রমোদশালার বাহিরে আসিয়া পড়ে না। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের সম্বন্ধ আপিসের বাঁধা কাজ এবং হিসাবের খাতা-সহির সম্বন্ধ। প্রাচ্য সম্রাটের ও নবাবের সঙ্গে আমাদের অন্নবস্ত্র শিল্পশোভা আনন্দ-উৎসবের নানা সম্বন্ধ ছিল। তাঁহাদের প্রাসাদে প্রমোদের দীপ জ্বলিলে তাহার আলোকে চারি দিকে প্রজার ঘরে ছড়াইয়া পড়িত—তাঁহাদের তোরণদ্বারে যে নহবত বসিত তাহার আনন্দধ্বনি দীনের কুটিরের মধ্যেও প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিত।

ইংরেজ সিভিলিয়ানগণ পরস্পরের আমন্ত্রণে নিমন্ত্রণে সামাজিকতায় যোগদান করিতে বাধ্য, যে ব্যক্তি স্বভাবদোষে এই-সকল বিনোদনব্যাপারে অপটু তাহার উন্নতির অনেক ব্যাঘাত ঘটে। এই সমস্তই নিজেদের জন্য। যেখানে পাঁচটা ইংরেজ আছে সেখানে আমোদ-আহ্লাদের অভাব নাই; কিন্তু সে আমোদে চারি দিক আমোদিত হইয়া উঠে না। আমরা কেবল দেখিতে পাই—কুলিগুলা বাহিরে বসিয়া সন্ত্রস্তচিত্তে পাখার দড়ি টানিতেছে, সহিস ডগ্‌কার্টের ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া চামর দিয়া মশামাছি তাড়াইতেছে, এবং দগ্ধ ভারতবর্ষের তপ্ত সংস্রব হইতে সুদূরে যাইবার জন্য রাজপুরুষগণ সিমলার শৈলশিখরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া চলিয়াছেন। মৃগয়ার সময় বাজে লোকেরা জঙ্গলের শিকার তাড়া করিতেছে এবং বন্দুকের দুটো-একটা গুলি পশুলক্ষ্য হইতে ভ্রষ্ট হইয়া নেটিভের মর্মভেদ করিতেছে। ভারতবর্ষে ইংরেজরাজ্যের বিপুল শাসনকার্য একেবারে আনন্দহীন, সৌন্দর্যহীন—তাহার সমস্ত পথই আপিস-আদালতের দিকে—জনসমাজের হৃদয়ের দিকে নহে। হঠাৎ ইহার মধ্যে একটা খাপছাড়া দরবার কেন? সমস্ত শাসনপ্রণালীর সঙ্গে তাহার কোনখানে যোগ? গাছে লতায় ফুল ধরে, আপিসের কড়িবরগায় তো মাধবীমঞ্জরী ফোটে না। এ যেন মরুভূমির মধ্যে মরীচিকার মতো। এ ছায়া তাপনিবারণের জন্য নহে, এ জল তৃষ্ণা দূর করিবে না।

পূর্বেকার দরবারে সম্রাটেরা যে নিজের প্রতাপ জাহির করিতেন তাহা নহে। সে-সকল দরবার কাহারও কাছে তারস্বরে কিছু প্রমাণ করিবার জন্য ছিল না; তাহা স্বাভাবিক। সে-সকল উৎসব বাদশা-নবাবদের ঔদার্যের উদ্‌বেলিত প্রবাহ-স্বরূপ ছিল। সেই প্রবাহ বদান্যতা বহন করিত, তাহাতে প্রার্থীর প্রার্থনা পূর্ণ করিত, দীনের অভাব দূর হইত, তাহাতে আশা এবং আনন্দ দূরদূরান্তরে বিকীর্ণ হইয়া যাইত। আগামী দরবার উপলক্ষে কোন্ পীড়িত আশ্বস্ত হইয়াছে, কোন্ দরিদ্র সুখস্বপ্ন দেখিতেছে? সেদিন যদি কোনো দুরাশাগ্রস্ত দুর্ভাগা দরখাস্ত হাতে সম্রাটপ্রতিনিধির কাছে অগ্রসর হইতে চায়, তবে কি পুলিসের প্রহার পৃষ্ঠে লইয়া তাহাকে কাঁদিয়া ফিরিতে হইবে না?

তাই বলিতেছিলাম, আগামী দিল্লির দরবার পাশ্চাত্য অত্যুক্তি, তাহা মেকি অত্যুক্তি। এদিকে হিসাবকিতাব এবং দোকানদারিটুকু আছে—ও দিকে প্রাচ্যসম্রাটের নকলটুকু না করিলে নয়। আমরা দেশব্যাপী অনশনের দিনে এই নিতান্ত ভুয়া দরবারের আড়ম্বর দেখিয়া ভীত হইয়াছিলাম বলিয়া কর্তৃপক্ষ আশ্বাস দিয়া বলিয়াছেন—খরচ খুব বেশি হইবে না, যাহাও হইবে তাহার অর্ধেক আদায় করিয়া লইতে পারিব। কিন্তু সেদিন উৎসব করা চলে না যেদিন খরচপত্র সামলাইয়া চলিতে হয়। তহবিলের টানাটানি লইয়া উৎসব করিতে হইলে, নিজের খরচ বাঁচাইবার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অন্যের খরচের প্রতি উদাসীন হইতে হয়। তাই আগামী দরবারে সম্রাটের নায়েব অল্প খরচে কাজ চালাইবেন বটে, কিন্তু আড়ম্বরটাকে স্ফীত করিয়া তুলিবার জন্য রাজাদিগকে খরচ করাইবেন। প্রত্যেক রাজাকে অন্তত কটা হাতি, কটা ঘোড়া, কজন লোক আনিতে হইবে, শুনিতেছি তাহার অনুশাসন জারি হইয়াছে। সেই-সকল রাজাদেরই হাতিঘোড়া-লোকলস্করে যথাসম্ভব অল্প খরচে চতুর সম্রাটপ্রতিনিধি যথাসম্ভব বৃহৎ ব্যাপার ফাঁদিয়া তুলিবেন। ইহাতে চাতুর্য ও প্রতাপের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু বদান্যতা ও ঔদার্য, প্রাচ্য সম্প্রদায়ের মতে যাহা রাজকীয় উৎসবের প্রাণ বলিলেই হয়, তাহা ইহার মধ্যে থাকে না। এক চক্ষু টাকার থলিটির দিকে এবং অন্য চক্ষু সাবেক বাদশাহের অনুকরণকার্যে নিযুক্ত রাখিয়া এ-সকল কাজ চলে না। এ-সব কাজ যে স্বভাবত পারে সেই পারে, এবং তাহাকেই শোভা পায়।

ইতিমধ্যে আমাদের দেশের একটি ক্ষুদ্র রাজা সম্রাটের অভিষেক উপলক্ষে তাঁহার প্রজাদিগকে বহু সহস্র টাকা খাজনা মাপ দিয়াছেন। আমাদের মনে হইল, ভারতবর্ষের রাজকীয় উৎসব কী ভাবে চালাইতে হয়, ভারতবর্ষীয় এই রাজাটি তাহা ইংরেজ কর্তৃপক্ষদিগকে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু

যাহারা নকল করে, তাহারা আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করে না, তাহার বাহ্য আড়ম্বরটাকেই ধরিতে পারে। তপ্ত বালুকা সূর্যের মতো তাপ দেয়, কিন্তু আলোক দেয় না। সেইজন্য তপ্তবালুকার তাপকে আমাদের দেশে অসহ্য আতিশয্যের উদাহরণ বলিয়া উল্লেখ করে। আগামী দিল্লি-দরবারও সেইরূপ প্রতাপ বিকিরণ করিবে, কিন্তু আশা ও আনন্দ দিবে না। শুদ্ধমাত্র দম্ভপ্রকাশ সম্রাটকে শোভা পায় না—ঔদার্যের দ্বারা, দয়াদাক্ষিণ্যের দ্বারা, দুঃসহ দম্ভকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই যথার্থ রাজোচিত। আগামী দরবারে ভারতবর্ষ তাহার সমস্ত রাজরাজন্য লইয়া বর্তমান বাদশাহের নায়েবের কাছে নতিস্বীকার করিতে যাইবে—কিন্তু বাদশাহ তাহাকে কী সম্মান, কী সম্পদ, কোন্ অধিকার দান করিবেন? কিছুই নহে। ইহাতে যে কেবল ভারতবর্ষের অবনতিস্বীকার তাহা নহে, এইরূপ শূন্যগর্ভ আকস্মিক দরবারের বিপুল কার্পণ্যে ইংরেজের রাজমহিমা প্রাচ্য জাতির নিকট খর্ব না হইয়া থাকিতে পারে না।

যে-সকল কাজ ইংরেজি দস্তুর মতে সম্পন্ন হয় তাহা আমাদের প্রথার সঙ্গে না মিলিলেও সে সম্বন্ধে আমরা চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য। যেমন, আমাদের দেশে বরাবর রাজার আগমনে বা রাজকীয় শুভকর্মাদিতে যে-সকল উৎসব-আমোদ হইত তাহার ব্যয় রাজাই বহন করিতেন, প্রজারা জন্মতিথি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপলক্ষে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিত। এখন ঠিক তাহার উলটা হইয়াছে। রাজা জন্মিলে-মরিলে নড়িলে-চড়িলে প্রজার কাছে রাজার তরফ হইতে চাঁদার খাতা বাহির হয়, রাজা-রায়বাহাদুর প্রভৃতি খেতাবের রাজকীয় নিলামের দোকান জমিয়া উঠে। আকবর শাজাহান প্রভৃতি বাদশারা, নিজেদের কীর্তি নিজেরা রাখিয়া গেছেন, এখনকার দিনে রাজকর্মচারীরা নানা ছলে নানা কৌশলে প্রজাদের কাছ হইতে বড়ো বড়ো কীর্তিস্তম্ভ আদায় করিয়া লন। এই-যে সম্রাটের প্রতিনিধি সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে সেলাম দিবার জন্য ডাকিয়াছেন, ইনি নিজের দানের দ্বারায় কোথায় দিঘি খনন করাইয়াছেন, কোথায় পান্থশালা নির্মাণ করিয়াছেন, কোথায় দেশের বিদ্যাশিক্ষা ও শিল্পচর্চাকে আশ্রয় দান করিয়াছেন। সেকালে বাদশারা নবাবরা, রাজকর্মচারীগণও এই সকল মঙ্গলকার্যের দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ের সঙ্গে যোগ রাখিতেন। এক কর্মচারীর অভাব নাই, তাঁহাদের বেতনও যথেষ্ট মোটা বলিয়া জগদ্‌বিখ্যাত, কিন্তু দানে ও সৎকর্মে এ দেশে তাঁহাদের অস্তিত্বের কোনো চিহ্ন তাঁহারা রাখিয়া যান না। বিলাতি দোকান হইতে তাঁহারা জিনিসপত্র কেনেন, বিলাতি সঙ্গীদের সঙ্গে আমোদ-আহ্লাদ করেন, এবং বিলাতের কোণে বসিয়া অন্তিমকাল পর্যন্ত তাঁহাদের পেনশন সম্ভোগ করিয়া থাকেন।

ভারতবর্ষে লেডি ডাফরিনের নামে যে-সকল হাসপাতাল খোলা হইল তাহার টাকা ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ভারতবর্ষের প্রজারাই জোগাইয়াছে। এ প্রথা খুব ভালো হইতে পারে, কিন্তু ইহা ভারতবর্ষের প্রথা নহে, সুতরাং এই প্রকারের পূর্তকার্যে আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে না। না করুক, তথাপি বিলাতের রাজা বিলাতের প্রথামতই চলিবেন, ইহাতে বলিবার কথা কিছু নাই। কিন্তু কখনো দিশি কখনো বিলিতি হইলে কোনোটাই মানানসই হয় না। বিশেষত, আড়ম্বরের বেলায় দিশি দস্তুর এবং খরচপত্রের বেলায় বিলিতি দস্তুর হইলে আমাদের কাছে ভারি অসংগত ঠেকে। আমাদের বিদেশী কর্তারা ঠিক করিয়া বসিয়া আছেন যে, প্রাচ্য হৃদয় আড়ম্বরেই ভোলে, এইজন্যই ত্রিশ কোটি অপদার্থকে অভিভূত করিতে দিল্লির দরবার—নামক একটা সুবিপুল অত্যুক্তি বহু চিন্তায়-চেষ্টায় ও হিসাবের বহুতর কষাকষি দ্বারা খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন—জানেন না যে, প্রাচ্য হৃদয় দানে, দয়া-দাক্ষিণ্যে, অবারিত মঙ্গল-অনুষ্ঠানেই ভোলে। আমাদের যে উৎসবসমারোহ তাহা আহূত অনাহূত রবাহূতের আনন্দসমাগম, তাহাতে 'এহি এহি দেহি দেহি দীয়তাং ভুজ্যতাং' রবের কোথাও বিরাম ও বাধা নাই। তাহা প্রাচ্য আতিশয্যের লক্ষণ হইতে পারে, কিন্তু তাহা খাঁটি, তাহা স্বাভাবিক। আর পুলিসের দ্বারা সীমানাবদ্ধ, সঙিনের

দ্বারা কন্টকিত, সংশয়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত, সতর্ক কৃপণতার দ্বারা সংকীর্ণ, দয়াহীন দানহীন যে দরবার, যাহা কেবলমাত্র' দম্ভপ্রচার, তাহা পাশ্চাত্য অত্যুক্তি—তাহাতে আমাদের হৃদয় পীড়িত ও লাঞ্ছিত হয়—আমাদের কল্পনা আকৃষ্ট না হইয়া প্রতিহত হইতে থাকে। তাহা ঔদার্য হইতে উৎসারিত নহে, তাহা প্রাচুর্য হইতে উদ্‌বেলিত হয় নাই।

এই গেল নকল-করা অত্যুক্তি। কিন্তু নকল, বাহ্য আড়ম্বরের মূলকে ছাড়াইবার চেষ্টা করে, এ কথা সকলেই জানে। সুতরাং সাহেব যদি সাহেবি ছাড়িয়া নবাবি ধরে তবে তাহাতে যে আতিশয্য প্রকাশ হইয়া পড়ে তাহা কতকটা কৃত্রিম, অতএব তাহার দ্বারা জাতিগত অত্যুক্তির প্রকৃতি ঠিক ধরা যায় না। ঠিক খাঁটি বিলাতি অত্যুক্তির একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়িতেছে। গবর্মেন্ট সেই দৃষ্টান্তটি আমাদের চোখের সামনে পাথরের স্তম্ভ দিয়া স্থায়ীভাবে খাড়া করিয়া তুলিয়াছেন, তাই সেটা হঠাৎ মনে পড়িল। তাহা অন্ধকূপহত্যার অত্যুক্তি।

পূর্বেই বলিয়াছি, প্রাচ্য অত্যুক্তি মানসিক ঢিলামি। আমরা কিছু প্রাচুর্যপ্রিয়, আঁটিসাঁটি আমাদের সহে না। দেখো-না, আমাদের কাপড়গুলা ঢিলাঢালা, আবশ্যকের চেয়ে অনেক বেশি; ইংরেজের বেশভূষা কাটাছাঁটা, ঠিক মাপসই—এমন-কি, আমাদের মতে তাহা আঁটিতে আঁটিতে কাটিতে কাটিতে শালীনতার সীমা ছাড়াইয়া গেছে। আমরা—হয় প্রচুররূপে নগ্ন নয় প্রচুররূপে আবৃত। আমাদের কথাবার্তাও সেই ধরনের—হয় একেবারে মৌনের কাছাকাছি নয় উদারভাবে সুবিস্তৃত। আমাদের ব্যবহারও তাই, হয় অতিশয় সংযত নয় হৃদয়াবেগে উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু ইংরেজের অত্যুক্তির সেই স্বাভাবিক প্রাচুর্য নাই; তাহা অত্যুক্তি হইলেও খর্বকায়। তাহা আপনার অমূলকতাকে নিপুণভাবে মাটি চাপা দিয়া ঠিক সমূলকতার মতো সাজাইয়া তুলিতে পারে। প্রাচ্য অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই শোভা, তাহাই তাহার অলংকার, সুতরাং তাহা অসংকোচে বাহিরে আপনাকে ঘোষণা করে। ইংরেজি অত্যুক্তির 'অতি'টুকুই গভীরভাবে ভিতরে থাকিয়া যায়; বাহিরে তাহা বাস্তবের সংযত সাজ পরিয়া খাঁটি সত্যের সহিত এক পঙ্‌ক্তিতে বসিয়া পড়ে।

আমরা হইলে বলিতাম, অন্ধকূপের মধ্যে হাজারো লোক মরিয়াছে। সংবাদটাকে একেবারে এক ঠেলায় অত্যুক্তির মাঝদরিয়ার মধ্যে রওনা করিয়া দিতাম। হলওয়েল সাহেব একেবারে জনসংখ্যা সম্পূর্ণ নির্দিষ্ট করিয়া তাহার তালিকা দিয়া অন্ধকূপের আয়তন একেবারে ফুট-হিসাবে গণনা করিয়া দিয়াছেন। যেন সত্যের মধ্যে কোথাও কোনো ছিদ্র নাই! ও দিকে যে গণিতশাস্ত্র তাঁহার প্রতিবাদী হইয়া বসিয়া আছে সেটা খেয়াল করেন নাই। হলওয়েলের মিথ্যে যে কত স্থানে কত রূপে ধরা পড়িয়াছে, তাহা অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের সিরাজদ্দৌলা গ্রন্থে ভালোরূপেই আলোচিত হইয়াছে। আমাদের উপদেষ্টা কার্জন সাহেবের নিকট স্পর্ধা পাইয়া হলওয়েলের সেই অত্যুক্তি রাজপথের মাঝখানে মাটি ফুঁড়িয়া স্বর্গের দিকে পাষাণ-অঙ্গুষ্ঠ উত্থাপিত করিয়াছে।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্য হইতে দুই বিভিন্ন শ্রেণির অত্যুক্তির উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। প্রাচ্যে অত্যুক্তির উদাহরণ আরব্য উপন্যাস এবং পাশ্চাত্য অত্যুক্তির উদাহরণ রাডিয়ার্ড কিপলিঙের "কিম" এবং তাঁহার ভারতবর্ষীয় চিত্রাবলী। আরব্য উপন্যাসেও ভারতবর্ষের কথা আছে, চীনদেশের কথা আছে, কিন্তু সকলেই জানে তাহা গল্পমাত্র—তাহার মধ্য হইতে কাল্পনিক সত্য ছাড়া আর কোনো সত্য কেহ প্রত্যাশাই করিতে পারে না, তাহা এতই সুস্পষ্ট। কিন্তু কিপ্‌লিঙ তাঁহার কল্পনাকে আচ্ছন্ন রাখিয়া এমনি একটি সত্যের আড়ম্বর করিয়াছেন যে, যেমন হলপ-পড়া সাক্ষীর কাছ হইতে লোকে প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা করে তেমনি কিপ্‌লিঙের গল্প হইতে ব্রিটিশ পাঠক ভারতবর্ষের প্রকৃত বৃত্তান্ত প্রত্যাশা না করিয়া থাকিতে পারে না।

ব্রিটিশ পাঠককে এমনি ছল করিয়া ভুলাইতে হয়। কারণ, ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের প্রিয়। শিক্ষা লাভ করিবার বেলাও তাহার বাস্তব চাই, আবার খেলেনাকেও বাস্তব করিয়া তুলিতে না পারিলে তাহার সুখ হয় না। আমরা দেখিয়াছি, ব্রিটিশ ভোজে খরগোশ রাঁধিয়া জন্তুটাকে যথাসম্ভব অবিকল রাখিয়াছে। সেটা যে সুখাদ্য ইহাই যথেষ্ট আমোদের নহে; কিন্তু সেটা যে একটা বাস্তব জন্তু ব্রিটিশ ভোগী তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে চায়। ব্রিটিশ খানা যে কেবল খানা তাহা নহে, তাহা প্রাণিবৃত্তান্তের গ্রন্থবিশেষ বলিলেই হয়। যদি কোনো ব্যঞ্জনে পাখিগুলা ভাজা ময়দার আবরণে ঢাকা পড়ে, তবে তাহাদের পাগুলা কাটিয়া আবরণের উপরে বসাইয়া রাখা হয়। বাস্তব এত আবশ্যক। কল্পনার নিজ এলাকার মধ্যেও ব্রিটিশ পাঠক বাস্তবের সন্ধান করে—তাই কল্পনাকেও দায়ে পড়িয়া প্রাণপণে বাস্তবের ভান করিতে হয়। যে ব্যক্তি অসম্ভব স্থান হইতেও সাপ দেখিতেই চায়, সাপুড়ে তাহাকে ঠকাইতে বাধ্য হয়। সে নিজের ঝুলির ভিতর হইতেই সাপ বাহির করে, কিন্তু ভান করে যেন দর্শকের চাদরের মধ্যে হইতে বাহির হইল। কিপ্‌লিঙ নিজের কল্পনার ঝুলি হইতেই সাপ বাহির করিলেন, কিন্তু নৈপুণ্যগুণে ব্রিটিশ পাঠক ঠিক বুঝিল যে, এশিয়ার উত্তরীয়ের ভিতর হইতেই সরীসৃপগুলা দলে দলে বাহির হইয়া আসিল।

বাহিরের বাস্তব সত্যের প্রতি আমাদের এরূপ একান্ত লোলুপতা নাই। আমরা কল্পনাকে কল্পনা জানিয়াও তাহার মধ্য হইতে রস পাই। এজন্য গল্প শুনিতে বসিয়া আমরা নিজেকে ভুলাইতে পারি; লেখককে কোনোরূপ ছলনা অবলম্বন করিতে হয় না। কাল্পনিক সত্যকে বাস্তব সত্যের ছদ্ম-গোঁফ-দাঁড়ি পরিতে হয় না। আমরা বরঞ্চ বিপরীত দিকে যাই। আমরা বাস্তব সত্যে কল্পনার রঙ ফলাইয়া তাহাকে অপ্রাকৃত করিয়া ফেলিতে পারি, তাহাতে আমাদের দুঃখবোধ হয় না। আমরা বাস্তব সত্যকেও কল্পনার সহিত মিশাইয়া দিই, আর য়ুরোপ কল্পনাকেও বাস্তব সত্যের মূর্তি পরিগ্রহ করাইয়া তবে ছাড়ে। আমাদের এই স্বভাবদোষে আমাদের বিস্তর ক্ষতি হইয়াছে, আর ইংরেজের স্বভাবে ইংরেজের কি কোনো লোকসান করে নাই? গোপন মিথ্যা কি সেখানে ঘরে-বাহিরে বিহার করিতেছে না? সেখানে খবরের কাগজে খবর বানানো চলে তাহা দেখা গিয়াছে এবং সেখানে ব্যাবসাদার-মহলে শেয়ার-কেনাবেচার বাজারে যে কিরূপ সর্বনেশে মিথ্যা বানানো হইয়া থাকে তাহা কাহারও অগোচর নাই। বিলাতে বিজ্ঞাপনের অত্যুক্তি ও মিথ্যোক্তি নানা বর্ণে নানা চিত্রে নানা অক্ষরে দেশে বিদেশে নিজেকে কিরূপ ঘোষণা করে তাহা আমরা জানি—এবং আজকাল আমরাও ভদ্রাভদ্রে মিলিয়া নির্লজ্জভাবে এই অভ্যাস গ্রহণ করিয়াছি। বিলাতে পলিটিক্‌সে বানানো বাজেট তৈরি করা, প্রশ্নের বানানো উত্তর দেওয়া প্রভৃতি অভিযোগ তুলিয়া এক পক্ষের প্রতি অপর পক্ষে যে-সকল দোষারোপ করিয়া থাকেন তাহা যদি মিথ্যা হয় তবে লজ্জার বিষয়, যদি না হয় তবে শঙ্কার বিষয় সন্দেহ নাই। সেখানকার পার্লামেন্টে পার্লামেন্ট-সংগত ভাষায় এবং কখনো বা তাহা লঙ্ঘন করিয়াও বড়ো বড়ো লোককে মিথ্যুক,প্রবঞ্চক, সত্যগোপনকারী বলা হইয়া থাকে। হয় এরূপ নিন্দাবাদকে অত্যুক্তিপরায়ণতা বলিতে হয়, নয় ইংলন্ডের পলিটিক্‌স মিথ্যার দ্বারা জীর্ণ এ কথা স্বীকার করিতে হয়।

যাহা হউক, এ-সমস্ত আলোচনা করিলে এই কথা মনে উদয় হয় যে, বরঞ্চ অত্যুক্তিকে সুস্পষ্ট অত্যুক্তিরূপে পোষণ করাও ভালো, কিন্তু অত্যুক্তিকে সুকৌশলে ছাঁটিয়া-ছুঁটিয়া, তাহাকে বাস্তবের দলে চালাইবার চেষ্টা করা ভালো নহে—তাহাতে বিপদ অনেক বেশি।

পূর্বেই বলিয়াছি, যেখানে দুইপক্ষে উভয়ের ভাষা বোঝে সেখানে পরস্পরের যোগে অত্যুক্তি আপনি সংশোধিত হইয়া আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে বিলাতি অত্যুক্তি বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত।

এইজন্য তাহা অক্ষরে অক্ষরে বিশ্বাস করিয়া আমরা নিজের অবস্থাকে হাস্যকর ও শোচনীয় করিয়া তুলিয়াছি। ইংরেজ বলিয়াছিল, 'আমরা তোমাদের ভালো করিবার জন্যই তোমাদের দেশ শাসন করিতেছি, এখানে সাদা-কালোয় অধিকারভেদ নাই, এখানে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়, সম্রাটশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ আকবর যাহা কল্পনা মাত্র করিয়াছিলেন আমাদের সাম্রাজ্যে তাহাই সত্যে ফলিতেছে।' আমরা তাড়াতাড়ি ইহাই বিশ্বাস করিয়া আশ্বাসে স্ফীত হইয়া বসিয়া আছি। আমাদের দাবি আর অন্ত নাই। ইংরেজ বিরক্ত হইয়া আজকাল এই-সকল অত্যুক্তিকে খর্ব করিয়া লইতেছে। এখন বলিতেছে, 'যাহা তরবারি দিয়া জয় করিয়াছি তাহা তরবারি দিয়া রক্ষা করিব।' সাদা-কালোয় যে যথেষ্ট ভেদ আছে তাহা এখন অনেক সময়ে নিতান্ত গায়ে পড়িয়া নিতান্ত স্পষ্ট করিয়া দেখানো হইতেছে। কিন্তু তবু বিলাতি অত্যুক্তি এমনি সুনিপুণ ব্যাপার যে, আজও আমরা দাবি ছাড়ি নাই, আজও আমরা বিশ্বাস আঁকড়িয়া বসিয়া আছি, সেই-সকল অত্যুক্তিকেই আমাদের প্রধান দলিল করিয়া আমাদের জীর্ণচীরপ্রান্তে বহু যত্নে বাঁধিয়া রাখিয়াছি। অথচ আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এক সময়ে ভারতবর্ষ পৃথিবীকে কাপড় জোগাইয়াছে, আজ সে পরের কাপড় পরিয়া লজ্জা বাড়াইতেছে—এক সময়ে ভারতভূমি অন্নপূর্ণা ছিল, আজ 'হ্যাদে লক্ষ্মী হইল লক্ষ্মীছাড়া'—এক সময়ে ভারতে পৌরুষরক্ষা করিবার অস্ত্র ছিল, আজ কেবল কেরানিগিরির কলম কাটিবার ছুরিটুকু আছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির রাজত্ব পাইয়া অবধি ইচ্ছাপূর্বক চেষ্টাপূর্বক ছলে বলে কৌশলে ভারতের শিল্পকে পঙ্গু করিয়া সমস্ত দেশকে কৃষিকার্যে দীক্ষিত করিয়াছে, আজ আবার সেই কৃষকের খাজনা বাড়িতে বাড়িতে সেই হতভাগ্য ঋণসমুদ্রের মধ্যে চিরদিনের মতো নিমগ্ন হইয়াছে—এই তো গেল বাণিজ্য ও কৃষি। তাহার পর বীর্য এবং অস্ত্র, সেকথার উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। ইংরেজ বলে, 'তোমরা কেবলই চাকরির দিকে ঝুঁকিয়াছ, ব্যাবসা কর না কেন?' এ দিকে দেশ হইতে বর্ষে বর্ষে প্রায় পাঁচ শত কোটি টাকা খাজনায় ও মহাজনের লাভে বিদেশে চলিয়া যাইতেছে। মূলধন থাকে কোথায়? এ অবস্থায় দাঁড়াইয়াছি। তবু কি বিলাতি অত্যুক্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কেবলই দরখাস্ত জারি করিতে হইবে? হায়, ভিক্ষুকের অনন্ত ধৈর্য! হায়, দরিদ্রাণাং মনোরথাঃ! রোমের শাসনে, স্পেনের শাসনে, মোগলের শাসনে এতবড়ো একটা বৃহৎ দেশ কি এমন নিঃশেষে উপায়বিহীন হইয়াছে। অথচ পরদেশশাসন সম্বন্ধে এত বড়ো বড়ো নীতিকথার দম্ভপূর্ণ অত্যুক্তি আর কেহ কি কখনো উচ্চারণ করিয়াছে? কিন্তু এ-সকল অপ্রিয় কথা উত্থাপন করা কেন! কোনো একটা জাতিকে অনাবশ্যক আক্রমণ করিয়া পীড়া দেওয়া আমাদের দেশের লোকের স্বভাবসংগত নহে, ইহা আমরা ক্রমাগত ঘা খাইয়া ইংরেজের কাছ হইতেই শিখিয়াছি। নিতান্ত গায়ের জ্বালায় আমাদিগকে যে অশিষ্টতায় দীক্ষিত করিয়াছে তাহা আমাদের দেশের জিনিস নহে।

কিন্তু অন্যের কাছ হইতে আমরা যতই পাই-না কেন, আমাদের দেশের যে চিরন্তন নম্রতা, যে, ভদ্রতা, তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? ইহাকে বলে চোরের উপর রাগ করিয়া নিজের ক্ষতি করা।

অবশ্য, পরের নিকট হইতে স্বজাতি যখন অপবাদ ও অপমান সহ্য করিতে থাকে তখন যে আমার মন অবিচলিত থাকে এ কথা আমি বলিতে পারি না। কিন্তু সেই অপবাদলাঞ্ছনার জবাব দিবার জন্যই যে আমার এই প্রবন্ধ লেখা তাহা নহে। আমরা যেটুকু জবাব দিবার চেষ্টা করি তাহা নিতান্ত ক্ষীণ, কারণ বাক্‌শক্তিই আমাদের একটিমাত্র শক্তি। কামানের যে গর্জন তাহা ভীষণ, কারণ তাহার সঙ্গে সঙ্গে লোহার গোলাটা থাকে। কিন্তু প্রতিধ্বনির যে প্রত্যুত্তর তাহা ফাঁকা—সেরূপ খেলামাত্রে আমার অভিরুচি নাই।

ইংরেজ আমার এ লেখা পড়িবে না, পড়িলেও সকল কথা ঠিক বুঝিবে না। আমার এ

লেখা আমাদের স্বদেশীয় পাঠকদের জন্যই। অনেক দিন ধরিয়া চোখ বুজিয়া আমরা বিলাতি সভ্যতার হাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, সে সভ্যতা স্বার্থকে অভিভূত করিয়া বিশ্বহিতৈষা ও বিশ্বজনের শৃঙ্খলমুক্তির পথেই সত্য প্রেম শান্তির অনুকূলে অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু আজ হঠাৎ চমক ভাঙিবার সময় আসিয়াছে।

পৃথিবীতে এক-এক সময়ে প্রলয়ের বাতাস হঠাৎ উঠিয়া পড়ে। এক সময়ে মধ্য এশিয়ার মোগলগণ ধরণী হইতে লক্ষ্মীশ্রী ঝাঁটাইতে বাহির হইয়াছিল। এক সময়ে মুসলমানগণ ধুমকেতুর মতো পৃথিবীর উপর প্রলয়পুচ্ছ সঞ্চালন করিয়া ফিরিয়াছিল। পৃথিবীর মধ্যে যে কোণে ক্ষুধার বেগ বা ক্ষমতার লালসা ক্রমাগত পোষিত হইতে থাকে সেই কোণ হইতে জগদ্‌বিনাশী ঝড় উঠিবেই।

প্রাচীনকালে এই ধ্বংসধ্বজা তুলিয়া গ্রীক-রোমক-পারসীকগণ অনেক রক্ত সেচন করিয়াছে। ভারতবর্ষ বৌদ্ধ-রাজাদের অধীনে বিদেশে আপন ধর্ম প্রেরণ করিয়াছে, আপন স্বার্থ বিস্তার করে নাই। ভারতবর্ষীয় সভ্যতার বিনাশপ্লাবনের বেগ কোনোকালে ছিল না। ক্ষমতা ও স্বার্থ-বিস্তার ভারতবর্ষীয় সভ্যতার ভিত্তি নহে।

য়ুরোপীয় সভ্যতার ভিত্তি তাহাই। তাহা সর্বপ্রযত্নে নানা আকারে নানা দিক হইতে আপনার ক্ষমতাকে ও স্বার্থকেই বলীয়ান করিবার চেষ্টা করিতেছে। স্বার্থ ও ক্ষমতাস্পৃহা কোনোকালেই নিজের অধিকারের মধ্যে নিজেকে রক্ষা করিতে পারে না—এবং অধিকারলঙ্ঘনের পরিণামফল নিঃসংশয় বিপ্লব।

ইহা ধর্মের নিয়ম, ইহা ধ্রুব। সমস্ত য়ুরোপ আজ অস্ত্রে-শস্ত্রে দস্তুর হইয়া উঠিয়াছে। ব্যবসায়বুদ্ধি তাহার ধর্মবুদ্ধিকে অতিক্রম করিতেছে।

আমাদের দেশে বিলাতি সভ্যতার এমন-সকল পরম ভক্ত আছেন যাঁহারা ধর্মকে অবিশ্বাস করিতে পারেন, কিন্তু বিলাতি সভ্যতাকে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা বলেন, বিকার যাহা-কিছু দেখিতেছ এ-সমস্ত কিছুই নহে—দুই দিনেই কাটিয়া যাইবে। তাঁহারা বলেন, য়ুরোপীয় সভ্যতার রক্তচক্ষু এঞ্জিনটা সার্বজনীন ভ্রাতৃত্বের পথে ধক্‌ধক্ শব্দে ছুটিয়া চলিয়াছে।

এরূপ অসামান্য অন্ধভক্তি সকলের কাছে প্রত্যাশা করিতে পারি না। সেইজন্যই পূর্বদেশের হৃদয়ের মধ্যে আজ এক সুগভীর চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। আসন্ন ঝড়ের আশঙ্কায় পাখি যেমন আপন নীড়ের দিকে ছোটে, তেমনি বায়ুকোণের রক্তমেঘ দেখিয়া পূর্বদেশ হঠাৎ আপনার নীড়ের সন্ধানে উড়িবার উপক্রম করিয়াছে; বজ্রগর্জনকে সে সার্বভৌমিক প্রেমের মঙ্গলশঙ্খধ্বনি বলিয়া কল্পনা করিতেছে না। য়ুরোপ ধরণীর চারি দিকেই আপনার হাত বাড়াইতেছে; তাহাকে প্রেমালিঙ্গনের বাহুবিস্তার মনে করিয়া প্রাচ্যখণ্ড পুলকিত হইয়া উঠিতেছে না।

এই অবস্থায় আমরা বিলাতি সভ্যতার যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি তাহা কেবলমাত্র আত্মরক্ষার আকাঙ্ক্ষায়। আমরা যদি সংবাদ পাই যে, বিলাতি সভ্যতার মূলকাণ্ড যে পলিটিক্‌স্ সেই পলিটিক্‌স্ হইতে স্বার্থপরতা ও নির্দয়তা ও অসত্য, ধনাভিমান ও ক্ষমতাভিমান, প্রত্যহ জগৎ জুড়িয়া শাখাপ্রশাখা বিস্তার করিতেছে, এবং যদি ইহা বুঝিতে পারি যে স্বার্থকে সভ্যতার মূলশক্তি করিলে এরূপ দারুণ পরিণাম একান্তই অবশ্যম্ভাবী, তবে সে কথা সর্বতোভাবে আলোচনা করিয়া দেখা আবশ্যক হইয়া পড়ে—পরকে অপবাদ দিয়া সান্ত্বনা পাইবার জন্য নহে, নিজেকে সময় থাকিতে সংযত করিবার জন্য।

আমরা আজকাল পলিটিক্‌স্ অর্থাৎ রাষ্ট্রগত একান্ত স্বার্থপরতাকেই সভ্যতার একটিমাত্র মুকুটমণি ও বিরোধপরতাকেই উন্নতিলাভের একটিমাত্র পথ বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি, আমরা পলিটিক্‌সের মিথ্যা ও দোকানদারির মিথ্যা বিদেশের দৃষ্টান্ত হইতে প্রতিদিন গ্রহণ করিতেছি,

আমরা টাকাকে মুনষ্যত্বের চেয়ে বড়ো এবং ক্ষমতালাভকে মঙ্গলব্রতাচরণের চেয়ে শ্রেয় বলিয়া জানিয়াছি—তাই এতকাল যে স্বাভাবিক নিয়মে আমাদের দেশে লোকহিতকর ধর্ম ঘরে ঘরে অনুষ্ঠিত হইতেছিল তাহা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেছে। ইংরেজ গোয়ালা বাঁটে হাত না দিলে আমাদের কামধেনু আর একফোঁটা দুধ দেয় না—নিজের বাছুরকেও নহে। এমনি দারুণ মোহ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। সেই মোহজাল ছিন্ন করিবার জন্য যে-সকল তীক্ষ্ণবাক্য প্রয়োগ করিতে হইতেছে, আশা করি, তাহা বিদ্বেষবুদ্ধির অস্ত্রশালা হইতে গৃহীত হইতেছে না; আশা করি, তাহা স্বদেশের মঙ্গল-ইচ্ছা হইতে প্রেরিত। আমরা গালি খাইয়া যদি জবাব দিতে উদ্যত থাকি সে জবাব বিদেশী গালিদাতার উদ্দেশে নহে—সে কেবল আমাদের নিজের কাছে নিজের সম্মান রাখিবার জন্য, আমাদের নিজের প্রতি ভগ্নপ্রবণ বিশ্বাসকে বাঁধিয়া তুলিবার জন্য, শিশুকাল হইতে বিদেশীকে একমাত্র গুরু বলিয়া মানা অভ্যাস হওয়াতে তাঁহাদের কথাকে বেদবাক্য বলিয়া স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধাবিহীন হইবার মহাবিপদ হইতে নিজেরা রক্ষা পাইবার জন্য। ইংরেজ যে পথে যাইতে চায় যাক্, যত দ্রুতবেগে রথ চালাইতে চাহে চালাক, তাহাদের চঞ্চল চাবুকটা যেন আমাদের পৃষ্ঠে না পড়ে এবং তাহাদের চাকার তলায় আমরা যেন অন্তিম গতি লাভ না করি এই হইলেই হইল। ভিখ আমরা চাহি না। উত্তরোত্তর দুর্লভতর আঙুরের গুচ্ছ অক্ষমের অদৃষ্টে প্রতিদিন টকিয়া উঠিতেছে বলিয়াই হউক আর যে কারণেই হউক, আমাদের আর ভিক্ষায় কাজ নাই—এবং এ কথা বলাও বাহুল্য, কুত্তাতেও আমাদের প্রয়োজন দেখি না। শিক্ষাই বলো, চাকরিই বলো, যাহা পরের কাছে মাগিয়া-পাতিয়া লইতে হয়, পাছে কবে আবার কাড়িয়া লয় এই ভয়ে যাহাকে পাঁজরের কাছে সবলে চাপিয়া বক্ষ ব্যথিত করিয়া তুলি,তাহা খোওয়া গেলে অত্যন্ত বেশি ক্ষতি নাই। কারণ, মানুষের প্রাণ বড়ো কঠিন, সে বাঁচিবার শেষ চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার যে কতটা শক্তি আছে, নিতান্ত দায়ে না পড়িলে তাহা সে নিজেই বোঝে না। নিজের সেই অন্তরতর শক্তি আবিষ্কার করিবার জন্য বিধাতা যদি ভারতকে সর্বপ্রকারে বঞ্চিত হইতে দেন, তাহাতে শাপে বর হইবে। এমন জিনিস আমাদের চাই যাহা সম্পূর্ণ আমাদের স্বায়ত্ত, যাহা কেহ কাড়িয়া লইতে পারিবে না—সেই জিনিসটি হৃদয়ে রাখিয়া আমরা যদি কৌপীন পরি, যদি সন্ন্যাসী হই, যদি মরি, সেও ভালো। ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। **আমাদের খুব বেশি ব্যঞ্জনে দরকার নাই, যেটুকু আহার করিব নিজে যেন আহরণ করিতে পারি; খুব বেশি সাজসজ্জা না হইলেও চলে, মোটা কাপড়টা যেন নিজের হয়; এবং দেশকে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা আমরা যতটুকু নিজে করিতে পারি তাহা যেন সম্পূর্ণ নিজের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়।** এক কথায়, যাহা করিব আত্মত্যাগের দ্বারায় করিব, যাহা পাইব আত্মবিসর্জনের দ্বারাই পাইব, যাহা দিব আত্মদানের দ্বারাই দিব। এই যদি সম্ভব হয় তো হউক-না যদি হয়, পরে চাকরি না দিলেই যদি আমাদের অন্ন না জোটে, পরে বিদ্যালয় বন্ধ করিবামাত্রই যদি আমাদিগকে গণ্ডমূর্খ হইয়া থাকিতে হয়, এবং পরের নিকট হইতে উপাধির প্রত্যাশা না থাকিলে দেশের কাছে আমাদের টাকার থলির গ্রন্থিমোচন যদি না হইতে পারে, তবে পৃথিবীতে আর কাহারও উপর কোনো দোষারোপ না করিয়া যথাসম্ভব সত্বর যেন নিঃশব্দে এই ধরাতল হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে পারি। ভিক্ষাবৃত্তির তারস্বরে, অক্ষম বিলাপের সানুনাসিকতায় রাজপথের মাঝখানে আমরা যেন বিশ্বজগতের দৃষ্টি নিজেদের প্রতি আকর্ষণ না করি। যদি আমাদের নিজের চেষ্টায় আমাদের দেশের কোনো বৃহৎ কাজ হওয়ার সম্ভাবনা না থাকে তবে, হে মহামারী, তুমি আমাদের বান্ধব—হে দুর্ভিক্ষ, তুমি আমাদের সহায়।

কার্তিক ১৩০৯

২. বঙ্গবিভাগ

বঙ্গবিভাগ এবং শিক্ষাবিধি লইয়া আমাদের দেশে সম্প্রতি যে আন্দোলন হইয়া গেছে, তাহার মধ্যে একটি অপূর্বত্ব বিদেশী লোকেরাও লক্ষ্য করিয়াছে। সকলেই বলিতেছে, এবারকার বক্তৃতা দিতে রাজভক্তির ভড়ং নাই, সামলাইয়া কথা কহিবার প্রয়াস নাই, মনের কথা স্পষ্ট বলিবার একটা চেষ্টা দেখা গিয়াছে। তা ছাড়া, এ কথাও কোনো কোনো ইংরাজি কাগজে দেখিয়াছি যে, রাজার কাছে দরবার করিয়া কোনো ফল নাই—এমনতরো নৈরাশ্যের ভাবও এই প্রথম প্রকাশ পাইয়াছে।

কন্‌গ্রেস প্রভৃতি রাষ্ট্রনৈতিক সভাস্থলে আমরা বরাবর দুইকূল বাঁচাইয়া কথা কহিবার চেষ্টা করিয়াছি। রাজভক্তির অজস্র গৌরচন্দ্রিকার দ্বারা আমরা সর্বপ্রথমেই গোরার মনোহরণব্যাপার সমাধা করিয়া তাহার পরে কালার তরফের কথা তুলিয়াছি। হতভাগ্য হতবল ব্যক্তিদের এইরূপ নানাপ্রকার নিষ্ফল কলাকৌশল দেখিয়া নিষ্ঠুর অদৃষ্ট অনেকদিন হইতে হাস্য করিয়া আসিয়াছে।

এবারে কিন্তু দুর্বল ভীরুর স্বভাবসিদ্ধ ছলাকলা বিশেষ দেখা যায় নাই—প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিরাও একেবারে হাল ছাড়িয়া দিয়া সোজা সোজা কথা কহিয়াছেন।

ইহার কারণ এই, যে দুটো ব্যাপার লইয়া আলোচনা উপস্থিত হইয়াছে সে দুটোই আমাদের মনে গোড়াতেই একটা অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিয়াছে। এ দুটো ব্যাপারের ভিত্তিই অবিশ্বাস।

এই অবিশ্বাসের যথার্থ হেতু আছে কি না-আছে তাহা লইয়া তর্ক করা মিথ্যা—কারণ, চাণক্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন, স্ত্রীলোক এবং রাজা উভয়ের মনস্তত্ত্ব সাধারণ লোকের পক্ষে দুর্জ্ঞেয়। এবং যাহা দুর্জ্ঞেয় আত্মরক্ষার জন্য দুর্বল লোকে তাহাকে গোড়াতেই অবিশ্বাস করিয়া থাকে, ইহা স্বাভাবিক।

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ করিয়াছি যে, য়ুনিভার্সিটি বিলের দ্বারা তোমরা এদেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার মূলোচ্ছেদ করিতে চাও, এবং বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিয়া তোমরা বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিতে ইচ্ছা কর।

শিক্ষা এবং ঐক্য এই দুটাই জাতিমাত্রেরই আত্মোন্নতি ও আত্মরক্ষার চরম সম্বল। এই দুটার প্রতি ঘা পড়িয়াছে, এমন যদি সন্দেহমাত্র মনে জন্মায়, তবে ব্যাকুল হইয়া উঠিবার কথা। বিশেষত যখন মনে জানি—অপরপক্ষ বলিষ্ঠ, আমাদের হাতে কোনো উপায় নাই, এবং যাঁহারা আমাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন তাঁহাদিগকেই আমাদের সহায় ও সখা বলিয়া আহ্বান করিতে হইবে।

কিন্তু, বর্তমান ঘটনায় আমাদের কাছে সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই মনে হয় যে, আমরা অবিশ্বাস প্রকাশ করিয়াছি, কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধন ছেদন করিতে পারি নাই। ইহাকেই বলে ওরিয়েন্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্যদের সঙ্গে আমাদের প্রভেদ। য়ুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাস করিতে জানে। আমরা ক্ষণকালের জন্য রাগ করি, আর যাই করি, অন্তরের মধ্যে আমরা পুরোপুরি অবিশ্বাস করিতে পারি না। ষোলো-আনা অবিশ্বাসকে জাগাইয়া রাখিবার যে শক্তি তাহা আমাদের নাই—আমরা ভুলিতে চাই, আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলে বাঁচি।

আমি জানি, আমার একজন বাঙালি বন্ধুর বিরুদ্ধে কোনো ইংরাজ মিথ্যা চক্রান্ত করিয়াছিল। সেই মিথ্যা যখন প্রমাণ হইয়া গেল তখন তাঁহাকে তাঁহার এক ইংরাজ সুহৃদ বলিয়াছিলেন : Spare him not crush him like a worm! কিন্তু বাঙালি সে সুযোগ সম্পূর্ণ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, এবং তাহার ফল এখনো ভোগ করিতেছেন। নিঃশেষে দলন করিতে, নিঃশেষে অবিশ্বাস করিতে, নিঃশেষে চুকাইয়া ফেলিতে আমরা জানি না—আমাদের চিরন্তন

প্রকৃতি এবং শিক্ষা আমাদিগকে বাধা দেয়—এক জায়গায় আমাদের মন বলিয়া ওঠে, 'আহা, আর কেন, আর কাজ নাই, আর থাক্।' পরিপূর্ণ অবিশ্বাসের মধ্যে যে একটা কাঠিন্য, যে একটা নির্দয়তা আছে, আমাদের গার্হস্থ্যপ্রধান, আমাদের মিলনমূলক সভ্যতা তাহা আমাদিগকে চর্চা করিতে দেয় নাই। সম্বন্ধবিস্তার করিবার জন্যই আমরা সর্বতোভাবে চিরদিন প্রস্তুত হইয়াছি, সম্বন্ধবিচ্ছেদ করিবার জন্য নহে। যাহা অনাবশ্যক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার চেষ্টা করিয়াছি। কোনো জিনিসকেই ঝাড়ে-মূলে উপড়াইয়া একেবারে টান মারিয়া ফেলিয়া দিতে শিখি নাই—আত্মরক্ষার পক্ষে, স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষে ইহা সুশিক্ষা নহে।

য়ুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিদ্রোহ করিয়া পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন, বিদ্রোহপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মুশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধা করে না।

চাণক্যপণ্ডিতের 'স্ত্রীষু রাজকুলেষু চ' শ্লোক বাঙালির কণ্ঠস্থ কিন্তু বাঙালির তদপেক্ষা কণ্ঠলগ্ন তাহার স্ত্রী। সেজন্য তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না; কারণ শুষ্ক পুঁথির চেয়ে সরস রক্তমাংসের প্রমাণ ঢের বেশি আদরণীয়। কিন্তু রাজকুল সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। হাতে-হাতেই তাহার দৃষ্টান্ত দেখো—

যদি সত্যই তোমার এই ধারণা হইয়া থাকে যে, বাঙালিজাতিকে দুর্বল করিবার উদ্দেশেই বাংলাদেশকে খণ্ডিত করা হইতেছে—যদি সত্যই তোমার বিশ্বাস যে, য়ুনিভার্সিটি-বিলের দ্বারা ইচ্ছাপূর্বক য়ুনিভার্সিটির প্রতি মৃত্যুবাণ বর্ষণ করা হইতেছে, তবে সে কথার উল্লেখ করিয়া তুমি কাহার করুণা আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। উদ্যত কুঠারকে গাছ যদি করুণস্বরে এই কথা বলে যে 'তোমার আঘাতে আমি ছিন্ন হইয়া যাইব', তবে সেটা কি নিতান্ত বাহুল্য হয় না। গাছের মজ্জার মধ্যে কি এই বিশ্বাসই রহিয়াছে যে, কুঠার তাহাকে আলিঙ্গন করিতে আসিয়াছে, ছিন্ন করিতে নহে।

আর মনের মধ্যে যদি অবিশ্বাস না জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাস প্রকাশ করিতেছ কেন—অমন চড়াসুরে কথা কহিতেছ কেন—কেন বলিতেছ,'তোমাদের মতলব আমরা বুঝিয়াছি, তোমরা আমাদিগকে নষ্ট করিতে চাও।' এবং তাহার পরক্ষণেই কাঁদিয়া বলিতেছ, 'তোমরা যাহা সংকল্প করিয়াছ তাহাতে আমরা নষ্ট হইব, অতএব নিরস্ত হও।' বলিহারি এই 'অতএব'।

আমাদের প্রকৃতি এবং শিক্ষার বৈষম্যে সকল বিষয়েই আমাদের এইরূপ দ্বিধা উপস্থিত হইয়াছে। আমরা মুখে অবিশ্বাস দেখাইতে পারি, কিন্তু আচরণে অবিশ্বাস করিতে পারি না। তাহাতে সকল দিকই নষ্ট হয়—ভিক্ষাধর্মও যথানিয়মে পালিত হয় না, স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতেও প্রবৃত্তি থাকে না।

আমাদের মনে সত্যই যদি অবিশ্বাস জন্মিয়া থাকে, তবে অবিশ্বাসের মধ্য হইতে যেটুকু লাভের বিষয় তাহা গ্রহণ না করি কেন। আমাদের শাস্ত্রে এবং সমাজে রাজায়-প্রজায় মিলনের নীতি ও প্রীতিসম্বন্ধই চিরকাল প্রচার করিয়া আসিয়াছে—সেইটেই আমরা বুঝি ভালো, সেইটেই আমাদের পক্ষে সহজ। সেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের দ্বারা আমরা কী লাভ করিতে পারিতাম তাহা বর্তমানে কল্পনা করিয়া কোনো ফল নাই।

কিন্তু ভারতবর্ষে সম্প্রতি রাজাপ্রজার মাঝখানে খুব যে একটা মন কষাকষি চলিতেছে, তাহা এত স্পষ্ট, এত প্রত্যক্ষ যে, কোনো পলিসি-উপলক্ষেও তাহা গোপন কবিবার চেষ্টা বৃথা এবং লজ্জাকর। আমরা যদি-বা কপট ভাষায় তাহা ঢাকিতে ইচ্ছা করি, কর্তৃপক্ষদের কাছে তাহা ঢাকা পড়ে না। কারণ, ইংরাজ ও দেশী কোনো পক্ষেই প্রেমের ছড়াছড়ি নাই— এমন অবস্থায় রাস্তায়

ঘাটে, আপিসে আদালতে, রেলে, ট্রামে, কাগজপত্রে, সভাসমিতিতে উত্তমরূপে পরস্পরের মন-জানাজানি হইয়া থাকে।

আমরা ঘরে ঘরে বলিয়া থাকি, বাঙালিজাতির প্রতি ইংরাজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছে এবং কর্তৃপক্ষেরা বাঙালিজাতিকে দমন করিতে উৎসুক। ইংরাজি সাহিত্যে, বিলাতি কাগজে বাঙালিজাতির প্রতি প্রায় মাঝে মাঝে তীব্রভাষা প্রয়োগ করিয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সম্মানিত করিয়া থাকে।

ইহাতে অধীন দুর্বলজাতির চাকরি-বাকরি, সাংসারিক সুযোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে নানাপ্রকার অসুবিধা ঘটিবার কথা। তাহা আক্ষেপের বিষয় হইতে পারে, কিন্তু ইহা হইতে যেটুকু সুবিধা স্বভাবত প্রত্যাশা করা যাইতে পারিত তাহারও কোনো লক্ষণ দেখিতে পাই না কেন। গালেও চড় পড়িবে, মশাও মরিবে না—আমাদের কি এমনি কপাল।

পরের কাছে সুস্পষ্ট আঘাত পাইলে পরতন্ত্রতা শিথিল হইয়া নিজেদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় হয়। সংঘাত ব্যতীত বড়ো কোনো জিনিস গড়িয়া উঠে না, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ আছে।

কিন্তু আমরা আঘাত পাইয়া নিরাশ্বাস হইয়া কী করিলাম। বাহিরে তাড়া খাইয়া ঘরে কই আসিলাম। আবার তো সেই রাজদরবারেই ছুটিতেছি। এ সম্বন্ধে আমাদের কী কর্তব্য তাহার মীমাংসার জন্য নিজেদের চণ্ডীমণ্ডপে আসিয়া জুটিলাম না।

আন্দোলন যখন উত্তাল হইয়া উঠিয়াছিল তখন আমরা কোনো কথা বলি নাই; এখন বলিবার সময় আসিয়াছে।

দেশের প্রতি আমাদের কথা এই—আমরা আক্ষেপ করিব না, পারের কছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধদ্বারে মাথা-খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎকশাঘাত করে, তবে সেই লইয়াই কি হাহাকার করিতে হইব। আমাদের দ্বারের কাছে নদী বহিয়া যাইতেছে না? সেই নদী শুষ্কপ্রায় হইলেও তাহা খুঁড়িয়া কি জল পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় করা যায় না।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুণ করিয়া তুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয় তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। সেই চেষ্টাই আমাদের যথার্থ লাভ। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যখন মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইবে তখনই আন্তরিক ঐক্য উদ্‌বেল হইয়া উঠিবে —তখনই আমরা যথার্থভাবে অনুভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রহ্মপুত্র তাঁহার প্রসারিত ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছেন; এই পূর্ব-পশ্চিম, হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রক্তস্রোতে সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা–উপশিরায় প্রাণ-বিধান করিয়া আসিয়াছে। আমাদিগকে কিছুতে পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে, তবে সে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর কোনো কৃত্রিম উপায়ের দ্বারা হইতে পারে না। এখন হইতে সর্বতোভাবে সেই শঙ্কার কারণগুলিকে দূর করিতে হইবে, ঐক্যকে দৃঢ় করিতে হইবে, সুখে-দুঃখে নিজেদের মধ্যেই মিলন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে।

এ হইল প্রাণের কথা; ইহার মধ্যে সুবিধা-অসুবিধার কথা, লাভক্ষতির কথা যদি কিছু থাকে—যদি এমন সন্দেহ মনে জন্মিয়া থাকে যে, বঙ্গবিভাগসূত্রে ক্রমে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' লোপ পাইতে পারে, আমাদের চাকরি-বাকরির ক্ষেত্র সংকীর্ণ হইতে পারে—তবে সে সম্বন্ধে আমাদের

বক্তব্য এই যে, পারে বটে, কিন্তু কী করিবে। কর্তৃপক্ষ যদি মনে মনে একটা পলিসি আঁটিয়া থাকেন, তবে আজ হউক কাল হউক, গোপনে হউক, প্রকাশ্যে হউক, সেটা তাঁহারা সাধন করিবেনই; আমাদের তর্ক শুনিয়া তাঁহারা ক্ষান্ত হইবেন কেন। মনে করো-না কেন, কথামালার বাঘ যখন মেষশাবককে খাইতে ইচ্ছা করিয়া বলিল—'তুই আমার জল ঘোলা করিতেছিস, তোকে মারিব', তখন মেষশাবক বাঘকে তর্কে পরাস্ত করিল, কহিল, 'আমি ঝরনার নীচের জল খাইতেছি, তোমার উপরের জল ঘোলা হইল কী করিয়া।' তর্কে বাঘ পরাস্ত হইল, কিন্তু মেষশিশুর কি তাহাতে কোনো সুবিধা হইয়াছিল।

অনুগ্রহই যেখানে অধিকারের নির্ভর সেখানে মমতা বাড়িতে দেওয়া কিছু নয়। ম্যুনিসিপালিটির স্বায়ত্তশাসন এক রাজপ্রতিনিধি আমাদিগকে দিয়াছিলেন, আর-এক রাজপ্রতিনিধি তাহা স্বচ্ছন্দে কাড়িয়া লইলেন। উপরন্তু গাল দিলেন, বলিলেন, 'তোমরা কোনো কর্মের নও'। আমরা হাহাকার করিয়া মরিলাম, 'আমাদের অধিকার গেল।' অধিকার কিসের। এ মোহ কেন। মহারাণী এক সময়ে আমাদের একটা আশ্বাসপত্র দিয়াছিলেন যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিলে আমরা রাজকার্যে প্রবেশলাভ করিতে পারিব, কালো চামড়ার অপরাধ গণ্য হইবে না। আজ যদি কর্মশালা হইতে বহিষ্কৃত হইতে থাকি তবে সেই পুরাতন দলিলটির দোহাই পাড়িয়া লাভ কী। সেই দলিলের কথা কি রাজপুরুষের অগোচর আছে। ময়দানে মহারাণীর প্রস্তরমূর্তি কি তাহাতে বিচলিত হইবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আজও স্থায়ী আছে, সে কি আমাদের অধিকারের জোরে না রাজার অনুগ্রহে। যদি পরে এমন কথা উঠে যে, কোনো বন্দোবস্তই স্থায়ী হইতে পারে না, শাসনকার্যের সুবিধার উপরেই স্থায়িত্বের নির্ভর, তবে সত্যরক্ষার জন্য লর্ড কর্নওয়ালিসের প্রেতাত্মাকে কলিকাতা টাউন-হল হইতে উদ্‌বেজিত করিয়া লাভ কী হইবে। এ-সমস্ত মোহ আমাদিগকে ছিন্ন করিতে হইবে, তবে আমরা মুক্ত হইব। নতুবা প্রতিদিনই পুনঃপুন বিলাপের আর অন্ত থাকিবে না।

কিন্তু যেখানে আমাদের নিজের জোর আছে সেখানে আমরা দৃঢ় হইব। যেখানে কর্তব্য আমাদেরই সেখানে আমরা সচেতন থাকিব। যেখানে আমাদের আত্মীয় আছে সেইখানে আমরা নির্ভর স্থাপন করিব। আমরা কোনোমতেই নিরানন্দ নিরাশ্বাস হইব না। এ কথা কোনোমতেই বলিব না যে, গবর্মেন্ট একটা কি করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই অমনি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল—তাহাই যদি হওয়া সম্ভবপর হইতে পারে তবে কোনো কৌশললব্ধ সুযোগে, কোনো ভিক্ষালব্ধ অনুগ্রহে আমাদিগকে বেশিদিন রক্ষা করিতে পারিবে না।

ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি-বা তিনি আমাদের জন্য গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না।

ব্রিটিশ গবর্মেন্ট নানাবিধ অনুগ্রহের দ্বারা লালিত করিয়া কোনোমতেই আমাদিগকে মানুষ করিতে পারিবেন না ইহা নিঃসন্দেহ; অনুগ্রহভিক্ষুদিগকে যখন পদে পদে হতাশ করিয়া তাঁহাদের দ্বার হইতে দূর করিয়া দিবেন তখনই আমাদের নিজের ভাণ্ডারে কী আছে তাহা আবিষ্কার করিবার অবসর হইবে, আমাদের নিজের শক্তিদ্বারা কী সাধ্য তাহা জানিবার সময় হইবে, আমাদের নিজের পাপের কী প্রায়শ্চিত্ত তাহাই বিশ্বগুরু বুঝাইয়া দিবেন। যাচিয়া মান, কাঁদিয়া সোহাগ যখন কিছুতেই জুটিবে না—বাহির হইতে সুবিধা এবং সম্মান যখন ভিক্ষা করিয়া, দরখাস্ত করিয়া অতি অনায়াসে মিলিবে না—তখন ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু প্রেম লক্ষ্মীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্য গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তখন মাতৃভাষায় ভ্রাতৃগণের সহিত সুখদুঃখ-লাভক্ষতির আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিতে পারিব, প্রোভিন্সাল কন্‌ফারেন্সে

দেশের লোকের কাছে বিদেশের ভাষায় দুর্বোধ্য বক্তৃতা করিয়া আপনাদিগকে কৃতকৃত্য জ্ঞান কবিব না। এবং সেই শুভদিন যখন আসিবে, ইংরাজ যখন ঘাড়ে ধরিয়া আমাদিগকে আমাদের নিজের ঘরের দিকে, নিজের চেষ্টার দিকে জোর করিয়া ফিরাইয়া দিতে পারিবে, তখন ব্রিটিশ গবর্মেন্ট্‌কে বলিব ধন্য—তখনই অনুভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। হে রাজন্‌, আমাদিগকে যাহা যাচিত ও অযাচিত দান করিয়াছ তাহা একে একে ফিরাইয়া লও, আমাদিগকে অর্জন করিতে দাও। আমরা প্রশ্রয় চাহি না, প্রতিকূলতার দ্বারাই আমাদের শক্তির উদ্‌বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না—তোমাদের রুদ্রমূর্তিই আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একই মাত্র উপায় আছে—আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব—সমাদর নহে, সহায়তা নহে, সুভিক্ষ নহে।

১৩১১

৩. দেশের কথা

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন শ্রীযুক্ত সখারাম দেউস্কর মহাশয়ের রচিত 'দেশের কথা' নামক পুস্তকের সমালোচনা আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। তাহার আরম্ভে তিনি লিখিতেছেন—

'এই পুস্তকের বিষয়গুলি মৌলিক নহে। ভারতহিতৈষী ডিগ্‌বি প্রভৃতি ইংরেজগণ এবং দাদাভাই নরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি ভারতের সুসন্তানগণ যে-সকল বিষয় লইয়া বহুবৎসর যাবৎ আলোচনা করিতেছেন তাহাই মূলত অবলম্বন করিয়া এই পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব অস্পষ্টভাবে আমাদের ধারণায় ছিল, এই পুস্তকখানি পড়িয়া তাহা সুস্পষ্ট জীবন্ত এবং আকারপ্রাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

'কোনো সাধুপুষ্পিত সুন্দর উদ্যান দাবদগ্ধ হইয়া গেলে কিংবা কোনো সুদর্শন পরিচিত বন্ধুর হঠাৎ কঙ্কাল দেখিলে মনের যেরূপ অবস্থা হয়, বর্তমান চিত্রে অঙ্কিত ভারতীয় শিল্পবাণিজ্যাদির অবস্থা দর্শনে সেইরূপ একটা ভাবের উদয় হইবে, অথচ দেউস্করমহাশয় কোনো উত্তেজিত বক্তৃতা প্রদান করেন নাই—কতকগুলি সংখ্যাবাচক অঙ্ক এবং সেন্সাস ও স্ট্যাটিস্টিক্‌স হইতে সমুদ্‌ধৃত কথা নিঃশব্দে একটি মর্মচ্ছেদী দৃশ্য উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখাইবেন। এই দৃশ্য একটি বিয়োগান্ত নাটকের ন্যায়—প্রভেদ এই যে, ইহাতে কাল্পনিক দুঃখের কথা নাই, ইহা আমাদের নিজেদের দুঃখদারিদ্র্য ও মৃত্যুর চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। গ্রন্থকার ভিষকের ন্যায় আমাদের ক্ষতস্থানটি জাগাইয়া তুলিয়া বেদনাবোধের সঞ্চার করিয়াছেন।'

ইহার অনতিদূর পরেই তিনি লিখিতেছেন—

'দেউস্করমহাশয় বলেন, পুনঃপুন আন্দোলন করিলে গবর্মেন্ট্‌ অবশ্যই আমাদের কথায় কর্ণপাত করিবেন।'

শিক্ষাটা কি এই হইল। ইতিহাসে প্রমাণ হইতেছে, প্রবল জাতি ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া দুর্বলজাতির স্বত্ব নষ্ট করিতেছে; ইহা হইতে কি এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, সেই প্রবলজাতির নিকট পুনঃপুন আন্দোলন করিলেই লোপ্‌ত্রদ্রব্য ফিরিয়া পাওয়া যায়। ব্যাপারটা এতই সহজ?

ইহার উত্তরে আন্দোলনের দল বলিবেন, তা ছাড়া আর কী করিব। একটা তো কিছু করা চাই।

আমরা বলি, কিছু যদি করিতেই হয় তো ঐ অরণ্যে রোদনটা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, তোমরা এই ইতিহাস হইতে লাভ করিবার বিষয় কী দেখিলে। আমরা বলিব, লাভের বিষয় দেখিয়াছি, কিন্তু সেটা দরখাস্তপত্রিকা নহে। আমাদের লাভ এই যে : ইংরাজের আদর্শ আমাদের হৃদয় জয় করিয়াছিল। স্বদেশের সকল দিক হইতে আমাদের হৃদয় বিমুখ হইতেছিল। মুখে আস্ফালন করিয়া যাহাই বলি আমাদের অন্তঃকরণ বলিতেছিল, বিলাতি সভ্যতার মতো সভ্যতা আর নাই। এই কারণে আমাদের দেশের আদর্শ কী, শক্তি কোথায়, তাহা যথার্থভাবে বিচার করিয়া বাহির করিতে পারিতেছিলাম না। প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্-মূলক সভ্যতার চেহারা ইতিহাসে উত্তরোত্তর যতই উৎকট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে ততই আমাদের হৃদয়ের উদ্ধার হইতেছে। ক্রমশই আমাদের দেশ যথার্থভাবে আমাদের হৃদয়কে পাইতেছে। ইহাই পরম লাভ। ধনলাভের চেয়ে ইহা অল্প লাভ নহে।

অন্যপক্ষ বলিবেন, তবে দেশহিতৈষিতাটাকে তোমরা ভালোই বল না। আমরা বলি, দেশহিতৈষিতা কাহাকে বলে তাহা লইয়া এত তর্কের বিষয় আছে যে, কেবল ঐ নামটাকে লইয়া মুখে মুখে লোফালুফি করিয়া কোনো ফল নাই। প্যাট্রিয়টিজ্‌মের প্রতিশব্দ দেশহিতৈষিতা নহে। জিনিসটা বিদেশি, নামটাও বিদেশি থাকিলে ক্ষতি নাই। যদি কোনো বাংলা শব্দই চালাইতে হয়, তবে 'স্বাদেশিকতা' কথাটা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের উর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা। স্বদেশের *লেশমাত্র স্বার্থে যেখানে বাধে না সেইখানেই ধর্ম* বল দয়া বল, আপনার দাবি উত্থাপন করিতে পারে—কিন্তু যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল, সমস্ত নীচে তলাইয়া যায়। *স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজ্‌ম্* শব্দের বাচ্য হইয়াছে।

স্বার্থপরতা কখনোই ধর্মের জন্য আপনাকে সংযত করে না, স্বার্থের জন্যই করে। ইংরাজ কখনোই এ কথা ভাবে নাই যে পৃথিবীতে ফরাসি সভ্যতার একটা উপকারিতা আছে, অতএব সে সভ্যতায় আঘাত করিলে সমস্ত মানবের, সুতরাং আমাদেরও ক্ষতি। নিজের পেট ভরাইবার জন্য আবশ্যক হইলে ফরাসিকে সে বটিকার মতো গিলিয়া ফেলিতে পারে, দ্বিধামাত্র করে না। তাহার দ্বিধার একমাত্র কারণ, আমারও গায়ে জোর আছে, ফরাসিও নেহাত ক্ষীণজীবী নহে, অতএব কী জানি লাভ করিতে গিয়া মূলধন-সুদ্ধ হারানো অসম্ভব নহে, এ স্থলে ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য এশিয়া-আফ্রিকার ডালপালা সমস্ত মুড়াইয়া খাইলে কোনো দোষ দেখি না। অতএব তিব্বতে শান্তিদূত প্রেরণের ব্যবস্থাকালে কপোলযুগ লজ্জায় রক্তিমবর্ণ করিবার কোনো প্রয়োজন নাই।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বার্থপরতাকে যদি ধর্মের আসনের প্রান্তে বসাইয়া কিছুমাত্র প্রশ্রয় দেওয়া যায়, তবে অবশেষে সে একদিন ধর্মকে ঠেলা মারিয়া ফেলিবেই। স্বদেশীয় স্বার্থপরতা আজ সেইজন্য কেবলই পৃথিবীময় তাল ঠুকিয়া-ঠুকিয়া দেবতাকে সুদ্ধ ভয় দেখাইয়া স্তম্ভিত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

বিখ্যাত ভ্রমণকারী 'Sven Hedin' এর নাম সকলেই শুনিয়াছেন। ইংরাজের তিব্বত-আক্রমণ প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন—

"The English campaign in Tibet is a fresh proof of the Imperialist brutality which seems to characterise the political tendencies of our times, and in face of which the position of the smaller states appears precarious. A small state which does not possess the power to defend itself is doomed to decay, whether it is Christian or not. If our priests taught the people the meaning of the words 'Love thy neighbours as thyself', 'Thou shalt not steal', 'Thou shalt do no

murder', 'Peace on earth and goodwill towards men', instead of losing themselves and their hearers in unfathomable and completely useless dogmas, such an injustice as the present one would be impossible. But probably such really Christian feelings are nonsense in modern polity. And the same Christians send our missionaries to Japan. In the name of truth one ought to protect the Asiatics from such Christianity."

এ-সকল কথার তাৎপর্য আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। টেলিগ্রাফ রেলগাড়ি ও বড়ো বড়ো ইস্কুলই যে সভ্যতার প্রকৃত উপকরণ ও লক্ষণ নহে তাহা নিশ্চয় জানিয়া যথার্থ মনুষ্যত্বলাভের জন্য অন্যত্র সন্ধান করিতে হইবে—তখন জ্ঞান হইতেও পারে যে, মনুষ্যত্বচর্চার জন্য পাশ্চাত্য শস্ত্রধারীদের ছাত্রত্ব স্বীকার করা আমাদের পক্ষে অত্যাবশ্যক নহে। তখন নিজের দেশের আদর্শ ও নিজের শক্তিকে নিতান্ত অবজ্ঞেয় বলিয়া মনে হইবে না।

কিন্তু অন্নের অভাবে কৃশ হইয়া, তেজের অভাবে ম্লান হইয়া, ঝরিয়া মরিয়া পড়িলে তখন তোমার দেশের আদর্শই বা কোথায় ধর্মই বা কোথায়। আদর্শ রক্ষা করিতে গেলেও যে শক্তির প্রয়োজন হয় তাহার অবাধ চর্চার স্থল কোথায়। কাজেই সেজন্য দরখাস্ত করিতেই হয়, শুদ্ধ ইংরাজি ভাষায় রেজোল্যুশন পাস না করিলে চলেই না।

এক দিকে স্বদেশীয় স্বার্থপরতার সংঘাত আক্রমণ করিলে অপর দিকেও স্বদেশীয় স্বার্থরক্ষার উদ্যম স্বভাবতই জাগিয়ে উঠে। এমনি করিয়া ইংরাজিতে যাহাকে নেশন, অর্থাৎ পোলিটিকাল স্বার্থবদ্ধ জনসম্প্রদায় বলে, তাহার উদ্‌ভব হইতে থাকে।

আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় তাহার উদ্‌ভব না হইয়া থাকিতেই পারে না। সুতরাং এই সময়েই আমাদের মোহমুক্ত হওয়া দরকার। অনিবার্য প্রয়োজনে যাহা আমাকে লইতেই হইবে তাহার সম্বন্ধে অতিমাত্রায় মুগ্ধভাব থাকা কিছু নয়। এ কথা যেন না মনে করি, জাতীয় স্বার্থতন্ত্রই মনুষ্যত্বের চরম লাভ। তাহার উপরেও ধর্মকে রক্ষা করিতে হইবে—মনুষ্যত্বকে ন্যাশনালত্বের চেয়ে বড়ো বলিয়া জানিতে হইবে। ন্যাশনালত্বের সুবিধার খাতিরে মনুষ্যত্বকে পদে পদে বিকাইয়া দেওয়া, মিথ্যাকে আশ্রয় করা, ছলনাকে আশ্রয় করা, নির্দয়তাকে আশ্রয় করা প্রকৃতপক্ষে ঠকা। সেইরূপ ঠকিতে ঠকিতে অবশেষে একদিন দেখা যাইবে, ন্যাশনালত্ব-সুদ্ধ দেউলে হইবার উপক্রম হইয়াছে; কারণ, স্বার্থপরতার স্বভাবই এই যে, সে ক্রমশই সংকীর্ণতার দিকে আকর্ষণ করে। তাহার প্রমাণ, বোয়ার যুদ্ধে ইংরাজের তরফের রসদের মধ্যে রাশি রাশি ভেজাল। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষেও সেইরূপ দেখা গেছে। মনুষ্যত্বের মঙ্গলকে যদি ন্যাশনালত্ব বিকাইয়া দেয়, তবে ন্যাশনালত্বের মঙ্গলকেও একদিন ব্যক্তিগত স্বার্থ বিকাইতে আরম্ভ করিবে। ইহার অন্যথা হইতেই পারে না। প্রাকৃতিক নিয়মই যে অমোঘ—ধর্মের নিয়ম যে অমোঘ নহে—তাহা নয়।

বাল্যশিক্ষার প্রভাব বড়ো কম নয়। ভারতবর্ষের অস্থিমাংস লইয়াও দীনেশবাবুর ন্যায় মনীষী ব্যক্তি 'দেশের কথা'র সমালোচনার ছলে এক জায়গায় লিখিয়াছেন—

'গবর্মেন্ট যখন এক চক্ষে ভারতবাসীর হিত ও ভাবী উন্নতির দিকে লক্ষ্য করেন তখন তাঁহার আর-একটা চক্ষু সাগরমেখলা শ্বেতদ্বীপাধিষ্ঠাত্রী বাণিজ্যলক্ষ্মীর চরণনখরপ্রান্তে আবদ্ধ থাকিবে, ইহা আমরা কোনোক্রমেই অন্যায় বলিয়া মনে করিতে পারিব না।'

দুটি চোখের ঠিক একটি চোখ সাগরের এ পারে এবং একটি চোখ ওপারে রাখিলে ন্যায়দণ্ড কতকটা সিধা থাকিত। কিন্তু দেউস্কর মহাশয়ের গ্রন্থখানি কি তাহাই প্রমাণ করিয়াছে? আসল কথা, আমরা আজকাল অনেকেই মনে করি, ন্যাশনালিটির স্পর্শমণির স্পর্শে সমস্ত অন্যায় সোনার চাঁদ হইয়া উঠে।

যাহা হউক, আমাদিগকে নেশন বাঁধিতে হইবে—কিন্তু বিলাতের নকলে নহে। আমাদের জাতির মধ্যে যে নিত্যপদার্থটি, যে প্রাণপদার্থটি আছে, তাহাকেই সর্বতোভাবে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগকে ঐক্যবদ্ধ হইতে হইবে—আমাদের চিত্তকে, আমাদের প্রতিভাকে মুক্ত করিতে হইবে; আমাদের সমাজকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও বলশালী করিতে হইবে। এ কার্যে স্বদেশের দিকে আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয়, স্বদেশের প্রতি আমাদের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা চাই—যাহা শিক্ষা ও অবস্থার গুণে অন্য দিকে ধাবিত হইয়াছে তাহাকে ঘরের দিকে ফিরাইতে হইবে। আশা করি, দেউস্কর মহাশয়ের বইখানি আমাদিগকে সেই পথে যাত্রার সহায়তা করিবে—আমাদিগকে পুনঃপুন নিষ্ফল আন্দোলনের দিকেই উৎসাহিত করিবে না।

১৩১১

৪. ব্যাধি ও প্রতিকার

কিছুকাল হইতে বাংলাদেশের মনটা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষে খুবই একটা নাড়া পাইয়াছে। এইবার প্রথম দেশের লোক একটা কথা খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়াছে। সেটা এই যে, আমরা যতই গভীররূপে বেদনা পাই-না কেন, সে বেদনার বেগ আমাদের গবর্মেন্টের নাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারে না। গবর্মেন্ট্ আমাদের হইতে যে কতদূর পর তাহা আমাদের দেশের সর্বসাধারণ ইতিপূর্বে এমন স্পষ্ট করিয়া কোনোদিন বুঝিতে পারে নাই।

কর্তৃপক্ষ সমস্ত দেশের লোকের চিত্তকে এমন কঠোর ঔদ্ধত্যের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিল কোন্ সাহসে, এই প্রশ্ন আমাদের মনকে কিছুকাল হইতে কেবলই পীড়িত করিয়াছে। ইহাতে আমাদের প্রতি মমত্বের একান্ত অভাব প্রকাশ পাইয়াছে—কিন্তু শুধু কি তাই। এই কি প্রবীণ রাষ্ট্রনীতিকের পন্থা। রাজাই যেন আমাদের পর, কিন্তু রাষ্ট্রনীতি কি দেশের সমুদয় লোককে একেবারে নগণ্য করিয়া চলিতে পারে।

যখন দেখি—পারে, তখন মনের মধ্যে কেবল অপমানের ব্যথা নহে, একটা আতঙ্ক জাগিয়া উঠে। আমাদের অবস্থা যে কিরূপ নিঃসহ উপায়বিহীন, কিরূপ সম্পূর্ণ পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিয়া আছে, আমাদের নিজের শক্তি যে এতটুকুও অবশিষ্ট নাই যে রাষ্ট্রনীতির রথটা আমাদের প্রবল অনিচ্ছাকেও একটি ক্ষুদ্র বাধা জ্ঞান করিয়াও অল্পমাত্র বাঁকিয়া চলিবে, ইহা যখন বুঝি তখন নিরুপায়ের মনেও উপায়-চিন্তার জন্য একটা ক্ষোভ জন্মে।

কিন্তু আমাদের প্রতি রাষ্ট্রনীতির এতদুর উপেক্ষার কারণ কী। ইহার কারণ, আমাদের দ্বারা কোনো ক্ষতির আশঙ্কা নাই। কেন নাই। আমরা বিচ্ছিন্ন, বিভক্ত। আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার ঢেউ কাহাকেও জোরে আঘাত করিতে পারে না। সুতরাং কোনো কারণে ইহার সঙ্গে আপস করিবার কোনোই প্রয়োজন হয় না। এমন অবস্থায় আমাদের কোনো ইচ্ছা বা অনিচ্ছা আমরা যদি মনের আবেগে কিছু উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করি তবে উচ্চ-আসনের লোকেরা সেই অশক্ত আস্ফালনকে কখনোই বরদাস্ত করিতে পারেন না। ইচ্ছার পশ্চাতে যেখানে শক্তি নাই সেখানে তাই স্পর্ধা।

এমন অবস্থায় ক্ষতি করিবার শক্তি আমাদের কোথায় আছে তাহা একাগ্রমনে খুঁজিয়া দেখিবার ইচ্ছা হয়। ইহা স্বাভাবিক। এই ইচ্ছার তাড়নাতেই 'স্বদেশী' উদ্‌যোগ হঠাৎ অল্পদিনের মধ্যেই আমাদের দেশে এমন প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। আমরা তোমাদের জিনিস কিনি বলিয়া তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের এত দাম, অতএব ঐখানে আমাদের একটা শক্তি আছে। আমাদের অস্ত্রশস্ত্র নাই, কিন্তু যদি আমরা এক হইয়া বলিতে পারি যে, বরং কষ্ট সহিব তবু তোমাদের জিনিস

আমরা কিনিব না, তবে সেখানে তোমাদিগকে হার মানিতে হইবে।

ইহার অনেক পূর্ব হইতেই স্বদেশী সামগ্রী দেশে চালাইবার চেষ্টা ভিতরে ভিতরে নানা স্থানে নানা আকারে দেখা দিতেছিল—সুতরাং ক্ষেত্র কতকটা প্রস্তুত ছিল। তাহা না থাকিলে শুদ্ধ কেবল একটা সাময়িক রাগারাগির মাথায় এই উদ্‌যোগ এমন অভাবনীয় বল পাইয়া উঠিত না।

কিন্তু সশস্ত্র ও নিরস্ত্র উভয়প্রকার যুদ্ধেই নিজের শক্তি ও দলবল বিচার করিয়া চলিতে হয়। আস্ফালন করাকেই যুদ্ধ কবা বলে না। তা ছাড়া এক মুহূর্তেই 'যুদ্ধং দেহি' বলিয়া যে পক্ষ রণক্ষেত্রে গিয়া দাঁড়ায় পরমুহূর্তেই তাহাকে ভঙ্গ দিয়া পালাইবার রাস্তা দেখিতে হয়। আমরা যখন দেশের পোলিটিকাল বক্তৃতাসভায় তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইলাম, বলিলাম 'এবার আমাদের লড়াই শুরু হইল', তখন আমরা নিজের অস্ত্রশস্ত্র দলবলের কোনো হিসাবই লই নাই। তাহার প্রধান কারণ, আমরা দেশকে যে যতই ভালোবাসি-না কেন, দেশকে ঠিকমতো কেহ কোনোদিন জানি না।

চিরদিন আমাদিগকে দুর্বল বলিয়া ঘৃণা করিয়া আসাতে আমাদের প্রতিপক্ষ আমাদিগকে প্রথমে বিশেষ কোনো বাধা দেন নাই। মনে করিয়াছিলেন, এ সমস্তই কন্‌গ্রেসি চাল—কেবল মুখের অভিমান, কেবল বাক্যের বড়াই।

কিন্তু যখন দেখা গেল, ঠিক কন্‌গ্রেসের মলয়মারুতহিল্লোল নয়, দুটো একটা করিয়া লোকসানের দমকা বাড়িয়া উঠিতেছে, তখন অপর পক্ষ হইতে শাসন তাড়নের পালা পুরাদমে আরম্ভ হইল!

কিন্তু ইংরেজ আমাদিগকে যতই পর মনে করুক-না কেন, প্রজাদের প্রতি হঠাৎ উৎপাত করিতে ইংরেজ নিজের কাছে নিজে লজ্জিত হয়। এ প্রকার বেআইনি ভূতের কাণ্ড তাহাদের রাষ্ট্রনীতিপ্রথাবিরুদ্ধ। অল্পবয়সে অধীন জাতিকে শাসন করিবার জন্য যে-সব ইংরেজ এ দেশে আসে তাহাদের মধ্যে এই ইংরেজি প্রকৃতি বিগড়িয়া যায় এবং অধীন দেশের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে ইংরেজ জাতির মনকে আধিপত্যের নেশায় অভ্যস্ত করিয়া আনিতেছে। তবু আজিও ইংলন্ডবাসী ইংরেজের মনে আইনের প্রতি একটা সম্ভ্রমের ভাব নষ্ট হয় নাই। এই কারণে অত্যন্ত ত্যক্ত হইয়া উঠিলেও ভারত রাজ্যশাসন ব্যাপারে হাঙ্গামার পালা সহজে আরম্ভ হয় না—ইংরেজই তাহাতে বাধা দেয়। এইজন্য ফুলার তাঁহার দলবল লইয়া একদা পূর্ববঙ্গে যেরূপ বে-ইংরাজি দাপাদাপি শুরু করিয়াছিলেন তাহা ভদ্র ইংরেজ পক্ষের দৃষ্টিতে বড়োই অশোভন হইয়া উঠিয়াছিল।

এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজদিগের ঐ একটা ভারি মুশকিল আছে। তাহারা যখন ক্ষ্যাপা হইয়া উঠিয়া আমাদের হাড় গুঁড়া করিয়া দিতে চায় তখন স্বদেশীয়ের সঙ্গেই তাহাদের ঠেলাঠেলি পড়ে। তাহারা বিলক্ষণ জানে, আমাদের উপরে খুব কষিয়া হাত চালাইয়া লইতে কিছুমাত্র বীরত্বের দরকার করে না—কারণ, অল্পে অল্পে আমাদেরই শিল এবং আমাদেরই নোড়া লইয়া আমাদেরই দাঁতের গোড়া একটি একটি করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব তর্জনতাড়ন-ব্যাপারে হাত পাকাইবার এমন সম্পূর্ণ নিরাপদ ক্ষেত্র আমাদের দেশের মতো আর কোথাও নাই। কিন্তু সমুদ্রপারে যে ইংরেজ বাস করিতেছে তাহাদের মধ্যে এখনো সেন্টিমেন্টের প্রভাব ঘোচে নাই, রাশিয়ান কায়দাকে লজ্জা করিবার সংস্কার এখনো তাহাদের আছে।

এইজন্য আমাদের মতো অস্ত্রহীন সহায়হীনেরা যখন কোনো একটা মর্মান্তিক আঘাত পাইয়া চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতে থাকি, তখন ক্ষুদ্র ইংরেজের মধ্যে হাত-নিসপিস ও দাঁত-কিড়্‌মিড়ের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়—তখন বৃহৎ ইংরেজের অবিচলিত সহিষ্ণুতা ও ঔদার্য তাহাদের কাছে অত্যন্ত অসহ্য হইতে থাকে। তাহারা বলে, ওরিয়েন্টালদের সঙ্গে এরকম চাল ঠিক নয়—যেমন অস্ত্রশস্ত্র

কাড়িয়া লইয়া ইহাদিগকে পৌরুষহীন করা হইয়াছে তেমনি টুটি চাপিয়া ধরিয়া ইহাদিগকে নির্বাক্‌ ও নিশ্চেষ্ট করিয়া রাখিলে তবে ইহারা নিজের ঠিক জায়গাটা বুঝিতে পারিবে।

এই কারণে বৃহৎ ইংরেজকে ভুলাইবার জন্য ক্ষুদ্র ইংরেজকে বিস্তর বাজে চাল চালিতে ও কাপুরুষতা অবলম্বন করিতে হয়। এই-সমস্ত আধ-মরা লোকদিগকেও মারিবার জন্য মিথ্যা আয়োজন না করিলে চলে না; বোয়ার যুদ্ধের পূর্বে এবং সেই সময়ে যে ভূরি ভূরি মিথ্যা গড়িয়া তোলা হইতেছিল তাহাও ইংরেজের সদ্‌বুদ্ধিকে পরাস্ত করিবার জন্য। কিন্তু আমরা যে এমন নিরুপায়, আমাদের সম্বন্ধেও গায়ের জ্বালা মিটাইতে এখানকার ক্ষুদ্র ইংরেজের দলকে যে এত ক্ষুদ্রতা প্রকাশ করিতে ও এত মিথ্যা খাড়া করিয়া তুলিতে হয়, ইহাতে ইংরেজ ইংরেজকে হয়তো ভুলাইতে পারে কিন্তু এ দেশের জনসাধারণের কাছে তাহাদের লজ্জা কিছুমাত্র ঢাকা পড়ে না। ইহাতে তাহাদের কাজ উদ্ধার হইতেও পারে কিন্তু চিরকালের মতো সম্ভ্রম নষ্ট হয়।

যাহা হউক, এ-সমস্তই যুদ্ধের চাল। বঙ্গবিভাগের সময় আমরা যখন কাঁদিয়া কাটিয়া কর্তাদের আসন তিলমাত্র নড়াইতে পারিলাম না তখন বয়কটের যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলাম; এই স্পর্ধায় স্থানীয় ইংরেজের রক্ত আমরা যথেষ্ট গরম করিয়া তুলিয়াছি। তখন কি আমরা ঠাহরাইয়াছিলাম যুদ্ধ কেবল এক পক্ষ হইতেই চলিবে, অপর পক্ষ শরশয্যা আশ্রয় করিবার অভিপ্রায়ে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে।

অপর পক্ষে অস্ত্র ধরিবে না একথা মনে করিয়া যুদ্ধে নামা একটা কৌতুকের ব্যাপার, যদি-না অশ্রুজলে তাহার পরিসমাপ্তি হয়। এখন দেখিতেছি, আমরা সেই আশাই মনে রাখিয়াছিলাম। ইংরেজের ধৈর্যের উপরে, ইংরেজের আইনের উপরেই আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা ছিল, নিজের শক্তির উপরে নহে। তাই যদি না হইবে, তবে আইন-রক্ষকদের হাতে আইনের দণ্ড লেশমাত্র বিচলিত হইলেই, সামান্য দুই-একটা মাথা ফাটাফাটি ঘটিলেই আমরা এমন-ভাব করি কেন, যেন মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল? ভাবিয়া দেখো দেখি, ইংরেজের উপরে আমাদের কতখানি শ্রদ্ধা কতখানি ভরসা জমিয়া উঠিয়াছে যে আমরা ঠিক করিয়া বসিয়াছিলাম যে, আমরা বন্দেমাতরম্‌ হাঁকিয়া তাহাদের দক্ষিণ হাতে আঘাত করিব তবু তাহাদের সেই হাতের ন্যায়দণ্ড অন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র টলিবে না।

কিন্তু এই সত্যটা আমাদের জানা দরকার যে, ন্যায়দণ্ডটা মানুষের হাতেই আছে, এবং ভয় বা রাগ উপস্থিত হইলেই সে হাত টলে। আজ নিম্ন-আদালত হইতে শুরু করিয়া হাইকোর্ট পর্যন্ত স্বদেশি মামলায় ন্যায়ের কাঁটা যে নানা ডিগ্রির কোণ লইয়া হেলিতেছে, ইহাতে আমরা যতই আশ্চর্য হইতেছি ততই দেখা যাইতেছে আমরা হিসাবে ভুল করিয়াছিলাম।

অবশ্য তর্কে জিতিলেই যদি জিত হইত তবে এ কথা বলা চলিত যে, রাগদ্বেষের দ্বারা আইনকে টলিতে দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে অধর্ম হয়, অনিষ্ট হয় ইত্যাদি। এ-সমস্তই সদ্‌যুক্তি তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার উপর ভর দিয়া একেবারে দুই চক্ষু বুজিয়া থাকিলে চলে না। যাহা ঘটে, যাহা ঘটিতে পারে, যাহা স্বভাবসংগত, আমরা দুর্বল বলিয়াই যে আমাদের ভাগ্যে তাহার অন্যথা হইবে বিধাতার উপরে আমাদের এতবড়ো কোনো দাবি নাই। সমস্ত বুঝিয়া জোয়ার-ভাঁটা রৌদ্রবৃষ্টি সমস্ত বিচার ও স্বীকার করিয়া লইয়া, যদি আমরা যাত্রা আরম্ভ করি তবে নৌকা লেশমাত্র টলিলেই অমনি যেন একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটিল বলিয়া একেবারে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ি না।

অতএব গোড়ায় একটা সত্য আমাদিগকে মনে রাখিতেই হইবে যে, যে-কোনো কারণেই এবং যে-কোনো উপায়েই হউক ইংরেজের যদি আমরা কোনো ক্ষতি করিতে যাই তবে ইংরেজ তাহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেই এবং সে চেষ্টা আমাদের সুখকর হইবে না। কথাটা নিতান্তই

সহজ, কিন্তু স্পষ্টই দেখা যাইতেছে এই সহজ কথাটা আমরা বিচার করি নাই এবং আমরা যখন উচ্চস্বরে নিজের বড়াই করিতেছিলাম তখন ইংরেজের মহত্ত্বের প্রতি উচ্চস্বরে আমাদের অটল শ্রদ্ধা ঘোষণা করিতেছিলাম—ইহাতে আমাদের সুবুদ্ধি অথবা পৌরুষ কোনোটারই প্রমাণ হয় নাই।

এই তো দেখিতেছি যুদ্ধের আরম্ভে আমরা বিপক্ষকে ভুল বুঝিয়াছিলাম, তার পরে আত্মপক্ষকে যে ঠিক বুঝি নাই সে কথাও স্বীকার করিতে হইবে।

আজ আমরা সকলেই এই কথা বলিয়া আক্ষেপ করিতেছি যে, ইংরেজ মুসলমানদিগকে গোপনে হিন্দুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া দিতেছে। কথাটা যদি সত্যই হয় তবে ইংরেজের বিরুদ্ধে রাগ করিব কেন। দেশের মধ্যে যতগুলি সুযোগ আছে ইংরেজ তাহা নিজের দিকে টানিবে না, ইংরেজকে আমরা এতবড়ো নির্বোধ বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব এমন কী কারণ ঘটিয়াছে।

মুসলমানকে যে হিন্দুর বিরুদ্ধে লাগানো যাইতে পারে এই তথ্যটাই ভাবিয়া দেখিবার বিষয়, কে লাগাইল সেটা তত গুরুতর বিষয় নয়। শনি তো ছিদ্র না পাইলে প্রবেশ করিতে পারে না; অতএব শনির চেয়ে ছিদ্র সম্বন্ধেই সাবধান হইতে হইবে। আমাদের মধ্যে যেখানে পাপ আছে শত্রু সেখানে জোর করিবেই—আজ যদি না করে তো কাল করিবে, এক শত্রু যদি না করে তো অন্য শত্রু করিবে—অতএব শত্রুকে দোষ না দিয়া পাপকেই ধিক্কার দিতে হইবে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্বন্ধ লইয়া আমাদের দেশের একটা পাপ আছে; এ পাপ অনেক দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার যা ফল তাহা না ভোগ করিয়া আমাদের কোনোমতেই নিষ্কৃতি নাই।

অভ্যস্ত পাপের সম্বন্ধে আমাদের চৈতন্য থাকে না। এইজন্য সেই শয়তান যখন উগ্রমূর্তি ধরিয়া উঠে তখন সেটাকে মঙ্গল বলিয়াই জানিতে হইবে। **হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানটাতে কতবড়ো যে একটা কলুষ আছে এবার তাহা যদি এমন একান্ত বীভৎস আকারে দেখা না দিত তবে ইহাকে আমরা স্বীকারই করিতাম না, ইহার পরিচয়ই পাইতাম না।**

পরিচয় তো পাইলাম, কিন্তু শিক্ষা পাইবার কোনো চেষ্টা করিতেছি না। যাহা আমরা কোনোমতেই দেখিতে চাই নাই বিধাতা দয়া করিয়া আমাদিগকে কানে ধরিয়া দেখাইয়া দিলেন; তাহাতে আমাদের কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিল, অপমান ও দুঃখের একশেষ হইল—কিন্তু দুঃখের সঙ্গে শিক্ষা যদি না হয় তবে দুঃখের মাত্রা কেবল বাড়িতেই থাকিবে।

আর মিথ্যা কথা বলিবার কোনো প্রয়োজন নাই। এবার আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হইবে হিন্দু-মুসলমানের মাঝখানে একটা বিরোধ আছে। আমরা যে কেবল স্বতন্ত্র তাহা নয়। আমরা বিরুদ্ধ।

আমরা বহুশত বৎসর পাশে পাশে থাকিয়া এক খেতের ফল, একে নদীর জল, এক সূর্যের আলোক ভোগ করিয়া আসিয়াছি; আমরা এক ভাষায় কথা কই, আমরা একই সুখদুঃখে মানুষ; তবু প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর যে সম্বন্ধ মনুষ্যোচিত, যাহা ধর্মবিহিত, তাহা আমাদের মধ্যে হয় নাই। আমাদের মধ্যে সুদীর্ঘকাল ধরিয়া এমন-একটি পাপ আমরা পোষণ করিয়াছি যে, একত্রে মিলিয়াও আমরা বিচ্ছেদকে ঠেকাইতে পারি নাই। এ পাপকে ঈশ্বর কোনোমতেই ক্ষমা করিতে পারেন না।

আমরা জানি, বাংলাদেশের অনেক স্থানে এক ফরাশে হিন্দু-মুসলমানে বসে না—ঘরে মুসলমান আসিলে জাজিমের এক অংশ তুলিয়া দেওয়া হয়, হুঁকার জল ফেলিয়া দেওয়া হয়।

তর্ক করিবার বেলায় বলিয়া থাকি, কী করা যায়, শাস্ত্র তো মানিতে হইবে। অথচ শাস্ত্রে হিন্দু-মুসলমান সম্বন্ধে পরস্পরকে এমন করিয়া ঘৃণা করিবার তো কোনো বিধান দেখি না।

যদি-বা শাস্ত্রের সেই বিধানই হয় তবে সে শাস্ত্র লইয়া স্বদেশ-স্বজাতি-স্বরাজের প্রতিষ্ঠা কোনোদিন হইবে না। **মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশের ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইবেই।**

মানুষকে মানুষ বলিয়া গণ্য করা যাহাদের অভ্যাস নহে, পরস্পরের অধিকার যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মভাবে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিবার কাজেই ব্যাপৃত—যাহারা সামান্য স্খলনেই আপনার লোককে ত্যাগ করিতেই জানে, পরকে গ্রহণ করিতে জানে না—সাধারণ মানুষের প্রতি সামান্য শিষ্টতার নমস্কারেও যাহাদের বাধা আছে—মানুষের সংসর্গ নানা আকারে বাঁচাইয়া চলিতে যাহাদিগকে সর্বদাই সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়—মনুষ্যত্ব হিসাবে তাহাদিগকে দুর্বল হইতেই হইবে। যাহারা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত করিয়া রাখিয়াছে, ঐক্যনীতি অপেক্ষা ভেদবুদ্ধি যাহাদের বেশি, দৈন্য অপমান ও অধীনতার হাত হইতে তাহারা কোনোদিন নিষ্কৃতি পাইবে না।

যাহা হউক 'বয়কট'-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া আমরা বাহির হইলাম এবং দেশধর্মগুরুর নিকট হইতে স্বরাজমন্ত্রও গ্রহণ করিলাম; মনে করিলাম এই সংগ্রাম ও সাধনার যতকিছু বাধা সমস্তই বাহিরে, আমাদের নিজেদের মধ্যে আশঙ্কার কারণ কিছু নাই। এমন সময় হঠাৎ আমাদের ভিতরকার বিচ্ছিন্ন অবস্থা বিধাতা এমন সুকঠোর সুস্পষ্ট আকারে দেখাইয়া দিলেন যে, আমাদের চমক লাগিয়া গেল। আমরা নিজেরাই নিজেদের দলনের উপায়, অগ্রসর হইয়া প্রতিবন্ধক, এ কথা যখন নিঃসংশয়রূপে ধরা পড়িল তখন এই কথাই আমাদিগকে বলিতে হইবে যে, স্বদেশকে উদ্ধার করিতে হইবে, কিন্তু কাহার হাত হইতে? নিজেদের পাপ হইতে।

ইংরেজ সমস্ত ভারতবর্ষের কাঁধের উপরে এমন করিয়া যে চাপিয়া বসিয়াছে, সে কি কেবল নিজের জোরে। আমাদের পাপই ইংরেজের প্রধান বল। ইংরেজ আমাদের ব্যাধির একটা লক্ষণ মাত্র। লক্ষণের দ্বারা ব্যাধির পরিচয় পাইয়া ঠিকমত প্রতিকার করিতে না পারিলে গায়ের জোরে অথবা বন্দেমাতরম্ মন্ত্র পড়িয়া সন্নিপাতের হাত এড়াইবার কোনো সহজ পথ নাই।

বিদেশী রাজা চলিয়া গেলেই দেশ যে আমাদের স্বদেশ হইয়া উঠিবে তাহা নহে। দেশকে আপন চেষ্টায় আপন দেশ করিয়া গড়িয়া তুলিতে হয়। অন্নবস্ত্র-সুখস্বাস্থ্য-শিক্ষাদীক্ষা দানে দেশের লোকই দেশের লোকের সর্বপ্রধান সহায়, দুঃখে বিপদে দেশের লোকই দেশের জন্য প্রাণপণ করিয়া থাকে, ইহা যেখানকার জনসাধারণে প্রত্যক্ষভাবে জানে সেখানে স্বদেশ যে কী তাহা বুঝাইবার জন্য এত বকাবকি করিতে হয় না। আজ আমাদের ইংরেজি-পড়া শহরের লোক যখন নিরক্ষর গ্রামের লোকের কাছে গিয়া বলে 'আমরা উভয়ে ভাই'— তখন এই ভাই কথাটার মানে সে বেচারা কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহাদিগকে আমরা 'চাষা-বেটা' বলিয়া জানি, যাহাদের সুখদুঃখের মূল্য আমাদের কাছে অতি সামান্য, যাহাদের অবস্থা জানিতে-হইলে আমাদিগকে গবর্মেন্টের প্রকাশিত তথ্যতালিকা পড়িতে হয়, সুদিনে-দুর্দিনে আমরা যাহাদের ছায়া মাড়াই না, আজ হঠাৎ ইংরেজের প্রতি স্পর্ধা প্রকাশ করিবার বেলায় তাহাদের নিকট ভাই-সম্পর্কের পরিচয় দিয়া তাহাদিগকে চড়া দামে জিনিস কিনিতে ও গুর্খার গুঁতা খাইতে আহ্বান করিলে আমাদের উদ্দেশ্যের প্রতি সন্দেহ জন্মিবার কথা। সন্দেহ জন্মিয়াও ছিল। কোনো বিখ্যাত 'স্বদেশী'-প্রচারকের নিকট শুনিয়াছি যে, পূর্ববঙ্গে মুসলমান শ্রোতারা তাঁহাদেব বক্তৃতা শুনিয়া পরস্পর বলাবলি করিয়াছে যে বাবুরা বোধ করি বিপদে ঠেকিয়াছে। ইহাতে তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু চাষা ঠিক বুঝিয়াছিল। বাবুদের স্নেহভাষণের মধ্যে ঠিক সুরটা যে লাগে না তাহা তাহাদের বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। উদ্দেশ্যসাধনের উপলক্ষে প্রেমের সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে ক্ষুদ্রব্যক্তির কাছেও

তাহা বিস্বাদ বোধ হয়—সে উদ্দেশ্য খুব বড়ো হইতে পারে, হউক তাহার নাম 'বয়কট' বা 'স্বরাজ', দেশের উন্নতি বা আর-কিছু। মানুষ বলিয়া শ্রদ্ধাবশত ও স্বদেশি বলিয়া স্নেহবশত আমরা যদি সহজেই দেশের জনসাধারণকে ভালোবাসিতাম, ইংরেজি শিক্ষায় আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ না ঘটাইয়া মিলনকে যদি দৃঢ় করিতে পারিত, তাহাদের মাঝখানে থাকিয়া তাহাদের আপন হইয়া তাহাদের সর্বপ্রকার হিতসাধনে যদি আমাদের উপেক্ষা বা আলস্য না থাকিত, তবে আজ বিপদ বা ক্ষতির মুখে তাহাদিগকে ডাক পাড়িলে সেটা অসংগত শুনিতে হইত না।

হিন্দু-মুসলমান একে হইলে পরস্পরের কত সুবিধা একদিন কোনো সভায় মুসলমান শ্রোতাদিগকে তাহাই বুঝাইয়া বলা হইতেছিল। তখন আমি এই কথাটি না বলিয়া থাকিতে পারি নাই যে, সুবিধার কথাটা এ স্থলে মুখে আনিবার নহে; দুই ভাই এক হইয়া থাকিলে বিষয়কর্ম ভালো চলে, কিন্তু সেইটেই দুই ভাই এক থাকিবার প্রধান হেতু হওয়া উচিত নহে। কারণ, ঘটনাক্রমে সুবিধার গতি পরিবর্তন হওয়াও আশ্চর্যকর নহে। আসল কথা, আমরা এক দেশে এক সুখদুঃখের মধ্যে একত্রে বাস করি, আমরা মানুষ, আমরা যদি এক না হই তবে সে লজ্জা, সে অধর্ম। আমরা উভয়েই এক দেশের সন্তান—আমরা ঈশ্বরকৃত সেই ধর্মের বন্ধনবশত, শুধু সুবিধা নহে, অসুবিধাও একত্রে ভোগ করিতে প্রস্তুত যদি না হই তবে আমাদের মনুষ্যত্বে ধিক্। আমাদের পরস্পরের মধ্যে, সুবিধার চর্চা নহে, প্রেমের চর্চা, নিঃস্বার্থ সেবার চর্চা যদি করি তবে সুবিধা উপস্থিত হইলে তাহা পুরা গ্রহণ করিতে পারিব এবং অসুবিধা উপস্থিত হইলেও তাহাকে বুক দিয়া ঠেকাইতে পারিব।

এইজন্য অদ্যকার অত্যন্ত উত্তেজনার দিনেও আমাকে এ কথা বলিতে হইতেছে যে, স্পর্ধা করিবার, লড়াই করিবার দিন আজ আমাদের নহে। স্পর্ধা করাটা শক্তিমানের পক্ষে একটা বিলাসের স্বরূপ হইতে পারে, কিন্তু অশক্তের পক্ষে তাহা দেউলে হইবার পন্থা। যে শক্তি তাহাতে অপব্যয় হয় তাহা খরচ করিবার সম্বল আমাদের আছে কি? শুধু তাই নয়, যে হিসাবের উপর নির্ভর করিয়া আমরা এতটা আস্ফালন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে হিসাবটা কি ভালোরূপ পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে। যে নৌকায় কোনোমতে ভর সয় মাত্র সে নৌকায় নৃত্য করিতে শুরু করিলে যদি তাহার ফাটাগুলা দিয়া জল উঠিতে থাকে তবে সেটাকে আমরা এমন অভাবনীয় বলিয়া মনে করি কেন। এই নৃত্যব্যাপারে আমি আপত্তি করিতে চাই না কিন্তু ইহাই যদি আমাদের অভিপ্রায় থাকে তবে একটু সবুর করিয়া অন্তত ঐ ফাটাগুলা সারাইয়া লইতে হইবে তো?—তাহাতে বিলম্ব হইবে। তা হইবে বটে, কিন্তু জগতের মধ্যে আমরা এমন পুণ্য করি নাই যে, ভাঙা আসবাব লইয়া কাজও করিব, দুর্লভ ধন লাভও করিব, অথচ বিলম্ব ঘটিবে না।

তবে করিতে হইবে কী। আর-কিছু নয়, স্বদেশ সম্বন্ধে স্বদেশীর যে দায়িত্ব আছে তাহা সর্বসাধারণের কাছে স্পষ্টরূপে প্রত্যক্ষ করিয়া তুলিতে হইবে। পুরাতন দলই হউন আর নূতন দলই হউন, যিনি পারেন একটা কাজের আয়োজন করুন। প্রমাণ করুন যে, দেশের ভার তাঁহারা লইতে পারেন। তাঁহাদের মত কী সে তো বারংবার শুনিয়াছি, তাঁহাদের কাজ কী কেবল সেইটেই দেখা হইল না। দেশের সমস্ত সামর্থ্যকে একত্রে টানিয়া যদি তাহাতে একটা কলেবর দান করিতে না পারি, যদি সেইখান হইতে স্বচেষ্টায় দেশের অন্ন বস্ত্র স্বাস্থ্য ও শিক্ষার একটা সুবিহিত ব্যবস্থা করিয়া তোলা আমাদের সকল দলের পক্ষেই অসম্ভব হয়, যদি আমাদের কোনোপ্রকার কর্মনীতি ও কর্মসংকল্প না থাকে, তবে আজিকার এই আস্ফালন কাল আমাদিগকে নিষ্ফল অবসাদের মধ্যে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিবে।

যদি সকলে মিলিয়া একটা কাজের আয়োজন গড়িয়া তুলিবার শক্তি আজও আমাদের না

হইয়া থাকে তবে অগত্যা আমাদিগকে নিভৃতে নিঃশব্দে ব্যক্তিগত চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কিন্তু যদি আমরা অসময়ে ঔদ্ধত্য করিতে থাকি সেই বিচ্ছিন্ন চেষ্টার ক্ষেত্র একেবারে নষ্ট হয়। গর্ভিণীকে সমস্ত অপঘাত হইতে নিজেকে বাঁচাইয়া সাবধানে চলিতে হয়—সেই সতর্কতা ভীরুতা নহে, তাহা তাহার কর্তব্য।

আজও আমাদের দেশ সম্মিলিত কর্মচেষ্টায় আসিয়া পৌঁছিতে পারে নাই, একক চেষ্টার যুগে আছে, এ কথা যখন তাহার ব্যবহারে বুঝা যাইতেছে তখন দেশের যে-সকল যুবক উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছেন তাঁহাদের প্রতি একটিমাত্র পরামর্শ এই আছে, সমস্ত উত্তেজনাকে নিজের অস্থিমজ্জার মধ্যে নিস্তব্ধভাবে আবদ্ধ করিয়া ফেলো, স্থির হও, কোনো কথা বলিয়ো না, অহরহ অত্যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা নিজের চরিত্রকে দুর্বল করিয়ো না। আর-কিছু না পারো খবরের কাগজের সঙ্গে নিজের সমস্ত সম্পর্ক ঘুচাইয়া যে-কোনো একটি পল্লীর মাঝখানে বসিয়া যাহাকে কেহ কোনোদিন ডাকিয়া কথা কহে নাই তাহাকে জ্ঞান দাও, আনন্দ দাও, আশা দাও, তাহার সেবা করো, তাহাকে জানিতে দাও মানুষ বলিয়া তাহার মাহাত্ম্য আছে, সে জগৎসংসারের অবজ্ঞার অধিকারী নহে। অজ্ঞান তাহাকে নিজের ছায়ার কাছেও ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছে; সেইসকল ভয়ের বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষপট প্রশস্ত করিয়া দাও। তাহাকে অন্যায় হইতে, অনশন হইতে, অন্ধসংস্কার হইতে রক্ষা করো, নূতন বা পুরাতন কোনো দলেই তোমার নাম না জানুক, যাহাদের হিতের জন্য আত্মসমর্পণ করিয়াছ প্রতিদিন তাহাদের প্রতি অবজ্ঞা ও অবিশ্বাস ঠেলিয়া এক-পা এক-পা করিয়া সফলতার দিকে অগ্রসর হইতে থাকো। মিথ্যা আত্মপ্রকাশে আমরা যে শক্তি কেবলই নষ্ট করিতেছি, সত্য আত্মপ্রয়োগে তাহাকে খাটাইতে হইবে। ইহাতে লোকে যদি আমাদিগকে সামান্য বলিয়া, ছোটো বলিয়া অপবাদ দেয়, উপহাস করে, তবে তাহা অম্লানবদনে স্বীকার করিয়া লইবার বল যেন আমাদের থাকে। আমরা যে সামান্য কেহ নহি, আমরা যে কিছু একটা করিতেছি, ইহাই পরের কাছে দিনরাত প্রমাণ করিবার জন্য পাঁচকে পনেরো করিয়া ফলাইয়া কেবলই সাগরপারে টেলিগ্রাম করাকেই নিজের একমাত্র কাজ বলিয়া যেন না মনে করি। দেশের এক-একটি জায়গায় এক-একটি মানুষ বিরলে বসিয়া নিজের সমস্ত জীবন দিয়া যে-কোনো একটি কর্মকে গড়িয়া তুলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে থাকুন—এই আমাদের সাধনা। আমরা কিছুই গড়িয়া তুলিতে পারি না, আমাদের হাতে সমস্তই বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, আমরা কর্মের নানা সূত্রকে টানিয়া বাঁধিয়া রাশ বাগাইয়া নিজের হাতে দৃঢ় করিয়া ধরিতে পারি না—এই কারণেই আমরা কামনা করি, কিন্তু সাধনার বেলা চোখে অন্ধকার দেখিতে থাকি—কেবল সমিতির অধিবেশনে অতি সূক্ষ্ম নিয়মাবলী-রচনা লইয়া আমাদের তর্কবির্তকের অন্ত থাকে না, কিন্তু নিয়ম খাটাইয়া, বাধা কাটাইয়া সিদ্ধির পথে চলিবার দৃঢ় সংকল্পশক্তি আপনার মধ্যে খুঁজিয়া পাই না। চরিত্রের এই দৈন্য আমাদিগকে ঘুচাইতে হইবে। উত্তেজনার দ্বারা তাহা ঘুচে না—কারণ, উত্তেজনা আড়ম্বরের কাঙাল, এবং আড়ম্বর কর্ম নষ্ট করিবার শয়তান। আজ নানা স্থানে নানা কাজ লইয়া আমরা নানা লোকে যদি লাগিয়া থাকি তবেই গড়িয়া তুলিবার অভ্যাস আমাদের পাকা হইতে থাকিবে। এমনি করিয়াই ভিতরে ভিতরে স্বদেশ গড়িয়া উঠিবে এবং স্বরাজগঠনের যথার্থ অবকাশ একদিন উপস্থিত হইবে। তখন সত্য উপকরণ ও প্রকৃত লোকের অভাব কেবলমাত্র কথার জোরে ঢাকিয়া দিবার কোনো প্রয়োজন থাকিবে না।

এ কথা নিশ্চয় জানি, অপমানের ক্ষোভে ব্যর্থ আশার আঘাতে আমাদের আত্মাভিমান জাগিয়া উঠে; এবং সেই আত্মাভিমান আমাদের আত্মশক্তি-উদ্‌বোধনের একটা উপায়। বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে বাঙালির সকল চেষ্টার নিষ্ফলতা যখন সুস্পষ্ট আকারে আমাদের কাছে প্রত্যক্ষগোচর হইল তখন আমাদের অভিমান আলোড়িত হইয়া উঠিল। এই অভিমানের তাড়নায় আমরা

নিজেকে প্রবল বলিয়া প্রমাণ করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি। অতএব ইহার মধ্যে যে মঙ্গলটুকু আছে তাহাকে অস্বীকার করিতে পারি না।

কিন্তু ইহার মধ্যে বিপদের কথাটা এই যে, অভিমানের সঙ্গে যদি ধৈর্যের দৃঢ়তা না থাকে তবে পরিণামে তাহা আমাদের দুর্বলতার কারণ হইবে। চরিত্রের জোর থাকিলে অভিমানকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার শক্তিকে স্থায়ী ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সংকল্প জন্মে, কারণ যতক্ষণ শক্তি সত্য হইয়া না উঠে ততক্ষণ অভিমানকে অতিমাত্রায় প্রকাশ করিতে থাকা লজ্জাকর এবং তাহা কেবল ব্যর্থতাই আনয়ন করে। নিজের আবেগের আতিশয্যকে এইরূপ নিষ্ফলভাবে অসময়ে প্রকাশ করিয়া বেড়ানো শিশুকেই শোভা পায়। অভিমান যখন বিলম্ব সহিতে না পারে, তখন তাহা কর্মকে তেজ না দিয়া কর্মের অঙ্কুরকে ছারখার করিয়া ফেলে। যেদিন হইতে আমাদের মনে রাগ হইল সেইদিন হইতেই আমরা আকাশ কাঁপাইয়া বড়াই করিতে আরম্ভ করিয়াছি, আমরা এ করিব, সে করিব, আমরা ম্যাঞ্চেস্টরের রুটি বন্ধ করিব, লিভারপুলের দুই চক্ষু জলে ভাসাইয়া দিব। অথচ মনে মনে আমাদের ভরসাস্থল কী। ইংরেজেরই আইন, ইংরেজেরই সহিষ্ণুতা। আইন বিচলিত হইলেই আমরা বলি, এ যে মগের মুল্লুক হইল। মর্লির মুখে লিবারেল নীতির উলটা কথা শুনিলেই আমরা বলি, এ কি পূবের সূর্য পশ্চিমে উঠিল।

আমার নিবেদন এই, এমন অবস্থায় অভিমানকে নিজের মধ্যে দমন করিতে হইবে। সেই সংযত অভিমান মনের তলদেশ হইতে আমাদের শক্তির শিকড়ের মধ্যে তেজ সঞ্চার করিবে। এতদিন যে-সমস্ত কাজ আমাদের চেষ্টাকে টানিতে পারিত না, সেই সমস্ত কাজে আজ মন দিবার মতো ধৈর্য আমাদের জন্মিবে।

কাজের কি অন্ত আছে। আমরা কিছুই কি করিয়াছি। একবার সত্য করিয়া ভাবিয়া দেখো, দেশ আমাদের হইতে কত দূরে, কত সুদূরে। আমাদের 'ঘর হইতে আঙিনা বিদেশ'। সমস্ত ভারতবর্ষের কথা ভাবিলে তো মাথা ঘুরিয়া যায়—শুদ্ধমাত্র বাংলাদেশের সঙ্গেও আমাদের সম্পর্ক কত ক্ষীণ! এই বাংলাদেশও জ্ঞানে প্রেমে কর্মে আমাদের প্রত্যেকের হইতে কতই দূরে। ইহার জন্য আমরা কতটুকুই বা দিতেছি, কতটুকুই বা করিতেছি, এবং ইহাকে জানিবার জন্যই বা আমাদের চেষ্টা কত সামান্য। নিজের মন এবং ব্যবহার সত্যরূপে আলোচনা করিয়া সত্য করিয়া বলো দেশের প্রতি আমাদের ঔদাসীন্য কী সুগভীর। ইহার কোন্ দুঃখে কোন্ অভাবে কোন্ সৌন্দর্যে কোন্ সম্পদে আমাদের চিত্তকে এমন করিয়া আকর্ষণ করিয়াছে যে, নানা দিক হইতে আমাদের নানা লোক তাহার প্রতি আপন সময় ও সামর্থ্যের বহুল অংশ ব্যয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা শিক্ষিত কয়েকজন এবং আমাদের দেশের বহুকোটি লোকের মাঝখানে একটা মহাসমুদ্রের ব্যবধান। ত্রেতাযুগের সেতুবন্ধনে কাঠবিড়ালি যতটুকু কাজ করিয়াছিল আমাদের মাঝখানে এই সমুদ্র সেতু বাঁধিতে আমরা ততটুকুও করি নাই। সকল বিষয়ে সকল কাজই বাকি পড়িয়া আছে।

অথচ এমন সময়ে আমাদের মনে দুর্দান্ত অভিমান জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজকে ডাকিয়া বুক ফুলাইয়া বলিতে ইচ্ছা করিতেছে, আমরা সম্পূর্ণ সক্ষম, সমর্থ, প্রস্তুত। আমরা কোনোমতেই তোমাদের অবজ্ঞার পাত্র নই। তোমরা যদি আমাদিগকে অবজ্ঞা কর আমরাও তোমাদিগকে অবজ্ঞা করিতে পারি।

এই কটা কথা খুব জোরে বলিবার সুখই যদি আমাদের দেশের পক্ষে যথেষ্ট হয় তবে এই পালাই চলুক। কিন্তু এখনই আমরা সমস্ত পারি এই ভুলটা প্রচার করিয়া ও বিশ্বাস করিয়া ভবিষ্যতে আমরা যাহা পারিব তাহার গোড়া যদি মারিয়া দিই তবে আমাদের অদ্যকার সমস্ত আস্ফালন একদিন তিতুমীরের লড়াইয়ের সঙ্গে এক ইতিহাসে ভুক্ত হইবে।

বড়াই করিয়া নিজের ও অন্যের কাছে দুর্বলতা ঢাকিতে গিয়া সেই দুর্বলতাকে প্রতি পদে সপ্রমাণ করিতে থাকিলে এমন একদিন আসিবে যেদিন আমরা নিজেকে অন্যায়রূপে অবিশ্বাস করিব—নিজের মধ্যে যে সম্ভাব্যতা আছে তাহাকে অস্বীকার করিব—স্বজাতিকে গালি পাড়িয়া নিষ্কর্মতাকে আড়ম্বরপূর্বক আশ্রয় করিব—অকালে উৎপীড়ন সহ্য করিয়া আরামের মধ্যে হাল ছাড়িয়া দিতে চেষ্টা করিব। অতএব পুরুষোচিত ধৈর্যের সহিত অভিমানের প্রমত্ততাকে একেবারে দূর করিয়া কাজে প্রবৃত্ত হইবে। দেশ আজ আমাদিগকে এই কথা বলিতেছে যে—আমরা কতখানি রাগ করিয়াছি, আমরা কতবড়ো ভয়ংকর, সে আলোচনায় কাহারও কোনো লাভ নাই; কার্জন আমাদিগকে কেমন করিয়া মারিয়াছেন এবং মর্লি আমাদের কান্নার উপর কতবড়ো অন্যায় ধমকটা দিলেন সে কথা লইয়া অনবরত এক সভা হইতে আর-এক সভায়, এক কাগজ হইতে আর-এক কাগজে, মুষলধারে অশ্রুবর্ষণ করিয়া কোনো ফল নাই। এখন স্পষ্ট করিয়া বলো, কী কাজ করিতে হইবে। আচ্ছা, মানিলাম স্বরাজই আমাদের শেষলক্ষ্য, কিন্তু কোথাও তো তাহার একটা শুরু আছে, সেটা এক সময়ে তো ধরাইয়া দিতে হইবে। স্বরাজ তো আকাশকুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্যে দিয়া তো তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউন, তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়, তাঁহাদের প্ল্যান কী, তাঁহাদের আয়োজন কী। কর্মশূন্য উত্তেজনায় এবং অক্ষম আস্ফালনে একদিন একান্ত ক্লান্তি ও অবসাদ আনিবেই—ইহা মনুষ্যস্বভাবের ধর্ম—কেবলই মদ জোগাইয়া আমাদিগকে সেই বিপদের মধ্যে যেন লইয়া যাওয়া না হয়। যে অসংযম চরিত্রদুর্বলতার বিলাস মাত্র তাহাকে সবলে ঘৃণা করিয়া কর্মের নিঃশব্দ নিষ্ঠার মধ্যে আপন পৌরুষকে নিবিষ্ট করিবার সময় আসিয়াছে—এ সময়কে যেন আমরা নষ্ট না করি।

১৩১৪

৫. দেশহিত

বঙ্গব্যবচ্ছেদের আঘাতে বাংলাদেশে স্বাদেশিকতার যে উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিয়াছে তাহা যে অন্য দেশের এ-শ্রেণির উদ্দীপনার ঠিক নকল নহে, তাহা যে আমাদের দেশের স্বকীয় প্রকৃতি অনুসারে একটি বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে, এমন কথা আমাদের দেশের কোনো বিখ্যাত ইংরেজি কাগজে পড়িয়াছি। লেখক বলেন যে, আমাদের দেশের এই স্বাদেশিকতার উৎসাহ গভীরতর আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ, এইজন্য ইহা একটা ধর্মসাধনার আকার ধারণ করিতেছে।

এ কথা নিশ্চয় মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদের দেশের কোনো উদ্‌যোগ যদি দেশের সর্বসাধারণকে আশ্রয় করিতে চায় তবে তাহা ধর্মকে অবলম্বন না করিলে কোনোমতেই কৃতকার্য হইবে না। কোনো দেশব্যাপী সুবিধা, কোনো রাষ্ট্রীয় স্বার্থসাধনের প্রলোভন কোনোদিন আমাদের দেশের সাধারণ লোকের মনে শক্তি সঞ্চার করে নাই।

অতএব আমাদের দেশের বর্তমান উদ্দীপনা যদি ধর্মের উদ্দীপনাই হইয়া দাঁড়ায়, দেশের ধর্মবুদ্ধিকে যদি একটা নূতন চৈতন্যে উদ্‌বোধিত করিয়া তোলে, তবে তাহা সত্য হইবে, দেশের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইবে সন্দেহ নাই।

আমাদের বর্তমান আন্দোলন সেই সত্যতা লাভ করিয়াছে অথবা করিবে কি না তাহা নিশ্চয় নিরূপণ করিয়া বলিবার ক্ষমতা আমি রাখি না। এইটুকু বলা যায় যে, দেশে যদি দুই-চারিজন

মহাত্মাও এই আন্দোলনকে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের পোলিটিকাল চাঞ্চল্যমাত্র বলিয়া অনুভব না করেন—তাঁহারা যদি ইহার নিগূঢ় কেন্দ্রস্থলে সেই ধর্মের অগ্নিকে প্রত্যক্ষ দেখিয়া থাকেন যে অগ্নি সমস্ত মিথ্যাকে ভিতর হইতে দগ্ধ করিয়া ফেলে, সমস্ত দীনতাকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয় এবং আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ ও মহামূল্য তাহাকেই তপ্ত সুবর্ণের মতো উজ্জ্বল করিয়া তোলে—তবে তাঁহাদের সেই উপলব্ধি ও সাধনা নিশ্চয়ই নানাপ্রকার সাময়িক বিক্ষিপ্ততাকে ব্যর্থ করিয়া চরম সফলতা আনয়ন করিবে।

কিন্তু আমরা যে এই ধর্মের মূর্তিকে দেখিতে পাইয়াছি তাহার প্রমাণ কিসে পাওয়া যাইবে? যে ইঁহাকে দেখিয়াছে সে তো আর উদাসীন থাকিতে পারে না। সে একান্ত উদ্‌বেগ একান্ত সতর্কতার সহিত ইহাকে রক্ষা করিবার জন্য জাগ্রত থাকে—কোনো ভ্রষ্টতা কোনো ত্রুটি সে সহ্য করিতে পারে না। সেই প্রাণান্তিক সতর্কতা যদি দেখিতে না পাই, যদি দেখি উপস্থিত কোনো উদ্দেশ্যসাধনের কৃপণতায় আমাদের দুর্বল চিত্তকে এমনি অভিভূত করে যে আমাদের সাধনার কেন্দ্রস্থিত ধর্মকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব আমরা বিস্মৃত হই, তবে ইহার মতো উৎকণ্ঠার বিষয় আর কিছুই হইতে পারে না। রাজার সন্দেহ জাগ্রত হইয়া আমাদের চারি দিকে যে শাসনজাল বিস্তার করিতেছে তাহার বিরুদ্ধে আমাদের যজ্ঞের পবিত্র হুতাশনে পাপ-পদার্থ নিক্ষেপ করিয়া আমাদের হোমকে নষ্ট করিতেছে, তাহাদিগকে আমরা কেন সমস্ত মনের সহিত ভর্ৎসনা করিবার, তিরস্কৃত করিবার শক্তি অনুভব করিতেছি না। তাহারাই কি আমাদের সকলের চেয়ে ভয়ংকর শত্রু নহে।

চৈতন্যদেব একদিন বাংলাদেশে প্রেমের ধর্ম প্রচার করিয়াছিলেন। কাম জিনিসটা অতি সহজেই প্রেমের ছদ্মবেশ ধরিয়া দলে ভিড়িয়া পড়ে, এইজন্য চৈতন্য যে কিরূপ একান্ত সতর্ক ছিলেন তাহা তাঁহার অনুগত শিষ্য হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত কঠোর ব্যবহারে প্রমাণিত হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায় চৈতন্যের মনে যে প্রেমধর্মের আদর্শ ছিল তাহা কত উচ্চ, তাহা কিরূপ নিষ্কলঙ্ক। তাহার কোথাও লেশমাত্র কালিমাপাতের আশঙ্কায় তাঁহাকে কিরূপ অসহিষ্ণু ও কঠিন করিয়াছিল। নিজের দলের লোকের প্রতি দুর্বল মমতাকে তিনি মনে স্থান দেন নাই—ধর্মের উজ্জ্বলতাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করার প্রতিই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য ছিল।

আজ আমরা দেশে যদি শক্তিধর্মকেই প্রচার করিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকি তবে তাহারও কি কোথাও বিপদের কোনো সম্ভাবনা নাই। সে বিপদ কি কেবলই যাহাদিগকে আমরা শত্রুপক্ষ বলিয়া জানি তাহাদেরই নিকট হইতেই। উন্মত্ততা অন্যায় ও অত্যাচার কি শক্তিরই ছদ্মবেশ ধরিয়া তাহার মূলে আঘাত করে না। যথার্থ দুর্বলতাই কি উচ্ছৃঙ্খলতার আকার ধারণ করিয়া প্রবলতার ভান করে না। যাহা শক্তি নহে কিন্তু শান্তির বিড়ম্বনা, শক্তিধর্ম সাধনায় তাহার মতো সর্বনেশে বিঘ্ন আর তো কিছুই নাই। বর্তমানে আমাদের দেশে তাহার অভ্যুদয়ের লক্ষণ চাবি দিকে দেখা যাইতেছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে যাঁহারা তাহাকে স্পষ্টত প্রশ্রয় দিতেছেন না তাঁহারাও তাহাকে ক্ষমাহীন কঠোর শাসন ও ভর্ৎসনার দ্বারা দূরে ঠেকাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছেন না। যে শক্তি ধর্ম, তিনি যদি আমাদের স্পষ্ট উপলব্ধিগোচর হইতেন তবে তাঁহার এই-সকল নকল উৎপাতকে কখনো এক দণ্ডের জন্যও সহ্য করিতে পারিতাম না। আজ দস্যুবৃত্তি, তস্করতা, অন্যায় পীড়ন, দেশহিতের নাম ধরিয়া চারি দিকে সঞ্চরণ করিতেছে, এ কি এক মুহূর্তের জন্য তাঁহারা সহ্য করিতে পারেন যাঁহারা জানেন আত্মহিত দেশহিত লোকহিত যে-কোনো হিত-সাধনই লক্ষ্য হউক-না কেন, কেবলমাত্র বীর ও ত্যাগী ও তপস্বী তাহার যথার্থ সাধক। জাতির চরিত্রকে নষ্ট করিয়া আমরা জাতিকে গড়িয়া তুলিব এমন ভয়ংকর ভুলকে তিনি কখনোই এক মুহূর্তের জন্যও স্থান দিতে পারেন না যিনি ধর্মকেই শক্তি বলিয়া নিশ্চয় জানেন।

আমাদের দেশের সকল অমঙ্গলের মূল কোথায়। যেখানে আমরা বিচ্ছিন্ন। অতএব আমাদের দেশের বহুকে এক করিয়া তোলায় দেশহিতের সাধনা। বহুকে এক করিয়া তুলিতে পারে কে। ধর্ম। প্রয়োজনের প্রলোভনে ধর্মকে বিসর্জন দিলেই বিশ্বাসের বন্ধন শিথিল হইয়া যায়। যে অধর্ম দ্বারা আমরা আঘাত করিতে চাই সেই অধর্মের হাত হইতে আমরা নিজেকে বাঁচাইব কী করিয়া, মিথ্যাকে অন্যায়কে যদি আমরা কোনো কারণেই প্রশ্রয় দিই তবে আমরা নিজেদের মধ্যেই সন্দেহ বিশ্বাসঘাতকতা ভ্রাতৃবিদ্রোহের বীজ বপন করিব—এমন একটি প্রদীপকে নিভাইয়া দিব যে আলোকের অভাবে পুত্র মাতাকে আঘাত করিবে, ভাই ভাইয়ের পক্ষে বিভীষিকা হইয়া উঠিবে। যে ছিদ্র দিয়া আমাদের দলের মধ্যে বিশ্বাসহীন চরিত্রহীন ধর্মসংশয়িগণ অবাধে প্রবেশ করিতে পারিবে সেই ছিদ্রকেই দলবৃদ্ধি শক্তিবৃদ্ধির উপায় মনে করিয়া কি কোনো দূরদর্শী কোনো যথার্থ দেশহিতৈষী নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন। আমাদের দেশের যে দুইটি প্রাচীন মহাকাব্য আছে সেই দুই মহাকাব্যেই এই একটিমাত্র নীতি প্রচার করিয়াছে যে, অধর্ম যেখানে যে নামে যে বেশেই প্রবেশলাভ করিয়াছে সেইখানেই ভয়ংকর সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, আমরা শনির সঙ্গে কলির সঙ্গে আপাতত সন্ধি করিয়া মহৎ কার্য উদ্ধার করিব এমন ভ্রম আমাদের দেশের কোথাও যদি প্রবেশ করে তবে আমাদের দেশের মহাকবিদের শিক্ষা মিথ্যা ও আমাদের দেশের মহাঋষিদের সাধনা ব্যর্থ হইবে। আমাদের দেশের পূজনীয় শাস্ত্র ফলের আসক্তি ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন। কারণ, ফল লক্ষ্য নহে, ধর্মই লক্ষ্য। দেশের কাজেও ভারতবর্ষ যেন এই শাস্ত্রবাক্য কদাচ বিস্মৃত না হয়। দেশের হিতসাধনের জন্য আমরা প্রাণ সমর্পণ করিব, কেননা সেইরূপ মঙ্গলের জন্য প্রাণ সমর্পণ করাই ধর্ম ; কিন্তু কোনো ফল—সে ফলকে ইতিহাসে যত লোভনীয় বলিয়াই প্রচার করুক না—সেরূপ কোনো ফললাভ করিবার জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিব এরূপ নাস্তিকতাকে প্রশ্রয় দিলে রক্ষা পাইব না। বাইবেলে কথিত আছে, ফলের লোভে ধর্মকে ত্যাগ করিয়া আদিম মানব স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া মরণধর্ম লাভ করিয়াছে। ফললাভ চরম লাভ নহে, ধর্মলাভেই লাভ, এ কথা যদি কেবল দেশহিতের বেলাতেই না খাটে তবে দেশহিত মানুষের যথার্থ হিত নহে।

১৩১৫

৬. সদুপায়

বরিশালের কোনো-এক স্থান হইতে বিশ্বস্তসূত্রে খবর পাইলাম যে, যদিও আজকাল করকচ লবণ বিলাতি লবণের চেয়ে সস্তা হইয়াছে তবু আমাদের সংবাদদাতার পরিচিত মুসলমানগণ অধিক দাম দিয়াও বিলাতি লবণ খাইতেছে। তিনি বলেন যে, সেখানকার মুসলমানগণ আজকাল সুবিধা বিচার করিয়া বিলাতি কাপড় বা লবণ ব্যবহার করে না। তাহারা নিতান্তই জেদ করিয়া করে।

অনেক স্থলে নমশূদ্রদের মধ্যেও এইরূপ ঘটনার সংবাদ পাওয়া যাইতেছে:

আমরা পার্টিশন-ব্যাপারে বিরক্ত হইয়া একদিন দেশকে বিলাতি কাপড় ছাড়াইব ইহাই পণ করিয়াছিলাম, ইহা অপেক্ষা বড়ো কথা এবং দূরের কথা আমরা ভাবি নাই।

যদি জিজ্ঞাসা করো ইহা অপেক্ষা বড়ো কথাটা কী তবে আমি এই উত্তর দিব যে, বাংলাদেশকে দুই ভাগ করার দ্বারা যে আশঙ্কার কারণ ঘটিয়াছে সেই কারণটাকেই দূর করিবার প্রাণপণ চেষ্টা করা—রাগ প্রকাশ করা তার কাছে গৌণ।

পার্টিশনে আমাদের প্রধান আশঙ্কার কারণ কী। সে কথা আমরা নিজেরা অনেকবার আলোচনা করিয়াছি; এমন-কি, আমাদের মনে এই ধারণা আছে যে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়াই কর্তৃপক্ষ বাংলাকে পূর্ব ও অ-পূর্ব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বঙ্গকে ব্যঙ্গ অর্থাৎ বিকলাঙ্গ করিয়াছেন।

বাংলাদেশের পূর্বভাগে মুসলমান সংখ্যাই অধিক। ধর্মগত সমাজগত কারণে মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর চেয়ে ঐক্য বেশি, সুতরাং শক্তির প্রধান উপকরণ তাহাদের মধ্যে নিহিত হইয়া আছে। এই মুসলমান-অংশ ভাষা সাহিত্য শিক্ষা প্রভৃতির একত্ববশত হিন্দুদের সঙ্গে অনেকগুলি বন্ধনে বদ্ধ আছে। যদি বাংলাকে হিন্দুপ্রধান ও মুসলমানপ্রধান এই দুই অংশে একবার ভাগ করা যায় তবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু-মুসলমানের সকল বন্ধনই শিথিল করিয়া দেওয়া সহজ হয়।

ম্যাপে দাগ টানিয়া হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুকে পৃথক করিয়া দেওয়া কঠিন। কারণ, বাঙালি হিন্দুর মধ্যে সামাজিক ঐক্য আছে। কিন্তু মুসলমান ও হিন্দুর মাঝখানে একটা ভেদ রহিয়া গেছে। সেই ভেদটা যে কতখানি তাহা উভয়ে পরস্পর কাছাকাছি আছে বলিয়াই প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করা যায় নাই; দুই পক্ষ একরকম করিয়া মিলিয়া ছিলাম।

কিন্তু যে ভেদটা আছে রাজা যদি চেষ্টা করিয়া সেই ভেদটাকে বড়ো করিতে চান এবং দুই পক্ষকে যথাসম্ভব স্বতন্ত্র করিয়া তোলেন তবে কালক্রমে হিন্দুমুসলমানের দূরত্ব এবং পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষাবিদ্বেষের তীব্রতা বাড়িয়া চলিবে তাহাতে সন্দেহ নাই।

আসল কথা, আমাদের দুর্ভাগ্য দেশে ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া কিছুই শক্ত নহে, মিলন ঘটাইয়া তোলাই কঠিন। বেহারিগণ বাঙালি প্রতিবেশী এবং বাঙালি অনেক দিন হইতেই বেহারিগণের সঙ্গে কাজকারবার করিতেছে, কিন্তু বাঙালির সঙ্গে বেহারির সৌহৃদ্য নাই সে কথা বেহারবাসী বাঙালি মাত্রেই জানেন। শিক্ষিত উড়িয়াগণ বাঙালি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া দাঁড় করাইতে উৎসুক এবং আসামিদেরও সেইরূপ অবস্থা। অতএব উড়িষ্যা আসাম বেহার ও বাংলা জড়াইয়া আমরা যে দেশকে বহুদিন হইতে বাংলাদেশ বলিয়া জানিয়া আসিয়াছি তাহার সমস্ত অধিবাসী আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া কখনো স্বীকার করে নাই, এবং বাঙালি ও বেহারি উড়িয়া এবং আসামিকে আপন করিয়া লইতে কখনো চেষ্টামাত্র করে নাই, বরঞ্চ তাহাদিগকে নিজেদের অপেক্ষা হীন মনে করিয়া অবজ্ঞা দ্বারা পীড়িত করিয়াছে।

অতএব বাংলাদেশের যে অংশের লোকেরা আপনাদিগকে বাঙালি বলিয়া জানে সে অংশটি খুব বড়ো নহে; এবং তাহার মধ্যেও যে ভূভাগ ফলে শস্যে উর্বর, ধনে ধান্যে পূর্ণ, যেখানকার অধিবাসীর শরীরে বল আছে, মনে তেজ আছে, ম্যালেরিয়া এবং দুর্ভিক্ষ যাহাদের প্রাণের সার শুষিয়া লয় নাই, সেই অংশটিই মুসলমানপ্রধান—সেখানে মুসলমানসংখ্যা বৎসরে বৎসরে বাড়িয়া চলিয়াছে, হিন্দু বিরল হইয়া পড়িতেছে। এমন অবস্থায় এই বাঙালির বাংলাটুকুকেও এমন করিয়া যদি ভাগ করা যায় যাহাতে মুসলমান-বাংলা ও হিন্দু-বাংলাকে মোটামুটি স্বতন্ত্র করিয়া ফেলা যায় তাহা হইলে বাংলাদেশের মতো এমন খণ্ডিত দেশ ভারতবর্ষে আর একটিও থাকিবে না।

এমন স্থলে বঙ্গবিভাগের জন্য আমরা ইংরাজ-রাজের প্রতি যতই রাগ করি না কেন, এবং সেই ক্ষোভ প্রকাশ করিবার জন্য বিলাতি-বর্জন আমাদের পক্ষে যতই একান্ত আবশ্যক হউক-না, তাহার চেয়ে বড়ো আবশ্যক আমাদের পক্ষে কী ছিল। না, রাজকৃত বিভাগের দ্বারা আমাদের মধ্যে যাহাতে বিভাগ না ঘটে নিজের চেষ্টায় তাহারই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা।

সে দিকে দৃষ্টি না করিয়া আমরা বয়কট-ব্যাপারটাকেই এত একমাত্র কর্তব্য বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম, যে-কোনোপ্রকারেই হোক, বয়কটকে জয়ী করিয়া তোলাতেই আমাদের সমস্ত

জেদ এত বেশিমাত্রায় চড়িয়া গিয়াছিল যে, বঙ্গবিভাগের যে পরিণাম আশঙ্কা করিয়া পার্টিশনকে আমরা বিভীষিকা বলিয়া জানিয়াছিলাম সেই পরিণামকেই অগ্রসর হইতে আমরা সহায়তা করিলাম।

আমরা ধৈর্য হারাইয়া, সাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছা সুবিধা-অসুবিধা বিচারমাত্র না করিয়া, বিলাতি লবণ ও কাপড়ের বহিষ্কার-সাধনের কাছে আর কোনো ভালোমন্দকে গণ্য করিতে ইচ্ছাই করিলাম না। ক্রমশ লোকের সম্মতিকে জয় করিয়া লইবার বিলম্ব আমরা সহিতে পারিলাম না, ইংরেজকে হাতে-হাতে তাহার কর্মফল দেখাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

এই উপলক্ষে আমরা দেশের নিম্নশ্রেণির প্রজাগণের ইচ্ছা ও সুবিধাকে দলন করিবার আয়োজন করিয়াছিলাম, সে কথা স্বীকার করিতে আমাদের ভালো লাগে না, কিন্তু কথাটাকে মিথ্যা বলিতে পারি না।

তাহার ফল এই হইয়াছে, বাসনার অত্যুগ্রতা দ্বারা আমরা নিজের চেষ্টাতেই দেশের এক দলকে আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করাইয়াছি। তাহাদিগকে আমাদের মনের মতো কাপড় পরাইতে কতদূর পারিলাম তাহা জানি না, কিন্তু তাহাদের মন খোয়াইলাম। ইংরেজের শত্রুতা-সাধনে কতটুকু কৃতকার্য হইয়াছি বলিতে পারি না, **দেশের মধ্যে শত্রুতাকে জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছি** তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। আমরা যে সকল স্থানেই মুসলমান ও নিম্নশ্রেণির হিন্দুদের অসুবিধা ঘটাইয়া বিরোধ জাগাইয়া তুলিয়াছি এ কথা সত্য নহে। এমন-কি, যাহারা বয়কটের কল্যাণে বিশেষ লাভবান হইয়াছে তাহারাও যে আমাদের বিরুদ্ধ হইয়াছে এমন প্রমাণও আছে। ইহার কারণ, আমরা ইহাদিগকে কাজে প্রবৃত্ত করিবার চেষ্টার পূর্বে এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহাদের মন পাই নাই, মন পাইবার প্রকৃত পন্থা অবলম্বন করি নাই, আমাদের প্রতি ইহাদের অবিশ্বাস ও দূরত্ব দূর করি নাই। আমরা ইহাদিগকে নিজের মতে চালাইবার এবং কাজে লাগাইবারই চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু ইহাদিগকে কাছে টানি নাই। সেইজন্য সহসা একদিন ইহাদের সুপ্তপ্রায় ঘরের কাছে আসিয়া ইহাদিগকে নাড়া দিতে গিয়া ইহাদের সন্দেহকে বিরোধকেই জাগাইয়া তুলিয়াছি। ইহাদিগকে আত্মীয় করিয়া না তুলিয়াই ইহাদের নিকট হইতে আত্মীয়তা দাবি করিয়াছি। এবং যে উৎপাত আপন লোক কোনোমতে সহ্য করিতে পারে সেই উৎপাতের দ্বারা ইহাদিগকে পূর্বের চেয়ে দ্বিগুণ দূরে ফেলিয়াছি।

এবারে এতকাল পরে আমাদের বক্তারা ইংরেজি সভার উচ্চ মঞ্চ ছাড়িয়া দেশের সাধারণ লোকের দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। দেশের লোকের মনে একটা প্রশ্ন উদয় হইল—এ কী ব্যাপার, হঠাৎ আমাদের জন্য বাবুদের এত মাথাব্যথা হইল কেন।

বস্তুতই তাহাদের জন্য আমাদের মাথাব্যথা পূর্বেও অত্যন্ত বেশি ছিল না, এখনো এক মুহূর্তে অত্যন্ত বেশি হইয়া উঠে নাই। আমরা এই কথা মনে লইয়া তাহাদের কাছে যাই নাই যে, 'দেশী কাপড় পরিলে তোমাদের মঙ্গল হইবে এইজন্যই আমাদের দিনে আহার নাই এবং রাত্রে নিদ্রার অবকাশ ঘটিতেছে না।' আমরা এই বলিয়াই গিয়াছিলাম যে, 'ইংরেজকে জব্দ করিতে চাই, কিন্তু তোমরা আমাদের সঙ্গে যোগ না দিলে বয়কট সম্পূর্ণ হইবে না; অতএব ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তোমাদিগকে দেশী কাপড় পরিতে হইবে।'

কখনো যাহাদের মঙ্গলচিন্তা ও মঙ্গলচেষ্টা করি নাই, যাহাদিগকে আপন লোক বলিয়া কখনো কাছে টানি নাই, যাহাদিগকে বরাবর অশ্রদ্ধাই করিয়াছি, ক্ষতিস্বীকার করাইবার বেলা তাহাদিগকে ভাই বলিয়া ডাক পাড়িলে মনের সঙ্গে তাহাদের সাড়া পাওয়া সম্ভবপর হয় না।

সাড়া যখন না পাই তখন রাগ হয়। মনে এই হয় যে, কোনোদিন যাহাদিগকে গ্রাহ্যমাত্র করি নাই আজ তাহাদিগকে এত আদর করিয়াও বশ করিতে পারিলাম না, উল্টা ইহাদের গুমর

বাড়িয়া যাইতেছে।

যাহারা উপরে থাকে, যাহারা নিজেদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানে, নীচের লোকদের সম্বন্ধে তাহাদের এইরূপ অধৈর্য ঘটে। অশ্রদ্ধা-বশতই মানবপ্রকৃতির সঙ্গে তাহাদের অপরিচয় জন্মে। ইংরেজও ঠিক এই কারণ-বশতই আমাদের দ্বারা তাহার কোনো অভিপ্রায়সাধনের ব্যাঘাত ঘটিলেই কার্যকারণ বিচার না করিয়া একেবারে রাগিয়া উঠে। আমরা যখন নীচে আছি তখন উপরওয়ালার ইচ্ছা আমাদের ইচ্ছা দ্বারা অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে বাধা পাইলেও সেটাকে অবিমিশ্র স্পর্ধা বলিয়া মনে হয়।

ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানে আমাদের বক্তারা যখন মুসলমান কৃষিসম্প্রদায়ের চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারেন নাই, তখন তাঁহারা অত্যন্ত রাগ করিয়াছিলেন। এ কথা তাঁহারা মনেও চিন্তা করেন নাই যে, আমরা যে মুসলমানদের অথবা আমাদের দেশের জনসাধারণের যথার্থ হিতৈষী তাহার কোনো প্রমাণ কোনোদিন দিই নাই; অতএব তাহারা আমাদের হিতৈষিতায় সন্দেহ বোধ করিলে তাহাদিগকে দোষী করা যায় না। ভাইয়ের জন্য ভাই ক্ষতি স্বীকার করিয়া থাকে বটে, কিন্তু ভাই বলিয়া একজন খামকা আসিয়া দাঁড়াইলেই যে অমনি তখনই কেহ তাহাকে ঘরের অংশ ছাড়িয়া দেয় এমনতরো ঘটে না। আমরা যে দেশের সাধারণ লোকের ভাই তাহা দেশের সাধারণ লোকে জানে না, এবং আমাদের মনের মধ্যেও যে তাহাদের প্রতি ভ্রাতৃভাব অত্যন্ত জাগরূক আমাদের ব্যবহারে এখনো তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

পূর্বেই বলিয়াছি, সত্য কথাটা এই যে, ইংরেজের উপরে রাগ করিয়াই আমরা দেশের লোকের কাছে ছুটিয়াছিলাম, দেশের লোকের প্রতি ভালোবাসা-বশতই যে গিয়াছিলাম তাহা নহে। এমন অবস্থায় "ভাই" শব্দটা আমাদের কণ্ঠে ঠিক বিশুদ্ধ কোমলসুরে বাজে না—যে কড়িসুরটা আর-সমস্ত স্বরগ্রাম ছাপাইয়া কানে আসিয়া বাজে সেটা অন্যের প্রতি বিদ্বেষ।

আমরা দেশের শিক্ষিত লোকেরা জন্মভূমিকে লক্ষ্য করিয়া "মা" শব্দটাকে ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছি। এই শব্দের দ্বারা আমাদের হৃদয়াবেগ এতই জাগিয়া উঠে যে, আমরা মনে করিতে পারি না দেশের মধ্যে মা'কে আমরা সত্য করিয়া তুলি নাই। আমরা মনে করি, কেবল গানের দ্বারা, কেবল ভাবোন্মাদের দ্বারা মা সমস্ত দেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছেন। এইজন্য দেশের সাধারণ গণসমাজ যদি স্বদেশের মধ্যে মা'কে অনুভব না করে তবে আমরা অধৈর্য হইয়া মনে করি, সেটা হয় তাহাদের ইচ্ছাকৃত অন্ধতার ভান, নয় আমাদের শত্রুপক্ষ তাহাদিগকে মাতৃবিদ্রোহে উত্তেজিত করিয়াছে। কিন্তু আমরাই যে মা'কে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করি নাই এই অপরাধটা আমরা কোনোমতেই নিজের স্কন্ধে লইতে রাজি নহি। ছাত্রকে মাস্টার পড়া বুঝাইয়া দেয় নাই, বুঝাইবার ক্ষমতাও তাহার নাই, অথচ ছাত্র যখন পড়া বলিতে পারে না তখন রাগিয়া তাহাকে মারিতে যাওয়া যেমন, এও তেমনি। আমরাই দেশের সাধারণ লোককে দূরে রাখিয়াছি, অথচ প্রয়োজনের সময় তাহারা দূরে থাকে বলিয়া আমরাই রাগ করি। অবশেষে যাহারা আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক কারণেই যোগ দিতে পারে নাই, যাহারা বরাবর যে পথে চলিয়া আসিতেছিল সেই চিরাভ্যস্ত পথ হইতে হঠাৎ ইংরেজিপড়া বাবুদের কথায় সরিতে ইচ্ছা করিল না, আমরা যথাসাধ্য তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ করিয়াছি, তাহাদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য আমাদের জেদ বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা নিজেকে এই বলিয়া বুঝাইয়াছি, যাহারা আত্মহিত বুঝে না বলপূর্বক তাহাদিগকে আত্মহিতে প্রবৃত্ত করাইব।

আমাদের দুর্ভাগ্যই এই, আমরা স্বাধীনতা চাই। কিন্তু স্বাধীনতাকে আমবা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করি না। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি শ্রদ্ধা রাখিবার মতো ধৈর্য আমাদের নাই; আমরা ভয় দেখাইয়া তাহার বুদ্ধিকে দ্রুতবেগে পদানত করিবার জন্য চেষ্টা করি। পিতৃপুরুষকে নরকস্থ

করিবার ভয়, ধোবানাপিত বন্ধ করিবার শাসন, ঘরে অগ্নিপ্রয়োগ বা পথের মধ্যে ধরিয়া ঠেঙাইয়া দিবার বিভীষিকা, এ-সমস্তই দাসবৃত্তিকে অন্তরের মধ্যে চিরস্থায়ী করিয়া দিবার উপায়। কাজ ফাঁকি দিবার জন্য, পথ বাঁচাইবার জন্য আমরা যখনই এই-সকল উপায় অবলম্বন করি তখনই প্রমাণ হয়, বুদ্ধির ও আচরণের স্বাধীনতা যে মানুষের পক্ষে কী অমূল্য ধন তাহা আমরা জানি না। আমরা মনে করি, আমার মতে সকলকে চালানোই সকলের পক্ষে চরম শ্রেয়; অতএব সকলে যদি সত্যকে বুঝিয়া সে পথে চলে তবে ভালোই, যদি না চলে তবে ভুল বুঝাইয়াও চালাইতে হইবে— অথবা চালনার সকলের চেয়ে সহজ উপায় আছে জবরদস্তি।

বয়কটের জেদে পড়িয়া আমরা এই সকল সংক্ষিপ্ত উপায় অবলম্বন করিয়া হিতবুদ্ধির মূলে আঘাত করিয়াছি তাহাতে সন্দেহ নাই। অল্পদিন হইল মফস্বল হইতে পত্র পাইয়াছি, সেখানকার কোন-একটি বড়ো বাজারের লোকে নোটিস পাইয়াছে যে, যদি তাহারা বিলাতি জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দেশী জিনিসের আমদানি না করে তবে নির্দিষ্টকালের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই বাজারে আগুন লাগিবে। সেইসঙ্গে স্থায়ী ও নিকটবর্তী জমিদারের আমলাদিগকে প্রাণহানির ভয় দেখানো হইয়াছে।

এইরূপভাবে নোটিস দিয়া কোথাও কোথাও আগুন লাগানো হইয়াছে। ইতিপূর্বে জোর করিয়া মাল আমদানি বন্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছে এবং খরিদ্‌দারদিগকে বলপূর্বক বিলাতি জিনিস খরিদ করিতে নিরস্ত করা হইয়াছে। ক্রমে এখন সেই উৎসাহ ঘরে আগুন লাগানো এবং মানুষ মারাতে গিয়া পৌঁছিয়াছে।

দুঃখের বিষয় এই যে, এইরূপ উৎপাতকে আমাদের দেশের অনেক ভদ্রলোক আজও অন্যায় বলিয়া মনে করিতেছেন না। তাঁহারা স্থির করিয়াছেন, দেশের হিতসাধনের উপলক্ষে এরূপ উপদ্রব করা যাইতে পারে।

ইঁহাদের নিকট ন্যায়ধর্মের দোহাই পাড়া মিথ্যা। ইঁহারা বলেন, মাতৃভূমির মঙ্গলের জন্য যাহা করা যাইবে তাহা অধর্ম হইতে পারে না। কিন্তু অধর্মের দ্বারা যে মাতৃভূমির মঙ্গল কখনোই হইবে না সেকথা বিমুখ বুদ্ধির কাছেও বার বার বলিতে হইবে।

জিজ্ঞাসা করি, বাজারে আগুন লাগাইয়া অথবা অনিচ্ছুক লোকের মাথা ভাঙিয়া যদি আমরা বিলাতি কাপড় ছাড়াইয়া একদল লোককে দেশি কাপড় ধরাই তবে বাহিরে মাত্র দেশি কাপড় পরাইয়া ইহাদের সমস্ত অন্তঃকরণকে কি স্বদেশির বিরুদ্ধে চিরদিনের জন্য বিদ্রোহী করিয়া তুলি না। দেশের যে সম্প্রদায়ের লোক স্বদেশি-প্রচারের ব্রত লইয়াছেন তাঁহাদের প্রতি এই-সকল লোকের বিদ্বেষকে কি চিরস্থায়ী করা হয় না।

এইরূপ ঘটনাই কি ঘটিতেছে না! "যাহারা কখনো বিপদে আপদে সুখে দুঃখে আমাদিগকে স্নেহ করে নাই, আমাদিগকে যাহারা সামাজিক ব্যবহারে পশুর অপেক্ষা অধিক ঘৃণা করে, তাহারা আজ কাপড়-পরানো বা অন্য যে-কোনো উপলক্ষে আমাদের প্রতি জবরদস্তি প্রবেশ করিবে ইহা আমরা সহ্য করিব না"—দেশেব নিম্নশ্রেণির মুসলমান এবং নমশূদ্রের মধ্যে এইরূপ অসহিষ্ণুতা জাগিয়া উঠিয়াছে। ইহারা জোর করিয়া, এমনকি, ক্ষতিস্বীকার করিয়াও বিলাতী সামগ্রী ব্যবহার করিতেছে।

তাই বলিতেছি, **বিলাতি দ্রব্য-ব্যবহারই দেশের চরম অহিত নহে, গৃহবিচ্ছেদের মতো এতবড়ো অহিত আর কিছুই নাই।** দেশের এক পক্ষ প্রবল হইয়া কেবলমাত্র জোরের দ্বারা অপর ক্ষীণ পক্ষকে নিজের মতশৃঙ্খলে দাসের মতো আবদ্ধ করিবে, ইহার মতো ইষ্টহানিও আর কিছু হইতে পারে না। এমন করিয়া বন্দেমাতরম্-মন্ত্র উচ্চারণ করিলেও মাতার বন্দনা করা হইবে না—এবং দেশের লোককে মুখে ভাই বলিয়া কাজে ভ্রাতৃদ্রোহিতা করা হইবে। সবলে

গলা টিপিয়া ধরিয়া মিলনকে মিলন বলে না; ভয় দেখাইয়া, এমন-কি, কাগজে কুৎসিত গালি দিয়া মতের অনৈক্য নিরস্ত করাকেও জাতীয় ঐক্য সাধন বলে না।

এ-সকল প্রণালী দাসত্বেরই প্রণালী। যাহারা এইরূপ উপদ্রবকে দেশহিতের উপায় বলিয়া প্রচার করে তাহারা স্বজাতির লজ্জাকর হীনতারই পরিচয় দেয় এবং এইপ্রকার উৎপাত করিয়া যাহাদিগকে দলন দমন করিয়া দেওয়া যায় তাহাদিগকেও হীনতাতেই দীক্ষা দেওয়া হয়।

সেদিন কাগজে দেখিতেছিলাম, মর্লিকে যখন বলা হইয়াছিল যে প্রাচ্যগণ কোনোপ্রকার আপসে অধিকারপ্রাপ্তির মূল্য বোঝে না, তাহারা জোরকেই মানে, তখন তিনি বলিয়াছেন—তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমরা তো প্রাচ্য নই, আমরা পাশ্চাত্য।

কথাটা শুনিয়া মনের মধ্যে আক্ষেপ বোধ হইয়াছিল। আক্ষেপের কারণ এই যে, আমাদের ব্যবহারে আমরা প্রাচ্যদের বিরুদ্ধে এই গুরুতর অপবাদের সমর্থন করিয়া থাকি। অন্যকে জোরের দ্বারা অভিভূত করিয়া চালনা করিব, এই অতিহীনবুদ্ধিকে আমরা কিছুতে ছাড়িতে চাহি না। যেখানে আমরা মুখে স্বাধীনতা চাই সেখানেও আমরা নিজের কর্তৃত্ব অন্যের প্রতি অবৈধ বলের সহিত খাটাইবার প্রবৃত্তিকে খর্ব করিতে পারি না। উহার প্রতি জোর না খাটাইলে উহার মঙ্গল হইবে না, অতএব যেমন করিয়া পারি আমাকে উহার উপরে কর্তা হইতে হইবে। হিতানুষ্ঠানের উপায়ের দ্বারাও আমরা মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করি এবং এইপ্রকার অশ্রদ্ধার ঔদ্ধত্য দ্বারা আমরা নিজের এবং অন্য পক্ষের মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিতে থাকি।

যদি মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকে তবে লোকের ঘরে আগুন লাগানো এবং মারধর করিয়া গুণ্ডামি করিতে আমাদের কদাচই প্রবৃত্তি হইবে না; তবে আমরা পরম ধৈর্যের সহিত মানুষের বুদ্ধিকে হৃদয়কে মানুষের ইচ্ছাকে, মঙ্গলের দিকে, ধর্মের দিকে আকর্ষণ করিতে প্রাণপাত করিতে পারিব। তখন আমরা মানুষকেই চাহিব, মানুষ কী কাপড় পরিবে বা কী নুন খাইবে তাহাই সকলের চেয়ে বড়ো করিয়া চাহিব না। মানুষকে চাহিলে মানুষের সেবা করিতে হয়, পরস্পরের ব্যবধান দূর করিতে হয়, নিজেকে নম্র করিতে হয়, মানুষকে যদি চাই তবে যথার্থভাবে মানুষের সাধনা করিতে হইবে; তাহাকে কোনোমতে আমার মতে ভিড়াইবার, আমার দলে টানিবার জন্য টানাটানি-মারামারি না করিয়া আমাকে তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে। সে যখন বুঝিবে আমি তাহাকে আমার অনুবর্তী অধীন করিবার জন্য বলপূর্বক চেষ্টা করিতেছি না, আমি নিজেকে তাহারই মঙ্গলসাধনের জন্য উৎসর্গ করিয়াছি, তখনই সে বুঝিবে, আমি মানুষের সঙ্গে মনুষ্যোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছি; তখনই সে বুঝিবে, বন্দেমাতরম্-মন্ত্রের দ্বারা আমরা সেই মা'কে বন্দনা করিতেছি, দেশের ছোটোবড়ো সকলেই যাঁহার সন্তান। তখন মুসলমানই কি আর নমশূদ্রই কি, বেহারি উড়িয়া অথবা অন্য যে-কোনো ইংরেজিশিক্ষায়-পশ্চাদ্‌বর্তী জাতিই কি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমান লইয়া কাহাকেও ব্যবহারে বা বাক্যে বা চিন্তায় অপমানিত করিব না। তখনই সকল মানুষের সেবা ও সম্মানের দ্বারা যিনি সকল প্রজার প্রজাপতি তাঁহার প্রসন্নতা এই ভাগ্যহীন দেশের প্রতি আকর্ষণ করিতে পারিব। নতুবা আমার রাগ হইয়াছে বলিয়াই দেশের সকল লোককে আমি রাগাইয়া তুলিব, অথবা আমি ইচ্ছা করিতেছি বলিয়া দেশের সকল লোকের ইচ্ছাকে আমার অনুগত করিব, ইহা কোনো বাগ্মিতার দ্বারা কদাচ ঘটিবে না। ক্ষণকালের জন্য একটা উৎসাহের উত্তাপ জাগাইয়া তুলিতে পারি; কিন্তু তাহা সত্যকার ইন্ধনের অভাবে কখনোই স্থায়ী হইতে পারিবে না। সেই সত্যপদার্থ মানুষ—সেই সত্যপদার্থ মানুষের হৃদয়বুদ্ধি, মানুষের মনুষ্যত্ব; স্বদেশি মিলের কাপড় অথবা করকচ লবণ নহে। সেই মানুষকে প্রত্যহ অপমানিত করিয়া মিলের কাপড়ের পূজা করিতে থাকিলে আমরা দেবতার বর পাইব না। বরঞ্চ উলটা ফলই পাইতে থাকিব।

একটি কথা আমরা কখনো ভুলিলে চলিবে না যে, অন্যায়ের দ্বারা, অবৈধ উপায়ের দ্বারা কার্যোদ্ধারের নীতি অবলম্বন করিলে কাজ আমরা অল্পই পাই, অথচ তাহাতে করিয়া সমস্ত দেশের বিচারবুদ্ধি বিকৃত হইয়া যায়। তখন কে কাহাকে কিসের দোহাই দিয়া কোন্ সীমার মধ্যে সংযত করিবে। দেশহিতের নাম করিয়া যদি মিথ্যাকেও পবিত্র করিয়া লই এবং অন্যায়কেও ন্যায়ের আসনে বসাই তবে কাহাকে কোন্‌খানে ঠেকাইব। শিশুও যদি দেশের হিতাহিত সম্বন্ধে বিচারক হইয়া উঠে এবং উন্মত্তও যদি দেশের উন্নতিসাধনের ভার গ্রহণ করে তবে সেই উচ্ছৃঙ্খলতা সংক্রামক হইতে থাকিবে, মহামারীর ব্যাপ্তির মতো তাহাকে রোধ করা কঠিন হইবে। তখন দেশহিতৈষীর ভয়ংকর হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করাই আমাদের পক্ষে সকলের চেয়ে দুঃখকর সমস্যা হইয়া পড়িবে। দুর্বুদ্ধি স্বভাবতই কোনো বন্ধন স্বীকার করে না; বৃহৎভাবে সকলের সহিত যুক্ত হইয়া বৃহৎ কাজ করিতে সে সহজেই অক্ষম। দুঃস্বপ্ন যেমন দেখিতে দেখিতে অসংগত অসংলগ্ন-ভাবে এক বিভীষিকা হইতে আর-এক বিভীষিকায় লাফ দিয়া চলিতে থাকে তেমনি মঙ্গলবুদ্ধির অরাজকতার দিনে নিতান্তই সামান্য কারণে চন্দননগরের মেয়রকে হত্যা করিবার আয়োজন হয়, কোথাও কিছু নাই হঠাৎ কুষ্ঠিয়ার নিতান্ত নিরপরাধ পাদ্রির পৃষ্ঠে গুলি বর্ষিত হয়, কেন-যে ট্রামগাড়ির প্রতি সাংঘাতিক আক্রমণের উদ্‌যোগ হয় তাহা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না; বিভীষিকা অত্যন্ত তুচ্ছ উপলক্ষ অবলম্বন করিয়া চারি দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং কাণ্ডজ্ঞানহীন মত্ততা মাতৃভূমির হৃৎপিণ্ডকেই বিদীর্ণ করিয়া দেয়।[১] এইরূপ ধর্মহীন ব্যাপারে প্রণালীর ঐক্য থাকে না, প্রয়োজনের গুরুলঘুতা-বিচার চলিয়া যায়, উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে সুসংগতি স্থান পায় না, একটা উদ্‌ভ্রান্ত দুঃসাহসিকতাই লোকের কল্পনাকে উত্তেজিত করিয়া তুলে। অদ্য বার বার দেশকে স্মরণ করাইয়া দিতে হইবে যে, অধ্যবসায়ই শক্তি এবং অধৈর্যই দুর্বলতা; প্রশস্ত ধর্মের পথে চলাই নিজের শক্তির প্রতি সম্মান; এবং উৎপাতের সংকীর্ণ পথ সন্ধান করাই কাপুরুষতা, তাহাই মানবের প্রকৃত শক্তির প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবের মনুষ্যধর্মের প্রতি অবিশ্বাস। অসংযম নিজেকে প্রবল বলিয়া অহংকার করে। কিন্তু তাহার প্রবলতা কিসে। সে কেবল আমাদের যথার্থ অন্তরতর বলের সম্বলকে অপহরণ করিবার বেলায়। এই বিকৃতিকে যে-কোনো উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই একবার প্রশ্রয় দিলে শয়তানের কাছে মাথা বিকাইয়া রাখা হয়। প্রেমের কাজে, সৃজনের কাজে, পালনের কাজেই যথার্থভাবে আমাদের সমস্ত শক্তির বিকাশ ঘটে। কোনো-একটা দিকে আমরা মঙ্গলের পথ নিজের শক্তিতে একটুমাত্র কাটিয়া দিলেই তাহা অভাবনীয়রূপে শাখায় প্রশাখায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। একটা কিছুকে গড়িয়া তুলিলে কতকটা কৃতকার্য হইবামাত্র সেই আনন্দে আমাদের শক্তি অচিন্তনীয়রূপে নবনব সৃষ্টি দ্বারা নিজেকে চরিতার্থ করিতে থাকে। এই মিলনের পথ, সৃজনের পথই ধর্মের পথ। কিন্তু ধর্মের পথ দুর্গম—দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি। এই পথেই আমাদের সমস্ত পৌরুষের প্রয়োজন, ইহার পাথেয় সংগ্রাম করিতেই আমাদের সর্বস্ব ত্যাগ করিতে হইবে; ইহার পারিতোষিক অহংকারতৃপ্তিতে নহে, অহংকারবিসর্জনে; ইহার সফলতা অন্যকে পরাস্ত করিয়া নহে, নিজেকে পরিপূর্ণ করিয়া।

১৩১৫

১। কাঁকিনাড়ার কারখানার ইংরেজ কর্মচারীদের প্রতি লক্ষ করিয়া রেলগাড়িতে বোমা ছুঁড়িবার পূর্বে এই প্রবন্ধ লিখিতে হয়। কোনো ছিদ্রে পাপ একবার অন্তরে প্রবেশ করিতে পারিলে ক্রমশই মানুষকে তাহা কিরূপে বিকৃতিতে লইয়া যায়, এই লজ্জাকর শোচনীয় ঘটনাই তাহার প্রমাণ।

স্বদেশি—আন্দোলন



পালাবদলের ডাক

শিবনাথ শাস্ত্রী

১. স্বদেশি ধূয়া

দেশ যে বিদেশীয় রাজার অধীনে রহিয়াছে, ইহার সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট ফল কি? সর্বাপেক্ষা অনিষ্ট ফল—জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তা। যে জাতির অধিকাংশ মানবের ক্ষুদ্র স্বার্থের উপরে আর কিছু ভাবিবার থাকে না—সে জাতির অবস্থা অতি হীন। এই একটা মূল তত্ত্ব জানিয়া রাখিতে হইবে। যতদিন দেশ স্বাধীন থাকে, তত দিন শাসনাদি সম্বন্ধে নিতান্ত বিশৃঙ্খলা থাকিলেও দেশের অগ্রগণ্য ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগকে বাধ্য হইয়াও পরার্থ চিন্তাতে নিযুক্ত হইতে হয়। আজ আক্রমণকারী অপর জাতির হস্ত হইতে দেশকে রক্ষা করা আবশক, কল্য মহামারীর বা দুর্ভিক্ষের হস্ত হইতে সহস্র সহস্র প্রজার জীবন রক্ষার উপায়বিধান আবশ্যক, পরশ্ব দারিদ্র-পীড়িত প্রজাকূলের অবস্থার প্রতি মনোযোগ আবশ্যক, এইরূপে কোনও না কোনও পরার্থ প্রসঙ্গ সততই উপস্থিত রাখে। এবং তাহাতে দেশের নেতৃগণকে সর্বদাই ব্যাপৃত হইতে হয়। তৎপরে সামাজিক শক্তি ও পদগৌরবজনিত এক প্রকার দায়িত্বজ্ঞান মানবমনে নিরন্তর কার্য করে। আমার হাতে এত লোকের ধন, মান, প্রাণ—এই জ্ঞান চিত্তে এক প্রকার গাম্ভীর্যের আবির্ভাব করে। তাহার ফল অতি উৎকৃষ্ট। তাহাতে মানবচিত্তকে সমুন্নত, সংযত ও উদার করিয়া থাকে। গড়ের উপরে একথা সর্বদা মনে রাখিবার উপযুক্ত যে, দায়িত্বজ্ঞানের ন্যায় মানবচরিত্রের শিক্ষক ও উন্নতি বিধায়ক শক্তি অতি অল্পই আছে। সর্বদেশে ও সর্বসমাজে এই শক্তি মানবচরিত্রকে উন্নত করিতেছে। ভারতবর্ষে দেশীয় অধিকার বলে এরূপ উদারচেতা উন্নতহৃদয় নেতার অভাব কখনই হয় নাই। এমন কি অতি অধুনাতন কালেও আমরা স্যর, টি. মাধব রাও, স্যর স্যালার জঙ্গ, স্যর দিনকর রাও, বঙ্গাচার্লু, স্যর শেষাদ্রি আইয়ার প্রভৃতি উদারচিত্ত, বিচক্ষণ, কর্তব্য সাধনে দৃঢ়চেতা নেতা পাইয়াছি। ইঁহারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতি গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ রাজকার্য চালাইবার লোক আমাদের মধ্যে দুষ্প্রাপ্য নহে। এক দিকে মানসিক শক্তি, অপরদিকে দায়িত্বজ্ঞান ইহাদিগকে গড়িয়াছিল।

বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে যে নিয়ম, ক্ষুদ্র ক্ষেত্রেও সেই নিয়ম। পদার্থচিন্তা ও দায়িত্বজ্ঞান যদি বহু বিশাল ক্ষেত্রে মানুষকে উন্নত করিতে পারে, সামান্য গ্রাম বা জনপদের ক্ষুদ্র জীবনকেও সমুন্নত করিতে পারে। প্রাচীন কালে ইহাও ছিল। গ্রামবাসিগণ সম্মিলিত হইয়া গ্রামের সাধারণ হিতকর বিষয় সকলে মনোনিবেশ করিত; এবং সেই সকলের নির্বাহ বিষয়ে যথাসাধ্য পরস্পরের সাহায্য করিত। বন্যা হইয়া গ্রাম ভাসিয়া যায়, গ্রামবাসিগণ একত্র হইল পরামর্শ করিয়া কেহ বা খাটিয়া দিল, কেহ বা অর্থ সাহায্য করিল—সকলে মিলিয়া গ্রামরক্ষার একটা উপায় নির্ধারণ করিল; গ্রামে হিংস্র জন্তুর ভয় উপস্থিত, তাহারা সকলে একত্র হইয়া তাহা নিবারণের একটা উপায় নির্ধারণ করিল; রাজকোষে অর্থ প্রেরণের প্রয়োজন, মোড়লের আহ্বানে সকলে একত্র হইয়া পরামর্শানন্তর প্রত্যেকে যথাসাধ্য কর দিয়া সে দায় উদ্ধার করিল ; গ্রামে দুই পরিবারের ঘোর বিবাদ উপস্থিত, গ্রামবাসিগণ পঞ্চায়েতের দ্বারা তাহার নিষ্পত্তি করিয়া লইল। এইরূপে পরার্থ চিন্তার জন্য আহূত হওয়াতে গ্রামবাসী জনসাধারণের চিত্তে পরার্থ-প্রবৃত্তি প্রবল হইত; দায়িত্ব জ্ঞান-জনিত এক প্রকার উদার ন্যায়পরতার উদ্রেক করিত; তাহারা ইহা ভাবিতে অভ্যস্ত হইত যে, জনসমাজে সুখে বাস করিতে হইলে স্বার্থের ন্যায় পরার্থেও মনোনিবেশ করিতে হয়। এরূপ শিক্ষার ন্যায় সামাজিক শিক্ষা আর

হইতে পারে না। ইহাই জনসমাজের মূল ভিত্তি। এই সর্তেই জনসমাজের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল এবং এই সর্তই প্রাচীনকালের প্রত্যেক সামাজিক ব্যবস্থাকর্তার মনে প্রবল ছিল। "তুমি যদি আত্মরক্ষার জন্য, নিজের সুখ-সুবিধার জন্য, সমাজের আশ্রয় চাও, এবং অপরের সাহায্যের অপেক্ষা কর, তবে অপরকে সাহায্য করিবার জন্য প্রস্তুত থাক"—মূল ভাব এই। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার এই একটি শোচনীয় ভাব দেখা যাইতেছে যে, ইহাতে মনুষ্যকে আত্মসুখে সুখী করিতেছে। আমার প্রতিবেশীর সুখ-দুঃখ আমার চিন্তনীয় বিষয় নহে, এই ভাব অতিরিক্ত মাত্রাতে যাওয়াতে মানুষ পরার্থচিন্তাবিমুখ হইয়া পড়িতেছে।

যাক্ ইহা বাহিরের কথা, আমরা বর্তমান বিদেশীয় অধিকারকে যে জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তার উৎপাদক কারণ বলিয়াছি তাহার কারণ এই—বর্তমান রাজারা কি দেশের বুদ্ধি-বিদ্যাসম্পন্ন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে কি গ্রামের প্রজাসাধারণকে, সকলকেই পরার্থ চিন্তা ও দায়িত্বজ্ঞানের উপযোগী কার্য হইতে এক প্রকার বঞ্চিত রাখিতেছেন। কোথায় তাঁহারা শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এদেশবাসিদিগকে স্বদেশ শাসন বিষয়ে উন্নত ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য দিবেন, তাহা না করিয়া বরং তাহাদের রাজনীতির গতি উন্নত পদ হইতে এদেশীয়দিগকে দূরে রাখিবার দিকেই দেখিতেছি। ওদিকে গ্রাম্য শাসনপ্রণালী দেশ মধ্যে যাহা কিছু ছিল তাহা তাহারা অনেক স্থলে ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন। এক্ষণে যদিও কোনও কোনও স্থলে গ্রাম্য মিউনিসিপ্যালিটি ও পঞ্চায়েৎ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন বটে, কিন্তু প্রজাগণকে প্রকৃত শক্তি দিতে না পারাতে ভাঙা ভাঙা জিনিষ আর ভাল করিয়া গড়িতেছে না। ইহার ফল এই হইতেছে যে, দেশের ক্ষুদ্র ও মহৎ সকল লোকের মনে এই ভাব দৃঢ় নিবদ্ধ হইতেছে যে, এই বিদেশীয় রাজ্যের সুযোগে আমরা যে যা করিয়া লইতে পারি—করিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ স্বার্থসাধন করাই এই সুযোগের প্রকৃত সদ্ব্যবহার। এইরূপে স্বার্থই মানুষের ধ্যানে-জ্ঞানে প্রবেশ করিতেছে। স্বার্থচিন্তাই মানুষের অধিকাংশ সময়, ও অধিকাংশ মানসিক শক্তিকে অধিকার করিতেছে।

ইহার মধ্যে যে কতিপয় ব্যক্তি দেশবাসিগণের মনে স্বদেশপ্রিয়তা জাগাইবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদের হস্তে কি কঠিন কার্যের ভারই পড়িয়াছে!! স্বদেশের কল্যাণ কিসে হয়, এ প্রশ্নের প্রতি কে প্রণিধান করে! ঐ যে কলিকাতার বড়বাজারে সহস্র সহস্র মাড়োয়ারি কিনিতেছে বেচিতেছে, উহাদের কয়জন ভাবে স্বদেশের কল্যাণ কিসে হয়? রেলযোগে কলিকাতা হইতে সিন্ধু দেশ পর্যন্ত যাত্রা কর, তৃতীয় শ্রেণির গাড়িতে যাত্রা করিলে ত কথাই নাই, ভদ্র মধ্যবিত্ত সেবিত মধ্যম শ্রেণির গাড়িতে যাও, চব্বিশ ঘণ্টা আরোহীদিগের কথাবার্তার প্রতি মনোযোগ রাখ, কি শুনিবে? দেশের কল্যাণ কিসে হয় এ চিন্তা কতবার দেখিবে? তাহাদের অধিকাংশ লোক দেশের কল্যাণের কোনও ধার ধারে না। ক্ষুদ্র চিন্তা ক্ষুদ্র কথা অবিশ্রান্ত স্রোতে বহিতেছে। তাহাদের আদর্শপুরুষ কংগ্রেসের নেতৃগণ নহেন ; কিন্তু অমুক গ্রামের অমুক ধনী, যিনি চুরি, চামারি, জাল, জুয়াচুরি করিয়া বিপুল ধন সংগ্রহ করিয়াছেন।

আবার বলি এই জাতীয় ক্ষুদ্রাশয়তার অপেক্ষা জাতীয় পরাধীনতায় অধিক অনিষ্ট ফল আর কিছু দেখিতেছি না।

দ্বিতীয় অনিষ্ট ফল জাতীয় হীন-চিন্ততা। প্রবল বিদেশিয়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে আপনাকে আপনি হারাইয়া ফেলার মত দুর্গতি আর হইতে পারে না। প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছে—"তুই কিছুই নহিস, তোর দ্বারা কিছুই হইতে পারে না। আমার অনুগ্রহপ্রার্থী হওয়াই তোর জীবন ধারণের উপায়"—শুনিয়া আমার মনও যদি বলে, "তাইত আমি ত কিছুই নই, আমার দ্বারা ত কিছুই হইতে পারে না"—তাহা হইলে আমার আর উপায় নাই! আমি হীন থাকিবারই উপযুক্ত।

ব্যক্তিগত আত্মাদরের ন্যায় জাতীয় আত্মাদর জাতীয় মহত্ত্বের নিদান। যে মানুষ আপনার

শক্তিকে আপনি আদর করে না, সে স্বভাবতঃই নিচ হইয়া পড়ে। একটা কথা এদেশে সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত আছে—"হাতির চোখ ছোট বলে সে আপনাকে আপনি দেখে না, আপনাকে আপনি জানে না, এই জন্যই সে মানুষের হাতে এত সহজে কাবু হয়।" হাতির পক্ষে ইহা সত্য কিনা বলিতে পারি না। তবে একথা যথার্থ যে, যে-ব্যক্তি আপনার শক্তির পরিচয় আপনি পায় নাই, আপনার প্রতি যার সাহস নাই, সে আপনাকে আপনি বড় করিতে পারে না।

বিদেশীয়দিগের সহিত প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিবন্ধন যে আমাদের শিল্প বাণিজ্যাদি নষ্ট হইয়া যাইতেছে, প্রজাকুল বৃকতাড়িত মেষযূথের ন্যায় দিশাহারা হইয়া পড়িতেছে, এখন সে কথা বলিতেছি না। আরও গূঢ়তর স্থানে জাতীয় আত্মদরের অভাব প্রবিষ্ট হইয়া যে জাতীয় হীনচিত্ততা আনিয়া দিতেছে ও তৎসঙ্গে সঙ্গে যে জাতীয় অবনতি ঘটাইতেছে তাহার প্রতি স্বদেশবাসিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সেটি এই—আমরা যেন চিন্তার জগতেও বিদেশীয়দিগের সমক্ষে সোজা হইয়া দাঁড়াইতে পারিতেছি না। তাহারা আমাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন—"থাম! থাম! তোমাদের দ্বারা বড় বা ভাল কিছু হইতে পারে না; তোমরা বর্বর ও চিন্তাশক্তিহীন জাতি; বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্মনীতি প্রভৃতি বিষয়ে এক সময়ে তোমরা যাহা কিছু করিয়াছ তাহা কিছুই নহে; এখনও ও সকল সম্বন্ধে তোমরা যে বেশি কিছু করিবে তার আশা নাই, তোমরা সর্বদা আমাদের অনুবর্তী হও; আমাদের চরণে বসিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্ম প্রভৃতি শিক্ষা কর।" এই কথা শুনিয়া আমরাও মনে করিতেছি আমাদের দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞান ধর্মাদি সম্বন্ধে ভাল বা বড় কিছু হয় নাই এবং হইতে পারে না , ধর্মাদি বিষয়েও আমাদিগকে পাশ্চাত্য জগতের চরণে বসিতে হইবে—এইটাই আমাদের জাতীয় হীন-চিত্ততা। এইটিই এই বিদেশীয় অধিকারের দ্বিতীয় গুরুতর অনিষ্ট ফল। বিদেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদিগকে যেন সামলাইতে দিতেছে না। যেন আমরা নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় পাইতেছি না; একটু নিরিবিলি হইয়া বসিয়া যে একটা কিছু ভাবিব তাহার যেন সময় পাইতেছি না! আমাদের চিত্তাক্ষেত্রে প্রতিদিন নূতন নূতন বিষয় আসিয়া আমাদের চিত্তকে বহির্মুখ করিতেছে; আমরা নিবিষ্ট চিত্তে জ্ঞানের অনুসরণ করিতে পারিতেছি না। একান্ত মনে আত্মা ও পরমাত্মার চিন্তাতে রত হইতে পারিতেছি না। হায়! আমরা জাতীয় আত্মাদর হারাইয়া ফেলিতেছি।

এই জাতীয় আত্মাদর কিরূপে থাকে? আমরা কিছু হইতে পারি কিছু করিতে পারি—এই জ্ঞান কিরূপে আসে? এস্থলে একটি গুরুতর বিষয় বিবেচ্য আছে। ব্যক্তিগত আত্মাদরের মূল দেখিতে পাই, অতীতের উপরে সর্বদা নির্ভর থাকে। যে ব্যক্তি একটা কিছু করিয়াছে:—সে আর একটা কিছু করিতে সাহস পায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ঘোর দারিদ্র্যের মধ্যে জন্মিয়া পুরুষকারের গুণে উচ্চ পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। এই জন্যই তিনি বলিতে পারিয়াছিলেন—'দারিদ্র্যকে ডরাই না, আমার পথ আমি খুলিয়া লইব।" তেমনি মানুষ নিজ শক্তির পরিচয় অগ্রে না পাইলে সে শক্তির উপরে জোর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না। অতএব বর্তমান আত্মাদর অতীত মহত্ত্বের উপরে দণ্ডায়মান থাকে। অতএব এ দেশে জাতীয় আত্মাদর বর্ধিত করিতে হইলে এ দেশীয় অতীত মহত্ত্বকে জাতীয় স্মৃতিতে উদ্দীপ্ত করিতে হইবে ; আমরা এক সময় কিছু করিয়াছি এই জ্ঞানকে বাড়াইতে হইবে। আমাদের প্রাচীন গৌরব যাহা কিছু আছে তাহাকে বিদেশীয়গণ যে ভাবে নামাইয়া দিতে চাহিতেছেন সে ভাবে নামাইয়া দিতে দেওয়া হইবে না; তাহাকে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

কিন্তু তাহা করিতে গিয়া আর এক বিপদকে পরিহার করিতে হইবে। সে বিপদ এই—পরপদদলিত জাতিরা অনেক সময়ে একদিকে আঘাত পাইয়া অপরদিকে অতিরিক্ত মাত্রায় ঝুঁকিয়া পড়ে। বর্তমানকে অন্ধকারময়ও নৈরাজ্যপূর্ণ দেখিয়া অতীতকে অতিরিক্ত মাত্রাতে আশ্রয় করে। আমাদের যাহা ছিল ভাল ছিল, তাহার মত আর হইতে পারে না, আমাদের ন্যায় কোন জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে? আমরা কি না করিয়াছি বিজ্ঞান-দর্শনে, ধর্ম-কর্মে, আমাদের মত প্রাচীনে কোন জাতি হইয়াছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। "পূর্বে আমরা অনেক করিয়াছি" এই জ্ঞান হইতে "আমাদের করিবার

কিছু নাই", এই জ্ঞানে স্খলিত হইয়া পড়া অতি সহজ। তাহা হইলেই মানুষ সর্ববিধ উন্নতি-বিমুখ হইয়া পড়ে। তাহা হইলে আর জাতীয় উন্নতির আশা থাকে না।

অতীতের প্রতি আস্থা ভাল—কিন্তু অতীত-পূজা ভাল নহে। ফ্রান্স, জার্মানি, যুক্ত-রাজ্য প্রভৃতি পাশ্চাত্য জাতি সকল, এমন কি প্রাচ্য জাপান পর্যন্ত কোনও উন্নতিশীল জাতি স্বীয় স্বীয় অতীতের প্রতি আস্থাহীন নহে ; কিন্তু সে আস্থা তাহাদিগকে অপর জাতিদিগের ভাল বিষয় লইতে বিমুখ করে নাই। অপর দিকে চীন ও ভারতবর্ষে অতিরিক্ত মাত্রাতে অতীত-পূজা থাকাতে ইহারা অপর জাতি সকলের নিকট হইতে ভাল বিষয় কিছু লইতে পারিতেছেন না; সর্ববিধ উন্নতির প্রতি বিমুখ হইয়া রহিয়াছেন। বলিতে গেলে এই দুই দেশে অতীত-পূজার প্রতি অধিক ঝোঁক না দিয়া, বর্তমান ও ভাবী উন্নতির প্রতি অধিক ঝোঁক দিলে ভাল হয়।

কিন্তু কেহ হয়ত প্রশ্ন করিবেন, অতীতের প্রতি আস্থা হইতে অতীত-পূজার পার্থক্য কোথায়? উত্তর—অতীতের প্রতি আস্থা যখন এরূপ উৎকট কোটিতে যায়, যে তাহা বর্তমান উন্নতির পথ-রোধ, এবং মানবের চিন্তাশক্তিকে খর্ব করে, তখন তাহা অতীত-পূজাতে দাঁড়ায়। মানুষ যখন অতিরিক্ত মাত্রাতে অতীতের দোহাই দেয় তখন বোঝা যায় যে, সে স্বাধীনচিন্তার শক্তি হারাইয়াছে। তাই বলিয়াছি অতীত-পূজা ভাল নহে, অতীতের প্রতি আস্থা ভাল। প্রথম প্রথম ইংরাজি শিক্ষা এদেশীয়দিগকে স্বজাতির অতীতের প্রতি অতিরিক্ত মাত্রাতে আস্থাহীন করিয়াছিল। কিছুদিন হইতে তাহারই প্রতিক্রিয়া চলিতেছে। মার্কিন সাধু এমারসন একস্থানে বলিয়াছেন 'সত্য এমনি জিনিস যে যদি তুমি অসাবধানতাবশতঃ তাহা পথে ফেলিয়া যাও, তোমাকে পিছাইয়া কুড়াইয়া লইয়া আসিতেই হইবে।" বর্তমান শিক্ষিত দলের চিত্তে যেন তাহাই দেখিতেছি। তাহাদের অগ্রগামী ব্যক্তিগণ এক সময় অসাবধানতাবশতঃ যাহা পথে ফেলিয়া গিয়াছিলেন, তাহাই তাহারা পিছাইয়া কুড়াইয়া লইতে আসিতেছেন।

যাহা হউক, এই স্বাভাবিক ক্রিয়ার আলোচনাতে আর অধিক সময় না দিয়া প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। আমরা প্রবল প্রতিপক্ষগণের সমক্ষে চিন্তারাজ্যে স্বাধীনভাবে দাঁড়াইতে পারি—এই জ্ঞানটা স্বদেশীয়দিগের মনে বর্ধিত করা আবশ্যক হইয়াছে। ইহা করিতে গেলেই দেখা যাইবে বিদেশীয়দিগকে ভুলিয়া গিয়া আমাদের কি করিবার আছে, আমাদের দ্বারা কতদূর হইতে পারে, সেই বিষয়ে মনোনিবেশ করা উচিত।

আমরা কিছু করিব, আমরা কিছু করিব, এরূপ একটা ধূয়া তুলিয়া দিতে পারিলেও ভাল হয়। শিল্প-শিক্ষার জন্য এদেশীয় যুবকদিগকে জাপান প্রভৃতি দেশে পাঠাইবার যে চেষ্টা হইতেছে তাহা এইরূপ একটা ধূয়া তুলিবার পক্ষে অনেক সহায়তা করিবে। রবিবাবু "স্বদেশি সমাজ, স্বদেশি সমাজ" বলিয়া যে আন্দোলন তুলিয়াছেন, তাহাও এইরূপ একটা ধূয়া তুলিবার পক্ষে বিশেষ সহায় বলিয়া মনে করি। কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্যে একটি বিষয় দেখিয়া কিছু ক্ষুণ্ণ হইতেছি। ইহারা অকারণ কংগ্রেসপক্ষীয়দিগের সহিত বিরোধ উৎপন্ন করিতেছেন। যেন স্বাধীনভাবে স্বদেশের উন্নতিসাধনের চেষ্টা ও কংগ্রেসের আন্দোলন ইহার মধ্যে কোনও বিবাদ আছে। আমি ত ইহার মধ্যে কোনও বিবাদ দেখিতে পাই না। কংগ্রেস রাজদ্বারে আঘাত করিয়া যে স্বদেশের জন্য বিশেষ কোন অধিকারলাভ করিতে পারিবেন তাহার অধিক আশা নাই। আর তাহা না করাতে যে ভগ্নহৃদয় বা নিরাশ হইতে হইবে তাহাও নহে। কংগ্রেস তিনটি মহাকার্য সাধন করিতেছেন, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারেন না ; এবং সে জন্য কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা আছে।

প্রথম দেশবাসিদিগকে আপনাদের বর্তমান রাজনীতিতে মনোযোগী করা, এবং বর্তমান সুখ-দুঃখে অভিনিবিষ্ট করা। কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় সকল সংবাদপত্রের স্তম্ভ দিয়া আপামর সাধারণ সকলের নিকট উপস্থিত হইতেছে, এবং সকলকেই রাজনীতির ভালমন্দ বিচারে অভ্যস্ত করিতেছে। ইহা একটি মহোপকার, কারণ যে দেশের অধিকাংশ লোক আপনাদের দেশের

শাসনকার্য ও তৎসক্রান্ত সদসৎ বিষয়ের আলোচনাতে বিমুখ ও উদাসীন সে দেশে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না ; এবং হইলেও সুফল প্রসব করে না।

দ্বিতীয় মহোপকার কংগ্রেসের অধিবেশন ও আলোচনা দেশের লোকের মনে স্বদেশপ্রেম জাগাইতেছে। লোকে যখন দেখিতেছে, দেশের সকল প্রদেশের ভাল ভাল লোকেরা স্বদেশের কল্যাণোদ্দেশে অর্থের ক্ষতি ও শ্রম স্বীকার করিয়া সকলে সমবেত হইতেছেন ; তখন স্বতঃই লোকের মনে স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত হইতেছে। ইহা কি কম উপকার? বলিতে কি কংগ্রেস, এত বৎসর কার্য না করিলে, স্বদেশি সমাজ বলিয়া একটা কথাই উঠিতে পারিত না।

কংগ্রেসের তৃতীয় কার্যটিও সামান্য নয়। ইহা বর্ষে বর্ষে বিভিন্ন প্রদেশের, বিভিন্ন সামাজিক অবস্থার, বিভিন্ন ধর্মের ব্যক্তিগণকে এক স্বদেশানুরাগসূত্রে আবদ্ধ করিয়া একস্থলে আনিয়া উপবিষ্ট করিতেছে। তাহারা কংগ্রেস মণ্ডপে সমবেত হইয়া অতি প্রবলরূপে অনুভব করিতেছেন যে, তাহারা এদেশের লোক, তাহাদের সুখ দুঃখ এক, তাহাদের আশা ও আকাঙ্ক্ষা এক। তাহাদের প্রাপ্য অধিকার এক। ইহা ভারতীয় একতা প্রবৃত্তিকে অদ্ভুতরূপে বর্ধিত করিতেছে। আমি এই ভারতীয় একতা সাধনকে কংগ্রেসের মহামূল্য কার্য বলিয়া মনে করি।

অতএব বলি স্বদেশি সমাজ যদি করিতে চাও কর, এদেশের শক্তিতে, এদেশের চেষ্টাতে, এ দেশের উপাদানে যতদূর হয় করিবার চেষ্টা কর, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার নাই। ফল কথা এই—যেমন করিয়া পার, "আমাদের দ্বারা কি হয় দেখি", এই ধূয়াটা তুলিয়া দেও। ধূয়া তুলিয়া দেওয়া একটা মস্ত কথা! ইহাতে আর কিছু না করুক যদি সকল বিষয়েই পাশ্চাত্যরাজ্যের দিকে চাওয়াটা ঘুচায় তাহা হইলেই মহালাভ। এই ধূয়াটা তুলিবার জন্য আমার একটি প্রস্তাব আছে, তাহা বলিতেছি। এই প্রস্তাবকে কার্যে পরিণত করিবার জন্য কাজে কিছু করা আমার শরীরের বর্তমান অবস্থাতে সাধ্যায়ত্ত নহে। ইহা দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের বিচারার্থ অর্পণ করিতেছি।

প্রস্তাব

১ম, জাতীয় সকল প্রদেশের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়া "জাতীয় স্বাবলম্বন সভা" নামে একটি সভা স্থাপিত হউক।

২য়, প্রত্যেক প্রদেশের রাজধানীতে ইহার প্রাদেশিক শাখা সভা সকল স্থাপিত হউক।

৩য়, প্রাদেশিক শাখা সকল প্রধানতঃ ছয় বিভাগে বিভক্ত হইয়া কার্য করুক।

ক. শিল্প বাণিজ্য বিভাগ।

খ. জ্ঞান-বিজ্ঞান বিভাগ।

গ. সাহিত্য বিভাগ।

ঘ. রাজনীতি বিভাগ।

ঙ. সমাজ ও নীতিবিভাগ।

চ. দৈহিক বিভাগ।

৪র্থ, প্রত্যেক বিভাগে স্বদেশীয়দিগের দ্বারা যে কিছু উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার উপায় আবিষ্কার করা, তাহাতে উৎসাহ দেওয়া, ও তাহার ফল সংগ্রহ করা, ও সেই ফল সকলের গোচর করা, ঐ সকল প্রাদেশিক শাখার প্রধান কার্য হউক।

৫ম, প্রত্যেক পাঁচ বৎসর অন্তর বিশেষ বিশেষ নির্দিষ্ট স্থানে এই স্বাবলম্বন সভার মহামেলা করিবার নিয়ম প্রবর্তিত হউক। তাহাতে বিদেশীয়দিগকে সভাপতি হইবার জন্য ডাকা হইবে না। এ দেশীয়গণই তাহার সকল কার্য করিবেন। তাহাতে কংগ্রেসের অধিবেশন হইবে, শিল্প প্রদর্শনী থাকিবে, বিজ্ঞানাদির প্রদর্শন থাকিবে, ব্যায়াম-কুস্তী, ক্রীড়া প্রভৃতির প্রদর্শনী থাকিবে। এবং পূর্ববর্তী

পাঁচ বৎসরে দেশের যে কোনও প্রদেশে স্বজাতীয়দিগের চেষ্টাতে, স্বজাতীয়দিগের যে কোন উন্নতি সাধিত হইয়াছে, তাহার বিবরণ প্রকাশ করা হইবে।

ইংলণ্ডের লোকে বর্তমান কংগ্রেসকে অতি হীন চক্ষে দেখিতেছেন। তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহারা দেখিতেছেন যে আমরা যে দেশ হইতে ব্রাডলা, ওয়েডারবরণ, কটন প্রভৃতিকে না ডাকিয়া কংগ্রেস করিতে পারিতেছি না, যে কারণে কংগ্রেসের নেতৃগণ ইহা করিতেছেন তাহা জানি। তাহারা জানেন যে ইংলণ্ডের লোককে বুঝাইতে না পারিলে, আমরা এদেশের লোকের প্রাপ্য অধিকার লাভ করিতে পারিব না। ইংলণ্ডের লোককে বুঝাইবার প্রধান উপায় সে দেশের রাজনীতিজ্ঞ নেতৃবৃন্দের মধ্যে একদল ভারতহিতৈষী প্রস্তুত করার প্রধান উপায়। ইহা সত্য, কিন্তু ইংলণ্ডের লোকে এরূপ কার্যের প্রতি বড় আস্থা রাখেন না। তাহারা জাতীয় স্বাধীনতাতে বর্ধিত, জাতীয় স্বাধীনতার পক্ষপাতী। ভারতবর্ষীয়গণ স্বাধীনভাবে কি করিতেছে ও কি চাহিতেছে তাহাই তাহারা দেখিতে চান। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। ১৮৮৮ সালে ইংলণ্ডে যখন বাস করি তখন একদিন কথোপকথনের মধ্যে কংগ্রেসের উল্লেখ করাতে সে দেশীয় একজন ভদ্রলোক বলিলেন—"That Congress is no good ; it is Hume driving the couch and you like your zenana ladies sitting inside ; Englishmen don't admire that sort of thing"— ইংরাজেরা এভাব পছন্দ করেন না।

আমি যে স্বাবলম্বন সভার প্রস্তাব করিতেছি তাহাতে বিদেশীয়গণ সাহায্য করিবেন না। তাহা সম্পূর্ণরূপে এদেশীয়দিগের কার্য হইবে। আমার মনে হয় যদি এরূপ একটি সভার আয়োজন করা যায়, তাহা হইলে আমরা একটা স্বদেশি ধূয়া তুলিয়া দিতে পারি ; এবং তদ্দ্বারা ভারতীয় একতাও আশ্চর্যরূপে সাধিত হইতে পরে।

প্রবাসী ১৩১২, *আষাঢ়*

২. জাতীয় একতা

একটি প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধ আরম্ভ করি। আমাদেব বাসগ্রামের একজন অজ্ঞ ও অশিক্ষিত দোকানদার একবার আমার সহিত কলিকাতা আসিতে পথে আমাকে বলিল—"অনেক দিনের পর ভাগ্যক্রমে মশাই-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, আমার একটা সন্দেহভঞ্জন করতে হবে।"

উত্তর—বল কি সন্দেহ?

প্রশ্ন—জগতের ত একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন? আপনি কি বলেন?

উত্তর—অবশ্য তাতে আবার কি সন্দেহ?

প্রশ্ন—আচ্ছা তিনি ত দয়াময়?

উত্তর—তাতেও সন্দেহ নাই।

প্রশ্ন—তবে কেন তিনি দেশটা বিদেশির হাতে দিলেন?

উত্তর—আচ্ছা মনে কর, তোমার একটি জমিদারি আছে। তুমি জমিদারিতে গিয়া সেখানকার কয়েকজন লোককে নিযুক্ত করিয়া তাহাদের উপরে জমিদারি দেখিবার ও প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার ভার দিয়ে এলে। মনে আশা রহিল যে তাহারা তোমার জমিদারির উন্নতি করিবে, এবং প্রজাদিগের কুশল দেখিবে। তার পর কিছু দিন বাদে তোমার নিকট সংবাদ এল যে, ঐ কতিপয় ব্যক্তি তোমার জমিদারির উন্নতিতে মনোযোগী না হয়ে স্বার্থসাধানের জন্য পরস্পরের সহিত বিবাদ কলহে তোমার জমিদারি নষ্ট করছে এবং প্রজাদের ঘোর দুঃখ উৎপন্ন করছে; তখন তুমি কি কর?

প্রশ্ন—আমি একজন জবরদস্ত নায়েব পাঠিয়ে দি, যে গিয়া সেই সকল ব্যক্তিকে পদচ্যুত করে দমনে রাখে, এবং প্রজাদের কুশল দেখে।

উত্তর—ঈশ্বর এই কাজ এদেশে করিয়াছেন। এ দেশটা বহুকাল এ দেশের রাজাদের হাতে ছিল। দেশীয় শাসনকর্তারা দেশের উন্নতির দিকে মনোযোগী না হইয়া স্বার্থসিদ্ধির জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে দেশ উৎসন্নে দিয়াছিল; এবং প্রজাদের ঘোর দুঃখ উৎপন্ন করিয়াছিল; সেই জন্য ঈশ্বর এক জবরদস্ত জাতিকে পাঠাইয়াছেন, যাহারা এই স্বার্থপর ও স্বদেশের অনিষ্টকারি রাজাদিগকে পদচ্যুত করিয়া, দেশে শান্তিস্থাপনপূর্বক দেশের উন্নতি ও প্রজাদের কুশল বিষয়ে মন দিতেছে।

প্রশ্ন—আজ্ঞে ঠিক বলেছেন! আমার এতদিনের ধোঁকাটা ভাঙিয়া গেল, দেশ ত বিদেশির হাতে, এটা ঈশ্বরের প্রদত্ত, সাজা বটে দয়াও বটে।

উত্তর—তাতে সন্দেহ কি? মনে কর দেশে যদি শান্তি ও সুশাসন না থাকিত, তুমি কি আজ নিরুদ্বেগে কলিকাতাতে জিনিসপত্র কিনিতে যাইতে পারিতে? আমি যে শিক্ষা পাইয়াছি তাহা কি পাইতাম?

প্রশ্ন—ঠিক ঠিক! দেশ যে বিদেশির হাতে আছে এটা ঈশ্বরের ইচ্ছা; এবং যতদিন দেশের লোকের চোখ না ফোটে, যতদিন তারা আপনার কল্যাণ আপনি না দেখে, ততদিন এরা থাকাই ভাল।

উত্তর—থাকাই ভাল কি, থাকবেই; ঈশ্বর এ দেশকে আবার তুলিবার জন্য এই আয়োজন করেছেন।

ক্ষণিক কথোপকথনে আমার স্বগ্রামবাসী দোকানদারকে যাহা বলিয়াছিলাম, তাহা কি সত্য নহে। যদি কোনও দেশে সকলের শীর্ষস্থানে এক প্রবল রাজশক্তি বিদ্যমান থাকা আবশ্যক হয়, তাহা এই ভারতবর্ষে। ইহার বিভিন্ন প্রদেশীয় প্রজাপুঞ্জের মধ্যে ধর্মগত, ভাষাগত, সামাজিক রীতিনীতিগত কতই বৈচিত্র্য রহিয়াছে। সাম্প্রদায়িক বৈরভাব, সামাজিক বৈরভাব, প্রাদেশিক বৈরভাব, এখনও ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রধূমিত রহিয়াছে। এই সকলকে দমনে রাখিয়া, শান্তি ও সুশাসন স্থাপনপূর্বক, অপক্ষপাতে ন্যায়দণ্ড ধারণ করিবার জন্য একটি শক্তি রহিয়াছে। ইহা কি দেশের বর্তমান অবস্থাতে মহোপকারক নহে? ইহা কি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা নহে? কেবল শান্তি ও সুশাসন নহে, এই শাসন শক্তির অধীনে আমরা জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প বাণিজ্য, কলা সাহিত্য সকলি বিকাশ করিবার অবসর পাইতেছি। ইহারই সাহায্যে জাতীয় জীবনে নব আকাঙ্ক্ষার অভ্যুদয় দেখিতেছি। গড়ের উপরে এ কথা কি সত্য নহে, যে আমাদের দেশের প্রাচীন সামাজিক বিধি ব্যবস্থা যেরূপ দাঁড়াইয়াছে তাহা জাতীয় নব জীবনের অনুকূল নহে? বদ্ধ জলে নূতন স্রোত প্রবেশের ন্যায় জাতীয় চিত্তে নবভাব ও নব আকাঙ্ক্ষার অভ্যুদয় ভিন্ন জাতীয় নবজীবনের সম্ভাবনা নাই। ইংলণ্ডের সমাগম সেই পুরাতন বাঁধ ভাঙিয়া নূতন চিন্তা প্রবিষ্ট করিতেছে।

ফলতঃ মঙ্গলময় ঈশ্বরের এই বিধি দেখা যাইতেছে, যে ভারতবাসি আবার উঠিবে, নবলোকে আবার নব দিন দেখিবে;—ইংরাজ তাহার সহায় মাত্র। ইংরাজ যাহা কিছু করিবেন তাহাতে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। যদি তাহারা এদেশীয়দিগের অনুকূল হইয়া তাহাদের উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হন তাহাতে এই নবদিনকে শীঘ্র শীঘ্র আনিবে; এবং তাহারা জগতের ইতিবৃত্তে পরাজিত জাতির নবজীবনদাতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন; আর যদি আমাদের প্রতিকূল হইয়া সমুদয় উন্নতির পথে অন্তরায়স্বরূপ দণ্ডায়মান হন, তাহাতে নবজীবনের দিন আসিতে বিলম্ব হইবে; এবং তাহারা আপনাদের অন্যায়কারিতার শাস্তি ভোগ করিবেন। সংকীর্ণচেতা রাজ-পুরুষদিগের রাজনীতি এখন যতই পশ্চাদ্‌গামিনী হইতে চাহুক না কেন, আমরা দেখিতেছি ভারতকে নবজীবন দিবার জন্য এত প্রকার শক্তি কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছে, যাহার সকলগুলিকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্তাধীন করা তাহাদেরও সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভারত নবজীবন পাইবে।

এরূপ আশা করিবার আর একটি বিশেষ কারণ আছে। সকলে চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন

যে, স্বায়ত্ত-শাসন শিক্ষা করিবার একটি প্রধান উপায় ইংলণ্ডের সংস্রব। তাহারা স্বায়ত্তশাসনে বর্ধিত, স্বায়ত্ত-শাসনের ভাব তাহাদের অস্থিমাংসে, স্বায়ত্তশাসনের ভাব তাহাদের রাজনীতির শিরাতে মজ্জাতে, তাহারা যতই সাম্রাজ্যলোলুপ হউন না কেন শাসনকার্যে সে সকল ভাব একেবারে বর্জন করিতে পারিবেন না। তাহার প্রমাণ রুষিয়া আজিও স্বীয় প্রজাবর্গকে যে সকল অধিকার দিতে সাহস করিতেছেন না, তাহা আমরা পাইয়াছি। ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা, প্রকাশ্য সভাদি করিবার স্বাধীনতা, নিরপেক্ষ আইন-আদালত প্রভৃতির আশ্রয় এ সমুদয় আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যদি সজাগ থাকি, আমাদের সুখ-দুঃখ যথাযথরূপে যদি বিদিত করিতে পারি, তাহাদের প্রদত্ত অধিকার ও তজ্জনিত দায়িত্বের সমুচিত ব্যবহার যদি করিতে পারি, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা জগতের অগ্রসর চিন্তা সকলের অংশী যদি হইতে পারি, স্বার্থনাশ ও স্বদেশ-হিতৈষণার দ্বারা যদি শ্রদ্ধেয় হইতে পারি, আমাদিগের প্রাপ্য অপরাপর অধিকার না দেওয়া তাহাদের পক্ষে সম্ভব থাকিবে না। দলাদলিতে তাহাদের রাজকার্য চলে;—সুতরাং এক দলে যাহা না দিবেন, আমরা সজাগ থাকিলে অপর দলের নিকট হয়ত তাহা পাইব। এরূপ আশা করা যাইতে পারে।

তবে এই সকল অধিকার আমাদিগকে নিয়মতন্ত্রাধীন আন্দোলন দ্বারা লাভ করিতে হইবে। **বিপ্লব ও অরাজকতা ইহার প্রকৃষ্ট পথ নহে। তদ্দ্বারা হঠকারী ব্যক্তিদিগের স্বার্থসাধনের সুযোগ দেওয়া হয়। এবং স্বাধীনতার নামে পরাধীনতাকে আনয়ন করা হয়। নিয়মতন্ত্রাধীন আন্দোলন বহুকালসাপেক্ষ তাহাতে সন্দেহ নাই; তাহাতে বিশেষ ধৈর্য সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ; কিন্তু তদ্দ্বারা জাতীয় চরিত্রে কর্তব্যনিষ্ঠা ও দৃঢ়তা বর্ধিত হয়; এবং জাতীয় জীবনে স্বায়ত্ত-শাসনের শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয়।** ইংলণ্ডের ইতিহাস ইহার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

ইংরাজ অনিচ্ছাসত্ত্বেও আর একটি কাজ করিতেছেন। ভারতীয় জাতি সকলের মনে একতা প্রবৃত্তি প্রবল করিয়া দিতেছেন। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই জন্যে বলিতেছি—তাহাদের রাজনীতির গতি যেরূপ দেখিতেছি, তাহাতে এরূপ একতা-প্রবৃত্তি যাহাতে বর্ধিত না হয়, ভারতের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীগণ যাহাতে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হয়, সেই যেন তাহাদের চেষ্টা। কিন্তু এই ভেদ ক্রিয়ার সাহায্যে দেশকে শাসন করা যতই তাহাদের লক্ষ্য হউক না কেন, দেশের সকল শ্রেণির লোকের মনে দুইটি ভাব দিন দিন বর্ধিত হইতেছে দেখিতে পাইতেছি। প্রথম ভাবটি এই দেশের বিকাশ ও উন্নতি বিষয়ে রাজাদের সাহায্যের আশা অল্প; সুতরাং আমাদিগকেই আত্মোন্নতি সাধনে প্রধান রূপে মনোযোগী হইতে হইবে। দ্বিতীয় ভাবটি এই—জাতীয় একতাসাধন করিতে না পারিলে আমরা দাঁড়াইতে পারিব না। যতদূর বুঝিতে পারিতেছি লর্ড কার্জনের গবর্নমেন্ট অজ্ঞাতসারে এই দুইটি ভাব জাতীয় চিত্তে বিশেষরূপে বর্ধিত করিয়াছেন। এই গবর্নমেন্ট দেশের লোককে জানিতে দিয়াছেন যে, বৃটিশ রাজ্য স্থাপনাবধি বিগত দেড় শত বৎসর উন্নতির অভিমুখে দেশের যে গতি হইয়াছে, সম্ভব হইলে অনেক বিষয়ে তাহা রোধ করিতে তাহারা ইচ্ছুক। তাহারা পরিষ্কাররূপে এদেশবাসীদিগকে বুঝিতে দিয়াছেন যে, তাহাদের স্বার্থের সঙ্গে যেখানে বিরোধ, সেখানে তাহারা এদেশীয়দিগের উন্নতির প্রতি বিমুখ। এই সংস্কার যে পরিমাণে প্রবল হইতেছে সেই পরিমাণে পূর্বোক্ত দুই ভাব এদেশীয়দিগের মনে প্রবল হইতেছে। হয়ত আমরা তাহাদিগকে বুঝিতে ভুল করিতেছি। তাহারা হয়ত ভাবিতেছেন যে বিগত দেড়শত বৎসর অনেক বিষয়ে দেশ যেরূপ দ্রুত গতিতে চলিয়াছে, এতটা দ্রুত গতি ভাল হয় নাই; প্রাচ্য দেশে প্রতীচ্য কার্যপ্রণালী প্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে আরও ধীরে ধীরে চলিতে হইবে; এই জন্য তাহারা কোনও কোনও বিষয়ে পশ্চাদগামী হইতে চাহিয়াছেন। উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তাহাদের অবলম্বিত রাজনীতির ফল এই ফলিতেছে যে, প্রজাগণ তাহাদের উপরে আশা রাখিতে পারিতেছেন না। জেতা বিজিতের পার্থক্য আমরা এখন যেমন উজ্জ্বলরূপে অনুভব করিতেছি, অগ্রে কখনই এরূপ করি নাই। যাহা হউক, এই যে **জাতীয় স্বাবলম্বন-প্রবৃত্তি ও জাতীয় একতা প্রবৃত্তি, জাতীয় নব-জীবনের পক্ষে এই দুইটিই**

অতীব প্রয়োজনীয়। জাতীয় স্বাবলম্বন সম্বন্ধে মনের ভাব অগ্রে "স্বদেশি ধূয়া" নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছি; জাতীয় একতা সম্বন্ধে অদ্য কিছু বলিবার অভিপ্রায় আছে।

জাতীয় একতার অশেষ গুণ। মনে কর এদেশের সাধারণ লোকে ধর্মঘট করিয়া যদি আজ প্রতিজ্ঞা করে যে, কেহ ইংরাজের ঘরে চাকর হইবে না, খিদ্‌মদ্‌গার চাপরাশি বা খানসামা হইবে না, তাহা হইলে ইংরাজদিগকে হয় দাসত্ব প্রথা প্রবর্তিত করিয়া প্রাচীন রোমানদিগের ন্যায় কণ্টক শয্যায় শয়ন করিতে হয়, না হয় আফ্রিকা প্রভৃতি দেশ হইতে ভৃত্য আমদানি করিয়া কাজ চালাইতে হয়; ফলতঃ তাহাদের এখানে বাস করিয়া কার্য করা কঠিন হয়। আমরা বঙ্গদেশে দেখিয়াছি কৃষকগণ এইরূপ ধর্মঘট করিয়া দেশকে নীলকর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়াছে। রাজারা নীলকরদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়াও কিছু করিতে পারেন নাই। অত্যাচারের শাস্তি আপনা-আপনি আসিয়াছে। ভারতীয় সাধারণ প্রজাকুলের পক্ষে এরূপ করা সম্ভব বা করা কর্তব্য তাহা বলিতেছি না। কেবল মাত্র একতা দ্বারা কি হইতে পারে, তাহার দিঙ্মাত্র প্রদর্শন করিতেছি। ফল যথা এই—সহস্র প্রভেদসত্ত্বেও দেশবাসীগণ যতদিন স্বদেশের উন্নতি সাধন বিষয়ে সকলে সমবেতভাবে চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত না হইবেন ততদিন দেশের প্রকৃত উন্নতি হইবে না।

এক্ষণে বিচার্য এই, জাতীয় একতা সাধনের উপায় কি? অগ্রেই বলিয়াছি বিদেশীয় গবর্নমেন্টের প্রতি বিরাগবশতঃ দেশের লোকের মনে বিশেষতঃ শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মনে এক প্রকার একতা-প্রবৃত্তি বর্ধিত হইতেছে। এরূপ একতা প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক মনে করি না। এরূপ একতা প্রবৃত্তি জাতীয় জীবনের মূলদেশকে স্পর্শ করে না, অথবা জাতীয় চরিত্রের পবিত্রতা ও শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না। ইংলণ্ডের দলাদলি গবর্নমেন্টেও এরূপ একতা-প্রবৃত্তি আমরা প্রতিদিন লক্ষ্য করিয়া থাকি। বর্তমান সময়ে দেখিতেছি কনসারবেটিব্‌গণ লোকের অপ্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদিগকে পদচ্যুত করিবার জন্য লিবারেলগণ বদ্ধপরিকর হইতেছেন। এই কার্যে বিভিন্ন শ্রেণির বিভিন্নভাবাপন্ন মানুষের অদ্ভুত একতা দেখা যাইতেছে। এ একতা বিদ্বেষ প্রসূত, বিশেষ লক্ষ্য সিদ্ধির জন্য অভ্যুদিত, সে লক্ষ্যসিদ্ধ হইলে আর ইহা প্রবল থাকিবে না। ইহাতে স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা ও চিত্তের নিঃস্বার্থতা অপেক্ষা, বিশেষ দলের নিপীড়ন ও পরোক্ষভাবে স্বার্থসাধন অধিক মাত্রাতে আছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

ক্ষণিক কারণে সকল মানবসমাজেই এরূপ একতা মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া থাকে। আমরা সর্বদাই দেখিতেছি গ্রাম মধ্যে জলপ্লাবন প্রভৃতি দৈবদুর্বিপাক ঘটিয়া সমস্ত গ্রামের বিপদ যখন ঘটিতেছে, তখন গ্রামবাসীগণ আপনাদের দৈনিক বিবাদ বিসম্বাদ, ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রভৃতি ভুলিয়া গিয়া স্কন্ধের সহিত স্কন্ধ সংলগ্ন করিয়া সে বিপদুদ্ধার করিয়া লইতেছে। আবার সে বিপদ চলিয়া গেলে আপনাদের পুরাতন রীতির অনুসরণ করিতেছে। বিপদ ক্ষণকালের জন্য মানুষের প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া ফেলে। মানুষের কেন ইতর প্রাণীদেরও প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করে। ডাক্তার জর্জ স্মিথের লিখিত ডাক্তার ডফের জীবনচরিতে একটি আশ্চর্য ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। সে ঘটনাটি এই। ডাক্তার ডফ ১৮৩০ সালে এদেশে আসিয়া যখন কার্যারম্ভ করিলেন, তখন টাকির সুপ্রসিদ্ধ মুন্সী মহাশয়দিগের সাহায্যে সেখানে প্রচার ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহাদের মিশন গৃহটি একটি উন্নত ভূমির উপরে স্থাপিত হয়। ১৮৩৩ সালে সুন্দরবনে এক মহা সাইক্লোন উপস্থিত হয়। ঐ ঝড়ে সমুদ্রের জল উঠিয়া সুন্দরবন প্লাবিত হইয়া যায়। সেই প্লাবন টাকি পর্যন্ত প্রসৃত হইয়াছিল। সমুদয় গ্রাম জল প্লাবনে প্লাবিত হইয়া গেল, কেবল মিশন গৃহটি উন্নত ভূমির উপরে দণ্ডায়মান থাকিয়া বিপন্ন গ্রামবাসিগণকে আশ্রয় প্রদান করিল। এই মিশন গৃহটি যখন লোকাকীর্ণ, সকলে প্রাণভয়ে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে, তখন দেখা গেল যে একটি বাঘ প্রাণভয়ে জলে সাঁতার দিয়া মিশনগৃহের অভিমুখে আসিতেছে। বাঘটি অতি কষ্টে সাঁতরিয়া সেই উন্নত ভূমিতে উঠিল, এবং বিড়ালটির মত শান্তভাবে সেই ভিড়ের মধ্য দিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিল; এবং এক কোণে

গিয়া পড়িয়া ধুঁকিতে লাগিল। মিশনের কর্তারা এই অবস্থাতে আসিয়া তাহার কাণে বন্দুকের চোঙ্গ লাগাইয়া তাহাকে গুলি করিলেন।

বাঘ যে, সেও বিপদে পড়িয়া আপনার প্রকৃতিকে ভুলিয়া গিয়াছিল; মানুষের সঙ্গে এক স্থানে দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু কথা এই, সে কি চিরদিন সেইরূপ থাকিত? ঝড় থামিয়া গেলেই আবার নিজ মূর্তি ধারণ করিত। সেইরূপ, যে একতার মূলে কেবল বিদ্বেষ তাহা অধিক দিন থাকে না ; বা তাহা মানব-প্রকৃতিকে উন্নত করে না। সুতরাং যে স্বজাতি-প্রেম ওরফে ইংরাজ বিদ্বেষ, তাহার প্রতি অধিক আস্থা স্থাপন করিতেছি না।

এস্থলে কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, কেবল কি ইংরাজ-বিদ্বেষ বশতঃ একতা প্রবৃত্তি বর্ধিত হইতেছে? তাহা ত নহে; একতা প্রবৃত্তি বাড়িবার আরও অনেক কারণ বিদ্যমান। তাহা সত্য। (১ম) ইংরাজি শিক্ষাতে বিভিন্ন প্রদেশের যুবকগণের চিত্তসকলকে এক ছাঁচে ঢালিয়া গড়িতেছে; (২য়) সংবাদপত্র সকল বিভিন্ন প্রদেশের সুখ দুঃখ পরস্পরের গোচর করিতেছে, এবং চিন্তা ও ভাবের বিনিময়ের পক্ষে অদ্ভুত সহায়তা করিতেছে; (৩য়) রেলওয়ে স্টিমার প্রভৃতি গতায়াতের সুবিধা করিয়া দিয়া বিভিন্ন প্রদেশীয় মানবের সম্মিলন ও আত্মীয়তার দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিতেছে; (৪র্থ) ইংরাজের প্রধান কীর্তি যে পোস্ট আপিস তাহা ত্বরিতগতিতে এক প্রদেশের মানুষের চিন্তা আর এক প্রদেশে বহিয়া লইয়া যাইতেছে। (৫ম) সর্বোপরি সমগ্র দেশ এক রাজার অধীন হইয়া একই প্রকার আইন, আদালত, রাজশাসনের বশবর্তী হইয়া সামাজিক সুখ দুঃখে এক হইয়া যাইতেছে;—অর্থাৎ সমস্ত দেশ অগ্রে হিমালয়াদি প্রাকৃতিক প্রাচীরের দ্বারা একীভূত হইয়া যাইতেছে; এ সকল যে তলে তলে ভারতীয় জাতি সকলের চিত্তে একতা-প্রবৃত্তি বর্ধিত করিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে?

কিন্তু আমাদের এই সকল শক্তির উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকা কর্তব্য নহে—জাতীয় একতা বর্ধিত করিবার জন্য বিশেষ উপায় অবলম্বন করা উচিত। এই কথা যখন বলিতেছি, তখন এ কার্যের দুষ্করতাও বিশেষরূপে অনুভব করিতেছি। বর্তমান ভারতে জাতীয় একতা সাধন করা অসাধ্য ব্যাপার বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যখন দেখি (১) বিগত সেন্‌সস রিপোর্টে ৪৪০০ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উল্লেখ রহিয়াছে, যাহারা মিলিতভাবে আহার বিহার বা আদান-প্রদান করে না; (২) যখন দেখি এই এক ভারতে হিন্দি, পাঞ্জাবি, সিন্ধি, গুজরাটি, মারহাটি, কর্ণাটি, মালয়ালাম তামিল, তেলেগু, উড়িয়া, বাংলা, আসামি প্রভৃতি প্রধান প্রধান ও বহু সংখ্যক অপ্রধান ভাষা রহিয়াছে, (৩) যখন দেখি দশজন ব্যবসাদার এক মেলাতে গিয়া সর্বাগ্রে দশটি চৌকা বানাইতে বসিতেছে, (৪) যখন দেখি এখনও উন্নত বর্ণের লোকগণ নিকৃষ্ট জাতীয়দিগকে অস্পৃশ্য বোধে দূরে পরিহার করিতেছে, এমন কি তাহাদের ছায়া স্পর্শ করাকেও অপবিত্রতা ভাবিতেছে। (৫) যখন দেখি মহরমাদির সময়ে পুলিসের সহস্র সতর্কতা সত্ত্বেও হিন্দু মুসলমানের মধ্যে দাঙ্গা হাঙ্গামা ঘটিয়া রক্তপাত হইতেছে, তখন ভারতীয় একতার আশা স্বভাবতঃই ম্লান হইয়া যায়।

ইহার উপরে আবার তিনটি নূতন শক্তি দেখা দিয়াছে, যাহার গতি বিপরীত দিকে দৃষ্ট হইতেছে। প্রথম, বর্তমান রাজাদের রাজনীতি বিভিন্নপ্রদেশের ও সম্প্রদায়ের মানুষদিগের মনে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ উৎপাদন বিষয়ে সহায়তা করিতেছে। তাহারা বিহারিদিগকে বলিতেছেন—বাঙালিরা কেন তোমাদের মুখের গ্রাস হরিয়া লইয়া যায়? আমরা বাঙালিদিগকে বাধা দিতেছি, তোমরা অগ্রসর হইয়া এস; পাঞ্জাবিদিগকে বলিতেছেন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের লোক এখানে আসিবে কেন? মুসলমানদিগকে বলিতেছেন হিন্দুরা কেন সব লুঠিয়া খায়? শিখদিগকে বলিতেছেন—তোমরা কেন হিন্দুদের কাছে হারিয়া যাও? ইত্যাদি। তাহাদের বিদ্বেষ বুদ্ধিটা বাঙালিদের প্রতিই কিছু অধিক দেখা যাইতেছে। ইহার ফল হইতেছে যে, যেখানে ঈর্ষা ছিল না, সেখানে ঈর্ষা দেখা দিতেছে। এস্থলে ইহা স্মরণ করাইবার উপযুক্ত যে ইংলণ্ডে গবর্নমেন্ট কখনও

স্বপ্নও দেখেন না, যে স্কটল্যাণ্ডে ইংরাজ যাইবে না, বা ইংলণ্ডে স্কচ কর্ম পাইবে না, বা ওয়েলসবাসিদিগকে ইংরাজ তাড়াইয়া রক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশেই ইংরাজের রাজনীতি এই আকার ধারণ করিতেছে। দুঃখের বিষয় এই, তাহারা কিছু পরিমাণে কৃতকার্যও হইতেছেন; ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসিগণের মনে ঈর্ষা ও বিদ্বেষ দেখা দিতেছে।

এই এক একতা বিরোধী শক্তি। **দ্বিতীয় শক্তি হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের নামে বর্ণভেদের পুরাতন প্রাচীরগুলিকে পুনঃসংস্কার করিয়া তুলিবার চেষ্টা।** কিছুদিন হইতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণির মানুষ প্রাচীন ধর্মকে পুনরুত্থিত ও সবল করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছে। তাহাদের এই আকাঙ্ক্ষার যথেষ্ট কারণ আছে। তাহারা দেখিয়াছেন যে হিন্দুদিগের প্রাচীন আধ্যাত্মিকতা বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। যে জাতি ধর্মপ্রাণতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল, সেই জাতি ধর্মভাবহীন হইয়া যাইতেছে। এক্ষণে উপায় কি? যেমন করিয়া পার প্রাচীন ধর্মভাব সকলকে রক্ষা কর। প্রাচীন ধর্মভাবকে রক্ষা করিতে গিয়া তাহারা জাতিভেদ প্রথাকে রক্ষা করিতে ও পুনরায় দৃঢ় করিতে বাধ্য হইতেছে। কারণ প্রাচীন ধর্ম জাতিভেদ প্রথার উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার সহিত অভিন্নভাবে জড়িত। এই যে জাতিভেদের প্রাচীরকে পুনর্গঠনের চেষ্টা ইহার পরোক্ষ ফল এই দেখিতেছি যে, প্রত্যেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি বা বর্ণ আপনাদের সীমান্তরেখা আবার পরিষ্কার করিয়া আঁকিবার চেষ্টা করিতেছেন। কায়স্থ সভা, সুবর্ণবণিক সমিতি, তন্তুবায় সমিতি প্রভৃতি প্রতিদিন দেখা দিতেছে। এরূপ বিভিন্ন বর্ণের ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া নিজ নিজ বর্ণের মধ্যে শিক্ষা ও জ্ঞানবিস্তার করিয়া স্বদেশের উন্নতি সাধনে সহায় হন তাহাতে দুঃখ করিবার কিছুই নাই, এবং অনেকস্থলে যে তাহা হইতেছে না তাহাও বলা উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু **অনেকস্থলে দেখিতেছি আবার পুরাতন অধিকার, পুরাতন পার্থক্য, পুরাতন রীতি নীতি পুনরুত্থিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। এইরূপে এই সকল পুনরুত্থান চেষ্টার গতি একতার দিকে না গিয়া পার্থক্যের দিকে যাইতেছে।**

তৃতীয়তঃ আমাদের এমনি দুর্ভাগ্য যে ধর্মসংস্কারের জন্য যে আর্যসমাজ অভ্যুদিত হইয়াছে, তাহাও বৈদিক ধর্মকে পুনরুত্থিত করিতে গিয়া হিন্দু মুসলমানের প্রাচীন বিদ্বেষকে ঘনীভূত করিতেছে; এবং সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতাকে প্রসব করিয়া ভারতীয় একতার পথে অন্তরায় স্বরূপ হইতেছে।

এখন উপায় কি? এই সকল বিরুদ্ধ শক্তিকে ভুলিয়া উপায় চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইলে হইবে না। এগুলি মনে রাখিয়া উপায় চিন্তাতে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইংলণ্ডে দুইশত প্রকার সাম্প্রদায়িক বিবাদ সত্ত্বেও একতা আছে। জাপানে শিন্টো ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, খ্রিস্টিয় ধর্ম প্রভৃতি সহস্র প্রভেদ সত্ত্বেও একতা আছে। স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনার উপায় অবলম্বন করিতে পারিলে, অনিবার্যরূপে একতা প্রবৃত্তি বর্ধিত হইবে। অগ্রে একতা প্রবৃত্তির উন্মেষের যে সকল কারণ উল্লেখ করিয়াছি, তাহা ত আছেই, সে জন্য আমাদিগকে অধিক ভাবিতে হইবে না। ইংরাজ গবর্নমেন্ট এখনও এদেশে বহুকাল থাকিবে এবং তাহাদের রাজনীতি যে কোনও কালে জাতীয় উন্নতির সম্পূর্ণ অনুকূল হইবে তাহা বলা যায় না ; সুতরাং এই বিদেশীয় সংস্রব-জনিত সংঘর্ষ ও তাহার পরোক্ষ ফল যে এদেশবাসিদিগের মধ্যে একতা প্রবৃত্তি বর্ধিত করিতেছে, তাহা থাকিবেই। আমাদিগকে এখন ভাবিতে হইবে এতদতিরিক্ত আমাদের কিছু আছে কিনা? আমাদেরও কিছু করিবার আছে। জাপানবাসিগণ কিরূপে আপনাদের মধ্যে অদ্ভুত একতা স্থাপনে সমর্থ হইয়াছে তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখা যাউক।

জাপানের উন্নতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই। ১৮৬৮ সালে তাহাদের পূর্ব প্রচলিত যোগুন গবর্নমেন্ট রহিত হইয়া মিকাডোর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপিত হয়। তৎপূর্বে জাপানবাসিগণ বিদেশীয় সংস্রবের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। এমন কি প্রধানমন্ত্রী মাকুইস ইতো একস্থানে বলিয়াছেন, ১৮৬৩ সালেও রাজবিধি বিদেশগমনের বিরোধী ছিল; এবং তাহাকে লুকাইয়া বিদেশ যাইতে হইয়াছিল। ১৮৬৮ সাল হইতে বিদেশীয় সংস্রবের বিরোধী রাজবিধি নিরাকৃত হইয়া উদার রাজনীতি অবলম্বিত হইল।

তদবধি নানা বিষয় অধ্যয়ন করিবার জন্য সম্ভ্রান্ত বংশীয় বহুসংখ্যক যুবককে প্রতিবর্ষে ইংলণ্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে প্রেরণের রীতি প্রবর্তিত হইল। জাপানের প্রধান পুরুষগণ বিদেশীয় সকল সভ্য জাতি সকলের রাজনীতি, সমাজনীতি, সামরিক নীতি, শিল্প, বাণিজ্য, কলা সাহিত্য প্রভৃতি অনুশীলন ও প্রয়োজনমত অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করিতে লাগিলেন। ১৮৭১ সালে দেশের প্রধান পুরুষদিগের পরামর্শে মিকাডো লর্ড ইবাকুরা নামক একজন প্রধান রাজ পুরুষকে দূত স্বরূপ নিয়োগ করিয়া, কিডো, ওকুবো, ইতো, যমগুচি প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশীয় কতিপয় সুদক্ষ ব্যক্তিকে তাহার সহকারীরূপে দিয়া, তাহাদিগকে পাশ্চাত্য সভ্য জাতি সকলের সহিত মৈত্রীস্থাপনের ও তাহাদের রাজনীতি প্রভৃতি অধ্যয়নের উদ্দেশে প্রেরণ করিলেন। ইহারা প্রথমে আমেরিকা গমন করেন। সেখানে বহুদিন বাস করিয়া তাহাদের রাজনীতি প্রভৃতি অনুশীলন করিয়া ইউরোপে আগমন করেন ; এবং ইংলণ্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, প্রুসিয়া, রুসিয়া, ডেনমার্ক, সুইডেন, জর্মানি, ইটালি, অষ্ট্রিয়া, হঙ্গেরি, সুইজারল্যাণ্ড, প্রভৃতি সমুদয় দেশ পরিদর্শন করেন। সকল দেশে তাহারা রাজনীতিজ্ঞ প্রধান পুরুষদিগের সহিত মিশিয়া রাজনীতি, সামাজিক নীতি, সামরিক নীতি, শিল্প বাণিজ্যাদি বিষয়ে সমুদয় জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করেন; বিদ্যাগার, শিল্পাগার, যুদ্ধাগার, বাণিজ্যাগার প্রভৃতি সমুদয় তন্ন তন্ন করিয়া পরিদর্শন করেন। একজন জাপানবাসী লেখক বলেন, তাহারা দুই বৎসরকাল এই সকল কার্যে এত ব্যস্ত ছিলেন যে দিবাভাগে তাহাদের বিশ্রামের সময় থাকিত না। ১৮৭৩ সালে বিয়েনা নগরে যে মহাপ্রদর্শনী হয়, তাহাতে উপস্থিত থাকিয়া তাহারা ইউরোপীয় শিল্প ও বাণিজ্যের বিকাশের সাক্ষাৎ প্রমাণ প্রাপ্ত হন। তৎপরে তাহারা স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পাঁচ বালাম বৃহৎ বৃহৎ গ্রন্থে আপনাদের পরীক্ষিত বিষয় সকল মিকাডোর ও স্বদেশবাসিগণের গোচর করেন। এই অদ্ভুত পাঁচ বালাম গ্রন্থ নব্য জাপানের পথ প্রদর্শক রূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। বলা বাহুল্য, যে নব্য জাপানের অনেক উন্নত রাজনীতি কার্যনীতি ইহা হইতে প্রাপ্ত। ইহার পরে মার্কুইস ইতো প্রজাতন্ত্র শাসন প্রণালী অনুশীলন করিবার জন্য আবার ইউরোপ ও আমেরিকাতে গিয়াছিলেন। তাহার ফলস্বরূপ ১৮৮৯ সালে নব জাপানের এক শাসনপ্রণালী রচনা করিয়া ইনি মিকাডোর হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৯০ সাল হইতে তাহাই প্রবর্তিত হইয়াছে। ইহা অনেক পরিমাণে ইংলণ্ডের পার্লেমেন্টি প্রণালীর অনুরূপ। ইহাতে হাউস অব [illegible]র্স, হাউস অব রেপ্রেজেন্টেটিভস্ আছে; এবং প্রজাদিগকে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সামরিক নীতি শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতি অনুশীলনের জন্য আরও অনেক লোক পাশ্চাত্য জগতে প্রেরিত হইয়াছেন।

সদ্বংশজাত, সুশিক্ষিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণই এইরূপ কার্যের জন্য প্রেরিত হইতেন। ইহার ফল এই হইল যে কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিদেশ প্রত্যাগত শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গে রাজকার্যের সকল বিভাগ পূর্ণ হইয়া গেল। ইহারা সকল বিভাগের নেতা স্বরূপ হইলেন। ইহাদের সংস্রবে ইহাদের উচ্চ উদার ভাবসকল সকল শ্রেণির মধ্যে ব্যাপ্ত হইতে লাগল। ইহারা নব-জাপানের এক প্রবল দল হই[illegible]ছিলেন। ইহারা মিকাডোকে পরামর্শ দিয়া আর এক মহাকার্যে প্রবৃত্ত করিলেন। তাহা সকল শ্রেণির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। শিক্ষা এতদূর বিস্তৃত হইয়াছে যে শিক্ষাবিভাগের একজন উচ্চ কর্মচারির প্রদর্শিত তালিকাতে দেখা যাইতেছে যে এখন বালকবালিকাদিগের মধ্যে শতকরা ৯০ জন শিক্ষা পাইতেছে। ইহার ফল কি দাঁড়াইয়াছে তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। পূর্বোক্ত বিদেশ প্রত্যাগত অগ্রসর দলের ভাব সকল শিক্ষার সাহায্যে চুয়াইয়া সমাজের নিম্নতম স্তর পর্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। বৎসর বৎসর লক্ষ লক্ষ নরনারী স্বদেশহিতৈষণা মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া সংসার ধর্মে প্রবেশ করিতেছে।

জাপানের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই, এই অগ্রসর দল মিকাডোকে আপনাদের ভাবাপন্ন করিতে সমর্থ হইলেন। মিকাডো ইহাদের পরামর্শে তিনি যে পাঁচটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসের স্মরণীয় অদ্ভুত ঘটনা বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য। এই পাঁচটি প্রতিজ্ঞার মধ্যে একটি

এই ছিল, যে দেশের রাজকার্য প্রজাসাধারণের পরামর্শ ও সম্মতি অনুসারে চলিবে। ইহার ফল এই হইল, যে তদবধি জাপানবাসী প্রজাগণ দেশকে আপনাদের দেশ এবং রাজকার্যকে আপনাদের কার্য বলিয়া অনুভব করিতে লাগিল। তদ্দ্বারা তাহাদের স্বদেশহিতৈষিতা ও একতা-প্রবৃত্তি অগ্নির ন্যায় জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ফল আমরা এই যুদ্ধে প্রত্যক্ষ করিতেছি। রুষিয়া কেন জাপানের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিল না? কিরূপে দাঁড়াইবে? জাপান হইতে যে সৈন্যদল গেল তাহার প্রত্যেক ছোট বড় সৈনিক পুরুষ, এক একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায়, স্বদেশের নিমিত্ত প্রাণ দিবার জন্য ব্যগ্র। ওদিকে রুষিয়া হইতে যে সকল রির্জাভিস্ট আনা হইল, তাহাদের প্রত্যেককে গলা টিপিয়া অনিচ্ছার উপরে আনিতে হইল। ইহার ফল যাহা হয়, তাহাই ঘটিয়াছে। যে দেশে রাজকার্যে প্রজাদের হাত নাই, একমাত্র নিরঙ্কুশ স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীন, সে দেশে প্রজাগণ এই বিশ্বাসে বর্ধিত হয়, যে দেশরক্ষা, দেশশাসন রাজারই কাজ তাহাদের কাজ নহে। তৎপরে দেশরক্ষার জন্য যখন তাহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয়, তখন তাহারা সহজে সে কার্যে অগ্রসর হইতে চায় না। ইহার একটি অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ব্রহ্মদেশে পাওয়া গিয়াছে। লর্ড ডাফরিন যখন ব্রহ্মদেশের রাজাকে পদচ্যুত করিবার আশায় সৈন্য প্রেরণ করিলেন, তখন বিনা যুদ্ধে বিনা রক্তপাতে সে কার্য সাধিত হইল! জগতের লোক দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হইল, যে একটা দেশ জয় হইয়া গেল; তাহার রাজাকে বন্দীকৃত করা হইল; অথচ প্রজারা রাজার সাহায্যের জন্য একটি অঙ্গুলিও তুলিল না। এ কেমন? ভিতরকার কথা এই ইংরাজ সৈন্য যখন গেল, তখন প্রজারা ভাবিয়াছিল যে দেশরক্ষা ত রাজার কাজ, রাজা নিশ্চয় তাহার কোনও উপায় বিধান করিবেন; কিন্তু যখন দেখিল যে দেশ পরহস্তে গেল; রাজা বন্দি হইয়া গেলেন; তখন তাহারা স্বদেশ রক্ষার জন্য উঠিল; কিন্তু তখন আর সময় নাই। ইংরাজেরা ইহাদিগকে ডাকাতের দল বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং ইহাদিগকে দমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দমন করা বড় কঠিন কাজ দাঁড়াইল না; কারণ এই বিদ্রোহী দল সকলের মধ্যে লক্ষ্য ও পরামর্শের একতা ছিল না। রাজতন্ত্র শাসন প্রণালীতে কি দাঁড়ায় তাহা আর দেখিতে বাকি রহিল না।

মিকাডো প্রজাবর্গকে রাজ্যশাসনে অধিকার দিয়া জাপানবাসিগণের মধ্যে একতা বিষয়ে যেরূপ সহায়তা করিয়াছেন, তাহা ভারতবর্ষে সম্ভব নহে। কিন্তু অপর দুইটি উপায় ত আমরা অবলম্বন করিতে পারি। প্রথম, একটি অগ্রসর উন্নতি-প্রয়াসী স্বদেশহিতৈষী শিক্ষিত দলের সৃষ্টির দ্বারা স্বদেশ প্রেমের উদ্দীপনা করা, দ্বিতীয় প্রজাসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার। 'স্বদেশি ধুয়া' নামক প্রবন্ধে যে "জাতীয় স্বাবলম্বন সভার" (National Self-help Association) প্রস্তাব করিয়াছি, এই অগ্রসর উন্নতি-প্রয়াসী দল তাহার দ্বারা সৃষ্ট হইবে। এইরূপ একটি সভা স্বদেশ প্রেমিকদিগের মিলনের ভূমি হউক। বিদেশগামী যুবকের সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হউক। তাহারা কেবল ব্যারিষ্টার হইয়া, চুরুট ফুঁকিতে, ইয়ারকি দিতে ও পরের নিন্দা করিতে, শিখিয়া আসিবেন না; যে সকল উপায় অবলম্বন করিলে, শিল্প বাণিজ্য প্রভৃতির উন্নতি হইতে পারে তাহা শিখিয়া আসুন। কতগুলি প্রতিভাশালী লোক জাপানে যান, দেখিয়া আসিয়া বলুন জাপান কি করিয়া বড় হইল, কতকগুলি ফিলিপাইনে যান দেখিয়া আসুন আমেরিকা সেখানে কোন রাজনীতি অবলম্বন করিয়াছেন। বিশেষ ভাবে কতকগুলি দেশ বিদেশে শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির ক্রম প্রদর্শন করিয়া আসুন। সর্ব বিষয়ে ইহারা আমাদের পথপ্রদর্শক ও পরামর্শদাতা হউন।

এই দল হইতে রীতিমত জাতীয় একতার প্রচারক একদল নিযুক্ত করা আবশক। ইহারা স্বদেশের উন্নতি সাধন মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া, ভরণ-পোষণের জন্য স্বদেশীয়দিগের স্বতঃ প্রবৃত্ত সাহায্যের উপরে নির্ভর করিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে ভ্রমণ করিবেন। রাজা প্রজা সকলের অভিমুখীন হইবেন; সকলকেই আপনাদের ভাবাপন্ন করিবার চেষ্টা করিবেন, বিশেষভাবে দেশীয় রাজাদিগকে বুঝাইয়া শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস পাইবেন; যে যে বিষয়ে ইংরাজ গবর্নমেন্ট এদেশের উন্নতি প্রয়াসী যে সকল বিষয়ে বিধিমতে ইংরাজ গবর্নমেন্টের সাহায্য করিবেন; সর্বথা বিদ্রোহ প্রবৃত্তি দমন করিবেন,

রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রকৃত পন্থা প্রদর্শন করিবেন; সর্বোপরি জাতীয় স্বাবলম্বন ও জাতীয় একতার ভাব সর্বত্র ব্যাপ্ত করিবেন। ইহাদের শিক্ষা ও চরিত্রগুণে সর্বসাধারণের অগ্রগণ্য ও সম্মানিত লোক হওয়া আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ইহারা সর্বসাধারণের, রাজা প্রজার, শ্রদ্ধাভাজন হইতে পারিবেন না।

কিন্তু অনেকে হয়ত বলিবেন কে স্বদেশের জন্য এতটা ত্যাগ স্বীকার করিবে? ব্রাহ্মসমাজেও সভ্যেরা এক সময়ে নিরাশ হইয়া বলিয়াছিলেন, কে সমাজের জন্য এত ত্যাগ স্বীকার করিবে? কিন্তু এক কেশবচন্দ্র সেন সে পথ খুলিয়া দিয়াছেন। তাঁহার পদবীর অনুসরণ করিয়া আজ আমরা কত ব্যক্তিকে ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারে আত্মসমর্পণ করিতে দেখিতেছি। কেন স্বদেশের উন্নতির জন্য আত্মসমর্পণ করিবার লোক পাব না? ইহা কি ঈশ্বর ও মানবের সেবা নয়?

আমি যে সম্পূর্ণ কল্পিত ছবি আঁকিয়া লিখিতেছি তাহা নহে। আমি জানি ভারতবাসীর প্রীতি ও শ্রদ্ধাভাজন সুপ্রসিদ্ধ গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় এইরূপ একদল সৃষ্টি করিবার জন্য বিশেষ ব্যগ্র আছেন; এবং হয়ত কতকদূর অগ্রসরও হইয়াছেন। আমি তাঁহার চেষ্টার উপরে ঈশ্বরের আশীর্বাদ ভিক্ষা করি; তিনি এ বিভাগে দ্বিতীয় কেশবচন্দ্র সেন হইবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত। তাঁহার নিজের স্বার্থনাশের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত কি বৃথা যাইবে? ভারতবাসিগণ ত্যাগী পুরুষদিগকে সকল কালেই পূজা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা নিশ্চয় গোখলে মহোদয়ের ন্যায় মানুষের সহায় হইবেন। আসুন আমরা সকলে তাঁহার সহায় হই।

সর্বশেষে প্রজাসাধারণের শিক্ষার বিষয় কিছু বলি। যাহারা দেশের উন্নতি চান, তাহারা ভুলিবেন না, যে বর্তমান শিক্ষা প্রণালীতে প্রজাসাধারণের ও নারীকুলের সহিত শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের বিচ্ছেদ ঘটাইয়াছে। আমরা কংগ্রেস করিতেছি, আমরা শিল্পশিক্ষার আয়োজন করিতেছি। আমরা জাপানে ছাত্র পাঠাইতেছি, প্রজাসাধারণ ও দেশের নারীগণ কোথায়? তাহারা এ সকল আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যম হইতে দূরে — বহুদূরে। আমরা তাহাদের উৎসাহ ও সাহায্য পাইতেছি না। আমাদের হৃদয়ের ভাব চুয়াইয়া সে স্তর পর্যন্ত নামিতেছে না। এরূপ বিচ্ছেদ থাকিতে দেশের উন্নতির কোনও চেষ্টা স্থায়ী ফল প্রসব করিবে না। এইজন্য শিক্ষার বিস্তার বিষয়ে এই অগ্রসর দলকে সর্বাপেক্ষা মনোযোগী হইতে হইবে। শিক্ষা বলিতে কেতাব পড়া শিক্ষা মনে করিতে হইবে না। সামাজিক উপায়ে কথোপকথন ও বক্তৃতাদি দ্বারা অনেক শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে। ইংলণ্ডের ইউনিভার্সিটি একস্টেনসন প্রণালী তাহার পথ প্রদর্শন করিয়াছে।

প্রজাসাধারণের শিক্ষা বলিলেই ভাষাগত পার্থক্য মহান অন্তরায় স্বরূপ সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হয়। কোন্ ভাষায় ইহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া হইবে? কোন্ ভাষা ভারতের সর্বসাধারণের ভাষা হইবে? কোন্ ভাষা অন্ততঃ উর্দু বা হিন্দির স্থান অধিকার করিবে? ইহা এক মহা প্রশ্ন। ইহার আলোচনাতে এখন প্রবৃত্ত হইতে পারি না। স্থূলতঃ একথা বলিতে পারি, যে ইংরাজি ভাষা ভারতের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইতে যাইতেছে। এ ভাষা পৃথিবীর সর্বত্র আপনাকে ব্যাপ্ত করিতেছে। স্বাধীন জাতিরাও যত্নপূর্বক ইহা স্বীয় দেশের মনুষ্যকে শিখাইতেছে। মান্দ্রাজী আয়া ও মান্দ্রাজী সামান্য লোকদিগকে দেখিয়া মনে হয়, সাধারণ মানুষকে মোটামুটি ইহা বলিতে ও বুঝিতে সমর্থ করা বড় কঠিন কার্য নয়। অন্ততঃ প্রত্যেক গ্রামে এরূপ এক একটি ক্ষুদ্র দল করা যায়, যাহারা ইহা বুঝে ও ইহা হইতে লব্ধ চিন্তা সকল মানুষের কাছে ব্যক্ত করিতে পারে। তৎপরে প্রত্যেক প্রদেশের দেশীয় সাহিত্য ও সংবাদপত্রাদি দ্বারা প্রজাসাধারণের শিক্ষার সাহায্য করা যাইতে পারে।

শেষে বলি প্রকৃত স্বদেশ-হিতৈষী যারা, তারা শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না। জাতীয় একতার ভিত্তি সেখানে।

প্রবাসী ১৩১২ ভাদ্র

স্বর্ণকুমারী দেবী

১. আমাদের কর্তব্য

"তোমরা এ সকল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিতেছিলে কেন?"

নর্টনের এই প্রশ্নে নরেন্দ্র গোস্বামী উত্তর করিয়াছিল "গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য।"

দুই চারিখানা অস্ত্র সংগ্রহ করিয়া যাহারা ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কল্পনা মনে আঁটে তাহারা উন্মাদ নহে ত আর কি?

প্রফুল্ল চাকি ইনস্পেক্টর নন্দলাল কর্তৃক ধৃত হইয়া আত্মহত্যা করিবার সময় এইরূপ আক্ষেপোক্তি করিয়া মরিল, "তুমি বাঙ্গালী হইয়া এই কাজ করিলে?"

ইহা হইতে কি বুঝা যাইতেছে? এই ভ্রান্ত বালকেরা মনে করিয়াছিল তাহারা সুশাসন ও স্বরাজপ্রাপ্তির জন্য যে বিদ্রোহনীতির অবলম্বন করিতেছে, তাহা দেশের জনসাধারণের অনুমোদিত; কেবল সাধারণ সকলেই এজন্য প্রাণ দিতে পারে না, উহারা তাহাদের হইয়া জীবন বলিদান ব্রত গ্রহণ করিল।

বালক-বুদ্ধির প্ররোচনায়, অসংযত কল্পনার মাদকতাসেবনে উন্মত্ত জ্ঞানশূন্য হইয়া তাহারা প্রকৃত কার্যের পথ ছাড়িয়া বিপথে ছুটিল। আমাদের পরিশ্রম বিফল, সাধনা অসিদ্ধ, উদ্দেশ্য নষ্ট হইয়া পড়িল।

কর্জনের বঙ্গচ্ছেদ ব্যবস্থার সময় ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকলেরই মধ্যে জাতীয় ভ্রাতৃভাবের জ্বলন্ত উদ্দীপনা, স্বদেশি ব্রত গ্রহণ ও প্রচারের একান্ত একাগ্রতা দেখা গিয়াছিল। ১৬ অক্টোবর ভারতবাসীর একটি স্মরণীয় দিন। সেই দিনকার বিরাট জনতায়, বয়ন শিল্পের উন্নতি সংকল্পে লোকে চাঁদা দিয়া চাঁদা নিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। কলিকাতার গণ্যমান্য লোকেরা এই সময় পদব্রজে চাঁদা সংগ্রহ করিয়াছেন। বেঙ্গল টেক্‌নিকাল বিদ্যালয়, ন্যাশনাল কলেজ, ন্যাশনাল ফণ্ড, প্রভৃতি সেই সময়কার উৎসাহের ফল। ইহা ছাড়া বঙ্গলক্ষ্মী মিল, ছোট ছোট বয়ন বিদ্যালয়, নানারূপ কলকারখানা স্থাপন এবং স্বদেশি ব্রত গ্রহণের উৎসাহে দেশ তখন জাগ্রত মুখরিত হইয়া উঠিয়াছিল।

আমরা দেখিতেছি সেই উৎসাহ বহ্নি উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর প্রভায় প্রজ্বলিত না হইয়া সমভাবেই যেন অবস্থিত রহিয়াছে। সেই আগ্রহ-স্রোত দিন দিন প্রবলতর ও পরিবর্ধিত প্রবাহে সমগ্র বঙ্গভূমির উর্বরা না করিয়া স্রোতের জল যেন একস্থানেই আটকা পড়িয়া গিয়াছে! ধনী, শ্রমজীবী, বা চাকুরে লোকের উৎসাহ স্বাভাবিক নিয়মে শিথিল হইয়া পড়া আশ্চর্যের বিষয় নহে। কিন্তু যে সকল নব্যদল দেশব্রত গ্রহণ করিয়া এই কার্যেই আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন তাঁহাদেরও যেন ঐ সকলদিকে পূর্বের প্রাণপণ উৎসাহের অভাব দেখা যায়। রাজনৈতিক আন্দোলনের নেশায় মাতিয়া তাঁহারাও কি প্রকৃত কার্য ভুলিয়া থাকিবেন ; তাহাদের কর্তব্য, তাহাদের উদ্দেশ্য সাধনে অবহেলা করিবেন!

বঙ্গচ্ছেদের সময় স্বদেশি ব্রত গ্রহণের আরম্ভে আমরা যে পথ ধরিয়া জাতীয় উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলাম তাহাই আমাদের পক্ষে শ্রেয় পথ। দেশে নানারূপ কলকারখানা, নানারূপ শিল্পের যাহাতে উন্নতি হয়, স্বদেশি গ্রহণ, বিদেশি বর্জনের যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার দিকেই আপাততঃ আমাদের বিশেষরূপে মনোযোগী হইতে হইবে। কিন্তু এখানেও ধৈর্যের আবশ্যক। দোকানদারের বিদেশি জিনিস নষ্ট করিয়া, লোককে স্বদেশি গ্রহণে বাধ্য করিলে স্থায়ী ফললাভের

সম্ভাবনা নাই। একদিকে সকলকে বুঝাইয়া এই কার্যে প্রবৃত্ত করিতে হইবে, অন্যদিকে দ্রব্য সুলভ করিবার ব্যবস্থা করা চাই। বস্তুতঃ **মূল্য সুলভতাই স্বদেশি দ্রব্যের প্রচলন ও বিদেশি বর্জনের সহজ এবং স্থায়ী উপায়।**

বস্ত্রের কল বহুব্যয়সাধ্য। তাহার অপেক্ষায় না থাকিয়া পাড়ায় পাড়ায় বয়ন শিল্পের আয়োজন করা উচিত। গ্রামে গ্রামে চিনির ছোট ছোট কল সহজেই হইতে পারে। বাঙালির বুদ্ধির অভাব নাই, কলকৌশল উদ্ভাবনের চেষ্টায় বিজ্ঞান চর্চা আরম্ভ করিলে তাহারা যে শীঘ্রই কৃতকার্য হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোমা শিখিতে বালকগণ যদি বিলাত যাইতে পারে তবে ব্যবসা-বাণিজ্য কলকারখানা শিখিতে কেনই বা বিলাত যাইতে পারিবে না। আসল কথা এই দিকে আকাঙ্ক্ষার গতি হওয়া আবশ্যক। শুনিতে পাই, এ দেশে কাচের চুড়ি বিক্রয় করিয়া বিদেশিগণ কোটি কোটি মুদ্রা দেশে লইয়া যান। ইহা বস্ত্রাদির ন্যায় অত্যাবশ্যকীয় বস্তু নহে, সখের জিনিষ। ছেলেরা বুঝাইয়া অনেককেই ইহার ব্যবহারে নিবৃত্ত করিতে পারেন। আর দেশে যাহাতে ইহা প্রস্তুত হয় বড়লোকেরা তাহার চেষ্টা করুন। কলকাবখানা ছাড়া কতপ্রকার ব্যবসা বাণিজ্য শিক্ষার ক্ষেত্র এ দেশে পড়িয়া আছে তাহার ঠিক নাই। বিলাত হইতে মাছ ফল দুধ প্রভৃতি নানাদ্রব্য এ দেশে টিনে আবদ্ধ হইয়া আসে, তাহার কৌশল শিখিয়া আসিলে আমাদের দেশের মাছ ফল প্রভৃতি বিদেশে পাঠাইয়া আমরা বিস্তর লাভ করিতে পারি। একান্ত প্রাণে, ধীর অধ্যবসায় সহকারে এইরূপ কার্যে মনোযোগী হইলে ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ উত্তরোত্তর অতি সহজভাবে জাতীয় উন্নতির ভিত্তি দৃঢ় হইতে থাকিবে। যোগ্যতার জয় সর্বত্র। ইংরাজ শাসনে উৎকণ্ঠিত হইবার কোনই আবশ্যক দেখি না। ভারতে বিদেশি শাসনের আবশ্যক আছে তাই তাহারা আছে ; আবশ্যক বন্ধ হইলে আপনা হইতেই তাহারা চলিয়া যাইবে। ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। কেমন করিয়া তাহারা যাইবে আমরা জানি না, তাহা ভাবিবার দরকারও নাই। যখন অনাবশ্যক হইল তখন রোম আপনা হইতে ইংলণ্ড ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। বোয়ারদিগকে পরাজয় করিয়াও ইংরাজ শেষে তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিল। কোন অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সমগ্র সুইজারল্যান্ড যখন এক বাক্যে বলিল আমরা নরওয়ের অধীনতা মানিব না, তখন তাহাই হইল, ইহার জন্য একবিন্দু রক্তপতন হয় নাই।

প্রাকৃতিক নিয়ম পাশ্চাত্যজাতির উপর একরূপ, প্রাচ্যজাতির উপর অন্যরূপ নহে। আমরা যোগ্য হইলে আপনা হইতে স্বরাজ্য প্রাপ্ত হইব। সকলেই জানেন, হল্যাণ্ড সমুদ্রের সমতলভূমি। এই সমুদ্র কৌশলে প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া হল্যাণ্ডবাসী ইহা বাসযোগ্য করিয়াছে। ইউরোপ, আমেরিকা পরিশ্রমপটু, অধ্যবসায় নিপুণ বলিয়াই বিজ্ঞান, শিল্পে, বাণিজ্যে সকল বিষয়েই তাহাদের শ্রেষ্ঠতার পরিচয় দিতেছে। মহৎ জাতি হইবার গুণসকল আমরা আয়ত্ত করিতে পারিলে কে আমাদের অধীন করিয়া রাখিতে পারে?

কিন্তু আমাদের গোড়াতেই গলদ। জাতিগঠনের প্রকৃত চেষ্টা আমাদের নাই বলিলেই হয়। চরিত্র বল-বৃদ্ধির চেষ্টাই প্রকৃত জাতি গঠনের চেষ্টা। আধুনিক শিক্ষার ফলে বালকদিগের মধ্যে যে ঔদ্ধত্য দেখা যায় তাহা চরিত্র বল নহে। পূর্বকালে বালকগণের গুরুভক্তি প্রসিদ্ধ কথা। কিন্তু অধুনা বহুস্থলে নব্যদল স্ববুদ্ধি গর্বে অভিজ্ঞ প্রাজ্ঞলোকদিগকেও যেরূপ অশ্রদ্ধা অমান্য করে তাহা জাতীয় উন্নতির অনুকূল বলিয়া মনে হয় না। বিলাতের ছাত্রগণ কিরূপ বাধ্যতার সোপান দিয়া চরিত্র বল সঞ্চয় করে তাহা আমাদের শিক্ষার বিষয়। ইওরোপ, আমেরিকার প্রতি গৃহে, প্রতি স্কুলে বালক বালিকাদিগকে যেরূপ শাসননিয়মে কর্তব্য শিক্ষা দেওয়া হয় তাহার দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্তব্যসাধন অতি সহজ হইয়া আসে। একজন আমেরিকাবাসী গল্প করিতেছিলেন, প্রতি স্কুলে বালকগণ অগ্নি পরীক্ষা দিতে বাধ্য। পাড়ায় আগুন লাগিলে কি রূপে তাহার মধ্যে ঝাঁপ দিয়া অগ্নি হইতে দ্রব্যাদি রক্ষা করিবে অতি কঠোর নিয়মে তাহারা সে শিক্ষা পায়। এই শিক্ষার ফলে কোথাও অগ্নিকাণ্ড ঘটিলে শ্রেণিবদ্ধ বালকেরা প্রাণের প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করিয়া

সদর্পে অনলে বিচরণ করে। আর এ দেশে পথে কাহাকেও বিপন্ন দেখিলে লোকে জনতলা করিয়া দাঁড়াইয়া দেখে কিন্তু বিপদে পড়িবার সম্ভাবনায় অসহায়কে রক্ষা করিতেও অগ্রসর হয় না। আমাদেব দেশের প্রবাদই এই, চাচা আপন প্রাণ বাঁচা; আপনি বাঁচলে বাপের নাম।

স্বেচ্ছাসেবকদল পরোপকার কার্যে আত্মসমর্পণ করিয়া কেবল যে প্রশংসার কাজ করিতেছেন এমন নহে; যথার্থই জাতি গঠনের সহায়তা করিতেছেন। কিন্তু ইহা একটি উপায় মাত্র। সর্ববিষয়ে আমাদের জাতিগঠনের চেষ্টা করিতে হইবে। দেশের মহিলাগণ শিক্ষিত না হইলে যথার্থ জাতিগঠন হইতে পারে না। কিন্তু এতদিনেও আমাদের দেশে স্ত্রী-শিক্ষা কতটুকু অগ্রসর হইয়াছে? গুরুকুল সমাচার পত্রে এ সম্বন্ধে একজন যাহা লিখিয়াছেন আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

লেখক বলেন যে, "যদিও চরমপন্থীগণ প্রজাতন্ত্র, স্বাধীনতা, ভ্রাতৃভাব প্রভৃতি বিষয় লইয়া খুব আন্দোলন করিতেছেন কিন্তু তথাপি জাতিভেদ সংস্কার তাঁহাদের হৃদয়ে সম্পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাঁহারা নারীগণের অন্তঃপুরকারাগৃহের বাহিরে বিন্দুমাত্র স্বাধীনতা ভোগের বিরোধী অথচ তাঁহারা পরাধীনতা, পরমুখাপেক্ষিতা প্রভৃতি বিষয়ে ঘৃণা প্রকাশ করিতে কদাপি কুণ্ঠিত নহেন। তাঁহারা তাঁহাদের নিচ জাতীয় দেশবাসীকে স্পর্শ করিতেও সঙ্কুচিত হন অথচ সর্ববিষয়ে ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত সমান অধিকারপ্রার্থী এবং রেলওয়ের কোন গাড়ি কেবল সাহেবদিগের জন্যই নির্দিষ্ট দেখিলে সহজেই আত্মহারা হইয়া পড়েন। তাঁহারা শ্বেতাঙ্গের বিন্দুমাত্র প্রভুত্ব সহ্য করিতে চান না, অথচ অন্ধভাবে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াই ব্রাহ্মণগণ সমাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। সংস্কার কেবল এক বিষয়ে নহে, সকল বিষয়েই হওয়া অবশ্য কর্তব্য। যে সকল লোকে সমাজ প্রভুত্বে পীড়িত, রাজনৈতিক অধীনতা তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারে না। যাহাদের নিকট মনুষ্যের কোন রকম দাসত্ব একান্ত অসহ্য, তাঁহারাই বিধাতার আশীর্বাদে স্বাধীনতা লাভের যোগ্যপাত্র। রাজনৈতিক ক্ষমতা সত্ত্বেও রোমে দাসত্ব ছিল। যে সমস্ত লোক পুরোহিতগণের ইঙ্গিতে অন্ধভাবে পরিচালিত এবং তাঁহাদের আদেশ নির্বিবাদে আনতমস্তকে পালন করে তাঁহারা স্বেচ্ছাচার অথবা নিয়মতন্ত্রে গঠিত প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ লক্ষ্য না করিয়া দ্বিধাশূন্যভাবে রাজপুরুষগণের প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লয়। অতএব কেবলমাত্র রাজনৈতিক আন্দোলন কখনই সাধারণকে স্বাধীনতা এবং ভ্রাতৃভাবের কল্যাণময় পথে আনয়ন করিতে পারিবে না।"

ভারতী ১৩১৫ ভাদ্র

২. কর্তব্য কোন পথে?

সংবাদপত্রে প্রকাশ, সম্প্রতি বর্ধমানে তিনটি বালক ধৃত হইয়াছে। বঙ্গেশ্বর ট্রেনে সেই পথ দিয়া যাইবেন শুনিয়া তাহারা নাকি তাহার হত্যা সঙ্কল্পে ঘুরিতেছিল। আগড়পাড়া ট্রেনেও আবার বোমানিক্ষেপের কথা শুনা যাইতেছে। এখনো যে বালকদিগের দুর্বুদ্ধি দূর হইতেছে না ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। এইরূপ অরাজকতা সংসাধনে শক্তিক্ষয় করিলে প্রকৃত মঙ্গলকার্যে শক্তি আসিবে কোথা হইতে?

ভাবিয়া দেখিতে গেলে দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারে কয় জন? এই লক্ষ কোটি ভারতবাসীর মধ্যে এরূপ ভক্তসংখ্যা বোধ হয় অঙ্গুলিনির্দিষ্ট করা যাইতে পারে। আর তাহারাই কি না ভ্রান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাঁহাদের আত্মদান, পুণ্যশক্তি অন্যায় প্রয়োগে নিষ্ফল ব্যর্থ করিতে বসিয়াছেন! কেবল তাহাই নহে, দেশের কল্যাণ কল্পনায় দেশের সর্বনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? যে সকল স্বদেশ সেবকগণ অরাজকতার পক্ষপাতী, অনুরাগে জ্ঞানশূন্য না হইয়া এ সম্বন্ধে ধীরচিত্তে একটু বিবেচনা করিয়া দেখুন—ইহাই আমাদের অনুরোধ।

ইতিহাস কি বলে? বিদেশীয় দৃষ্টান্তেই বা আমরা কি দেখিতে পাই? স্বাধীন রাজ্যের মধ্যেও রাজনিধনকামীদলকে সিদ্ধকাম হইতে দেখা যায় নাই। আর আমরা হৃতশক্তি, নিতান্ত অক্ষম দুর্বল অধীন জাতি; দু একটা ইংরাজহত্যা দ্বারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে এরূপ মনে করা কি নিতান্তই মূঢ়তা নহে? কার্যক্ষেত্রে প্রবেশের আগে যদি বা বুদ্ধির ভুল জন্মিয়া থাকে, অভিজ্ঞতায় অন্ততঃ এখন ত সচেতন হওয়া উচিত। এই অরাজকতার ফলে সমস্ত দেশ সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুলিসের অত্যাচার, শত নির্দোষ ব্যক্তির শাস্তি, সংবাদপত্র দমন, কঠোরতর বিচারপদ্ধতির প্রবর্তন প্রস্তাব প্রভৃতি দলননীতিতে ভারতবাসী দিন দিন নিপীড়িত, পেষিত হইয়া উঠিতেছে। এই পেষণ স্থায়ী হইলে কিছুদিনে যে আমরা একেবারেই নির্জীব অসাড় হইয়া পড়িব না এমন কে বলিতে পারে? অন্ততঃ ইহা সুস্পষ্ট যে উক্তরূপ মারকাট সঙ্কল্পে রাজপক্ষের ক্ষতি অপেক্ষা প্রজাপক্ষের ক্ষতি শত সহস্রগুণে অধিক। ইংরাজ যদি আজ প্রজাদমন অভিপ্রায়ে তোপের মুখে সমস্ত ভারতবাসীকে উড়াইয়া দিতে চায়—আমাদের এমন সাধ্য নাই যে আমরা তাঁহার প্রতিরোধ করি। বোম্বাই সহরের প্রজাবিদ্রোহে কি ঘটিল? বস্তুতঃ তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর, ন্যায় বিচারের উপরই আমাদের একান্ত ভরসা। এ সত্য মিথ্যা বলিয়া কল্পনা করিলে চলিবে না। দেশের জন্য মৃত্যু পুণ্যকার্য সন্দেহ নাই, কিন্তু সে মৃত্যুতে যদি সিদ্ধির পরিবর্তে অসিদ্ধি, মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গল আনয়ন করে—তাঁহা হইলে? যাঁহাদের বাচাইবার জন্য তুমি মৃত্যুবরণে উদ্যত, তোমার কার্য যদি তাঁহাদেরই জীবন বলির কারণ হয়, তাঁহা হইলে? তাঁহা হইলে নিশ্চয়ই সে মৃত্যু বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না।

ঝড়ের মুখে নৌকা চালাইয়া নৌকা ডুবান কোন নাবিকেরই কর্তব্য নহে, শত্রুর অপরিমিত শক্তির মধ্যে মুষ্টিমেয় সৈন্য সঞ্চালনে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। স্বদেশ-সেবকগণ এরূপ অসম অন্যায় যুদ্ধে মৃত্যুর সঙ্কল্প ত্যাগ করুন। যেরূপ জীবনদানে সর্বাপেক্ষা অধিক ফল লাভ হয়—যাহাতে মাতৃভূমির যথার্থ সেবা হয়—এখন সেই কার্যেই জীবনপাত করিতে হইবে; অন্য কথায়,—এখন তাঁহাদের মরিবার সময় নাই, বাঁচিয়া কাজ করিতে হইবে—সম্মুখে স্তূপাকৃতি কাজ পড়িয়া আছে; তাঁহা দিয়া সযত্নে স্বরাজের ভিত্তি প্রস্তুত করিতে হইবে;— সে জন্য বিস্তর পরিশ্রম বিস্তর আয়োজনের প্রয়োজন, এক পুরুষের আজীবনব্যাপী উদ্যমেও তাঁহা সম্পন্ন হইবে কিনা সন্দেহ। উত্তেজনার মুহূর্তে প্রাণ দান অপেক্ষাকৃত সহজ বীরত্ব; কিন্তু আমৃত্যু কষ্টকর অধ্যবসায় ও আত্মত্যাগই অধিকতর বীরত্বের পরিচায়ক। ভারতবাসীর পক্ষে এই ব্রতই প্রশস্ত ব্রত। রাজা প্রজার বিবাদে মারকাট অত্যাচারে সবলপক্ষেরই যখন জয় লাভের আশা নাই তখন দুর্বল পক্ষের কোন কথা। ধীর সহিষ্ণুতায় অত্যাচার সহ্য করিয়া, সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে হইবে, আত্মসঙ্কল্পে অটল থাকিতে হইবে! গৃহবিবাদই আমাদের সকল অনর্থের মূল,—সকল উন্নতির প্রতিবন্ধক। অধিক কি কথা; এহেন জাতীয় মহাসমিতি, যাহার প্রভাবে আমাদের জাতীয় মহাদেহে গৌরবময় নবজীবন প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল তাঁহাই আজি মতপার্থক্যজনিত অন্তর্বিবাদে পুনর্বিচ্ছিন্ন, বলহীন, মুমূর্ষুবৎ। অতএব মাতৃভূমির পূজায় যতদিন আমরা সকলে অর্থাৎ দেশের অধিকাংশ লোকে বিবাদ বিসম্বাদ স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে না শিখি ততদিন কেবল মুষ্টিমেয় লোকের অবৈধ চেষ্টায় স্বরাজ-প্রতিষ্ঠার আশা দুরাশাবিড়ম্বনা মাত্র। স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশি বর্জন নীতির প্রচার, স্ত্রীপুরুষ সর্বসাধারণের মধ্যে দেশভক্তি ও জ্ঞান শিক্ষা বিস্তার, শিল্প বাণিজ্যের উন্নতিতে অর্থবল সংগ্রহ, সর্বোপরি একতার মহাবল সঞ্চয়ই আমাদের সফলতা লাভের মূল মন্ত্র। বলা বাহুল্য, অন্নপানের ন্যায় নিয়মিত ব্যায়ামচর্চায় স্বাস্থ্যরক্ষা ও দেহবলের উৎকর্ষ সাধন ও বিদ্যাচর্চায় মানসিক বলের উৎকর্ষ সাধন সমস্ত সাধনার মূলে বর্তমান। অতএব স্বদেশি হুজুকে বালকগণ যদি তাঁহাদের লেখাপড়া ও শরীর পালন ছাড়িয়া দেন তাঁহা হইলে পরবংশে দেশের কাজ করিবার অল্প লোকই থাকিবে। বালকগণের নহে—সুশিক্ষিত যুবকগণেরই প্রতি গ্রামে গ্রামে সভাসমিতি করিয়া, প্রকাশ্য ভাবে বৈধ উপায়ে ভিন্ন ভিন্ন দল সংগঠনে, ভিন্ন ভিন্ন উন্নতিজনক

ব্রত গ্রহণ করিতে হইবে। অধিকন্তু যাহাতে গভর্নমেন্ট সন্দেহ না করেন—রাজপক্ষকেও আপনাদিগের সহায় গ্রহণে চেষ্টা করিতে হইবে। বস্তুতঃ ইংরাজ বাঙালির বন্ধুত্বের মধ্য দিয়া কোন কাজ সাধিত হইতে পারিলে তাঁহার আর বিনাশ নাই। কেহ কেহ বলেন, আমাদের নিজের কোন কার্যে গভর্নমেন্টের সাহায্য লইলে আত্মনির্ভরতা, আত্মসম্মানের হানি হয়। ইহা নিতান্তই ভ্রান্তিপূর্ণ যুক্তি। প্রথমতঃ, অবিমিশ্র আত্মনির্ভরতা সংসারে নাই, কোন না কোনরূপে একের সাহায্য অন্যকে গ্রহণ করিতে হয়ই। রাজপক্ষ প্রজাপক্ষ উভয়ে মিলিয়া দেশ, আমরা যতই প্রতিজ্ঞা করি না কেন; রাজপক্ষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরহীন হইতে পারিই না। সুতরাং উক্তরূপ কথার কোনই মূল্য নাই। দ্বিতীয়তঃ আমরা যদি আরাম শয্যায় শয়ন করিয়া আমাদের মুখে গ্রাস তুলিয়া দিবার জন্য গভর্নমেন্টকে ডাকি—তাঁহাই প্রকৃত নির্ভরতা। কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে কার্য সুসিদ্ধির জন্য রাজপক্ষের সহায়তা গ্রহণে আত্মনির্ভরতা বা আত্মসম্মানের ত্রুটি হইতে পারে না। কেন না উদযোগী প্রজাপক্ষের রাজপক্ষের সহায়তা ন্যায্য প্রাপ্য, অনুগ্রহ ভিক্ষা নহে। বস্তুতঃ আমাদেব স্বজাতির মধ্যে সদ্ভাব যেমন আবশ্যক, রাজা প্রজার মধ্যেও বন্ধুত্বস্থাপন তদপেক্ষা কম আবশ্যক নহে। এ সম্বন্ধে স্যর অ্যানড্রু তাঁহার বিদায়কালের বক্তৃতাতে যেরূপ উপদেশ দান করিয়াছেন তাঁহা কার্যতঃ কতদূর সফল হইবে জানি না; তবে কর্তৃপক্ষ ইহা যে বুঝিতেছেন, তাঁহাও আশাজনক। সত্যই গভর্নমেন্ট আমাদের অমঙ্গল প্রার্থী নহেন; প্রজাপক্ষকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করাও তাঁহাদের নীতির অন্তর্গত নহে। রাজায় প্রজায় মিলন নাই বলিয়া, পরস্পরকে আমরা জানি না চিনি না বলিয়াই পরস্পরে বিরোধের এত কারণ ঘটে। কিন্তু সেলামবাজি পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্বস্থাপনের উপায় নহে। "সেলামবাজি" কথাটা যে এস্থলে চলিত অর্থেই ব্যবহৃত, তাঁহার বোধ কবি টীকার আবশ্যক নাই। স্বার্থসাধন উদ্দেশ্যে দাসভাবে যেরূপ সম্মান দেখান হয়—তাঁহাই উক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে অনুগ্রহলাভ হইতে পারে, সমভাব সৌহার্দ্য লাভ হয় না। আমাদের দুর্ভাগ্যই এই—যাহারা রাজপক্ষের সহিত মেলামেশা করেন তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকেই হয়ত বা কোন ফাঁকা উপাধির প্রত্যাশায়, নয়ত বা কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবার ভয়ে সতেজে সমকক্ষভাবে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারেন না। এবং সেলামবাজিকেই হীন স্বার্থসাধনের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র বিবেচনা করেন। সুতরাং রাজপক্ষও ইহাতে এমন অভ্যস্ত যে ইহার ত্রুটি দেখিলেই তাঁহারা অসম্মান মনে করেন, এবং উভয়ত সমকক্ষ মিলন যে সম্ভবপর ইহাও তাঁহাদের মনের ত্রিসীমাতে প্রবেশ করে না। অনেক সময় তোষামোদকারীগণ দেশের সত্য মনোভাব (sentiment) প্রকৃত ইচ্ছা সংগোপন করিয়া স্পষ্ট বিপরীত বলিয়া রাজপক্ষের মন রক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হন না। স্বরাজ বিরুদ্ধে কাশীর রাজার উক্তিই ইহার একটি দৃষ্টান্ত। **দোষ রাজপক্ষের নহে, দোষ আমাদেরই; ইহা বুঝিয়া আত্মসংশোধন করিতে হইবে। মহতের বন্ধুত্ব মহত্ত্ব দ্বারাই অর্জন করিতে হয়।** তাঁহারা যদি দেখেন তাঁহারাও যেমন মানুষ আমরাও তেমনি মানুষ; তাঁহারা যদি দেখেন অনুগ্রহ লাভের জন্য নহে, দেশের কল্যাণ উদ্দেশ্যেই আমরা তাঁহাদের বন্ধুতা প্রার্থনা করিতেছি, তাঁহারা যদি বোঝেন, সেলামবাজি না করিয়া আমরা তাঁহাদের অসম্মান করিতেছি না, আমরা মনুষ্যোচিত ভদ্রতা বিনয় রক্ষা করিয়া ভারতের প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য কি নির্ভয়ে তাঁহাই প্রকাশ করিতেছি মাত্র, — তাঁহা হইলে ক্রমশ পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস ও বন্ধুত্বস্থাপন হইবেই হইবে।

রামমোহন বিদ্যাসাগর তাঁহাদের হৃদয়মাধুর্যে ও চরিত্রবলে লাট মহালাটদিগেব যেরূপ শ্রদ্ধাভাজন বন্ধু ছিলেন,—কোন রাজা মহারাজা অপর্যাপ্ত তৈলমর্দনেও রাজপক্ষের সেরূপ সম্মানীয় বন্ধু? বর্তমান অ্যাডভোকেট জেনেরল তাঁহার নির্ভীক ন্যায়কর্তব্যপরায়ণতায় দেশেব হিতসাধন করিয়া রাজপক্ষের শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু হায়। যাঁহাদের স্বার্থসাধনের গূঢ় অভিসন্ধি হৃদয়ে জাগ্রত, তাঁহাদের এ সাহস কোথা হইতে আসিবে? এমন লোকও আছেন, যাঁহারা রাজপক্ষের প্রিয় পাত্র হইবার জন্য দেশের সর্বনাশেও অকুণ্ঠিতচিত্ত! **গভর্নমেন্ট দেশের শত্রু নহেন, আমরাই**

আমাদের নিজের শত্রু। বর্তমান যুবকগণ, যাহারা দেশের আশা-ভরসা, যাহারা নিঃস্বার্থতা-মূর্তিমান, গভর্নমেন্টকে উপেক্ষা না করিয়া, তাঁহার শত্রুতাচরণ না করিয়া—যাহাতে নিজের চরিত্রবলে তাঁহাদের সৌহার্দ্য জয় করিতে পারা যায় সেই দিকেই লক্ষ্য দান করুন। যদি আমরা কখনও এই মিলনযুদ্ধে জয়ী হই, একদিকে স্বদেশির মধ্যে একতা স্থাপন, অন্যদিকে বিদেশির নিকট হইতে শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্মানপূর্ণ সৌহার্দ্য আকর্ষণ করিতে পারি তখনি বিনা রক্তপাতে ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা হইবে। এখন একজন কটন, একজন ওয়েদারবর্ণ আমাদের উন্নতি কামনায় নিজ জাতির সহিত দ্বন্দ্ব করিতেছেন,—আমাদের চরিত্রবল দেখিলে তখন শত কটন, শত ওয়েদারবর্ণ অভ্যুদিত হইয়া আমাদিগের ন্যায়সঙ্গত অধিকারদানে আপনাদিগকেই সম্মানিত জ্ঞান করিবেন।

চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই—কে জানিত বঙ্গবালকগণ এত পাহারার মধ্যেও বোমার কারখানা সৃজন করিতে পারে! কিন্তু এরূপ কার্য আমাদের উন্নতিরই প্রতিকূল, ইহা বুঝিয়া যে পথ আমাদের স্বরাজের প্রকৃত পথ তাঁহা নির্মাণেই নববংশের বল নিয়োগ করা কর্তব্য।

ভারতী ১৩১৫ পৌষ

বিপিনচন্দ্র পাল

১. বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের অবস্থা

বাংলাদেশের প্রবল ও প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন-আবেদনাদির আন্তরিক অসারতা বর্তমান বঙ্গবিভাগসম্বন্ধীয় সাধারণ বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদিতে অতিশয় ক্লেশকররূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বহুকাল হইতে রাজকীয়-শাসনসংরক্ষণ-বিষয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে একটা ঐক্যভাব ও ঘননিবিষ্টতা গড়িয়া উঠিয়াছে, যে ঐক্য ও পরস্পরের সঙ্গে গভীর সহানুভূতি ও সতেজ সহকারিতার সম্বন্ধ ইদানীন্তন রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও আধুনিক শাসননীতির নিষ্পেষণে ও নিপীড়নে আরো ঘনীভূত ও ঘনিষ্ঠতর হইয়া উঠিতেছিল, ইংরেজরাজ ইহা হইতে কথঞ্চিৎপরিমাণে আপনার ভবিষ্যৎ অমঙ্গল বা অশান্তি আশঙ্কা করিয়া এই ঐক্যবন্ধন ছিন্ন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন বলিয়া, সংবাদপত্র ও বক্তৃতামঞ্চ হইতে ঘোষণা বাহির হইয়াছে যে, বাংলাদেশের আপামর সাধারণ সকলে ঘোরতর শোকাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুতই কি তাই হইয়াছে? বাংলাদেশে এ সম্বন্ধে একটা অভূতপূর্ব ভাবের বন্যা ছুটিয়াছে, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ ভাবকে কি শোক নামে কদাপি অভিহিত করিতে পারা যায়? শোকাহত হইয়াই কি বাংলার ধনিবর্গ "প্রভো সংহর সংহর" বলিয়া রাজদ্বারে তারস্বরে চীৎকার ও তারযোগে আবেদন-আর্তনাদ তুলিয়াছেন? শোকাচ্ছন্ন হইয়াই কি অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন ইংরেজের কোমল-কম্বল-লালিত সুষুপ্তিকে ভঙ্গ করিবার জন্য আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবর্গ সশরীরে বিলাতযাত্রা করিয়া প্রবল ক্রন্দনের রোল তুলিবার বিপুল আয়োজন করিতেছেন? যে ভাবে দেশ মাতিয়াছে, তাহাকে কি শোক বলে? এ সকল প্রশ্ন তুলিলেই আমাদিগকে এই সকল আন্দোলন-আস্ফালনের আন্তরিক অসারতা প্রকাশিত হইয়া পড়ে।

এ ভাবকে আমরা শোক বলিতেছি শুদ্ধ এইজন্য যে, ইহার প্রকৃত মর্ম ও সত্য প্রকৃতি ব্যক্ত করিতে পারি, ইংরেজের লোহিতলোচনসম্মুখে আমাদের প্রাণে এমন সাহস হয় না। গভীর বিরাগ, বিজাতীয় বিদ্বেষ, অপরিসীম সন্দিগ্ধতা ও অবিশ্বাস, এ সকলেই আমাদের প্রাণে ইংরেজরাজের এই অমঙ্গল সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছে। ইংরেজের দণ্ডবিধির ভয়ে এ সকল ভাবকে যথাসত্যভাবে ব্যক্ত করিতে সাহস পাই না। তাই বলিয়া আমরা আমাদের অমল লোচনকে কৃষ্ণ অবগুণ্ঠনে আবৃত করিয়া এই অলীক শোকের হাহাকার তুলিয়াছি। ইংরেজের চক্ষে ধূলা দিবার ইচ্ছাতেই আমরা হাতে কালো ফিতা বাঁধিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছিলাম। তারই জন্য আমরা আমাদিগকে বিরাট্ সভার দিনে বহুল অর্থের অপব্যয় করিয়া সভামণ্ডপকে কৃষ্ণবস্ত্রমণ্ডিত করিবার জন্য এত ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছিলাম। তারই জন্য আমরা এই অলীক শোকের কথা এমন তারস্বরে দেশ মধ্যে প্রচার করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে যে, দেশে এই বঙ্গবিভাগ লইয়া একটা শোকের উচ্ছ্বাস উঠিয়াছে, ইহা নহে।

ফলত, ভাবিয়া দেখিলে ইহাতে শোকের কারণই বা কি আছে? ইংরেজ তাহার স্বার্থসাধনের জন্যই এদেশে আসিয়াছে, আমাদিগের উদ্ধারসাধনের জন্য নহে। এতদিনেও যদি আমরা এই সামান্য কথাটা না বুঝিলাম, তবে আমাদিগের বিচারবুদ্ধিকে ধিক্,—শতাধিক ধিক্। আপনার স্বার্থসাধন করিতে যাইয়া, আপনার শ্রেষ্ঠবল প্রয়োগে ইংরেজ যদি আমাদের অনিষ্টসাধন করিতে

যায়, তাহাতে আমাদের ক্ষোভের কারণ থাকিতে পারে, শোকের কারণ কি আছে, বুঝি না। অভিমানেও একপ্রকার শোকের উদ্রেক হয়, কিন্তু ইংরেজ কি এতদিন ধরিয়া আমাদিগকে এতটাই ভালবাসিয়া আসিয়াছে যে, আজ সে সহসা বিমুখ হইল বলিয়া স্ত্রীজন-স্বভাবসুলভ অভিমানভরে আমরা ক্রন্দন করিতে বসিব? ইংরেজ প্রেমের হাট বসাইতে এদেশে আসে নাই, আপনার পণ্য বিক্রয় করিতে আসিয়াছিল। এ তো অতিশয় জানা কথা। তবে, আমাদিগকে হতবীর্য ও হীনবল করিয়া সে আপনার প্রভুশক্তিকে সর্ববিধ উপায়ে এদেশে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছে, ইহার জন্য আমরা এত অধীর হইয়া এরূপ শোকের অভিনয় করিব কেন? ইহাতে আমাদের অকল্যাণ ভিন্ন কদাপি কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

অলীক কথা লইয়া অতিশয় আলোচনা আন্দোলন করিলে, সেই শব্দের অন্তর্বর্তী ভাব ও চরিত্র পর্যন্ত আন্দোলনকারীর স্বভাবে স্বল্পবিস্তর সংক্রমিত হইয়া থাকে, ইহা মনস্তত্ত্বের একটা অতি স্থূল কথা। এইজন্যই এই শোকধ্বনিতে আমাদের বীর্যহানির বিশেষ আশঙ্কা করিতেছি। শোকে লোককে অধীর করে,—আমরা চাই আজ অশেষ ধৈর্য। শোকে মানুষকে হতাশ করে, —আমরা চাই আজ বিপুল বিশ্বের সমগ্র আশাকে হৃদয়ে জাগ্রত করিয়া বিশ্বমানবের বিশাল ক্রোড়ে বাঙালিজাতির জন্য যে বিধাতৃনির্দিষ্ট স্থান অনাদিকাল হইতে বিশ্বের অবিরাম পরিণামের মধ্য দিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে, তাঁহাতে উপবেশন করিতে। জাতীয়জীবনের এই অভিনব উদ্দীপনাকালে কি এই অলীক শোকের অভিনয় আমাদিগকে আর সাজে? ইহাতে ইংরেজের প্রসাদলাভ তো হইবেই না, আমাদেরও শক্তি বা চরিত্র লাভ হইবে না।

আমরা আপনাদিগের অন্তরে শক্তি বা চরিত্র লাভ করিবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল ইংরেজরাজের প্রসাদলাভের জন্য আকুল হইয়া এতকাল বিপুল অর্থ ও সামর্থ্য ব্যয় করিয়া আসিয়াছি। আমাদের প্রচলিত রাজনৈতিক আন্দোলন-অনুষ্ঠানের দ্বারা এইজন্যই আমরা ক্রমশ হতাশ্বাস ও হীনবল হইয়া পড়িয়াছি। ইংরেজ রাজনীতি ও ইংলণ্ডের ইতিহাসের কতকগুলি বাঁধা গত্ সাধিয়া সাধিয়া আমাদের রাজনৈতিক চিন্তা, আলোচনা ও চেষ্টার মৌলিকতা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। দেশের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমরা আজ পর্যন্ত তাহার যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারি নাই, ইহারই জন্য আমাদের সমুদয় চেষ্টা এমন ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে। এখনো যদি অবস্থা-অনুযায়ী ব্যবস্থা কবিতে না পারি, বঙ্গবিভাগসম্বন্ধীয় যে আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে, তাঁহাও নিশ্চয়ই একান্ত ব্যর্থ হইয়া যাইবে।

এইজন্য সর্বাগ্রে প্রকৃত অবস্থাটা যে কি, তাহা বিশদরূপে বুঝিয়া লইতে হইবে; অলীক শব্দসন্ধানে যাইয়া শুদ্ধ পথভ্রান্ত হইয়া শক্তিক্ষয় করিলে চলিবে না। প্রথমত ইংরেজ যদিই বা বাংলাদেশকে দ্বিভাগ করিয়া ফেলে, তাহাতে আমাদের প্রকৃত অনিষ্টসম্ভাবনা কি, ইহা বুঝিতে হইবে; তার পর, সে কেন এ অনিষ্টসাধনে উদ্যত হইয়াছে, তাহারই বা ইহাতে স্বার্থ বা সুবিধা কি, এ কথাও ভাল করিয়া তলাইয়া দেখিতে হইবে। এইরূপ আমাদিগের দিক্ দিয়া ও ইংরেজের দিক্ দিয়া, এই উভয় দিক্ হইতে ধীরভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিলে তাহার প্রকৃত মর্ম উদঘাটিত হইয়া পড়িবে, এবং প্রকৃত অবস্থা একবার পরিস্ফুটভাবে হৃদয়ঙ্গম হইলে যথাবিহিত ব্যবস্থা করা কঠিন হইবে না।

প্রথমত বাংলাদেশ যদি সত্যসত্যই বিভক্ত হইয়া যায়, তাহাতে আমাদের কিরূপ অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা, ইহার আলোচনা করা যাউক। এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়াছেন, কিন্তু সত্যকথাটা পরিষ্কার ভাষায় আজ পর্যন্ত অতি অল্প লোকেই ব্যক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। সে কথাটা যে কেহ বোঝেন নাই, এমন মনে করি না। কথাটা এত জটিল নয় যে, তাহা অতি সামান্য বুদ্ধি লইয়াও কেহ বুঝিতে পারিবেন না। বিষয়টা চক্ষের উপরেই পড়িয়া রহিয়াছে, কিন্তু পথিপার্শ্বস্থ মৃতদেহ দেখিয়া ভীরু লোকে যেমন চোখ বুজিয়া সরিয়া যায়,—কি জানি তাহা

দেখিলে ও তাহার কথা ব্যক্ত করিলে পরিণামে আপনাকেই খুনদায়ে পড়িতে হয়, সেইরূপ কি জানি এই বঙ্গবিভাগের মূল উদ্দেশ্যটা কি, তাহা ব্যক্ত করিয়া বলিলে রাজদ্বারে রাজভক্তিহীনতা-অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া লাঞ্ছিত হইতে হয়, এই ভয়ে বুঝিয়া-সুঝিয়াও অনেকে তাহা মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহসী হন নাই। গতবৎসর এই বিষয়ে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহাতে সকলেই এই মূল উদ্দেশ্যটাকে চাপা দিয়া, অবান্তর বিষয়েরই আলোচনা ও প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। এইজন্য এত সহজে লাট কার্জন তাহার ঢাকা, ময়মনসিং ও চট্টগ্রামের বক্তৃতায়, বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে আমরা যা-কিছু আপত্তি তুলিয়াছিলাম, তাহা অমন করিয়া খণ্ডন করিতে পারিয়াছিলেন। সত্য কথাটা একবার সাহস করিয়া যদি আমরা বলিতে পারিতাম, শাসনের সুবিধার জন্য নহে, কিন্তু গভীর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে এই বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে, এ কথা যদি স্পষ্ট করিয়া একবার বলিতাম, লাট কার্জন তাহার অসাধারণ বিচারশক্তি ও অলোককুটিল যুক্তিজাল বিস্তার করিয়াও আমাদের আপত্তিখণ্ডন বা আমাদিগের যুক্তিবলকে আপাতত অধিকৃত ও পরাভূত করিতে পারিতেন না।

বাংলাবিভাগের বিরুদ্ধে সচরাচর যে সকল আপত্তি উত্থাপিত হইয়া থাকে, তাহা অধিকাংশস্থলেই আমার নিকটে নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। সাক্ষাৎভাবে এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক বা নৈতিক, বা অর্থগত বা সমাজগত কোন বিশেষ অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে, ইহা আমি মনে করি না। আমাদের মানসিক জীবন দেশের পাঠশালা, স্কুল, কালেজ ও ইউনিভার্সিটি দ্বারা গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। শিক্ষাবিষয়ক এই সকল প্রতিষ্ঠান ইংরেজরাজ্যের শিক্ষানীতি দ্বারা সর্বত্রই পরিচালিত হইতেছে। সে নীতি পূর্ববঙ্গে যেমন, পশ্চিমবঙ্গেও সেইরূপই সমভাবে কার্য করিবে। পূর্বেকার অবস্থা যাহাই থাকুক না কেন, এখন যে একই শিক্ষানীতি দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের লোকশিক্ষার অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানাদি পরিচালিত হইতেছে, ইহা অস্বীকার করা অসম্ভব। বাংলা বিভক্ত হইয়া, পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাগ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেই যে এই শিক্ষানীতি দুই বিভাগে দুইরূপ হইবে, তাহা নহে। সুতরাং এই বিভাগপ্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে, আমাদের মানসিক জীবনে সাক্ষাৎরূপে যে কোনপ্রকারের বিশেষ বিসদৃশ ভাব বা আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙালিজাতির বর্তমান মানসিক ঐক্যবন্ধন শিথিল বা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিবে, এমন আশঙ্কা করিবার কিছু কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

রাজকীয় বিধিব্যবস্থা ও রাজনৈতিক সমস্যার সমতা হইতে চিন্তা, ভাব ও আদর্শ বিষয়ে জাতীয়জীবনে যে মানসিক ঐক্য স্থাপিত হয়, একই শাসনাধীনে বাস করিয়া বাঙালিজাতির মধ্যে যে ঐক্যবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া উঠিতেছিল, এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা তাহাও যে সাক্ষাৎভাবে শিথিল বা বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে, এমন আশঙ্কাও করি না। কারণ, রাজকীয় বিধিব্যবস্থা, নিতান্ত স্বেচ্ছাচারী রাজার অধীনেও, প্রজামণ্ডলীর অবস্থারই অনুসরণ করিয়া রচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। আর বাংলাদেশের প্রজাসাধারণের সর্ববিধ অবস্থা পূর্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে যখন একইরূপ রহিয়াছে, ও মোটামুটি একইরূপ থাকিয়াও যাইবে, তখন বাংলার দুই বিভাগে যে রাজকীয়-বিধিব্যবস্থা-জনিত কোন একটা বিশেষ পার্থক্যের সৃষ্টি হইতে পারিবে, এমন ভাবিবার কোন উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না। পশ্চিমবঙ্গে যে সকল আইনকানুন সময়-সময় প্রচলিত হইবে, পূর্ববঙ্গেও প্রায় তাহাই হইবে।

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে বাংলা-সাহিত্যের কোন অনিষ্ট হইবে, এমনও সম্ভাবনা দেখি না। বাংলাসাহিত্য ইংরেজের সংসর্গে অসাধারণ সজীবতা ও প্রসার লাভ করিয়াছে, সত্য; কিন্তু তাহা ইংরেজের শাসন-নীতির দ্বারা হয় নাই, ইংরেজী ও পাশ্চাত্যে দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস ও সাহিত্যেরই দ্বারা হইয়াছে। বাংলা বিভক্ত হইয়া গেলে দেশ মধ্যে পাশ্চাত্যসাধনার চর্চা ও প্রভাব যে কোনরূপে হ্রাস পাইয়া যাইবে, তাহার কোন উপযুক্ত কারণ দেখিতে পাইতেছি না। অতএব

তদ্দ্বারা যে বাংলাসাহিত্যের শক্তিহ্রাস বা অধিকার সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবদ্ধ হইবে, এ আশঙ্কাও করি না। বাংলা সাহিত্য বাঙালিজাতির সাধারণ সম্পত্তি। এই সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে পূর্বে যেমন পশ্চিম ও পূর্ববঙ্গ যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছে, বঙ্গদেশ যদি রাজ-আদেশে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়, তাহার পরেও সেইরূপ পূর্বপশ্চিম সম্মিলিত হইয়াই, এই সাধারণ সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টিসাধনে রত হইবে। স্কুলপাঠ্যের বাহিরে বাংলাসাহিত্যের উপরে বিদেশীয় ইংরেজরাজের হাত সাক্ষাৎভাবে আজ পর্যন্ত পড়ে নাই, কখনো পড়িতে পারিবেও না। আর স্কুলের পাঠ্যের দ্বারা সাহিত্যের দেহপুষ্টি কোথাও হয় না, আমাদের মধ্যেও হইবে না। এই সকল কারণে এই বঙ্গবিভাগপ্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলেই যে অবশ্যম্ভাবীরূপে বাংলাসাহিত্যের উপরে কোন বিশেষ অনিষ্টপাত হইবে, এইরূপ ভয় করিবার উপযুক্ত কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না।

এতদ্দ্বারা যে আমাদের কোন অর্থগত অনিষ্টও সাধিত হইতে পারে, এ আশঙ্কাও করি না। পণ্য ও বাণিজ্য, এই প্রশস্ত পন্থা। এখন দেশে যে পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন হইতেছে, বাংলাদেশে একজন লাটের স্থানে দুইজন লাট প্রতিষ্ঠিত হইবে, এমন কল্পনা করাও সঙ্গত নহে। গ্রাহকের প্রয়োজন দ্বারা সর্বত্রই পণ্যের পরিমাণ নির্ধারিত হইয়া থাকে,—রাজকীয় বিধিব্যবস্থার দ্বারা নহে। ভারতে ইংরেজ রাজ্যে একটা সর্বজনীন অর্থনীতি বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তাহা ভারতের পণ্যবৃদ্ধিতে ভারতবাসীর দৈন্যনিবারণের প্রতিরোধ করিয়া আসিয়াছে, সত্য। ভারতের পণ্যে, এই ব্রিটিশ অর্থনীতি প্রভাবে, ভারতসন্তানগণের দৈন্য দূর হয় নাই, হইতেছে না; ব্রিটিশেরই ধনাগার পরিপূর্ণ ও স্ফীতকায় হইয়া যাইতেছে। বাংলাদেশের পূর্ব-পশ্চিম বিভাগ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্তই থাকুক, আর পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্নই হইয়া যাউক,—তাহা দ্বারা এই সর্বগ্রাসী ব্রিটিশ অর্থনীতির প্রকৃতি কিছুতেই পরিবর্তিত হইবে না। সুতরাং যতদিন এই অর্থনীতি রাজকীয় শাসনের অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকে, ততদিন কিছুতেই আমাদের এই নিদারুণ দৈন্য দূর হইবে না;—বাংলা এক থাকুক আর দুই হউক, এ বিষয়ে আমাদের ভাগ্যপরিবর্তন করিতে পারিবে না। অন্যদিকে, বাংলার বাণিজ্যের লাভ যাহাদেরই মুষ্টিগত হউক না কেন, —বাংলা-বিভাগের দ্বারা এই বাণিজ্যের পরিমাণের কিছুতেই হ্রাসবৃদ্ধি হইবে না। কলিকাতার ব্যবসায়িগণ ও ইংরেজ বণিক্‌সম্প্রদায় এখন বাংলার সমুদায় বহির্বাণিজ্যকে আপনাদের হস্তগত রাখিয়াছেন, বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে, এই বহির্বাণিজ্যস্রোত দ্বিধাবিভক্ত হইয়া, এক ভাগ চট্টগ্রামে চলিয়া যাইবে, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে কলিকাতার যে ক্ষতি হইবে, চট্টগ্রামের সে-পরিমাণ শ্রীবৃদ্ধি হইবেই হইবে। বঙ্গবিভাগে কলিকাতার ব্যবসায়ী ও বণিক্‌সম্প্রদায় ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন, কিন্তু সমষ্টিভাবে বিচার করিলে বাংলাদেশের বা বাঙ্গালিজাতির অর্থগত লাভালাভ তদ্দ্বারা বিশেষ কিছুই হইবে বলিয়া বোধ হয় না। বরং চট্টগ্রামের শ্রীবৃদ্ধিতে মোটের উপরে যে বাণিজ্যবিস্তারের সম্ভাবনা আছে; তাঁহা দ্বারা কলিকাতা বন্দরের বাণিজ্যের যতটুকু হ্রাস হইবার আশঙ্কা আছে, তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিমাণে অধিক হইবারই কথা। সে অবস্থায় চট্টগ্রাম কলিকাতার বাণিজ্য যতটা আত্মসাৎ করিবে, তদপেক্ষা যা-কিছু নূতন পণ্য আমদানি রপ্তানি করিতে পারিবে, সেই পরিমাণে, এই নূতন বন্দরের প্রতিষ্ঠা দ্বারা সমগ্র বাংলাদেশের স্বল্পবিস্তর লাভবান্ হইবারই কথা।

সামাজিক বিষয়েও এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের যে কোন গুরুতর অনিষ্ট হইবার আশঙ্কা আছে, এমনও মনে হয় না। ইংরেজ আইনকানুন ও সিপাইসান্ত্রীরই কর্তা, আমাদের সমাজের প্রভু নহে। আমাদিগের সামাজিক জীবন কার্যত ইংরেজাধিকারের বাহিরে এখনো অনেকটাই পড়িয়া রহিয়াছে। ইংরেজের প্রতি আমাদের বিশ্বাসভক্তি যে-পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাতে আর যে কখনো আমরা স্বেচ্ছায় তাহাকে আমাদিগের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা নষ্ট করিয়া আমাদিগের সামাজিক নেতৃত্বে বরণ করিব, এ আশা একদিন হয় ও

আমরা কেহ কেহ করিতাম, এখন সে আশঙ্কা আর নাই। বিষম-উৎসাহগ্রস্ত সমাজসংস্কারকও এখন আর ইংরেজের হস্তে আপনাদের সামাজিক কুরীতি-কুনীতি সংশোধনের ভার কিঞ্চিৎ পরিমাণেও অর্পণ করিতে সাহস পাইবে না। ইংরেজ দেশীয় জনসাধারণের এতটাই শ্রদ্ধাভাজন হইয়া উঠিয়াছে যে, সে যাহা স্পর্শ করিবে, তাহারই বিরুদ্ধে লোকের মন প্রবলভাবে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইবে। অতএব ইংরেজ বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডই করুক বা দ্বিশতখণ্ডই করুক, বাঙালি-হিন্দুমুসলমানের সামাজিক জীবন তদ্দ্বারা কিছুতেই প্রত্যক্ষভাবে ভালমন্দ কোনদিকেই পরিবর্তিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

বর্তমান আন্দোলনে এ সকল মানসিক, নৈতিক, অর্থগত বা সামাজিক রীতিনীতিসম্বন্ধে বঙ্গবিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা বর্ণিত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহা অধিকাংশস্থলেই নিতান্ত অলীক ও অসার বলিয়া মনে হয়। এই সকল আপত্তির ও আশঙ্কার কোন মৌলিক শক্তি ও সারবত্তা নাই বলিয়াই ইংরেজ এই আন্দোলনকে নিতান্তই কল্পনাজড়িত ও শুদ্ধ ভাবুকতাপ্রধান বা Sentimental বলিয়া মনে করিতেছে। কথাটাও তাহাই। এই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবে আমাদের একটা বহুকালপোষিত ভাবে আঘাত লাগিয়াছে। আমরা বাঙালি সকলে এক হইয়া আছি, একই হইয়া থাকিতে চাই; আমাদের ভাষা এক, সাহিত্য এক, প্রাচীন ইতিহাস এক; ভৌগোলিক ও নৈসর্গিক আধার ও আবেষ্টন এক; আমরা হিন্দু হই, মুসলমান হই, —মোটামুটি আমাদের পুরুষপরম্পরাগত প্রকৃতি ও কৌলিক জীবনপ্রবাহ একই মূল হইতে উৎপন্ন হইয়া, গঙ্গাযমুনাধারার ন্যায়, একই জাতীয়জীবনধারার মধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া বহু শতাব্দী ধরিয়া প্রাচীন স্মৃতি ও সম্বন্ধকে ছিন্ন করিয়া সহসা অকারণে এক অভিনব রাজকীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ইংরেজ আমাদিগকে পূর্ব পশ্চিম এই দুই ভাগে বলপূর্বক বিভক্ত করিবে, ইহা আমাদের মর্মে লাগে। এই মর্মে লাগাটুকুই কেবল, এই Sentimental এবং আমাদের অনিষ্টাশঙ্কা যে কেবলই কল্পিত, ইহা আমারা স্বীকার করি না। এ বিষয়ের প্রকৃত মর্ম ইংরেজও ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে, আমরাও প্রকাশ করিয়া বলিতে বা আলোচনা করিতে আজ পর্যন্ত সাহস পাই নাই। তারই জন্য কেহ বুঝিয়াও, কেহ বা বস্তুতই না বুঝিতে পারিয়া, আমাদিগের এই আপত্তি-ও আন্দোলনকে কেবলই Sentimental বলিয়া প্রচার করিয়াছেন বা ধরিয়া লইয়াছেন। কিন্তু সত্য কথা এ নয়।

এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা আমাদের মানসিক জীবনের, আমাদের জাতীয় সাহিত্যের, আমাদের আর্থিক বা সামাজিক বিশেষ অনিষ্ট হইবে, এ ফাঁকা কথা। আমরাও ইহা জানি, ইংরেজও ইহা বিলক্ষণই বোঝে। আসল কথাটা এই যে, ইহা দ্বারা ইংরেজ এমন এক স্থানে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, যাহার উপরে আমাদের সকল ভবিষ্যৎ উন্নতি ও মুক্তি সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে। এই প্রস্তাবের দ্বারা ইংরেজরাজ আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের, কেবল যে পেলব-পল্লবে আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে, তাহা নহে, কিন্তু তাহার মূলে, একেবারে আপনার সুতীক্ষ্ণ ছুরিকা চালাইবার চেষ্টা করিতেছে। যাহার উপরে আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নতি, সাহিত্যের সম্প্রসারণ, আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ও সামাজিক শক্তিসঞ্চয় ও রাজনৈতিক মুক্তিলাভ, সকলই একান্ত নির্ভর করিতেছে, ইংরেজ এই প্রস্তাব করিয়া সেই বস্তুকে আমূল উৎপাটিত ও বিনষ্ট করিবার প্রয়াস পাইতেছে। ইহাই আমাদের আপত্তির কারণ।

প্রথমত আমরা দেখিতেছি যে, আমাদের সর্ববিষয়ে সার্থকতালাভ আত্যন্তিকভাবে রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা লাভের উপরে নির্ভর করিতেছে। মানসিক উন্নতি, জ্ঞানবিজ্ঞানের অবাধ চর্চা দ্বারা জাতির উদ্ভাবনী শক্তিকে ফুটাইয়া তোলা, প্রথমত শিক্ষার ও দ্বিতীয়ত সেই শিক্ষা হাতেকলমে—কার্যে, জীবনে, চরিত্রে—মূর্তিমতী করিয়া তুলিবার সুযোগ ও অবসরের উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। শিক্ষাপ্রণালী যদি এমন হয় যে, তাঁহার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর মানসিক

শক্তি ও বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন করা নহে, কিন্তু তাহার মধ্যে ধর্ম বা সমাজ বা রাজ্যশাসনবিষয়ে কতকগুলি মত, ভাব ও আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা, তবে সে শিক্ষাদ্বারা শিক্ষার্থীর মানসিক বৃত্তির যথাযথ বিকাশসাধন কদাপি সম্ভব হয় না। ইংরেজের আধুনিক শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য আমাদের মানসিক উন্নতিসাধনের সহায়তা করা নহে, কিন্তু ভারতে ইংরেজ-প্রভুশক্তির স্থায়িত্ব রক্ষা করা। এইজন্য এই শিক্ষা আমাদিগকে জাতীয়জীবনের প্রাচীন গৌরবকাহিনীকে ঢাকিয়া-রাখিয়া আমাদের চিরন্তন হীনতা ও বর্তমান বিদেশীয় রাজজাতির শক্তি ও মহিমা দ্বারা আমাদিগের সরল চিত্তকে অভিভূত করিয়া রাখিবার জন্য এমন অপরিসীম ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া থাকে;—যে সকল উপায়ে আমাদের উদ্ভাবনী শক্তি ফুটিয়া উঠিতে পারে, সর্বদা সশঙ্কিতে, নানা কৌশল অবলম্বনে তাহার পথরুদ্ধ করিয়া রাখিতে চাহে। রাজকার্যে ও স্বদেশের শিক্ষা, সম্পদ্, সৌন্দর্য ও শক্তিবিধানের শতমুখ পন্থায় মানসিক শক্তি নিয়োগ ও মৌলিক গবেষণা করিবার অবাধ সুযোগ ও অবসর প্রাপ্ত হওয়া যায়,—ইংরেজ সেগুলি প্রায় সম্পূর্ণরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। সকল ক্ষেত্রে, সর্ববিধ বিষয়ে দেশের রাজশক্তি তাঁহার হস্তগত আছে বলিয়া, ইংরেজ এদেশে হুকুমবরদার হইয়া রহিয়াছে—দেশে গণ্যমান্য, শিক্ষিত ও শক্তিশালী যে যেখানে আছে, হয় বিজনে পারিবারিক জীবনের সঙ্কীর্ণতা ও নির্জীবতার মধ্যে পড়িয়া আপনার স্বভাবদত্ত শক্তিরাশির অপচয় করিতেছে, অথবা ইংরেজের তাঁবেদার হইয়া দাসের উপজীবিকা সংগ্রহ করিয়া স্বল্পবিস্তরপরিমাণে ইংরেজের প্রসাদভোগ করিতেছে। আপিসে ইংরেজ কর্তা, এদেশীয়গণ তাহার ভৃত্য। ব্যবসায়বাণিজ্যে ইংরেজ ধনী, এদেশীয়েরা কেবল জন খাটিয়া জীবনধারণ করিতেছে। জাতীয়জীবনের বিশাল কর্মভূমিতে যথাযোগ্য কর্তৃত্ব, সুযোগ ও অবসর আমাদের ভাগ্যে কদাপি লাভ হয় না। এ অবস্থায় আমাদের মানসিক, নৈতিক, আর্থিক বা সামাজিক কোনপ্রকারের উন্নতিলাভের আশা অলীক কল্পনামাত্র।

অল্পে অল্পে আমরা এইটি বুঝিয়া উঠিতেছিলাম। **ক্রমে ক্রমে আমাদের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনকে স্বতন্ত্র, স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠিত করিবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা আমাদের মধ্যে জাগিয়া উঠিতেছিল**। ইংরেজ শাসনক্ষেত্রকে অধিকার করিয়া আছে, থাকুক। পুলিস পাহারার ভার এবং এই পুলিস পাহারার জন্যই রাজস্ব আদায় ও ব্যয় করিবার ভারও যে আপনার হাতে রাখিবে, তাহাও রাখুক। আইনকানুন যাহা করিতে হয়, সে করুক। এ সকল বিষয়ে আমরা এখনি তাহাকে সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করিতে পারি, আমাদের সে শক্তি নাই। কিন্তু এই সকলের বাহিরে যে বিশাল কর্মক্ষেত্র পড়িয়া আছে, যথাসাধ্য আমরা অগ্রে সে ক্ষেত্র অধিকার করিতে চেষ্টা করিব। দেশের লোকের শিক্ষার ভার আমরা স্বহস্তে যথাসাধ্য গ্রহণ করিব। দেশের শিক্ষিতদলের সঙ্গে আপামর সাধারণের স্বাভাবিক নেতৃ-নীতসম্বন্ধ যতটা বর্তমান-অবস্থাধীনে পূর্ণপ্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্ভব, ইংরেজের শাসননীতির কুটিল গতির প্রতি বিন্দুমাত্রও ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, আমরা তাহার যথাযোগ্য উপায় উদ্ভাবন ও প্রতিষ্ঠা করিব। এইরূপে বিবিধ ক্ষেত্রে, বিবিধ উপায়ে স্বজাতির আভ্যন্তরীণ প্রজাশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিয়া, জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চারিদিকেই হইতেছিল। এই চেষ্টার সঙ্গে ইংরেজরাজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের একটা সহজ বিরোধ রহিয়াছে। আমাদের এই চেষ্টা যে পরিমাণে ফলবতী হইবে, ভারতশাসনের দ্বারা ইংরেজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধনের পন্থা সেই পরিমাণে সঙ্কুচিত হইয়া আসিবে। ইংরেজের সঙ্গে এখন এমনই এক বিপরীত সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া গিয়াছে যে, আমাদের প্রভাবে তাহার পরাভব, আমাদের ধনাগমে তাহার অর্থহানি, আমাদের শক্তিবিকাশে তাহার শক্তিচালনার ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হইবেই হইবে। এ অবস্থায় ইংরেজ দেবতা হইলেও আমাদের কল্যাণকামনা করিতে পারিত কি না, সন্দেহের কথা। ইংরেজ সামান্য মানুষ, আত্মস্বার্থ নষ্ট করিয়া আমাদের স্বার্থ সে সাধন করিতে যাইবে, এ অদ্ভুত আশা করা বাতুলতামাত্র। অন্য কোন জাতি আমাদের উপর এরূপ অনন্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুশক্তি

লাভ করিলে আমাদিগকে বহুদিন পূর্বে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিত, সন্দেহ নাই। এই নিষ্পেষণে হয় আমাদের জাতীয়শক্তি অরণিগর্ভস্থ অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইয়া পড়িত, নতুবা এই প্রাচীন জাতিও অপরাপর প্রাচীন জাতিসকলের ন্যায় পৃথিবীবক্ষ হইতে একেবারে চিরদিনের জন্য বিলোপ পাইত। ইংরেজ আমাদিগকে প্রাণে প্রাণে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে; যাহাতে আমরা তাহার উন্নত সভ্যতার ভার বহন করিবার উপযোগী বল লাভ করি, তাহারও চেষ্টা করিয়াছে। হৃষ্ট-পুষ্ট-তুষ্ট বলীবর্দের মত বসুন্ধরার শ্রীসম্পৎশক্তিকর্ষণে তাহার সহকারিতা করিয়া আপনাদের অকিঞ্চিৎকর জীবনকে সার্থক করি, ইংরেজ আমাদের জন্য এ আয়োজনও করিয়া রাখিয়াছে। অন্য কোন জাতি ইহাও করিত কি না, সন্দেহ। মানুষে যতটা মহত্ত্ব ও উদারতা সম্ভব, ইংরেজ তাহা দেখাইয়াছে। এর বেশি করিতে পারিলে ইংরেজ দেবতা হইত। দেবতা নয় বলিয়া তাহার নিন্দা করিতে পারি না।

ইংরেজের কোন দোষ ইহাতে নাই—ইংরেজকে ইহার জন্য দায়ী করি না। কিন্তু বিষয়টা এই যে, ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে, বর্তমান অবস্থায়, আমাদের জাতীয় স্বার্থের সম্মিলন ও সামঞ্জস্য কদাপি সম্ভব নহে। **আমরা যে ভাবে আমাদের জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি করিতে চাই, সেভাবে আমাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়, ইংরেজ ইহা ইচ্ছা করিতে পারে না। রাজনীতিক্ষেত্রে আমাদিগকে অশক্ত করিয়া রাখিতে পারিলেই, এদেশে তাহার নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে, অন্যথা নহে। এইটি ইংরেজ বিলক্ষণ বোঝে, এবং বোঝে বলিয়াই বাঙালির জাতীয়জীবনের এই অভিনব অঙ্কুরোদ্গম দর্শন করিয়া আপনার স্বার্থ ও প্রভুত্বের অনিষ্টাশঙ্কায় অধীর হইয়া, বাংলাদেশকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া বাঙালিজাতির এই বিকাশোন্মুখ রাজনৈতিক শক্তি ও প্রভাবকে ভাঙিয়া দিবার জন্য উদ্যত হইয়াছে।**

বর্তমান ভারতবর্ষে যে অভিনব রাজনৈতিক আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত হইয়া ভারতবাসীর রাজনৈতিক জীবনকে উর্বর ও সজীব করিয়া তুলিতেছে, সেই পুণ্যধারার পবিত্র গোমুখী, ভারতভাগ্যবিধাতা, বহুশতাব্দী হইতে বিষমসম্পাতগ্রস্ত ভস্মাবশিষ্ট ভারতবাসীর উদ্ধারের জন্য, এই মুখসর্বস্ব বাঙালির মুখ হইতেই প্রবাহিত করিয়াছেন। বোম্বাইএ, মাদ্রাজে, পঞ্জাবে, আগ্রা ও অযোধ্যায় যে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা আজ জাগিয়া উঠিয়াছে, তাহার মূলে এই অধম বাঙালিজাতির রাজনৈতিক আন্দোলন-আলোচনা প্রত্যক্ষভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙালি কার্যক্ষম নহে, কিন্তু অবলাজনের ন্যায় তাহার দুর্বল হৃদয়ের সংস্পর্শে ভারতের কর্মঠ ও বীর্যবান্ জাতিসকলের জীবনে, ভাবে, চরিত্রে ও চেষ্টায় এক অলৌকিক বল সঞ্চার করিয়া দিয়াছে। এখনো ভারতের অন্যত্র লোকে রাজনীতিক্ষেত্রে যে সৎসাহসের পরিচয় দিতে পারে না—বাঙালি প্রতিদিন তাহার সাক্ষ্যদান করিতেছে। বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনে এমন একটা মুখরতা ও প্রগল্‌ভতা ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা অন্য প্রদেশে এখনো দেখা যায় নাই। এ মুখরতা নির্বীর্য ও নিরস্ত্র ও রমণীস্বভাব বাঙালির মধ্যে কোন বিশেষ অনিষ্টসাধন করিতে পারিবে, ইংরেজ এ আশঙ্কা করে না। কিন্তু তাহার দৃষ্টান্ত যদি অন্যে অনুসরণ করিতে আরম্ভ করে, **বাংলার সংবাদপত্রে এবং বক্তৃতামঞ্চে যে নির্ভীকতার পরিচয় ক্রমশই পাওয়া যাইতেছে,—পঞ্জাবে, অযোধ্যায় ও মহারাষ্ট্রে যদি সে নির্ভীকতা একবার ফুটিয়া উঠে, এমন ভীষণ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইতে পারে, যাহা রাজা প্রজা উভয়েরই মহা অকল্যাণের কারণ হইয়া উঠিবে।** গোমুখীতে গঙ্গার ক্ষীণ নির্ঝরকে যদি বন্ধ করিতে পারা যায়, তবে গঙ্গা-পদ্মা, সকলের শক্তি যেরূপ ক্ষীণ হইয়া যাইবে, সেইরূপ বাঙালির রাজনৈতিক জীবনকে যদি ভাঙিয়া দিতে পারা যায়, তবে ভারতবর্ষের সর্বত্র রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তাপ ও বেগ নিশ্চয়ই কমিয়া আসিবে। এইজন্যই, **আপনার ভবিষ্যৎ অকল্যাণের আশঙ্কা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য ইংরেজ এই বঙ্গবিভাগব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছে।**

বাংলার **রাজনৈতিক শক্তি বাঙালি-হিন্দুদিগের মধ্যে বিশেষভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালি-হিন্দুদিগের ঐক্য ও উপচীয়মান প্রভুত্বকে যদি বিনাশ করিতে পারা যায়, বাংলার রাজনৈতিক জীবন ও শক্তি বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা ইংরেজ তাহারই চেষ্টা করিতেছে।** পূর্ববঙ্গে অধিকাংশ অধিবাসী মুসলমান। এই মুসলমানগণ স্মরণাতীত কাল হইতে আপনাদিগের হিন্দু প্রতিবেশীদের সঙ্গে সর্ববিষয়ে অত্যন্ত সদ্ভাবে বাস করিয়া আসিতেছেন। বাংলার অধিকাংশ মুসলমানই ফলত আদিতে হিন্দুসন্তান ছিলেন। হিন্দুদিগের সঙ্গে কুলগত বা ethnological কোন বিশেষ পার্থক্য ইহাদিগের নাই। হিন্দু মুসলমানের বিবাদ বাংলায় কখনো শোনা যায় নাই। **ইংরেজের কুটিল রাজনীতি উত্তরপশ্চিম প্রদেশে,—আগ্রা ও অযোধ্যায়—হিন্দু মুসলমানের মধ্যে যে বিদ্বেষবহ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিয়াছে, বাংলাতেও এই বঙ্গবিভাগের পরে, তাহা করিতে চেষ্টা করিবে।** মুসলমানসম্প্রদায় নানা কারণে এখনো ইংরেজের মুখাপেক্ষী হইয়া চলাকেই শ্রেয়স্কর মনে করেন। পূর্ববঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের কোন কোন নেতা ইতিমধ্যেই, এই বঙ্গবিভাগবিষয়েই, ইংরেজনীতির সমর্থন করিয়াছেন। এই সকল অনুচরের সাহায্যে আপনার কুটিল ভেদনীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া, ইংরেজ বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিবিধ রাজকীয় ব্যাপারে ঈর্ষাদ্বেষ উৎপাদন ও পরিপোষণ করাইয়া, বাঙালির রাজনৈতিক শক্তিকে অক্ষম করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবে। পশ্চিমবঙ্গে সেইরূপ ভেদনীতি প্রচার করিয়া উড়িষ্যাবাসী ও বেহারবাসীদিগের সাহায্যে মুষ্টিমেয় বাঙালীকে চাপিয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে এবং পূর্ববঙ্গে চা-কর সম্প্রদায় ও পশ্চিমবঙ্গে ইংরেজ বণিক্‌মণ্ডলী ও বেহারের নীলকরদল, উভয়ত্রই হিন্দুমুসলমানকে চাপিয়া রাখিবে। এইভাবে, **এই বঙ্গবিভাগের দ্বারা, বাংলার বর্তমান রাজনৈতিক শক্তিকে নষ্ট করিবার চেষ্টা হইবে।** এই আমাদের প্রধান আশঙ্কা। ইহাই আমাদের এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি। এই জন্যই আমি মনে করি যে, বঙ্গবিভাগ কেবল বাংলার নহে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষের নবোন্মেষিত জাতীয়জীবনের উপরে বিষম কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছে। এইজন্যই ইংরেজ যাই করুক না কেন-আমাদিগকে এই প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়া, অনুরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

বঙ্গদর্শন ৫ম বর্ষ কার্তিক

২. বঙ্গচ্ছেদে বঙ্গের ব্যবস্থা

ইংরেজ অকারণে বাংলাদেশকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয় নাই। প্রকাশ্যে যে কারণ দেখাইতেছে, তাহাই যে এই ব্যাপারের মুখ্য হেতু, ইহাও সহজে বিশ্বাস করা যায় না। দেশটা অতি বড় হইয়া পড়িয়াছে, লোকসংখ্যা অনেক বাড়িয়াছে, শাসনযন্ত্রের জটিলতাও তার সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পাইয়াছে;—এত বড় দেশ, এতগুলি লোক. এমন জটিল শাসনযন্ত্রের উপরে যথাযথ দৃষ্টি রাখিয়া তাহাকে যথানিয়মে পরিচালিত করা একজন লাটের পক্ষে অসাধ্য,—এ কথার কোনো মূল্য নাই। কিছুদিন হইতে বাংলাশাসনে যাহাদের অভিজ্ঞতা নাই, এমন রাজপুরুষ বাংলার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইতেছেন, এই কারণে তাহাদের পক্ষে শাসনভার কিঞ্চিৎ পরিমাণে গুরুতর হইতে পারে। কিন্তু এ রোগের ঔষধ যথাসম্ভব বাংলার রাজপুরুষগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত লোক নির্বাচন করিয়া বাংলার শাসনের পদে প্রতিষ্ঠিত করা। বাংলাকে দ্বিখণ্ড করা নহে। আর দেশের প্রধানতম রাজপুরুষকে সাধারণভাবে শাসননীতির তত্ত্বাবধানই করিতে হয়, পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রত্যেক বিষয়ের অনুসন্ধান করা ও প্রত্যেক কার্যের পর্যবেক্ষণ করা তাহার সঙ্গত কর্তব্য নহে। এ সকল ভার স্থানীয় শাসনকর্তাদিগের উপরেই ন্যস্ত আছে। তবে আর লাটের ভার এত গুরু হইল কিরূপে? বাংলার ছোটলাট বাহিরের অনেক কার্য সাধন করিয়া থাকেন।

তাহার এক ষাণ্মাসিক সফরে যে শক্তিক্ষয় হয়, তাহা দেখিয়াও এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন যে, বাংলার লাট বস্তুতই অতি গুরুভারে নিপীড়িত হইতেছেন। বর্তমান লাটবাহাদুর ধর্ম ব্যবসায়ীর পুত্র, ধর্মপ্রচারে বৈজিক প্রভাবে বিশেষ অনুরক্ত। তিনি তো কদাপি পাদ্রিসভার সভাপতিত্ব গ্রহণে অবসরাভাব অনুভব করেন না। তবে কি করিয়া বলি, তিনি শাসনকার্য সম্যক্‌রূপে পরিদর্শন করিয়া উঠিতে পারেন না? মোট কথা এই শাসনভারের গুরুত্ব একটা ছুতোমাত্র, ইহা বাংলা বিভাগের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইহার মূলে গভীর, কুটিল রাজনীতি বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ইংরেজ এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সহজে কদাপি ইহা হইতে বিরত হইবে না।

বাংলাদেশ বিভক্ত হইবে, ইহা প্রথম হইতেই জানিতাম। বাংলার রাজনৈতিক শক্তি প্রবল হইয়া উঠিয়াছে, ইংরেজ ইহা বহুকাল হইতেই লক্ষ্য করিয়া আসিতেছিল। এই রাজনৈতিক শক্তিকে ইংরেজ ভয়ের চক্ষে দেখিতেছিল। বহুদিন হইতে নানা উপায়ে এই শক্তিকে সংযত করিবার চেষ্টা করিয়াছে। ক্যাম্বেলীশাসনে উচ্চশিক্ষার বিরুদ্ধে এতদর্থেই সংগ্রাম ঘোষণা করা হয়। উড়িষ্যা ও বেহারে বাঙালি যাহাতে কোনো প্রকারে প্রভাববিস্তার করিবার অবসর না পায়, তজ্জন্যও বহুকাল হইতে বিশেষ চেষ্টা হইতেছিল। এই ভেদনীতি নূতন নহে। এই নীতিপ্রসাদে বেহারে বাঙালির প্রতি সৌহার্দ হ্রাস হইয়াছে। ইহারই প্রভাবে ইংরেজের কুটিলনীতি মূর্তিমতী হইয়া উড়িষ্যায় একটা কপট, সঙ্কীর্ণ, স্বার্থপর স্বদেশহিতৈষার জাল পাতিয়া উৎকলীয়দিগের প্রাণে বাঙালি বিদ্বেষ জ্বালিতেছে। এই নীতিই আসামে আসামী ও বাঙালির মধ্যে বিষম প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করিয়া জাতীয় একতাসাধনের অভিনব অন্তরায় উৎপাদন করিতেছে। এই ভেদনীতি প্রতিষ্ঠার দ্বারা ইংরেজ এদেশ অধিকার করিয়াছিল; এই ভেদনীতি প্রচার করিয়াই দেশ মধ্যে সে আপনার বর্তমান অসংযত অধিকারকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহিতেছে। এই ভেদনীতির সফলতার উপরেই, ইংরেজ মনে করে, ভারতে তাহার প্রভুশক্তি চিরপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। **আত্মরক্ষার্থে সে এই ভেদনীতি অবলম্বন করিয়াছে—আমাদের নিন্দাস্তুতিতে, আমাদের নিবেদন-আবেদনে বা আন্দোলন-আর্তনাদে সে কদাপি ইহা পরিত্যাগ করিবে না, করিতে পারে না।**

নিগূঢ় স্বার্থের প্রেরণায় ইংরেজ বাংলাকে বিভক্ত করিতে উদ্যত হয়, আমাদের চীৎকারে যে সে তাহা হইতে বিরত হইবে, এ কল্পনা আমি কদাপি করি নাই। আর এই স্বার্থ যেমন এদেশের রাজপুরুষদিগের তেমনি সমগ্র ইংরেজ জাতির। বিলাতের লোকে বা বিলাতের মন্ত্রিদল আমাদের মুখ চাহিয়া এ ভেদনীতি বর্জন করিতে যে ভারতের রাজপুরুষদিগকে কদাপি অনুরোধ করিবেন, এ কল্পনাও আমি কখনো করি নাই। আমরা এদেশের রাজপুরুষ ও বিলাতের ইংরেজমণ্ডলীর মধ্যে ভাবগত, আদর্শগত ও চরিত্রগত যতটা প্রভেদ আছে বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকি, বাস্তবিক তাহাদের মধ্যে সে প্রভেদ নাই। এখানকার অবস্থা গুণে ইংরেজের আচার-আচরণ কতকটা পরিবর্তিত হইয়া যায় সত্য—কিন্তু সেটা কেবল বাহ্যব্যাপার মাত্র। ইংরেজ এদেশে আপনার ভৃত্যকে গালি দিয়া বা প্রহার করিয়া আপনার প্রভুত্ব রক্ষা করে, স্বদেশে কথায় কথায় তাহাকে ধন্যবাদ করিয়া ভৃত্যের পরিচর্যা লইতে হয়। ইহা এজন্য নহে যে, এদেশে আসিয়া সে মন্দলোক হইয়া যায়, কিন্তু কেবল এই কারণে যে, বিলাতে ভৃত্যের অঙ্গে হাত তুলিলে তাহার আপনার পৃষ্ঠ নিরাপদ্‌ থাকে না,—এখানে কৃষ্ণকথায় ভৃত্যকে পদদলিত করিলেও সে কদাপি তাহার প্রতিশোধ নিতে চায় না। এদেশে ইংরেজের চরিত্র যদি বিকৃত হয়, তাহা আমাদের গুণে, তাহার আপনার দোষে নহে।

ফলত ইংরেজ কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সর্বত্রই আপনার স্বার্থটা পূর্ণমাত্রায় বোঝে এবং তাহা রক্ষা করিবার জন্য সদসৎ সর্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। উদারনীতিকই হউক বা রক্ষণশীলই হউক, ইংরেজ সর্বাগ্রে ইংরেজ। ইংরেজত্বকে বজায় রাখিয়া তবে সে উদারমতি

বা রক্ষণশীল হইয়া থাকে। এইজন্য ইংরেজের স্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থের যখনই বিরোধ উপস্থিত হয়, তখনই সে স্বার্থ রক্ষা করিবার জন্য উদারমতিও রক্ষণশীল হয়, রক্ষণশীল উদারমতি হইয়া উঠে। সেখানে ইংরেজ এক। বাহিরে উদারমতি ও রক্ষণশীলে যতই বিরোধ হউক না কেন,—উদারনীতি ও রক্ষণনীতির উপরে ও অন্তরালে একটা সাধারণ ব্রিটিশনীতি বিদ্যমান আছে। ঐ নীতিই ইংরেজের ইতিহাসকে বিরলে বসিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে! মন্ত্রীপরিবর্তন, মত পরিবর্তন, রাজনৈতিক দলাদলির ঘাতপ্রতিঘাতের অবিরাম আন্দোলন ও আবর্তনের মধ্যে ঐ সনাতন ব্রিটিশনীতিই সাক্ষী ও আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। তাহারই উপরে ইংরেজনীতির একত্ব প্রতিষ্ঠিত। একদল মন্ত্রী যায়, আর একদল আসে, কিন্তু এই সনাতন নীতির অঙ্গে কেহ হস্তক্ষেপ করে না। এইজন্য একদল পররাষ্ট্র হরণ করে ও হরণকালে বিপক্ষদলের নিকট যথেষ্ট লাঞ্ছনা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু হৃতরাষ্ট্র আত্মসাৎ করিবার সময় কোনো দলেরই আপত্তি থাকে না। বুয়রবিগ্রহকালে উদারমতিদল বর্তমান মন্ত্রিসমাজের বিরুদ্ধে কি আন্দোলনই না করিয়াছিল; কিন্তু চারিবৎসর পূর্বে যদি উদারমতিগণ মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইত, এই অন্যায়সমরলব্ধ ট্রান্সভ্যাল ও অরেঞ্জ রিভার রিপব্লিক্‌কেও আত্মসাৎ করিতে তাহারা কিঞ্চিৎমাত্রও কুণ্ঠিত হইত না। বিপক্ষের চৌর্যাপবাধের প্রতিবাদ করিতে উভয় পক্ষই পটু, কিন্তু চৌর্যলব্ধ পরধন স্বজাতিসাৎ করিবার সময়ে কেহই কদাপি পরাঙ্মুখ হন না। ইহারই নাম ইংরেজনীতি, এতদ্দ্বারাই সনাতন ব্রিটিশনীতির পরিচয় ও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এই সনাতন ব্রিটিশনীতির তথ্য যাহারা অবগত আছেন, বিলাতের রাজপুরুষেরা বা প্রজাসাধারণে যে কখনো বাংলাবিভাগের প্রস্তাব রদ করিবেন, তাহারা কখনো এ কল্পনা করেন নাই। এ বিষয়ে এদেশে আন্দোলন যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিষ্ফল হইয়া যাইবে; ইহা অভিজ্ঞ লোকে অনেকেই বিশ্বাস করিয়াছিলেন। উদারমতিদল এই সনাতন ব্রিটিশনীতির বিরুদ্ধে ভারতের হিতকামনায় যে আজ পর্যন্ত কোনো সাধুকার্য করিয়াছেন, ইতিহাসের স্মৃতিতে তাহা অন্বেষণ করিয়া পাওয়া যায় না। রিপন্-আমলে ইহারা লীটন্-প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রসম্বন্ধীয় কঠিন বিধি রদ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবারেও যে মন্ত্রিত্ব পাইলেই বাংলাবিভাগের ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত করিয়া দিবেন, এ কল্পনাও নিতান্তই অসার ও অলীক। লীটন্-আমলে কেবল মুদ্রাযন্ত্রবিধিই যে প্রজার স্বার্থ স্বাধীনতাকে সঙ্কুচিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল, তাহা নহে। ফলত লীটন্-দরবারে যত রাজবিধি প্রচলিত হয়, তন্মধ্যে ভারতের জাতীয়জীবনের পক্ষে অস্ত্রবিধিই সর্বাপেক্ষা সাংঘাতিক ছিল। ইতিপূর্বে ভারতের সমগ্র প্রজামণ্ডলীকে ইংরেজ কখনো একেবারে নিরস্ত্র করিতে উদ্যত হয় নাই। বৈধভাবে অস্ত্রধারণ ও আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রচালনা করিবার অধিকার প্রজার মৌলিক অধিকার। এ অধিকার হইতে যে দেশের প্রজামণ্ডলী বঞ্চিত হয়, কেবল তাহাদের রাজনৈতিক জীবন নহে, কিন্তু মনুষ্যত্ব পর্যন্ত হেয় ও হীন হইয়া পড়ে। ইংরেজরাজ লীটন্-আমলে ভারতের মনুষ্যত্বের মূলে এই বিষম আঘাত করেন। বিদেশীয় প্রজাকে নিরস্ত্র ও নির্বীর্য করিয়া রাখা সনাতন ব্রিটিশনীতির অন্তর্ভুক্ত। ইহার উপরে স্বজাতির যথেচ্ছ-অধিকার পররাষ্ট্রে স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইংরেজ ইহা মনে করে। অস্ত্র-আইনের সঙ্গে ইংরেজের জাতীয়স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এই জন্য উদারমতি রিপন এই বিধানের প্রতিবিধানের জন্য কিঞ্চিৎমাত্রও চেষ্টা করিলেন না; কিন্তু স্বদলের ঔদার্য প্রভাবে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিধানটি তুলিয়া দিলেন। ফলত মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক বিধানের দ্বারা ইংরেজ আপনার উপরে আপনি বিপদ্ ডাকিয়া আনিতেছিল। এই বিদেশি প্রজামণ্ডলীর গোপনীয় মনোভাব ইংরেজ কেবল মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যেই অবগত হইতে পারে। এইজন্য মুদ্রাযন্ত্রের ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষা করা ইংরেজের আত্মরক্ষার নিমিত্তই আবশ্যক। আত্মপ্রয়োজনেই রিপন-শাসনে ইংরেজ লীটনের অদূরদর্শী বিপদসঙ্কুল মুদ্রাযন্ত্রনীতিকে বর্জন করিয়া প্রজামণ্ডলীর স্বাধীনভাবে মনোভাব ব্যক্ত করিবার হৃত অধিকার তাঁহাদিগকে পুনরর্পণ

করে, আমাদের বিশেষ কল্যাণকামনায় নহে। ইংরেজ যদি বোঝে যে, বঙ্গবিভাগের প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে তাহার কোনো বিশেষ বিপৎপাতের আশঙ্কা আছে, সে সোৎসাহে অতিশয় ঔদার্য প্রকাশ করিয়া ইহা পরিত্যাগ করিবার জন্য ভারতের শাসনকর্তাগণকে অবিলম্বে অনুরোধ করিবে। অন্যথা আমরা যতই আন্দোলন-আর্তনাদ করি না কেন, সে তৎপ্রতি কদাপি কর্ণপাত করিবে না।

এদেশের আন্দোলন যেমন নিষ্ফল হইয়াছে, এইজন্য বিলাতের আন্দোলনও সেইরূপ নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইয়া যাইবে। এই সকল নিষ্ফল আন্দোলনে শক্তিক্ষয় না করিয়া, এখন আমাদিগকে আপনাদিগের শক্তিসংগ্রহ করিয়া, আত্মশক্তিপ্রয়োগে এই অনিষ্টনিবারণের আয়োজন করিতে হইবে।

আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ইংরেজ আপনিই আমাদের বিলাতি আন্দোলনের পথ একরূপ বন্ধ করিয়া দিয়াছে। বঙ্গবিভাগের আদেশ প্রচারিত হইয়াছে, নূতন সুবাসৃষ্টির জন্য অভিনব রাজবিধি প্রণীত হইয়া তাহা পাস্ হইয়াও যাইবে। এখন আর এজন্য বিলাতে আন্দোলনের প্রয়োজন আছে বলিয়া আমাদিগের **রাজভক্ত স্বদেশহিতৈষিগণও** মনে করিবেন, এমন বোধ হয় না। বিশেষত আমরা এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রবল আন্দেলন করিয়াছি, ও করিতেছি, তাহাতেই ইহার রদের পথ একেবারে বন্ধ হইয়াছে।

কার্জনবাহাদুর এরূপভাবে তাড়াতাড়ি বাংলাবিভাগের আদেশ প্রচার করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করিয়াছেন কি না, জানি না। তিনি আমাদিগের বিচারাধীন নহেন; ইতিহাস প্রত্যক্ষ প্রমাণে তাহাব ভারতশাসনের যথাযথ বিচার করিবে। কিন্তু কাজটা ভালই হউক আর মন্দই হউক, ইহা দ্বারা বর্তমান রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির মধ্যে ভবিষ্যৎ সন্ধির সম্ভাবনা একেবারে নষ্ট হইয়াছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। আমরা যদি, যেভাবে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছি, তাহা না করিতাম, —শিষ্টসন্তানের ন্যায় কঠোর বিমাতৃ-আজ্ঞা পাইয়া যদি কেবল অশ্রুজলেই আমাদিগের মনোবাসনা নিঃশেষ নির্বাপিত করিতাম, তবেও বা হয়ত ইংরেজ কখনো আমাদের দুঃখমোচনার্থ ইচ্ছুক হইতে পারিত। কিন্তু আমরা এই আন্দোলনে অভিনব ও অজ্ঞাতপূর্ব অস্ত্র ধারণ করিয়াছি। ইংরেজের শ্রুত্যাধারকে পরিত্যাগ করিয়া, আমরা তাহার অর্থাধারের উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছি। প্রাচীন আত্মনিবেদনের পন্থা নিষ্ফল জ্ঞানে বর্জন করিয়া, এখন আমরা আত্মপ্রতিষ্ঠাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। ইংরেজ আমাদের আবেদন-আর্তনাদে কান দেয় নাই, এখন যদি আমরা তাহার বিরুদ্ধে পণ্যসংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছি বলিয়া আমাদের অভিযোগে মনোনিবেশ করে ও আমাদিগকে ঈপ্সিতফলদানে শান্ত করিতে উদ্যত হয়, যে কুহকজালে তাহার প্রভুশক্তি এতকাল ভারতের অমিতসংখ্যক প্রজমণ্ডলীকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা ছিঁড়িতে আরম্ভ করিবে। পূর্বে আমাদের আর্তনাদে এই অনিষ্টপাত নিবারণ করা ইংরেজের পক্ষে বুদ্ধির কার্য হইত; এখন, এই আধুনিক রাজাজ্ঞাপ্রচারের পর, এই প্রস্তাব প্রত্যাহার করা, সাংঘাতিক দুর্বলতার পরিচায়ক হইবে। লাট কার্জন্ ইংরেজরাজের প্রত্যাবর্তনের পথ স্বয়ং রুদ্ধ করিয়া দিয়াছেন।

তিনি আমাদিগের প্রত্যাবর্তনের পথ নষ্ট করিয়াছেন। বর্তমান অবস্থায় আমরা যদি রণে ভঙ্গ দিই, ভারতের প্রজামণ্ডলীর পক্ষে আর বহুকাল মধ্যে রাজনৈতিক অধিকারপ্রতিষ্ঠার কোনোই সম্ভাবনা থাকিবে না।

অবস্থা এম্নি দাঁড়াইয়াছে যে, ইংরেজকেও এখন বাংলাবিভাগ করিতেই হইবে; আমাদিগকেও তাহার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করিতে হইবে। **বাংলাদেশ বিভক্ত হইলেও আমাদিগের এই আন্দোলন ও চেষ্টা নিবৃত্ত হইতে পারিবে না। তবে এখন বিলাত-আপিল পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশীয় প্রজাসাধারণের নিকটে ইংরেজরাজের এই কু-অভিসন্ধির বিরুদ্ধে আবেদন অভিযোগ উপস্থিত করিতে হইবে।**

ইংরেজ আপনার সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জন্য বাংলাকে অযথা কারণে বিভাগ করিতেছে; আমরা আমাদের জাতীয়স্বার্থরক্ষার্থে যথাসম্ভব বাংলাকে একত্র করিয়া রাখিতে চেষ্টা করিব। এইজন্য বাংলায় একটা জাতীয়সমিতি গঠন করিতে হইবে। এই সমিতি পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ, উভয় বিভাগের সর্বপ্রকার স্বদেশি অনুষ্ঠানকে একই আদর্শে প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ও একই উপায়ে তাহার উদ্দেশ্যসিদ্ধির চেষ্টা করিবে। ইংরেজদরবারে যদি কখনো কোনো আবেদন-আন্দোলন উপস্থিত করিতে হয়, তাহা পূর্ববঙ্গের শাসনাদি সম্বন্ধেই হউক, আর পশ্চিমবঙ্গের শাসনাদি সম্বন্ধেই হউক, এই সমিতিকেই করিতে হইবে। ইংরেজরাজ বাংলাকে দ্বিভাগ করিয়াছেন, করুন; রাজপুরুষদিগের প্রতিষ্ঠা ও পরিবর্তনাদি তাহারা যে ভাবে হউক যদৃচ্ছা বিহিত করুন; আইনকানুন যখন যেরূপ ইচ্ছা, এই দুই ভাগে বিধিবদ্ধ করুন, কিন্তু আমরা একের কর্তব্যকে উভয়ের কর্তব্য মনে করিয়া, কার্যত যুক্তভাবে তাহা সাধন করিব। পূর্ববঙ্গে স্বতন্ত্র রাজনৈতিক সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত করিব না, পশ্চিমবঙ্গেও করিব না,—আমাদের বেসরকারি স্বায়ত্তশাসন উভয় ভাগে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখিব ও প্রতিষ্ঠিত করিব। এই বাংলা জাতীয়সমিতির অধীনে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক জেলায় জেলাসমিতি, এ জেলাসমিতির অধীনে প্রত্যেক সব্‌ডিভিসনে সব্‌ডিভিসন সমিতি, ও তাহার অধীনে গ্রাম্যসমিতিসকল প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সমগ্র বাংলাদেশকে, রাজশাসনবিভাগ নির্বিশেষে, লাটভক্তি ও লাটবিভক্তি উভয়কে উপেক্ষা করিয়া, এক বিশাল, স্বাধীন, সবল, স্বদেশসেবানুপ্রাণিত, স্বজাতিহিতরত, আত্মশাসনজালে আবদ্ধ করিবে। এই সকল সমিতি স্বদেশচর্যার জন্য আপনারা আপনাদিগের উপরে ইচ্ছাকর নির্ধারিত করিবে; আপনারা আপনাদের শাসনাদির ব্যবস্থা করিয়া লইবে; আপনাদের শক্তি, অর্থ ও সর্ববিধ চেষ্টা নিয়োগ করিবে। এইরূপ একটা বিরাট্ বাংলা জাতীয়সমিতি গঠন করা, বর্তমান অবস্থায়, আমাদের সর্বপ্রধান কর্তব্য।

ইংরেজ আমাদিগের রাজনৈতিক একতাকে ভাঙিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে, আমরা তাহা ভাঙিতে দিব না। যাহাতে ইংরেজ এ অনিষ্টপাতে অক্ষম হয়, যাহাতে বাংলার প্রজাশক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়া একই যন্ত্রসাহায্যে সমগ্র বাংলার হিতসাধনে প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহার জন্য এই সমিতি গঠন করিতে হইবে। সেইরূপ ইংরেজ বাংলা ভাগ করিয়া দিয়া, এদেশে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা জাগাইবার আয়োজন করিতেছে; তাহার প্রতিবিধানের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। হিন্দুমুসলমানের মধ্যে এদেশে বহুকালাবধি অপূর্ব সৌহার্দ্য বিদ্যমান রহিয়াছে। ইদানীন্তন কালে ইংরেজের ইঙ্গিতে, রাজকীয় ভিক্ষার লোভে, কোনো কোনো স্থলে মুসলমানহিন্দুর এই প্রাচীন সৌখ্য নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এ সকল চেষ্টা এখনো অতি সঙ্কীর্ণ সীমাতেই আবদ্ধ রহিয়াছে। বাংলাবিভাগ করিয়া এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া তোলা হইবে। আমাদিগকে এই চেষ্টার প্রতিরোধ করিতে হইবে।

প্রথমত যে সূত্রে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইবার সম্ভাবনা, তাহা নষ্ট করিয়া দিতে হইবে। ইহার এক সূত্র সরকারি চাকুরি, অপর সরকারি অবৈতনিক সম্মানার্হ পদ ও খ্যাতি। এই দুই লোভ যদি জয় করিতে পারি, তবে ইংরেজ শত চেষ্টা করিয়াও আমাদিগের মধ্যে কোনো বিরোধ উৎপাদন করিতে পারিবে না। কুক্কুর যেমন পরিত্যক্ত উচ্ছিষ্ট মাংসখণ্ড লইয়া পরস্পরের সঙ্গে বিষম কলহে প্রবৃত্ত হয়, সেইরূপ ইংরেজের উচ্ছিষ্ট সামান্য রাজকর্মের লোভে হিন্দু মুসলমানে বিষম কলহ উপস্থিত হইবে। এই অনিষ্টাশঙ্কা নিবারণ করিতে হইলে সরকারি কার্যের প্রতি দেশের লোকের মনে ঘৃণা ও উপেক্ষা উৎপাদন করিতে হইবে; যথাসম্ভব ইংরেজের দাসত্ব হইতে বিরত থাকিতে হইবে; এবং যাহারা অনন্যোপায় হইয়া উদরান্নের জন্য এই দাসত্ব গ্রহণ করিবে, স্বদেশের জনসাধারণের চক্ষে তাহারা হীনবৃত্ত বলিয়া পরিগণিত হইবে। রাজা যাহাকে সম্মান করিবে, আমরা সে সম্মান স্বীকার করিব না। রাজা যাহাকে মান্য করিবে, আমরা তাহাকে

উপেক্ষা করিব। রাজার খেলাতখেতাব আমরা দাসত্বের চিহ্ন বলিয়া ঘৃণার চক্ষে দেখিব। এই ভাব প্রাণপণে স্বদেশীয় জনগণের মধ্যে প্রদীপ্ত করিয়া দিতে হইবে। এই উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিবাদের কারণ সমূলে বিনাশ করিয়া দিলে, ইংরেজ আর এই বিভাগের দ্বারা আমাদিগের জাতীয়জীবনকে হীনবল করিতে পারিবে না।

এতদ্ব্যতীত হিন্দুদিগের মধ্যে মুসলমানের ও মুসলমানের মধ্যে হিন্দুর সাহিত্য ও সাধনার সম্যক্ প্রচার করিয়া উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ভদ্রমণ্ডলীকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাবান করিতে হইবে। হিন্দু বিশ্বমানবের সাধনভাণ্ডারে যেরূপ আপনার মহার্ঘ সাধনধন প্রদান করিয়াছে, মুসলমানও সেইরূপই করিয়াছে। মুসলমানও একদিন য়ুরোপের গুরু ছিল, মুসলমানও জগৎকে অনেক শিক্ষাদীক্ষা দান করিয়াছে। ভারতের ইতিহাসে মুসলমান অক্ষয়কীর্তি রাখিয়াছে। বর্তমান ভারতীয় সভ্যতা যেমন হিন্দুর নিকটে, সেইরূপ মুসলমানের নিকটেও অশেষপ্রকারে ঋণী রহিয়াছে। উদারভাবে, মনস্তত্ত্বের দিক্ দিয়া, জাতীয়জীবনের বিবর্তনের বিধানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভারতের ইতিহাসের অধ্যয়ন ও আলোচনা করিয়া ভারতের ইতিহাসকে পুনর্গঠন করিতে হইবে। এই সকল উপায়ে হিন্দুমুসলমানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধাব উদ্রেক করিয়া নবভারতের জাতীয় একতাসাধনের চেষ্টা করিতে হইবে। এইরূপেও বাংলাবিভাগের দ্বারা যে অনিষ্টপাতের আশঙ্কা আছে, তাহা নিবারণ করিতে পারা যাইবে।

বিদেশীয়-পণ্য-ব্যবহার হইতে বিরত হইয়া বঙ্গবিভাগনিবারণের যে চেষ্টা হইয়াছে, তাহাকে সর্বপ্রযত্নে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। এই চেষ্টা বঙ্গবিভাগ উপলক্ষ্যে প্রবল হইয়াছে মাত্র, মূলত বঙ্গবিভাগের সঙ্গে ইহার কোনো সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। বঙ্গবিভাগ না হইলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইত; বঙ্গবিভাগ হইয়া গেলেও এই চেষ্টাকে বলবতী করিয়া রাখিতে হইবে; কারণ, এই চেষ্টার উপরে আমাদিগের সমগ্র জাতীয়জীবনের শক্তি ও মুক্তিসাধন নির্ভর করিতেছে। বিদেশিপণ্য পরিহারের যে সঙ্কল্প হইয়াছে, বঙ্গবিভাগের সঙ্গে তাঁহার কোনো আন্তরিক সম্বন্ধ নাই; স্বতন্ত্রভাবেই এই বিষয়ের আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। সময়ান্তরে ইহার স্বতন্ত্র আলোচনা করিব।

বঙ্গদর্শন ৫ম বর্ষ অগ্রহায়ণ

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

১. আবেদন, —না আত্মচেষ্টা*

স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোন পন্থা প্রশস্ত এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, ইহা একটি শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ইহাতে জানা যাইতেছে, আমাদের অসাড় সমাজদেহে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অন্ন মৎসাহার ক্ষুদ্রকায় একটি আসিরিক জাতির অভিনব অসাধারণ অভ্যুদয় ও উন্নতির যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাই আমাদিগকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন পথে গেলে, উহাদের ন্যায় আমরাও আবার উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে পারিব, সেই বিষয় আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ইহাতে নিচ দলাদলির গন্ধ মাত্র নাই। কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা।

একদল বলিতেছেন, রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্যের প্রতিবাদ করা, তাহাদের কর্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করা, বর্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদের মুখ্য কার্য, উন্নতি সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের গৌণ কর্তব্য। স্পষ্ট এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্ত না করিলেও, তাহাদের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, এই কথারই আভাস পাওয়া যায়।

আর একদল বলেন, শুধু আবেদন নিবেদনে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি আমরা নিজের চেষ্টায় নিজের অভাব স্বল্পমাত্রও পূরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আত্মনির্ভরের শিক্ষা হয়। আমরা আত্মসম্মান ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, নিজস্ব বলে বলীয়ান হইতে পারি, জাতীয় গৌরবের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারি, উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে পারি। যাহারা সাধনার দ্বারা, ইংরাজি শিক্ষিত সমাজের বিত্তকে স্বদেশের কার্যে চালিত করিয়াছেন তাহাদিগকে আমি ভক্তির সহিত নমস্কার করি। তাহারা যে পথে গিয়াছিলেন, সে পথে যাত্রা যে ব্যর্থ হইয়াছে, এ আমি কখনই বলিব না।

তখন সমস্ত দেশের ঐক্যের মুখ রাজদ্বারেই ছিল। কিন্তু যখন আমাদের হৃদয় নিজের মধ্যে সেই উপায়ে একটা বিপুল ঐক্যের আভাস উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে, যাহা বিচ্ছিন্ন ছিল তাঁহা ঐক্যের অমৃত কথার আস্বাদে যখন আপনার মধ্যে আপনার যথার্থ বল অনুভব করিতে পারিতেছে, তখন সে আপনার সমস্ত শক্তিকে রাজপুরদ্বারে ভিক্ষাকুণ্ডের মধ্যে নিঃশেষিত করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারে না। এখন চিরন্তন সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছি—এখন সে আত্মশক্তি আত্মচেষ্টার পথে সার্থকতা লাভের দিকে অনিবার্যবেগে চলিবে—কোন একটা বিশেষ মুষ্টিভিক্ষা বা প্রসঙ্গ লাভের দিকে নহে।

অপর দলের মুখপাত্র শ্রীযুক্ত পৃথ্বীশচন্দ্র রায় মহাশয় আবেদন-নিবেদনের পক্ষ সমর্থন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন;—"আমাদের সকলেরই আত্মোন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে, আমাদের নৈতিক শক্তির বিকাশের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছে।"

আসল কথা এই দুই দলের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন মতপার্থক্য নাই, যাহা কিছু প্রভেদ মুখ্য গৌণ লইয়া।

---

* দেখুন, পৃ. ৪০৩

তবে আবেদন-নিবেদনের কাজকে ভিক্ষাবৃত্তি বলায়, "ব্যাধি ও চিকিৎসার" লেখক মহাশয় আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক কথা বলিতে গেলে আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থায়, ইহা ভিক্ষাবৃত্তি ভিন্ন আর কি? যখনি ইংরাজরা আমাদের দেশ জয় করিলেন এবং যখন আমরা পরাজয় স্বীকার করিয়া তাহাদের পদানত হইলাম, তখন হইতেই আমরা বাধ্য হইয়া আমাদের সমস্ত ন্যায্য অধিকার ছাড়িয়া দিয়াছি। এখন আমরা যাহা কিছু তাহাদিগের নিকট পাইতেছি সে কেবল তাহাদের অনুগ্রহ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? এখন অধিকার সমর্থনের কথা আমাদের মুখে শোভা পায় না। রাজনৈতিক অধিকারের সঙ্গে বলের অকাট্য যোগ, যেখানে বল নাই সেখানে অধিকার কোথায়? অবশ্য বিধাতা প্রত্যেক মনুষ্যকে, প্রত্যেক জাতিকে কতকগুলি স্বাভাবিক অধিকারে অধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু সে অধিকার রক্ষা করা না করা আমাদের নিজের হস্তে। একটা সংস্কৃত বচন আছে "দেবা দুর্বল ঘাতকা।" দুর্বলের প্রতি দেবতারাও বিমুখ।

ইংলণ্ডের ইতিহাস-পাঠে জানা যায়, কেবল বলের দ্বারা এবং বহুকাল যুঝাযুঝি করিয়াই রাজাপ্রজা পরস্পরের অধিকার নির্ধারিত হইয়া অবশেষে তাহাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। এখন ইংলণ্ডের রাজা প্রায় সাক্ষীগোপাল, প্রজারাই সর্বেসর্বা। এখন রাজার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রজার কোন বিবাদ নাই। প্রজাদের মধ্যেই দুই তিনটা দল আছে, তাহাদেরই মতামত লইয়া যাহা কিছু বাদ বিসম্বাদ চলিয়া থাকে। প্রজাদের মধ্যে যে পক্ষ প্রবল হয় সেই রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করে; পূর্বনির্দিষ্ট রাজার নিজস্ব অধিকার বজায় রাখিয়া সর্বসাধারণ প্রজাদের অধিকার বিস্তারের চেষ্টায় ইংলণ্ডে যে আন্দোলন চলিয়া থাকে তাহাকেই Констiutional agitation অর্থাৎ রাষ্ট্রতন্ত্র-সম্মত আন্দোলন বলে। আমরাও এক্ষণে তাহাদের দেখাদেখি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র এবং আমাদের রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন। এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, ইংলণ্ড স্বাধীন, আমরা পরাধীন, ইংলণ্ড বিজয়ী আমরা বিজিত। তাহাদের মধ্যে যে রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ, আমাদের মধ্যে সে রাজনৈতিক আন্দোলন ফলপ্রদ নহে।

আমরা ক্রন্দন করিব তাহার নিকট? ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র অনুসারে শাসন বিষয়ে আমাদের রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। তাহার দয়া উদ্রেক করিয়া কোন ফল নাই। পার্লামেন্ট আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা। ইংণ্ডের জনসাধারণ হইতে নির্বাচিত প্রতিনিধি লইয়াই ঐ মহাসভা গঠিত। অতএব জনসাধারণের মধ্যে যে ভাব ও মতামত প্রবল থাকে তাহার দ্বারাই সমস্ত পার্লামেন্টের রাষ্ট্রনীতি অনুরঞ্জিত হয়। এক্ষণে ইংরাজ-জাতির যেরূপ ভাব ও মতামত তাহাতে ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট হইতে আমরা কি কিছু বিশেষ অধিকার লাভের প্রত্যাশা করিতে পারি?

হিন্দু রাজত্বের সময় প্রজার উপর হিন্দু রাজার অসীম প্রভুত্ব ছিল বটে; কিন্তু, পুত্রের উপর পিতার যেরূপ অসীম প্রভুত্ব, উহা সেইরূপ প্রভুত্ব। তখন রাজা প্রজার মধ্যে পিতা পুত্রের সম্বন্ধ—একটা স্নেহের সম্বন্ধ ছিল। পুত্রবৎ প্রজা পালন করা কর্তব্য—এই সনাতন রাজধর্মের উপরেই তখনকার রাজশাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল, বলার্জিত অধিকারের উপরে নহে। আমাদের দেশে প্রজার রঞ্জনার্থেই রাজা নামের সার্থকতা। রাজা রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য কিনা করিয়াছিলেন? তখন রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থ এক ছিল। সুসময়ে প্রজার নিকট রাজা যে কর চাহিতেন, তাহা তাহাকে অকাতরে দান করিত। কেন না, তাহারা বেশ জানিত, অসময়ে তাহাদিগকে রাজাই আবার রক্ষা করিবেন। তাহারা জানিত, তাহাদের প্রদত্ত ধন তাহাদের দেশেই ব্যয় হইবে; অথবা সেই ধনে রাজা যে কোন অনুষ্ঠানই করুন না কেন, তাহারাও কতকটা তাহার ফলভোগী হইবে। কোন অভাব বোধ করিলে, কিম্বা বিপদে পড়িলে, পুত্র যেরূপ পিতার নিকট আবদার করিয়া কিছু চাহে কিংবা সাহায্য প্রার্থনা করে, প্রজারাও রাজার নিকটে ঠিক সেই ভাবেই প্রার্থনাদি করিত। তাহাতে ভিক্ষার ভাব কিছুই ছিল না, হীনতার ভাব কিছুই ছিল না। মোগল রাজত্বের অভ্যুদয় কালেও

রাজা প্রজার মধ্যে এই রূপ পিতাপুত্রের সম্বন্ধ কতকটা বজায় ছিল। তাহার কারণ, মোগল রাজারা এই দেশেতেই বাস করিতেন, তাহাদের অতুল ঐশ্বর্য এই দেশেই ব্যয় হইত। প্রজা বলিয়া প্রজার উপর তাহাদের ক্ষমতা ছিল। আকবর বাদশা হিন্দু প্রজার মনোরঞ্জনার্থে হিন্দু পরিচ্ছদাদি ধারণ করিতেন; এমনকি, রাজ্য মধ্যে গোহত্যা নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহারা আইন-যন্ত্র পরিচালিত করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতেন না; তাহাদের শাসনকালে তাহাদের ব্যক্তিগত দয়া ও ন্যায়পরতা আমরা প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারিতাম। পাছে কোন সামান্য প্রজা সুবিচার হইতে বঞ্চিত হয়, এই জন্য জাহাঙ্গির বাদশা তাহার প্রাসাদকক্ষে শৃঙ্খলবদ্ধ একটি ঘণ্টা রাখিয়াছিলেন, বাহিরের শৃঙ্খলটি ধরিয়া কেহ নাড়িলেই বুঝিতে পারিতেন, তাহার নিকট কোন ব্যক্তি বিচারপ্রার্থী হইয়া আসিয়াছে।

ইংরাজ-রাজের সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ উহা পিতাপুত্রের সম্বন্ধ নহে, উহা বিজয়ী-বিজিতের সম্বন্ধ, ক্রেতা-বিক্রেতার সম্বন্ধ, এক কথায় নিরবচ্ছিন্ন স্বার্থের সম্বন্ধ, উহাতে হৃদয়ের তিলমাত্র সংশ্রব নাই। লর্ড কার্জন সেদিন ইংলণ্ডের কোন সভায় বলিয়াছিলেন, ভারতরাজ্য শাসনে ভারতের হৃদয়স্পর্শ করা আবশ্যক। একথা খুবই ঠিক। কিন্তু তিনি যদি বুঝিয়া থাকেন, দিল্লি দরবারের ন্যায় বিপুল আড়ম্বরেই ভারতের হৃদয়পুষ্ট হয়, তাহা হইলে তিনি ভারি ভুল বুঝিয়াছেন। প্রথমত মোগলের অনুকরণ করিয়া, দিল্লির দরবারে তিনি যে আড়ম্বর ঘটার চেষ্টা করিয়াছিলেন, মোগল রাজত্বের সময়ে, একটা সামান্য উৎসবে যে ঘটা হইত, তাহার তুলনায় উহা কছুই নয় বলিলেও হয়। তাহা ছাড়া, সে সকল উৎসবের বাহ্য আড়ম্বরের ভিতরেও একটা প্রাণ ছিল—সহৃদয়তা ছিল। তাহাতে লোকের যে শুধু চক্ষু, কর্ণ তৃপ্ত হইত তাহা নহে, তাহাতে তাহাদের হৃদয়ও মুগ্ধ হইত। গরিব দুঃখী কাঙালদিগকে মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া, সরকারের হিতৈষীযোগ্য ব্যক্তিদিগের উচ্চপদে উন্নীত করিয়া, সারবান প্রসাদ বিতরণ করিয়া মোগল সম্রাট, প্রজাদিগের অকৃত্রিম আশীর্বাদ অর্জন করিতেন।

পক্ষান্তরে, প্রথম হইতেই ইংরাজ এদেশে বণিকভাবে প্রবেশ করিয়াছেন, এখনও বণিক ভাবেই রাজ্য চালাইতেছেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-কার্য বন্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের বণিক নীতি এখনও কার্যত অক্ষত রহিয়াছে। ইংরাজের রাজত্ব বণিকনীতি অনুসারেই চলিতেছে। ইংরাজ ভারতের তেত্রিশ কোটি অধিবাসীকে প্রজাভাবে যতটা না দেখেন, তদপেক্ষা তাহাদের রপ্তানি মালের ক্রেতা হিসাবে দেখিয়া থাকেন। তাহাদের চক্ষে, ভারত অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের নিবাস ভূমি একটি বিপুল রাজ্য নহে—উহা তাহাদের মাল কাটাইবার একটি মহা বিপণি। এই ভাবে দেখেন বলিয়াই, ভারতীয় প্রজার স্বার্থের অপেক্ষা, লাঙ্কেষ্টারের স্বার্থ তাহাদের নিকট গুরুতর বলিয়া বোধ হয়, এইভাবে দেখেন বলিয়াই, সেদিন লর্ড কার্জন ইংরাজ প্লাণ্টারের খাতিরে, দেশীয় কৃশি প্রজার দুঃখদুর্দশায় কিঞ্চিৎ উপশম করিতেও সাহসী হইলেন না। এই বণিক-নীতি অবলম্বন করিয়াই, নিজ স্বার্থ সাধনার্থ, ইংরাজ এদেশের কত শিল্প বিদলিত করিয়াছেন, এখনও দেশীয় ব্যবসায়ের উন্নতি পক্ষে কত বাধা দিতেছেন। যতটুকু শিক্ষা দিলে, অল্প বেতনের কেরাণি পাওয়া যায় ততটুকু শিক্ষা দেওয়াই এখন তাহাদের মনোগত অভিপ্রায়; এইরূপ উচ্চশিক্ষার সঙ্গে নানাপ্রকার কন্টক রোপণ করিতেছেন। আমরা মনে করি ইংলণ্ডে যখন *Constitutional agitation* করিয়া ইংলণ্ডের প্রজাবৃন্দ এত অধিকার লাভ করিয়াছে, তখন সেই প্রণালী অবলম্বন করিলে আমরাও কেন না সফল হইব। কি বিষম ভুল। ইসপ-কথামালার সেই রজকের ভারবাহী হেয় পশু ও তাহার আদরের ও সখের গৃহপ্রহরী জীব—এই উভয়ের প্রতি তাহার কিরূপ বিভিন্ন ব্যবহার এই প্রসঙ্গে কি তাহা স্মরণ হয় না? চির অনাথ মাতৃহীন অবোধ শিশু নিজ জননী মনে করিয়া বিমাতার ক্রোড়ে, স্নেহাকাঙ্ক্ষায় বার বার ঝাঁপাইয়া পড়ে, ও বার বার প্রত্যাখ্যাত হইয়াও সে যেমন প্রকৃত অবস্থা ঠিক বুঝিতে পারে না, আমাদেরও এক্ষণে সেই দশা হইয়াছে।

তাছাড়া, ইংলণ্ডে এখন "সাম্রাজ্যিকতার" ধুয়া উঠিয়াছে, ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা চূড়ান্ত সীমায়

পৌঁছিয়াছে। যে ইংলণ্ড এক সময়ে স্বাধীনতার লীলাভূমি ছিল, পৃথিবীর দাসত্ব মোচনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিল। সেই ইংলণ্ড সেদিন নিজ স্বার্থের জন্য বলপূর্বক চীনদেশে অহিফেন প্রবেশ করাইতেও কুণ্ঠিত হইলেন না। ইংলণ্ডের দার্শনিক পণ্ডিত হর্বট স্পেনসার সেদিন তাঁহার *Facts and Comments* নামক গ্রন্থে, ইংলণ্ডে কতদূর নৈতিক অবনতি হইয়াছে তাহা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন। এখনকার পার্লমেন্টে, সেদিনকার ব্রাইট্ গ্ল্যাডস্টোনের মত লোকই বা কোথায়? আর তাহারা থাকিতেই বা ভারতের হিতের জন্য কতটুকু করিতে পারিয়াছিলেন? প্রাতঃস্মরণীয় ভারতহিতৈষী মহাত্মা রিপণ ভারতের জন্য যে হিতকর ব্যবস্থা ও অনুষ্ঠান প্রবর্তিত করিতে উদ্যোগী হইয়াছিলেন, তাঁহা কি শেষে রক্ষিত হইল?

আসল কথা, যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন ও এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে। আমরা যদি তাহাদের ধর্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার দোহাই না দিয়া, তাহাদের স্বার্থের দিক দিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, বরং তাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে। কিন্তু এ সময়ে তাহা বুঝানও বড় সহজ নহে। যখন তাহারা আপনারা বুঝিবেন, ভারতবর্ষে দুর্ভিক্ষ মহামারীতে প্রভূত লোকক্ষয় হইতেছে, করভারে প্রপীড়িত হইয়া ভারতবাসী দিন দিন দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে এবং এই কারণেই তাহাদের রপ্তানি মালের তেমন কাটতি হইতেছে না, তখন তাহাদের একটু চেতনা হইবে, তখন তাহারা আপনা হইতেই আমাদের দারিদ্র্যের প্রকৃত কারণ অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইবেন—আমাদের দুঃখদুর্দশা প্রতিকারের উপায় চিন্তা করিবেন। এখন আমরা তাহাদের নিকট যতই ক্রন্দন করি তাহাতে কোন ফল হইবে না।

কি কন্‌সারবেটিভ কি লিবার‍্যাল ইংলণ্ডের যে কোন পক্ষই কর্তৃত্ব লাভ করুক, ইহাদের কাহারও আমলে 'অস্ত্র-আইন' রহিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে? ভারতের আয়ব্যয়ের উপর আমাদের বাস্তবিক কর্তৃত্ব লাভের কি কোন আশা আছে? ভারতের স্বার্থের উদ্দেশে ম্যাঞ্চেস্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে এরূপ কখন কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি? পার্লামেন্টে দুই একটা প্রশ্ন উত্থাপিত করিতে পারিলেই কি আমরা কৃতার্থ হইব?—ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার আর দুই একজন সদস্য বাড়িলেই কি আমাদের চতুর্থবর্গ ফল লাভ হইবে? তবে **শুধু রাজনৈতিক আন্দোলনের উপরেই আমাদের কেন এত আস্থা? আবেদন নিবেদন কি প্রতিবাদ যে আমরা একেবারেই করিব না, আমি একথা বলি না—উহাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্থ ব্যয় না করি, আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য।**

এখন তবে আমরা করিব কি?—এ সময়ে আমাদের মুখ্য কর্তব্য কি? আমাদের সমস্ত অর্থ ও উদ্যম কেবল আবেদন নিবেদনে নিঃশেষিত না করিয়া, রাজ্য সরকারের একান্ত মুখাপেক্ষী না হইয়া, যাহাতে নিজের চেষ্টায় আত্মবল সঞ্চয় করিতে পারি তাহাই কি এখন আমাদের মুখ্য কর্তব্য নহে? রাজ সরকার নিজ কর্তব্য সাধন করিতেছে না বলিয়া আমরা কি একেবারে নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিব? "ব্যধি ও চিকিৎসার" লেখক মহাশয় ঐ মর্মে বলেন—"আমরা রাজ সরকারকে এত কর দিতেছি, তাহাদের নিকট হইতে তদনুরূপ কাজ আদায় না করিয়া, যদি তাহাদের কর্তব্য কাজগুলি আমরা করিতে যাই, তাহা হইলে আমাদের দোকর খরচ হইবে। এই দরিদ্র দেশে অত টাকা কোথায়?" কিন্তু রাজ সরকার তাহাদের কর্তব্য করিতেছেন না বলিয়া, তাহাদিগের নিকট সেই বিষয় আবেদন করিবার জন্য, তাহাদের কর্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, প্রতি বৎসরে আমরা যে সার্দ্ধ লক্ষেরও অধিক টাকা খরচ করিয়া থাকি, উহাও কি দোকর খরচ নহে? শুধু আবেদনের কার্যে ঐ টাকা নিঃশেষিত না করিয়া, দেশের বাস্তবিক কোন হিতকর অনুষ্ঠানে উহার কিয়দংশ নিয়োগ করিলে কি ভাল হয় না? আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। আমি কংগ্রেসের একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। কংগ্রেসের দ্বারা দেশের বাস্তবিকই একটা মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। ইংরাজের নিকট হইতে দুই একটি প্রসাদ অর্জন করা অপেক্ষা

তাহার মূল্য আমি অধিক বিবেচনা করি। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও একতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এই কংগ্রেসকে ধ্বংস না করিয়া যাহাতে উহার চেষ্টা উদ্যম বাঞ্ছিত পথে চালিত হয়, তৎপ্রতি স্বদেশবৎসলব্যক্তিমাত্রেই যত্নবান হওয়া উচিত।

কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের উপর নির্ভর না করিয়া, কিসে এদেশে ব্যবসায় শিল্পের উন্নতি হয়, সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার হয়, অন্নকষ্ট দূর হয়, স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, নৈতিক ও দৈহিক বল সঞ্চিত হয়, ইতর-সাধারণের সহিত শিক্ষিতমণ্ডলীর যোগ নিবদ্ধ হয়, এই সকল বিষয় লইয়া কংগ্রেস যদি আলোচনা করেন, উপায় নির্ধারণের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে এই জাতীয় মহাসভার যে সম্পূর্ণ সার্থকতা ও গৌরব বৃদ্ধি হয় তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অধীন জাতি যতই চেষ্টা করুক না কেন, স্বীয় আকাঙ্ক্ষারূপ উন্নতি কখনই সম্পূর্ণরূপে লাভ করিতে পারে না সত্য। তবে একথাও ঠিক, আবেদন নিবেদনের উপর একান্ত নির্ভর না করিয়া, আত্মচেষ্টায় আমরা আপনাদের যতটুকু উন্নতি সাধন করিতে পারি, ততটুকুই আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গল—তাহাতে আমাদের আত্মবল সঞ্চয় হয়—আত্মপ্রসাদ লাভ হয়।

যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত, পরাধীন ভারতের তুলনা হয় না, তথাপি যে পথ অনুসরণ করিয়া এই আসিরিক জাতি এত অল্পকালের মধ্যে অসাধারণ উন্নতি লাভ করিয়াছে সেই পথটি আমাদের সকলেরই একবার আলোচনা ও চিন্তা করা কর্তব্য। সে পথটি শিক্ষার পথ—সর্বাঙ্গীণ শিক্ষার পথ।

জাপান সম্রাট মিকাডো, টোকিও নগরে পাঠশালা ও উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন করিবার সঙ্কল্প করিয়া, রাজ্যের পূর্বতন অভিজাতবর্গের নিকট শিক্ষা সম্বন্ধে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলেন :

"শ্রম ও অধ্যবসায়ের ফল হস্তগত করিবার নিমিত্ত আব কিছুই করিবার আবশ্যক নাই, কেবল জ্ঞানকে পরিস্ফুট ও হৃদয়ের বৃত্তি সকলকে পরিমার্জিত করা আবশ্যক। আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবল সমস্ত পৃথিবীর সভ্যতার প্রতি দৃষ্টি স্থির রাখিতে হইবে; শিক্ষার উদ্দেশে বিদেশে গমন করিতে হইবে এবং সমস্তই হাতে কলমে শিখিতে হইবে। গৃহে শিক্ষা কবিবার বয়স যাহার অতীত হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে বিদেশ ভ্রমণই যথেষ্ট। দেখিয়া শুনিয়া তাহাদিগের জ্ঞান চক্ষু প্রসারিত হইবে এবং তাহাদের বুদ্ধি উন্নত হইবে। আমাদের দেশে স্ত্রীশিক্ষার কোন পদ্ধতি নাই। সে কারণেও তাহাদের অনেকের মধ্যে বুদ্ধির অভাব লক্ষিত হয়। এতদ্ব্যতীত শিশুদিগের শিক্ষার সহিত তাহাদিগের মাতাদিগের শিক্ষার একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। এ বিষয়টি নিতান্ত গুরুতর বিষয়। সেই জন্য যাহারা আপন আপন স্ত্রী কন্যা ভগিনীগণকে সঙ্গে করিয়া বিদেশে গমন করে তাহাদিগের আচরণে তিলমাত্র আপত্তি হইতে পারে না। তাহা হইলে, বিদেশে স্ত্রী শিক্ষার পত্তনভূমি কিরূপ, এবং শিশুদিগকে শিক্ষা দিবার প্রকৃত পদ্ধতি কি, এই সমস্ত তাহারা অবগত হইতে পারে। তোমরা সকলেই যদি এই বিষয়ে মনোযোগী হও, তাহা হইলে সভ্যতা-পথে অগ্রসর হওয়া আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। আমরা সকলেই অর্থ ও বলের মূল পত্তন করিতে সমর্থ হইব এবং অনায়াসেই পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত সমকক্ষভাবে টক্কর দিতে পারিব। অতএব, তোমরা আমাদের এই সকল বাসনাকে তোমাদের হৃদয় মধ্যে ভাল করিয়া স্থান দেও। যাহাতে আমাদের এই মনস্কামনা পূর্ণ হয় তদ্বিষয়ে সাহায্য করিতে তোমরা প্রত্যেকে যথাসাধ্য চেষ্টা কর।"

এই নীতি অনুসরণ করিয়া জাপান কিরূপ উন্নতিলাভ করিয়াছে আমরা সকলেই তাহারা প্রত্যক্ষ পরিচয় পাইতেছি। পুনর্বার বলিতেছি, যদিও স্বাধীন জাপানের সহিত আমাদের তুলনা হয় না, যদিও জাপানীদিগের ন্যায় আমাদের কার্যদক্ষতা নাই, দৃঢ়তা নাই, অর্থবল নাই, নৈতিক বল নাই, স্বদেশ বাৎসল্য নাই, তথাপি এই পরীক্ষিত মার্গটি অনুসরণ করিলে শুধু আবেদন নিবেদন অপেক্ষা আমাদিগের যে অধিক ফললাভ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। সুখের বিষয় এই মার্গ অবলম্বন

করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় আমাদের আত্মচেষ্টার একটা পথ উন্মুক্ত করিয়াছেন। ভরসা করি, ইহা কালে সুফল প্রসব করিয়া আমাদের চির আশা পূর্ণ করিবে।

ভারতী, ১৩১১ আশ্বিন

২. রমণীর স্বদেশব্রত

গত ৩০ আশ্বিন তারিখে আমাদের দেশের আবালবৃদ্ধবনিতা যে ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহার মূলমন্ত্র 'স্বদেশ সেবা' আর তাহার অভূতপূর্বত্ব—'কার্যতৎপরতা', সকলেই কিছু করিতে ব্যস্ত। দাসদাসী পরিবেষ্টিত ধনী, সুখশয্যা ছাড়িয়া দেশের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেছেন। মাতার কোল ছাড়িয়া শিশু তাহাতে যোগ দিতেছে। দরিদ্র আসিয়া তাহার যথাসামর্থ্য জাতীয় ধনভাণ্ডারে দান করিয়া প্রসন্নমুখে গৃহে ফিরিতেছে। সকলে, নগরে নগরে, গ্রামে গ্রামে, সভা-সমিতি করিয়া বক্তৃতা, গান উপদেশ দ্বারা সাধারণকে এই স্বদেশব্রতে দীক্ষিত করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। **আমাদের দীর্ঘ ঘুমের পর এই নবজাগরণ,আমাদের দেহে নবশক্তি আনয়ন করিয়াছে।** এক কথায়, কোন-না-কোন-রূপে সকলে মাতৃসেবা করিতেছেন। দীর্ঘ অন্ধতায় আমরা মায়ের যে দুর্দশা করিয়াছি আজ তাহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে লালায়িত। আজ শুধু স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারের প্রতিজ্ঞা লইয়া লোকে বসিয়া নাই, সকলেই কাজ করিতে ব্যস্ত। কিন্তু এই যে সব কাজের উল্লেখ করা গেল তাহা অবশ্য পুরুষেরাই করিতেছেন—আর রমণীগণ কি করিতেছেন? বিলাতি বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া পুরুষের সহধর্মিণী নামের সার্থকতা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু তাহার অধিক কি আর কিছু করিবার নাই? তাহাদের রাজ্য অন্তঃপুরে, গৃহধর্মে কি তাহাদের কিছু করিবার নাই? [illegible] জানি যে অনেকে তাহা করিতেছেন। অন্তঃপুরের সংবাদ বাহিরে আসে না আর না আসাই ভাল। রমণী নীরবেই আপনার কার্য করিবেন কিন্তু বিশেষ বিশেষ স্থানে বিশেষ বিশেষ নিয়ম। অরক্ষণীয়া কন্যার অকালেও বিবাহের বিধি আছে। ছেলেদের পাঠে মনোনিবেশ করা উচিত—এ বিষয়ে কাহারো মতদ্বৈধ না থাকিলেও দেশের এই বিশেষ মুহূর্তে যে সে নিয়ম অকাট্য নয় তাহাতেও সকলে একমত। সেই নিয়মে, রমণীর অন্তঃপুরে কি ঘটিতেছে তাহাও আজ প্রকাশ্যে আলোচনা করা যাইতে পারে, কারণ, তাহা জানিলে অন্য রমণীগণও তাহা গ্রহণ করিতে পারেন।

বিলাতি বস্ত্র যথাসাধ্য বর্জন করিবার প্রতিজ্ঞা ভিন্ন কয়েকটি রমণী ৩০ আশ্বিন হইতে আরও ২/১টি বিশেষ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটি শিল্পের সহিত জড়িত। যাহারা এ ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন তাহারা প্রতিদিন চরকায় কিছু পরিমাণে সুতা কাটিয়া, আগামী পূজার আগে, অন্ততঃ একখানি শাড়ির পরিমাণ সুতা কাটিয়া, তাহার দ্বারা শাড়ি তৈয়ারি করাইয়া সেই শাড়ি পরিয়া দেবতা প্রণামে যাইবেন এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। এই শাড়ি যে তাহাদের অঙ্গকে গৌরবান্বিত করিবে, এই মোটা কাপড়ের মূল্য যে অনেক চেলি, বানারসী অপেক্ষা অধিক তাহা কি বলিতে হইবে? ভগিনীগণ! তোমরা সকলে কি এই অপরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া পতিপুত্রের চক্ষু সার্থক করিবে না?

আর কয়েকজন রমণী একটি ব্রত গ্রহণ করিয়া তাহার নাম "মায়ের কৌটা" রাখিয়াছেন। ইহার মধ্যে করিবার আর কিছু নাই ; কেবল অন্নপূর্ণার নিকট একমুষ্টি অন্ন সংগ্রহ। তাহার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে জননী জন্মভূমির উদ্দেশে একটি মৃৎ-পাত্র বা যে-কোন পাত্র স্থাপন করিয়া প্রতিদিন তাহাতে অন্ততঃপক্ষে একমুষ্টি চাউল রাখিয়া দিবেন। এটি এমনই সহজ যে কাহারও পক্ষে এ ব্রত গ্রহণ করিতে বাধা হইবে না। ঘরে ঘরে সকলে ইহার মাহাত্ম্য বুঝিয়া ইহার প্রতিষ্ঠা করুন ইহাই আমাদের প্রার্থনা। ইহাতে যে শুধু দেশের জন্য দান করা হইবে তাহা নহে—ইহাতে রমণীর

আর একটি গুরুতর কর্তব্য — সন্তান শিক্ষার সহায়তা করিবে। মাতা যদি তাহার শিশুসন্তানকে শিক্ষা দেন যে, প্রভাতে সর্বপ্রথমে দেবতাকে প্রণাম করিয়া তৎপরে এই জন্মভূমির উদ্দেশে রক্ষিত পাত্রে একমুঠা চাউল অর্পণ করিয়া তবে অন্য কাজে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলে তাহার মনে ধর্ম ও স্বদেশভক্তি উভয় বীজই প্রতিষ্ঠিত হইবে। আর আমাদের দেশে এই শিক্ষা বিশেষরূপে হওয়া আবশ্যক। অপর দেশে অন্যান্য শিক্ষার সহিত ধর্ম ও স্বদেশভক্তিও শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে যে শুধু তাহা হয় না তাহা নহে, বরং তাহার বিপরীতই হইয়া থাকে। কিন্তু স্বদেশভক্ত পরিবারে জন্মিয়া শিশু যদি মাতৃস্তন্যের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ প্রীতি পান করে, আপনার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে জননী জন্মভূমিকে চেনে, আপনার ভাইবোনের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ভাইবোনকে ভালবাসিতে শেখে তবে সে কখনও স্বদেশকে বিস্মৃত হইবে না। গবর্নমেন্ট হাজার শিক্ষার জাঁতায় পিষিয়া — শিশুদের ব্ল্যাকি, লংম্যান ও ম্যাক্‌মিলিয়ানের হাতে সমর্পণ করিয়া, বয়স্কগণকে Lee Warner পড়াইয়াও তাহাদের হৃদয় হইতে স্বদেশপ্রেম দূর করিতে পারিবেন না। আজ যে বহু পুণ্যের ফলে এই স্বদেশপ্রীতির বন্যা আমাদের উপস্থিত শুষ্ক হৃদয়কে ভাসাইয়া সবল করিয়া যাইতেছে, এ দৈব ঘটনা। এ সব সময় ঘটে না। কিন্তু তটিনী তাহার কোলের জমিটি চিরকালই শ্যামল রাখে। বাল্যশিক্ষার ফলও জীবনকে চিরকাল পরিচালিত করে। মাতা যদি শিশুর মনে এ বীজের অঙ্কুর স্থাপন করেন আর গৃহে যদি তাহা পোষিত হয় তবে সহস্র প্রতিকূল অবস্থাতেও তাহার মন বিচলিত হইবে না, বরঞ্চ বাধার আঘাতে তাহাকে নূতন শক্তিশালী করিবে। সেই জন্যই বলিতেছি, এ শিক্ষা আমাদের ঘরে হওয়া উচিত, আর এই "মায়ের কৌটা" ব্রত গ্রহণে তাহার সহায়তা হইবে। জ্ঞানোদয় হইবার পূর্বেই শিশু এই পারিবারিক অনুষ্ঠান দেখিয়া তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল তাহারা প্রত্যেক বালক-বালিকার দ্বারা একমুঠা চাউল দেওয়াইতে পারেন। যাহাদের অবস্থা তেমন সচ্ছল নহে তাহারা স্বজনগণের মধ্যে পালা করিয়া তাহা দিবার ব্যবস্থা করিবেন। ইহা দ্বারা পুরস্কার ও শাসনের বিধিও করা যাইতে পারে। ছেলেমেয়ে কোন ভাল কাজ করিলে মা-বাপ যদি তাহাকে কিছু অর্থ পুরস্কার দেন আর সেই পুরস্কার বা তাহার অংশ হইতে কিছু এই পাত্রে অর্পণ করিতে শিক্ষা দেন তবে দেশের সেবা করিয়া আমরা নিজেই যে কৃতার্থ হই তাহা সহজে তাহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে। ছেলে কোন মন্দ কাজ করিলে, তাহার একটি শাস্তি হইবে, সেদিন সে মায়ের কৌটায় কিছু দিতে পারিবে না। পশ্চিমের কোন একটি মফঃস্বল শহরে আমাদের এই প্রস্তাবমত অনুষ্ঠানের কিরূপ সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে উদ্ধৃত একটি পত্র হইতে বুঝিতে পারিবেন।

"এখানে অনেক বাঙালি মেয়ে আছেন। আমাদের মনে হইল ইহাদের সঙ্গে দেখা শুনা কথাবার্তা হইলে শুভ ফল হইতে পারে। অনেকেই স্বদেশব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। ব-দিদির সহিত এখানকার অনেকেরই আলাপ পরিচয় আছে। আমাদের অনুরোধে তিনি নিজে পাড়ায় পাড়ায় গিয়া অনেককে তাহার বাড়িতে একদিন নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলেন। সে দিন বিকাল বেলায় আমরা সকলে একত্র সম্মিলিত হইলাম। তাহার বাটি গিয়া দেখিলাম, তাহার ঘরের আয়তন যত তাহার চেয়ে নিমন্ত্রণ অনেক বেশি হইয়া পড়িয়াছে। তবু এই অসুবিধা সত্ত্বেও ব-দিদির উৎসাহে মনে মনে আনন্দ অনুভব করিলাম। বলা বাহুল্য আমরা আসিতে না আসিতে গান গাহিতে অনুরুদ্ধ হইলাম; পুরুষের মজলিসে চা-পান আছে, গম্ভীর আলোচনা আছে, চুটকি গল্প আছে, গান তাহার আনুষঙ্গিক একটি আমোদ মাত্র। কিন্তু এরূপ মেয়ে মজলিসে গান আমোদনামের বাচ্য নহে। ইহা প্রীতিমিলনের সর্বপ্রধান উপায় ও অঙ্গ। শুনিলাম প্রধানতঃ এই প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া এখানে এত মেয়ের সমাগম। প্রথম গান হইল "বন্দেমাতরম" এবং এই গান হইতেই স্বদেশি বিষয়ে কথা পাড়িবার সূত্রপাত হইল। দেশের মঙ্গলের জন্য পুরুষেরা যে দিকে অগ্রসর হইয়াছেন আমাদেরও সেই দিকে অগ্রসর হওয়া উচিত,—সংক্ষেপে আমরা এই বিষয়টি তাহাদিগকে বুঝাইয়া বলিলাম।

ইহাতে তাহারা সকলেই প্রায় এক বাক্যে বলিলেন, 'এতে কি আমাদের কারও অমত হতে পারে, আমাদের পুরুষরা যা করছেন আমাদেরও তাই করা চাই।'

সত্যই সকলে কার্যত তাহা করেন। বিলাতি লবণ, বিলাতি চিনি খান না, বিলাতি শাড়ি পরেন না কিন্তু অনেকে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝে না, বাবুরা যাহা আদেশ করেন তাহা পালন করিয়া চলেন মাত্র। সেখানেই তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেখিলাম। "একজন আর একজনের একটি জামার লেস দেখিয়া দরদাম জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, জানিয়া কি ফল? আপনি ত আর এ কিনতে পারছেন না, এ বিলাতি-বাবু (তাঁর স্বামী) যে স্বদেশি হয়েছেন, তিনি কি আপনাকে আনতে দেবেন?"

উত্তর হইল, "বাবুকে জানাইব না, আমার ছেলেকে বলিব চুপি চুপি আনাইবে।"

আমরা তখন বিদেশি দ্রব্য না কিনিবার শুভ ফল কি, তাহাতে দেশের কিরূপ মঙ্গল হইবে তাহা বুঝাইয়া দিলাম। বলা বাহুল্য পূর্বোক্তা রমণী লেস ক্রয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিলেন। খুব উৎসাহের স্রোত বহিলে সকলেই একবাক্যে বলিলেন, মায়ের কাজ করা সকলেরি কর্তব্য। তখন এই গানটি গাওয়া হইল।

কি আলোক জ্যোতি আঁধার মাঝারে কি পুলকে প্রাণ ছায়।
ফুটিল যে আজি অন্ধ নয়ন সমুখে নেহারি কায়।। ইত্যাদি—

ইহার পর শ্রীমতী ল—একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন।

আমাদের আবশ্যকীয় ব্যবহার্য কোন্ জিনিস কোথায় পাওয়া যায় এই প্রবন্ধে তাহাই লেখা হইয়াছিল। প্রবন্ধ পাঠের পর রবিবাবুর একটি জাতীয় সঙ্গীত হইল। তাহার পর, মহিলারা স্বদেশ ব্রত গ্রহণ করিলেন। আমরা আগে হইতেই কতকগুলি টুকরা কাগজে "মায়ের কৌটা" লিখিয়া সেই কাগজগুলি স্থানীয় নির্মিত একটি সুন্দর ছোট টুকরিতে করিয়া আনিয়াছিলাম। টুকরিটি তাহাদেব নিকট ধরিয়া বলিলাম, 'সাধারণতঃ লোকে নিমন্ত্রণ করিয়া ফুল, আতর দিয়া আদর করে, আজ আমরা আপনাদের সম্মানার্থে এই প্রতিজ্ঞাপত্র উপহার ধরিতেছি। যিনি আজ হইতে স্বদেশব্রত গ্রহণ কবিবেন, তিনি একখানি কাগজ তুলিয়া লউন। এই কাগজখানি তিনি বাড়ি গিয়া একটি পাত্রে তুলিয়া বাখিবেন। সে পাত্রটিকে মায়ের কৌটা নাম দিবেন। প্রতিদিন ভাঁড়ার দিবার সময় সেই পাত্রে একটি দুইটি পয়সা বা দু-এক মুষ্টি চাল রাখিয়া দিবেন এবং এইরূপে সঞ্চিত দান ১ বৈশাখে বা বিজয়া দশমীর দিন বা মাসে মাসে জননী জন্মভূমির পূজার জন্য দান করিবেন, আর প্রতি ব্রতধারিণীর আরও একটি মহিলাকে এই ব্রতধারণ করাইতে হইবে।

কাগজ সকলেই উঠাইয়া লইলেন, কেহ কেহ আমার কথা শুনিতে পান নাই, তাহাদিগকে আবার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া হইল। অ-বাবুর মা তখনি সে টুকরিতে একটি টাকা ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, ভাণ্ডার ত অনেক পরে সংগ্রহ হইবে, আজ এই যে শুভ মুহূর্তের, শুভ সম্মিলন, এই আনন্দের দিনে কি কিছু দান সংগ্রহ কবিলে ভাল হয় না? পারিবারিক মায়ের কৌটা আমরা গৃহে গিয়া স্থাপন করিব। এই টুকরিটি, যাহা হইতে আমরা স্বদেশব্রত গ্রহণ করিলাম, এই শহরের মায়ের কৌটা হউক। যাহাদের কাছে টাকা ছিল তৎক্ষণাৎ তাহারা টুকরিতে এক একটি টাকা ফেলিয়া দিলেন। ব-দিদির বিশেষ বন্ধুরা তাহার নিকট হইতে ধার করিয়া দিলেন। তৎক্ষণাৎ ত্রিশ টাকা টুকরিতে জমা হইল। ব্রত গ্রহণের পর আরও দুই একটি গান হইল। অবশেষে ক-বাবুর দুই কন্যা, যোগীনবাবুর ভারতবর্ষের মানচিত্র অভিনয় করিয়া মুখস্থ পাঠ করিলেন। বড় ভগিনী হইলেন গুরু, ছোট শিষ্য। গুরু, শিষ্যকে ভারতবর্ষের মানচিত্র দেখাইয়া তাহার কীর্তিস্থলগুলির নির্দেশ করিয়া ভারতের গৌরব কাহিনী বিবৃত করিতে লাগিলেন—সকলে মুগ্ধ হইয়া শুনিতে লাগিলেন। সন্ধ্যাকালে সভা ভঙ্গ হইল, আমরা আশাতীত আনন্দ লইয়া গৃহাগমন করিলাম; শুনিলাম কেবল আমরা নহি, সকল মহিলাই আমাদের মত আনন্দলাভ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট সভার গল্প

শুনিয়া যাহারা আসিতে পারেন নাই তাহারা খুব আপশোষ করিতেছেন। কিন্তু এখানেই ইহার শেষ হইল না। সেদিন যে রমণীগণ সঙ্গে টাকা না থাকায় টাকা দিতে পারেন নাই তাহারা টাকা পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপ ৬/৭ দিনে আর কিছু অর্থ অযাচিত ভাবে সংগৃহীত হইল। তাহার দ্বারা দুটি তাঁত কেনা হইয়াছে। এখান হইতে দুইজন ভদ্র যুবক কলিকাতায় তাঁত শিক্ষা করিতে গিয়াছেন, তাহারা ফিরিয়া আসিলে, এখানে একটি তাঁতশিক্ষালয় স্থাপন করিয়া স্থানীয় তাঁতি, জোলাদের এই তাঁতে শিক্ষা দিবেন। আর শিল্পসমিতির সম্পাদক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক নিজ লোক দ্বারা গৃহে গৃহে মাসান্তে লোক পাঠাইয়া মায়ের কৌটায় সঞ্চয় আদায় করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই মাসিক সংগ্রহে শিল্পবিদ্যালয়ের কতকটা খরচ চলিবে।"

আমাদের ইচ্ছা বঙ্গের ঘরে ঘরে এই ব্রত গৃহীত হউক। শুনা যায় অতীতকালে ভারত মহিলাগণ, নিজ অলঙ্কার মোচন করিয়া দেশের কার্যে সমর্পণ করিয়াছেন। বঙ্গরমণীর নাম ব্রতপালনের জন্য বিখ্যাত। আজ যদি তাহারা এই কষ্টশূন্য ব্রতপালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ না হন, জননী জন্মভূমির পূজার জন্য এই যৎসামান্য দানে কুণ্ঠিত হ'ন, তাহা হইলে তাহাদিগের লজ্জার সীমা-পরিসীমা থাকিবে না। তাহা হইলে জননীর অভিশাপে আমাদের দেশ চির অভিশপ্ত হইয়া থাকিবে।

রমণীগণ ঘরে ঘরে যদি এই মায়ের কৌটা স্থাপন করেন, তবে দ্রৌপদীর হাঁড়ি যেমন কখনও শূন্য হইত না, একটি শাকান্ন হইতে সহস্রলোককে খাইয়াইতে পারিতেন, তেমনি আমাদের গৃহলক্ষ্মীর একমুঠা চাউলে দেশের ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে। যুবকগণ! তোমাদের সাহায্য ভিন্ন কোন কর্ম সিদ্ধ হইতে পারে না। তোমরা ঘরে ঘরে যাইয়া মাতৃগণকে ইহার উদ্দেশ্য বুঝাইয়া দিয়া মায়ের কৌটা প্রতিষ্ঠা করিয়া আইস।...

ভারতী ১৩১২ পৌষ

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা

বন্দে মাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়্লেন। প্রয়াগ কাশী পার হ'য়ে মা পূর্ব্ববাহিনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ ক'রে মা সেখানে শতমুখী হলেন। শতমুখী হ'য়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শতমুখে অধিষ্ঠান করলেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলাদেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্তে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলা-ভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গাল ভরা হাসি হ'ল। লোকে পরম সুখে বাস করতে লাগল।

এমন সময় মর্ত্তে কলির উদয় হ'ল। লোকে ধর্ম্ম কর্ম্ম ছাড়্তে লাগল। ব্রাহ্মণ-সজ্জনে অনাচারী হ'ল। সন্ন্যাসীরা ভণ্ড হ'ল। সকলে বেদবিধি অমান্য করতে লাগল। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি চঞ্চল হ'লেন। লক্ষ্মী ভাবলেন—হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী ; আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়্তে হ'ল। তখন বাংলাতে রাজা ছিলেন, তার নাম আদিশূর। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী ; বাংলায় অনাচার ঘটেছে ; আমি বাংলা ছেড়ে চললেম। রাজা কেঁদে বললেন,—না মা, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়োনা; যাতে বাংলায় সদাচার ফিরে আসে, তা আমি কর্ছি। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্লেন। দরবারে ব'সে পশ্চিম দেশে কনোজে লোক পাঠালেন ; কনোজ থেকে পাঁচজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ আনালেন। তাদের সঙ্গে পাঁচজন সজ্জন কায়েত এলেন। রাজা তাদের রাজ্যের মধ্যে বাস করালেন। তারা বাংলা দেশে বেদবিধি নিয়ে এলেন, সদাচার নিয়ে এলেন। তাদের ছেলেমেয়ে বাংলার গায়ে গায়ে বাস করতে লাগ্ল। তাদের দেখাদেখি দেশে বেদবিধি সদাচার ফিরে এল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বস্লেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। বাংলার ধন দেখে ধান দেখে মোছলমান বাংলায় এলেন। তখন বাংলার রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল লক্ষ্মণ সেন। তাঁর রাজ্য গেল। মোছলমান বাংলার রাজা হলেন। হিঁদুর জাতিধর্ম নষ্ট হ'তে লাগল। হিঁদুর ঠাকুরঘর ভেঙে মোছলমান মসজিদ তুলতে লাগলেন। অর্দ্ধেক হিঁদু মোছলমান হল। হিঁদু-মোছলমানে এক গাঁয়ে এক ঠাঁয়ে বাস ক'রে মারামারি কাটাকাটি করতে লাগল। লক্ষ্মী ভাবলেন, হায়, আমি বাংলার লক্ষ্মী, আমাকে বুঝি বাংলা ছাড়তে হ'ল। তখন বাংলাতে গৌড়ের পাঠান-বাদ্শা রাজা ছিলেন, তার নাম ছিল হোসেন সা। লক্ষ্মী তাঁকে স্বপ্ন দিলেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী; আমার হিঁদুও যেমন, মোছলমানও তেমনি ; হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই যখন মারামারি করতে লাগল, আমি বাংলা ছেড়ে চললেম। পাঠান রাজা কেঁদে বললেন—মা, তুমি যেতে পাবে না; আমি হিঁদু মোছলমান সমান দেখব; তাদের ভাই-ভাই এক ঠাঁই করব; তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না। লক্ষ্মী বল্লেন—আচ্ছা তাই হবে, আমি এখন থাক্ব ; দিল্লিতে মোগল বাদ্শা হ'বেন। দিল্লির বাদ্শা বাংলার রাজা হবেন, সেই রাজা হিঁদু মোছলমান সমান দেখবেন; তখন হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই হবে, ঝগড়া বিবাদ মিটে যাবে। রাজা ঘুম ভেঙে দরবারে বস্লেন। দরবারে ব্রাহ্মণ এসে রাজাকে মহাভারত শোনালে। মোছলমান রাজা ব্রাহ্মণকে মান্য ক'রে রাজমন্ত্রী করলেন। হিঁদু গিয়ে মোছলমানের পীরতলায়

সিন্নি দিতে লাগ্‌ল। এমন সময় মহাপ্রভু নদীয়ায় অবতার হ্‌লেন। তিনি যবন ব্রাহ্মণ সবাইকে ডেকে কোল দিলেন। পাঠানের পর দিল্লির মোগল বাদ্‌শা বাংলার রাজা হ'লেন। তিনি হিঁদু মোছলমানকে সমান চোখে দেখতে লাগলেন। হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই হ'ল, ঝগড়া বিবাদ মিটে গেল। বাংলার লক্ষ্মী বাংলা জুড়ে বসলেন। ধনে ধানে দেশ পূর্ণ হ'ল।

এইরূপে বহুদিন গেল। চিরদিন সমান যায় না। লক্ষ্মী চঞ্চলা; তিনি আবার চঞ্চল হ'লেন। দিল্লির তখনকার বাদ্‌শা ছিলেন, তাঁর নাম ছিল আলম্‌গীর। তিনি হিঁদু-মোছলমানে তফাত করতে গেলেন। বর্গী এসে বাদ্‌শার রাজ্য লুঠ করতে লাগল। সাত সমুদ্র পার হ'য়ে খ্রিষ্টান ইংরেজ সদাগর বাংলায় বাণিজ্য করতে এসেছিল। দিল্লির বাদ্‌শা তাদের আদর ক'রে নিজের রাজ্যমধ্যে জায়গা দিয়েছিলেন। বাংলার ধন দেখে, ধান দেখে তাদের লোভ হ'ল। লক্ষ্মী তখন আলমগীরের বংশের দিল্লির বাদ্‌শাকে ছেড়েছেন। বাদ্‌শা ইংরেজকে বাংলার দেওয়ান ক'রে দিলেন। বাদ্‌শার দশা দেখে বাদ্‌শাকে খাজনা দেওয়া বন্ধ ক'রে তারাই হ'ল বাংলার রাজা। তারা এসেছিল সদাগর, হ'য়েছিল বাদ্‌শার দেওয়ান, হ'য়ে গেল দেশের রাজা। রাজা হ'ল; কিন্তু রাজ্যে বাস করল না। বাংলাদেশের ধন নিয়ে ধান নিয়ে সাত সমুদ্রপারে আপন দেশে চল্‌ল। সাগরের জাত কিনা, মেজাজ ঠাণ্ডা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, অতিশয় ধূর্ত। তারা চোর ডাকাত দমন করল, মিষ্টি মিষ্টি কথা কইতে লাগ্‌ল, আবার নিজের দেশ হতে খেলনা এনে পুতুল এনে প্রজার মন ভুলাতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী যখন চঞ্চল হন্, তখন মানুষের বুদ্ধি লোপ হয়। বাংলার লোকের বুদ্ধিলোপ হ'ল। বুড়ো মানুষ শিশু সাজ্‌ল; ইংরেজের দেওয়া খেলনা-পুতুল নিয়ে ছেলেখেলা করতে লাগ্‌ল। সদাগর রাজা কাঁচ এনে দিলেন। বাংলার প্রজা কাঞ্চন বদলে সেই কাঁচ নিতে লাগ্‌ল। দেশের জিনিসে লোকের মন উঠে না। ঝুঁটোমণির রঙ দেখে দেশের সাচ্চামণিকে অনাদর কর্‌তে লাগ্‌ল। রাজা যত আদর দেন, সোহাগ করেন, দেশের লোক ততই খোকা সাজ্‌তে লাগল। রাজা হাততালি দিতে লাগ্‌লেন; দেশের যত বুড়ো হামাগুড়ি দিয়ে আধ-আধ কথা বলতে লাগ্‌ল। লক্ষ্মী বললেন— আর না, আমি বাংলার লক্ষ্মী, বাংলার লোকের এই দশা, আমার আর বাংলায় থাকা চল্‌লো না।

লক্ষ্মী চঞ্চলা। চঞ্চল হয়ে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে চললেন। আঁধার রাতে কালপেঁচা ডেকে উঠ্‌ল। তখন সাত কোটি বাঙালি কেঁদে উঠল। রাজার দোষে লক্ষ্মী আমাদের ছেড়ে চল্‌লেন ব'লে রাজার দোষ দিয়ে সকলে কেঁদে উঠ্‌ল। ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে বিরক্ত হলেন। ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল কেরাণি, হয়ে এসেছিল নায়েব। নায়েবী পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান কর্‌ত। আলমগীর বাদ্‌শার তক্তে ব'সে সে আপনাকে আলমগীরের নাতি ঠাওরা'ত। সে বললে এরা বড় ঘ্যান্ ঘ্যান্ কর্‌ছে, থাক্, এদের দু-দল ক'রে দিচ্ছি ; এক দিকে যাক মোছলমান, একদিকে থাক্ হিঁদু। এরা ভাই-ভাই এক ঠাই থেকে বিরক্ত কর্‌ছে ; এদের ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই ক'রে দাও, এদের জোট ভেঙে দাও। এই ব'লে তিনি বাঙালিকে দু'দল ক'রে দিলেন,—একদিকে গেল হিঁদু, একদিকে গেল মোছলমান।-পূবে-উত্তরে গেল মোছলমান, পশ্চিমে-দক্ষিণে থাক্‌ল হিঁদু।

লক্ষ্মী দেখ্‌লেন, আমি বাংলার লক্ষ্মী ; আর আমার নিতান্তই বাংলায় থাকা চল্‌ল না। আমার হিঁদু যেমন মোছলমান তেমনি। হিঁদু মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হ'ল, তখন আর আমার বাংলায় থাকা চল্‌ল না।

১৩১২ সাল আশ্বিন মাসের তিরিশে, সোমবার কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া, সেদিন বড় দুর্দিন, সেইদিন রাজার হুকুমে বাংলা দু-ভাগ হবে; দু-ভাগ দেখে বাংলার লক্ষ্মী বাংলা ছেড়ে যাবেন। পাঁচকোটি বাঙালি আছাড় খেয়ে ভূমে গড়াগড়ি দিয়ে ডাকতে লাগ্‌ল—মা, তুমি বাংলার লক্ষ্মী, তুমি বাংলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ; বিদেশি রাজা আমাদের সুখ দুঃখ বোঝেন না, তাই ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই কর্‌তে চাইলেন ; আমরা ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হব না ; মা, তুমি কৃপা

কর ; আমরা এখন থেকে মানুষের মত হ'ব; আর পুতুলখেলা কর্‌ব না, কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ কিন্‌ব না ; পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌ব না ; মা তুমি আমাদের ঘরে থাক ; বাংলার লক্ষ্মী বাঙালিকে দয়া কর্‌লেন। কালীঘাটের মা-কালীতে তিনি আবির্ভাব হলেন। মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন। সেদিন আশ্বিনের অমাবস্যা ; ঘোর দুর্যোগ, ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি, হুহু ক'রে হাওয়া। পঞ্চাশ হাজার বাঙালি মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়্‌ল। বললে, মা আমাদের রক্ষা কর। বাংলার লক্ষ্মী যেন বাংলা ছেড়ে না যান। আমরা আর অবোধের মত ঘরের লক্ষ্মীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। ঘরের জিনিষ থাক্‌তে পরের জিনিষ নেবো না। মায়ের মন্দির হ'তে মা ব'লে উঠলেন—জয় হউক ; জয় হউক ; ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাক্‌বেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাক্‌বেন, তোমরা প্রতিজ্ঞা ভুলোনা ; ঘরের থাক্‌তে পরের নিয়ো না, পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হয়ো না, তোমাদের "এক দেশ এক ভগবান্ এক জাতি এক মনপ্রাণ" হোক্; লক্ষ্মী তোমাদের অচলা হবেন।

তিরিশে আশ্বিন ; কোজাগরী পূর্ণিমার পর তৃতীয়া। পূর্ণিমার পূজা নিয়ে বাংলার লক্ষ্মী ঐ দিন বাংলা ছাড়্‌ছিলেন। ঐ দিন বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় অচলা হ'লেন। বাংলার হাট মাঠ-ঘাট জুড়ে বস্‌লেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ কর্‌তে লাগ্‌লেন। ফলে ফুলে দেশে আলো হ'ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা কর্‌তে লাগ্‌ল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি হ'ল।

বাংলার মেয়েরা ঐ দিন বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত নিলে। ঘরে ঘরে সেদিন উনুন জ্বল্‌ল না। হিঁদু মোছলমান ভাই-ভাই কোলাকুলি করলে। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখি বাঁধলে। ঘট পেতে বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুন্‌লে। যে এই বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন।

বচ্ছর বচ্ছর ঐ দিনে বাঙালির মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালির ঘরে ঐ দিন উনুন জ্বল্‌বে না। হাতে হাতে হল্‌দে সুতোর রাখি বাঁধবে। বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটালি প্রসাদ পাবে। ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হ্‌বেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকবেন।

সবাই বল—

আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।।
ভাই ভাই এক ঠাঁই
ভেদ নাই ভেদ নাই।।

মা লক্ষ্মী, কৃপা কর। কাঞ্চন দিয়ে কাঁচ নেবো না। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। ঘরের থাক্‌তে পরের নেবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা কর্‌বো না।

ভিক্ষার ধন হাতে তুলবো না। মোটা অন্ন ভোজন কর্‌বো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ কর্‌বো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। ভাইকে খাইয়ে পরে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক্। মোটা বস্ত্র অক্ষয় হোক্। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুন। বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।

বাঙলার মাটি, বাঙলার জল,
বাঙলার বায়ু, বাঙলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক,
পুণ্য হউক হে ভগবান্।

বাঙলার ঘর, বাঙলার হাট,
বাঙলার বন, বাঙলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান্।

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান্।

বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান্।

বন্দেমাতরম
অনুষ্ঠান

প্রতি বৎসর আশ্বিনে বঙ্গবিভাগের দিনে বঙ্গের গৃহিণীগণ বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত অনুষ্ঠান করিবেন। সে দিন অরন্ধন। দেব-সেবা ও রোগীর ও শিশুর সেবা ব্যতীত অন্য উপলক্ষ্যে গৃহে উনুন জ্বলিবে না। ফলমূল চিড়ামুড়ি, অথবা পূর্বদিনের রাঁধা-ভাত ভোজন চলিবে।

পরিবারস্থ নারীগণ যথারীতি ঘট স্থাপন করিয়া ঘটের পার্শ্বে উপবেশন করিবেন। বিধবারা ললাটে চন্দন ও সধবারা সিঁদুর লইবেন। হরিতকী বা সুপারি হাতে লইয়া বঙ্গলক্ষ্মীর কথা শুনিবেন। কথা-শেষে বালকেরা শঙ্খধ্বনি করিলে পর ঘটে প্রণাম করিবেন। প্রণামান্তে বাম হস্তের (বালকেরা দক্ষিণ হস্তের) প্রকোষ্ঠে স্বদেশি কার্পাসের বা রেশমের হরিদ্রারঞ্জিত সূত্রে পরস্পর রাখি বাঁধিয়া দিবেন। রাখিবন্ধনের সময় শঙ্খধ্বনি হইবে। তৎপরে পাটালি প্রসাদ গ্রহণ করিবেন। সংবৎসরকাল যথাসাধ্য বিদেশি, বিশেষতঃ বিলাতি, দ্রব্য বর্জন করিবেন। সাধ্যপক্ষে প্রতিদিন গৃহকর্ম আরম্ভের পূর্বে লক্ষ্মীর ঘটে মুষ্টিভিক্ষা রাখিবেন এবং মাসান্তে বা বৎসরান্তে উহা কোনরূপ মায়ের কাজে বিনিয়োগ করিবেন।

রজনীকান্ত গুহ

ইংরেজ শাসন ও দেশব্যাপী অসন্তোষ

স্বদেশি আন্দোলনের মূল কারণ

কেহ কেহ মনে করেন, বৎসরাধিক হইল ভারতবর্ষে যে প্রবল আন্দোলন-তরঙ্গ প্রবাহিত হইতেছে, একমাত্র ইংরেজ বিদ্বেষই তাহার মূল। ইহাদিগের কথার ভাবে বোধ হয় যে, যে সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসী এই আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন, বর্তমান শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে তাহাদের প্রধান আপত্তি এই যে ইংরেজ বিদেশি—কোনও স্বদেশীয় রাজা তাহাদিগের স্থান অধিকার করিলেই সকল গোল চুকিয়া যায়। এই সংস্কার ভ্রান্ত। কারণ, শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে বোধ হয়, এমন নির্বোধ কেহই নাই, যিনি মনে করেন, রাজা স্বদেশীয় হইলেই প্রজাসাধারণকে স্বাধীন বলা যাইতে পারে। কোনও দেশের অধিবাসিগণ স্বাধীন কিনা, তাহা বিচার করিতে হইলে, তাহাদিগের রাজনৈতিক অধিকার কি প্রকার, তাহাই দেখিতে হয়, রাজা স্বদেশি কি বিদেশি, এ প্রশ্নের সহিত উহার সম্পর্ক বড় কম। অর্থাৎ, আরও সোজা কথায় বলিতে হয়, রাজা বিদেশি হইলেও প্রজাসাধারণ বহুপরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারে, আবার রাজা স্বদেশীয় হইলেও দেশবাসিগণ ক্রীতদাসরূপে পদ-দলিত হইতে পারে। দুই একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। ইংরেজগণ স্বাধীনতার জন্য যত সংগ্রাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে তাহাদিগকে কঠোরতম সংগ্রাম করিতে হইয়াছে তাহাদিগের স্বদেশীয় প্রথম চার্লস ও দ্বিতীয় জেম্‌সের সহিত। পক্ষান্তরে, ওলন্দাজ তৃতীয় উইলিয়ম তাহাদিগের বর্তমান স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠাতা এবং তাহার পরে, প্রথম জর্জের সময় হইতেই পার্লিয়ামেন্ট ও মন্ত্রিগণ সর্বেসর্বা হইতে আরম্ভ করেন। প্রথম জর্জ তো পূর্ণমাত্রায় বৈদেশিক ছিলেন, তিনি এক বর্ণ ইংরাজি বলিতে পারিতেন না, ভাঙা লাটিনে প্রধানমন্ত্রীর সহিত প্রয়োজনীয় কথাবার্তা চালাইতেন, ইংলণ্ড ছাড়িয়া হানোবরে যাইতে পারিলে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিতেন। আবার তৃতীয় জর্জ ইংলণ্ডেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সিংহাসনারোহণের পূর্বে ইংরাজ (born Englishman) বলিয়া তিনি সকলের প্রিয় ছিলেন, অথচ তিনিই আজীবন প্রজাগণের ন্যায্য অধিকার হরণ করিবার জন্য প্রাণপণে প্রয়াস পাইয়াছেন। নেপোলিয়নের প্রসিদ্ধ সেনাপতি বার্নাডট (Bernadotte) সুইডেনের রাজা নির্বাচিত হন এবং চার্লস নাম গ্রহণ করিয়া উহার সিংহাসনে আরোহণ করেন। আর সে দিন নরোওয়েবাসিগণ সুইডেন হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ডেন্‌মার্কের এক যুবরাজকে রাজত্বে বরণ করিয়াছে। ইহাতে সুইডেন বা নরোওয়েবাসিদিগের স্বাধীনতা কিছুমাত্র খর্ব হয় নাই। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতবাসী যে আপনাদিগকে পরাধীন বলিয়া অনুভব করিতেছে, তাহার একমাত্র ইহাই কারণ নয় যে, ভারতের রাজা বিদেশি। আমরা জানি, এডোয়ার্ড আমাদের রাজা থাকিলেও আমরা হিন্দু বা মুসলমান আমলের অপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনতা সম্ভোগ করিতে পারি। তবে এই যে দেশব্যাপী অসন্তোষ স্পষ্ট অনুভূত হইতেছে ইহার কারণ কি? কারণ, ভারতবাসীর উল্লেখযোগ্য কোনও রাজনৈতিক অধিকার নাই, এবং তজ্জন্য তাহারা কতকগুলি বিষম কুফল ভোগ করিতেছে।

ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার - বিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি

ভারতবাসির রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা করিতে হইলে পূর্বে ভারত রাজশক্তির

অন্তর্ব্যবস্থান বা constitution of the State ভাল করিয়া বুঝিতে হয়। তদর্থে বিভিন্ন প্রকারের রাজশক্তি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

প্রাচীনকাল হইতে আজ পর্যন্ত যত প্রকারের রাজশক্তির পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাহাদিগের সকলের যথাযথ বর্ণনা না করিয়া মোটামুটি দুটি মেরু (Poles) বা সীমা নির্দেশ করা যাইতে পারে। একমেরু, পূর্ণ একনায়কত্ব বা absolute despotism। ফ্রান্সের সর্বপ্রধান নৃপতি চতুর্দশ লুই-এর একটি কথাতে ইহার অভিব্যক্তি দেখিতে পাই। একদা তিনি কথায় কথায় বলিয়াছিলেন, "L 'etat? e'est Moi!" "রাজ্য? সে তো আমি।" এই তন্ত্রের মূল কথা, রাজা স্বয়ং ঈশ্বর, বা ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তিনিই রাজ্য। প্রজাসাধারণের কোনও স্বত্ব নাই। অম্লানবদনে রাজার আদেশ পালন করাই তাহাদিগের ধর্ম। প্রাচীন ভারতে, পারস্যে, মিশরে, মধ্যযুগে ইউরোপে এবং বর্তমান সময়ে চীন ও অন্যান্য দেশে এই একনায়কত্ব দৃষ্ট হয়। ইহার বিপরীত মেরু, প্রজাতন্ত্র অর্থাৎ যে তন্ত্রের ব্যবস্থানুসারে দেশের সমগ্র প্রাপ্তবয়স্ক অধিবাসী (পুরুষ ও রমণী) সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে রাজক্ষমতা পরিচালন করে। বলা বাহুল্য, এই রূপ প্রজাতন্ত্র আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনও দেশে দেখা যায় নাই। কিন্তু চিন্তাশীল সুধীজনের আশা এই, পৃথিবীতে কোন-না-কোন দিন এই প্রকারের রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। ভবিষ্যতের আশা, যাহাই হউক, আজকাল যত প্রকারের শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহা ঐ উভয় মেরুর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণিতে স্থাপনযোগ্য, ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এবং ইহাও বুঝা যাইতেছে, ভারত গবর্নমেন্ট ঐ প্রথম মেরুর অতি নিকটবর্তী। এক কথায় বলা যাইতে পারে ভারতবর্ষে একনায়কত্ব বা despotism প্রতিষ্ঠিত।

মানবজাতির আদিম অবস্থায় যথেচ্ছাচার শাসন প্রণালী (অথবা absolute despotism tempered by assassination) উপযোগী ছিল। কিন্তু কালক্রমে বিভিন্ন জাতি যতই উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে, ততই উহা অনুপযোগী হইয়া পড়িতেছে। এ জন্য সভ্য দেশ মাত্রেই প্রজাশক্তি ক্রমেই প্রসারলাভ করিতেছে এবং কোথায়ও বা বিনা রক্তপাতে, কোথাও বা লক্ষ লোকের শোণিত বিনিময়ে একনায়কত্ব স্থলে বহুনায়কত্ব (বা democracy) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য জাতি সমূহের চক্ষে ভারতবর্ষ সভ্য নয় সুতরাং এদেশে প্রজাশক্তি প্রতিষ্ঠার আশা বাতুলতা বলিয়া উপহাসাস্পদ। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, অপ্রতিহত রাজশক্তি প্রজারঞ্জক বা প্রজাপীড়ক উভয়ই হইতে পারে। হিন্দু রাজাদিগের ক্ষমতা, অপ্রতিহত ছিল, কিন্তু মনুসংহিতা ও মহাভারতে যে রাজকর্তব্য নির্দিষ্ট আছে, তাহাতে মনে হয়, প্রাচীনকালে এ দেশে প্রজার সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই রাজার প্রধান কার্য ছিল। অর্থাৎ হিন্দু despotism benevolent despotism ছিল। আকবরের সম্বন্ধেও ঐ কথা প্রযোজ্য। প্রশ্ন এই, ইংরেজ শাসন কি পূর্ণমাত্রায় প্রজারঞ্জক? British, despotism কি benevolent despotism? অথবা ভারত গবর্নমেন্ট অসীম ক্ষমতাশালী হয় হউক, কিন্তু উহা কি গবর্নমেন্টের অবশ্যকর্তব্য সকল পালন করিতেছে? ইংরেজ শাসনের গুণাগুণ এই প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে।

রাজশক্তির প্রধান কর্তব্য — স্পেন্সারের মত

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হয়, গবর্নমেন্টের অবশ্যকরণীয় কার্য কি? আমরা এ বিষয়ে প্রথমে হার্বার্ট স্পেন্সারের মত আলোচনা করিব। যে সমাজ বর্বরাবস্থা অতিক্রম করিয়া অপেক্ষাকৃত সুসভ্যাবস্থায় উপনীত হইয়াছে, সে সমাজস্থ নরনারীগণের একটি নৈসর্গিক অধিকার এই যে তাহারা প্রত্যেকে অপরের স্বাধীনতায় হস্তার্পণ না করিয়া ইচ্ছানুরূপে আপনাদিগের শক্তির ব্যবহার করিতে পারে।

[Every man has freedom to do all that he will provided he infringes not

the equal freedom of any other man—Social Statecs, P. 54.]

এই নীতি অনুসারে প্রত্যেক মানুষের কতকগুলি স্বত্ব (rights) আছে। সে যাহাতে এই স্বত্বগুলি অব্যাহতভাবে ভোগ করিতে পারে, তাহার উপায় বিধান করাই গবর্নমেন্ট বা রাজশক্তির কর্তব্য। দেশে শান্তি রক্ষা করা অর্থাৎ দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, এবং বৈদেশিক শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশকে নিরাপদ রাখা, এই কর্তব্যেরই অন্তর্গত।

[When we agreed that it was the essential function of the State to protect – to administer the law of equal freedom – to maintain men's rights ; we virtually assigned to it the duty, not only of shielding each citizen from the trespasses of his neighbours, but of defending him, in common with the community at large, against foreign aggressions — *Social States,* P. 115]

এই আদর্শ অনুসারে বিচার করিলে ইংলণ্ডের শাসন প্রণালীও দোষশূন্য নয়, ভারতবর্ষের সম্বন্ধে আর কী কথা। যে দেশের অধিবাসিরা সমুদ্রতীরে বাস করিয়াও পয়সা দিয়া লবণ কিনিতে বাধ্য হয়, সে দেশে মানবজাতির নৈসর্গিক স্বাধীনতার কথা উপস্থিত করাই বিড়ম্বনা। অতএব অতঃপর অন্য আদর্শের অনুসন্ধান করা যাক।

রাজশক্তির গুণ পরীক্ষা — মিলের মত

উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী (good government) কাহাকে বলে? মিল্ বলেন —

"The most important point of excellence which any form of Government can possess is to promote the virtue and intelligence of the people themselves".

Representative Government, P-12.

পুনশ্চ,

"All government which aims at being good is an organization of some part of the good qualities existing in the individual members of the community for the conduct of its collective affairs." — Do p. 13.

উপরে যাহা উদ্ধৃত হইল, নিম্নোক্ত কথায় তাহার সার সংগৃহীত হইয়াছে—

"We have now, therefore obtained a foundation for a twofold division of the merit which any set of political institutions can possess. It consists partly in the degree in which they promote the general mental advancement of the community, including under that phrase advancement in intellect, in virtue, and in practical activity and efficiency ; and partly of the degree of perfection with which they organize the moral, intellectual, and active worth already existing, so as to operate with greatest effect on public affairs" — Do PP. 13, 14.

মিল যাহা বলিতেছেন, তাহার মর্ম এই। উৎকৃষ্ট শাসন প্রণালী তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যদ্দ্বারা জনসাধারণের মানসিক, নৈতিক ও কার্যকরী শক্তিসমূহ সম্যক বিকশিত হয়, এবং যাহা ঐ সকল শক্তিকে যথাসম্ভব কার্যে নিয়োজিত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হিতসাধন করে। এক্ষণে যদি দেখা যায় কোনও দেশের শাসনকার্যে তদ্দেশবাসীদিগের মোটেই কোন হাত নাই—তাহারা কেবল কর প্রদান করে, কিন্তু তাহার ব্যয় সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করিতে পারে না—তাহারা দিন দিন আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া পড়িতেছে, উপযুক্ত কার্যক্ষেত্রের অভাবে তাহাদিগের মানসিক শক্তি বিকশিত হইতে পারিতেছে না এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহারা নৈতিক বল হারাইতেছে—যদি দেখা যায়, সে দেশের উচ্চতর রাজকার্য সমস্তই বৈদেশিকদিগের একচেটিয়া, জনসাধারণ স্বদেশে ভারবাহী গর্দভ মাত্র, —তবে বলিতে হইবে, মিলের আদর্শানুসারে এইরূপ শাসন প্রণালী নিতান্ত দোষযুক্ত। বস্তুতঃ

প্রাচীন হিন্দু আদর্শ বা বর্তমান উন্নততর ইউরোপীয় জ্ঞান—যাহা দ্বারাই বিচার করি না কেন, এক্ষণে এ দেশে যে প্রকারের শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, রাজপুরুষগণের স্বার্থপরতা ভিন্ন তাহার স্বপক্ষে বলিবার আর কিছুই নাই। কথাটা যে একান্তই অসঙ্গত ও মিথ্যা নয়, তাহা বুঝাইবার জন্য ইংরেজ শাসন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

ইংরেজ শাসনের দোষ ও অভাব
স্পেন্সারের উক্তি

এ কথা বলিবার অপেক্ষা করে না যে অপরের দেশ জয় করিতে হইলে ন্যায় ধর্মকে পদদলিত করিতে হয়। ইংরেজের ভারত জয়ে এই সাধারণ নিয়মের ব্যাভিচার দৃষ্ট হইবে না, ইহা কোনও বুদ্ধিমান ব্যক্তিই আশা করিতে পারে না। সুতরাং ইংরেজ কি কি উপায়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ অধিকার করিলেন, তাহার অনুসন্ধান করার আবশ্যক নাই। প্রশ্ন এই, অতীতকালে যাহাই হউক, এক্ষণে কি ইংরেজের রাজদণ্ড ন্যায় ও ধর্মের অনুষ্ঠানুসারে পরিচালিত হইতেছে? ইহার উত্তরে হার্বার্ট স্পেন্সারের ন্যায় নিরপেক্ষ সত্যনিষ্ঠ দার্শনিক লেখক কি বলেন শুনুন। ভারতে ইংরেজগণ যে সকল বহুবিধ কুকর্ম করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি উল্লেখ করিয়া স্পেন্সার ক্ষোভ সহকারে বলিতেছেন—

> "Even down to our own day kindred iniquities are continued. Down to our own day, too, are continued the grievous salt monopoly, and the pitiless taxation which wrings from the poor ryots nearly half the produce of the soil. Down to our own day continues the cunning despotism which uses native soldiers to maintain and extend native subjection".—
> *Social States,* P. 194

[এখনও পূর্বের ন্যায় অন্যায় আচরণ চলিতেছে। এখনও ভারবহ লবণের একচেটিয়া রহিয়াছে এবং নির্দয়রূপে প্রজাগণের নিকট হইতে ভূমির প্রায় অর্ধেক শস্য কররূপে গৃহীত হইতেছে। এখনও এই ধূর্ত যথেচ্ছাচার তন্ত্র ভারতীয় সৈন্যের সাহায্যে ভারতবাসীকে পরাধীন করিয়া রাখিতেছে ও নূতন নূতন প্রদেশ জয় করিতেছে।]

আর একজন ইংরাজের মত

বর্তমান ভারত শাসনের মূল প্রকৃতি কি? ইহা এদেশে সুফল না কুফল প্রসব করিতেছে? একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ বলেন, যে সকল কুকীর্তির জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস পার্লিয়ামেন্ট কর্তৃক অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, বর্তমান শাসন প্রণালীর কুফল তাহা অপেক্ষাও ভীষণ। সেই কুফল কি?

> It is the alien rule of India in its present form! it is the economic drain of India's resources ; it is the subordination of the interests of the sons of the soil to the interests of the foreigners ; it is the consideration always of England before India — *Digby's Prosperous British India,* P. 638.

অর্থাৎ সেই কুফল আর কিছুই নহে —বর্তমান আকারের বৈদেশিক শাসন হইতে যাহা প্রসূত হইতে পারে তাহাই। উহা ভারতের শোষণ, বৈদেশিকদিগের স্বার্থের নিকট ভারতবাসির স্বার্থের বলিদান, ভারতের কথা ভাবিবার পূর্বে ইংলণ্ডের কথা ভাবা। ইহাতে দেশের যে দশা হওয়া সম্ভব, তাহাই দিন দিন স্পষ্টীকৃত হইতেছে।

দাদাভাই নৌরজীর মত

শ্রীযুক্ত দাদাভাই নৌরজী *Poverty and Un British Rule in India* নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে

ভারতবাসীর অবস্থা ও ইংরেজ শাসনের দোষগুণ সম্যক্ আলোচনা করিয়া নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

> **"The existing system of British Rule is an unBritish, debasing, destructive, despotic and impoverishing Rule."**

এই কথার মধ্যে একবর্ণ অত্যুক্তি নাই। ক্রমে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

[Un-British অব্রিটিশ]

ব্রিটিশ রাজনীতির মূলসূত্র কি? No Representation no taxation, অর্থাৎ কেবল প্রজাসাধারণের প্রতিনিধিগণই কর স্থাপন করিতে পারে, তাহাদিগের সম্মতি ব্যতীত রাজার করস্থাপনের অধিকার নাই। ইহা হইতে দ্বিতীয় এই সূত্র প্রসূত হইয়াছে যে প্রজাসাধারণের অমতে রাজস্ব ব্যয়িত হইতে পারে না, তাহাদিগের মতবিরুদ্ধ কোনও কার্য করিতে চাহিলে প্রজাগণ রাজার আয়ের পথ বন্ধ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু ভারতে কি দেখিতে পাই? বড়লাটের মন্ত্রিসভায় রাজস্বের হিসাব উপস্থিত করা হয় বটে, কিন্তু দেশীয় সদস্যগণ তদুপরি শুধু বক্তৃতা করিতে পারেন, প্রজার রক্তশোষণ করিয়া যে কর আদায় হয়, তাহা শত অপকর্মে অপব্যয়িত হইলেও তাহাদিগের কোনও প্রতীকার করিবাব সাধ্য নাই। ফলে দিন দিন যুদ্ধের আয়োজনে কত অর্থ জলের ন্যায় খরচ হইতেছে তাহার ঠিকানা নাই। এদিকে শিক্ষা প্রভৃতি অত্যাবশ্যক কার্যে একান্ত অর্থাভাব। শুধু তাই নয়, পূর্বে চীন হইতে পশ্চিমে মিশর পর্যন্ত যেখানে ইংরেজগণ প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে যে যুদ্ধে ব্যাপৃত হউন না কেন ভারতবাসিকে তাহার খরচ জোগাইতেই হইবে। কাবুলের আমীর বা তাহার পুত্র বিলাতে গেলে তাহার অভ্যর্থনার ব্যয় দরিদ্র ভারতবাসিকে বহন করিতে হইবে। পারস্যের শাহ বিলাতে ভোজ খাইলে সে আতিথেয়তার ব্যয়টাও আমাদিগকেই দিতে হইবে। আরও দেখুন, কি ন্যায় বিচার! উপনিবেশ সমূহের জন্য বিলাতে যে আফিস আছে, উপনিবেশবাসিরা তাহার ব্যয়স্বরূপ এক কপর্দকও দেয় না, অথচ ভারত-সচিবের বেতন হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার আফিসের কাগজ, কলম, আলপিনটির ব্যয় পর্যন্ত কড়াক্রান্তি হিসাব করিয়া সমস্তই ভারতবাসিকে দিতে হয়। এদেশে গোরা সৈন্য পাঠাইতে হইবে, বিলাতে তাহাদিগের সংগ্রহ ও শিক্ষার জন্য যে ব্যয় হয় তাহা তো ভারতবর্ষ দিতে বাধ্য। দক্ষিণ আফ্রিকায় সৈন্য রাখার ব্যয়টা যে ভারতবাসির স্কন্ধে পড়ে নাই, সেটা তাহাদিগের নিতান্ত কপালের জোর। এই সমস্ত যদি un-British-ন্যায়বিরুদ্ধ না হয়, তবে আর ন্যায় অন্যায় বলিয়া দুটা কথা অভিধানে আছে কেন?

Debasing অবনতিজনক

ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষিত ভারতবাসির উচ্চতর মানসিক শক্তি বিকাশের সুযোগ নাই। প্রথমতঃ সমগ্র ভারতবাসী নিরস্ত্র, সৈনিক বিভাগের উচ্চকর্মে তাহাদিগের প্রবেশাধিকার নাই। সুতরাং তাহারা দিন দিন নির্বীর্য, অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে। বহিঃশত্রুর কথা দূরে থাকুক, তাহারা বন্য জন্তুর হস্ত হইতেও আপনাদিগকে বাঁচাইতে পারে না। উচ্চতর রাজকার্যের দ্বারও তাহাদিগের নিকট রুদ্ধ। ফলে, ব্রিটিশ ভারতে মাধবরাও, সালরজঙ্গ, কৃপারাম, দিনকর রাও, ফয়জ আলি খাঁ, পূর্ণিয়া, শেষাদ্রি আয়ার প্রভৃতি মনস্বী লোকের স্থান নাই। আনন্দমোহন বসু, রমেশচন্দ্র দত্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ইংলণ্ডে জন্মগ্রহণ করিলে শাসনবিভাগে কোন্ পদ লাভ করিতেন, তাহা কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এ বিষয়ে আক্‌বরের উদার ও দূরদর্শী নীতির সহিত ইংরেজের অনুদার, সঙ্কীর্ণ ও স্বার্থান্ধ নীতির কোন তুলনাই হয় না। আকবর মানসিংহকে কাবুলের ন্যায় একটি নিরবচ্ছিন্ন মুসলমান অধ্যুষিত দেশের শাসনকর্তার পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশের

কথা ত বলাই নিষ্প্রয়োজন। কেহ কি কল্পনা করিতে পারেন, ইংরেজগণ গাইকোয়াড়কে কানাডার গবর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত করিতে পারেন? কানাডা তো পরের কথা,—মর্লীর অতবড় বক্তৃতার পরেও তো বাবু কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত বঙ্গের অস্থায়ী ছোটলাট না হইয়া মৎস্য রক্ষণ কর্মে নিযুক্ত হইলেন। আরও নিচে অবতরণ করা যাক। রমেশবাবু বর্ধমানের কমিশনারের পদে উন্নীত হইলে ইংরেজ কর্মচারীগণের মধ্যে কি বিষম কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল—ডাক্তার প্রসন্নকুমার রায় যাহাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ হইতে না পারে, তদুদ্দেশ্যে যে ষড়যন্ত্র হইয়াছিল, শ্রীযুক্ত চন্দ্রমাধব ঘোষ যেদিন প্রধান বিচারপতির আসন গ্রহণ করেন সেদিন শ্বেতাঙ্গ ব্যবহারজীবিগণ অনুপস্থিত হইয়া তাহার প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—ইহা যখন স্মরণ করি তখন ইংরেজ চরিত্রের সঙ্কীর্ণতা ভাবিয়া বস্তুতঃই বড় ক্ষুব্ধ হইতে হয়। একটি অপরিবর্তনীয় প্রাকৃতিক নিয়ম এই যে চর্চার অভাবে কোনও শক্তিই বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। ভারতবাসির জন্য উচ্চতর মানসিক শক্তি বিকাশের ক্ষেত্র নাই, সুতরাং তাহারা যে দিন দিন নানা প্রকারে শক্তিহীন হইয়া পড়িবে, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি? 'আগে উপযুক্ত হও, পরে আশা করিও', এই প্রবাদ বাক্য ইংরেজের মুখে সর্বদাই শুনা যায়। কিন্তু আগে সন্তরণ শিখিয়া পরে কেহ জলে অবতরণ করে কি? বুদ্ধি প্রকাশের কোনও সুযোগ না দিয়া কাহাকেও নির্বোধ বলিয়া উপহাস করা, রাজনীতি হইতে পারে, কিন্তু ইহা ধর্মনীতি নহে।

[Destructive and impoverishing সর্বনাশী ও দারিদ্র্যোৎপাদক]

অনেকেই জানেন, একশত বৎসরে সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধে যত লোক মরিয়াছে, এক ভারতবর্ষে বিগত পঞ্চাশ বৎসরের দুর্ভিক্ষে তদপেক্ষা অনেক অধিক লোক প্রাণত্যাগ করিয়াছে। ইহার কারণ কি? অনাবৃষ্টি অতিবৃষ্টি তো পৃথিবীর সর্বত্রই ঘটিতেছে, তবে শুধু ভারতবর্ষেই লক্ষ লক্ষ লোক দুর্ভিক্ষে ধ্বংস হইতেছে কেন? ইহার একমাত্র উত্তর ভারতের সাংঘাতিক দারিদ্র্য। দাদাভাই নৌরজী বা ডিগবীর গণনা না হয় নাই স্বীকার করিলাম। লর্ড ক্রোমার এবং লর্ড কার্জনের উক্তি অনুসারেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দরিদ্র। প্রতি ইংরেজের আয় বার্ষিক ত্রিশ পৌন্ড, প্রতি ভারতবাসির আয়, সরকারি গণনানুসারে, মোটে দুই পৌন্ড, অথচ প্রত্যেক ইংরাজ আয়ের শতকরা আটভাগ কর স্বরূপ প্রদান করেন, আর প্রতি ভারতবাসিকে আয়ের শতকরা পনের ভাগ দিতে হয়। এই ঘোর দারিদ্র্য কি ভারতবাসির অলঙ্ঘনীয় কর্মফল, না ইহার জন্য রাজপুরুষগণও কিয়ৎ পরিমাণ দায়ী? দায়ী বই কি। ইংরেজগণ অধর্মাচরণ করিয়া ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন, এবং বর্ষে বর্ষে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কোটি টাকা শোষণ করিতেছেন। এই দুই কারণে ভারতবাসী হৃতসর্বস্ব ও রক্তহীন হইয়া পড়িতেছে। এই জন্যই দিনের পর দিন প্রায় দশ কোটি ভারতবাসী অর্ধাশনে জীবনপাত করিতেছে—এই জন্যই যখনই দৈব কিঞ্চিন্মাত্র প্রতিকূল হন, তখনই পঙ্গপালের ন্যায় ভারতীয় প্রজা মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

Despotic যথেচ্ছাকারী

১৮৩৩ সনে, পার্লিয়ামেন্ট ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে নূতন সনন্দ দিবার সময় আইন করিলেন—

> That no Native of the said territories, nor any natural born subject of his Majesty resident there in, shall, by reason only of his religion, place of birth, descent, colour, or any of them, be disabled from holding any place, office or employment under the said company.

অর্থাৎ ভারতীয় কোনও প্রজা কেবল জাতি বা ধর্মগত পার্থক্য নিবন্ধন কোনও রাজকার্য হইতে বঞ্চিত হইবে না। কিন্তু ১৮৫৮ সন পর্যন্ত এই বিধি শুধু কাগজ পত্রেই আবদ্ধ রহিল। ঐ সনে

মহারানী ভিক্টোরিয়া স্বহস্তে ভারত সাম্রাজ্য গ্রহণ করিয়া ঘোষণা করিলেন—

> "And it is our further will that, so far as may be, our subjects, of whatever race or creed, be freely and impartially admitted to offices in our service, the duties of which they may be qualified, by their education, ability, and integrity, duly to discharge.

[শিক্ষা, দক্ষতা ও সততা দ্বারা উপযুক্ত হইলে ভারতবাসি জাতিধর্ম নির্বিশেষে যত দূর সম্ভব সমস্ত রাজকার্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে।]

ইহার পরে ১৮৬০ সনে, এই অভিপ্রায় কার্যে কতদূর পরিণত হইতে পারে, তাহা বিবেচনা করিবার জন্য, ভারত-সচিবের কয়েকজন সদস্য লইয়া একটি কমিটি রিপোর্ট দিলেন, ইংলণ্ডে ও ভারতে যুগপৎ সিবিল সার্বিস পরীক্ষা গৃহীত হইলে ভারতবাসির প্রতি ন্যায্য ব্যবহার হইতে পারে। গবর্নমেন্ট দেখিলেন, মহাবিপদ; রিপোর্টটি প্রকাশিত হইলে ভারতবর্ষে একটা তুমুল কোলাহল উপস্থিত হইবে। অতএব রিপোর্টটিকে বেমালুম চাপা দিলেন। এমন চাপা দিলেন যে আজ পর্যন্ত অল্প লোকেই উহার খোঁজ রাখেন ; দাদাভাই অনেক আয়াস স্বীকার করিয়া তাহার তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ইহার ৩৩ বৎসর পরে, ১৮৯৩ সনের ২ জুন হাউস অব্ কমন্স এই মর্মে এক মন্তব্য নির্ধারণ করেন যে সিবিল সার্বিস পরীক্ষা ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে যুগপৎ গৃহীত হইবে। বলা বাহুল্য, এই মন্তব্যও বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। পার্লিয়ামেন্টের একটি এতবড় নির্ধারণ এমন ভাবে পদদলিত হইল, অথচ তজ্জন্য ইহার সভ্যগণ একটিবার উচ্চবাচ্য করিলেন না, ইহার অর্থ কি? লর্ড সল্সবেরীর কথায় সেই অর্থ প্রকাশিত হইতেছে—ভারতবাসীকে বহুলভাবে রাজকার্যে নিয়োগের কথা একটা রাজনৈতিক ভণ্ডামি বা প্রবঞ্চনা — Political hypocrisy. লর্ড লিটনের এক গোপনীয় পত্রেও এই উক্তি সমর্থিত হইতেছে—

> We have had to choose between prohibiting them and cheating them : and we have chosen the least straight forward course ... Since I am writing confidentially I do not hesitate to say that both the Governments of England and of India appear to me up to the present moment, unable to answer satisfactorily the charge of having taken every means in their power of breaking to the heart the words of promise they had uttered to the ear.

অর্থাৎ ভারতবাসী রাজকার্য পাইবে না, স্পষ্ট এরূপ না বলিয়া, গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে মিথ্যা আশায় প্রবঞ্চিত করিতেছেন। মুখে আশার বাণী শুনাইয়া কার্যতঃ সে আশায় নিরাশ করা—এই অভিযোগ হইতে কি ভারত গবর্নমেন্ট কি বিলাতের কর্তৃপক্ষ, কেহই মুক্ত নহেন। ভারত গবর্নমেন্ট আমাদিগের কেমন অকপট সুহৃৎ, দাদাভাই নৌরজীর নিম্নোক্ত কথায় তাহা ব্যক্ত হইতেছে—

> "The way of the Indian authorities is first to ignore any Act or Resolution of Parliament or Report of any committee or commission in favour of Indian interests. If that is not enough, then to delay replies. If that does not answer, then openly resist, and by their persistence carry their own point unless a strong secretary of State prevents it".
>
> — *Poverty and Un-British Rule in India,* P. 432.

অর্থাৎ ভারতবাসির হিতকল্পে যদি পার্লিয়ামেন্টের কোনও আইন বা নির্ধারণ থাকে, অথবা কোনও কমিটি বা কমিশন কোনও রিপোর্ট লিপিবদ্ধ করেন, তবে ভারত গবর্নমেন্ট প্রথমে তাহা অগ্রাহ্য করিয়া চলেন। তাহাতে না কুলাইলে, ভারত সচিব এইরূপ নির্ধারণের প্রতি তাহাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে, তাহারা পত্রের উত্তর দিতে বিলম্ব করেন। (কোনও কোনও স্থলে এইরূপ দীর্ঘসূত্রতা দ্বারা দশ বৎসর অতিবাহিত হয়—প্রমাণ স্ট্যাটুটরি সিবিল সার্বিস সম্বন্ধে ভারত সচিবের আদেশ ও তৎপ্রতিপালনে ভারত গবর্ণমেন্টের তৎপরতা)। যখন ইহাতেও কুলায় না,

তখন তাহারা প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করেন, এবং সর্ববিধ উপায়ে ভারতবাসির পক্ষে হিতকর প্রস্তাবটিকে পণ্ড করিবার জন্য প্রয়াস পান। এরূপ বীর্যবান্ ভারত-সচিব আজ পর্যন্ত অতি অল্পই দেখা গিয়াছে, যিনি তাহাদিগের প্রাণপণ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করিয়া এরূপ কোনও প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। যাহারা দাদাভাই-এর এই মন্তব্যের প্রমাণ চান, তাহারা তাহার গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিবেন।

আমাদিগের উন্নতির জন্য রাজপুরুষগণ কেমন ব্যগ্র, আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা দেখান যাইতেছে। **ভারতবাসির অজ্ঞানান্ধকার দূর করবার উদ্দেশ্যে সরকার বাহাদুর জনপ্রতি উচ্চশিক্ষায় এক পয়সা ও নিম্নশিক্ষায় এক আনার কম ব্যয় করিতেছেন। আর ১৯০৪-০৫ সালে বিলাতি গবর্ণমেন্ট রাজকোষ হইতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইংলণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডে জনপ্রতি প্রায় সাত শিলিং (৫।০) ও আয়ার্লণ্ডে ৬ শিলিং ৫।০ পেন্স (প্রায় ৫ টাকা) দিয়াছেন।** ইহার উপর স্থানীয় কর ও অন্যান্য ভাণ্ডার হইতেও যথেষ্ট ব্যয় হইয়াছে।

এই সমস্ত পর্যালোচনা করিয়া দাদাভাই হাউস অব্ কমন্সে বলিয়াছিলেন—

"The evil of foreign rule involved the triple loss of wealth, wisdom, and work".

ব্রিটিশ শাসনে ভারতের ত্রিবিধ ক্ষতি হইতেছে। প্রথম — ভারতের রক্তশোষণ। পূর্বেই বলা হইয়াছে বর্ষে বর্ষে প্রায় ৪৫ কোটি টাকা বিলাতে যাইতেছে। দ্বিতীয়তঃ ভারতবাসী জ্ঞান ও বুদ্ধি হারাইতেছে, কারণ তাহারা দেশ শাসন ও সংরক্ষণে বঞ্চিত বলিয়া তাহাদিগের জ্ঞান-বুদ্ধির উপযুক্ত পরিচালনা হইতেছে না। তৃতীয়তঃ রাজকার্যে ন্যায়তঃ ধর্মত তাহাদিগের প্রাপ্য স্থান ইউরোপীয়গণ গ্রহণ করাতে তাহারা জীবিকা উপার্জনে ক্লেশ পাইতেছে।

দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনা

এই তো ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অবস্থা। এখন একবার একটি দেশীয় রাজ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। ১৮৮১ সনে মহীশূর দেশীয় নৃপতির হস্তে প্রত্যর্পিত হয়। তখন সুদীর্ঘ ব্রিটিশ শাসনান্তে উহার ভারত গবর্ণমেন্টের নিকট আশী লক্ষ টাকা ঋণ ছিল, এবং আয়ের অপেক্ষা সমগ্র ঋণের পরিমাণ পৌনে একত্রিশ লক্ষ টাকা অধিক ছিল। স্বদেশীয় শাসনাধীনে মহীশূরের কি দ্রুত উন্নতি হইতেছে। ১৮৮১ সনে উহার বার্ষিক রাজস্ব এককোটি তিনলক্ষ ও ১৮৯৪-৯৫ সনে এক কোটি আশী লক্ষ টাকা ছিল। আর গত বৎসর উহা (১৯০৫-০৬) দুই কোটি একচল্লিশ লক্ষ আঠার হাজার টাকা হইয়াছে। সমস্ত ব্যয় নির্বাহ করিয়া গত বৎসর নয় লক্ষ নিরানব্বই হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়। বর্তমান বর্ষের প্রারম্ভে রাজকোষে প্রায় এককোটি টাকা সঞ্চিত ছিল। অথবা মহীশূরের ন্যায় উন্নত দেশীয় রাজ্যের সহিত তুলনারই বা প্রয়োজন কি? স্বদেশি ও বিদেশি শাসনের তুলনা করিয়া লর্ড সল্‌স্‌বেরী স্বয়ং বলিতেছেন —

> "The British Government has never been guilty of the violence and illegality of Native Sovereigns. But it has faults of its own, which, though they are far more guiltless in intention are more terrible in effect"
>
> —*Poverty*, C.P. 370.

"ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট দেশীয় নৃপতিদিগের ন্যায় অবিচার অত্যাচার করেন না"— মোটেই করেন না, এমন এখন আর বলিতে পারি না,—নাতু ভ্রাতৃদ্বয় এবং বরিশাল প্রাদেশিক সমিতি ইহার সাক্ষী)। "কিন্তু ইহার এমন কতকগুলি দোষ আছে যাহা কর্তৃপক্ষগণের অভিপ্রায় বিশুদ্ধ হইলেও অতি ভীষণ ফল প্রসব করিতেছে।" এই জন্যই দাদাভাই নৌরজী বলিয়াছেন —

> "The romance is that there is security of life and property in India; the reality is that there is no such thing." — Do, P. 224.

এখন ভারতবাসির জীবন ও সম্পত্তি নিরাপদ, এটা নিতান্তই কবিকল্পনা। দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ নাই. সত্য বটে, কিন্তু ইংরেজের গ্রাস হইতে ভারতবাসির ধনপ্রাণ কে রক্ষা করিবে?

হিন্দু বা মুসলমান রাজারা অত্যাচার করিতেন, সত্য কথা। কিন্তু হিন্দু বা মুসলমান despotism এর সঙ্গে British despotism এর পার্থক্য কি? পার্থক্য এই, তখন রাজা ছিলেন একজন, এখন রাজা প্রায় চারি কোটি। জন স্টুয়ার্ট মিল যথার্থই বলিয়াছেন—

> "It is not certain that the despotism of twenty millions is necessarily better than that of a few or of one."
>
> "একজনের যথেচ্ছাচার অপেক্ষা দুই কোটি লোকের যথেচ্ছাচার নিশ্চয়ই শ্রেয়ঃ হইবে, এমন কথা দৃঢ়তার সহিত বলা যায় না।"

প্রতিকারের পন্থা—বৈদেশিক শাসনের অপরিহার্য ত্রুটি

আমাদিগের নেতৃবর্গের মধ্যে অনেকে মনে করেন পার্লিয়ামেন্ট যদি ভারতবর্ষের প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে আরম্ভ করেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি এ দেশের প্রতি আর একটু দৃষ্টিপাত করেন, তবেই আমাদিগের ভাগ্য ফিরিতে পারে। এ বিষয়ে মিল্ কি বলেন, শুনুন—

> "To govern a country under responsibility to the people of that country, and to govern one country under responsibility to the people of another, are two very different things. What makes the excellence of the first is that freedom is preferable to despotism; but the last is despotism."
>
> —*Repr. Government,* P. 135.

অর্থাৎ ইংলণ্ড শাসনের জন্য ইংরাজদিগের নিকট জবাবদিহি থাকা,আর ভারতশাসনের জন্য ইংলণ্ডের নিকট জবাবদিহি থাকা, দুই স্বতন্ত্র বস্তু। প্রথমটির অর্থ প্রজাসাধারণের স্বাধীনতা, দ্বিতীয়টির অর্থ ভারতের পূর্ণ পরাধীনতা। মোট কথা, ভারত গবর্ণমেন্ট যদি পার্লিয়ামেন্টের আজ্ঞাবহ ভৃত্যের ন্যায় কার্য করেন, ইংলণ্ডের জনসাধারণ যদি দিবা রাত্রি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে ভারতের মঙ্গলামঙ্গল পর্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন, তাহাতেও ভাবতবাসির দুঃখ দূর হইবে না, তাহাতে বরং ভারতের ভাগ্যে কেবল এক লাট কার্জনের স্থলে লক্ষ লাট কার্জন লাভ হইবে। ইহার কারণ কি? কারণ মিল নিজেই বলিতেছেন—

> "It is always under great difficulties and very imperfectly, that a country can be governed by foreigners—Foreigners do not feel with the people.
>
> —*Repr. Government,* P. 135.
>
> "বৈদেশিক শাসন সর্বদাই অতি দুরূহ ও অসম্পূর্ণ—বৈদেশিকেরা কখনও প্রজাসাধারণের সহিত এক হৃদয় হইতে পারে না।" পুনশ্চ—
>
> "The Government of a people by itself has a meaning and a reality ; but such a thing as Government of one people by another, does not and cannot exist. One people may keep another as a warren or preserve for its own use, a place to make money in, a human cattle farm to be worked for the profit of its own inhabitants. But if the good of the governed is the proper business of a government, it is utterly impossible that a people should directly attend to it".- *Repr Government,* P. 135.
>
> "একজাতি আপনাদিগের শাসনকার্য স্বয়ং নির্বাহ করিতেছে, ইহা সম্ভবপর; কিন্তু এক জাতি অপর জাতিকে শাসন করিতেছে, ইহা কখনও হইতে পারে না। এক জাতি অপর

জাতিকে আপনাদিগের স্বার্থের জন্য ব্যবহার করিতে পারে ; অর্থোপার্জনের ক্ষেত্র বা গোশালারূপে আপনাদিগের লাভের জন্য তাহাদিগকে লইয়া ব্যবসায় চালাইতে পারে। কিন্তু প্রজাগণের হিতসাধন যদি রাজ্য শাসনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ইহা নিশ্চিত যে একটি সমগ্র জাতি কখনও সাক্ষাৎভাবে তাহাতে মনোযোগী হইতে পারে না।"

এতক্ষণ যাহা আলোচনা করিলাম, তদ্দ্বারা বুঝা গেল, ভারত শাসনে যে সকল দোষ রহিয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি বৈদেশিক শাসন হইতে উৎপন্ন—সেগুলি বর্তমান প্রণালীর সংশোধন না হইলে অপরিহার্য। আর কতগুলি অনায়াসেই দূর হইতে পারে, যদি মহারাণীর ঘোষণাপত্র ও পার্লিয়ামেন্টের বিধান কথার কথা থাকিয়া না যায়, যদি কেবল ভারতবাসির কল্যাণের জন্য ভারতবর্ষ শাসিত হয়। এখন জিজ্ঞাস্য এই, ভারতবাসী যে দিন দিন ধ্বংসের দিকে চলিয়াছে; তাহা হইতে রক্ষা পাইবার কোনও উপায় আছে কি? আছে। স্বদেশি আন্দোলন সেই উপায় প্রদর্শন করিতেছে। ...

প্রবাসী ১৩১৩ অগ্রহায়ণ

সখারাম গণেশ দেউস্কর

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ*

সরকারি মন্তব্য

গত ১৯০৫ সালের ১৯ জুলাই সিমলা হইতে প্রকাশিত 'ইণ্ডিয়া গেজেটে' বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ বিষয়ে ভারত গবর্নমেন্ট তাহাদের নিদারুণ সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করেন। সরকারি মন্তব্যের সারমর্ম এই—

মুখ-বন্ধে গবর্নমেণ্ট বলিয়াছেন যে, বহুদিন হইতে এই সুবিশাল বঙ্গ দেশের শাসন-কার্য-পরিচালনের অসুবিধা সম্বন্ধে নানা অভিযোগ শ্রবণ করিয়া ভারত গবর্নমেণ্ট পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশকে একজন স্বতন্ত্র ছোট লাটের অধীন করিবার কল্পনা করিতেছিলেন। কারণ, একজন শাসন-কর্তার উপর এত বড় দেশের শাসন-ভার থাকায় সুশাসনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। আসামের চা প্রভৃতি ব্যবসায়ের উন্নতি-সাধনের জন্যও ঐ প্রদেশটিকে স্বতন্ত্র শাসন-কর্তার অধীন করা প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। এই কারণে ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্নমেণ্ট এই প্রস্তাব সম্বন্ধে প্রাদেশিক শাসন-কর্তাদিগের মতামত জানিতে চাহেন। তাহাদের প্রকাশিত অভিমতের বিশেষভাবে আলোচনা ও তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধানাদি কার্য যথোচিতভাবে সমাধা করিয়া ভারতবর্ষীয় গবর্নমেণ্ট আপনাদের পূর্ব প্রস্তাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিয়াছেন। তদনুসারে ছোটনাগপুরের বহুলাংশ মধ্য-প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার ও মান্দ্রাজ প্রদেশের কয়েকটি জেলা বঙ্গের অধীন করিবার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে জাতি-গত ও ভাষা-গত বৈষম্যের জন্য মান্দ্রাজের জেলাগুলি মান্দ্রাজ লাটের আপত্তি-হেতু বঙ্গদেশে পরিগৃহীত হইল না। বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুবিধা-অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া ছোট-নাগপুরের অধিকাংশ স্থান বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত রাখিতে হইল।

(১) পূর্বে একবার তাহারা চট্টগ্রাম ও আসাম লইয়া একটি স্বতন্ত্র নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিবার কল্পনা করিয়াছিলেন। (২) ইহার পর ১৯০৩ সালে গবর্নমেণ্ট যে প্রস্তাব করেন, তাহাতে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাকেও আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার কথা লিখিত হইয়াছিল; (৩) কিন্তু এই দুইটি জেলা গ্রহণ করিয়াও নূতন প্রদেশটিকে একজন ছোটলাটের অধীনতায় স্থাপনের যোগ্য বৃহৎ করিতে পারা গেল না। তখন বড়লাট বাহাদুর ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামে বক্তৃতাকালেই আভাস দিয়াছিলেন যে, বঙ্গ-বিভাগের তদানীন্তন প্রস্তাব অপেক্ষাও বৃহত্তর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার কর্তৃপক্ষের সংকল্প আছে। সেই সময়ে, লোকের প্রতিবাদ-সমূহ পাঠ করিয়া, গবর্নমেন্ট জনসাধারণের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে প্রবৃত্ত হন।

প্রথমে বঙ্গের ছোটলাট বাহাদুর, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রঙ্গপুর, পাবনা ও আসাম লইয়া একটি নূতন বিভাগ গঠন করিতে বলেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট দেখিলেন যে, ইহাতেও নূতন প্রদেশটি আশানুরূপ বড় হয় না। তাই তাহারা রাজসাহী, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও কোচবিহার রাজ্য নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা আবশ্যক স্থির করিলেন।

এই নূতন বিভাগ-কার্যটি বাঙালি জাতির বংশ-গত, জাতি-গত, ভাষাগত ও ভৌগোলিক বিভাগ-গত সামঞ্জস্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই করা হইয়াছে। তদ্ভিন্ন আসামের চা-বাগানগুলিরও যাহাতে অধিকতর উন্নতি হয়, তাহার প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য রাখা হইয়াছে। স্থির হইয়াছে, নূতন

*'দেশের কথা' গ্রন্থ থেকে

প্রদেশের নাম "পূর্ববঙ্গ ও আসাম" রাখা হইবে। চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী-বিভাগ, পার্বত্য ত্রিপুরা-রাজ্য ও আসাম—এই নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে। ঢাকা এই নব প্রদেশের রাজধানী ও চট্টগ্রাম উহার দ্বিতীয় প্রধান নগর হইবে। এই প্রদেশের পরিমাণ ১,০৬,৫৪০ বর্গমাইল ও জন-সংখ্যা ৩ কোটি ১০ লক্ষ হইবে। ইহাদিগের মধ্যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান ও ১ কোটি ৩০ লক্ষ হিন্দু। নূতন ছোট লাট বাহাদুরের একটি ব্যবস্থাপক সভা ও একটি বোর্ড অব রেবিনিউ থাকিবে। সেই বোর্ডে দুইজন মেম্বার থাকিবেন। নূতন প্রদেশটি কলিকাতা হাইকোর্টের অধীন থাকিবে। অতঃপর পশ্চিমবঙ্গের পরিমাণ ১,৪১,৫৮০ বর্গ মাইল ও জন-সংখ্যা ৫ কোটি ৪০ লক্ষ—তন্মধ্যে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু হইবে।

জনসাধারণ এই প্রস্তাবের যে প্রতিবাদ করিয়াছে, গবর্নর জেনারেল তাহা বিশেষরূপে অবগত আছেন। এই প্রতিবাদের মূলে যে ভাবোচ্ছ্বাস বিদ্যমান, গবর্নর জেনারেল তাহা উপেক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন না। দেশে দেশে, মানুষে মানুষে এত শীঘ্র ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়া যায় যে, দেশ নূতন রকমে বিভক্ত করিলে ঐ ঘনিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখা দুরূহ হইয়া উঠে; এবং এইরূপ ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হইলে তাহা বড়ই ক্লেশ-দায়ক ও সাধারণের অপ্রীতিকর হয়। কিন্তু এক প্রদেশের লোকের সহিত ঘনিষ্ঠতা বিচ্ছিন্ন হইলে আবার অবিলম্বেই নূতন প্রদেশবাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতা উৎপন্ন হয়। পূর্বের অভিজ্ঞতা হইতে ভারত গবর্নমেণ্ট আশা করেন যে এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে।

উপসংহারে ভারত গবর্নমেণ্ট বলিয়াছেন যে, এই বিভগের ফলে বাঙালি জাতির উন্নতি সাধিত হইবার সম্ভাবনা অধিক।

৪।।০ কোটি বাঙালির প্রার্থনা বিফল হইল

বঙ্গের ৪।।০ কোটি লোক এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ রহিত করিবার জন্য না করিয়াছে কি? এক বেলা না খাটিলে যাহার সমস্ত পরিবার অনাহারে থাকে, এমন দরিদ্র কৃষকও স্বদেশ-রক্ষার জন্য অর্থ দিয়াছে, কাজ-কর্ম ফেলিয়া রাখিয়া রাজপুরুষদিগের নিকটে মনের ব্যথা জানাইবার জন্য ব্যাকুল প্রাণে, যেখানে সভাসমিতি হইয়াছে, সেইখানেই উর্ধ্বশ্বাসে গমন করিয়াছে। প্রজা আশা করিয়াছিল, রাজপুরুষেরা তাহাদের প্রাণের গভীর যাতনা উপলব্ধি করিয়া বঙ্গদেশকে দুই খণ্ডে বিভাগের চেষ্টা করিতে ক্ষান্ত হইবেন। কিন্তু প্রজার কাতর প্রার্থনায় লর্ড কার্জন বা স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার কর্ণপাত করা উচিত মনে করিলেন না। পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ শত প্রলোভন, শত ভ্রূকুটি দেখিয়াও বিচলিত বা ভীত হন নাই—তাহারা জননী জন্মভূমির দেহে ছুরিকাঘাত হইবে, ইহা কল্পনা করিতেও শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহারা জন্ম-ভূমিকে অখণ্ড রাখিবার জন্য কুলি মজুরের ন্যায় দিবা-রাত্রি খাটিয়াছেন, দুই হস্তে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজপুরুষেরা তাহাদিগের কাতর ক্রন্দনে কিছুতেই কর্ণপাত করিলেন না!

মান্দ্রাজের অন্তর্গত গঞ্জাম জেলা ও ভিজিগাপত্তমের দেশীয় রাজ্যসমূহ বঙ্গের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু মান্দ্রাজের জন-সাধারণ তাহাতে তীব্র প্রতিবাদ করেন। মান্দ্রাজের সহৃদয় গবর্নর লর্ড এমথিল প্রজার হৃদয়ের ব্যথা বুঝিতে পারিয়া ভারত গবর্নমেণ্টের প্রস্তাবে প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভারত গবর্নমেণ্ট মান্দ্রাজের অঙ্গচ্ছেদ করিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজের গবর্নর লর্ড কার্জনের একান্ত আজ্ঞাবহ নহেন; সুতরাং লর্ড কার্জন মান্দ্রাজের অঙ্গে ছুরিকাবিদ্ধ করিতে পারিলেন না।

ছোটনাগপুরের অনেক স্থান মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু ছোট-নাগপুর কয়লা ও লোহার ব্যবসায়ের জন্য প্রসিদ্ধ। কলিকাতার ইংরাজ বণিক্-সমাজ গভীর গর্জনে বলিলেন, "ছোট-নাগপুর বঙ্গের অঙ্গচ্যুত হইতে পারে না।" লর্ড কার্জন অমনি সে প্রস্তাব পরিহার করিলেন।

বঙ্গের প্রধান লোকেরা বঙ্গের ছোটলাটের নিকট গমন করিয়া বঙ্গদেশকে অক্ষত রাখিবার জন্য কত অনুনয় বিনয় করিয়াছিলেন। ছোটলাটও মুখে কত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন; যাহার যে আপত্তি আছে, তিনি তাহা স্বহস্তেই লিখিয়া লইয়াছিলেন; বঙ্গবাসীর মনের কথা বড় লাটকে জানাইবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু কার্যতঃ তিনি রঙ্পুর, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর ও বাকরগঞ্জ জেলা আসামের সামিল করিবার জন্য লর্ড কার্জনকে অনুরোধ করিলেন! ছোটলাট যদি আপত্তি করিতেন, তবে লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতে কখনও সাহসী হইতেন না।

৪৷৷০ কোটি বাঙালির প্রার্থনা উপেক্ষিত হইল। কিন্তু জনকয়েক কয়লা-ব্যবসায়ী ইংরাজের আপত্তিতে লর্ড কার্জন ছোট-নাগপুর প্রদেশটি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে সাহসী হইলেন না।

বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। যাহারা স্মরণাতীত কাল হইতে একত্র বাস করিতেছিল, পরস্পরের সুখ-দুঃখের অংশী ছিল, পরস্পর প্রেম-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া মহাশক্তিশালী জাতিতে পরিণত হইয়াছিল, লর্ড কার্জনের এক খড়্গাঘাতে তাহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বাকরগঞ্জ, চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, রাজসাহী, রঙ্পুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা, জলপাইগুড়ি, মালদহ ও বঙ্গের গৌরব-স্থল স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্য নূতন প্রদেশের অন্তর্গত হইল! খাস বাংলায় কেবল ২ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোহর, খুলনা, বর্ধমান, হুগলি, হাওড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম জেলা ও কোচবিহার রাজ্য থাকিল।

ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই

ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড কার্জন বাহাদুর ভারত গবর্নমেণ্টের মন্তব্য-পত্রে বলিয়াছেন যে, বঙ্গদেশের ন্যায় অষ্ট-কোটি জনপূর্ণ বিশাল দেশ একজন শাসন-কর্তার অধীন থাকিলে শাসন-কার্যের বড় অসুবিধা হয়, একজন শাসন-কর্তার পক্ষে এত বড় দেশ-শাসন করা বড়ই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। তাই বঙ্গদেশের বিভাগ করিয়া উহার একাংশ একজন নূতন শাসন-কর্তার অধীন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল। বঙ্গদেশের বিভাগ না করিয়া অন্যরূপে যদি শাসন-শৃঙ্খলা বিধান করা সম্ভবপর হইত, তাহা হইলে কর্তৃপক্ষ কখনও বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিয়া প্রকৃতিপুঞ্জের হৃদয়ে পীড়াদান করিতেন না, একথা বলিতেও তিনি বিস্মৃত হন নাই। ফলতঃ গবর্নমেণ্ট যাহা বলিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে আমরা মনে করিতে পারিতাম যে, কর্তৃপক্ষ নিতান্ত নিরুপায় হইয়াই এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। কিন্তু গবর্নমেণ্টের প্রদর্শিত হেতুবাদ কি সত্য?

আমরা তর্কচ্ছলে না হয়, স্বীকার করিয়াই লইলাম যে, বঙ্গেশ্বরের গুরুভার লাঘব করিবার জন্য বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা নিতান্তই আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছিল—তিন কোটি দশ লক্ষ নর-নারীর শাসন-ভার অপরের হস্তে অর্পণ করা বিশেষ আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ২ কোটি ৩৩৷৷০ লক্ষ বেহারী, ৪৯ লক্ষ ছোটনাগপুরী ও প্রায় ৭৫ লক্ষ উৎকলবাসীকে লইয়া একটি ৩৷৷০ কোটি জনপূর্ণ প্রদেশের সৃষ্টি করা হইল না কেন? ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোক লইয়া "পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের" সৃষ্টি না করিয়া কর্তৃপক্ষ ৩৷৷০ কোটি জন-সমন্বিত 'বেহার ও উড়িষ্যা" নামে নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিলেন না কেন? বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগকে পূর্ব-বঙ্গ ও আসাম প্রদেশের সহিত পূর্ববৎ সম্মিলিত রাখিয়া উহাকে "বঙ্গদেশ ও আসাম" নামে অভিহিত করিলে কি ক্ষতি হইত? যখন ভিজিগাপত্তম ও গঞ্জাম প্রদেশকে ভাষা ও জাতিগত সামঞ্জস্যের দোহাই দিয়া মান্দ্রাজ প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইল না, যখন ছোটনাগপুরের পাঁচটি দেশীয় রাজ্য ভাষা-গত ঐক্যের জন্য মধ্যপ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইল, সম্বলপুর, বামড়া, কালাহাণ্ডি প্রভৃতি প্রদেশ উড়িষ্যা প্রদেশের সহিত সম্মিলিত করা হইল, তখন বঙ্গ-ভাষা-ভাষী লোকদিগকে একত্র ও একজন

লাটের শাসনাধীন রাখা হইল না কেন? উত্তরে গবর্নমেণ্ট বলিয়াছেন যে, That would make the province universally unpopular. অর্থাৎ সেরূপ ব্যবস্থা কাহারও (অর্থাৎ কোনও সিবিলিয়ানেরই) প্রীতিপ্রদ হইত না! সুতরাং বঙ্গের লক্ষ লক্ষ প্রজার মত পদ-দলিত হইল!

পাঠক ব্যাপারটা বুঝুন। অখণ্ড বঙ্গ-দেশের লোক-সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি; ইহাদের মধ্যে ৪ কোটি ২৮ লক্ষ জনের মাতৃভাষা বাংলা ; ২ কোটি ৩৩।। লক্ষ জনের মাতৃভাষা বেহারী হিন্দি; অবশিষ্ট ৭৫ লক্ষ জন উড়িয়া ভাষায় কথা কহে। বড় লাট বাহাদুর ৪ কোটি ২৮ লক্ষ বঙ্গভাষা-ভাষীর মধ্যে ১ কোটি ৭২ লক্ষ বাঙালিকে উড়িয়া ও বেহারীদিগের সহিত রাখিয়া অবশিষ্ট ২ কোটি ৬৬ লক্ষ বাঙালিকে আসামবাসীর সহিত সংমিলিত করিবার আদেশ করিয়াছেন। এই আদেশ অনুসারে, বাংলা যাহাদিগের মাতৃভাষা, এমন ১৪টি জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের অধিবাসীদিগকে আসামীদের সহিত এবং দশটি জেলার ও একটি দেশীয় রাজ্যের লোককে উড়িয়া ও বেহারীদিগের সহিত সম্মিলিত হইতে হইল। সুতরাং পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে এতদিন যে সামান্য পার্থক্য ছিল, এবং যে পার্থক্য একত্র অবস্থান ও জ্ঞানের চর্চা-হেতু দিন দিন হ্রাস পাইতেছিল, তাহা (বঙ্গীয় জনসাধারণ সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করিলে) অতঃপর বর্ধিত ও স্থায়ী হইবে, সন্দেহ নাই।

সেইরূপ এতদিন হিন্দু ও মুসলমান একত্র ছিল, তাহারা নূতন ব্যবস্থায় পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। পশ্চিমবঙ্গে ৪ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ও ৯০ লক্ষ মুসলমান এবং পূর্ববঙ্গে ১ কোটি ২০ লক্ষ হিন্দু ও ১ কোটি ৮০ লক্ষ মুসলমান হইল। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া কর্তৃপক্ষ পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু-প্রধান ও পূর্ববঙ্গকে মুসলমান প্রধান করিয়া তুলিলেন! ফলকথা, যে দিক্ দিয়াই দেখি, বাংলা প্রদেশকে বিভক্ত করা অপেক্ষা বাঙালি জাতির ব্যবচ্ছেদ-সাধন করাই কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং দেশের বিশালতায় বা জন-সংখ্যার আধিক্যে শাসনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল,—একথা বলা অপেক্ষা বাঙালি জাতির ঐক্য-বলই কর্তৃপক্ষের চক্ষুঃশূল হইয়াছিল, বলিতে হইবে। তাই সুচতুর গবর্নমেণ্ট বঙ্গ-বিভাগের নামে বঙ্গভাষা-ভাষী একতা-সম্পন্ন বাঙালি জাতিকে দ্বিখণ্ড করিলেন।

ভারত গবর্নমেণ্ট বলিয়াছেন,—ইদানীং বঙ্গেশ্বরের কার্য-ভার অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছে। একথা যতদূর সত্য হউক, ইহা নিশ্চিত যে, বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার কার্য বৃদ্ধি পায় নাই। বঙ্গের হাইকোর্ট, কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে বলিয়া কোনরূপ অভিযোগ করেন নাই, অন্ততঃ তাহারা দ্বিতীয় হাইকোর্ট-প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী হন নাই। রেবিনিউ বোর্ড সমগ্র বঙ্গে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্য-পরিচালনে অশক্ত হইয়াছিলেন, এমন কথাও শুনিতে পাওয়া যায় নাই। শিক্ষা-বিভাগের ডাইরেক্টার মহোদয়ও শিক্ষা-বিভাগের কার্য-পরিচালন-বিষয়ে স্বীয় অসামর্থ্য জ্ঞাপন করেন নাই। পুলিশের ইনস্পেক্টার জেনারেল মনুষ্যের সাধ্যাতীত কার্য করিতে হইতেছিল বলিয়াও অভিযোগ করেন নাই। ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশনকে প্রতি বৎসর গবর্নমেণ্টের নিকট স্বীয় কার্যের রিপোর্ট দাখিল করিতে হয় না বটে, কিন্তু তিনিও সাধ্যাতীত পরিশ্রম করিয়া কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রকার ক্ষোভ-প্রকাশ করেন নাই। তদ্ভিন্ন কারাগার-সমূহের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেল এবং হাসপাতাল-সমূহের ইন্‌স্পেক্টার জেনারেলদিগের সম্বন্ধেও ঐ প্রকার কথা বলা যাইতে পারে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, বঙ্গীয় রাজপুরুষদিগের মধ্যে এক ছোটলাট ভিন্ন আর কেহই কার্যভার বৃদ্ধির অভিযোগ উপস্থিত করেন নাই! কিন্তু তাহার একজনের কার্য-ভার লঘু করিবার জন্য বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করিবার প্রয়োজন কি? ছোটলাট বাহাদুরের কার্যে সাহায্য করিবার জন্য একজন ডেপুটি গবর্নর নিযুক্ত করিলেই ত কার্য চলিতে পারিত? সংপ্রতি বঙ্গদেশ যেরূপে বিভক্ত হইয়াছে, তাহাতে শাসনকার্যের জন্য বৎসরে অন্যূন ১২।।০ লক্ষ টাকা অধিক ব্যয় পড়িতেছে, কিন্তু একজন ডেপুটি গবর্নর নিযুক্ত করিলে বার্ষিক ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা অধিক ব্যয় করিলেই নির্বিঘ্নে সকল কার্য সুসম্পন্ন হইত। বোম্বাই ও মান্দ্রাজের ন্যায় বঙ্গদেশেও একজন গবর্নর নিযুক্ত

করিলে বর্তমান ব্যবস্থার অপেক্ষা বৎসরে ৭ লক্ষ ২১ হাজার টাকা কম ব্যয়ে কার্য-সিদ্ধি হইতে পারিত। বঙ্গবাসী গবর্নমেণ্টের নিকট এই সকল প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু লর্ড কার্জন ও ভারত-সচিব মিঃ ব্রডরিক তাহাদের কোনও কথায় কর্ণপাত না করিয়া বঙ্গদেশের বিভাগ করিবারই আদেশ প্রচার করিলেন। তাহাদিগের এই প্রকার ব্যবহারের মর্মানুধাবন করিলে সহজেই মনে হয় যে, শাসনকার্যের শৃঙ্খলা-বিধান বা ছোটলাটের কার্যভার লাঘব বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের মূল উদ্দেশ্য নহে; বাঙালিকে বিভক্ত করিয়া তাহাদের শক্তি-খর্ব করাই কর্তৃপক্ষের অভিপ্রেত ছিল।

অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম

এই বাঙালি জাতির অঙ্গচ্ছেদের পরিণাম চিন্তা করিলে আমাদিগকে অবসন্ন হইতে হয়। প্রথমতঃ পশ্চিমবঙ্গের ক্ষতির কথাই বলি। পূর্ব ও উত্তর বঙ্গের ব্যবসায়ীদিগের সাহায্যে কলিকাতার বাণিজ্য আর পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারিবে না। চট্টগ্রাম বাণিজ্য ব্যবসায়ের কেন্দ্রস্থল হইলে কলিকাতার মারওয়াড়ী, মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু ব্যবসায়ীগণের অবনতি আরম্ভ হইবে। নূতন প্রদেশে নূতন হাইকোর্ট হইলে কলিকাতার হাইকোর্টের জজদিগের সংখ্যা ও ক্ষমতা হ্রাস পাইবে। হাইকোর্টের ক্ষমতা-হ্রাসের সহিত শাসন-বিভাগের জুলুম বাড়িবে। কলিকাতা আর সমগ্র বাঙালি জাতির বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সম্মিলন-ক্ষেত্র থাকিবে না। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের প্রতিভাশালী ব্যক্তিগণের সম্মিলন অতঃপর নূতন প্রদেশের রাজধানীতেই হইবে। আমরাও তাহাদিগের সাহচর্য ও সহায়তা হইতে ক্রমে বঞ্চিত হইব। ইহাতে বঙ্গ সাহিত্যের সামান্য ক্ষতি সংঘটিত হইবে না।

পূর্ববঙ্গের জমিদারগণ কলিকাতা ছাড়িয়া নূতন প্রদেশের রাজধানীতে গিয়া বাস করিবেন। অনেক জমিদারের পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গে—উভয়ত্রই জমিদারি আছে। তাহাদিগকে উভয় রাজধানীতে আবাস-স্থান নির্মাণ করিতে হইবে, সরকারি চাঁদার খাতায় উভয় প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অর্থদান করিতে হইবে, বঙ্গের প্রায় অর্ধেক লোক-সংখ্যা নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে, কিন্তু বঙ্গীয় গবর্নমেণ্টের ব্যয় তদনুপাতে হ্রাস পায় নাই। কাজেই রাজ-কার্য পরিচালনের ব্যয় আমাদিগকে পূর্বের অপেক্ষা অধিক পরিমাণে বহন করিতে হইতেছে।

পূর্ব ও উত্তর বঙ্গবাসীদিগকেও এই সকল অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, সেখানকার শাসন-ব্যয় অতিরিক্ত মাত্রায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। পূর্ববঙ্গবাসীর অন্যান্য অসুবিধা ও ক্ষতিও সামান্য নহে। নূতন প্রদেশে একটা নূতন রাজধানী নির্মাণ করিতে, ছোট লাটের প্রাসাদ ও আফিস প্রভৃতি তৈয়ার করিতে ১৪/১৫ কোটি টাকার কম খরচ হইবে না, ইহা সুনিশ্চিত। এই ১৪ কোটি টাকা যে নূতন প্রদেশের লোকদিগের নিকট হইতে আদায় করা হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ছোট লাট ও তাহার সেক্রেটারিদিগের বেতন ইত্যাদির জন্য বৎসরে ১২ লক্ষ টাকার কম কখনও ব্যয় হইবে না। সমস্ত বঙ্গের ৭॥০ কোটি লোকে এতদিন যে ব্যয়ভার বহন করিত, নূতন প্রদেশের ৩ কোটি ১০ লক্ষ লোককে এখন সেই ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। এই ব্যয়ভারে কি পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ ও আসাম নিষ্পেষিত হইবে না?

নূতন প্রদেশে কলিকাতার ন্যায় মেডিকেল কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পুষা কৃষি কলেজ এবং মিশনারী ও স্বাধীন কলেজ-সমূহের মত বিদ্যালয়-নির্মাণ করা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া অসম্ভব হইবে। সুতরাং নূতন প্রদেশবাসীর শিক্ষার অবনতি অনিবার্য। নূতন প্রদেশের ছোটলাটের জন্য সৈন্য রাখিতে হইবে। সুতরাং সৈন্যাবাস নির্মাণ করিতেও স্বতন্ত্র খরচ পড়িবে। ইহাতেও অনেক অর্থের প্রয়োজন হইবে। এই সকল কার্যে বহু অর্থ ব্যয়িত হইলে জনসাধারণের কল্যাণের জন্য রাজকোষ হইতে অধিক অর্থ ব্যয় করা সম্ভবপর হইবে না। এতদ্ভিন্ন বঙ্গব্যবচ্ছেদের

ফলে দেশে যে অশান্তি ও উৎপীড়নের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন।

ফলতঃ এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের ফলে বাঙালি জাতি বিভক্ত, দুর্বল ও কর-ভারে প্রপীড়িত হইয়া ক্রমশঃ ধ্বংস-মুখে অগ্রসর হইতে থাকিবে। তাই আমরা বঙ্গ-বিভাগে এরূপ প্রাণপণে প্রতিবাদ করিয়াছি ও করিতেছি। শাসন-কার্যের সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের ব্যবচ্ছেদ করা হয় নাই, বাঙালি জাতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানই রাজপুরুষদের উদ্দেশ্য।

রাজপুরুষদিগের কুটিলতা

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে "স্টেটসম্যান" পত্রের সম্পাদক একটি অতি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ঐ প্রবন্ধের একস্থলে কর্তৃপক্ষের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছিলেন;—

"Objects of the scheme are, briefly, first to destroy the collective power of Bengali people, secondly, to overthrow the political ascendency of Calcutta, and thirdly to foster in East Bengal the growth of Mahomedan power which, it is hoped, will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the educated Hindu community."

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্য এই যে, (১) বাঙালি জাতির সমবেত শক্তিকে নষ্ট করা, (২) কলিকাতার রাজনীতিক প্রাধান্যের উচ্ছেদ সাধন করা, (৩) পূর্ববঙ্গের মুসলমান শক্তির পরিপুষ্টি সাধন করা। মুসলমান শক্তির পুষ্টি সাধিত হইলে তাহা শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্রুত বর্ধনশীল শক্তিকে বাধা দান করিবে বলিয়া কর্তৃপক্ষের আশা করেন।"

পাঠক! ওরিয়েন্টাল ডিপ্লোম্যাসী বা প্রাচ্য কুটিলতার নিন্দাকারী লর্ড কার্জনের বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাবের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, তাহা একজন অ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান সম্পাদকের মুখেই শুনিলেন? এখন একবার শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করুন। বঙ্গ-বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল সরকারি কাগজপত্র প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লর্ড কার্জন একস্থলে স্পষ্টই বলিয়াছেন,—

It cannot be for the lasting good of any country or any people that public opinion or what passes for it should be manufactured by a comparatively small number of people at a single centre and should be disseminated thence for universal adoption, all other views being discouraged or suppressed........From every point of view it appears to us desirable to encourage the growth of centres of independent opinion, local aspirations, local ideas and to preserve the growing intelligence and interprise of Bengal from being cramped and stunted by the process of forcing it prematurely into a mould of rigid and sterile uniformity.

লর্ড কার্জনের এই কৌশলময়ী উক্তির সরল বাংলায় অর্থ এই যে,—কলিকাতার ন্যায় কোনও কেন্দ্র স্থানের স্বল্প-সংখ্যক শিক্ষিত ব্যক্তির মতানুসারে যদি সমগ্র বঙ্গের লোকে চলে, তবে তাহার ফল কখনই বঙ্গদেশের ও বাঙালি জাতির পক্ষে শুভকর হইবে না। এক মতে সকলেই না চলিয়া সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অংশের লোকে যাহাতে ভিন্ন ভিন্ন পথে গমন করে—যাহাতে এক-ভাষাভাষী লোকের মধ্যে নানা মুনির নানা মত ঘটিবার সুযোগ বৃদ্ধি পায়, সকলেই স্ব স্ব প্রধান ভাবে চলে, সকলের আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শ একবিধ না হইয়া যাহাতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র প্রকার হয়, তাহার ব্যবস্থা করাই গবর্নমেণ্ট সর্বপ্রকারে বাঞ্ছনীয় বলিয়া মনে করেন। বঙ্গে অধুনা যেরূপ ঐক্য দেখা যাইতেছে, তাহাতে সমাজে স্বতন্ত্র ভাবের ও মতের স্ফূর্তি ঘটিতে পাইতেছে না। এরূপ ঐক্য কর্তৃপক্ষের দূষণীয় বলিয়া মনে করেন।"

ইহা অপেক্ষা গবর্নমেন্টের পক্ষে স্পষ্ট স্বীকারোক্তি আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখানেই রাজপুরুষদিগের ক্রূরতার শেষ হয় নাই। জাতীয় মহাসমিতির গত একবিংশ অধিবেশনের সভাপতি

যথার্থই বলিয়াছেন,—"এই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে লর্ড কার্জন যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে ধীর ও সংযতভাবে তাহার কার্যের সমালোচনা করা যায় না। পূর্বে ক্ষুদ্রভাবে যে ব্যবচ্ছেদের কল্পনা হইয়াছিল, তাহা তিনি প্রকাশ করিলে দেশে ভীষণ আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে ভীত হইয়া তিনি তাহার শেষের সিদ্ধান্ত, সমগ্র পূর্ববঙ্গের ব্যবচ্ছেদের সঙ্কল্প, আদৌ প্রকাশ করিলেন না। এক বৎসরের অধিককাল এই বিষয়ে উচ্চবাচ্য ছিল না। কিন্তু গোপনে গোপনে কার্য চলিতেছিল। জনরব উঠিল, ব্যবচ্ছেদের সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইয়াছে। সে বিষয়ে লর্ড কার্জনও কোনও প্রতিবাদ করিলেন না। শেষে ভারত-সচিবের অনুমোদন-লাভ করিয়া সিমলা হইতে সহসা ব্যবচ্ছেদের কথা প্রকাশ করা হইল। পরে হঠাৎ লর্ড কার্জন পদত্যাগ করিলেন। ইহাতে লোকে ভাবিল, সে সম্বন্ধে আর কিছু হইবে না—কারণ তৎপূর্বে ভারত-সচিব পার্লামেণ্টে ব্যবচ্ছেদ সংক্রান্ত কাগজ-পত্র দাখিল করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন ; সুতরাং পার্লামেণ্টে আলোচনার পূর্বে কিছু হইবে না, ইহাই লোকে বুঝিল। বস্তুতঃ পদত্যাগ করিবার পর লর্ড মিণ্টোর উপর এই বিষয়ের বিবেচনা করিবার ভার অর্পণ করাই লর্ড কার্জনের উচিত ছিল। যুবরাজের ভারতে আগমনের সময় যাহাতে একটা সমগ্র প্রদেশের লোক শোকে মুহ্যমান না হয়, তাহা করাও তাহার উচিত ছিল। কিন্তু লর্ড কার্জনের সে সুমতি হইল না। তিনি জেদের বশবর্তী হইয়া গত ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ৩০ শে আশ্বিন বঙ্গবাসীর মস্তকে বজ্রাঘাত করিলেন।"

মুসলমান সমাজের ক্ষতি

লর্ড কার্জনের এই ব্যবস্থায় মুসলমানদিগের কিছু সুবিধা হইল বলিয়া আমরা মনে করি না। কারণ, এত দিন সমগ্র বাঙলার অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রায় এক তৃতীয়াংশ মুসলমান ছিল। যদি বঙ্গীয় গবর্নমেণ্ট মুসলমানদিগের সামাজিক কোন রীতি নীতিতে হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিতেন, তাহা হইলে বাংলার এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী—অর্থাৎ আড়াই কোটি বাঙালী মুসলমান সেই কার্যের প্রতিবাদ করিত। সুতরাং আড়াই কোটি মুসলমান, অধিবাসীর বিরক্তিকর কোন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্বে গবর্নমেণ্টকে একটু ইতস্ততঃ করিতে হইত। কিন্তু এখন পশ্চিম বঙ্গের ৫০ লক্ষ মুসলমানকে বঙ্গেশ্বর গ্রাহ্য করিবেন না। সাড়ে চারি কোটি অধিবাসীর মধ্যে পঞ্চাশ লক্ষ মুসলমান কোথায় নগণ্য হইয়া পড়িয়া থাকিবে।

যে কারণে পশ্চিম বঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট মুসলমানগণ অগ্রাহ্য হইবে, অবিকল সেই কারণে পূর্ববঙ্গের কর্তৃপক্ষের নিকট পূর্ববঙ্গের হিন্দু অধিবাসীরা নগণ্য হইবে। পূর্ববঙ্গের সমগ্র অধিবাসীর মধ্যে হিন্দুর সংখ্যা অর্ধেকের অপেক্ষা অল্প হওয়াতে রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে গ্রাহ্য করিবেন না। ফলতঃ বাংলার হিন্দু মুসলমানকে পৃথক্ করিয়া দেওয়াতে ক্ষমতা-প্রিয় রাজপুরুষদিগের যথেচ্ছাচার-প্রবৃত্তি পরিপূর্ণ করিবার যথেষ্ট সুযোগ উপস্থিত হইবে। কাহারও কাহারও ধারণা যে, বঙ্গদেশ ব্যবচ্ছিন্ন হওয়ায় মুসলমানদিগের পক্ষে ভালই হইয়াছে। কারণ, তাহাতে পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা অধিক হইয়াছে এবং সেইজন্য মুসলমানের পক্ষে রাজ-কার্য লাভের কিছু সুবিধা হইয়াছে। কিন্তু পূর্বেও পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুর অপেক্ষা অধিকই ছিল। গবর্নমেণ্ট মুসলমানকে সংখ্যার অনুপাতে চাকরি দিতে ইচ্ছা করিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ না করিয়াও তাহা দিতে পারিতেন।

মুসলমান সমাজের মধ্যে ইদানীং যে বিদ্যাচর্চার আদর হইতেছে, তাহা পূর্ববঙ্গ অপেক্ষা পশ্চিম বঙ্গেই অধিক পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। পূর্ববঙ্গে মুসলমানগণ সংখ্যায় অধিক হইলেও পশ্চিম বঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যাচর্চায় ও জ্ঞানানুশীলনে সমধিক আগ্রহ-সম্পন্ন। এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গ হইতে পূর্ববঙ্গকে বিচ্ছিন্ন করাতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজে শিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইবে।

সুতরাং অতঃপর মুসলমান সমাজের উন্নতির গতি অপেক্ষাকৃত মৃদু হইবে। শতাধিক বর্ষের চেষ্টার পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানগণ বিদ্যাচর্চা কিছু উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছেন; সেই শিক্ষিত মুসলমানদিগের সাহায্য লাভ করায় পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত মুসলমানদিগের উন্নতির পথ যতটুকু সুগম হইয়া আসিতেছিল, তাহা অতঃপর রাজপুরুষদিগের অনুগ্রহে বহু কালের জন্য কণ্টকিত হইল। পূর্ববঙ্গের মুসলমানগণের উন্নতি-সাধনের জন্য আবার একশত বৎসর সময় লাগিবে।

শিক্ষিত মুসলমান-সমাজের মুখপত্র 'নবনূরে' (১৩১২ সালের আশ্বিন মাসের সংখ্যায়) মৌলবী একিনউদ্দীন আহম্মদ বি. এ. মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে,—"বহুদিনের চেষ্টার পর সমস্ত বঙ্গদেশের মুসলমানগণ সংপ্রতি দুই এক বৎসর হইতে একমত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজনীতিক পথে কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার ইতিকর্তব্যতা অল্পদিন হইল, নির্ধারণ করিয়া তাহারা অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন আবার গবর্নমেণ্টের নূতন ব্যবস্থা হইল। নূতন প্রদেশে নূতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এখন মুসলমানকে অগ্রসর হইতে হইবে। তাহাদের এত দিনের সমবেত চেষ্টা এক মুহূর্তে চুরমার হইল। মুসলমানগণ যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউক ও সংখ্যায় যতই হউক, উচ্চশিক্ষালাভ না করিলে তাহাদের কিছুতেই উন্নতি হইবে না। সেইজন্য মুসলমানের শিক্ষার উন্নতি যেস্থানে হইবে, সেই স্থানের সহিত মুসলমানের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু বহু দিনের ও বহু লোকের অসীম চেষ্টায় যে কলিকাতা মহানগরী উচ্চ শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র-স্থান হইয়াছে, বঙ্গবিভাগে সেই কলিকাতার সহিত অধিকাংশ মুসলমানের সংস্রবচ্ছেদ হইল। ইহাতে মুসলমানের সামান্য ক্ষতি হয় নাই।"

তাই এই আন্দোলনে বগুড়ার নবাব শ্রীযুক্ত আব্দাস সোভান চৌধুরী সাহেব, টাঙ্গাইলের জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল হালেম গজনবী, ব্যারিষ্টার মি. এ. রসুল, চট্টগ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত আবদুল কুদ্দুস চৌধুরী, ও শ্রীযুক্ত সিদ্দিক আহাম্মদ চৌধুরী, খাঁ বাহাদুর বদরুদ্দিন হায়দার, ব্রাহ্মণবেড়িয়ার মৌলবী শামস উল হুদা এম. এ. বি. এল. ফরিদপুরের জমিদার মৌলবি আনারউদ্দীন খাঁ চৌধুরী ও চৌধুরী মহম্মদ আলিমজ্জমান বি. এ. সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার স্থাপয়িতা শ্রীযুক্ত মওলানা ওবারদল হক্‌, মৌলবি মনিরজ্জমা, মৌলবি কাজিম আলি, ময়মনসিংহের মৌলবি হামিদউদ্দীন মহম্মদ, হবিগঞ্জের জমিদার শ্রীযুক্ত গোলাম মওলা চৌধুরী সাহেব প্রভৃতি বহুসংখ্যক দেশমান্য মুসলমান যোগদান করিয়া গবর্নমেণ্টের কার্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন।

প্রজার প্রতিবাদ

ভারত গবর্নমেণ্টের বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ-বিষয়ক আদেশের অন্যায্যতা প্রদর্শনের জন্য বঙ্গদেশের নানা স্থানে সভা সমিতি হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। গবর্নমেণ্টের প্রথম প্রস্তাব শ্রবণ করিয়াই বঙ্গদেশে বিষম আন্দোলন উপস্থিত হয়। প্রকৃতিপুঞ্জ ন্যূনধিক ৬ শত বৃহতী সভার অধিবেশন করিয়াছিল; প্রত্যেক সভায় দশ হাজার হইতে ৪০ হাজার পর্যন্ত লোক সমবেত হইয়াছিল। শুদ্ধ তাহাই নহে, দেশের রাজা, মহারাজ ও জমিদারেরা—যাহারা চিরকাল গবর্নমেণ্টের হুকুম শিরোধার্য করিয়া ও গবর্নমেণ্টের প্রদত্ত শূন্যগর্ভ উপাধি লাভ করিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিয়াছেন, তাহারাও এবার প্রতিবাদের আন্দোলনে যোগ দিয়াছেন। উত্তর পূর্ববঙ্গ হইতে নাটোর ও দিনাজপুরের মহারাজ এবং কাকিনা, দিঘাপাতিয়া ও ডিমলার রাজারা এবং বগুড়ার নবাব বাহাদুর ঐ আদেশে অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া বিলাতে ভারতসচিব মহোদয়ের নিকট টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ হইতে মহারাজ স্যর যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও কাশীমবাজারের মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীও ভারত-সচিবের নিকট পূর্বোক্ত প্রকারে তার-যোগে আপনাদিগের অসন্তোষ-বার্তা জ্ঞাপন করেন। এইরূপে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী দরিদ্র জমিদার হিন্দু মুসলমান

প্রজা প্রভৃতি যাবতীয় অধিবাসী একযোগে বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবে আপত্তি জানাইয়াছেন। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত লালমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি যে সকল মনীষী অন্যদেশে পূজার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদিগের কথাও কর্ণপাতের যোগ্য বলিয়া রাজপুরুষেরা বিবেচনা করেন নাই! ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগের রেজোলিউশনে ব্যবচ্ছেদের আন্দোলনকে শূন্য-গর্ভ বা কৃত্রিম বলিয়া নির্দেশ করিতে সাহসী হন নাই। তথাপি তাহারা ৪।।০ কোটি প্রজার কাতর প্রার্থনায় উপেক্ষা-প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহাদের প্রথম উপেক্ষা-প্রকাশের পরও আবার প্রকৃতিপুঞ্জ ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, জমিদার প্রজা সকলে মিলিয়া রাজার নিকটে অনুগ্রহ ভিক্ষা করিয়া বলিয়াছেন,—"প্রভো! আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিও না।" গত ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলিকাতার টাউন হলে যে বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ২০ হাজার বঙ্গবাসী ও ৪ হাজার কলেজের ছাত্র উপস্থিত হইয়া সরকারি প্রস্তাবে আপত্তি করিয়াছিলেন। এই সভার অন্যান্য প্রস্তাবের সহিত ইহাও স্থির হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিত্যক্ত না হওয়া পর্যন্ত বঙ্গবাসী কোনও বিলাতি জিনিস ব্যবহার করিবেন না। এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তথাপি গবর্নমেণ্ট সঙ্কল্পচ্যুত হইলেন না। তাহারা ১ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করিলেন, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গ-বিভাগ কার্য সম্পন্ন হইবে! ঘোষণানুসারে যথাসময়ে বঙ্গ-জননী দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছেন!

আমাদের কর্তব্য

এখন আমাদের কর্তব্য কি? লর্ড কার্জনের ব্যবহারে বাঙালির মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে। পরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিলে, নিজের কর্তব্যে অবেহলা করিয়া মোহে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া থাকিলে, আর আমাদের চলিবে না। আত্ম-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া আমাদিগকে কঠোর কর্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নচেৎ আমাদিগের ঘোর অধঃপতন ও সর্বনাশ অনিবার্য। আমরা যে উপায় অবলম্বন করিতে অগ্রসর হইয়াছি, তাহাই আমাদিগের এখন একমাত্র অনুসরণীয়। বিলাতি বস্ত্রাদি পণ্য দ্রব্য যথাসম্ভব পরিহার-পূর্বক আমাদিগের অভিযোগে ইংলণ্ডের জনসাধারণকে কর্ণপাত করিতে বাধ্য করিতে হইবে। ইহাই আমাদের এখন একমাত্র কর্তব্য। আমাদের ছোটলাট ও বড়লাট বাহাদুর মনে করিয়াছিলেন, বঙ্গ-বিভাগ সংক্রান্ত ঘোষণা পত্র প্রচারিত হইলেই এই কৃত্রিম আন্দোলনের নিবৃত্তি হইবে। এই বিশ্বাসেই তাহারা অতীব ক্ষিপ্রতার সহিত বঙ্গবিভাগ-বিষয়ক ঘোষণাপত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের ধারণা যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, তাহা তাহারা এক্ষণে বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া আমাদিগের বিশ্বাস।

লর্ড কার্জন ও স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার যে ঘোষণা-পত্রকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহারবিষয়ক আন্দোলনের নিবৃত্তি-কারক বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সেই ঘোষণা-পত্রই বঙ্গদেশে নূতন আন্দোলনের সূচনা করিয়াছে। আমরা লর্ড কার্জনের এই ঘোষণা-প্রচারের দিবসকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিবস বলিয়া মনে করি। ৪।।০ কোটি বাঙালি প্রাণ-পণে একত্রে থাকিতে চেষ্টা করিতেছে, আর সাম্রাজ্য মদমত্ত রাজপুরুষেরা তাহাদিগকে রাজকীয় বজ্রদণ্ডের আঘাতে বিভক্ত করিতেছেন। বঙ্গদেশের ইতিহাসে এ ঘটনা যে অভূতপূর্ব, তাহাতে সন্দেহ নাই। গবর্নমেণ্টের প্রতিজ্ঞা বঙ্গদেশের বিচ্ছেদ-সাধন; আমাদিগের চেষ্টা বাঙালি জাতির ঐক্য-সংরক্ষণ। গবর্নমেণ্ট রাজশক্তির বলে স্বীয় প্রতিজ্ঞাপালন করিয়াছেন, আর আমরাও ৪।।০ কোটি বঙ্গসন্তান লর্ড কার্জনের শেলাঘাত বক্ষে ধারণ করিয়া সম্মিলিত চেষ্টায় আমাদের জননী জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদ-নিবারণে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি। তাই সমগ্র বঙ্গে প্রজার পক্ষ হইতে এই ঘোষণা প্রচারিত হইয়াছে—

যেহেতু সমগ্র বঙ্গবাসীর সমস্ত আপত্তির বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ বঙ্গদেশকে দ্বিখণ্ড করাই স্থির করিলেন, সেই জন্য আমরা বাংলার অধিবাসীগণ এই বিভাগ-নীতির অশুভফল দূর করিবার জন্য সমগ্র জাতির অস্তিত্ব-রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আমাদের একাগ্র সম্মিলিত চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম, ইহাই অদ্য ঘোষণা করিতেছি। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউক।

দেখা যাউক, ৪৷৷০ কোটি বাঙালির সঙ্কল্প সিদ্ধ হয় কি না?

রাজপুরুষেরা আজ সাম্রাজ্য গর্বে স্ফীত হইয়া আপনাদিগকে সর্বশক্তিমান্ মনে করিতেছেন। ভারত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, অকর্মণ্য ভারত সচিব মিঃ ব্রডরিক ও জন মর্লি লর্ড কার্জনকে সন্তুষ্ট করিবার জন্যই কোটি কোটি প্রজার আবেদন, নিবেদন ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া তাহাদিগের বক্ষঃস্থলে শেলাঘাত করিবার প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমরা তাহাদিগের এই ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইলেও হতাশ হই নাই। আমরা জানি, রাজপুরুষেরা যতই ক্ষমতাশালী হউন, তাহাদের উপরও কর্তা আছেন। বিলাতের জন-সমাজ ভূতপূর্ব মন্ত্রি-সমাজের বিরুদ্ধবাদী হওয়ায় তাহারা নিমেষ-মধ্যে যে কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন, তাহার স্থিরতা নাই। এখন সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী ঔদারনীতিক দল ইংলণ্ডের রাজনীতি-চক্র পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু আমাদের ভাগ্যদোষে ইহারা রক্ষণশীল দলের অপেক্ষাও অধিকতর কঠোরতা-অবলম্বনে অগ্রসর হইয়াছেন। তথাপি আমরা নিরাশ হইতে পারি না। আমরা স্থাণুর ন্যায় অচল থাকিলে, ধৈর্যচ্যুত হইয়া কাপুরুষের ন্যায় কর্তব্য-পথ পরিত্যাগ না করিলে, বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন অবশ্যই হইবে।

ফল কথা, রাজ-বংশের ন্যায় রাজপুরুষগণেরও উত্থান ও পতন আমরা চিরকালই দেখিয়া আসিয়াছি, আরও কত দেখিব! রাজ্যের সহিত রাজপুরুষগণের সম্বন্ধ যেরূপ ক্ষণিক, দেশের সহিত দেশবাসীর সম্বন্ধ সেরূপ ক্ষণিক নহে। সুতরাং আমাদিগের সংকল্পের দৃঢ়তা থাকিলে—আমরা কায়মনোবাক্য ও স্থায়ীভাবে চেষ্টা করিতে পারিলে রাজপুরুষদিগের ক্ষণিক উদ্যম কতক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকিবে? পক্ষান্তরে আমরা ইহাও জানি যে, ইংরাজ এদেশের রাজা হইলেও রাজ্যের অপেক্ষা বাণিজ্যের প্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি সমধিক। ভাবুতে শাসনদণ্ডের পরিচালনা করিয়া তাহারা যেরূপ লাভবান্ হইয়া থাকেন, এদেশের বাণিজ্যে তাহাদিগের তদপেক্ষা বহুগুণে অধিকতর লাভ হইয়া থাকে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় বাণিজ্যের জন্যই বিলাতের লোকের নিকট ভারতীয় সাম্রাজ্যের এত আদর। সে বাণিজ্যের যদি কোনরূপে ক্ষতি সাধিত হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডীয় জন-সমাজ নিশ্চিত বিচলিত হইয়া তাহাদের বাণিজ্য-পথের কণ্টক দূর করিবার জন্য গ্রাহক-স্থানীয় ভারতীয় প্রজার সন্তোষ-সাধনে অগ্রসর হইবেন, সন্দেহ নাই।

এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়াই আমরা বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের প্রতীকারস্বরূপ বিলাতি পণ্যের যথাযথ পরিবর্জন করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আমাদিগের বিশ্বাস, এ সঙ্কল্প যদি আমরা অটল রাখিতে পারি, তাহা হইলে আমাদের বাসনা নিশ্চিত পূর্ণ হইবে, "কাটা মুণ্ড কথা কহিবে, কাটা বাংলা জোড়া লাগিবে।" ইতোমধ্যেই আমরা যতটুকু দৃঢ়তা দেখাইয়াছি, তাহাতেই বিলাতি বণিক্-সমাজের চমক্ ভাঙিবার উপক্রম হইয়াছে। রাজপুরুষেরাও ভীত হইয়া স্বদেশি আন্দোলন বন্ধ করিবার জন্য কঠোর শাসন-নীতির অবলম্বন করিয়াছে। তথাপি স্বদেশির প্রসার ও বয়কটের প্রবলতা দিন দিনই বৃদ্ধি হইতেছে। (১) যদি আমরা প্রাণপণ চেষ্টায় যথাসম্ভব বিলাতি দ্রব্যের পরিহার করিতে সমর্থ হই, তাহা হইলে আমাদিগের আশা পূর্ণ হইবে, জননী জন্ম-ভূমির অঙ্গচ্ছেদ নিশ্চয়ই নিবারিত হইবে।

এতদুপলক্ষে বারাণসীর জাতীয় মহাসমিতির সভাপতিরূপে মাননীয় শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে মহাশয় যাহা বলিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর মনোযোগ আবশ্যক। তিনি বলিয়াছেন—"অমঙ্গল হইতেও মঙ্গলের উদ্ভব হইয়া থাকে। বঙ্গে যে দুর্দিন গিয়াছে ও যাইতেছে, তাহার একটি শুভ ফল ইতোমধ্যেই নয়নগোচর হইতেছে। এই ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে লোকের মনের ভাব যেরূপ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা আমাদিগের জাতীয় উন্নতির ইতিহাসে স্মরণীয় হইবে। সমগ্র

প্রদেশে প্রকৃত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা হইয়াছে—সকলে ব্যক্তিগত স্বার্থ, বিদ্বেষ, কলহ-বিসংবাদ প্রভৃতি (অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও) বিস্মৃত হইয়াছে। রাজপুরুষগণের যথেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী যেরূপ নির্ভীক ভাবে ও দৃঢ়তা-সহকারে দণ্ডায়মান হইয়াছে, তাহাতে সমগ্র ভারতবাসী বিস্মিত ও পুলকিত হইয়াছেন। এরূপ আন্দোলনে সামান্য একটু বাড়াবাড়ি লক্ষিত হইতে পারে, কিন্তু তজ্জন্য বিচলিত হইবার কোনও কারণ নাই। এই ব্যাপার উপলক্ষে এদেশের প্রজাসাধারণ যে শক্তি লাভ করিল, তজ্জন্য বঙ্গবাসীর নিকট সমগ্র ভারতের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। অবশ্য বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দকে এবিষয়ে অসংখ্য বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইবে—বরং প্রকৃত বাধা বিঘ্নের এই সূত্রপাত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু আমি জানি যে, এই দায়িত্ব গ্রহণে তাহাদিগের কেহই অসম্মতি প্রকাশ করিবেন না, এবং ইহার জন্য যে স্বার্থ-ত্যাগ আবশ্যক হইবে, সকলেই প্রফুল্লচিত্তে তাহা করিবেন। সমগ্র ভারতবাসী বঙ্গীয় নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষক-স্বরূপ রহিয়াছেন। এবিষয়ে বঙ্গবাসী অন্যান্য প্রদেশের সহানুভূতি প্রাপ্ত হইবেন। তাহাদিগের দুর্নাম হইলে আমাদিগেরও দুর্নাম হইবে। আর তাহাদিগেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, বাঙালিরই হস্তে এক্ষণে সমগ্র ভারতবর্ষের সম্মান ন্যস্ত রহিয়াছে।"

(১) আমাদের বিলাতি পণ্য-বর্জনের চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা দেখুন,—বঙ্গদেশে (কলিকাতায়) বিলাতি বস্ত্রের আমদানি হইয়াছে—

১৯০৫ সালে ১৯,৪০,৩০,২০১ টাকার
১৯০৬ সালে .৭,০৩,৩৪,১০৭ টাকার

সেই সঙ্গে দেশীয় কলকারখানায় উৎপন্ন বস্ত্রের পরিমাণও বাড়িয়াছে—

১৯০২ সালে ৪১,২৪,৭৫,৪৬৫ গজ	১৯০৫—৫৬,২৮,৭১,৯৪৯ গজ
১৯০৩ সালে ৪৬,০৫,৪৪,২৭৩ গজ	১৯০৬—৫৯,৭৮,০৮,৯৯৪ গজ
১৯০৪ সালে ৪৭,৭১,২৯,৮১০ গজ	১৯০৭—৬৮,০০,৪৬,৮২১ গজ

এখন দেশে সূক্ষ্ম সূত্রের উৎপত্তি কিরূপ বাড়িয়েছে দেখুন,—

	১৯০৫/৬ সাল	১৯০৬/৭ সাল	১৯০৭/৮ সাল
২১—৩০ নং—	১০,৫৭,৭৯,১১১	১১,৬০,১৩,৬৭৯	১২,৩২,৪৩,৯৮৫ পৌণ্ড
৩১—৪০ নং—	১,৫৫,৯৩,৯০৯	১,৭১,৮৮,৮৩৩	২,২০,১০,৩১৭ পৌণ্ড
৪০ নম্বরের উর্ধ্ব—	৯,৩১,১৯৭	১৪,২১,০০২	২৭,০৬,৪৯৩ পৌণ্ড

১৯০৭ সালের এপ্রিল হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ছয়মাসে ভারতে যত বিলাতি কাপড়ের আমদানি হইয়াছিল, ১৯০৮ সালের ঐ কয় মাসে তদপেক্ষা প্রায় ২ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকার কাপড় কম আমদানি হইয়াছে। সে জন্য গবর্ণমেণ্টের বাণিজ্য শুল্ক (কষ্টম) বিভাগের আয়ও ৯ লক্ষ ২৭ হাজার টাকা কম হইয়াছে। লবণের শুল্ক হ্রাস হওয়ায় পূর্ববৎসরের তুলনায় ১৯০৭/৮ সালে এদেশে লবণের আমদানি প্রায় এক পঞ্চমাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে, কিন্তু লিবারপুলী লবণের আমদানি ২৩,৫৯০ টন বা শতকরা ১০।। টন কমিয়াছে। এডেন আরব ও মিশর দেশীয় লবণের আমদানি খুব বাড়িয়াছে। সুলভ এনামেলের আদর অশিক্ষিত সমাজে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে—ইহা দেশবাসীর দারিদ্র্য-বৃদ্ধির পরিচায়ক।

বীরেন্দ্রনাথ চৌধুরী

স্বরাজের পূর্বাভাস

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ যার কোথায় সে রোম?
কাঁপিত যাহার তেজে মহী, সিন্ধু ব্যোম?
ধরণীর সীমা থাক, ছিল রাজ্য অধিকার,
সহস্র বৎসরাবধি একাদি নিয়ম—
দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ আজি কোথায় সে রোম! হেমচন্দ্র।

High walls and huge the body may confine,
And iron gates obstruct the prisoner's gaze,
And massive bolts may baffle his design
And vigilant keepers watch his devious ways,
But scorns the immortal mind such base control
No chains can bind it and no cell in close.
William Lloyed Garrison.

এ দেশে প্রচলিত একটি পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, একদিন লক্ষ্মীনারায়ণ গরুড়ের রথে চড়িয়া পৃথিবী পরিদর্শনে বহির্গত হইয়াছিলেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে ফিরিবার সময় দেখিলেন যে, এক বাড়িতে বহুলোক তিন দলে বিভক্ত হইয়া ভীষণ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত রহিয়াছে। গৃহস্থের কন্যা বিবাহ যোগ্যা, কিন্তু পিতা, মাতা ও ভ্রাতা তিনজনে তিন বর আনিয়া উপস্থিত করিয়াছেন। কোন্ বরের সঙ্গে বিবাহ হইবে, তাহাই বিতণ্ডার বিষয়। আজই বিবাহের দিন। লক্ষ্মী স্ত্রী জন-সুলভ কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে? নারায়ণ উত্তর করিলেন ও তিনজনের কাহারও সঙ্গে নহে। কিন্তু নিকটবর্তী বটবৃক্ষের নিম্নস্থ এক রাখাল বালকের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলিলেন, আজই রাত্রে ঠিক সময়ে, ঐ বালকের সঙ্গে বিবাহ হইবে। লক্ষ্মীর মনে কোনও সন্দেহ আসিল না, কিন্তু গরুড়ের এ ব্যবস্থাটা নিতান্তই অপছন্দ হইল, তাহার মনে একটা মস্ত খট্‌কা লাগিল। এ কি আশ্চর্য, তিন বর বাড়িতে উপস্থিত। তাদের কাহারও সঙ্গে বিবাহ হইবে না, বিবাহ হইবে কি না এক অজ্ঞাত কুলশীল রাখাল বালকের সঙ্গে? অসম্ভব! তাহা হইতেই পারে না, উহা মানুষের কল্পনার অতীত। আমি এ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই পণ্ড করিব; এই ভাবিয়া, গরুড় লক্ষ্মী নারায়ণকে তাড়াতাড়ি বৈকুণ্ঠে পৌঁছাইয়া দিয়া; এক মুহূর্তে ব্রাহ্মণের বাড়িতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক ছোঁতে রাখাল বালককে শূন্য মার্গে লইয়া এক পর্বতের উচ্চ শিখরে রাখিয়া দিলেন, সঙ্কল্প এই যে, বিবাহের ঠিক সময় চলিয়া গেলে বালককে পর্বত হইতে নামাইবেন। গরুড় ব্রাহ্মণের বাড়ি ছাড়িলেন না, চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, কখন সময়টা উত্তীর্ণ হয় বা অন্য কাহারও সঙ্গে বিবাহ হয়! কিন্তু তা আর হয় না। তখন গরুড়ের মনে হইল, যে বালকটাকে পর্বতের উপর রাখিয়া আসিলাম, উহার কিঞ্চিৎ খাদ্যের সংস্থান প্রয়োজন। বিবাহ-বাড়িতে খাদ্যের অভাব কি? দেখিলেন, একজন ভীমকায় লোক প্রকাণ্ড এক ঝুড়ি খাবার লইয়া কোথায়

চলিয়াছে, গরুড় সটান সেটি তাহার মস্তক হইতে উত্তোলন করিয়া পর্বত শিখরে বালকের সম্মুখে রাখিয়া আসিলেন। এ দিকে বিতণ্ডা আর থামে না। অনেক কষ্টে স্থির হইল, পিতার মনোনীত বরেই কন্যা সমর্পিত হইবে। কিন্তু কন্যা কোথায়? এ দিকে সময় কিন্তু উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। গরুড় স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ জানিয়া মনে মনে হাসিতে হাসিতে সগর্বে পর্বত শিখরে যাইয়া উপস্থিত। কিন্তু যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাহার চক্ষু স্থির; দেখিলেন, কন্যা বালকের গলায় বরমাল্য দিয়া তাহার পার্শ্বে আসীনা! কিন্তু হঠাৎ বুঝিতে পারিলেন না, কিরূপে ইহা সম্ভব হইল। হায় গরুড়, ভ্রান্ত তুমি, পশুবল-গর্বিত তুমি বুঝিলে না, বিধাতার বিধান অলঙ্ঘনীয়! তুমি নারায়ণের ব্যবস্থা উল্টাইতে যাইয়া যাহা কিছু করিয়াছ, তাহার প্রতি পদক্ষেপে তুমি তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ করিয়াছ। তোমার ঐ বিরুদ্ধ সঙ্কল্পের দ্বারাই ভগবান স্বীয় সঙ্কল্প পূর্ণ করিয়াছেন। কন্যার মাতা যখন দেখিলেন, এ বিপদে তাহার জয়ের আশা নাই, তখন তিনি স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। কন্যাকে স্বীয় মনোনীত বরের গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। তাহাকে এই উপদেশ দিয়া পাঠাইলেন যে, সেখানে যে বালককে দেখিবে, তাহাকেই বরমাল্য প্রদান করিবে। কিন্তু যে চুবরিতে করিয়া খাদ্য দ্রব্যের সঙ্গে লুকাইয়া মানুষের মাথায় তিনি কন্যাকে বরের গৃহে পাঠাইয়াছিলেন, পথে তাহা গরুড় কর্তৃক অপহৃত হইল এবং লোকটিও ভয়ে পলায়ন করিল। পশুবল-মদগর্বিত পক্ষীরাজ প্রতি পদক্ষেপে স্বীয় পদে কুঠারাঘাত করিয়াছেন এবং ভগবানের ইচ্ছাই পূর্ণ করিয়াছেন।

আমাদের দেশে বর্তমান সময়ে বিস্তৃতাকারে এইরূপ অভিনয় চলিতেছে। বিধাতার স্বরাজ বিধান ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছে, গরুড় স্থানীয় ফিরিঙ্গিরাজ আজ মদগর্বে স্বীয় পশুবলে তাহাকে বাধা জন্মাইতে অগ্রসর। কিন্তু তিনি যাহা কিছু করিতেছেন, তাহাতে কেবল স্বরাজের মুখই খুলিয়া যাইতেছে। মানুষ জলে পতিত হইলে যেমন যা পায়, তাই ধরে, হিতাহিত বিবেচনা শূন্য হইয়া কেবল ছট্‌ফট্ করে এবং আপনাকে আরও জলে নিমগ্ন করে; ভারতে ফিরিঙ্গিরাজের রাজভক্তেরও আজ সেই দশা! এ বুঝি ডুবে! Times যতই অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি শুনান না কেন, ভারত রাজ্য অস্ত্রবলে শাসিত হয় না, সম্মোহন বলে শাসিত হয়। ভারতের জনমণ্ডলীর মনে যে সুশাসনের একটা বিকট কুসংস্কার বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে, তাহাই ফিরিঙ্গি রাজের সম্মোহন অস্ত্র। সকল কুসংস্কারের ন্যায় এ কুসংস্কারও প্রত্যক্ষকে অগ্রাহ্য করিতেছে; অন্য কুসংস্কারের প্রকৃতি ইহাতে যোল আনা বিদ্যমান: চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলেও ছাড়িতে চাহে না। এই যে কুসংস্কার আমাদিগকে ছাড়িয়াও ছাড়ে না, ইহার মধ্যে মানব প্রকৃতির একটা গূঢ় রহস্য বর্তমান। কুসংস্কারকে কুসংস্কার বলিয়া স্বীকার করিলে ইহাই স্বীকার করা হয় যে, এতদিন অজ্ঞানতার অধীন ছিলাম, মানব সহজে তাহা স্বীকার করিতে রাজি নহে। তাই কুসংস্কার সরিয়াও সরে না, ঘুম ভাঙিয়াও ভাঙে না। কিন্তু এবার সম্মোহন ছুটিয়াছে, শক্ত আঘাতে ঘুম ভাঙিয়াছে এবং ফিরিঙ্গি তাহা বুঝিয়াছে; বুঝিয়াছে বলিয়াই দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া পাগলের মত অভিনয় করিতেছে, বুঝিতেছে না কি করিলে ভাল। যাহা করিতেছে, তাহাতেই উল্টা ফল ফলিতেছে। এই যে দেশব্যাপী আগুন জ্বলিয়াছে, তাহা নিবাইতে যাইয়া কোথাও বা আগুনে ইন্ধন জোগাইতেছে, কোথাও বা আগুন উস্কাইয়া দিতেছে, সর্বত্রই কিন্তু স্বপদে কুঠারাঘাত। এ আগুন নিবাইতে সকল চেষ্টাই তাহার বিরুদ্ধে যাইতেছে। কারণ যাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাহা বিধাতার বিধান, তাই কোন ঔষধই ধরিতেছে না। মহাকাল যাহার বক্ষে চাপিয়া বসে, ঔষধ তাহার কি করিবে? একদিন ধন্বন্তরি একটা ঔষধ প্রস্তুত করিয়া গর্বের সঙ্গে বলিলেন, এমন ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছি, যাহা সেবন করিলে আসন্ন-মৃত্যু ব্যক্তিও জীবন লাভ করিবে। মহাদেব তখন বলিলেন, আমি যখন বুকে চাপিয়া বসি, তখন ঔষধ সেবন করিবার শক্তি থাকে কি? থাকিলেও তখন অমৃত বিষ হইয়া যায়। ফিরিঙ্গির পাপের ভরা পূর্ণ হইয়াছে, তাহার আসন্নকাল উপস্থিত, তাহাকে কে রক্ষা করিবে? তাই স্বরাজের বিরুদ্ধে তাহার সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে, তাহার সকল চেষ্টা স্বরাজের ভিত্তি স্থাপন

করিতেছে। বঙ্গভঙ্গের দিন হইতে গণনা করিলে দৃষ্টান্তের অভাব হইবে না, শত শত দৃষ্টান্ত মিলিবে। কিন্তু কুমিল্লার ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করিতেছে। কুমিল্লায় যাহা ঘটিয়াছে, তাহা চক্ষে আঙ্গুল দিয়া এ দেশে রাজশক্তি ও প্রজাশক্তির বর্তমান অবস্থা দেখাইয়া দিতেছে। যাহারা ভাবিতেছেন, কুমিল্লার ঘটনা হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ, তাহারা চক্ষু থাকিতে অন্ধ। হিন্দু-মুসলমানে এদেশে কোনও বিবাদ নাই; থাকিতে পারে না, জন কতক মুসলমান কেবল রাজশক্তির হাতে ক্রীড়া পুতুলরূপে ব্যবহৃত হইতেছে মাত্র। উহা ব্যর্থ রাজশক্তি ও জাগ্রত প্রজাশক্তির মহা সংগ্রাম—স্বরাজের প্রথম গাঁথুনি। শহর-কোটাল ম্যাজিস্ট্রেট নগরবাসীর আবেদনের উত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সারমর্ম কি? বিপিন পালের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করিতে বলিয়া তিনি কি প্রমাণ করিয়াছেন? তিনি হয়তো ঠাট্টা করিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্যই বলিয়াছেন, কিন্তু এই ঠাট্টার পশ্চাতে যে একটা প্রকাণ্ড সত্য নিহিত রহিয়াছে, আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিতে পারি না। সত্যটি এই যে, ফিরিঙ্গিরাজ আজ আমাদের স্বরাজের দাবি-দমনে অসমর্থ, জাতীয় জীবনের যে মহাস্রোত বহিয়া চলিয়াছে, তাহার গতিরোধ করিতে সম্পূর্ণ অপারগ। তাই অপারগের রাগে তাহার শরীর গজগজ করিতেছিল। এমন সময় প্রতিহিংসার সুযোগ উপস্থিত হইল। স্বরাজের জন্য গণ্ডগোলকারী হিন্দুকে বিপদাপন্ন দেখিয়া তিনি স্বীয় কর্তব্য ভুলিয়া গায়ের ঝাল ঝাড়িলেন। কিন্তু "উল্টা বুঝলি রে রাম!" তিনি বড়ে দিয়ে বড়ে মারিবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু এদিকে স্বয়ং 'কিস্তিমাৎ'। স্বরাজের বিরুদ্ধে ফিরিঙ্গি-রাজের শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ মাত্র। হিন্দু মরিল না, স্বরাজ গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। ফিরিঙ্গি মনে করিয়াছিল যে, এ অস্ত্রে নিশ্চয়ই হিন্দুর স্বরাজ আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হইবে। কিন্তু হরি! হরি!! হিন্দু প্রমাণ করিয়া দিয়াছে যে, সে অরাজকতা নিবারণ করিয়া আত্মরক্ষা ও রাজ্য-রক্ষায় সমর্থ। ফিরিঙ্গি এবার ভারতে রাজত্ব করিবার শেষ ওজুহাতটিও খোয়াইয়াছে। ইহারই নাম কেঁচো খুড়িতে সাপ ওঠা। ফিরিঙ্গি এবার ভাবিতেছে "কি করলাম কি হ'ল, ছাতু মাখলাম কিন্তু এ যে কি হয়ে গেল!!!

রাজশক্তি তো প্রজাশক্তির প্রতিনিধি মাত্র। প্রজা স্বীয় ধন প্রাণ রক্ষার ভার রাজাকে দিয়াছে, তাই রাজশক্তির আবির্ভাব। রাজশক্তির কোনও স্বাধীন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। যেখানে রাজশক্তি প্রজারক্ষণে অসমর্থ, সেখানে অরাজকতা, অরাজকতার অর্থ প্রজা আত্মরক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করিয়াছে, সুতরাং ধরিতে হইবে, রাজশক্তি লোপ পাইয়াছে। কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেট আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদিগকে "বিপিন পালে"র নিকট যাইতে বলিয়া রাজশক্তির তিরোভাব ঘোষণা করিয়াছেন, এবং হিন্দুগণ আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া স্বরাজকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া গৃহে আনিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের কথার ইহাই অর্থ। কেহ হয়তো বলিবেন, যে হিন্দু মুসলমানের বিবাদে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, দেশে প্রজাশক্তির বিচ্ছিন্নতাই প্রকাশ পাইতেছে, এখন স্বরাজের কথা বলা নিতান্তই অস্বাভাবিক! ইহার উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়াছি, এ বিবাদ প্রকৃত হিন্দু-মুসলমানের বিবাদ নহে, প্রজাশক্তির এক অংশ রাজার হাতের যন্ত্র মাত্র। আসল উত্তর এই, এ স্বরাজ হিন্দুরও নহে, মুসলমানেরও নহে, কিন্তু ভারতের! কে সাহায্য করিল, কে বিপক্ষতাচরণ করিল, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, মুসলমান ভ্রাতাদের কেহ যদি মনে করিয়া থাকেন যে, ফিরিঙ্গির সহায়তা করিয়া তাহারা স্বরাজে বাধা জন্মাইবেন, তবে তাহাদিগকে বলি যে তাহারা ভ্রান্ত, তাহারা বিড়ম্বিত। এ স্রোত কেহ ফিরাইতে পারিবে না। প্রলয়ের বাতাস যখন বহিয়া যায়, তখন কি সে কাহারও সাহায্যের অপেক্ষা রাখে? প্রলয়াগ্নির ন্যায় স্বরাজাগ্নি ভারতের সকল অত্যাচার অবিচার ভস্মীভূত করিবার জন্য দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছে, ইহার হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। কেবল ভারতেই বা বলি কেন? পৃথিবী বেষ্টন করিয়া স্বরাজের বিজয় ভেরি বাজিয়া উঠিয়াছে, বিশ্বে মহা কোলাহল পড়িয়া গিয়াছে, কাহার সাধ্য বধির হইয়া থাকে। ঐ শুন স্বরাজের দুন্দুভি নিনাদ চীন হইতে রুষিয়াতে, পারস্য হইতে মিশরে দিগঙ্গনাগণকে বিকম্পিত করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত

করিতেছে, কাহার সাধ্য আর ঘুমাইয়া থাকে। তাই মুসলমান, তুমি যদি ঘুমাইয়া থাক, তাহাতে স্বরাজ আটকাইবে না। স্বরাজের বিরুদ্ধে কুরাজকে ধরিয়া রাখিতে তুমি যতই চেষ্টা কর না কেন, তোমার বিপক্ষতাচরণ সত্ত্বেও, তোমার সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়াই ভারতে স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। কেবল তুমিই আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হইবে। তুমি যে তিমিরে, সেই তিমিরেই রহিয়া যাইবে। স্বরাজে তোমার স্থান কোথায় থাকিবে? ভারতের জাতি সকলের নিকট এক মহা সমস্যা উপস্থিত। আজ যিনি স্বরাজকে যে ভাবে অভ্যর্থনা করিতেছেন, স্বরাজে তাহার স্থান সেই ভাবে নির্দিষ্ট হইবে। ইহা প্রকৃতির নিয়ম, কিন্তু যিনি নিয়ম লঙ্ঘন করেন, নিয়ম তাহাকে নিষ্পেষিত করিবেই, কাহারও কাতর ক্রন্দন শুনিবে না। তাই বলি, ভাই, হিন্দু হও, মুসলমান হও, বিধাতার বিধান লঙ্ঘন করিতে যাইয়া নিষ্পেষিত হইও না।

একটা সাধারণ প্রচলিত কথা আছে যে, দেবতারা যাহাকে শাস্তি দিতে ইচ্ছা করেন, আগে তাহার বুদ্ধি হরণ করেন। ফিরিঙ্গিরাজের মস্তকে দেবতার অভিশাপ অবতীর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাহার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে। তাই মুসলমান গুন্ডাদিগ কর্তৃক মগরা বাজার লুণ্ঠনের সংবাদ পাইয়াও কর্তারা নিশ্চেষ্ট, উৎপীড়িতদিগের জন্য সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থার প্রত্যুত্তরে এক কর্ত্তা বলিয়াছেন, "No, you think that I should send armed police to all parts of the country."

ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর কিছুই নাই। আমরা চিরদিনই বলিয়া আসিতেছি যে, এদেশে ফিরিঙ্গির রাজত্ব হাওয়ার উপরে প্রতিষ্ঠিত, একটু জোরে বাতাস বহাইতে পারিলেই উড়িয়া কোথায় দিগ্‌দিগন্তে পতিত হইবে। এত বড় দেশ রক্ষা করিবার ক্ষমতা ফিরিঙ্গির নাই। একটা গ্রামে গুণ্ডার উৎপাত নিবারণ করিতে যে অক্ষম, সে কি শক্তিবলে এই রাজ্য চালাইতেছে? কখনই না। সম্মোহন, কেবল সম্মোহন অস্ত্রবলে! ঘুম ভাঙিলেই সব ফক্কিকার! শহরের লোকগুলো "জন কত শ্বেত প্রহরী পাহারা" দেখিয়া একেবারে জাহান্নামে গিয়াছে। পল্লীবাসীদিগকে সে 'ধান্দা' এখনও স্পর্শ করিতে পার নাই। ত্রিশ কোটি লোকের দেশে সে ধান্দা লাগান সম্ভব নহে। লক্ষ লক্ষ পল্লী আছে, যেখানে কখনও কোন শ্বেতপুরুষ যায় নাই, কখনও যাইতে পারিবে না। অথচ তাহারাও শ্বেতের অধীন। ঐ সম্মোহন। ঘুম ভাঙুক, এক দিনেই অধীনতা পাশ ছিন্ন হইবে। মগরার মত সব গ্রামে যদি গুণ্ডামি আরম্ভ হয়, তবে কি হইবে? এক গ্রাম রক্ষা করিতেই যাহাকে ঘর্মাক্ত হইতে হইল, দশ গ্রামের কথা সে ভাবিবে কিরূপে? সে দিন আর ফিরিঙ্গিকে ভারতের রাজত্ব ভাবিতে হইবে না। যে কয়জন শ্বেত প্রহরী পাহারা আছে, কোন গণ্ডগোল উপস্থিত হইলে, এ দেশের ফিরিঙ্গি পুরুষ-রমণীকে নিরাপদে জাহাজে তুলিয়া দিতেই তাহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয়িত হইবে, আর কিছু করিবার তাহাদের সময় থাকিবে না। আমরা তাহার প্রমাণ পাইয়াছি। কুমিল্লায় একটা খুন হতে না হতেই সাহেব মেমদের এমন হৃদকম্প উপস্থিত হইয়াছিল এবং তাহা একজন কমিশনারের সম্মুখে যে, মিলিটারি পুলিশ আনিয়া সে কাঁপুনি থামাইতে হইয়াছে, সুতরাং পুলিশ আর হাঙ্গামা থামাইতে মনোনিবেশ করিতে পারে নাই। এই তো অবস্থা, এরূপ স্থলে যে আমরা অত্যাচারিত হই; সে কেবল আমাদের মূর্খতা। হা মূর্খ! তুমি বাক্যের স্বাধীনতার (Freedom of Speech) গর্ব কর, যে রাজ্যে আত্মরক্ষার স্বাধীনতা নাই, যে অধিকার কীটপতঙ্গেরও আছে, সেই রাজ্যে বাক্যের স্বাধীনতা! এ রাজ্যে রক্ষার জন্য যদি প্রয়োজন হয়, তবে তোমার জীবনের মূল্য এক কড়া কানা কড়িও নয়, মূর্খ! তাহা বুঝিলে না। তবুও, বাক্যের স্বাধীনতার গর্ব! এখন আর নয়, উঠ, চক্ষু মেলিয়া দেখ, এবং জগতের কর্মক্ষেত্রে অগ্রসব হও। এবারে ফিরিঙ্গি রাজত্বের শেষ ওজুহাতও চলিয়া গিয়াছে। কতগুলি ভাল মানুষ (অমানুষ) দেশে আছেন, যাহারা মৃত্যুর শান্তির সঙ্গে মনুষ্যত্বের শান্তির কোনও পার্থক্য ধারণা করিতে পারেন না। তাহারা সকল প্রকার পরিবর্ত্তনকেই শান্তির বিরোধী মনে করেন। কুমিল্লা তাহাদের ঘুম ভাঙাইতে পারিবে কি? তাহারা এবারে নিশ্চয়ই পণ্ডিত প্রবর স্পেন্সারের, "The agency which maintains order may cause

miseries greater than the miseries caused by disorder".

এই উক্তিটির চাক্ষুষ প্রমাণ লাভ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি তাহাদের চোখ্ না ফোটে, তবে বলিতে হইবে, ইহারা ফিরিঙ্গির গুপ্তচর। সুতরাং, দেশের প্রথম ব্যবস্থা ইহাদেরই জন্য করিতে হইবে।

কুমিল্লার ঘটনাবলীতে স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে, গোলমালের সময় দেশরক্ষার ভার নিজ হস্তে লইতে ফিরিঙ্গিরাজ কেবল যে অসম্মত, তাহা নহে, দেশের পরিমাণ ও লোকসংখ্যা দৃষ্টে, একেবারে অসমর্থ। সুতরং আত্মরক্ষার ভার দেশের নিজ হাতেই আসিয়া পড়িতেছে। কাজেই আমাদিগকে আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। রাজ শক্তি যখন দেশ রক্ষায় অসমর্থ তখন যে সমস্ত রাজ আইন আত্মরক্ষার পরিপন্থী, তাহা আর দেশ মানিতে বাধ্য নহে। সেইজন্য অস্ত্র আইন ন্যায়ত ধর্মতঃ আর আমাদের উপর খাটিতেছে না। আমাদিগকে অস্ত্র আইন অগ্রাহ্য করিয়া আত্মরক্ষার জন্য শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। এতদিন অস্ত্র আইনের একটা ওজর ছিল, কুমিল্লার ঘটনায় সে ওজর চলিয়া গিয়াছে। এখন যে ব্যক্তি জননী ও ভগিনী, স্ত্রী ও কন্যার সম্মান রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া প্রস্তুত না থাকিবে, সে ধর্মের নিকট দায়ী। এতদিন অস্ত্র আইন তুলিয়া লইবার জন্য সরকারের কাছে প্রার্থনা করিয়াছি, আজ আর প্রার্থনা নাই, অস্ত্র আইন পদদলিত কর, আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত থাক। যে রাজা প্রজার ধন প্রাণ রক্ষায় অসমর্থ; তাহার রাজত্ব চলিয়া গিয়াছে, ও কাঠাম বিসর্জন দিতে আর অধিক সময় লাগিবে না।

যাহা হউক, কুমিল্লার ঘটনাবলী পর্যালোচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, রাজশক্তি প্রজাশক্তির জাগরণে ভীত হইয়াছে এবং হঠাৎ সম্মুখ সমরে অগ্রসর হইতে সাহসী হয় নাই। কেন না, বিদেশি রাজার পক্ষে প্রজাশক্তির বলাবল যথাযথ নির্ণয় করা একেবারে অসম্ভব এবং বলাবল নির্ণয় না করিয়া হঠাৎ সম্মুখ সমরে সমূহ বিপদের আশঙ্কা, তাই রাজশক্তি কুমিল্লায় প্রজামণ্ডলীর এক কোণে মুখ লুক্কায়িত করিয়া কপট যুদ্ধে প্রজাশক্তির, সম্মুখীন হইয়াছিল। জাগ্রত প্রজাশক্তি কপট রাজশক্তিকে বিধ্বস্ত করিয়া দিয়াছে। প্রজাশক্তি এখন আত্মজ্ঞান লাভ করিয়াছে। সে আত্মরক্ষার ও বিপক্ষদলনে সমর্থ। ইহাই স্বরাজের পূর্বাভাস। যাহা কুমিল্লায় হইয়াছে, তাহা সর্বত্র হইলেই স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই দিকেই এখন সকলকে মনোনিবেশ করিতে হইবে। মুখে "স্ববাজ" "স্বরাজ" বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠার আয়োজনে নিযুক্ত হও। স্বরাজ উপার্জন করিতে হইবে, ভিক্ষালব্ধ স্বরাজে আমাদের প্রয়োজন নাই। অনুগ্রহ-লব্ধ স্বাধীনতায় ক্রীতদাসগণের দুর্দশা আরও বাড়িয়াছে, পূর্বে তাহাদের একজন রক্ষক ছিল, আজ তারা অসহায়। কুকুর বিড়ালের ন্যায় শ্বেতকায়গণ আজ তাহাদিগকে হত্যা (Lynch) করিতেছে, কেহ তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছে না। যে আত্মরক্ষায় অক্ষম, তাহার দুর্দশা কিছুতেই ঘুচিবে না। তাই বলি, ভাই ভারতবাসী দলবদ্ধ হও, আত্মরক্ষাব আয়োজন কর, অত্যাচারীকে দমন করিবার জন্য কটিবদ্ধ হও, দেখিবে, তোমার সকল অভাব দূর হইয়াছে, স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ওঁ বন্দেমাতরম্।

নবাভারত ১৩১৪ বৈশাখ

কালীপ্রসন্ন চক্রবর্তী

বঙ্গবিভাগের শিক্ষা

বিধাতার ইচ্ছায় এত দিনে ছিন্নবঙ্গ পুনরায় মিলিত হইল। আবার দেশজননী জন্মভূমির জয়ধ্বনিতে বন্দে মাতরম্ মন্ত্রে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। লর্ড কার্জন একদিন ময়মনসিংহের মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া তাহার একটি কলমের আঘাতে আমাদিগকে আসাম প্রদেশের শাসনাধীন করিতে পারেন বলিয়া রক্তচক্ষু দেখাইয়া যে শক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন, এত দিনে তাহার সম্যক্ পরীক্ষা হইল।

বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন কোন বৃক্ষের একটি শুষ্ক পত্রও ভূপৃষ্ঠে পতিত হয় না, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। বঙ্গভঙ্গ এবং ছিন্নবঙ্গে পুনঃসংযোজন ইহার কোনটিই বিধাতার ইচ্ছা ভিন্ন সংঘটিত হয় নাই, হইতে পারিত না, একথাও যেমন সত্য বলিয়া জানি এবং মানি, আবার এই বিরাট এবং বিস্ময়জনক ব্যাপারের কোন কিছুই নিরর্থক হয় নাই কিংবা হইতেছে না, তাহাও তেমনি জানি এবং মানি। এ ব্যাপারে রাজা প্রজা, স্বদেশি বিদেশি, হিন্দু মোসলমান, বাঙালি ভারতবাসী, পূর্ববঙ্গবাসী, পশ্চিমবঙ্গবাসী,—প্রত্যেকের এবং সকলেরই শিক্ষণীয় বহু বিষয় আছে। এবং সেইসকল অসামান্য শিক্ষাদানের মহদভিপ্রায়েই মঙ্গলময় পরমেশ্বর এই কয় বৎসরে কত কাণ্ড সংঘটিত করিলেন। ভরসা করি, এই অনন্যসাধারণ অভূতপূর্ব আশ্চর্যজনক ব্যাপারের ইতিহাস এবং শিক্ষা কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই কদাচ বিস্মৃত হইবেন না।

এ ব্যাপারের সূচনার মধ্যভাগে. এবং অধুনা এই উপসংহার কালেও অনেকে লর্ড কার্জনকে নিন্দা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু লর্ড কার্জনকে কোন দোষ দিতে এখন আর ইচ্ছা করি না। লর্ড কার্জন কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র,—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা সাধনের একটা সামান্য উপকরণ বা ক্রীড়নক মাত্র, এ বিরাট বিশ্বরঙ্গমঞ্চের বিধিনির্দিষ্ট পন্থানুসরণকারী তিনি একজন সামান্য পথিক কিংবা অভিনেতা মাত্র। রামায়ণে মুখরা মন্থরার যেরূপ অত্যাবশ্যকতা, মহাভারতে মাতুল শকুনির যতটুকু প্রয়োজনীয়তা, এই কলির একপঞ্চাশৎ শতাব্দীর বঙ্গভঙ্গরূপ বিরাট ব্যাপারে লর্ড কার্জনেরও সেইরূপ আবশ্যকতা ছিল। এবং সেজন্য স্বয়ং বিধাতা তাহাকে ক্ষেত্র ও যথোচিত বিদ্যাবুদ্ধি ও শক্তি দিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করিয়াছিলেন। লর্ড কার্জন আমাদের ভারতবর্ষের এবং ভারতবাসিদের হিতাকাঙ্ক্ষী না হইতে পারেন কিংবা নহেন, কিন্তু তিনি যে অনিচ্ছাতেও ভারতবর্ষ এবং ভারতবাসিদের একজন অনন্যসাধারণ হিতকারী বন্ধু, সে বিষয়ে আমাদের কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। বঙ্গবিভাগের প্রচণ্ড আঘাতেই এ দেশের সকল স্তরে জনসমাজের মোহনিদ্রা অপসারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। বঙ্গবিভাগের পরই এদেশে নানা প্রকারে নবজাগরণের লক্ষণ পরিলক্ষিত হইতেছে। বঙ্গবিভাগেই "বিদেশি বর্জন" বয়কটের উৎপত্তি, বয়কটেই "স্বদেশির" উদ্ভব, স্বদেশিতেই আবার এদেশে স্বদেশীয় বিদেশীয় নানা বন্ধুরূপধারী ব্যক্তির স্বরূপ সুপ্রকাশিত সুব্যক্ত হইয়াছে। আমাদের শত্রু মিত্র, ভাই বন্ধুর প্রকৃত পরিচয় পাইবার সুযোগ ঘটিয়াছে। এই বঙ্গবিভাগের প্রস্তাবের পরই এদেশবাসি দেশমাতার সন্দর্শন লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে, দেশজননীর চিন্ময়ীরূপ দর্শন করিয়া জননীকে এতকাল পরে চিনিতে পারিয়া চরিতার্থ হইয়াছে, অমৃতের আস্বাদ ও অধিকার

লাভের আশায় অস্থির হইয়াছে। সুতরাং আমাদের এমন শিক্ষাগুরু আর দ্বিতীয় পাই নাই, সহজে এমন আর মিলিবেও মনে হয় না। এমন সুহৃদকে কেহ ভুলিতে পারে কি?

এ ব্যাপারে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগের বিশ্লেষণীয় বিষয় কি কি আছে সে সম্বন্ধেই সর্বাগ্রে কিছু আলোচনা করিব। বঙ্গভাষাভাষী ব্যক্তিমাত্রেই বাঙালি ; কিন্তু নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলি, বর্ধমান, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের বাঙালিগণ খাস বাংলার অপর সকল জেলার লোককেই মনে মনে, অনেকে প্রকাশ্যেও, "বাঙাল" বলিয়া চিরদিন উপহাস করিতেন। সুতরাং বরিশাল, চট্টগ্রাম, ঢাকা, রঙ্গপুর, রাজসাহী প্রভৃতি পূর্বোত্তরবঙ্গের সকল জেলার লোক, এমন কি খুলনা যশোহর প্রভৃতি মধ্যবঙ্গের বাঙালিগণও পশ্চিমবঙ্গের লোকেদের নিকট বাঙাল বলিয়া চিরদিন ঘৃণিত, অবজ্ঞাত, উপহসিত হইতেন। বাঙালেরা সরলবিশ্বাসী, অপরিণামদর্শী, কোপনস্বভাব, হঠকারী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বলিয়া চতুর চটুল সমাজে নিন্দিত হইতেন। "বাঙাল দেশ" আয়তন, লোকসংখ্যা, ধনসমৃদ্ধি, উর্বরতা, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, নদনদীর প্রাচুর্য, ব্যবসাবাণিজ্যের সুখসুবিধা প্রভৃতি বহু বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সংস্কৃত উপাধি পরীক্ষা প্রভৃতির উত্তীর্ণ বালকের তালিকায় পূর্বোত্তরবঙ্গের কৃতীছাত্রের সংখ্যাও সামান্য নহে। ক্রিয়াকর্মে, দানশৌণ্ডতায় "বাঙাল" দেশের তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। বঙ্গদেশের গৌরবমণি বলিয়া বিক্রমপুর সর্বত্র সুবিদিত। একদিন বাঙালির সুহৃদ লর্ড কার্জন বিদ্বেষবিদগ্ধহৃদয়ে বাঙালি জাতির বিষয়ে বলিতে গিয়া এই বিক্রমপুরের গৌরবের কথা উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আনন্দমোহন, শিশিরকুমার, অশ্বিনীকুমার, সূর্যকান্ত, চন্দ্রকান্ত, মনোমোহন, লালমোহন, শীতলাকান্ত, দুর্গামোহন, কালীমোহন, গঙ্গোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ, মহামহোপাধ্যায় দ্বারকানাথ, বিজয়রত্ন, গুডিভ চক্রবর্তী, প্রসন্নকুমাব রায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, নবীনচন্দ্র, আশুতোষ, অম্বিকাচরণ, চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন্দ্রকিশোর, কৃষ্ণকুমার, শ্যামাকান্ত প্রভৃতির জন্মভূমি হইয়াও পূর্বোত্তরবঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের "ভ্রাতাদের" নিকট এতদিন নিন্দিত, ঘৃণিত ও উপহাসিত হইয়া আসিতেছিল। দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি বঙ্গের সুরসিক নাট্যকারেরা অভিনয়ের মধ্যে রঙ্গরসের অবতারণা করিতে হইলেই একজন উড়িয়া কিংবা "বাঙালেব" আমদানি করিতেন। ইহা কি আত্মীয়তার চিহ্ন? না ইহা প্রেমের লক্ষণ? মুখে সৌভ্রাত্রের কথা এক আধবার বলিলেই প্রকৃত সৌভ্রাত্র সংস্থাপিত কিংবা সুরক্ষিত হইতে পারে না। পূর্ববঙ্গকে বাদ দিলে শুধু পশ্চিমবঙ্গ কত ক্ষুদ্র, কত দরিদ্র, কত শক্তিহীন, তাহা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষিত চিন্তাশীল বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই এই কয় বৎসরে বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন, কোন দ্রব্যের অভাব না হইলে অনেকে তাহার প্রকৃত মর্যাদা বুঝিতে পারে না। পূর্বোত্তরবঙ্গকে কিছু দিনের জন্য হারাইয়া ভরসা করি পশ্চমবঙ্গ অতঃপর তাহার প্রকৃত সমাদর করিতে শিখিলেন।

অপর দিকে পূর্বোত্তরবঙ্গের বহু লোকেই পশ্চিমবঙ্গের লোকদিগকে মিথ্যাবাদী, খলস্বভাব, প্রতারক, ভ্রষ্টাচার, স্বার্থসর্বস্ব, ধূর্ত বলিয়াই মনে ভাবিতেন। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অক্ষয়কুমার, স্বর্ণময়ী, তারক প্রামাণিক, কালীপ্রসন্ন সিংহ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক প্রাতঃস্মরণীয় অসংখ্য নরনারীর কথা সুবিদিত থাকিলেও পূর্বোত্তরবঙ্গের বহু লোকের নিকট পশ্চিমবঙ্গ ভয় অবিশ্বাস এবং ঘৃণারস আশ্রয়স্থল ছিল। ইহাও কখন সৌভ্রাত্রের লক্ষণ নহে। প্রেম কিংবা সৌভ্রাত্র কখনও এরূপ জলবায়ুতে জন্মিতে কিংবা প্রবর্ধিত হইতে পারে না। পশ্চিমবঙ্গের সহিত এই কতিপয় বৎসর রাজাদেশে বিচ্ছিন্ন হইয়া পূর্বোত্তরবঙ্গও নিজের দুঃখ, দৈন্য, দুর্বলতা—অভাব অসুবিধার কথা সম্যকরূপে বুঝিতে পারিয়াছে। বঙ্গসমাজ-দেহের পশ্চিমবঙ্গই যে শীর্ষস্থানীয়, তাহা দুর্দিনে পড়িয়াই পূর্বোত্তরবঙ্গ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছে। চতুরতা যে সকল সময়েই নিন্দনীয় নহে, বুদ্ধিকৌশল যে মনুষ্যের বিধিদত্ত অত্যাবশ্যক অমূল্য বৈভব এবং বহু পরিমাণে সুখ ও সম্মানের সম্বর্ধক, তাহা পূর্বোত্তরবঙ্গ ভাল মতে জানিতে পারিয়া আজ পশ্চিমবঙ্গকে অধিকতর প্রীতি ও অনুরাগের সহিত সম্বর্ধনা করিতেছে। অপর দিকে অম্বিকাচরণ,

আনন্দচন্দ্র এবং অনাথবন্ধু আজ তাই দেশের সর্বত্র অদৃষ্টপূর্ব আদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত হইতেছেন। ভরসা করি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যবঙ্গ অতঃপর সকল প্রকার ভেদবৈষম্য ও বিদ্বেষবুদ্ধি বিস্মৃত হইয়া, প্রত্যেকে এবং সকলে মিলিয়া জননীজন্মভূমির গৌরব বৃদ্ধি করিতে যত্নপরায়ণ হইবেন।

তারপর, এ ব্যাপারে হিন্দু ও মোসলমানের শিক্ষার কথাই সর্বাগ্রে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করিব। পশ্চিমবঙ্গের মোসলমানসমাজ পূর্ববঙ্গের মোসলমানদিগকে হারাইয়া নিতান্ত দুর্বল শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। অতি অল্প কয়েকদিন পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের মোসলমানসমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ বর্ধমানে সম্মিলিত হইয়া যে ভাবে আপনাদের মনের ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বঙ্গবিভাগ জন্য তাহাদের যে বিশেষ শক্তির অপচয় হইয়াছে এবং অসুবিধায় পড়িয়া তাহারা বিষাদিত ছিলেন তাহাই সুস্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছিলেন। পূর্ববঙ্গের অশিক্ষিত জনবহুল মোসলমানসমাজ কয়েকটি অল্পবুদ্ধি অদূরদর্শী নেতার স্বার্থপূর্ণ প্ররোচনায়, শুধু তাহাদের স্বধর্মাশ্রিত জনমণ্ডলীর সংখ্যাধিক্যের বলে এবং বৈদেশিক রাজপুরুষগণের সাহায্যে, হিন্দুগণের সহিত সকল সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়াও, সুখ ও সম্মান সুবিধার সহিত জীবনসংগ্রামে অগ্রসর হইতে পারিবেন, দিন দিন অধিকতর উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন, এরূপ মনে ভাবিতেছিলেন। তাহাদের সে ধারণা যে নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ তাহা এতদিনে তাহারাও বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। কতকগুলি স্বার্থান্ধ দুষ্ট লোকের কুমন্ত্রণায় তাহারা কতই জল্পনা কল্পনা করিয়া দেখিলেন। পরমপ্রীতিভাজন প্রতিবেশী জ্যেষ্ঠসহোদরতুল্য হিন্দুগণের মনে নিদারুণ শেলাঘাত করিয়া, এমন কি কোন কোন স্থলে অমানুষিক পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় করিয়া সমগ্র দেশকে ভীত ও উদ্বেলিত করিতেও কোন কোন স্থানের অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণির মোসলমান পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু এত দিনে নানা পরীক্ষায় তাহারা আপনাদের ও হিন্দুদের--উভয় পক্ষের সম্যক্ পরিচয়লাভ করিয়াছে। দেশের সামান্য অশিক্ষিত মোসলমানেরাও অবশ্য এখন আপন আপন মনে অনুমান করিয়া লইয়া এক প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছে। হিন্দু সমাজকে নির্যাতন করিয়া কিংবা অসন্তুষ্ট রাখিয়া ত দূরের কথা, এমন কি উপেক্ষা করিয়াও এ দেশের মোসলমানেরা কেবলমাত্র বিদেশীয় রাজপুরুষগণের অত্যধিক অনুগ্রহে ও সাহায্যে কিংবা শুধু আত্মশক্তির বলে এ দেশে জয়ী হইতে পারিবেন না, এ কথা এখন সে সমাজের বহু ব্যক্তিই বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন।

এ দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার বহুল প্রচার কিরূপ অত্যাবশ্যক, এ দেশের উচ্চস্তরের শিক্ষিত হিন্দুগণও এ ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। অজ্ঞানতার কুসংস্কারের ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকাতেই ময়মনসিংহের মোসলমানদের মধ্যে "লাল ইস্তাহার" (The Red Pamphlet) তেমন ভীষণ আগুন জ্বালাইতে পারিয়াছিল। অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনসমাজে বাস সর্পগৃহে বাসের ন্যায় কেমন ভীষণ এবং উদ্বেগকর পূর্বোত্তরবঙ্গের হিন্দুগণ এই কয় বৎসরের কয়েকটি শোচনীয় বীভৎস ব্যাপারে তাহা বেশ বুঝিতে পারিয়াছেন। মহামতি গোখলে মহোদয়ের প্রস্তাবিত সার্বজনীন শিক্ষাবিষয়ক বিধি, ভরসা করি এসব কথা চিন্তা করিয়া ভারতের সকল শ্রেণির শিক্ষিত চিন্তাশীল ব্যক্তিই সাদরে সমর্থন করিবেন। ভারতবর্ষে প্রাথমিক শিক্ষার সৌকর্যার্থে সম্রাট মহোদয় যে প্রকার অনুরাগের নিদর্শন প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাহার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ রহিব। এবং আমাদের রাজভক্তি প্রকাশের এই এক মহা সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে—আমাদের ছোট বড় ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সকল শিক্ষিত লোকেরই উচিত দেশে অবাধ সার্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের সহায়তা করা।

মহামতি স্যার সৈয়দ আহমদ সাহেব ভারতবর্ষকে একটি পরম সুন্দরী সম্ভ্রান্ত মহিলার সহিত তুলনা করিয়া এদেশের হিন্দু এবং মোসলমান সমাজকে তাহার দুইটি নেত্রস্বরূপ অমূল্য নিধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা যোগ্য কথাই বটে। ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মোসলমান, উভয়েরই

একের মঙ্গলে অপরের মঙ্গল, একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের অবনতিতে অপরেরও অবনতি, একের সৌন্দর্যে, অপরের সৌন্দর্য, একের অনিষ্টে অপরের অনিষ্ট, একের অঙ্গহানিতে অপরের অঙ্গহানি, এমন কি জীবনাশঙ্কা। ভারতবর্ষে হিন্দুকে বাদ দিয়া মোসলমানের, কিংবা মোসলমানকে বাদ দিয়া হিন্দুর রাজনৈতিক কোন স্থায়ী মঙ্গল হইতে পারে না। তাই আজ মাননীয় মোসলমান সমাজপতি আগা খাঁ সাহেব অনাহূত হইয়াও হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের মঙ্গলকামনা করিয়া দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুরের নিকট পঞ্চ সহস্র মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন, আবার তাই অপর দিকে দ্বারবঙ্গের মহারাজ বাহাদুর মোসলমান বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ডারে বিংশতি সহস্র মুদ্রা দান করিয়া স্বীয় কর্তব্য প্রতিপালন করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন। এ সবই নবযুগের সুসময়ের শুভ চিহ্ন। কোন কোন স্বার্থান্ধ নীচাশয় ব্যক্তি এ সকল দেখিয়া শুনিয়া দুঃসহ হিংসা-বিদ্বেষ-বিষে জর্জরিত হইতেছে, হইবার কথাও বটে। কিন্তু স্বদেশহিতৈষী বুদ্ধিমান সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য দেখিয়া অতিমাত্র প্রীত ও আনন্দিত হইয়াছেন, এবং ভগবানের চরণে কৃতজ্ঞহৃদয়ে অসংখ্য অভিবাদন করিতেছেন।

এত দিন এদেশের নিম্নস্তরের অসংখ্য হিন্দু নরনারীর প্রতি উচ্চস্তরের হিন্দুগণের ব্যবহারও যে ন্যায়সঙ্গত হইতেছিল না, এবং তাহারা যে উচ্চস্তরের হিন্দুগণের পরমাত্মীয়, স্নেহ ও প্রীতিভাজন সুহৃদ—বিপদের বন্ধু, তাহাদের সুখসম্মান শান্তি ও সংখ্যাবৃদ্ধির চেষ্টা করা উচ্চস্তরের শক্তিশালী হিন্দুগণের যে অবশ্য কর্তব্য,—এ সকল কথাও বঙ্গবিভাগের পরবর্তী কয় বৎসরের নানা ব্যাপারে উচ্চস্তরের হিন্দুগণ বুঝিতে পারিয়াছেন। তাই আজ নানাস্থলে, সভাসমিতি ও সংবাদপত্রে তাহাদের সম্বন্ধে অন্ততঃ শ্রুতিমধুর নানা শুভ প্রস্তাব মধ্যে মধ্যে শ্রুত হইতেছে। তাহার ভাবী ফলও সমাজের পক্ষে শুভকর হইবে এরূপ আশা হইতেছে।

ছিন্নবঙ্গের পুনর্মিলনে সমগ্র ভারতবর্ষের লোকেরও শিক্ষার অনেক কথা আছে। ভারতে আজ ন্যায়ের জয়, সত্যের জয়, একতার জয়, একনিষ্ঠতার জয়, বিধিসঙ্গত আন্দোলনের জয়, প্রজা-শক্তির জয় দেখিয়া সকলেই বিস্মিত এবং পুলকিত হইয়াছেন। ভারতবাসী এ ব্যাপারের শিক্ষালাভ করিয়া এ সুফল দেখিয়া হৃদয়ে অতুলনীয় অননুভূতপূর্ব বললাভ করিয়াছেন। এ শিক্ষার মূল্য সামান্য নহে। এতদিনে ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষে প্রজাশক্তির অস্তিত্ব প্রকৃত পক্ষে মহামহিমান্বিত প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ রাজেশ্বর কর্তৃক স্বীকৃত হইল। একথা বলা বাহুল্য যে এতদ্দ্বারা রাজা কিংবা রাজজাতির মাহাত্ম্য এবং মহত্ত্ব কিছুমাত্রও হ্রাস প্রাপ্ত হয় নাই, বরং বৃদ্ধিই প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাঙালি খুব শক্তিশালী জাতি, এমন কথা কোন বুদ্ধিমান ধর্মভীরু বাঙালি স্বপ্নেও মনে ভাবিতে পারেন না। ভগবান যেন অহংকারের এমন অতল সমুদ্রতলে নিমজ্জন হইতে বাঙালিজাতিকে রক্ষা করেন। তবে বাঙালির বিন্দুমাত্রও শক্তি নাই, এমন মিথ্যা কথা বলিয়া যেসকল নিচাশয় লোক আমাদের উদয়োন্মুখী ক্ষুদ্র শক্তিকে নিস্তেজ ও দুর্বল করিতে চাহে, আমরা তাহাদিগকে আমাদের ঘোর শত্রু বলিয়াই মনে করি। সর্বদা মিথ্যা কলঙ্ক ঘোষণা করিতে করিতে তেমন সমৃদ্ধ শক্তিশালী লোককেও মানুষ জগতে অতি হীন ও নিস্তেজ করিয়া ফেলিতে পারে। স্বজাতীয়ের নিন্দাশ্রবণ এ কারণেই মহাপাপ বলিয়া লোকসমাজে নিন্দিত হইয়া থাকে। সুতরাং যাহারা বাঙালিকে অন্তঃসারবিহীন, অপদার্থ, ভীরু, কাপুরুষ, স্বার্থ-সর্বস্ব, তোষামোদ-পরায়ণ প্রভৃতি বিশেষণে ভূষিত করিয়া আনন্দবোধ করে, আমরা তাহাদিগকে ঘোর মিথ্যাবাদী এবং বাঙালিজাতির শত্রু মনে করিয়া তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিতে ইচ্ছা করি না। সত্যের অনুরোধে একথা বলিলে বোধ হয় বিশেষ দোষ হইবে না যে রাজার নিকট হইতে নিজেদের ন্যায্য অধিকার লাভ করিতে বাঙালিকে এই কয় বৎসর স্বীয় ক্ষুদ্র পুরুষকারের সাহায্যে অতি কঠোর সাধনা করিতে হইয়াছে। ন্যায্য স্বত্ব রক্ষা করিতে হইলে কি প্রকার শক্তিক্ষয় ও সাধনা করিতে হয়, কি প্রকার ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, কত গায়ের রক্ত জল করিতে হয়, কত অজস্র অশ্রু বর্ষণ করিতে হয়, ভারতবাসী এ ব্যাপারে

তাহার কতক পরিচয় পাইয়াছেন। কি সাধনা বলে ভগবানের কৃপাবারি বর্ষিত হইয়া দেশের স্তূপীকৃত মনস্তাপ, শত শত অত্যাচার অবিচারের দারুণ দাবানল প্রশমিত, দেশব্যাপী অশান্তির অনল নির্বাপত হইল তাহা সকলেরই গভীরভাবে আলোচনার উপযুক্ত বিষয়। ভারতবাসী এ শিক্ষা কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিবেন না।

বিদেশীয় বণিককুলও এ ব্যাপারে সামান্য শিক্ষা লাভ করে নাই। ভারতবর্ষ তাহাদের কেমন অতুলনীয় দুর্লভ বিশাল বিপণিক্ষেত্র, কেমন অমূল্য কামধেনু, তাহা তাহাদের অবিদিত ছিল না। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষীয় জনমণ্ডলীর ক্রোধ কেন্দ্রীভূত হইলে বিদেশীয় বণিকবর্গের স্বার্থ নিমেষের মধ্যে কি প্রকারে ভস্মস্তূপে পরিণত হইতে পারে, এ ব্যাপারে তাহারা তাহার সুস্পষ্ট ভীষণ আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। ব্যবসায়-বুদ্ধি এবং লোক-চরিত্রের রহস্য প্রভৃতির গূঢ় তত্ত্ব অবধারণে তাহারা আমাদের অপেক্ষা বহু গুণে অভিজ্ঞ, সুতরাং এ ব্যাপারে তাহারা যে কত কথা শিখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাহা তাহারাই ভাল মতে বলিতে পারেন! সে অমোঘ শিক্ষাবলী তাহারা যে কস্মিনকালেও ভুলিবেন না, এ কথা নিশ্চয় রূপেই বলিতে পারি।

স্বদেশি বয়কট আন্দোলনে আমাদের স্বদেশীয় ব্যক্তিগণ স্বদেশি শিল্প বাণিজ্যের অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের বিষয়ে অনেক তথ্য—অনেক অমূল্যতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছেন। কি প্রকারে স্বদেশি শিল্পের ও বাণিজ্যের সংরক্ষণ ও সমুন্নতি সাধিত হইতে পারে, স্বদেশি শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির অন্তরায় বিঘ্ন বাধা কি, কে এবং কোথায় কিরূপে অনিষ্ট করিতেছে তাহাও বেশ বুঝিতে পারা গিয়াছে। আমাদের শক্তি, সুযোগ, বিঘ্নবাধা, কর্তব্য প্রভৃতি নানা বিষয়েই এখন দেশের লোকের অভিজ্ঞতা বহু পরিমাণে বর্ধিত হইয়াছে। এত দিনে সমগ্র বঙ্গ পূর্ববৎ এক এবং অখণ্ড হইতে চলিল। আর বিদেশি পণ্যদ্রব্যের প্রতি আমাদের বয়কট্ প্রযুক্ত হইবে না। তা বলিয়া স্বদেশীয় অক্ষয় বট কদাচ বিলুপ্ত হইবে না, অথবা কেহ তাহাকে বিস্মৃতও হইবে না। অবশ্য আমরা অতঃপর আমাদের অতি প্রয়োজনীয় কোন দ্রব্য বাজারে স্বদেশজাত না পাইলে বাধ্য হইয়া অনিচ্ছাসত্ত্বে বিদেশি দ্রব্যও ক্রয় করিব কিন্তু তা বলিয়া 'স্বদেশি'কে কেহ কদাচ বিস্মৃত হইতে পারিব না, স্বদেশিকে সর্বদাই গৌরবের সহিত সমাদর করিব। বন্দে মাতরম্।

প্রবাসী ১৩১৮ ফাল্গুন

চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন

লোক কথায় বলে "ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।" মানুষেই প্রতিজ্ঞা করিয়া রক্ষা করে, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া মানুষ, মানুষ হয়, জাতিও বড় হয়। যে জাতি বা যে জনসম্প্রদায় প্রতিজ্ঞা রক্ষায় পশ্চাৎপদ, এ নিত্যসংগ্রামপূর্ণ সংসার-ক্ষেত্রে তাহাদের দাঁড়াইবার স্থান কোথায়? ১৩১৩ সালের (১৯০৫) ৩০ আশ্বিন, প্রাতঃকালে, বাঙালি বাঙালির হাতে রাখি বাঁধিয়া যে প্রতিজ্ঞাপাশে বদ্ধ হইয়াছিল আজ বাঙালির সে দারুণ প্রতিজ্ঞা কোথায় রহিল? আজ দেশবিদেশ, আজ ইংরাজ বাঙালি সকলেই বলিতেছে "সেইত মল খসালি, তবে কেন লোক হাসালি।"

বাংলা দেশটাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লর্ড কার্জন বাহাদুর দেশের এমনকি সর্বনাশ করিয়াছিলেন, আর রাজরাজেশ্বর শ্রীযুক্ত ভারত-সম্রাটের এক ফুৎকারে সেই ভঙ্গ বঙ্গ জোড়া লাগাতেই বা কি বিশেষ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, তাহা ত তলাইয়া দেখিলে অতলস্পর্শ বলিয়াই মনে হয়। কোনও মহামূল্য রত্ন ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। রত্ন লাভ দূরের কথা, দুটা বাজে ঝিনুকও পাওয়া যায় না। তোমরা ভাঙা বাংলা জোড়া লাগাইতে বলিয়াছিলে, মহামহিমময় সম্রাটপ্রবর তাহা করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু হিসাব নিকাশ করিতে গিয়া লাভ লোকসানের অঙ্ক অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তোমরা হাসিয়া আটখান। এটা কি আত্মপ্রবঞ্চিত বঞ্চকের হাসি নহে?

দেড়শত বৎসরের অধিক কাল ধরিয়া যে জাতির নায়কদল বঞ্চনা-ব্যবসায়ে পরিপক্কতা লাভ করিয়া আত্মবলি ও স্বদেশের স্বার্থ-বলি দিয়া আসিতেছে, তোমরা তাহাদেরই উত্তরসাধক মাত্র। তোমাদের নিকট ইহার অধিক আর কিছু আশা করা নির্বোধের কাজ, সন্দেহ নাই। তাই বলি, এ অধম নায়কদল জাতিটাকে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে দিবে না। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ৩০ আশ্বিন যে মাতৃপূজার পুরোহিত সাজিয়া দেশনায়ক হইয়াছিল, সে কি কেবল বঙ্গভঙ্গ রদের জন্য? না, তাহার পশ্চাতে আর কিছু মহত্তর ব্রতানুষ্ঠানের আয়োজন ছিল? সে দিন কি তোমরা এ কথা বল নাই যে, আর পরের দ্বারস্থ হইবে না, কাঁদিতে হইলে, ঘরের লোকের গলা ধরিয়া কাঁদিবে? "ভাই ভাই ঠাঁই ঠাঁই" না থাকিয়া "ভাই ভাই এক ঠাঁই" হইবে? সে মহাব্রতের উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠান কি সম্পন্ন হইয়াছে?

সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ, বৈকুণ্ঠনাথ, অনাথবন্ধু, আনন্দচন্দ্র, অম্বিকাচরণ ও মতিলাল প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরিত এক রোকা জারি হওয়াতে বিগত ছয় বৎসর জাতীয় কল্যাণ স্মরণ জন্য "অরন্ধন ও রাখিবন্ধন" হইয়া আসিতেছিল। এবার কি এই সকল মহানুভব ব্যক্তির স্বাক্ষরিত কোন পরোয়ানা জারি হওয়াতে "অরন্ধন ও রাখিবন্ধনের" গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা হইল? ইহারা হুকুম জারি করিয়া জাতীয় ব্রতের সূচনা করিয়াছিলেন, ইহারাই কি আবার তাহা বন্ধ করিলেন? ঐ সকল মহাত্মা ব্যক্তি এ দেশের লোকের সরল বিশ্বাসজড়িত সংস্কারের উপর এই হুকুম জারি করিয়া আত্মমর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, আজ সেই সুপ্রবীণ সপ্তরথী মিলিত হইয়া চুপে চুপে সপ্তমবর্ষীয় শিশু জাতীয় জীবনের নিধনসাধনে অগ্রসর হইলেন, আজ এই শিশু জাতীয়জীবনের প্রাণ রক্ষায় একটি প্রাণীও অগ্রসর হইল না! বঙ্গসুভদ্রার বালক-অভিমন্যু, কলঙ্ক-কালিমামণ্ডিত কুরুপ্রবীণগণের

কুমন্ত্রণায় কালের ক্রোড় আশ্রয় করিল, আজ বাসুদেবশিষ্য অরবিন্দ ও বিপিনচন্দ্রও এই জাতীয় জীবনরূপ শিশুর নিধন সাধন স্বচক্ষে সন্দর্শন করিয়া নীরব ধ্যান ধারণায় ব্যস্ত! এই বেওয়ারিশ দেশে জাতীয়-জীবন-শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও প্রতিপালন জন্য অভিভাবকতা করিতে, নরম গরম বা মধ্য ও চরম পন্থীদলে কি না কলহ! এরা বলে আমরাই ঐ শিশুর মা বাপ, ওরা বলে, যেই মা বাপ হউক, ওটি আমাদের কলমের চারা। যতক্ষণ জিনিসটা ছিল, ততক্ষণ উভয়দলের যে কলহ কোলাহল উত্থিত হইয়াছিল, তাহার তীব্র জ্বালা দেশের লোক এখনও সহ্য করিতেছে, আর মাঝখান হইতে কেমন সহজে এ জাতীয় জীবনের চিত্র-পট হইতে ঐ মহামূল্য বস্তুটি — ঐ সাতরাজার ধন মাণিক চুরি হইয়া গেল, কেহই দেখিল না। কেহ রক্ষা করিল না, এই হইল বাঙালির ধাত্।

ভারতের অন্যান্য জাতি ও বিদেশীয়গণ বলেন "বাঙালি অত্যন্ত বুদ্ধিমান!" আর আমি কবির সঙ্গে একমত হইয়া বলি, এমন "অধম" ও নির্বোধ জাতি মর্তপৃষ্ঠে আর কোথাও নাই। এত বড় একটা কঠোর বাক্য বলিয়া নীরবে অন্য কথায় অগ্রসর হওয়া উচিত নহে, খুলে বলাই ভাল। অরন্ধন ও রাখি-বন্ধন এই দুটাই এদেশের বিশেষ অনুষ্ঠান। একটি প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন, আর একটা শ্রাবণের পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এ দুটিই জাতীয় পার্বণ। এ দুটিই পঞ্জিকাভুক্ত ধর্মানুষ্ঠান-জড়িত সামাজিক ক্রিয়া। দেশের বর্তমান নায়কদল ধর্মহিসাবে সম্পূর্ণরূপ দায়িত্বজ্ঞানবিহীন মানুষ। ইহারা যখন ৩০ আশ্বিন তারিখকে জাতীয় জীবনেব বিশেষ দিন বলিয়া ঘোষণা করেন, ইহারা যখন ঐ দিনটিকে বাঙালি জাতির পক্ষে পরম পবিত্র দিন বলিয়া দেশের লোককে শিক্ষা ও দীক্ষা দেন, এবং ঐ দিনটিকে বিশেষ দিন বলিয়া দেশের পঞ্জিকাভুক্ত করিতে উপদেশ ও আদেশ দেন, তখন তলাইয়া দেখিলেন না যে, হিন্দুর গার্হস্থ্যজীবন যাপনের পক্ষে পঞ্জিকা একটি প্রধান সম্বল। বার, তিথি, মাস, তারিখ ইত্যাদির শুভাশুভের সহিত হিন্দুজীবনের সংস্কার আজও দৃঢ়ভাবে জড়িত, পঞ্জিকা-সম্বল হিন্দুর সংস্কারে ৩০ আশ্বিনকে এক পবিত্র স্মরণীয় দিন বলিয়া স্থান দান করিয়া, পরে ১৩১৯ (১৯১২) সালের পঞ্জিকায় উহা থাকা সত্ত্বেও, জাতীয় অনুষ্ঠান হিসাবে, হিন্দু-সন্তান কখনই ইহা উঠাইয়া দিতে পারেন না। এরূপ কাজের অপকারিতার পরিমাণ, বোধ হয়, নেতাদের অনুধাবন করিবার শক্তিই নাই। তাহাদের হইল "বিয়ে ফুরাইলেই ছাতনাতলায় লাথি।" ধর্মাধর্ম ও তন্নিবন্ধন পঞ্জিকার সঙ্গে ইহাদের ত সম্বন্ধ নাই, ইহারা সবই করিতে পারেন। এটা জাতীয় সংস্কার হিসাবে ধর্মজ্ঞানবিহীন বর্বরানুষ্ঠান ভিন্ন আব কি বলিতে পারা যায়। যাহারা হটকারিতার অধীন না হইয়া, স্থিরভাবে বিষয় বিশেষের গুরুত্ব চিন্তা করে এবং সকল শুভাশুভ অনুষ্ঠানের অগ্রপশ্চাত ফলাফল চিন্তা করিয়া কাজে হাত দেয়, তাহারা কখনই এরূপ গর্হিত কাজের প্রশ্রয়দাতা হইতে পারে না। যাহারা পারে, সেই শ্রেণির লোকের ইহপরকাল জ্ঞান সমান, ইহারা না করিতে পারে, এমন কাজ নাই। আত্ম প্রয়োজনে ইহারা দেশ ও দেশের স্বার্থ অকুণ্ঠিত চিত্তে বিসর্জন দিতে পাবে। সে ত বেশি দিনের কথা নহে, কতকগুলি অল্পবয়স্ক যুবক তোমাদেরই উপদেশের ফলে বিপথগামী হইয়া বুদ্ধির দোষে জীবন দান করিয়াছে, অপর কতকগুলি বাজাদেশে নির্বাসিত, আর তোমরা দেশের পরিচালকদল নিবাপদে ও নির্বিবাদে আনন্দ-কোলাহলে প্রমত্ত। দেশে কি এমন মানুষ নাই যে, যাহারা তোমাদের এই তামসিক রঙ্গবসের পশ্চাতে দারুণ মর্মবেদনা অনুভব করিতেছে? তোমরা আজ কোন্ প্রাণে জাতীয় জীবনতরণীখানি বাত্যাবিতাড়িত সমুদ্র-বক্ষে ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে? টাইটানিকের নাবিক ত পলায়ন কবে নাই! সে ব্যক্তি ইংরাজ কি না, তাই জাহাজ লইয়া জলমগ্ন হইল! আর তোমরা স্থাণুবত হইয়া এই জাতীয় জীবনের সর্বনাশ সাধনের প্রশ্রয়দাতা হইলে, এই কি স্বদেশ-সেবা! জানি না, তবে মনে হয়, হয়ত আজ কাব্য বিশারদ থাকিলে এত সহজে এক কথায "অরন্ধন ও রাখিবন্ধন" উঠিয়া যাইত না, পঞ্জিকা-বিভ্রাটও ঘটিত না।

"পরমুখাপেক্ষী হইবে না" বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া সমগ্র দেশ ত মাতাইয়া তুলিলে, তোমাদের উপদেশে সমস্ত বাঙালি জাতি আনন্দে আটখানা হইয়া স্বদেশি আন্দোলনকে আদরে বরণ করিয়া লইয়াছিল, পরাধীন জাতির পক্ষে যাহা অসম্ভব, তাহাও সম্ভব করিতে চাহিয়াছিল, সেই প্রতিজ্ঞার শক্তি এতটাই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে,তোমরা স্বদেশির আসর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেও বাঙালির ঘরে এখনও এমন নিষ্ঠাবান লোক অনেক আছেন, যাহারা স্বদেশি ভিন্ন বিদেশি ব্যবহার করেন না। সেই সকল মহানুভব ব্যক্তির পক্ষে তোমরা পতিত। প্রতিজ্ঞাভঙ্গ-পাপে তোমরা আপনাদিগকে ও দেশকে রসাতলে ডুবাইয়াছ বলিয়া তাহারা মর্মাহত। তাহাদের দৃষ্টিতে ৩০ আশ্বিন অতি পবিত্র দিন। জাতীয় জীবনের "হাতে খড়ির" দিন। ঐ হাতে খড়ির গুরু মহাশয়গণ এখন পলাতক, প্রাণভয়ে আত্মরক্ষাব জন্য ব্যস্ত। আজ আর "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়" কেহ গান করে না, আজ আর "আমার মা সোনার বাংলা" কেহ বলে না। এখন আর "বিজয়ার বায়না" "Lucky day"-এর কথা কেহ স্বপ্নেও দেখে না ; আর টুশব্দটি নাই, সব চুপচাপ। তাই কবি বলিয়াছিলেন "তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে।"

১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ হইতে ১৭৮৩ পর্যন্ত দীর্ঘ আট বৎসর কাল নানা বিঘ্ন বিপত্তি ও লোক ক্ষয়ের পর পরাজিত ইংলণ্ড আমেরিকার যুক্তরাজ্যের স্বাধীনতা স্বীকার করিয়া আত্মমর্যাদা রক্ষায় ব্যস্ত হন। সে ঘটনাও আজ প্রায় ১৩০ বৎসর হইতে চলিল। এই সুদীর্ঘকাল ধরিয়া যুক্তরাজ্যের লোকমণ্ডলী কেন স্বাধীনতার স্মৃতি রক্ষা করিয়া আসিতেছেন? বাঙালির জাতীয় আন্দোলনের ফলেই যদি ভারতসম্রাট তদীয় মন্ত্রীবর্গের পরামর্শে ভাঙা বাংলা জোড়া দিয়া তদীয় ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জেব অশ্রুজল মোচন কবিয়া থাকেন, তাহা হইলেও ত রাজরাজেশ্বর ভারত-সম্রাটেব প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ও তদীয় মন্ত্রণা-দাতাদের প্রতি হৃদয়ের সদ্ভাব জ্ঞাপন জন্যও ৩০ আশ্বিন চিরনির্ধাবিত পবিত্র দিন বলিয়া গণ্য কবা বাঙালির পরম ধর্ম বলিয়া পবিগণিত হওয়া উচিত ছিল। তাহাই বা কেন হইল না? যাহাবা রোকা জারি করিয়া দেশের লোককে কার্যবিশেষে প্রবৃত্ত করিতে পটু, যাহারা পুষ্প মুকুটে (floral crown) পরিশোভিত হইয়া দেশের ও দশেব পূজা গ্রহণে ব্যস্ত, তাহার কি এ সকল গুরুতর প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহেন? ৩০ আশ্বিন রদ করে কে? বদ যেই করুক. ইহার জন্য দায়ী বঙ্গের সপ্তরথী,—যাহারা কার্যোদ্ধারেব সময়ে রোকা জাবি কবিতে অগ্রসব, তাহারাই এই অধর্মাচরণের জন্য দায়ী। আমরা জানিতে চাই, তাহাদের এরূপ চুপে চুপে এই জাতীয় অনুষ্ঠানটি লোপ করিবার কি অধিকার ছিল? এখন দেশের লোকের নিকট এই বিনীত প্রার্থনা, তাহারা স্বদেশের ও স্বজাতির হিতের জন্য হয়, এইরূপ দায়িত্ব-জ্ঞান-হীন প্রধানগণের প্রাধান্য অস্বীকার করুন, আর না হয়, এই সকল দিকপালগণের এই গুরু পাপের প্রায়শ্চিত্তের সুব্যবস্থা করুন। তবেই বুঝিব যে, এ জাতির জাতীয় কল্যাণের সহজ পথ এখনও মুক্ত আছে, নতুবা বুঝিতে হইবে যে, দেশের দশজন যেমন কর্তব্য ও দায়িত্বজ্ঞানবিহীন, আপামর-সাধারণ জনমণ্ডলীও তদ্রূপ আত্মোন্নতি-বিমুখ। আশা করি, দেশের লোক এ বিষয়ে স্পষ্ট কথা বলিয়া নায়ক-দলের দিব্যজ্ঞানেব উদয় করিয়া দিতে বিলম্ব করিবেন না।

'নব্যভারত', ১৩১৯ অগ্রহায়ণ

বঙ্গভঙ্গ



স্বদেশি গ্রহণ ● বিদেশি বর্জন

দেশি জিনিস ব্যবহার

"Those who were responsible for the boycotting resolution have doubtless been fired by the example of the Chinese and they are optimistic enough to assume that a boycott of European goods in Bengal could be made as damaging and as effective as the Chinese boycott of American goods has to all appearances been. the assumption will cause a smile on the European side for more reasons than one."

The Statesman

.... While in the opposite event (i.e. in case of failure) it will render the movement and its supporters absurd,

The Englishman

"বিদেশীয় দ্রব্য আর ব্যবহার করিব না" বাঙালি কলিকাতার টাউন হলের বিরাট সভায়, গ্রামে গ্রামে, নগরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সঙ্কল্প খুব ভাল, কিন্তু সঙ্কল্প রক্ষা করিবার বিধিমত উপায় করিতে হইবে, নচেৎ সমগ্র বাঙালি জাতিকে জগতের সম্মুখে হেয় হইতে হইবে। কেবল তাহাই নহে। দেশীয় শিল্পের উন্নতি দ্বারা দেশের ধন দেশে রক্ষা ও দেশের ধন বৃদ্ধির একটি প্রধান উপায় কার্যে পরিণত হইবে না। পদদলিত, পরাধীন বাঙালির যে কিঞ্চিৎও মনুষ্যত্ব আছে তাহা দেখাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। এ সময় যদি আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ পায়, তবে আমরা কখনও মাথা তুলিতে পারিব না। আমরা ধমক দিয়াছি, সে ধমক কার্যে পরিণত করিতে হইবে। মুখে বলিয়াছি, এখন কাজে করিয়া দেখাইতে হইবে। ভারতের সমগ্র ইংরাজসমাজ কুঞ্চিত অধরে, অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া আমাদের পরাজয় দেখিবার জন্য ব্যগ্র, সমস্ত ভারতবাসী আমাদের কার্যকলাপের প্রতি উৎসুক নেত্রে চাহিয়া আছে, এ সময় ঘরের কোণে ফিরিয়া আসিয়া প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া মুখ লুকাইলে চলিবে না। কিন্তু ইংরাজেরা যেন মনে না করেন যে আমাদের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইলে উহা কেবল আমাদেরই কলঙ্কের কারণ হইবে। উহাতে ইংরাজ-শাসনের অনিষ্টকারিতা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। লোকে দেখিবে, যে দেশ পূর্বে অন্যান্য দেশকে বস্ত্রাদি যোগাইত, ইংরাজ শাসনের গুণে এক্ষণে তাহা নিজের লজ্জা রক্ষায়ও অসমর্থ। আমরা আমাদের কর্তব্য বুঝিতে পারিয়াছি; কিন্তু ইষ্টসিদ্ধির উপায় স্থির করিতে সকলকেই চেষ্টান্বিত দেখিতে চাই। কোন আমদানিকারক কিম্বা কোন চেম্বার অব্ কমার্সকে বলিলে চলিবে না, "তোমাদের পায়ে পড়ি তোমরা বিলাতি বস্ত্র আমদানি করিও না, পাছে আমরা সস্তা ও সুবিধার লোভ সামলাইতে না পারিয়া কিনিয়া পরিয়া ফেলি। আমরা প্রতিজ্ঞা করিলাম, তোমরা ম্যাঞ্চেষ্টারকে জব্দ কর।" তাহারা আমাদের জন্য কেন ক্ষতি সহিবে? তাহারা দেশীয় দ্রব্যাদিতে টাকা আবদ্ধ করুক, আর আপনারা যদি না কিনিলেন? আপনাদের যদি এই মনের অবস্থা সে পর্যন্ত না রহিল? কাহারও নিকট ভিক্ষা করিয়া কি লাভ? যাহার ইচ্ছা যত বিলাতি মাল আমদানি করুক না কেন, আমাদের না কিনিলেই হইল, না পরিলেই হইল। মাল তোমার বস্তাপচা হউক, তোমার সুবিধা, অসুবিধা তুমি তখন বুঝিয়া লইবে। আর কাহারও মুখাপেক্ষী হইলে চলিবে না, নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে শিখিতে হইবে, নিজের উদ্ধারের উপায় নিজে করিয়া লইতে হইবে।

কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদির সমধিক প্রচলন হইতে পারে। এই প্রবন্ধে তদ্বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব করিব। এ বিষয়ে যদি ব্যবসায়ী ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এসময়ে নিজেদের মতামত প্রকাশ করেন তাহা হইলে আমরা শীঘ্রই একটা সুসাধ্য কার্যপ্রণালী স্থির করিতে পারিব। গ্রামে গ্রামে লোকেদের স্বদেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিবার জন্য প্রতিনিধি পাঠাইলেই চলিবে

না; কি প্রকারে প্রত্যেক গ্রামে দেশীয় দ্রব্যাদি সহজে পাওয়া যাইতে পারে, তাহার উপায় প্রথমে করিতে হইবে। লোকের দ্বারে দ্বারে দেশীয় দ্রব্যাদি পঁহুছাইয়া দাও, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ না হইলেও তাহারা উহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিবে। দেশীয় দ্রব্যাদি সহজে না পাইলে কেবল অঙ্গীকার করিয়াই বা কি ফল?

আমরা নয় দশ বৎসর ধরিয়া কেবল মাত্র দেশি জিনিসের (প্রধানতঃ দেশি কাপড়ের) ব্যবসা করিয়া এই কার্যের নানা অসুবিধা বুঝিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতেছি।

আমরা সচরাচর যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি, তাহা মোটামুটি তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যাইতে পারে।

১ম, সখের দ্রব্য, গন্ধ দ্রব্য, সিগারেট ইত্যাদি।

২য়, যাহা একান্ত আবশক নহে; যথা—কাচের বাসনকোসন, ল্যাম্প ইত্যাদি।

৩য়, যাহা অতি আবশ্যকীয়, না হইলে চলে না। যথা—বস্ত্রাদি, তৈজসপত্রাদি, চিনি, লবণ ইত্যাদি। সখের দ্রব্যাদি আমাদিগকে একেবারে বর্জন করিতে হইবে।

দ্বিতীয় শ্রেণির দ্রব্যাদি যাহা দেশীয় পাওয়া যায়, তাহা ব্যবহার করিতে হইবে, ও যাহা না পাওয়া যায় তাহা যতদূর সম্ভব ব্যবহার না করিব। যদি ব্যবহার করিতে হয়, তবে এশিয়ায় (যেমন জাপানে) প্রস্তুত, অভাবে ইউরোপের জিনিস ব্যবহার করিব।

তৃতীয় শ্রেণির কোন দ্রব্য বিদেশীয় কোন কারণেই কখনও ব্যবহার করিব না।

অনেকে বলিতেছেন ম্যানচেষ্টারকে জব্দ করিতে হইবে। তবে কি জার্মেন ও আমেরিকান বস্ত্রাদি পরিধান করিতে হইবে? যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রহিত হয়, তাহা হইলে কি আমরা আর দেশীয় বস্ত্র ব্যবহার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিব না? ম্যাঞ্চেষ্টারের অন্ন হয়ত মারিলেন, কিন্তু তাহাতে আমাদের দেশের কি উপকার হইল? ইংরাজের গ্রাস জার্মেন কিংবা আমেরিকানে কাড়িয়া লইল, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই রহিলাম। মনে রাখিতে হইবে যে দেশের দুর্দশা ঘোচাইতে হইবে। ভারতের দ্রব্যাদি ব্যবহার করা ভারতের উন্নতির এক প্রকৃষ্ট উপায়। ভারত একটা মহাদেশ, ভারত নিজের সকল প্রধান অভাবই পূরণ করিতে পারে। দেশের অভাব পূরণ করিতে পারিলেই ভারতের বহির্বাণিজ্যেরও দরকার হয় না। আর স্মরণ রাখিতে হইবে যে, ম্যাঞ্চেষ্টার বিদেশিয়ের তুল্যার্থক নহে—যাহা স্বদেশীয় নহে তাহাই বিদেশীয়; এদেশের ইংরাজ চালিত মিলও স্বদেশীয় মিল। যাহা বিদেশীয় তাহাই বর্জন করিতে হইবে।

অনেকে বলেন, একেবারে সকল বিদেশি জিনিস ত্যাগ করা ত সম্ভব নয়, বোম্বাইয়ের কলের কাপড়ও ত বিলাতি যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত, তবে আর এরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া কি লাভ? আমরা বলি যত বিদেশি জিনিস ত্যাগ করা যায়, ও দেশি জিনিস ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। একেবারে নীরোগ হওয়া যায় না বলিয়া কি আত্মহত্যা করিতে হইবে? সকলেই এম. এ. পাশ করিতে পারে না, বলিয়া কি ক, খ, গও শিখিতে হইবে না? পাছে কখন একটা মিথ্যা কথা মুখ হইতে বাহির হইয়া যায়, সেই ভয়ে কি কখন সত্য কথা বলিবার চেষ্টাও করিতে হইবে না?

এখন দেখিতে হইবে দেশীয় কি কি জিনিস পাওয়া যায়। কয়েকটির মাত্র উল্লেখ করিতেছি।

১ম, যদি সৌখীন দ্রব্য ব্যবহার করিতেই হয়, তবে আমাদের দেশীয় আতরের মত কি আর সুগন্ধ দ্রব্য আছে? ইংরাজের অনুকরণ ছাড়ুন, দেশীয় জিনিস ব্যবহারে গৌরব আছে। আমরা তামাক খাওয়ার বিরোধী, কিন্তু যদি খাইবেনই, তাহা হইলে দেশীয় তামাকই ভাল। দেশীয় তামাক পূর্বেকার বহু উচ্চপদস্থ এদেশবাসি ইংরাজও ব্যবহার করিতেন। ডাক্তারদের মতে দেশীয় উপায়ে প্রস্তুত তামাক অন্য সকল প্রকার তামাক অপেক্ষা কম হানিকর। মান্দ্রাজের সিগার ও সিগারেট বিলাতের আদরের সামগ্রী আর আমরা ইংরাজি ও আমেরিকান সিগারেট বিষে শরীর ও অর্থ দুইই নষ্ট করিতেছি। বেঙ্গল ও নর্থওয়েস্ট কোম্পানির সাবান বিদেশি সাবান অপেক্ষা হীন নহে।

২য়, যাহা একান্ত আবশ্যক নহে। দেশে আপাততঃ ছাতা প্রস্তুত হয় না, "ফিট" হয়, উহার ব্যবহার করুন। ভাল ছাতার দরকার হইলে জাপানি ব্যবহার করুন। যদি দেশীয় দেশলাই না পাওয়া যায় জাপানি দেশলাই ব্যবহার করুন। বর্মাতে প্রায় চেষ্টারের মত কেরোসিন তৈল প্রস্তুত হইতেছে। কাটতি হইলে আরও উৎকৃষ্ট হইবে। জাপানি ল্যাম্ব ব্যবহার করুন। উৎসাহ পাইলে আমাদের দেশীয় কারিকরেরা সুন্দর টেকসই পিতলের কেরোসিন ল্যাম্প প্রস্তুত করিতে পারে। দেশে সুন্দর ছুরি কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। কাচের বাসন যতটা সম্ভব ব্যবহার না করিলেই হইল। কেহ মনে না করেন যে বিদেশীয় দ্রব্যাদির খরস্রোত একবার বঙ্গদেশে সভা সমিতি করিতে পারিলেই সম্পূর্ণরূপে রোধ হইয়া যাইবে। না—ইহা সময়সাপেক্ষ। তবে যদি আমরা উপায় স্থির করিয়া দৃঢ়তার সহিত ধীর ভাবে আমাদের কর্তব্যের পথে অগ্রসর হই তবে কালে কৃতকার্য হইব।

এখন যে ধনের স্রোত বিদেশের অভিমুখে অবিরাম প্রবাহিত হইতেছে, অল্পে অল্পে বহু বৎসর ধরিয়া সেই স্রোতের মুখে বাঁধ বাঁধিতে পারিলে ভারতের শিল্প বাণিজ্যক্ষেত্র উর্বরা হইয়া উঠিবে। কেবল হৈ চৈ করিলে চলিবে না।

৩য়, (ক) বস্ত্রাদি—আমাদের দেশে ধুতি, শার্ট, জামা, কোট, চাপকান, জ্যাকেট, সেমিজের কাপড়, বিছানার চাদর, উড়ানি, মোজা, গেঞ্জি,তোয়ালে, শীতবস্ত্রাদি সকলই এদেশের কলে প্রস্তুত হইতেছে। তবে এগুলি সকল স্থলে বিদেশির মত তত সূক্ষ্ম কিম্বা বিচিত্র বর্ণের নয়। কিন্তু যাহারা একটুও ফ্যাশান বা আরাম ত্যাগ করিতে পারেন না, স্বদেশের কথা তাদের মুখে না আনাই ভাল। তাদের বাঁচিয়া থাকায় কি ফল?

(খ) জুতা—বোম্বাই ও কানপুরের কলে, হস্তনির্মিত বিস্তর জুতা পাওয়া যায়। অনেক উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারি এদেশি মুচিদের নির্মিত জুতা ছাড়া অন্য কোন জুতা ব্যবহার করেন না। কিন্তু বাঙালি বাবুদের ডসন ও নর্ম্যান্ না হইলে পদদ্বয় সুশোভিত হয় না।

(গ) তৈজস পত্রাদি—এ বিষয়ে বাঙালির মত হীন জাতি আর ভারতে নাই। ভারতের কোন প্রদেশে এনামেলের বাসন ব্যবহার হয় না। কিন্তু বাঙালির গৃহে গৃহে উহা বিরাজ করিতেছে। অধিক দুঃখের বিষয় এই যে বাঙালির পিত্তল কাঁসার মত সুন্দর বাসন-কোসন আর ভারতে কুত্রাপি হয় না। এরূপ সুন্দর ও স্থায়ী তৈজসপত্রাদি ছাড়িয়া আমরা বিদেশীয় ঘৃণিত জঞ্জাল ব্যবহার করিতেছি। অবশ্য এনামেল প্রথমে সস্তা বোধ হয়, কিন্তু একপ্রস্ত পিত্তল-কাঁসার বাসন পুরাতন হইলে অর্ধেক দরে বিক্রয় হয়। এনামেলের সকলই নষ্ট। এনামেল একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে। আবার পিত্তল-কাঁসা ব্যবহার করিতে হইবে।

(ঘ) লবণ—বঙ্গে দেশীয় লবণ কেন ব্যবহার হয় না? উহা অপেক্ষা কি বিদেশীয় দরে এত সস্তা? তাছাড়া, হিন্দুস্থানী হিন্দুরা ত বিলাতি লবণ ব্যবহার করেন না, সৈন্ধব বা করকচ ব্যবহার করেন। আমরা প্রবাসী বাঙালিরাও তাহাই ব্যবহার করি। বঙ্গের লোকেরা কেন তাহা করিতে পারেন না?

(ঙ) চিনি—বিলাতি চিনি ব্যবহার করিতে আরম্ভ করা অবধি আমাদের দেশীয় চিনির কারবার লোপ পাইয়াছে। কাশীপুর, মজঃফরপুর, বক্সার ইত্যাদির এখনও বিস্তর চিনি পাওয়া যায়। আমরা বিলাতি ছাড়িয়া উহা কেন ব্যবহার করি না? যুক্ত প্রদেশে উচ্চ শ্রেণির হিন্দুরা বিলাতি চিনি ব্যবহার করেন না, যে সকল ময়রার দোকানে উহা ব্যবহার হয় সেখান হইতে কখনই মিঠাই ক্রয় করেন না। আমরা কি এতটাও পারি না?

(চ) সর্বপ্রধান বিদেশীয় দ্রব্য যাহা আমরা অনায়াসে পরিহার করিতে পারি ও একবার যাহা বর্জন করিতে পারিলে স্বদেশের প্রভূত উপকার হয়, তাহা পরিধেয় বস্ত্রাদি। কিন্তু দেশের প্রস্তুত বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি একস্থানে সুবিধামত, দরকার মত, পছন্দমত পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। কেহ যেন মনে না করেন একবার বিদেশীয় পরিহার করিলেই স্বদেশীয় দ্রব্যাদি নিজেই আমাদের দ্বারে

বিলাতির মত আসিয়া উপস্থিত হইবে। বিলাতি প্রচার করিতেও ভারতের দূরবর্তী নিভৃত কোণ পর্যন্ত পঁহুছাইতে ইংরাজকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছে, রেলের ও পথের জন্য কত কোটি টাকা ব্যয় করিতে হইয়াছে। ১৮৬০/৭০ সালের মাঝামাঝি আমাদের গবর্নমেন্ট ভারতের ৬ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া কেবল সমগ্র দেশের পরিধেয় বস্ত্রাদির নমুনা সংগ্রহ করিয়া বিলাতের চেম্বার অব্ কমার্সগুলার ব্যবহারের জন্য পাঠান। আমাদের স্বদেশি দ্রব্যাদি পাইতে ও সকল স্থানে সরবরাহ করিতে বিস্তর পরিশ্রম করিতে হইবে। অতএব সুবন্দোবস্তের বিশেষ দরকার। যে পর্যন্ত সংগ্রহের কোন উপায় না হইবে, সে পর্যন্ত দেশীয় বস্তুর প্রচার উত্তমরূপে হইতে পারিবে না; আমাদের প্রতিজ্ঞা কার্যে পরিণত করা সুকঠিন হইবে। কি উপায়ে দেশীয় দ্রব্যাদি এক কেন্দ্রীয় স্থানে সংগ্রহ করিয়া বঙ্গের গ্রামে গ্রামে ও নগরে নগরে যোগান যাইতে পারে তাহাই সর্বপ্রথমে স্থির করিতে হইবে। বর্তমান দেশীয় দোকানের মধ্যে প্রধান ইণ্ডিয়ান স্টোরস্ খুচরা বিক্রয়ের প্রতি অধিক মনোযোগী। কলিকাতায় এরূপ বিশ ত্রিশ খানা দোকানের দরকার। আর যে দুই একখানা ব্যক্তিবিশেষের দোকান আছে, তাহাদের মূলধন অধিক নহে; তাহারা এ বৃহৎ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে পারে না।

মাড়বারি কিম্বা অন্য কেহ যাহারা বিলাতি দ্রব্য আমদানি করে, তাহারা একাজে সহজে অগ্রসর হইতে সাহসী হইবে না। ইহাতে আপাততঃ বিস্তর ঝঞ্ঝাট, অনেক জঙ্গল কাটিয়া পথ পরিষ্কার করিতে হইবে। ইহা ব্যক্তিবিশেষের কর্ম নহে—তাহারা প্রথমেই এরূপ (risk) ঝুঁকি লইতে সাহসী হইবে না। যৌথ কারবারই ইহার পথপ্রদর্শক হইতে পারে। পরে দেখাদেখি অনেকেই পথানুসরণ করিবে। অনেকের ধারণা আমাদের দেশের বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানের মিলে সকল প্রকার ব্যবহারযোগ্য বস্ত্রাদি সর্বদা প্রস্তুত থাকে—বাস্তবিক তাহা নহে। আমাদের দরকার মত দ্রব্য ফরমাইস দিয়া প্রস্তুত করাইতে হইবে। ইহাতে বিস্তর টাকার প্রয়োজন অতএব সমগ্র বঙ্গদেশে দ্রব্যাদি সরবরাহ করিবার জন্য কলিকাতায় একটা বৃহৎ পাইকারি ভাণ্ডার (Central Stores) খুলিতে হইবে। আমাদের স্টোরসকে Limited Liability Co. করিতে হইবে, ও উহার মূলধন ১৫/২০ লক্ষ টাকার কম হওয়া উচিত নহে। কারণ উহা বঙ্গের গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে ক্ষুদ্র দোকানগুলিতে মাল জোগাইবে। এ সামান্য মূলধন বাঙালির পক্ষে তোলা কঠিন নহে। ১০্ টাকা করিয়া শেয়ার করিলে সমগ্র বঙ্গে কি ২লক্ষ বাঙালি নাই যাহারা দেশের জন্য ১০্ টাকা দিতে পারে? আমি বলিতে চাই না যে, এই একটা দোকান, সামান্য মূল ধন লইয়া সমস্ত দেশের স্বদেশি বস্ত্রাদির অভাব পূর্ণ করিবে। একটা পথ প্রদর্শকের অত্যন্ত আবশ্যক। পরে হয়ত এ প্রকার ৫০ খানা দোকান খুলিলেও যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু এরূপ একটা কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার না খুলিলে স্বদেশি ব্যাপার বেশি দূর অগ্রসর হইবে না। যাহারা আমাদের মত স্বদেশি দ্রব্যাদির ব্যবসায়ে লিপ্ত তাহারাই জানেন। স্বদেশি বস্ত্রাদি পাওয়া কত দুরূহ ব্যাপার।

আমাদের প্রস্তাবিত স্টোরস্ ফরমাইস দিয়া বোম্বাই, আহম্মদাবাদ, মান্দ্রাজ, বাঙালোর, কানপুর, ধারিওয়াল ইত্যাদি মিল হইতে পছন্দসই বাঙালির দরকার মত বস্ত্রাদি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি যাহা ভারতে সহজে সস্তায় প্রাপ্য হইতে পারে, তৈয়ার করাইয়া সর্বদা বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিবে। এরূপ ব্যবসায়ে লোকসান হইবার সম্ভাবনা নাই (কারণ ইহা ঝুঁকিদার ব্যবসা নহে—কিন্তু কোন ব্যক্তিবিশেষ এরূপ ব্যবসায়ে প্রথম প্রথম এত টাকা খাটাইতে অগ্রসর হইবে না।) বিশ্বস্ততা ও সামান্য বিষয় বুদ্ধির পরিচালনা করিলেই যথেষ্ট হইবে। বঙ্গে যেরূপ বস্ত্রাদির বিশেষ কাটতি ও ব্যবহার তাহার একটা নমুনা সংগ্রহ করিতে হইবে ও নমুনা দেখাইয়া মিলের দ্বারা বস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইতে হইবে। মিলের সহিত দর দস্তুর করিয়া সর্বদা সুলভ মূল্যে দ্রব্যাদি প্রস্তুত করাইবার জন্য সচেষ্ট থাকিতে হইবে।

বাংলা দেশে কাটা কাপড় বিস্তর বিক্রয় হয়; পাইকারি কাটা কাপড়ের একটা শাখা খুলিতে

হইবে। কারণ কাটা কাপড়ে সহজে বিলাতি দেশি ভেদ করা কঠিন, ইহাতে ধর্মাধর্মজ্ঞানশূন্য অনেক দোকানদারেরা খরিদ্দারকে ঠকাইবে। স্টোরসের মাল বস্তাবন্দি করিয়া মফঃস্বলে রওয়ানা করিবার জন্য একটা বিভাগ উত্তমরূপে সজ্জিত (equip) করিয়া রাখিতে হইবে। কারণ মফঃস্বলের অর্ডার সরবরাহ করাই ইহার প্রধান কার্য হইবে। জিনিস অল্প লাভে একদরে, নগদ দামে বিক্রয় করিতে হইবে। খরচ যথাসম্ভব কম করিতে হইবে। কারণ এরূপ দোকানের বাহ্য চাকচিক্যের আবশ্যকতা নাই। এক কথায় ইহা কলিকাতায় একটা বড় আমদানির হৌসের মত হইবে।

এখন দেখা যাক্ মফঃস্বলে প্রচার কার্য কিরূপে করিতে হইবে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ক্ষুদ্র, বৃহৎ স্বদেশি দোকান খুলিতে হইবে। প্রত্যেক দোকানের মূলধন ১০/১২ জন শিক্ষিত উৎসাহী ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে সংগ্রহ করিবেন। স্থানবিশেষে আপাততঃ ২০০/১০০০ টাকা হইলে চলিবে। ঢাকা ইত্যাদির মত বড় স্থানে ১০/১৫ হাজার দরকার হইতে পারে। ক্ষুদ্র দোকানগুলা অংশীদারেরা নিজেই চালাইতে চেষ্টা করিবেন। প্রথমে চাকর রাখিবার আবশ্যকতা নাই। দোকান কোন অংশীদারের বহির্বাটিতে স্থাপন করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যার সময়ে খুলিলে চলিবে। আমরা প্রথমে এরূপ করিয়াছিলাম, ক্রমশঃ অভিজ্ঞতা ও দরকার মত মূলধন বৃদ্ধি করা হইতে পারে।

কলিকাতার কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার হইতে নগদ দামে মাল কিনিতে হইবে ও নিজেদের মধ্যে নগদ টাকায় বিক্রয় করিতে হইবে। ধারে বিক্রয় করিলে কম মূলধনে চালান কষ্টকর হইবে। সকল কার্য ব্যবসার নিয়মে করিতে হইবে, লোকসান হওয়া উচিত নয়। শাখা দোকান রেল, স্টিমার, খরচ বাদে/০ বা ১০ টাকায় লাভ রাখিয়া বিক্রয় করিতে পারেন। এরূপে কার্য আরম্ভ করিলে কখন অকৃতকার্য হইতে হইবে না। কোন বিষয়ে পবামর্শ দরকার হইলে কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার পরামর্শ দিবেন।

অনেকে বলিবেন, স্থানীয় বর্তমান দোকানগুলার দ্বারা কি এই কার্য হইতে পারে না? এ কার্যে সফলতা লাভ করিবার জন্য প্রথমত কতকটা স্বদেশি ভাবের (Sentiment) আবশ্যক। যে উৎসাহী শিক্ষিত যুবকেরা দোকান খুলিবেন তাহারা নিজেরা দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিবেন ও আর সকলকে লওয়াইবেন। তাহাদের কথায় ও কার্যের দৃষ্টান্তে অত্যধিক ফল হইবে। এরূপ মহৎ কার্য অশিক্ষিত লোকের হস্তে দিলে চলিবে না। বিদেশীয় দ্রব্যে অধিক লাভ। যাহারা বিদেশি দ্রব্য বিক্রয় করে তাহরা দেশীয় দ্রব্যাদির ব্যবহার বিস্তার করিতে কখনও উৎসাহী হইবে না। তবে কালে যদি দেশীয় দ্রব্যাদির কাটতি অধিক হয় তখন তাহারা পথানুসরণ করিবে। কিন্তু প্রথম পথপ্রদর্শক শিক্ষিত লোককে হইতে হইবে। উপরি উক্ত উপায়ে স্বদেশি ব্যাপার অতি শীঘ্র দেশের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িবে। এ বিষয়ে (regular organised effort) নিয়মিত সুব্যবস্থিত, চেষ্টা হওয়া উচিত, (disconnected, spasmodic attempts) পরস্পরের সহিত সম্পর্কবিহীন, অব্যবস্থিত খামখেয়ালি চেষ্টা হইলে সফলতা লাভ হইবে না। স্বদেশি ব্যাপারের নেতাদের এ বিষয়ে অগ্রসর হওয়া উচিত। তাহারা কলিকাতায় একটা সমিতি গঠন করিয়া একটা কেন্দ্রীয় ভাণ্ডার খুলিবার বন্দোবস্ত করুন ও মফঃস্বলে স্থানীয় উৎসাহী ব্যক্তিদের দ্বারা অন্যান্য দোকান স্থাপিত করিবার চেষ্টা করুন।

দোকান খোলা হইলেই হইবে না। আরও কিছু চাই। দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইতে হইবে যে, যত অসুবিধা ভোগ করিতে হউক না কেন, তবুও এক গিরাও বিদেশীয় বস্ত্র কিম্বা অন্য দ্রব্যাদি, যাহা দেশে প্রস্তুত না হয় ব্যবহার করিব না। এজন্য স্বার্থত্যাগের আবশ্যকতা, কিন্তু এ স্বার্থত্যাগ বিশেষ কঠিন কিম্বা কষ্টকর নহে। কেবল একটু দৃঢ়সঙ্কল্প হইতে হইবে। আর সাহেবদের দোকানে জুতা জামার জন্য দৌড়াইব না, দেশি খসখসে মোটা বস্ত্র ও দেশীয় চামড়ার কঠিন জুতা পরিধান করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত সম্মানিত মনে করিব। কারণ উহাই আমাদের দেশের, যে বিলাতি পরিবে সেই হীন, সেই নিচ। দেখিবে দেশেরও কার্য হইবে, অনেক টাকাও বাঁচিবে।

আমরা ত মোটা খসখসে পরিলাম, কিন্তু অনেকে বলিবেন আমাদের গৃহলক্ষ্মীরা বিস্তর ওজর আপত্তি করিবেন; তাহাদের বিলাতি সিল্কের বডিস্ ও নয়ন সুখের সেমিজ না হইলে প্রলয় উপস্থিত হইবে। কিন্তু যাহারা ব্রত করিয়া কত সুন্দর, সুখাদ্য বস্তু চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করিতে পারেন, তাহারা কি একটা সামান্য বিদেশি বস্ত্রের মায়া ছাড়িতে পারিবেন না? ইহা কখনও বিশ্বাস করিতে পারি না। যখন আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নরনারীসমূহ একমত হইয়া ইংরাজের দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সে সময় আমাদের দেশের মতও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যাদি তথায় প্রস্তুত হইত না। অতি মোটা রুক্ষ বস্ত্রাদি ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যাইত না। কিন্তু আমেরিকান মহিলাদের স্বদেশ প্রেম এত দৃঢ় ছিল যে তাহারা কম্বলের মত মোটা বস্ত্রাদি কোমল অঙ্গে পরিয়া নিজেকে গৌরবমণ্ডিত মনে করিয়াছিলেন।

কিছুকাল পূর্বে আমাদের রাজ্ঞী ও ডচেস অব ডেভনসায়ার প্রমুখ কতকগুলি সম্ভ্রান্তবংশীয়া মহিলা দেখিলেন যে ইংলণ্ডে ফ্রান্স ও ইটালি হইতে বহু কোটি টাকার রেশমি বস্ত্র আমদানি হয়। ইংলণ্ডের জলবায়ু রেশমের বস্ত্র বয়ন ও রঞ্জনের পক্ষে একান্ত অনুপযোগী। তথাপি তাহারা সমস্ত ইংলণ্ডে সভাসমিতি করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে মোটাই হউক আর চিকণই হউক ইংলণ্ডে প্রস্তুত রেশম ব্যতীত অন্য রেশম পরিধান করিবেন না। তাহার ফলে এ সময়ে ইংলণ্ডে ৪ কোটি টাকার অধিক রেশম প্রস্তুত হইতেছে।

এখনই মিল খুলিয়া কাপড় পরিব এ আশা করাই বৃথা। একটা মিল প্রস্তুত হইতে অন্ততঃ দুই তিন বৎসর লাগিবে। এ সময় ভারতের অন্য সকল প্রদেশের মিলের উপর আমাদের নির্ভর করিতে হইবে।

উপসংহারে এইমাত্র বলিব যে আমাদের এ স্বদেশি প্রচেষ্টা চীনাদের অনুকরণ নহে। দেশীয় দ্রব্যাদি ব্যবহার করিব। এ ইচ্ছা বহু বৎসর হইতে লোকের মনে জাগরিত হইয়াছে। এবং তদনুসারে অনেকে কাজও করিয়া আসিতেছেন। উপযুক্ত সময় পাইয়া কেবল উহা পূর্বাপেক্ষা প্রসার লাভ করিয়াছে, এখন জিনিস জোগাইতে পারিলেই হয়। কিন্তু কোন জিনিস মাঝে মাঝে না পাওয়া গেলেও আমাদের নিরুৎসাহ হওয়া উচিত নয়। যখন পাইব তখনই আবার কেনা চাই। তাছাড়া প্রস্তুত করিবার ও পাইবার জন্য সমবেত চেষ্টা চাই।

যাহারা অতি বুদ্ধিমান, কাজে কিছু করিতে চান না, তাহারা এখন হয়ত এই বলিয়া আপত্তি তুলিবেন, "আরে তোমার ভারতবর্ষে আর কটা কাপড়ের কল আছে? যে সমুদয় বাঙালির কাপড় যোগাইতে পারিবে?" তাহাদিগকে বলি সকল বাঙালিই ত একদিনে বিলাতি ছাড়িয়া দেশি কাপড় ধরিতেছে না। চিন্তার প্রয়োজন কি? কিন্তু ইহাতে সন্তুষ্ট না হইলে নিম্নলিখিত উত্তর দেওয়া যাইতে পারে। ১৯০২-৩ সালে সমুদয় ব্রিটিশ শাসিত ভারতে সর্বপ্রকারের কাপাসের কাপড় ২,১০৯, ৮১৫,৮২৯ অর্থাৎ মোটামুটি ২১০ কোটি গজ আসিয়াছিল। ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্যা ২,৩১, ৮৯৯,৫০৭ অর্থাৎ মোটামুটি ২৩ কোটি। সুতরাং জনপ্রতি মোটামুটি ৯ গজ কাপড় আসে। বাঙালির সংখ্যা মোটামুটি ৪ কোটি। সুতরাং বৎসরে বাঙালির ৩৬ কোটি গজ কাপড়ের দরকার। ১৯০২-৩ সালে ভারতবর্ষের মিলগুলিতে ১২২,৭৭৪,০০০ অর্থাৎ মোটামুটি ১২ কোটি গজ কাপড় প্রস্তুত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ৬৯,৫৪৮,০০০ গজ বিদেশে রপ্তানি হয়। অর্থাৎ ভারতবর্ষের পাঁচ কোটি গজের কিছু বেশি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আমরা আগে হইতে বরাত দিলে ১২ কোটি গজই রাখিতে পারি। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে এখন ভারতে যত মিল আছে, তাহার দ্বারা এক তৃতীয়াংশ বাঙালির কাপড় জোগান যাইতে পারে। সকলের জোগাইতে হইলে যে ২০১টি মিল আছে, তাহার জায়গায় ৬০০ টির দরকার। সমুদয় ব্রিটিশ-ভারতের জন্য ৩৬০০ মিলের দরকার। দেশি রাজ্যগুলি সহিত ধরিলে সাড়ে ২৯ কোটি লোকের জন্য প্রায় সাড়ে চারি হাজার মিলের দরকার। কিন্তু স্বদেশি প্রচেষ্টা ত আর একদিনে সমুদয় বাঙালি বা সমুদয় ভারতবাসির মধ্যে বিস্তৃত হইবে না। বহু বৎসর

সময় লাগিবে। ততদিনে আমরা মনুষ্যত্ববর্জিত না হইলে ক্রমশঃ মিল বাড়াইয়া লইতে পারিব। তাছাড়া হাতের তাঁতেও এখনও বিস্তর কাপড় বুনা হয়। তাহা এই হিসাবে ধরা হয় নাই। ভাল জাপানি তাঁত, আহমেদনগর সরশিনা মানেকজী পেতিত শিল্প বিদ্যালয়ের তাঁত বা (হেটার্শলী প্রভৃতি) বিলাতি তাঁত প্রচলিত করিতে পারিলে হাতে আরও অনেক কাপড় বুনা যাইতে পারে। ভাল হাতের তাঁত দূরস্থানে রপ্তানি করিতে হইলে কলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে পারে না, কিন্তু স্থানিক অভাব নিশ্চয়ই কলের সমান দরে মোচন করিতে পারে। প্রত্যেক বড় গ্রামে ও শহরে শিক্ষিত লোকেরা সামান্য ২/৪ টাকা করিয়া চাঁদা দিয়া ভাল তাঁত আনাইয়া ও সূতা কিনিয়া দিয়া তাঁতিদের অন্নসংস্থান, দেশের উন্নতি ও নিজেদের সুবিধা করিতে পারেন। দেশি সূতার অভাব নাই। ১৯০২-৩ সালে ভারতবর্ষীয় কলগুলিতে ৫৭৬,২৩৫,০০০ পৌণ্ড (২ পৌণ্ডে ১ সের) কাপাসের সূতা প্রস্তুত হইয়াছিল; ইহাতে মোটা ও মিহি উভয় প্রকার সূতাই ছিল; তবে মোটাই অধিক, কিন্তু ১২০ নম্বর পর্যন্ত সূতা এক্ষণে ভারতবর্ষে হইতেছে। বিদেশ হইতে আসিয়াছিল ৩৩,৬৮১,৩০০ পৌণ্ড।

উত্তরোত্তর বেশি পরিমাণে দেশি কাপড় পাইবার জন্য আমাদিগকে নিম্নলিখিত ছয়টি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে—(১) কেন্দ্রীয় সরবরাহ ভাণ্ডার স্থাপন; ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (২) তৎসঙ্গে প্রতি গ্রামে ও সহরে দোকান স্থাপন (৩) তাঁতিদিগকে ভাল তাঁত ও দেশি সূতা জোগান (৪) কলে সূতা কাটিতে ও কাপড় বুনিতে শিখিবার জন্য প্রয়োজন মত বোম্বাইয়ে ও বিদেশে ছাত্র প্রেরণ; কারণ মিল চালাইবার জন্য বিদেশির আশ্রয় লইলে চলিবে না। (৬) উৎকৃষ্ট কার্পাস জন্মাইবার চেষ্টা। কারণ খুব ভাল তুলা এখন ভারতবর্ষে হয় না।

সূতা কিনিবার সময় যথাসাধ্য বিদেশি সূতা বাদ দিতে হইবে। নতুবা বিলাতি কাপড়ের বদলে বিলাতি সূতার আমদানি বাড়িবে। তাহাতে আমাদের লাভ নাই। ভাল তুলার চাষ না হইলেও আমাদের ক্ষতি। কারণ সরু সূতার জন্য এখন আমেরিকা ও মিশর দেশের তূলার উপর নির্ভর করিতে হয়।

কিঞ্চিৎ অপ্রাসঙ্গিক হইলেও এখানে আর একটি কথা বলিতে চাই। আমাদের দেশে ভদ্র ও সাধারণ লোকেদের মধ্যে দূরত্ব বাড়িয়া চলিয়াছে। আমরা তাহাদের উপকারের জন্য কোন রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে তাহা তাহারা জানিতে, বুঝিতে পারে না। অথচ সমস্ত জাতিটা এক না হইলে উন্নতির আশা নাই; রক্ষা নাই। আমরা যদি এখন তাঁতি ও কামার প্রভৃতির উন্নতিতে মন দি, তাহা হইলে নিজেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা, সুবিধা, দেশের ধন দেশে রক্ষা, গরিবের অন্নসংস্থান, এ সব ত হয়ই, অধিকন্তু সব শ্রেণির লোকের মনে ঐক্য ও ঘনিষ্ঠতা জন্মে।

প্রবাসী ১৩১২ আশ্বিন

বিদেশি বর্জন ও স্বদেশি গ্রহণ

এবার সোনার বাংলার চতুর্দিকে হাহাকার—সর্বত্র অন্নকষ্ট, পাঁচ টাকার কমে কোথাও দেশি চাউল পাওয়া যাইতেছে না। সম্প্রতি আমরা দক্ষিণে ফরিদপুরের দুর্ভিক্ষপীড়িত স্থানসমূহ পরিদর্শন ও অবস্থা বিশেষে কিছু কিছু সাহায্য প্রদান করিতে মফঃস্বলে গিয়াছিলাম, যে দৃশ্য দেখিয়া আসয়াছি, তাহা বর্ণনা করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়। মফঃস্বলের হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিয়া আসিয়া, অশ্রুপ্লাবিত চক্ষে, ঘরের পার্শ্বে, কলিকাতার শিবাজী উৎসবের আনন্দময় দৃশ্য দেখিতেছি, গান বাজনার ধ্বনি শুনিতেছি, আর মনে প্রশ্ন হইতেছে, যে দেশের স্বদেশপ্রেমিক হিতৈষীদল স্বদেশি নিম্নশ্রেণিকে সর্বদা পরিত্যাগ করেন ও ভুলিয়া থাকেন, সে দেশের মঙ্গল কোথায়? ম্যাটসিনি দেশের দুর্দশা স্মরণ করিয়া বাল্যকাল হইতে শোক-বস্ত্র পরিধান করিতেন, আর **আমাদের দেশের যাহারা দিগ্বিজয়ী হিতৈষী, (ছাত্রেরা গাড়ি টানিলেও যাহারা লজ্জিত হন না!) তাহারাও দুর্ভিক্ষপীড়িত মুমূর্ষু ব্যক্তির পার্শ্বে দাঁড়াইয়াই বিলাস ভূষণে ও আনন্দ উল্লাসে মাতোয়ারা!!** এদেশের উন্নতি সম্বন্ধে আশা করিবার সময় কত নিদারুণ চিন্তা প্রাণে জাগিয়া উঠে! কবির বিষাদ-মাখা কথা মনে হয়—

'পর দীপ মালা নগরে নগরে
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে'

দেশে চাউল দিন দিন এত দুর্মূল্য হইতেছে কেন? আমাদের মনে হয়, পাট চাষই তাহার অন্যতর প্রধান কারণ। সমস্ত জমিতে ধানচাষ হইলে, বিদেশে রপ্তানি হইলে, খোরাকি চাউলের এত অভাব হইত না। কিন্তু আজ কাল বাংলার অধিকাংশ জমিতেই পাট-চাষ হইতেছে। পাট-চাষে অধিক টাকা পাওয়া যায় বলিয়া প্রায় সকল কৃষকই এদিকে মন দিতেছে। সকলেই যদি পাট চাষ করে, তবে ধান কি আকাশ হইতে পড়িবে? গত বৎসর, ধরিতে গেলে কেবল বরিশালে ধান জন্মে নাই, অন্যান্য সর্বত্রই, যাহারা ধান বুনিয়া ছিল, তাহারা কতক না কতক ফসল পাইয়াছিল, কিন্তু লিখিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, অনেকেই ধানের বদলে পাটের চাষ করিতে আরম্ভ করায়, এবং রপ্তানি সমানভাবে চলায়— ধান ও চাউলের দর এত বাড়িয়া গিয়াছে। সকলেই যদি পাট-চাষ করে, তবে ধান কি আকাশ হইতে পড়িবে? বাঙালিকে রক্ষা করিতে হইলে পাট-চাষকে বন্ধ করিতেই হইবে। কিন্তু একথা কৃষকদিগকে কে বুঝাইবে? **স্বদেশিবস্ত্র গ্রহণের দিনও স্বদেশি নিম্নশ্রেণির লোক সকল উপেক্ষিত।**

বিদেশি বর্জন-নীতিকে অবলম্বন করিতে হইলে বিদেশ সম্বন্ধীয় সমস্ত, এমনকি বিদেশে মাল রপ্তানি করাও বন্ধ করিতে হইবে। অবাধ বাণিজ্য (Free-trade) ভারত রক্ষার পক্ষে বিশেষ প্রতিবন্ধক রূপে দণ্ডায়মান হইয়াছে। যে কারণে বিলাতের চেম্বারলেন-প্রমুখ ব্যক্তিগত অবাধবাণিজ্যের স্থলে সবাধ-বাণিজ্য-নীতি অবলম্বন করিতে চাহেন, সেই কারণেই, ভারতকে বাণিজ্যে আত্ম-রক্ষা-নীতি অবলম্বন করিতে হইবে। মহা পালোয়ানের সহিত দুর্বল ক্ষুদ্র শিশুর যেমন যুদ্ধ করা সাজে না, আমাদের পক্ষে, তেমনি অবাধ বাণিজ্যের নীতি অবলম্বনে দুর্জয় জাতি সকলের সহিত বাণিজ্য-যুদ্ধ করিতে যাওয়া সাজে না। আত্মরক্ষা ভিন্ন এদেশ রক্ষার আর উপায় নাই।

পাট-চাষে অবাধ-বাণিজ্য প্রশ্রয় পায়—আমাদের ঘরে অন্নের অভাব ঘটে সোনার বাংলার লোক হাহাকার করে বটে, কিন্তু তবুও সময়ে সতর্ক হয় না।

নানা করভারে পীড়িত ভারতের অধিকাংশ লোকের দিনের অন্ন প্রতিদিন সংগ্রহ করিতে হয়। দরিদ্র ধান উৎপন্ন করিয়া যদি অন্ততঃ খোরাকি ধান ঘরে রাখিত, প্রতি বৎসর এরূপ অনাহারে লোক মরিত না। দুর্দৈবে স্থান বিশেষে শস্য উৎপন্ন না হইতে পারে, কিন্তু সমগ্র দেশের সর্বত্র হাহাকারের কারণ কেবল অজন্মা নয়। এক কারণ গবর্নমেন্টের লুণ্ঠন, দ্বিতীয় কারণ অবাধ-বাণিজ্য, তৃতীয় কারণ মূলধনের জন্য মহাজনের অযথা অধিক সুদ-গ্রহণ, চতুর্থ কারণ, শিল্পের বিনাশ। কিরূপে অবাধ বাণিজ্য—আমাদের সর্বনাশ করিয়াছে, তাহা কে না জানে? বিলাতি সস্তা কাপড়ের আমদানিতে দেশের তাঁতি, কারিকর মারা গিয়াছে, বিদেশি সস্তা চিনির আমদানিতে খর্জুর ও ইক্ষুর চাষ লোপ পাইতেছে, চিনির কারখানা সকল উঠিয়া গিয়াছে, বিলাতি লবণের আমদানিতে বহু স্থানের লবণের কারবার বন্ধ হইয়া গিয়াছে। বিদেশি সিগারেটের আমদানিতে এ দেশের তামাকের চাষ ও কারখানা উঠিয়া যাইতেছে।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, সস্তায় জিনিস পাইলে কি দরিদ্রের উপকার হয় না? সস্তা জিনিসের অর্থ প্যারিচাঁদ মিত্রের লিখিত গরু-কোট-জুতা দানের ব্যবস্থার ন্যায়। উপকার হয়, যদি ঘরে ঘরে অন্ন থাকে। দেশের লোক সকল যদি অনাহারে মরে, তবে সস্তার জিনিস ক্রয় করিবে কে? উদরের অন্ন, ঐ কাপড়, লবণ, চিনি, মদ, তামাক, নানা বিলাসের উপকরণ, খেলনা ইত্যাদি দিয়া যে তাহারা প্রলুব্ধ করিয়া কাড়িয়া লইতেছে, তাহা কি কেহ বুঝিবেন না? অবাধ-বাণিজ্য আমাদের সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। এখন আত্মরক্ষা নিতান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

"বয়কট" কথাটা ক্রোধ, সঙ্কীর্ণতা ও হিংসা বিদ্বেষ-মূলক বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত ও ধার্মিক ব্যক্তি অভিমত প্রকাশ করিতেছেন। তাহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহারা জগতের নর-নারীর পরিচর্যা না করিয়া আপন পরিবার প্রতিপালন করেন কেন? "তোমরা বঙ্গ-বিভাগ করিয়াছ, সুতরাং, আমরা তোমাদের জিনিস কিনিব না।"—এইরূপ কথা বলা ঠিক নয়, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। পরন্তু বিভক্ত বঙ্গকে আবার সংযুক্ত করা হইলেই কি বিদেশি বর্জন-নীতি পরিত্যক্ত হইবে? যদি তাহা হয়, এদেশের সর্বনাশের আর অবধি থাকিবে না। বরং পার্টিসন চিরতরে থাকুক, তবুও এদেশের পক্ষে বিদেশি-বর্জন-নীতি যেন পরিত্যক্ত না হয়, ইহাই আমাদের ব্যাকুল কামনা। লবণ ও চিনিতে হিন্দু ও মুসলমানের ধর্ম লোপ হয়, একথা তুমি মান বা না মান, ইহা তোমাকে মানিতেই হইবে, এ দেশে লবণ ও চিনি প্রস্তুত করার ও বস্ত্র বয়ন করার জন্য সকলকে বদ্ধপরিকর হইতেই হইবে, নচেৎ দেশ রক্ষার আর উপায় নাই। স্বাধীন-বাণিজ্যে দেশের কত কোটি কোটি টাকা বিদেশে চলিয়া যাইতেছে, ভাবিলে শরীর শিহরিয়া উঠে। "বয়কটে"র বিরোধী ব্যক্তিরা বলেন,—"স্বদেশি গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছি না, তাহা কর না কেন?" এ কথার উত্তরে আমরা বলি—বিদেশি সস্তা জিনিস বাজারে থাকিতে স্বদেশি অধিক মূল্যের জিনিস বিকাইবে না। এবারের স্বদেশি আন্দোলনের ফলে অনেক স্থলে নূতন চিনির কারখানা খুলিয়াছিল, কিন্তু আমরা যতদূর অবগত আছি, বিদেশি চিনির বাজার অত্যন্ত সুলভ করিয়া দেওয়ায়, দেশি চিনি বিক্রয় হইতেছে না। সুতরাং নূতন কারখানা সকল নিশ্চয় বন্ধ হইবে। বিদেশি লোকেরা লক্ষ লক্ষ টাকা চাঁদা তুলিয়া ভারতের চিনির কারবার মাটি করিতে বদ্ধপরিকর। এরূপ স্থলে, আত্ম-রক্ষার জন্য বিদেশি বর্জন কি সর্বতোভাবে বিধেয় নহে? একবার দেশের কারবার বন্ধ করিতে পারিলে তাহারা শেষে মূল্য বাড়াইয়া সুদে আসলে আদায় করিবে। সব বিষয়েই এইরূপ করিয়াছে। পার্টিসন উঠিলেই বিদেশি-বর্জন বন্ধ করিতে হইবে, ইহা যাহাদের মত, আমরা তাহাদের দলভুক্ত নহি। পার্টিসন উপলক্ষে স্বদেশি আন্দোলন সর্বত্র উঠিয়াছে বটে, কিন্তু ইহা আমাদের চিরন্তন নীতি—স্বদেশি গ্রহণ ভিন্ন এদেশের আত্মরক্ষার আর উপায় নাই। হিংসা, বিদ্বেষের জন্য নয়—"পার্টিসন করিয়াছ, সুতরাং তোমাদের ক্ষতি করিব,"—এইরূপ কলুষিত ইচ্ছার বশবর্তী হওয়াও নয়। আমরা চিরকাল স্বদেশ-রক্ষার জন্যই স্বদেশি গ্রহণের পক্ষপাতী। স্বদেশি-গ্রহণের অর্থ স্বদেশি-বস্তু-গ্রহণ ও জাতি

নির্বিশেষে স্বদেশি ভ্রাতাদিগকে গ্রহণ উভয়ই। আমরা এই উভয়েরই চিরপক্ষপাতী। আমরা জানি, কিছুতেই পার্টিসন উঠিবে না। মহামতি গোখলেই বিলাতে যাউন, দত্তই যাউন, কিছুতেই পার্টিসন উঠিবে না। পার্টিসন বঙ্গরক্ষার, তৎসহ ভারত-রক্ষার একমাত্র বিধাতা-নির্দিষ্ট একমাত্র উপায়। ইহা উঠিলে বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করিতে হয়। তুমিও নও, আমিও নই, আমরা এ আন্দোলন তুলিতে পারি নাই, স্বয়ং বিধাতা আজ আন্দোলন রূপে অবতীর্ণ। যাহারা তাহা না বুঝেন, তাহারা এখনও পরপদলেহনের জন্য বৃথা অর্থ ব্যয় করিতে লালায়িত, আমাদের এ দুঃখ রাখিবার ঠাঁই নাই। হায়, এই দুর্ভিক্ষের দিনে, এই চতুর্দিকের অন্নকষ্টের দিনে, এই টাকাগুলি যদি দরিদ্রের জীবন-রক্ষার জন্য ব্যয় হইত না জানি, কত দীনদুঃখী জীবন পাইত!! কিন্তু সেকথা ভাবিবে কে? **কংগ্রেস গরিব দুঃখীর কথা ভাবেন নাই। জমিদার সভা, ভারত সভা—কোন সভাই দরিদ্রের জন্য কখনও ভাবেন নাই।** স্বদেশি আন্দোলনকারীরাও যদি দরিদ্রের কথা ভাবিতেন, এই হাহাকারের দিনে শিবাজী উৎসবে পুতুল নাচ, যাত্রা ও বাজনায় বৃথা অর্থ নষ্ট করিয়া হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষ জন্মাইতেন (কেহ কেহ বলেন, গবর্নমেন্ট কোন কোন নেতাকে প্রলুব্ধ করিয়া এই কাজ করিতেছেন) না—এবং বরিশালের নির্যাতনের পরও আবার মর্লির পদলেহনের জন্য টাকা ব্যয় করিয়া বিলাতে প্রতিনিধি পাঠাইতেন না। বড় বড় লোকের বড় বড় মাথা, আমাদের ন্যায় দরিদ্রের রোদন কেবল অরণ্যেরই যোগ্য। হায়রে দেশ!!

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি, এ দেশের দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে হইলে, সুদখোর মহাজনের নির্মম হস্ত হইতে জনসাধারণকে রক্ষা না করিলে আর উপায় নাই। টাকায় টাকা সুদ—ইহাতে শ্রমজীবীকুল উৎসন্ন যাইতেছে। বিলাতি ব্যাঙ্কে টাকা না রাখিয়া, ধনীরা যদি কৃষিব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া সেই সব ব্যাঙ্কে টাকা রাখিতেন, তবে দরিদ্রেরা রক্ষা পাইত, বিদেশেও এই বাবদে জলের ন্যায় অনেক টাকা চলিয়া যাইত না, ধনীরাও লাভ পাইতেন। রাজা যাহা নিবে, তাহার উপর পরাধীন আমাদের কোন হাত নাই—কিন্তু যাহা স্বেচ্ছাপূর্বক বিদেশে পাঠাইয়া স্ব-খাত সলিলে ডুবিয়া মরিতেছি, তাহা কি রাখিতে পারিতাম না? কংগ্রেস কি শহরে শহরে, উপশহরে উপশহরে, থানায় থানায় কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়া দেশের নিম্নশ্রেণিকে রক্ষা ও বিদেশি ব্যাঙ্কের হাত দিয়া বিদেশে টাকা পাঠান বন্ধ করিতে পারিতেন না? এ দেশের লোন অফিস সকলে কত আয় হইতেছে, কেহ কি তাহা জানেন না? কৃষি-ব্যাঙ্ক করিলে তাহার আয়ে কত লক্ষ্মী মিল স্থাপিত হইতে পারিত। কিন্তু সে কথা দীর্ঘকাল পরেও কাহারও মাথায় প্রবেশ করিতেছে না। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, কারণ কেবল এই, দরিদ্রদিগকে উত্তোলিত করিলে অনেকের স্বার্থে বজ্রপাত হয়। তাই, বোধ হয়, দরিদ্রদিগকে বাদ দিয়া স্বদেশি-গ্রহণ-নীতি সাধনে সকলে বদ্ধপরিকর। মহাত্মা বিদ্যাসাগর বলিতেন, "তাহাদিগকে ত আমরা মানুষ মনে করি না, তাহারা যে পশু, আর আমরা যে শিক্ষিত মনুষ্য! পশুর উপকার কি মানুষে করে?" হায়, দুঃখের বোঝা চিরদিন মস্তকে বহিয়া কত দুঃখী প্রজা আজ মৃত্যু-মুখে পতিত!! কেহ তাহাদের জন্য এক বিন্দু চক্ষের জলও ফেলিলেন না!

গবর্নমেন্টের লুণ্ঠন-কার্য বহু-কর-ভার পীড়িত ভারতে কিরূপ অবাধে চলিতেছে, অনেক প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং এ প্রবন্ধে আর তাহা লিখিলাম না।

...গবর্নমেন্টের ইচ্ছা এই—এদেশের লোক দুর্বল হইয়া মৃতবৎ বাঁচিয়া থাকুক, হাত পা নাড়িতে বা মনুষ্যের ন্যায় চলিতে ফিরিতে না পারে!—গবর্নমেন্টের ইচ্ছা এই—ভারতের লোক কেবল ভিস্তি ও কাঠুরে (drawers of water and hewers of wood) হইয়া থাকুক। ইচ্ছা এই—অনাহারে মরিবার সময় আর উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া গবর্নমেন্টের গোলামিতে অথবা পদলেহনে সকলে প্রাণ মন ঢালিয়া সর্বসুখ লাভ করুক। এই ইচ্ছা সাধনের জন্য, কখনও কখনও প্রলুব্ধ করিয়াও, দুই চারিটা বড় বড় কাজও দিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমেই জাল গুটাইয়া আনিতেছেন—আর বেশি দিন ঐ ইচ্ছা সাধনার জন্য আর তাহাকে অযথা ব্যয়-বাহুল্য করিতে হইবে না। আমরাও ঐ দৃষ্টান্ত

অনুকরণে, নিম্নশ্রেণিকে উপেক্ষা করিয়া বরাবর চলিয়াছি। যেমন, গবর্নমেন্ট, আমরাও তেমনি। কেমন জগজ্জয়ী উদারতা দেখ ত! এইরূপ অবস্থায় একতা কেমনে আসিবে, বল ত?

বুঝিয়া শুনিয়া এখন সংযত না হইলে আর এই দেশের উদ্ধারের উপায় নাই।

কিন্তু এ দেশের বড়লোকেরা, শিক্ষিত লোকেরা যে কথা বুঝিবেন না—দরিদ্রদিগকেও তাহারা ডাকিবেন না;—ডাকিয়া তাহাদিগকে এ সব কথা বুঝাইবেন না। এই যে বিদেশি বর্জনের কথা উঠিয়াছে, সে কথায়,—শুনিতেছি, নিম্নশ্রেণি বলিতেছে, "আমরা তোমাদের কথা শুনিব কেন? তোমরা, আমাদের শিক্ষার জন্য, নানা অত্যাচার হইতে আমাদিগকে রক্ষা করার জন্য, আমাদের অন্নকষ্ট দূর করিবার জন্য কি ব্যবস্থা করিয়াছ? তোমরা আমাদের কে যে, আমরা সস্তার জিনিস পরিত্যাগ করিয়া দুর্মূল্য জিনিস কিনিব?" তাহাদিগকে শুধু কথায় বুঝাইলেও তাহারা বুঝেন না। দৃষ্টান্ত চায়। মৌলবি লইয়া মফঃস্বলে যাও, তবুও তাহারা বুঝিবে না। যে বরিশাল বিদেশি বর্জনের মহা আড়ম্বররূপে দেশ বিখ্যাত হইয়াছে, সেই বরিশালের মুসলমান নিম্নশ্রেণিও বিদেশি বর্জন করিতেছে না। তাহারা জানে, এদেশের "জমিদার বাবুরা তাহাদের রক্তশোষণ করিতে পারে, কিন্তু তাহাদিগকে রক্ষা করিতে চায় না।" যদি জমিদারদের হৃদয় থাকিত, এই দারুণ দুর্ভিক্ষের দিনে, পিতৃ-মাতৃ শ্রাদ্ধের জন্য, বা পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য বা গুরু পুরোহিতের পুত্র-কন্যার বিবাহের জন্য, বা পাকা ইমারতের জন্য যত খাজনা, তত আবওয়াব আদায় করিতে পারিত না। তোমরা হৃদয়বান শিক্ষিত শ্রেণি, তোমরা নেতা, তোমরা কত বক্তৃতা করিতেছ, কোনদিন ছাত্রেরা তোমাদের গাড়ি টানিবে, সেই আশার নেশায় মাতিতেছ, একদিনও কি কোন দরিদ্রকে দু-মুষ্ঠি খাইতে দিয়াছ? একদিনও কি তাহাদের জন্য দু ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিয়াছ। বিদেশি কত লোক গারো পাহাড়ে, নাগা পাহাড়ে দরিদ্রের উদ্ধারের জন্য প্রাণ দিতেছে, তোমরা স্বদেশি হইয়াও স্বদেশির জন্য কিছুই করিলে না! স্বদেশিকে বাদ দিয়া তোমরা স্বদেশি-গ্রহণ ব্রত উত্থাপন করিবে? ধিক, শত ধিক!!

বুঝিতেছি, সর্ব প্রকারে বিদেশি-বর্জন ও সর্বপ্রকারে স্বদেশি-গ্রহণ ভিন্ন এদেশ রক্ষার উপায় নাই; কিন্তু তাহা সাধনের উপায় কি? নিম্নশ্রেণি তোমাদের সহিত যোগ না দিলে, নিশ্চয় জানিও, কিছুতেই কিছু হইবে না। তাহার সুযোগ উপস্থিত! এই দুর্ভিক্ষের হাহাকারের দিনে দরিদ্রদিগকে রক্ষা করিতে যাও, তাহারা তোমাদের গোলাম হইয়া যাইবে।

তাহারা লাঠি খেলার আয়োজন করিতেছেন কেন? পুতুল নাচের এ রঙ্গ কেন? লাঠি খেলিয়া বল বিধান হইবে এবং তাহাতে দেশোদ্ধার হইবে? দেশোদ্ধারের মূল মন্ত্র লাঠি বা অস্ত্র সাধন নয়; প্রেম-সাধন ও একতা সাধন, নিশ্চয় জানিও।

একতা সাধন ভিন্ন কোন দেশ জাগে নাই, কোন দেশ জাগিবে না। একতা সাধন হইলে জগতের সকল অসাধ্য সাধিত হয়, কিছুই অসাধ্য থাকে না। অস্ত্রে যাহা সিদ্ধ হয় না; শুধু একতায় তাহা সিদ্ধ হয়। আমাদের মধ্যে যদি প্রকৃত একতা থাকিত, অস্ত্র আইন কি ক্ষতি করিতে পারিত? উহাদের বারুদ, গুলি, গোলা, টাকা, কড়ি, সব কি আমাদের নয়? কিন্তু হায়—সে একতা কত দূর! আমরা ভাই ভাই, ঠাঁই ঠাঁই; আমরা ভায়ের রক্ত পান করি। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাই, দরিদ্র বধ করিতে সদা প্রস্তুত, অথবা দরিদ্রেরা অনাহারে মরিলে ফিরিয়াও তাকাই না! হায়, সে একতা কতদূর? হায়রে হায়, আমাদের দ্বারাও নাকি দেশোদ্ধার হইবে!

আমরা নাচ তামাসায়, যাত্রাগানে, বিবাহ পার্বণে কত কোটি কোটি টাকা উড়াইয়া দেই—কিন্তু দরিদ্রকে দুবেলা খাইতে দেই না। তাহারা দেন না, তুমি হিতৈষী, তুমিও দেও না, আমিও না! আমরা দিগ্বিজয়ী আত্মম্ভরিতা ও স্বার্থ লইয়া জগতে কীর্তিধ্বজা উড়াইয়া ফিরিতেছি। শতধিক আমাদিগকে?

একদিন মহাত্মা রামতনু বলিয়াছিলেন—"আমার রসিককৃষ্ণ, (রসিক ত মানুষ ছিল না; সে যে দেবতা ছিল), একদিন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের খাতা লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়া আমাকে

বলিল, "আপনি কিছু দিন।" আমি কি দিব, ইতস্তত করিয়া ভাবতেছিলাম। বিলম্ব দেখিয়া রসিক অধীর হইল, চাহিয়া দেখি, তাঁহার দুনয়ন হইতে জলধারা পড়িতেছে,—চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়াছে।

রসিক বলিল—"আপনি হয়ত ৯০ স্বাক্ষর করিবেন, তাহা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছেন, কিন্তু জানেন না কি যে, ঐ ৯০ আনায় একজনের জীবন রক্ষা হইতে পারে? ৫/৬ দিন অনাহারের পর একদিন খাইলেও লোক আর ৭ দিন বাঁচিতে পারে। তখন হয়ত অন্য উপায় হইতে পারে। সামান্যে কত উপকার হয়, জানেন না কি?" এই কথা বলিবার সময় দেখিলাম, রামতনুর নয়ন হইতেও জল পড়িতেছে। ইহারাই ছিলেন, মানবদেহে দেবতা;—আর আমরা, কেবল বাক্যবাগীশের দল!

সামান্যকে যে উপেক্ষা করে, সে কখনও মহৎ হইতে পারে না। অণু অণু জমিয়া পরমাণু; পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিয়া মহাপর্বত সৃষ্টি করে। এক পয়সার হিসাব যে করিতে পারে না, লক্ষ কি বস্তু, সে বুঝিতে পারিবে না। আমরা যখন অপব্যয় করি, তখন এই কথাটি স্মরণ রাখা একান্ত উচিত। সান্তে আরম্ভ, অনন্তে পরিণতি। একটু একটু উপকার করিতে করিতে উপকার সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়া যায়। একটু একটু ভালবাসিতে বাসিতে অনন্ত মানব পরিবারকে ভালবাসা যায়। প্রেম-সাধনার পথ ধর, কখনও নিরন্ন, দরিদ্রদিগকে ভুলিয়া থাকিতে পারিবে না; তাহাদের দুঃখে তোমার প্রাণ ফাটিয়া যাইবে। যখন প্রেম ও সাধনার পথ পাইবে—তখন কোটি লোকের কোটি কোটি অভাব তোমাকে বৃশ্চিকের ন্যায় দংশন করিবে, তুমি কিছুতেই নিজের সুখের চিন্তায় বিভোর থাকিতে পারিবে না। অন্যের অভাব থাকিতে নিজে খাইতে বা পরিতে পারিবে না, তাহাদের দুঃখ শোক, তোমার দুঃখ শোকে পরিণত হইবে; তখন তুমিও সে-একাত্মক হইয়া যাইবে। তখন ম্যাৎসিনির ন্যায় তাহাদের ন্যায় মলিন বা শতগ্রন্থী-বস্ত্র পরিধানে তোমার ইচ্ছা হইবে। এইরূপ প্রেম-সাধনের পথে যখন সব একাকার হইবে; তখন তোমার সাদর বাক্যে সকলে মাতিবে—এক সুরে সকলের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিবে। তখন আর পাশব বলসাধনের প্রয়োজন হইবে না—আত্মিক বলে অসাধ্য সাধিত হইবে; এক হুঙ্কারে বিশ্ব বিজিত হইবে, স্বর্গ মর্ত্য কাঁপিয়া যাইবে; অসুর দল প্রকম্পিত ও ভয়ে জড়সড় হইবে। তুমি প্রেম সাধন করিবে না, অথচ একতা আসিবে; দরিদ্রের জন্য ভাবিবে না, অথচ একতা আসিবে? তাহা কখনও হইবে না, নিশ্চয় জানিও। স্বদেশি দরিদ্রকে বাদ দিলে কখনও পূর্ণাঙ্গে স্বদেশি গ্রহণ হইবে না, নিশ্চয়ই জানিও। ভাবিতে শেখ, জীবন বলি দিতে শেখ, আপনাকে বিতরণ করিতে শেখ, তবে অসাধ্য সাধিত হইবে; তুমি অগণ্য জনগণের হৃদয় সিংহাসনের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অনভিষিক্ত রাজা হইবে। না হইলে, সহস্র রবীন্দ্রনাথও তোমাকে নেতৃত্বের সিংহাসনে বসাইয়া দিতে পারিবেন না।

বিদেশি-বর্জন ও *স্বদেশি-গ্রহণ* ব্রত এক সূত্রে এক মূলে গ্রথিত—তাহা দেশ রক্ষার দুর্লঙ্ঘ্য সোপান। যদি ইহা সাধন করিতে চাও, প্রেম-সাধনের পথ ধরিয়া অসংখ্য স্বদেশি দরিদ্র কাঙালের পর্ণকুটিরের দিকে ধাবিত হও। হায়, তাহারা যে মরিয়া গেল!! কেবল স্বদেশি দ্রব্য গ্রহণ করিবে, কিন্তু স্বদেশি লোক গ্রহণ করিবে না? তাহারাই যে চৌদ্দ আনা। বিলাস বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, সকল স্বার্থ তাহাদের জন্য একবার ঢালিয়া দেও ত, দেখি, পুণ্যময় স্বদেশি গ্রহণ ব্রত সফল হয় কি না?

নব্যভারত ১৩১৩ *আষাঢ়*

বিধুভূষণ দত্ত

বিলাতি পণ্য বর্জনে স্বদেশি দীক্ষা*

নদীতে বান ডাকিবার পূর্বে জলের একটি কূলপ্লাবী উচ্ছ্বাস হইয়া থাকে। তাহা লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, বান ডাকিবার বিলম্ব নাই। ইহা লক্ষ্য করিয়াও যাহারা তীরে দাঁড়াইয়া প্রতিকূলতা করিতে ইচ্ছুক হয়, তাহাদের অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়; হয়ত, তাহারা ভাসিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আজ বাঙালির বিলাতি পণ্য বর্জন প্রতিজ্ঞার প্রথম বার্ষিক উৎসবের দিন। বাংলার জাতীয় ইতিবৃত্তে ইহা একটি স্মরণীয় ঘটনা। ইহাতেই বাঙালির জাতীয় জীবনের উন্মেষ হইয়াছে।

১৩১২ সনের এই স্মরণীয় ২২ শ্রাবণ তারিখে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদজনিত মর্মকষ্টে বাংলার প্রতি নগরের প্রতিনিধিবর্গ সমবেত হইয়া, কলিকাতার টাউন হলে, ভীমকণ্ঠে বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করেন। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি সেই পুণ্যদিনে আপনাদিগের প্রতিনিধিরূপে সেই বিরাট সভায় উপস্থিত ছিলাম!

এই ভাব-তরঙ্গের শেষ কোথায়, কে বলিবে? ইহার নানাদিকের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সম্যক আলোচনা করিতে পারি, তেমন শক্তি বা ক্ষমতা আমার নাই। এই এক বৎসরে বঙ্গদেশের ইতিবৃত্তে ইহা যে এক নবীন উচ্ছ্বাস আনয়ন করিয়াছে, তাহারই ঘটনাবলী এই প্রস্তাবে আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইব।

তলাইয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়, বঙ্গে এই বর্তমান জাতীয় উদ্দীপনার প্রত্যক্ষ কারণ সেই বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা হইলেও, ইহার প্রকৃত কারণ অনেক সুদূর পরাহত। ইংরাজের অত্যাচার অবিচার, ইংরাজ হস্তে কৃষ্ণাঙ্গদের বিনা অপরাধে কৃষ্ণ-প্রাপ্তি, দেশি বনাম ফিরিঙ্গির ফৌজদারি মোকদ্দমায় অন্যায় বিচার বিভ্রাট এবং সর্বোপরি, আমাদের অশেষ কল্যাণকারী কর্জনের করাঘাত, রাজপুরুষগণের ভারতবাসীকে মানুষ বলিয়া স্বীকার করিতে একান্ত অনিচ্ছা—এই সমস্ত কারণ বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে দেশমধ্যে মহা অসন্তোষের বীজবপন করিতেছিল—লোকের মনে অলক্ষিতভাবে প্রচলিত শাসনের প্রতি ভীষণ অশ্রদ্ধা জন্মিতেছিল। যেমন ভূমি-গর্ভে ধীরে ধীরে জল সঞ্চিত হইয়া, হঠাৎ সুযোগ বুঝিয়া, প্রস্রবণের সৃষ্টি করে, সেইরূপে, বহুদিন ধরিয়া নীরবে একটি শক্তি সঞ্চিত হইতেছিল, বর্তমান সুযোগে স্ফূর্তি পাইয়া, ভারত মরুভূমিকে পুনঃ শস্য শ্যামলা করিবার জন্য, বিধি নিয়োগে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। অন্যান্য দেশের সমসাময়িক ঘটনাবলীও আমাদের সমাজের উপর অত্যাশ্চর্য আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন তাঁহারা জানেন, বিগত বুয়র যুদ্ধের কালে দেশের অনেকেই মনে মনে অত্যাচারিত স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী বুয়রদিগের সহিত সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। তারপর, বর্তমান জাপানযুদ্ধকে দেশের লোক নিজ দেশের ব্যাপারের ন্যায় মনে করিয়া, জাপানের জয়ে গৌরবান্বিত ও সুখী মনে করিতেন। এ সকলের কি কোন কারণ নাই? অন্যদিকে ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, দেশ মধ্যে একটা জিঘাংসার ভাবও নিতান্ত গোপনে ফুটিয়া উঠিতেছিল; যে দিন তাহা পূরণ করিবার পথ পাইল সেই মুহূর্তেই দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেশের আপামর সর্বসাধারণ

* ৭ আগস্টের উৎসবের দিনে কুমিল্লা জাতীয় বিদ্যালয়ে পঠিত।

বিনা বাক্যব্যয়ে, নত মস্তকে, অবলীলাক্রমে, স্বদেশিব্রত অবশ্য পালনীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিল।

আমেরিকা হস্তে উৎপীড়িত চীনবাসিদিগের আমেরিক-পণ্যবর্জনের প্রতিজ্ঞা কি প্রকার ফলবতী হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া, যে এই বিলাতি পণ্য বর্জনের কথা দেশের নেতৃবৃন্দের মনে প্রথম উদিত হয়, নিঃসন্দেহ। তবে, কোন স্থান হইতে, কি সূত্রে ইহার প্রথম সূচনা হয়, তাহা নির্ধারণ করা সুকঠিন। ইহা ঠিক যে, কলিকাতার সেই মহাসভার পর হইতেই এই নবদীক্ষা অসাধারণ বিস্তৃতি লাভ করে।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সর্বপ্রথমে যে দিন বৈকালে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের বিজ্ঞাপন কলিকাতায় তারের সংবাদে প্রকাশিত হয়, তখন দেশমান্য প্রকৃত স্বদেশভক্ত 'সঞ্জীবনী' সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহোদয় এতদূর অস্থির হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার হৃদয়ে ঘৃণা ও ক্রোধের বহ্নি এত প্রজ্বলিত হইয়াছিল যে, তিনি সেই রাত্রি গোলদিঘিতে পরিভ্রমণ করিয়া কাটাইয়াছিলেন। তারপর, সতেজে নিজ কাগজে প্রকাশ করিলেন যে, আমরা এমন আন্দোলনের তরঙ্গ তুলিব, যাহাতে বৃটিশ সিংহাসন পর্যন্ত কম্পিত হয়। আরও লিখিলেন—আমরা করকচ্ খাইব তবু লিভারপুলের লবণ খাইব না, গুড় খাইব, বিদেশি চিনি খাইব না; ছালা পরিব, তবু বিলাতি কাপড় পরিব না—ইত্যাদি। অনেকেই হাসিয়াছিলেন, আমরাও ছাত্রাবাসে বসিয়া কত ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াছিলাম। তখন কে বুঝিতে পারিয়াছিল যে 'সঞ্জীবনী'র সেই হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মত এই কথাতে এই পণ বঙ্গে বর্তমান বিরাট ও সার্বজনীন আকার ধারণ করিবে। এই আন্দোলনের মূলে, মহাত্মা কৃষ্ণকুমার।

এই স্বদেশি ব্রত গ্রহণ পর্বে যে বিধাতার হাত রহিয়াছে তাহা অস্বীকার করা অসম্ভব। ১৩১০ সালের পৌষ মাসে, যখন রিজলি স্বাক্ষরিত পরওয়ানা দ্বারা চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলাদ্বয়ের আসামে সামিল হওয়ার প্রস্তাব প্রচারিত হয়, তখনও দেশময় একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল। কিন্তু, তাহা প্রধানতঃ কলিকাতার 'জমিদার সভার' উদ্যোগেই হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে প্রতিনিধি পাঠাইয়া, নানা স্থানে পুস্তিকা বিতরণ করিয়া, তবে তাহাকে স্থায়ী করিতে হইয়াছিল। ইহা নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা। সে সময়ে কলিকাতার ত্রিপুরাবাসী ছাত্রবৃন্দ কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া আমি চাঁদপুর গিয়াছিলাম। লোকদিগকে বহু কষ্টে, কত যত্ন করিয়া যে একত্রিত করিতে হইত, তাহা বলিবার নহে। সে আন্দোলনের বেগও ক্রমশঃ কমিয়া আসিল। স্বদেশি আন্দোলন কল্পে কিন্তু কলিকাতা হইতে অতদূর আয়োজন করিতে হয় নাই, দেশ আপনিই জাগিয়াছে। দেখিতে দেখিতে বিলাতি কাপড়ের অগ্রিম বাৎসরিক চুক্তি—Forward contract বন্ধ হইল। বোম্বাই কলওয়ালারা হঠাৎ এত কাপড় যোগাইতে পারিল না বটে, কিন্তু কোথা হইতে দেশের লোকের মধ্যে ত্যাগের এক অভিনব শিক্ষা আসিল—সকলেই যথাসম্ভব বস্ত্র-সংক্ষেপ সহ্য করিল। যাহা পাওয়া গেল, দ্বিগুণ, তিনগুণ মূল্যে তাহা আনন্দে ক্রয় করিল। দেশের আশা যুবকবৃন্দ দুঃখ-কষ্ট ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, দোকানে দোকানে চৌকি দিয়া, এ প্রতিজ্ঞায় যথার্থ হোমাগ্নি প্রদান করিল। সেই অবধি আন্দোলন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কি মানুষের কাজ? যে কারাগারের নামে পূর্বে লোক কম্পিত কলেবর হইত, আজ দেশের জন্য, স্বচ্ছন্দে অম্লানবদনে তথায় কত লোক যাইতেছে, কত শত লোক যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। সমস্ত নিগ্রহ প্রফুল্ল চিত্তে ভোগ করিতেছে।

বিগত বৎসর ২২ শ্রাবণ তারিখে যখন কলিকাতার দুই সহস্র যুবক ছাত্রবৃন্দ বিভিন্ন বর্ণের উত্তরীয় স্কন্ধে লইয়া, সুদীর্ঘ সারিবদ্ধ হইয়া, গোলদিঘি হইতে টাউনহলের মহাসভায় উপস্থিত হয়, সেইদিন হইতেই দেশের যুবকবৃন্দ মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত। সে দিনে মৃতপ্রাণ সঞ্জীবনী মাতৃমন্ত্র "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে সমস্ত পথ মুখরিত হয় নাই বটে, তবুও সে দিনেই উহার নীরব উদ্বোধন সূচিত হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-নব-উদ্দীপনাক্ষেত্রে গোলদিঘি রাজনৈতিক পীঠস্থান। অন্যূন অর্ধশতাব্দী পূর্বে বঙ্গের অমরকবি মধুসূদন সহধ্যায়ীগণসহ ইহারই তীরে, অখাদ্য ভক্ষণ, সুরাপান, ইত্যাদি পাশ্চাত্য-শিক্ষার ও সভ্যতার (?) স্রোত "ইয়ং বেঙ্গল" অর্থাৎ নব্য-বঙ্গ সমাজে প্রচারিত করিয়া প্রাচীনের সহিত নবীনের সমর ঘোষণা করেন। প্রথম অবস্থায় যাহা হইবার তাহা হইল। মধুসূদনের সমসাময়িক ও পরবর্তী কয়েক পুরুষের লোকেরা দেশ হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন। দেশের সমস্ত চিন্তাবৃত্তি বহির্মুখীন হইল; ইংরাজ তাঁহাদের চক্ষে দেবতা; তাহাদের অনুকরণই কর্তব্য বিবেচিত হইল। কালের কুটিল গতিতে আবার ঠিক সেইস্থানেই বর্তমান বঙ্গীয় যুবক সমাজ, অর্ধশতাব্দীর পরে ঘরে ফিরিয়াছে, দেশ চিনিয়াছে। গোলদিঘির ধারে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে মাতৃমন্দিরে আহ্বান করিয়া, যুবকবৃন্দকে যে উৎসাহপূর্ণ উপদেশ দেওয়া হইত, বঙ্গের প্রতি পল্লীতে পল্লীতে আজ তাহার প্রতিধ্বনি শ্রুত হইতেছে। সে উৎসাহ, সে জ্বলন্ত তেজ, না দেখিলে বুঝা যায় না। দেশের সমস্ত নেতৃবৃন্দের পাদস্পর্শে সেই পীঠস্থান ধন্য, এই গোলদিঘির তীরে দাঁড়াইয়াই অঙ্গচ্ছেদে অশৌচগ্রস্ত যুবকগণ তিন দিন নগ্নপদে উত্তরীয় ধারণ করিয়াছিল; সমস্ত বঙ্গদেশের ছাত্রবৃন্দ সে দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। এই সহানুভূতি, একপ্রাণতা, একযোগে কার্যকারিতার কি মূল্য নাই? যে দিন অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইল, সে দিন কলিকাতার সমস্ত কলেজের ছাত্রবৃন্দ দেখিতে দেখিতে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া, গোলদিঘিতে সমবেত হইল। অদ্ভুত কর্মী, প্রকৃত ত্যাগী স্বর্গীয় রমাকান্ত রায়ের কার্যক্ষেত্রও এই গোলদিঘি। সর্বস্বত্যাগ করিয়া, দুঃখ কষ্টে নিরপেক্ষ হইয়া, কি প্রকারে স্বদেশসেবা করিতে হয়, তাহা রমাকান্ত রায়ই প্রথম এ দেশে দেখাইয়াছেন। এই গোলদিঘির তীরেই জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েরও সূচনা হয়। জাতীয় সঙ্গীতের মর্মস্পর্শী ভাষায় মায়ের নাম প্রচার করিবার প্রথাও আরম্ভ হয়, এই গোলদিঘি হইতে। সেই জাতীয় উদ্দীপনার বোধনকালে নিত্য নিত্য গোলদিঘির পশ্চিম পার হইতে জনৈক যুবক সুললিত কণ্ঠে—"স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখ রেখ মনে ধ্রুব জ্ঞান"—গান করিত। সুশীতল সান্ধ্য সমীরণ ভর করিয়া সেই মধুর সঙ্গীত দূর সুদূর পর্যন্ত নরনারীর প্রাণমন ভেদ করিয়া অন্তরের অন্তরতম স্থানে পশিত—পাষাণ হৃদয়েও স্বদেশ-প্রীতি জাগিয়া উঠিত। তারপর, ক্রমে ক্রমে শহরের নানা স্থানে দলে দলে স্বদেশ-প্রীতিতে মাতোয়ারা ছাত্রবৃন্দ মাতৃ-সঙ্গীতের মিছিলও বাহির করিল। এই আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি গোলদিঘি।

যে দিন (১ সেপ্টেম্বর) অঙ্গচ্ছেদের ঘোষণাপত্র কলিকাতায় প্রচারিত হইল, সে দিনই কতিপয় ছাত্রবৃন্দের সহিত হোয়াইট ওয়ে কোং-এর জনৈক উদ্ধত ফিরিঙ্গির বচসা হয়। ফিরিঙ্গি অন্যায়ভাবে যুবককে আক্রমণ করিয়া প্রহারে উদ্যত হইল, নিদ্রিত আত্মসম্মানের ভাব তখনই জাগিল—এ অপমান আর চুরি করা হইবে না—তাহার উপযুক্ত প্রতিদান হাতে হাতে দেওয়া হইল। ঠিক সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায়, হাবড়ার পোলের নিকট, হাবড়ার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট প্রেন্সিস্ সাহেব গাড়ি হাঁকাইয়া ছাত্রদলের উপর আসিয়া পড়েন। এ অপমানেরও উপযুক্ত প্রতিদান হইল। বঙ্গে-আত্ম-সম্মান জ্ঞান উন্মুক্ত ও আত্মশক্তির বীজ রোপিত হইল।

বিজয়া দশমী মারওয়াবি বণিক সমাজে "লক্ষ্মী দিন" বলিয়া পূজিত হইয়া থাকে। পর বৎসরের প্রায় সমস্ত নূতন চুক্তি এই দিনেই সম্পাদিত হয়। গত বৎসর সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই "লক্ষ্মী দিনের" প্রায় সমস্ত নূতন চুক্তিই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব চুক্তি মতে যে সমস্ত বিলাতি কাপড়ের আমদানি হইয়াছিল, আজও তাহা গুদামজাত হইয়া পচিতেছে—অর্থপিশাচ বণিকদিগের আন্তরিক ইচ্ছা সত্ত্বেও নূতন চুক্তি করিবার সাহস কুলাইল না। এক সময়ে ইংরেজ বণিক বাঙালির পণের কথা লইয়া কত বিদ্রূপ করিয়াছিল, আজ তাহার সত্য সত্যই ভয়ের উদ্রেক হইয়াছে। গাত্রজ্বালায় অন্তর্দাহে উদ্‌ব্যস্ত হইয়া উপায়ান্তর না পাইয়া তাহারা Englishman প্রমুখ সংবাদপত্রে বাঙালিকে নানাপ্রকার কটূক্তি করিতেছে।

তারপর ৩০ আশ্বিনের কথা। লক্ষ লক্ষ প্রজাপুঞ্জের সমবেত মতের বিরুদ্ধে সরকার বাহাদুর

এইদিন বঙ্গবিভাগ করিলেন। একদিকে রাজশক্তি, অপরদিকে প্রজাশক্তি। প্রজাশক্তি এতদিন সুপ্ত ছিল। কিন্তু এই দারুণ আঘাত পাইয়া প্রজাশক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল। সেই দিনের সেই জাতীয় জীবনের প্রথম উচ্ছ্বাস, জীবনে ভুলিবার নয়। রাজশক্তি যাহাকে বিভক্ত করিয়াছে, প্রজাশক্তি তাহাকে সর্বথা যুক্ত রাখিবার জন্য কায়মনোবাক্যে যত্নবান্ হইল। যাহা সরকারি আইনে বিভক্ত, "রাখিবন্ধনে" তাহা যুক্ত হইল। সকলে সমবেত হইয়া পুণ্য ভাগীরথীতে স্নাত হইয়া, রাখি-বন্ধনে যুক্ত হইয়া বঙ্গে যে নবীন একপ্রাণতা ও জাতীয়তার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহার শক্তি কত! তাহা আরও ঘনীভূত ও সুপরিচালিত হইলে, এমন কোন অসাধ্য কার্য নাই যাহা অনায়াসে সিদ্ধ হইতে না পারিবে। বর্তমান নানা ঘটনাবলীর ভিতরে সে শক্তির কার্যকারিতা এই অল্পদিনের মধ্যেই আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বিধাতার বিশেষ দয়া ব্যতীত, কাহার শক্তিতে সমস্ত বঙ্গদেশের চুল্লি অকস্মাৎ নির্বাপিত হইল এবং দেশের আপামর সাধারণ স্বেচ্ছাকৃত উপবাস ব্রত গ্রহণ করিল? তাহাতে কি বিধাতার ইঙ্গিত নাই? সে দিন কলিকাতার যুক্ত বঙ্গ-মন্দিরের প্রতিষ্ঠা-ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিপুল উচ্ছ্বাস কি শুধু ক্ষণিক? পঞ্চাশ সহস্র লোক কোথা হইতে, কাহার আদেশে সেই স্থানে সমবেত হইল? দেশের নেতৃবৃন্দ সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হইতে সাধারণ ইতর লোক পর্যন্ত সে স্থানে নগ্নপদে কাহার আদেশে সমবেত হইয়াছিল? রুগ্ন ও পীড়িত দেশমান্য আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে যখন স্বেচ্ছা-সেবক দল বহিয়া আনয়ন করেন, তখন তাঁহার রুগ্নদেহে ও শুষ্কমুখে যে জ্যোতি ফুটিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। তাঁহার সে দিনের বক্তৃতা অগ্নিময়ী ; তাঁহার সেই জলদ গম্ভীর ঘোষণা—"আমি সর্বসাধারণের পক্ষ হইতে ঘোষণা করিতেছি; আমরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ স্বীকার করিব না এবং আমাদের জাতীয় একতা রক্ষা করিবই করিব; ইহার প্রতিকূলে যত চেষ্টা হইবে তাহাকে ব্যর্থ করিবই করিব।" ইহার ভিতরে কত যে, শক্তির বীজ লুক্কাইত ছিল, তাহা কে বলিবে। আনন্দমোহনের দুই দিকে দুই জন ভিষক্‌প্রবর ঔষধ হস্তে দণ্ডায়মান — পাছে, জনসঙ্ঘের বিপুল উচ্ছ্বাস দর্শনে তাঁহার মূর্ছা হয়। তারপর যখন সেই যুক্ত বঙ্গ-মন্দিরের ভিত্তিস্থাপন করিতে প্রস্তরে হস্তক্ষেপ করিলেন, তাহার চক্ষু দিয়া দর দর ধারে অশ্রু বহিয়া পড়িতেছে। কি মহান দৃশ্য! বঙ্গের মহারথিগণ তাঁহার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই মুহূর্তে কতিপয় উৎসাহী যুবক বুকের রক্ত দ্বারা সেই মাতৃমন্দিরের ভিত্তিকে পূজা করিতে চাহিয়াছিল; আনন্দমোহন নিষেধ করিয়া বলিলেন—"এখনও সময় হয় নাই।" তাঁহার স্বাস্থ্যের পক্ষে সেই স্থানে আর অধিকক্ষণ অবস্থান অনুচিত বিবেচিত হওয়ায়, স্বেচ্ছাসেবকগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে উঁহার বাটিতে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিল। তিনি বাড়িতে পৌঁছিলে পর, কোন ব্যক্তি তিনি কেমন আছেন জিজ্ঞাসা করায়, প্রত্যুত্তর করিলেন, "এখন মরিলেও দুঃখ নাই, আর এক ঘণ্টা পূর্বে মরিলে দুঃখের অবধি থাকিত না। জীবনের যাহা দেখিবার তাহা দেখিতে পাইতাম না।" কি মহা দেশহিতৈষণা!

বঙ্গের নগরে নগরে পল্লীতে পল্লীতে যেদিন রাখি-বন্ধন ও অরন্ধন ব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সেই দিন প্রথম বাঙালি বাঙালিকে চিনিল, বাস্তবিক সেই দিনেই সর্ব প্রথমে—"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল," পুণ্য হইল। সে দিনেই বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ, বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে সমস্ত ভাই বোন, প্রকৃত পক্ষে জাতীয় ক্ষেত্রে এক হইল। সে দিনেই ভবিষ্যতে বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা, যে সত্য ও পূর্ণ হইবে, তাহারি বীজ রোপিত হইল।

যাহারা সেদিন সন্ধ্যাকালে কলিকাতা বাগবাজারে রায় পশুপতিনাথ বসু মহাশয়ের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে সম্মিলিত লক্ষাধিক লোকের সমাগম সন্দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, তাহারা জাতীয় জীবন-উচ্ছ্বাসের কিছু আভাষ পাইয়াছেন। দিনান্তে অন্ন-সংস্থান হয় না এমন যে মুটে মজুর তাহারাও তাহাদের দেয় অর্ধ পয়সা এক পয়সা দিবার জন্য কি আবেগে ছুটিয়াছিল? ধন ভাণ্ডারের জন্য সেদিন দুইশত টাকার অর্ধ পয়সা সংগৃহীত হইয়াছিল; ঐ প্রত্যেকটি অর্ধ পয়সার সঙ্গে কত

অমূল্য হৃদয় যে দেশের দিকে ছুটিয়াছিল, গণনা করা অসম্ভব। ধনী নির্ধনের এমন সমাগম, মাতৃসেবার জন্য এমন উচ্ছ্বাস বঙ্গে আর কখনও দৃষ্ট হয় নাই। বঙ্গে যুগান্তর সমাগত।

এতদিন সরকার বাহাদুর এই বিলাতি বর্জনের আন্দোলনকে একটা ভাব-তরঙ্গের অস্থায়ী উচ্ছ্বাস মাত্র বলিয়া উপেক্ষা করিয়া আসিতেছিল। মনে করিত—It must die its natural death—প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী ইহার বিনাশ অনিবার্য। যখন দেখিল বিজয়ার লক্ষ্মী দিনে মারোয়াড়ি বণিকগণ বিলাতি মালের নূতন চুক্তি করিল না এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ দিনে বাঙালিগণ 'রাখি বন্ধনে' জাতীয় জীবনের ভিত্তি স্থাপন করিয়া, যে ভেদনীতি অনুশীলনে, ইংরেজ ভারতে তাহাদের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, তাহার মূলে কুঠারাঘাত করিতে উদ্যত, তখন সরকার প্রমাদ গণিলেন। তাহারি ফলে, কার্লাইলের ছাত্র-দলনী পরোয়ানা জাহির হইল; সরকার যে এতকাল আমাদের ছাত্রবৃন্দের আন্তরিক মঙ্গলের (?) জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, তাহার মূলে শুধু স্বদেশি আন্দোলন দমনের একটা ঘৃণিত ইচ্ছা বর্তমান। রাজপুরুষগণ দেখিলেন, যদিও এই স্বদেশি আন্দোলনের সূচনা বিলাতি পণ্য বর্জন হইতে, কিন্তু ইহার শেষ কোথায় স্থিরতা নাই। আরও দেখিলেন, ইহা একটি সার্বভৌমিক আন্দোলন—ইহাতে দেশের ধনী নির্ধন সকলেই যুক্ত—ইহাতে জাতীয় জীবনের উন্মেষ আবশ্যম্ভাবী। স্বার্থরক্ষার্থে কাজেই ইহার মূলচ্ছেদ করা কর্তব্য। স্বদেশি আন্দোলন প্রচারের মূলে, দেশের যুবক শক্তি যে প্রকৃত কার্যকারী এবং ছাত্রবৃন্দই যে মাতৃযজ্ঞের প্রকৃত পুরোহিত, তাহা তাঁহাদের বুঝিতে বিলম্ব হইল না।

অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ সিলি তাঁহার Expansion of the British Empire, — 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি' নামক পুস্তকে, অনেক গবেষণার পর, ভারতশাসনের তিনটি মূল সূত্র নির্দেশ করিয়াছেন। সিলি লিখিয়াছেন,—আশ্চর্যের বিষয়, এত যোজন দূর হইতে মুষ্টিমেয় একদল বণিক গিয়া কি প্রকারে, এত বড় সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। তরবারির সাহায্যে তাহা অসম্ভব। ইহার কারণ আর কিছুই নহে—এ ভারতে জাতীয়তা নাই। একদল অন্য দলের সর্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত নয়। তাঁহারি ফলে, আমরা ভারত জয় করিয়াছি। ভারতে ব্রিটিশ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তিনটি কাজ করিতে হইবে,—প্রথমে,—এমন কোন আন্দোলন যেন না জাগিতে পারে, যাহাতে দেশের ধনী-নির্ধন সমস্তই যোগ দিতে পারে, সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি করিতে হইবে। National movement জাতীয় আন্দোলন—যদি কোন দিন দেখা দেয়, তাঁহাকে অঙ্কুরেই, ছলে বলে কৌশলে, বিনাশ করিতে হইবে। বিভিন্ন শ্রেণির একটিকে অন্যটির বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিয়া রাখিতে হইবে, যেন সমবেত শক্তি না জাগিতে পারে। যদি কোন গতিকে সে শক্তি জাগে, তবে ইংরাজকে 'With bag and baggage'—যথাসর্বস্ব লইয়া স্বদেশে ফিরিতে হইবে।

দ্বিতীয়তঃ—সেনা বিভাগে দেশীয়গণকে এমন কোন পদ যেন দেওয়া না হয়, যাহাতে তাঁহাদের হৃদয়ে কোন প্রকারের উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, ড্যালহৌসীর নীতি পরিহার করিয়া, দেশীয় রাজাদিগকে স্ব স্ব স্থানে রাখিতে হইবে, কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা যাহাতে ইংরেজের হাতে থাকে তাহা করিতে হইবে।

চিন্তা করিলেই দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত অধ্যাপক সিলির মূল সূত্রানুযায়ী এদেশের শাসনচক্র ঘুরিতেছে। কাজেই স্বদেশি আন্দোলন দমনের এত চেষ্টা।

স্মরণীয় ২২ শ্রাবণের মহাসভাব সভাপতি শ্রীযুক্ত রাজা প্যারীমোহন তাঁহার বক্তৃতার শেষ অংশে যে ভবিষ্যতবাণী করিয়াছিলেন,—Out of evil shall come good—এই অকল্যাণ হইতেই আমাদের মঙ্গল হইবে—তাহা অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়াছে। **রংপুরের ছাত্রগণ সর্বপ্রথমে এই অন্যায় কার্লাইল-হুকুম অমান্য করিল**। সেজন্য যখন তাঁহাদিগের জরিমানা হইল, তাঁহারা অম্লান-বদনে, দেশের মুখ-রক্ষার জন্য, বাঙালির ভবিষ্যৎ জাতীয় জীবনের পথ প্রদর্শন করিয়া, ঘৃণাভরে সেই সরকারি বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিল। ভগবানে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহারা অকূল পাথারে ঝাঁপ

দিল; বিধাতা তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য, এক জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। অভিভাবকবর্গ নিজেরা ছাত্রগণের শিক্ষার ভার লইলেন। বঙ্গে যুগান্তর উপস্থিত। বলিতে লজ্জা হয়, যদিও ঘটনাকালে বাংলা দেশ হইতে তাঁহারা দুই সহস্র সহানুভূতি জ্ঞাপক টেলিগ্রাফ পাইয়াছিল, কিন্তু, কার্যকালে অতি অল্প সংখ্যক লোকই তাঁহাদের সহিত যোগ দিয়া প্রকৃত সহানুভূতি দেখাইয়াছেন।

তারপর, কলিকাতায় অদ্ভুত কর্মী পরলোকগত রমাকান্ত রায় Anti Circular Society—পরোয়ানা বিরোধী সভা স্থাপিত করিয়া যুবকদিগকে দেশের কাজে সজোরে টানিয়া আনিলেন। যুবকবৃন্দ ত্যাগ ব্রত ধারণ করিল। দেশি কাপড়ের মোট মাথায় লইয়া, রৌদ্র বৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া, যুবকবৃন্দ স্বদেশি প্রচার ব্রত উদ্‌যাপন করিতে লাগিল।

যখন রঙ্‌পুরের ছাত্রেরা এরূপ ভাবে সহানুভূতিশূন্য হইয়া ভাসিতেছে, তাঁহাদের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী জমিদার মহাশয় সঙ্গীত সমাজের সম্মুখস্থ মাঠে এক প্রকাশ্য সভায় বলিলেন,—"আমরা একক হইয়া রাজশক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জাতীয় বিদ্যালয় রক্ষা করিতে পারি, তেমন শক্তি নাই। আমাদেব পশ্চাতে যদি দেশের লোক দণ্ডায়মান হন, আমরা শেষ পর্যন্ত একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব।" তখনকার অবস্থা অতীব শোচনীয়; সহানুভূতির অভাবের ভিতর পড়িয়া, রঙ্‌পুর বাঙালির সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, সকলে সন্দেহ করিতে লাগিলেন। বাঙালির জাতীয় জীবনের তরী অকূল পাথারে ডুবু ডুবু, বুঝিবা অতল-তলে বিলীন হয়। অনেক মন্ত্রণা, অনেক সভা-সমিতি হইল। 'ফিল্ড এন্ড একাডেমির' গৃহে আমাদের শ্রদ্ধেয় দেশভক্ত স্বদেশবাসী শ্রীযুক্ত আবদুল রসুল জাতীয়-শিক্ষার উপকারিতা সম্বন্ধে এক মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করিলেন। পটলডাঙার মল্লিক বাড়িতে, কবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতার সমবেত ছাত্রমণ্ডলীর নিকট জাতীয় শিক্ষাব ভার নিজ হস্তে গ্রহণ করার উপকারিতা নির্দেশ করিয়া, আবেগময়ী উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন। কিন্তু, শিক্ষাভার স্বহস্তে লইবার অন্তরায় হইল অর্থাভাব। এই অমানিশার অন্ধকারে পুণ্যশ্লোক শ্রীযুক্ত 'রাজা' সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা কল্পে এক লক্ষ টাকা দান করিতে প্রস্তুত হইয়া, বঙ্গে নব আশা-চন্দ্র সমুদিত করিয়া অন্ধকার কিছু দূর করিলেন। আসন্ন বিপন্ন জাতীয় তরণীর পুরোভাগে সুবোধচন্দ্র কর্ণধার, ধীরে ধীরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সূচনা হইল। গৌরীপুরের পুণ্যশ্লোক মহাভাগ যুবক জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর, রাজপুরুষদিগের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করিয়া, অকুতোভয়ে পঞ্চলক্ষ টাকা দান করিলেন; জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হইল। ইহার পরে, সুপ্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী দেশমান্য শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহোদয় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া, ইতিমধ্যে বঙ্গীয় শিল্প বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। কেহ কি ভাবিতে পারিয়াছিল, যে দেশের ধনীবৃন্দ এতদিন রাজপদ-সেবায় অজস্র ধারে অর্থ ব্যয় করিয়া কৃত কৃতার্থ হইয়াছেন, আজ তাঁহারা অন্তর্মুখীন হইয়া দেশসেবার সহায়তা কল্পে অগ্রসর হইবেন। সমস্তই বিধাতার কৃপা; তাঁহার কৃপায় অসাধ্য সাধিত হয়।

সরকার দেখিলেন, নিগ্রহ অত্যাচার ব্যতীত এই আন্দোলন দমনের আর উপায়ান্তর নাই। কাজেই রঙ্‌পুরে ভদ্রলোকদিগকে পাহারাওয়ালার শ্রেণিভুক্ত করিয়া, মাদারীপুরে বালক অনন্তমোহনের, ময়মনসিংহের যুবক খগেন্দ্রজীবনের, বল্লার শ্রীমান রাজেন্দ্রনাথের, ময়মনসিংহের এডওয়ার্ড বিদ্যালয়ের শিক্ষক বিপিনবিহারী দাশগুপ্তের, বরিশাল জেলার উকিলদ্বয়ের, জলপাইগুড়িতে ৩টি বালকের, রাজবাড়ি মোহরমল্লার, সিরাজগঞ্জের ডাক্তার শশধর নিয়োগীর, ঢাকা নর সিংহদীয় জমিদারদের, বরিশাল নলছিটের মুসলমান জমিদারদের, মাধবপাশায় অধিবাসীদের, রঙ্‌পুর কুড়িগ্রামের স্বদেশভক্তদের, বিভিন্ন উপায়ে, নানা প্রকারের নিগ্রহ নির্যাতন আরম্ভ করিলেন। অত্যাচারিত বাঙালি—তবুও মাতৃ-মন্ত্র ভুলিল না, বরং আরও দৃঢ়কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' বলিতে লাগিল। কলিকাতার কেরোল দারোগা যখন যুবক যতীন্দ্র সিংহকে, দুই জন চৌকিদার দ্বারা বাঁধিয়া, নিচজনোচিত প্রহার করিতে করিতে বলিয়াছিল,—'Where is your Bandemataram now"—এখন

তোমার বন্দে মাতরম্ কোথায়? তখন প্রহারে জর্জরিত রক্তাক্ত কলেবর বীর যতীন্দ্রমোহন নির্ভীকচিত্তে প্রত্যুত্তর করিল,—"Bande Mataram is still in my heart"—বন্দেমাতরম্ এখনও আমার অন্তরের মধ্যে রহিয়াছে। যতীন্দ্রমোহন আরও বলিল, বন্ধন করিয়া এরূপ কাপুরুষের ন্যায় প্রহার করিতেছ কেন; উন্মুক্তভাবে সমান অবস্থায় আইস, উভয়ের বল ও শক্তির পরীক্ষা হউক। সেই দুর্বৃত্ত কেরোলকেও প্রকৃত আত্মতেজ ও শক্তির নিকট নত হইতে হইয়াছিল; কেরোল ইহার বন্ধন-মোচন করিয়া দিল। ময়মনসিংহের বালক খগেন্দ্রজীবনের অকুতোভয় ও সাহস দর্শনে মুগ্ধ হইয়া, পুলিশের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট প্রহারে উদ্যত পাহারাওয়ালাকে নিবারণ করিয়া বলিলেন, —"মৎ মার, এ শেরকা বাচ্চা"। বাস্তবিক তাঁহারা এদেশে সিংহ শাবক। বল্লার রাজেন্দ্রলাল ইংরেজের আদালতে দাঁড়াইয়া Charge Sheet—অভিযোগ জ্ঞাপক নথি—সহি করিবার কালে বিলাতি কলম দেখিয়া বলিল, "আমি উহা স্পর্শ করিব না।" আদালতকে বাধ্য হইয়া দেশি কলমের বন্দোবস্ত করিতে হইল। রাজেন্দ্র ইহাতে বিচারকের অসন্তোষের কারণ হইয়া, তাঁহার নিজের শাস্তির পথ প্রশস্ত করিল, কিন্তু সেদিকে তখন তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই।

জাতীয় শিক্ষা-সমিতি প্রথমে রঙ্পুরের ছাত্রদের উপকারার্থে, তাঁহাদের জন্য একটা পন্থা করিবার উদ্দেশ্যে, স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু, যতই অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই জনসাধারণের দৃষ্টি বহির্মুখীন হইতে অন্তর্মুখীন হইল। ইংরেজের বিদ্যালয়ে মনুষ্যত্বের বিকাশ হইলে হইতেও পারে; যাহাতে জাতীয় শক্তি উদ্বোধিত হয়, তাহা কখনই শিক্ষা দেওয়া হয় না। বরিশালের গুরখাদেব অত্যাচারে লোকের চক্ষু আরও ফুটিল। সকলে বুঝিল, দেশের রাজা, নিজ দেশীয় বণিকমণ্ডলীর স্বার্থের দিকে তাকাইয়া, অনায়াসে রাজধর্ম বিস্মৃত হইলেন। সেই স্বার্থ সংরক্ষণার্থে ব্যাকুল হইয়া সরকার বাহাদুর নিরপরাধী প্রজাপুঞ্জকে উৎপীড়িত করিয়া, তাঁহাদের জাতীয় উদ্দীপনার অবসান করিবার জন্য, তাঁহাদিগের মধ্যে, দয়ামায়া বিবর্জিত চরিত্রবিহীন কতকগুলি গুরখা-সেনা ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহারা বিনা কারণে বরিশালের উকিল শ্যামাচরণের মস্তকে লগুড়াঘাত করিয়া অর্ধমৃত করিল; বিনামূল্যে দোকানদারদের পণ্যাদি লুণ্ঠন করিল; লোকের বাড়ির অন্তঃপুরে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া, যথাতথা অত্যাচার করিতে লাগিল; রমণীর সতীত্ব রক্ষা কঠিন ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। রাজশক্তি এ সকলের প্রতিকার করিতে পরাঙ্মুখ। এই সকল লোমহর্ষক ব্যাপারে, দেশে রাজভক্তি যে কতদূর শিথিল হইয়াছে, একটু ভিতরে প্রবেশ করিলেই, বুঝিতে পারা যায়।

এই অত্যাচার অবিচারের ফলে দেশের মধ্যে একটা আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি সজাগ হইয়া উঠিল। আত্মরক্ষার জন্যই যে শিক্ষা প্রণালী আমাদের স্বীয় করায়ত্ত হওয়া একান্ত আবশ্যক, এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ রহিল না। ইংরাজ যে কেবল স্বার্থপরবশ হইয়াই শিক্ষা বিধান করে, তাহা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইল। এই নবজীবনের সঙ্গে সঙ্গেই ইতিহাস পর্যালোচনা দেশের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। দেখা গেল, ইংরাজ এদেশে শিক্ষা বিস্তার করিতে সদাই শঙ্কিত ও সঙ্কুচিত। শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, পাছে দেশের লোকের মানসিক শক্তি স্ফূর্তি পায়, নিজ অধঃপতিত অবস্থার জ্ঞান জাগরিত করে ও উন্নতির আকাঙ্ক্ষা বলবতী হয়, তবেই ইংরাজকে নানা প্রকারে ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হইবে। এই জন্য সরকার বাহাদুর সতত ভয়ে ভয়ে শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্তিত করেন। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে, উইলবারফোর্স প্রথম যখন ভারতে ইংরাজি শিক্ষা প্রচারের প্রস্তাব করেন, তৎকালীন কোম্পানি বাহাদুরের জনৈক সদস্য বলেন—"আমরা আমেরিকায় শিক্ষা বিস্তার করিয়া সে দেশ হারাইয়াছি; ভারতে আর সে ভুল করা হইবে না।" কি উদার নীতি! ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে লর্ড এলেনবরার সহিত স্বর্গীয় মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে শিক্ষাসম্বন্ধীয় আলোচনা হয়, তাহা একবার ভাবিয়া দেখা উচিত। মহাত্মা দ্বারিকানাথ একদা কলিকাতা টাউন হলে শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটি বক্তৃতা করেন। তৎপর, লাট সাহেবের সাক্ষাতে সেই প্রসঙ্গ উঠিয়াছিল। লাট সাহেব

বলিলেন—"তোমরা যে দেশীয়দিগকে উপযুক্তভাবে শিক্ষা দিতে চাও, বাস্তবিক তাহা হইলে এদেশে আমাদের তিন মাসের অধিক থাকিতে হইবে না।" দ্বারিকানাথ হাসিয়া বলিলেন,—"তিন মাস কেন, তিন সপ্তাহ"। লাট সাহেবও তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। যাক; রাজ পুরুষদিগের শিক্ষানীতির মূল সূত্র বুঝিতে আর কাহারও বাকি রহিল না। ফলতঃ, ক্রমে ক্রমে, রঙ্পুরের দেখাদেখি, ময়মনসিংহ, দিনাজপুর, ঢাকা প্রভৃতি নানা স্থানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইতে লাগিল।

ফুলার লাট (রাহু কাটিয়া গিয়াছে) যখন সফরে বাহির হইতেন, পূর্ব-বঙ্গ তাঁহাকে কোনরূপ অভিনন্দন পত্র প্রদান বা অভ্যর্থনা করে নাই। ইহা জাতীয় জীবনের এক অগ্নি পরীক্ষা — ইহাতে উত্তীর্ণ হইয়া পূর্ববঙ্গ প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভ করিয়াছে। এই মনুষ্যত্বের ফলে, আজ ফুলারকে চির-বিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। জাতীয়শক্তি কেন্দ্রীভূত হইলে কতদূর কৃতকার্য হইতে পারে, ইহাই তাঁহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। বাঙালি বিদ্বেষী 'পাইওনিয়ার' পত্রিকাকেও স্বীকার করিতে হইয়াছে—"It is a victory for the popular Leaders" — দেশীয় নেতৃবৃন্দের ইহা এক মহাজয়।

স্বদেশ-ভক্ত বীরজনের পূজা, জাতীয় জীবনের প্রধান অঙ্গ। বিগত ফাল্গুন মাসে কলিকাতায় গ্রান্ড-রঙ্গমঞ্চে স্বদেশের জন্য লাঞ্ছিত দেশভক্তদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ বিরাট সভার অধিবেশন হয়। তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়া দেশবাসী ধন্য হইয়াছে। এইরূপ নানা স্থানেই উৎপীড়িত স্বদেশ-ভক্তের পূজা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। দেশের নামে যাহারা ইংরাজ আদালতে শাস্তি পাইয়াছে, তাঁহাদের কারামুক্তির দিনে অনেকস্থলে সহস্র সহস্র লোক কারাদ্বারে উপস্থিত হইয়া, তাঁহাদের আদর অভ্যর্থনা ও পুষ্প চন্দনে সম্বর্ধনা করিয়াছে।

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশনে বঙ্গবাসী নবজীবন লাভ করিয়াছে। নববর্ষের প্রথম দিনে, পুণ্যভূমি বরিশালে, রাজশক্তি তাড়িত প্রজাশক্তি এক অভূতপূর্ব বীর্য লাভ করিয়াছে। ধৈর্যই যে বীর্যের প্রকৃত পরিচায়ক,—তাহা পুলিশ প্রহৃত চিত্তরঞ্জন, ব্রজেন্দ্রনাথ, ফণিভূষণ প্রভৃতি যুবকবৃন্দ বরিশালে দেখাইয়াছে। শরীরের রক্ত দিয়া, ইহারাই প্রকৃত মাতৃপূজা সম্পন্ন করিয়াছে। ভারতের রাজশক্তি যে প্রচলিত আইনের ধার ধারে না, লৌকিকতা মানে না, বিধিবিধান মানে না, যথেচ্ছাচারী হইয়া যে দেশনায়ক সর্বজনপূজ্য সুরেন্দ্রনাথকে পর্যন্ত লাঞ্ছিত করিতে কুণ্ঠিত নয়, নানা স্থানের সমবেত প্রতিনিধিবর্গ স্বচক্ষে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। রাজা এখন, নানা প্রকারে, সংবাদ-পত্রে, সত্য মিথ্যা কৈফিয়ৎ প্রকাশ করিলেও, এ অবিচার অত্যাচারের কথা দেশের কুটিরে কুটিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। সকলে বুঝিয়াছে, যাহা একবার সংঘটিত হইয়াছে, তাঁহার পৌনঃপুনিক অভিনয় অসম্ভব নহে। পাশববলের বিরুদ্ধে পাশব বল, শক্তির উত্তরে শক্তি ও হিংসার প্রতি-হিংসাই প্রকৃত ঔষধ। সেই কারণে, বরিশালের ঘটনার পরে, সকলেই শক্তি সঞ্চারে কৃতসঙ্কল্প হইতেছেন। শক্তি-মন্ত্রে দীক্ষিত করিবার মানসে, বরিশালের অধিবেশনান্তে, দেশমান্য শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল, স্বদেশভক্ত শ্রীযুক্ত অরবিন্দ ঘোষ ও 'রাজা' শ্রীযুক্ত সুবোধচন্দ্র মল্লিক সমভিব্যাহারে পূর্ববঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, অগ্নিময়ী বক্তৃতায় জন-সাধারণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। ইহাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে, সাধারণ লোক পর্যন্ত রাজনীতির নানা জটিল কূটপ্রশ্নসকল হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইল। এতদিনে বহির্মুখীন চিন্তা-স্রোত অন্তর্মুখীন হইল।

বিগত জ্যৈষ্ঠমাসের পূর্ণিমা তিথিতে কলিকাতার সঙ্গীত সমাজের সম্মুখস্থ বৃহৎ মাঠে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীর রাজ্যাভিষেক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে মহারাষ্ট্র কুলতিলক নির্ভীক চিত্ত শ্রীযুক্ত বাল গঙ্গাধর তিলক ও অমরাবতী দেশনায়ক শ্রীযুক্ত খাপর্দে মহোদয় আগমন করেন। বাঙালির সহিত মহারাষ্ট্রীয় মিত্রতাবন্ধন এই সূত্রে সুদৃঢ় হইয়াছে। এই উৎসবে তিলক মহাশয় বলিয়াছিলেন,—"দেশকে ভালবাসিতে শিক্ষা কর, বিদেশি বর্জন আপনা হইতেই আসিবে। অন্যের অনুগ্রহ অনুকম্পা ভিক্ষাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া আত্মশক্তিতে দীক্ষিত হও।" রাজপুরুষদের দয়াকে

তিনি কারারুদ্ধ বন্দির প্রতি কারাধ্যক্ষের দয়ার সহিত তুলনা করেন। অধ্যক্ষ বন্দিকে বেত্রাঘাত করে ; পরে, রক্তাক্ত কলেবরে দর্শনে দয়ার্দ্র হইয়া, ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দুঃখ ও সহানুভূতি প্রকাশ করে। রাজনৈতিক দয়া এই প্রকার।

এই আন্দোলনের প্রথমাবস্থায় বঙ্গবাসী অঙ্গচ্ছেদের শোকে অধীর হইয়া অভিমানসূচক প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল,—"যতদিন না বিভক্ত বঙ্গ-যুক্ত হয়, ততদিন বিলাতি বর্জন করিব"। আশা ছিল, এই প্রতিজ্ঞার ফলস্বরূপ প্রজাশক্তি কিছু বলশালী হইলেই, রাজা নত হইয়া আসিবেন ও মনস্কামনা সিদ্ধ করিবেন। ক্রমে ক্রমে সে বিশ্বাস অনেকটা শিথিল হইয়াছে। স্বনামখ্যাত অধ্যাপক গোখলে মহোদয়, বিগত ১১ জুলাই তারিখে, লণ্ডন ইষ্ট-ইণ্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশনে, ভারতে স্বায়ত্তশাসন সম্বন্ধে এক সারগর্ভ প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁহাতে এইরূপ ভাবের কথা বলিয়াছিলেন—"ভারতের রাজপুরুষগণ যাহাই বলুক না কেন,ভারতের শিক্ষিত সমাজ পূর্বে কখনও ইংরাজ শাসন হইতে বিচ্যুত হইতে চায় নাই। ...নবাগত শাসনকর্তাদের চরিত্র-মাধুর্য, ও জগতে তাঁহাদের স্বাধীনতার বন্ধু বলিয়া খ্যাতি এবং সর্বোপরি ভারত শাসনে তাঁহাদের বিজ্ঞাপিত উদার সাম্যনীতি অবলোকনে ভারতবাসির মনে এক ঐন্দ্রজালিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। তৎসঙ্গে, ভারতে ইংরাজ কর্তৃক শান্তি-স্থাপনা, তথায় পাশ্চাত্য সর্বোচ্চ শাসন-প্রণালী প্রবর্তন, উচ্চ-বিজ্ঞান-শিক্ষা বিধানার্থে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, বাক্য ও লিপির স্বাধীনতা দান, গমনাগমনের সুবিধার জন্য রেলবর্ত্ম সৃষ্টি, সংবাদ প্রেরণের জন্য টেলিগ্রাফ ও ডাকঘরের প্রতিষ্ঠা ও বিস্তার ইত্যাদি নানা বিষয়ে, এবং এই সমস্তের আনুষঙ্গিক সুখ-স্বচ্ছন্দতা লাভ করিয়া, কৃতজ্ঞ ভারতবাসী প্রথম অবস্থায় মনে মনে ইংরাজকে যথার্থ ভক্তি করিত। বর্তমান অত্যাচারাদিতে অবিচারে, রোগ-শোক দুর্ভিক্ষ যন্ত্রণায় প্রপীড়িত নর-নারীর প্রাণে কিন্তু ক্রমেই সন্দেহ বাড়িতেছে। মরীচিকা, এই কুহক, এই বিজাতীয় মোহ-ইন্দ্রজাল ক্রমেই অপসারিত হইতেছে। যাহা,পূর্বে সুখসমৃদ্ধি বলিয়া বিবেচিত হইত, ক্রমে তাহা ভারবহ হইয়া দাঁড়াইতেছে। ভূয়ো ভূয়ঃ আত্ম-সম্মানে আঘাত, মনুষ্যত্ব বিকাশের সুযোগের অভাব, জাতীয়তার ক্রমাবনতি, পরাধীনতার জন্য বাণিজ্য-ঘটিত আর্থিক অধোগতি ইত্যাদি নানা প্রকারের আত্মক্ষতি, ওই কুহকে পড়িয়া, জনসাধারণ এতদিন ততটা লক্ষ্য করে নাই। কিন্তু আজকাল সে সকল নিতান্ত অসহ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে...।" গোখলে মহোদয় এই মত পরিবর্তন সম্বন্ধে যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহার প্রতি বর্ণ সত্য। তাঁহার মতে ভারতবাসী সমস্ত সত্ব ও অধিকার না পাইলে, এই দুরারোগ্য বিদ্বেষ বীজ মুক্ত হইবে না। তিনি বলেন, — "ভারতবাসীকে এমন অধিকার দিতে হইবে যাহাতে রাজা প্রকৃত প্রস্তাবে প্রজার দাস হইবেন।" "Till at last the officials will become in fact, as in theory, the servants of the people"— কিন্তু হায়, এ আশা দুরাশা মাত্র। জাতি সকলের শক্তি এক সমান না হওয়া পর্যন্ত, বুঝি বা দুর্বলের উপর প্রবলের আধিপত্য বিস্তার অবশ্যম্ভাবী। তাঁহাদের ভিতরে কোন ন্যায়, কোন সত্য, কোন ধর্ম বলিয়া জিনিস থাকে না। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক হারবার্ট স্পেন্সার তাঁহার 'সমাজতত্ত্বে' (Socialism) বলিয়াছেন—"যে সমস্ত ভাব ও কার্য আমাদের স্বার্থের বিরোধী নহে, তাঁহাকে আমরা সাধু ও মঙ্গলকাজ বলি, এবং যে সকল কার্য আমাদের স্বার্থ ও প্রভাব বিনষ্ট করিতে প্রয়াসী হয়, তাঁহাকে আমরা অন্যায় ও অবৈধ কার্য বলিয়া ঘৃণা করি। 'উইলিয়ম টেল' প্রভৃতির পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক উপাখ্যানে, কোন দেশের নিপীড়িত লোকের উৎপীড়নকারী রাজশক্তির বিপক্ষে উত্থান ও নির্ভীকতা, স্বদেশপ্রীতি ও সাহস দেখিলে আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু, আমরাই যদি সেই দেশবাসীকে দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া থাকি, আর যদি তথায় উইলিয়ম টেলের ন্যায় লোক আবির্ভূত হয়, তাহা হইলে প্রশংসা ত দূরের কথা—ঘৃণা ও ক্রোধে মন গর্ গর্ করে। আমাদের দাসত্ব-শৃঙ্খল ছিন্ন করিতে হিন্দুরা চেষ্টা পাইলে, তাঁহাদিগকে পাপাসক্ত জ্ঞান করি...।" এই অভিমতের সার্থকতা প্রতিপাদনার্থে আমাদিগকে বহু দূরে যাইতে হইবে না। অল্পদিন হইল পার্লিয়ামেন্ট মহাসভায় এক

দিকে বিপ্লবকারী "ডুমার" সভ্যদিগকে স্বয়ং ইংলণ্ডের রাজমন্ত্রী নানা প্রকারে প্রশংসা করিলেন—অপরদিকে, আবার তাঁহারই অনুচর ফ্রেডরিক হ্যারিসন ভারতের মাতৃভক্তদিগকে রাষ্ট্রবিপ্লবকারী বলিয়া উক্ত সভায় নানা প্রকার কটূক্তি করিয়াছেন। রাজশক্তির স্বার্থের অন্তরায় যাহাতে সম্ভব হইতে পারে, সে সমস্তের বিরুদ্ধে ন্যায় ও অন্যায়রূপে, সমর ঘোষণা ইংরাজ করিবেই করিবে। প্রজাশক্তিকে সে সকল উপেক্ষা করিয়া, স্বীয় কর্তব্য সাধন করিতে হইবে। যেখানে রাজার স্বার্থ প্রজার স্বার্থের অনুকূল, তথায় রামরাজত্ব বিরাজমান। যে দেশে দুই বিরোধী স্বার্থ পরস্পরে প্রতিযোগিতা করিয়া থাকে, তথায় ঘোর সংগ্রাম হইবেই হইবে। ভারতে প্রজাপুঞ্জের এখনও অনেক সহ্য করিতে বাকি আছে।

আজ প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল, বঙ্গীয় সাহিত্য সম্রাট স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র অমর কণ্ঠে 'বন্দেমাতরম্' গীত গাহিয়াছিলেন। আর কেহ না বুঝিতে পারিলেও বিচক্ষণ ভবিষ্যৎদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, যথা সময়ে ঐ গীতের মর্মে বঙ্গবাসী সকলে অনুপ্রাণিত হইবে। আজ সে শুভদিন উপস্থিত। বহুদিনাবধি বঙ্গের আধুনিক কবিমণ্ডলী—হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি মহারথীগণ—তাঁহাদের সুললিত বীণার ঝঙ্কারে মাতৃ-পূজা করিয়া আসিতেছেন। আজ তাহা সর্বভূতে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। স্টার থিয়েটার প্রমুখ বঙ্গীয় নাট্যশালা, গত কয় বৎসর যাবত জাতীয় উদ্দীপনা পূর্ণ 'প্রতাপাদিত্য' প্রভৃতি নাটকাদির অভিনয়ে লোকের মনকে বর্তমান আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করিতে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। এই সমস্তের ফলে, এক অভিনব জাতীয় একতা ও আত্মসংবর্ধনার প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়াছে। ফলে, বারন কোম্পানির কেরানি মণ্ডলীর, ট্রামওয়ে কোম্পানির কর্মচারীবর্গের, মুদ্রাকরদিগের ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। অত্যাচারিত পদদলিত বাঙালি; আত্মসম্মানের মূল্য বুঝিয়াছে, একে অন্যের ব্যথায় ব্যথিত হইতে শিখিয়াছে; পরস্পরে সহানুভূতির ভাব জাগিয়াছে।

আমরা বিলাতি পণ্য বর্জন ব্রত লইয়া আরম্ভ করিয়াছিলাম, ধীরে ধীরে, নানা ঘটনাবৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত মাটি কাটিতে আসিয়া কোহিনুর পাইয়া বসিয়াছি। সে রত্ন আমাদের উদ্ধার করিতেই হইবে, ফিরিলে চলিবে না।

দেশ প্রীতি জাগিলে দেশের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে আর সকল সাধনা সিদ্ধ হইবেই হইবে, সকল অভাব পূর্ণ হইবে। আজ এই উৎসবের দিনে, সকলে সম্মিলিত হইয়া, বিধাতার আশীর্বাদ ভিক্ষা করি। তিনি আমাদের স্বদেশ-প্রীতি অটুট রাখুন।

বিপদভঞ্জন আমাদের সকল বিপদের অবসান করিবেন। দীন দুর্বলের একমাত্র সহায় ও অবলম্বন তিনি; তাঁহার কৃপা পাইলে শরীরে শক্তিসঞ্চার হইবে—হৃদয়ে দৃঢ়তা আসিবে—মনে প্রতিজ্ঞার বল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাইবে। বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলীর ভিতরে বিধাতার কি অপার করুণা আমরা দেখিতে পাইলাম। এই এক বৎসরের সাধনের ফল, আমরা শিবশঙ্করের মঙ্গলময় চরণে নিবেদন করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। বিলাতি পণ্য বর্জন উপলক্ষ্য মাত্র—জাতীয় জীবন প্রতিষ্ঠাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। বিধাতা আশীর্বাদ করুন, আমরা সেই উদ্দেশ্য সাধনে সফলতা লাভ করি।

বিগত বৎসরের সাধনার ফলে বাঙালির 'বাক্যবীর' অপবাদ কথঞ্চিৎ অপসারিত হইয়াছে। স্বদেশি জাহাজ আজ চট্টগ্রাম হইতে পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া রেঙ্গুন যাইতেছে। তিনটি কাপড়ের কল স্থাপনের আয়োজন প্রায় সফল হইয়াছে। দেশলাইয়ের কারখানা স্থাপিত হইবার আয়োজন হইতেছে। আরও অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পাদি দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে,—এই অল্প সময়ের মধ্যে সে সমস্ত নির্দেশ করা অসাধ্য।

আশা—বুকভরা আশা লইয়া, ভবিষ্যতের দিকে চল, আমরা অগ্রসর হই। ভাগ্যসূর্য পূর্বগগনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহার পশ্চিমের আবর্তন শেষ হইয়াছে। ঐ শোন আজিও স্বর্গীয় স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার জলদগম্ভীর স্বরে আকাশ হইতে ভবিষ্যৎ বাণী প্রচার করিতেছেন—"আবার

পূর্বগগনে বালার্ক কিরণরাশি ধীরে ধীরে এশিয়াকে অনুপ্রাণিত করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সে নবীন তপন মধ্যাহ্ন গগনে আসিয়া, নিশ্চয়ই এই সুজলা সুফলা, মলয়জ শীতলা শস্য শ্যামলা ভারতকে সগৌরবে আলোকিত করিবে।" জয় দয়াময়, তাই হোক।

আয় ভাই আয়, বান ডাকিয়াছে—স্রোতের প্রতিকূলে যাস্ না; মৃত্যু নিশ্চয়। চল, নির্ভয়ে চল—

"নিশিদিন ভরসা রাখিস্
ওরে্ ভাই হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস্
সে পণ তোমার রবেই রবে।

নব্য ভারত ১৩১৩ আশ্বিন

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সর্ববিষয়ে স্বদেশি

স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, কেবল বাজারে গিয়া জিনিষ কিনিবার সময় স্বদেশি হইলেই চলিবে না, সর্ববিষয়েই স্বদেশি হইতে হইবে। তাঁহাদের মতে যাহারা হ্যাটকোট পরেন, তাঁহারা ধুতি চাদর ধরুন; যাহারা টেবিলে খান, তাঁহারা আসন পাতিয়া মেঝেতে বসুন; বাবুর্চি ছাড়াইয়া ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করুন; বিলাত যাওয়া বন্ধ করুন; এক কথায় বলিতে গেলে সকলেই—টিকি রাখুন।

এক সময় ছিল যখন উক্তরূপ "অপকার্য" অর্থাৎ হ্যাটকোট পরা, টেবিলে খাওয়া প্রভৃতি, কেবল বিলাত প্রত্যাগতগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। অদ্যাবধি যদি তাঁহাই থাকিত, তবে বর্তমান আলোচনার প্রয়োজন হইত না; কারণ সংখ্যা হিসাবে বিলাত প্রত্যাগতগণ সমাজের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু এখন দেখিতে পাইতেছি, অনেক রাজা, জমিদার, উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, হ্যাটকোট ব্যবহার করিতেছেন, টেবিলে বসিয়া "ফরজু খানসামা"র হস্তপক্ক খানা খাইতেছেন এবং অন্যান্য আচারেও "সাহেব" হইয়াছেন। ইহাতে কোন গর্হিত কার্য হইতেছে কিনা, তাঁহাই প্রবন্ধে আলোচনা করিতে চেষ্টা করিব।

উক্ত আচরণগুলি সাহেবদের অনুকরণ সন্দেহ নাই। কিন্তু অনুকরণ মাত্রই কি দূষণীয়? যে বন্দেমাতরমের প্রভাবে আজ একথা উঠিয়াছে, সে বন্দেমাতরম্ কি? তাহা প্রাচ্য না পাশ্চাত্য? তাহা পূর্বাবধিই আমাদের নিজস্ব ছিল, অথবা ঘৃণিত সাহেবদের নিকট হইতেই আমরা তাহা পাইয়াছি?

এই যে বন্দেমাতরম্—অর্থাৎ Patriotism—অর্থাৎ স্বদেশপ্রীতি, ইহার জন্য আমরা পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী। পূর্বে আমরা রাজার জন্য যুদ্ধ করিয়াছি, ধর্মের জন্য মাথা দিয়াছি কিন্তু দেশের জন্য প্রাণদান, এ ভাব আমাদের মনে পূর্বে ছিল কি? আমি ত কোথাও দেখিতে পাই না। যদি কোনও শাস্ত্রদর্শী মহাত্মা, সংস্কৃত সাহিত্য হইতে Patriotism শব্দের প্রতিশব্দ বাহির করিয়া দিতে পারেন, কেহ দেশকে মা বলিয়া অথবা অন্য কিছু বলিয়া পূজা করিতেছে দেখাইয়া দিতে পারেন, তবে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ও আহ্লাদিত হইব।

এই 'বন্দেমাতরম্' বঙ্কিমচন্দ্র যেখানে প্রথম অবতারণা করিয়াছেন, সেখানে তিনি কি লিখিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি লিখিয়াছেন—

মহেন্দ্র গীত শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইল, কিছু বুঝিতে পারিল না, সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা মাতা কে,—জিজ্ঞাসা করিল "মাতা কে?"

উত্তর না করিয়া ভবানন্দ গাইতে লাগিলেন—

> শুভ্রজ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্—
> ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
> সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
> সুখদাং বরদাং মাতরম্।

মহেন্দ্র বলিল—"এ ত দেশ, এ ত মা নয়।"

ভবানন্দ বলিলেন—'আমরা অন্য মা জানি না,—'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী'—"

মহেন্দ্রের মুখ দিয়া বঙ্কিমবাবু যাহা বলাইয়াছেন, তাহা বাঙালির কথা,—বাঙালির বিস্ময়। বাঙালির নিকট এ ভাব সম্পূর্ণ নূতন। দেশ যে মা, ইহা আমরা কস্মিন্ কালেও জানিতাম না। বঙ্কিমবাবুকে মুখপাত্র করিয়া পাশ্চাত্য সভ্যতালক্ষ্মীই আমাদিগকে এ মধুর বাণী শুনাইলেন। ঐ যে সংস্কৃত শ্লোকার্ধটুকু ভবানন্দের মুখে বাহির হইয়াছে, তাহা হইতে হঠাৎ এমন মনে হইতে পারে বটে, এ ভাব আমাদের চিরপুরাতন হইলে অত্যন্ত সুখী হইতাম। কিন্তু সম্পূর্ণ শ্লোকটি এবং স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করিলে সে সুখকর মোহবিদূরিত হইয়া যায়। শ্লোকটি রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে আছে। যুদ্ধ অবসিত, সীতার উদ্ধার সম্পন্ন হইয়াছে, চতুর্দশ বর্ষ বনবাসকালও শেষ হইয়া আসিয়াছে। শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইয়া বিভীষণকে বলিতেছেন—

ইয়ং স্বর্ণপুরী লঙ্কা মিত্রাস্মভ্যং ন রোচতে।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।।

হে মিত্র, এমন যে স্বর্ণপুরী লঙ্কা, ইহাতে আমার আর তৃপ্তি নাই। আমি এখন গৃহে গিয়া জননী কৌশল্যা ও জন্মভূমি অযোধ্যানগরীকে দর্শন করিতে পারিলে বাঁচি, কারণ আমার জননীদেবী ও অযোধ্যানগরী আমার নিকট স্বর্গাপেক্ষাও গরীয়সী। ইহাই ঐ উক্তির ভাবার্থ। ভবানন্দ যে মহাভাবে অভিভূত হইয়া দেশকে মা বলিতেছেন, সে ভাব এখানে কোথায়? রামচন্দ্রের জন্ম যদি অযোধ্যায় না হইয়া বারাণসীতে হইত; তাহা হইলে বারাণসীই তাঁহার কাছে স্বর্গাদপি গরীয়সী হইত। অযোধ্যা কিছুই হইত না। আরও একটা বিষয় পাঠক লক্ষ্য করিবেন। জন্মভূমিকে জননী বলা হইতেছে না। একটা "চ" থাকিয়া জননীকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। সুতরাং জননী অর্থে যে কৌশল্যা দেবী তাঁহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই।

দেশকে মা বলিয়া পূজা করিবার কল্পনা আমরা কখনও যে করি নাই তাঁহার আর একটা প্রমাণ, ভারতমাতা বা বঙ্গমাতা নামে আমাদের কোন দেবীপ্রতিমা নাই। ভবানন্দ যে ভাবে দেশকে মা বলিয়াছেন, সে পূজার ভাব আমাদের মনে থাকিলে, নিশ্চয়ই পূজার জন্য দেবীমূর্তি থাকিতেন। পঞ্জিকায় সে পূজার তিথি নক্ষত্র নির্দিষ্ট থাকিত এবং নিত্যকর্ম পদ্ধতিতে তাঁহার মন্ত্রও পাওয়া যাইত।

"বন্দেমাতরমে"র মধ্যে দুইটা বিভিন্ন Idea বা ভাব পাওয়া যাইতেছে—উভয়টার জন্যই আমরা ঐ ঘৃণিত সাহেবদের নিকট ঋণী। প্রথম idea ভারতবর্ষ একটি দেশ, তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অংশগুলি প্রদেশমাত্র। দ্বিতীয় idea এই দেশ আমাদের জন্মভূমি বলিয়া জননীর ন্যায় পূজনীয় এবং এই দেশের কল্যাণের জন্য আমাদের ধনপ্রাণ উৎসর্গ করা আমাদের পরমধর্ম।

এখন প্রথম ভাবটির বিষয় চিন্তা করুন। ভারতবর্ষ একটি সমগ্র দেশ এবং আমাদের জন্মভূমি, এ ভাবটি আমরা কি উপায়ে পাইলাম? ইংরাজ যদি সমস্ত ভারতবর্ষের একছত্র অধিপতি না হইত, তবে সমস্ত ভারতবর্ষকে একটি দেশ বলিয়া আমরা মনে করিবার অবসর পাইতাম কি? পূর্বেও সমগ্র ভারতবর্ষ একছত্রী সম্রাটের অধীন ছিল বটে, কিন্তু কোনও কালে সমস্ত ভারতবর্ষের প্রজাপুঞ্জের রাজনৈতিক একত্বভাব জন্মায় নাই। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের বিচার ব্যবস্থা প্রভৃতি সমস্তই বিভিন্ন ছিল। যিনি সম্রাট, তিনি করগ্রাহী সম্রাট ছিলেন মাত্র, দূর প্রদেশের শাসনকার্য তাঁহার হস্তে ছিল না। একরাজা যেমন ভিন্ন ভিন্ন দেশের রাজা হইতে পারেন, সেইরূপ ভাবটাই ছিল। রাজা এক হইলেও, দেশ এক হয় নাই। সুতরাং ভারতবর্ষ যে এক এ idea-টাই খাঁটি স্বদেশি নহে; যেহেতু বিদেশি আসিয়াই এরূপ ঘটাইয়াছে। এবং এ idea টা এখনও পর্যন্ত আমাদের অস্থিমজ্জায়

প্রবেশ করে নাই। এখনও বাঙালি কলিকাতা হইতে কটকে গিয়া "প্রবাসীর আক্ষেপ" শীর্ষক কবিতা লিখিয়া কলিকাতার মাসিক পত্রে প্রকাশ জন্য পাঠায়। এখনও বিহারে, উত্তর-পশ্চিমে, বাঙালি কেরানিরা দরখাস্ত লেখে—"Foreign country-তে বাস করিতেছি, ২০ টাকা বেতনে আমার কুলায় না, কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি প্রার্থনা করি।"

দ্বিতীয়তঃ দেশপ্রীতির ভাবটাও যে আমাদের নিজস্ব নহে, পরের নিকট পাইয়াছি, তাহা উপরেই দেখাইয়াছি। য়ুরোপীয় জাতিগণের ইতিহাসে যুদ্ধ বিগ্রহ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা ছিল। তাই স্বদেশপ্রীতির ভাবটা তাঁহাদের মধ্যে বিশিষ্টরূপে জাগ্রত হইবার অবসর ঘটিয়াছে। হিন্দু রাজত্বের ইতিহাস য়ুরোপীয় ইতিহাসের তুলনায় শান্তিময়। মাঝে মাঝে বড় বড় রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছেন বটে, কিন্তু ঘোড়াটি ফিরাইয়া লইয়াই চলিয়া আসিয়াছেন, ভিন্ন রাজার প্রতি কোনও রূপ উৎপাত করেন নাই। মুসলমান আবির্ভাবের পূর্বে, হিন্দুকে কেহ হিন্দুস্থান হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করে নাই, সুতরাং দেশকে মা বলিয়া জড়াইয়া ধরিবার অবকাশও হয় নাই।

এই স্বদেশ প্রীতি আমরা পরের ভাণ্ডার হইতে আহরণ করিয়া আনিয়াছি, তথাপি ইহা মহামূল্য রত্ন। এই রত্নকে আমরা চিরকাল যেন বক্ষে করিয়া রক্ষা করিতে সমর্থ হই।

জাতীয়তার ভিত্তিস্থাপনের জন্য, স্বদেশপ্রীতিই মূলমন্ত্র বা বীজমন্ত্র। ইহা ছাড়া আরও কতকগুলি মন্ত্র সাধনা আমাদিগকে করিতে হইবে,—যথা প্রজাতন্ত্রতা। যিনি রাজা তিনি দেশের প্রকৃত রাজা নহেন, প্রজাগণই দেশের রাজা। "দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই স্বদেশি ideaটি পরিবর্জন করিয়া প্রজাতন্ত্রতার উপাসনা না করিলে দেশের মঙ্গলের "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা"। "সর্ববিষয়ে স্বদেশি" হইয়া কি আমরা পাশ্চাত্য প্রজাতন্ত্রতা গ্রহণ করিতে বিরত থাকিব?

তাঁহার পর ধরুন, দেশের ধনবৃদ্ধি না করিতে পারিলে কোনও উন্নতিই আমরা করিতে পারিব না। দেশীয় শিল্পকলার উন্নতিকল্পে য়ুরোপে, আমেরিকায় আমাদিগকে গিয়া দীর্ঘকাল বাস করিয়া শিক্ষালাভ করিতেই হইবে। "সর্ববিষয়ে স্বদেশি" হইতে গেলে আমরা পুত্রটিকে কেমন করিয়া বিদেশে পাঠাই? কি খাইয়া সেখানে সে জীবন ধারণ করিবে? সন্ধ্যাহ্নিক করিবার জন্য গঙ্গাজলই বা সে পাইবে কোথায়? টিকি দুলাইয়া ভট্টাচার্য মহাশয় "সর্ববিষয়ে স্বদেশি হও" বলিয়া ত খালাস, কিন্তু এ প্রশ্নের তিনি কি উত্তর দিতে চাহেন? তাহা ছাড়া বর্ণ অনুসারে শিল্পশিক্ষার্থী পাওয়া যাইবে কোথা? আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হইলে, ক্রমে আমাদের স্বদেশি জাহাজের আবশ্যক হইবে, এবং জাহাজ নির্মাণ প্রণালী য়ুরোপে বা জাপানে গিয়া বহুসংখ্যক লোককে শিখিয়া আসিতে হইবে। উপযুক্ত শিক্ষার্থী সূত্রধর সন্তান কোথায় মিলিবে? যদি ব্রাহ্মণ কায়স্থের সন্তান এই বিদ্যা শিক্ষা করিতে যায়, তবে ভট্টাচার্য মহাশয়ের অনুমোদিত "সর্ববিষয়ে স্বদেশীয়তা" রক্ষা হইবে কি?

সুতরাং দেখা গেল, বিদেশযাত্রা, শিল্পশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও পুরাতন আচারের মর্যাদা রক্ষা করা অসম্ভব। এ বিষয়েও বিদেশি আচার অবলম্বন ভিন্ন "নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।"

পুরাতনের মধ্যে যাহা সত্য, যাহা শিব, তাহা থাকুক। তাহা বিসর্জন দিলে আমাদের কোনও উদ্দেশ্যই সফল হইবে না; বরঞ্চ বিশেষ ক্ষতি হইবারই সম্ভাবনা। দেশের লোক, আদর্শ সম্বন্ধে নিজ নিজ মত নির্ধারিত করুন। আদর্শটা কি? জাতীয় উন্নতিটাই আদর্শ? না "সর্ববিষয়ে স্বদেশীয়তাই" আদর্শ? যদি জাতীয় উন্নতিই আদর্শ হয়, তবে যে বিষয়ে "স্বদেশীয়তা" করিতে গেলে সে উন্নতির বিঘ্ন হইবে, তাহা সর্বতোভাবে বর্জনীয়।

উপরে যাহা লিখিলাম, তাঁহার সহিত যিনি একমত হইবেন, তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে, যে কোনও জিনিস বাহির হইতে আসিতেছে বলিয়াই, বিদেশির নিকট হইতে পাইতেছি বলিয়াই, তাহা নিন্দনীয় নহে। স্বদেশভক্তি, প্রজাতন্ত্রতা, বর্ণনির্বিশেষে বাণিজ্যাদি সেবা; দেশান্তর গমন, এই

সমস্ত বিষয়ে যদি আমরা সনাতন প্রথা পরিত্যাগ করিয়া বিদেশীয়ের অনুসরণ করাই কর্তব্য বলিয়া মনে করি, যদি এই সকল বড় বড় ভাবগত ব্যাপারে পাশ্চাত্য সভ্যতার নিকট ঋণী হইতে সম্মত হই, তবে পরিচ্ছদাদি সামান্য বহির্বিষয়ক ব্যাপার অনুকরণই কি মহাপাতক বলিয়া সাব্যস্ত হইবে? পশ্চিমের হাতিই যদি গলিয়া গেল, তবে মশাগুলিকে লইয়া এত টানাটানি কেন?

প্রথমতঃ পোষাকের কথা ধরা যাউক। যাহারা বলেন—"হ্যাট কোট ছাড়িয়া ধুতি চাদর ধর, উহাই আমাদের জাতীয় পোষাক"—তাঁহাদিগকে আমি জিজ্ঞাসা করি, আমি কি বাঙালি জাতি না ভারতবর্ষীয় জাতি? বাঙালিকে স্বতন্ত্র জাতি বলিলে ভারতবর্ষের একজাতীয়ত্ব অস্বীকার করা হয়। তাহা কোন্ স্বদেশভক্ত করিতে প্রস্তুত আছেন? যদি আমি ভারতবর্ষীয় জাতিই হই, তবে জিজ্ঞাসা করি, ধুতি চাদরই কি ভারতবর্ষীয় জাতির পোষাক? অবশ্যই না। দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতবর্ষীয় মাত্রের জন্য এখনও এক পোষাক আবিষ্কৃত হয় নাই। এক পোষাক আবিষ্কৃত হওয়া আবশ্যক। সমস্ত ভারতবর্ষের ভাষাও এক হওয়া আবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইতেছি, সমাজের উচ্চস্তরে, ইংরাজিই সেই এক ভাষার স্থান অধিকার করিয়াছে। পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ (আমি ইচ্ছা করিয়াই 'পাশ্চাত্য' শব্দ ব্যবহার করিলাম—কারণ ও পরিচ্ছদ শুধু ইংরাজেরই ইজারা মহল নয়, সমগ্র য়ুরোপীয় ও আমেরিকান জাতিরও বটে)—পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ, সেটাও না হয় চলিয়া যাউক না। তাঁহাতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হইবে? জাতীয়তা ম্লান হইবে? ঐ দেখুন জাপান, যাহার পদতলে বসিয়া এখন এক শতাব্দী ধরিয়া আমরা জাতীয়তা শিক্ষা করিতে পারিলে ধন্য হই—সেই জাপান পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন বলিয়া কি তাঁহাদের স্বদেশপ্রীতি ম্লান হইয়াছে? সে দেশে গবর্নমেন্টে অফিসের সমস্ত কর্মচারী ও রাজপুরুষ কর্মস্থানে পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিতে রাজাজ্ঞায় বাধ্য। ইহা হইতে বুঝা যায়, জাপানিরা স্থির করিয়াছেন, ঐ পরিচ্ছদই তাঁহাদের সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত। যাহারা রাজাজ্ঞায় বাধ্য নহেন,—এরূপ শিক্ষিত ও পদস্থ ব্যক্তিগণও স্বেচ্ছায় পাশ্চাত্য পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া থাকেন। কই, কোনও জাপানি ভট্টাচার্য ত বলেন নাই—"পরিচ্ছদে স্বদেশি হও।" যদি বলিয়া থাকেন, তাঁহার কথা কেহ শুনে নাই স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। জাপান যদি জাপানি বন্দেমাতরম্ গান করিয়া ও বিদেশি মাল বয়কট করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত, যদি বিদেশীয় জ্ঞান, বিদেশীয় শিল্পশিক্ষা, বিদেশীয় রাজনীতি, বিদেশীয় যুদ্ধ কৌশল এ সমস্তের বিরুদ্ধে স্বীয় দ্বার রুদ্ধ করিয়া "সর্বতোভাবে স্বদেশি" হইয়া, স্বদেশি অহিফেন সেবন করিয়া, স্বদেশি পালঙ্কে নিদ্রিত থাকিত, তবে আজ তাঁহাদের নামও আমাদের শ্রুতিগোচর হইত কিনা সন্দেহ।

এখন, আমাদের "জাতীয়" পোষাকটা কি দেখা যাউক। ধুতি কামিজ বা কোট ও চাদর। যাহারা একটু সৌখীন, তাঁহাদের ধুতি পাঞ্জাবি ও সিল্কের চাদর। যাহারা প্যান্টালুন কামিজ ও কলারের উপর গলাবন্ধ কোট, তাঁহার উপর পাগড়ি বা টুপি পরিধান করেন, তাঁহারাও বিশেষ নিন্দভাজন নহেন। যত অপরাধ করিয়াছে ঐ হ্যাট আর নেকটাইটা, যাহারা ঘোরতর টিকিবাদী স্বদেশি, তাঁহারা শার্ট, কোট ও প্যান্টালুনেরও বিপক্ষ, কারণ মুনিঋষিগণ এ তিনের কোনটাই পারিতেন না। আচ্ছা না হয় ধরিয়াই লইলাম মুনিঋষিগণ পাঞ্জাবি ও চাদরটা ব্যবহার করিতেন। আজিকালি দেখিতে পাইতেছি, অনেক নব্য বিলাতফেরত, হাইকোর্ট হইতে ফিরিয়া সুসূক্ষ্ম শিমুলিয়ার ধুতি ও আদ্দির পাঞ্জাবি পরিয়া, তাঁহার উপর সিল্কের চাদরের বাহার দিতেছেন। পরিবর্তন দেখিয়া দুঃখ হয়। তাঁহারা যতক্ষণ পাশ্চাত্য পোষাকে থাকেন, তাঁহাদিগকে দেখিলে মনে হয়, হাঁ, এই লোকটা ঘুঁসির বিনিময়ে ঘুঁসি দিতে পারে বটে। আবার তাঁহাদিগকেই "দেশীয়" পোষাকে দেখিলে মনে হয়—কাহার বাছনি রে, নিছনি লয়ে মরি। মনে হয়, ইহাকে বর করিয়া বিবাহ সভায় বসাইয়া দিলে মানাইবে ভাল। মনে হয়, ড্রয়িং রুমের গালিচার উপর বেড়াইতে ইহার পায়ে ব্যথা বাজিতেছে না ত? হেমবাবু

লিখিয়াছেন—

যাও সিন্ধুনীরে, ভূধর-শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত, বজ্রশিরে ধরে
স্বকার্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

মনে হয়, যদি ইহাকেই এখনি যাইতে হয়, তবে ভূধর-শিখরে উঠিবার বহু পূর্বেই ইহার কোঁচার ফুলটি নষ্ট হইয়া যাইবে, কোঁচার কাপড় পায়ে পায়ে লটপট করিয়া জড়াইয়া ইনি আছাড় খাইয়া পড়িবেন, বায়ু একটু জোরে বহিলেই যতনের রেশমি চাদরখানি উড়িয়া কোথায় চলিয়া যাইবে, উল্কাপাতের সম্ভাবনা দেখিলেই ইনি মূর্ছিত হইয়া পড়িবেন, এবং বজ্রপাত শব্দ শ্রবণ মাত্র ইহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যাইবে।

আমাদের ধুতি চাদরের মত effiminatc পোষাক আর কুত্রাপি দেখা যায় না। এই স্বদেশি আন্দোলন যখন আরম্ভ হইল, তখন বঙ্গীয় যুবকের ধুতি চাদরেই এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখিলাম। একটি যুবক গ্রাজুয়েট আমার সহিত দেখা করিতে আসিলেন। দেখিলাম, তিনি "মালকোঁচা দিয়া" আসিয়াছেন। সেদিন একটু বিস্মত হইয়াছিলাম। তাঁহার পর দেখিলাম, দলে দলে স্কুল কলেজের ছাত্রগণ প্রকাশ্য রাজপথে, ঐ রূপে "মাল কোঁচা" দিয়া বেড়াইতেছে। তখন বুঝিলাম, ইহা পরিচ্ছদ ব্যাপারে ক্রমাভিব্যক্তির একটা বিকাশ মাত্র। পূর্বে মানুষ কিছুই পরিত না। তাঁহার পর সম্ভবতঃ গাছের ছাল পরিতে আরম্ভ করিল। তাঁহার পর যখন বস্ত্র বয়ন করিতে শিখিল, তখন খানিকটা লম্বা চৌড়া একটা বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া, গাছের ছাল যে রূপে অঙ্গে জড়াইত, সেইরূপ করিয়া জড়াইতে লাগিল। আমাদের "জাতীয় পোষাক" এখনও ঠিক সেই Stage-এ আছে। আজ বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে বাঙালির শীতল শোণিতে উত্তাপ সঞ্চারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। তাঁহার হস্ত পদাদি যেন স্বাধীনতার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাই কোঁচায় আর সুবিধা হয় না। কোঁচা অদৃশ্য হইল। পদদ্বয় স্বাধীন হইল। আজিকার এই মালকোঁচা, আগামী কল্যের প্যান্টালুনেরই পূর্বপুরুষ।

আরাম করিবার পক্ষে ধুতি, চাদরই পরম উপাদেয় জিনিস সন্দেহ নাই। কিন্তু অঙ্গপ্রত্যঙ্গ একটু পুরুষোচিত ভাবে চালনা করিতে হইলেই প্রমাদ। গত ১০ শ্রাবণের সঞ্জীবনীতে "শ্বেতাঙ্গের স্পর্ধা" নামক একটি প্রবন্ধ পড়িলাম। একদিক হইতে একজন বাঙালি ও অপর দিক হইতে একজন শ্বেতাঙ্গ বিডন স্ট্রিট দিয়া যাইতেছিল। হঠাৎ সাহেবের গায়ে বাঙালির গা লাগাতে সাহেব ক্রুদ্ধ হইয়া বাঙালিকে গালি দিল। তখন বাঙালিটি "কাপড় সামলাইয়া লইয়া" সাহেবকে আক্রমণ করিল। অপমানের প্রতিশোধ লইবার পূর্বে, যে কাপড়কে সাবধানে "সামলাইয়া" লইতে হয়, সে কাপড় কোনও মহাজাতির জাতীয় পরিচ্ছদ হইবার উপযুক্ত বলিয়া আমি মনে করি না।

যদি কোনও দিন আমাদের স্বপ্ন সফলই হয়, আমরা যদি একটা স্বাধীন মহাজাতি হইয়া দাঁড়াই, তখন পৃথিবীর অন্যান্য মহাজাতিগণের সঙ্গে আমাদের একটা সম্পর্ক ও সংযোগ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিবে। তখন যদি আমরা শ্রীযুত অমুকচন্দ্রকে আমাদিগের Ambassador করিয়া ইংলণ্ডের রাজসভায় পাঠাই, তবে তিনি ধুতি পাঞ্জাবি ও রেশমি চাদর লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইবেন ত? সম্ভবতঃ মাঝে মাঝে Buckingham Palacc এ বা অন্যান্য Palacc এ State Ball এ তাঁহার নিমন্ত্রণ হইবে এ কথা স্মরণ রাখিবেন। আর, হঠাৎ যখন সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোনও য়ুরোপীয় জাতি, শত্রু দমন করিবার জন্য আমাদের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিবেন, তখন শ্রীযুত তুমুকচন্দ্রকে যদি আমরা সেনাপতি করিয়া সে দেশে পাঠাইতে চাই, তবে তিনি যাইতে কোনও আপত্তি করিবেন

না ত? রাঁধুনি বামুন সঙ্গে লওয়া হয়ত বিশেষ অসুবিধাজনক হইয়া উঠিবে। আর যখন আমেরিকা হইতে "সর্বজাতীয় ধর্মমণ্ডলী" আমাদিগকে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিবেন, তখন মহামহোপাধ্যায় মহাশয় আপনি পশ্চাৎপদ হইবেন না ত? আমেরিকায় আলোচাল মিলিলেও মিলিতে পারে, কিন্তু গব্যঘৃত ও কাঁচকলা "অত্যন্তাভাব।"

চিরকাল হইতে একটা যাহা চলিয়া আসিতেছে, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইলে কষ্ট হয়, দুঃখ হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা যদি স্বজাতির পক্ষে স্বদেশের পক্ষে মঙ্গলজনক হয়, তবে সে দুঃখ সে কষ্ট বক্ষ পাতিয়া পুরুষের মত বহন করিতে হইবে। নাকে কাঁদিলে চলিবে না। আমরা স্ত্রীলোকের মত Sentimental হইয়া পড়িয়াছি, এটার বিরুদ্ধে আপত্তি, ওটার বিরুদ্ধে আপত্তি, আমাদের সেই Sentimentality-র ফল মাত্র। আমরা কি চিরদিনই School girl ই থাকিয়া যাইব? কোনও দিন কি Practical হইব না, মানুষ হইব না, পুরুষ হইব না? দেশের উন্নতি জাতির উন্নতিই আমাদের ধ্রুব লক্ষ্য হউক। সেই ব্রত সাধনের পক্ষে, সেই লক্ষ্যে উপনীত হইবার পক্ষে যতটুকু স্বদেশীয়তা আমাদের সহায়, তাঁহাই আমরা প্রাণপণে অবলম্বন করি আসুন। যতটুকু তাঁহার বিঘ্ন তাহা অসঙ্কোচে পরিত্যাগ করি আসুন। দেশোন্নতিই লক্ষ্য, স্বদেশীয়তা তাঁহার উপায় মাত্র। আমরা লক্ষ্য ভুলিয়া যেন উপায়টিকেই পরমার্থ জ্ঞানে আঁকড়াইয়া না ধরি। সকল জিনিষেরই ব্যবহার ও অপব্যবহার আছে। ঈশ্বর আমাদিগকে আগুন দিয়াছেন রাঁধিয়া খাইবার জন্য, গৃহের চালে লাগাইয়া দিবার জন্য নহে। স্বদেশীয়তার উপযোগী অংশের দ্বারায় আমরা আমাদের দেশোন্নতিরূপ কার্যসাধন করিয়া লই আসুন, অনুপযোগী অংশের প্রতি অন্ধভক্তি বশতঃ আমাদের চরম লক্ষ্যের যেন সর্বনাশ না করিয়া বসি। একটি জাপানি গল্প আছে—এক ব্যক্তি কোনও জাপানি যুবককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল,—"দেখ, যদি বুদ্ধদেব স্বয়ং সেনাপতি হইয়া, কনফুসিয়স্ তাঁহার সহকারী হইয়া, জাপান আক্রমণ করিতে আসেন, তবে তুমি কি কর?" যুবক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিল, "বুদ্ধদেবের মাথা কাটিয়া ফেলি, কনফুসিয়স্‌কে সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করি।" ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে,—জাপানে বৌদ্ধধর্ম, শিন্তোধর্ম, কনফুসিয়ান ধর্ম প্রভৃতি নানা ধর্ম আছে বটে, কিন্তু সেখানে সর্বধর্মের সারধর্ম স্বদেশপ্রীতি বা বন্দেমাতরম্। আমরাও সেই বন্দেমাতরম ধর্মকে জীবনের সারভূত করি আসুন। নানারূপ নিষেধ, বিধান, অনুস্বার বিসর্গের শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইয়া জীবনের একমাত্র মহাব্রত করি আসুন—স্বদেশোন্নতি।

[পাশ্চাত্য পরিচ্ছদের প্রতি বিদ্বেষ মনের একটা সংকীর্ণতা মাত্র। অনেক সাহেবি পোষাক পরিহিত বাঙালিকে জানি, যাহারা স্বদেশপ্রেমে ধুতি-চাদর পরিহিত কোন বাঙালির চেয়ে নিকৃষ্ট নহেন। বিদেশি যাহা ভাল ও আমাদের লওয়া দরকার, তাহা সমস্তই লইতে প্রস্তুত থাকা উচিত। এমন কি, যদি কেহ প্রমাণ করিয়া দিতে পারেন যে, স্বদেশি সমুদয় ছাড়িয়া বিদেশি যাহা কিছু সব লইলেই দেশের ও জাতির প্রকৃত মঙ্গল হইবে, তাহা হইলে আমাদের তাঁহাই করা কর্তব্য। কিন্তু প্রমাণ চাহিতে সকলেরই অধিকার আছে।

প্রভাত বাবু অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন, আরও কয়েকটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। ১। গ্রীষ্মের রৌদ্রে সোলাটুপি খুব কাজ ও আরাম দেয়। অন্য ঋতুতে কোন প্রকার হ্যাট, বাঁধা (readymade) পাগড়ি অপেক্ষা বেশি কাজ বা আরাম দেয় কি? ২। নেক্‌টাই ও উল্টা কলার দ্বারা কোন প্রয়োজন সাধিত হয় কিনা? ৩। ভারতবর্ষের অধিকাংশ প্রদেশ গ্রীষ্ম প্রধান। জাপান শীতপ্রধান দেশ। জাপানে যে পরিবর্তন সঙ্গত ও হিতকর, ভারতবর্ষের তাহা উপযোগী কি না? অর্থাৎ সাহেবি পোষাক স্বাস্থ্য ও আরাম হিসাবে ভারতবর্ষের উপযোগী কিনা? আরাম ও স্বাস্থ্যরক্ষার নিকট একটি উপায়। ৪। ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে নানা অঙ্গসম্পন্ন সাহেবি পোষাক উপযোগী কি না? ৫। Sentiment জিনিসটা অনেক স্থলে বাজে হইলেও উহাকে বাদ দিতে পারা যায় না। আমাদের দেশের সাধারণ লোক ও শিক্ষিত লোকদের মধ্যে অনেকটা দূর দূর ভাব আছে। যাহাতে এই ভাব নষ্ট হইয়া ঘনিষ্ঠতা বাড়ে, তাহা করা দরকার। সাধারণ লোকে সাহেবি

পোষাক পরা লোককে সহজে নিজের লোক মনে করে না। এ ভাবটা অযৌক্তিক হইতে পারে। কিন্তু ইহার অস্তিত্ব ও বলবত্তা অস্বীকার করা যায় না। সাহেবি পোষাক পরিলে ঘুসি মারিবার সুবিধা হইতে পারে। কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে, জাতীয় ঘনিষ্ঠতা লাভ বাঞ্ছনীয় জিনিস কিনা, এবং এমন কিছু পরিবর্তন করা উচিত কিনা, যদ্দ্বারা এই ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধির বিঘ্ন জন্মে।* প্রভাতবাবুর রাজদূতের ও সেনাপতির পরিচ্ছদের কথা তুলিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় যে বেশে বিলাতে দৌত্য করিয়াছিলেন, তাহা স্বদেশি বলা চলে, এবং তাহা মন্দও নহে। দেশীয় ফৌজের দেশীয় সেনাপতিদের বেশ মন্দ নয়। সৈনিক বিভাগে রণজিৎ সিং সাহেবি পোষাক চালাইয়াছিলেন। নেপালে এখনও এই পোষাক সিপাহিরা পরে।] *প্রবাসী সম্পাদক*

প্রবাসী ১৩১৩ কার্তিক

* রুশীয় গ্রন্থকার টলষ্টয় What shall we do then? নামক বহিতে চতুর্দশ অধ্যায়ে, যে যে কারণে পাশ্চাত্য দেশ সকলে গরিব ও ধনীর দূর দূর ভাব জন্মিয়াছে ও রক্ষিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নানা অঙ্গবিশিষ্ট পোষাক একটি। তিনি বলেন—

"If a rich man wore simple garments, which only protected the body against the cold, he would need very little, and he could not help, if he had two fur coats, but give one to him who had none. but the rich man begins by having made for himself wearing apparel that consists of several parts and is good only for certain occasions, and so is of no use to the poor man. He has dress coats, vests, sack coats, patent leather boots, capes, shoes with French heels, garments that for the sake of fashion are cut up into small pieces, hunting coats and travelling ulsters and so forth, which can be put to use only in a condition removed from poverty. Thus the wearing apparel also becomes a means of segregating oneself from the poor. Fashion makes its appearance that is, that which separates the rich from the poor."

রামপ্রাণ গুপ্ত

স্বদেশি

(মিঃ পি. এন. বসু, বি. এস. সি'র বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত)

সম্প্রতি বঙ্গবাসীর হৃদয়ে স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্ফুরিত হইয়াছে। চারিদিকে এই প্রবল আকাঙ্ক্ষার লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইতেছে। তাদৃশ নূতন ভাবোদয়ে স্বদেশের শুভার্থী মাত্রেই আশা ও আনন্দে পুলকিত হইয়া উঠিয়াছেন। দশ বৎসর পূর্বে কদাচিৎ কোন স্থানে শিল্পপ্রদর্শনী হইত। বর্তমান সময়ে প্রধান প্রধান নগরে প্রতি বৎসর শিল্প প্রদর্শনী হইতেছে। জাতীয় মহাসমিতির সংশ্রবে নেতৃগণ বর্ষে বর্ষে শিল্প প্রদর্শনী করিতেছেন। গত বৎসর হইতে শিল্প সমিতি সূচিত হইয়াছে। এই সমিতির কার্য সুপরিচালিত হইলে দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে। গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ আমাদের দেশে স্বদেশি আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে; কিন্তু এতদিন ইহার গতি অতি মন্থর ছিল, দেশের অধিকাংশ লোক এতৎ সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন। গত বৎসর হইতে বাঙালি প্রবলোৎসাহে স্বদেশি আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন; বাঙালির হৃদয়ে নূতন ভাব, নূতন আশা জাগিয়া উঠিয়াছে। এই স্বদেশি আন্দোলনের ফলে দেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে বলিয়া আশা জন্মিতেছে। পনর বৎসর পূর্বে শিল্প-শিক্ষার জন্য অর্থ সংগ্রহ দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল; বস্তুতঃ তজ্জন্য আবেদন নির্জন অরণ্যে রোদনতুল্য নিরর্থক ছিল। কিন্তু গত দুই বৎসরে একমাত্র বঙ্গদেশেই শিল্পশিক্ষার ব্যয় নির্বাহ জন্য ন্যূনাধিক দশ লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বদেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য প্রবল আকাঙ্ক্ষা বঙ্গদেশেই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিস্ফুট হইয়াছে। বঙ্গদেশে এই আকাঙ্ক্ষা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয়ও বটে। কি শিক্ষার বিস্তার, কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি সমাজ সংস্কার সর্ববিষয়েই বঙ্গবাসী ভারতবর্ষে অগ্রগামী। কিন্তু শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সম্পর্কে বাঙালি বোম্বাইবাসীর এমন কি, পাঞ্জাবী ও হিন্দুস্থানীরও পশ্চাতে রহিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। প্রধানতঃ সূতা ও কাপড়ের কল লইয়াই বোম্বাইর শিল্পব্যবসায় চলিতেছে। এই সকল কলের সমস্তগুলি না হইলেও অধিকাংশই বোম্বাইবাসীর অর্থে তাহাদেরই কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছে। পাট এবং কয়লা বঙ্গদেশের ব্যবসায়ের প্রধান সম্বল। এই দুই ব্যবসায়ই বিদেশি-বণিকের হস্তগত রহিয়াছে। যাহা হউক, বঙ্গবাসী আপনার পূর্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এরূপ আশা হইতেছে যে, অচিরে শিল্পবাণিজ্য সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অবনতি অতীতের কুক্ষিগত হইয়া পড়িবে। বাঙালি একটি বড় কাপড়ের কল সংস্থাপন করিয়াছেন;* উন্নত প্রণালীর তাঁত বহুল পরিমাণে প্রচলিত হইতেছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীর কলের সাহায্যে

* **বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল** ব্যতীত বঙ্গদেশে আরও কতিপয় কাপড় ও সূতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে। আমরা সংক্ষেপে তৎসমুদায়ের বিবরণ এখানে প্রদান করিতেছি। (১) ত্রিপুরা কোম্পানি লিমিটেড, কলিকাতার বিখ্যাত ব্যবসায়ী কে. এম. দে অ্যান্ড কোম্পানি এই কোম্পানির ম্যানেজিং এজেন্টস্। মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরে কারখানা স্থাপিত হইবে। আপাততঃ কেবল সূতা নির্মিত শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইবে। ২) ইণ্ডিয়ান স্পিনিং অ্যান্ড উইভিং কোম্পানি লিমিটেড। মূলধন ১২ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির

মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে; প্রধানতঃ বাঙালির উদ্যোগে একটি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়া কয়লার খনির কাজ আরম্ভ হইয়াছে এবং দেশলাই, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য ছোট ছোট কারখানার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবনা কার্যে পরিণত হইতেছে।

বস্তুতঃ সুশৃঙ্খল ভাবে, সমস্ত কাজ আরম্ভ হইয়াছে। যদি ভবিষ্যতেও এই নব জাগ্রত কার্যশীলতা সুপরিচালিত হয়, তবে নিশ্চয়ই দেশের মহা কল্যাণকর বহু সুফল লাভ হইবে। বর্তমান সময় পর্যন্ত প্রধানতঃ ইউরোপীয় বণিকের উদ্যমেই ভারতবর্ষের অর্থাগমের ক্ষেত্র সকল উন্মুক্ত হইয়া আসিতেছে এবং সে সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদেরই প্রায় একাধিপত্য রহিয়াছে। বিশেষ খনিজ সম্পদ কেবল মাত্র বিদেশিদের দ্বারাই উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। গত দশ বৎসরে (১৮৯৪-১৯০৪) ভারতবর্ষের খনিসমূহের উৎপন্ন অনেক পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে; আমরা একটি তালিকা দিতেছি।

খনিজ পদার্থের নাম	১৮৯৪ সনে উৎপন্ন	১৯০৪ সনে উৎপন্ন	১০ বৎসরে যতগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে
ম্যাঙ্গানিজ ধাতু	১১৪১০ টন	১৬৫০০৬ টন,	১৫
কেরোসিন তৈল	১১,৪৫২,৬৪৯ গ্যালন	৮৭৮৫৯০৬৯ গ্যালন	৭
অভ্র	২৮৫ টন	১৯৭৭ টন,	৪
সোনা	২১০৪১২ আউন্স	৬০৩২১৬ আউন্স	৩

কয়লার উৎপাদন দ্বিগুণ অপেক্ষাও বেশি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে।

অন্যান্য নূতন ব্যবসায় সম্বন্ধে ও ক্রমশঃ শ্রীবৃদ্ধি পরিদৃষ্ট হইতেছে।

কলের নাম	১৮৮১-২ সনের সংখ্যা	১৯০৪-৫ সনের সংখ্যা	গত ২৪ বৎসরে যতগুণ বৃদ্ধি হইয়াছে
পাটের কল	৮	২২	৩
পশম রেশম ও অন্যান্য কল	৩	৩১	১০
চিনির কল	৪	৯	২
কাগজের কল	১	৫	৫

কলে ২২ হাজার চরকা ও ৩ শত তাঁত চলিবে। কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল শ্রীযুক্ত পি. এম. গুহ প্রভৃতি এই কোম্পানির ডাইরেক্টর। (৩) **চট্টগ্রাম স্পিনিং অ্যান্ড জিনিং** কোম্পানি। চট্টগ্রামের নেতৃগণ এই কোম্পানির উদ্যোগী। এই কোম্পানির কারখানায় তুলার বিচি বাছাই এবং সূতা প্রস্তুত হইবে। মূলধন পাঁচ লক্ষ টাকা। এই কোম্পানি এ পর্যন্ত রেজেস্টারি হয় নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই অনেক টাকার অংশ বিক্রয় হইয়াছে। (৪) **ময়মনসিংহ সূতা ও কাপড়ের কল**। ময়মনসিংহের উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মজুমদার এই কলের উদ্যোগী। মূলধন ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা। এই কোম্পানি শীঘ্রই রেজেস্টারি হইবে, এ পর্যন্ত ৩০ হাজার টাকার অংশ বিলি হইয়াছে। (৫) **জলপাইগুড়ি উইভিং কোম্পানি লিমিটেড**। জয়েন্ট স্টক কোম্পানি পরিচালনে সুপটু শ্রীযুক্ত উমাপতি রায় প্রভৃতি কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। মূলধন ৩০ হাজার টাকা। এই কোম্পানির কারখানায় ২৫ খানা তাঁত চলিবে। এই কোম্পানির সমস্ত অংশ বিক্রয় হইয়াছে, শীঘ্রই কাজ আরম্ভ হইবে। (৬) **কলিকাতা উইভিং কোম্পানি লিমিটেড**। কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার মি. এ. কে. ঘোষ প্রভৃতি এই কোম্পানির পরিচালক। মূলধন ৩০ হাজার টাকা। ৫০ খানি তাঁত চলিবে। অক্টোবর মাসে কাজ আরম্ভ হইবে। (৭) **চন্দননগর কাপড়ের কল**। স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বটকৃষ্ণ ঘোষ। ৫০ খানি তাঁত চলিতেছে। (৮) **জহুরি লুম ফ্যাক্টরি**। অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত জগৎরাম শুকুল। কলিকাতা হোগলকুঁড়িয়ায় ফ্যাক্টরির বাড়ি প্রস্তুত হইতেছে।

এই সকল ব্যবসায়ের উন্নতির সঙ্গে ভারতবাসীর কার্যশীলতার সম্পর্ক অতি নগণ্য। ১৯০৪-৫ সনে খনিজ ব্যবসায়ে জয়েন্ট স্টক কোম্পানির হিসাবে ৩৭৯৫৪০০০ টাকা মূলধন নিয়োজিত ছিল। এই বিপুল ধনের পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগও ভারতবাসী কর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছে কিনা সন্দেহ। আধুনিক প্রণালীতে ভারতবর্ষে লৌহ এবং ইস্পাত উৎপন্ন করিবার অভিপ্রায়ে দেড়কোটি টাকা মূলধন লইয়া একটা কোম্পানি গঠিত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অর্থ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য বিবেচনা করিয়া কোম্পানির কর্তৃপক্ষ (যদিও তাহারা ভারতবাসী) বিলাতে কোম্পানির অংশ বিক্রয় করিবার বন্দোবস্ত করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

অতএব দেখা যাইতেছে যে, নূতন ব্যবসায়গুলির সমস্তই বিদেশির হস্তগত রহিয়াছে। ভারতবাসী নব উদ্যমে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীসাধন জন্য কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন; কিন্তু তাহাদিগকে সফলকাম হইতে হইলে বিদেশি বণিকের সহিত প্রবল প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। শিল্পবাণিজ্য ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় বহু সুবিধা ইউরোপীয় বণিকের আছে; আর ভারতবাসীকে নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়া কাজ করিতে হইবে। ইউরোপীয় বণিক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীসম্প্রদায়ভুক্ত; ভারতবাসী সর্বাপেক্ষা নির্ধন। ইউরোপে অর্থ এত প্রচুর যে, শতকরা ৩/৪ টাকা লাভ পাইলেই তত্রত্য ধনীরা সন্তোষ লাভ করেন। কিন্তু ইহার তিনগুণ লাভ পাইলেও লোকসান হইবার সম্ভাবনা আছে এরূপ কোন ব্যবসায়ে আমাদের দেশের লোক অর্থ ন্যস্ত করিতে স্বীকৃত হইবেন না। গত অর্ধ শতাব্দী যাবৎ ইউরোপে উচ্চঅঙ্গের শিল্পশিক্ষা প্রদত্ত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে শিল্প শিক্ষার সূচনা মাত্র হইয়াছে; আধুনিক প্রণালীতে ব্যবসায়ের উন্নতিসাধন করিতে হইলে ঈদৃশ শিক্ষালাভ অপরিহার্য বলিয়া ভারতবাসী এই মাত্র বুঝিতে পারিয়াছেন। কি কি উপায়ে ভারতবর্ষের অর্থসংস্থান বৃদ্ধি পাইতে পরে, তৎসম্বন্ধীয় জ্ঞান ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে অতি অল্পব্যক্তিরই আছে; এমন কি কিছুদিন পূর্বেও ভারতের অর্থসংস্থানের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য অভিলাষী শিক্ষিতের সংখ্যাও অল্প ছিল। বিদেশি বণিক ব্যবসায়ে সহযোগিতার মাহাত্ম্য সম্যক অবগত আছেন। এজন্য তাহারা কোন বৃহৎ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইলে তাহা সাধারণতঃ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে ভারতবাসী অতি অল্পদিন যাবৎ ব্যবসায় ক্ষেত্রে সহযোগিতার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আমরা উল্লেখ করিতেছি যে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে ১১০টি ক্ষুদ্র কয়লার খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিকারীর সংখ্যাও প্রায় ১১০ জন হইবে; ইহাদের প্রায় সকলেই ভারতবাসী। এই সকল খনির কাজের জন্য স্বতন্ত্র কর্মচারী স্বতন্ত্র করখানা এবং অনেক স্থলে স্বতন্ত্র রেলওয়ে সাইডিং রহিয়াছে। অন্যদিকে ঐ সনে ১৪২টি বৃহৎ খনির কাজ হইয়াছে এবং এই সকল খনির স্বত্বাধিকারী মাত্র ৪১টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি; এই সকল কোম্পানির প্রায় সমস্তগুলিই বিদেশি বণিক কর্তৃক পরিচালিত। এদেশীয়দের আয়ত্তাধীন কয়লার খনি হইতে মাত্র ৭৮৬৬৭০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছে, ইহা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি উত্তোলিত কয়লার পরিমাণে অতি নগণ্য; এই সকল কোম্পানির খনি হইতে ৬২৭৭০০০ টন কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। যদি ঐ সকল ক্ষুদ্র কয়লার খনির স্বত্বাধিকারীরা সহযোগিতা সুবিধা উপলব্ধি করিতে পারিয়া নিকটবর্তী কয়লার খনিগুলি এক সঙ্গে মিলিত করিয়া লইতেন, তবে অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে অধিকতর সুশৃঙ্খলভাবে সমস্ত কার্য নির্বাহিত হইত এবং অধিক লাভ দাঁড়াইত; বর্তমানের ন্যায় যত আয় তত ব্যয়ের মত অবস্থা থাকিত না।

মূলধনের অসচ্ছলতা, শিল্পশিক্ষার অবিদ্যমানতা এবং যথোপযুক্ত সহযোগিতার অভাব, —আমাদের ব্যবসায় ক্ষেত্রের এই সকল বিঘ্ন ব্যতীত আর একটি প্রবল অন্তরায় আছে; তাহা ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণির বংশানুগত বিরাগ। আজ পর্যন্ত আমাদের দেশের কেবল নিম্ন শ্রেণির লোকেই ব্যবসায় লিপ্ত রহিয়াছে। সভ্য সমাজ মাত্রেই এইরূপ বিরাগ কম বেশি দেখা যাইয়া থাকে!

প্রাচীন গ্রীক সমাজে ব্যবসায়ের প্রতি উচ্চশ্রেণির যথেষ্ট বিরাগ ছিল। কিন্তু বর্তমান সময়ে পার্থক্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বর্তমান সময়ে পাশ্চাত্য সভ্যতা প্রধানতঃ ব্যবসায়মূলক। পক্ষান্তরে বর্ণভেদ প্রথার দরুণ ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠবর্ণ এবং শিল্পী ও ব্যবসায়ির মধ্যে যে অসামাজিকতা বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা দূর করিবার জন্য এতদিনে চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশের প্রতিভা ও প্রজ্ঞা শিল্প এবং বাণিজ্য ক্ষেত্র হইতে দূরে রহিয়াছে, ইহাই বর্তমান অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য দেশের অনুকরণে আমাদের সমস্ত প্রবৃত্তি একমাত্র শিল্প বাণিজ্যের উন্নতির চেষ্টার অনুবর্তিনী হইবে, ইহা অবশ্য প্রার্থনীয় নহে। কিন্তু আমাদের ভদ্র সমাজে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য আরও কিঞ্চিৎ আকাঙ্ক্ষা না জন্মিলে এবং ব্যবসায় সম্বন্ধে তাহাদের জন্মগত ঔদাসীন্য পরিত্যক্ত না হইলে তদ্বিষয়ে আমাদের দেশের স্থায়ী উন্নতি অসম্ভব।

ভূমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আমাদের দেশের প্রভূত মঙ্গলসাধন করিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বাঙালি শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন পক্ষে বিঘ্নকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের দেশের ধনীরা ভূসম্পত্তিতেই আপনাদের ধন ন্যস্ত করিতেই পটু। বোম্বাই প্রদেশে বণিকদিগকে লইয়া অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে; ইহার একটি প্রধান কারণ এই যে, ঐ প্রদেশে জমিদার বলিয়া কোন সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব নাই। যাহা হউক, জমিদারগণও শিল্প বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনে অনেক পরিমাণে মনোযোগী হইয়াছেন এবং আমরা আশা করি যে, এতদিন যাহা বিস্ময়কর ছিল, এখন তাহাই আমাদের শিল্পবাণিজ্য বিষয়ক উদ্যমশীলতার গতি পরিবর্ধিত করিয়া দিবে।

বর্তমান অবস্থায় চামড়া পরিষ্কার, সাবান তৈয়ার, সুগন্ধি প্রস্তুত প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাজ নির্বাহ করিয়াই আমাদের নবজাত উদ্যমশীলতা অনেকস্থলে তৃপ্তিলাভ করিতেছে। কিন্তু এই সকল জিনিসের ব্যবসায় প্রয়োজনীয় হইলেও ইহাতে দেশের সবিশেষ ধনাগম হয় না। অতএব আমাদের উদ্যমশীলতাকে বৃহৎ কাজ সম্পাদন জন্য পরিচালিত করিতে হইবে। আর একটি কথা আছে। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ব্যবসায়, এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদ্ অতি অল্প। সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যে সকল জিনিস প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত সাধারণতঃ ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপিত হইয়া থাকে, তজ্জন্য বৃহৎ কারখানা স্থাপন করিলে অধিক লাভ দাঁড়াইতে পারে।

অবশ্য ছোট ছোট কারখানা স্থাপন করিয়া আমরা বড় বড় কারখানা অর্থাৎ ঝুঁকির কাজে প্রবৃত্ত হইবার উপযুক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। কিন্তু আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সময় অমূল্য এবং ইউরোপীয় বণিক অতি সতর্ক ও অবহিত। তাহারা অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে এদেশবাসির প্রবেশোদ্যমে অন্তরায় জন্মাইবে। ত্রিশ বৎসর পূর্বে আমাদের দেশের কদাচিৎ কেহ ম্যাঙ্গানিজ নামক খনিজ ধাতুর নাম অবগত ছিল; কিন্তু গত ১৫ বৎসর মধ্যেই এই ব্যবসায়ের সৃষ্টি হইয়া এতদূর পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছে যে, বর্তমান অবস্থায় ঐ অর্থসংস্থান ক্ষেত্রে ভারতবাসীর স্থান হওয়া সম্ভবপর নহে। এখন আমাদিগকে চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। অর্থাগমের কোন ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তথায় প্রবেশ জন্য উদ্যম করিতে হইবে; নতুবা সে ক্ষেত্রে প্রবেশ পথ সম্ভবতঃ চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইবে। পাশ্চাত্যদেশে শিল্পবাণিজ্যের পরিপুষ্টিসাধন জন্য এই প্রাণপণ প্রতিযোগিতা—অর্থসঞ্চয়ের জন্য এই অশান্ত কর্মশীলতার মূল কারণ কি, তাহা প্রাচ্য ভাবের সম্পূর্ণ অধিগম্য নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রকৃতি ভারতীয় সভ্যতার প্রকৃতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। কিন্তু যদি ভারতবাসী স্বদেশের অর্থাগমের উপায় বর্ধন করিতে সংকল্প করেন (এই বিষয়ে এখন আর মতদ্বৈধ নাই) তবে আমাদিগকে চতুর্দিকস্থ অবস্থার উপযোগী এবং পাশ্চাত্যসুলভ শিল্প বাণিজ্যের আবর্তে ঘূর্ণিত হইতে হইবে।

বর্তমান জাতীয় আন্দোলনের ফলে আমাদের আত্মনির্ভরতা জন্মিয়াছে; ইহাই বর্তমান আন্দোলনের অন্যতম সুমধুর ফল। কিন্তু আমাদিগকে দেখিতে হইবে যেন আত্মনির্ভর, আত্মাভিমানে

পরিণত না হয়। কোন কোন বিষয়ে,—যথা ধর্ম—বিদেশির সহায়তা ব্যতীতও আমাদের চলিতে পারে। কিন্তু এরূপ অনেক বিষয় আছে; যাহাতে বিদেশীয় সহায়তা গ্রহণ না করিলে সাফল্য লাভ অসম্ভব। শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টি এই শ্রেণির অন্তর্গত। কল, কারখানা, খনি এই সকল কাজ সম্পাদন কালে আমাদিগকে বিদেশি বণিকের অনুকরণ করিতে হইবে।

ইউরোপীয় বণিকগণের সহিত ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতে হইলে আমাদের কি কি বাধা বিঘ্ন আছে, তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইল। অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে, এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার জন্য যত্ন করা হইতেছে। দৃঢ় সংকল্প হইয়া অধ্যবসায় সহকারে যত্ন করিলে সিদ্ধিলাভ অবশ্যই হইবে। গত বৎসর বঙ্গদেশে অন্ততঃ ছয়টি জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ইহাই বঙ্গের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আন্তরিকতা সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ।*

পনের বৎসর পূর্বে আমাদের দেশে আর একবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ চেষ্টা সময়োপযোগী ছিল না বলিয়া সফল হইতে পারে নাই। ঐ চেষ্টার ফলে ৭/৮ টা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল; তন্মধ্যে ২/১ টা মাত্র অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। কিন্তু এই বিষয় চিন্তা করিয়া আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই; বরং তৎকালের চেষ্টা ও যত্ন কি কি কারণে সফল হইতে পারে নাই, তাহা পর্যালোচনা করিয়া আমরা অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি। আমাদের দেশের শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধনার্থ কার্যাবলীর গতিবিধি যাহারা গত পঁচিশ বৎসর যাবৎ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন, তাঁহারা বিন্দুমাত্রও ইতস্ততঃ না করিয়া স্বীকার করিবেন যে, বাঙালির বর্তমান সংকল্প পূর্ববারের সংকল্প অপেক্ষা অনেক সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত হইয়াছে এবং উপযুক্ত যত্ন ও সতর্কতা সহকারে সংকল্প সাধনে প্রবৃত্ত হইলে

* বর্তমান আন্দোলনের ফলে যে সকল কাপড় এবং সূতার কলের অনুষ্ঠান হইয়াছে, তাহা ইতিপূর্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কাপড় ও সূতার কল ছাড়া আর যে সকল অনুষ্ঠানে বাঙালি প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা আমরা সংক্ষেপে লিখিতেছি। দুইটি স্টিমার কোম্পানির প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। প্রথম, বেঙ্গল স্টিম নেভিগেশন কোম্পানি লিমিটেড, মূলধন বার লক্ষ টাকা। সমস্ত মূলধন সংগৃহীত হইয়াছে। এই কোম্পানির স্টিমার মাল ও যাত্রী লইয়া রেঙ্গুন হইতে চট্টগ্রাম পর্যন্ত যাতায়াত করিতেছে। চট্টগ্রামের মোসলমান বণিকেরা এই স্টিমার কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয়, ইষ্ট বেঙ্গল রিভারস্ ষ্টিম সারভিস্ লিমিটেড। কলিকাতা হাটখোলার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সীতানাথ রায়, বাহাদুর এই কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা। মূলধন ছয় লক্ষ টাকা। এই কোম্পানির ষ্টিমার কেবল মাল লইয়া কলিকাতা হইতে নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত করিতেছে। যশোহরের সুপ্রসিদ্ধ উকিল রায় যদুনাথ মজুমদার বাহাদুর আর একটি ষ্টিমার কোম্পানির প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। হাইকোর্টের উকিল ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ মহাশয় একটি দিয়াশলাই-এর কারখানা স্থাপনের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত শেষ করিয়াছেন; কেবল তাঁহার প্রদত্ত মূলধনে এই কারখানা স্থাপিত হইতেছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়, সি এস. আই. প্রভৃতি মহোদয়গণ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি করিয়া আর একটি দিয়াশলাইর কারখানা স্থাপন করিতেছেন। দিয়াশলাই, ছুরি, কাঁচি, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত জন্য দুই লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া Association for the Advancement of Scientific and Industrial Education of Indians এর তত্ত্বাবধানে একটা জয়েন্ট স্টক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায়চৌধুরি, শীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ সরকার, ডাক্তার নীলরতন সরকার এবং শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকালী গুহ প্রভৃতি মহোদয়গণ সাবানের কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। নীলরতন বাবু ও প্রমথবাবুর কারখানার কাজ আরম্ভ হসয়াছে; উপেন্দ্র বাবু এবং কালীকৃষ্ণবাবুর কারখানার কাজও শীঘ্রই আরম্ভ হইবে। ঢাকাতে আর একটি সাবানের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে। আধুনিক উন্নত প্রণালীতে কলের সাহায্যে মৃৎপাত্রাদি প্রস্তুত জন্য পশ্চিমবাজারের মহারাজা এবং শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় জাপান প্রত্যাগত মিঃ সত্যসুন্দর দেবের তত্ত্বাবধানে একটি কারখানা স্থাপন করিয়াছেন। বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মহোদয়গণ ঐ উদ্দেশ্যেই জয়েন্ট স্টক কোম্পানি করিয়া আর একটা কারখানা স্থাপন করিবেন বলিয়া সম্প্রতি বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছে।

সমস্ত বাধা বিঘ্ন দূরীভূত হইবে। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমভাগে রাজপুরুষগণ আমাদের শিল্পবাণিজ্যের সম্পর্কে যেরূপ ভাবই পোষণ করিয়া থাকুন না কেন, তাঁহাদের বর্তমান ভাব অনুকূল বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে; এমন কি, অনেক স্থলে সহানুভূতিও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। স্বদেশি আন্দোলন সুগঠিত ও সুপরিচালিত হইলে উহা দেশ মধ্যে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি সাধনের অনুকূল প্রভাব বিস্তার করিবে। ব্যবসায় ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকের সহিত প্রতিযোগিতা করিবার সুবিধাও কোন কোন বিষয়ে আমাদের আছে ইহাও বিবেচ্য। আমাদের দেশে অপেক্ষাকৃত অতি অল্প বেতনে লোকে সন্তুষ্ট হইয়া থাকে, এইটা আমাদের অনুকূল অবস্থা। অবশ্যই ইহা স্বীকার্য যে, পারিশ্রমিক অল্প হইলেই কারখানাজাত দ্রব্যাদির নির্মাণ ব্যয়ও নিশ্চয়ই অল্প হইবে, এরূপ কোন কথা নাই। কিন্তু আমাদের দেশে শিল্প শিক্ষা বিস্তার লাভ করিলে লোকের কলকারখানার কাজে দক্ষতা জন্মিবে। তখন অল্প পারিশ্রমিকের সহিত দক্ষতা মিলিত হইয়া ব্যবসায় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার পক্ষে অতি অনুকূল অবস্থা দাঁড়াইবে। দেশীয় রাজন্যগণের রাজ্যে এবং জমিদারগণের জমিদারিতে এরূপ অনেক ভূমি আছে, যাহা মূল্যবান খনিজ সম্পদপূর্ণ। এই কারণে তাঁহাদের পক্ষে খনিজ সম্পদের কারবার প্রতিষ্ঠা করিবার বিশেষ সুযোগ রহিয়াছে। ইহা ছাড়া কৃষি কার্যের উন্নতি সাধন করিবার জন্যও যথেষ্ট সুযোগ তাঁহাদের আছে! কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল সুযোগ সত্ত্বেও তাঁহারা ইহার কোন কাজেই অবহিত হন নাই। যাহা হউক, আমরা আশা করিতে পারি যে, তাঁহারা অতঃপর আপনাদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

আমাদের দেশের শিল্প বাণিজ্যের পরিপুষ্টি সাধন ব্যাপারে ভারতবাসীর সম্মুখে সুবিশাল কর্মক্ষেত্র উন্মুক্ত হইয়াছে। ইহার ফলে ভূসম্পত্তির প্রতি লোকের বর্তমান অত্যধিক আগ্রহ (আমাদের অনেক শিল্প বিলুপ্ত হওয়াতে বহু লোক স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া ভূমির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে) কমিয়া আসিবে, মধ্যবিত্ত শ্রেণি অর্থ উপার্জনের সুন্দর উপায় প্রাপ্ত হইবেন, বিদেশাভিমুখী ধনের প্রবল প্রবাহ শীর্ণ হইবে। আর একটা বিষয় বিবেচনার যোগ্য। সভ্যদেশে রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থায় রাজনৈতিক আন্দোলন ইংরেজ জাতির ন্যায়বুদ্ধির নিকট আবেদন নিবেদন মাত্র। কিন্তু তাঁহাদের ন্যায়বুদ্ধি অদ্যাবধি এরূপ বিকশিত হয় নাই যে, রাজনীতি ক্ষেত্রেও উহার প্রত্যুৎপাদক প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। পক্ষান্তরে দুর্বলজাতির প্রতি তাঁহাদের ব্যবহার লক্ষ্য করিলে প্রতীতি জন্মায় পাশ্চাত্য দেশের নৈতিক আদর্শ ক্রমশঃ উন্নত ভাব লাভ করিতেছে না, বরং অবনতির দিকেই হেলিয়া পড়িতেছে। আধুনিক ইউরোপের পরপীড়ক সাম্রাজ্যবাদের মূলে শিল্পবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়া অর্থসংস্থান জন্য তীব্র তৃষ্ণা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রধানতঃ ব্যবসায় ক্ষেত্র প্রসারিত করিবার অভিপ্রায়েই ইউরোপের প্রধান প্রধান রাজশক্তি এশিয়া ও আফ্রিকার দুর্বল জাতির উপর আধিপত্য স্থাপন জন্য প্রয়াসী হইয়াছেন। যদি এই সকল দুর্বলজাতি প্রবলোৎসাহে কার্যক্ষেত্রে অর্থাগমের পথ খুলিতে প্রবৃত্ত হয়, এবং স্বদেশজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাদের অভাব মোচন করিতে আরম্ভ করে, তবে বৈদেশিক শিল্পিকুলের তাণ্ডবে তাঁহাদের পণ্যক্ষেত্র এক্ষণে যেরূপ অন্তঃসারশূন্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা আর হইতে পারিবে না এবং তাঁহাদের দেশ আর প্রতীচ্য শিল্পবাণিজ্যের লীলাক্ষেত্র থাকিবে না। তখন পরপীড়ক সাম্রাজ্যাদি আপনা আপনি নীরবে অন্তর্হিত হইবে; অন্ততঃ সাম্রাজ্যবাদসুলভ পরপীড়ন এবং সমরশীলতা দূরীভূত হইয়া যাইবে। এই বিপ্লব সাধিত হইলে তাঁহার ফল অতি মঙ্গলজনক এবং বহুদূরবিস্তৃত হইবে, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দেশেরই মহদুপকার সাধিত হইবে। ফলতঃ প্রাচ্যজাতি তাদৃশ ফল লাভ কল্পে মহাসাধনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রম কিছুই অযথা নিয়োজিত হইবে না। *প্রবাসী ১৩১৪ বৈশাখ*

রজনীকান্ত গুহ

বয়কট্ (Boycott)

বয়কট্ কথার উৎপত্তি ও ইতিহাস

খ্রিস্টিয় ১৮৭৯ সনের শেষ ও ১৮৮০ সনের প্রথম ভাগে, শীতকালে, আয়র্লণ্ডে ভীষণ দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়। একেই বহুকালাবধি আইরিশ প্রজাগণের অবস্থা অতি হীন ছিল, তাহাতে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়াতে সহস্র সহস্র নরনারী অনশনে অর্ধাশনে কালযাপন করিতে বাধ্য হয়। প্রজাসাধারণের এরূপ অসহনীয় ক্লেশের সময়েও জমিদারগণ কড়া ক্রান্তিতে খাজনা আদায় করিতে সচেষ্ট হইলেন, এবং যাহারা খাজনা দিতে অসমর্থ হইল, তাহাদিগকে উৎখাত করিতে লাগিলেন। আয়র্লণ্ডের ভূমি সম্বন্ধীয় আইন চিরদিনই জমিদারগণের সহায় ছিল। প্রজাগণ উপায়ান্তর রহিত হইয়া জমিদারবর্গ ও তাহাদিগের কর্মচারিগণের সংশ্রব পরিত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই সময়ে কাপ্তান্ বয়কট্ নামক ইংরাজ একজন বড় জমিদারের নায়েব (agent) ছিলেন। তাহার প্রতিবেশী প্রজাগণ তাহার সহিত সকল প্রকারের সংশ্রব ত্যাগ করে। এমন কি, তিনি গৃহকর্মের জন্যও ভৃত্য পাইলেন না। গৃহের ও ক্ষেত্রের যাবতীয় কার্য তাহাকে ও তাহার পত্নীকে নিজ হস্তে সম্পন্ন করিতে হইত। অনেক দিন পর্যন্ত তাহাকে পুলিশ-প্রহরী-বেষ্টিত হইয়া পথে বাহির হইতে হইত। এই ঘটনা হইতে কাহাকেও সর্বতোভাবে বর্জন করা এই অর্থে 'বয়কট' কথা প্রচলিত হয়। সুবিখ্যাত চার্লস পার্নেল ও মাইকেল ডেবিট্ কর্তৃক স্থাপিত আইরিশ ল্যান্ডলিগের কার্যকারিতায় ইহার প্রভাব আয়র্ল্যন্ডময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। যাহারা ল্যাণ্ডলিগে যোগ না দিত, তাহারা কেবল সামাজিক ভাবে 'এক ঘরে' হইত তাহা নয়, তাহারা কোনও দোকানদারের নিকট কোনও জিনিস পাইত না, বা কাহাকেও কোন জিনিস বিক্রয় করিতে পারিত না। সংক্ষেপে বলিতে হয়, এই বয়কটের শাসনে তাহাদিগের জীবন ভারবহ হইয়া উঠিত, সুতরাং অচিরাৎ অনুতপ্ত হইয়া তাহাদিগকে প্রজাসাধারণের সহিত মিলিত হইতে হইত। এই ব্যাপক অর্থে বয়কট বঙ্গদেশের সর্বত্র এখনও প্রবর্তিত হয় নাই। আমরা এই প্রবন্ধে উহা 'বৈদেশিক পণ্যবর্জন' অর্থেই ব্যবহার করিব।

বয়কট বা বিদেশজাত পণ্যবর্জনের বিরুদ্ধে যে কয়েকটি আপত্তি সচরাচর শুনা যায়, একে একে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে।

প্রথম আপত্তি—বয়কট অবাধ বাণিজ্যনীতি বিরোধী।

এক শ্রেণির সমালোচক বলেন, বয়কট্ "ফ্রি ট্রেড" (free Trade) বা অবাধ বাণিজ্যের পরিপন্থী, অতএব উহা নিন্দনীয়। সুতরাং আগে দেখিতে হয়, ফ্রি-ট্রেড কি এবং উহা ভারতবর্ষের উপযোগী কিনা।

অবাধ বাণিজ্যের মূলসূত্র

অবাধ বাণিজ্যের মূলসূত্র একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে। মনে করা যাক, বঙ্গদেশে যে পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে পঞ্চাশ মণ ধান হয়, সেই পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে পঁচিশ মণ পাট উৎপন্ন হয়। কিন্তু ঠিক ঐ পরিমাণ ধন ও শ্রম ব্যয়ে ব্রহ্মদেশে পনের মণ পাট ও পঁয়তাল্লিশ

মণ ধান উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ বঙ্গদেশে দুই মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট ও ব্রহ্মদেশে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মণ পাট পাওয়া যায়। সুতরাং ধান ও পাট উভয়ই ব্রহ্মদেশ অপেক্ষা বঙ্গদেশে সুলভ হইলেও এই দুই দেশই ধান ও পাটের আদান প্রদান দ্বারা লাভবান হইতে পারে। বঙ্গদেশ যদি ব্রহ্মদেশ হইতে পাটের বিনিময়ে ধান গ্রহণ করে, তবে এক মণ পাট দিয়া আড়াই মণ ধান পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। এবং ব্রহ্মদেশ যদি ধানের বিনিময়ে পাট গ্রহণ করে, তবে আড়াই মণ ধন দিয়া একমণ পাট পাইলেও তাহার আধ মণ ধান লাভ। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ এক্ষণে তিন মণ ধানের বিনিময়ে এক মনের অধিক পাট পাইবে। সুতরাং এই আদান-প্রদান দ্বারা উভয়েরই লাভ হইবে। এক্ষণে যদি বঙ্গদেশ অধিকতর রূপে পাট ও ব্রহ্মদেশ অধিকতর রূপে ধান উৎপাদন করিয়া পরস্পর ঐ সকল পণ্য বিনিময়ে করে, তবে উভয় দেশের সমষ্টিগত ধন বৃদ্ধি পাইবে। অন্যথা, যদি বঙ্গদেশ পূর্বের মত ধান ও ব্রহ্মদেশ পাট উৎপাদনের চেষ্টা করে, তবে উভয়েরই ধন ও শ্রম কিয়ৎ পরিমাণে অপব্যয়িত হইবে। অর্থাৎ যে স্থলে বঙ্গদেশ এক মণ পাটের বিনিময়ে ব্রহ্মদেশ হইতে আড়াই মণ ধান পাইয়া অধিকতর রূপে পাট উৎপাদন করিতে পারিত, সে স্থলে তাহাকে দুই মণ ধান পাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে, এবং ব্রহ্মদেশও আড়াই মণ ধানের বিনিময়ে একমণ পাট পাইবে না, তাহাকে এক মণ পাটের জন্য তিন মণ ধান দিতে হইবে। অবাধবাণিজ্য এই ক্ষতি হইতে উভয়দেশকেই রক্ষা করে।*

অবাধ বাণিজ্য অব্যাহত রাজনৈতিক অধিকার ভিন্ন অসম্ভব
(Free Trade Presupposes Freedom)

কিন্তু এস্থলে একটি কথা বিশেষ অনুধাবনযোগ্য। বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশ যে এই বিনিময় দ্বারা লাভবান্ হইবে, তদুদ্দেশ্যে উভয়েরই অব্যাহতভাবে নিজ নিজ ধন ও শ্রম বিনিয়োগের অধিকার থাকা আবশ্যক। যদি বঙ্গদেশের অবস্থা এমন হয় যে, যে যে ক্ষেত্রে ধন ও শ্রম খাটাইলে সর্বাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে, সেই সকল ক্ষেত্রে তাহার প্রবেশাধিকার নাই, তবে এই অবাধবাণিজ্য তাহার পক্ষে বিড়ম্বনা মাত্র। কারণ উহার মূল কথাই এই যে, উহা প্রত্যেক দেশকে সর্বাপেক্ষা লাভজনক কার্যে আপনার শক্তি বিনিয়োগ করিতে সমর্থ করে।** যাহাদিগের এই অধিকার নাই, তাহাদিগের পক্ষে ফ্রি-ট্রেড বা অবাধবাণিজ্য, বন্ধ্যার পুত্রলাভের ন্যায় অলীক। একটা দৃষ্টান্ত দিতেছি। মনে করুন, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের মধ্যে অবাধবাণিজ্য চলিতেছে। ইংলন্ড ভারতবর্ষকে লৌহ দিতেছে, ভারতবর্ষ তাহার বিনিময়ে অতি সহজে লবণ দিতে পারে। কিন্তু লবণ ভারতীয় গবর্নমেন্টের একচেটিয়া, সুতরাং গবর্নমেন্ট নিজেই অবাধ বাণিজ্যনীতির মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। কেবল গবর্নমেন্টের একচেটিয়া অবাধ বাণিজ্য নীতির বিরোধী নহে। শিল্প ও বাণিজ্যের

*If two countries which trade together attempted, as far as was physically possible, to produce for themselves what they now import from one another, the labour and capital of the two countries would not be so productive, the two together would not obtain from their industry so great a quanity of commodities, as when each employs itself in producing both for itself and for the other, the things in which its labour is relatively most efficient. The addition thus made to the produce of the two combined, constitutes the advantage of the trade. – *Mill's Political Economy. P. 349.*

** Free trade is simply an extention of the principle of the division of labour. By breaking down the artificial barriers which have been erected between nations, each country,instead of being obliged to depend entirely on home manufactures, can devote its energies to those branches of trade or agriculture to which natural circumstances or national peculiarities have especially adopted it.
- *Mrs. Fawcett's Political Economy for Beginners, P. 15.*

সর্বতোমুখী সকল উপকরণ আবশ্যক, ভারতবর্ষের ন্যায় পরাধীন দেশে তাহা দুষ্প্রাপ্য। বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য হইতে হইলে সর্বাগ্রে শারীরিক, মানসিক, ও নৈতিক বল এবং স্বাস্থ্য আবশ্যক। জলবায়ু ও খাদ্য দ্বারা শারীরিক বল ও স্বাস্থ্য নিয়মিত হয়। ভারতের জলবায়ু সনাতন কাল হইতেই ভারতে আছে—কিন্তু তাহার দোষে যদি প্রজাসাধারণ দলে দলে মরিতে আরম্ভ করে, তবে তাহার প্রতিকার অনেক পরিমাণে সরকার বাহাদুরের হাতে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। আর দিনের পর দিন প্রজাগণ অর্ধাশনে থাকিলে, সরকার বাহাদুরকে নির্দোষ মনে করা যাইতে পারে না। ...ঐ ত্রিবিধ প্রকারের বল ও স্বাস্থ্যই আশালতা, স্বাধীনতা ও ইচ্ছাপূরণ স্থান ও কার্য পরিবর্তনের উপর নির্ভর করে।* পরাধীন দেশে স্বাধীনতা তো নাই-ই, আশাশীলতা ও পরিবর্তন ক্ষমতাও অতি মন্দীভূত। সুতরাং অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে যে সকল গুণ অত্যাবশ্যক, ভারতে তাহার সর্বাঙ্গীণ বিকাশ অসম্ভব।

শিল্প-বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির জন্য ভূ-বিদ্যা, খনিজ-বিদ্যা, রসায়ন বিদ্যা, স্থাপত্য, এঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতির উন্নত জ্ঞান অপরিহার্য। এদেশে এ সকল শিক্ষার উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা থাকিলে ভারতীয় যুবকগণকে নানা বিপদ ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া বিদেশে যাইতে হইত না। বঙ্গীয় ছাত্র রুড়কী কলেজে গৃহীত হয় না, এদেশে নৌবিদ্যা শিক্ষার কোনও ব্যবস্থাই নাই, বিলাতেও নৌ বিভাগে কোনও ভারতীয় ছাত্র প্রবেশ করিতে পারে না। নানারূপে ভারতবাসীর হাত পা বাঁধা, তথাপি অনেকে আমাদিগকে বুঝাইতে চাহেন যে, ভারতে ও বিলাতের মধ্যে যে বাণিজ্য চলিতেছে, তাহা একান্তই অবাধ।

অবাধ বাণিজ্যের দোহাই হাস্যজনক

অতীত কাহিনীর আলোচনা করিলে দেখিতে পাই, ইংরেজগণ যত দিন না ভারতীয় শিল্পের সর্বনাশ সাধনে কৃতকার্য হইয়াছিলেন, ততদিন স্বদেশে অবাধ বাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই। কি গর্হিত উপায়ে তাহারা এ দেশীয় শিল্পের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মহাশয় তাহার Economical History of British India নামক গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণন করিয়াছেন। আশা করি, শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই উহা পাঠ করিয়াছেন। আমরা এ স্থলে শুধু বলিতে চাই যে, সে কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া যাহারা এক্ষণে অবাধ বাণিজ্যের দোহাই দিয়া বয়কটের নিন্দা করেন, তাহারা কপট না নির্বোধ, ইহা নির্ণয় করা কিঞ্চিৎ কঠিন। ভারতবর্ষ হইতে যখন বিলাতে বস্ত্র রপ্তানি হইত, তখন যদি ইহারা অবাধবাণিজ্যের পক্ষে সংগ্রাম করিতেন, তবে বুঝিতাম ইহাদিগের কথার মূল্য আছে। কিন্তু সে বিষয়ে বিলাতি পণ্য কলিকাতায় শতকরা আড়াই টাকা এবং ভারতীয় পণ্য ইংলণ্ডে শতকরা চারিশত টাকা শুল্ক দিত! এইরূপে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যখন ভারতীয় শিল্প সমূলে নির্মূল হইল, তখন ইংরেজগণ অপূর্ব উদারতাগুণে অবাধবাণিজ্যের

* "We have next to consider the conditions on which depend health and strength, physical, mental and moral. They are the basis of industrial efficiency, on which the production of material wealth depends" - *Marshall's Economies of Industry. P. 111.*

"Next come three closely allied condition of vigour, namely hopefullness, freedom and change. All history is full of the record of inefficiency caused in varying degrees by slavery, serfdom, and other forms of civil and political oppression and repression. Freedom and hope increase not only man's willingness but also his power for work.

"Changes of work, of scene, and of personal associations bring new thoughts, call attention to the imperfection of old methods, stimulate a divine discontent and in every way develop creators energy".-- -*Marshall's Economis of Industry. P. 114*

পক্ষপাতী হইয়া জোর করিয়া ভারতে উহার প্রবর্তন করিলেন। অবাধবাণিজ্য তো বটেই!*

ভারতীয় শিল্প যাহাতে পুনরুজ্জীবিত না হইতে পারে, তৎপক্ষে ভারতের ও বিলাতের গবর্নমেন্ট সর্বদাই সাবধান। এদেশীয় শ্রমজীবীগণের অবস্থা পরিদর্শনের জন্য সম্প্রতি জন মর্লী এক কমিটি নিয়োগ করিয়াছেন। ঐ কমিটির উদ্দেশ্য অতি মহৎ, সন্দেহ নাই। বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের বিরুদ্ধে এত সংগ্রাম করিয়াও কিন্তু মর্লীর সিংহাসন টলাইতে পারা গেল না! আর সে দিন লর্ড মিন্টো প্রদর্শনী ক্ষেত্রে "সাধু স্বদেশি" ও "অসাধু স্বদেশি" ইত্যাকার অনেক সুমিষ্ট উপদেশ দিয়াছেন। মর্লীর কমিটি, মিন্টোর উপদেশ এবং ফুলারের লাঠি—এই সকলের মধ্যেই এক নিগূঢ় সমপ্রাণতা রহিয়াছে, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রেই তাহা দেখিতে পাইবেন। বস্তুতঃ বর্তমান অবস্থায় অবাধবাণিজ্যের দোহাই দিয়া ভারতবর্ষকে ইংলন্ডের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বাধ্য করা আর জরাজীর্ণ, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে প্রকাণ্ড দানবের সহিত মল্লযুদ্ধে আহ্বান করা একই কথা।** অবাধ বাণিজ্য ভারতেব পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযোগী এবং এখন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের যে ব্যবস্থা আছে, তাঁহাকে অবাধবাণিজ্য বলা নিতান্তই অযৌক্তিক।

ভারতের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি নিয়ম এই যে, আমদানি ও রপ্তানি পরস্পরের মূল্য প্রদান করে। অর্থাৎ সমকক্ষভাবে বাণিজ্য চলিলে, ভারতবর্ষ যদি বিলাতে এক কোটি টাকার গম রপ্তানি করে, তবে তৎপরিবর্তে বিলাত হইতে এক কোটি টাকার বস্ত্র আমদানি করিবে। কিন্তু ভারতবর্ষ যদি ইংলন্ডের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে, তবে উহার সুদস্বরূপ ঐ এক কোটি টাকার উপর অতিরিক্ত গম রপ্তানি কবিতে হইবে। এবং এইরূপে ভারতের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি অধিক হইবে। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ যদি প্রতি বৎসর বিলাতে এক কোটি দশ লক্ষ টাকার গম পাঠাইয়া বিলাত হইতে এক কোটি টাকার বস্ত্র গ্রহণ করে, তবে সে ক্রমেই নিঃস্ব হইয়া পড়িবে। সুতরাং যে দেশের রপ্তানি আমদানি অপেক্ষা অধিক, সে দেশের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হয়। ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক তাই। এ দেশের আমদানি অপেক্ষা রপ্তানি বৎসরে প্রায় সাঁইত্রিশ কোটি টাকা অধিক।*** ইহার কারণ ভারত সচিবের অফিসের ব্যয়, ইংরেজ কর্মচারিগণের পেন্সন, রেলওয়ে ইত্যাদির মূলধনের সুদ প্রভৃতি বাবদে ভারতবর্ষকে বৎসরে অনেক কোটি টাকা বিলাতে দিতে হয়—উহার সমস্তই রপ্তানি রূপে প্রেরিত হয়। এই অস্বাভাবিক ও সর্বনাশকর অবস্থা হইতে দেশকে

---

* "The above extract will show that while British political Economists professed the principles of free trade from the latter end of the eighteenth century, the British Nation declined of adopt them till they had crushed the Manufacturing power of India, and reared their own Manufacturing power Then the British Nation turned free traders, and invited other nations to accept free trade principles The other nations including the Bitish colonies Know better, and are now rearing their Manufacturing power by protection. But in India the Manufacturing power of the people was stamped out by protection against her industries, and then free-trade was forced on her so as to prevent a revival.

--*Dutt's Economical History. P. 302*

** "Free-trade between England and India in a matter like this is something like a race between a starving exhausting invalid, and a strong man with a horse to ride on Free trade between countries which have equal command over their own resources is one thing, but even then the colonies snapped their fingers at all such talk. But what can India do? Before powerful English inerests India must and does go to the wall

- *Dadabhai Nowroji's Poverty and Un-British rule in India, P 62*

*** The necessity of relying upon foreign countries for our suppiies of food has forced upon England the adoption of free-trade

Mrs. Fawcett's Political Economy, P. 174.

রক্ষা করিবার একতম উপায় বয়কট। কারণ আমরা যদি বিলাতি পণ্য গ্রহণ না করি, তবে তৎপরিবর্তে এদেশীয় পণ্যও বিলাতে প্রেরিত হইবে না। সুতরাং যেমন আমদানি কমিবে, তেমনি রপ্তানিও কমিয়া যাইবে অর্থাৎ দেশের ধন পূর্বাপেক্ষা অধিকতররূপে দেশে থাকিবে। সঙ্গে সঙ্গে আরও যে সকল উপকার হইবে, তাহার কথা এস্থলে না বলিলেও চলে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভারতের ক্ষতি

আমরা বিলাতে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য, এবং পাট প্রভৃতি কাঁচা মাল পাঠাই। তদ্বিনিময়ে বস্ত্র প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বস্তু পাই বটে, কিন্তু এগুলি ছাড়া আমরা এমন অনেক বস্তু গ্রহণ করি, যাহা জীবনের পক্ষে একান্ত আবশ্যকীয় নয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি নিয়ম এই যে, এ দেশ হইতে যাহা রপ্তানি হইবে, এ দেশে তাঁহার মূল্য বৃদ্ধি পাইবে এবং যাহা আমদানি হইবে, তাহার মূল্য হ্রাস হইবে। এই নিয়মানুসারে এ দেশে চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য বস্তু দুর্মূল্য হইতেছে এবং ফসল একটু মন্দ হইলেই সহস্র সহস্র লোককে অনশনে বা অর্ধাশনে দিন যাপন করিতে হইতেছে। পক্ষান্তরে বিলাসের উপকরণগুলি সস্তা পাওয়া যাইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে প্রজাসাধারণের লাভ কি? আর কাঁচা মাল অল্পমূল্যে বিলাতকে দিয়া তাহার আবার রূপান্তরিত রূপে অধিক মূল্যে আমরা গ্রহণ করিতেছি—পাঁচ টাকায় এক মণ পাট বিক্রয় করিয়া তাহারই বস্ত্র পঞ্চাশ টাকায় ক্রয় করিতেছি—ইহাতে আমরা কতদূর লাভবান হইতেছি, ইহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। এই বাণিজ্য বন্ধ হউক—ভারতের নগরে নগরে শিল্পশালা প্রতিষ্ঠিত হউক—দ্রুতগতিতে দেশের ধন বৃদ্ধি হইবে—অচিরাৎ ভারতবাসীর শ্রী পুনরাগমন করিবে। ইংরেজগণ পরোপকারের জন্য অবাধবাণিজ্যনীতি অবলম্বন করেন নাই—উদরের জ্বালায় করিয়াছেন।* ভারতবর্ষের পক্ষে উহার কোনও আবশ্যক নাই। কারণ আমাদের "সুজলা সুফলা, শস্য-শ্যামলা" ভারতজননী একাকিনীই তাহার কোটি কোটি সন্তানের সর্বপ্রকার অভাব মোচনে সমর্থ।

বয়কট এক প্রকারের আমদানি শুল্ক (Boycott is a sort of Protection)

বিলাতের গবর্নমেন্ট যখন ভারতীয় শিল্পের উচ্ছেদসাধন করিতেছিলেন, তখন, ভারতের রাজপুরুষগণও আমাদিগের স্বদেশীয় হইলে বিলাতি পণ্যের উপর ঐরূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া প্রাদেশিক শিল্পকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা করিতেন। কিন্তু ভারতের প্রকৃত রাজা ইংরেজ বণিকগণ, সুতরাং আমাদের সদাশয় ভারত গবর্নমেন্ট বিলাতি পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিবেন, ইহা তো দূরের কথা, বোম্বে ও অন্যান্য স্থানের কাপড়ের কলগুলি যাহাতে মাথা তুলিতে না পারে, তাহার বিধান করিতে সর্বদাই অগ্রসর। এ অবস্থায় আমাদের কর্তব্য, আমরা নিজেরা বৈদেশিক পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিয়া ভারতীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার করি। কথাটা একটু পরিষ্কার করিয়া বলা আবশ্যক।

মনে করা যাক, একখানি বিলাতি কাপড় এক টাকায় এ দেশে পাওয়া যায়। তাহার কারণ ঐ কাপড়ের উপকরণের মূল্য, শ্রমজীবীর বেতন, এ দেশে উহা আনিবার ব্যয় প্রভৃতি নির্বাহ করিয়াও কাপড়খানিতে দুই আনা বা এক আনা লাভ হয়। কিন্তু ঐরূপ একখানি দেশি কাপড় আঠার আনায় বিক্রয় করিলে তবে তত্তুল্য লাভ থাকে। সুতরাং লোকে সস্তা বলিয়া বিলাতি কাপড়ই ক্রয় করিবে। এখন গবর্নমেন্ট যদি ঐ বিলাতি কাপড়ের উপরে তিন আনা শুল্ক স্থাপন করেন,

---

* ১৯০৩ সনের ৩১-শে মার্চ পর্য্যন্ত এক বৎসরে আমদানি, ১৩২, ৭২, ১২, ০৭৬, রপ্তানি ১৬৯, ৭৮, ৯৪, ২৩০.

তবে আর উহা এ দেশে এক টাকায় বিক্রীত হইতে পারিবে না; তখন উহার মূল্য বৃদ্ধি হইবে, সুতরাং দেশীয় বস্ত্রের সহিত প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে না পারাতে ক্রমে উহার আমদানি রহিত হইবে। ইহারই নাম শিল্পরক্ষা বা Protection। কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি ইংরেজ উপনিবেশ সমূহ বিলাতি পণ্যের উপর এইরূপ শুল্ক স্থাপন করিয়া আপন আপন শিল্প রক্ষা করিতেছে। আমরাও যদি এক টাকায় একখানি বিলাতি কাপড় ক্রয় না করিয়া কিঞ্চিৎ অধিক মূল্যে একখানি দেশি কাপড় ক্রয় করি, তবে যাহা অধিক দিলাম, তাহা ঐ শুল্কের কার্য করিবে। সুতরাং বয়কট্ বা বিদেশি বর্জন কোনও পৈশাচিক ব্যাপার নহে। উহা আমেরিকা, কানাডা প্রভৃতি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন দেশসমূহে বহুকাল প্রচলিত বাণিজ্যনীতির অস্ফুট অনুসরণ।

আমদানি শুল্ক (Protection) সর্বদা নিন্দনীয় নহে

এক ইংলণ্ড অনাহারের ভয়ে অবাধ বাণিজ্যনীতি গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু ইংলন্ডেও কয়েক বৎসর ধরিয়া চেম্বার্লেন উহা পরিবর্তিত করিবার জন্য সংগ্রাম করিতেছেন। এবং জন্ স্টুয়ার্ট মিলের ন্যায় মনস্বী লেখকও স্থলবিশেষে প্রোটেকশন বা আমদানি শুল্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলেন, যদি কোনও দেশে কোনও পণ্যের উপর শুল্ক স্থাপন করিলে, ঐ পণ্য ঐ দেশেই উৎপন্ন করিবার স্থায়ী উপায় প্রবর্তিত করা যাইতে পারে, তবে ঐরূপ শুল্ক স্থাপন সর্বথা সঙ্গত।* ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই নীতি সর্বতোভাবে প্রযোজ্য—কারণ এ দেশে বস্ত্রশিল্পের তো কথাই নাই—আমাদের নিত্য ব্যবহার্য এমন কিছুই নাই, যাহা উপযুক্ত উৎসাহ পাইলে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হইতে না পারে।

জাতীয় জীবনে অর্থ-লাভই চরম শ্রেয়ঃ নহে

আর যদি বা অর্থনীতির সিদ্ধান্ত অনুসারে বয়কটের কিছু দোষ ত্রুটি থাকে, মনে রাখিতে হইবে, জাতীয় জীবনে অর্থনীতিই এক মাত্র-পথপ্রদর্শক নহে—অর্থনীতির উপরেও নীতি আছে—স্বর্ণ রৌপ্য অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ ধন আছে। অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ লেখক জন স্টুয়ার্ট মিল্ স্বয়ং বলিয়াছেন, যাহা economically disadvantageous, তাহা অনেক সময়ে Politially expedient, অর্থাৎ কোনও প্রণালী অর্থের হিসাবে ক্ষতিকর হইলেও তাহা পরিত্যাজ্য নহে, কারণ, জাতীয় উন্নতির পক্ষে তাহা অত্যাবশ্যক হইতে পারে। ইহা বলিবার অপেক্ষা করে না যে **বয়কট বঙ্গদেশে এক নবজীবন আনয়ন করিয়াছে। অতি অল্প দিনের মধ্যে ইহা বাঙালিদিগের মধ্যে স্বাবলম্বন ও স্বাধীন চিন্তার প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছে, নানা ক্ষেত্রে উদ্ভাবনী শক্তি স্ফুরণের পথ সুগম করিয়া দিয়াছে, এবং এই নির্জীব জাতির হৃদয়ে আত্মমর্যাদা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব জাগ্রত করিয়া তুলিতেছে।** সুতরাং অবাধ বাণিজ্যনীতি যাহাই বলুক না কেন, **বয়কট্ বঙ্গদেশে ভারতে চির প্রতিষ্ঠিত থাকুক।**

দ্বিতীয় আপত্তি, ইহা বিচ্ছিন্নতামূলক (Boycotty means isolation)

বয়কটের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় আপত্তি, ইহা এই সভ্যতা ও উন্নতির যুগে ভারতকে অপরাপর দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে চাহে। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই, এই ধারণা ভ্রমাত্মক। আমরা চাই,

* "The only case in which on mere principles of political economy, protecting duties can be defensible, is when they are imposed temporarily, (especially in a young and rising nation) in hopes of naturalizing a foreign industry, in itself perfectly suitable to the circumstances of the country..... A protecting duty, continued for a reasonable time, will sometimes be the least inconvenient mode in which the nation can tax itself for the support of such an experiment." - *Mill's Political Economy, P. 556.*

আবহমানকাল ভারত যেমন য়ুরোপ ও এশিয়াকে শিল্পজাত পণ্য দিয়া ধনধান্যে পরিপূর্ণ থাকিত, তেমনি আবার শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি করিয়া কমলাকে গৃহে অচঞ্চলা করিয়া রাখুক। ভারত কেন ম্যাঞ্চেষ্টারেরর বস্ত্র গ্রহণ করিবে—ভারতের বস্ত্র অলঙ্কারের মত য়ুরোপ ও আমেরিকায় প্রেরিত হউক। কার্পাস, পাট এদেশেরই বস্ত্রে রূপান্তরিত হউক, চাউল, গম প্রভৃতি আহার্য বস্তুতে প্রতি গৃহস্থের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকুক, অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টিতে গরিব জনসাধারণ যেন আর পঙ্গপালের মত মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।

তৃতীয় আপত্তি, ইহা অভাবাত্মক (Negative)

কোন কোন দেশ বিখ্যাত ব্যক্তি এই বলিয়া বয়কটের নিন্দা করেন যে, স্বদেশি ভাবাত্মক, বয়কট অভাবাত্মক। আমরা এতকাল তো জানিতাম, ভাব ও অভাবে দিবারাত্রির ন্যায় নিত্য সম্বন্ধ, একে অন্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। স্বদেশি বস্তু ব্যবহার করিব, অথচ বিদেশি পণ্য বর্জন করিব না, ইহা কিরূপে সম্ভব, তাহা সুতীক্ষ্ণ মেধাবিশিষ্ট ব্যবহারজীবীগণের পক্ষেই বলা সম্ভব, অথবা বলিতে হয়, ইহা "দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ।"

চতুর্থ আপত্তি, বয়কট, নিষ্ফল, কারণ বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই।

কোন কোন বুদ্ধিমান লোকের মুখে শুনিতে পাই, সকলেই যদি বিদেশি বর্জন করে, তবে চলিবে কি রূপে? এ দেশে জীবনধারণোপযোগী শিল্পজাত এত প্রচুর উৎপন্ন হয় না, যে তাহাতে সমস্ত ভারতবাসীর অভাব মোচন হইতে পারে। যখন বৈদেশিক পণ্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই, তখন আমরা না হয় বিদেশি ত্যাগ নাই করিলাম। একটি গল্প বলিলেই ইহাদিগের কথার উত্তর দেওয়া হইবে।

এক রাজা একটি দীর্ঘিকা খনন করাইয়া প্রজাগণকে আদেশ করিলেন, এক রাত্রির মধ্যে উহা দুগ্ধ দ্বারা পূর্ণ করিয়া দিতে হইবে, এবং তদর্থে প্রত্যেক প্রজাকে এক ঘটি দুগ্ধ দিতে হইবে। প্রজাগণ সকলেই চতুর। প্রত্যেকেই ভাবিল, আর সকলেই দুগ্ধ দিবে, আমি না হয় এক ঘটি জলই দিলাম। নিশাবসানে দেখা গেল, সেই দীর্ঘিকা জলে পরিপূর্ণ, উহাতে এক বিন্দুও দুগ্ধ নাই।

পঞ্চম আপত্তি, বয়কট্ প্রেম বিরোধী

ধার্মিক বা ধর্মাভিমানী কেহ কেহ বলেন, বয়কট্ প্রেমবিরোধী, হাঁ, ইংরেজ প্রেম-চাকুরি প্রেম-শ্বেতাঙ্গপদলেহন প্রেম-বিরোধী তো বটেই। কিন্তু ইহা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী নহে। একজন বিখ্যাত লেখক বলিয়াছেন, "যে স্বদেশকে প্রীতি করিতে জানে না, তাহার পক্ষে বিশ্বপ্রেম মিথ্যা কল্পনা।" উচ্চতম প্রেমধর্মের উপদেশ এই, যদি তোমার প্রতিবেশীর বস্ত্র না থাকে, আর তোমার দুখানি বস্ত্র থাকে, প্রতিবেশী অনাহারে থাকে, আর তোমার গৃহে প্রয়োজনাতিরিক্ত খাদ্য থাকে, তবে তুমি অপরাধী।* বয়কট্ ভারতীয় প্রজাপুঞ্জকে মৃত্যুগ্রাস হইতে রক্ষা করিতে চাহে, ইহা যে প্রেমের বিরোধী, তাঁহার অর্থ স্বার্থপরতা ও নিশ্চেষ্টতা — মানবপ্রীতি নহে।

সামাজিক বয়কট্ এ দেশে নূতন নহে

এতক্ষণ বৈদেশিক পণ্য বর্জনের কথা বলিলাম। দেশদ্রোহীকে সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত করাও সর্বদা কর্তব্য। প্রেমাবতার বুদ্ধদেব তাহার বিধি দিয়া গিয়াছেন। একবার ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদিগের

* "I felt, and feel even now, and shall never stop feeling, that I am a participant in a crime which is taking place all the time, so long as I have superfluous food, and another man has none, and I have two garments, when another had not even one."

--- *Tolstory's What shall we do then? P. 15.*

মধ্যে কলহ উপস্থিত হইল। এই কলহে চন্ন নামক একজন ভিক্ষু ভিক্ষুণীদিগের পক্ষ অবলম্বন করে। তাহাতে সংঘপ্রীতির অভাব দেখিয়া বুদ্ধদেব তাহার প্রতি ব্রহ্মদণ্ডের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মদণ্ড আর কিছুই নহে—সামাজিক বয়কট।

"চন্নস্‌স, আনন্দ, ভিক্‌খুনো মম্‌ অচ্চয়েন ব্রহ্মদণ্ডো কাতব্বো তি।
কতমো পন, ভন্তে, ব্রহ্মদণ্ডো তি। চন্নো,আনন্দ, ভিক্‌খু যং ইচ্ছেয্য তং
বদেয্য, সো ভিক্‌খুহি নেব বত্তব্বো ন ওবদিতব্বো ন অনুসাসিত ব্বো তি।"

মহাপরিনির্বাণসুত্তং। ৬

"হে আনন্দ আমার দেহান্ত হইলে চন্নের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড প্রয়োগ করিবে। (আনন্দ বলিলেন) ভগবন্‌ ব্রহ্মদণ্ড কি? (বুদ্ধ বলিলেন), হে আনন্দ, চন্ন যাহা ইচ্ছা বলুক, ভিক্ষুগণ তাঁহার সহিত কথা বলিবে না, তাহাকে উপদেশ দিবে না, তাহাকে অনুশাসন করিবে না।"

কথিত আছে, চন্ন এই দন্ড বহন করিতে না পারিয়া অনুতপ্ত হৃদয়ে সংঘের শরণাপন্ন হয়, ও পরিশেষে সাধন বলে নির্বাণ লাভ করে "আমি বুদ্ধদেব অপেক্ষা প্রেমধর্মে সমুন্নত", এই স্পর্ধা যিনি অন্তরে পোষণ না করেন, তিনি স্বদেশদ্রোহীর দন্ডদানে কুণ্ঠিত হইতে পারেন না।

উপসংহার

আয়র্লন্ডের সহিত ভারতবর্ষের অবস্থাগত সাদৃশ আছে। আয়র্লন্ডেই 'বয়কটের' উৎপত্তি। অতএব ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে উহা অতি সঙ্গতরূপেই প্রবর্তিত হইয়াছে। সকলের জন্য এক পথ নির্দিষ্ট হয় নাই, সকল জাতিই এক উপায়ে সৌভাগ্যমঞ্চে আরোহণ করিবে না। আমেরিকা অস্ত্র বলে যাহা করিয়াছে, ভারতবর্ষ যে বয়কটের সাহায্যে তাহা করিবে না, কে বলিতে পারে? সে দিন দূরবর্তী হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বয়কটের প্রয়োজনীয়তা খণ্ডিত হইতেছে না।

প্রবাসী ১৩১৩ চৈত্র

প্রমথনাথ চৌধুরী

বয়কট এবং স্বদেশীয়তা

গত ৭ আগস্ট টাউন হলে আমাদের সমাজের নেতারা সভা করে প্রতিশ্রুত হয়েছেন যে, যতদিন না গভর্নমেন্ট বঙ্গ-বিভাগের প্রস্তাব ত্যাগ করেন ততদিন বাঙালি ব্রিটিশ মাল বয়কট (boycott) করবে। তার পরে অনেক সভাসমিতিতে বক্তাদের মুখে এমন কথাও শোনা যাচ্ছে যে, বঙ্গদেশ আস্ত থাকুক্ কিম্বা কাটা পড়ুক আমরা কেবল মাত্র স্বদেশি বস্তু ব্যবহার করবার পণ ছাড়ব না। এক দলের মতে বয়কট ব্যাপারটা শুধু একটা রাজনীতির চাল, উদ্দেশ্য, প্রজার অধিকার বজায় রাখা। অপর দলের মতে—"স্বদেশীয়তা" শুধু একটা অর্থনীতির চাল, উদ্দেশ্য—প্রজার দারিদ্র্য মোচন। নেতা এবং বক্তার দল বাদ দিলে বাদবাকি আমাদের সকলের নিকট বয়কট এবং স্বদেশীয়তা দুয়ে মিলে একটা ব্যাপার হয়ে উঠেছে। বয়কটই বল আর স্বদেশীয়তাই বল,—সাধারণের কাছে নামের পার্থক্য ছাড়া অন্য কোনও বিশেষ প্রভেদ নেই। আসল জিনিসটা কি চাই, কি করতে হবে এবং কেন করতে হবে সে বিষয় সকলেরই একটা মোটামুটি ধারণা জন্মে গেছে। কিন্তু প্রচারকের দল পরস্পরের সঙ্গে মিল কি আছে সে বিষয়ে বড় নজর দেন না, কোথায় গরমিল আছে তাই নিয়েই চিৎকার করতে ভালবাসেন। এমন লোকও পৃথিবীতে দুর্লভ নয় যার মনোভাব এই যে, তার মনের আঁস্তাকুড় হতে উদ্ধৃত কানাকড়িটি যদি না চালাতে পারেন তা হ'লেই সমাজ উচ্ছন্নে যাবে, অন্ততঃ যাওয়া উচিৎ। অবস্থা যখন এই রকম, তখন বয়কট এবং স্বদেশীয়তা এ দুই একই জিনিস, কিম্বা বাস্তবিকই দুয়ের ভিতর কিছু পার্থক্য আছে, আর যদি পার্থক্য থাকে ত সে পার্থক্য কোথায়, সেটা আমাদের বুঝে দেখা কর্তব্য।

প্রথমতঃ আমি "স্বদেশীয়তা" সম্বন্ধে দুটি চারটি কথা বলতে চাই। স্বদেশীয় বস্তু প্রচারের কথাটা ভারতবর্ষে অনেক দিন হল উত্থাপিত হয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য সকল জিনিষ বিদেশ থেকে আনাতে হলে আমাদের ধনক্ষয় হয় এই রূপ একটা ধারণা অনেকেরই অনেক দিন থেকে আছে। কৃষি এবং বাণিজ্যের মত শিল্পও যে দেশের শ্রীবৃদ্ধির একটা বিশিষ্ট উপায় এ কথাটা বুঝতে বেশি বুদ্ধির আবশ্যক করে না। আমাদের দেশের শিল্পলোপ যে বর্তমান দারিদ্র্যের একটা প্রধান কারণ সে ত স্পষ্ট। সুতরাং শুধু প্রাণের দায়ে আমাদের দেশীয় শিল্পের উন্নতি এবং বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমাদের যে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য এ কথাও কেউ অস্বীকার করবেন না। এ সব জেনে শুনেও দু'চারজন ছাড়া বড় কেউ, কি করে দেশীয় শিল্পের উন্নতি হতে পারে, তার জন্য কিছুমাত্র যত্ন করেন নি। আমরা শিক্ষিতের দল, মনে করতুম যে কল-কারখানার বিরুদ্ধে শুধু হাতের কাজের লড়াই চলে না। সুতরাং নানা কারণে যখন কল-কারখানা আমরা এদেশে চালাতে অপারগ তখন মিছি মিছি economical laws-এর সঙ্গে বিবাদ করে বাঁচবার প্রয়াস ছেড়ে দেওয়াই ভাল। আর যারা অশিক্ষিত, কি কারণে কি ফল হয় যাদের জানাও নেই এবং বোঝবারও ক্ষমতা নেই, তারা নিজেদের অদৃষ্ট, দুরবস্থার কারণ বলে স্বীকার করে নেয়। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ সকলেরই ভিতর তারা ভগবানের হাত দেখে। তাদের নিজের চেষ্টায় যে তাদের অবস্থার উন্নতি হতে পারে ; তাদের দুর্দশার কারণ যে মানুষের চেষ্টায় দূর হতে পারে এ ধারণা তাদের ছিল না এবং আমরা শিক্ষিত লোকেরাও অনুগ্রহ করে সে ধারণা তাদের মাথায় প্রবেশ করিয়ে দিইনি। আমাদেরও তাতে বিশেষ

দোষ ছিল না। শুধু বক্তৃতায় কারো পেট ভরে না। এবং আমাদের কোটি কোটি ইতরসাধারণের পক্ষে দেশের কথা প্রধানতঃ পেটের কথা। তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তির উপায় যদি না করে দিতে পারি তাহলে আমাদের দূরে থাকাই ভাল। যারা পেটের জ্বালায় জ্বলছে তাদের উপরন্তু কথার জ্বালায় জ্বালাবার কোন দরকার নাই। শিল্পীর উন্নতি, ইংরেজিতে যাকে বলে Supply, তার উপর নির্ভর করে। নিজের দেশের গড়া জিনিষ চাওয়াটার চাইতে পাওয়াটাই হচ্ছে বিশেষ দরকার। আমরা সব পুঁথি পড়া লোক demand এর সৃষ্টি করতে পারি কিন্তু supply এর সৃষ্টি করতে পারিনে। মনের ভাবকে আমরা বদলে দিতে পারি কিন্তু বস্তুজগৎকে আমরা কায়দা করতে পারিনে। পিপাসা বাড়ালেই যে জলের পরিমাণ অমনি বেড়ে যাবে এমন কোন জাগতিক নিয়ম আমার জানা নেই। এই সব কারণে এতদিন আমাদের দ্বারা দেশীয় শিল্পের উন্নতি বিশেষ কোন সাহায্য হয় নি। শিল্পজাত দ্রব্য কাজে লাগে বলে আমাদের আবশ্যকীয় এবং সুন্দর হলে আমাদের আদরের সামগ্রী। কলের হাত, পা আছে, পেট আছে কিন্তু আমাদের সৌন্দর্যজ্ঞানকে পরিতৃপ্ত করতে পারে না। কিন্তু হাতে গড়া জিনিষে অনেক সময় উভয়গুণই বর্তমান থাকে, সুতরাং আমাদের মধ্যে যারা খালি কাজের লোক নয়, এমন দু'চারজন,—দেশীয় শিল্পজাত দ্রব্যের আদর করতে শিখছিলুম। Economy ছেড়ে aesthetics ধরে যতটুকু হয় স্বদেশি শিল্পের মর্যাদা রক্ষা করতে চেষ্টা করছিলুম। অরুচি রোগটা সৌখিন লোকদের মধ্যেই হয়ে থাকে, সাধারণের মধ্যে সেটা চারিয়ে দেওয়া যায় না ; এবং দেওয়াটাও ইচ্ছনীয় নয়। দু'মাস আগে আমাদের "স্বদেশীয়তা" এই অবস্থায় ছিল।

এখন বয়কটে আসা যাক্ বয়কটের অর্থ হচ্ছে তোমার জিনিস ছোঁব না। তুমি সস্তাতেই দাও আর ভাল জিনিষই দাও আমি তোমার জিনিস কিন্‌ব না। ফি রকম জিনিষ যদি বেশি দামে কিন্‌তে হয় তবুও তোমার ছাড়া আর সকলের জিনিস কিন্‌ব। ভাল, তুমি ছাড়া যদি আর কারও কাছে জিনিস না পাওয়া যায় তাহ'লে কিছু কিনবই না। আমার লোকসান হয় তাও স্বীকার, আমাকে নানারকম স্বার্থত্যাগ করতে হয় সেও স্বীকার। এ রকম মনোভাব বহুলোকের মধ্যে মনে একটা বিশেষ কোন আঘাত না লাগ্‌লে জন্মায় না। অধিকাংশ লোকের পক্ষে শুধু জীবনযাত্রাটা এতই কঠিন ব্যাপার যে, তারা নিজের বর্তমান স্বার্থ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বক্তার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করো বলাটা যত সহজ, শ্রোতার পক্ষে স্বার্থত্যাগ করাটা ঠিক ততটা সহজ নয়। কোন্ দূর ভবিষ্যতে তাঁতি, ছুতোর, কুমোর, কামারের অবস্থা একটু ভাল করবার জন্য বর্তমানে নিজে দুরবস্থায় পড়তে খুব কম লোকই রাজি। বয়কটের ভিতর লোকসান আছে, স্বার্থত্যাগ আছে অথচ আজকের দিনে ধনী, দরিদ্র আবালবৃদ্ধবণিতা বাঙালিমাত্রই ব্রিটিশ মাল বয়কট কর্‌ব এ কঠিন পণ কেন করে বসেছে? কারণ এই, বঙ্গবিভাগে সকলের মনে এতটা আঘাত লেগেছে যে তারা দুদিনের জন্যও নিজের স্বার্থ ভুলে নিজেদের জাতীয় জীবন অক্ষুণ্ণ রাখবার চেষ্টা করছে। কেবল Economics এর দোহাই দিয়ে মানুষের মনে এ ভাবে এ দৃঢ়তা আনা যায় না। যে সকল বক্তা পার্টিশানের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে বয়কটকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা কর্‌ছেন তারা আমার মতে গোড়া কেটে আগায় জল ঢালছেন। দ্বিতীয় কথা, বয়কট, আমরা রাজার অবিচারের প্রতিকারের উপায় স্বরূপ মনে করি। ইংরাজ জাতের পকেটে টান পড়লে, চাই কি বাঙালির প্রতিও তাদের নজর পড়্‌তে পারে, এই বিশ্বাসে এই আশায় বয়কটের জন্ম। আমরা আর যত প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন করি সে সব ইংরাজের কাছে আমাদের শেখা। বয়কট হচ্ছে খাঁটি দেশি চিজ—সেইজন্য দেশশুদ্ধ লোক এতে যোগাদান করেছে। আমাদের দেশে ধর্মঘট করা দোকানপাট বন্ধ করা প্রভৃতি, রাজার অন্যায় কার্যের প্রতিবাদ করবার সনাতন প্রথা। এই ধর্মঘট, প্রবলের বিরুদ্ধে দুর্বলের হাতে একমাত্র অস্ত্র। সকল দেশে সকল সময়ে বয়কট করবার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক। ধর্মঘটও চিরকাল রাখা যায় না, বয়কটও চিরকাল রাখা যায় না। দেশের শিল্পের উন্নতির প্রধান উপায় দেশে জিনিষ প্রস্তুত করা। পরের কিন্‌ব না বলায় কোনও লাভ নেই, যদি-না নিজের মাল বাজারে

ফেল্‌তে পারি। সুতরাং স্বদেশি বস্তু ব্যবহার, স্বদেশি বস্তু প্রচার করা নয়, প্রস্তুত করবার উপর নির্ভর করছে। শিল্পের উন্নতি ধীরে-সুস্থে হয় স্বদেশীয়তার ভিত্তি লাভের উপর। বয়কটের প্রাণ ক্ষতি স্বীকারের উপর। কেবল অর্থলাভের উপর স্বদেশীয়তা দাঁড়াতে পারে। কিন্তু বয়কটের পিছনে অনেকটা স্বজাতি বৎসলতা থাকা চাই। স্বদেশীয়তা ধীরে-সুস্থে চর্চা করবার বিষয়। বয়কট আসন্ন বিপদ হতে উদ্ধার হবার সময়োপযোগী উপায়। যে উদ্দেশ্যে এ কার্য করা তার যতদিন পুরোপুরি নিষ্পত্তি না হয়ে যায় ততদিন যতই অসুবিধা হোক সকলেরই কর্তব্য প্রাণপণে নিজের প্রতিজ্ঞা বজায় রাখা। যদি আমরা বয়কটে কৃতকার্য হই, যদি ইংলণ্ডের লোকের পকেটে সত্য-সত্যই টান পড়ে, তবেই বোঝা যাবে যে আমাদের দুর্বলের উপায় সফল হল কি না? আমাদের উপায় আমরা পুরোপুরি প্রয়োগ না করতে পারলে, সে উপায় বাস্তবিকই ঠিক, কি মিছে, তা বলবার আমাদের অধিকার জন্মাবে না। শেষকথা এই যে, বয়কটের মুখ্য উদ্দেশ্য লাভ করি আর নাই করি এর গৌণফল অতি শুভ। এই ঝোঁকে আমাদের "স্বদেশীয়তা" প্রাণলাভ করেছে। এই ঝোঁক আমরা কিছুদিন রাখতে পারলেই আমাদের স্বদেশি শিল্পের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে যে কার্য আরম্ভ করা গেছে অর্থনৈতিক হিসাবে তার আসল ফল লাভ করবো। উপরে যা বললুম তার সারমর্ম এই—যারা বলেন বয়কট রাজনীতির কথা, তাদের কথাও ঠিক; যারা বলেন, "স্বদেশীয়তা" অর্থনীতির কথা তাদের কথাও ঠিক। আর আমরা আপামর সাধারণ যারা মনে করি ও দুই-ই একদেহের পৃথক অঙ্গ এবং আমাদের রাজনৈতিক উন্নতির ইচ্ছাই হচ্ছে সে দেহের প্রাণ ; আমাদের মতই সকলের চাইতে বেশি ঠিক।

ভারতী ১৩১২, আশ্বিন

স্বদেশিত্ব ও বিদেশি বর্জনের মাত্রা ও প্রকারভেদ

স্বদেশিত্ব ও বিদেশি বর্জন সম্বন্ধে সমুদয় বাঙালি একমত নহেন। অনেকে স্বদেশির পক্ষপাতী কিন্তু বিদেশি বর্জন চান না। যাহারা স্বদেশি ও বিদেশি বর্জন দুই চান, তাহাদের মধ্যেও সামান্য মতভেদ আছে। আমরা পূর্বেও এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। বর্তমান প্রবন্ধেও কিছু বলিব।

প্রথমে ইহা বলা আবশ্যক যে বিদেশি জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিবার প্রণালী ও যন্ত্রাদি; এবং অন্যান্য বিষয়েও কার্য করিবার উৎকৃষ্ট পাশ্চাত্য পদ্ধতি আমরা বর্জন করিতে পারি না; করা উচিতও নহে। বিদেশি বিলাসদ্রব্য, মাদকাদি অনিষ্টকর দ্রব্য, অহিতকর ফ্যাশন ও সামাজিক রীতিনীতি, প্রভৃতি সমুদয়ই বর্জনীয়। ফ্যাশন সম্বন্ধেও মতভেদ দেখা যায়। কারণ এমন অনেক লোক আছেন যাহারা সাহেবি পোষাক পরেন, কিন্তু পোষাকগুলি দেশি উপাদানে প্রস্তুত করাইয়া থাকেন। এ সকল কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল জিনিষ সম্বন্ধে বিচার করিলে বলা যায় যে, যে সকল জিনিষ ভারতবর্ষে বর্তমান সময়ে উৎপন্ন হয়, বিদেশি সে সকল জিনিষ কেনা আমাদের উচিত নয়। যে সকল জিনিস ভারতবর্ষে এখন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু ভবিষ্যতে চেষ্টা করিলে হইতে পারে, তৎসমুদায়, বিলাসদ্রব্য হইলে ত্যাগ করা উচিত ; প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইলে যতদিন ভারতবর্ষে না হয়, ততদিন বিদেশি ব্যবহার করা যাইতে পারে। এমন অনেক জিনিস আছে, যাহা ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত হইতে পারে না। তৎসমুদায় বিলাসদ্রব্য হইলে, বর্জনীয় · নতুবা ব্যবহার্য। কোন্‌টি বিলাসদ্রব্য এবং কোন্‌টি আবশ্য প্রয়োজনীয় তদ্বিষয়ে অবশ্য মতভেদ হইবে।

ভারতবর্ষে উৎপন্ন বা প্রস্তুত সমুদয় দ্রব্যকেই আমরা স্বদেশি বলিয়া থাকি ; কিন্তু তন্মধ্যেও শ্রেণিবিভাগ আছে। তাহা ক্রমশঃ দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝান যাইতেছে।

প্রথমেই ধরুন, লিখিবার ও ছাপিবার কাগজ, কলম, কালি, মুদ্রাযন্ত্র ইত্যাদি। লিখিবার কাগজ, কলম ও কালি এখন সমস্তই দেশি পাওয়া যায়। তাঁহার মধ্যে একটু প্রকারভেদ আছে। লিখিবার কাগজের মধ্যে হাতের তৈয়ারি যে সকল অমসৃণ বা খস্‌খসে চিঠির কাগজ আদি পাওয়া যায়, তাহাই সম্পূর্ণ দেশি। বাংলা দেশে যে সকল কলের কাগজ লিখিবার জন্য এবং খবরের কাগজ মাসিক পত্র ও পুস্তক ছাপিবার জন্য অনেকে ব্যবহার করেন, তাহা ঠিক দেশি নহে। উহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় বটে, কিন্তু উহার কল বিলাতি, মূলধন ও পরিচালকগণ বিলাতি, প্রধান কারিকরগণ বিলাতি, রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতি ; কেবল ঘাস, খড় আদি উপাদান এবং মজুরগণ দেশি। বাংলা দেশে দেশি লোকদের কাগজের কল একটিও নাই। অযোধ্যা প্রদেশে লক্ষ্ণৌয়ে দেশি লোকদের পরিচালিত একটি কাগজের কল আছে। উহারও কলকারখানা এবং রাসায়নিক দ্রব্যাদি বিলাতি। বর্তমানে ভারতবর্ষে দেশি ও বিলাতি লোকদের দ্বারা পরিচালিত যতগুলি কাগজের কল আছে, তাহারা দেশের প্রয়োজনানুরূপ কাগজ যোগাইতে অসমর্থ। অবশ্য কাপড় সম্বন্ধেও স্বদেশির বিরোধিরা এই যুক্তি প্রয়োগ করেন। তাহারা বলেন যে দেশের কলে ও হাতের তাঁতে যত কাপড় হয়, তাহাতে দেশের লোকের অভাব মোচন হইতে পারে না। অতএব বিদেশি কাপড় বর্জন করা যাইতে পারে না। কিন্তু কাপড়ে ও কাগজে প্রভেদ আছে। ছেঁড়া পুরাতন কাপড়ও সেলাই করিয়া পরা যায়। কিন্তু ছেঁড়া পুরাতন কাগজে পুনর্বার ছাপা যায় না। যিনি বৎসরে ৪ জোড়া কাপড় পরেন, তিনি কষ্ট করিয়া ৩ জোড়াতেও কাজ চালাইতে পারেন। কিন্তু যাহার খবরের কাগজের ১০,০০০ বা পুস্তকের ২,০০০ কাটতি [illegible] ৭ হাজার বা দেড়হাজার ছাপিলে চলে না। অপেক্ষা

করিবারও যো নাই। সপ্তাহে ১০,০০০ কাটতি হইলে ১০,০০০ই ছাপিতে হইবে। কিন্তু এ প্রভেদ সত্ত্বেও যাহাদের হাফটোন ছবি ছাপিতে হয় না, তাহারা বাজারে দেশি কাগজ যতদূর পাওয়া যায়, ব্যবহার করিতে পারেন। সরকারি অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, ভারত সাম্রাজ্যে, বিশেষতঃ ব্রহ্মদেশে, কাগজের কল বেশ চলিতে পারে। ইহাতে অনেক মূলধনের দরকার। কিন্তু এক যোগে কাজ করিলে মূলধনের অভাব হয় না। জ্ঞানও চাই। যদি শিক্ষিত যুবকগণ কুলির কাজ লইয়া টিটাগড় প্রভৃতি কলে কাজ শিখিতে আরম্ভ করেন, তাহা হইলে দেশে থাকিয়াই এই জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। তবে ভদ্রলোক সাজিয়া গেলে তাহারা কাজ পাইবেন না। এবং অতিরিক্ত মান অভিমান থাকিলেও চলিবে না।

কাগজ সম্বন্ধে আর একটি কথা আছে। প্রবাসী এবং অন্যান্য সমুদয় বাংলা, হিন্দি, ইংরাজি প্রভৃতি দেশি ও বিলাতি মাসিক পত্রে বা পুস্তকে যে রূপ উৎকৃষ্ট মসৃণ কাগজে হাফটোন ছবি ছাপা হয়; তাহা ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। উহা বিলাতি বা বিদেশি। যাহারা বিদেশি কিছুই ব্যবহার করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তাহাদিগকে অবশ্য হাফটোন ছবি যুক্ত সমুদয় বাংলা ইংরাজি দেশি ও বিলাতি মাসিকপত্র এবং পুস্তক বর্জন করিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় বিলাতের ছাপা বহিও ত্যাগ করা উচিত ; কারণ উহার লেখক, মুদ্রাকর, কাগজ, কালি, মুদ্রাযন্ত্র, দপ্তরি, সুতা, বাঁধাইয়ের কাপড়, সবই বিলাতি। হাফ্‌টোন ছবি বিলাসদ্রব্য কিম্বা উহার কোন উপকারিতা আছে, তাহা আমরা এখানে বিচার করিব না। আমাদের মত এই যে ভাল ছবির উপকারিতা আছে। প্রসঙ্গতঃ হাফটোন ছবি সম্বন্ধেও ইহা বক্তব্য যে উহার সমুদয় যন্ত্র, সাজসরঞ্জাম, মালমসলা, বিলাতি বা বিদেশি; প্রস্তুত অবশ্য শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় বা অপর কোন কোন ভারতবাসী কর্তৃক হইতে পারে। তদ্ভিন্ন ইহাও জানা দরকার যে হাফটোন ছবি ছাপিবার কালি ভারতবর্ষে প্রস্তুত হয় না। বিলাতি কিম্বা মার্কিন কালিই ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হয়।

লিখিবার কালি খাঁটি দেশি বেশ পাওয়া যায়। তাহা সত্ত্বেও অনেকে বাধ্য হইয়া বা অন্য কারণে কোন্‌নগরে ওয়াল্ডি সাহেবের প্রস্তুত কালি ব্যবহার করেন।

তৎপরে মুদ্রাযন্ত্রের কথা। যত ছাপাখানা আছে, সমুদয়েই বিলাতি বা বিদেশি মুদ্রাযন্ত্র বা ছাপিবার কল ব্যবহৃত হয়। এক আধ জন ভারতবাসী কাঠের বা লোহার ২/১টি হস্তচালিত মুদ্রাযন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছিলাম ; কিন্তু তাহা কোথাও ব্যবহার হইতেছে বলিয়া শুনি নাই। মুদ্রাযন্ত্র ছাড়া ছাপাখানার আরও অনেক সাজসরঞ্জাম বিলাতি। অব্যবসায়ী পাঠকবর্গ তাহা বুঝিবেন না বলিয়া বিশেষ বিবরণ দিলাম না। যাহারা বিলাতির কোনই সম্পর্ক রাখিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, তাহাদিগকে সমুদয় মুদ্রিত খবরের কাগজ, মাসিকপত্র এবং পুস্তক পাঠ ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের বোধ হয় আপাততঃ পুস্তকাদি পাঠ ত্যাগ না করিয়া ছাপাখানার এই সব জিনিস দেশে প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করা উচিত।

আমরা যতদূর জানি, অধিকাংশ বড় ছাপাখানায় বিলাতি বা মার্কিন ছাপিবার কালি ব্যবহৃত হয়। দেশি কালি কেহ কেহ ব্যবহার করেন বলিয়া শুনা যায়। ভারতবর্ষে ভাল ছাপিবার কালি প্রস্তুত হয় না। যদি কেহ ভাল ছাপা চান, তাহাকে বর্তমান সময়ে বিদেশি কালির সহিত সম্পর্ক রাখিতেই হইবে। এ বিষয়ে আমাদের স্বদেশানুরাগ পরিতৃপ্ত করিবার একমাত্র উপায় বিদেশ গিয়া ভাল কালি প্রস্তুত করিবার প্রণালী শিখিয়া আসিয়া স্বদেশে কালির কারখানা খোলা।

তাহার পর যে সকল অক্ষর বা হরফের দ্বারা ছাপা হয়, তাহারও স্বদেশিত্ব বিচার্য। ইংরাজি ভাল সুদৃশ্য সাধারণ ও বিচিত্র নানা রকমের হরফ বিলাত ও মার্কিন দেশ হইতে আমদানি হয়। দেশেও হয়, কিন্তু বৈচিত্র্য, উৎকর্ষ ও স্থায়িত্বে উহা বিদেশির সমকক্ষ নহে। বাংলা-হরফ আমাদের দেশেই দেশি লোকদের দ্বারা প্রস্তুত হয়। কিন্তু হরফ ঢালাই খানার যন্ত্রাদি বিদেশি। হরফ সাধারণতঃ সীসা, আন্টিমনি, টিন ও তামা এই চারিটি ধাতু মিশাইয়া, এই মিশ্র ধাতু হইতে প্রস্তুত হয়। মোটের

উপর বলিতে গেলে এই চারিটি ধাতুর প্রায় সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। ভারতবর্ষে খনি হইতে অতি অল্পই উত্তোলিত হয়।

যাহা হউক, ছাপাখানার এই সব ব্যাপারে দেশের অধিকাংশ লোকেরই কিছু আসিয়া যায় না। প্রধানতঃ চারি প্রকার জিনিসের আমদানিতে আমাদের ধনক্ষয় হইতেছে; কাপড়, লৌহ ইস্পাত প্রভৃতি ধাতুদ্রব্য, লবণ এবং চিনি। দেশি-কাপড় কলের তাঁতের ও হাতের তাঁতের এই দুই প্রকার। কলগুলি বিদেশি, কোন কোন হাতের তাঁতও বিদেশি। কিন্তু দেশি খুব ভাল হাতের তাঁতও পাওয়া যায় ; তাহাই ব্যবহার করা যাইতে পারে। কাপড়ের কলও কতক দেশি লোকের, কতক ইংরাজদের। তন্মধ্যে আমাদের দেশি লোকের কলের কাপড়ই পছন্দ করা উচিত। ইহা ছাড়া কাপড়ের আর এক শ্রেণিবিভাগ আছে। সরু সুতার ও মোটা সুতার। মোটা সুতা ভারতবর্ষজাত কার্পাস হইতেই প্রস্তুত হইতে পারে। সরু সুতার জন্য মিশর ও মার্কিন দেশের কার্পাস ব্যবহৃত হয়। আজকাল সিন্ধু দেশে সরু সুতার উপযোগী কার্পাস অল্প পরিমাণে উৎপন্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। যাহারা সম্পূর্ণরূপে দেশি কাপড় পরিতে চান, তাহারা বোম্বাইয়ে প্রস্তুত মোটা সুতা হইতে হাতের তাঁতে বুনা কাপড় পরিলেই ঠিক্ হয়। কিন্তু কাপড়ের পাড়ের রং বিদেশ হইতে আসে। সুতরাং রংও আমরা প্রস্তুত করিতে না পারিলে খাঁটি দেশি কাপড় পরিতে পাইব না। তাহার পর আর এক কথা। যদিও ভারতবর্ষের মাটির নিচে যথেষ্ট লোহা আছে, তথাপি, হাতের তাঁতের মাকু প্রভৃতি নির্মাণের জন্য লোহা ইস্পাত প্রভৃতি প্রায়ই বিদেশ হইতে আসে। কলের তাঁত ত সমস্তই বিদেশি। জামশেদজী নাসের বাঞ্জি তাতা মহাশয় মধ্যপ্রদেশে বিশাল লোহার কারখানা খুলিবার উদ্যোগ করিয়া গিয়াছিলেন। উহার কার্য কিছু দিন পরে আরম্ভ হইবে, কিন্তু উহার সমুদয় মূলধন ভারতে পাওয়া গেল না। উহার অনেক অংশীদার বিদেশি। এই কারখানা হইতে লোহা উঠিতে আরম্ভ হইলে আমরা দেশি লোহা ইস্পাত যত আবশ্যক পাইব।

তাতা মহাশয়ের নামের উল্লেখে একটা কথা মনে হইল তিনি মোটর গাড়ি, ইত্যাদি আমাদের বিবেচনায় অনাবশ্যক বিস্তর বিদেশি জিনিষ ব্যবহার করিতেন। আমরা অনেকে তাহা করি না। কিন্তু তিনিই যে সকল কাপড়ের কল স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে আমাদের মত হাজার হাজার লোকের কাপড় সম্বন্ধে স্বদেশিব্রত পালন সম্ভব হইয়াছে। আবার তাঁহারই চেষ্টার ফলে আমরা দেশি লোহা-ইস্পাত এবং তন্নির্মিত দ্রব্যও পাইব। সুতরাং কেহ বিলাতি জিনিষ ব্যবহার করেন বলিয়াই তাঁহাকে দেশের শত্রু বা স্বদেশির বিরোধী মনে করা উচিত নয়। তিনি "স্বদেশি"র জন্য কি করিতেছেন তাহাও দেখা উচিত। অবশ্য সকলেই যদি বিলাতি বর্জন ও দেশিদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার, দুইটিই করেন, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়।

যাহা হউক, আমরা যদি মোটা কাপড় পরিতে রাজি হই, ও তজ্জন্য আপাততঃ কিছু বেশি মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকি, এবং প্রত্যেকেই কাপড়ের খরচ কিছু কমাই, তাহা হইলে স্বদেশোৎপন্ন কাপড়ে সকলেরই লজ্জানিবারণ নিশ্চয়ই হইতে পারে।

কিন্তু শীতবস্ত্র সম্বন্ধে আমাদের অবস্থা কার্পাস বস্ত্র অপেক্ষা খারাপ। পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি প্রদেশে দেশজাত পশমে হাতের তাঁতে বোনা অল্প পরিমাণ গরমকাপড় পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু বেশির ভাগ পশমী লুই প্রভৃতি যাহা আমরা দেশি বলিয়া ব্যবহার করি, তৎসমুদয় ধারিওয়াল, কানপুর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। ইহারা পশম আমদানি করেন প্রধানতঃ অস্ট্রেলিয়া হইতে। সুতরাং শীত গ্রীষ্ম উভয় কালেই আমাদিগকে পোশাক বিষয়ে খাঁটি স্বদেশি থাকিতে হইলে দেশে পশম উৎপাদন ও দেশের লোকের দ্বারা তাহা বুনাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তবে আর এক উপায় হইতে পারে। আমরা অনায়াসে তূলাভরা জামা ও পাজামা পরিতে পারি। ফ্যাশনের ব্যত্যয় হয় না, এরূপ সুন্দর তূলাভরা জামা এবং পাজামাও প্রস্তুত হইয়া থাকে। হাল্কা ও নরম বলিয়া ইহা পরিতেও বেশ আরাম।

আমাদের দেশে এখন সুন্দর সুন্দর ছুরি, কাঁচি ইত্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। গবর্নমেন্টের ও রেলওয়ে কোম্পানিদের কারখানায় যথাক্রমে কামান বন্দুকাদি অস্ত্রশস্ত্র এবং রেলগাড়ি চালাইবার এঞ্জিনাদি হইতেছে। কারিকর দেশি, সুতরাং ভারতে এ সবই হইতে পারে। তাতা মহাশয়ের লোহার খনির কাজ আরম্ভ হইলে বিদেশ হইতে আমদানি লোহার পরিবর্তে দেশি লোহা ইস্পাতও পাওয়া যাইবে। কিন্তু ছুরি, কাঁচি তরবারি কামান বন্দুক এঞ্জিন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদির কারখানা আমাদের নিজের কখন হইবে?

বিলাতি লবণ পরিত্যাগ করা খুব সহজ। কারণ করকচ লবণ দামেও সস্তা এবং যথেষ্ট পাওয়া যায়।

বিদেশি চিনি দেশি চিনি অপেক্ষা সস্তা এবং দেখিতেও উজ্জ্বল ও পরিষ্কার। এইজন্য অনেকে বিদেশিই ব্যবহার করেন। যাহারা বেশি দাম দিয়াও দেশি চিনি খাইতে প্রস্তুত, দোকানদারেরা অনেক স্থলে তাহাদিগকে লাভের আশায় দেশি বলিয়া বিদেশি চিনি দিয়া ঠকায়। কেবল গুড় খাওয়া একটা উপায় বটে ; কিন্তু গুড়ও বিদেশ হইতে আসে ও জাভার লাল চিনিকে গুড়ে পরিণত করিয়া দেশি বলিয়া বিক্রি করিলে লাভ থাকে। যাহারা চিনি প্রস্তুত করিবার বৈজ্ঞানিক উপায় জানেন তাহারা বলেন যে ভারতেও ভাল জাতীয় আখের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চাষ করিয়া কারখানা স্থাপন করিলে এবং দেশি লোক দ্বারা চালাইলে (সাহেব হইলে চলিবে না, কারণ তাহারা বেশি বেতন চায়) দামে বিদেশির সঙ্গে টক্কর দেওয়া চলে। এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত মে মাসের মডার্ন রিভিউ পত্রিকায় দ্রষ্টব্য। বর্তমানে যে সকল আধুনিক প্রণালীর চিনির কারখানা আছে, তন্মধ্যে কানপুর ও সাজাহানপুর এবং বেহার প্রদেশেরগুলি ইংরাজদের। কোটচাঁদপুরে একটি দেশি কারখানা আছে।

মোট কথা, কাপড়, চিনি, কিম্বা আর যাহাই বলুন, কেবল বর্জননীতিতে সমস্ত কাজ হইতে পারে না। সঙ্গে সঙ্গে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে ভাল সস্তা জিনিষ উৎপাদনও করিতে হইবে। বিদেশি বর্জন আন্দোলনের আমরা পক্ষপাতী ; কিন্তু উহাতেই আমাদের শক্তির অধিকাংশ নিয়োগ করা উচিত নহে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক একদিকে বলিতেছে যে বাঙালি কেবল বকিতেছে ও বর্জন করিতেছে কিন্তু উৎপাদন করিতেছে না, অপর দিকে উহারাই বাঙালির বকা ও বর্জনের ফল ভোগ করিতেছে—দেশি জিনিষ প্রস্তুত করিয়া। আমাদের বাক্‌সর্বস্ব বলিয়া বদনামও হইতেছে এবং আমাদেরই সমালোচকগণ আমাদের বাক্যের দ্বারা আমাদের পকেট হইতে টাকা লইয়া ধনবান হইতেছে, এ দৃশ্য বোধ হয় আমাদের পক্ষে প্রীতিকর ও গৌরবজনক নহে।

প্রবাসী ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ

GRADUATED BOYCOTT

The opponents of the New Spirit have discovered that boycott is an illusion. An entire and sweeping boycott, they say, is a moral and physical impossibility, and their infallible economic authority, Mr. Gokhale, has found out that a graduated boycott is an economic impossibility. They point to the failure of the thorough-going boycott in Bengal as a proof of the first assertion ; the second, they think, requires no proof, for how can what Mr. Gokhale has said be wrong? This assertion of the impossibility of a graduated boycott is an answer to the reasoning by which Mr. Tilak has supported the movement in Maharashtra. In the first days of the movement Mr. Tilak published a series of vigorous and thoughtful articles in the *Kesari* on Boycott as a political Yoga. He advocated the entire exclusion of British goods, the preference of Swadeshi goods at a sacrifice when they were attainable, and, when unattainable, the preference of any foreign goods not produced in the British Empire. To the argument that this programme was not immediately practicable in its completeness, he replied that as in Yoga, so in the boycott, "even a little of this *dharma* saves us from a mighty peril". The mighty peril is the enire starvation of the country by foreign exploiters and its complete and hopeless dependence on aliens for almost all articles of common use. Even a slight immediate diminution of this dependence would be a great national gain and could by degrees by extended until the full boycott policy became an accomplished fact. Mr. Tilak, with his shrewd practical insight, was able to see clearly that immediate and complete success of a thorough-going boycott was not possible in India, but that a gradually efficacious boycott would naturally result from a thorough-going boycott campaign. What Mr. Tilak foresaw, is precisely what is happening.

The entire exclusion of British-made goods is the political aspect of the Boycott with which we do not deal in this article. Is it a fact that as an economic weapon a graduated boycott is impossible? Boycott may be graduated in several ways. First, by the gradual growth of the idea of excluding foreign goods a steadily increasing check may be put on the import of particular foreign articles and a corresponding impulse given to the use of the same articles produced in India. A government by imposing a gradually increasing duty on an import in successive tariffs may kill it by degrees instead of immediately imposing a prohibitive rate; the same kind of increasing check. The growth of the sentiment will help on the production of the indigenous article and the increased production of the indigenous article will help on the growth of the sentiment. Thus mutually stimulated, Swadeshi and Boycott will advance with equal and ever more rapid steps, until the shrinkage of the foreign import reaches the point where it is no longer

profitable to import it. The process can only be checked by the insufficiency of capital in the country available or willing to invest itself in Swadeshi manufacture. But the growth of the boycott sentiment will of itself encourage and is encouraing capital to invest in this direction; for so much boycott means so much *sure market* for Swadeshi articles and therefore an increase of capital willing to invest in Swadeshi manufacture. The increased production of the Swadeshi article in its turn means more money in the hands of the mercantile class and of investors in Swadeshi Companies and therefore more capital *available* for investment in Swadeshi manuacture. We fail to see how in this sense an automatically graduated boycot is impossible; on the contrary, it seems to us economically inevitable, provided only the boycott sentiment is inceasingly embraced by the people.

Boycott may be graduated in another way. When the boycott was declared in Bengal, it was declared specially against cloth, sugar and salt, and only generally against other articles. It is therefore the imports of English piece-goods, Liverpool salt and, though only to a slight extent, of foreign sugar into Bengal which have suffered. When this specific boycott has been proved effective, it may be extended to other articles. Thus the boycott may be graduated not only in its incidence on particular articles, but in its extent and range. The graduation of a specific boycott may be partly by artificial and partly automatic. It is artificial when the leaders of the people preach an economic Jehad against particular foreign goods and the people accept their decision. But this artificial boycott can only succeed when there is already an incipient industry in the corresponding Swadeshi article or some existing means of supply however partial, which may be stimulated or extended by the boycott. Liverpool salt has been affected because 'Karkach' is available; British piece-goods have been affected because there was already a mill-industry and a handloom industry which have been enormously stimulated by the boycott, as is shown by the wholesale return of the weaver class to their trade in Bengal and by the increase in the number of weaving mills and the splendid dividends which the existing concerns are paying. On the other hand the campaign against foreign sugar has not been successful, because the proper substitute is not available. Yarns have not been affected because the spinning industry in India is a negligible quantity while the demand for yarn has enormously increased. In time a Jehad against foreign yarn will become feasible. But the specific boycott may also be automatic when the general sentiment of boycott attacks a particular article for which a substitute exists in the country. To take a small instance, the market for steel trunks sent ready-manufactured from England is decreasing to such an extent that failures of dealers in steel trunks are beginning to be recorded. Here again, we fail to see the impossibility of a graduated boycott. It is quite true that in the very beginning the increase of the stimulated Swadeshi article may not be sufficient to blot out entirely the increase in the import, and the superfical and hasty may proclaim the failure of the boycott. But by the growth of the boycott the increase of the Swadeshi article must progressively swell and

the increase of the import must progressively shrink until it is turned into an actual decrease. The fact that the success of the boycott is progressive and not miraculous, need not frighten or disappoint any sensible and determined boycotter. It is true also that the growth of Swadeshi may actually stimulate for a time the import of particular foreign articles, such as machinery or yarns; but the stimulation is temporary and, as soon as part of our growing capital is free and willing to invest in new fields, the graduated boycott will naturally extend itself in these directions sooner than in others.

The theory therefore that a graduated boycott is impossible, seems to us to have no foundation either of facts or of reasoning. Whatever the fate of its use as a political weapon, its success as an economical weapon depends solely on the zeal with which it is preached and the readiness with which it is received by the people.

Bandemataram 1907 April 26

স্বদেশি আন্দোলন



মুসলমান সমাজ

সেদিনের কথা*

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা থেকে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কালপর্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ নিয়ে দীর্ঘকাল বিতর্ক চলেছে। অনেকেই মন্তব্য করেছেন, প্রথম দিকে এই আন্দোলনে মুসলমান সম্প্রদায়ের যে সংযোগ ছিল, মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর থেকে তা ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে। ব্রিটিশ ষড়যন্ত্রে বাঙালি জাতির মেরুদন্ড ভেঙে সেদিন দু-টুকরো হয়ে গিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করে গোটা ভারতের বুকে তারা যে দূষিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, তার বিষাক্ত পরিমণ্ডল পরবর্তী কালে আরও বিস্তৃত হয়েছে।

সেদিনের সেই মুহূর্তকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে মৌলানা আবুল কালাম আজাদ লিখেছেন :
"............ভারতের বড়লাট তখন লর্ড কার্জন। তাঁর সাম্রাজ্যবাদী ধরন-ধারণ আর প্রশাসনিক বিধিব্যবস্থা ভারতের রাজনৈতিক অসন্তোষের আগুনে নতুন করে ঘি ঢেলেছে। সবচেয়ে বেশি অশান্তি মাথা চাড়া দিল বাংলায়; কেননা এই প্রদেশের ওপর লর্ড কার্জন বিশেষ নজর দিয়েছিলেন। রাজনৈতিক দিক থেকে এটি ছিল ভারতের সবচেয়ে অগ্রসর অঞ্চল। বাংলার হিন্দুরা ভারতের রাজনৈতিক জাগৃতিতে নেতৃত্বের ভূমিকা নিয়েছিল। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে ভাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এর ফলে হিন্দুরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং এতে বাংলার হিন্দু আর মুসলমানের মধ্যে স্থায়ী বিচ্ছেদ সৃষ্টি হবে।

"বাংলা এ ব্যবস্থা মুখ বুঁজে মেনে নেয়নি। বরং এক অভূতপূর্ব রাজনৈতিক আর বিপ্লবী উদ্দীপনায় ফোট পড়েছে। শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ বরোদা ছেড়ে চলে এসে কলকাতায় তাঁর কাজের ঘাঁটি গাড়লেন। তাঁর পত্রিকা 'কর্মযোগী' হয়ে উঠল জাতীয় জাগৃতি আর বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক।

"এই সময়ে আমি তখনকার একজন বাঘা বিপ্লবী কর্মী শ্রীশ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর সংস্পর্শে আসি। তাঁর মারফত অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। শ্রী অরবিন্দ ঘোষকে আমি বার দুই দেখেছি মনে আছে। ফলে আমি বিপ্লবী রাজনীতির দিকে ঝুঁকি এবং ছোট ছোট উপদলের একটিতে ঢুকে পড়ি।

"সে সময় বিপ্লবী দলগুলোতে শুধু হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকদেরই নেওয়া হত। সত্যি বলতে কি, বিপ্লবী দলগুলো তখন ছিল কায়মনোবাক্যে মুসলিম বিরোধী। তারা দেখতে পেত যে, ব্রিটিশ সরকার ভারতের রাজনৈতিক সংগ্রামের বিরুদ্ধে মুসলিমদের কাজে লাগাচ্ছে এবং তারা সরকারের হাতের পুতুল হয়ে খেলছে। পূর্ববঙ্গ ততদিনে ভিন্ন প্রদেশ; সে সময়ের জঙ্গীলাট ব্যামফিল্ড ফুলার প্রকাশ্যেই বললেন যে, ব্রিটিশদের চোখে মুসলিম সম্প্রদায় হল তার সুয়োরানী। বিপ্লবীরা মনে করত, ভারতের মুক্তি সাধনায় মুসলিমরা হল পথের কাঁটা; বাধা স্বরূপ বলেই পথের সেই কাঁটা সরাতে হবে।

"বিপ্লবীরা যে মুসলিমদের দেখতে পারত না, তার আরও একটি কারণ ছিল। সরকার এটা মনে মনে জানত যে, বাংলার হিন্দুদের মধ্যে রাজনৈতিক জাগরণ এত বেশি যে, বিপ্লবী আন্দোলনকে টিট্ করার ব্যাপারে কোনো হিন্দু কর্মচারীকেই ষোল আনা বিশ্বাস করা যায় না। সরকার তাই পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের লোকবল বাড়ানোর জন্যে উত্তর প্রদেশ থেকে বিস্তর

* পরিশিষ্ট ৯ দেখুন

মুসলিম অফিসার আমদানি করেছিল। এর ফলে বাংলার হিন্দুরা মনে করতে আরম্ভ করল যে, যেই মুসলিম সেই বুঝি রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের শত্রু।

"শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী আমাকে অন্যান্য বিপ্লবীদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। নবলব্ধ বন্ধুরা যখন শুনলেন আমি তাদের দলে যোগ দিতে চাই, তাদের চোখ ট্যারা হয়ে গেল। গোড়ায় গোড়ায় আমাকে তারা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেন নি; গোপন আলোচনায় আমাকে তারা বাইরে রাখার চেষ্টা করতেন। আস্তে আস্তে সে ভুল তারা কাটিয়ে উঠলেন; আমি তাদের আস্থাভাজন হলাম। যুক্তি দিয়ে আমি তাদের বোঝাতে শুরু করলাম যে, সম্প্রদায়গতভাবে মুসলিমদের শত্রুজ্ঞান করাটা তাদের ভুল। আমি তাদের বলি যে, বাংলায় গুটিকযেক মুসলিম অফিসারের কীর্তিকলাপ দেখে তা থেকে তাদের সার্বিক সিদ্ধান্তে পৌঁছুনো ঠিক নয়।..... আমরা যদি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে কাজ করি, আমাদের বন্ধু হিসেবে তাদের যদি টানবার চেষ্টা করি, তাহলে তারাও রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দেবে। আমি এও তাদের স্পষ্ট করে বলি যে, মুসলিমরা যদি সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করে অথবা এমন কি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে রাখে, তাহলেও রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই ঢের বেশি কঠিন হবে। কাজেই আমাদের সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে যাতে ঐ সম্প্রদায়ের সমর্থন আর বন্ধুত্ব অর্জন করা যায়।"*

বর্তমান বাংলাদেশের অন্যতম বুদ্ধিজীবী আবুল মনসুর আহমদ। সাহিত্য, সাংবাদিকতা, আইনব্যবসায়—জীবনের বহুমুখী ক্ষেত্রের এই কৃতী মানুষটি লিখেছিলেন আত্মস্মৃতি "আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশবছর।" বিশ শতকের এক বিশাল অধ্যায় জুড়ে তাঁর পদচারণা। অবিভক্ত ভারতের রাজনীতি জগতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গড়ে উঠেছিল সম্পর্ক। তাঁর ছেলেবেলা, বঙ্গচ্ছেদ, মুসলিম মানসিকতা এবং সমকালীন রাজনীতির বিষয়ে অনেক কিছুই জানা যায় বইটি থেকে।

আবুল মনসুর ১৯০৬ সালে গ্রামের পাঠশালায় ঢুকে প্রথম "স্বদেশি" শব্দটির সঙ্গে পরিচিত হন। পাঠশালার হিন্দু শিক্ষক ছাত্রদের স্বদেশি কাপড় পরতে বলতেন। কিন্তু "স্বদেশি" শব্দে অর্থ তিনি কখনও ছাত্রদের কাছে ব্যাখ্যা করে বলেন নি। ১৯০৫ সালে ভারতের বড়লাট যখন ময়মনসিংহ যান, তখন রাস্তার গাছের গায়ে এবং বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ইংরেজিতে লেখা ছিল "ডিভাইড আস্ নট। মুরব্বিদের জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারি ওসব 'স্বদেশি' হিন্দুদের কাণ্ড। মুসলমানদের খেলাফে দুশমনি। এই দুশমনিটা কি, ঘরে ফিরিয়া পরে চাচাজীর কাছে পুছ করিয়াছিলাম। তিনি ব্যাপারটা আমাদের বুঝাইবার জন্য যেসব কথা বলিয়াছিলেন, তার কিছুই তৎকালে বুঝি নাই। তবে সে সব কথার মধ্যে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, ঢাকা রাজধানী, বাংলা ও আসাম এই কয়টা শব্দই শুইু আমার মনে ছিল। "স্বদেশি"রা তবে মুসলমানদের দুশমন? ভাবনায় পড়িলাম। দরিরামপুর মাইনর স্কুলে ভর্তি হওয়ার (১৯০৯) অল্প দিন পরেই দেখিলাম, একজন ভাল মাস্টার হঠাৎ বিদায় হইলেন। খোঁজ লইয়া জানিলাম, লোকটা তলে তলে স্বদেশি বলিয়া তাঁকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। আর সন্দেহ রইল না যে 'স্বদেশি' হওয়াটা দোষের।"

তারপর আবুল মনসুরের মনে বাড়তে থাকে ইংরেজ বিদ্বেষ এবং স্বদেশিদের প্রতি অনুরাগ। ১৯১১ সালে সম্রাট পঞ্চম জর্জের দিল্লি দরবার উপলক্ষে আবুল মনসুর বিদ্যালয়ের সেরা ছাত্র হিসাবে বেশ কিছু ইংরেজি ও বাংলা বই উপহার পেয়েছিলেন। সেসব বই নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে দেখা মাদ্রাসার ছাত্রবন্ধু আতিকুল্লার সঙ্গে।

আতিকুল্লা সেদিন তাঁকে বলেছিল :"... ইংরাজ স্বদেশিদের কথায় বঙ্গ-ভঙ্গ বাতিল করিয়াছে এবং তাতে মুসলমানদের সর্বনাশ হইয়াছে, তখন আমার ভুল ভাঙিল। বন্ধুবর আতিকুল্লা ছিলেন আমাদের সকলের বিবেচনায় একটি খবরের গেজেট, জ্ঞানের খনি। তিনি আমাকে পূর্ব-বাংলা

* ভারত স্বাধীন হল—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ। পৃ. ৪-৫

ও আসাম প্রদেশ, রাজধানী ঢাকা ও মুসলমানদের কর্তৃত্বের কথা সবিস্তারে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। স্বদেশিরা কি কারণে এই নয়া প্রদেশ বাতিল করিবার আন্দোলন করিয়াছে, সে আন্দোলন সফল হওয়ায় আজ মুসলমানদের কি সর্বনাশ হইল, চোখে আঙুল দিয়া তা আমাকে বুঝাইয়া দিলেন। তিন বছর আগে চাচাজী যা যা বলিয়াছিলেন, সে সব কথাও এখন আমার মনে পড়িল। তাঁরও কোনও কোনও কথা আজ বুঝিতে পারিলাম। আতিক ভাই এইভাবে সব বুঝাইয়া দেওয়ায় ইংরাজের প্রতি বিদ্বেষ ত বাড়িলই. 'স্বদেশি'র প্রতি আরও বেশি বাড়িল।..."

তারপর আবুল মনসুর একটি মারাত্মক উক্তি করেছেন : "....মুসলমানদের মধ্যে সাধারণভাবে এবং আমার মুরুব্বি ও চিনা-জানা মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা তখনও দানা বাঁধে নাই।..."

অবশ্য পরবর্তী সময়ে আবুল মনসুর অন্যান্য অনেকের মতই অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন, জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা কবেন এবং বৃহৎ রাজনীতি ক্ষেত্রে যুক্ত হযে বাংলার অন্যতম হিন্দু মুসলমান নেতৃবৃন্দের সান্নিধ্যে এসেছিলেন।*

হরিদাস মুখোপাধ্যায়, উমা মুখোপাধ্যায় এবং পরবর্তীকালে সুমিত সরকারের আলোচনায় বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। গোপন পুলিশ রিপোর্ট এবং উর্ধ্বতন সরকারি কর্মীদের বিবরণকে তাঁরা ব্যবহার করে ইতিহাসের জটিল পর্বের ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনাপর্বে পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষজনের একটি অংশকে এই আন্দোলনে শরিক হতে দেখা যায়। কয়েকজন বিশিষ্ট মুসলমান দুই বাংলার সভা-সমিতিতে উপস্থিত থেকে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বক্তব্য রেখেছিলেন। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের জোটবদ্ধ সেই আন্দোলন ইংরেজ শাসকদের পক্ষে প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু ইংরেজ শাসকদের বঙ্গভঙ্গের মূল উদ্দেশ্যই তো ছিল দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষকে উস্‌কে দেওয়া। যা ভ্রাতৃবিরোধী সংঘাতের সৃষ্টি করবে। সে কারণে তারা পূর্ববাংলা ও আসাম নিয়ে স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠনের উদ্দেশ্যে মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার কথা বারবার ঘোষণা করেছে। স্বয়ং কার্জন পূর্ব বাংলা ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন সভায় যে বক্তব্য রাখেন, তার মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্যই প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

ইংরেজ শাসকদের প্ররোচনা ও উসকানিতে প্রভাবিত হয়ে ঢাকার নবাব এবং সাঙ্গোপাঙ্গোরা বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজনকে উত্তেজিত করে তুলেছিলেন। তাব ভয়ানক পরিণতি বাংলার মানুষের পক্ষে মঙ্গলকর হয় নি। যে বিষাক্ত সাম্প্রদায়িকতার বিষ তারা সেদিন ছড়িয়েছিলেন, তার পরিণতিতে কুমিল্লা ও ময়মনসিংহে শুরু হয়ে যায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের তীব্রতা ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেলেও, সাম্প্রদায়িকতার দূষিত পরিবেশ বাংলার দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝখানে এক চিরস্থায়ী ভেদ রেখা টেনে দেয়। যার ভয়ঙ্কর পরিণতিতে আমরা দেখতে পাই, ১৯৪৭ সালে এবং তার পরবর্তী সময়ে বর্বরোচিত সাম্প্রদায়িক সংঘাত। কয়েকজন অবাঙালি মুসলমান নেতা এই দুষ্ট ক্ষতের উৎসমূলে বারুদ সংযোগ করেছিলেন।

যে হিন্দু মুসলমান এক জাতি এক প্রাণ হয়ে বংশ পরম্পরায় সৎ প্রতিবেশী সুলভ মানসিকতায় বসবাস করছিল, রাতারাতি তারা শত্রুতে পরিণত হল কেন? এর পিছনে কেবল ইংরেজ সরকারের উসকানি এবং মুসলমান নেতাদের প্ররোচনা ছাড়াও, হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতাদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা যায় না।

* আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর—আবুল মনসুর মহম্মদ

মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববাংলায় বেশির ভাগ জমিদারই ছিল হিন্দু। উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, সরকারি কর্মী—সর্বত্রই হিন্দুদের প্রাধান্য। এই প্রাধান্য বরাবর চলে আসছিল। মুসলমান সম্প্রদায় থেকে কখনও তার বিরুদ্ধে সরব কণ্ঠস্বর শোনা না গেলেও তাদের মধ্যেও ক্ষোভ ছিল, বেদনা ছিল। আর সেই ক্ষোভ ও বেদনা স্থানকেই ইংরেজ শাসকরা সুনিপুণ চক্রান্তে এক দীর্ঘস্থায়ী জাতিবিদ্বেষী সংঘর্ষের রূপ দেয়।

আর মুসলমান নেতারা ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে নয়, হিন্দু আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলেছিল সাধারণ মুসলমান সমাজকে। দুর্গত, চিরকালের নিষ্পেষিত এইসব মানুষ ভবিষ্যতের সুখকর দিনের হাতছানিতে যদি সেদিন উদ্বেলিত হয়ে থাকে, তবে তার মধ্যে দূষণীয় কিছু থাকতে পারে না। জমিদারি শাসন এবং হিন্দু সমাজপতিদের বিদ্বেষী আচরণ সেদিন সাধারণ মুসলমান শ্রেণির জীবনযাত্রাকে অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। ইতিহাসের ধারা অনুসারে তাদের বিস্ফোরণ ছিল অনিবার্য। কিন্তু রাজনীতির চক্রান্তে সেই বিস্ফোরণ ঘটেছিল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার মধ্য দিয়ে সমগ্র হিন্দু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। চোগাচাপকানধারী মুসলমান উচ্চবিত্তদের সঙ্গে সাধারণ মুসলমান শ্রেণির পার্থক্য ছিল দুস্তর। সাধারণ মুসলমান সমাজ এদেশকে তাদের মাতৃ-পিতৃভূমি মনে করলেও, উচ্চবিত্তরা তা মনে করত না। তারা পশ্চিমী ভাবধারা অনুসরণ করে তাদের আভিজাত্য বজায় রেখেছিল।

সমকালীন বিভিন্ন পত্রপত্রিকার সংবাদ উদ্ধৃত করে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় দেখিয়েছেন বয়কট আন্দোলনে মুসলমানদের অংশগ্রহণ ঘটেছিল আন্দোলনের সূচনাতেই। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউন হল ও কলকাতা ময়দানের জনসভায় মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেয়। ১৯০৫ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকার জনসভা, ১৯০৫ সালের ৪ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারের জনসভা, ১৯০৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর কলকাতার টাউন হলের জনসভা, ১৯০৫ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর কলকাতার রাজাবাজারে মুসলমানদের জনসভা, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর কলকাতায় মিলন মন্দির প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবাদ সভা—এরকম বহু সভা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে বিপুল সংখ্যক মুসলমান অংশগ্রহণই কেবল করেনি, তারাও 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দিতে দ্বিধা বোধ করে নি। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হল ও ময়দানের জনসভায় কলকাতার বিভিন্ন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্ররা কলেজ স্কোয়ার থেকে শোভাযাত্রায় যোগ দেয়, তাদের মধ্যে ছিল কলকাতা মাদ্রাসার ছাত্ররা। এই শোভাযাত্রা থেকেই ছাত্ররা প্রথম বন্দেমাতরম ধ্বনি দেওয়া শুরু করে। বঙ্গ-ভঙ্গের দিন সারা বাংলা জুড়ে যে অরন্ধন ও রাখিবন্ধন ব্রত পালিত হয় মুসলমানদেরও সেই আন্দোলনে ছিল সমর্থন।

স্বদেশি আন্দোলনের প্রথমপর্বে যেসব মুসলমান নেতৃবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম কয়েকজন হলেন ঃ—

আবদুল রসুল	মহম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর	মৌলবি দেদারবক্স
মৌলবি লিয়াকৎ হোসেন	আবদুল হালিম গজনভি	ইব্রাহিম হোসেন
মৌলবি আবুল হোসেন	ডাক্তার আবদুল গফুর	মজিবুর রহমান
মৌলবি তদিসুদ্দিন আহমদ	মৌলবি আবদুল মজিদ	মৌলবি দেলওয়ার হোসেন
মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন	মৌলবি ওয়াজেদ হোসেন	আবুল হোসেন
চৌধুরী ইসমাইল খাঁ	মোতাহার হোসেন	মহম্মদ আশ্রুফ

এরকম আরো মুসলমান নেতার নাম পাওয়া যায়, যাঁরা স্বদেশি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শিক্ষিত মুসলমানদের একটি বড় অংশই ছিল আন্দোলনের সপক্ষে। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির অন্যতম নেতা ছিলেন লিয়াকৎ হোসেন। যাঁকে পরে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল

বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনে যখন সমগ্র বঙ্গদেশ উদ্বেলিত। সেই সময় সূচনা হয় জাতীয় শিক্ষার। "জাতীয় ভাবের উদ্দীপক ও জাতীয় স্বার্থের পরিপোষক" এক স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রণালী প্রবর্তনে নেতৃবৃন্দ যখন উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তখন মুসলমান সম্প্রদায়ও সেই উদ্যোগে অংশ গ্রহণে দ্বিধাবোধ করেনি। ১৯০৫ সালের ২৪ অক্টোবর ফিল্ড আকাদেমি ক্লাবে কার্লাইল সার্কুলারের প্রতিবাদে এবং জাতীয় শিক্ষার দাবিতে যে জনসভা অনুষ্ঠিত হয় সেই সভায় ব্যারিস্টার আবদুল রসুল বলেছিলেন:—"আমরা (মুসলমানগণ) যে আজ জ্ঞানবিজ্ঞানে তেমন পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছি না এবং এই জন্য আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া উঠিতে পারিতেছি না, একথা সত্য। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এইটিও মনে রাখিতে হইবে যে শিক্ষালাভ করিবার উপযোগী অর্থ আমাদের নাই। লর্ড কার্জনের বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হওয়ার পূর্বে আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যে ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহাতেই মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে শিক্ষালাভ করা অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় পুনর্গঠিত হইবার পর হইতে উহা অধিকতর ব্যয়সাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। ইহার ফলে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্বের অপেক্ষাও অল্পসংখ্যক মুসলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারিবে। আজ আমি আমার হিন্দু-মুসলমান-খৃস্টান সর্বধর্মাবলম্বী স্বদেশবাসিগণের নিকট প্রার্থনা করি যে তাহারা যেন এ বিষয়টি ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখেন এবং অবিলম্বে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য ধনভাণ্ডার স্থাপন করেন।"*

—কেবল কলকাতা নয়, মফঃস্বল অঞ্চলে জাতীয় শিক্ষার সপক্ষে ব্যাপক প্রচার শুরু হয়ে যায়। এবং বহু বিদ্যালয়ও স্থাপিত হয়। যার সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের জড়িত থাকার প্রমাণও মেলে। তাছাড়া বেশ কিছু মুসলমানকে সে সময়ে বিপ্লবী দলে জড়িত থাকতে দেখা যায়। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম নেতা আবদুল হালিম গজনভি স্বদেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান 'ইউনাইটেড বেঙ্গল স্টোর্স' স্থাপন করেছিলেন বহুবাজার ও লাল বাজারের সংযোগ স্থলে।

বরিশালের সাপ্তাহিক 'বিকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত 'জারি গানে দেশের কথা' শীর্ষক একটি আলোচনায় জানা যায় : "এ জেলায় 'জারি' নামক এক প্রকার গান আছে। নিম্নশ্রেণির লোকদিগের মধ্যে এই গান বিশেষ আদরের। আলাম, আকুর ও মযোজদ্দি নামক তিনজন মুসলমান তিন দল জারির নেতা। এই জারি গান এদেশের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানেই হইয়া থাকে এবং সকলে, বিশেষতঃ মুসলমান ভ্রাতাগণ, অতি আগ্রহ সহকারে তাহা শুনিয়া থাকেন। উক্ত তিন দলের জারিতেই এবার দেশের কথা গীত হইতেছে। পুলিশ লাইনে কালীপূজা উপলক্ষে প্রায় প্রত্যেক বৎসরই জারি গান হইয়া থাকে, এ বৎসরও দুইদিন হইয়াছিল। শেষ দিন রাত্রে পুলিশ লাইনে তিন দলেই বিদেশিবর্জন ও স্বদেশি গ্রহণ সম্বন্ধে অনেক গান হয়। তৎপর দিন সহরস্থ স্বেচ্ছাসেবকদিগের যত্নে স্থানীয় জমিদারবাবু বিরাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয়ের বাড়িতে জারি হইয়াছিল। বিশাল প্রাঙ্গণ লোক সমাগমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তিন দলেই বঙ্গ বিভাগের অপকারিতা, বিদেশি বর্জনের উপকারিতা, স্বদেশি গ্রহণের বৈধতা সম্বন্ধে অতি সুমধুর পদাবলী গীত হইয়াছিল। আলম, আকুব্বর বা মফেজদ্দি কেহই শিক্ষিত নহে। সরল ভাষায় এই সমস্ত গায়কগণ যে গানগুলি গাহিয়াছে তাহা শুনিয়া অনেকে অশ্রুসম্বরণ করিতে পারেন নাই। বাকরগঞ্জের গ্রামে গ্রামে কৃষকগণ এক্ষণ এই সমস্ত গান গাহিতে আরম্ভ করিয়াছে।"**

বরিশালে মুসলমানদের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল সব থেকে বেশি। এর অন্যতম কারণ ছিল লোকনায়ক অশ্বিনীকুমার দত্তের অনন্য নেতৃত্ব।

কিন্তু মুসলমানদের এই সমর্থন ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। ১৯০৬ সালের পরই তার

*স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১৯৫

**স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায় গ্রন্থে উদ্ধৃত। পৃ. ১৯৮-১৯৯

গতি মন্থর হয়ে পড়ে। এর অন্যতম কারণ মুসলিম লিগের সক্রিয় ভূমিকা এবং ধর্মগত বিদ্বেষে সরকারের প্রশ্রয় দান। সরকারের এই ভূমিকার নিদর্শন ধরা আছে সেকালের সংবাদপত্রের পাতায় এবং সরকারি নথিপত্রে। নবগঠিত পূর্ব বাংলার প্রাদেশিক সরকার যে হিন্দু বিদ্বেষী মুসলিম নীতি অনুসরণ করছিল, সে সম্পর্কে বিলেতের পার্লামেন্টেও বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছিল। পূর্ব বাংলার শাসন কর্তৃত্ব থেকে ফুলারের পদত্যাগের পর নতুন গভর্নর ল্যান্সিলট হেয়ারও একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন। নবাব সলিমুল্লাহ ছিলেন ইংরেজ দোসর। ১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর তারই উৎসাহে ঢাকা এবং প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে বঙ্গভঙ্গের বার্ষিকী পালিত হয়। এ ব্যাপারে তিনি আর্থিক সহযোগিতায় কার্পণ্য করেন নি। বিভিন্ন স্থানে প্রতিনিধিও পাঠিয়েছিলেন। মুসলমানদের স্বদেশি আন্দোলন থেকে সরে যেতে সময় লাগেনি। তাই বলে সমগ্র মুসলমান সমাজকে স্বদেশি আন্দোলনবিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করায় ইতিহাস বিকৃতি ঘটবে।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল ১৯০৭ সালে। যার সূচনা কুমিল্লায় নবাব সলিমুল্লাহের আগমনের পর। তারপর ময়মনসিংহের জামালপুরে দাঙ্গা চরম রূপ নেয়। রায়গঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, বরিশাল ও রাজসাহীতে এই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়েছিল। সে সময়ে মুসলমান জনতাকে উত্তেজিত করার পিছনে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক কিছু প্রচার পুস্তিকাও বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। এর মধ্যে ছিল "লাল ইস্তেহার" ও "বিলাতি-বর্জন রহস্য"।

সম্প্রতিকালে প্রকাশিত একটি গ্রন্থে ইতিহাসবিদরা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেছেন :

"স্বদেশি আন্দোলনের সূচনায় অসংখ্য মুসলমান নাগরিক আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। মহিলারা পর্দা ছেড়ে এই প্রথম বেরিয়ে এলেন মিছিলে যোগ দিতে, কিংবা পিকেটিং-এ অংশ গ্রহণ করতে। মুসলমান সমাজ এই আন্দোলনে কতটা সক্রিয় ছিলেন তার অন্য পরিচয় আরো অনেক পাওয়া যায়। বয়কটের চিন্তা যাদের মাথায় প্রথম আসে পাটনার লিয়াকৎ হোসেন তাদের অন্যতম। ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে ধর্মঘটের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। বরিশালের যে বৃহৎ সম্মেলন পুলিশ নির্মমভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিয়েছিল তার সভাপতি ছিলেন আবদুল রসুল। জমিদার এবং আইনজীবী হিসেবে খ্যাত আবদুল হালিম গজনভি স্বদেশি শিল্পের উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন; ব্রিটেনে তৈরি চামড়ার জিনিস বয়কট করার আন্দোলন তিনিই পরিচালনা করেন। বাংলার বাইরে বিপ্লবী রাজনীতি ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগে অরবিন্দের সঙ্গে মিলিত হন আবুল কালাম আজাদ। হিন্দু ধর্মের ঐতিহ্য নিয়ে কিছু কিছু চরমপন্থীর এত যুক্তিহীন গোঁড়ামি ছিল যে মুসলমানদের তারা দূরে সরিয়ে রাখেন। তবু সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কণ্ঠে বারবারই ধ্বনিত হল হিন্দুমুলসমানের ঐক্যের কথা।'*

কিন্তু সেই ঐক্য সম্ভব হয়নি। এর পিছনে কেবল ইংরেজদের উস্কানিই নয়, মুসলিম নেতাদের (যাদের বেশির ভাগ জমিদার ও অভিজাত শ্রেণির মানুষ) একাংশের ভূমিকা ছিল এই ঐক্যস্থাপনের পরিপন্থী। সরকার স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তাদের কৌশলে ব্যবহার করেছিল। শুধু মাত্র হিন্দুমুসলমানে বিভেদকে প্রশস্ত করাই নয়, হিন্দুর উঁচুজাত ও নিচুজাতে সংঘাত সৃষ্টির মূলে ছিল তারা। বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে তাঁদের আলোচনায় ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারের বেশ কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে আছে :

১. শিল্প ও বাণিজ্যক্ষেত্রে মুসলমানরা ছিল অনেক অনগ্রসর।

২. মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবোধ থেকে অনেক দূরেই থেকে যান।

---

*স্বাধীনতাসংগ্রাম—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে। পৃ. ১১৯

৩. মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তুলনামূলকভাবে, তা হিন্দু, পার্শী এবং খ্রিস্টানদের তুলনায় অনেক কম।

৪. বাণিজ্য ও শিল্পোন্নয়নে মুসলমানদের ভূমিকা ছিল অনুল্লেখ্য।

৫. প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান ভূস্বামীদের মুসলমান জনসাধারণের ওপর ছিল অপ্রতিহত প্রভাব—যা তাদের পশ্চাদ্‌মুখীন করে রেখেছিল।

৬. শিক্ষা ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা সরকারি চাকরি ক্ষেত্রে, তাদের অনেক পিছনে ফেলে রেখেছিল। ব্যতিক্রম ছিল একমাত্র বোম্বাই। সেখানকার মুসলমানরা প্রথম থেকেই শিক্ষা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল। এর ছাপ বেশ কিছুটা ছিল উত্তরপ্রদেশ, পঞ্জাব এবং বাংলায়।

৭. উগ্রপন্থীদের ভাবনা ও রাজনীতিতে হিন্দুত্ব প্রাধান্য পেয়েছিল। আর চতুর ইংরেজ সেই বিষয়টিকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষিত মুসলমানদের স্বাধীনতা সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছিল।

৮. ১৯০৬ সালে মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার পর "মুসলমানদের মধ্যে এক শ্রেণির লোকের স্বার্থপরতা এবং মুসলমান জমিদার এবং উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণির কায়েমী স্বার্থ"—হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মাঝখানের বিভেদের পাঁচিলটাকে ক্রমশ দৃঢ় করে তুলেছিল। যার ফলে মুসলিম লিগ বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবে সমর্থন জানায়। এই নেতাদের বেশির ভাগই ছিলেন বাংলার বাইরে থেকে আসা মানুষ। এখানে বড় বড় জমিদার হয়ে বসেছিল। ইংরেজ সরকারের আনুগত্য প্রকাশ ছিল তাদের উদ্দেশ্য। প্রজাদের মঙ্গল, স্বদেশের মঙ্গল তাদের কাম্য ছিল না।

"আধুনিক মনোভাবাপন্ন, শিক্ষিত অনেক মুসলিম তরুণ কিন্তু মুসলিম লিগের ফাঁকি ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। মুসলিম লিগকে তারা সকল শ্রেণির মুসলমানের মত ও স্বার্থের প্রতিনিধি বলে স্বীকারও করলেন না। মুসলমানদের স্বার্থ যে অন্যান্য ভারতীয়দের স্বার্থের থেকে আলাদা, মুসলিম লিগের এ দাবি সমর্থন করার মত কোন যুক্তিও তারা খুঁজে পাননি। বরং উদারনৈতিক জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দিকেই তাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। মৌলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, মজহর-উল-হক প্রমুখ নেতারা এই সময়ে যে আহরার আন্দোলন শুরু করলেন তাকে চরমপন্থী জাতীয় আন্দোলন বলে গণ্য করা যায়। ঐতিহ্যাশ্রয়ী অনেক মুসলমান পণ্ডিতের মধ্যেও এ সময়ে স্বদেশপ্রেম বিকাশলাভ করছিল, সাম্প্রদায়িক চিন্তায় আচ্ছন্ন না হয়ে এরাও বেছে নিয়েছিলেন জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পথ। এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন মৌলানা আবুল কালাম আজাদ।"*

"......... ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ। আসামসহ পূর্ব বাংলায় এক মুসলিম গরিষ্ঠ প্রদেশ তৈরি করে কার্জনের আমলারা একই সঙ্গে চরমপন্থা ও বাংলাভাষী ঐক্য ভেঙে দিতে চেয়েছিল। কার্জন তা কার্যে পরিণত করতে সহায়তা চাইলেন ঢাকার/বগুড়ার নবাবদের মত অভিজাত ও কিছু ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত মুসলমানের কাছে। বেশ কিছুকাল ধরে তার জমি তৈরি হচ্ছিল। মুসলিম আশ্রফরা নিজেদের আরব পারস্য দেশাগত মনে করে, বাংলা ভাষার সঙ্গে প্রচুর আরবী-ফারসি শব্দ মিলিয়ে, স্বর্ণোজ্জ্বল মুসলিম গৌরব গাথা বা কাহিনি লিখে, ইসলামী ধর্মানুষ্ঠানকে অত্যধিক গুরুত্ব দিয়ে, এমনকি আলাদা পোশাক-আসাক পরে, নিজেদের অনগ্রসরতার মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতিপূরণ চাইছিল। এখন সেন্সাসের উসকানিতে আতরফ মুসলমানরাও নিজেদের সেখ, সৈয়দ বলতে লাগল। শুধু তাই নয়, তারা সচেতন হলো, পূর্ববঙ্গে মুসলিম সংখ্যা গরিষ্ঠতা ও যুক্তবঙ্গে ধীর কিন্তু সুনিশ্চত গরিষ্ঠতা লাভের ব্যাপারে। ১৮৮১-র আদমসুমারিতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল—১:৭২ কোটি, মুসলমানের ১.৭৮ কোটি। দশ বছর পরে দাঁড়াল যথাক্রমে ১:৮০ কোটি ও ১:৯৫ কোটিতে। আরও দশ বছর পরে (১৯০১ সালে) ২ কোটি ও ২ : ১৯ কোটিতে। সংখ্যা বাড়ছে

*স্বাধীনতাসংগ্রামে—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী এবং বরুণ দে। পৃ. ১৪৪

অথচ হিন্দু জমিদার জোতদারদের হাতে মুসলিম প্রজার রেহাই নেই, ঈশ্বরবৃত্তির মত কর দিতে হয়। হিন্দু মহাজনদের হাতে তুলে দিতে হয় অসম্ভব চড়া সুদ বা অসম্ভব সস্তায় পাট। শহরে হিন্দু ব্যবসায়ীর প্রাধান্য, চাকরিতে শিক্ষিত হিন্দুর। তাদের মনে হলো নিজেদের রাজ্য পেলে অবস্থা ভাল হবে। অনেক মুসলিম বুদ্ধিজীবী আপত্তি করেছিলেন বঙ্গভঙ্গে। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান-সম্মতি।

"হিন্দুদের উত্তর হলো স্বদেশি ও বয়কট। শুধু অর্থনৈতিক কারণে নয়, এখন রাজনৈতিক কারণেও, মুসলমানরা তাতে আপত্তি জানাল। গরিব মুসলমান চাষী সস্তায় বিলেতি কাপড় কেনে, তারা দামি স্বদেশি কাপড় কিনবে কি করে? গঞ্জে হাটে যে সব মুসলমান দোকানদার বিলেতি কাপড় বা নুন বেচে তারাই বা মাল পোড়াতে চাইবে কেন? অথচ চাপ এলো প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে। পরোক্ষভাবে হিন্দু জমিদার ও তাদের নায়েব আমলার কাছ থেকে। জোর করে মাল পোড়ানো বা নষ্ট করা হলো। ফলে বাড়ল সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ। .....রিজলে হিন্দু জমিদারদের বয়কট চাপানোর চেষ্টাকে ১৯০৬ - ৭ সালের দাঙ্গার কারণ বলেছেন। নাথান বলেছেন, হিন্দু আমলা, দোকানদার,মহাজনও তাদের লক্ষ্য ছিল। মুসলিমদের পক্ষ থেকে 'নবাব সাহেবের সুবিচার' ও 'লাল ইশ্‌তেহার' জাতীয় প্রচার পুস্তিকা ও মৌলভী মোল্লাদের উত্তেজক বক্তৃতা কম দায়ী নয়। অন্যদিকে 'সন্ধ্যা', 'বঙ্গবাসী'-র মত হিন্দু কাগজ ফলাও করে বাসন্তী মূর্তি ভাঙা বা গৌরীপুর কাছারি লুটের যে খবর দেয়, তাও যথেষ্ট উত্তেজনা সৃষ্টি করে। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় অরবিন্দ'র লেখাগুলি পড়লে গা গরম হয়ে ওঠা অসম্ভব নয়।

"স্বদেশি আন্দোলনের সময়কার মুসলিম কৃষকদের অর্থনৈতিক অবস্থা—অর্থাৎ তাদের হিন্দু জমিদার-মহাজন-ব্যবসায়ী বিরোধী অসন্তোষের কথা বিবেচনা করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না কেন পাট চাষে ধনী মুসলিম জোতদারদের নেতৃত্বে সাধারণ মুসলিম চাষী ওপরতলার নবাব সাহেবদের সাম্প্রদায়িকতার শিকার হয়েছিল। ১৯০৬ সালে ঈশ্বরগঞ্জ পুরসভা নির্বাচন জেতবার জন্য কাজে লাগান হয়েছিল মৌলবি সামিরুদ্দিকে। ১৯০৬ সালের শেষে ঢাকায় মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠা উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলিমদের আইনসভায় অধিক আসন লাভ করার অন্যতম মাধ্যম ছিল। ইংরেজরা মর্লে মিন্টো সংস্কার মারফত মুসলমানদের স্বতন্ত্র ভোটাধিকার ও সংরক্ষিত আসন দিয়ে তা আরও উস্‌কে দিল।...

"ফলশ্রুতি — হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অবিশ্বাস এবং চরমপন্থীদের প্রাধান্য। 'বন্দেমাতরম' ও 'যুগান্তর'-এর মতে মুসলিম দাঙ্গাবাজরা ছিল ভাড়াটে গুণ্ডা। এর পেছনে দরিদ্র মুসলিম চাষীর হতাশা ও ক্ষোভ থাকতে পারে এবং তার সমাধান জরুরী এমন কথা হিন্দু ভদ্রলোক বিপ্লবীদের মনে হয়নি। মুসলমান চাষীরাও বোরুনি নবাব থেকে জোতদাররা ও তাদের টাকায় মোল্লারা কি সর্বনেশে খেলায় মেতেছে। একদিন উভয় সম্প্রদায় সে খেলায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়বে যে বাংলাকে দ্বিতীয়বার ভাঙা ছাড়া গতি থাকবে না।*

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়ের আলোচনা থেকে উদ্ধৃত করা যেতে পারে। দীর্ঘ আলোচনার শেষে তাঁদের কয়েকটি মন্তব্য :

১. "......... পূর্ববঙ্গ ও আসাম সরকারের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রকাশ্যভাবে হিন্দু-বিদ্বেষী কারণ শিক্ষা-দীক্ষায় ও রাজনৈতিক চেতনায় হিন্দুগণই সে সময় ছিল মুসলমানগণ অপেক্ষা অনেক বেশি অগ্রসরশীল এবং সেই হিন্দুরাই ছিল উক্ত আন্দোলনের প্রাণস্বরূপ। তাই সেদিনকার ইংরেজ সরকারকে ইংরেজ-বিরোধী জাতীয় আন্দোলনকে ধ্বংস করবার উদ্দেশ্যে নানা উপায় সন্ধান করতে হয়েছিল। হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের দাঁড় করাতে হবে বলেই ইংরেজ সরকার সেদিন

সাম্প্রদায়িক সমস্যা : শিকড়ের সন্ধানে—অমলেশ ত্রিপাঠী। গণশক্তি। শারদ সংকলন ১৯৯২

এমন নগ্নভাবে মুসলিম তোষণ নীতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।" (পৃ. ২১৯)*

২. "............ নবাব সালিমুল্লার হিন্দু-বিরোধী কর্মনীতি, মুসলিম জনগণের অজ্ঞানতা অনগ্রসরতা ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে সাম্প্রদায়িক কূটনীতির আশ্রয় গ্রহণ, সৈয়দ আহমদ্ প্রবর্তিত আলিগড় রাজনীতির বিবর্তন ও মুসলিম লিগের প্রতিষ্ঠা এই সমস্ত বিচিত্র ঘটনা স্মরণ রাখলে বয়কট ও স্বদেশিকে পূর্ববঙ্গে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার মূল বা প্রধান কারণ বলে চিহ্নিত করা চলে না। অশিক্ষিত মুসলিম জনগণের রাজনৈতিক চেতনার অভাবে তাদের ধর্মান্ধতা ও দারিদ্র্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন একদিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শাসকবৃন্দ ও অন্যদিকে কতিপয় স্বার্থান্বেষী মুসলিম নেতা। সেই সঙ্গে বাংলার নবজাগরণে হিন্দু প্রাধান্য এবং মুসলমানদের উন্নয়নের প্রতি শিক্ষিত হিন্দুসমাজের আন্তরিক দরদশীলতার অভাব হিন্দু-মুসলমান বিভেদের জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী—একথা বললে বোধ হয় ভুল হবে না।"* (পৃ. ২৩৫)

৩. "...........বিংশ শতকের সূচনায় বাংলাদেশ ও ভারতের নানা প্রান্তে যে জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন আবির্ভূত হয়, তা হিন্দুদের চোখে ছিল প্রগতির বাহন, জাতীয় আত্মবিকাশের অত্যাবশ্যক সোপান। কিন্তু মুসলমান জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ কিছু স্বতন্ত্র। মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকে তখনও বিশ্বাস করতেন যে, ভারতীয় মুসলমানদের অগ্রগতির স্বার্থেই ভারতে ইংরেজ শাসন শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, অতি প্রয়োজনীয়। একদল ইংরেজ শাসনের অবসান চাইলেন জাতীয় অগ্রগতির প্রাথমিক সোপান হিসাবে, অন্যদল ইংরেজ শাসন অক্ষুণ্ণ রাখাকেই জ্ঞান করলেন প্রগতির পথে অত্যাবশ্যক উপাদান বলে।......" * পৃ. ২৩৬।

৪. "............ বিলাতি পণ্যবর্জনের তাগিদ যে পরিমাণে এলো নেতাদের কাছ থেকে, সে পরিমাণ কিন্তু স্বদেশি সামগ্রী দারিদ্র-প্রপীড়িত জনগণের সামনে দেখা দিল না। তাই যতই দিন অতিবাহিত হতে থাকে, "বয়কট" আন্দোলন (অর্থনৈতিক অর্থে) হতে জনগণ ততই দূরে সরে যেতে থাকে। দারিদ্র্যের বেদনা যেখানে যত বেশি প্রবল ছিল, সেখানে তত বেশি কংগ্রেস আন্দোলনের প্রতি জনগণের বিরূপতাও দেখা দিতে লাগল। পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের তুলনায় মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা ছিল অনেক বেশি দুর্দশাগ্রস্ত। স্বল্প মূল্যের বিলাতি দ্রব্যের প্রতি তাদের আকর্ষণ স্বাভাবিক নিয়মেই ছিল বেশি। ১৯০৬ সালের পর বিলাতি পণ্য বয়কটের সঙ্কল্প হিন্দু নেতারা যতই উৎসাহ নিয়ে প্রচার করতে লাগলেন, ততই মুসলিম জনগণ ঐ আন্দোলনকে তাদের স্বার্থবিরোধী বলে মনে করতে থাকে। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে হিন্দু পরিচালিত সমগ্র জাতীয় আন্দোলনই তাদের দৃষ্টিতে অস্বাভাবিক উদ্দেশ্যমূলক ও স্বীয় স্বার্থের প্রতিকূল বলে প্রতীয়মান হয়।..." পৃ. ২৩৭

[1] স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ—হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়।

মৌলবি একিনউদ্দীন আহ্‌মদ

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

বড়লাট লর্ড কার্জন দ্বিতীয়বার ভারতবর্ষে আগমন করিয়া বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে বদ্ধ-পরিকর হইয়াছেন। এতদিন ধরিয়া বঙ্গবাসী বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, আসামের চিফ্ কমিশনারের স্থানে লেফটেন্যান্ট গভর্নর বসিবেন; আসামের সঙ্গে চট্টগ্রাম, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসিয়া জুটিবে ; এবং কলিকাতার জায়গায় শিলং রাজধানী হইবে। তখন মহামান্য হাইকোর্টের অস্তিত্ব সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ আসিয়া এতদ্দেশবাসীর হৃদয় আন্দোলিত করিয়াছিল। তাহার ফলে প্রতিবাদের তরঙ্গ বাংলার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত খরবেগে প্রবাহিত হইয়াছিল। বড়লাট স্বচক্ষে আন্দোলনের তরঙ্গ-খেলা, ঢাকা ও ময়মনসিংহে দেখিয়াছিলেন। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রামবাসীরা 'আসামী' হইতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন, দেখিয়া লাট সাহেব তাহার নবগঠিত বঙ্গদেশের নাম 'পূর্ব বাংলা ও আসাম' রাখিয়াছেন।

আমরা সন্তানদিগকে যেমন অনেক সময় স্তোকবাক্য দিয়া ভুলাইতে চেষ্টা করি, বড়লাট বাহাদুরও তেমন তাঁহার নূতন বাংলার 'আসাম' নামের পরিবর্তে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' নামকরণ করিয়া আমাদিগকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। 'আসাম' নামের মোহিনীশক্তি তিনি ভুলিতে পারেন নাই। আসামে সাহেবরা চা উৎপাদন করিতেছেন, অসংখ্য কুলি দাসখত লিখিয়া দিয়া সাহেবদের চা-র চাষ করিতেছে; আসামের বনজঙ্গল চা-বাগানে ভরিয়া গিয়াছে ; বড় বড় চা-কর সাহেবরা আসামকে বাংলাদেশের সমকক্ষ একটি নূতন প্রদেশ রূপে দেখিতে চাহিয়াছিলেন ; সেই জন্যই নতুন প্রদেশের নাম 'আসাম' নামের যোগ অব্যাহত রহিয়াছে। কিন্তু আসামের পূর্বে 'পূর্ব বাংলা' যোগ হওয়ায় সাহেবেরা বোধ হয় ততটা সুখী হন নাই ; এবং নূতন প্রদেশের নূতন ছোটলাটের রাজধানী শিলং ছাড়িয়া ঢাকায় পরিবর্তিত হওয়াতে যে তাহাদের সম্পূর্ণ মনস্তুষ্টি হয় নাই; তাহাও স্থির নিশ্চিত। নূতন প্রদেশের 'পূর্ব বাংলা' নাম হইয়াও সমস্ত উত্তর বাংলাও তৎসঙ্গে সংযোজিত হইয়াছে; সুতরাং লর্ড কার্জনের নূতন প্রদেশের এরূপ নামকরণ কি সাহেব, কি বাঙালি কাহারই প্রীতিকর হয় নাই, এবং নূতন প্রদেশের যে ব্যবস্থা তিনি প্রচার করিয়াছেন, তাহাও কাহারও মনোমত হয় নাই।

পাঠকগণ বোধ হয় সেই গল্পটি জ্ঞাত আছেন যে, একজন একটি গর্দভ বাজারে বিক্রয় করিতে লইয়া যাইতেছিল। সঙ্গে তাহার ছোট পুত্রও যাইতেছিল। পিতা-পুত্রে হাঁটিয়া চলিয়াছে—গাধাটি টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। একজন বলিল, 'তুমি বড় নির্বোধ, গাধার উপর চড়িয়া গেলেই ত হয়। নিজের গাধা থাকিতে হাঁটিতেছ কেন?' কথাটি মনোমত হইল বলিয়া সে গাধায় চড়িল। ছোট পুত্র হাঁটিয়া চলিয়াছে। আর একজনের সঙ্গে দেখা হইলে সে বলিল, 'তুমি কি নিষ্ঠুর, নিজে গাধায় চড়িয়া যাইতেছ। আর তোমার ছোট পুত্রটি হাঁটিয়া চলিয়াছে!' তখন সে পুত্রটিকে গাধার উপর চড়াইয়া লইল। পিতা পুত্রে গাধার উপর চড়াতে একজন বলিল, 'একটি গাধা কি এত ভার বহন করিতে পারে? তোমাদের বরং গাধাটিকে বহন করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত।' গাধার মুনিব তখন উহাকে বাঁধিয়া কাঁধে বহন করিয়া নিতে লাগিল। সম্মুখে একটি খালে সাঁকো পার হইতে হইল।

যেমন তাহারা সাঁকোর মাঝখানে গিয়াছে, অমনি গাধাটি এমন জোরে গা ঝাড়া দিল যে, তাহাতে তাহার বন্ধন-রজ্জুটি ছিঁড়িয়া গিয়া গাধাটি জলে পড়িয়া গেল, এবং তাহাতেই তাহার মৃত্যু হইল। অবোধ রাসভ-স্বামী তখন দীর্ঘনিশ্বাস সহকারে বলিল—'আমি সকলকেই সন্তুষ্ট করিতে যাইয়া কাহাকেও ত সন্তুষ্ট করিতে পারিলাম না ; অধিকন্তু আমার গাধাটিকেই জলে ডুবাইয়া দিতে হইল!' আমাদের বড়লাট বাহাদুরও তেমন সকলকেই পরিতুষ্ট করিতে গিয়া সকলেরই বিরাগভাজন হইয়া পড়িয়াছেন, মাঝ থেকে গর্দভের ন্যায় হায়! দুর্ভাগ্য বাংলাটাকেই ডুবিতে হইল।

তাঁহার নূতন প্রদেশ ভৌগোলিক বৈষম্য, অধিবাসীগণের বৈষম্য ইত্যাদি বহু বৈষম্যের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে আমরা এই বৈষম্যের বিষময় ফল ভোগ করিব বলিয়াই আমরা বিচলিত হইয়াছি। আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, নূতন প্রদেশের আসামই শীর্ষস্থানীয় হইবে। পূর্ব বাংলাতে রাজধানী থাকিবে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে সে রাজধানী শিলংয়ের শৈলাবাসে স্থানান্তরিত হইবে। বড়লাট বাহাদুরের গেজেটের উক্তি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, চা এবং পাটের দিকে গবর্নমেন্টের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। একদিন নীলের চাষের প্রতিপত্তি ছিল ; কিন্তু য়ুরোপের বিজ্ঞান য়ুরোপবাসিগণকে আর এদেশের নীলের জন্য লালায়িত করিয়া রাখে নাই। চা এবং পাট য়ুরোপে উৎপন্ন হয় না। এই দুইটি জিনিষের জন্য ইউরোপভূমি লালায়িত। ইংলণ্ডবাসিগণ চা এবং পাটের বিশেষ ব্যবস্থা করিবার জন্যই নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতেছেন। বিলাতের রাজনৈতিকগণ ইহাতে লাটসাহেব বাহাদুরের জ্ঞানের প্রশংসা করিবেন,লর্ড কার্জন আশা করিয়াছেন। আবার নূতন প্রদেশের মুসলমান অধিবাসী সংখ্যায় বেশি হইয়াছে। সুতরাং মুসলমান অধিবাসীগণও এই নূতন প্রদেশের সৃষ্টিতে সন্তুষ্ট ও সুখী হইবেন, লাট বাহাদুরের এরূপ আশা। মুসলমানকে গবর্নমেন্ট এতদিন Self-help-এর আদেশ উপদেশ শুনাইয়াই ক্ষান্ত ছিলেন ; মুসলমানদের উন্নতির জন্য মধ্যে মধ্যে ছোটখাট সার্কুলার জারি করিয়াই মুসলমানকে বলিতেন, 'তোমাদের জন্য গবর্নমেন্ট যথেষ্ট করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন ; কিন্তু Self-help চাই।' আজি মুসলমান যদিই-বা একটু আধটু Self-help-এর উপর নির্ভর করিয়া এক পা আধ পা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে, এমন সময়েই মুসলমানের জন্য লাট বাহাদুর একটি নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিয়াছেন ; এই কথায় মুসলমান কি সন্তুষ্ট হইবেন? নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হউক আর নাই হউক, মুসলমানের সংখ্যা বাড়িবেও না, কমিবেও না। সমস্ত বঙ্গদেশের মুসলমানগণ দুই এক বৎসর হইতে একমত হইতে আরম্ভ করিয়াছেন। রাজনৈতিক পথে কি প্রকারে অগ্রসর হইবেন, তাহার ইতি কর্তব্যতা অল্পদিন হইল নির্ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছিলেন। এখন আবার গবর্নমেন্টের নূতন ব্যবস্থা হইল। নূতন প্রদেশে নূতন ব্যবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া মুসলমানকে অগ্রসর হইতে হইবে; এতদিনের সমবেত চেষ্টা এক মুহূর্তে চুরমার হইল।

লাট সাহেব ইঙ্গিত ইশারায় বলিয়াছেন যে, নূতন বাংলা প্রদেশের মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা বেশি হইবে ; তাহাতে কিন্তু মুসলমানগণ সন্তুষ্ট নহে। মুসলমানগণ একমত হইয়া লাট বাহাদুরের এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে। দেশের শিক্ষার ভার ইণ্ডিয়া গবর্নমেন্ট নিজ হাতে লইয়াছেন। যে উদারনীতি লর্ড মেকলে, মেটকাফ ও ক্যানিং প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন, তাহার সুফল আমরা চারিদিকের উন্নতিতেই দেখিতে পাইতেছি। লাট সাহেবের নূতন ব্যবস্থা সে উদার উন্নতি-বিধায়িনী শিক্ষার মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে। আজি কালিকার স্কুল কলেজের কঠোর ব্যবস্থা দেখিতে পাইয়া আমাদের মনে স্বতঃই এই সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে যে, গবর্নমেন্টের এতদ্দেশবাসী মুসলমান ও হিন্দুগণের উচ্চশিক্ষার উন্নতির দিকে দৃষ্টি নাই ; বরং উত্তরোত্তর কঠিন নিয়মাদির প্রণয়ন করিয়া যাহাতে দেশীয় লোকের শিক্ষার ব্যাঘাত হয়, তাহারই চেষ্টা করিতেছেন। মুসলমানগণ গরিব। এই সমস্ত ব্যয়সাধ্য কঠিন ব্যবস্থার প্রবর্তন করিয়া মুসলমানেরই উন্নতির মূলে গবর্নমেন্ট কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন। সুতরাং নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিয়া নূতন প্রদেশে মুসলমান সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া

লইয়া যদি গবর্নমেন্ট নূতন ব্যয়সাধ্য শিক্ষা পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তাহা হইলে মুসলমানের আনন্দিত হইবার কোন কারণই থাকিতে পারে না। বরং কলিকাতা বিভাগের শিক্ষিত (Public opinion) সাধারণ মতের জগৎ উদ্ভাসী বিদ্যুৎ-প্রভা হইতে নিভৃত অন্ধকারেই গবর্নমেন্ট হিন্দু মুসলমানের শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থা করিবেন, এ চিন্তাই সর্বসাধারণের আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। আমরা লর্ড কার্জন বাহাদুরের অমিত তেজের পক্ষপাতী ; কিন্তু সেই তেজ, সেই পরিশ্রম ও অধ্যবসায় দেশের মঙ্গলের কারণে প্রয়োগ হইলেই আমাদের পরম সুখের কারণ হইত।

অতঃপর মহামান্য হাইকোর্টের ক্ষমতা অপ্রতিহত রাখিবেন না, এই আশঙ্কাও আমাদের সকলের মনেই উদিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে গবর্নমেন্ট লিখিয়াছেন যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা for the present পূর্বের মতই থাকিবে। তবেই ত কথাতেই for the future অর্থাৎ অতঃপর অন্য রূপ ব্যবস্থা হইবে, এরূপ আভাষ পাওয়া যাইতেছে। এবারকার Gazette Extraordinary-তে গবর্নমেন্ট প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা will be retained অর্থাৎ রাখা যাইবে। গবর্নমেন্ট অনুগ্রহ করিয়া এক্ষণে রাখিলেন ; পরে সে অনুগ্রহ রাখিবেন কিনা, গবর্নমেন্টই জানেন!

ব্রিটিশ রাজত্ব যে এতদ্দেশবাসীগণের হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তাহার প্রধান কারণ ব্রিটিশ রাজত্বের সুশাসন। বহুযুগের ন্যায়পরায়ণ অপক্ষপাত বিচার দ্বারা হাইকোর্ট বাংলার সর্বসাধারণের গভীর ভক্তির পাত্র হইয়াছেন। ইংরেজ রাজ কর্তৃক বিশেষ আইন প্রণয়ন দ্বারা মহামান্য হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। গবর্নমেন্টের খাতির না করিয়া অপক্ষপাতিত্বের সহিত হাইকোর্ট আইনের ব্যবস্থামত কার্য করিবেন, তজ্জন্য হাইকোর্ট ইংরেজ-রাজ কর্তৃক আদিষ্ট। যে জাতির ধর্মাধিকরণে রাজপুত্র অন্যায় করিতে গিয়া তাহারই বেতনভোগী বিচারক কর্তৃক তিনি রুদ্ধ হইতে আদিষ্ট হইয়াছিলেন, সেই জাতির রাজাই হাইকোর্টের প্রতিষ্ঠা করিয়া হাইকোর্টকে সেই প্রকার ন্যায়বিচার পরিচালনা করিতে আদেশ করিয়াছেন। সেই জন্যই হাইকোর্টের উপর এতদ্দেশবাসীগণের এরূপ অসাধারণ ভক্তি! এই হাইকোর্টের ক্ষমতা, খর্ব করিয়া, হাইকোর্টের ন্যায়বিচারে ব্যাঘাত জন্মাইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপর এতদিন সাধারণের যে অসাধারণ ভক্তি ছিল, গবর্নমেন্ট তাহা লোপ করিবার উপক্রম করিয়াছেন। বহুদিন ধরিয়া গবর্নমেন্টের শাসন ও বিচার বিভাগের একত্র সমাবেশ আছে বলিয়া অনেক সময় বিচার-বিভ্রাট ঘটিয়াছে। গবর্নমেন্ট আপনার অধীন কর্মচারিগণের কার্য ন্যায়সঙ্গত হইয়াছে, মনে করিয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিতে ত্রুটি করেন নাই ; সে সময় হাইকোর্টের ন্যায়বিচারেই সুবিচার পাইয়া ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের শাসনাধীনে ন্যায়বিচার পাওয়া যায়, জনসাধারণের হৃদয়ে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়াছিল। গবর্নমেন্ট এখন এই ধারণা বিনষ্ট করিবার চেষ্টা করিয়া জনসাধারণের বিরাগভাজন হইতেছেন কিনা, তাহাই বিবেচনা করা উচিত। মুসলমানের সাধারণ মত প্রকাশ আমরা করিতেছি কিনা বলিতে পারি না। আমাদিগের মধ্যে যাহারা সমাজের নেতা, তাঁহারা সকলে বেশির ভাগ নিজ স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত। গবর্নমেন্টের হস্তে তাঁহাদের স্বার্থ বেশি পরিমাণে সাহায্য পাইবে ভরসায় আমাদের নেতৃগণ নিস্তব্ধ ; কিন্তু সেজন্য যে তাঁহারা গবর্নমেন্টের অন্যায় কার্যের প্রশংসা করিবেন তাহা কোনক্রমেই বিবেচিত হইতে পারে না।

রাজসাহী ডিভিসন এবং মালদহ জেলাকে পূর্ববঙ্গ ও আসামের সহিত সংযুক্ত করাতে উপরোক্ত প্রদেশের অধিবাসীগণের যে বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে, আমরা এখানে তাহা দেখাইতে চেষ্টা করিব। রাজসাহী ও মালদহ জেলার অধিবাসীদিগের কলিকাতায় যাওয়ার কত সুযোগ ও সুবিধা ; তাহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। তথা হইতে দার্জিলিং শৈলও অতি সন্নিকট এবং তথায় কার্যবশতঃ গমন করিলে আমোদ উপভোগও সঙ্গে সঙ্গে ঘটিয়া উঠে ; কিন্তু ঢাকা ও শিলংয়ের কথা ভাবিতে গেলে আমাদের গায়ে জ্বর আইসে। দার্জিলিং আরোহণ যেমন বিশুদ্ধ আনন্দের বিষয়, শিলং ভ্রমণ তেমনি কষ্টের কারণ। ব্যয়ের তুলনায়ও শিলং যাওয়া কিছু আয়াসসাধ্য। গবর্নমেন্ট কেবল নিজের সুবিধার উপর নির্ভর করিয়াই কখনও নূতন প্রদেশের সৃষ্টি করিতে যাইতেছে না, বোধ হয়।

অধিবাসীগণের সুবিধা অসুবিধার দিকেও দৃষ্টি অবশ্যই রাখিবেন।

আমরা বড়লাট বাহাদুরের এক বিষয়ের প্রশংসা করিতেছি, তিনি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে যে অতিরিক্ত গেজেট বাহির করিয়াছেন, তাহাতে তাহার এই অভিনব কার্যের কারণ প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, বহু চিন্তার ফলস্বরূপ তিনি এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রথমে একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের দ্বারা সমস্ত বঙ্গদেশের শাসন সংরক্ষণ কার্য সুচারুরূপে চলিতেছিল না বলিয়া এই ব্যবস্থা হইয়াছে। আমরা বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করি, কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাইবার সময় পথের ধারে ও এপাশে ওপাশে যে সমস্ত জেলা পড়িয়াছে, সে সমস্ত জেলারই পরিদর্শন কার্য তাহার দ্বারা সহজে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত ; তাহা না করিয়া ঢাকা হইতে লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নরকে আসিয়া সে সমস্ত জেলা পরিদর্শন করিতে হইলে কতদূর আয়াসের প্রয়োজন, তাহা লাটসাহেব বাহাদুরকে আমাদের বুঝাইতে হইবে কি? বড়লাট বাহাদুর যে কারণেই হউক, যখন দার্জিলিংকে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে রাখিয়াছেন, তখন কলিকাতা হইতে দার্জিলিং যাইবার পথে যে সমস্ত জেলা পড়িয়াছে, সে সমস্তও কলিকাতা বিভাগের লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নরের হস্তে ন্যস্ত করিলে শাসন-সৌকর্যের কারণ দেখিতে পাইয়া আমরা মুক্তকণ্ঠে তাহার প্রশংসা করিতাম। উত্তর বাংলাকে পূর্ববাংলার সঙ্গে একত্র করাতে ভৌগোলিক বৈষম্যও সংসাধিত হইয়াছে। এইজন্য নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করিবার যে সমস্ত কারণ বড়লাট বাহাদুর প্রদর্শন করিয়াছেন, রাজসাহী বিভাগ এবং কোচবিহার ও মালদহ সম্বন্ধে সে সমস্ত কারণ আমাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত বোধ হয় না; পরন্তু অন্যায় ও বহু অসুবিধার সৃষ্টিকারী বলিয়াই বিবেচিত হইতেছে।

মুসলমানগণ এখন যে প্রদেশেরই অধিবাসী হউক, প্রদেশের অধিবাসী সংখ্যা বেশিই হউক আর কমই হউক, যে পর্যন্ত তাহারা উপযুক্তরূপে শিক্ষিত না হয়, যে পর্যন্ত অজ্ঞানান্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানের উজ্জ্বলরশ্মি তাহাদিগকে আলোকিত না করিবে, সে পর্যন্ত মুসলমানের কোন প্রকারের উন্নতিই হইবে না। সেই জন্যই আমরা বলিতেছি যে, মুসলমানগণের শিক্ষার উন্নতি যে স্থানে হইবে, সেই স্থানেই তাহাদের গমন করা উচিত। বহুকাল ধরিয়া গবর্নমেন্টের অসীম চেষ্টায় কলিকতা মহানগরী শিক্ষার প্রধান স্থান হইয়াছে। মুসলমানগণ এখন কলিকাতায় যাইয়া বিদ্যালাভ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ঢাকা রাজধানী হইলে, কলিকাতা মহানগরীতে সমবেত চেষ্টায় বিদ্যালাভের যে সমস্ত পীঠস্থান সংস্থাপিত হইয়াছে, সে সমস্ত নূতন করিয়া ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। তাহা বহু ব্যয়সাধ্য। গবর্নমেন্ট যে সে ব্যয়-ভার বহন করিতে স্বীকার করিবেন তাহা আমাদের ভরসা হয় না। কলিকাতায় গবর্নমেন্টের মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুল স্থাপিত হইয়াছে এবং প্রতি বৎসর তাহারা উন্নত শিক্ষা প্রদান করিতেছে, কলিকাতায় আর্ট স্কুল, শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, নানা প্রাইভেট স্কুল ও কলেজ এবং মিশনারী স্কুল ও কলেজ সংস্থাপিত আছে। সেই সকল বিদ্যালয়ে অসংখ্য ছাত্র শিক্ষালাভ করিতেছে। কলিকাতার বিজ্ঞান অ্যাসোসিয়েশন এতদ্দেশবাসিগণের বিজ্ঞানের উন্নতির সোপান হইয়া আছে। কলিকাতায় বহুজ্ঞানী লোকের সমাগম হওয়ায় সর্ববিষয়ে উন্নতি করিবার একটি উপায় হইয়াছে। দেশের যে সামান্য উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের সমবেত চেষ্টা। **গবর্নমেন্ট নূতন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন।** অধুনা কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে যে সমস্ত কঠোর আইনের প্রবর্তন হইয়াছে, শিক্ষা সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট যে সমস্ত কঠোর নিয়ম প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে এতদ্দেশবাসী মুসলমানগণের শিক্ষা লাভ করা অতীব কঠিন হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। পক্ষান্তরে গবর্নমেন্ট স্কুল কলেজ ভিন্ন প্রাইভেট স্কুল কলেজে যে শিক্ষালাভ এবং শিক্ষাদান বড় সহজ ব্যাপার হইবে, তাহাও মনে করা উচিত নহে। এ সময় যদি ঢাকায় নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট স্কুল কলেজ ভিন্ন অন্য যে ২/১টি স্কুল কলেজ ঢাকায় আছে, তাহাদের গবর্নমেন্টের ব্যবস্থার বিরুদ্ধে দ্বিরুক্তি

করিবার শক্তি থাকিবে না। সুতরাং যে কঠিন হইতে কঠিনতর নিয়ম গবর্নমেন্ট প্রবর্তিত করিয়াছেন, তাহার বিস্ময়কর ফল ফলিবার বেশি দিনের অপেক্ষা করিতে হইবে না। মুসলমানগণ নূতন প্রদেশে সংখ্যায় বেশি হইলে কি উপকার হইবে? যদি তাহাদের অত্যাবশ্যক শিক্ষার পথই বন্ধ হয়, যদি তাহাদের উন্নতির আশাই তিরোহিত হয়, তাহা হইলে (hewers of wood and drawers of water) কাঠ ও জলবাহকরূপী লোকের সংখ্যা বেশি করিয়া গবর্নমেন্ট মুসলমানগণের কি উপকার ও উন্নতি করিবেন? মুসলমানগণের উন্নতি সাধনই যদি গবর্নমেন্টের একতম লক্ষ্য হয়, তবে পূর্বের ন্যায় শিক্ষা-দীক্ষার বিষয়ে তাহাদের পথ সরল করিয়া দেওয়া হউক না ; রাজসরকারে প্রবেশের পথে যে সমস্ত কন্টক বড়লাট বাহাদুর ইদানীং রোপন করিয়াছেন, তাহার অপসারণ করা হউক না! বড়লাট বাহাদুর কূটনীতি বলে কেবল কথায়ই চিড়া ভিজাইতে চাহিতেছেন। **মুসলমান সাধারণ এবং বড়লোকগণের বড়লাট বাহাদুরের এই স্তোক বাক্যে ভুলিয়া যাওয়া একান্তই অনুচিত।**

কলিকাতায় ব্যবসায়-বাণিজ্যের যে উন্নতি আমরা দেখিতেছি, তাহা বহু বর্ষের সমবেত চেষ্টাতেই হইয়াছে। অবশ্য ইহা মুক্ত-কণ্ঠে স্বীকার করি যে, ইংরেজ ব্যবসায়িগণের সমবেত চেষ্টায় এবং ইংরেজ গবর্নমেন্টের অসীম যত্নেই কলিকাতা মহানগরীর বাণিজ্য এতদূর শ্রীবৃদ্ধি সম্পন্ন হইয়াছে। ইংরেজ রাজপুরুষগণের শিক্ষায় না হইলে, ভারতবর্ষে যে একপ্রাণতা আজি আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার জন্মই হইত না। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশস্থ বিভিন্ন জাতির স্বার্থ ভিন্ন ভিন্ন পথে পরিচালিত হইত। ভারতবর্ষ বহু বৈষম্যের আধার ছিল। ইংরেজ-রাজ ভারতবর্ষের শাসনদণ্ড গ্রহণ করিয়া দেশে শান্তিস্থাপন করিয়াছেন। রেল, টেলিগ্রাম ও পোস্টঅফিস ভারতবর্ষের সুদূরবর্তী প্রদেশগুলিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তদুপরি ইংরাজি ভাষা ভারতবর্ষবাসির হৃদয়ে একতার বীজ বপন করিয়াছে। যাহার শান্তিচ্ছায়ায় আমরা এতদিন এত সুখশান্তি সম্ভোগ করিয়া আসিতেছে, দুর্ভাগ্যবশতঃ আজি কালি সেই গবর্নমেন্টেরই অনেক কার্যে কেবল এতদ্দেশ-বাসিগণের অনিষ্টের সূচনাই দেখিতে পাইতেছি। গবর্নমেন্টে বিদেশীয়। গবর্নমেন্ট নিঃস্বার্থপরতায় প্রণোদিত হইয়াই যে ভারতবর্ষের শাসনকার্য হস্তে লন নাই; ইহা আমরা জানি। নিজের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কার্য করিতে তাহাদের আমরা দোষ দিতে পারি না। এতদিন যে শান্তি, ন্যায়বিচার ও সমদর্শিতা ইংরেজ গবর্নমেন্ট ভারতবাসিগণকে দিয়াছেন, সে জন্য আমরা গবর্নমেন্টের নিকট কৃতজ্ঞই আছি।

আমরা কলিকাতার বাণিজ্য সম্বন্ধে বলিতেছিলাম। এই বাণিজ্য যে প্রকার শ্রীবৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার সুবিধা কলিকাতার নিকটস্থ সমস্ত প্রদেশে আমরা সম্ভোগ করিতেছি। কলিকাতা সমুদয় বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ; সুতরাং সেই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নিকটস্থ প্রদেশগুলিরও বাণিজ্য উন্নতি প্রাপ্ত হইয়াছে। নূতন প্রদেশের সৃষ্টি হইলে কলিকাতার বাণিজ্য বহু পরিমাণে অবনত হইবে। কলিকাতার সঙ্গে উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের পশ্চিমভাগের রেলওয়ের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। ঢাকার সঙ্গে সে প্রকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হওয়া অতীব সুকঠিন ; সুতরাং তদ্দেশবাসী জনগণের কলিকাতার অবনত বাণিজ্যেই পরিতৃপ্ত হইতে হইবে। **আমরা ইংরেজ সওদাগরগণের চেম্বার্স অব কমার্সের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রতিবাদ দেখিয়াছি।** তাহারা কলিকাতা হাইকোর্টের ক্ষমতা পূর্বমত স্থায়ীরূপে অপ্রতিহত রাখিবার জন্য গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন করিয়াছেন। এ পর্যন্ত গবর্নমেন্ট তাহার উত্তর দেন নাই। চট্টগ্রামের বন্দর প্রতিষ্ঠা করিতে এখনও বহু আয়াসের দরকার। সেজন্য কলিকাতার ইংরেজ সওদাগরগণের ব্যবসায় বাণিজ্যের ক্ষতির সময় এ পর্যন্ত আইসে নাই। আমরা নিশ্চিত বলিতে পারি যে, সাহেব সওদাগরগণ তাহাদের বাণিজ্য অবনত হইতেছে, দেখিবা মাত্রই তীব্র প্রতিবাদ করিবেন। এই প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে জানিতে পারিলাম,—চেম্বার্স অব্ কমার্সের হাইকোর্ট সম্বন্ধে চিঠির উত্তরে লর্ড কার্জন বলিয়াছেন যে, হাইকোর্টের ক্ষমতা

চিরকালের জন্য অপ্রতিহত থাকিবে, তাহা গবর্নমেন্ট এখন প্রকাশ করিয়া আবদ্ধ হইতে পারেন না। ইহাতে গবর্নমেন্টের মুখোস খসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং এখন সাহেব সওদাগরেরা নূতন প্রদেশের সৃষ্টি সম্পর্কে গুরুতর আপত্তিই উত্থাপন করিবেন, আশা করা যায়। হাইকোর্ট চিরকাল এখনকার মত ক্ষমতাসম্পন্ন না থাকিলে এতদ্দেশবাসিগণ অপেক্ষা ইংরেজ অধিবাসিগণেরই বেশি আশঙ্কা ও আপত্তির কারণ হইবে। এতদ্দেশবাসিগণ বহুদিন হইতে স্বাধীনতা হারাইয়াছে। তাহারা পুলিস ও আপিস আদালতের অত্যাচার সহ্য করিতে অভ্যস্ত্। কিন্তু ইংরেজ অধিবাসিগণ ইউরোপের স্বাধীন আবহাওয়ায় পরিবর্ধিত ; তাহারা হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব হইতে দেখিলেই তাহাদিগের স্বাধীনতা বিলোপের চেষ্টা হইতেছে, ইহাই আলোচনা করিবেন। এবং তাহারা নিশ্চয়ই বহুযুগ ধরিয়া প্রাপ্ত স্বাধীনতা হারাইয়া লর্ড কার্জন বাহাদুর দত্ত স্বাধীনতার মুখাপেক্ষী হইতে কখনই চাহিবেন না, ইহা নিশ্চয়।

উপরের লিখিত বিষয়গুলির আলোচনা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, লর্ড কার্জন বাহাদুরের নূতন প্রদেশ সৃষ্টি করিবার প্রস্তাব এতদ্দেশবাসী কি ইংরেজ, কি দেশীয় কাহারই অভিমতি লাভে সক্ষম হয় নাই। এতদিন আমরা সকলে সুখশান্তিতে জীবনযাপন করিতেছিলাম, লর্ড কার্জন বাহাদুর বিনা কারণে হঠাৎ এই সৃষ্টিছাড়া প্রস্তাবের প্রবর্তন করিয়া দেশের শান্তি অপহরণ করিয়াছেন। তাহাতে দেশে মহা গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে ও দেশের লোকের হৃদয়ে মহাআতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। এখনও ব্রিটেনবাসিগণের ন্যায়পরতা ও সত্যজ্ঞানের উপর এতদ্দেশবাসিগণের আশা ভরসা অটুট রহিয়াছে। সেজন্য সেক্রেটারি অব্ স্টেটের নিকট পূর্ববঙ্গের অধিবাসিগণ বহু নাম সম্বলিত এক দরখাস্ত পাঠাইয়া অপেক্ষা করিয়া আছে। আমাদের মুসলমান দলপতিগণের সাধারণ মত কি, তাহা এখনও আমরা জানিতে পারি নাই। দেশের মুসলমানগণ অধিকাংশ স্থানেই নূতন প্রদেশ-সৃষ্টির প্রতিবাদ করিয়াছেন। সেজন্য মুসলমান সাধারণের মত যে নূতন প্রদেশ সৃষ্টির বিপক্ষে তাহা নিশ্চিত। আমাদের বোধ হইতেছে ; বাংলা দেশকে বিভক্ত না করিয়া আসাম ও অন্যান্য প্রদেশ একত্র করিয়া বাংলায় লেফ্‌টেন্যান্ট গবর্নর না রাখিয়া মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত গবর্নর করিবার প্রস্তাব করিলেই এতদ্দেশবাসী সকলে তাহা সাদরে গ্রহণ করিতেন।

নবনূর ১৩১২, আশ্বিন

আব্‌দুল হামিদ খান ইউসুফজী

হিন্দুর উপস্থিত বিপদে মোসলমানের সহানুভূতি

আজ আমাদের কি অশুভ দিন, কি দুঃসময়ই না উপস্থিত! আজ সাত শত বৎসর ধরিয়া নানা প্রকার অবস্থার মধ্যে, একই দেশে, একই আবহাওয়ার উপভোগের আস্বাদনে এবং একই সুনীল আকাশের চন্দ্রাতপতলে, হিন্দু-মোসলমান আমরা একত্র এক সঙ্গে, বসবাস করিয়া আসিতেছিলাম। এই সাত শত বৎসরের সম্মিলন প্রভাবে, প্রকৃতিগত সখ্য ও সাম্যবন্ধনের যে যে স্থায়ী কারণ তাঁহাও ক্রমে যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল। পূর্বে এ দেশের রাজপাট নামেমাত্র মোসলমানদিগের হস্তগত ছিল। কিন্তু রাজত্ব রক্ষার যে সকল কার্য, তাঁহার অধিকাংশই হিন্দুদিগের আয়ত্তাধীন ছিল। তৎপর প্রায় দেড়শত বৎসর যাবৎ ইংরেজ রাজের রাজত্ব হইয়াছে, ইহার মধ্যে হিন্দু মোসলমান আমরা একই অবস্থাপন্ন হইয়া একই দাসত্ব শৃঙ্খলে, সুখে দুঃখে জড়ীভূত ভাবে কোন মতে জীবন কাটাইয়া আসিতেছি। এখন দেশের মধ্যে দশ জনের নিকট এবং রাজদরবারের মধ্যে রাজপুরুষদিগের নিকট, শুধু হিন্দুর সুখ-সুবিধা অথবা কেবলই মোসলমানের সুখ সুবিধা বলিয়া পৃথক একটা কিছু জিনিস নাই, পৃথক কোন বিধিব্যবস্থাও নাই। নৈসর্গিক কোন ঘটনাতেও তেমন কোন পৃথক পৃথক সুখ-সুবিধা কাহাকেও বিতরণ করিতেছে না। যেমন, রাজবিধির একই বিধানে হিন্দু-মোসলমান একই প্রকার শাসনদণ্ড প্রাপ্ত হইতেছে, প্রকৃতিগত ঝড়, বৃষ্টি, রৌদ্র, হিম আদিও তেমনি বিধাতা হিন্দু-মোসলমানকে সমানভাবে বিতরণ করিতেছেন। বিধাতা হিন্দুকে অপবিত্র কাফের ভাবিয়া তাঁহাদের বাড়ি রৌদ্রের প্রখর তাপ এবং মোসলমানকে প্রিয়পাত্র জানিয়া তাঁহাদের উপর অমৃত বর্ষণ করিতেছেন না। সুদীর্ঘকালের সম্মিলনবশতঃ হিন্দু মোসলমানের মধ্যে অধুনা একটা স্থায়ী আত্মীয়তার ভাব পরস্পরের প্রাণে প্রাণে এমনি করিয়া জড়িত হইতেছিল যে, সে ভাব অতি মধুর অতীব আনন্দপ্রদ! সেই আনন্দপ্রদ প্রীতি বন্ধনের দরুণ হিন্দুকে মোসলমান এবং মোসলমানকে হিন্দু সাহায্য করিয়া আসিতেছিল। মোসলমানের মান ইজ্জত হিন্দু রক্ষা করিয়া আসিতেছে আর হিন্দুরও ইজ্জত মোসলমানগণ রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সুমধুর অমৃতযোগের মধ্যে দেশের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সূচনা দেখিয়া আমরা অতীব পুলকিত হইয়াছিলাম; আমাদের আজীবন কঠোর চেষ্টা, উদ্যম এবং কঠোর সাধনা সিদ্ধ হইতেছে মনে করিয়া জীবনকে সার্থক ভাবিতেছিলাম। কিন্তু হায়! হঠাৎ কতিপয় উদ্দীপ্ত লোকের কুকাণ্ডময় ঘটনায় আমাদের হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আমাদের দোদুল্যমান আশালতিকার মাথায় ঘোরতর বজ্রাঘাত হইয়াছে। কুক্ষণে কুমিল্লার কুকাণ্ড সংঘটন বার্তা আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়াছে; কুক্ষণে মগড়া এবং বিক্রমপুর প্রভৃতির কুসংবাদ আমাদের নিকট ঘোষিত হইয়াছে; প্রাণের বিষম মর্ম-বেদনার মধ্যে আবার জামালপুরের ভীষণ দুর্ঘটনার কথায় আমাদিগকে একেবারে গভীর বিষাদে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে!! এই কথা লিখিতে লিখিতে সিরাজগঞ্জের ভাবী অমঙ্গল ভাবিয়া প্রাণ মন আকুল হইয়া উঠিয়াছে!! হায়! কি ভাবিলাম, আর কি হইল! কি দশা হইতে চলিল! কোন্ যাদুমন্ত্রবলে অসম্মিলনের বিষম বিষ সমস্ত বঙ্গ ও ভারত জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়িল? কোন্ চক্রীর চক্রান্ত প্রভাবে হঠাৎ এই ভীষণ কালানল আজ এমনি করিয়া দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল!! হে ঈশ্বর! তুমি জান, তুমিই অবগত আছ, এই অবস্থার মধ্যে ভারতের ভাবী দশার কি হইবে?

পুর্বে পুঁথিপুস্তকে পাঠ করিতাম যে, মোসলমানগণ হিন্দুদিগের আরাধ্য দেবতার প্রতিমা আদি বিধ্বংস করিয়াছে, হিন্দুগণের কুলমহিলাদিগের মান ইজ্জতের প্রতি মোসলমানগণ অযথা আক্রমণ করিয়া বিশ্ব কলঙ্কিত করিয়াছে; একথা অনেক স্থলেই বিশ্বাস করিতাম না; অনেক স্থলেই বলিতাম যে, মোসলমানের শত্রুপক্ষীয়গণ উহার মিছামিছি একটা রটনা করিয়াছে। কিন্তু এইক্ষণ এই সভ্যতা-ভব্যতার দিব্য আলোকপ্রভা এবং উদার সাম্যবাদ মতাবলম্বী ন্যায়পরায়ণ ব্রিটিশ গবর্নমেন্টর উন্নত সুশাসনের ঢক্কানিনাদের মধ্যে যাহা কখনও কল্পনা জল্পনাতেও উদয় হয় নাই, সেইরূপ অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতরে আজ মোসলমান কর্তৃক হিন্দু পরিবারের লাঞ্ছনা এবং হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা নাশের প্রত্যক্ষ ঘটনা, জানিয়া শুনিয়া আমরা আজ কিংকর্তব্যবিমূঢ় এবং স্তম্ভিত হইয়া পড়িয়াছি; আমাদের চিত্ত মন কম্পিত হইতেছে; ভাল লোকের নিকট আমাদের আর উত্তর দান সরিতেছে না!! আমরা ভাবিয়া ঠিক পাইতেছি না যে, এ আবার কোন্ সুলতান মাহমুদ গজ্‌নভী, বা কোন্ মহাম্মদ ঘোরি, অথবা কোন্ এক ইসা খাঁ কালাপাহাড়ের আমল উপস্থিত হইল। আর কোন্ বা পীর পয়গাম্বর জাহেদিনের আবির্ভাবে জেহাদের এমন ভয়ঙ্কর উগ্রভাব আবার ধরাতলে দেখা দিতে চলিল!!

মানুষ ধর্ম লইয়া আছে, মানুষ ধর্মকে বড় ভালবাসে ; প্রাণ যায় যাউক কিন্তু ধর্মের অবমাননা এবং পরিবারের লাঞ্ছনা কোন জীবন্ত মনুষ্য সহ্য করিতে পারে না। জামালপুর এবং কুমিল্লার ঘটনায় হিন্দু ভ্রাতাগণের অন্তর আত্মায় কি যে বিষম ভীষণ আঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের মর্মে মর্মে কি যে এক নিদারুণ শক্তিশেল বিদ্ধ হইয়াছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন তাহা আর অন্য কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। সাধ্য নাই যে, আজ ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে পারে। ব্যাঘ্রে সংহার করিলে, কিম্বা কালসর্পে দংশন করিলে কোনই ক্ষোভ জন্মিত না; কিন্তু যে নিদারুণ বিষে তাহাদের মর্মস্থল আজি জর্জরিত করিতেছে, তাহার বুঝি ঔষধ নাই, বুঝিবা তাহার আর শান্তি নাই! একটি পুরুষে নয়, দুইটি পুরুষে নয়, যুগের পর যুগ চলিয়া যাইবে কিন্তু এই কালান্তর বিষ অতি তীব্রতর হইয়া উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস, তরঙ্গের পর তবঙ্গ, গঙ্গা যমুনার ন্যায় ভয়ঙ্কর বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিবে, আর দরিদ্র দুর্দ্দশাগ্রস্ত অতি বিপন্ন হিন্দু মোসলমান জাতিদ্বয়কে ঘোর রসাতলে বুঝি বা নিমজ্জিত করিবে! বিগত বৎসর এমনি দিনে, এমনি সময়ে, ঘোরতর দুর্ভিক্ষের দুরাবস্থার মধ্যে যে হিন্দুগণ ক্ষুধাতুর মোসলমানগণকে অন্ন বস্ত্র বিতরণ করিয়া উপকার করিয়াছিল, যে হিন্দুগণ মোসলমানগণের শেষ সমরে ইংরাজের গুলিতে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াও মোসলমানের স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত অনন্ত শয্যায় শয়ন করিয়াছিল, সেই হিন্দুগণের প্রতি, সেই মোসলমান জাতি, এবার হঠাৎ যে দুর্ব্যবহার করিয়া উঠিয়াছে, তাহা অকথ্য ও অসহনীয়! পৃথিবীতে এমন কোন হৃদয়হীন লোক নাই; যে ব্যক্তি এই সকল কুকার্যের সমর্থন করিতে পারে। এমন কোন শিক্ষিত ভদ্র মোসলমান এস্‌লাম-সমাজে নাই যে, এমন সকল কুকাণ্ডের প্রতি সহানুভূতি দেখাইতে পারে। এই সকল অতীবগর্হিত কার্যের পিছনে কোন ভাল মোসলমানের বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি নাই এবং থাকিতেও পারে না। এই সমস্ত কার্যের দরুণ আমরা অতীব মর্মপীড়া ভোগ করিতেছি; সমগ্র হিন্দু জাতির নিকট আমরা অত্যন্ত লজ্জিত ও অতিশয় ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছি। এস্‌লাম শাস্ত্রের এমন কোন বিধান নাই যে, অনর্থক কাহারও মনে অযথা পীড়া দেওয়া হয় এবং নিরর্থক একটা মারামারি ঘটায়। হিন্দু কিম্বা অন্য ধর্মাবলম্বীদিগের সঙ্গে এদেশে এখন আর ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ করা যাইতে পারে না। কোরাণ হাদিস মতে এদেশের হিন্দুদিগকেও আর কাফের বলা যাইতে পারে না। যেহেতু তাহারা নামাজ রোজা করিতে হজ্জ করিতে ও জায়গত দিতে মোসলমানদিগের প্রতিবন্ধক জন্মায় না, মোসলমানদিগের ধর্মকর্ম করিতেও বাধা দেয় না। কোরবাণী করিতেও হিন্দুদিগের কোন আপত্তি নাই। ছাগ, দুম্বা, উট দ্বারা কোরবাণী করিতে যথা তথা তাহাদের নিকট অবারিত দ্বার। কেবল হিন্দু পল্লী ও হিন্দু দেবমন্দিরের সন্নিকটে হিন্দুদিগের দৃষ্টিগোচরে গোহত্যা করিতে তাহাদের মাত্র আপত্তি ঘটে। প্রকৃত

প্রস্তাবে কোরবাণী করাও মোসলমানদিগের অবশ্য কর্তব্য অর্থাৎ ফরজ কর্ম নহে। কোরবাণী না করিলে মোসলমানী নষ্ট হয় না। আর কোরবাণী করিবার জন্য আরব দেশে—এমন কি পবিত্র মক্কা মদিনার মধ্যেও নির্দিষ্ট স্থান রহিয়াছে। নির্দিষ্ট স্থান ভিন্ন যথাতথা কোরবাণী দেওয়া যাইতে পারে না। হিন্দু ভ্রাতৃগণ একথা যেন মনে করেন না যে, মোসলমানদিগের ধর্মগ্রন্থ সকলের ভাব অতি সঙ্কীর্ণ এবং অনুদার ও উদ্দীপ্ত বিদ্বেষময়। প্রকৃত প্রস্তাবে এসলামধর্মের মত এবং ভাব অতীব উদার ও অতীব অমায়িক সুতরাং আমরা সুশিক্ষিত হিন্দু ভ্রাতাগণকে আমাদের ধর্মগ্রন্থের উদারতার দিকে আকর্ষণ করিয়া বিবেচনা করিতে অনুরোধ করিতেছি। তাই আজ আমরা অতিশয় মর্মবেদনার সহিত সমগ্র ভারতের হিন্দুগণের সমীপে আমাদের অন্তরের বিঘোর সমবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতেছি; নিবেদন করিতেছি যে, তাহারা আমাদের কতিপয় অজ্ঞান-উদ্দীপ্ত লোকের দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমাদের সমগ্র মোসলমান জাতিকে দেশের এই দুঃসময়ের মধ্যে অবিশ্বাস করিবেন না, এই দুঃসময়ের মধ্যে মোসলমানদিগকে খল বিবেচনা করিয়া তাহাদিগ হইতে সরিয়া দাঁড়াইবেন না। অবশ্যই বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেই একথা উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, এই সকল কার্য কখনই একমাত্র কাণ্ডজ্ঞানহীন মোসলমানগণ দ্বারা সংঘটিত হইতেছে না, মোসলমানগণ দ্বারাও এই সকল ভেদবুদ্ধি ঘটিতে পারে না। ভেদবুদ্ধি পরায়ণ রাজপুরুষগণ চিরকাল কৌশল খাটাইয়া এ দেশকে নীতিবলে শাসন করিয়া আসিতেছেন, সেই নীতিবলেই আজ "বিলাতিপণ্য বাণিজ্যরক্ষা" ও "স্বদেশি" দলন এবং "পার্টিসন" সুদৃঢ় করণ উদ্দেশ্যে মেড়ায় পাঁঠায় লাগাইয়া দিয়া একগুলিতে তিন শিকার করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাই বলি হে ভেদনীতিপরায়ণ রাজনীতিকগণ! আপনারা দুর্বল অক্ষম চব্বিশ কোটি হিন্দুকে লাঠি ধরিতে যে শিক্ষা দিতেছেন, তাহা এই স্বদেশিভাবের উচ্ছ্বাসের মধ্যে অতি উত্তম কার্যই হইয়াছে। এতদিন পরে অতি উত্তম ও প্রকৃত পথ আবিষ্কার ও পরিষ্কার হইয়া উঠিতেছে। তেত্রিশ কোটি ভারতবাসী সামরিক জাতিতে পরিণত হইবেক, আর অন্ততঃ পক্ষে দশ কোটি ভারত রমণী উগ্র চামুণ্ডার বেশে রণরঙ্গে নৃত্য করিতে বাধ্য হইবে, ইহা ভাবিতেও কাহার না হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়, কাহার না চিত্ত মনে আশার উচ্ছ্বাস উথলিয়া ওঠে। ফলতঃ ঈশ্বর বুঝি দুর্বল বাঙালিকে চিরকলঙ্ক হইতে বিমোচন করিবার জন্যই এই আত্মপরীক্ষায় নিক্ষেপ করিতেছেন, বিধাতার স্বর্গীয় বরেই বুঝি সকলেই ভারতময় সাড়া দিয়া দাঁড়াইতে বসিয়াছে! তাই যাহা ঘটিতেছে, বুঝি বা তাহার জন্য পরিতাপ করিবার কিছু নাই। বোধ হয় ভবিষ্যতে মঙ্গল ঘটনার নিমিত্তই মঙ্গলময় এই বিপদরাশি আনয়ন করিয়াছেন! কিন্তু তথাপি আমরা আশা করি, তথাপি আমরা অনুনয় বিনয় সহকারে আজ হিন্দু-মোসলমান উভয় সম্প্রদায়ভুক্ত নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করি, যাহাতে অতি শীঘ্র এই দাবানল প্রশমিত হয়, আসুন আমরা সকলে মিলিয়া তাহারই অনুষ্ঠান করি। নচেৎ আমাদের সাধের "স্বদেশি" অকালে মারা পড়িবে; আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে কণ্টক পড়িবে। তাই আসুন আমরা জ্ঞানীর ন্যায় কার্য করি, বাদবিসম্বাদ চাপা দিয়া যেমনতর ছিলাম তেমনটি এক হইয়া যাই।

আবদুল হামিদ্ খান্ ইউসফজী
সেক্রেটারি,............. সাধারণ সম্মিলন
টাঙ্গাইল

প্রবাসী ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ

খায়রন্নেসা

স্বদেশানুরাগ

বর্তমান সময়ে বঙ্গ-সমাজে যে সমস্ত বিষয়ের আন্দোলন-আলোচনা হইতেছে ; ইহাতে আমাদের অধঃপতিত দেশের সৌভাগ্য সূচিত হইতেছে। বঙ্গ-বিচ্ছেদ যে এই আন্দোলনের আদি কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। আজ প্রত্যেক জেলার গ্রামে-শহরে রাজা, মহারাজা, উকিল, মোক্তার ও শিক্ষিত, অশিক্ষিত সকলেই বিরাট সভার আয়োজন করিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হইতেছেন যে বিদেশি জিনিষ ব্যবহার করিব না। এই সময় তাহাদের অন্তঃপুরচারিণীগণের কি করা কর্তব্য এই প্রবন্ধে সেই সম্বন্ধে দু'একটা কথা বলিব।

ভগ্নিগণ, আমাদের পিতা, ভ্রাতা ও স্বামীগণ যে সমস্ত কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, যে সমস্ত বিষয়ে শরীর ও মন সমর্পণ করিয়াছেন এবং যে সমস্ত বিষয়ে তাহাদের সর্বক্ষণের চিন্তার বিষয় হইয়া পড়িয়াছে, সেই সমস্ত বিষয়ে আমাদের চিন্তা করিবার কি কোন অধিকার নাই? অবশ্য, ইহাতে আমাদের সমান অধিকার আছে! তাহাদের উপযুক্ত সাহায্য না করিলে, তাহাদের দুঃখ ও কষ্টে সহানুভূতি না দেখাইলে পিতৃ ও ভ্রাতৃস্নেহের অমর্যাদা করা হইবে এবং অর্ধাঙ্গিনী বা সহধর্মিণী নামে কলঙ্ক স্পর্শ করিবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এই মহা আন্দোলনের সময় আমাদের চুপ করিয়া বসিয়া থাকা উচিৎ নয়। আমাদেরও সাধ্যমত চেষ্টা করা কর্তব্য। তাই বলিয়া আমি তোমাদিগকে বিরাট সভার আয়োজন করিতে বলিতেছি না, অথবা বক্তৃতার জন্য টাউনহলে ও রাস্তাঘাটে দণ্ডায়মান হইতে বলিতেছি না। আমরা যদি ইচ্ছা করি তবে ঘরের এক পার্শ্বে বসিয়াই পুরুষজাতির যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিব। সাহায্য আর কিছু নয়, কতকগুলি বিষয়ে আমাদের ত্যাগ স্বীকারে যদি মাতৃভূমির উপকার হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি স্বদেশ ধন ও ধান্যে পরিপূর্ণ হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি ভারতে অস্তমিত শিল্পের পুনঃ আবির্ভাব হয়, তোমাদের ত্যাগে যদি ভারতের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীদেবীর আশ্রয় হয়, তবে তোমরা কেন ত্যাগ স্বীকারে বিমুখ হইবে, ও ত্যাগস্বীকারজনিত কষ্ট উপভোগে কুণ্ঠিত হইবে? আইস, আমরাও পুরুষজাতির মত দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় বদ্ধপরিকর হই। আমরাও সমাজকে দেখাই যে ভারত ললনার দ্বারা দেশের প্রভূত মঙ্গলকার্য সাধিত হইতে পারে। ভগ্নিগণ, সকলেরই স্মরণ হইতে পারে যে, ক্ষত্রিয় রমণীগণ একদিন কতদূর ত্যাগ স্বীকার করিয়া পুরুষজাতির সাহায্যার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে তাহাদের অতি আদরের বহুমূল্য রত্নবিজড়িত গাত্রালঙ্কার ও সুবর্ণ-খচিত গাত্রাচ্ছাদন বিক্রয় করিতে এবং ছিলাবন্ধন জন্য শিরোশোভন কেশচ্ছেদনে কুণ্ঠিত হয় নাই। আজ আমরা সামান্য ত্যাগ স্বীকার করিতে কেন কুণ্ঠিত হইব? আজ আমরা যদি পুরুষজাতির পার্শ্বানুচারিণী হইয়া তাহাদিগকে এই সামান্য বিষয়ে সাহায্য করিতে ও উৎসাহ দিতে বিমুখ হই তবে কি আমাদের নারী জাতির উপর বিধাতার কোন অভিসম্পাত পড়িবে না?

ভগ্নিগণ, আইস, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদেশি শাড়ি পরিত্যাগ করি; বিলাতি বডিজ, সেমিজ ও মোজা ইত্যাদি ঘৃণার চক্ষে দেখি, লেভেন্ডারের পরিবর্তে আতর ও গোলাপ ব্যবহার করিতে শিখি এবং লেডী সু পায়ে দিয়া হুচট খাওয়ার দায় হইতে নিষ্কৃতি পাই। তবেই আমরা স্বদেশের অনেক উপকার করিতে পারিব। বোম্বাই, ঢাকা, পাবনা, নদীয়া ও মুরশিদাবাদ প্রভৃতি

স্থানে নানা রকমের সুতি ও রেশমি শাড়ি এবং চিকন কাপড় প্রস্তুত হয়। এই সকল বস্ত্র যেমন চাক্‌চিক্যশালী সেইরূপ টেক্‌সই। ইহা ব্যবহারে আমাদের দেশের টাকা দেশেই থাকিয়া যাইবে, স্বদেশে শিল্পকার্যের প্রচুর উন্নতি হইবে এবং গরিব তন্তুবায় ও শ্রমজীবীরা খাটিয়া দুইটা শাকান্নের সংস্থান করিয়া লইতে পারিবে। স্বদেশের উন্নতি আমাদের নারীজাতির চেষ্টার উপর যতদূর নির্ভর করে, বোধ করি পুরুষজাতির চেষ্টা ততদূর কার্যকরী নয়। আমরা যদি বিদেশি দ্রব্যাদি ঘরে আনিতে না দিই তবে কি পুরুষেরা আনিতে পারেন? ঘরে আমাদের বেশি দখল আছে। যদি কোন পুরুষ বিদেশি দ্রব্যের পক্ষপাতীও হন, তবে আমাদের অনুনয় ও বিনয়ে কি তাহা ছাড়ান যায় না? অবশ্য যায়, যদি না পারি তবে আমরা অর্ধাঙ্গিনী কিসে?

দেশে প্রচুর কার্পাস ও রেশম উৎপন্ন হয়। আমরা তাহার আদর জানি না। বিদেশিরা তাহা অল্পমূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যায় ও ইহার পরিবর্তে বিদেশীয় কাপড় আমাদিগকে অতি দামে ক্রয় করিতে হয়। আমরা যদি দেশের কাপড় ব্যবহার করি, তবে অনেক কলকারখানা দেশেই হইতে পারে ও এই সমস্ত কার্পাস ও রেশম দেশেই ব্যবহৃত হইলে বিদেশিরা আমাদের ঘরের টাকা কোন মতেই জাহাজ ভরিয়া সাত সমুদ্র পারে লইয়া গিয়া আমাদের সর্বনাশ করিতে পারে না।

আর দেখ, এনামেলের বাসন হইয়া আমাদের কি না সর্বনাশ হইতেছে। আমরা চিরদিন কাঁসা, পিতল ও তাম্রের বাসন, ঘটি ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলাম, হঠাৎ কোথা হইতে এই সমস্ত চাকচিক্যশালী অথচ ক্ষণভঙ্গুর দ্রব্যাদি আসিয়া আমাদের ঘর বাড়ি পরিপূর্ণ হইতেছে। আমাদের দেশীয় বাসন আদি ভাঙিয়া গেলেও অর্ধমূল্যে বিক্রয় হয় ; কিন্তু ভগ্নিগণ, কোন দিন কি দেখিয়াছ যে এই এনামেল ভাঙিলে কিছু দাম হয়? কোন গৃহস্থের দশখানা কাঁসা ও পিতলের দ্রব্য থাকিলে একদিন বিপদে পড়িয়া বিক্রয় করিলে বা বন্ধক দিলেও দুই পয়সা পাওয়া যায় ; এবং ইহা একটি সম্পত্তি বলিয়া গণ্য করা যায় ; কিন্তু এনামেল সামান্য পয়সার জিনিষ বলিয়াও কেহ মনে করে না। এই সব দ্রব্য যখন আমাদের ব্যবহারের জিনিস, ব্যবহার না করিলে, পুরুষজাতি কি জোর করিয়া ব্যবহার করাইতে পারেন? এস ভগ্নিগণ, আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, এই সমস্ত এনামেল হাত দিয়া স্পর্শ করিব না। দেখি আমরা আমাদের দেশীয় কাঁসা পিতলের পুনঃ প্রচলন করিতে পারি কিনা?

ভগ্নিগণ, তোমরা কি চেয়ে দেখ না, যে আমরা একেবারে উৎসন্নে গিয়াছি। আমরা নির্বোধ না হইলে সাত সমুদ্র পার হইতে বণিকগণ আসিয়া আমাদিগকে সামান্য জার্মান সিলভারের গহনা ও বেলুয়ারি চুড়ির দ্বারা প্রতারিত করিয়া জাহাজ ভরিয়া ভারতের ধন ও ধান্য লইয়া যাইতেছে আর আমরা মনে করিতেছি যে, বহুমূল্য দ্রব্যলাভ করিলাম। এই সব কি আমাদের সর্বনাশের কারণ নয়? স্থির মনে চিন্তা করিয়া বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, বিদেশিরা আমাদের উপর প্রকারান্তরে ডাকাতি করিতেছে। এক ভারত প্রায় সমগ্র পৃথিবীর সামগ্রী দিতে পারে অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীতে যাহা পাওয়া যায় এক ভারতেই তাহা আছে। এই ভারতে বাস করিয়া আমরা দিন দিন কেন যে অধঃপাতে যাইতেছি তাহা কি তোমরা ক্ষণকালের জন্য ভাব? আমাদিগকে নির্বোধ দেখিয়া, আমেরিকা, ইংলণ্ড, স্কট্‌ল্যাণ্ড, জার্মানি, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড ও জাপান প্রভৃতি দেশের বণিকগণ অনবরত সামান্য দ্রব্যাদি দিয়া আমাদের বহু শ্রমোৎপন্ন শস্যাদি স্বদেশে লইয়া যাইতেছে, আর আমরা দুমুঠা ভাতের জন্য দ্বারে দ্বারে হা হা করিয়া বেড়াইতেছি। যতদিন আমরা এই সমস্ত বিদেশি বণিকগণের প্রতারণার হাত হইতে নিষ্কৃতি না পাইব ততদিন আমরা অধঃপাতে যাইতে থাকিব।

দেশের প্রায় অনেকেই দুধ খাইবার জন্য দুই একটি গাভি পুষিয়া থাকেন, এবং প্রায় সকল ভদ্রলোকেই প্রত্যহ দুগ্ধ খাইয়া থাকেন ; তথাপি বিদেশীয় কৌটার দুগ্ধ না হইলে চা যেন ভাল

লাগে না। কি সর্বনাশ! এই সব চিন্তা করিলে একেবারে হতাশ হইয়া পড়িতে হয়। যখন কোন দেশ একেবারে উৎসন্ন যায়, তখন তাহাদের অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয় হইয়া পড়ে। ভগ্নিগণ! চা খাও, এবং কৌটার দুগ্ধ অতি বিশুদ্ধ বলিয়া অনেক দুগ্ধপোষ্য শিশুকেও খাওয়াও। কিন্তু মনে কি কখনও ভাব যে, এই দুগ্ধ গাধার কি ঘোড়ার? সাত সমুদ্র পারে দুগ্ধ হয়, তাহাই যে আমাদের বাড়ির গাভির টাট্‌কা দুগ্ধ হইতে ভাল হইল, ইহা কেবল এই হতভাগ্য ভারতবাসীর নিকটেই; বোধ করি অন্য কোন দেশের লোকের নিকট নয়।

গুড়, চিনি, মিস্রি আমাদের দেশেই প্রচুর পরিমাণে জন্মে। ভারতবাসী, ইংরেজ আগমনের পূর্বে এই গুড় ও চিনি খাইয়াই পরিতৃপ্ত হইত। এখন আমরা দেশীয় গুড়, চিনি ও মিস্রি খাইতে ঘৃণা বোধ করি। এখন রিফাইন্ড চিনি না হইলে আমাদের চলে না। এখন আমরা দেশি গুড় ও চিনিতে ময়লা দেখিতে পাই, প্রত্যেক বৎসর এই ভারতে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকার রিফাইন্ড চিনি আমদানি হয়। ভগ্নিগণ, এই সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দেশে থাকিলে দেশের কিনা উপকার হইতে পারে? ইহা আমরা ক্ষণকালের জন্য ভাবি না। ইচ্ছা করিলে আমরা কি দেশি গুড়কে রিফাইন্ড করিয়া লইতে পারি না? নিশ্চয়ই পারিব, আইস, আমরা একবার স্বদেশি গুড় ও চিনি খাইতে আরম্ভ করিয়া দেখি।

আর একটি সর্বনাশী কার্যে আমাদের দেশের টাকা বিদেশে প্রচুর পরিমাণে চলিয়া যাইতেছে। এইটি চুরুট ও সিগারেট। আমাদের দেশেও স্কুল ও কলেজের ছেলেরা বিদেশীয় চুরুট ও সিগারেট খাইতে বড়ই লালায়িত। কেন যে লালায়িত, বুঝিয়া উঠিতে পারি না ; আমার বিবেচনায় এইটি বাবুগিরির একটি অংশ হইতে পারে। এই চুরুট ও সিগারেটে বাৎসরিক ৩০ লক্ষ টাকা বিদেশে যায়। এই ত্রিশ লক্ষ টাকা হইতে দেশে তামাকের ও তাহার আবশ্যকীয় মসলাদির চাষ আবাদ করিলে সুন্দর চলিতে পারে ; অনেক টাকাও দেশে থাকিয়া যায়। ভগ্নিগণ, আমাদের সন্তানগণ বাল্যকাল হইতে এই সকল বিদেশীয় বিষাক্ত সিগারেট খাইয়া স্বাস্থ্য নষ্ট করিতেছে, তৎপ্রতি কি আমরা কোন দিন লক্ষ্য করি? হায়! পরিতাপের বিষয় আমরা স্নেহময়ী জননী হইয়া সন্তানগণকে এই সকল বিষাক্ত সিগারেট খাইবার জন্য নিষেধ না করিয়া প্রকারান্তরে উৎসাহই দিয়া থাকি। এক্ষণে আমরা যদি চেষ্টা করি তবে কি আমাদের সন্তানগণকে এই বিষাক্ত দ্রব্যের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পারি না? আমাদের সন্তানদিগের মধ্যে সিগারেট স্পর্শ করার কঠিন নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলে তাহারা কি আমাদের আদেশ উপেক্ষা করিবে? আপনাদের মাতৃ-আজ্ঞার কি কোন মূল্য নাই?

প্রিয় ভগ্নিগণ, অদ্য এই সামান্য কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। আশা করি তোমরা প্রত্যেকেই প্রাণপণে স্বদেশের উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবে। তোমরা চির নিদ্রায় নিদ্রিত থাকিলে এই দরিদ্র ভারতের আর উপায় নাই। এখন আমাদের ঘুম ভাঙিবার সময় হইয়াছে। এখনও চাহিয়া দেখিলে আমাদের চেষ্টায় অনেক কার্য হইবে, আশা করি।

নবনূর ১৩১২ আশ্বিন

খয়েরখাহ্ মুন্‌শী

রাজনৈতিক আন্দোলন ও মুসলমান

গত আষাঢ় সংখ্যা নবনূরে *"রাজনীতিক্ষেত্রে হিন্দুমুসলমান"* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রবন্ধ সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। প্রবন্ধটির আদ্যন্ত একটা ভাব দেখা যায়। সে ভাবটা এই, হিন্দু মাত্রেই শিক্ষিত ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী, আর মুসলমানেরা সকলেই মূর্খ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের বিরোধী। লেখক এই ভ্রান্ত ধারণার উপরেই প্রবন্ধটি খাড়া করিয়াছেন।

কি হিন্দু কি মুসলমান, অধিকাংশ ভারতবাসীই নিরক্ষর এবং নিম্ন-শ্রেণিভুক্ত। নিম্নশ্রেণির তুলনায় উচ্চ শ্রেণিভুক্ত হিন্দু মুসলমানের সংখ্যা অতি নগণ্য। এই উচ্চশ্রেণিভুক্ত হিন্দুমুসলমানেরা আবার সকলেও শিক্ষিত নহেন। হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার অনুপাতে উচ্চশ্রেণির মুসলমানের সংখ্যা অল্প। ইহার কারণ নির্দেশ জন্য আমাদিগকে বহুদূর যাইতে হইবে না। মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস পাঠ করিলে জানা যায় যে, মুসলমান রাজপুরুষগণের অসাধারণ কার্য কুশলতার বিবরণে ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত রহিয়াছে। এই বিবরণ পাঠ করিতে করিতে বারম্বার মনে হয়, সেই সকল অসংখ্য বিচক্ষণ রাজকর্মচারীর বংশধরগণ আজ কোথায়? মুসলমান রাজত্ব বিলুপ্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে বহু সংখ্যক আত্মাভিমানী সম্ভ্রান্ত মুসলমান বিজাতির শাসনে বাস করা আত্মাবমাননার কারণ বলিয়া বিবেচনা করেন এবং তজ্জন্য ভারতবর্ষ পরিত্যাগপূর্বক পারস্য প্রভৃতি মুসলমান-শাসিত দেশে গমন করেন।

এজন্যই আমরা দেখিতে পাই যে, হিন্দু মুসলমানের জনসংখ্যার তুলনায় ভারতবর্ষে ভদ্র মুসলমানের সংখ্যা অল্প। একে এদেশে ভদ্র শ্রেণির মুসলমানের সংখ্যা অল্প, তাহাতে আবার তাহারা স্বভাবতই রক্ষণশীল এবং অনুকরণে অনিচ্ছুক ও অপটু, এজন্য মুসলমান সমাজ ইংরাজী শিক্ষায় হিন্দুর পশ্চাতে রহিয়াছেন। ইহার ফলে কি রাজনৈতিক আন্দোলন, কি গবর্নমেন্টের কার্যলাভ, কোন বিষয়েই মুসলমান হিন্দুর সমকক্ষ নহেন।

যে সকল সদাশয় ইংরাজ এই দেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করেন তাহারা জানিতেন যে, ইংরেজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া এদেশীয়গণ স্বায়ত্তশাসন ও উচ্চপদ লাভের অভিলাষী হইবেন; তাহারা তজ্জন্য প্রস্তুতও ছিলেন। মেকলে সাহেব লিখিয়াছেন, যেদিন এ-দেশবাসী ইংরাজী বিদ্যায় শিক্ষিত হইয়া পাশ্চাত্য শাসনপ্রণালীর জন্য দাবী করিবেন, সেইদিনই ইংরাজ শাসনের সর্বাপেক্ষা গৌরবের দিন। এই গৌরবের দিন আগত হইয়াছে, কিন্তু ইংরাজ রাজপুরুষগণ পাশ্চাত্য শাসনপ্রণালী প্রয়াসী এদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়কে সঙ্কুচিত করিয়া তুলিবার জন্য সদসদ্ জ্ঞানশূন্য হইয়াছেন। ইহার কারণ কি? এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম যুগে ইংরাজ রাজপুরুষগণের প্রাগুক্তশুভ ইচ্ছা কল্পনা মাত্র ছিল। এখন তাহা কার্যে পরিণত, অর্থাৎ এদেশবাসীর মঙ্গলার্থ ইংরাজজাতির কুক্ষিগত স্বার্থ ও ক্ষমতার কিয়দংশ পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহা বড় কঠিন ব্যাপার। মিঃ রমেশচন্দ্র দত্ত তদীয় ইংরেজ রাজত্বের ইতিহাসের একস্থানে লিখিয়াছেন, কখন কোন বিদেশি রাজা কেবলমাত্র বিজিত জাতির মঙ্গলের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দেশ শাসন করেন নাই। ইংরাজ রাজও তাহাতে অক্ষম হইয়াছেন।

ইংরাজ ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার ও সময় সময়ে রাজকীয় মন্তব্যের প্রচার করিয়া এদেশীয় শিক্ষিতগণের হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপিত করিয়াছেন, তাহা পূর্ণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে। ইহাতে চারিদিকে রাজনৈতিক আন্দোলন আরব্ধ হইয়াছে। এই রাজনৈতিক আন্দোলন কেবলমাত্র হিন্দুগণ মধ্যে সীমাবদ্ধ, ইহা বলিলে সত্যের অপলাপ করা হয়। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশ-হিতৈষণার ভাব দেশের সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে।

নবনূরের লেখক একস্থানে লিখিয়াছেন, 'হিন্দুগণ আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে ন্যাসনাল কংগ্রেসের জন্য উৎকণ্ঠিত, আর মুসলমান ইহাতে যোগ দিতে নারাজ কেন?' ইহার কোন অংশই সত্য নহে। যে সমাজে শিক্ষার প্রভাব যতদূর প্রবল, সে সমাজে রাজনৈতিক আন্দোলন ততদূর গাঢ়। প্রতি বৎসরের কংগ্রেসের ডেলিগেটের তালিকা দেখিলেই আমাদের এই নির্দেশের যথার্থতা প্রতীয়মান হইবে।

লর্ড রিপনের শাসন মাহাত্ম্যে এই দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের আকাঙ্ক্ষা প্রসারতা প্রাপ্ত হয়, রাজনৈতিক আন্দোলনও পূর্বাপেক্ষা খরবেগ ধারণ করে। এই সময় কূটনীতিবিশারদ লর্ড ডাফরিনের আগমন। তিনি আপনার উপযুক্ত লেপ্টেন্যান্ট স্যার অক্‌লাণ্ড কল্‌ভিনের সহিত মিলিত হইয়া ভেদনীতি দ্বারা রাজনৈতিক আন্দোলন দুর্বল করিয়া তুলিতে সংকল্প করেন। এই সময় হইতে মুসলমানের পিঠ চাপড়ান আরম্ভ হয়। এই পিঠ চাপড়ানর ফল একটি সার্কুলার। এ সার্কুলার আর কিছুই নহে, মুসলমানের চোখে ধূলি নিক্ষেপ মাত্র। এই সার্কুলার দ্বারা ইংরেজ গবর্নমেন্ট ঘোষণা করেন যে, হিন্দুর সমকক্ষ মুসলমান কার্যপ্রার্থী উপস্থিত হইলে মুসলমানের দাবী অগ্রগণ্য হইবে। ইংরাজ গবর্নমেন্টের অধীনে হিন্দুর কর্মক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ, ইংরাজ গবর্নমেন্ট এই সঙ্কীর্ণ কর্মক্ষেত্রের প্রলোভন প্রদর্শন করিয়াই মুসলমানকে হিন্দু হইতে বিচ্ছিন্ন রাখিতে সমর্থন হইবেন বলিয়া বিবেচনা করেন। গবর্নমেন্টের আর একটি ঘোষণা, মুসলমান সমাজে ইংরাজী শিক্ষার আলোক বিস্তার জন্য প্রচারিত হয়।

প্রলোভন প্রদর্শনের প্রথমচ্ছটায় অনেক মুসলমান মুগ্ধ হইয়াছিলেন। কিন্তু গবর্নমেন্টের মনোহর বাক্যের প্রলেপ মুসলমানের চক্ষু দীর্ঘকাল বন্ধ রাখিতে পারে নাই। ইংরাজের কর্মশালার বহু দ্বার এদেশীয়ের পক্ষে রুদ্ধ রহিয়াছে। গবর্নমেন্ট মুসলমানপ্রীতির বশে তাহার একটাও খুলিয়া দেন নাই। মুসলমান সমাজে বিচক্ষণ রাজকর্মচারীর অভাব নাই। গবর্নমেন্ট তাহাদের পদোন্নতি বিধান জন্য কিছুই করেন নাই। তারপর মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের কথা। গবর্নমেন্ট কি কয়েকটা সামান্য বৃত্তি স্থাপন করিয়াই বিপুল মুসলমান সমাজের বিদ্যোৎসাহ বর্ধন সম্পর্কীয় কর্তব্য শেষ করেন নাই? দরিদ্র মুসলমান ছাত্রের জন্যে গবর্নমেন্ট কি অবৈতনিক শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়াছেন? মুসলমান ছাত্রের অবস্থানের সুবিধার জন্য গবর্নমেন্ট রাজকোষ হইতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিয়াছেন? গবর্নমেন্টের মুসলমান প্রীতি কতদূর ফাঁকা তাহা ফিরিঙ্গিগণের অবস্থার দিকে একবার লক্ষ্য করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা। শিক্ষা বিষয়ে মুসলমানগণ ফিরিঙ্গিদের অপেক্ষা অনুন্নত নহেন বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। গবর্নমেন্ট ফিরিঙ্গিগণের জন্য কত পদ রিজার্ভ করিতেছেন ; এই সেদিনও রেভিনিউ বোর্ডের কতকগুলি পদ ফিরিঙ্গিদের জন্য একচেটিয়া করা হইয়াছে। গবর্নমেন্ট তাহাদের শিক্ষা বিধানের জন্য কত অর্থ ব্যয়, কত চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। গবর্নমেন্টের নিকট হিন্দু মুসলমান উভয়েই বিজাতি ; উভয়ের ক্ষমতা লাভই ইংরাজের সমান স্বার্থ-বিরোধী।

ইংরাজের রাজনীতি শিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রকট হইয়া পড়িয়াছে। ইংরাজ গবর্নমেন্টও বুঝিয়াছেন যে, শুধু ফাঁকা কথায় শিক্ষিত মুসলমানকে পরিতৃপ্ত রাখা সম্ভবপর নহে। ইহার ফলে ইংরাজের মুসলমান প্রীতিতে ভাটা দেখা গিয়াছে। লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে গমন করিয়া তত্রত্য মুসলমান সভার রাজকার্য প্রার্থনার উত্তরে কর্কশ ভাষা প্রয়োগ করেন।

ফলতঃ কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলের পক্ষেই রাজনৈতিক আন্দোলন সমান প্রয়োজনীয়। এ জন্যই দেখা যাইতেছে যে আজকাল হিন্দুমুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। নবনূরের লেখক লিখিয়াছেন যে, শিক্ষিত হিন্দুর সহিত অশিক্ষিত মুসলমান মিলিত হইলে অশিক্ষিত মুসলমানেরই ক্ষতি হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে শিক্ষিত হিন্দুর সঙ্গে অশিক্ষিত মুসলমানের সম্মিলন কি সম্ভবপর? শিক্ষিত মুসলমানের সম্মিলন সম্ভবপর ইহাতে কোনপক্ষেরই ক্ষতি হইবে না। লেখক লিখিয়াছেন যে, survival of the fittest নীতি অবলম্বিত হইলেই মুসলমানের দ্রুত পতন আরম্ভ হইবে। এই নির্দেশ হাস্যজনক। লেখক কি মনে করেন যে, গবর্নমেন্ট অনুপযুক্ত মুসলমানদিগকে চাকুরী দিতেছেন? আজ যদি কোন দৈববলে সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ হইয়া যায়, তথাপি অশিক্ষিত হিন্দু মুসলমানের গবর্নমেন্টের চাকুরিলাভ হইবে না। আমাদের লেখক একস্থানে ভীত চিত্তে লিখিয়াছেন, 'মুসলমান, তুমি রাজনৈতিক আন্দোলনে গবর্নমেন্টকে বিরক্ত করিয়া তুলিলে এই কৃপাটুকু, এই ন্যায়সঙ্গত কৃপাটুকুর আশা করিতে পার কি?' মুসলমানগণ একযুগ ধরিয়া গবর্নমেন্টের কৃপাভিখারী হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে বিরত ছিলেন। কিন্তু তাহাতে কি ফল লাভ হইয়াছে? মুসলমান এই দীর্ঘকাল মধ্যে কোন অধিকার কোন স্বত্বলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে? নবনূরের লেখক যদি স্থির চিত্তে আদ্যন্ত ভাবিয়া দেখেন, তবে তিনিই স্বীকার করিবেন যে, মুসলমানের পক্ষেও রাজনৈতিক আন্দোলন একান্ত প্রয়োজনীয়।

রাজনীতিক্ষেত্রেও হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন আবশ্যক। সুখের বিষয় তাহা দেখাও যাইতেছে। লেখক এরূপ ভাবও প্রকাশ করিয়াছেন, যেন হিন্দুভ্রাতৃগণ রাজনীতিক্ষেত্রে মুসলমানের সহিত সম্মিলন ঘটাইবার জন্য নানারূপ কূটনীতি ও কৌশলের অবতারণা করিতেছেন। লেখক আপন মতের পোষণ জন্য যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এখানে তার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "হিন্দুগণ নিরক্ষর মুসলমানকে ডেলিগেট নিযুক্ত করিতে পারিলে কৃতার্থ হন।" "আজ কাল দুই একজন বদরুদ্দীন তায়েবজী, বদরুদ্দীন কেন দুই একজন কবিরুদ্দীন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টরূপে অধিষ্ঠিত হইলেও কিছু আশ্চর্যান্বিত হইব না।" "হিন্দুগণ নিজেরাও যোগাড়যন্ত্র করিয়া স্থলবিশেষে অনুপযুক্ত মুসলমানকেও সভাপতি, সহকারী সভাপতি প্রভৃতি উচ্চ উচ্চ কার্যে নিযুক্ত করিয়া মুসলমান প্রীতির নিদর্শন দেখাইয়া থাকেন।" মুনশী লেহাজউদ্দীন আহ্‌মদ নিজের কথায় নিজেই ধরা পড়িয়াছেন। কংগ্রেসের ডেলিগেট রূপে নিরক্ষর ব্যক্তির নির্বাচন বিশ্বাসযোগ্য নহে। বদরুদ্দীন তায়েবজী কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টগণ মধ্যে কাহারও অপেক্ষা হীন নহেন। কোন কবিরুদ্দীনকে মুনশী সাহেব কি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট রূপে বিরাজমান দেখিয়াছেন? হিন্দুর সহায়তায় অযোগ্য মুসলমান মিউনিসিপালিটী প্রভৃতির সভাপতি বা সহকারী সভাপতি রূপে নির্বাচিত হইয়াছেন, এরূপ একটা দৃষ্টান্তও কি তিনি দেখাইতে পারিবেন? এইসকল নির্বাচন ক্ষেত্রে হিন্দু ভোট অধিক, ইহা স্বীকার্য। এরূপস্থলে মুসলমানের নিয়োগ হিন্দুর সমদর্শিতা এবং গুণগ্রাহিতারই নিদর্শন, কূটনীতি অথবা কৌশলের ফল নহে। মুনশী সাহেব প্রবন্ধের প্রথমেই লিখিয়াছেন, "আপাততঃ হিন্দুগণ ভ্রাতৃভালবাসার মধুর হাসি হাসিয়া মুসলমানকে দুই হাতে উচ্চে করিয়া ধরিলেও তাহাদের কার্য সিদ্ধির সঙ্গে সঙ্গেই সেই স্বার্থ মিশ্রিত ভালবাসার হাসিও বদনপ্রান্তে আপনা হইতে বিলীন হইবে।" হিন্দু স্বার্থ কি? এদেশীয়দের দাবী "জাতি বিশেষের অথবা সম্প্রদায়বিশেষের কথা নয়, পরন্তু ভারতের সকল জাতির সকল সম্প্রদায়ের কথা বলিয়া" প্রদর্শন। ইহা একদিন প্রদর্শন করিলেই চলিবে না। যতদিন রাজনৈতিক আন্দোলন থাকিবে, ততদিন এইরূপে ঐক্যভাব আবশ্যক। অতএব ক্ষমতা থাকিলেও হিন্দু আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যই কখন রাজনীতিক্ষেত্রের মুসলমান সহযোগীগণকে অবহেলা অথবা সভাক্ষেত্রের আসন ও পট্টাবাস বহনে নিযুক্ত করিতে সাহসী হইবেন না। মুনশী সাহেব আশঙ্কা করিয়াছেন, হিন্দুগণ কালক্রমে রাজনীতিক্ষেত্রের মুসলমান সহযোগীদিগকে সভাক্ষেত্রের আসবাব

বহনে নিযুক্ত করিবেন। এরূপ কল্পনাও কিরূপে সম্ভব হইয়াছে ৬াহা আমরা ধারণা করিতে অক্ষম।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, মুসলমানের অবনতি চরমে উ াছে। এখন আর বাক্‌বিতণ্ডার সময় নাই। প্রকৃত কার্যের সময় আসিয়াছে ; সর্ববিষয়েই উন্নতি সাধন জন্য যত্নশীল হইতে হইবে। সমাজশরীরের একাঙ্গ অপুষ্ট রাখিয়া অন্যান্য অঙ্গের পুষ্টিসাধনের আশা সুদূবপরাহত। ফলতঃ রাজনৈতিক আন্দোলনেও যোগ দিতে হইবে। রাজনীতিক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেই কর্মে জলাঞ্জলি দিতে হয় বলিয়া নবনুরের লেখক আশঙ্কা করিয়াছেন। কিন্তু আমাদেব দেশের অধিকাংশ বাজনৈতিক আন্দোলনকারী কেবল বাক্যবর নহেন, তাহারা কর্মবীর বলিয়াও পরিচিত।

নবনূর ১৩১২ ভাদ্র

মৌলবি মোহাম্মদ হেদায়েত উল্লা

স্বদেশি আন্দোলন

সাম্য ও মৈত্রীর মহামন্ত্রে উদ্বোধিত হইয়া যখন কোন জাতি উত্তরোত্তর উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে থাকে এবং পরিশেষে আপনাকে আদর্শরূপে পরিগণিত হইবার উপযুক্ত করিয়া তুলে, তখন মনে হয়, সমস্ত জগৎ সাম্য ও মৈত্রীতে আচ্ছাদিত হইয়া যাউক। কিন্তু হায়! প্রকৃতির রীতি অন্যবিধ; শুধু সরল সাম্য লইয়া নিরস্ত থাকা যেন প্রকৃতির প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। প্রকৃতির ক্রোড়শয্যায় সাম্যের পার্শ্বে বৈষম্য পরিপোষিত হইতেছে। শুধুই সাম্যের একচ্ছত্র আধিপত্য সম্ভবপর নহে। তবে বৈষম্যের উপর সাম্যের প্রাধান্য লাভই বাঞ্ছনীয়—যেখানে তাহা হয় না সেইখানে প্রকৃতিকে বিচলিত হইতে হয়।

একদিন অথবা দুইদিন নয়—পূর্ণ নয় শতাব্দী হইল মুসলমান ভারতে স্থান লাভ করিয়াছে। কোরান শরীফের বিশ্বজনীন সমদর্শিতা ও সাম্যপ্রসূ লোকশিক্ষা প্রচার করিয়া যাহারা নয় শত বৎসর এখানে কাটাইয়া দিল, অন্যূন সাত শত বৎসর যাহারা দেশের শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছে, তাহাদের সহিত দেশের প্রাণ এক হইয়া যায় নাই—ইহা স্বীকার করিতে গেলে সাহচর্য এবং সংসর্গ-বলের কার্যকারিতা একেবারে অস্বীকার করিতে হয়। বস্তুতঃ ভারতবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সংসর্গ-বলের এই সাধারণ নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা যায় না। দীর্ঘকাল ব্যাপী সম্পর্কের ফলে এই দুই জাতির আচার ব্যবহার ও ধর্মগত বৈলক্ষণ্যের মধ্য হইতে এরূপ একটি সাম্য ও সামঞ্জস্য গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, যাহা আবশ্যক মত দুইকে সর্বতোভাবে এক করিয়া ফেলিয়াছে। এই সামঞ্জস্যের নিকট হিন্দুর হিন্দুত্ব ন্যায্যরূপে কতকটা পরাজয় মানিয়াছে—মুসলমানের মুসলমানত্বও আপনাকে আবশ্যক মত অবস্থান্তরিত করিয়া লইয়াছে। হিন্দুত্বের সহিত মুসলমানত্বের এতটা ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল বলিয়া ভারতে মুসলমান শাসনের সময় হিন্দুর ন্যায্য প্রাধান্য লুপ্ত হয় নাই। বাদসাহের পরিষদে, রাজ্যশাসনের মন্ত্রণাকার্যে, দেশরক্ষা এবং রাজ্যজয়ের যুদ্ধ ব্যাপারে হিন্দুর যোগ্যতা সর্বতোভাবে সমাদৃত হইত। ভারতের যে বাদসাহ্‌গণ হিন্দু-ধর্ম বিরাগী বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন তাহারাও এই যোগ্যতার অনাদর করিয়া যান নাই।

এখানকার হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একত্রাবস্থানজনিত যে একটা সাম্য সংস্থাপিত হইয়া গেছে তাহার উচ্ছেদন বা উৎপাটন সম্ভবপর নহে। বিদেশীয় যত কিছু যেরূপ ভাবেই আমাদের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টির চেষ্টা করুক না কেন এ সাম্য এ ঐক্য এ সামঞ্জস্য যাইবার নহে। তবে, এ সাম্য যে এখন অনেকটা হীনবল হইয়া পড়িয়াছে তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার কারণ প্রীতির অভাব। এই প্রীতির পুনরুদ্ধার করিতে পারিলে আমাদের সেই মহীয়সী সাম্যশক্তি পুনর্জীবিত হইয়া উঠিবে এবং নবভাবে সঞ্জীবিত হইয়া তাহা এরূপ দুর্জয় বল লাভ করিবে যে তাহার সম্মুখে আমাদের প্রতিকূলাচারী কোন শক্তিই দাঁড়াইতে পারিবে না। এই প্রীতির অভাব আসিল কিসে, তাহা ভাবিবার বিষয়। কারণ নির্ণীত হইলে প্রতীকার সহজ হইয়া পড়ে।

ইংরাজ আমাদের উন্নয়ন কার্যে যতটা সহায়তাই করুন না কেন, তাহার ভেদনীতিই আমাদের

সর্বনাশ করিয়াছে। ইংরাজের এই ভেদনীতিই হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে ক্ষীণাদপি ক্ষীণ পার্থক্যের রেখা—তাহাকে সুবৃহৎ করিয়া তুলিয়াছে—তাই আজ হিন্দুমুসলমান হইতে বহুদূরে—তাহাদের মধ্যে যে সাম্য তাহাতে আজ প্রীতির অভাব ঘটিয়াছে। এখানে রাজ্যস্থাপন করিতে আসিয়া ইংরাজ সহজেই বুঝিয়া ছিলেন, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যে এক মহাশক্তি গঠিত হইয়াছিল তাহার অভ্যন্তরে বৈষম্য উৎপাদিত করিয়া প্রতিহত করিতে না পারিলে তাহার রাজশক্তি অপ্রতিহত রাখিতে পারিবেন না। তাই তাহাকে সুচতুর ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া ভারতের সেই জাতীয় শক্তিকে ঠেকাইতে হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, ভারতের সেই শক্তি কিরূপ সুমহান ছিল। ইংরাজ এখনও যে ভেদনীতির প্রশ্রয় দিতেছেন তাহা হইতে বুঝা যায় যে, আমাদের সেই সাম্যশক্তির বিভীষিকা তাহাকে এখনও সন্ত্রস্ত রাখিয়াছে—আমাদের সে সাম্য যায় নাই, যাইতেও পারে না—তাহা হইলে এই ভেদনীতির আবশ্যক হইত না। ইংরাজ ভারতে নানা কল্যাণের অবতারণা করিয়াছেন ইহা অস্বীকার করা অকৃতজ্ঞতা। কিন্তু আমাদিগের পরুষ গৌরব বজায় রাখিয়া তিনি যদি আমাদের জাতীয়তার মূলে কুঠারাঘাত করিতে প্রয়াস না পাইতেন, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের পূর্ণ কৃতজ্ঞতা—লাভ করিতেন। আজ ভারতে রাজা প্রজার এই মতভেদের যে আন্দোলন সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হইয়াছে তাহাতে ইংরাজের রাজকীয় গৌরব বাড়িতেছে বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরাজ ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার স্রোত বহাইয়াছেন। সেই প্রবহমান শিক্ষার স্রোত আমাদিগকে পাশ্চাত্যের দিকে টানিয়া লইয়াছে। আমরা পাশ্চাত্য শিক্ষা পাইয়াছি (!) ; এই পাশ্চাত্য শিক্ষা আদর্শরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য কিন্তু সে শিক্ষা যদি আমরা পাইয়া থাকি, তবে আমরা আমাদের মনুষ্যত্ব হারাইলাম কেন, তাহা ভাবিবার বিষয়। পাশ্চাত্য শিক্ষা যে ভাবে আমাদিগকে দেওয়া হইতেছে, তাহাতে ইহা কোন শিক্ষার্থীর উপর স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির বীজ পূর্ণরূপে উপ্ত করিতে পারে না—আমরা ঠিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পাই নাই। যে শিক্ষা উত্তরোত্তর শিক্ষার্থীকে হীনবল করিতে থাকে, যে শিক্ষা তাহাকে রাজনীতি চর্চা হইতে বিরত থাকিতে অনুশাসিত করে, তাহা কোন ক্রমেই পাশ্চাত্য শিক্ষা নহে। Political Education বা রাজনীতি-শিক্ষা পাশ্চাত্য শিক্ষার একটা অঙ্গ। কিন্তু এই শিক্ষা যথাযথ দান করিয়া আমাদিগকে Politically বড় করা ইংরাজের অভিপ্রেত নহে, তাই আমাদের শিক্ষা হইতে তিনি রাজনীতির অংশটা বাদ রাখিতে চাহেন। আমরা লেখা পড়া শিখি ইহাতে হয় ত তিনি আপত্তি করিতেন না—যদি আমরা আমাদের শিক্ষার শক্তিটুকুকে শুধু দপ্তরের হিসাব নিকাসের কার্যে ব্যয়িত করিতে পাইয়া সন্তুষ্ট হইতাম। দেশের শাসনকার্যে ন্যায্য দখল পাইবার জন্য আমাদের চেষ্টা দেখিয়া তিনি বিচলিত হইয়াছেন—আমাদের এ চেষ্টাকে চাপিয়া রাখা অভিপ্রেত ত আছেই অতঃপর আমাদের উচ্চশিক্ষার পথরোধ করিতেও তাহাকে পথ দেখিতে হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় বিধান এই পথের একটা চাল বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু এই পাশ্চাত্য শিক্ষা আমরা ছাড়িব না। যাহা লইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গঠিত তাহার মধ্যে প্রাচ্যের প্রভাব সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। তাহার, অভ্যন্তরে ভারতের প্রবীণ ভাব সমাবিষ্ট—তাহাতে আরবীয় ভাব পূর্ণাংশে বিরাজিত।* প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সংমিশ্রণে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা গঠিত। যে শিক্ষার মধ্যে এরূপ প্রকারে প্রাচ্যের প্রভাব নিহিত রহিয়াছে তাহা যথাযথ পাইলে আমরা কখনও হেয় ও অকিঞ্চিৎকরের মত উপেক্ষিত হইব না। জাপানের পথ অনুসরণ করিয়া আমরা আমাদের হীনতা দূর করিব।

* আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় আরবীয় প্রভাব সম্বন্ধে আমরা অতঃপর আলোচনা করিব, বাসনা রহিল। নঃ সঃ।

আপনার উন্নতি কল্পে জাপান পাশ্চাত্যের সহায়তা গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু সে আপনাকে ভুলে নাই। প্রতীচ্যের মধ্যে প্রাচ্যকে সম্পূর্ণরূপে অনুভব ও উপলব্ধি করিয়া, প্রতীচ্যের সাহায্যে স্বীয় প্রাচ্যকে মহত্তর করিয়া লইয়া, সে এত অল্প কালের মধ্যে আপনাকে এত উন্নত করিতে পারিয়াছে। আমরাও কণ্টক সাহায্যে আমাদের কণ্টকবিদ্ধ চরণ নিষ্কণ্টক করিব। জাপান ও আমাদিগের অবস্থায় বিভেদ আছে কিন্তু সে তারতম্য আত্মোন্নতির পথে কোন আন্তরায় সূচিত করে না। জাপানের স্বাধীনতা ছিল, আমাদের তাহা নাই। যে রাজশক্তি আমাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছে, তাহা আমাদিগের রাজনীতি অনুশীলনকে চাপিয়া রাখিতে চায়, আমাদের দেশের শাসন কার্যে আমাদের প্রাপ্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, আমাদের ভালমন্দ আমাদিগকে বিবেচনা করিতে নিষেধ করে—কিন্তু এরূপ প্রভুত্বের ভিত্তি কখনও সুদৃঢ় হইতে পারে না। তথাপি এদিকে আমাদিগকে নিরস্ত থাকিতে হইলে আমরা অন্যদিক দিয়া আপনাকে বড় করিয়া তুলিব। তখন আমাদিগের গতি অনিবার্য হইবে। যথেচ্ছাচারী যে কোন শক্তিকেই তখন আমাদিগের অনুকূলাচারী হইতে হইবে। স্রোত একবার বেগবান হইলে তাহার গতিরোধ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। একদিক দিয়া প্রতিহত হইলে অন্যদিক দিয়া সে আপনার নির্গম পথ খুঁজিয়া লয়। আমরাও অন্য পথ লইব। ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির জন্য রাজশক্তির সহিত প্রতিযোগিতা করা একেবারে অসম্ভব নহে।

আপনার মধ্যে আপনাকে হারাইয়া আমরা আত্মশক্তি সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিতেছিলাম না। আমাদের নিজস্ব যাহা কিছু আছে তাহার উপর এমন একটা বিজাতীয় আবরণ দেওয়া হইয়াছে যে তাহাকে আপনার বলিয়া চিনিতে পারিতেছিলাম না। তাই আত্মশক্তির উপর আমাদের আস্থা কমিয়াছে। কিন্তু আর এরূপ থাকিবে না। পরের হাত হইতে পরস্ব বলিয়া যাহা আমরা পাইয়াছি ও পাইতেছি তাহার কতটা অংশ আমাদের নিজস্ব তাহা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। উপরে শিক্ষার কথায় বলিয়াছি যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিয়া যাহা আমরা পাইতেছি তাহাতে ভারতীয় ও আরবীয় ভাব নিহিত রহিয়াছে। এই পাশ্চাত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আপনাকে চিনিতে পারিলে তাহারা ইহাকে এক প্রাণে আপনাদের উন্নতিকল্পে খাটাইতে পারিবে, আপনাদের কল্যাণের জন্য একই পথ অবলম্বন করিতে পারিলে তাহাদের মধ্যে প্রীতি প্রসারতা লাভ করিবে, তাহাদের সাম্যশক্তি জাগিয়া উঠিয়া তাহাদের অগ্রগতি অনিবার্য করিয়া তুলিবে।

আপনার প্রয়োজনীয় সংগ্রহের জন্য ভারতবর্ষকে ইত্যগ্রে কখনও পর দ্বারে যাইতে হয় নাই। পরন্তু আপনার অভাব মোচন করিয়া সে আপনার প্রচুর উদ্‌বৃত্ত দ্বারা পরের অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছে। আমাদের বর্তমান দশা ঠিক তাহার উল্টা—আমরা এখন সর্বতোভাবে পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িয়াছি। বিলাস সামগ্রীর কথা দূরে থাক, পরিধেয় প্রমুখ নিত্য ব্যবহার্যের জন্যও এখন আমাদিগকে পরের মুখ তাকাইয়া থাকিতে হয়। অতঃপর কোন দিন হয়ত শুনা যাইবে যে আমাদের মলিন বস্ত্রগুলি ধৌতি করিবার জন্য বিদেশীয়গণ অনুগ্রহপূর্বক আমাদের রজকত্ব গ্রহণ করিয়াছেন— আর আমরাও হয়ত আমাদের রজকগুলিকে আবহমান কাল হইতে পতিত ভূমিতে লাঙল বলদ লইয়া গলদঘর্ম হইতে বাধ্য করিয়া, আমাদের মলিন কাপড় বিদেশীয়ের শ্বেত হস্তে সাদা করিবার জন্য দিয়া দিয়াছি। যাহারা এত অনুগ্রহপূর্বক আমাদিগকে নানাদিক হইতে আপনার কবলে টানিয়া লইয়া মাথায় হস্ত বুলাইতেন তাহাদের মহিমা আমরা নিয়তই গাহিয়া আসিয়াছি; এখন আমরা যতটা কর্তব্য শৈথিল্যের প্রশ্রয় দিয়াছি তাহার জন্য লজ্জিত হইবার সময় আসিয়াছে। আমাদেরই প্রস্তুত অন্ন ও লবণ পরহস্ত দ্বারা শুধু মাখাইয়া লইয়াছি মাত্র। এই মাখানর শক্তিটুকুও যে আমাদের ছিল তাহা আমাদিগকে ভুলান হইয়াছিল। সে ভ্রম আমাদের ঘুচিয়াছে। আমরা আমাদের নষ্ট শিল্প উদ্ধার করিব। আমাদের কার্পাস, আমাদের পট্ট হইতে আমরাই আমাদের

আবশ্যক মত পরিধেয়াদি প্রস্তুত করিয়া লইব। নিত্য ব্যবহার্যের সরবরাহ ত আমরা করিবই, তাহা ছাড়া আমাদের বিলাসসম্ভারও আমরা স্বহস্তে তৈয়ার করিয়া লইতে পারিব। হিন্দুর ভারত যখন হিন্দুর ছিল—তারপর মুসলমান যখন ভারতে আসিয়া ক্রমে আপনাকে তন্মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিল তখন কি ভারতবাসী উলঙ্গ থাকিত, না অন্যান্য প্রয়োজনীয়ের অভাবে তাহাকে দুঃস্থের মত নানা অনিবার্য অসুবিধা ভোগ করিতে হইত? অধিকন্তু, ভারতে আসিয়া, ভারতবাসী হইয়া, ভারতের পণ্য হইতেই আবশ্যক মত বিলাস-সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া লইয়া মুসলমান যেরূপ বিলাসিতা করিয়া গিয়াছে আধুনিক ইউরোপের সভ্যতম কোন জাতি সেরূপ বিলাসিতার কল্পনাও করিতে পারেন কিনা সন্দেহ!

ভারতের নষ্ট মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার পথে বাঙালি অগ্রগামী হইয়াছে—তাই আজ সমস্ত ভারত বাঙালির দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া আছে। দেশহিতের এই মহা অনুষ্ঠানে বাঙালি এ পর্যন্ত যত উদ্দীপনা দেখাইয়াছে তাহাতেই অনেক সুফল ফলিয়াছে—ক্রমে সমস্ত ভারত বাঙালির পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছে, সুতরাং শুধু বাংলায় কেন আজি "সমস্ত ভারতে উত্তেজনার অভাব নাই।" বাঙালির এই উত্তেজনা যখন সমস্ত দেশকে প্রেরণা দিতে পারিয়াছে তখন প্রয়াস আশু ফলপ্রসূ হইবে না বলিয়া মনে লয় না। কর্তব্য জ্ঞানের সঙ্গে যখন পরিচালক বা পথ প্রদর্শকের দায়িত্ব আসিয়া পড়ে তখন সাধনা ও সফলতার পথ সুগম হইয়া যায়। আজ যে বাঙালি এই গুরু দায়িত্ব লইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা ক্ষণিক উত্তেজনার ফল নহে—ইহার মূলে যোগ্যতা আছে। বিদ্যা ও বুদ্ধিতে বাঙালি ত আপনাকে ভারতে সর্বাগ্রগণ্য করিয়াছে এতদ্ভিন্ন এই বিদ্যা ও বুদ্ধি নিয়মিতরূপে চালিত ও ব্যয়িত হইবার পক্ষে আবশ্যকীয় উপকরণের অভাবও বাঙালির নাই। সুতরাং শুধু উত্তেজনাই আমাদের সম্বল নহে—এবং ইহা লইয়াই আমরা থাকিব না। একটা কারখানা ঘরের কল-কব্জাগুলি স্টিমের প্রেরণায় শুধু ঘুরিতে থাকিলেই কলের নির্মাণ শক্তি সার্থকতা পাইল না। এই ঘূর্ণায়মান কল-বলের মুখে যথাযথ উপাদান রাখিয়া আবশ্যক মত দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া লইতে হয়। আমরাও শুধু উত্তেজনার বলে মাতিয়া থাকিব না—আমাদের উপকরণের অভাব নাই—সেই উপকরণগুলিকে আমাদের এই উত্তেজনার মুখে ধরিয়া আমাদের অভাব মত জিনিস প্রস্তুত করিয়া লইব। তাহাতে আমাদের অভাব ত মোচন হইবেই—অধিকন্তু এ আশাও দাম্ভিকতা নহে যে আমরা তদ্দ্বারা অপরকেও আমাদের মুখাপেক্ষী করিতে পারিব।

আমাদের যে সকল অপ্রস্তুত পণ্য (Raw goods) বিদেশীয়গণ কর্তৃক বিদেশে রূপান্তরিত হইয়া বিদেশীয় মার্কায় আমাদের নিকট বিলাতি বলিয়া বিক্রীত হইতেছে—যে সকলকে আমরা কোনও অংশেই আমাদের আপনার বলিয়া চিনিতে পারিতেছিলাম না—সেগুলিকে আমরা বিদেশীয়ের কবল হইতে রক্ষা করিব—ইহাদিগের উপর আমরাই আমাদের অভাব মিটাইয়া লইব। এখন যেমন অনেক অপ্রস্তুত পণ্যের জন্য ইউরোপকে সর্বতোভাবে আমাদের উপর নির্ভর করিতে হয়, আমরা এমন দিন আবার আনিব যে বিদেশীয়গণকে আবার আমাদের প্রস্তুত বস্তু পাইবার জন্য লালায়িত থাকিতে হইবে। এই সেদিনও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে মুর্শিদাবাদের রেশমী বস্ত্র ঢাকার মসলিন না হইলে বিলাসিতাভিমানিনী প্যারিস রমণীরও বিলাস বাসনা নিবৃত্তি পাইত না।*

আর আজ আমাদের তুলা ও পাট লইয়া ম্যাঞ্চেস্টার আমাদিগকে মজাইতেছে, আমাদের রেশম (Raw Silk) লইয়া ইটালি, চায়না ও জাপান আমাদের রেশমি বস্ত্র সরবরাহ করিতেছে,

* ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে কেবল ঢাকা হইতেই এক কোটি ৫২ লক্ষ টাকার কাপড় ফ্রান্সে রপ্তানি করা হইয়াছিল। প্রেঃ লেঃ।

কিন্তু একথা আমরা স্মরণ করিতে শিখিয়াছি। আজ আমরা ম্যাঞ্চেষ্টারের 'মিহি' ছাড়িতেছি—তাই আজ আমাদের তন্তুবায়গুলি লাঙল ছাড়িয়া "মাকু"র তল্লাস লইতেছে। লিবারপুলবাসিরা হয়ত আমাদিগকে নিমকহারাম খেতাব দিতে চাহিবেন—কিন্তু আমরা কখনও ইংরাজের নিকট অকৃতজ্ঞ হই নাই এবং হইবও না—আজ আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখিয়া হয়ত কিয়ৎ পরিমাণে তাহার বাণিজ্যে বাদ সাধিব কিন্তু তাহার ফলে যে আমরা দু'বেলা দু'মুঠা পাইবার উপায় করিতে পারিব, তাহার জন্য চিরদিনই তাহার সাধুবাদ করিতে থাকিব। বলিতে কি আজ আমরা ইংরাজ-রাজ প্রতিনিধি লাট কার্জনেরও স্তুতি গাইবার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না।

নবনূর ১৩১২ কার্তিক

১৯০৫ সালে বাংলা

১৯০৫ সালে বাংলা

সোল এজেন্ট —

আর্য্য পাবলিশিং কোং

২৬ কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্

কলিকাতা।

৩৮ নং শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ
ঘোষ প্রেস্ হইতে
শ্রীজীবনকৃষ্ণ তপস্বী কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

নিবেদন

এই পুস্তকে সংগৃহীত লাঞ্ছিতদিগের বিবরণ এবং বরিশাল বিভ্রাটের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রধানতঃ হিতবাদী, সঞ্জীবনী, চারুমিহির, বরিশাল হিতৈষী প্রভৃতি সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত হইয়াছে। এই পুস্তকে অনেক স্থলে সংবাদপত্রাদির ভাষা অবিকল পরিগ্রহণ করিয়াছি, তজ্জন্য সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট ঋণী রহিলাম। যদি এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে কাহারও দেশের জন্য কষ্ট সহিবার প্রবৃত্তি মনে বদ্ধমূল হয়, তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। উক্ত পুস্তকে ১৯০৫ সালের ইতিহাসই যথাসম্ভব দেওয়া গেল পরবর্তী সংস্করণে যদি সম্ভব হয় তবে ১৯০৫ হইতে ১৯৩১ পর্যন্ত দেওয়ার ইচ্ছা রহিল। ইতি —

প্রকাশক

উৎসর্গ

চিরনির্যাতিত — একনিষ্ঠ কর্মী

শ্রীযুক্ত আনন্দকিশোর মজুমদার

করকমলেষু।

শাস্ত্রে যে বয়সে বাণপ্রস্থের বিধান আছে, সেই বয়সে তুমি যুবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছ। তুমি অশীতিপর বৃদ্ধ, চক্ষের জ্যোতি তোমার নিষ্প্রভ, কিন্তু বিধাতা তোমার অন্তরে যে অনির্বাণ আলো জ্বালিয়া দিয়াছেন, তাহা এখনও তোমাকে পথ দেখাইয়া চলিয়াছে। আজও তুমি লৌহ-কারান্তরালে থাকিয়া মুক্তির দিব্যমন্ত্র জপিতেছ। ১৯০৫ সালে বাংলার বুকে স্বাধীনতার যে যজ্ঞ-সূচনা হয়, তুমি তাহাতেও ইন্ধন সঞ্চার করিয়াছিলে। তাই অতীত বাংলার সেই গৌরবময় ইতিহাস আজ তোমার হস্তে সমর্পণ করিয়া ধন্য বোধ করিতেছি। ইতি—

চৈত্র, ১৩৩৭ সাল, প্রকাশক

কলিকাতা

পূর্বাভাস

ইংরাজ যখন প্রথমে আমাদের এদেশে আসে, তখন নানা কারণে আমাদের জাতীয় জীবন দুর্বলতার আধার হইয়াছিল। তখন আমাদের ধর্ম একেবারেই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, একদিকে চির পুরাতন চিরশক্তির আকর সনাতন হিন্দু ধর্ম কেবলমাত্র মৌখিক আবৃত্তি ও আড়ম্বরের মধ্যে আপনার শিবশক্তিকে হারাইয়া ফেলিয়াছিল ও অপর দিকে যে অপূর্ব প্রেমধর্মের বলে মহাপ্রভু সমস্ত বাংলা দেশকে জয় করিয়াছিলেন, সেই প্রেমধর্মের অনন্ত মহমা ও প্রাণ-সঞ্চারিণী শক্তি কেবলমাত্র তিলককাটা ও মালা ঠকঠকানিতেই নিঃশেষিত হইয়া যাইতেছিল। বাংলার হিন্দুর সমগ্র ধর্মক্ষেত্র শক্তিহীন শাক্ত ও প্রেমশূন্য বৈষ্ণবের ধর্মশূন্য কলহে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল, তখন নবদ্বীপের চিরকীর্তিময় জ্ঞানগৌরব কেবলমাত্র ইতিহাসের কথা, অতীত কাহিনি, বাঙালি জীবনের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না, এইরূপে কি ধর্মে, কি জ্ঞানে বাংলার হিন্দু তখন সর্ববিষয়ে প্রাণহীন হইয়া পড়িয়াছিল।

আলিবর্দি খাঁর পর হইতেই বাংলার মুসলমানও ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল এবং সেই সময় তাহাদের সকল জ্ঞান ও সকল শক্তি বলহীনের বিলাসে ভাসিয়া গিয়াছিল। এমন সময় সেই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ইংরাজ বণিক-বেশে আগমন করিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই রাজত্ব স্থাপন করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিল। আমাদের জাতীয় দুর্বলতা নিবন্ধন আমরা ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ইংরাজ জাতিকে ও তাহাদের সভ্যতা ও তাহাদের বিলাসকে বরণ করিয়া লইলাম। দুর্বলের যাহা হয়, তাহাই হইল। ইংরাজি সভ্যতার সেই প্রখর আলোক সংযতভাবে ধারণ করিতে পারিলাম না। অন্ধ হইয়া পড়িলাম। অন্ধকারাক্রান্ত দিগ্‌ভ্রান্ত পথিক যেমন বিস্ময়ে ও মোহবশত আপনার পদপ্রান্তস্থিত সুপথকে অনায়াসে পরিত্যাগ করিয়া, নিজের শাস্ত্রকে অবজ্ঞা করিয়া, নিজের সাহিত্যকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করিয়া, আমাদের জাতীয় ইতিহাসের ইঙ্গিতে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের সাহিত্য, ইংরাজের ইতিহাস, ইংরাজের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের দিকে নিতান্ত অসংযতভাবে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। সেই ঝোঁক অনেকটা কমিয়া আসিয়াছে সত্য, কিন্তু এখনও একেবারে যায় নাই। রামমোহন যে দেশে "বিজ্ঞানের তূর্যধ্বনি" করিয়াছিলেন, আমরা তাহাই শুনিয়াছিলাম, বা মনে করিয়াছিলাম শুনিয়াছি, অন্ততঃপক্ষে বিজ্ঞানের বুলি আওড়াইতে আরম্ভ করিলাম। কিন্তু রামমোহন যে গভীর শাস্ত্রালোচনায় জীবনটাকে ঢালিয়া দিয়াছিলেন, তাহার দিকে ত আমাদের চোখ পড়ে নাই। তিনি যে আমাদের সভ্যতা ও সাধনার মধ্যে আমাদের উদ্ধারের পথ খুঁজিয়াছিলেন সে কথা ত আমরা একবারও মনে করি নাই। তারপর দিন গেল। আমাদের স্কুল, কলেজ, প্রতিষ্ঠিত হইল, আমাদের ঝোঁকটা আরও বাড়িয়া গেল, তারপর বঙ্কিম সর্বপ্রথমে বাংলার মূর্তি গড়িলেন, প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিলেন, বঙ্গজননীকে দর্শন করিলেন, সেই "সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং শস্যশ্যামলাং মাতরম্" তাহারই গান গাহিলেন, সবাইকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ দেখ, এই আমাদের মা, বরণ করিয়া ঘরে তোল।" কিন্তু আমরা তখন সে মূর্তি দেখিলাম না ; সে গান শুনিলাম না, তাই বঙ্কিম আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি একা মা মা বলিয়া রোদন করিতেছি।" তার পর শশধর তর্কচূড়ামণির হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থানের আন্দোলন। এই আন্দোলন সম্বন্ধে আমাদের দেশে অনেক মতভেদ আছে। কেহ বলেন, উহা আমাদের দেশে অনেক অনিষ্ট করিয়াছিল, আবার কেহ কেহ বলেন আমাদের অশেষ উপকার সাধন করিয়াছিল। সে সব কথা

লইয়া আলোচনা করা আমি আবশ্যক মনে করি না। এই আন্দোলন যে অনেক দিকে একেবারেই অল্প ছিল, তাহা আমি বিশ্বাস করি। কিন্তু আমি যেন সেই আন্দোলনের মধ্যেই বাঙালি জাতির, অন্তত‌পক্ষে শিক্ষিত বাঙালির আত্মস্থ হইবার একটা প্রয়াস — একটা উদ্যম দেখিতে পাই। সেইটুকুই আমাদের লাভ। তারপর আরও দিন গেল, ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ হইতে স্বদেশি আন্দোলনের বাজনা বাজিতে লাগিল, বাঙালি আপনাকে চিনিতে ও বুঝিতে আরম্ভ করিল। রবীন্দ্রনাথ গাহিলেন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল
সত্য কর সত্য কর হে ভগবান্"

বাংলার জল বাংলার মাটি আপনাকে সার্থক করিতে লাগিল। কিন্তু আমাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানীগুণী মহাপণ্ডিত আছেন, যাহারা নাকি বলেন যে, এই স্বদেশি আন্দোলন ইহা একটি বৃহৎ ভ্রান্তির ব্যাপার। আমরা নাকি সব দিকে ঠিক হিসাব করিয়া চলিতে পারি নাই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশে একটা প্রাণহীন জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। এই মুখস্ত করা জ্ঞানের ক্ষমতা অল্পই; কিন্তু অহঙ্কার অনেকখানি। এই জ্ঞানে যারা জ্ঞানী, তাহারা সব জিনিস সের দাঁড়ি লইয়া মাপিতে বসেন। কিন্তু, প্রাণের যে বন্যা, সে ত অঙ্ক শাস্ত্র মানে না, সে যে সকল মাপকাঠি ভাসাইয়া লইয়া যায়। **স্বদেশি আন্দোলন একটা ঝড়ের মত বহিয়া গিয়াছিল, একটা প্রবল বন্যায় আমাদের ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল**। প্রাণ যখন জাগে তখন ত হিসাব করিয়া জাগে না। মানুষ যখন জন্মায়, সে তো হিসাব করিয়া জন্মায় না, না জন্মাইয়া পারে না বলিয়াই সে জন্মায়। আর না জাগিয়া থাকিতে পারে না বলিয়াই প্রাণ একদিন অকস্মাৎ জাগিয়া উঠে। এই যে মহাবন্যার কথা বলিলাম, তাহাতে আমরা ভাসিয়া—ডুবিয়া বাঁচিয়াছি। বাংলার যে জীবন্ত প্রাণ, তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছি। বাংলার প্রাণে প্রাণে আবহমান যে সভ্যতা ও সাধনার স্রোত, তাহাতে অবগাহন করিয়াছি। বাংলার যে ইতিহাসের ধারা, তাহাকে কতকটা বুঝিতে পারিয়াছি। বৌদ্ধের বুদ্ধ, শৈবের শিব, শাক্তের শক্তি, বৈষ্ণবের ভক্তি, সবই যেন চক্ষের সম্মুখে প্রতিভাত হইল। চণ্ডিদাস বিদ্যাপতির গান মনে পড়িল। মহাপ্রভুর জীবন-গৌরব আমাদের প্রাণের গৌরব বাড়াইয়া দিল। জ্ঞানদাসের গান, গোবিন্দদাসের গান, লোচনদাসের গান, সবই যেন এক সঙ্গে সাড়া দিয়া উঠিল। কবিওয়ালাদের গানের ধ্বনি প্রাণের মধ্যে বাজিতে লাগিল। রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতে আমরা মজিলাম। বুঝিলাম, কেন ইংরাজ এদেশে আসিল, রামমোহনের তপস্যার নিগূঢ় মর্ম কী? বঙ্কিমের যে ধ্যানের মূর্তি সেই—

"তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম,
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে,
বাহুতে তুমি মা শক্তি
হৃদয়ে তুমি মা—ভক্তি
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে"—

সেই মাকে দেখিলাম, বঙ্কিমের গান আমাদের "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল," বুঝিলাম, রামকৃষ্ণের সাধনা কি—সিদ্ধ কোথায়! বুঝিলাম কেশবচন্দ্র কেন কাহার ডাক শুনিয়া ধর্মের তর্ক রাজ্য ছাড়িয়া মর্মরাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বিবেকানন্দের বাণীতে প্রাণ ভরিয়া উঠিল। বুঝিলাম, বাঙালি হিন্দু হউক, মুসলমান হউক খ্রিস্টান হউক, বাঙালি বাঙালি।

বাঙালির একটা বিশিষ্টরূপ আছে, একটা বিশিষ্ট প্রকৃতি আছে, একটা স্বতন্ত্র ধর্ম আছে। এই জগতের মাঝে বাঙালির একটা স্থান আছে, অধিকার আছে, সাধনা আছে কর্তব্য আছে। বুঝিলাম, বাঙালিকে প্রকৃত বাঙালি হইতে হইবে। বিশ্ববিধাতার যে অনন্ত বিচিত্র সৃষ্টি, বাঙালি সেই সৃষ্টিস্রোতের মধ্যে এক বিশিষ্ট সৃষ্টি। অনন্তরূপ লীলাধারের রূপ বৈচিত্র্যে বাঙালি একটি বিশিষ্টরূপ হইয়া ফুটিয়াছে। আমার বাংলা সেইরূপের মূর্তি আমার বাংলা সেই বিশিষ্টরূপের প্রাণ, যখন

জাগিলাম, মা আমার আপন গৌরবে—তাঁহার বিশ্বরূপ দেখাইয়া দিলেন, সে রূপে প্রাণ ডুবিয়া গেল, দেখিলাম, সে রূপ বিশিষ্ট, সে অনন্ত! তোমরা হিসাব করিতে হয় কর, তর্ক করিতে চাও কর—সেরূপের বালাই লইয়া মরি।

(বাংলার কথা হইতে উদ্ধৃত) "দেশবন্ধু।"

তারপর স্বদেশী আন্দোলনের প্রবল ঢেউ বাংলার হৃদয়-কূলে আঘাত করিল। দেশবন্ধু বাংলাকে যতটা ভালোবাসিয়াছিলেন ঠিক ততটা আবেগ এবং উন্মাদনা লইয়া বাংলার দুর্গম-পন্থী যুবকগণ এই আন্দোলনের স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শাসকের অমোঘ বজ্র তাহাদের উপর নিক্ষিপ্ত হইল। কিন্তু প্রলয়ের ইঙ্গিত পাইয়া সমুদ্রের ঢেউ যেমন চঞ্চল হইয়া ওঠে, রাজশক্তির এই প্রতিকূলতায় স্বদেশি আন্দোলনের স্রোতে জোয়ার আসিয়া গেল।

প্রলয়ের সেই সংশয় জটিল মুহূর্তে যাহারা লাভ-লোকসানের হিসাব না খতাইয়া ভরা জোয়ারে গা ভাসাইয়াছিলেন এবং রাজরোষে পড়িয়া লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে যাইয়া আমাদের কম বেগ পাইতে হয় নাই। তাহারই অনতিরঞ্জিত ইতিহাস এই ক্ষুদ্র গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

সৎকার্যে বাধাদানের চেষ্টা

স্বদেশি আন্দোলন উপলক্ষে নিগৃহীত মহোদয়গণের প্রতি যৎসামান্য সম্মান প্রকাশে উদ্যত হইয়া আমাদিগকে সামান্য বিড়ম্বিত হইতে হয় নাই। আমাদিগের স্বদেশবাসী এক শ্রেণির লোকের কাপুরুষতা, খলতা ও নিচাশয়তাই এস্থলে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যাহারা স্বদেশি আন্দোলনে সহায়তা করিতে গিয়া জন্মভূমির সেবায় আগ্রহাধিক্য প্রকাশ পুরঃসর রাজপুরুষ দিগের বিরাগ-ভাজন হইয়াছেন, ইংরাজের ধর্মাধিকরণে অভিযুক্ত হইয়া দণ্ডিত হইয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশের চেষ্টাতে বিবিধ ব্যক্তি অশেষ প্রকারে বাধাদানের প্রয়াস পাইয়াছিল। যাহারা স্বদেশের হিতসাধন করিতে গিয়া, রাজপুরুষদিগের হস্তে নিগৃহীত হইয়াছেন, এবং প্রফুল্লবদনে সেই সকল নিগ্রহ সহ্য করিয়া আবার স্বদেশ-সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সেই সকল মহাপ্রাণ ব্যক্তির প্রতি যে প্রকাশ্যভাবে কৃতজ্ঞতা ও সম্মান প্রকাশ করা আমাদের প্রধান কর্তব্য, একথা কে না স্বীকার করিবেন? সকল দেশেই এইরূপ বীরপূজা হইয়া থাকে। যাহারা দেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করেন, তাহাদিগের নাম সকল দেশে প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকে। যে জাতি বীর পূজা করিতে জানে না, বা আত্মোৎসর্গকারীর মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে অগ্রসর হয় না, সে জাতির উন্নতির সম্ভাবনা অতি অল্প, একথা বলাই বাহুল্য।

দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশের একদল মহাত্মা এই সদনুষ্ঠানে বাধা দানে সাধ্যমত ত্রুটি করেন নাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশবাসীর নিকট পণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিচিত ; কাহারও কাহারও স্বদেশভক্ত বলিয়া পরিচয়দানের আগ্রহও অল্প নহে। তথাপি ভীরুতা বশেই হউক, অথবা স্বভাব-দোষেই হউক, তাহারা রাজপুরুষদিগের হস্তে লাঞ্ছিত দেশের লোকের প্রতি প্রকাশ্যভাবে সম্মান প্রকাশে প্রতিবাদ করিয়াছেন। তাহার পর যাহাতে কলিকাতা টাউন হলে এরূপ সভার অধিবেশন না হয়, দেশের নেতৃবৃন্দ যাহাতে এই কার্যে যোগ না দেন, সেজন্যও গুণধরেরা চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। এই সকল ব্যক্তির চেষ্টা সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়াছিল সত্য. তথাপি ইহাদের নীচতামূলক ব্যবহার কোন মতেই উপেক্ষণীয় নহে। নানা শ্রেণির লোক ভিন্ন ভিন্ন কারণে এবিষয়ে আপত্তি করিয়াছিল। আমরাও কাহারও নামোল্লেখ না করিয়া অতি সংক্ষেপে কারণগুলির উল্লেখ ও আলোচনা করিতেছি।

প্রথম আপত্তি, লাঞ্ছিত ব্যক্তিরা সম্মান প্রাপ্তির যোগ্য কোন কার্য করেন নাই। অন্যান্য দেশে

যাহারা বড় বড় কার্য করেন তাঁহাদিগেরই সম্মান লাভ ঘটে। আমরা কেন তিলকে তাল করিয়া তুলিব? তাহাতে কী লাভ হইবে?

ইহার উত্তরে আমরা এই মাত্র বলিব, প্রাণের যে উচ্চতা, সৎসাহস ও মহানুভবতা সর্বত্র সমাদৃত হয়, আমাদিগের লাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে সেই সকল গুণের অসদ্ভাব ছিল না, যাহারা সম্মানিত হইতেছেন, আমরা তাহাদিগকে এই মাত্র জানাইতেছি যে, তাহারা রাজদ্বারে নিগ্রহ ভোগ করিলেও দেশের লোক তাহাদিগের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করে ; আমরা তাহাদিগকে সম্মানিত করিয়া নিজের সম্মানই বাড়াইতেছি, তাহাদিগের ইহাতে ব্যক্তিগত লাভ নাই, আমাদিগেরই জাতিগত লাভ। রাজপুরুষেরা এই কার্যে জানিতে পারিবেন যে, তাহাদিগের অকারণ লাঞ্ছনায় মানের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। দুর্বল চিত্ত ব্যক্তিরাও ঈদৃশ সম্মান প্রদর্শন দর্শনে উন্নতচেতা হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় আপত্তি, রাজপুরুষেরা বিরক্ত হইবেন, তাহারা রীতিমত বিচার করিয়া যাহাদিগকে দোষী সাব্যস্ত করিলেন, প্রজা হইয়া আমরা তাহাদিগকে সম্মানিত করি কিরূপে? যাহারা বিরক্ত হন হউন আমরা কী করিব? মান্যবর বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসুর পত্রে, ইহার একটি সদুত্তর দেওয়া হইয়াছে। ফলত ইংরাজের দেবতা পাশ্চাত্য জগতের উপাস্য প্রভু ও যীশুখ্রিস্টও প্রকাশ্য আদালতে রীতিমত বিচারে "দোষী সাব্যস্ত" হইয়া কঠোরতম প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, ইহা বাইবেলের উক্তি।

তৃতীয় আপত্তি, যাহারা স্বদেশের কার্য করেন নাই, অকারণে রাজপুরুষদিগের ভ্রমে বা কাহারও চক্রান্তে লাঞ্ছিত, তাহাদিগকে সম্মানিত করা সম্মানের অপব্যবহার। এ উক্তি অত্যন্ত অসার। কারণ যাহারা লাঞ্ছিত তাহারা অধিকাংশস্থলে অভিযোগের বিষয়ীভূত ব্যাপারে নির্লিপ্ত থাকিলেও অন্যরূপে স্বদেশি আন্দোলনের জন্য কর্তৃপক্ষের বিরাগ-ভাজন। এ বিষয়ে অধুনা অধিক কিছু বলা যুক্তিসিদ্ধ বোধ করি না। এই পর্যন্ত বলিতে পারি, যদি কোন ব্যক্তি যোগ্যতা ব্যতিরেকে সম্মানিতই হন, তাহাতে যোগ্যের গৌরব লাঘব হয় না।

এই গেল স্বদেশবাসী কতিপয় ধুরন্ধরের বিরুদ্ধাচরণের কথা। ইহার পর শ্বেতাঙ্গ মহোদয়েরাও বিরুদ্ধাচরণে ক্ষান্ত হন নাই। গত ৫ ফেব্রুয়ারি (১৯০৬) সোমবার এই বিরাট সভার অধিবেশন করিবার জন্য যখন টাউনহলে স্থান-প্রার্থনা করিয়া সুরেন্দ্রবাবু মিউনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান এলেন সাহেবকে পত্র লিখেন, তখন তিনি টাউনহলে এই সভার অধিবেশন বিষয়ে অনুমতি-দান করিয়াছিলেন। তদনুসারে সংবাদপত্রাদিতে টাউনহলে সভা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হয়। বলা বাহুল্য, যে উদ্দেশ্যে সভা হইবে, তাহা সুরেন্দ্রবাবুর পত্রে অতি স্পষ্টভাষায় খুলিয়া লেখা হইয়াছিল। এলেন সাহেব তখন উহাতে সম্মতি প্রকাশ করিয়া সভার অধিবেশনের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ ১২ ফেব্রুয়ারি সোমবারে মতের পরিবর্তন করিলেন ; তিনি উক্ত সোমবারে সুরেন্দ্রবাবুকে যে পত্র পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইল :

CORPORATION OF CALCUTTA, MUNICIPAL OFFICE

Calcutta 11th Feb. 1908

MY DEAR SIR,

When you asked me for permission to hold a meeting at the Town Hall to express sympathy with the sufferers in the cause of Swadeshi, I did not clearly understand the object of your meeting. I now learn that you intend to express sympathy with persons who have been convicted for offences committed in connection with the boycott agitation. I certainly do not consider that the Town Hall is the proper place for a demonstration of this character and I regret that

I must revoke my sanction to the use of the Town Hall for this purpose.

Yours Sincerely,

C. H. ALLEN

অর্থাৎ এলেন সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রথমবার সম্মতিদানের সময় তিনি, যে উদ্দেশ্যে সভা করা হইবে, তাহা ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। কিন্তু পরে বিশেষ বিবেচনা করিয়া তিনি বুঝিয়াছেন যে, বিলাতি বর্জন ব্যাপারে যাহারা অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া আদালতে দণ্ডিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশের জন্য টাউন হলে সভার অধিবেশন করা হইবে। এই নিমিত্ত টাউন হল কোনক্রমেই দেওয়া উচিত বলিয়া আমি মনে করি না। এই বলিয়া চেয়ারম্যান মহাশয় টাউন হলে সভার জন্য স্থানদান করিবার পূর্ব প্রদত্ত অনুমতির প্রত্যাহার করিলেন।

টাউন হল পাওয়া যাইবে না, অধিবেশনের দুই দিন পূর্বে এই কথা শ্রবণগোচর হইল ; সেই দুই দিনের মধ্যে আয়োজন করিয়া অন্যত্র সভা করিতে হইল, ইহা কীদৃশ শ্রম, ব্যয় ও কষ্টসাপেক্ষ তাহা ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে বুঝিতে পারিবেন না। কত হ্যাণ্ডবিল, প্লেকার্ড নষ্ট হইল, পুনশ্চ মুদ্রাঙ্কন হইল না, পরিশেষে একজন দয়ালু হিন্দুস্থানী মহাজনের অনুগ্রহে স্থান-লাভ ঘটিলেও কি কষ্টে সেই স্থান সুসজ্জিত করিতে হইয়াছিল, তাহা সকলে জানেন না। পূর্বে এই বাটিতে থিয়েটার হইত, কয়েক মাস পূর্বে তাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় স্থানটি অব্যবহার্য হইয়া উঠিয়াছিল ; গ্যাস কাটা, বৈদ্যুতিক আলোক বন্ধ, বসিবার আসন নাই, স্থানটি ধূলিরাশি সমাকীর্ণ, কত কষ্টে তাহা পরিষ্কৃত করিতে হইয়াছিল তাহা অন্যে বুঝিবে না।

ইহার উপর পুলিশ কমিশনার মহাশয়ের ভয় হইয়াছিল ছাত্রেরা “লাঠি” প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামা করিবে! দাঙ্গা হাঙ্গামার উদ্বেগ প্রকাশক পত্র পাঠ করিয়া আমরা হাস্যসংবরণ করিতে পারি নাই।

এ ত গেল এক পর্ব। তাহার পর মিউনিসিপাল আফিসের কর্তৃপক্ষগণ টাউনহলে যে সভা হয় নাই, সেই সভার আলোক, পাহারা, ফরাস প্রভৃতির হিসাব দাখিল করিয়া আমাদিগের নিকট হইতে ৬৩্ টাকা চাহিয়াছেন! তাঁহাদিগের মূলপত্র এই :

No. 12449 M.

MUNICIPAL OFFICE,

Calcutta, the 14th February 1906

Re : Engagement of the Town Hall for a Public Meeting on 14th February 1906.

Dear Sir,

In continuation of my letter No. 11979 M, dated the 6th February 1906, I write to ask you to kindly remit Rs. 63 to meet the undernoted charges :—

Provisional cost for gas	...	Rs. 30
Lighting charges	...	„ 5
Police Attendance	...	„ 8
	Total	Rs. 43 only,

The amount mentioned in item (1) will be adjusted in accordance with the actual consumption of gas and the balance if any refunded to you.

Yours faithfully

(Illegible)

for Secy, to the Corporation,

ইহাতেও শেষ হয় নাই। টাউনহল হইতে চেয়ার ভাড়ার জন্য আরও ৪১।০ টাকার দাবিতে একজন ইন্‌স্পেক্টর তাগাদা করেন তাহারও উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

১৪ ফেব্রুয়ারি (১৯০৬ সালে) ২ ফাল্গুন বুধবার অপরাহ্ণ কালে গ্রাণ্ড থিয়েটারে, স্বদেশি আন্দোলন উপলক্ষে, রাজপুরুষদিগের দ্বারা লাঞ্ছিত মহোদয়গণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য একটি বিরাট সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভার সময় মুষলধারে বৃষ্টিপাত হইলেও জনতা এত অধিক হইয়াছিল যে, অনেককেই স্থানাভাবে ফিরিয়া যাইতে হয়। রঙ্গালয়ের মধ্যে এত লোক হইয়াছিল যে, তিল ধারণের স্থান ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশসেবা ব্রতে আগ্রহ নিবন্ধন এই লাঞ্ছিত মহাত্মাদিগকে দেখিবার জন্য লোকে যে প্রকার ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা বর্ণনাতীত। যখন লাঞ্ছিত ভদ্রলোকেরা রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত হইলেন, তখন বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে রঙ্গালয়টি পুনঃ পুনঃ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কলিকাতার সকল শ্রেণির ও সকল সম্প্রদায়ের লোকই এই সভার কার্যে যোগদান করিয়াছিলেন।

প্রবীণ দেশহিতৈষী, সুপ্রসিদ্ধ মিরার সম্পাদক বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন সভাপতির আসন গ্রহণ পূর্বক যে সারগর্ভ বক্তৃতা পাঠ করেন, তাহা এইরূপ :

Gentlemen,—We have met here this evening to honour those gentlemen who have suffered for the Swadeshi cause, and it is superfluous for me to say that in honouring them, we are honouring ourselves as a nation. The occasion is a unique one, for this is the first time in the history of modern India that the nation has been called upon to honour people who have suffered for the country's cause. The event marks a new era in the history of our country, and heralds a new destiny for our countrymen. No nation need despair of its future that counts in its ranks men who are ready to suffer for their Motherland.

These gentlemen, whom we see before us, are the sufferers for the Swadeshi cause. They have suffered first for a just and righteous cause, and our sympathy naturally goes out to them. But I may be permitted to say, that their sufferings, however great, are nothing compared with what the people of Ireland Russia and China have suffered, and are suffering still. Through her patient suffering, Ireland is about to realise her long-cherished aspiration for Home Rule. Through her suffering, Russia has wrung not a few concessions from the Autocratic Czar. Through her suffering China too, with the aid of the Reform Party, has emerged from her stagnant national life. Suffering constitutes the best and greatest sacrifice and no cause has ever been won without it. Our people are yet at the beginning of the struggle and they must be prepared for greater sacrifices than they have yet undergone. Let them fight the battle manfully, undeterred by any difficulties which they may find in their way.

Gentlemen, what strikes me as peculiar is that in such a cause as Swadeshi anybody should have to suffer persecution from a progressive and enlightened Government like the British Government. We know that Lord Curzon when in India posed himself as an apostle of Swadeshi. The Swadeshi Gospel is preached by all the advanced nations of the West, and by none so eloquently as the school of politicians in England who follow the Chamberlain flag. But the dullest amongst us can see that Government is bitterly opposed to that Swadeshi movement, and is determined to put to down by force. At the beginning, the attempt to suppress the movement was a veiled one. The veil has since been thrown aside, and an open crusade is now being waged against the movement all over the country. Why so, we cannot understand. Is not the Swadeshi movement beneficial both to Indians

and Anglo-Indians? We do not refuse to use articles of English manufacture. All we want is that the articles of our use may be produced in the country by whom it does not matter. The term "Swadeshi" is suficiently elastic to include products of Indian as well as Anglo-Indian enerprise provided only that in the latter case as in the former the capital and labour are employed in India. In this view, the Anglo-Indian planter and miner are as much Swadeshists as the Indian tiller of the soil. It is reported that the Government of India have in contemplation the issue of orders for the extended purchase of articles manufactured in this country for Government stores. Is not this an encouragement of the Swadeshi movement? If our rulers had acted in conformity with their declarations, our people would not have been victims of unmerited persecution in connection with the Swadeshi movement. In the new Province, Is regret to say, the policy of our rulers has been one of stern repression. But gentlemen, history teaches the great lesson that repression is never successful in checking the tide of national progress, nor marring any good and righteous work which a nation takes upon itself to accomplish. For every act of repression, there is a martyr and it is martyrdom that strengthens the foundation of a national movement. In spite of repression and persecution we see to day the watch-fires of Swadeshi burning in every city, every town and every village in the country,—we see not one or two here and there, but hundreds patiently suffering for the national cause. Martyrdom has sanctified Swadeshi,--it has stamped the movement with a glorified halo. And I make bold to say that so long as this policy of repression lasts, the Swadeshi cause will spread and prosper with increasing vigour.

Gentlemen, I must not be understood, in all that I have said, to mean that the methods, employed in advancing the Swadeshi cause have been invariably right. My point is that the Government has mistaken the true end and scope of the movement. The stand taken by Swadeshi is one of defence not defiance. All the more we regret the attitude of the Government in view of the fact that it is now generally acknowledged in Anglo-Indian circles, that a new national sentiment as the product of English education has sprung up among the people of this country. Swadeshi is the result of that sentiment. Why then should the ruling race keep away from the movement, as if it were designed for unlawful and sinister purposes? I venture to think that Swadeshi furnishes the exact basis on which an *entente cordiale* may be established between Indians and Anglo-Indians. May we hope that our non-official Anglo-Indian brethren will approach the subject in a rational spirit, and make common cause with the children of the soil in furthering a movement which is calculated to promote the material interests of both alike? As regards Government, I can only say that it is pursuing an altogether mistaken policy in regard to the movement.

Among the gentlemen whom we see before us to-day may I mention in particular,without meaning to make my invidious distinction, the name of Babu Aswini Kumar Dutt of Barisal than whom there are few sincere, self-sacrificing patriots known in all Bengal both old and new. I am told Babu Aswini Kumar has left Calcutta and is not with us this evening. Howerer, I say again that in honouring all these gentlemen who have suffered for the Swadeshi cause, we are honouring ourselves as a nation. To all workers for our dear Motherland I would say : Have patience. India's struggles, however great are not greater than those

of Ireland and Russia. Sacrifice is the true test of of patriotism. There can be no progress without struggle and suffering. Go on working with trust in Providence, and you will soon reach the goal which you seek, I need only remind you of what the poet says .—

Courage yet, my brother or my sister.
Keep on — Liberty is to be subserved whatever occurs ;
That is nothing that is quell'd by one or two failures, or any number of failures.
Or by the indifference or ingratitude of the people, or by any unfaithfulness.
Or the show of the tushes of powers, soldiers, cannon, penal statutes.
What we believe in waits latent for ever through all the continents.
Invites no one, promises nothing, sits in calmness and light, is positive and composed, knows no discouragement.
Waiting patiently, waiting its time.

উক্ত বক্তৃতার মর্ম

বাংলায় ইহার মর্ম এই—যে সকল ভদ্রলোক স্বদেশের মঙ্গল সাধন করিতে গিয়া রাজপুরুষদিগের হস্তে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শনার্থ আজি আমরা এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি। তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিয়া আমরা যে সমগ্র বাঙালিজাতিকে সম্মানিত করিতেছি, একথা বলাই বাহুল্য। আজিকার ঘটনা অভূতপূর্ব। যাঁহারা স্বদেশের কল্যাণ-সাধন-কল্পে নিগ্রহ ভোগ করিতেছেন, তাহাদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য সমগ্র জাতিকে কেহ আর ইতঃপূর্বে আহ্বান করে নাই। আজিকার এই ঘটনা আমাদিগের জাতীয় ইতিহাসে নূতন যুগারম্ভের নির্দেশ করিতেছে এবং সমগ্র বাঙালি জাতির অভিনব ভবিষ্যৎ জীবনের কথা ঘোষণা করিতেছে। যে জাতি স্বদেশহিতব্রতে উৎসর্গীকৃত প্রাণ ব্যক্তিদিগকে সম্মান প্রদর্শন করিতে শিখিয়াছে, তাহাদিগের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া হতাশ হইবার কোন কারণ নাই।

যে সকল ভদ্রলোক আজ আমাদিগের সম্মুখে সমাসীন রহিয়াছেন, ইহারাই সর্বপ্রথমে স্বদেশি পণ্য প্রচলনমূলক আন্দোলন সূত্রে লাঞ্ছিত হইয়াছেন। ইহারা অতি ন্যায়সঙ্গত ও পুণ্যময় ব্রত পালন করিতে গিয়াই নিগ্রহভোগ করিয়াছেন, এইজন্য ইহারা আমাদিগের আন্তরিক সহানুভূতিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু স্বদেশের মঙ্গলের জন্য ইহারা যে লাঞ্ছনাভোগ করিয়াছেন আয়র্লন্ড রুষিয়া ও চীনের স্বদেশভক্তদিগের নিগ্রহের তুলনায় তাহা কিছুই নহে। আয়র্লণ্ডবাসীরা নানা নিগ্রহভোগের পর এক্ষণে তাহাদিগের চিরবাঞ্ছিত স্বায়ত্তশাসন লাভের পথে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। রুষিয়ার অধিবাসিবৃন্দ বহু নির্যাতন সহ্য করিয়া রুষিয়ার যথেচ্ছাচারপরায়ণ সম্রাটের নিকট অল্প স্বত্ব ও অধিকার লাভ করেন নাই। বিবিধ লাঞ্ছনাভোগ করিয়া সংস্কারক সম্প্রদায়ের সহায়তায় চীনের অধিবাসীরা এক্ষণে উন্নতিপথে প্রবেশ করিয়াছেন, চীনে এক্ষণে নূতন জাতীয় জীবনের সঞ্চার হইয়াছে। স্বদেশের জন্য নিগ্রহভোগ আত্মত্যাগের উৎকৃষ্ট ও উচ্চ উদাহরণ। এবংবিধ আত্মত্যাগ ব্যতীত কোন মহৎ কার্যই সুসম্পন্ন হয় না। আমাদিগের স্বদেশবাসিগণ এই সর্বপ্রথম স্বদেশের জন্য সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে ভবিষ্যতে এতদপেক্ষা বহুগুণ নিগ্রহভোগ এবং আত্মত্যাগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। সংকল্প সাধনে যতই বিঘ্ন উপস্থিত হউক না কেন তাহাদিগকে মনুষ্যোচিত দৃঢ়তা সহকারে পণ রক্ষার্থ চেষ্টা করিতে হইবে।

স্বদেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি-সাধন করিতে গিয়া লোকে যে বৃটিশ গবর্নমেন্টের ন্যায় সুসভ্য উন্নতিশীল গবর্নমেন্টে হস্তে নিগৃহীত হইয়াছে, ইহাই আমার নিকট সর্বাপেক্ষা বিচিত্র ব্যাপার বলিয়া বোধ হয়; নূতন প্রদেশের শাসনকর্তারা, নিদারুণ জন নিগ্রহকেই সর্বশ্রেষ্ঠ শাসননীতি রূপে

গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অতীব দুঃখের বিষয়। কিন্তু কেবল নির্যাতনে যে কোন জাতির উন্নতির স্রোত প্রতিরুদ্ধ হয় না, জাতীয় সাধু অনুষ্ঠান বিঘ্নবিহত হয় না, ইতিহাসই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। রাজপুরুষেরা প্রজাবৃন্দের উন্নতিস্রোতে বাধা দিবার জন্য চেষ্টা করিলেই এক একজন স্বদেশভক্ত লোক স্বদেশের মঙ্গলের জন্য নিজ ইচ্ছায় রাজার হস্তে নির্যাতন সহ্য করেন—ফলে স্বদেশের হিতকর অনুষ্ঠানাদি আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠে। রাজার উৎপীড়ন ও অত্যাচার সত্ত্বেও আজি দেশের প্রত্যেক নগর ও পল্লীতে স্বদেশি পণ্যের প্রচলনকল্পে লোকের উৎসাহবহ্নি উজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এক আধ জন নহে--শত শত ব্যক্তি স্বদেশের মঙ্গলসাধনের জন্য অম্লানবদনে নিগ্রহভোগ করিতেছেন। স্বদেশভক্তের আত্মত্যাগ স্বদেশব্রতকে পুণ্যময় এবং গৌরবে উদ্ভাসিত করিয়াছে। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, রাজপুষেরা স্বদেশি আন্দোলনের দমনকল্পে জননিগ্রহে যতই আগ্রহ প্রকাশ করুন না—এ আন্দোলনের স্রোত কিছুই হ্রাস পাইবে না, বরং উত্তরোত্তর ইহার শক্তি ও প্রসার বর্ধিত হইবে।

অতঃপর বক্তা স্বদেশি আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও গবর্নমেন্টের স্বদেশি আন্দোলন দমনমূলক নিন্দনীয় নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া স্বদেশভক্তদিগকে ধৈর্য্যশালী হইতে উপদেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, আত্মোৎসর্গই স্বদেশ ভক্তির প্রকৃত পরীক্ষা। সংঘর্ষ ও লাঞ্ছনা ব্যতীত উন্নতিলাভ সম্ভবপর নহে। সকলে ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া কার্য করিতে থাকুন, অচিরে আমরা বাঞ্ছিতফল লাভে সমর্থ হইব।

সভাপতির বক্তৃতা শেষ হইলে ভবানীপুরের স্বদেশসেবক সম্প্রদায় "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গান করিলেন। সভাস্থ সকলে বহুবার "বন্দেমাতরম্" শব্দ উচ্চারণ করিলে অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সভায় অনুপস্থিত কতিপয় স্বদেশ-হিতৈষীর নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্র ও তারের সংবাদ পাঠ করিতে আদিষ্ট হইলেন।

তন্মধ্যে ঢাকা পিপল্‌স্ অ্যাসোসিয়েশনের পত্র ও শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একখানি পত্র এই স্থানে প্রকাশিত হইল।

ঢাকার পত্র

The Dacca People's Association hereby express their feeling of hearty sympathy with the object of the public meeting to be held on the 14th Instant at the Town Hall to honour the Gentlemen who have suffered in the "Swadeshi Cause".

Dacca
The 10-2-06.

I have the honour to be
Sir,
Your most obedient servant
Rajaninath Bose,
Secy, to the People's Association

রবীন্দ্রনাথের পত্র

বাংলা দেশের বর্ত্তমান স্বদেশী আন্দোলনে কুপিত রাজদণ্ড যাঁহাদিগকে পীড়িত করিয়াছে তাঁহাদের প্রতি আমার নিবেদন এই যে, তাঁহাদের বেদনা যখন আজ সমস্ত বাংলা দেশ হৃদয়ের মধ্যে বহন করিয়া লইয়াছেন, তখন এই বেদনা অমৃতে পরিণত হইয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া তুলিয়াছে; রাজচক্রের যে অপমান তাঁহাদের অভিমুখে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল মাতৃভূমির করুণ করস্পর্শে তাহা বরমাল্য রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাদের ললাটকে আজ ভূষিত করিয়াছে। যাঁহারা মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাকেন বিধাতা জগৎসমক্ষে তাঁহাদের অগ্নি-পরীক্ষা করাইয়া সেই ব্রতের মহত্ত্বকে উজ্জ্বল করিয়া প্রকাশ করেন—অদ্য কঠিন ব্রতনিষ্ঠ বঙ্গভূমির প্রতিনিধি স্বরূপ যে কয়জন এই দুঃসহ অগ্নিপরীক্ষার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক বিশেষ রূপে নির্বাচিত হইয়াছেন তাঁহারা ধন্য, তাঁহাদের জীবন সার্থক। রাজরোষরক্ত-অগ্নিশিখা তাঁহাদের জীবনের ইতিহাসে লেশমাত্র কালিমার সঞ্চার না করিয়া বার বার সুবর্ণ অক্ষরে লিখিয়া দিয়াছে।

বন্দেমাতরম্

২রা ফাল্গুন
১৩১২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অনন্তর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করেন। সুরেন্দ্রবাবুর মূল বক্তৃতা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল :

Sir,—We are assembled here to-night to perform what I, for one, regard as a solemn patriotic duty and, in respect of which, I will add that we are not to be deterred therefrom by the frowns or the smiles of power. I think, Sir, our countrymen have proved, by the hard logic of facts which have transpired within the last few months,that the Bengali of to-day is a very different personage from the Bengali as he is represented to be by historians, more anxious to round off their sonorons periods than to tell the real and veritable truth. Our countrymen have proved and the martyrs, whom we are about to honour to-day, have had a large share in it, our countrymen have proved by their sufferings that repression will not daunt them. We have read the lessons of history and we have read in a book, which we highly prize, that the blood of the martyrs is the cement of the church. Our cause, consecrated by the sufferings of our youngmen, will grow in strength and vitality as the years roll on. We have heard the storv of the young men of Mymensing. They were sent to the lock-up in connection with some Swadeshi incident. As soon as they found themselves within their prison cells, they made the prison walls resound with the echoes of their patriotic songs. The hearts of the jailers were touched, for after all they are human. They brought them food which they declined to partake of. The terrors of the law will not indeed

daunt us. We have cheerfully submitted to the stroke of the whip. With equal alacrity have we suffered the rigours of imprisonment ; and now are gathered together in this hall to declare to the world that those, who have suffered for their devotion to the *Swadeshi* cause, have not been degraded in our estimation but that on the contrary, their punishments have enhanced the public respect which is felt for them and have won for them a high place in our affectionate regard. It is not indeed possible for us to reverse the decrees of our rulers. We are impotent – our voice and our vote count for nothing in the counsels of the Empire. But, in our social and domestic concerns, we are still all powerful. Here we permit no intrusion of any kind on the part of any one. Here, in this domain which is exclusively reserved for us, we say. "Hands off – this is our affair and not yours." If we cannot reverse the decrees of our rulers, we can, at any rate, guide and control the public mind of Bengal. If we cannot modify the punishments which have been inflicted, we can, at any rate, neutralize their effect upon public opinion. If the object of punishment be to deter by degrading, we say that those who have suffered in the *Swadeshi* cause shall not be degraded. If the object of punishment be to deter by the infliction of pain, we say that pain cheerfully borne is not deterrent, and pain is cheerfully borne when the plaudits of the whole community and the mandate of an approving conscience follow the infliction. It has been asked whether it is constitutional to hold a demonstration such as this, and if constitutional, whether it is wise and expedient? I venture to answer both these questions in the affirmative. The authorities of the State hold their powers as a trust for the public good. The public are their masters and they are truly public servants—not in a figurative, but in a higher and literal, sense. The public have therefore every right to sit in judgement on their conduct. They do so every day in connection with executive orders. The same principle applies to judicial decisions. Our Anglo-Indian fellow-citizens have set an excellent example to us in this respect. You know what they do when they believe that any of their community has been wrongly punished by a court of law. They agitate, and agitate and never cease to agitate until they have obtained some sort of redress. You know what they did in connection with the Bain case. Even after the accused had been discharged by the High Court, they submitted a protest to Government, with a view to prevent a recurrence of proceeding such as those which had formed the subject matter of their complaint. We are, therefore, quite within our rights in holding this demonstration. But is it wise and consistent with prudence and considerations of expediency? I confess this is, a question somewhat more difficult and complicated. But I ask—is it possible to overlook the moral significance and the educative value of a demonstration like this? If the political and moral education of the people be a supreme factor in the evolution of national life, then I venture to hold that the demonstration of to-day is abundantly justified. It might be said that a meeting like the present will still further irritate our rulers. I fear it is too late in the day to bring forward an argument of this kind. We have been offending our rulers rather too frequently in recent years. The Indian National Congress is a huge offence. The smaller Provincial Conferences are so many offences on a somewhat reduced scale. Our political agitations are a perennial source of irritation. The agitation against the partition of Bengal is cordially detested as implying a perverse determination, on our part, not to accept what is regarded as an accomplished fact. I ask you—are you prepared to give up the Congress,

to close your Conferences, to abandon political agitation and to accept the partition of Bengal and go down on you knees and invoke the blessing of Almighty Providence on your rulers for the boon which they have thrust upon you against your wishes and which, forsooth, you in your folly, are not able or are unwilling to appreciate! I fear, you are not prepared to do anything of the sort. I fear, it is too late in the day to discuss the question of pleasing or displeasing the authorities. We cannot hunt with the hounds, and run with the hare. We cannot serve both God and Mammon. For my part, as one going down the vale of years, I will say this, that I have made my choice—definite, clear and pronounced Have you made yours? I ask you whether you have decided to serve God or Mammon ; whether you will consecrate yourselves to the service of your country or the furtherance of your personal self-aggrandisement? Let there go forth a spontaneous outburst of expression from this great gathering that we, who are assembled here, are resolved to live and die for the Swadeshi cause. The line of cleavage between the rulers and the ruled is becoming wider day by day. I ask—who is responsible for it? God knows that awful burden does not rest upon our heads. Our rulers are responsible. Those who misapprehned the situation and who coming from the wilds of the Central Provinces, misunderstand the temper and character of the people of Bengal are accountable for the unhappy tension and excitement which prevail throughout these provinces. They seek to repress, where the sovereign remedy is conciliation. They seek to quench the flame by the application of force, and the flame blazes forth with redoubled fury. But whatever may be the defects of our rulers—and there has been a distinct deterioration in their qualities—our course of duty is plain and simple, namely to serve our country with unflinching devotion to her interest and to the cause of constitutional agitation which we are resolved to uphold. You, gentlemen, have by your sufferings set up a noble example, and it is because we mean to profit by that example that we are here to night. We desire to record a vote of confidence in your favour—not in your interest, but in our own—we want to declare to the world that your punishments have not degraded you, that punishments cheerfully borne in the country's cause, never degrade any one, but they are the passports to public honour and popular applause and affection and to the affection and gratitude of the country. Martyrs in our cause, go forth from this hall impressed with the conviction that in honouring you we proclaim to the world our firm determination to honour the future martyrs of our race. You are among the first of the glorious band. I am sure, you will not be the last. But whether first or last, in your sufferings you had our sympathies and now in the hour of your triumph you enjoy, in an unstinted measure, the blessings of your fellow countrymen. In honouring the martyrs, how-ever let us not forget the cause for which they have suffered. I ask you to rise from your places and cry out *Bande Mataram*.

(At this the whole meeting rose to a man and there was a loud and prolonged shouting of *Bande Mataram.*)

Continuing, the speaker said :—Renew the *Swadeshi* vow—the solemn vow—before you go, that you will abstain, as far as in you power lies, from purchasing and using foreign goods, and that you will, to the best of your powers, use and purchase home made and indigenous articles. Will you take this vow in the presence of God and man?

Loud and prolonged cries of ***Bande Mataram.***

সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতা
(মর্মানুবাদ)

আমরা অদ্য যে অভিপ্রায়ে এই সভাস্থলে সমবেত হইয়াছি তাহা অতীব মহান্ এবং দেশের পক্ষে অশেষ কল্যাণের আকর। আমরা শক্তিমান্‌দিগের নিগ্রহ বা অনুগ্রহের ভয়ে কোনক্রমেই এই কর্তব্যপথ হইতে বিচলিত হইতে পারি না। গত কয়েক মাসের মধ্যে প্রকৃত কার্যক্ষেত্রে আমাদিগের দেশের লোকে অবলীলাক্রমে প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, যে ঐতিহাসিকেরা সরল সরল সত্যের আবৃত্তি অপেক্ষা কল্পনাময় ললিত-পদ-বিন্যাসে সমধিক অনুরাগী সেই সকল লেখকের বর্ণিত বাঙালি এবং এখনকার বাঙালি এই উভয়ের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ পরিলক্ষিত হয়।

আমাদিগের দেশের লোকে প্রতিপন্ন করিয়াছেন, বিশেষত অদ্য যে সকল লাঞ্ছিত মহোদয়কে সম্মানিত করিতেছি তাহারা দেখাইয়াছেন, যে নির্যাতনে তাহারা ভীত হইবার পাত্র নহেন। আমরা ইতিহাসের উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি, সম্মান-যোগ্য পাশ্চাত্য গ্রন্থেই পাঠ করিয়াছি যে সর্বত্রই ভক্তদিগের রক্তে ধর্মের ভিত্তিমূল দৃঢ়তর হইয়াছে। আমাদিগের যুবকসম্প্রদায়ের কষ্টসহিষ্ণুতায় আমাদিগের মহান্ উদ্দেশ্য দিন দিন অধিকতর শক্তি সংগ্রহ করিয়া পরিপুষ্ট ও পরিবর্ধিত হইতে থাকিবে। ময়মনসিংহের যুবকদিগের কথা আমরা সকলেই শুনিয়াছি, স্বদেশি ব্যাপারের সংশ্রবে তাহারা অবরুদ্ধ হইয়াছিল, কারাগৃহে প্রবেশ করিয়াই তাহারা দেশানুরাগপ্রকাশক সঙ্গীতের ধ্বনিতে চারিদিকে প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। কারারক্ষকদিগের হৃদয় গলিয়া গেল, তাহারা ত মানুষ ; তাহারা খাদ্য আনিয়া দিল কিন্তু যুবকেরা হাজতে আনীত খাদ্য পরিগ্রহণ করিল না। রাজবিধানের বিভীষিকা আমাদিগকে কখনই বিচলিত করিবে না। আমরা অম্লান বদনে বেত্রদণ্ডের আঘাত সহ্য করিয়াছি, অবিচলিত চিত্তে কারাগারে গমন করিয়াছি, এবং এক্ষণে এই সভাক্ষেত্রে সমবেত হইয়া সমগ্র জগৎকে দেখাইতেছি যে যাহারা স্বদেশি আন্দোলনের সংশ্রবে নির্যাতন ভোগ করিয়াছেন তাহারা আমাদিগের নিকটে কোন ক্রমেই সম্মানভ্রষ্ট বা গৌরবহীন হন নাই। বরং তাহাদিগের লাঞ্ছনা ভোগে সাধারণের নিকট তাহাদিগের সম্মানবৃদ্ধি হইয়াছে এবং তাহারা সাধারণের অধিকতর অনুরাগের পাত্র ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়া লোকের হৃদয়ে উচ্চতর স্থান অধিকার করিয়াছেন।

রাজাদেশের প্রত্যাহার করা আমাদিগের পক্ষে সম্ভব নহে। আমরা অশক্ত, আমাদিগের উক্তি, আমাদিগের মত, রাজ্যপরিচালন কালে গণনার যোগ্য বিবেচিত হয় না। কিন্তু আমাদিগের সামাজিক ও গার্হস্থ্য ব্যাপারে আমরা এখনও সম্পূর্ণ শক্তিসমন্বিত। সেখানে আমরা অপর কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দিই না। সে রাজ্য আমাদিগের, তথায় অনধিকারীদিগকে আমরা অনায়াসে অপসারিত করিয়া দিতে পারি, বলিতে পারি সরিয়া যাও এ আমাদিগের বিষয়, তোমাদিগের আলোচ্য নহে। রাজাদেশের ব্যতিক্রম সংঘটন আমাদিগের অসাধ্য হইলেও বঙ্গের জনসাধারণের মনোরাজ্যে আমরা শাসনকর্তা ও পরিচালক রূপে প্রতিভাত হইতে পারি। আমরা রাজদণ্ডের অন্যথা করিতে না পারিলেও তাহাতে যেন সমাজের মত পরিবর্তিত না হয়, এরূপ ব্যবস্থা করিতে পারি। লোকের নিকট অবজ্ঞাত করা যদি দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, যাহারা স্বদেশি আন্দোলনের সংস্পর্শে দণ্ডিত তাহারা অবজ্ঞাত হইবে না এই স্থির করিয়া আমরা সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিতে পারি। যদি কষ্ট দিয়া কার্য রহিত করা দণ্ড প্রয়োগের উদ্দেশ্য হয়, আমরা মনে করিব প্রফুল্লচিত্তে যে কষ্ট সহ্য করা যায় তাহা কার্যের প্রতিরোধক নহে। দণ্ড সহিলে মনে অসন্তোষ জন্মে না, সমগ্র সমাজের প্রশংসা ও সমাদর লাভ হয় এবং বিবেকের বিচারে আত্মপ্রসাদ জন্মে, সেই দণ্ড অম্লান বদনে সহ্য করা যায়।

প্রশ্ন উঠিয়াছে, এরূপ সম্মানার্থ সভা করা ব্যবস্থাবিরোধী কি না, এবং ব্যবস্থাবিরোধী না হইলেও যুক্তিসিদ্ধ কিনা? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি ইহা ব্যবস্থাসঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত। সাধারণের হিতার্থই

রাজ্যশাসন। প্রত্যেক রাজকর্মচারী সাধারণের ভৃত্য, তাহাদিগের শক্তি প্রজার মঙ্গলার্থ তাহাদিগের হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে। তাহারা সাধারণের সেবক (সরকারি চাকর) ইহা উক্তি মাত্র নহে প্রকৃত প্রস্তাবেই তাহারা জনসাধারণের ভৃত্য। সুতরাং তাহাদিগের কার্যকলাপের সমালোচনায় সাধারণের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। শাসন বিভাগের অনুমতি সম্বন্ধে প্রত্যহই লোকে সমালোচনা করিয়া থাকে। আদালতের মীমাংসা সম্বন্ধেও এই নিয়ম অনুসৃত হয়। এ বিষয়ে এ দেশের "এংগ্লো ইণ্ডিয়ান্' সম্প্রদায় আমাদিগকে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন ; আপনারা জানেন তাহাদিগের সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি রাজদ্বারে অবৈধভাবে দণ্ডিত হইয়াছেন বিশ্বাস হইলে তাহারা কি করেন? তাহারা পুনঃ পুনঃ আন্দোলন করেন, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত কোন প্রকার প্রতিকার লাভ না হয় ততক্ষণ আন্দোলনে বিরত হন না। "বেইনকেস্" নামক প্রসিদ্ধ মামলায় তাহারা কি করিয়াছিলেন, তাহা আপনারা অবগত আছেন। হাইকোর্টে আসামী অব্যাহতি পাইবার পরেও তাহারা কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়া প্রার্থনা করেন যে ভবিষ্যতে বিচারের অভিনয় যেন আর না হয়। সুতরাং এই সম্মান প্রকাশের সভা করিয়া আমরা প্রজাস্বত্বের ব্যতিক্রম করি নাই, বরং এরূপ করায় আমাদিগের শান্তিপ্রিয়তা ও কর্তব্যের উপলব্ধিই প্রকাশ পাইতেছে।

কিন্তু আমাদিগের বর্তমান অবস্থায় এরূপ অনুষ্ঠান কি সুবুদ্ধির পরিচায়ক ও যুক্তিসঙ্গত? আমি স্বীকার করি এবারকার সমস্যা অপেক্ষাকৃত জটিল ও কঠিন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ সম্মান সভার নীতিগত সুফল ও শিক্ষাবিধায়িনী শক্তি কি কোন অংশে উপেক্ষণীয়? জাতীয় জীবনের বিকাশে যদি রাজনীতিগত ও ধর্মনীতিগত শিক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি যে, অদ্যকার সভার যথেষ্ট সার্থকতা আছে।

এরূপও বলা যাইতে পারে, যে ঈদৃশ সভায় রাজপুরুষদিগের আরও বিরক্তি বৃদ্ধি হইবে। কিন্তু বোধ হয় এখন এরূপ তর্কের সময় আর নাই। আমরা ত গত কয়েক বৎসর পদে পদেই রাজপুরুষদিগের নিকট অপরাধী হইতেছি। জাতীয় মহাসমিতির অনুষ্ঠান একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ। ছোট ছোট প্রাদেশিক সমিতিগুলি বোধ হয় কিয়ৎ পরিমাণে লঘু অপরাধ। আমাদিগের রাজনীতিক আন্দোলনাদিও প্রভুদিগের চিরদিন বিরক্তির মূল। বঙ্গব্যবচ্ছেদ সম্বন্ধে আমাদিগের দেশব্যাপী প্রতিবাদ, আমাদিগের জঘন্য নির্বন্ধাতিশয়ের নিদর্শন ও অনুষ্ঠিত বিভাগ স্বীকারে অবৈধ অপ্রবৃত্তি বলিয়া ঘৃণিত হয়। আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা কি জাতীয় মহাসমিতি বন্ধ করিবেন? প্রাদেশিক সমিতিগুলি পরিত্যাগ করিবেন, রাজনীতিচর্চা পরিহার করিবেন? আপনারা কি বঙ্গব্যবচ্ছেদের আদেশ শিরোধার্য করিতে প্রস্তুত আছেন? এবং জানু অবনত করিয়া ভগবৎসমীপে রাজপুরুষদিগের মঙ্গল কামনা করিয়া আপনারা কি বলিবেন, যে মোহান্ধবশে যাহার উপকারিতা আপনারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেছেন না, আপনাদিগের ইচ্ছার প্রতিকূলে সেই-মহোপকার সাধনের জন্য আপনারা বাধিত হইয়াছেন? আমার বোধ হয় আপনারা কেহই এরূপ করিতে স্বীকৃত নহেন। রাজপুরুষেরা কিসে তুষ্ট হইবেন, কিসে রুষ্ট হইবেন, তাহার মুখাপেক্ষী হইবার সময় চলিয়া গিয়াছে। আমরা শিকারি কুকুরের সঙ্গে শিকার করিব ও পলায়নপর শশকের সহিত লুকাইবার চেষ্টা করিব, এই উভয়দিকে চলিতে পারিব না। আমরা জগদীশ্বর ও ধনেশ্বর উভয়ের সেবা করিতে পারি না। আমার জীবনের অধিত্যকাদেশ হইতে অবরোহণ কালে এই পর্যন্ত বলিতে পারি যে নির্দিষ্ট পরিষ্কৃত ও স্পষ্টভাবে আমি আমার সংকল্প স্থির করিয়াছি। আপনারা কি আপনাদিগের ইতিকর্তব্যতা নির্ণয় করিয়াছেন? আমি জিজ্ঞাসা করি, আপনারা জগদীশ্বরের সেবা করিবেন, না ধনেশ্বরের সেবা করিবেন? আপনারা জন্মভূমির সেবায় জীবন সমর্পণ করিবেন, না ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির পন্থানুসরণ করিবেন? এই মহতী সভার কেন্দ্রস্থল হইতে প্রচার হউক যে এই স্থানে আমরা সমবেত হইয়া সত্যবদ্ধ হইতেছি স্বদেশি ব্যাপারের জন্য আমরা বাঁচিতে মরিতে প্রস্তুত রহিলাম। শাসিত ও শাসনকর্তাদিগের মধ্যে বিচ্ছেদ-রেখা দিন দিন বিস্তারিত হইতেছে। ইহার জন্য দায়ী কে? জগদীশ্বর

জানেন এই দায়িত্বের গুরুভার আমাদিগের শিরোপরি ন্যস্ত নহে, ইহার জন্য আমাদিগের শাসকবর্গই সম্পূর্ণ দায়ী। যাহারা প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারেন না, মধ্যপ্রদেশের মহাবন হইতে সমাগত হইয়া যাহারা বাঙালির মনোভাব ও প্রকৃতি হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ নহেন, এই দেশব্যাপী শোচনীয় বিরোধ ও উত্তেজনার জন্য তাহারাই দায়ী। যেখানে মিলন ও সান্ত্বনায় কার্য হয় সেইখানে তাহারা কঠোর দমন নীতির প্রয়োগ করিয়াছেন। তাহারা অগ্নিশিখা বলপ্রয়োগে নির্বাপিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, শিখা দ্বিগুণবেগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু আমাদিগের রাজপুরুষদিগের দোষ যাহাই হউক না কেন, তাহাদিগের গুণবত্তার যতই লাঘব ঘটিয়া থাকুক, আমাদিগের কর্তব্য পথ সরল ও স্পষ্টই রহিয়াছে। দেশের সেবায় অবিচলিত চিত্তে নিযুক্ত হওয়া ও বিধিসঙ্গত উপায়ে আন্দোলনে প্রবৃত্ত থাকা আমাদিগের কর্তব্য কার্য।

মহোদয়গণ! আপনারা লাঞ্ছনাভোগ করিয়া আমাদিগের সম্মুখে যে উচ্চ আদর্শ উপস্থাপিত করিয়াছেন সেই আদর্শে আমরা লাভবান্ হইব বলিয়া এস্থলে সমবেত হইয়াছি। আপনাদিগের উপর আমাদিগের আস্থা ও অনুরাগ আছে ইহা আপনাদিগের সম্মানার্থ নহে, আমাদিগের নিজেরই মঙ্গলার্থে লিপিবদ্ধ করিতেছি। আমরা সমস্ত জগৎসমক্ষে প্রকাশ করিতে চাহি যে আপনাদিগের উপর দণ্ডপ্রয়োগে আপনারা অপদস্থ হন নাই, দেশের কল্যাণার্থ প্রফুল্লচিত্তে শাস্তি সহ্য করায় কাহারও গৌরব হানি হয় না বরং তাহাতে সাধারণের নিকট সম্মানবৃদ্ধি ও প্রশংসা লাভ হয়। এবং দেশের লোকের স্নেহ ও কৃতজ্ঞতা আকর্ষণ করে। আমাদিগের পবিত্র ব্রতের নিমিত্ত লাঞ্ছিত মহোদয়গণ আপনাদিগের সম্মানে আমরা জগৎ সমক্ষে প্রচার করিতেছি যে আমাদিগের দেশের ভবিষ্যৎ লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত মহোদয়বর্গকে সম্মানিত করিতে আমরা কৃত সংকল্প হইয়াছি ; সভাস্থল পরিত্যাগ কালে আপনারা এই ধারণা হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া যাইবেন। সেই গৌরবান্বিত মহাত্মাদিগের মধ্যে আপনারাই প্রথম ও অগ্রবর্তী। আমি নিশ্চিত বলিতে পারি আপনারাই সর্বশেষ বলিয়া পরিগণিত হইবেন না। পরন্তু, প্রথমই হউন আর শেষই হউন, নিশ্চয় জানিবেন আপনাদিগের লাঞ্ছনায় আমাদিগের প্রত্যেকের সহানুভূতি ছিল, এবং এক্ষণে আপনাদিগের বিজয় লাভের মাহেন্দ্রক্ষণে আপনারা পর্যপ্ত পরিমাণে সমগ্র স্বদেশবাসীর আশীর্বাদ লাভ করিতেছেন। লাঞ্ছিত দিগের প্রতি অনুরাগ প্রকাশের সময়ে যে ব্রতের জন্য তাহাদিগের লাঞ্ছনা ভোগ হইয়াছে সে কথা আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। আমি আপনাদিগকে দণ্ডায়মান হইয়া "বন্দে মাতরম্" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিতে বলিতেছি।

(সকলে দাঁড়াইয়া বার বার বন্দেমাতরম্ বলিলেন)

প্রস্থানের পূর্বে আপনারা পুনর্বার স্বদেশি প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন, সাধ্যমত বিদেশি দ্রব্যের বর্জন, স্বদেশি দ্রব্যের ব্যবহার ও প্রচারে ব্রতী থাকিবেন এই মহতী প্রতিজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করুন, মানবের সম্মুখে জগদীশ্বরের সম্মুখে এই গভীর সংকল্প দেদীপ্যমান রাখুন, ইহাই আমার বক্তব্য।

(চারিদিকে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারিত হইতে লাগিল। বক্তা আসন গ্রহণ করিলে আবার জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।)

উপহার প্রদান

সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা শেষ করিয়া লাঞ্ছিত মহোদয়গণকে একে একে আহ্বানপূর্বক পদক, বন্দেমাতরম পরিদোলক বা লকেট, বন্ধনী ব্রুচ এবং প্রশংসাসূচক রুমাল প্রদান করিলেন। পদকগুলি রৌপ্য নির্মিত ; পদকে এবং প্রশংসা পত্রে লাঞ্ছিতদিগের নাম লিখিত ছিল। সুরেন্দ্রবাবু নাম ধরিয়া একে একে সকলকে আহ্বানপূর্বক পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করিলেন এবং অবশেষে গাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া তাঁহাদিগকে পদকাদি ও প্রশংসাসূচক রুমাল উপহার দিলেন।

যাহারা পদক, লকেট প্রভৃতি উপহার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অনেকেই সভায় উপস্থিত থাকিয়া সুরেন্দ্রবাবুর নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়াছিলেন। যাহারা সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, তাঁহাদিগের নিমিত্ত প্রস্তুত পদকাদি সুবিধাক্রমে প্রেরিত হইবে এই মীমাংসান্তে তখন তুলিয়া রাখা হইল। প্রথমে সভার অধিবেশনস্থল সম্বন্ধে গোলযোগ ঘটায় সংবাদ আদান প্রদানের অনেক ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। এমন কি শেষে জানা গেল অনেক লাঞ্ছিত ব্যক্তি আদৌ সংবাদ পান নাই সহৃদয় মহাত্মারা ত্রুটি মার্জনা করিবেন।

এই সময়ে "আমার যায় যাবে জীবন চলে, শুধু তোমার কাজে, জগৎ মাঝে, বন্দেমাতরম্ ব'লে", এই সঙ্গীতটি ভাবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় দ্বারা গীত হইয়া শ্রোতৃবর্গকে বিমোহিত ও উত্তেজিত করিয়াছিল। এই সঙ্গীত ও জয়ধ্বনি শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ নিম্নলিখিত মহোদয়গণের ধন্যবাদ করেন।

১। শ্রীযুক্ত মতিলাল রাধাকিষণ, কাষ্ঠ বিক্রেতা। ইনি অসময়ে, প্রার্থনা পত্র প্রাপ্তি মাত্রেই এই রঙ্গমঞ্চে সভা করিবার অনুমতি প্রদান করেন।

২। বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ মল্লিক ১৬৪ নং বারাণসী ঘোষের স্ট্রীট। ইনি স্বহস্তে নির্মিত ৭ খানি কারুকার্য সংবলিত কাষ্ঠফলক "বন্দে মাতরম্" শব্দাঙ্কিত করিয়া সাতজনাকে প্রদান করিবার জন্য সম্পাদকের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাহা ঐ সভায় প্রদত্ত হইয়াছে।

৩। এইচ. বসু, ইনি কুন্তলীন প্রেসের স্বত্বাধিকারী। প্রদত্ত রুমাল ছাপিবার জন্য অভ্যর্থনা সমিতির নিকট হইতে এক কপর্দকও গ্রহণ করেন নাই।

৪। ভবানীপুরের বাবু প্রভাসচন্দ্র দাস। ইনি বিপিনবাবু ইন্দ্রবাবু এবং যতীনবাবুকে উপহার দিবার জন্য তিনটি বন্দেমাতরম্ অঙ্কিত নিকেল নির্মিত সেফটি পিন ও তিনটি পুষ্পগুচ্ছ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫। জোড়াসাকো সেন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। ইনি সমুদয় পুষ্প গুচ্ছ ও মাল্য প্রভৃতি প্রদান করিয়াছিলেন।

অনারেবল বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, বৃষ্টির প্রাবল্যে ও জনতার বাহুল্যে ঐ পত্র কিঞ্চিৎ বিলম্বে মঞ্চোপরি উপস্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং তাহা এই সময়ে পঠিত হইল। পত্রখানি এই—

"My dear Kabyabisarad, I am truly sorry that a too recent bereavement renders it impossible for me to attend to-day's meeting held in honour of the martyrs in the Swadeshi cause. I am in hearty sympathy with the object of the meeting. It is the height of supercilious sanctimoniousness to treat these gentlemen as convicted criminals : neither history nor ethics would justify such an attitude of mind towards men who have dared the terrors of the law for the sake of their convictions. Constitutional authority not unoften represents hidebound superstitions or ignorance ; and those great men who have hallowed the history of the world have suffered for what they believed and preached as the ture principles of religious or national life. Jesus of Nazareth, whom the peoples of Europe profess to worship and adore, was a convict, sentenced by a constitutional authority ; and the regenerator of the French nation, Joan of Arc, was burned at the stake by authority legally exercised. I might name Luther and Galilio. and coming to our own times and to lesser men, the Nonconformist ministers who have suffered imprisonment for disobedience of the Education Act. Our gratitude is due to our friends for proving to the world that the Bengalees of to day can do more than talk – they can suffer for their country - and their truest reward will be not what we can offer them at this meeting, but their example always kept in

sight and borne in mind. May He, who holds in the hollow of his palm the weak and the strong, and judges them equally, grant them years of strenuous work, to the glory of His name and the everlasting good of my unhappy country, is the earnest prayer of.

Yours sincerely,
Bhupendra Nath Bose

এই পত্রের মর্ম

প্রিয় কাব্যবিশারদ—স্বদেশের কল্যাণ কামনায় যাহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন, তাহাদের প্রতি সম্মান প্রকাশের সভায়, অধুনাতন একটি পারিবারিক দুর্ঘটনার জন্য উপস্থিত হইতে পারিলাম না বলিয়া বড়ই দুঃখিত হইয়াছি। অদ্যকার সভার কার্যে আমার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। এই সকল লাঞ্ছিত মহাত্মাগণকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত জ্ঞানে ঘৃণা করা বড়ই নীচতার পরিচায়ক। দেশের মঙ্গলের জন্য যাহারা রাজদণ্ড দেখিয়াও বিচলিত হন নাই, তাহাদিগকে ঘৃণা করা ঐতিহাসিক অথবা দার্শনিক কাহারও দৃষ্টিতে যুক্তিসঙ্গত নহে। রাজপুরুষগণ অনেক সময়ে ভ্রমে পতিত হইয়া প্রকৃত মহাত্মাদিগকে লাঞ্ছিত করেন সত্য, কিন্তু মহাত্মারা কখনও রাজপুরুষগণের ভ্রূকুটি ভঙ্গীতে বিচলিত হন না। যে যিশুখ্রিস্টকে আজ সমগ্র ইউরোপ পূজা করিতেছেন বলিয়া প্রকাশ, সেই খ্রিস্টও বিধিসঙ্গত বিচারালয়ে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ; ফ্রান্সের উদ্ধারকর্ত্রী জোয়ান অফ আর্ককে রাজপুরুষগণ রাজ বিধানের দোহাই দিয়া দগ্ধ করিয়াছিল ; মার্টিন লুথার, গ্যালিলিও এবং আমাদের সমকালে বহু সংখ্যক নন্‌কনফার্মিস্ট মন্ত্রী কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন। যে সকল মহাত্মা সমগ্র পৃথিবীর নিকট সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, বাঙালি কেবল বাক্যবীর নহেন, কর্মবীর, তাহারাও দেশের কল্যাণের জন্য সকল প্রকার উৎপীড়ন সহ্য করিতে পারেন, সেই সকল মহাত্মা বাস্তবিকই আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র। অদ্যকার সভাতে আমরা যাহা উপহার দিতেছি, তাহাই তাহাদের চরম পুরস্কার নহে ; দেশের সকলেই যে তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিবে, ইহাই তাহাদের প্রকৃত পুরস্কার। যিনি দুর্বল ও বলবান্‌কে সমদৃষ্টিতে দেখিয়া সমান বিচার করেন, সেই সর্বনিয়ন্তা ভগবান্ এই সকল মহাত্মাদিগকে দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য—চিরদুঃখিনী বঙ্গভূমির দুঃখ মোচন করিবার জন্য, সুদীর্ঘ আয়ুঃ প্রদান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।

নিবেদক
শ্রীভূপেন্দ্রনাথ বসু

অনন্তর "দণ্ড দিতে চণ্ডমুণ্ডে এস চণ্ডি যুগান্তরে, পাষণ্ড প্রচণ্ড বলে অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করে," এই আগমনী সঙ্গীত গীত হইল। তৎপরে বানারীপড়ার (বরিশাল) শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন গুহ ঠাকুরতা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই অশীতপর বৃদ্ধের প্রত্যেক কথায় লোকের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট, জানকীনাথ দত্ত নামক যে বালকটিকে বেত্রদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, সেই বালকের পিতা বাবু বসন্তকুমার দত্ত পুত্রের মুখপাত্র স্বরূপ সভার অনুষ্ঠাতৃবর্গের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

অনন্তর হবিবপুরের লাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের অন্যতম বাবু বিপিনচন্দ্র গুহ সভার কর্তৃপক্ষের ধন্যবাদ করিয়া সভাপতির হস্তে নয় আনা পয়সা দিয়া বলিলেন যে, তিনি এবং তাহার সহযোগীরা যখন কারামুক্ত হয়েন, তখন কারাধ্যক্ষ তাহাদের পাথেয় স্বরূপ এই নয় আনা পয়সা প্রদান করিয়াছিলেন। এই পয়সা ন্যাশন্যাল ডিফেন্সফাণ্ডে প্রেরণ করিবার জন্য বিপিন বাবু সভাপতিকে অনুরোধ করিলেন।

ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে বাবু জ্ঞানচন্দ্র রায় বি. এল. সভার অনুষ্ঠাতাদিগের ধন্যবাদ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন যে, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় দেশের কল্যাণ কামনায় যে প্রকার অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াছিলেন নিজের শারীরিক সুখ দুঃখের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া যে প্রকার দেশে দেশে স্বদেশি আন্দোলনের জন্য ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন, তাহাতে তিনি সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন। তাহার উপর প্রভূত অর্থব্যয়পূর্বক তিনি লাঞ্ছিতদিগের উপহার প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া বঙ্গবাসী মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আর, মাননীয় সুরেন্দ্রবাবুর বিষয় কিছু বলাই নিষ্প্রয়োজন। সুরেন্দ্রবাবুর দেশহিতৈষিতা, তাঁহার সাহস, তাঁহার অদম্য উৎসাহ কেবল বঙ্গদেশে নহে, সমগ্র ভারতে অতুলনীয়। সুরেন্দ্রবাবুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে পারিলে সকলেই আপনার জীবন সার্থক বলিয়া মনে করেন। প্রবীণ স্বদেশহিতৈষী, সুবিজ্ঞ, পণ্ডিতপ্রবর নরেন্দ্রনাথ সেন যে ইণ্ডিয়ান মিরারের গুরুতর সম্পাদকীয় ভার গ্রহণ করিয়াও দেশের কার্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ইহা বঙ্গবাসী মাত্রেরই গৌরবের কথা। নরেন্দ্রবাবু এই সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া লাঞ্ছিত দেশভক্তগণের গৌরব শতগুণ বর্ধিত করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু ও নরেন্দ্রবাবুর ধন্যবাদ উপযুক্ত ভাবে করা আমার সাধ্যাতীত।

তবে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের বিষয়ে আমি আরও কয়েকটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারি না। তাহার মত ব্যক্তি এরূপ শ্রম স্বীকার ও অকাতরে অর্থব্যয় না করিলে অদ্যকার এই অলৌকিক দৃশ্য নয়নগোচর হইত না। এ প্রস্তাব তাহার, এ উদ্‌যোগ তাহার, ব্যয় ভারও তাহার ; তিনি বিঘ্নে নিরস্ত হন নাই, সুতরাং এ উদ্যোগ যে কার্যে পরিণত হইয়াছে সেজন্য তিনি স্বদেশবাসীর অজস্র ধন্যবাদের পাত্র। অধিক কি বলিব, তাহার গুণগ্রাহিতায় আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।

জ্ঞানচন্দ্র বাবুর বক্তৃতা শেষ হইলে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বলিলেন যে, ১৬ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার অপরাহ্নে কলিকাতার মুসলমানগণ লাঞ্ছিত ব্যক্তিদিগের প্রতি সম্মান প্রকাশ করিবার জন্য এলবার্ট হলে একটি সভা করিবেন। অনন্তর ডাক্তার গফুর ওজস্বিনী ভাষায় একটি অনতিদীর্ঘ বক্তৃতা করিলে সভাপতির ধন্যবাদপূর্বক সভা ভঙ্গ করা হইল। সভাভঙ্গের পূর্বে স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় আর একটি সঙ্গীত গান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় সভা

উল্লিখিত সভা ভঙ্গকালে প্রবলবেগে বারি বর্ষণ হইতেছিল বলিয়া অন্যূন তিন সহস্র শ্রোতা গ্রাণ্ড থিয়েটার পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তখন সর্বসম্মতিক্রমে তথায় একটি স্বদেশি সভার অধিবেশন হইল। এই সভায় শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল, পণ্ডিত গীষ্পতি কাব্যতীর্থ,ডাক্তার আবদুল গফুর প্রভৃতি অনেকে স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় এই সভাতেও জাতীয় সঙ্গীত গান করিয়াছিল।

মুসলমান সমাজের সম্মান প্রকাশ

৪ ফাল্গুন শুক্রবার লাঞ্ছিত স্বদেশভক্তদিগের অভ্যর্থনা করিবার জন্য মুসলমান সমাজের কয়েকজন নেতা এলবার্ট হলে একটি সভার অধিবেশন করিয়াছিলেন। ঐ দিন আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়াছিল এবং ক্রমাগত বৃষ্টিপাত হইতেছিল। এরূপ দুর্যোগ সত্ত্বেও সভার কার্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছিল, সভায় অনুষ্ঠানকারীরা লাঞ্ছিতদিগের প্রতি যথোচিত আদর ও সম্মান প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং আতর পুষ্পমাল্য ও পুষ্পগুচ্ছ প্রদানপূর্বক তাঁহাদিগের প্রীতি বর্ধন করিয়াছিলেন। মৌলবি লিয়াকৎ হোসেন, মুন্সী দেদারবক্স এবং ডাক্তার আবদুল গফুর প্রভৃতি এই স্বদেশ-সেবকদিগকে

প্রীতিপূর্ণ-হৃদয়ে আলিঙ্গন করেন। দুর্যোগবশত সেদিন লাঞ্ছিতদিগের সকলে সভাস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। লাঞ্ছিতদিগের মধ্যে বাবু ধীরেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সিংহ, বাবু ভূতনাথ ভট্টাচার্য ও বাবু নগেন্দ্রনাথ গুহ রায় এই কয়েক ব্যক্তি সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

সিটি কলেজের সঙ্গীত শিক্ষক বাবু হেমচন্দ্র সেন দ্বারা কতিপয় জাতীয় সঙ্গীত গীত হইবার পর সভার কার্য আরব্ধ হয়। মুন্সী দেদার বক্স মহোদয়ের প্রস্তাব এবং সমবেত জনগণের সম্মতিক্রমে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয়ের অনুরোধক্রমে মুন্সী দেদার বক্স বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন, হিন্দু ও মুসলমান এই উভয় সম্প্রদায় দীর্ঘকাল সম্প্রীতি সহকারে এদেশে বাস করিতেছেন। মুসলমান নরপতিদিগের শাসনকালে ভারতবর্ষ বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক প্রীতি ও সৌহার্দ্য ছিল। এখনও মুসলমানদিগের প্রতি হিন্দুদিগের প্রীতি ও সহৃদয়তা অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। একবার বক্তা রেলগাড়িতে দারুণ বেদনা রোগে আক্রান্ত হইলে উপেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় নামক একজন হিন্দু যুবক শুশ্রূষা করিয়া তাহার প্রাণ রক্ষা করেন। দেশের কল্যাণ সাধন করিতে গিয়া যাঁহারা লাঞ্ছিত হইয়াছেন, এবং স্বদেশবাসীর নিকট সম্মান-সূচক পদক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে একজনও মুসলমান নহেন,—ইহাই গভীর পরিতাপের বিষয়।

অতঃপর ডাক্তার আবদুল গফুর বক্তৃতা করেন, তিনি মুসলমান যুবকদিগকে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বদেশের মঙ্গল সাধন বিষয়ে লাঞ্ছিত স্বদেশভক্তদিগের পদাঙ্কানুসরণ করিতে বলেন এবং মুক্তকণ্ঠে লাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গের ধন্যবাদ করেন।

গফুর মহোদয়ের বক্তৃতা শেষ হইলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় বলেন যে, —স্বদেশের কার্যে মুসলমান সম্প্রদায়ও নিশ্চেষ্ট নহেন। তাহারাও স্বদেশি শিল্পের উন্নতি ও প্রচলনকল্পে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন। মুসলমানেরা যে কর্তৃপক্ষের হস্তে অধিক পরিমাণে নিগৃহীত হন নাই, তাহার কারণ মুসলমানদিগের স্বদেশ-সেবার অভাব নহে। কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত কূটনীতির ফলেই এইরূপ ঘটিয়াছে। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত করিবার জন্য তাঁহারা ঐরূপ ভেদনীতির অনুসরণ করিতেছেন। হিন্দু-মুসলমানে চিরদিনই সদ্ভাব আছে, মুসলমান সম্রাটদিগের শাসনকালে হিন্দু মুসলমান সুখস্বাচ্ছন্দ্যে এবং সুহৃদভাবে কালযাপন করিয়াছেন। কিন্তু মুসলমানের সহিত হিন্দুর মিলন ও সম্প্রীতি কর্তৃপক্ষের শাসননীতির প্রতিকূল। এইজন্য তাহারা উভয় জাতির মধ্যে বিবাদ ঘটাইবার চেষ্টা করিতেছেন। তবে গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে যতই চেষ্টা করুন না কেন, পরিণামে তাহাদিগের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ বিফল হইবে। যে সকল নাম সভা মধ্যে সে দিন প্রকাশিত হয় নাই, তন্মধ্যে যে একজনও নিগৃহীত মুসলমান ছিলেন না, একথা কে বলিতে পারে? নানা কারণে এ অবস্থায় সকলের নাম প্রকাশিত হয় নাই। যাহা হউক, এ স্থলে সে বিষয়ে অধিক আন্দোলন করা অনাবশ্যক।

অতঃপর বাবু লালবিহারী সাহা খ্রিস্টান সমাজের পক্ষ হইতে সভার কার্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। ইহার পর বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ও সভাপতি মহোদয় প্রভৃতি বক্তৃতা করিলে শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়-চৌধুরী কাব্যতীর্থ সভার উদ্দেশ্য ও কার্যের আলোচনাপূর্বক সভাপতি মহোদয়ের ধন্যবাদ করিলে সভাভঙ্গ হয়।

ভবানীপুরে সভা

জননী জন্মভূমির সেবায় প্রবৃত্ত হইয়া যাহারা কর্তৃপক্ষের নিকটে লাঞ্ছিত হইয়াছেন, সেই সকল মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ১৮ ফেব্রুয়ারি ৬ ফাল্গুন রবিবার কলিকাতা ভবানীপুরের সাউথ সুবারবন স্কুলে সর্বশ্রেণির হিন্দু মুসলমান সমবেত হইয়া একটি সভা করেন।

সে সময় অবিরাম বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তথাপি সেই দুর্যোগেও সভায় যোগদান করিতে কেহই পশ্চাৎপদ হন নাই। বাবু চারুচন্দ্র ঘোষ বি-এল্, মহাশয়ের প্রস্তাব এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম্-এ, মহাশয়ের সমর্থনে কলিকাতা হাইকোর্টের সরকারি উকিল শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাপতি মহাশয় প্রথমে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিলে ভবানীপুরের স্বদেশসেবক সমিতি কতিপয় স্বদেশ সঙ্গীত গাইয়া সমাগত জনসমূহকে সম্মোহিত করেন। মুন্সী দেদার বক্স, মৌলবী আবুল হোসেন, পণ্ডিত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি রায় চৌধুরী কাব্যতীর্থ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বক্তৃগণ সভায় বক্তৃতা করেন। অতঃপর সভাপতি মহাশয় স্বদেশের হিতসাধন বিষয়ে বক্তৃতা করেন গ্রাণ্ড থিয়েটারের সভায় ভট্টপল্লীর শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই সভায় তিনি উপস্থিত হন এবং তাহার স্বদেশ হিতৈষণার জন্য তাহাকে পদক ও প্রশংসাপত্র প্রদত্ত হয়। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাহাকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ মল্লিক বি. এল. মহাশয়ের প্রস্তাব ও ডাক্তার কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম্. বি. মহাশয়ের অনুমোদন ক্রমে সভাপতির ধন্যবাদ করা হইলে সভাভঙ্গ হয়।

ভবানীপুরের স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় দ্বারা যে সকল গান গীত হইয়াছিল এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দুই একটি ক্ষুদ্র সভায় মনোমোহন বাবু নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কাব্য বিশারদের যে কয়েকটি গান গাওয়া হয় সে সমস্ত গানই "স্বদেশ সঙ্গীত" নামক পুস্তকে আছে। সুতরাং তাহার পুনঃ প্রকাশ আবশ্যক বোধ হইল না।

অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি

ছাত্রদলনার্থ কার্লাইল সাহেবের যে আদেশপত্র প্রচারিত হইয়াছিল এবং যাহার বলে রাজনীতিক আলোচনার্থ কোন সভায় ছাত্রেরা যোগদান করিতে পারিবে না ইহা স্থির হইয়া গিয়াছিল সেই আদেশ পত্রের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। রঙ্পুরে যে সকল ছাত্রের অনর্থক অর্থদণ্ড হইয়াছিল তাহাদিগের শিক্ষা বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। সদস্য ছাত্ররা দলবদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করেন যে দেশের মঙ্গলকর কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিবার জন্য যদি আবশ্যক বোধ হয়, তাহা হইলে বরং বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগ করিব তথাপি স্বদেশ সেবা পরিত্যাগ করিব না।

এই সভার উদ্দেশ্যের বিস্তার ও প্রসার বৃদ্ধি হইয়াছিল তজ্জন্য ইহার নামকরণ পরিবর্তন সঙ্ঘটন বাঞ্ছনীয় হয় নাই। বঙ্গদেশে যেখান হইতে ছাত্রদিগের প্রতি অত্যাচার বিষয়ক সংবাদ আসিয়াছে সেইখানেই এই সমিতি নেতাদিগের পরামর্শানুসারে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রেরা পর্যন্ত গৃহে গৃহে বস্ত্রাদি বহন করিয়া বিনালাভে সরবরাহ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন।

সমিতির কার্য নিম্নলিখিত বিভাগ অনুসারে চলিয়াছিল :

১। বিদ্যালয় বিভাগ—যে সকল ছাত্র স্বদেশানুরাগের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন বা নিগৃহীত হইয়াছিলেন তাহাদিগের শিক্ষার্থ এই বিভাগে কার্য হইত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরা অধ্যাপনা করিতেন।

২। সঙ্গীত বিভাগ—এই বিভাগ হইতে পথে পথে সঙ্কীর্তন প্রচার প্রভৃতি কার্য হইত।

৩। অনুসন্ধান বিভাগ—কেহ বিলাতি জিনিস ক্রয় করে কি না, এবং করিলে অনুরোধ, অনুনয়, যুক্তি বা তর্কের সাহায্যে তাহাকে ফিরান যায় কি না তদ্বিষয়ে এই বিভাগ ব্যাপৃত থাকিতেন। বিলাতি দ্রব্যাদি বিক্রেতার পণ্যাদি প্রত্যর্পর বা বিনষ্ট করিবার জন্য সকল সময়ে সচেষ্ট থাকিতেন।

৪। বিক্রয় বিভাগ—বিনা লাভে গৃহে গৃহে স্বদেশীয় বস্ত্রাদি সরবরাহ করা, ও সমিতির কার্যালয়ে

বিক্রয় করা এই বিভাগের কার্য। ইহার কার্যকলাপ চারিদিকে সুফল উৎপন্ন করিয়াছিল। অধিক লাভের আশায় ও লোভে পড়িয়া যে সকল দোকানদার দর চড়াইয়া বিক্রয় করিত এই বিভাগের কার্যে তাহাদিগের দমন হইয়াছিল। ইচ্ছা করিলেই ক্রেতারা এই বিভাগের কল্যাণে দেশীয় দ্রব্যাদি উচিত মূল্যে পাইতেন।

৫। প্রচার বিভাগ—এই বিভাগ হইতে প্রচারকেরা চারি দিকে স্বদেশের মঙ্গলকর রাজনীতিক প্রচার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অনেক সুবক্তা উন্নতচরিত্র যুবক এই বিভাগে পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

আমরা অতি সংক্ষেপে এই অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির কার্য প্রণালী বিবৃত করিলাম। এই সভার ভিন্ন ভিন্ন বিভাগের শাখা সমিতি চারি দিকে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমাদিগের কার্য কিরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত নির্বাহিত হইতে পারে তাহা চিন্তাশীল ও কার্যক্ষম ব্যক্তি মাত্রেই সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

যুবকেরা যে অধ্যবসায় সহকারে দেশের কার্য করিয়াছিলেন, তাহা অনেক বয়োবৃদ্ধেরও অনুকরণীয় ইহা বলাই বাহুল্য। দুঃখের বিষয় সকলের প্রতিকৃতি সংগ্রহ করিয়া এই পস্তকে সন্নিবিষ্ট করিতে পারিলাম না।

স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায়

এই সমিতির সদস্যগণ দেশহিতকর সঙ্গীতে যে যে স্থানে ভাবের উদ্দীপনা করিতেছিলেন, তাহার ফলে স্বদেশজাত বস্তুর প্রচার ও স্বদেশানুরাগের বৃদ্ধি পরিলক্ষিত হইতেছিল। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে বহু বক্তৃতাতেও যে ভাবের বিকাশ ঘটে নাই, ইহাদিগের একটি গানে তদপেক্ষা অল্পায়াসে সেই সকল ভাবোদ্রক হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের ব্যয়ভার শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বহন করিয়াছিলেন।

সম্মানিত লাঞ্ছিতদিগের তালিকা

বরিশাল—হাবিবপুর

অক্টোবর মাসে অন্যান্য কতিপয় ভদ্রলোকের সহিত (১) শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী গুহ, (২) শ্রীযুক্ত ললিতমোহন গুহ ও (৩) শ্রীযুক্ত ইন্দ্রচন্দ্র গুহ এই তিনজনের নামে, বরিশাল হবিবপুরে বিলাতি লবণ নষ্ট করা অপরাধে অভিযোগ উপস্থিত হয়। যাহার লবণ নষ্ট করা হইয়াছিল শুনা যাইতেছে তাহাকে মামলা মিটাইতে দেওয়া হয় নাই। যাহা হউক, বিচারে এই তিন জনের এক মাস করিয়া সপরিশ্রম কারাবাসের অনুমতি হইয়াছিল। আপীলে ফল হয় নাই।

ইহাদিগের সম্মানের নিদর্শন স্বরূপে রজত পদকাদি প্রদত্ত হইয়াছে। অভিযোগের বিস্তারিত বিবরণ যথাসময়ে প্রকাশিত হইয়াছে। পৌষ মাসে দণ্ডাজ্ঞা হয়।

ভোলা

পৌষ বা ডিসেম্বর মাসে (৪) উকিল বাবু নবীনচন্দ্র দাস ও (৫) বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় একজন বিলাতি লবণ ব্যবসায়ীকে ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন এই মর্মে অভিযোগ হয়। উকিল দ্বয়ের এক মাস করিয়া সশ্রম কারারোধ ও যথাক্রমে চারিশত ও এক সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড হয়। আপিলে কারাদণ্ড রহিত হইয়াছিল, কিন্তু অর্থদণ্ডের লাঘব হয় নাই। ইহাদের উভয়কেই রজতপদকাদি অনুরাগ নিদর্শন প্রদান করা হইল। গত নভেম্বরে (৬) উকিল বাবু শ্যামাচরণ দত্ত গুরখাদিগের বিরুদ্ধে মামলা লইয়াছিলেন—এই অপরাধে তাহাকে পাপিষ্ঠেরা গুরুতরভাবে আহত করে। কোন আসামী দণ্ড পায় নাই। শ্যামাচরণ বাবু রাজদ্বারে লাঞ্ছিত না হইলেও গুরখাদিগের হস্তে যে লাঞ্ছনাভোগ

করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে উল্লেখের যোগ্য। তিনি যে প্রাণে রক্ষা পাইয়াছেন ইহাই পরম মঙ্গল। তাহাকে অনুরাগের নিদর্শন রজতপদক প্রদান করা হয়। ডাক্তার নিশিকান্ত বসুকেও গুরখারা প্রহার করে।

নলছিটি—বরিশাল

ফেব্রুয়ারি মাসে, ইয়াকুব আলি ও মমাজ আলি নামক দুইজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী বিলাতি লবণ বিক্রয়ে বাধা দেওয়া অপরাধে ভাস সাহেবের বিচারে এক মাসকাল কঠোর পরিশ্রমসহ কারাবাস করিবার জন্য আদিষ্ট হন। ইহাদিগের দুইজনেরই নিমিত্ত অনুরাগনিদর্শন রজত পদক প্রেরিত হইয়াছে।

এতদ্ভিন্ন শ্রীযুক্ত সাধু ও শ্রীযুক্ত সিধু এই লবণের মামলায় আসামী হন। বিচারে ইহাদিগের প্রত্যেকের পঞ্চাশ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হয়। জরিমানার টাকা দিতে না পারিলে উভয়ের চতুর্দশ দিবসের কঠোর শ্রীঘরবাস নির্ধারিত ছিল। উভয়েই এই অর্থদণ্ড প্রদানে অসমর্থ হওয়ায় কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে স্থানীয় হিন্দু ভদ্রলোকেরা এ ব্যাপার অবগত হইয়া জরিমানার টাকা তুলিয়া দেন, তখন এই দুইজনের মুক্তি লাভ ঘটে। এই দুইজনকে "বন্দেমাতরম্" অঙ্কিত রজত দোলক বা লকেট অনুরাগ নিদর্শন স্বরূপ প্রদান করা হইল।

বরিশাল আমাদিগের আন্দোলনে তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ ও সর্বাগ্রগণ্য হইয়াছে। সুতরাং আমরা বরিশালের লাঞ্ছিত স্বদেশানুরাগীদিগের নাম করিয়া শেষ করিতে পারি না। যে কয়েকজন মহাপুরুষ কার্যক্ষেত্রে আমাদিগের স্মৃতিগোচর হইয়াছিলেন তাহাদিগেরই নাম উল্লিখিত হইল।

ঢাকা

ঢাকা, নরসিংদি গ্রামে, দেশহিতৈষী মহাত্মা ললিত বাবুর হাটে দুইজন মুসলমান গত ৮ ডিসেম্বর বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে যায় ইহাতে বাধা দেওয়ায় জমিদারের দেওয়ান (৭) বাবু রাজকুমার চক্রবর্তী ও তাহার পদাতিক (৮) লালু বাদ্যকর অভিযুক্ত হন। নিম্ন আদালতের বিচারে যে কোন বিক্রেতা হাটে যাহা ইচ্ছা বিক্রয় করিতে পারিত, সেইজন্য বিক্রয়ে বাধা প্রদান এবং অবৈধ জনতা ও গুরুতর আঘাত দ্বারা আসামীরা কঠোর অপরাধ করিয়াছে সুতরাং রাজকুমারবাবুর তিন শত টাকা অর্থদণ্ড এবং তিন মাস কঠোর কারাবাসের আজ্ঞা হয়। লালু বাদ্যকরের এক শত টাকা জরিমানা ও দেড়মাস সপরিশ্রম অবরোধের আদেশ হইয়াছিল।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি আপিল আদালত স্থির করিয়াছেন যে হাটের অধিকারী যাহা ইচ্ছা বিক্রয়ে বাধা দিতে বা নিষেধ করিতে পারেন তবে সে জন্য তাঁহার কর্মচারীরা অবৈধজনতা ঘটাইতে বা কাহাকেও প্রহার করিতে পারে না। এই নিমিত্ত অবশিষ্ট কারাবাস রহিত করিয়া দেওয়া হইল। যে কয়দিন খাটা হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হইয়াছে। অর্থদণ্ড প্রভৃতিতে হস্তক্ষেপ করা হইল না। সম্মান নিদর্শন স্বরূপ রাজকুমার বাবুকে রজত পদক ও সেখ লালু বাদ্যকরকে রৌপ্য লকেট প্রদান করা হইয়াছে। ঢাকা প্রকাশ্য সভায় শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সভাপতিত্বে সুরেন্দ্রবাবু স্বয়ং এই সম্মান নিদর্শন প্রদান করেন।

ফরিদপুর—মাদারিপুর

শ্রীমান অনন্তমোহন দাস নামক একটি ছাত্র ক্যাটেল সাহেবের নামে প্রহারের অভিযোগ উপস্থিত করে। ক্যাটেল সাহেব ও অনন্তমোহনের নামে এবং কালীনাথ, নেপালচন্দ্র, সুধন্য,

ভুইমালি, ভুবনমোহন গুহ এবং বসন্তকুমার গুহ নামক কতিপয় বালক ও যুবকের বিরুদ্ধে লোষ্ট্র ক্ষেপের অভিযোগ করেন। বিচারে ক্যাটেল সাহেব অবশ্যই নিষ্কৃতি পাইয়াছে। অনন্তমোহন ছয় সপ্তাহের জন্য শ্রীঘরে প্রেরিত হন। আপিলে ফলোদয় হয় নাই। সম্মান নিদর্শন রজতপদক অনন্তমোহনের নিকট প্রেরিত হইল।

মাদারিপুরের আদর্শ শিক্ষক বাবু কালীপ্রসন্ন দাস অনন্য সাধারণ সৎসাহস ও সুদৃষ্টান্তে ঐ স্থানে স্বদেশি আন্দোলন অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন তাহারই ফলে তিনি কর্ম্মচ্যুত পর্যন্ত হন। তাহার প্রতি বঙ্গদেশের অধিবাসী প্রত্যেকেরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ রজত নির্মিত "বন্দেমাতরম্' ব্রুচ বা বন্ধনী তাহার নিকট প্রেরিত হইল।

মাদারিপুরের ছাত্রগণের মোকদ্দমার পরিণাম ও বিবরণ সংবাদপত্রে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে—"অনন্তমোহন দাস গত অক্টোবর মাসে মিঃ ক্যাটেল সাহেব কর্তৃক প্রহৃত হয়; তাহাতে তাহার নাসিকায় বিলক্ষণ আঘাত লাগে। সেই জন্য সে মিঃ ক্যাটেলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ আনয়ন করে। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সেই মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন এবং আসামী ক্যাটেল উক্ত আনন্দমোহন ও অপর কয়েকজন ছাত্রের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ উপস্থিত করেন। পুলিশ ৭, ৮, ১০, ১৬ ও ১৭ বৎসর বয়স্ক কতিপয় ছাত্রকে চালান দেয়। মাদারিপুরের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট অনন্তমোহন ব্যতীত আর সকলকেই অব্যাহতি দেন—অনন্তমোহনের প্রতি ছয় সপ্তাহ সশ্রম কারাবাসের আদেশ দেওয়া হয়। অনন্ত ফরিদপুরের সেসন জজের নিকট আপিল করে। জজ সাহেব আপিল ডিস্‌মিস্ করিয়াছেন।" অনন্তের নামে আবার একটি মামলা রুজু হইয়াছিল।

ফরিদপুর—রাজবাড়ি

মোহরমোল্লা রাজবাড়ির বাজারের ইজারাদার। রাজবাড়ি গ্রাম বেণীবাবুদিগের জমিদারির অন্তর্গত। লক্ষ্মীকোলের রাজা সূর্যকুমার গুহের সহিত বহুকাল হইতে তাঁহাদিগের বিবাদ চলিতেছিল। সূর্যকুমারবাবুর পক্ষীয় দুইজন মুসলমান একদিন হাটের সময় বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে যায়। বাজারের যে অংশ লবণ বিক্রয়ের জন্য নির্দিষ্ট আছে, তাহারা সে স্থানে না বসিয়া অন্য স্থানে বসে। অন্যান্য সকলে তাহাতে আপত্তি করে। সেইজন্য উক্ত ইজারাদার তাহাদিগকে নির্দিষ্ট স্থানে যাইতে বাধ্য করিবার জন্য তাহাদিগের তুলাদণ্ড ও বাটখারাগুলি যথাস্থানে লইয়া যায় এবং তাহাদিগের স্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। কিন্তু মুসলমান দুইটি সেই স্থানে না যাইয়া সবডিভিসনাল অফিসার মহাশয়ের নিকট গমন করে এবং মোহরমোল্লার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করে। সবডিভিসনাল অফিসার বাবু প্রসন্নকুমার দাস স্বয়ং এই ঘটনার তদন্ত করে এবং স্বয়ং মোকদ্দমার বিচার করেন। তিনি ভারতীয় দণ্ড-বিধির ৩৫৫ ও ৩৭৯ ধারা অনুসারে মোল্লাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ৫০ টাকা অর্থদণ্ড করেন। ফরিদপুর সেশন জনের নিকট এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছিল।

এই মোকদ্দমা পরে ঘটায় পূর্বতন মহাসভায় উল্লিখিত হইতে পারে নাই। কিন্তু পরিশেষে সভার সম্পাদক ইহাকে স্বতন্ত্র একটি রৌপ্য দোলক বা রূপার লকেট দিয়াছিলেন।

বর্ধমান—মানকর

গত অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহে মানকরের জমিদারবাবু রাজকৃষ্ণ দীক্ষিতের অনুমতিক্রমে তাহার লোক একজন মোদকের বাটিতে গিয়া বিলাতি চিনি ফেলিয়া দিতে বলে। মোদক "আমি দোকানে বিলাতি চিনি রাখিয়া অপরাধ করিয়াছি" এই বলিয়া দোকান হইতে চিনি বাহির করিয়া দেয়। এ ব্যাপারে কোন প্রকার দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয় নাই, কিন্তু পুলিশ মোদককে হস্তগত করিয়া

রাজকৃষ্ণবাবু ও তদীয় কর্মচারীদিগের বিরুদ্ধে, জুলুম, অনধিকার প্রবেশ প্রভৃতি দোষারোপ করে। আদালতে রাজকৃষ্ণ বাবুর একশত টাকা অর্থদণ্ড ও এজলাস ভাঙার সময় পর্যন্ত অবরোধের আদেশ হয়। রাজকৃষ্ণ বাবুকে সম্মান প্রদর্শনার্থ রজত পদকাদি প্রদত্ত হইয়াছিল।

জলপাইগুড়ি

অগ্রহায়ণ মাসে বাবু দুর্গাদাস চক্রবর্তী, চণ্ডীদাস চক্রবর্তী ও আদ্যনাথ মিত্র বিলাতি কাপড় বিক্রয়ে বাধা দেওয়ার জন্য নিগৃহীত হন। দুর্গাদাস বাবুর বিরুদ্ধে ২৫৫ ধারা এবং অপর দুই জনের বিরুদ্ধে ১৭৬ ধারা অনুসারে অভিযোগ হয়। থানায় অবস্থান কালে পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কুইন্টনবারন্ দুর্গাদাস বাবুকে প্রহার পর্যন্ত করিয়াছিলেন এরূপ কথাও উক্ত হইয়াছিল। বিচারে দুর্গাদাস ও আদ্যনাথ বাবু উভয়ের প্রতিই দুই সপ্তাহ করিয়া কঠোর কারাবাসের আদেশ হয়। চণ্ডীদাস অর্থ দণ্ডেই অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। চণ্ডীদাস বাবুকে রৌপ্যদোলক এবং দুর্গাদাস ও আদ্যনাথ বাবুকে রজতপদক প্রদান করিয়া অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছিল। হাইকোর্টের শেষ আপিলে ৮ এপ্রিল স্থির হইয়াছিল দুর্গাদাস বাবুর দোষ দণ্ডবিধি অনুসারে অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

ভট্টপল্লী

শ্রীযুক্ত ভূতনাথ ভট্টাচার্য কলিকাতায় বাসা করিয়া থাকিতেন ও হাওড়ায় চাকরি করিতেন। জাহাজে গঙ্গাপার হইবার সময়ে তাহাকে পরিচ্ছদের জন্য উপযুক্ত স্থানে উঠিতে দেওয়া হয় নাই। এই সময়ে ভূতনাথবাবু "বন্দেমাতরম্" বলায় অনেকে তাহার সহায় হয় এবং অবজ্ঞাকারীরা রীতিমত প্রহৃত হয়। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সি মাজিস্ট্রেটের বিচারে ভূতনাথের প্রতি বার দিন কঠোর কারাবাসের আদেশ হইয়াছিল। হাইকোর্টে আপিলে ফল হয় নাই বরং একজন জজ এ দণ্ড লঘু হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করেন।

পুত্রের কারাদণ্ডের কথা শুনিয়া ভূতনাথের জননী কাঁদিতে কাঁদিতে মণিরামপুরে সুরেন্দ্রবাবুর নিকট গমন করেন। সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন আমি দুই মাসের জন্য জেলে গিয়াছিলাম, আমার মা সে জন্য কাঁদেন নাই। আপনার পুত্র চুরি ডাকাতি, জালিয়াতি করিয়া জেলে যায় নাই, ভাল কার্যের নিমিত্ত গিয়াছে, কয়টা দিন বাদে হাসিতে হাসিতে ফিরিয়া আসিবে। ইহা শুনিয়া শোকাকুলা জননী অশ্রু সংবরণ করিলেন। ভূতনাথবাবুকে রৌপ্য পদক দানে সম্মানিত করা হইল।

গৌরীবেড়

শ্রীমান্ জানকীনাথ দত্ত, কলিকাতার উত্তর পূর্বে পরেশনাথ মন্দিরের সমীপবাসী বাবু বসন্তকুমার দত্তের পুত্র। নভেম্বর মাসে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া চীৎকার করা অপরাধে এই বালককে বেত্রাঘাত করা হয়। কলিকাতার প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এই অদ্ভুত দণ্ডাজ্ঞায় যে সহৃদয়তা প্রকাশ করিয়াছেন তদ্দর্শনে সকলেই বিস্মিত হইয়াছিল। বেত মারা তদ্দণ্ডেই হইয়া গেল, তখন আর আপিলে কি হইবে? জানকীনাথকে সম্মান নিদর্শন রৌপ্যপদক দেওয়া হয়।

পৌষ মাসে শ্রীমান্ সুরথকুমার বসু, শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ সেন ও শ্রীমান্ সুবোধচন্দ্র ঘোষ এই তিন জন যুবক বিদেশি দ্রব্যের বিক্রয়ে বাধা দেওয়া অপরাধে পুলিশ দ্বারা প্রহৃত ও অভিযুক্ত।

শেষোক্ত দুইজন অতি তরুণ বয়স্ক, কলেজের ছাত্র। সুরথ কুমারের একমাস কঠোর কারাবাস ও দেড়শত টাকা জরিমানা, এবং ছাত্র দুইজনের এক শত টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইল।

প্রথম আদালতের বিচারের বিরুদ্ধে চব্বিশ পরগণার জজের নিকট আপিল হয়। জজ সুরথের কারাদণ্ড অক্ষুণ্ণ রাখেন তবে জরিমানার টাকার পরিমাণ দেড়শতের পরিবর্তে একশত স্থির করিয়া দেন। হাইকোর্টের চরম মীমাংসার যে কয়দিন (১৭ দিন) কারাদণ্ড ভোগ হইয়াছে তাহাই যথেষ্ট স্থির হইল। অর্থদণ্ড রহিত হইল, সুরথ বাবুর দোষ সাব্যস্তই রহিল, এক বৎসর মুচলেখার আদেশও পূর্ব্ববৎ বজায় রহিল।

ছাত্রদ্বয়ের আপিল না-মঞ্জুর হইয়াছিল। সুরথবাবুকে সম্মান নিদর্শন রজত পদক প্রদান করা হইয়াছিল, এবং ছাত্রদ্বয়ের নিকট রৌপ্য পরিদোলক লকেট প্রেরিত হইয়াছিল।

নোয়াখালি

নোয়াখালিতে একজন চতুর ব্যক্তি স্বদেশবৎসল সাজিয়া যুবকদিগকে বলে "বন্দেমাতরম্' আমাদিগের ইষ্টমন্ত্র, সুতরাং গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্রের ন্যায় মনে রাখিতে হয়, মুখে আনিতে নাই। নোয়াখালির নবীন জমিদার বাবু নগেন্দ্রনাথ গুহরায় বয়সে বালক হইলেও উত্তর করেন মুমূর্ষুকালে ইষ্টমন্ত্র রাম নাম চীৎকার করিয়া বলিতে হয়। আমরা যে মরণাপন্ন, অতি চীৎকার করিয়া না বলিলে আমাদিগের মর্ম্মস্থলে ইষ্টমন্ত্র প্রবেশ করান সম্ভবপর নহে। শুনা যায় কোর্ট অফ ওয়ার্ডের কর্ত্তারা ইহাকে স্বদেশি আন্দোলন ত্যাগ করিতে বলেন, ইনি স্বীকৃত হন নাই। ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিতে পারেন নাই।

নগেন্দ্রবাবুকে সম্মানের নিদর্শন "বন্দেমাতরম্" রজত-বন্ধনী (বা ব্রুচ) প্রদত্ত হয়।

রাজপথের ধারে মারওয়াড়ি ব্যাপারীরা বিলাতি কাপড় বিক্রয় করে দেখিয়া কতিপয় ছাত্র ও যুবক অগ্রহায়ণ মাসের শেষভাগে দেশীয় কাপড় বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহাতে বিলাতি পণ্যের ব্যবসায়ীরা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পুলিশের সহায়তা প্রার্থনা করে। ম্যাজিস্ট্রেট পথের ধারে ছাত্রদিগের পণ্য বিক্রয় করা রহিত করিয়া দিবার জন্য মিউনিসিপাল চেয়ারম্যান্ বাবু শ্যামাচরণ রায়কে লিখিয়া পাঠান। শ্যামাচরণ বাবু কি বিলাতি কি স্বদেশি কোন প্রকার পণ্য পথের ধারে বিক্রয় করিতে দেওয়া হইবে না এই আদেশ প্রচার করেন। ম্যাজিস্ট্রেট পুঙ্গব ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া শ্যামাচরণ বাবু কেন বিলাতি বিক্রয়ে বাধা দিতেছেন জানিতে চাহেন। শ্যামাচরণ বাবু মারওয়াড়িদিগের ও ছাত্রদিগের বস্ত্রবিক্রয় ব্যাপারে নিয়মের কোন তারতম্য করিতে স্বীকার না করায় ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর তাহাকে নিজ প্রকৃতি সুলভ ভাষায় ভয় প্রদর্শন করেন এবং পদচ্যুত করিতে চাহেন। শ্যামাচরণবাবুও ছাড়িবার পাত্র নহেন, নিজ পদমর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া ম্যাজিস্ট্রেটকে উপযুক্ত উত্তর দান করেন এবং পদচ্যুত করিবার অধিকার ম্যাজিস্ট্রেটের নাই ইহা ক্রুদ্ধ হুজুরকে বুঝাইয়া দেন।

এ দিকে মারওয়াড়িরা বিলাতি কাপড় বেচিতেছে কি না দেখিবার জন্য যুবকেরা পথের ধারে যায়। পুলিশ এই উপলক্ষে তাহাদিগের সহিত বিবাদ বাধাইয়া দাঙ্গা করে। তজ্জন্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রজীবন রায়, মেঘনাথ দাস, হরকিশোর ধর, ধীরেন্দ্রচন্দ্র রায়, সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ এবং একজন মুসলমান ধৃত হন। মুসলমান যুবককে নাম জিজ্ঞাসা করিয়াই ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবশিষ্ট যুবকদিগের নামে দণ্ডবিধির ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮, ১৪৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩৫৩ ধারা অনুসারে অভিযোগ হয়, এবং বহু কষ্টে পাঁচশত টাকা করিয়া জামিন লইয়া তাঁহাদিগকে থানা হইতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এই ঘটনা ২১ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার ঘটে। আরও কয়েকজন ভদ্রলোক ধৃত হন। বাবু

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ নামক যে ভদ্রলোক ধৃত ও একরাত্রি হাজতে আবদ্ধ হন তিনি পাটের আফিসে কার্য করিতেন, ছাত্র নহেন। এতদ্ভিন্ন জজকোর্টের উকিল বাবু দ্বারিকানাথ বসু, ও বাবু ললিতচন্দ্র দে এবং দেবেন্দ্রচন্দ্র আইচ লাঞ্ছনার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী নামক আর একজন ভদ্রলোক অকারণে ধৃত ও লাঞ্ছিত হন।

সে যাহা হউক, গত ২২ ফেব্রুয়ারি বিচারের রায় বাহির হয়। খগেন্দ্র, মেঘনাদ, ধীরেন্দ্র ও সুরেন্দ্র চৌধুরী, প্রত্যেকে পঞ্চদশ দিবসের জন্য সপরিশ্রম কারাবাসের এবং একশত টাকা করিয়া অর্থদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হন। ললিত ও সুরেন্দ্রমোহন প্রত্যেকের একশত টাকা করিয়া জরিমানা হয়।

ময়মনসিংহ এডওয়ার্ড স্কুলের হেড্‌মাস্টার বাবু বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত কিরূপে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হন তাহা অনেকেরই স্মরণ আছে। কিরূপে বিপিনবাবুকে বিরক্ত করা হইয়াছিল, তাহার নামে অভিযোগ, স্কুল ইন্‌স্পেক্টরের পীড়াপীড়ি, বিপিনবাবুকে পদত্যাগ করাইবার প্রয়াস, প্রভৃতি ধারাবাহিকরূপে বিবৃত করিলে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ হইয়া পড়ে। সুতরাং আমরা সে বিষয়ে কোন কথা না বলিয়া বিপিনবাবুর নিজের একটি উক্তি অবিকল উদ্ধৃত করিলাম তাহাতেই প্রত্যেক বিষয়ের এবং বিপিনবাবুর স্বদেশানুরাগের ও সৎসাহসের যথেষ্ট আভাষ পাওয়া যাইবে।

With reference to your memo No. 5442, dated Dacca, the 22nd December 1905, and to your office No. 402, dated the 1st February 1905, I have the honour to state that the District Magistrate of Mymensingh on the strength of D. S. P's report, called upon me for an explanation of my conduct on the 1st December 1905. The Magistrate after receiving my explanation reported against my school to the Commissioner of the Dacca Division, laying a fresh charge upon the school, namely "the conduct of my boys in the Barabazar" As a copy of my explanation NO. 17, dated the 2nd December 1905 has been forwarded to you by the Magistrate, it is needless to repeat my arguments again. With regard to the latter charge, I humbly beg to submit that the statement that the Edward School boys were conspicuous in the Barabazar riot and in the previous picketing is without any basis. It is a patent fact that my boys were not implicated in the riot ; only one boy of my school was arrested by the Police on the day of occurence, not because he took part in the riot but because he simply happened to be there. He had a stall in the bazar and he used to sell country made guernsy frocks in the evening. Eye witnesses say that he was dragged by the Police from the Verandah of a building where he was standing. Whatever that may be, it can hardly be expected that a Head master should keep every boy of his school under control beyond school hours.

বিপিনবাবুর নামে যে মোকদ্দমা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইস্থলে সংবাদপত্র হইতে সঙ্কলিত করা গেল। সে বিবরণ এই—

"এডওয়ার্ড স্কুলের হেড্‌মাস্টার বাবু বিপিনচন্দ্র দাসগুপ্ত বি. এ. পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর বাবু গোপালচন্দ্র মুখার্জির আদেশ অনুসারে স্কুলের ছাত্রগণের উপস্থিতি বহি পুলিশ সাহেবের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত করেন নাই এই অবজ্ঞা প্রকাশ অপরাধে ময়মনসিংহের জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট্ মেঃ গারলিক বিপিনবাবুর প্রতি পাঁচ দিবসের জন্য কারাবাস ও ৬০ টাকা অর্থদণ্ডের আদেশ করেন। গত ১২ চৈত্র সেসন জজের সমীপে বিপিন বাবুর আপীলের শুনানী হইয়াছিল। মিঃ বসু বিপিনবাবুর পক্ষ সমর্থন করেন ও পাবলিক প্রসিকিউটর বাবু শশাঙ্কমোহন ঘোষ গবর্নমেন্ট পক্ষে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষের বক্তৃতা শুনার পর জজ সাহেব রায় প্রকাশ করেন। বিপিনবাবু আপিলে মুক্তিলাভ করেন।"

স্বদেশি আন্দোলনের নিমিত্ত সাহসপূর্ণ প্রত্যুত্তরে দানের জন্য বাবু তারানাথ বলকে অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট ও মিউনিসিপাল কমিশনর কার্য হইতে অপসারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আসাম বঙ্গ লাটের আদেশ এই ;—

NOTIFICATION

The 9th Feb. 1906

No. 820 J.C.Babu Taranath Bal, Magistrate of the 2nd class in the District of Mymensing, is now removed from his office under sec. 26 of the Code of Criminal Procedure, Act V. of 1898.

P.C.LYON
Chief Secretary

Memo No. 821
Dated the 9th Feb. 1906.
Copy forwarded to the Commissioner Dacca for information and favour of communication to the Honorary Magistrate who should be informed that it was passed after consideration of his letter to the District Magistrate dated the 9th December 1906.

By order & c.
P. C. Lyon.
Chief Secretary.

বাবু তারানাথ বলকে রৌপ্য দোলক ও বাবু শ্যামাচরণ রায় এবং বাবু বিপিনচন্দ্র দাশগুপ্ত, এই দুইজন মহাত্মাকে "বন্দেমাতরম্" চিহ্নাঙ্কিত রজতবন্ধনী বা ব্রুচ দেওয়া হইয়াছিল। বাবু খগেন্দ্র জীবন রায়কে রৌপ্য পদক ও অন্যান্য যুবকদিগকে "বন্দেমাতরম" লকেট বা রৌপ্য পরিদোলক প্রেরণ করা হইয়াছিল।

ময়মনসিংহের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যদি বঙ্গের অন্যান্য স্থানে অনুকৃত হয় তাহা হইলে ইহাদিগের লাঞ্ছনাভোগ সার্থক হইয়াছে একথা সকলেই বুঝিবেন। ময়মনসিংহের অন্যতম নেতা পুণ্যশ্লোক বাবু অনাথবন্ধু গুহের উপর বিতরণের ভার অর্পিত হইয়াছিল।

বল্লা—ময়মনসিংহ

আবদুল রসীদ নামক এক ব্যক্তি দ্বারা রাজেন্দ্রলাল সাহা নামক একটি সপ্তদশ বৎসর বয়স্ক বালকের বিরুদ্ধে দাঙ্গা প্রভৃতির দাবিতে দণ্ডবিধির ১৪৭ ও ৩০৯ ধারায় অভিযোগ উপস্থাপিত করা হয়। বিচারালয়ে বালক রাজেন্দ্র বিদেশি কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে চাহে নাই। তাহার দুই সপ্তাহ কঠোর কারাবাস ও ৬০্ টাকা জরিমানা হইয়াছিল! সম্মান প্রদর্শনের দিবসে মোকর্দমা বিচারাধীন ছিল, তথাপি সর্বসম্মতিক্রমে "বন্দেমাতরম্" শব্দাঙ্কিত রজত বন্ধনী বা ব্রুচ তাহাকে প্রদত্ত হয়।

ময়মনসিংহ—টাঙ্গাইল

ডাক্তার শশিধর নিয়োগী পুলিশ দ্বারা গুরুতর ভাবে প্রহৃত হন। তাহাকে রজত পরিদোলক প্রদানে অনুরাগ প্রকাশ করা হইয়াছিল।

বরিশাল—মাধবপাশা

শ্রীযুক্ত বিলাসচন্দ্র কুঞ্জবিহ্ব সেটেলমেন্ট অফিসারকে "বন্দেমাতরং" শব্দে অভিনন্দন করিয়া দণ্ড বিধির ১৫৭ ও ১০৬ ধারা মতে অভিযুক্ত হন। বিচারে তাহার দুই মাসের জন্য কঠোর কারাবাস এবং দেড়শত টাকার মুচলেকা লওয়া হইয়াছিল।

বরিশাল বিভাগের যে সকল মহাত্মা কলিকাতার সভায় উপস্থিত থাকিতে পারে নাই তাহাদিগের প্রতি প্রদর্শিত সম্মানের নিদর্শন আমাদিগের অন্যতম নেতা অশ্বিনীবাবুর নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

হ্যারিসন রোড

কলিকাতা হ্যারিসন রোডে বিদেশি দ্রব্য বর্জন প্রস্তাবের পোষকতা করিবার উদ্যমে পুলিশের সহিত একদল যুবকের দাঙ্গা হয়। বলা বাহুল্য এ প্রসঙ্গে পুলিশ অকারণে অনেক পথিককেও আসামি করিয়াছিল। বাবু যতীন্দ্রনাথ সিংহ নামক একজন কলিকাতা কলেজের ছাত্র এই ব্যাপারে ধৃত ও চারিজন ইংরাজ ও হিন্দুস্থানী কনস্টেবল দ্বারা থানায় নীত হল। তাহাকে পুলিশ যখন নিজের স্থানে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল—এখন তোমার "বন্দেমাতরম্" কোথায়? যুবা অম্লান বদনে বলিলেন, এই বুকের ভিতর "বন্দেমাতরম্" রহিয়াছে।

বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ সিংহ, বীরেন্দ্র নাথ মৈত্র প্রভৃতি এই মোকদ্দমায় আসামি ছিলেন। এ অভিযোগের মীমাংসা অনেকের চেষ্টায় "আপোস" হয়। যতীন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে মেডিকেল কলেজের অনেকেই খড়্গহস্ত হওয়াতে তিনি চিকিৎসা শিক্ষা পরিত্যাগপূর্বক আইন শিক্ষার্থ বিলাত যাত্রা করেন। যাইবার পূর্বে তিনি সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন, তখনও তাহার স্বদেশানুরাগ ও উৎসাহের নিদর্শন যেন বদনমণ্ডলে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছিল। ইহাদিগকে রজত দোলকাদি নিদর্শনে সম্মানিত করা হইয়াছিল।

সর্বশুদ্ধ মেডাল ২১টা লকেট ৫০টা ও ব্রুচ ১০টা প্রস্তুত হইয়াছিল।

বরিশালে প্রাদেশিক সমিতি

বিস্তারিত বিবরণ

স্টিমার পথে

বঙ্গদেশে কেন, সমগ্র বৃটিশ ভারতে এ পর্যন্ত যাহা কখনও ঘটে নাই ঘটিতে পারে বলিয়া কেহ কখনও কল্পনা করিতে পার নাই, গত ১৩১৩ সালের ১ ও ২ বৈশাখ বরিশালে ফুলার লাটের অনুগ্রহে তাহাই ঘটিয়াছে। এই ঘটনায় একদিকে যেমন ইংরাজ শাসনের ন্যায়পরতা সম্বন্ধে জন-সাধারণের চিত্তে ঘোর অবিশ্বাসের সঞ্চার হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ বাঙালির জীবনে নূতন উদ্দীপনার সমাগম হইয়াছে, এক দিকে সভ্যতাভিমানী ইংরাজ শাসনকর্তাদিগের বিচার দেখিয়া যেমন বাঙালির মোহভঙ্গ হইয়াছে, অন্যদিকে সেইরূপ আত্মনির্ভরশীলতাব বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া বাঙালি জাতীয় জীবনে নূতন শক্তি সঞ্চয়ে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। বাঙালির সাহস ও একতার পরিচয়ও এই ঘটনায় যথেষ্ট পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে প্রস্থানের পর বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ প্রভৃতি প্রতিনিধিগণ ও স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বিরাট স্বদেশি সভার অধিবেশন করিয়া স্টিমার যোগে বরিশালে গমন করিতেছিলেন। বরিশালের স্বেচ্ছাসেবকেরা কলিকাতার প্রতিনিধিদিগের প্রত্যুদ্‌গমনের জন্য খুলনা পর্যন্ত আগমন করিয়াছিলেন। তথা হইতে স্টিমারের প্রত্যেক ঘাটেই স্থানীয় অধিবাসিগণের অভ্যর্থনার জন্য বিবিধ বর্ণের পতাকা হস্তে সমবেত হইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহকারে চতুর্দিক কম্পিত করিয়াছিলেন। খুলনার স্টিমার ঘাটে সভাপতি মহাশয়ের যথোচিত সম্বর্ধনা হইয়াছিল।

পূর্ববঙ্গের স্টিমারস্টেশনে বহু প্রহরী বড় বড় লাঠি হস্তে লইয়া "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি নিবারণের জন্য উপস্থিত ছিল। স্টিমার হইতে প্রতিনিধিগণ তীরস্থ ব্যক্তিদিগকে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া অভিবাদন করিলেন। কিন্তু পুলিশের ভয়ে তীরস্থ লোকেরা প্রথমে "বন্দে মাতরম্" বলিয়া তাহাদিগের প্রত্যভিবাদন করিতে পারেন নাই। কিন্তু তাহার পর যখন অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির যুবকদিগের মধ্যে দুই একজন অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "বল ভাই বন্দেমাতরম্, জীবন ধন্য হউক।" এই কথায় বালির বাঁধ ভাঙিয়া গেল, লগুড়ধারী পুলিশ প্রহরীর ভয় ঘুচিল। তীর হইতে সহস্র সহস্র কণ্ঠে চতুর্দিক মুখরিত করিয়া ধ্বনি উঠিল "বন্দেমাতরম্"। অনেক স্থানেই এইরূপ হইয়াছিল, পুলিশ প্রহরীরাও ভয়ে উচ্চবাচ্য করে নাই। মাঠের কৃষকেরা পর্যন্ত লাঙল ছাড়িয়া নদীতীরে সমবেত হইয়া সেই বন্দেমাতরম্ উচ্চারণে যোগদান করিয়াছিল।

সভাপতি মিঃ এ রসুল মহোদয়ের অভ্যর্থনার জন্য প্রত্যেক স্টিমার স্টেশনই স্থানীয় অধিবাসিগণের দ্বারা পত্রপুষ্প কদলীবৃক্ষে ও আম্র পল্লবে সজ্জিত হইয়াছিল।

স্বতন্ত্র পথে

খুলনার পথে এই। নারায়ণগঞ্জের পথে সুরেন্দ্রনাথের স্টিমারে আরও উৎসাহপূর্ণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হইয়াছিল। ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিবর্গ এই জাহাজেই কোন প্রকারে স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। 'বন্দেমাতরম্" ধ্বনির সহিত "সুরেন্দ্রনাথের জয়" "সুরেন্দ্রনাথের জয়" ইত্যাদি ধ্বনি সর্বত্র পরিশ্রুত হইয়াছিল। কুমারীগণ মঙ্গল শঙ্খ নিনাদিত করিয়া তাহার অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। মুসলমানেরাও দলবদ্ধ হইয়া প্রায় প্রত্যেক স্টিমার স্টেশনেই সুরেন্দ্রবাবুর প্রতিনিধিবর্গের অভ্যর্থনার জন্য সাগ্রহে সমবেত হইয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য সকলেরই বিশেষ ব্যগ্রতা প্রকাশ পাইয়াছিল। ইদিলপুর স্টেশনের দৃশ্যই অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। সেখানকার লোকেরা ৫ খানি নৌকা "বন্দে মাতরম্", Long live our Banerjee, আমাদের বাড়ুয্যে দীর্ঘজীবী হউক ইত্যাদি শব্দাঙ্কিত পতাকা নিচয়ে সজ্জিত করিয়া স্টিমারের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং পুষ্পমাল্যে সুরেন্দ্রনাথ ও তাহার সহগামী প্রতিনিধিদিগকে ভূষিত করিয়াছিলেন। নৌকাগুলি স্থানীয় ভদ্র মহোদয়গণে এরূপ পরিপূর্ণ হইয়াছিল যে, নৌকায় তিল ধারণের স্থান ছিল না। নৌকাস্থিত মহোদয়েরা স্টিমারে উঠিয়া "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি শব্দাঙ্কিত পতাকা দিয়া স্টিমারটিকে সজ্জিত করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথের অনেক সহযাত্রী তাহার সম্মানের অংশ পাইয়াছিলেন।

"রাজেন্দ্র সঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে।"

তাহার সঙ্গে অনেকে সেইরূপে সুখে বরিশালে গমন করিয়াছিলেন। কতদূর হইতে কত প্রবীণ অশীতিপর বৃদ্ধ সুরেন্দ্র বাবুকে দেখিতে আসিয়াছিলেন ভাবিলে হৃদয় আনন্দে আপ্লুত হয়। কৃষক

বালিকা হইতে অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পর্যন্ত নদীর তীরে সারি দিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাহাদিগের সকলের নিকটের সুরেন্দ্র বাবুর এক নিবেদন—"আপনারা স্বদেশী বস্তুর প্রচার ও ব্যবহার করুন, বিদেশি দ্রব্যের পরিবর্জন করুন।'

বরিশালে পদার্পণ

শুক্রবার রাত্রি আটটার সময় কলিকাতা, যশোহর, খুলনা, ঢাকা, রংপুর, বগুড়া, প্রভৃতি স্থানের প্রতিনিধিগণকে লইয়া স্টিমার বরিশাল উপস্থিত হইল। স্টিমার ঘাটে লাগিবামাত্র সমাগত প্রতিনিধিগণ উচ্চ কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলেন। তীরে বরিশালের মান্যগণ্য লোকেরা তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য উপস্থিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই প্রতিনিধিগণের জয়ধ্বনির উত্তরে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া প্রতিধ্বনি করিলেন না। তখন প্রতিনিধিগণের মধ্যেই যাঁহারা প্রধান, তাঁহারা পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে বরিশালের রাজপথ প্রতিধ্বনিত করিতে হইবে। বরিশালের নেতৃবর্গ স্টিমারে উঠিয়া সুরেন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, —ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব রাজপথে 'বন্দেমাতরম্' বলিতে নিষেধ করিয়াছেন এবং দলবদ্ধভাবে রাজপথে দিয়া সভাপতি রসুল সাহেবকে লইয়া যাইতেও নিষেধ করিয়াছেন। অতএব সকলে নীরবে স্টিমার হইতে অবতরণ করিয়া ভূকৈলাসের রাজবাটিতে চলুন। সেখানে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি প্রাণ ভরিয়া করা যাইবে, প্রতিনিধিগণের যথোচিত অভ্যর্থনাও সেইখানেই হইবে। অনুরোধ পালনে প্রতিনিধিবর্গের মধ্যে অনেকেই সম্মত হইলেন। কিন্তু অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ বলিলেন "ম্যাজিস্ট্রেটের আইন বিরুদ্ধ আদেশ আমরা মানিতে পারিব না। যদি "বন্দেমাতরম্" বলিতে দেওয়া না হয়, তবে আমরা কনফারেন্সে যোগদান করিব না।" অনেকে অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণের মতের সমর্থন করিলেন।

দ্বিতীয় জাহাজের আগমন

এই সকল প্রতিনিধি ঘাটে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন এমন সময়ে নারায়ণগঞ্জের জাহাজে সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি বরিশালে আসিলেন। জাহাজ হইতে বন্দেমাতরম্ শব্দ উঠিল, তীর হইতেও পূর্ব জাহাজে সমাগত প্রতিনিধিমণ্ডলী সেই পবিত্র শব্দের প্রতিধ্বনিতে তীরভূমি কাঁপাইয়া তুলিলেন। তখন ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রথম জাহাজের যাত্রীরা ইঙ্গিতে তাহাদিগকে থামাইয়া দ্বিতীয় জাহাজে সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করিতে আসিলেন। বরিশালের নেতারা বলিলেন এখন পথিমধ্যে পুলিশের সঙ্গে বিবাদ করিলে আমরা অভ্যর্থনার যে উদ্‌যোগ করিয়াছি যে সকলই পণ্ড হইবে। তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে, অন্তত সেদিনকার মত কোন বিবাদ করা হইবে না। প্রতিনিধিরা তখন রাজা বাহাদুরের হাবেলীতে চন্দ্রাতপ তলে গমন করিলেন। রীতিমত অভ্যর্থনা হইলে যে যার নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন।

স্বেচ্ছাসেবক

ভলান্টিয়ারদিগের সম্বন্ধে দুই একটি কথা না বলিলে আমাদিগের বিবৃতি সম্পূর্ণ হইতে পারে না। সম্ভ্রান্ত বংশসম্ভূত উচ্চপদস্থ ভদ্র সন্তানগণ সামান্য ভৃত্যের ন্যায় অভ্যাগতদিগের পরিচর্যায় কিরূপ আগ্রহ সহকারে রত হইয়াছিলেন, তাহা বলিয়া বুঝানো দুঃসাধ্য। পুলিশ কুলিদিগকে উত্তেজিত করিয়া ভারবহনে অপ্রবৃত্ত করিলে এই মহোদয়গণের গুণে সেজন্য কাহারও কোন কষ্ট হয় নাই। দলে দলে ভদ্র সন্তানেরা মাথায় মোট লইয়া প্রতিনিধিদিগের জন্য নির্দিষ্ট বাসায় উপনীত

হন। এ দৃশ্য যিনি দেখিয়াছেন তিনি কখনই ভুলিতে পারিবেন না। ইহাদিগের শ্রমশীলতা, কষ্টসহিষ্ণুতা, আজ্ঞানুবর্তিতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ সকলেরই অনুকরণীয়।

প্রথম দিবসের ঘটনা

বেলা দুই ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্বে অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিগণ দলবদ্ধ হইয়া রাজবাটি অভিমুখে গমন করিতেছিলেন। তাহাদের সঙ্গে ব্রজমোহন কলেজের অধ্যক্ষ বাবু রজনীকান্ত গুহ, হাওড়া-হিতৈষী সম্পাদক বাবু গীষ্পতি রায়চৌধুরী ও সঞ্জীবনী সম্পাদক বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র ছিলেন। ইহারা রাজবাটীর তোরণের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র পুলিশ সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প সহসা অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির সভ্যদের গতিরোধপূর্বক তাহাদিগের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক লাঠি দ্বারা বাবু ফণিবাবু বন্দ্যোপাধ্যায়ের চিবুকে আঘাত করিলেন।; চিবুক কাটিয়া শোণিতপাত হইতে লাগিল। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র পশ্চাৎদিক্ হইতে দৌড়িয়া আসিলেন এবং কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "আপনি অকারণে ফণিভূষণকে প্রহার করিলেন কেন?" মিঃ কেম্প বলিলেন "আমি ইহাদিগকে দলবদ্ধ হইয়া যাইতে দিব না।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "পাছে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া না গেলে আপনারা বলেন যে রাস্তা বন্ধ করিয়া যাইতেছে, তাই ইহারা সুশৃঙ্খলাভাবে গমন করিতেছিলেন কেন ইহাদিগের গতিরোধ করিলেন? কেনই বা একজনকে প্রহার করিলেন?" মিঃ কেম্প এ প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া বলিলেন "ইহারা প্রতিনিধি নহেন, ইহাদিগকে যাইতে দিব না।" কৃষ্ণবাবু বলিলেন "ইহারা যাইতে পারেন।" অতঃপর ইহাদের সম্মুখ হইতে লালপাগড়ির দল সরিয়া গেল, ইহারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া রাজবাটীতে প্রবেশ করিলেন। নেতৃবর্গের আদেশ ছিল, সে দিন পুলিশের সহিত বিবাদ করিবে না, কাজেই অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিরা রক্তপাত দেখিয়াও নীরবে নিগ্রহ সহ্য করিলেন।

অতঃপর অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ বাটির প্রাঙ্গণে প্রথমে "বন্দেমাতরম" এবং "যায় যাবে জীবন চলে" সঙ্গীত গাইয়া সমবেত জনমণ্ডলীর অপূর্ব উদ্দীপনার সঞ্চার করিতে লাগিলেন।

বেলা আড়াইটার সময় মিঃ রসুল সহধর্মিণীসহ প্রাঙ্গণে উপনীত হইলেন এবং শকটারোহণে মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

প্রহরী দল

পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মিঃ কেম্প সাহেব বহুসংখ্যক কৃষ্ণ পরিচ্ছদ সাধারণ পুলিশ ও খাকি কোর্তাধারী রিজার্ভ পুলিশ লইয়া বেলা একটার সময় রাজবাটির দ্বারদেশে বার দিয়াছিলেন। অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট একটি বালক ফিরিঙ্গী মাত্র। তিনিও অশ্বপৃষ্ঠে তথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন। বহুসংখ্যক বাঙালি ইনস্পেক্টার রাস্তায় ও হাবেলির প্রাঙ্গণে যাতায়াত করিতেছিলেন। তাহারা অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদের উপর রক্তলোলুপ ব্যাঘ্রের ন্যায় সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিল। হাবেলির নিকটে রাস্তার অপর পার্শ্বে ঢাকার নবাব সলিমোল্লার কাছারি। সেই বাটি পুলিশের কেল্লায় পরিণত হইয়াছিল। সেই বাটিতে বহুসংখ্যক পুলিশ বন্দুক লইয়া সমবেত হইয়াছিল।

প্রতিনিধিগণ দেখিলেন, সাধারণ পুলিশ ও রিজার্ভ পুলিশ বড় লাঠি লইয়া রাজপথে অবস্থিতি করিতেছে, নবাবের কাছারিতে বন্দুকধারী পুলিশ সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে রিজার্ভ পুলিশের সুবাদারের হাতে লাঠি ও কটিদেশে তরবারি শোভা পাইতেছে। তথাপি বরিশালের রাজপথে

"বন্দেমাতরম্" বলিবার জন্য তাহারা যে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহা কিছুতেই বিচলিত হইল না। তাহারা ফুলারের বেআইনি সার্‌কুলার অগ্রাহ্য করিয়া রাজপথে "বন্দেমাতরম" বলিবার জন্য বহির্গত হইলেন ; বাবু সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দও বহির্গত হইলেন। তাহাদের কিছু পশ্চাতেই অ্যান্টিসোসাইটির প্রতিনিধি ছিলেন ইহারা ফটক পার হইয়া রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইল। নিমেষ মধ্যে পূর্বগামী ও অনুসরণকারী প্রতিনিধিদিগের শ্রেণি হইতে তাহাদিগকে পৃথক করিয়া বহু "কৃষ্ণবর্ণ কোর্তা ও খাকি কোর্তাধারী" পুলিশ তাহাদিগকে বেষ্টন করিল। মিঃ কেম্প তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "তোমাদের উত্তরীয় (Eadge) পরিত্যাগ কর।" তাহারা "বন্দেমাতরম" অঙ্কিত উত্তরীয় পরিত্যাগ করিতে অস্বীকার করিলেন। তখন কেম্প বলপূর্বক উত্তরীয় কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। তাহারা হস্ত দ্বারা বক্ষোপরিস্থ উত্তরীয় চাপিয়া ধরিলেন। তখন কেম্প স্বয়ং ও তাহার অনুচর পুলিশ তাহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন তাহারা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিয়া অটল অচলের ন্যায় রাজপথে দণ্ডায়মান হইলেন। কেম্প ও পুলিশ বলপূর্বক তাহাদের উত্তরীয় অপহরণ করিতে লাগিল। ইহাদের উপর অবিশ্রান্ত লাঠি বৃষ্টি হইতে লাগিল. তথাপি ইহারা ছত্রভঙ্গ হইলেন না, বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিলেন। পুলিশের লাঠিতে শচীন্দ্রপ্রসাদের বদনমণ্ডল ফাটিয়া রক্তপাত হইল। ফণীন্দ্রনাথের সর্বাঙ্গ লাঠিতে ক্ষত বিক্ষত হইল, বীরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হেম আহত হইল, তথাপি কেহ বন্দেমাতরম্ বলিতে ক্ষ্যান্ত হইল না। অ্যান্টিসার্‌কুলার সোসাইটির প্রত্যেক প্রতিনিধি আহত হইল, তথাপি কেউ ভীত হইল না। শ্রেণি ভাঙ্গিয়া পলায়ন করিল না।

বাবু বিপিনচন্দ্র পাল গোলযোগের প্রারম্ভকালে লোন আফিসের অলিন্দোপরি দ্রুত-পদবিক্ষেপে গমন করিলেন, আর শ্রীযুক্ত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় "আত্মশক্তির" উপর নির্ভর করিয়া "সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশের" আশায় শনৈঃ শনৈঃ প্রাচীর উল্লঙ্ঘনপূর্বক সেই স্থান ত্যাগ করিলেন।

পুলিশের অত্যাচার

বহুসংখ্যক লাঠিধারী পুলিশ শূন্যহস্ত বালকদিগকে ঘিরিয়া যখন প্রহার করিতেছিল, তখন অগ্রগামী বা অনুসরণকারী কোন প্রতিনিধি জানিতে পারেন নাই যে, অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে কেহ এমন করিয়া প্রহার করিতেছে। অনুসরণকারী প্রতিনিধিগণ যখন ফটক পার হইয়া রাজপথে গমন করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন, তখন আর একদল পুলিশ তাহাদের উপর লাঠি চালাইয়া তাহাদিগকে বাটির বাহির হইতে দিল না, পাছে তাহারা অগ্রসর হইয়া অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির প্রতিনিধিদিগকে সাহায্য করেন, সেই জন্য পথরোধ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাদের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। ফটকের সম্মুখে কতকগুলি লণ্ঠন জ্বলিতেছিল, লাঠির আঘাতে সেগুলি ভাঙিয়া গেল। তখন দেখা গেল বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র হাবেলির ভিতর হইতে বহির্গত হইলেন। পুলিশের লাঠি বর্ষণের ভিতর দিয়া রাজপথে আসিলেন। তাহার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকিল বাবু বেচারাম লাহিড়ি যেই ফটক পার হইয়াছেন, অমনি কাল কোর্তাওয়ালা একটা বাঙালি কনস্টেবল তাহাকে প্রহার করিল বেচারাম বাবু তাহা অগ্রহ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। তখন কৃষ্ণবাবু সেই কনস্টেবলটার গলা ধরিয়া আনিয়া মিঃ কেম্পের নিকট উপস্থিত করিলেন। কেম্প বলিলেন, "হাঁ আমি ইহাকে মারিতে দেখিয়াছি। আমি ইহাকে কয়েদ করিলাম।" প্রকাশ পাইল ইহার নাম শশিভূষণ দে।

কাব্যবিশারদের দুর্গতি*

বাবু ললিতমোহন ঘোষালের চীৎকারে ছাত্রদিগের নিগ্রহ হইতেছে শুনিয়া কাব্যবিশারদ একদিকে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি যুবককে তাহাদের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি দান করেন। তাহার উপরে লগুড় চালিত হইয়াছিল; কিন্তু আঘাতের মাত্রা কলিকাতায় ডাক্তারি পরীক্ষার পূর্বে সম্যকরূপে বুঝিতে পারা যায় নাই। একজন হিন্দুস্থানী সুবাদার বলিয়া উঠিল "মারো মাৎ, ব্রাহ্মণ হ্যায়।" তাহাতেই সেযাত্রা তাহার নিষ্কৃতি লাভ ঘটিয়াছে।

আরও অত্যাচার

শ্রীহট্ট সুনামগঞ্জের বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলি ফটক হইতে বাহির হইবামাত্র পুলিসের সুবাদারের হুকুমে প্রহৃত হইয়া ভূতলশায়ী হইলেন। তাহার মস্তক ফাটিয়া গেল, হাত ভাঙিয়া গেল। কৃষ্ণবাবু কিঞ্চিৎ দূর হইতে তাহার এই অবস্থা দেখিয়া অগ্রসর হইলেন এবং সুবাদারকে এক ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলেন। যে সকল পুলিশ প্রহার করিতেছিল, কৃষ্ণবাবুর কথায় তাহারা সরিয়া গেল। তখন কৃষ্ণ বাবু মিঃ কেম্পের নিকট গমন করিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া যেখানে ব্রজেন্দ্রলাল পড়িয়াছিলেন, সেইখানে লইয়া গেলেন। কৃষ্ণবাবু কেম্পকে বলেন, "তোমার পুলিশ গুণ্ডায় ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। তাহাদিগকে এখনই সরিয়া যাইতে বল। নতুবা আজ মহা বিপদ হইবে।" কৃষ্ণবাবু যখন কেম্পকে টানিয়া লইয়া গিয়া ব্রজেন্দ্রলালকে দেখাইলেন, তখন চারিদিকে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইতে লাগিল।

সুরেন্দ্রবাবুর অবরোধ

বাবু ললিতমোহন ঘোষালের গগনভেদী স্বরে অগ্রগামী নেতারা যখন জানিতে পারিলেন যে পশ্চাদ্‌ভাগের শ্রেণিতে যুবকদিগের উপর লাঠি চালাইতেছে, তখন তাহারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিয়া সকলের উৎসাহ বৃদ্ধি পাইল। পুলিশদলেও একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কনস্টেবলগণ লাঠি স্কন্ধে করিয়া রুদ্ধশ্বাসে সেই দিকে দৌড়িয়া গেল। কেম্পও সেই দিকে ধাবিত হইলেন। কিঞ্চিৎকাল পরে কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দি করিয়া ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পশ্চাতে লাঠির আঘাতে প্রতিনিধিদিগের দেহ ক্ষত বিক্ষত করিতেছে, ইহা শুনিতে পাইয়া বাবু সুরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ফিরিয়া আসিতেছিলেন। সম্মুখে কেম্পকে দেখিতে পাইয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "এসব কি হইতেছে? যদি কোন বে-আইনি কাজ করিয়া থাকি. তবে আমাদিকে অবরুদ্ধ করিতে পার, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করার অধিকার তোমাদিগের নাই। যদি ইচ্ছা হয়,আমাকে বন্দী করিতে পার।" কেম্প বলিলেন "আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" সুরেন্দ্র বাবু তখন বলিলেন, "বেশ গ্রেপ্তার কর ক্ষতি নাই, আমার ঘাড়ে সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি। কাহাকেও প্রহার করিও না।" তখন মতিবাবু, ভূপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি পশ্চাদ্দিকে আসিয়া বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" চারিদিক হইতে বহু লোক বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প বলিলেন "আপনাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই। কেম্প সুরেন্দ্রবাবুকে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ি গেলেন। লাকুটিয়ার মনস্বী জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ তাহার সঙ্গে গমন করিলেন। গমনকালে সুরেন্দ্রবাবু অপর সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আপনারা মণ্ডপে গমন করিয়া কার্য নির্বাহ করুন।"

---

* এ অংশ প্রথমে হিতবাদী ও বেঙ্গলীতে অপ্রকাশিত রাখা হইয়াছিল, সুতরাং বাহির হয় নাই। পরে টেলিগ্রাফ, বঙ্গবাসী ও অমৃতবাজার পত্রিকাদিতে প্রকাশের শেষে হিতবাদী প্রভৃতিতেও বাহির হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরি

সুরেন্দ্রনাথের এই অবরোধের অব্যবহিত পূর্বে শ্রীযুক্ত অনারেবল মিঃ জে. চৌধুরি ফটকের সম্মুখে আসিয়া কেম্পকে বলিলেন, "তুমি পুলিশকে শাসনে রাখিতে পারিতেছ না।" কেম্প বলিলেন, "আমার কর্তব্য কর্ম আমি বেশ জানি।" একজন কনস্টেবল আসিয়া মিঃ চৌধুরির মাথায় লাঠি মারিয়াছিল। তাহার মাথায় টুপি না থাকিলে বোধ হয় তাহার মাথা ফাটিয়া যাইত। সে যাহা হউক, এমন সময় হঠাৎ সম্মুখে গভীর "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইল। কেম্প তখন সুরেন্দ্রবাবুকে বন্দি করিয়া ম্যাজিস্ট্রেটের বাটিতে গিয়াছিলেন। সুতরাং আসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অশ্বে কশাঘাত করিয়া দ্রুতবেগে সেই দিকে ছুটিলেন। প্রকাণ্ড লাঠি উত্তোলন করিয়া পুলিশদল সেই দিকে দৌড়িল। তখন পশ্চাদ্দিক হইতে বন্দেমাতরর্ ধ্বনি হইল। ছোট প্রভু ও পুলিশ আবার পশ্চাদ্দিকে দৌড়িয়া আসিলেন। তখন সম্মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শুনিয়া পুলিশ সেই দিকে ধাবিত হইল। পুলিশ এইরূপ একবার সম্মুখে, একবার পশ্চাদ্দিকে, ফুটবলের ন্যায় দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিল। সমস্ত প্রতিনিধি রাস্তায় বহির্গত হইয়া বন্দেমাতরম্ রবে নগর প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ভাণ্ডার পত্রের অধ্যক্ষ বাবু কেদারনাথ দাশগুপ্ত রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন। ছোট সাহেব ঘোড়ার উপর হইতে তাহার পেটে পদাঘাত করিলেন। কেদারবাবু তাহার ঘোড়া ধরিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ছোট বীর দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়া গেলেন। সকলের পশ্চাতে বাবু আনন্দচন্দ্র রায়, বাবু অনাথবন্ধু গুহ ও মিঃ জে. চৌধুরির নির্দিষ্ট স্থানে ছিল। তাহারা সমস্ত প্রতিনিধিদিগকে লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথে একজন যুবক সভাপতির মুদ্রিত বক্তৃতা লইয়া মণ্ডপের দিকে যাইতেছিলেন। ছোট হুজুর মনে করিলেন ঐ বুঝি রাজদ্রোহসূচক পুস্তিকা লইয়া যাইতেছে। তাই সে কয়েকখানি কাগজ কাড়িয়া লইয়া তিনি প্রস্থান করিলেন।

কার্যারম্ভ

সভাপতি মিঃ আবদর রসুল সপত্নীক সভাস্থলে উপস্থিত হইলে অধিবেশন আরম্ভ হইল। এত উত্তেজনা, সুরেন্দ্রনাথের অনুরোধ পুলিশের অত্যাচার প্রভৃতি কিছুতেই সদস্যবর্গের হৃদয় টলিল না। তাহারা কার্যারম্ভ করিলেন। বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সুরেন্দ্র বাবুর সঙ্গে ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়িতে গিয়াছিলেন। সুতরাং সহকারী সম্পাদক বাবু নিবারণচন্দ্র দাস তাহার পরিবর্তে আবাহন বক্তৃতা পাঠ করিলেন। "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল।

ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে

পূর্বেই বলিয়াছি, সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে লাকুটিয়ার উচ্চমনা জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়, সুপ্রসিদ্ধ বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গমন করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব চাপরাসী দিয়া কাব্যবিশারদকে ডাকাইলেন। তাহার সেই অনাবৃত দেহ, শুভ্র উপবীত ও কৌষিক ধুতি চাদর অবশ্যই অসভ্যতা-ব্যঞ্জক বিবেচিত হইল। প্রভু ইমার্সন কেম্প সাহেবকে বলিলেন, "এইরূপ লোকদিগকে মাথায় 'হ্যাট' না দিয়া আমার সম্মুখে আনয়ন পুরঃসর আমার অবজ্ঞা করিবার কি প্রয়োজন ছিল, বুঝিতে পারি না।" বিশারদকে বলিলেন, "Get out"। এরূপ সম্ভাষণ পাইয়া সহাস্য হাস্যে, লগুড় গ্রহণপূর্বক কাব্যবিশারদ মহাশয় গাড়িতে আসিয়া বসিলেন ও কৌতুক দেখিতে লাগিলেন। তৎপরে বাবু অশ্বিনীকুমার দত্তের অভ্যর্থনা হইল। তাহার ধুতি চাদর জামা পরা ছিল, কিন্তু মাথায় হ্যাট বা সাহেবী টুপী ছিল না, সুতরাং তাহারও বহির্দেশে গমনের অনুমতি হইল। শেষে বিহারীবাবুকেও আরক্ত নেত্রে বাহিরে যাইতে বলা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ আবার ডাকা হইল।

সুরেন্দ্রনাথের প্রথম বিচার

বাবু সুরেন্দ্রনাথ চেয়ারে বসিতে যাইতেছিলেন। ইমার্সন সাহেব তাহাতে আপত্তি করিয়া বলিল, "আপনি আসামি বসিতে পারেন না। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাকে কি অপমানিত করিবার জন্য এই স্থলে আনয়ন করা হইয়াছে?" হুজুর কোন উত্তর দিলেন না। আপন মনে কি লিখিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন "আপনাকে দশ হাজার টাকার মুচলেকা দিতে হইবে ও প্রত্যেকে পাঁচ হাজার করিয়া দশ হাজার টাকার দুইজন জামিন দিতে হইবে। অতঃপর এ বিষয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য হইল না। কোথায় বা জামিন, কোথায় বা মুচলেকা কে দিবে আর কে বা গ্রহণ করিবে? এ কথাই আর উঠিল না! এ ব্যাপার এই পর্যন্তই চাপা পড়িল।

ইমার্সন লীলা

তখন কেম্পের এজেহার গৃহীত হইল। ম্যাজিস্ট্রেট সুরেন্দ্রনাথকে বলিলেন, "আপনাদিগের ব্যবহার কি লজ্জাজনক নহে?" তাহাতে সুরেন্দ্রবাবু কহিলেন, "আমি এরূপ ভাষা ব্যবহারের প্রতিবাদ করি।" ম্যাজিস্ট্রেটের মুখে এরূপ ভাষা শোভা পায় না। ম্যাজিস্ট্রেট বলিলেন, "আপনি আদালতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন, সুতরাং আপনাকে অভিযুক্ত করিতেছি।"

সুরেন্দ্রবাবু "তাহা হইলে আপনি ইহার বিচার করিতে পারেন না।"

ম্যাজিস্ট্রেট—"আমি আমার কর্তব্য বেশ বুঝি।" ইস্টার পর্বের ছুটির সময়ে, ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহে আদালতের প্রতি অবজ্ঞা এই ভাবে গড়াইতে লাগিল। কাণ্ড দেখিয়া হুজুরের বন্ধুর আর এক হুজুর সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া ফেলুন"। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি তাহাতে প্রস্তুত নহি।"

ম্যাজিস্ট্রেট—"আমি আপনাকে আর একবার সময় দিতেছি। আপনি আপনার কথার প্রত্যাহার করুন।"

সুরেন্দ্রবাবু—"আমি কোন অন্যায় কথা বলি নাই, সুতরাং কোন কথারই প্রত্যাহার করিব না।"

আদালতের অবজ্ঞার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর দুই শত টাকা জরিমানা হইল।

গ্রেপ্তারের পরিশিষ্ট

তখন সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগকারী কেম্প সাহেবের এজেহার গৃহীত হইতে লাগিল। এই এজেহারের সহিত সরকারি প্রকাশিত এজেহার কিরূপ মিলিয়াছে, তাহা পাঠকবর্গ বুঝিতেই পারিতেছেন। ১১৮ ধারার মামলায় বিনা ওয়ারেন্টে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারে না, তথাপি সুরেন্দ্রবাবু অবরুদ্ধ ও দণ্ডিত হইলেন। দুইশত টাকা জরিমানা অথবা তাহার পরিবর্তে একমাস কারাবাসের অনুমতি হইল।

সুরেন্দ্রনাথের সভাপ্রবেশ

সভাস্থলে সুরেন্দ্রনাথ প্রত্যাগত হইলে তথায় যে ভাবের প্রবাহ উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা মানব ভাষার অসাধ্য। দিগদিগন্ত জয়ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।; সকলে সমস্বরে "সুরেন্দ্রনাথের জয়" "বন্দেমাতরম্" প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে লাগিল। ভাবাবেশে গদগদ কণ্ঠে সকলের হৃদয় দ্রব করিয়া সুরেন্দ্রবাবু সভাপতি নির্বাচন প্রস্তাবের যে প্রকারে অনুমোদন করিলেন, তাহা বর্ণনা করা অপেক্ষা অনুভব করা অল্পায়াসসাধ্য।

হৃদয়-বিদারক দৃশ্য

পূর্বকথিত আহত যুবক বাবু ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলির ক্ষতস্থান চিকিৎসকেরা যে ভাবে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে সেই ভাবে টেবলের উপর দাঁড় করাইয়া জ্বরগ্রস্ত, আহত চিত্তরঞ্জনের পিতা বাবু মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা মধ্যে দণ্ডায়মান হইলেন। মনোরঞ্জন বাবু বলিলেন, "বাল্যকালে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিতে করিতে করিতে আমার দুইটি ছত্র বড় ভাল লাগিয়াছিল। পুত্রশোকাতুর রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ ধুলায় লুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন :

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ় ; শত ধিক্ তারে!"

আজি আমার পুত্রকে পুলিশ হস্তে নিগৃহীত দেখিয়া ও ধূল্যবলুণ্ঠিত এই সকল বালককে দেখিয়া আমার মুখ দিয়া যেন বাহির হইতেছে—

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা!

এইরূপ ওজস্বিনী ভাষায় লোকের মর্মস্পর্শ করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যখন বলিতে লাগিলেন, তখন সভাস্থ আবাল বৃদ্ধ বণিতার কেহই বোধ হয় অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। পুত্র জীবিত থাকিবে কি না, সেই শঙ্কা, এই উদ্বেগ, পিতার প্রাণে কি দারুণ আঘাত করিতেছিল, তাহা অন্তর্যামীই জানেন। কিন্তু অন্তরের ভাষা বেশ সংযত করিয়া মনোরঞ্জন বাবু যে বীরত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইলেন, তাহা কি এই হতভাগ্য বঙ্গদেশে বিফল হইবে?

শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতা

এই বীরবালক সুপ্রসিদ্ধ বক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার অন্যতম পুত্র। ইহার অঙ্গে অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির নাম অঙ্কিত ছিল বলিয়া কাপুরুষ পুলিশের লোকেরা ইহাকে আক্রমণ করে। এদিক হইতে লগুড়ের আঘাতে উহাকে ওদিকে ফেলিয়া দেয়। বালক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বলিতে ওদিকে গিয়া পড়ে, আবার ওদিক হইতে লাঠির ঘায় বালককে এদিকে ফেলিয়া দিলে বালক বন্দেমাতরম বলিতে বলিতে এদিকে আসিয়া পড়ে। কঠোর আঘাতে একবারও বালক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বিরত হয় নাই। শেষে পাষণ্ডেরা যখন তাহাকে পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিল ও লগুড়াঘাত করিতে লাগিল তখনও শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি পরিত্যাগ করে নাই। এই ভাবে তাহার প্রাণ-বিয়োগের সম্ভাবনা দেখিয়া একজন হিন্দুস্থানী পুলিশ কর্মচারী তাহাকে পুষ্করিণীর পাড়ে তুলিয়া দেয়। বালকের তখন মাথা ঘুরিতেছিল, তীরে আসিয়া দারুণ যন্ত্রণায় তাহার সংজ্ঞা বিলুপ্ত হইলে, সে বিশ্রামলাভ করিল। তাহার পিতা আসিয়া যখন পুত্রকে দেখিলেন, তখন বালক বলিল, "বাবা শেষ পর্যন্ত আমি "বন্দেমাতরম্" বলিয়াছি। আর এক ঘা লাঠি খাইলে আমার মৃত্যু হইত।" পিতা মনোরঞ্জন বাবু প্রত্যুত্তরে বলিলেন, "বাবা দেশের জন্য তুমি মরিতে, তাহা হইলে আমি কিছুমাত্র দুঃখিত হইতাম না।" ঐ দিবস বালকের জ্বর হয় ; এখন আমরা আহ্লাদের সহিত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি, তিনি ভাল আছেন।

বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র

ইনি যে প্রকার স্বদেশানুরাগ ও সৎসাহস প্রকাশ করিয়া বালকদিগকে কাপুরুষদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার জন্য অগ্রগামী হইয়াছিলেন, তাহা পূর্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণকুমারবাবু রিক্ত হস্তে ৪ জন কনস্টেবলের গলদেশ ধৃত করিয়া তাহাদিগকে কয়েক হাত তফাতে নিক্ষেপ করেন। তাহাতে কয়েকটি ছাত্রের নির্যাতন রহিত হয়।

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু

ছাত্রদিগকে রক্ষা করিবার জন্য নির্ভীক চিত্তে সশস্ত্র পুলিশ কনস্টেবলের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন "মারো মৎ"। একজন মুসলমান প্রহরী তাহাকে বলিল, "তোমকোবি মারেগা"। ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "মারো"। তাহাকে কিন্তু কেহ মারিল না।

সমিতির অন্যান্য কার্যবিবরণ

সভাপতি নির্বাচন

বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া যে তেজোগর্ভ বক্তৃতা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিষম উত্তেজিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, একদিন সকলেই এদেশে ইংরাজরাজত্ব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে বলিয়া মনে করিত। কিন্তু অদ্যকার ব্যাপার দেখিয়া অন্যরূপ মনে হইতেছে। নিরীহ, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজনসমাজের প্রতি এরূপ ঘোর অবৈধ অত্যাচার কখনই রাজ্যের পক্ষে কল্যাণকর নহে। তাহার অগ্নি-গর্ভ বক্তৃতার শেষ হইলে ছয় সহস্র কণ্ঠে ভীষণ রবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব অনুমোদন ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সমর্থন করিলে সর্বসম্মতিক্রমে উহা পরিগৃহীত হয়। তখন মিঃ রসুল সভাপতির আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন। সভাপতি মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধন তাহার বক্তৃতার একাংশ শ্রীযুক্ত হালিম গজনভি মহোদয় পাঠ করিয়াছিলেন।

প্রথম প্রস্তাব

সভাপতির বক্তৃতার পর বাবু মতিলাল ঘোষ প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। সে প্রস্তাবের মর্ম এই — যেহেতু আজ দিবালোকে, সমস্ত শহরের লোকের সম্মুখে ডিস্ট্রিক্ট ও আসিস্টান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশে পুলিশ সভাপতি মিঃ রসুলের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত প্রতিনিধিদের উপর অবৈধভাবে লাঠি চালাইয়াছে এবং দেশবাসীর নেতা বাবু সুরেন্দ্রনাথকে বিনা কারণে এরূপ ভাবে কয়েদ করিয়াছে, তাহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, বরিশালে আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী বিলুপ্ত হইয়াছে।

যেহেতু পূর্ববাংলা ও আসামের নানা স্থানের লোক স্বদেশসেবা করার অপরাধে প্রহৃত ও নানারূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য এই সমিতি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, এই প্রদেশে আর বৈধ শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই ; সুতরাং নিজের শক্তির উপর যে সকল কার্য নির্ভর করে, বর্তমান বর্ষের সমিতি কেবল সেই সকল প্রস্তাবের আলোচনা করিবেন। বর্তমান দায়িত্বশূন্য গবর্নমেণ্টের উপর যে সকল কার্যের মীমাংসার ভার আছে, বর্তমান বর্ষের সমিতি তাহার আলোচনা হইতে ক্ষান্ত থাকিবেন। এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হইলে সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হয়।

দ্বিতীয় দিবস

অদ্য শহরে গুজবের অন্ত নাই। কেহ বলিল, আজ প্রতিনিধিগণ রাস্তায় শ্রেণিবদ্ধ হইয়া বাহির হইলেই পুলিশ গুলি চালাইবে। কেহ বলিল, রাস্তায় যে বন্দেমাতরম্ বলিবে, তাহাকেই পুলিশ গুলি করিবে বলিতেছে। এমন কি গুজব রটিল যে, ফুলার সাহেব বরিশালে আসিয়াছেন। তাহার ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্টিমারে দেখা করিবার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট ইমার্সন সাহেব গমন করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, সেইদিন ফুলার সাহেবের স্টিমার বরিশালের ঘাটে আসিয়া লাগিয়াছিল, তবে ফুলার সাহেব সে স্টিমারে ছিলেন কি না তাহা ঠিক জানা যায় নাই।

এই সকল জনরবে প্রতিনিধিগণ ভীত হন নাই। যথারীতি পূর্বাহ্ণ ১১টার সময় সভার অধিবেশন হইল। দলে দলে প্রতিনিধিগণ রাজপথ দিয়া উচ্চ কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে করিতে সমিতির মণ্ডপে উপনীত হইতে লাগিলেন। পূর্ব দিনের অপেক্ষা অদ্য মণ্ডপে অধিক সংখ্যক লোকের সমাগম হইয়াছিল। পূর্ব দিবসে দুই শত রমণী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন, অদ্য উপস্থিত রমণীর সংখ্যা প্রায় পঞ্চশত হইয়াছিল। সভাস্থল স্থির নিশ্চল বিশাল জন-সমুদ্রের আকার ধারণ করিল। প্রথমে বন্দেমাতরম্ সঙ্গীত গীত হয়। সভায় উপস্থিত সমগ্র জনমণ্ডলী সসম্মানে দণ্ডায়মান হইয়া জন্মভূমির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। তৎপরে ভাবানীপুরের স্বদেশ-সেবক সম্প্রদায় এ অ্যান্টিসারকুলার সোসাইটির যুবকগণ মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া "মাগো যায় যেন জীবন চলে, শুধু জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দেমাতরম্ বলে" এই গানটি প্রাণ খুলিয়া গাইলেন।

স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের প্রস্তাব

তৎপরে অশ্বিনীবাবু একখানি পত্র অবলম্বন করিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, গত কল্য যে স্থানে বালকদিগের রক্তপাত হইয়াছে ও সুরেন্দ্রবাবু বন্দি হইয়াছেন, সেই স্থানে একটি স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপিত হউক। এই প্রস্তাব উপস্থিত হইবামাত্র চাঁদা সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইল। অবশ্য নগদ টাকা লইয়া অতি অল্প লোকেই সমিতিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং সকলে সভাস্থলে অর্থদান করিতে পারেন নাই, তথাপি অনেকে হস্তের অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি খুলিয়া স্মৃতিস্তম্ভের সহায়তাকল্পে দান করিয়াছিলেন। বাবু তারাপ্রসন্ন বসুর পত্নী শ্রীমতী সরোজিনী বসু তাহার সোনার বালা খুলিয়া দান করিলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, যতদিন বঙ্গদেশে "বন্দেমাতরম্" রহিত করিবার অবৈধ আদেশ রহিত না হয় ততদিন তিনি আর হস্তে বালা পরিবেন না। এই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহারা এই স্মৃতিস্তম্ভ প্রতিষ্ঠার জন্য নগদ টাকা দান করিয়াছিলেন তাহাদিগের মধ্যে কলিকাতার জনৈক দরিদ্র ব্রাহ্মণের দানের মাত্রাই সর্বাপেক্ষা অধিক হইয়াছিল ; তিনি সভাস্থলে নগদ একশত মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব

ইহার পর দ্বিতীয় প্রস্তাবে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাব ফরিদপুরের বাবু কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, চট্টগ্রামের বাবু যাত্রামোহন সেন, শ্রীহট্টের বাবু শশীন্দ্র সিংহ, কাছাড়ের বাবু ইন্দুভূষণ মজুমদার, বর্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃষ্ণনগরের বাবু বেচারাম লাহিড়ি, হুগলীর বাবু মথুরানাথ গাঙ্গুলি, ২৪ পরগণার ডাক্তার গফুর প্রভৃতি উত্থাপন, অনুমোদন ও সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি সহকারে এই প্রস্তাব পরিগৃহীত হয়।

তৃতীয় প্রস্তাব

রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয় তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপিত করেন। এই প্রস্তাবে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয় আলোচিত হইয়াছিল। বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বাবু ব্রজসুন্দর রায়, বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন, মৌলবী হেদায়ৎ বক্স এই প্রস্তাবের অনুমোদন ও সমর্থন করেন। এই সময়ে সেই প্রসিদ্ধ বীর বালক রাজেন্দ্রলাল সাহাকে সকলের সম্মুখে উপস্থিত করা হইল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে যে, এই বালক আসামীর কাঠগড়ায় থাকিয়া ও বিলাতি কলমে নাম স্বাক্ষর করিতে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছিল; এবং কারাগারে বিলাতি কম্বল ব্যবহার করিতে চাহে নাই। তাহাকে দেখিয়া সকলে উচ্চরবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলেন। অতঃপর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি-কল্পে গৌরীপুরের ভূম্যধিকারিণী শ্রীমতি বিশ্বেশ্বরী দেবী এক লক্ষ টাকা, বাবু সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিন হাজার, বাবু অনাথবন্ধু গুহ দুই হাজার, ভূমহারের বাবু বরেন্দ্র কুণ্ডু মহাশয় পাঁচশত টাকা নগদ দান করিতে স্বীকার করেন।

চতুর্থ প্রস্তাব

এই প্রস্তাবে স্বয়ং সভাপতি মহাশয় বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবুল হোসেন, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বাবু শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই প্রস্তাবের সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু মহিলাগণকে সম্বোধন করিয়া বিলাতি দ্রব্য বর্জনে দৃঢ়সংকল্প হইতে অনুরোধ করেন। মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি সহকারে রমণী সমাজ সে প্রস্তাবে সম্মতিজ্ঞাপন করেন।

পুলিশের প্রবেশ

কাব্যবিশারদ মহাশয় বক্তৃতা করিতেছিলেন, এমন সময়ে পুলিশ সাহেব মিঃ কেম্প সশস্ত্র পুলিশ ফৌজ লইয়া মণ্ডপের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু দ্বারস্থিত একজন ভলন্টিয়ার তাহাকে সভাস্থলে প্রবেশ করিতে দিল না। তিনি ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলে ভলন্টিয়ার (মুকুন্দলাল) তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "কাপ্তেনের অনুমতি ভিন্ন আমি কাহাকেও বিনা টিকিটে ভিতরে প্রবেশ করিতে দিব না।" তখন মণ্ডপের বাহিরে বহুসংখ্যক বন্দুক ও লগুড়ধারী পুলিশ দণ্ডায়মান ছিল, দ্বারস্থিত ভলন্টিয়ার তথাপি ভীত হয় নাই। মিঃ কেম্প মণ্ডপে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হইয়া বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও সমিতির সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তদনুসারে তাহারা বাহির হইবামাত্র মিঃ কেম্প তাহাদিগের হস্তে নিম্নলিখিত পরোয়ানা প্রদান করিলেন।

কনফারেন্স সভার সভ্য সেক্রেটারি দর্শক ও শ্রোতাগণ প্রতি

যেহেতু আমার নিকট প্রকাশ করা হইয়াছে যে, আপনারা অত্র বরিশাল শহরে ব্রজমোহন কলেজের উত্তর পার্শ্বে এক সভা করিয়া বিনা কারণযুক্ত গোলমালজনক করিতেছেন। অতএব আমি এতদ্দ্বারা আপনাদিগকে আদেশ করিতেছি যে, আপনারা অথবা সর্বসাধারণ কেহই ঐ সভায় যোগদান করিতে পারিবেন না অথবা করিবেন না। প্রকাশ থাকে যে, অত্র শহরে রাজা বাহাদুরের হাউলীতে (বা অন্যত্র) ঐরূপ কোন কাজ করিবেন না।

T. Emerson, Magistrate.
15.4.06.

As it appears from Police report that the breaking up of the meeting of the Conference which is being held at a Pandal in the town opposite the B. M. College is likely to be followed by unruly proceedings in the streets and noisy procession which have been forbidded by proper authority, I hereby order that the public or any persons are not to meet in the Pandal or elsewhere for the said purpose and the public are not to form crowds in the streets. As it also appears likely that the crowds may meet in Rajabahadur's Habeli and from unlawful assembly.

It is hereby ordered that this is also forbidden.

(Sd.) T. Emerson,
15.4.06.

অশ্বিনীবাবু ও রজনীবাবু এই বিচিত্র ইংরাজী ও অশ্রুতপূর্ব বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত পরোয়ানা লইয়া সভাপতির নিকট উপস্থিত হইলেন। তখন উহা লইয়া নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হইল। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল বলেন, পুলিশ যখন আপত্তি করিতেছে, তখন আমাদের সভাভঙ্গ করাই উচিত। কৃষ্ণবাবু এই কথায় প্রতিবাদ করিয়া বলেন,—আমরা কিছুতেই সভাগৃহ ত্যাগ করিব না। পুলিশ গুলি চালাক্ তথাপি আমরা নড়িব না। এই বলিয়া তিনি বিপিনবাবুকে ভীরুতার জন্য তিরস্কার করেন। আলোচনার স্থির হইল যে, এই অবৈধ আদেশ কেহ পালন করিবে না, যদি মিঃ কেম্প ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে বলপূর্বক সভাভঙ্গ করিতে পারেন। এই সময়ে মিঃ কেম্প সভাপতির অনুমতি গ্রহণ করিয়া মঞ্চোপরি আরোহণ করিলেন। তখন চারিদিকে ভৈরব রবে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উত্থিত হইতেছিল। উপস্থিত জনগণের চিত্তে বিষম উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই ভীষণ উত্তেজনা দর্শনে কম্পিত কলেবর কেম্প সুরেন্দ্রবাবুর সম্মুখবর্তী হইয়া বলিলেন, 'I hope now I am safe.' অর্থাৎ ভরসা করি আপনার নিকট দাঁড়াইয়া আমি এখন নিরাপদ হইয়াছি। প্রতিনিধিগণ তখন মিঃ কেম্পকে বলিলেন, 'বল বন্দেমাতরম্',—চারিদিক হইতে বিশেষ উত্তেজনার সহিত ঐ কথা ধ্বনিত হইতে লাগিল। তখন মিঃ কেম্পও বন্দেমাতরম্ বলিলেন।

মিঃ কেম্পের মুখে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া উত্তেজিত জনসাধারণ শান্ত হইলে মিঃ কেম্প বলিলেন, সভা ভাঙিয়া ফিরিয়া যাইবার সময় কেহ রাস্তায় "বন্দেমাতরম্" বলিবেন না। আপনারা যদি এ বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনাদিকে সভার কার্য নির্বাহ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইবে। বলা বাহুল্য, প্রতিনিধিগণ এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, দায়িত্ব গ্রহণ না করেন, শুদ্ধ নেতৃবৃন্দ প্রতিনিধিদিগকে সভার বাহিরে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে নিষেধ করুন। তাহাতেও কেহ সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, অগত্যা আমাদিগের বল প্রকাশ করিতে হইবে।

অতঃপর নেতৃবৃন্দের মধ্যে পরামর্শ আরম্ভ হইল। তাহারা বুঝিলেন যে, পুলিশ সাহেবের আদেশে সভাগৃহ ত্যাগ না করিলে বালকদিগকে অকারণে লগুড়াঘাত সহ্য করিতে হইবে। সুতরাং পুলিশকে অত্যাচার করিবার অবসর না দিয়া নীরবে সভাগৃহ ত্যাগ করাই কর্তব্য বলিয়া সকলে স্থির করিলেন। বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র কিছুতেই সে প্রস্তাবে সম্মত হইতে চাহেন নাই। পরিশেষে অনেক বুঝাইয়া তাহাকে সভা ত্যাগ করিতে সম্মত করা হয়।

সভা-ভঙ্গ

পুলিশ সাহেব যখন বলেন যে, হয় আপনারা সভা হইতে স্বেচ্ছায় বাহির হইয়া যান, না হয় আমি পুলিশ দিয়া এখনই সকলকে বাহির করিয়া দিব, তখন সেই নির্মম বাণী শুনিয়া সেই মণ্ডপস্থিত জন-সমুদ্র অবিরাম কলরোলে মুখরিত হইয়া উঠিল। মাতৃপূজার মন্ত্র "বন্দেমাতরম্"

তখন মুহুর্মুহু মণ্ডপ-গৃহচূড়া ভেদ করিয়া দিঙ্মণ্ডল নিনাদিত করিতে লাগিল। উত্তাল-সমুদ্র-তরঙ্গ পাষাণ গাত্রে প্রবল আঘাত প্রাপ্ত হইলে যেমন ক্ষুব্ধ হইয়া ওঠে, তেমনি এই অগণিত মনুষ্যমণ্ডলী ক্রোধে ক্ষোভে উন্মত্ত হইল। কিন্তু নেতার আদেশ অনতিক্রমণীয়। সুতরাং সকলেই ধীরে ধীরেই মণ্ডপ গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে লাগিলেন। মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরি বলিলেন, যাও সকলে বাড়ী যাও, কনফারেন্স এ জায়গায় ভাঙিল বটে, কিন্তু গৃহে গৃহে কনফারেন্স হউক—গ্রামে গ্রামে আন্দোলন হউক। বিদেশি জিনিস একেবারে নির্বাসিত হউক। স্বদেশি দ্রব্য নির্মিত হউক। যাও,বাড়ী যাও। আজি আমাদের শোকের দিন নহে, আনন্দের দিন। যে দিন এই লাঠি বিলাতে ইহাদিগের পৃষ্ঠে পড়িবে, সেই দিন আমাদিগের প্রতিশোধের দিন আসিয়াছে বুঝিব।

ক্রমে সভাগৃহ জন-শূন্য হইল। উৎসবান্তে নাট্যমঞ্চ যেমন বিষাদ-মণ্ডিত হয়, এখানেও সেইরূপ বা ততোধিক বিষাদের কালিমা দৃষ্ট হইল। ইংরাজ রাজ্যে নব শাসন-প্রণালীর সুস্পষ্ট প্রতিকৃতি সর্বজন সমক্ষে প্রকটিত হইল!

পরামর্শ সভার বাদানুবাদ

প্রাদেশিক সমিতি ভঙ্গ হইবার পরেই স্থানীয় মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যান বাবু রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের বাটিতে একটি পরামর্শ সভার অধিবেশন হয়। পরামর্শকালে কথা-প্রসঙ্গে কাব্যবিশারদ মহাশয়ের সহিত বাবু বিপিনচন্দ্র পালের কিঞ্চিৎ বাগবিতণ্ডা হয়। পুলিশের ভয়ে সমিতির মণ্ডপ পরিত্যাগ উপলক্ষে মতভেদই এই বিষয়ের সূত্রপাত হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় পুলিশের ভয়ে সভা ভাঙিয়া সরিয়া যাইবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বাবু বিপিনচন্দ্র পাল কাব্যবিশারদ মহাশয়ের অনুযোগের উত্তরে বলেন, আমি লাঠি মানি, গবর্নমেন্ট মানি না। তাই লাঠি দেখিয়াই সরিয়া গিয়াছিলাম। কাব্যবিশারদ বলিলেন,আমি গবর্নমেন্ট মানি, লাঠি মানি না; এই কথা সভাপতি মি. রসুল, শ্রীযুক্ত হালিম গজনবি, মাননীয় ভূপেন্দ্রনাথ বসু, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ, শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরি, মৌলবি আবুল হোসেন, বাবু মতিলাল ঘোষ এবং ময়মনসিংহ, ঢাকা চট্টগ্রাম ও বরিশাল প্রভৃতি স্থানের বহু প্রধান ব্যক্তির সমক্ষে হইয়াছিল।

প্রকাশ্য সভা

সেই সময়ে বাহিরে একটি প্রকাশ্য সভা করিবার প্রস্তাব হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় সেই প্রস্তাব করিয়াছিলেন। বিপিনবাবু সেই সভায় যোগদান করিলেন না। তিনি বলিলেন, আমার বিশেষ কার্য আছে। এই বলিয়া তিনি সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। ঐ প্রকাশ্য সভায় পুলিশের আদেশের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা বাঞ্ছনীয় কি না, এ তর্কও তিনি তুলিলেন না। সভা আরম্ভ হইতে না হইতে বিপিন বাবু অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া গেলেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রবাবুর অনুমতি লইয়া এ সভা আরব্ধ হয়। কাব্যবিশারদ মহাশয় প্রথমেই বক্তৃতা করেন। তিনি বক্তৃতা মুখে অতীব ওজস্বিনী ভাষায় বিলাতি বর্জন ও স্বদেশি দ্রব্যের গ্রহণ, রাজপুরুষদিগের অত্যাচারের অবৈধতা, সেই দিবসের অত্যাচার ও সভাভঙ্গ প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

কাব্যবিশারদের বক্তৃতায় পর দেশের গৌরব, বাগ্মিপ্রবর সুরেন্দ্রনাথ সেই সভাতে বক্তৃতা করেন। তাহার বক্তৃতায় শ্রোতৃবৃন্দ মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবুর উদ্দীপনাপূর্ণ এবং প্রবল স্বদেশপ্রীতিব্যঞ্জক বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া সমবেত জন-মণ্ডলী উৎসাহে প্রদীপ্ত, করুণায় বিগলিত, রোষে উত্তেজিত এবং অননুভূতপূর্ব ভাবাবেশে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। ময়মনসিংহ প্রবাসী

জনৈক হিন্দুস্থানী সুবক্তা হিন্দী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করেন। সভাপতি মি. রসুল মহাশয়কে দর্শন করিবার জন্য এই সময়ে উপস্থিত জন-সাধারণ আগ্রহ প্রকাশ করায় সভাপতি মহাশয়কে একটি চৌকির উপর উঠাইয়া সকলকে প্রদর্শিত করা হয়। তাহার সৌম্যমূর্তি দর্শন করিয়া সকলে উৎসাহ বিহ্বল চিত্তে সমস্বরে আল্লা হো আকবর ও "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে দিঙ্মণ্ডল পূর্ণ করেন। মৌলবী আবুল হোসেন ও শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরি মহাশয়েরা বক্তৃতা করিলে সুরেন্দ্রনাথের জয়ধ্বনি সহকারে সভাভঙ্গ হয়।

রহমৎপুরে সভা

সেই দিনেই অর্থাৎ সোমবার রহমৎপুরে একটি সভা হইয়াছিল। রহমৎপুর বরিশালের ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। সেখানকার চক্রবর্তী জমিদারগণের যত্নেই এই সভার অধিবেশন হয়। নদীর তীরবর্তী একটি সুরম্য স্থানে সভার অধিবেশন হইয়াছিল। বিবিধ বর্ণের পতাকা ও অন্যান্য উপকরণে সভাস্থল ইন্দ্রপুরীর ন্যায় সুন্দর করিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ (রায়চৌধুরি) মৌলবী আবুল হোসেন, বাবু কৃষ্ণকুমার মিত্র, প্রভৃতি মহাশয়েরা স্বদেশি গ্রহণ ও বিলাতি দ্রব্য বর্জন ও পুলিশের অত্যাচার সম্বন্ধে অতীব আবেগময়ী ভাষায় বক্তৃতা করেন। স্বদেশ সেবক সম্প্রদায় জাতীয় সঙ্গীতে সকলকে মুগ্ধ করেন। পুলিশ কর্তৃপক্ষ নাকি সে সভা ভঙ্গ করিবার জন্য ও বহুসংখ্যক লগুড়ধারী পুলিস প্রেরণ করিয়াছিলেন।

লাকুটিয়ার সভা

রহমৎপুর হইতে প্রত্যাবর্তন কালে লাকুটিয়ার জমিদার বাবু বিহারীলাল রায়ের বাটিতে আর একটি সভার অধিবেশন হয়। তাহাতেও বহুসংখ্যক হিন্দু মুসলমান ও স্ত্রীলোক যোগ দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু, কাব্যবিশারদ ও আবুল হোসেনের বক্তৃতায় সকলেই বিলাতি বর্জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েন।

পরদিন মঙ্গলবার কলিকাতার অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল ত্যাগ করেন। প্রহৃতদিগের পক্ষ হইতে অভিযোগ করিবার জন্য মাননীয় মিঃ জে. চৌধুরী ও অন্য কয়েকজন মঙ্গলবার দিবসে ও বরিশালে অবস্থান করেন। তৎপরদিন তাহারা বরিশাল ত্যাগ করেন। সকলেরই প্রস্থান কালে পুলিশ কনস্টেবলেরা লাঠি লইয়া ষ্টিমার ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিল।

প্রতিনিধিবর্গের প্রত্যাবর্তন

সুরেন্দ্রবাবুর অভ্যর্থনা

শিয়ালদহ স্টেশনে দশ সহস্র লোকের সমাগম

সেই সোমবার ও মঙ্গলবার কলিকাতায় যে সকল সভা হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হয় যে প্রতিনিধিবর্গ যখন বরিশাল হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিবেন, তখন তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য সকলে শিয়ালদহ স্টেশনে সম্মিলিত হইবেন। তদনুসারে ৫ই বৈশাখ বুধবার প্রাতঃকালে তাহারা কলিকাতায় প্রত্যাবৃত্ত হইলে অন্যূন দশ সহস্র হিন্দু ও মুসলমান তাহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হন। প্রথমে রাত্রি তিনটার সময় সকলে কলেজ স্কোয়ারে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। চারিটার পর তাহারা শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সেই বিশাল জনস্রোত মন্থর গতিতে যখন স্টেশনে উপস্থিত হইল, তখনও ট্রেন আসিতে বিলম্ব ছিল।

সকলে ট্রেনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইল, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ কলিকাতার প্রতিনিধিবর্গ ট্রেন হইতে অবতরণ করিলেন। অমনি দশ সহস্র কণ্ঠ হইতে ভৈরব রবে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি সমুত্থিত হইল ; সেই অভ্রভেদী ধ্বনিতে আপামর সকলেরই হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। সকলেই পুনঃ পুনঃ বন্দে মাতরম্ ধ্বনি করিতে লাগিলেন। প্রতিনিধিবর্গ সেই স্বদেশভক্ত জনসমূহের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে সুশোভিত করা হইল। সর্বাগ্রে দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, তৎপার্শ্বে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র, অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ নিজ নিজ দ্রব্য সম্ভার মস্তকে বহন করিয়া "যায় যাবে জীবন চ'লে, মাগো, জগৎ মাঝে তোমার কাজে বন্দে মাতরম্ ব'লে" সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে যখন স্টেশন হইতে আসিতেছিলেন, তখনকার দৃশ্য প্রত্যক্ষ না করিলে অনুধাবন করা যায় না।

প্রথমে একদল অতি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ অগ্রসর হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে আশীর্বাদ করিলেন। শকটের অশ্ব খুলিয়া দেওয়া হইল। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি সেই শকটে আরোহণ করিলেন, উৎসাহী যুবকবৃন্দ সেই শকট টানিয়া আনিতে লাগিল। জনস্রোতের গতি ফিরিল, সকলে হ্যারিসন রোড দিয়া কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইলেন। সুরেন্দ্রবাবু শকটের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে লক্ষ্য করিয়া বক্তৃতা করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ট্রেনে আসিবার সময় যে সকল স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছিল, সেই সকল স্টেশনেই সমাগত ব্যক্তিবৃন্দকে দেশের বর্তমান অবস্থা, এবং আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি উপদেশ দিয়া আসিয়াছেন—সমস্ত রাত্রি তাহার এই ভাবেই অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেক স্টেশনেই শত শত লোক উৎকণ্ঠিত চিত্তে তাহাদিগের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন—সকল স্থানের লোকেই সরকারি অত্যাচারের প্রতিকার-কল্পে বিলাতি দ্রব্য প্রাণান্তেও পরিগ্রহণ করিবেন না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু সম্মিলিত জনসমূহকে বলিয়াছেন যে, কেবল নিজে বিলাতি দ্রব্য গ্রহণ না করিলেই চলিবে না, যাহাতে অপর কেহ কখনও বিলাতি দ্রব্য স্পর্শ না করে, তাহার চেষ্টাও করিতে হইবে। বিধিসঙ্গত যে কোন উপায়ে তাহাদিগের বিলাতি দ্রব্য ক্রয়ে বাধা দিতে হইবে। সকলেই সুরেন্দ্রবাবুর উপদেশানুরূপ কার্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

সুরেন্দ্রবাবু তাহাদিগকে আরও বলিলেন যে, বরিশালে যে তাহাকেই নিগৃহীত করা হইয়াছে, এমন নয়—অন্যান্য সকল প্রতিনিধি এবং অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির যুবকবৃন্দেরও নিগ্রহ হইয়াছে। এই অবমাননার, এই নিগ্রহের জন্য প্রতিহিংসা চাই—এই পাশবিক অত্যাচারের প্রতিশোধ লইতে হইবে। বিদেশি দ্রব্য, বিশেষতঃ বিলাতি দ্রব্য কেহ ভ্রমক্রমেও স্পর্শ না করিলেই প্রতিহিংসা চরিতার্থ হইবে, তাহা হইলে এই সার্বজনিক অবমাননার চূড়ান্ত প্রতিশোধ লওয়া হইবে।

এ পর্যন্ত সুরেন্দ্রবাবু ইংরাজীতেই বক্তৃতা করিতেছিলেন ; অতঃপর তিনি বঙ্গভাষাতেও কিছুকাল বক্তৃতা করেন। তিনি এবং তাহার সহযোগী ও সহচরবৃন্দকে পথশ্রমে পরিম্লান বোধ হলে তাহাদের হৃদয়ে যে এক প্রবল উৎসাহের সঞ্চার হইয়াছে, বরিশালের পাশবিক অত্যাচারের ফলে তাহাদের যে মানসিক বল বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা প্রতীত হইতেছিল। স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের কার্য দেখিয়া মুসলমানগণের হৃদয়ে কিরূপ ঘৃণার সঞ্চার হইয়াছে, মৌলভী মহম্মদ রহমান ও মৌলভী লিয়াকৎ হোসেন মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে তাহা ব্যক্ত করেন।

অতঃপর গোলদীঘির উত্তরপূর্ব কোণে অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির আফিসের সম্মুখে একটি

বিরাট সভা হয়। তথায় সমবেত ব্যক্তিবৃন্দের মধ্যে অনেকেই উৎফুল্ল অন্তঃকণে প্রতিনিধিবর্গের সহিত আলিঙ্গনপাশে বদ্ধ হন। তাহারা প্রতিনিধিগণকে যেরূপ প্রীতিভরে বিদায় দিয়াছিলেন, এক্ষণে তদধিক প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে পরস্পর বিশ্রম্ভালাপ করিলেন। এ দৃশ্য অতি মনোরম ও তৃপ্তিপ্রদ। সমবেত জনমণ্ডলী এই দৃশ্য দেখিয়া অশ্রুসংবরণ করিতে পারেন নাই। এই সময়ে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয় একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। সকলে একাগ্র চিত্ত হইয়া তাহার কথা শুনিতে লাগিলেন। তিনি বলেন যে, অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ ধীরভাবে আপনাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। সুবক্তা শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার পুত্র শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা পুলিশের হস্তে গুরুতররূপে প্রহৃত হইলেও "বন্দেমাতরম্" বলিতে বিবত হয় নাই। সোসাইটির সভ্যগণ নেতৃবর্গের ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়াছিলেন। পুলিশ তাহাদিগকে ক্রমাগত প্রহার করিতে থাকে, তথাপি তাহারা কেবল মাত্র "বন্দেমাতরম্" ব্যতীত আর কিছুই বলেন নাই। কৃষ্ণকুমার বাবু বরিশালের প্রথম দিবসের ঘটনা বিবৃত করিলে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ অসুস্থতাসত্ত্বেও কিয়ৎকাল বক্তৃতা করেন। তিনি বরিশালে পুলিশ ঘটিত অত্যাচারকাহিনী বিবৃত করেন এবং পুলিশ যে আবশ্যক হইলে কিরূপ পশুবল প্রকাশ করিতে উদ্যত হইতে পারে, তাহা বুঝাইয়া দেন। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ইমার্সন দেশমান্য শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি কিরূপ অসদ্ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাও তিনি প্রকাশ করেন। ইহাতে সমাগত জনসমূহ ভয়ানক উত্তেজিত হইয়া উঠেন এবং প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধই তাহাদের বীজমন্ত্র হইবে বলিয়া স্বীকার করেন। তাহারা কখনও আর বিলাতি দ্রব্য স্পর্শ করিবেন না, তাহাতেই বরিশালের অত্যাচারে প্রতিশোধ লইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন।

তদনন্তর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গীষ্পতি রায়চৌধুরি কাব্যতীর্থ, দণ্ডায়মান হইয়া নূতন বঙ্গের ছোটলাট ফুলার সাহেব ও তাহার উপযুক্ত পার্শ্বচর, অনুচর প্রভৃতির পাশবিক গুণের কথা একে একে ব্যক্ত করিলেন। বক্তৃতান্তে সভা ভঙ্গ হয়। সকলেই বন্দোমাতরম্ ধ্বনি সহকারে স্বস্থানে প্রস্থান করেন।

বঙ্গভঙ্গ



সংবাদ-সাময়িকপত্রের প্রতিবেদন

১৯০৫-১৯১১

সঞ্জীবনী ● ঢাকা প্রকাশ The Statesman ● Bandemataram

স্বরাজ ● Amrit Bazar Patrika

সঞ্জীবনী*

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ অধিবাসীবৃন্দের মনোভাব ২ *বৈশাখ* ১৩১১

লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে পূর্ব্ববঙ্গবাসীদের অভূতপূর্ব তুমুল আন্দোলনের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণের সহিত এই আন্দোলনের কোনই সংস্রব নাই; আসামের সামিল হইলে তাহাদের যে কোন লাভ ক্ষতি হইবে, তাহারা তাহা জানে না বা বোঝে না; কতকগুলি লোক তাহাদিগকে পরামর্শ দিয়া আন্দোলনে যোগ দেওয়াইয়াছে। লর্ড কার্জনের এই উক্তির যে মূল্য নাই, তাহা আমরা বহুবার প্রদর্শন করিয়াছি। অদ্য একটি ঘটনার দ্বারা আমরা লর্ড কার্জনের উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিব। চৈত্র সংক্রান্তির পূর্বদিনে ঢাকা শহরে প্রতি বৎসর অনেক সং বাহির হয়। এবারও অনেক সং বাহির হইয়াছিল। তন্মধ্যে এক সং এইরূপ ছিল : কৈলাসে হর-পার্বতীকে ঘেরিয়া দেবগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের সমালোচনা করিতেছেন। নারদ বীণাবাদন করিয়া সঙ্গীত করিয়া মহাদেবকে বলিতেছেন, আপনি সকল দেবতার, আপনার এ কেমন বিচার? আপনি কালীঘাটের কালীর অধীশ্বর, তদ্রূপ ঢাকার ঢাকেশ্বরীর এবং কামরূপের কামাখ্যা দেবীরও অধীশ্বর। ঢাকেশ্বরীকে কামাখ্যেশ্বরীর অধীন করিতেছেন কেন? আপনি সদাই নেশায় বিভোর, সুতরাং কোথায় কি ঘটে, তাহার খোঁজ খবর রাখেন না। যদি আপনি ঢাকাবাসীদের উপর ন্যায় বিচার না করেন, তাহা হইলে আমি বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর নিকট আবেদন করিতে যাইব। অজ্ঞ অশিক্ষিত লোকেরাই চৈত্র সংক্রান্তির সং বাহির করিয়া থাকে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে সাধারণ লোকের মনের ভাব কি, এই ঘটনাতে তাহাই প্রকাশ পাইয়াছে। লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন, কতকগুলিলোক কুপরামর্শ দিয়া দেশের লোককে মাতাইয়া তুলিয়াছে। এই ঘটনা তাঁহার উক্তির অসারতা প্রতিপন্ন করিতেছে। পূর্ববঙ্গের লোক কিছুতেই বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে প্রস্তুত নহে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব ১৬ *বৈশাখ* ১৩১১

আমরা অনেক দিন হইল এই শুভ সংবাদ প্রকাশ করিয়াছি যে, ভারত সরকার অবশিষ্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব আপাততঃ স্থগিত রাখিয়াছেন। পাইওনিয়ার আমাদের প্রকাশিত সেই সংবাদের সমর্থন করিয়া গত শনিবার লিখিয়াছেন যে—"The question of the partition of Bengal will probably be held over now for sometime as the matter will have to be referred to the Secretary of State" ভারত সচিবের অনুমতি না লইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করা যাইবে না। সুতরাং অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব সম্ভবতঃ কিয়ৎকালের জন্য স্থগিত থাকিবে।

লর্ড কার্জন এদেশে ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপন করিতে আসিয়াছেন। ইংরাজ যাহাতে ভারতবাসির উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারেন, লর্ড কার্জন তাহারই ব্যবস্থা করিবার জন্য ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। বেসরকারি ইংরাজ অর্থাৎ ইংরাজ চা-কর, কফি-কর, খনি-কর, দোকানদার ও বণিকদিগকে শক্তিশালী করিয়া ভারতবাসিকে সন্ত্রস্ত রাখা, গবর্নমেন্ট অফিসে অফিসে শ্বেতাঙ্গদিগকে সংখ্যায় শক্তিশালী করিয়া ভারতবাসীকে অধীন রাখা, পুলিশ বিভাগে শ্বেতাঙ্গ প্রাধান্য স্থাপন করিয়া

*সঞ্জীবনী সংকলন ও সম্পাদনা—কানাইলাল চট্টোপাধ্যায়।

ভারতবাসিকে দমন রাখা, সৈনিক বিভাগে ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপন করা, লর্ড কার্জনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি সে উদ্দেশ্য সফল করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

ইংরাজ প্রাধান্য স্থাপনের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় আইন, গুপ্ত সংবাদ প্রকাশ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করার আয়োজন হইয়াছে।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভক্তির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন এবং সে আয়োজন সুসিদ্ধ হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এমন কে আছে, যে ভিক্টোরিয়াকে মাতার ন্যায় শ্রদ্ধা না করিত? কিন্তু লর্ড কার্জন নীতির পরিবর্তন করিয়া ভারতবাসির দুর্বলতার উপর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা কবিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। কিন্তু লর্ড কার্জনের জানা উচিত, আমরা অরাজক দেশে বাস করি না। আমাদের রাজা আছেন, তিনি আমাদের ভক্তির উপর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে কখনও বিমুখ হইবেন না।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিলে বাঙালি সকল বিষয়েই দুর্বল হইবে। বাঙালির শিক্ষায় হীনতা হইবে, সমাজ ও ধর্ম সংস্কার শক্তি দুর্বল হইবে, ভাষা ম্লান হইবে, সংবাদপত্রসমূহ সাহায্যহীন হইবে, রাজনীতিক আন্দোলন খর্ব হইবে, বাঙালি জাতি অক্ষম হইবে।

লর্ড কার্জন এতদিন আপনার সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতেন, কিন্তু বঙ্গের জমিদার ও কৃষক এক প্রাণ হইয়া বাধা দেওয়াতে সে সঙ্কল্প সিদ্ধ করিতে পারেন নাই।

লর্ড কার্জন ইংলণ্ডে যাইতেছেন, ভারত সচিবকে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রয়োজন বুঝাইতে ত্রুটী করিবেন না। এমন সঙ্কটকালে কি আমরা নীরব থাকিব? নদীর কূলে পঁহুছিয়া কি তরী ডুবাইব?

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যদি সম্ভব হয় আরও কতিপয় ব্যক্তিকে অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা কর্তব্য। এখন যদি আলস্য করি, অর্থ সংগ্রহ করিতে শিথিলতা প্রদর্শন করি, তবে আমাদের এতদিনের সকল চেষ্টা উদ্যম বিফল হইবে। বঙ্গদেশ আসামের কুক্ষিগত হইয়া কতকাল যে আগ্রাসিতা হইবে, তাহা জানি না।

লর্ড কার্জন অদ্য সিমলা হইতে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাঁহার ভারত ত্যাগের পূর্বেই আমাদের প্রতিনিধিদের ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করা উচিত ছিল। সে যাহা হউক, আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাদের প্রতিনিধিদিগকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করা উচিত। আমরা আশা করি, এক সপ্তাহের মধ্যে অন্যূন ২৫ হাজার টাকা বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সম্পাদকের নিকট বঙ্গের নানা স্থান হইতে প্রেরিত হইবে। অবিলম্বে ৫ হাজার টাকা চাই। ইহার গুরুত্ব সকলেই উপলব্ধি করিয়া অর্থ সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইবেন, আমরা এই আশা করিতেছি।

ছোটলাট ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ *৩০ আষাঢ় ১৩১১*

ছোটলাট ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি প্রভৃতি পূর্ববঙ্গের যে সকল স্থান পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। সর্বত্র বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ শ্রবণ করিয়াছেন। ফরিদপুরের জনসাধারণ সভা অভিনন্দন পত্রে অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। ছোটলাট জনসাধারণ সভাকে এই কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—"আমিও এ বিষয় সম্বন্ধে কি করা হইবে, তাহা এখন বলিতে পারি না।" নোয়াখালির হিতসাধিনী সভাও অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। ছোটলাট বলিয়াছেন—"বঙ্গের কয়েকটি জেলা আসামের সামিল করার প্রস্তাব হয় নাই। বঙ্গের কয়েকটি জেলা ও আসাম লইয়া এক নূতন প্রদেশ গঠন করার প্রস্তাব হইয়াছে। সেই প্রদেশে লেফটেনেন্ট গবর্নর, ব্যবস্থাপক সভা ও রেভিনিউ বোর্ড থাকিবে। ভারত গবর্নমেন্ট ও ভারত সচিব এই প্রস্তাবের সম্বন্ধে বিবেচনা করিতেছেন। গবর্নমেন্ট প্রজার হিতকামনার বশবর্তী হইয়া এ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণ করিবেন।" প্রজার প্রকৃত হিত যদি গবর্নমেন্ট সর্বদা বুঝিতেন, তবে এত বাদ প্রতিবাদ কখনও হইত না।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। সম্পাদকীয় *৬ শ্রাবণ ১৩১১*

বিগত আষাঢ় মাসের প্রথমে কোন কোন সংবাদপত্র এই কথা প্রচার করিয়াছিলেন যে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের সামিল হইবে না। কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। কে এই সংবাদ প্রচার করিয়াছে তাহা আমরা জানি না, কিন্তু এই সংবাদ প্রচার করিয়া অনিষ্ট করা হইয়াছে। যাঁহারা আন্দোলনের অগ্রণী, তাঁহারা এই সংবাদে আস্থা স্থাপন করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়াছেন। আমরা সে সংবাদে কোন আস্থা স্থাপন করি নাই, সে জনরবের কথা আমরা সঞ্জীবনীতে প্রকাশও করি নাই। সংবাদটা যে অমূলক তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বঙ্গের ছোটলাট সম্প্রতি পূর্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। ফরিদপুর, কুমিল্লা, নোয়াখালি ও বরিশালের নগরবাসিগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ছোটলাটকে আমাদের মনোগত ভাব জানাইয়াছিলেন। ছোটলাট সর্বত্রই এই কথা বলিয়াছেন যে—"ভারত গবর্নমেন্ট বঙ্গে হিতের জন্যই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন। যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করেন, তবে প্রজার হিত হইবে মনে করিয়াই তাহা করিবেন।" ছোটলাট একথাও প্রকাশ করিয়াছেন যে—"অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব এখন ভারত গবর্নমেন্ট ও ভারত সচিবের বিবেচনাধীন আছে।" ছোটলাট সকলকে আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিয়াছেন—"পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে না। পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলা ও আসাম লইয়া এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হইবে। সেই প্রদেশ শাসনের জন্য একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর নিযুক্ত হইবেন। আয়কর আইন প্রণয়ন করিবার জন্য ব্যবস্থাপক সভা হইবে। সে প্রদেশের উপর হাইকোর্ট ও রেভিনিউ বোর্ডের ক্ষমতা থাকিবে।" কোন নগরবাসী ছোটলাটকে বলিয়াছিলেন—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব শুনিয়া জনসাধারণ ভীত ও শঙ্কাযুক্ত হইয়াছে।" ছোটলাট নগরবাসীর মুখে জনসাধারণের ভয় ও শঙ্কার কথা শুনিয়া একটু রাগ করিয়াছেন। রাগ করিবার কথাই বটে। ছোটলাট যদি জনসাধারণের মনের অবস্থা বুঝিতে সমর্থ হইতেন, তবে কখনও রাগ করিতেন না। সত্য সত্যই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের কথা শুনিয়া পূর্ববঙ্গ ভীত ও শঙ্কিত হইয়াছে।

ছোটলাটের কথা শুনিয়া সকলেই বুঝিতে পারিয়াছেন, গবর্নমেন্ট অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিহার করেন নাই। ঢাকা ও ময়মনসিংহকেও বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব পরিহার করেন নাই।

যাঁহারা এক সময়ে তুমুল আন্দোলন করিয়াছিলেন, যেরূপ আন্দোলন কেহ কখনও দেখে নাই শুনে নাই, সেইরূপ আন্দোলন করিয়াছিলেন—যাঁহারা অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে পুনরায় মহান্দোলনে ব্রতী হইতে হইবে।

এই প্রস্তাব হইয়াছিল যে, গত ফাল্গুন মাসেই কয়েকজন প্রতিনিধিকে ভারত সচিবের নিকট প্রেরণ করা হইবে। প্রতিনিধিগণ অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা ভারত সচিব ও তাঁহার সভ্যদিগকে বুঝাইয়া দিবেন। ইংলণ্ডের রাজপুরুষদিগের নিকট বাঙালির মনোবেদনা প্রকাশ করিবেন।

লর্ড কার্জন ইংলণ্ডে গিয়াছেন। তিনি অঙ্গচ্ছেদের অনুকূলে যত যুক্তিতর্ক আছে তাহা ভারত সচিবকে বুঝাইয়া দিয়াছেন, কিন্তু তাহার প্রতিকূলে যে সকল প্রবল যুক্তিতর্ক আছে, তাহা কেহ বুঝাইল না। বাঙালি মহাভ্রম করিয়াছেন।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, যদি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন বসু, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়দের মত লোককে আমাদের প্রতিনিধি পদে বিধি পূর্বক নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতে পারিতাম, তবে ভারত সচিব ও তাঁহার সভার সভ্যগণ আমাদের আবেদন উপেক্ষা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বাঙালির শিথিলতায় আমাদের পক্ষ সমর্থন করা হইল না। ভারত সচিব লর্ড কার্জনের উক্তি শুনিয়া এই বিষয় একতরফা নিষ্পত্তি করিবেন।

আমরা বলি এখনও সময় আছে। শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী একাকী সকলকে জানাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাহারও নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই। কিয়দ্দিন হইল, মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য বাহাদুর কলিকাতা আসিয়াছেন। তাঁহার অনন্য সাধারণ সৎসাহস ও অদম্য উৎসাহ ব্যতিরেকে এই আন্দোলন অঙ্কুরে বিনষ্ট হইত। তিনি পুনরায় কলিকাতা আসিয়াছেন, অন্যান্য উদ্যোগীগণ পুনরায় সমবেত হইয়া বিলাতে আন্দোলনের উদ্যোগ করুন। অচিরে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়া ইংলণ্ডে প্রেরণ করুন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ *১৮ কার্তিক ১৩১১*

বঙ্গভূমি কি জীবিত না মৃতের দেশ? যাহাদের সর্ববিধ উৎসাহ উদ্যম আতসবাজির অগ্নি স্ফুলিঙ্গবৎ হঠাৎ প্রজ্বলিত হয়, এবং অকস্মাৎ লুপ্ত হয়; আরাম ও আত্মসুখের মোহে যাহারা জীবনের সর্ববিধ গুরুতর কর্তব্যকে অক্লেশে লঘুতর করিয়া তুলে এবং নিদারুণ অবহেলা ভরে বিস্মৃত হয়; ব্যক্তিগত সঙ্কীর্ণ স্বার্থের গণ্ডি অতিক্রম করিয়া তাহারা কখনও দশের সেবায় জন্মভূমির কল্যাণে সরলভাবে প্রাণের ব্যগ্রতায় নিযুক্ত হইতে পারে না। বহুমূল্য জাতীয় একতাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট হইতে দেখিয়াও যে জাতি নির্বোধের মত কল্পিত সিদ্ধির প্রত্যাশায় বসিয়া বসিয়া আলস্যে দিন কাটাইতে পারে, তাহাদের জাতীয় জীবন কি বাস্তবিক উপকথার বিষয় নহে?

লর্ড কার্জন বলিয়াছিলেন বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাবটি নূতন বলিয়া আন্দোলনকারিগণ এক্ষণে ইহাকে বিপ্লবজনক মনে করিতেছে। সুতরাং প্রথমতঃ কিছুদিন ইহারা খুব হৈ চৈ করিবে, কিন্তু ক্রমে যখন সহ্য হইয়া যাইবে তখন বুঝিবে এই বিভাগে তাহাদের কি উপকার হইয়াছে।

অন্যায় অত্যাচার সহ্য করিয়া আমরা পাপগ্রস্ত ও অধঃপতিত হইয়াছি। পাপের শাস্তি স্বরূপ এক্ষণে অতি অন্যায় অত্যাচারে আমাদের প্রাণে তীব্র বেদনাবোধ জন্মে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে আমরা কার্যের দ্বারা দেখাইয়াছি যে আমাদের বেদনাবোধ কেবল ওষ্ঠবাহী—অন্তর্দাহী নহে। অন্তরের বেদনা কেহ এত শীঘ্র ভুলিতে পারে না। অথবা আমরা বাঙালি জাতি নিতান্তই নির্বোধ; নতুবা এমন বিপদপাতে এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিতাম না।

খবরের কাগজে টেলিগ্রাম প্রেরণ এবং গবর্নমেন্টের নিকট আবেদন প্রেরণ, ইহাতেই কি এরূপ বিপদের সমুচিত প্রতিকার প্রয়াস শেষ হইয়া গেল? যাহা কিছু করা হইয়াছে, তাহাতে যে কোন ফললাভ হয় নাই এমত নহে। কিন্তু ইহারই মধ্যে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। শুনা যাইতেছে, সার এণ্ড্রু ফ্রেজার দার্জিলিঙে বসিয়া বিভাগীয় কমিশনারদিগকে লইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন করিতেছেন ; এবং কমিশনারগণ অঙ্গচ্ছেদের অনুকূলে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়াও আমরা কি নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিব? বহুদিন হইতেই গবর্নমেন্ট নানাবিধ কার্য দ্বারা এদেশের উদীয়মান জাতীয় একতার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া আসিতেছেন। এইবার বঙ্গবাসীর জাতীয় স্বার্থে ভীষণ আঘাত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বঙ্গের অঙ্কুরিত জাতীয় জীবনকে এই অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা দ্বারা নির্মূল করিবার আয়োজন যে সম্পূর্ণ প্রায় হইয়া উঠিল। হতভাগ্য বঙ্গবাসী কি এখনও জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দৃঢ়সংকল্প করিয়া দণ্ডায়মান হইয়া উঠিবে না?

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এক্ষণে এদেশে আন্দোলনে আর ফল নাই—সময়ও নাই। অবিলম্বে এদেশ হইতে বিলাতে একদল উপযুক্ত লোক প্রেরণ করা কর্তব্য। বঙ্গদেশে উপযুক্ত লোকের অভাব নাই। এক্ষণে অর্থের প্রয়োজন। প্রায় এক লক্ষ টাকা সংগৃহীত হইলেই বিলাতে প্রবল আন্দোলনের তরঙ্গ উত্থিত হইতে পারে। বিপুল জনমণ্ডলীর যুক্তিগর্ভ প্রতিবাদ ও অবিরাম আন্দোলন ইংলণ্ড ভূমে কবে নিষ্ফল হইয়াছে? আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের সমুচিত প্রণালী অবলম্বন না করিয়াই আন্দোলন বা প্রতিবাদ নিরর্থক বলিয়া সহজ ও সুলভ সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের মত গুরুতর বিপদপাতে বঙ্গ সন্তান আর নিশ্চিন্ত থাকিও না। বঙ্গের

জমিদার সভা, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা, ভারতসভা প্রভৃতি রাজনৈতিক সভাসমূহ এইবার দেশের লোকের নিকট প্রমাণ করুন যে তাহারা জীবিত আছেন। দেশের এই বিপদের সময় তাহারা কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন। বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে প্রাণমনে যোগদান করিয়া তাহারা দেশের সর্বশ্রেণিস্থ লোকের নিকট এইবার রাজনৈতিক আন্দোলনের সার্থকতা প্রমাণিত করুন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আয়োজন পূর্ণ হইল

সম্পাদকীয়। *২৫ কার্তিক ১৩১১*

বাঙালি কি এখনও নীরব থাকিবেন? ইংলণ্ড হইতে এই দুঃসংবাদ আসিয়াছে যে, লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ভারত সচিবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন—কেবল ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগ আমাদের সামিল করা হইবে না। আসাম, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা বিভাগ এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত রাজসাহী বিভাগ লইয়া উত্তরপূর্ব প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে—একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নর সে প্রদেশ শাসন করিবেন।

পাইওনিয়ার লিখিয়াছেন, আগামী শীতকালে ভারত গবর্নমেন্টের কার্য ঘটনা বা বৈচিত্র্যবিহীন হইবে না। লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব কার্যে পরিণত না করিয়া ছাড়িবেন না। এ সম্বন্ধে যে প্রতিবাদ হইয়াছে, তাহা উপেক্ষা করিয়া একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের অধীনে 'উত্তর-পূর্ব প্রদেশ' নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রথমতঃ যে প্রস্তাব করা হইয়াছিল, তাহার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে—উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুরের কিয়দংশ ছিন্ন করার প্রস্তাব পরিহার করা হইয়াছে। নিম্ন প্রদেশের ছোটলাটের কার্যভার লঘু করাই যদি এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য হয়, তবে বঙ্গদেশ হইতে অনেক স্থান ছিন্ন করিতে হইবে, লর্ড কার্জন ইংলণ্ডে অবস্থিতি কালীন এ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই ভারত সচিবের অভিপ্রায় অবগত হইয়াছেন। তিনি বঙ্গের সীমা সঙ্কীর্ণ করিবার জন্য অস্ত্র সজ্জিত হইয়া ভারতবর্ষে আসিতেছেন। বঙ্গের জনসাধারণের নেতৃবর্গ তাহা বেশ বুঝিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য দেখিয়া মনে হইতেছে, তাঁহারা প্রবল আন্দোলনের সূত্রপাত করিতেছেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট কি করিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা অবগত হইতে না পারিয়া তাঁহারা মুসকিলে পড়িয়াছেন। কিন্তু আর কয়েক মাসের মধ্যেই তাঁহারা গবর্নমেন্টের অভিপ্রায় অবগত হইতে পারিবেন।

বঙ্গের নেতৃগণ গবর্নমেন্টের প্রথম প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়া সফল হইয়াছেন। এখন তাঁহাদের নূতন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে হইবে।

সমস্ত চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ আসামের সামিল করা কার্জনের প্রথম প্রস্তাব ছিল। সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছিল, লর্ড কার্জনের ন্যায় লোকও তাহা খণ্ডন করিতে পারেন নাই। কিন্তু লর্ড কার্জন কখনও পরাজয় স্বীকার করিতে পারেন না। রুশ জেনারেল কুরোপটকিন জাপ সৈন্য কর্তৃক মথিত হইতেছেন, তবু মুখে বলিতেছেন আমি পরাভূত হই নাই—তিনি নূতন সৈন্য সহ জাপ সৈন্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জনের প্রস্তাবের অসারতা অকাট্য যুক্তিতে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে—লর্ড কার্জন তবু পরাজয় স্বীকার করেন নাই। তিনি নূতন প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন।

তাঁহার নূতন প্রস্তাবের অসারতা প্রতিপন্ন করা বড় ক্লেশকর ব্যাপার নয়। পাইওনিয়ার লর্ড কার্জনের নূতন প্রস্তাবের মর্ম প্রকাশ করেন নাই বটে, কিন্তু সে সম্বন্ধে স্পষ্ট ইঙ্গিত করিয়াছেন। পাইওনিয়ারে এই প্রবন্ধ লেখক যে উচ্চপদস্থ একজন রাজপুরুষ তাহার কোন সন্দেহ নাই। একবার একজন উচ্চ পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষ আমাদের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন যে, তিনি পাইওনিয়ারের প্রবন্ধ লিখিয়া থাকেন। সেই রাজপুরুষ এখন ভারত গবর্নমেন্টের কোন উচ্চ কার্যে নিযুক্ত আছেন।

আমাদের বিশ্বাস তিনিই পাইওনিয়ারের এই প্রবন্ধের লেখক। এই প্রবন্ধ হইতে দুইটি কথা বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

১। লর্ড কার্জন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ভারত সচিবের সম্মতি গ্রহণ করিয়াছেন।

২। ঢাকা, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রাম বিভাগ ও আসাম আরও কতিপয় জেলা লইয়া উত্তর-পূর্ব প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে।

প্রথম প্রশ্ন এই, কোন কোন নূতন জেলা লইয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা হইবে? আমরা ইংলণ্ড হইতে এই ঠিক সংবাদ পাইয়াছি যে, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত উত্তর-বঙ্গ প্রস্তাবিত নূতন প্রদেশের সামিল করা হইবে।

ইতঃপূর্বেও ঐরূপ প্রস্তাব করা হইয়াছিল। ঢাকা বিভাগের ফরিদপুর ও বাখরগঞ্জ এবং দার্জিলিং ব্যতীত সমস্ত রাজসাহী বিভাগ নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, এরূপ প্রস্তাব কোন বিভাগীয় কমিশনারের মুখে শুনা গিয়াছিল। তখন সংবাদপত্রেও তাহার আলোচনা হইয়াছিল। গবর্নমেণ্টকে এতৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হইয়াছিল, কিন্তু গবর্নমেণ্ট ঐ সকল প্রশ্নের কোন উত্তর প্রদান করেন নাই।

প্রস্তাবটি ক্রমে গুরুতর ও ভীষণ আকার ধারণ করিতেছে। খাস বঙ্গে ৫ বিভাগ—তন্মধ্যে ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম বিভাগ যদি নূতন প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়, তবে কেবল প্রেসিডেন্সি ও বর্ধমান বিভাগ বঙ্গদেশের সামিল থাকিবে। বাঙালি জাতিকে এইরূপে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে কি যে ঘোর অনিষ্ট হইবে, তাহা ভাবিয়া আমরা স্থির থাকিতে পারিতেছি না।

গবর্নমেণ্টের নূতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে যুক্তি অনেক সংগৃহীত হইবে। কিন্তু লর্ড কার্জন যুক্তিতে দমিবার পাত্র নহেন। তিনি একজন কুরোপাটকিন—"though vanquished will arguc still."

যে বঙ্গদেশকে দুই ভাগে ভাগ করিবে, সে বঙ্গের মহাশত্রু। বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলে বাঙালির সর্ব প্রকার উন্নতির পথ বন্ধ হইবে—বাঙালি ক্রমশঃ হীন হইতে হীনতর অবস্থায় পতিত হইবে। এই মহা বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার কি কোন উপায় নাই?

আমরা বলি আছে। লর্ড কার্জনের নিকট যুক্তিতর্ক উপস্থিত করিতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি তিনি কুরোপাটকিন্, তিনি হারিয়াও হার মানিবেন না। সুতরাং বাঙালি জাতিকে বিনাশ হইতে যদি রক্ষা করিতে হয়, তবে অগৌণে ইংলণ্ডে প্রবল আন্দালন করা কর্তব্য।

ভারত সচিবের সভায় অনেক ন্যায়পরায়ণ সভ্য আছেন। ভারত সচিব ও তাঁহার সভার সভ্যদিগকে অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবের অনিষ্টকারিতা বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইংলণ্ডের মন্ত্রিগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, ইলণ্ডের প্রধান রাজনীতিবিদগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লর্ড কার্জনের প্রস্তাবের কুফল বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইংলণ্ডের সংবাদপত্র সম্পাদকগণকে আমাদের মর্মবেদনা জানাইয়া তাহাদিগকে আমাদের সহায় করিতে হইবে। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক সভাসমুহকে আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতে হইবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালি জাতি নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবে। বাঙালির সংখ্যা আর তেমন বৃদ্ধি পাইতেছে না—বাঙালি জাতিকে রক্ষার এক পথ এই ছিল, জাতিভেদের কঠোরতা খর্ব করিয়া বারেন্দ্র, রাঢ়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলন। তাহার সূত্রপাতও হইয়াছিল। কিন্তু অঙ্গচ্ছেদ হইলে সে পথ কণ্টকিত হইবে।

আমরা দৃঢ় বিশ্বাস করি, দিব্যচক্ষে দেখিতেছি, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইলে বাঙালি জাতি বিনষ্ট হইবে। এই মহা বিনাশ হইতে যদি বাঙালিকে রক্ষা করিতে হয়, তবে অবিলম্বে তিনটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

১। অগৌণে প্রত্যেক বাঙালি স্বেচ্ছায় সাধ্যমত অর্থ বঙ্গীয় জমিদার সভার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করুন এবং এক মাসের মধ্যে লক্ষ টাকা সংগৃহীত করুন।

২। অন্যূন ছয় জন বিচক্ষণ ব্যক্তিকে বিরাট সভায় প্রতিনিধি পদে বরণ করিয়া ইংরেজ জাতির দ্বারে দরবার করিবার জন্য প্রেরণ করুন।

৩। সমস্ত বঙ্গে এমন তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হউক যে, গবর্নমেণ্ট তাহা দেখিয়া অঙ্গচ্ছেদের কল্পনা পরিহার করিতে বাধ্য হন।

আবেদন, না আত্মচেষ্টা? ২৭ *আশ্বিন* ১৩১১

বর্তমান মাসের 'ভারতী'তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় 'আবেদন না আত্মচেষ্টা?* শীর্ষক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। রাজনৈতিক আন্দোলনে আমাদের কোন উপকারিতা আছে কিনা, বর্তমান প্রবন্ধটিতে সেই বিষয় আলোচিত হইয়াছে। লেখক মহাশয়ের বক্তব্য এই—"স্বদেশের উন্নতিকল্পে কোন পন্থা প্রশস্ত এই বিষয় লইয়া আমাদের মধ্যে যে ঘোরতর আন্দোলন চলিতেছে, ইহা একটি শুভ চিহ্ন বলিতে হইবে। ইহাতে জানা যাইতেছে, আমাদের অসাড় সমাজদেহে একটু চেতনার সঞ্চার হইয়াছে। আমাদের ন্যায় অন্ন মৎস্যাহার ক্ষুদ্রকায় একটি আসিরিক জাতির অভিনব অসাধারণ অভ্যুদয় ও উন্নতির যে জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত এক্ষণে আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে, উহাই আমাদিগকে একটু উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে সন্দেহ নাই। কোন পথে গেলে, উহাদের ন্যায় আমরাও আবার উন্নতি শিখরে আরোহণ করিতে পারিব, সেই বিষয় আমাদের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ আগ্রহের সহিত আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দুঃখের বিষয়, ইহাতে নীচ দলাদলির গন্ধ মাত্র নাই। কিসে স্বদেশের প্রকৃত কল্যাণ হয়, ইহাই সকলের আন্তরিক কামনা।

"একদল বলিতেছেন, রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্যের প্রতিবাদ করা, তাঁহাদের কর্তব্য বুদ্ধি প্রবুদ্ধ করা, বর্তমান অবস্থায় ইহাই আমাদের মুখ্য কার্য, উন্নতি সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা আমাদের গৌণ কর্তব্য। স্পষ্ট এই কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে ব্যক্ত না করিলেও, তাঁহাদের অনুষ্ঠান উদ্যোগে, এই কথারই আভাস পাওয়া যায়।

"আর একদল বলেন, শুধু আবেদন নিবেদনে জাতীয় উন্নতির সম্ভাবনা নাই। যদি আমরা নিজের চেষ্টায় নিজের অভাব স্বল্প মাত্রও পূরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের আত্মনির্ভরের শিক্ষা হয়। আমার আত্মসম্মান ও আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারি, নিজস্ব বলে বলীয়ান হইতে পারি, জাতীয় গৌরবের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারি, প্রকৃত উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে পারি।... আসল কথা, এই দুই দলের মধ্যে বাস্তবিক পক্ষে কোন মতপার্থক্য নাই..."

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। লেখক পরিষ্কার ও সরলভাবে বিষয়টি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। অতিরিক্ত উপমার ছটায় ও ভাষার আড়ম্বরে বক্তব্য বিষয়কে আবৃত করেন নাই। লেখক নিজে রাজনৈতিক আন্দোলনের বা কংগ্রেসের বিরোধী নহেন। তিনি বলিতেছেন—"আবেদন নিবেদন কি প্রতিবাদ যে আমরা একেবারেই করিব না, আমি একথা বলি না—উহাতেই আমাদের সমস্ত চেষ্টা, সমস্ত উদ্যম, সমস্ত অর্থই যেন ব্যয় না করি, আমার বলিবার ইহাই উদ্দেশ্য।" "আমি কংগ্রেসের বিরোধী নহি। আমি কংগ্রেসের একজন ভক্ত বলিয়া পরিচয় দিতে গৌরবের বিষয় বলিয়া মনে করি। কংগ্রেসের দ্বারা দেশের বাস্তবিকই একটা মহৎ উপকার সাধিত হইয়াছে। ইংরাজের নিকট হইতে দুই একটা প্রসাদ অর্জন করা অপেক্ষা তাহার মূল্য আমি অধিক বিবেচনা করি। কংগ্রেস ভারতের বিভিন্ন জাতির মধ্যে সৌহার্দ্য ও একতার পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এই কংগ্রেসকে ধ্বংস না করিয়া যাহাতে ইহার চেষ্টা উদ্যম বাঞ্ছিত পথে চালিত হয়, তৎপ্রতি স্বদেশবৎসল ব্যক্তি মাত্রেই যত্নবান হওয়া কর্তব্য।

পূর্বে যাঁহারা আত্মচেষ্টার উপর নির্ভর করিতে আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন, তাঁহারা যদি

*বর্তমান গ্রন্থের ২১০ পৃষ্ঠা দেখুন।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর ন্যায় সরল ও সহজভাবে তাঁহাদের বক্তব্য বিবৃত করিতেন, তাহা হইলে হয়ত কোন বাদপ্রতিবাদের কারণ উত্থাপিত হইত না। তাঁহারা আত্মচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন নিতান্ত নিরর্থক বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিতেই আমাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন, কাজেই তাঁহাদের মনোগত অভিপ্রায় যে আমরা বুঝিতে পারি নাই, সে দোষ আমাদের নহে। আসল কথা লইয়া জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর সহিত আমাদের কোন বিরোধ নাই। তবে কোন কোন বিষয়ে আমরা কিছু কিছু আলোচনা করিতে ইচ্ছা করি।

রাজনৈতিক আন্দোলন সমর্থনকারিদের মত সম্বন্ধে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু ভুল করিয়াছেন। "রাজদ্বারে আমাদের দুঃখ নিবেদন করা, রাজপুরুষদিগের কার্যের প্রতিবাদ করা, ইহাই তাঁহাদের মুখ্য কার্য, উন্নতি সাধনের অন্যান্য উপায় অবলম্বন করা তাঁহাদের গৌণ কর্তব্য।" একথা ঠিক নহে। রাজনৈতিক আন্দোলন ও নিজেদের উন্নতি সাধনের চেষ্টা এই উভয়বিধ কার্যকেই তাঁহারা মুখ্য কর্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। সম্প্রতি এটা ছাড়িয়া ওটা ধরিতে হইবে একথা তাঁহারা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহেন। তবে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"তাঁহাদের কোন কার্যে এবং কোন অনুষ্ঠান উদ্যোগে এই কথার আভাস পাওয়া যায়।" তাঁহাদের কোন কার্যে এবং কোন অনুষ্ঠান উদ্যোগে এই কথার আভাস পাওয়া গিয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। যাহাতে দেশজ শিল্পের প্রভূত উন্নতি হইতে পারে, কংগ্রেসের অগ্রণীগণ বহুদিন হইতে সেই বিষয়ে চিন্তা করিতেছেন এবং যথাসাধ্য চেষ্টাও করিতেছেন। প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে, বিগত কয়েক বৎসর হইতে দেশজ শিল্প দ্রব্যের প্রদর্শনী কংগ্রেসের সংশ্রবেই হইয়া আসিতেছে। দেশীয় ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে কংগ্রেসের উদ্যোগী ও সমর্থনকারীদিগকেই বিশেষ উৎসাহী দেখা যাইতেছে।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"আমরাও এক্ষণে ইংরাজের দেখাদেখি এই রাজনৈতিক আন্দোলনের (constitutional agitation) পক্ষপাতী হইয়া উঠিয়াছি। কিন্তু আমরা ভুলিয়া যাই, ইংলণ্ডের রাজ্যতন্ত্র ও আমাদের রাজ্যতন্ত্র সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন।" আমাদের কোন কোন সহযোগী সম্প্রতি বলিতেছেন যে, constitutional agitation শব্দগুলি প্রয়োগ করাও আমাদের পক্ষে যুক্তি সঙ্গত নয়। ভারতবর্ষের constitution-ই নাই, সুতরাং constitutional agitation আমাদের পক্ষে অসম্ভব। এই শ্রেণির লেখকেরা মনে করেন, ইংলণ্ডের constitution-কেই constitution বলে। ভারতবর্ষের কোন constitution নাই। ইহাদের জানা উচিত যে প্রত্যেক দেশেই রাজা ও প্রজার সম্পর্ক কতকগুলি নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ। রাজ্য শাসনের যে নিয়ম তাহারই নাম constitution। ভারতবর্ষেরও একটা constitution আছে। রাজা বা রাজপ্রতিনিধি এদেশে যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন না। তাঁহার সমুদায় কার্যকলাপ নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু নিজেও স্বীকার করিতেছেন—"ইংলণ্ডের রাজতন্ত্র অনুসারে শাসন বিষয়ে আমাদের রাজার ব্যক্তিগত কোন ক্ষমতা নাই। পার্লামেন্টই আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা।" সুতরাং constitutional agitation আমাদের পক্ষে অসম্ভব নহে। অবশ্য একথা সত্য যে, প্রজা সাধারণের নিজের ভিতর যদি শক্তি থাকে, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট তাহাদিগকে উপেক্ষা করিত না। আমাদের ভিতর সে শক্তি নাই বলিয়াই আমাদের আন্দোলন সেরূপ শক্তিশালী হয় না। তবে আমাদের আন্দোলন যে নিরর্থক সে কথাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করিব। আমরা অনেক সময় দেখিয়াছি যে, গবর্নমেন্ট আমাদের আন্দোলন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। প্রমাণ স্বরূপ স্যর চার্লস এলিয়টের জুরী সম্বন্ধীয় অনুজ্ঞার উল্লেখ করা যাইতে পারে। পার্লামেন্ট আমাদের হর্তাকর্তা বিধাতা বলিয়াই আমাদের দেশে আন্দোলনের সার্থকতা আছে। ভারত গবর্নমেন্ট সর্বদাই পার্লামেন্টের মুখের দিকে তাকাইয়া কথা বলিতে বাধ্য হন। আমাদের আন্দোলনের ফলে যদি পার্লামেন্ট কোন কৈফিয়ৎ চাহেন, এ ভয় ভারত গবর্নমেন্টকে সর্বদাই করিতে হয়। এই যে লর্ড কার্জনের ন্যায় একজন বিচক্ষণ ও জবরদস্ত শাসনকর্তা ইংলণ্ডের নানা স্থানে নিজের শাসন নীতির প্রশংসা গীতি

াাহিয়া ফিরিলেন, তাহার কারণ কি? ইংলণ্ডের পার্লামেন্ট ও জনসাধারণের প্রতিবাদের ভয় কি তাহার প্রধান কারণ নহে? সুতরাং এদেশে আন্দোলন করা অপেক্ষাও বিলাতে আন্দোলনের চেষ্টা করা আমাদের অধিকতর কর্তব্য। আমরা মাঝে মাঝে ইংলণ্ডে আন্দোলনের যে, অত্যন্ত ক্ষীণ চেষ্টা করিতেছি, তাহাতেই অনেক সুফল লাভ করিতে পারিয়াছি।" ইংলণ্ডে এখন সাম্রাজ্যিকতার ধুয়া যতই উঠুক না কেন, ইংলণ্ডের স্বার্থপরতা যতই বৃদ্ধি পাইয়া থাকুক না কেন, তত্রাচ একথা সত্য যে, ইংলণ্ডে এখনও এমন কোন কোন সহৃদয় লোক আছেন, যাঁহাদের সহানুভূতি সাহায্য আমরা লাভ করিতে পারিব। ইংলণ্ডের জনসাধারণ ভারত শাসন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, তাহাদিগকে ভারতের অবস্থা জানান কর্তব্য এবং জানাইলে যে কোন ফল লাভের আশা নাই, একথা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। বাস্তবিক কথা এই, আমরা কাজে বেশি কিছু করি নাই। সামান্য স্বার্থত্যাগ করিতেও আমরা কুণ্ঠিত, অথচ হাতে হাতে ফললাভ না করিতে পারিলেই নিরাশ হইয়া পড়ি।

১৮৮৯ সনের কংগ্রেসে পরলোকগত মহামতি ব্রাড্‌ল মহোদয় বলিয়াছেন—"do not expect too much, and do not expect all at once. Do not disappointed if of the largest claims only something is conceded." অর্থাৎ "অত্যন্ত অধিক আশা করিও না, এবং হঠাৎ কৃতকার্যতা লাভের আশা করিও না। তোমাদের সম্পূর্ণ দাবির কতকাংশ লাভ করিয়াছ বলিয়া কখনও নিরাশ হইও না।" ব্রাড্‌ল যে কেবল আমাদের বন্ধু ছিলেন, তাহা নহে। তিনি অসামান্য বীর ছিলেন। তিনি ন্যায়ের জন্য এবং মানবের মতের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রাণপণ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই।

যাঁহারা constitutional agitation-এর বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে মহামতি ব্রাড্‌লর নিম্নলিখিত কথাগুলি স্মরণ করাইয়া দিতেছি।—"You have the constitutional right, not of going into the House and being heard yourselves, but of sending your petitions there from every town, from every division—from far off Sind and from every part. And I would ask you, if you really want to make me your mouthpiece in that House, to send signatures to petitions which you understand, by the thousand, by the hundreds of thousands, by the million if you so that India's people may kneel-and there is not shame in kneeling on the threshold where the months of Parliaments sits and ask that she may do justice to those 6,000, 7,000, 8,000 miles away, in the same way that she has done such justice to those who can assemble with a living voice within hearing of her own walls."

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বলিতেছেন—"আসল কথা, যতটুকু স্বকীয় স্বার্থের অনুকূল, ততটুকুই ইংরাজ আমাদের জন্য করিয়াছেন ও এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, তাহার অধিক নহে।" একথা সত্য। কিন্তু গবর্নমেন্ট ভ্রমবশতঃ এমন কাজও অনেক সময় করেন, যাহা ইংরাজের ও আমাদের স্বার্থের পরস্পর বিরোধী নহে। সুতরাং সে সকল বিষয়ে আন্দোলন বা আবেদনের স্বরূপ গবর্নমেন্টের মনোযোগ আকর্ষণ করা যায় এবং করিলে কৃতকার্য হইবারও সম্ভাবনা আছে। লেখক মহাশয় বলিতেছেন—"আমরা যদি তাঁহাদের ধর্মবুদ্ধি ও ন্যায়পরতার দোহাই না দিয়া, তাঁহাদের স্বার্থের দিক দিয়া তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারি, বরং তাহাতে কিছু কাজ হইতে পারে।" কংগ্রেসও কনফারেন্সে আমরা যে তাহা করিতেছি না তাহা নহে। আমরা সর্বদাই বলিতেছি যে, ভারতীয় প্রজার সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করা ইংরাজের স্বার্থ। প্রজাগণ যদি নিঃস্ব ও দুর্দশাগ্রস্ত হইয়া পড়ে তাহা হইলে ইংরাজের ব্যবসা এদেশে বেশি দিন চলিবে না।

লেখক মহাশয় বলিতেছেন—"কি কনসারবেটিব কি লিবারেল ইংলণ্ডের যে কোন পক্ষই কর্তৃত্ব লাভ করুক ইহাদের কাহারও আমলে 'অস্ত্র আইন' রহিত হইবার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

ভারতের আয়-ব্যয়ের উপর আমাদের বাস্তবিক কর্তৃত্ব লাভের কি কোন আশা আছে? ভারতের স্বার্থের উদ্দেশ্যে ম্যাঞ্চেষ্টারের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবে এরূপ কখনও কি আমরা প্রত্যাশা করিতে পারি?" ইহার কোনটিই সম্ভবপর নহে মানিলাম। তবে এখন কি করিতে হইবে? মনে করুন আমরা রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করিয়া দিয়া যাহাতে আত্মনির্ভর শিখিতে পারি, তাহারই চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলাম—অর্থাৎ এদেশের ব্যবসায় শিল্পের উন্নতি, সাধারণ শিক্ষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার নৈতিক ও দৈহিক বল সঞ্চয় প্রভৃতির চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলাম। ইংরাজ গবর্নমেন্ট ত আর নির্বোধ নহেন, কাল যদি দেখেন যে, বিলাতের স্বার্থের ব্যাঘাত হইতেছে, তাহা হইলে আমাদের সমুদায় চেষ্টা যদি এক দিনেই ব্যর্থ করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা কি করিব?

উপসংহারে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা কংগ্রেস, কনফারেন্স ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী। কংগ্রেসে প্রতি বৎসর যে টাকা ব্যয়িত হইয়া থাকে, কংগ্রেসের হিতকল্পে যে উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়, তাহা নিতান্তই যৎসামান্য বলিয়া মনে করি। আমাদের যে সফলতা লাভ হইতেছে না, আমাদের অযোগ্যতাই তাহার একমাত্র কারণ। কিন্তু আমরা রাজনৈতিক আন্দোলনের পক্ষপাতী বলিয়া আত্মচেষ্টার বিরোধী নহি। বরং আমরা মনে করি, আত্মনির্ভর ভিন্ন আমাদের গতি নাই। রাজনৈতিক আন্দোলন ও আত্মচেষ্টা উভয়ই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য মনে করিয়া দ্বিগুণতর উৎসাহের সহিত কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে হইবে। যতদিন আমরা তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের সমস্ত চেষ্টাই নিষ্ফল হইবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ২ *অগ্রহায়ণ* ১৩১১

ভারত গবর্নমেন্ট বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছে—আমাদের বড় আশার ধন স্যর এন্ড্রু ফ্রেজারও বাঙালি জাতির এই সর্বনাশ সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। ভারত গবর্নমেন্টের নির্ধারণ এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই কিন্তু, একথা ঠিক যে উত্তর পূর্ব প্রদেশ নামে এক নূতন প্রদেশ গঠিত হইবে—আসাম, ঢাকা বিভাগ চট্টগ্রাম বিভাগ ও দার্জিলিং ছাড়া সমস্ত রাজসাহী বিভাগ সেই প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর সেই প্রদেশের শাসনকর্তা হইবেন।

সে নূতন প্রদেশে হাইকোর্ট, রেভিনিউ বোর্ড ও ব্যবস্থাপক সভা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিনা, তৎ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় নাই। ব্যবস্থাপক সভা যদি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে জেলা বোর্ড প্রভৃতিকে তাহার সভ্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হইবে কিনা, তাহাও কেহ জানে না।

গবর্নমেন্ট গোপনে কি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, গবর্নমেন্ট সংগোপনে ভারত সচিবের নিকট কি লিখিয়াছেন, তাহা কেহ বলিতে পারে না। ভারত গবর্নমেন্ট যখন চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব করিয়াছেন, তখন বেশ সরল প্রাণে সে কথা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এবার অন্ধকারে কার্য করিবার প্রবৃত্তি হইল কেন? আমাদের মঙ্গলের জন্য যদি গবর্নমেন্ট কোন কার্য করিতে বাসনা করিয়া থাকেন, তবে আমাদের নিকট তাহা গোপন রাখিবেন কেন?

গবর্নমেন্ট কি মন্ত্রণা করিয়াছেন, আমরা তাহা জানিতে চাই। গবর্নমেন্টের মন্ত্রণা অবশ্যই আমাদিগকে জানাইতে হইবে। গবর্নমেন্ট নূতন প্রস্তাব সম্বন্ধে আমাদের মতামত প্রকাশের সুবিধা করিয়া দিন। যদি না দেন, তবে এই গবর্নমেন্টকে কেহ ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট বলিবে না। তবে রুশ গবর্নমেন্ট ও কার্জন গবর্নমেন্টে কোন বিভিন্নতা থাকিবে না।

লর্ড কার্জনের গবর্নমেন্টে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহ এক কলমের খোঁচায় আইন বহির্ভূত আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে প্রস্তাবের কথা প্রকাশ হওয়ামাত্র পূর্ব বাংলায় এমন গভীর গর্জন, এমন তীব্র প্রতিবাদ, এমন ভীষণ আন্দোলন হইয়াছিল যে, লর্ড

কার্জনের মত একরোখা লোকও থমকিয়া দাঁড়াইয়া ছিলেন, ভয় ও বাক্য বলে পূর্ববাংলার লোকদিগকে স্বমতাবলম্বী করিবার জন্য প্রভূত আয়োজন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার বাক্য বা ভ্রূ-ভঙ্গীতে একটি প্রাণীও তাঁহার মতাবলম্বী হয় নাই; বরং তাঁহার বাক্য ও যষ্টি সঞ্চালন দর্শন করিয়া সমস্ত লোক আরও ঘন সন্নিবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছিল।

সমস্ত পূর্ববঙ্গের প্রবল প্রতিবাদে লর্ড কার্জন অবশেষে বুঝিয়াছিলেন যে, কাজটা সহজে সংসিদ্ধ হইবে না। বাঙালি জাতির যে তেজ আছে, তাহা দেখিয়া তিনি আপনার প্রস্তাব অবশেষে প্রত্যাহার করেন। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে লর্ড কার্জনের মত লোক সঙ্কল্প পরিহার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

লর্ড কার্জন সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু আপনি এক বৃহত্তর সঙ্কল্প রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভীষণ প্রতিবাদের ভয়ে এবার অন্ধকারে কার্য সমাধার চেষ্টা হইতেছে। লর্ড কার্জনের নূতন প্রস্তাব যদি কার্যে পরিণত হয়, তবে বাঙালি জাতির যে মৃত্যু নিশ্চয়, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। লর্ড কার্জনের প্রথম প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে ক্ষুদ্র চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা ময়মনসিংহের বাঙালিদের বাঙালিত্ব লোপ পাইত ; নূতন প্রস্তাব কার্যে পরিণত হইলে পূর্ব ও পশ্চিম উভয়দিকের বাঙালিদের বাঙালিত্ব লোপ পাইবে। বর্ধমান ও প্রেসিডেন্সি বিভাগের বাঙালি যদি রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের বাঙালিদিগের হইতে ছিন্ন হয়, তবে শুষ্ক কঞ্চিখণ্ডের ন্যায় সকলেই ভাঙিয়া পড়িবেন। পূর্ব ও পশ্চিমের বাঙালি আর পরস্পরকে আপনার বলিয়া চিনতে পারিবে না। ভয়ঙ্কর সামাজিক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইয়া যাইবে।

গবর্নমেন্টের নূতন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে মহা আন্দোলনের সূচনা হইয়াছে। কলিকাতায় এক সপ্তাহের মধ্যেই ঘনীভূত প্রতিবাদের জন্য এক কমিটি স্থাপিত হইবে—সমস্ত দেশে প্রতিবাদের আগুন জ্বলিয়া উঠিবে—ইংলণ্ডে সে প্রতিবাদের ধ্বনি পঁহুছিবে — আমরা পড়িয়া পদাঘাত সহিব না। ইংরেজ জাতির নিকট, আমাদের রাজার নিকট, রাজপুরুষদের দুর্ব্যবহারের প্রবল প্রতিবাদ করিব। ফল অবশ্যই হইবে।

সমস্ত দেশ তবে জাগ। এবার কেবল পূর্ববঙ্গ নয়, এবার পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ একত্র হইয়া আন্দোলনের গভীর তরঙ্গ উত্থিত কর। বাঙালি জাতিকে মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা কর।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

অনরেবল অম্বিকাচরণ মজুমদারের পত্র

৯ অগ্রহায়ণ ১৩১১

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের ভীষণ বার্তা শুনিয়া বঙ্গবাসী ব্যাকুল ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছেন। কিন্তু গবর্নমেন্ট এ সম্বন্ধে কোন কথা ব্যক্ত করিতেছেন না। ইহাতে দেশবাসীর আতঙ্ক আরও বর্ধিত হইয়াছে। ঢাকা বিভাগের নবনিযুক্ত প্রতিনিধি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে প্রকৃত সংবাদ জানিবার জন্য প্রশ্ন করিবেন বলিয়া কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু কবে যে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইবে তাহা কেহ জানে না। এদিকে কর্তৃপক্ষের এই নিদারুণ নীরবতায় দেশের লোক বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না যে, এই বিপদে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। এই সমস্যায় পতিত হইয়া ঢাকা বিভাগের সদস্য বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার অবশেষে সাক্ষাৎভাবে ছোটলাটের প্রাইভেট সেক্রেটারির নিকট পত্রযোগে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন একথা সত্য কিনা? বাবু অম্বিকা এই পত্রখানি প্রেরণ করিয়া পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধির উপযুক্ত কার্যই করিয়াছেন। অম্বিকাবাবু ছোটলাটকে লিখিয়াছেন—"প্রথমবার

যখন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়, দেশের লোক তখন অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াছিল, এবং সেই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিল। তারপর তাহারা পরিবর্তিত প্রস্তাবেরও প্রতিবাদ করিয়াছিল। ইহার পর দেশের লোক মনে করিয়াছিল, গবর্নমেন্ট দয়াপরবশ হইয়াছেন। সুতরাং এক্ষণে গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া লোকমণ্ডলী অত্যন্ত আতঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা গবর্নমেন্টের মনোভাব অবগত হইতে পারিতেছে না। সংবাদপত্রে পুনঃপুনঃ এই কথা আলোচিত হইতেছে, গবর্নমেন্ট তাহার কোন উত্তর দিতেছেন না। ইহাতে লোকের সন্দেহ ও উত্তেজনা উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতেছে। সুতরাং জনসাধারণের প্রতিনিধি রূপে আমি ছোটলাট বাহাদুরের নিকট এ সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ শুনিবার জন্য আবেদন করিতেছি। গবর্নমেন্ট যদি অঙ্গচ্ছেদের সঙ্কল্প না করিয়া থাকেন, সংবাদপত্রের প্রচারিত সংবাদ যদি সত্য না হয়, তাহা হইলে জনসাধারণকে এ সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে না দিয়া তাহাদিগকে অনর্থক উত্তেজনা ও আন্দোলনে নিমজ্জিত করা কখনই ন্যায়সঙ্গত হইবে না।"

বলা বাহুল্য, স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার এই পত্রের কি উত্তর প্রদান করেন, তাহা জানিবার জন্য বঙ্গবাসী উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন।

জাতীয় মহাসমিতি। সম্পাদকীয়

১৬ *অগ্রহায়ণ* ১৩১১

আর তিন সপ্তাহ পরে বোম্বাই নগরে জাতীয় মহাসমিতির অধিবেশন হইবে। স্যর হেনরি কটন সভাপতির পদে বৃত হইয়াছেন। আর এক সপ্তাহ পরেই তিনি ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিবেন। ভারতের এই অকৃত্রিম সুহৃদ—যিনি যৌবনে রাজকার্য করিতে করিতে ভারতের হিত চিন্তা করিয়াছেন, বৃদ্ধ বয়সে রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও ভারতের হিত চেষ্টা করিতেছেন। সেই স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবারণ কংগ্রেসে উপস্থিত হইবার জন্য স্বদেশ হইতে শীঘ্রই যাত্রা করিবেন।

নির্ধারিত বিষয়গুলির মধ্যে কয়েকটি নূতন নূতন বিষয়বস্তু বিশেষ প্রয়োজনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই বোম্বাইর কর্তৃপক্ষগণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের মত গুরুতর বিষয় ভুলিয়া গিয়াছেন। মহাসমিতিতে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আলোচনা করা কর্তব্য। আমরা আশা করি, এই বিষয় আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পরিগণিত হইবে। কর্তৃপক্ষগণ আরও একটি গুরুতর বিষয়ে বিস্মৃত হইয়াছেন। শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ভারতবর্ষ হইতে যুবকদিগকে দলে দলে বিদেশে প্রেরণ করা কর্তব্য। যেমন বঙ্গদেশে এ সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছে এবং যুবকদিগকে বিদেশে পাঠাইবার আয়োজন করা হইয়াছে, ভারতের প্রত্যেক প্রদেশে সেইরূপ আয়োজন করা কর্তব্য। শিক্ষা বিস্তারের কথা ভুলিয়া গেলে, জাতীয় মহাসমিতির কর্তব্য অপূর্ণ থাকিবে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ১৬ *অগ্রহায়ণ* ১৩১১

অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলনে বঙ্গদেশ আবার জাগিয়া উঠিতেছে। ময়মনসিংহের মুক্তাগাছা হইতে কল্য আমরা নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছি—"People was greatly frightened at the news of threatened transfer of Mymensing to Assam. Preliminary consultation meeting of over 200 inhabitants of Bahadurpur and neighbouring villages in Mymensing was held yesterday. It was unanimously resolved to hold public meetings in various places and petition to Government against the proposal." বাহাদুরপুরের অধিবাসীগণ মানুষের মত কাজ করিয়াছেন। তাঁহারা নিকটবর্তী গ্রামসমূহের ২০০ লোক লইয়া ইতি কর্তব্য নির্ধারণ করিতেছেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব শুনিয়া তাঁহারা আতঙ্কিত

হইয়াছেন। নানা স্থানে সভা করিয়া এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। যাহাদের দেহে মানুষের প্রাণ আছে তাহারা নির্বিবাদে স্বজাতির সর্বনাশ হইতে দিবেন না। এবার বঙ্গ ও ইংলণ্ডব্যাপী আন্দোলনের প্রয়োজন। নতুবা এ মহাবিপদ কাটিবে না।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে সংবাদপত্রসমূহে যে সকল কথা আলোচিত হইয়াছে এ পর্যন্ত তদতিরিক্ত আরও কিছু জানা যাইতেছে না। সম্প্রতি অমৃতবাজার পত্রিকার পরিচালকগণ ছোটলাটের প্রধান সেক্রেটারির নিকট এসম্বন্ধে এক পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। তদুত্তরে মিঃ কার্লাইল লিখিয়াছেন—

"With reference to your letter regarding the proposed partition of Bengal, I can give you at present no information. The matter is before the Government, and until the Lieutenant Governor can ascertain what information is available, he can give none. So far he has not received any information from the Government of India which he can make public."

অর্থাৎ, বঙ্গভঙ্গ সম্বন্ধে প্রধান সেক্রেটারি আপাততঃ কোন সংবাদই দিতে পারিতেছেন না। বিষয়টি এক্ষণে ভারত গবর্নমেন্টের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ভারত গবর্নমেন্টের নিকট হইতে ছোটলাট এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত প্রকাশযোগ্য কোন সংবাদ পান নাই, কাজেই কিছু বলিতেও পারিতেছেন না।

প্রধান সেক্রেটারির দপ্তর মাফিক এক উত্তর প্রদান করিয়াছেন। আমরা জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গ বিভাগের সংবাদে দেশের জনসাধারণ যে সংশয়াকুল ও উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিতেছেন গবর্নমেন্ট কি তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না? সংবাদপত্রে সম্প্রতি বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে যে সকল কথা প্রচারিত হইয়াছে তাহা যদি প্রকৃত না হয়, অনর্থক প্রজাকুলকে উদ্বিগ্ন হইতে দেওয়া কি গবর্নমেন্টের উচিত কাজ? আর সংবাদপত্রের প্রচারিত সংবাদ যদি কিয়দংশেও সত্য হয়, গবর্নমেন্ট কি প্রজাদিগকে এই সম্বন্ধে তাহাদের মনোভাব ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিবেন না? বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সমগ্র বঙ্গবাসী এক স্বরে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছে। সে প্রতিবাদে লর্ড কার্জনের মত রাজপুরুষও ভীত ও বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, আত্মসম্বরণ করিতে পারেন নাই। গবর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই সে প্রতিবাদের কথা বিস্মৃত হইতে পারেন না। সুতরাং সমগ্র প্রজাকুলের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ এই প্রস্তাবকে গবর্নমেন্ট যদি পুনরায় নূতন ভাবে গঠিত করিয়া বিধিবদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে গবর্নমেন্ট প্রজাকুলের নিকট তৎসমাচার বিদিত করিতে ন্যায়ত বাধ্য। আমরা গবর্নমেন্টকে জানাইতেছি গবর্নমেন্টের এই সংগোপন নীতিতে দেশের লোক গবর্নমেন্টের কার্যকলাপের সম্বন্ধে ক্রমে সন্দেহ পোষণ করিতে শিক্ষা করিতেছে। রাজনীতি ও ধর্মনীতি একই জিনিস নহে, তাহা জানি। কিন্তু রাজনীতি কি ন্যায় বর্জিত? বঙ্গ বিভাগে যাহাদের ইষ্টানিষ্ট জড়িত, তাহারা জানিতে চাহিতেছে, গবর্নমেন্ট বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব সম্বন্ধে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। গবর্নমেন্ট বঙ্গ বিভাগে উদ্যত হইয়াছেন শুনিয়া জনসাধারণ উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়াছে। তাহারা জানিতে চাহিতেছে, সংবাদপত্রের প্রচারিত এই সকল সংবাদ সত্য কিনা? গবর্নমেন্ট লোকের ত্রুটি বা ভ্রম অপনোদন করিতেছেন না; কিম্বা তাহাদিগকে এই সম্বন্ধে প্রকৃত সংবাদ জানিতে না দিয়া গোপনে স্বীয় প্রস্তাব সিদ্ধ করিতেছেন। প্রজামণ্ডলী কি জিজ্ঞাসা করিতে পারে না—এই ব্যবহার কোন নীতিমূলক? ইহা কি ঔরঙ্গজেবের সন্দেহ নীতি; না রুশ গবর্নমেন্টের যথেচ্ছাচার নীতি?

গবর্নমেন্ট পাষাণের ন্যায় নীরব রহিয়াছেন। এদিকে বঙ্গ বিভাগ সম্বন্ধে দেশে নানা কথা প্রচারিত হইতেছে। রেঙ্গুন হইতে এই সংবাদ প্রচারিত হইয়াছে যে আরাকানকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিযুক্ত করিয়া সংকল্পিত নব প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে। গবর্নমেন্ট বলিতে পারেন, জনরবের

জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন। কিন্তু আমরা বলি, যে মিথ্যা জনরবে দেশময় এইরূপ অশান্তির উৎপত্তি হয়, লোকের মনে ত্রাসের সঞ্চার হয়, গবর্নমেন্টের প্রতি লোকে আস্থাহীন হয়, তেমন মিথ্যা জনরবকে গবর্নমেন্ট নীরবে প্রশ্রয় দিতে পারেন না। গবর্নমেন্ট দেশের শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের সর্বজনব্যাপী উত্তেজনা ও আন্দোলনের মধ্যে, দেশের কোন অজ্ঞাত কোণে কে কি অতিরঞ্জিত কথা প্রচার করিয়াছিল, ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন তাহাতে উত্ত্যক্ত হইতে পারেন, তাহা লইয়া আলোচনা ও বিদ্রূপ করিতে পারেন; আর এক্ষণে পাইওনিয়ার প্রমুখ গবর্নমেন্ট পোষিত বিশিষ্ট সংবাদপত্রে সমগ্র দেশের অশান্তিকর যে সকল কথা প্রচারিত হইল, দেশের লোক সে সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য জানিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে, গবর্নমেন্ট তৎসম্বন্ধে সত্য কথাটা প্রকাশ করা একান্তই অনাবশ্যক বোধ করিতেছেন! কিন্তু গবর্নমেন্টের মনোভাব শীঘ্রই ব্যক্ত হইবে। লর্ড কার্জন আগমন করিতেছেন। বঙ্গবাসী সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হও।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ। সম্পাদকীয়

৭ পৌষ ১৩১১

বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নিম্নলিখিত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—পাইওনিয়ারের এই কথা কি সত্য যে বাংলা গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে নিজ মন্তব্য ভারত গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন? যদি তাহা সত্য হয়, তবে সে মন্তব্য আমাদের অবগতির জন্য প্রকাশ করিবেন কিনা? যদি গবর্নমেন্ট সে মন্তব্য প্রকাশ করা উচিত মনে না করেন, তবে তাহার মর্ম প্রকাশ করিবেন কিনা?

বঙ্গীয় গবর্নমেন্টের প্রধান সেক্রেটারী মিঃ কার্লাইল ঐ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে—"গত ডিসেম্বর মাসে ভারত গবর্নমেন্ট বাংলার ছোটলাটের এলাকা হ্রাস করা সম্বন্ধে যে পত্র প্রকাশ করিয়াছিলেন, বাংলা গবর্নমেন্ট তাহার উত্তর ভারত গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। যে মন্তব্য ভারত গবর্নমেন্টের বিবেচনাধীন আছে, তাহা প্রকাশ করা নিয়ম বিরুদ্ধ। সুতরাং ছোটলাট আপাততঃ সেই মন্তব্য বা তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করিতে পারিবেন না।"

গত সোমবারের ইংলিশম্যান লিখিয়াছেন, লর্ড কার্জন সিমলা গমনের পূর্বেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার সম্পন্ন করিবেন। এই ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইবে, অদ্যাপি তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয় নাই। এক চট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন করা হইবে কি চট্টগ্রাম, ঢাকা ও রাজসাহী বিভাগ ছিন্ন করা হইবে, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা হইতেছে। অঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার যেরূপেই সম্পন্ন হউক না কেন, নূতন প্রদেশে লেফটেন্যান্ট গবর্নর, ব্যবস্থাপক সভা ও রেভিনিউ বোর্ড স্থাপনের কথা স্থিরীকৃত হইয়াছে।

বঙ্গের বিপদ ঘনীভূত হইতেছে। বঙ্গের লক্ষ লক্ষ লোক এই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন যে, তাহারা যে ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছেন, গবর্নমেন্ট তাহাতে অবশ্যই কর্ণপাত করিবেন। গবর্নমেন্ট সত্য সত্যই বঙ্গ বিভাগ করিবেন, ইহা যদি প্রকাশিত হয়, তবে সমস্ত বঙ্গ ক্ষিপ্তপ্রায় হইবে। গবর্নমেন্টের প্রকৃত অভিপ্রায় জানিবার জন্য বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার প্রশ্ন করিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্নমেন্ট তাহার কোন উত্তর প্রদান করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন নাই। গবর্নমেন্ট যদি প্রকাশ করিতেন যে, বঙ্গ বিভাগ করিতে গবর্নমেন্ট দৃঢ় সঙ্কল্প হইয়াছেন, তবে সমস্ত বঙ্গে আজ আগুন জ্বলিত।

কিন্তু এত বড় একটা ব্যাপার, যাহাতে বাঙালির উন্নতি অবনতি, বাঙালি জাতির জীবন, মরণ নির্ভর করিতেছে, গোপনে গোপনে তাহা সম্পাদন করা কখনই কর্তব্য নয়। ইংলিশম্যান বলিয়াছেন সিমলা গমনের পূর্বেই লর্ড কার্জন এই কার্য সম্পন্ন করিবেন। ইংলিশম্যান না জানিয়া বোধ হয় এমন গুরুতর সংবাদ প্রকাশ করেন নাই। কোন দিন প্রভাতে উঠিয়া বা আমাদের শুনিতে হয়,

বাংলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সেদিন হৃদয়ে কি বিষম মর্মবেদনা হইবে। কিন্তু সে মর্মবেদনায় কোন ফল হইবে না।

অনেকে মনে করিতেছেন, আইন ভিন্ন বঙ্গ বিভাগ হইতে পারিবে না। কিন্তু লর্ড কার্জন ব্যবস্থাপক সভার প্রথম অধিবেশনের দিনই বলিয়াছেন, এবার এমন কোন আইন করা হইবে না যাহা লইয়া বাদ বিসম্বাদ হইবার সম্ভাবনা। লর্ড কার্জনের বক্তৃতা পাঠ করিলে যাহা স্পষ্ট বুঝা যায়, গবর্নমেন্ট আইন না করিয়াই বঙ্গদেশ বিভাগ করিতে মনন করিয়াছেন। লর্ড কার্জন বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবেন না, এই আশায় বাঙালি নীরব রহিয়াছেন। এ নিশ্চেষ্টতা ও অতিরিক্ত বিশ্বাসের ফল শীঘ্রই ভুগিতে হইবে।

বাঙালি যদি বাঁচিতে চান, তবে অবিলম্বে ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করুন। ইংলণ্ডের কৃপা ভিন্ন, রাজার দয়া ভিন্ন বাঙালির এবার আর কোন পথ নাই।

বঙ্গবিভাগ ও আমাদের কর্তব্য

১৬ অগ্রহায়ণ ১৩১১

মহা সম্মানীয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড কার্জন পুনঃ ভারত সাম্রাজ্যের সিংহাসনারূঢ় হইবার পূর্বে বোম্বাই নগরের মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অভিনন্দনের প্রত্যুত্তরে, আগামী দুই বৎসরে তাঁহার কার্যকাল মধ্যে যে যে রাজকার্য সম্পন্ন করিবেন বলিয়া আভাস দিয়াছেন, তাহাতেও বঙ্গ বিভাগে যেন তাঁহার দার্ঢ্য অনুভব করিলাম।

আমরা বঙ্গদেশবাসী মহা মহিমময় ভারত সম্রাটের একান্ত নিরীহ প্রজা। আমাদিগের মনে মনে আঘাত দেওয়া, লর্ড কার্জনের ন্যায় সুচতুর প্রতিভাশালী, কার্যপটু রাজপ্রতিনিধির পক্ষে অতি তুচ্ছ কাজ। তাহা জানিয়াও নিশ্চেষ্টভাবে বিপদের প্রতীক্ষা করিতে মন চাহে না। সেই জন্য আপনার, এবং আমার স্বদেশবাসীদিগের নিকট এই প্রার্থনা যে, গত বৎসরের ন্যায় এবার মফঃস্বলে সভা সমিতিতে অর্থ ব্যয় না করিয়া, বঙ্গদেশের প্রতিনিধিদিগকে লইয়া গত মার্চ মাসের ন্যায় কলিকাতায় এক বিরাট সভা আহ্বান করিয়া, ইংলণ্ডে প্রেরণোপযোগী কতিপয় সংখ্যক প্রতিনিধি নির্বাচন করা হউক, এবং অগৌণে তাঁহাদিগকে ইংলণ্ডে পাঠান হউক। তাঁহারা সেখানে পৌঁছিলে বঙ্গ দেশের প্রধান প্রধান স্থানে সভা করিয়া দেশের লোকের মনের ভাব যথাসম্ভব তাঁহাদিগকে জ্ঞাপন করিয়া তাঁহাদিগকে শক্তিশালী করিলে, আশা করি,আমাদিগের উপকার হওয়ার সম্ভব।

যাহা হউক, নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকিবার আর সময় নাই। প্রার্থনা করি, দেশের নেতাগণ কার্যক্ষেত্রে শীঘ্রই অবতীর্ণ হইবেন। মফঃস্বলের সমস্ত লোক তাঁহাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া রহিয়াছে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়।

নানা কথা

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ, বিরাট সভার আয়োজন। কংগ্রেস মণ্ডপ হইতে আমাদের প্রতিনিধি নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন :—

"Meeting of the representatives of all Bengal districts will be held on the tenth January to consider Partition Question, Sir Henry Cotton presiding."

অর্থাৎ বঙ্গের সকল জেলার প্রতিনিধিবর্গ মিলিত হইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবেন। ১০ জানুয়ারী এজন্য এক বিরাট সভার অধিবেশন হইবে। সার হেনরী কটন সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

জাতীয় মহাসমিতি। বিংশ অধিবেশন

সভাপতির বক্তৃতা। *১৪ পৌষ* ১৩১১

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ ঃ—আমার বঙ্গদেশবাসী পুরাতন বন্ধুবর্গের যে ব্যাপারে অত্যন্ত আন্দোলিত হইতেছে এক্ষণে আমি সেই বিষয় সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলিব। আমি বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করিতেছি। এই ব্যাপারে কেবল প্রাদেশিক স্বার্থ জড়িত নহে। আমরা বুঝিতেছি যে, সম্ভবপর হইলে জাতীয় একতাকে বিচ্ছিন্ন করাই এই প্রস্তাবের গূঢ় অভিপ্রায়। বঙ্গের প্রাচীনতম, সর্বাধিক লোক সংখ্যা বিশিষ্ট এবং সর্বাপেক্ষা অধিক সমৃদ্ধিশালী অংশকে বিচ্ছিন্ন করা হইবে বলিয়া, বাঙালি জাতিকে যথেচ্ছভাবে দ্বিধা বিভক্ত করা হইবে বলিয়া বঙ্গবাসী অত্যন্ত আশঙ্কা ও মর্মবেদনা অনুভব করিতেছেন।

এই প্রস্তাবে জনমণ্ডলী যেরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছে ইতঃপূর্বে আর কোন ব্যাপারে এরূপ দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। প্রস্তাবিত নব প্রদেশের জন্য স্বতন্ত্র এক লেফটেন্যান্ট গবর্নর নিযুক্ত হইবেন এবং স্বতন্ত্র সেক্রেটারি বিভাগ থাকিবে বলিয়া শুনা যাইতেছে। সত্য বটে এই ব্যবস্থায় গবর্নমেন্টের আত্মপর কর্মচারীগণ নূতন পদ ও নূতন নামের সম্ভাবনা দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছেন। কিন্তু এই ব্যাপারের সহিত যাহাদের ইষ্টানিষ্ট সংসৃষ্ট। তাহারা ইহাতে মর্মাহত হইয়াছে। কারণ, ঐতিহাসিক, সামাজিক, আর্থিক ও মানসিক সম্পর্কে বঙ্গদেশবাসীগণ পরস্পর ঘনিষ্ঠ সূত্রে আবদ্ধ; এক্ষণে বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে আশঙ্কায় এই প্রস্তাবে তাহারা মর্মাহত হইয়াছেন।

আমি স্বীকার করি যে, বঙ্গের লেফটেন্যান্ট গবর্নরের কার্যভার লঘু করা কর্তব্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য অন্য উপায়েও সিদ্ধ হইতে পারে। একটি একজিকিউটিভ কাউনসিল গঠন করিয়া কিম্বা তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায়ে, বেহারকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, এই উদ্দেশ্যে গঠন করা যাইতে পারে। বেহার বাঙালির বাসস্থান নহে। বেহারের ২ কোটি অধিবাসি লইয়া বেহারকে এক স্বতন্ত্র চিফ কমিশনারের অধীন করা যাইতে পারে। বঙ্গবাসীদের প্রবল প্রতিবাদের বিরুদ্ধে বঙ্গ বিভাগের জন্য জেদ করিয়া গবর্নমেন্ট অত্যন্ত স্বেচ্ছাচারিতা, দায়িত্ববোধ হীনতা ও সহানুভূতি হীনতার পরিচয় প্রদান করিতেছেন। আমার দৃঢ় ধারণা এই, কোন উদারনৈতিক ভারত সচিব কখনও এই প্রস্তাব সমর্থন করিতেন না। আমি আশা করি ভারত গবর্নমেন্ট সুবুদ্ধি ও সুভাবের দ্বারা চালিত হইয়া এই সর্বজন বিরুদ্ধ প্রস্তাব পরিহার করিবেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

টাউন হলে মন্ত্রণাসভা। *২১ পৌষ* ১৩১১

বঙ্গদেশ হইতে ৮৫ জন প্রতিনিধি কংগ্রেসে গমন করিয়াছিলেন। কলিকাতা, ঢাকা, ময়মনসিংহ, বরিশাল, ফরিদপুর, চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ধুবড়ি, শিলচর, রঙ্পুর, দিনাজপুর, রাজসাহী, পাবনা, খুলনা, বহরমপুর, মেদিনীপুর, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, পূর্ণিয়া, কটক প্রভৃতি বহু জেলার প্রতিনিধিগণ বোম্বাই গমন করিয়াছিলেন। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদই তাঁহাদের প্রধান চিন্তা ও আলোচনার বিষয় হইয়াছিল। তাঁহারা ২৮ শে ডিসেম্বর বেলা ১।। ঘটিকার সময় কংগ্রেস ক্ষেত্রে সম্মিলিত হন। বহরমপুরের সুবিখ্যাত ও সুবিজ্ঞ নেতা শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সভাস্থলে এই প্রস্তাব নির্ধারিত হয় যে আগামী ১০ জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৪।। ঘটিকার সময় কলিকাতা টাউন হলে এক মন্ত্রণা সভার অধিবেশনে হইবে। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক জেলার প্রতিনিধিগণ সেই সভায় উপস্থিত হইবেন। পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তর বঙ্গের প্রত্যেক জেলায় ও প্রত্যেক মহকুমায় বিরাট সভা আহূত হইবে এবং সেই সকল সভা কর্তৃক মন্ত্রণা সভার জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হইবেন।

১০ জানুয়ারি, মঙ্গলবার, অফিস আদালত ছুটি নাই ; তবু ঐদিনই মন্ত্রণা সভার জন্য নির্ধারিত

হইয়াছে। বঙ্গের জীবন রক্ষার জন্য বাঙালি যে সকল স্বার্থ বিসর্জন করিতে পারে, এবার আমরা তাহাই দেখাইব। বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে বাঙালি জাতির যে সর্বনাশ হইবে, সে চিন্তায় যে দিন দিন আমাদের রক্ত শুষ্ক হইতেছে—এবার আমরা তাহা দেখাইব। উকিল অর্থের মায়া পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রণা সভায় যোগদান করিবার জন্য আসিবেন ; জমিদার সকল কষ্ট উপেক্ষা করিয়া জন্মভূমির জীবন রক্ষার জন্য আসিবেন ; প্রজা দরিদ্রতার ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া কলিকাতা আসিবার জন্য অর্থ ব্যয় করিবেন ; বঙ্গের প্রত্যেক জেলা হইতে প্রসিদ্ধ লোকেরা উপস্থিত হইয়া এই জাতীয় মহাসঙ্কটের দিনে গভীর মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হইবেন।

বঙ্গদেশের উপর দিয়া অনেক বিপদ গিয়াছে, কিন্তু এমন বিপদ আর কখনও হয় নাই। আমাদের জাতীয় জীবনের মৃত্যু সম্মুখে দর্শন করিয়া আমরা ভীত, চঞ্চল ও অস্থির হইয়াছি। এই মহাবিপদের দিনে আমাদের কি করা কর্তব্য, মন্ত্রণা সভায় তাহাই নির্ধারিত হইবে।

স্যর হেনরি কটন মন্ত্রণা সভার সভাপতির পদ গ্রহণ স্বীকার করিয়াছেন। আমাদের জাতীয় দুর্দিনে তিনি যে কর্ণধার হইতে অঙ্গীকার করিয়াছেন, ইহাতে আমাদের আশা ও উৎসাহ বর্ধিত হইয়াছে।

বৃহস্পতিবার। *২৮ পৌষ ১৩১১*

অদ্য বৃহস্পতিবার ২৮ পৌষ অপরাহ্ণ ৪টা ৫৫ মিনিটের সময় বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশন গৃহে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে প্রতিনিধিদের এক মন্ত্রণা সভা হইবে। প্রতিনিধিগণকে সাদরে নিমন্ত্রণ করা যাইতেছে।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে টাউন হলে মন্ত্রণাসভা

২৮ পৌষ ১৩১১

যে দিন বোম্বাই হইতে বাঙলার সংবাদপত্রসমূহে এই খবর প্রকাশিত হয় যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে কর্তব্য নির্ধারণের জন্য টাউন হলে বঙ্গের প্রতিনিধিদের মন্ত্রণা সভা হইবে এবং স্যর হেনরি কটন সেই সভার সভাপতি হইবেন, সেদিন হইতে সমস্ত বঙ্গে আবার তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। সেই দিন হইতে পূর্ব ও উত্তর বঙ্গে প্রকাশ্য সভা হইতেছিল, সেই দিন হইতে মন্ত্রণা সভার জন্য প্রতিনিধি নিয়োগ আরম্ভ হয়। গত সপ্তাহে নানা স্থানে প্রতিনিধি নির্বাচনের ত্বরা পড়িয়াছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান, বেঙ্গল ল্যাণ্ডহোল্ডার্স ও ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন মন্ত্রণাসভার আয়োজনে প্রবৃত্ত হন।

৬ জানুয়ারি টেলিগ্রাম আসিল যে, টাঙ্গাইলের জনসাধারণ মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবার জন্য ৫০ জন প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন। ফরিদপুরের জনসাধারণ সভায় ২৮ জন প্রতিনিধি প্রেরণ করিবেন।

ত্রিপুরার অন্তর্গত ব্রাহ্মণবেড়িয়ার প্রকাশ্য সভা ব্যারিষ্টার মিঃ রসুল, হাইকোর্টের উকিল মৌলবি সিরাজ-উল ইসলাম খাঁ বাহাদুর, মৌলবি সামসুল, হুদা, বাবু গোবিন্দচন্দ্র দাস, অবিনাশচন্দ্র সেন, বিধুভূষণ পাল, গিরীন্দ্রনাথ সেন ও অঘোরচন্দ্র সেনকে প্রতিনিধি নির্বাচন করিয়াছেন।

৭ জানুয়ারি টেলিগ্রাম আসিল যে, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত টাউন সেরপুরে এক বহু জনাকীর্ণ সভা হইয়া গিয়াছে। এই সভা ময়মনসিংহের মহারাজ, মহামহোপাধ্যায় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার, বাবু গোপালদাস চৌধুরী, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন চৌধুরী, বাবু হিরণচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি জমিদার এবং বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার, দ্বারকানাথ চক্রবর্তী, গোবিন্দচন্দ্র দে ও রায় হাজারিলালকে টাউন হলের মন্ত্রণা সভার প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়াছেন।

৮ তারিখে টেলিগ্রাম আসিল যে, দিনাজপুরে এক প্রকাশ্য সভা হইয়াছিল। পেনসন প্রাপ্ত

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভা এক বাক্যে অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিয়া মন্ত্রণাসভার জন্য দিনাজপুরের মহারাজা, কুমার পূর্ণেন্দুনারায়ণ রায়, বাবু সুরেন্দ্রনারায়ণ রায় ও বাবু বৃন্দাবনচন্দ্র রায়কে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

বিগত ৫ জানুয়ারি বগুড়ার জনসাধারণ সভার এক প্রকাশ্য অধিবেশন হইয়াছিল। বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুর শোভান চৌধুরী প্রভৃতি ৮ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত হইয়াছেন।

পাবনা হইতে ১০ জন, জলপাইগুড়ি হইতে ১ জন এবং বাঁকুড়ার অন্তর্গত সোনামুখী হইতে ৩ জন প্রতিনিধি মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত হইবেন।

৯ তারিখ এই টেলিগ্রাম আসিল যে, টাঙ্গাইলের অন্তর্গত আলিসাকান্দার তালুকদার সভা এক প্রকাশ্য সভা আহ্বান করিয়া ১৯ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়াছেন।

১০ তারিখ এই টেলিগ্রাম আসিল যে, বহরমপুর হইতে রাজা রণজিৎ সিংহ, বাবু বৈকুণ্ঠনাথ সেন প্রভৃতি ৪ জন, রামপুরহাট হইতে ১ জন, মেদিনীপুর হইতে ২ জন, কৃষ্ণনগর হইতে ২ জন, বীরভূম হইতে ৪ জন, নারায়ণগঞ্জ হইতে ১৪ জন, বরিশাল হইতে ১০ জন, ময়মনসিংহ হইতে ১০০ জন, কিশোরগঞ্জ হইতে ২ জন, নেত্রকোনা হইতে কয়েকজন, আলিসাকান্দা হইতে ১৯ জন, বাজিৎপুর হইতে ৬ জন, মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত মলসী হইতে ৫ জন, জামালপুর হইতে ৫ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছেন।

১১ তারিখ টেলিগ্রাম আসিল যে, ঢাকা হইতে ৬৬, নোয়াখালি হইতে ৬, চট্টগ্রাম হইতে ৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত রুটে হইতে ১, রাজসাহী হইতে ৭, নারায়ণগঞ্জ হইতে ৫, মেহেরপুর হইতে ২ জন প্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়াছে।

টাউন হলে মন্ত্রণাসভার জন্য বিপুল আয়োজন হইল।

পূর্ববঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের কোন কোন স্থান মহোৎসাহে আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনের সঙ্গে এবং ঐ দুই জমিদার সভা ভারত সভার সঙ্গে এক প্রাণ হইয়া মন্ত্রণাসভার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। উদ্যোগ সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে।

গতকল্য বুধবার টাউন হলে বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। সোম ও মঙ্গলবার বিবিধ জেলার বহুসংখ্যক প্রতিনিধি কলিকাতা উপস্থিত হন। ঢাকা, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, বরিশাল, নোয়াখালি, ত্রিপুরা, রাজশাহি, বগুড়া, নদীয়া, বহরমপুর, চট্টগ্রাম, আসাম প্রভৃতি বিবিধ স্থানের প্রতিনিধিগণ বহু অর্থ ব্যয় ও ক্লেশ স্বীকার পূর্বক কলিকাতা আগমন করেন।

গতকল্য অপরাহ্ণ ৫ টার সময় নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ৩টার পূর্বে দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। ৪।। টার সময় সভাস্থল লোকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কলিকাতার সম্ভ্রান্ত লোক ও মফঃস্বলের প্রতিনিধিগণের দ্বারা সভাক্ষেত্র পরিপূর্ণ হইল।

অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার কিঞ্চিৎ পূর্বে স্যর হেনরী কটন সভাস্থলে প্রবেশ করেন, দুই সহস্র লোক দণ্ডায়মান হইয়া আনন্দধ্বনির সহিত স্যর হেনরির অভ্যর্থনা করেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণন করেন। বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে বাঙালির জাতির যে সর্বনাশ হইবে, সংক্ষেপে তাহা প্রকাশ করেন। বাঙালি জাতি যে অঙ্গচ্ছেদের প্রবল প্রতিবাদ করিতেছে তাহা ব্যক্ত করেন এবং অবশেষে স্যর হেনরি কটনকে উপস্থিত বিপদে কি করা কর্তব্য তৎসম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য অনুরোধ করেন।

স্যর হেনরি দণ্ডায়মান হইলেন, আর টাউন হল জয়ধ্বনিতে কাঁপিতে লাগিল। বহুক্ষণ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। তারপর স্যর হেনরি বলিতে লাগিলেন,—বহুকাল পূর্বে একবার চট্টগ্রাম আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল। কিন্তু তৎকালের গবর্নমেন্ট সে প্রস্তাব যুক্তিসঙ্গত মনে না করিয়া তাহা পরিত্যাগ করেন। তারপর তিনি যখন আসামের প্রধান কমিশনার ছিলেন,

তখন ঢাকা ও ময়মনসিংহ এবং চট্টগ্রাম বিভাগ আসামের সামিল করার প্রস্তাব হইয়াছিল। তিনি তখন বলিয়াছিলেন, ঢাকা, ময়মনসিংহ, আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে, একথা যদি প্রকাশিত হয়, তবে ভয়ঙ্কর প্রতিবাদ হইবে, বঙ্গের শাসনকর্তাও সে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিবেন। তারপর সে প্রস্তাব সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হয় নাই। তাঁহার কার্যত্যাগের পর পুনরায় সেই প্রস্তাব উপস্থিত করা হইয়াছে। সমস্ত বঙ্গদেশ সে প্রস্তাবের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়াছে।

গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন, বঙ্গের ছোটলাটের বড় কার্য বাহুল্য হইয়াছে। অতএব তাহার ভার লঘু করা উচিত। তিনি ৩০ বৎসর কাল গবর্নমেন্টের সেক্রেটারিয়েট বিভাগের কোন না কোন কার্য করিয়াছেন। স্যর জর্জ ক্যাম্বেলের সময় হইতে স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি পর্যন্ত সমস্ত ছোটলাটের অধীনে কার্য করিয়াছেন। আগেকার অপেক্ষা এখন ছোটলাটের কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন কথা তিনি স্বীকার করিতে পারেন না।

পূর্বে আসাম বাংলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্যর জর্জ ক্যাম্বেল এক মাসে ডিব্রুগড় গিয়াছিলেন। এখন আসাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা হইয়াছে। তবু কি কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে? পূর্বে চট্টগ্রাম যাইতে ৪ দিন লাগিত, এখন প্রায় ২৪ ঘণ্টায় যাওয়া যায়। পূর্বে পুরী যাইতে হইলে বহু দিন রাস্তায় কাটাইতে হইত, এখন তথায় যাইতে ২৪ ঘণ্টা সময়ও লাগে না। সুতরাং কার্যভার বৃদ্ধি না হইয়া বরং লঘুই হইয়াছে।

পূর্বে ছোটলাটের এত বেশি কার্য ছিল যে, তাঁহারা মহকুমা পরিদর্শন করিবার সময় পাইতেন না, এখন ছোটলাটেরা মহকুমা পর্যন্ত পরিদর্শন করেন। এখন ছোটলাটেরা কত সভা সমিতিতে যোগদান করেন, স্যর এন্ড্রু ফ্রেজার সভায় বক্তৃতা করেন, সামান্য সামান্য বাড়ি ঘর নির্মাণ কার্য পরিদর্শন করেন। ইহা দেখিয়াও কি বলিবেন যে, ছোটলাটের কার্যভার বৃদ্ধি হইয়াছে?

বঙ্গের ছোটলাটের কার্য বৃদ্ধি হয় নাই, সুতরাং বাঙালি জাতিকে দুই ভাগে বিভক্ত করার কোন প্রয়োজন নাই।

বাঙালিরা দুই ভাগে বিভক্ত হইতে চায় না। তাহারা এক সমাজবদ্ধ, তাঁহারা এক ভাষা ব্যবহার করেন। তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইতে অবশ্যই আপত্তি করিবেন। গবর্নমেন্ট বলিয়াছেন "আমরা ওসব ভাবের কথা শুনিতে চাই না।" লর্ড কার্জনের মুখে ভাবের নিন্দা ভাল শুনায় না। লর্ড কার্জন যেমন ভাব-প্রবণ লোক, এমন আর কে আছে? সুতরাং তাঁহার নিকট ভাবের মূল্য অবশ্যই আছে।

লর্ড কার্জন ইউনিয়নিস্ট দলের লোক। অর্থাৎ আয়র্ল্যাণ্ডকে ইংলণ্ডের সহিত মিলিত রাখিতে ইচ্ছুক। আয়র্লাণ্ডের লোক পৃথক হইতে চায়, তবু তিনি আয়র্ল্যাণ্ডকে পৃথক হইতে দিবেন না। কিন্তু বঙ্গদেশের বেলায় তাঁহার বিপরীত কার্য করা ভাল নয়। বঙ্গদেশ একত্র থাকিতে চায়, তাহাকে পৃথক করিয়া দেওয়া কি তাঁহার মত লোকের কর্তব্য কার্য?

বঙ্গদেশ পৃথক করা উচিত নয়। যদি বল, বঙ্গের শাসন কার্য একজনের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে না, তবে বঙ্গ শাসনের জন্য মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ের ন্যায় গবর্নর ও মন্ত্রীসভা গঠন কর। লর্ড কার্জন বলিয়াছেন, গবর্নরের দ্বারা শাসন কার্য সুচারু রূপে নির্বাহ করা হয় না। গবর্নরেরা অনেকটা স্বাধীন, সুতরাং লর্ড কার্জন যে গবর্নর পছন্দ করেন না, তাহার কারণ বেশ বুঝা যায়। আচ্ছা যদি গবর্নরের দ্বারা শাসন কার্য ভাল না হয়, তবে এ পদ উঠাইয়া দিবার চেষ্টা করেন না কেন? তাহা হইলে পার্লামেন্টে অপদস্থ হইতে হইবে, সেই ভয়েই বোধ হয় সেরূপ প্রস্তাব কখনও করিবেন না। আসল কথা এই গবর্নর নিযুক্ত করিলে বঙ্গের শাসন কার্য আরও উৎকৃষ্ট হইবে।

বঙ্গ বিভাগের কোন প্রয়োজন নাই। যদি করিতে হয়, তবে বেহার ও ছোটনাগপুর এক প্রধান কমিশনারের অধীন কর। কোন কোন বেহারী বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে চান, একথা যদি

সত্য হয় তবে বেহারকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করলেই চলিতে পারে।

আসাম বঙ্গদেশের সহিত মিলিত হইয়া থাকিতে চায়। শ্রীহট্ট ও কাছাড়ের লোক পুনরায় বঙ্গদেশের অন্তর্ভুক্ত হইলে অত্যন্ত আনন্দিত হইবে। তাহারা বঙ্গদেশের অনেক সুখ সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছে।

লর্ড কার্জন একজন রাজনীতিবিদ পুরুষ। জনসাধারণের প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করা যে অনুচিত, তাহা তিনি জানে। অতএব আপনারা প্রবল প্রতিবাদ করুন—অক্ষুণ্ণ প্রতিবাদ করুন, যতদিন আপনাদের আশা পূর্ণ না হয়, ততদিন প্রতিবাদ করুন, নিশ্চয়ই সফলকাম হইবেন। কবডেন ও ব্রাইট কতকাল আন্দোলন করিয়াছিলেন, আশা নিরাশার মধ্যে আন্দোলন করিয়াছিলেন। তারপর তাঁহাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল। আপনারা সেইরূপ আন্দোলন করুন। এখানে কিছু না হয়, ইংলণ্ডে আন্দোলন করুন। আপনাদের চেষ্টা বৃথা হইবে না।

আমরা স্যর হেনরি কটনের যুক্তিপূর্ণ, তেজস্বিতা পূর্ণ বক্তৃতার কঙ্কাল মাত্র প্রকাশ করিতে সমর্থ হইলাম। তাঁহার বক্তৃতা শ্রোতাদের প্রাণে নব উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছে।

প্রায় এক ঘণ্টায় স্যর হেনরি কটনের বক্তৃতা শেষ হয়। তারপর বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এই প্রস্তাব করেন যে, এই সভা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে এবং গবর্নমেন্ট এতৎ সম্বন্ধে কি করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিতেছে। এই প্রস্তাব স্যর হেনরি কটনের দ্বারা গবর্নমেন্টের নিকট প্রেরণ করা হউক।

মিঃ আশুতোষ চৌধুরী এই প্রস্তাবের সমর্থন এবং বগুড়ার নবাব আবদুস শোভান চৌধুরী। ময়মনসিংহের মহারাজা এই প্রস্তাবে সমর্থন করেন। সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব ধার্য হয়।

তারপর সৈয়দ সামসুল হুদা প্রস্তাব করেন যে, টাউন হলের সভায় যে কমিটি স্থাপিত হইয়াছিল, সেই কমিটি বঙ্গে অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে যাহা করা কর্তব্য তাহা সত্বরে সম্পাদন করুন।

ঢাকার বাবু রজনীনাথ বসু, রাজসাহীর বাবু শশীভূষণ রায়, ময়মনসিংহের মিঃ আর. কে. দাস ও মিঃ গজনবি, বরিশালের বাবু দেবেন্দ্রকুমার চক্রবর্তী এই প্রস্তাবের সমর্থন করেন এবং সর্ব সম্মতিতে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্যর হেনরি কটনকে ধন্যবাদ করেন এবং জয়ধ্বনির মধ্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বক্তাগণ সকলেই একবাক্যে পুনরায় সহরে সহরে গ্রামে গ্রামে সভা করার প্রয়োজন প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ভারতে ও ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন করিবার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন।

বঙ্গদেশ তবে পুনরায় কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হউক, আন্দোলনের গভীর তরঙ্গ উত্থিত হইয়া সকল বাধা বিঘ্ন ভাসাইয়া লইয়া যাক।

নানা কথা

বঙ্গের অঙ্গছেদ : দ্বারভাঙ্গার মহারাজা বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, গবর্নমেন্ট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে যদি কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকেন, তবে কোন কোন জেলা বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন হইবে এবং তাহার শাসন প্রণালী কিরূপ হইবে? ভারত গবর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব স্যর ডেনজিল ইবেটসন প্রশ্নোত্তর বলিয়াছেন—"এ সম্বন্ধে অদ্যাপি কোনই সিদ্ধান্ত করা হয় নাই।"

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবের প্রতিবাদ *৬ মাঘ ১৩১১*

আমরা গবর্নমেন্টকে জানাইতেছি যে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে সমস্ত পূর্ববঙ্গ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এবার কেবল পূর্ব নয় উত্তরবঙ্গেও চঞ্চলতার লক্ষণ দেখা যাইতেছে। গত বৎসর

আন্দোলনের যে ঝটিকা উঠিয়াছিল এবারও সেইরূপ প্রবল ঝড়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

গত ১৫ জানুয়ারি ময়মনসিংহ নগরে সূর্যকান্ত হলে এক প্রকাণ্ড প্রতিবাদ সভা হইয়া গিয়াছে। মুক্তাগাছার জমিদার বাবু সারদাকিশোর আচার্য চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। মফঃস্বল হইতে অনেক লোক এই সভায় যোগদান করিবার জন্য আসিয়াছিলেন। বৃদ্ধলোকেরা উৎসাহের সহিত মনের দুঃখ প্রকাশ করিতে সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। সভাস্থ সমস্ত লোক লর্ড কার্জনের নিকট দয়া ভিক্ষা করিয়াছেন। সভাস্থ সমস্ত লোক বঙ্গদেশকে, বাঙালি জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য লর্ড কার্জনের নিকট নিবেদন করিয়াছেন। লর্ড কার্জনকে আমরা আর কি বলিব? তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, তিনি অবশ্যই বুঝিতেছেন, তাহার প্রস্তাব বাঙালির প্রাণে কি গভীর যাতনা প্রদান করিয়াছে। তাহাদিগকে এই প্রকার ক্লেশ দেওয়া কি তাহার উচিত? বাঙালি বেশ বুঝিয়াছে বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত হইলে তাহাদের ভীষণ সামাজিক দুর্গতি হইবে। বিবাহাদি সামাজিক সমস্যা এখনই ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ পৃথক হইলে সে সমস্যা মীমাংসার আর কোন উপায় থাকিবে না। বাঙালির আর কত যে অনিষ্ট হইবে, তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। বাঙালি জাতি লর্ড কার্জনকে অনুনয় করিয়া এই কথা বলিতেছে তিনি তাঁহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করুন; অবিলম্বে ঘোষণা করুন বঙ্গদেশ দুইভাগে বিভক্ত করিবেন না,বাঙালির প্রাণের দুশ্চিন্তা চলিয়া যাক, বাঙালিরা তাহাকে আশীর্বাদ করিবার সুবিধা লাভ করুক।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ *৬ মাঘ ১৩১১*

বিলাতের কথা। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানের লণ্ডনস্থ সংবাদদাতা লিখিয়াছেন—লর্ড কার্জন দেশে আসিয়া যে সকল স্থিরীকৃত করিয়া গিয়াছেন, শুনিলাম বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ তাহার অন্যতম। এই প্রস্তাব লইয়া ভারতে খুব আন্দোলন প্রতিবাদ হইয়াছে সত্য, কিন্তু তথাপি এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতেই হইবে বলিয়া লর্ড কার্জন স্থির করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু প্রস্তাবটি প্রথম যেরূপ ছিল তাহা অপেক্ষা অনেকাংশে পরিবর্তিত হইয়াছে। উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া মধ্যপ্রদেশের সহিত যুক্ত করিবার কথা হইয়াছিল, এই প্রস্তাব এক্ষণে পরিত্যক্ত হইয়াছে। আসামের সন্নিহিত স্থানসমূহ উক্ত প্রদেশের সহিত যুক্ত হইবে এবং এই নবগঠিত প্রদেশকে উত্তরপূর্ব প্রদেশ নামে অভিহিত করিয়া একজন লেফটেন্যান্ট গবর্নরের অধীন করা হইবে। বঙ্গীয় গবর্নমেন্ট সম্ভবতঃ সিকিম ও ভুটানের রাজনৈতিক দায়িত্ব হইতে মুক্ত হইবেন। এই দুই প্রদেশের দায়িত্ব ভারত গবর্নমেন্ট গ্রহণ করিবেন। সে যাহা হউক, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে। ভারতীয় বণিকগণ এই প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

স্যার হেনরী কটনের মন্তব্য ও মন্ত্রণা *৬ মাঘ ১৩১১*

বিগত ১১ই জানুয়ারি কলিকাতা টাউন হলের মন্ত্রণা সভায় সার হেনরি কটন যে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিতেছি। সকলে ইহা মনোযোগের সহিত পাঠ করুন এবং তাঁহার মন্ত্রণানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হউন ইহাই আমাদের অনুরোধ।

"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব সম্পর্কে আজ এই যে মন্ত্রণাসভার অনুষ্ঠান হইয়াছে ইহার সভাপতি রূপে আমি এস্থলে উপস্থিত হইয়াছি। ভদ্র মহোদয়গণ, আপনাদের প্রতি আমার প্রথম উপদেশ এই আপনারা আপনাদের মত সংগঠনে সদ্বিবেচনা ও ধীরতা অবলম্বন করিবেন। আপনারা স্পষ্টরূপে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করিবেন, কিন্তু কর্তৃপক্ষের প্রতি সমুচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ভুলিবেন না। তীব্র ভাষা ব্যবহার করিয়া কিম্বা কড়া কথা বলিয়া কিছুই লাভ নাই। আমাদের উদ্দেশ্য. যুক্তি দ্বারা কর্তৃপক্ষকে আমাদের মতাবলম্বী করা। আমাদের বর্তমান গবর্নর

জেনারেল কোনরূপ তীব্র মন্তব্য বা কঠোর ভাষায় বিচলিত হইবার লোক নহেন। আমি জানি তিনি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে এদেশের হিতকল্পে একান্ত অনুরাগী। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার বিবেচনা বা মতের সঙ্গে আমাদের মতের মিল নাই। যাহাই হউক, লর্ড কার্জনের সবল ও প্রবল ন্যায় নিষ্ঠা, অন্যান্য অত্যাচার দমনের জন্য একান্ত আগ্রহ, এবং তাঁহার বিবেকানুবর্তিতা প্রভৃতি গুণ সম্বন্ধে কোন সন্দেহই হইতে পারে না। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে তিনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে যে প্রস্তাব উত্থাপিত করিয়াছেন তাহা লইয়াই তাঁহার সঙ্গে আমাদের বিষম অনৈক্য। এ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ সম্মানের সহিত তাঁহার নিকট আমাদের মন্তব্য জানাইতে পারি এবং সম্ভব হইলে প্রস্তাবটি পরিহারের জন্য কিম্বা প্রস্তাবটির বিশেষ আপত্তিকর অংশগুলি যতদূর সম্ভব বাদ দিতে তাঁহার নিকট আমাদের প্রার্থনা জানাইতে পারি। এসম্বন্ধে আমাদের এই একমাত্র কর্তব্য পথ। তবে আমাদের অসুবিধা এই, আমরা জানি না যে প্রস্তাবটি বর্তমানে কি আকার ধারণ করিয়াছে।

অঙ্গচ্ছেদের মন্ত্রণা

এই বঙ্গব্যবচ্ছেদ প্রস্তাবটি ঠিক ত্রয়োদশ বৎসর পূর্বে এই সময়েই প্রথম সূচিত হয়। ভারতের উত্তরপূর্ব প্রান্ত সুরক্ষিত করিবার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার্থ বঙ্গের লেফটেনান্ট গবর্নর, ব্রহ্মের চিফ কমিশনার, আসামের চিফ কমিশনার এবং কয়েকজন উচ্চপদস্থ সৈনিক কর্মচারী এক মন্ত্রণা সভায় সমবেত হন। তখন এইরূপ প্রস্তাব হইয়াছিল যে, লুসাই পাহাড়ের সন্নিকট ভূভাগ আসামের সহিত যুক্ত করা হইবে এবং এই স্থানের শাসন কার্যের সুবিধার জন্য চট্টগ্রাম বিভাগও আসামের অন্তর্গত করা হইবে। ইহা হইল ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের কথা।

দ্বিতীয় মন্ত্রণা

তারপর, ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই ব্যাপার আরও একটু অগ্রসর হইল। স্যর উইলিয়ম ওয়ার্ড তখন আসামের শাসনকর্তা। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, এই সঙ্গে ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলা আসামের সামিল করা হউক। স্যর উইলিয়মের পর আমি আসামের চিফ কমিশনার হই। ভারত গবর্নমেন্ট এ বিষয়ে আমার মত জিজ্ঞাসা করেন। আমি চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং বঙ্গদেশকে বেশ জানি। আমি আমার অভিজ্ঞতা অনুসারে এক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া গবর্নমেন্টকে জানাই যে, চট্টগ্রাম বিভাগকে আসামের অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব অত্যন্ত অসঙ্গত—ঢাকা ও ময়মনসিংহের কথা তো উল্লেখ করাই অনাবশ্যক। কিন্তু আমি একথা বলিয়াছিলাম যে, লুসাই প্রদেশ আসামের অন্তর্গত করিলে আমি আনন্দিত হইব। তদনুসারে লুসাই প্রদেশ আসামের সহিত যুক্ত হইল, এবং বঙ্গের অপরাপর অংশ আসামের সামিল করার প্রস্তাব গবর্নমেন্ট পরিহার করিলেন। স্মরণ হইতেছে, দুই বৎসর পর আমি স্যর জন উডবরনের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করি। তিনি তখন বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার সদস্য পদ হইতে বঙ্গের ছোটলাট পদ লাভ করিয়াছেন। স্যর জন উডবরণকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"চট্টগ্রাম আসামের সামিল করার যে প্রস্তাব উঠিয়াছিল, তাহার কি হইল?" তিনি বলিলেন—'আমার মন্তব্য লিপি পাইয়া গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাব ত্যাগ করিয়াছেন। বুঝা গেল, নূতন একটা প্রদেশের শাসনকর্তা হইবার জন্য আপনার তেমন আগ্রহ বা আকাঙ্ক্ষা নাই।"

বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব

অতঃপর বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাবের সূচনা হইতে এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে গবর্নমেন্ট ও জনসাধারণ যাহা কিছু করিয়াছেন, স্যর হেনরি এই স্থলে তাহার আলোচনা করিয়া পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"ভারত গবর্নমেন্ট স্বয়ং এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছেন—আসামের শাসনকর্তা বা বঙ্গের গবর্নমেন্ট এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন নাই। আমার বোধ হয়, এদেশের বড় বা ছোট, কোন

সম্প্রদায় এই প্রস্তাবের অনুকূল নহেন। এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এদেশের জনসাধারণের মধ্যে এক প্রবল ভাবোচ্ছ্বাস জাগিয়া উঠিয়াছে। ভাবোচ্ছ্বাসকে কেহ কেহ বিদ্রূপ করেন। অপরে যাহাই করুন, লর্ড কার্জন কখনও ভাবোচ্ছ্বাসের শক্তিকে অবহেলা করিতে পারেন না—তাহার স্বীয় প্রকৃতিই অত্যন্ত ভাবপ্রবণ।

কিন্তু জনসাধারণের এই প্রতিবাদ কেবল ভাবোচ্ছ্বাসমূলক নহে। এই বঙ্গ বিভাগে আপনাদের সামাজিক, ঐতিহাসিক ও ভাষাগত সম্বন্ধ বিপর্যস্ত হইবে এবং শাসন কার্যেও গুরুতর বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। ফলতঃ বঙ্গ বিভাগের দ্বারা এদেশে যে বিষম কুফল উৎপন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে কোনরূপ অত্যুক্তি করাই অসম্ভব। কলিকাতার সহিত পূর্ববঙ্গের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হইলে জমিদারদের সর্বাপেক্ষা অধিক অসুবিধা হইবে। শাসন কার্যেও বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে। জেলাগুলিকে পুনরায় গঠন করিয়া লইতেও বিস্তর অসুবিধা হইবে। মেদিনীপুর ও মনয়মনসিংহ জেলাকে দ্বিখণ্ডিত করা হইবে শুনিতেছি। ইহাতে যে উক্ত দুই জেলার শাসন কার্যে অনেক অসুবিধা ঘটিবে তাহার আর সন্দেহ নাই। সমস্ত বঙ্গদেশকে ব্যবচ্ছেদ করিলে এই অসুবিধা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইবে। লর্ড কার্জনের মতের ঠিক নাই। আয়র্লণ্ডবাসীর গ্রেট ব্রিটেন হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে ইচ্ছা করেন, কিন্তু লর্ড কার্জন গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্লণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিতে একান্ত অনিচ্ছুক। তিনি প্রাণমনে সমগ্র শক্তি সহকারে ঐ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষণে আবার সেই লর্ড কার্জন বঙ্গদেশকে দুই খণ্ড করিতে সমুদ্যত। সমগ্র দেশবাসীরা কিন্তু প্রাণমনে এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতেছে। নিজ স্বার্থ ও পরকীয় স্বার্থে এমনই পার্থক্য! লর্ড কার্জন যদি আজ আপনাদের অবস্থায় অবস্থিত হইতেন, তিনি নিশ্চয়ই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিতেন।

অঙ্গচ্ছেদের হেতু ও তাহার প্রতিবাদ

কেন বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাব উঠিয়াছে? বঙ্গের ছোটলাটের কার্যভার লঘু করিবার জন্য। ছোটলাটের কার্যভার যে গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ তাহা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু একজন লেফটেনান্ট গবর্নরের পক্ষে এই প্রদেশ সমুচিত রূপে শাসন করা যে অসম্ভব এ কথা স্বীকার করিতে পারি না। আমি এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতার সহিত মত প্রকাশ করিতে পারি। বঙ্গের লেফটেনান্ট গবর্নরদের সম্বন্ধে আমার বিশেষ রূপেই জানা আছে। আমার সমকালীন অপর কাহারও এরূপ অভিজ্ঞতা আছে কিনা সন্দেহ। স্যর জর্জ কেম্বেল, স্যর রিচার্ড টেম্পল, স্যর এশলি ইডেন, স্যর রিভার্স টম্‌সন, স্যর স্টুয়ার্ট বেলি, স্যর চার্লস ইলিয়ট, স্যর এন্টনি ম্যাকডোনেল এবং স্যর আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি—এই সকল লেফটেনান্ট গবর্নরদিগকে ত্রিশ বৎসর কাল মধ্যে আমি ঘনিষ্ঠ রূপেই জানিয়াছি।

বিগত ত্রিশ বৎসর অপেক্ষা এক্ষণে যে বঙ্গের শাসনভার গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে আমি একথা বলিতে পারি না। লোকসংখ্যাদি বৃদ্ধি পাইয়াছে বটে, কিন্তু যাতায়াতের পথ সুগম হওয়ায় দেশ সমূহের নৈকট্য বৃদ্ধি পাইয়াছে। এক্ষণে কলিকাতা হইতে বঙ্গের ছোটলাট সহজে এবং শীঘ্র বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত করিতে এবং বিভিন্ন স্থানের শাসন কার্যের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ রাখিতে পারেন। আর একথাও বলিতে পারি না যে বিগত ত্রিশ বর্ষে বঙ্গের ছোটলাটের কার্যভার অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পাইয়াছে। শাসন সংক্রান্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রত্যেক বিষয়েই যে ছোটলাটকে স্বয়ং মনোযোগ দিতে হইবে এমতও নহে। যেটুকু ছোটলাটের প্রকৃত কার্য, তাহার জন্য বঙ্গ বিভাগের কোনই প্রয়োজন নাই।

ফলতঃ, বঙ্গ বিভাগের কোন আবশ্যকতা নাই। বোম্বাই ও মাদ্রাজের ন্যায় বঙ্গেও ইংলণ্ড হইতে একজন গবর্নর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সঙ্গে কয়েকজন অভিজ্ঞ সদস্য নিয়োগ করিলেই শাসনকার্য সুচারু রূপে পরিচালিত হইতে পারে। বঙ্গদেশের শাসন ব্যাপারে ইহাই সহজ, প্রকৃত

ও প্রয়োজনীয় সংস্কার। আমার স্মরণ হইতেছে লর্ড কার্জন ময়মনসিংহে যে বক্তৃতা করেন তাহাতে এই ব্যবস্থার প্রতি কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, এইরূপ শাসনপ্রথা সন্তোষকর নহে বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমি বলি যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বোম্বাই ও মাদ্রাজ হইতে ঐ প্রথা কেন রহিত করা হয় না? এবং কেনই বা উক্ত দুই প্রদেশে গবর্নর ও কাউন্সিলের পরিবর্তে লেফটেনান্ট গবর্নরের দ্বারা শাসনের ব্যবস্থা করা হইতেছে না? লর্ড কার্জন জানেন যে, ঐরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তাহা অসার বলিয়া নিন্দনীয় হইবে। ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষ এক মুহূর্তের জন্যও ঐ প্রস্তাবে কর্ণপাত করিবেন না। আপনারা জানেন যে, ইংলণ্ড হইতে কোন সম্ভ্রান্ত সহৃদয় লোক কিম্বা কোন প্রধান কর্মচারী ভারত সচিবের নিয়োগ অনুসারে এদেশের গবর্নর হইয়া আসেন। একজন গবর্নর তাঁহার কার্যে যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হন একজন লেফটেনান্ট গবর্নরের পক্ষে তেমন স্বাধীনতা লাভ করা অসম্ভব। লেফটেনান্ট গবর্নর কিম্বা চিফ কমিশনারের পক্ষে এক বিষম অসুবিধা এই যে, তাহারা স্বাধীনতা লাভ করিতে পারেন না; স্বাধীনভাবে কার্য করিতে গেলেই তাহাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির আশা বিনষ্ট হইয়া যায়।

চিফ কমিশনারের সম্বন্ধে যে এই কথা সত্য তাহাও স্পষ্টই বুঝা যায়। লেফটেনান্ট গবর্নরের পক্ষেও এই কথা সত্য। প্রথমতঃ এই সকল কর্মচারীরা বড়লাটের দ্বারা নিযুক্ত হন। সুতরাং বড়লাট যে কার্য করিতে ইচ্ছা করেন, ইঁহাদের পক্ষে তাহার প্রতিবাদ করা অসম্ভব। লেফটেনান্ট গবর্নরগণও মানুষ, সুতরাং তাঁহারাও মানবীয় আশা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন। তাঁহারা আশা করেন, কার্যান্তে তাঁহারা যেন ভারত সচিবের কাউন্সিলে সদস্য পদ লাভ করিতে পারেন। যে লেফটেনান্ট গবর্নর বড়লাটের কার্যের প্রতিবাদ করিবেন তাঁহার পক্ষে এই আরাম-গৃহে স্থান লাভ করা দুরাশা। যাহা হউক, যদি স-কৌন্সিল একজন গবর্নরের পক্ষেও বঙ্গদেশের শাসনভার গুরুতর বলিয়া বিবেচিত হয়, তবে অন্য উপায়েও বঙ্গের শাসনভার লঘু করা যাইতে পারে। বঙ্গদেশকে বিভক্ত করা দরকার হইয়াছে বলিয়া আমি স্বীকার করি না। নিতান্তই যদি বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতে হয়, আমি অন্য একটি উপায় দেখাইয়া দিতেছি। আমার প্রস্তাবটি.যে সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হইবে এমন মনে করি না, তবে গবর্নমেন্টের প্রস্তাবে এদেশে যে প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হইয়াছে, সম্ভবতঃ এই প্রস্তাবে তদ্রূপ হইবে না। যদি নিতান্তই বঙ্গদেশকে বিভক্ত করিতে হয়, আমি বলি ছোটনাগপুর, বেহার ও ভাগলপুরকে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই প্রদেশগুলিকে এক স্বতন্ত্র চিফ কমিশনারের অধীন কর। আপনারা মনে রাখিবেন আমি বলিতেছি না যে, বঙ্গদেশকে বিভক্ত কর ; বঙ্গ বিভাগ যদি নিতান্তই অনিবার্য ও অবশ্যম্ভাবী হইয়া থাকে, অন্ততঃ এই রূপেই ভাগ কর। এবং আমার আরও একটি কথা আছে, আসামকে বঙ্গদেশের সহিত যুক্ত কর। আসামবাসীরা এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবে না, শ্রীহট্ট ও কাছাড়বাসীর এই প্রস্তাবে অসম্মত হইবে না, শ্রীহট্ট ও কাছাড়বাসীরা এই প্রস্তাবে নিরতিশয় আহ্লাদিত হইবে। এই দুই জেলা বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এ পর্যন্তও ক্ষোভ প্রকাশ করিতে বিরত হয় নাই। যদি বল যে, ভবিষ্যতে আসামের শাসন কার্য নির্বাহ করা কঠিন হইয়া পড়িবে, তবে আমি বলি, আসামের চিফ কমিশনারের হস্তে অন্যান্য কমিশনার অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতা ন্যস্ত কর। বোম্বাই গবর্নমেন্টের কর্তৃত্বাধীনে সিন্ধুদেশের কমিশনার যে ক্ষমতা পরিচালন করিতেছেন, আসামের কমিশনারকে তদ্রূপ ক্ষমতা প্রদান কর। এই দুই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে অর্থ সঙ্কটও উপস্থিত হইবে না। বঙ্গদেশে অপর এক ছোটলাটের পদ সৃষ্টি করিলে তাহাতে অত্যধিক ব্যয় বৃদ্ধি হইবে। কলিকাতাবাসীরাও ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন। যে হাইকোর্ট এক্ষণে দেশের গৌরব স্বরূপ, সেই হাইকোর্ট তখন দ্বিতীয় শ্রেণির বিচারালয়ে পরিণত হইবে। কলিকাতার ব্যবসা বাণিজ্যেরও অবনতি হইবে। কারণ, তখন অপর একটি প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দর সৃষ্টি করা এবং এই পুরাতন রাজধানীর যাহা কিছু গৌরব তাহার প্রত্যেকটির একটি প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করা নব গঠিত গবর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হইয়া দাঁড়াইবে। যাহাই হউক,

কলিকাতাতে একজন গবর্নর ও তাঁহার সাহায্যের জন্য একটি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। উক্ত প্রণালী অনুসারে আমি আপনাদিগকে আন্দোলন করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

আন্দোলনের প্রয়োজন

"আপনারা আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হইবেন না। নিশ্চয়ই জানিবেন, চুপ করিয়া থাকিলে, কোনই ফললাভ হইবে না। অতীত ও বর্তমান কালে ইংলণ্ডে যে সকল প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, আপনাদের সমক্ষে সেই সব আন্দোলনের দৃষ্টান্ত বিদ্যমান রহিয়াছে। কবডেন ও ব্রাইট অবাধ বাণিজ্যের জন্য যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন আজ তাহার কথা স্মরণ করুন। এই মহা আন্দোলনে বৎসরের পর বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কোটি কোটি মুদ্রা ব্যয় হইয়া গিয়াছে, আন্দোলনকারীগণ সহজে জয়লাভ করিতে পারেন নাই। আবার এক্ষণে মিঃ জোসেফ চেম্বালেনের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কবডেন ও ব্রাইট যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহারই বিনাশ সাধনের জন্য তিনি কি বিপুল সংগ্রামই উপস্থিত করিয়াছেন। চেম্বারলেনের মত সমীচীন কি অসমীচীন সে সম্বন্ধে আমি কিছুই বলিতেছি না। কিন্তু তিনি সংগ্রামের জন্য যে বিপুল আয়োজন করিতেছেন, তাহার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করুন। তাঁহার অনুবর্তীগণ কি বিপুল অর্থ সম্ভার লইয়া তাহার সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন। কি প্রবল উৎসাহের সহিত মিঃ চেম্বারলেন এই মহা আন্দোলনে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছেন। এই আন্দোলনে চেম্বারলেন যদি একেবারে বিনাশপ্রাপ্ত হন, ক্ষতি নাই—কিরূপে আন্দোলন করিতে হয়, চেম্বারলেন তাহার দৃষ্টান্ত রাখিয়া যাইতেছেন।

ভদ্র মহোদয়গণ, এই মন্ত্রণা সভায় আমার মন্তব্য আমি আপনাদের নিকট উপস্থিত করিলাম। আমি আশা করি এই মন্তব্যগুলি ফলদায়ক হইবে এবং আপনাদের প্রয়াসকে প্রবল করিয়া তুলিবে। আপনারা যে উদ্দেশ্য লইয়া এই আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ রূপে ন্যায়ের অনুগত। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই, আপনারা যদি সদ্বিবেচনার সহিত এই আন্দোলনে লাগিয়া থাকেন, এদেশে না হয় ইংলণ্ডে, একদিন আপনারা নিশ্চয়ই সিদ্ধিলাভ করিবেন।"

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন। নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ *৬ মাঘ ১৩১১*

বিগত ৮ জানুয়ারি প্রাতঃকালে ৭।। ঘটিকার সময় এখানে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বিষয়ক নূতন প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিবার উদ্দেশ্যে জনসাধারণের এক সভার অধিবেশন হইয়াছিল। স্থানীয় উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ী, চিকিৎসক প্রভৃতি নানা শ্রেণির বহুলোক সভায় উপস্থিত ছিলেন। স্থানীয় বারের অন্যতম উকিল বাবু কালীকুমার উকিল মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর সর্ব সম্মতিক্রমে সভাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব সমূহ গৃহীত হইল।

১। "সংবাদপত্রাদিতে প্রকাশিত বঙ্গবিভাগ বিষয়ক প্রস্তাব অবগত হইয়া নেত্রকোণাবাসী জনসাধারণ অত্যন্ত শঙ্কান্বিত হইয়াছেন। জনসাধারণ সবিনয় প্রার্থনা করেন যে, যদি বঙ্গ বিভাগের নূতন কোন প্রস্তাব হইয়া থাকে তাহা হইলে তৎসংক্রান্ত সমস্ত কাগজপত্র সংবাদপত্রে প্রকাশিত হউক, এবং ইহাও সবিনয়ে নিবেদন করেন যে, সর্বসাধারণের এতৎ সম্বন্ধে মতামত প্রকাশের পূর্বে বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে কোনরূপ চূড়ান্ত আদেশ না হয়।"

২। "সংবাদপত্রে প্রকাশিত বঙ্গবিভাগের বিবরণ প্রকৃত হইলে অত্র সভা সম্মান পুরঃসর উহার বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন, যেহেতু ঐরূপ প্রস্তাব বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করিয়া বঙ্গের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিবে।"

৩। "উপরোক্ত প্রস্তাবসমূহের এক খণ্ড প্রতিলিপি মহামান্য বড়লাটবাহাদুর সমীপে প্রেরিত হউক।"

৪। "আগামী ১১ জানুয়ারি তারিখে কলিকাতা টাউন হলে বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদ সভায়

উপস্থিত হইবার জন্য বাবু ব্রজনাথ গোস্বামী, বাবু তারকেশ্বর পত্রনবিশ ও বাবু দ্বারকানাথ দে মহাশয়গণকে নেত্রকোণার প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হইল।"

৫। "এই সভার কার্য বিবরণ বেঙ্গলী, মিরার ও অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হইবার জন্য তারযোগে প্রেরিত হউক।"

এইরূপ সভার কার্য শেষ হইলে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিয়া সভা ভঙ্গ করা হয়।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আন্দোলন ২০ মাঘ ১৩১১

ইংলণ্ড হইতে এক সুসংবাদ আসিয়াছে। ইতঃপূর্বে শুনা গিয়াছিল, লর্ড কার্জন ভারত সচিবের নিকট অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রেরণ করিয়াছেন এবং ভারত সচিব সে প্রস্তাবে সম্মতি দান করিয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া কেহ কেহ বলিতেছিলেন যে, এ সম্বন্ধে তবে আর কোন আন্দোলন করিয়া ফল নাই। নীরবে মর্মবেদনা সহ্য করা ব্যতীত বাঙালির গত্যন্তর নাই। কিন্তু হাজার হাজার লোক মৃত্যু পর্যন্ত চিকিৎসা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। তাহাদের যত্ন ও উৎসাহেই পুনরায় আন্দোলনের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে। তাহাদের ঐকান্তিক আগ্রহেই বিগত জানুয়ারি মাসে টাউন হল ও বেঙ্গল ল্যাণ্ড হোল্ডার্স এসোসিয়েশনে মন্ত্রণাসভার অধিবেশন হইয়াছিল—তাহারাই ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়া আপনাদের মনের বেদনা তথাকার রাজপুরুষ ও জনসাধারণকে জানাইতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে ভারত সচিবের কাউন্সিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব এ পর্যন্ত প্রেরিত হয় নাই। সুতরাং আন্দোলন নিষ্ফল মনে করিয়া যে অল্প সংখ্যক লোক নিরাশ হইয়াছিলেন, তাঁহারা নব বলে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন।

ভারত সচিবের কাউন্সিলে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব প্রেরিত হয় নাই, ইহা সকলে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করুন। যাহারা মহোৎসাহে পুনরায় আন্দোলন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহাদের সহিত একত্র হইয়া পুনরায় মহাআন্দোলন উপস্থিত করুন। এদেশে ও ইংলণ্ডে আন্দোলন না করিলে বাঙালি জাতিকে মৃত্যুর মুখ হইতে কখনও রক্ষা করা যাইবে না।

যদি লক্ষ লক্ষ লোক লর্ড কার্জনের নিকট সুযুক্তি পূর্ণ প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন, তবে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস লর্ড কার্জনের মত লোকও অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাব পরিহার করিতে বাধ্য হইবেন।

আন্দোলন কিরূপে করিতে হয়, পূর্ববঙ্গ তাহা দেখাইয়াছে। পূর্ববঙ্গে পুনরায় প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইবে। উত্তরবঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এবার আন্দোলনে প্রবৃত্ত হইবেন। উত্তর ও পূর্ববঙ্গ যদি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের আর থাকিবে কি?

সমস্ত বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭,৮৪,৩৯,৪১০। তন্মধ্যে ব্রিটিশ অধিকৃত বঙ্গদেশের অধিবাসীর সংখ্যা ৭,৪৭,৪৪,৮৬৬। খাস বঙ্গের অধিবাসীর সংখ্যা এই ঃ—

বর্ধমান বিভাগ	৮২,৪০,০৭৬
প্রেসিডেন্সি বিভাগ	৮৯,৯৩,০২৮
রাজসাহী বিভাগ	৮৪,৯৫,১৫৯
ঢাকা বিভাগ	১,০৭,৯৩,৯৮৮
চট্টগ্রাম বিভাগ	১৩,৫৩,২৫০
মোট—	৩,৭৮,৭৫,৫০১

যদি রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ বঙ্গদেশ হইতে ছিন্ন হয় তবে বঙ্গদেশে ১,৭২,৩৩,১০৪ জন মাত্র বাঙালি থাকিবে। ২,০৬,৪২,৩৯৭ জন বাঙালি নূতন প্রদেশে চলিয়া যাইবে। বাঙালি জাতি ছারখার হইবে। বঙ্গদেশে বাঙালি হীনবল হইয়া পড়িবে।

এখন বঙ্গদেশে বাঙালি বেহারী অপেক্ষা জনসংখ্যায় কম হইবে। বেহারের অধিবাসীর সংখ্যার প্রতি সকলে লক্ষ্য করুন :

পাটনা বিভাগ	১,৫৫,১১,৯৮৭
ভাগলপুর বিভাগ	৮৭,২৬,৩১৮
মোট —	২,৪২,৩৮,৩০৫

এখন বঙ্গদেশে বাঙালির সংখ্যা ১,৭২,৩৩,১০৪ ও বেহারীর সংখ্যা ২,৪২,৪১,৩০৫ থাকিবে। তখন বাংলা গবর্নমেন্ট ন্যায়তঃ বাংলা অপেক্ষা বেহারীর হিত চিন্তা করিতে অধিকতর বাধ্য হইবেন।

তখন বঙ্গদেশে বেহারীরাই অধিক রাজকার্য পাইবেন, বেহারীই বাংলা দেশে প্রাধান্য লাভ করিবেন। বঙ্গের জেলায় জেলায় বেহারী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বেহারী সব জজের প্রাদুর্ভাব হইবে। বেহারের উন্নতির জন্য গবর্নমেন্ট যত চেষ্টা করিবেন, বঙ্গের উন্নতির জন্য তত চেষ্টা করা উচিত মনে করিবেন না। ২ কোটি ৬ লক্ষ বাঙালি নূতন প্রদেশের অধিবাসী হইবে, ১ কোটি ৭২ লক্ষ বাঙালি বঙ্গদেশে থাকিবে। বাঙালি জাতি কি তবে হীনবল হইয়া পড়িবে না?

বাঙালি জাতিকে রক্ষা করিতে হইলে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গেও ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করিতে কাল বিলম্ব করা উচিত নয়।

ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে ১০ হাজার টাকার প্রয়োজন। এই টাকা একপক্ষকালের মধ্যে সংগ্রহ করা আবশ্যক। সমস্ত বঙ্গদেশ জাগ্রত হউক, যে যাহা দিতে পারেন, বা সংগ্রহ করিতে পারেন, অবিলম্বে তাহা প্রেরণ করুন। মার্চ মাসেই ইংলণ্ডে প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে হইবে।

টাউন হলে প্রতিবাদ সভা *৩ চৈত্র ১৩১১*

নব্য ভারতের ইতিহাস লেখক অক্ষরে লিখিয়া রাখুন জাতীয় গ্লানিতে ভারতবাসী বেদনাবোধ করিতে শিখিয়াছে। ভারতের রাজপ্রতিনিধি মহা প্রতাপান্বিত লর্ড কার্জন বাহাদুরের শাসন নীতি ও কনভোকেশন বক্তৃতার নিন্দাবাদে এ দেশবাসীর প্রাণে যে তীব্র ক্ষোভ সঞ্চারিত হইয়াছে, গত শুক্রবার দিবস টাউন হলের বিরাট সভায় কলিকাতাবাসী তাহা কিঞ্চিৎ প্রকাশ করিয়াছেন।

সেদিন নির্দিষ্ট সময়ের বহু পূর্বেই কলিকাতার সর্বসম্প্রদায় ও সর্বশ্রেণির লোক সাগর তরঙ্গের ন্যায় গাম্ভীর্য সহকারে ও অবিচ্ছিন্ন স্রোতে টাউন হলের দ্বিতল কক্ষে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। অত্যল্প সময় মধ্যে টাউন হল এরূপ জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল যে নেতৃবর্গ আশঙ্কা করিতে লাগিলেন, টাউন হলে এই সভার স্থান সঙ্কুলান হইবে না। অবশেষে টাউন হলের প্রশস্ত কক্ষে আর তিল ধারণের স্থানও রহিল না ; সমস্ত স্থান পূর্ণ হইয়া গেল। শতশত লোক স্থানাভাবে ফিরিয়া গেলেন। প্রফেসর, ডাক্তার, উকিল, ব্যারিষ্টার, ব্যবসায়ী, কেরাণী, ছাত্র, রাজনীতিক ও সাহিত্যিক, সেদিন সর্বশ্রেণির লোক সমাবেশে প্রতিবাদ সভার সবিশেষ গুরুত্ব বৃদ্ধি হইয়াছিল।

মৌলবি মহম্মদ ইয়ুসুফের প্রস্তাবে হাইকোর্টের উকিল বর্গের আগ্রণী, রাজনীতি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ সি. আই. ই. মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পাঞ্জাব ও অন্যান্য স্থানের নেতৃবর্গ সভার সহিত সহানুভূতি সূচক টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ সমুদয় পাঠ করেন। তৎপর সভাপতি মহাশয় তাঁহার যুক্তি ও গাম্ভীর্যপূর্ণ সুলিখিত বক্তৃতাটি সভার সমক্ষে পাঠ করেন। এই বক্তৃতায় যে ধীর বিবেচনা শক্তি, দৃষ্টির উদারতা ও প্রখরতা এবং মিষ্ট বিদ্রূপের সহিত যেরূপ সমীচীনতা প্রদর্শিত হইয়াছে,

তাহাতে অনেকে এই বক্তৃতাটিকে রাজনৈতিক বক্তৃতার আদর্শ বলিয়া প্রশংসা করিতেছেন। সভাপতির বক্তৃতার পর শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রস্তাব ও শ্রীযুক্ত রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও ব্যারিষ্টার মিঃ রসুলের সমর্থনে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় :

লর্ড কার্জন তাঁহার বিগত কনভোকেশন বক্তৃতায় এদেশবাসীর চরিত্রে ও সাহিত্যে যে অযথা কলঙ্কারোপ করিয়াছেন, এই সভা তাহার ঘোরতর প্রতিবাদ করিতেছেন। স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতার সংকোচন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন, বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বেআইনী আইন, সরকারি গুপ্ত সংবাদ বিষয়ক আইন, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব, গবর্নমেন্টের কার্যে প্রতিযোগী পরীক্ষার পরিবর্তে সরকারি মনোনয়ন দ্বারা কর্মচারী নিয়োগ, এবং লর্ড কার্জনের শাসননীতি, সভা এতদ্ সমুদয়ের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন।

অতঃপর কর্ণেল কে. পি. গুপ্তের প্রস্তাবে এবং মিঃ এন. সি. বসু ও মি. ....* সমর্থনে স্থিরীকৃত হয় যে উক্ত প্রস্তাবগুলির প্রতিলিপি সভাপতির স্বাক্ষর হইয়া ভারত সচিবের নিকট প্রেরিত হইবে।

সভাপতির বক্তৃতার পর এই প্রতিবাদ সভায় সেদিন আর কোন বক্তৃতা হয় নাই। সভাক্ষেত্রে বিপুল লোকমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল, কিন্তু সভার গাম্ভীর্য কিছুমাত্র ভঙ্গ হয় নাই। টাউন হলে এরূপ গাম্ভীর্যপূর্ণ রাজনৈতিক সভা দৃষ্ট হয় না।

সভাপতির বক্তৃতা

আমার বক্তব্য বিষয় বলিবার পূর্বে আমি নিজের সম্বন্ধে অতি সংক্ষেপে দুই চারিটি কথা বলিব। প্রথম কথা এই যে, আমি নিজে এক জন প্রধান বক্তা বলিয়া দাবি করিতে পারি না। গবর্নমেন্টের প্রতি গালি বর্ষণ করিতেও আমি অভ্যস্ত নই। আমি শপথপূর্বক ইহাও বলিতে পারি যে, এ পর্যন্ত কখনও কংগ্রেসের আলোচনাদিতে যোগদান করি নাই। তবে আমি কেন আজ এখানে বক্তৃতা প্রদান করিতে উপস্থিত হইয়াছি? ইহার কারণ এরূপ নয় যে আমি গবর্নমেন্টের নিন্দাবাদে আনন্দ উপভোগ করি। কিন্তু ইহার প্রধান কারণ অন্যরূপ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, ভারতীয় রাজপ্রতিনিধির অদ্বিতীয় পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিতে আমরা স্বভাবতঃ যেরূপ দৃষ্টির প্রশস্ততা, বুদ্ধির বিচক্ষণতা এবং স্বভাবের কোমলতা দেখিতে চাই, আমাদের বড়লাট লর্ড কার্জনের মধ্যে যেরূপ গুণের অভাব। অবশ্য লর্ড কার্জন যে বিবিধ গুণাবলীর আধার, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় বিধি তাঁহার উপর বাম। সকলেই জানেন লর্ড কার্জন তোষামোদ প্রিয় নহেন। সম্রাট সপ্তম্ এডোয়ার্ডের ভারতীয় প্রতিনিধির উপযুক্ত গুণগ্রাম তাঁহার আছে, একথা বলিয়া তাঁহার তোষামোদ করিতে চাহি না। যদি এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকে তবে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সম্মিলন উপলক্ষে চ্যান্সেলার যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করুন। সেই বক্তৃতার লিখন প্রণালী নিশ্চয়ই এশিয়াবাসীর নিয়ম প্রণালীর মত নয়। লর্ড কার্জনের রুচি এতদূর বিকৃত নয় যে তিনি এশিয়াবাসির ধরনে লিখিবেন। তবে একথাও ঠিক যে তাঁহার বক্তৃতায় গ্রীকদের লিখন প্রণালীর সৌন্দর্য ও মধুরতা নাই। তাঁহার বক্তৃতার সমস্ত ভাষাই এক প্রকার আলঙ্কারিক ভাষায় পরিপূর্ণ। সুবিখ্যাত লেখক ম্যাথু আর্নল্ড এই লিখন প্রণালীকে 'করিন্থিয়ান' প্রণালী নামে অভিহিত করিয়াছেন। লর্ড কার্জন নিজে কিন্তু বাঙালি যুবকদিগকে এই ধারাটি পরিহার করিতে বিশেষভাবে উপদেশ দিয়াছেন।

* এই অংশটি কীটদষ্ট

লর্ড কার্জনের বক্তৃতায় মধুরতা বা লালিত্যের লেশমাত্রও নাই, কেবল পার্লামেন্টের বক্তৃতা মঞ্চের গন্ধ পাওয়া যায়। ইহা বিদ্রূপ ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ। ইহাতে ইংলণ্ডের আশ্রিত ভারতবাসীর প্রতি একটুও সহানুভূতির পরিচয় নাই। ইংলণ্ডের জনৈক রাজনীতি বিশারদ কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষ্যে বলিয়াছিলেন—"আমি একটা জাতির সমস্ত লোকের পক্ষে কোনও কলঙ্ক আরোপ করিতে পারি না। কিন্তু লর্ড কার্জন বিশ্ববিদ্যালয়ের চেন্সেলার রূপে শুধু ভারতবাসী কেন, এশিয়াবাসী সমস্ত জাতির নামে কলঙ্ক আরোপ করিয়াছেন। আর এই এশিয়াতেই বুদ্ধদেব, যীশুখৃষ্ট, মহম্মদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিরূপে রাজ্য শাসন করিতে হয়, ইহারা জগতের লোকদিগকে তাহা শিখান নাই বটে, কিন্তু সংসারে কিরূপে জীবন ধারণ করিয়া অনন্ত ধামে চলিয়া যাইতে হয়, তাহা ইহারাই শিখাইয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, জাতি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন মতবাদের মূল্য অতি সামান্য। তবে ইহা দ্বারা এই একটি কাজ হইবে যে, অর্ধ শিক্ষিত লোকেরা এই মতবাদ অবলম্বন করিয়া নানা প্রকার অযৌক্তিক কথার সৃষ্টি করিবে, এ সম্বন্ধে সার হেনরী মেইনও এসরূপ মত পোষণ করেন।

লর্ড কার্জন নিজেও পণ্ডিত, সুতরাং তাহাকে এস্থলে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করি। তিনি কি জানেন না যে, পাশ্চাত্য দেশের প্রাচীন সাহিত্যে সুসম্পাদিত প্রবঞ্চকতার প্রশংসা করা হইয়াছে ও আজ পর্যন্তও ইউরোপের যুবকগণ সেই সাহিত্যে শিক্ষিত হইতেছেন। লর্ড কার্জন তাঁহার অন্য কোন বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন,—"ভালবাসা ও প্রীতি ভিন্ন প্রাচ্য দেশ কখনও শাসন করা যাইবে না।" জিজ্ঞাসা করি, তাহার কনভোকেশনের বক্তৃতা কি ভারতবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করিবে? বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভায় বেআইনী আইন পাশ করা যেরূপ সহজ, ভারতবাসীর প্রীতি আকর্ষণ করাও সেইরূপ সহজ। এ সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়াই নীরব হইব। লর্ড কার্জন বলেন যে, ভারতবাসী নিশ্চয়ই এই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একজন প্রজা। তিনি এরূপ ইচ্ছা করেন না যে ভারতবাসী কেবল কাঠ কাটিয়া অথবা জল তুলিয়া জীবন কাটাইবে। লর্ড কার্জন এ সম্বন্ধে যে কথাগুলি বলিয়াছেন এবং হাইকোর্টের জজ, দেশীয় রাজ্যের মন্ত্রী ও বিচার শাসন বিভাগের রাজকীয় কর্মচারী সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আশা করি সকলেই তাহার যথার্থ মর্ম গ্রহণ করিবেন। কেহই তাহার কথার অবিকল অর্থ গ্রহণ করিবেন না। যদি রাগভরে কোন যুবক এবং রুষ্ট স্বভাব ভারতবাসী কদাচিৎ লর্ড কার্জনের কথার প্রকৃত মর্ম না বুঝিয়া অবিকল অর্থ করেন, তবে অবশ্যই বড়লাট তাহাতে বিস্মিত হইবেন না। কারণ, তিনি বিলাতে 'গিল্ড হল' বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—"ভারতীয় কুলির সাহায্যে তোমরা ডেমাবারা ও নেটালে চাষ-বাস কর, ভারতীয় শিক্ষিত কর্মচারীর সাহায্যে মিশর দেশে জলাগমের ব্যবস্থা কর ও নীল নদে বাঁধ স্থাপন কর। ভারতের বন বিভাগের কর্মচারীর সাহায্যে মধ্য আফ্রিকা এবং শ্যাম দেশের ভূমি হইতে রত্নরাজি খুঁজিয়া বাহির কর, ভারতীয় জরিপ আমিন লইয়া পৃথিবীর গুপ্তস্থান আবিষ্কার কর।" সুবিখ্যাত চিত্রকর দ্বারা অঙ্কিত উক্ত চিত্রে ভারতবাসীর আসন সকলের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা কি বেশে বিভূষিত হইয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করা উচিত। তাহারা সকলেই পৃথিবী কর্ষণ করিয়া বিদেশীয় লোকদিগের নিমিত্ত রত্নরাজি আহরণ করিতেছে।

স্বায়ত্ত শাসন ও বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ

আমি এক্ষণে বড়লাটের আইন প্রণয়ন ও শাসন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির বর্তমান আইনের ইতিহাস সকলের নিকট সুবিদিত, সুতরাং ইহার পুনরুল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। স্যর আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি মিউনিসিপালিটির চেয়ারম্যানকে কর্পোরেশনের

হস্ত হইতে মুক্ত রাখিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন ; নূতন কর্পোরেশনে লর্ড কার্জন মনোনয়ন প্রথার গর্ব করিয়াছেন। পুরাতন মিউনিসিপালিটির ব্যবস্থার যে সমস্ত দোষ ও অনিয়ম ঘটিয়াছিল তাহার দমনার্থ লর্ড কার্জন এই অপূর্ব উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। স্যর আলেকজাণ্ডার মেকেঞ্জি স্বায়ত্তশাসনের ছায়ামাত্র রাখিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু লর্ড কার্জন সে ছায়াটুকুও লোপ করিয়াছেন। বর্তমান মিউনিসিপাল আইন যে, শাসনকর্তাদের ভ্রম তাহা এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিতেছেন। তারপর বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবও কি বঙ্গবাসির ক্ষুদ্র আকাঙ্ক্ষা দমনের অপূর্ব উপায় নয়? এই অঙ্গচ্ছেদের প্রস্তাবে লোকের মনে যথার্থ ভীতির সঞ্চার হইয়াছে। যাহারা গবর্নমেন্টের আইন কানুনকে কোন রহস্যময়ী শক্তি বিশেষের ব্যবস্থা বলিয়া সাধারণতঃ বিশ্বাস করে, তাহারাও এই প্রস্তাবে ভীত হইয়াছে। যে যে কারণে আমরা এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করি, তাহা কিছুদিন পূর্বে এই সভা গৃহেই স্যর হেনরি কটন কর্তৃক বিশেষ রূপে আলোচিত হইয়াছে, সুতরাং এ স্থলে তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আমাদের বোধ হয় বড়লাট বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিতেই কৃত সঙ্কল্প হইয়াছেন। এই সম্পর্কে আরও একটি বিষয় উল্লেখ করিতেছি। এক্ষণ হইতে নিজ নিজ প্রাদেশিক ভাষাতেই কথা কহিতে শিখা উচিত। এ প্রস্তাবটি শাসন কর্তারা ভিন্ন অন্য লোকে কিভাবে দেখে তাহার আর আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে, আমি শুধু এই বলিতে ইচ্ছা করি যে, অন্য লোকে শাসন কর্তাদিগকে যে ভাবে দেখে, তাহারাও যদি আপনাদিগকে সেই ভাবে দেখিতে পারিতেন, তবে লোকের নিকট তাহারা সম্মানিত হইতেন।

ঢাকা প্রকাশ*

পূর্ববঙ্গের বিসর্জন *৩ জানুয়ারি ১৯০৪*

অশুভক্ষণে হোম সেক্রেটারি সাহেবের চিত্তাকাশে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদরূপ কালোমেঘ সমুদিত হইয়াছিল। অশুভক্ষণে সেই মেঘের বিজলী বিকাশ রাজকীয় ঘোষণাপত্র সমাশ্রয়ে লোক নয়নে নিপতিত হইয়া ভাবী বজ্রপাতের সূচনা করিয়াছিল। তদবধি এ অঞ্চলের অধিবাসীগণ কি যে অশান্তিতে কালাতিপাত করিতেছে, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরকে তাহা বুঝাইয়া বলা কঠিন। শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, এই শোচনীয় সমাচার যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, সেই আসন্ন অ:পদের আশঙ্কায় আতঙ্কান্বিত হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক তনয় হইতে জমিদার কুমার সকলেই স্বদেশের গৌরবরক্ষণে বদ্ধপরিকর হইয়া সম্ভ্রমের সহিত গভর্নমেন্টের এই অন্যায় প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছে। এই নিমিত্ত শহরে ও মফঃস্বলে বহুসংখ্যক সভাসমিতির অনুষ্ঠান হইতেছে। এ পর্যন্ত যে কয়টি সভার সংবাদ আমাদের হস্তগত হইয়াছিল, স্থানান্তরে তাহা বিবৃত হইল। গবর্নমেন্ট যদি অধিবাসিবৃন্দের আর্তনাদে কর্ণপাত না করিতে কৃতসংকল্প হইয়া থাকেন, তবে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা, নচেৎ, যেরূপ অনুষ্ঠান দেশবাসী আবালবৃদ্ধবনিতার অনভিপ্রেত, কোন সুশাসক তাদৃশ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করিতে সম্মত হইবেন? ঢাকা ও ময়মনসিংহের পরিবর্তন প্রস্তাব পূর্ববঙ্গবাসীর নিকট এমনই বিসদৃশ বলিয়া অনুমিত হইতেছে যে এই বিপ্লবকর ব্যাপারকে সাধারণের চক্ষে অনুমোদন যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত গভর্নমেন্ট যে সকল আশ্বাসবাক্য প্রদান করিতেছেন, তৎসমস্তই অধিবাসীবৃন্দের নিকট উপেক্ষা যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতেছে। স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে কর্তৃপক্ষ অবশ্যই বুঝিতে পারিতেন, স্বর্গে থাকিয়া দাসত্ব করাও শ্রেয় ; নরকের রাজত্ব লাভও বাঞ্ছনীয় নহে। বড়ই পরিতাপের বিষয়, লর্ড কার্জনের ন্যায় বিচক্ষণ ব্যক্তিও জাতীয়ত্ব বিসর্জনে অধিবাসিবৃন্দের আর্তনাদ কাল্পনিক বলিয়া উপেক্ষা করিতেছেন।

আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে ঢাকা ও ময়মনসিংহবাসীদের যে সকল সুবিধা হইবে ; তাহা ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিতে গেলে ঢাকা প্রকাশের ক্ষুদ্র কলেবরে কুলাইয়া উঠে না। সমাজ, শিক্ষা, শাসন প্রভৃতি যে কোন বিষয় লইয়া এই পরিবর্তন প্রস্তাব চিন্তা করিয়া দেখা যায়, তাহাই নিতান্ত বিভীষিকাময় বলিয়া অনুমিত হয়। কাজেই, এই প্রলয়কর প্রস্তাবের সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান ব্যতীত আমাদের গত্যন্তর নাই। যাহার সর্বাঙ্গে ক্ষত, কোন অঙ্গে তাহার অধিকবেদনা তাহা জিজ্ঞাসা করা যেমন নিরর্থক, ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামভুক্ত হইলে কি কি অসুবিধা হইবে তাহা বিবৃত করিতে অগ্রসর হওয়াও তেমনি অপ্রয়োজনীয়। এজন্যই আমরা এই ন্যায়বিগর্হিত ব্যাপার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবার জন্য প্রথমাবধিই গবর্নমেন্টকে অনুরোধ করিয়া আসিতেছি। বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের বিস্তীর্ণ রাজ্যে যাহাদের আশা ও ভরসা পরিসমাপ্তি লাভে অভ্যস্ত; যে গভর্নমেন্টের অধীনে থাকিয়া বাঙালি সন্তান একদিন বিভাগীয় কমিশনারের পদলাভে সমর্থ হইতে পারে, তাহারা সানন্দে আসামের ন্যায় সংকীর্ণ শাসননীতির অধীন হইবে, ইহা কল্পনা করাও কি প্রমত্ততার পরিচায়ক নহে।

পূর্বাবধিই আমরা বলিয়া আসিতেছি, বঙ্গসন্তান "বাঙালি" আখ্যা পরিত্যাগ করিতে প্রাণান্তেও

---

*উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িক পত্র-৪র্থ খণ্ড। মুনতাসীর মামুন সম্পাদিত।

প্রস্তুত নহে। জন্মভূমি ভাষা এবং ধর্ম সম্পর্কে সমগ্র বাঙালি জাতি এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। গভর্নমেন্ট যদি এই পবিত্র বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিতে যত্নবান হ'ন, তবে সমগ্র বাঙালিজাতির প্রাণে ঘোর অশান্তি অনল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। বঙ্গের শাসনভার যদি নিতান্তই গুরুতর হইয়া থাকে, তবে একজিকিউটিভ কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। আর, শাসন সৌকর্যার্থে যদি একান্তই বঙ্গের পুনর্গঠন প্রয়োজনীয় হইয়া উঠে, তবে আমরা বলি, খাস বঙ্গদেশ এবং আসাম, বঙ্গেশ্বরের শাসনাধীন করা হউক, অপরদিকে বিহার, উড়িষ্যা এবং মধ্যপ্রদেশের জন্য আর একজন লেফটেনেন্ট গভর্নর নিযুক্ত হউক। এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা শাসনকার্যও সুশৃঙ্খলভাবে চলিতে পারে, অথচ গবর্নমেন্টকেও ব্যয়াধিক্য বহন করিতে হয় না। কারণ, দুই জন চিফ কমিশনারের পরিবর্তে একজন লেফটেনান্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলে বেতনভার অবশ্যই হ্রাসপ্রাপ্ত হইবে। তারপর, খাস বঙ্গ ও আসামের লোকসংখ্যা সর্বসমেত ৪৭৩৮৬৩২৪ জন। এতগুলি লোকের উপর একজন লেফটেনেন্ট গবর্নর নিযুক্ত হইলে তাহা কখনও অসঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

ভাই ঢাকাবাসিগণ। সোদর প্রতিম ময়মনসিংহ সন্তান। প্রাণপণ করিয়া মাতৃভূমির গৌরব রক্ষণে বদ্ধ পরিকর হও। তোমাদের আন্দোলন নিষ্ফল হয় নাই। সহৃদয় বঙ্গেশ্বর বাহাদুর বুঝিতে পারিয়াছেন, এই ব্যাপারে বাঙালির প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিবে, তাই তিনি জনসাধারণের মতামত জানিতে চাহিয়াছেন। শুনিতেছি, জনসাধারণের অভিপ্রায় অবগত হইয়া ও তদ্বিষয়ে রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত নাকি বিভাগীয় কমিশনার বাহাদুর এবং ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটদিগকে অনুরোধও করা হইয়াছে। ইহা সুসমাচার, সন্দেহ নাই। ঢাকা ও ময়মনসিংহের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ যদি এ সময়ে জনসাধারণের মনের ভাব কমিশনার বাহাদুরের গোচরে আনিতে পারেন, তবে বোধ হয়, তাহা নিতান্ত নিরর্থক হইবে না। ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়দিগকেও এ বিষয় বিশদরূপে বুঝাইয়া বলিতে হইবে। তাঁহারা যদি জনসাধারণের মানসিক অবস্থার কথা যথাযথ রিপোর্ট করেন, তবে বঙ্গেশ্বর বাহাদুর কখনও তাহা উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। এ সময়ে মি. র‍্যানকিনের ন্যায় মহাপুরুষের হস্তে ঢাকার শাসনভার ন্যস্ত আছে, ইহা কম সৌভাগ্যের কথা নহে। র‍্যানকিন সাহেবের ন্যায় সুশাসকের দেবহৃদয় নিশ্চয়ই প্রজার ক্রন্দনে ব্যথিত হইবে। ভরসা করি। ঢাকাবাসীয় আর্তনাদ তিনি কর্তৃপক্ষের কর্ণগোচর করিয়া অভাগা অধিবাসীবৃন্দের আন্তরিক শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হইবেন। ভাষার হিসাবে যাহারা বাঙালি, সে জাতিকে যেন বিভিন্ন শাসনের অধীন করা না হয়, ইহাই আমাদের একমাত্র অনুরোধ। কলিকাতা বর্তমান সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল, সুতরাং বাংলা যাহাদের ভাষা, কলিকাতার সম্বন্ধ পরিত্যাগ তাহাদের পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব। ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুত হইলে, বাংলাভাষাও অচিরেই তাহাদের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিবে। প্রকৃতির ঈদৃশ বিকৃতি কিরূপ ভয়াবহ তাহা কল্পনারও অগোচর।

পূর্ববঙ্গের বিসর্জন *১০ জানুয়ারি ১৯০৪*

কে জানে, পূর্ববঙ্গবাসীর ভাগ্যপট বিধাতা কিরূপভাবে চিত্রিত করিয়াছেন? নচেৎ এত আলোচনা আন্দোলনের ফলেও গভর্নমেন্ট স্বকীয় ভ্রম বুঝিতে সমর্থ হইতেছেন না কেন! নিতান্ত নিমীলিত নয়নে নিদ্রা না গেলে এই যে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে তাহা উপেক্ষায় উড়াইয়া দেওয়া সম্ভবপর নহে। কুম্ভকর্ণ হইলেও তাহার নিদ্রাভঙ্গ করা সাধ্যায়ত্ত ; কিন্তু কেহ যদি প্রকৃত নিদ্রিত না হইয়া নিদ্রার ভান করে, তবে তাহাকে উদ্বোধিত করে কাহার সাধ্য। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাবে দেশে কিরূপ অশান্তি আনয়ন করিয়াছে তাহা বোধ হয়, ভারতে এখন আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে স্বীকার করিতে হইবে, রিজলি

সাহেবের ফলে সুদূর পল্লীর প্রান্ত ভাগ পর্যন্ত সমস্ত অধিবাসিবৃন্দ ভীত ও সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। প্রজাবর্গের প্রাণে উদ্বেগ ও অশান্তি জন্মাইয়া দিয়া গভর্নমেন্ট সুখানুভব করিবেন এরূপ কল্পনা করাও যদি অসঙ্গত ; কি উদ্দেশ্য তবে এত আলোচনা আন্দোলনের পরেও গভর্নমেন্ট এই প্রলয়কর প্রস্তাব পরিত্যাগ করিতেছেন না, সহজ বুদ্ধিতে সে তত্ত্ব নির্ণয় করা একান্তই অসম্ভব। ভাল; এই যে, অনর্থপাতের আশঙ্কায় দরিদ্র দেশবাসীগণ উদ্বিগ্নচিত্তে শোণিতসম অর্থে টেলিগ্রাফ ইত্যাদির ব্যয় করিতে বসিয়াছে, এজন্য দায়ী হইবে কে? গভর্নমেন্ট ভ্রূভঙ্গিতে আমাদিগকে চিরদিনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন, আর প্রপীড়িত প্রজাগণ মুখ ফুটিয়া মর্মবেদনাও জ্ঞাপন করিতে পারিবে না। অন্যকালে একথা অসম্ভব না হইলেও বিংশ শতাব্দীতে এরূপ কল্পনা করাও বাতুলতাজ্ঞাপক। কাজেই জনসাধারণের মতামত না জানিয়া যখন গভর্নমেন্ট এই প্রলয়ক প্রস্তাবে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তখন অযথা অর্থব্যয়ের জন্য ন্যায়তঃ ও ধর্মতঃ ভারত গভর্নমেন্টকেই দায়ী হইতে হইবে। যে দেশের লোক পেটের জ্বালায় পুড়িয়া মরে তাহাদিগের একটি কপর্দকও যদি এরূপ ভাবে ব্যয়িত হয় তবে তদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে।

ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত হইলে এ অঞ্চলবাসীকে যে অশেষ অসুবিধা ভোগ করতে হইবে তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শিক্ষা, সমাজ এবং শাসন প্রভৃতি সর্ববিষয়ে যে প্রদেশ ভারতে সর্বনিম্নস্থান অধিকার করিয়াছে, তাহার সহিত শ্রেষ্ঠতম প্রদেশের অংশবিশেষ সংযুক্ত হইলে এই বিচ্ছিন্ন বিভাগের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। বিভিন্ন ভাষাবলম্বীর মধ্যে ইহা কাহারও পক্ষে সুবিধাজনক হইতে পারে না। প্রজার সুখ শান্তি বিধান যদি গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হয়, তবে এই অসুবিধার আপত্তি কখন উপেক্ষাযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। কিন্তু, এই অসুবিধার কথাই আমাদের আপত্তি নহে। এই বিপ্লবকর ব্যাপারে আমাদের প্রথম ও প্রধান আপত্তি জাতীয়ত্ব। বঙ্গের আমরা আদিম অধিবাসী। প্রাচীন কালে পূর্ববঙ্গই একমাত্র বঙ্গদেশ বলিয়া কীর্তিত হইত। সুতরাং পূর্ববঙ্গবাসীর বাঙালি আখ্যা চিরন্তন। আবহমান কাল হইতে আমরা পৃথিবীর ইতিহাসে যে জাতি বলিয়া পরিগণিত, সে সাধের স্মৃতি বিনা বাক্যব্যয় বিসর্জন করিয়া, হোম সেক্রেটারির পরিবর্তন পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতে হইবে, পূর্ববঙ্গ ব্যতীত ভারতের কুত্রাপি গভর্নমেন্ট এইরূপ বিসদৃশ ব্যবস্থাবিধানে অগ্রসর হইতেন কিনা সন্দেহ। জাতীয় তেজে যাহারা অনুপ্রাণিত ; জাতীয়ত্বের মাহাত্ম্য যাহারা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহাদের নিকট এতদপেক্ষা ভীষণ ব্যাপার আর কিছু হইতে পারে কিনা, জানি না। বড়ই পরিতাপের বিষয়। স্বকীয় জাতীয়ত্বের অনুমান সঙ্কোচ দর্শনে যে জাতি ভুজঙ্গশিশুর ন্যায় গর্জন করিয়া উঠে, তাহাদেরই প্রতিনিধি আজ একটি প্রাচীন জাতির অস্তিত্ব অপনয়নে অগ্রসর।

প্রথমাবধিই আমরা বলিয়া আসিতেছি, সমগ্র বাঙালিজাতিকে এক শাসনের অধীনে না রাখিলে জাতীয় উন্নতির পথে বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইবে। সমগ্র বাঙালি সমাজ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত।

এই বিভিন্ন ভাবালম্বী ব্যক্তিবৃন্দকে যদি কখনও একতাসূত্রে সম্বন্ধ করা সম্ভবপর হয়, তবে বাংলা ভাষাই তাহার একমাত্র উপাদান। জাতীয় উন্নতি সাধন করিতে হইলে, বাংলা ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করিতে হইবে। ঢাকা ও ময়মনসিংহ যদি আসামের অন্তর্ভূত হয়, তবে আসামী সংস্পর্শে এ অঞ্চলের বাংলা ভাষা অচিরেই রূপান্তরিত হইয়া যাইবে। বর্তমান সময়ে যাঁহারা মনে করিতেছেন, শাসন কার্যার্থ ঢাকা ময়মনসিংহ যদি বঙ্গদেশ হইতে বিচ্যুতও হয়, তবে ঢাকা, ময়মনসিংহবাসীর বাঙালিত্ব ঘুচিবে কিসে, তাঁহারা যদি ভাষার দিক দিয়া চাহিয়া দেখিতেন তাহা হইলেই সহজেই বুঝিতে পারিতেন যে, ঢাকা ময়মনসিংহের ভাষা রূপান্তরিত হইলে তখন আর ইহাদিগকে বাঙালি বলিয়া চিনিবার কিছুই থাকিবে না। ঈশ্বর না করুন, যদি সত্য সত্যই গবর্নমেন্ট এই অপ্রিয় প্রস্তাব পরিবর্তন না করেন, তবে এই ভাষাগত পার্থক্যই সময়ে বাঙালির সর্বনাশের কারণ হইবে।

সহৃদয় বড়লাট বাহাদুর। বাঙালি জাতির অকল্যাণ কামনা হৃদয়ে লইয়া দেব, তুমি কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছ, এমন কথা আমরা ভ্রমেও মনে স্থান দিতে পারি না। কিন্তু প্রভো! তুমি সত্যসত্যই মহাভ্রমে নিপতিত হইয়াছ। বঙ্গের শাসনভার যদি একান্তই গুরুতর হইয়া থাকে, তবে, সমগ্র উড়িষ্যা প্রদেশ শাসনান্তরের অধীন করিয়া দাও, তাহাতে কাহারও কোন আপত্তি থাকিবে না। কিন্তু দেব! বাঙালি জাতির মধ্যে বিভাগ বন্টন ব্যাপার আনয়ন করিয়া এই দুর্বল জাতিকে আরও হীনবল করিও না। বাঙালি সন্তান আমরা, মাতৃভূমির সহিত সম্বন্ধত্যাগ করিব, একথা মনে করিতেও বুক ফাটিয়া যায়। যদি কোন বাঙালি সন্তান তোমাকে অন্য ভাবে বুঝাইয়া থাকে, নিশ্চয়ই জানিও প্রভো, সে ব্যক্তি স্বদেশের পরম শত্রু, স্বজাতির উচ্ছেদ সাধক। এই সমস্ত তথাকথিত প্রতিনিধির কথায় প্রত্যয় করিয়া যদি সমস্ত বাঙালির আবেদন অগ্রাহ্য কর, তবে স্পষ্টই বুঝিব বাঙালির সর্বনাশ সাধন ব্যতীত এ ব্যাপারে তোমার অপর কোন উদ্দেশ্য নাই। হিন্দুসন্তান আমরা, স্বদেশে থাকিয়া ভিক্ষা করিয়া মরিতেও প্রস্তুত আছি। তথাপি পরের দেশে যাইয়া সুখ সমৃদ্ধি বা রাজসম্মান লাভে কৃতার্থ হইতে চাহি না। আসামে যদি আমাদের জন্য সহস্র প্রকার সুবিধা ও সুযোগের ব্যবস্থা কর। তথাপি দেব। আমরা তাহা তৃণবৎ উপেক্ষা করিব। পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতিকে বিভাগ বন্টন রূপ প্রহসনের আঘাতে হীনবল করিও না। তোমার চরণে দেব, সওয়া চারি কোটি বাঙালির ইহাই প্রার্থনা।

বড়লাটের বাগ্ বিস্তার ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯০৪

বাক্য-বিলাসী বড়লাট বাহাদুর নানা ছন্দে বাগজাল বিস্তার করিয়া ঢাকা ময়মনসিংহ ও চট্টলবাসীর কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত করিয়া গিয়াছেন, এখন, বোধ হয় সে কথা আলোচনা করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। জ্যোতিপিণ্ডের প্রচণ্ড প্রভা অকস্মাৎ নয়নপথে নিপতিত হইলে কিয়ৎকাল যেমন অভিভূত হইয়া পড়িতে হয়। বচনরচনা নিপুণ বড়লাট বাহাদুরের মুখ স্থিত রচনা প্রবাহের তরঙ্গ-ভঙ্গে পড়িয়া পূর্ববঙ্গবাসীগণ তেমনি কিয়ৎকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত ও বিস্ময় বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিলেন , ক্ষুধার্ত ভিক্ষুক দাতাকর্ণের নিকট গলদশ্রুনয়নে ও করজোড়ে অন্নভিক্ষা করিয়া যদি ভস্মমুষ্টি প্রাপ্ত হয়, তবে যেমন অভাগা ভিখারী অদৃষ্টকে ধিক্কার দিয়া থাকে, জগতপূজ্য সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে ভারতের বর্তমান ভাগ্যবিধাতার নিকট পোড়া পূর্ববঙ্গবাসী কাতর ক্রন্দনের ফলে বিভীষিকাপূর্ণ ভর্ৎসনা বাক্য লাভ করিয়া তেমনই বীতশ্রদ্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিলেন। যাহার মুখে আশ্বাস বাণী শুনিবে বলিয়া পূর্ববঙ্গের আধিবাসীবৃন্দ বড় আশায় বুক বাঁধিয়া ছিল, প্রকৃতির বিকৃত কালআকাঙ্ক্ষিত আশ্বাসবাণী হুঙ্কারে পরিণত হইয়া বিষম বিভীষিকার বিস্তার করিয়াছে—বলিতে ঘৃণা ও লজ্জায় মরমে মরিয়া যাইতে হয়, পূর্ববঙ্গে রাজ প্রতিনিধির বাগ বিস্তার সত্য সত্যই, এমনিই হলাহল করিয়া সভ্যতার শিরে দুরপনের কলঙ্ক অর্পণ করিয়াছে।

যিনি অদ্বিতীয় বাক্যবাগীশ বলিয়া সর্বত্র সুপরিচিত, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তি তাহার বাক্যাবলীর সমালোচনা করিতে প্রয়াস পাইবে, সহা "উদ্বাহুরিব বামনঃ"বৎ প্রতীয়মান হইলেও কর্তব্যের দায়ে এ সম্বন্ধে দুই চারিটি কথা না বলিয়া পারিতেছি না। সম্রাট প্রতিনিধির অত্যুচ্চ আসনে যিনি প্রতিষ্ঠিত, তাঁহার মুখারবিন্দ হইতে যে রচনারাজি নিঃসৃত হয়, তন্মধ্যে যদি অসম্বন্ধতা, অপ্রাসঙ্গিকতা অযৌক্তিকতার লেশমাত্র বিদ্যমান থাকে, তবে তদপেক্ষা পরিতাপের আর কি হইতে পারে। বড়ই আশ্চর্যের বিষয় চট্টগ্রাম, ঢাকা বা ময়মনসিংহে প্রদত্ত বক্তৃতাত্রয়ের মধ্যে অনুসন্ধিৎসু পাঠক এমন দুটি কথাও খুঁজিয়া পাইতেছেন না, যুক্তি বা প্রত্যক্ষ পদার্থের সাহিত মিলাইয়া দেখিলে যাহার কিঞ্চিৎ মাত্রও সারবত্তা উপলব্ধি হইতে পারে। একদিন যদি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইবার আশা রাখেন বলিয়া সম্মুখে অম্লানবদনে এইরূপ অসার যুক্তিজাল বিস্তার করিয়া পূর্ববঙ্গের দেড় কোটি অধিবাসীর মনে বিভীষিকা সঞ্চারে যত্নবান হইবেন ; একথা কল্পনা করিতেও

শরীর শিহরিয়া উঠে। কিন্তু কালের ক্রীড়া এমনই অদ্ভুত একদিন কল্পনারও যাহা অগোচর ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান।

এই সুদীর্ঘ বক্তৃতা ত্রয়ের মধ্যে অন্য কোন ভাবের বিকাশ সহজ দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত না হইলেও, প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত বিদ্রূপাত্মক উগ্রতার রুদ্র মূর্তি পাঠকের প্রাণে যুগপৎ আতঙ্ক ও নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। আগাগোড়া সেই তর্জনী সঞ্চালিত ভৈরব গর্জন, মুখবন্ধ হইতে উপসংহার পর্যন্ত নিরীহ দেশবাসীর প্রতি প্রচণ্ড প্রভাব-প্রচ্ছাদিত উপহাসবর্ষণ; উপেক্ষা প্রদর্শন। চট্টগ্রামে যাহার পূর্বাভাষ, ঢাকায় তাহার ঈষৎ-বিকাশ এবং ময়মনসিংহে তাহা পূর্ণপ্রভায় পরিস্ফুট। এ জন্যই বুঝি বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, "এই তিন স্থানের বক্তৃতা একত্র করিয়া পাঠ না করিলে সকলে প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবেন না।" যাহা হউক, যাহা হইবার হইয়াছে, পূর্ববঙ্গবাসীর পোড়া অদৃষ্টপটের নিয়োগানুসারে অমিয়ার আধার হইতে হলাহল প্রবাহ উদ্গীরিত হইয়া অভাগা অধিবাসির জীবনীশক্তি সংহারে অগ্রসর হইয়াছে, এজন্য আক্ষেপ করিয়া লাভ কি। লাভ কিছু নাই তাহা বুঝি, কিন্তু কথা এই যৌক্তিকতার মর্যাদা রক্ষণই যে জাতির প্রধান ব্রত তাহাদের প্রতিভূরূপে বড়লাট বাহাদুর এ অঞ্চলবাসীর প্রতিনিধিবর্গের ন্যায্য আবেদন উপেক্ষা ও অবজ্ঞার চক্ষে অবলোকন করিবে এ কেমন ব্যাপার। যদি সত্যই সত্যই আমাদের আবেদন উপেক্ষিত হইল, তবে আমরা আমাদের পরমপূজনীয় সম্রাটের কৃপা প্রার্থী হইতে পারি না কি? আমাদের মনে হয়, বড়লাট বোধ হয় ভুল বুঝিয়াছেন। ভীতি প্রদর্শনে কার্যোদ্ধারের দিন এখন আর নাই। পঞ্চমবর্ষীয় শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্যন্ত দিনান্তভোজী কৃষক তনয় হইতে পর্যঙ্কবিলাসী জমিদার কুমার পর্যন্ত সকলেরই নিকট ন্যায়ের রাজ্য সুপরিচিত। কাজেই ন্যায়ের পবিত্র পতাকা উড্ডীন না হইলে, সহস্র গর্জনেও মানবমণ্ডলীর মস্তক অবনমিত হইবে না।

পূর্বেই বলিয়াছি, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে এ বক্তৃতায় ত্রিবিধ দোষ পরিলক্ষিত হইতেছে : অসম্বদ্ধতা; অপ্রাসঙ্গিকতা এবং অযৌক্তিকতা। অসম্বদ্ধতার নিদর্শনস্থলে চট্টগ্রামের বক্তৃতায় কটন সাহেবের উক্তির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। বড়লাটই বলিয়াছেন.....Unquestionably and inevitably wrote as a Bengal officer "অর্থাৎ কটন সাহেব বঙ্গদেশের সিবিলিয়ানের ন্যায় লিখিয়াছেন।" ভাল জিজ্ঞাসা এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার বঙ্গদেশীয় সিভিলিয়ানের চক্ষে অবলোকন করাটা দোষবহ বিবেচিত হইতে পারে কি? বঙ্গের অংশ বিশেষ চট্টগ্রাম বিভাগ আসামভুক্ত করার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রকাশকালে বঙ্গীয় সিভিলিয়ান বলিয়া যদি কটন সাহেবের ন্যায় প্রধান পুরুষের মত উপেক্ষিত হইল, তবে বিভাগ ব্যাপারে স্যর জন উডবারন এবং মিঃ বোর্ডিলন প্রভৃতির মত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইল কেন? তাহারাও তো বঙ্গীয় সিভিলিয়ান। তার পরে, বড়লাটের কথা মতে স্যর জন উডবারন এবং মিঃ বোর্ডিলন প্রভৃতির মত প্রমাণ স্বরূপ গৃহীত হইল কেন? তাহারাও তো বঙ্গীয় সিভিলিয়ান। তার পরে, বড়লাটের কথা মতে স্যর জন উডবারণ প্রভৃতি সিভিলিয়ানগণ বঙ্গবিভাগে মত প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু এই বিভাগ ব্যাপার কিরূপে সম্পন্ন হইবে তৎসম্বন্ধে তাহারা কোন মত প্রদান করিয়াছেন কিনা, বড়লাট বাহাদুর তো তৎসম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। বঙ্গের অংশবিশেষ আসামভুক্ত করা সম্বন্ধে তাহারা সম্মত ছিলেন কিনা একথা কে বলিবে? বঙ্গের অংশবিশেষ আসামভুক্ত করা অথবা ঐ অংশ বিশেষ ও আসাম লইয়া নূতন প্রদেশ গঠন করা ব্যতীতও তো অন্যরূপে এই বঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন হইতে পারে। বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা লইয়া বাংলা প্রেসিডেন্সি গঠিত। ইহার মধ্যে উড়িষ্যা ও বিহার ছাড়িয়া প্রকৃত বঙ্গদেশ ও আসাম লইয়া একটি নূতন প্রদেশ হইলে দোষ কি? তবে বঙ্গের অঙ্গ খণ্ড খণ্ড করা কেন? স্যর জন উদবারন প্রমুখ ব্যক্তি যদি বাংলা প্রেসিডেন্সির বিভাগ করিতে সম্মত হইয়াই থাকেন, তবে, তাহারা বর্তমান প্রস্তাব অনুযায়ী বিভাগের পক্ষপাতী কিনা

এ প্রশ্ন সাধারণের মনে উঠিতে পারে না কি? কটন সাহেব বঙ্গের অংশ বিশেষ আসামভুক্ত করার সম্বন্ধেই আপত্তি করিয়াছিলেন। হয়তো বড়লাট যাহাদিগের নাম প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহারাও এরূপ প্রস্তাবের (পক্ষে) নহেন। আর যদি তাঁহারা এ প্রস্তাবের পক্ষপাতীই হন, তবে বঙ্গীয় সিভিলিয়ান বলিয়া কটন সাহেবের মত পরিত্যক্ত হইবে, আর ধিক সেই কারণে স্যার জন উডবারনের মত গৃহীত হইবে, জনসাধারণ কিন্তু এহেন অদ্ভুত যুক্তির সারবদ্ধত্তা অবধারণে একান্তই অক্ষম। এরূপ উক্তিও যদি অসম্বদ্ধদোষ দুষ্ট না হয়, জানিনা তবে, অসম্বন্ধ উক্তি কাহাকে বলে। স্থির চিত্তে পাঠ করিলে বক্তৃতাত্রয়ের মধ্যে এরূপ নিদর্শনের প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হইবে। ব্যাপার দেখিয়া মনে হয়, যে সকল ব্যক্তি বড়লাটের মতাবলম্বী, জগতে তাহারাই একমাত্র ধীমান, আর সকলেই তদ্বিপরীত। বড়লাটের ন্যায় প্রধান পুরুষের মুখে এরূপ কথা শুনিলে বুদ্ধিমান ব্যক্তি বোধ হয় হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ ইংলিসম্যান যথার্থই বলিয়াছেন 'But the viceroy can afford to be illogical."[৩১]

শিখিলাম কি? ২৭ মার্চ ১৯০৪

সমগ্র ভারত সন্তানের প্রবল প্রতিবাদ উপেক্ষায় উড়াইয়া দিয়া পরাক্রান্ত প্রভুর অলঙ্ঘ্য আদেশে চক্ষের নিমিষে দেশে যে মহাপ্রলয়ের সূত্রপাত করিল, শিক্ষিত ভারত সন্তান ইহা হইতে কি শিক্ষা লাভ করিলেন, বর্তমান সময়ে চিন্তাশীলের চিত্তে স্বতই এ প্রশ্ন উদিত হইয়া থাকিবে। যে আশায় বুক বাঁধিয়া অভাগা ভারতবাসী অমানিশার আঁধাররাশি দুহাতে সরাইতেছিল, বিধাতার ব্যবস্থায় রাতুলের ব্যর্থ বাসনার ন্যায় আজি তাহার অযোগ্যতা প্রতিপাদিত হইয়া, পরমুখাপেক্ষী ভারত তনয়কে জগৎবাসীর উপহাস বা উপেক্ষার উপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আথো বিধিবিড়ম্বনা।

চক্ষু থাকিতে যাহারা তাহার ব্যবহারে অনভিজ্ঞ, প্রজ্ঞাবান হইয়াও যাহারা অজ্ঞান তিমির উচ্ছেদে অসমর্থ, আবহমানকাল ভরিয়া তাহার মোহ মদিরায় মুগ্ধ থাকিবে ইহা কখনই বিচিত্র নহে। কিন্তু অভাব অভিযোগের প্রবল পীড়নে বিমর্দিত হইয়া আপন অবস্থার কথা যাহারা ভাবিতে শিখিয়াছে, এবার তাহারা অবশ্যই বুঝিতে পারিবে একালে নয়নজলে বুক ভাসাইয়া পরাক্রান্ত প্রভুর অনুগ্রহ ভিক্ষা সম্পূর্ণ নিরর্থক। অফিসিয়াল সিক্রেট বিল বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় আইন, এ সকলের ইতিহাস পাঠ করিয়াও যদি ভারত সন্তানের চৈতন্যোদ্রেক না হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে হিতাহিত বুদ্ধিও ভারতসন্তানের নিকট হইতে চিরদিনের তরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে, উল্লিখিত আইন দুইটি বিধিবদ্ধ হইবার সময় রাজপ্রতিনিধির আইন সভায় যে অদ্ভুত ব্যাপার পরিলক্ষিত হইয়াছে, ব্রিটিশ শাসনের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে, জানি না, তাহার সাদৃশ্য মিলিবে কিনা। আসন্ন আপদের আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন সমগ্র ভারত কতই না বাদ প্রতিবাদে আলোচনা আন্দোলন উত্থাপন করিল, দীনদরিদ্র দেশবাসী, পিতৃমাতৃহীন শিশুর ন্যায় প্রভুর পদপ্রান্তে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া কাতর কণ্ঠে কতই না কৃপা ভিক্ষা করিল। কিন্তু লক্ষলক্ষের অনুনয় বিনয় এবং কোটি কণ্ঠের কাতর ক্রন্দনের ফলে ভারতের ভাগ্যবিধাতার প্রবল পিপাসা মুহূর্তের তরেও প্রশমিত হইল কি? বিজেতা বিজিত সম্বন্ধের এরূপ বিসদৃশ বিকাশ সভ্য জগতে আর কখনও পরিলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। আজ দেড় শতাধিক বৎসর যাবত ভারত তনয় বৃটিশরাজের পদমূলে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া আসিতেছে। কিন্তু এই দেড়শত বৎসরের মধ্যেও এমন একটি দৃষ্টান্ত সংঘটিত হয় নাই যেখানে সমগ্র ভারতীয় সম্প্রদায় এরূপে উপেক্ষিত, এরূপভাবে অবমানিত এবং এইরূপে তিরস্কৃত হইয়াছে। এত দেখিয়া শুনিয়াও যদি ভারত সন্তান আপনার অবস্থা বুঝিয়া চলিতে শিক্ষা না করে, তবে বুঝিতে হইবে সবুট পদপ্রহারই ভারতের সন্তানের জন্য সুসঙ্গত ব্যবস্থা।

পাঠক মনে করিবেন না আমরা বর্তমান গভর্নমেন্টের ব্যবহারে দোষারোপ করিতেছি। আমরা

বলি, ভারত সন্তানের অযোগ্যতাই এইরূপ উপেক্ষার একমাত্র কারণ। অধিকার গেল বা অধিকার পাইলাম এ সকল বিষয় লইয়া চীৎকার করা আমরা বিজিত জাতির অধিকার বহির্ভূত বলিয়া মনে করি। গভর্নমেন্টের ব্যবহারেও একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। গভর্নমেন্টের কার্য লইয়া আলোচনা না করিয়া, যদি ভারতের বর্তমান অবস্থা ভারতবাসীর দুর্দশার প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে আমাদের আলোচনা বা আন্দোলন পর্যবসিত হইত তবে বোধ হয়, ভিখারির বেশে আমাদিগকে আর কাঁদিতে হইত না। গভর্নমন্টে যে সকল বিধানাদি প্রবর্তিত করিলেন, কেহ কি বলিতে পারে যে উহার ফলে ভারত সন্তানের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্ত হইবে। ভারতবাসী পূর্বেও যেমন ছিল পরেও তেমন থাকিবে। সাগরে যাহার শয্যা, শিশিরে আর তাহার কত ভয়। তাই বলিতে ছিলাম, ভাই ভারতবাসী এবারের ব্যাপার দেখিয়া বুঝিয়া লও গভর্নমেন্ট কার্য লইয়া বাকবিতণ্ডা করা অপেক্ষা যাহাতে জাতির প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে তজ্জন্য যত্ন করাই একমাত্র কর্তব্য। দেশ দিন দিন ধনশূন্য হইয়া প্রকৃতই অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। অনাহারে বা অর্ধাহারে দরিদ্র দেশবাসী দিন নিই কঙ্কালসার হইয়া পড়িতেছে। শিক্ষা ও বাণিজ্যের বিস্তারে যদি দেশে অর্থাগমের উপায় উন্মুক্ত না হয়, তবে অচিরেই যে আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে, তদ্বিষয়ে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ভিক্ষা দ্বারা পূর্বসমৃদ্ধি লাভে সমর্থ হইবে এত দিন এই অলীক ধারণার বশবর্তী হইয়া ভারতসন্তান কি ফললাভ করিয়াছে? তাই বলিতেছিলাম, ভাই ভারতসন্তান। এখনও বুঝিয়া চলিতে শিখিলে দেশের দুর্দশা তিরোহিত হইতে পারে।

বঙ্গের সর্বনাশ *সেপ্টেম্বর ১৯০৪*

বঙ্গের সর্বনাশ হইয়াছে। আট কোটি বঙ্গবাসীর বক্ষস্থল পদপ্রহারে বিদীর্ণ করিয়া, কৃতান্তরূপী কার্জন বাহাদুর বঙ্গের ক্ষীণ অঙ্গযষ্টি দ্বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছেন। সপ্তশতবৎসর ব্যাপী বৈদেশিক শাসনে নিগৃহীত হইয়াও দীনদুর্বল বাঙালি সন্তান জাতীয়ত্বের যে অমূল্য রত্ন সযত্নে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে লুকাইয়া রাখিয়াছিল, প্রবল পরাক্রমে প্রদীপ্ত হইয়া ব্রিটিশ প্রতিনিধি বাঙালির বক্ষাভ্যন্তর হইতে আজ সে রত্ন কাড়িয়া লইতেছেন। হায় হায়! বিরূপ বিধাতার এরূপ বিষম ব্যভিচার কত কাল আর বাঙালি সন্তানকে নির্জীবের ন্যায় সহিয়া লইতে হইবে। কোটি কোটি অধিবাসিবৃন্দের আন্দোলন ও আর্তনাদ গর্ববেগে উড়াইয়া দিয়া, দম্ভদৃপ্ত বড়লাট, বঙ্গবিভাগের ঘোষণা-পত্র প্রচারদ্বারা, ব্রিটিশসিংহের পবিত্র নামে যে দুরপনেয় কলঙ্ক অর্পণ করিলেন, সভ্যতার শুভ্র জ্যোতি; যতদিন এ মরজগৎকে উদ্ভাসিত করিবে ততকাল এ কলঙ্ক অপগত হইবার নহে।

ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগের সহিত আসামপ্রদেশ সম্মিলিত করিয়া 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম' নামে এক নূতন প্রদেশ গঠনের ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্মিলিত বঙ্গের সমস্ত আশা ভরাসা এতদিনে চিরতরে বিলুপ্ত হইল। আসামের চিফ কমিশনার মাননীয় মি. জে. বি. ফুলার এই নূতন প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর নিযুক্ত হইলেন। শুনিতেছি, ফুলার মহোদয় ছোটলাটরূপে শীঘ্রই ঢাকা নগরীতে আগন করিতেছেন। তাহার আগমনোপলক্ষে নাকি নানারূপ বন্দোবস্ত হইতেছে।

যাহা হইবার হইয়া গেল! এখন এ ভীষণ দুর্দিনে বাঙালির কর্তব্য কি, তাহাই একমাত্র ভাবিবার বিষয়। আমরা বলি, ভারত গভর্নমেন্টের মীমাংসার উপর নির্ভর করিয়া নিরাশ হওয়া কর্তব্য বলিয়া পরিগণিত হওয়া উচিত। বিশেষতঃ, এ অমঙ্গলের অভ্যন্তর হইতে যে অশেষ কল্যাণকর 'স্বদেশি আন্দোলন' আবির্ভূত হইয়াছে, সেই আন্দোলন কেবল কথায় পর্যবসিত না হইয়া যাহাতে কার্যে পরিণত হইতে পারে তজ্জন্য সাধ্যানুরূপ যত্ন করা বাঙালিমাত্রেরই একমাত্র কর্তব্য। বঙ্গবিভাগ হয় হউক, এ স্বদেশি আন্দোলন যদি আমরা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারি, তবে সময়ে আমরা নিশ্চয়ই জননী জন্মভূমির মলিনমুখ সুপ্রসন্ন দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারিব।

ঢাকায় জনসাধারণের বিরাট সভা। ৩ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

১১ ভাদ্র, রবিবার, ঢাকার ইতিহাসে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিনরূপে কীর্ত্তিত হইবে। সেদিন যে অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, ঢাকায় আর কখনও তাহা দৃষ্টিগোচর হয় নাই। "বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ এবং স্বদেশীয় দ্রব্যের প্রচলনার্থ আন্দোলন" এই সংকল্প লইয়া, ঢাকা জনসাধারণ সভার সেক্রেটারি মহোদয় ঢাকাবাসিকে এক বিরাট সভায় সম্মিলিত হইবার নিমিত্ত আহ্বান করেন। স্থানীয় জগন্নাথ কলেজের বিশাল প্রাঙ্গণে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, এবং স্থানীয় শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের বালক, যুবক, বৃদ্ধ প্রভৃতিতে অন্যূন দশ সহস্র লোক সাগ্রহে সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। জনসাধারণ সভার আমন্ত্রণে, কলিকাতা হইতে বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জে. চৌধুরী, বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র এবং শ্রীযুক্ত আবদুল হালিম গজনভি এ নগরে শুভাগমন করিয়া শহরবাসীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। অগণিত জনমণ্ডলী যখন কলেজের প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে সমবেত হইতে লাগিলেন, তখন তাহাদের উৎসাহ ও উৎকণ্ঠা যে দেখিয়াছে সেই মুগ্ধ হইয়াছে। সেই বিশাল সম্মিলনীর দিকে চাহিলে মনে হয়, সম্মুখে যেন এক সুবিস্তৃত জনসমুদ্র বিদ্যমান রহিয়াছে। জমিদার, মহাজন, অধ্যাপক, অধ্যয়নার্থী, উকিল, চিকিৎসক প্রভৃতি সর্ব-সম্প্রদায়ের লোক দ্বারাই সম্মিলনী গঠিত হইয়াছিল। সেদিনকার সভায় ছাত্রগণ যেরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়াছে, তাহা বস্তুতঃই প্রশংসার্হ। এতবড় সভার কার্য যে এমন শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠবের সহিত সম্পন্ন হইতে পারে, অনেকেই তদ্বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু ছাত্রগণের সুব্যবস্থায় এই ১০/১২ হাজার লোকের মধ্যে এমনি শৃঙ্খলা রক্ষিত হইয়াছিল যে, সভাক্ষেত্রে জন-মানবহীন প্রান্তরের নির্জনতা অনুভূত হইয়াছে। বিদ্যার্থিবর্গের মধ্যে সেদিন যেরূপ উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা গিয়াছিল, ভগবৎ কৃপায় যদি তাহা স্থায়ী হয়, তবে দেশের পক্ষে বিশেষ কল্যাণের কারণ হইবে।

প্রারম্ভে স্থানীয় দুইটি যুবক কর্তৃক একটি উদ্দীপনাপূর্ণ সঙ্গীত হয়। সঙ্গীত এইরূপ :

"বন্দে মাতরম"।

নমো বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী
যুগে যুগে জননী লোকপালিনী।
সুদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে,
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি,
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী!
তাল তমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে,
আনন্দ জাগ অয়ি কাঙ্গালিনী!
কিসের দুঃখ মাগো কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব বিচূর্ণ পণ্য,
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ?
ডাক মেঘ মন্দ্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী—গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি
জান না আপনার সন্তানশালিনী।

সর্বসম্মতি ক্রমে ঢাকার প্রসিদ্ধ উকিল বাবু আনন্দচন্দ্র রায় সভাপতি নির্বাচিত হইয়া সভার কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ছয়টি প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে।

কথা ছিল, ভাওয়ালের জ্যেষ্ঠ কুমার রণেন্দ্রনারায়ণ রায় প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হইয়া পড়াতে, তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে, তাহার প্রাইভেট সেক্রেটারি প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। বাবু গোবিন্দপ্রসাদ দাস এবং বাবু দীনবন্ধু মজুমদারের সমর্থন মতে প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। প্রস্তাবটি এইরূপ :

বঙ্গবিভাগ প্রশ্ন সম্বন্ধে বঙ্গবাসীর অভিমত এবং স্বার্থসম্বন্ধ সমর্থন করাতে, এই সভা পার্লিয়ামেন্টের সভ্য মিঃ রবার্টসের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছেন। এই প্রস্তাবের প্রতিলিপি মিঃ রবার্টস মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করিবার নিমিত্ত এই সভা সভাপতি মহোদয়কে অনুরোধ করিতেছেন।

দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন স্থানীয় প্রসিদ্ধ উকিল বাবু ত্রৈলোক্যনাথ বসু (এম. এ. বি. এল)। প্রস্তাব উত্থাপনকালে তিনি একটি সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়া জনসাধারণের তৃপ্তিবিধান করিয়াছিলেন। বাবু রাজেন্দ্রকুমার বসু ও বাবু বিশ্বেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমোদন মতে প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব এইরূপ :

মিঃ ব্রডরিক যখন অতিরিক্ত সংবাদ প্রদানের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়াছেন, এবং যত শীঘ্র সম্ভব তিনি ভারত গবর্নমেন্টকে পত্রাদি লিখিয়া, এ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কাগজাদি মহাসভার সম্মুখে উপস্থিত করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন ; মহাসভা যখন কোন পক্ষেরই কারণাদি অবগত নহেন বলিয়া স্যর হেনরি ফাউলার মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, বিভাগের বৃহত্তম প্রস্তাব যাহা এখন অনুমোদিত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব আন্দোলনার্থ যখন জনসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করা হয় নাই; অতএব এই সভা অনুরোধ করিতেছেন যে, ভারত সচিব যদি বঙ্গবিভাগ আদেশ প্রত্যাহার না করেন, তবে অনুগ্রহপূর্বক বঙ্গবিভাগ অনুমোদনকল্পে তাহার আদেশ, হাউস অব কমন্সে এ বিষয়ের আন্দোলন পর্যন্ত, স্থগিত রাখুন।

মিঃ আবদুল হালিম গজনভির বক্তৃতা

দ্বিতীয় প্রস্তাব সমর্থন কালে, ময়মনসিংহের সুসন্তান মিঃ আবদুল হালিম গজনভি ওজস্বিনী ভাষায় যে একটি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করিয়াছিলেন, পাঠকবর্গের অবগতিব নিমিত্ত, নিম্নে উহার সংক্ষিপ্ত মর্ম বিবৃত হইল। মিঃ আবদুল হালিম গজনভির বক্তৃতা।

"ভাই হিন্দু মুসলমানগণ, এতদিনে বুঝিতে পারিয়াছ যে সত্য সত্যই আমাদের বিষম দুর্দিন উপস্থিত হইয়াছে। যদি যথার্থই উহা বুঝিয়া থাক, তবে এখনও নিরাশ হইও না; কারণ এ দুর্দিনে এখনও সন্ধ্যা সমুপস্থিত হয় নাই। ভ্রাতৃগণ, অদম্য উৎসাহের সহিত কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হও। হৃদয়ের সহিত কার্য করিতে পারিলে কখনও উহা বিফল হইবে না। ছয় বৎসর পূর্বে বড়লাট লর্ড কার্জন যখন ভারতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি আমাদিগকে কত আশার কথাই না শুনাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, ভারতবাসীকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসেন। ভাল, এখন আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, প্রভো! তোমার ভালবাসা কি এইরূপ? সোনার বাংলাকে আমাদিগের জননী জন্মভূমির দেহযষ্ঠিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কি প্রভো! তুমি তোমার সে ভালবাসা প্রদর্শন করিতে বসিয়াছ?" একথা শুনিয়া সেদিন মাননীয় যোগেশ বাবু ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল, ছোট প্রভো! কে কে তোমাকে বাংলা ভাগ করিতে বলিয়াছে?" ছোটলাট সে কথার কোন স্পষ্ট উত্তর দিলেন না, কেবল বলিলেন, তিনি কাহারও নাম প্রকাশ করিতে পারেন না। মাননীয় অম্বিকাবাবু ছোটলাটকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "বল প্রভো! তুমি ভিন্ন অপর কেহ কি কখনও

বলিয়াছে যে "এই বাংলাদেশ শাসন করা একজন ছোটলাটের পক্ষে সম্ভবপর নহে?" ছোটলাট সে কথারও কোন উত্তর দেন নাই। আমরা বলি, ইতিপূর্বে যখন কেহই এমন কথা বলেন নাই, তখন বর্তমান ছোটলাট যদি এদেশ শাসন করিতে একান্তই অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তিনি কার্যত্যাগ করিলেই পারেন। যে বোঝা তিনি বহিতে পারেন না, সে বোঝা তিনি মাথায় লইয়াছেন কেন? যে কার্যের ভার যাহার উপর প্রদত্ত হয়, সে যদি উহা সম্পাদন করিতে না পারে, তবে তাহারই অকর্মণ্যতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। তখন সেই কার্য সম্পাদনের নিমিত্ত কার্যক্ষম লোকই নিযুক্ত করা হয়। কার্যটি কিছু কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করা হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমাদের দেশের জমিদারি শাসনের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। কোন জমিদারের নায়েব যদি তাহার এলাকাধীন স্থান সুশাসনে রাখিতে সমর্থ না হয়, তবে জমিদার কি ঐ এলাকা কাটিয়া ছাটিয়া ছোট করিয়া দেন, না ঐ কর্ম সম্পাদনের নিমিত্ত নূতন নায়েব নিযুক্ত করেন? ছোটলাট যদি বঙ্গদেশ শাসনে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তবে তাহার স্থানে নূতন ছোটলাট নিযুক্ত করিলেই তো সকল গোল মিটিয়া যাইতে পারে। ভাই: তোমাদিগের এত লোককে সমবেত দেখিয়া আজ আমি আনন্দে বিহ্বল হইয়াছি। কেহ কেহ বলেন, হিন্দু মুসলমানের মধ্যে শত্রুতা আছে। যাহারা এরূপ বলেন, আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, তাহারা মিথ্যা বলিয়া থাকেন। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কখনও শত্রুতা হইতে পারে না; কারণ হিন্দু ও মুসলমান, উভয়েই এক বঙ্গজননীর সন্তান। ভাই ভাই শত্রুতা হইবে কিরূপে? হিন্দু মুসলমানের জন্মভূমি বাংলাদেশ, ইংরেজের তো জন্মভূমি বাংলা নহে? তাই আজ আমরা হিন্দু মুসলমান সকলে বলি, তোমরা ভাগ করিতে হয় কর, আমরা কিন্তু ভাগ করিতে দিব না। ইংরেজরা পয়সাটিকে বেশ চিনেন। ততদূর থেকে ইংরেজ এসেছেন পয়সা নিতে; সে পয়সা যদি বন্ধ করা যায়, তবে নিশ্চয়ই ভাল লাভ হইতে পারে। ভ্রাতৃগণ! এবার ইংরেজের পকেটে হাত দিতে হইবে। মিটিং তো অনেক করা হইল; কিন্তু কিছুতেই যখন রাজপুরুষেরা শুনিতেছেন না, তখন এ ব্যবস্থাই প্রশস্ত। বলি, আমরা স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিব। শতবৎসর পূর্ব কি দেশের কাপড়ে দেশের অভাব পূর্ণ হইত না? "ছেঁড়া কাপড় পরিব, তথাপি বিদেশি কাপড় পরিব না," সকলে এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন। যদি এই প্রতিজ্ঞা স্থির রাখিতে না পারেন, তবে রাজনৈতিক আন্দোলন এইখানেই শেষ হইল বলিয়া জানিবেন। এবার দুর্গোৎসবে বা ঈদে কোন প্রকার আমোদের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য নহে। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ। সকলে প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হউন, এই বিপদ উত্তীর্ণ না হওয়া পর্যন্ত, আর কেহই কোন উৎসবে বা আনন্দে যোগদান করিবেন না। আজ ৩০ বৎসর হইল, আমাদের সম্মুখস্থ এই মহাপুরুষ দেশে যে পতাকা উড্ডীন করিয়াছেন, দেখিও ভ্রাতৃবৃন্দ তোমরা যেন তাহা তেমনই গৌরবের সহিত উড্ডীন রাখিতে সমর্থ হও। তোমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলে এ পতাকা চিরদিনই উড্ডীন থাকিবে।

বেঙ্গল টাইমস পত্রিকার সম্পাদক মি. ক্যাম্প তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। সংক্ষেপে নানাবিধ যুক্তি দ্বারা মি. ক্যাম্প প্রথমে সভ্যগণকে এরূপ প্রস্তাবের প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দিয়াছেন। বক্তৃতাকালে একস্থলে মি. ক্যাম্প বলিয়াছিলেন, "ঢাকার ন্যায় একটি সামান্য শহরে এই ব্যাপার উপলক্ষে যদি দশ সহস্র লোক প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত অদ্য উপস্থিত হইয়াছে, তবে এই ব্যাপারে দেশে না জানি কী ভীষণ আন্দোলনই সৃষ্ট হইয়া থাকিবে। বাবু সাধুচরণ রায়, ডাক্তার শিবচন্দ্র বসু এবং বাবু মুকুন্দবিহারী চক্রবর্তীর অনুমোদন মতে প্রস্তাব সর্বসম্মতি ক্রমে পরিগৃহীত হয়। তৃতীয় প্রস্তাবের মর্ম এইরূপ :

১৯০৪ সনের ১৮ মার্চ তারিখে কলিকাতা টাউনহলে সভায় জনসাধারণের যে আবেদন-পত্র গৃহীত হইয়াছিল, ঐ আবেদন-পত্রে জনসাধারণ প্রার্থনা করিয়াছিল যে, বঙ্গের শাসনকর্তার কার্যভার যদি কমাইতে হয়, তবে বঙ্গদেশকে প্রেসিডেন্সি গভর্নমেন্ট উন্নতি করিয়া, তাহার শাসনের নিমিত্ত

একজিকিউটিভ কাউন্সিল সহ জনৈক বিলাতবাসি রাজনীতিবেত্তাকে গবর্নররূপে নিযুক্ত করাই ঐরূপ কার্য লাঘবের প্রকৃষ্ট উপায়। ঐরূপ ব্যবস্থা, প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগ অপেক্ষা বহু পরিমাণে অল্পব্যয়সাপেক্ষ। কারণ প্রস্তাবিত বঙ্গবিভাগে রেভিনিউ বোর্ড, সেক্রেটেরিয়েট এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় আফিসাদিসহ লেফটেন্যান্ট গভর্নর সৃষ্টি করিতে, প্রথমতঃ এবং প্রতি বৎসরের নিমিত্ত গুরুতর ব্যয়ভার বহনের আবশ্যক হইবে। এই সভা জনসাধারণের উল্লিখিত প্রার্থনার পুনরুক্তি করিতেছেন।

বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের বক্তৃতা

তৃতীয় প্রস্তাবের সমর্থনকালে কলিকাতা সিটি কলেজের স্বনামখ্যাত অধ্যাপক বাবু হেরম্বচন্দ্র মৈত্র যে সারগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম এইরূপ :

"সমবেত সভ্য মহোদয়গণ, ঘটনাচক্রে আজ আমার কণ্ঠস্বর ভাঙিয়া গিয়াছে কিন্তু ভগ্নকণ্ঠ হইলেও এই জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে আমি ভগ্নপ্রাণ নহি। এই সর্বব্যাপী আন্দোলনে যে আমার গভীর অনুরাগ আছে, তাহা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত আজ আমি এইরূপ রুদ্ধকণ্ঠস্বর লইয়াও আপনাদের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি। এই প্রস্তাব উপলক্ষে আমার দুই একটি কথা বলিবার আছে। অনেকেই সম্যক অবগত নহেন যে, সকৌন্সিল গভর্নর এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নরের প্রভেদ কি? লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসনকার্য এক ব্যক্তি কর্তৃকই পরিচালিত হইয়া থাকে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর একাকী যাহা সঙ্গত বা অসঙ্গত মনে করেন, তদনুসারেই শাসনকার্য সম্পন্ন হয়। কিন্তু সকৌন্সিল গভর্নরের শাসন পদ্ধতিতে একাকী কাহারও কিছু করিবার অধিকার নাই। কৌন্সিলের অধিকাংশ সদস্য এবং গভর্নর একমত না হইলে কোন কার্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। কাজেই একজন কর্তৃক পরিচালিত শাসন ব্যাপার যে সকল ভ্রম প্রমাদাদিদোষ-দুষ্ট হইতে পারে, সকৌন্সিল গভর্নরের শাসনে তদ্রূপ প্রমাদের সম্ভাবনা অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে একটি কথার উল্লেখ করিতেছি। সকলেই জানেন, বর্তমান বড়লাট বঙ্গ-বিভাগ কার্য সত্বর সম্পাদনের নিমিত্ত কিরূপ ব্যগ্র। কিন্তু এই কাউন্সিল থাকাতে বড়লাটের ব্যগ্রতা কার্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বিশ্বস্তভাবে শুনিয়াছি, এইরূপ সার্বজনিক প্রতিবাদের সম্মুখে সহসা এরূপ কার্য সম্পন্ন করা সঙ্গত নহে বলিয়া কাউন্সিলের কোন সদস্য অভিমত প্রকাশ করাতে, গত বৎসর বঙ্গ বিভাগ ব্যাপার সম্পন্ন হয় নাই। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের শাসন এবং কাউন্সিলস্থ সদস্যগণের সুপরামর্শ দ্বারা পরিচালিত গভর্নরের শাসনে পার্থক্য কত। কাজেই গভর্নর হইলে বহু বিপদ হইতে আমরা উদ্ধার পাইতে পারিব। ভাল, যে জন্য আমরা এত অনুরোধ করিতেছি, কেন আমরা সেই গভর্নর পাইতে পারিব না? বোম্বাই ও মাদ্রাজ যদি গভর্নর পাইতে পারিয়াছে, তবে বঙ্গের জন্য গভর্নরের ব্যবস্থা হইবে না কেন? শিক্ষায় বা সভ্যতায় বঙ্গদেশ তো অপর কোন দেশ অপেক্ষা হেয় নহে। লেফটেন্যান্ট গভর্নর তো ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্বিসের অন্তর্গত। সিভিল সার্বিসের লোক হইয়া তিনি সেই সিভিল সার্বিসস্থ অধীন রাজপুরুষগণের বিচার করিয়া থাকেন সুতরাং এক্ষেত্রে কিরূপ ন্যায় বিচার হয় তাহা সহজেই বোধগম্য। তিলকের মোকদ্দমার বিবরণ বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি স্যর লরেন্স জেঙ্কিন্স তিলককে মুক্তিদান কালে গভর্নমেন্টের কার্যে তীব্র ভাষায় দোষারোপ করিয়া যেরূপ ন্যায়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, মাননীয় জেঙ্কিস মহোদয় সিভিল সার্বিসের লোক হইলে তিনি তদ্রূপ করিতে পারিতেন কি? এসকল বিবেচনা করিলে সহজে বুঝা যাইবে শাসনকর্তার পদে, সিভিল-সার্বিসাতিরিক্ত লোকের নিযুক্তি কিরূপ মঙ্গলজনক। তৃতীয়তঃ ব্যয়ের কথা প্রস্তাবানুরূপ নূতন প্রদেশ গঠন যেরূপ বহুব্যয়সাপেক্ষ তত ব্যয় স্বীকার সমীচীন কি না। যে দেশে জলকষ্টে

লোকের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া যায়, ম্যালেরিয়ার প্রবল প্রকোপে নিত্য যে দেশ উৎসন্ন হইতেছে, সেই দারিদ্র পীড়িত, অনশনক্লিষ্ট দেশের টাকা এরূপ ভাবে ব্যয় করা সাজে কি? অভাগা অধিবাসিবৃন্দের অভাবাদি দূরীকরণকালে যখন আমরা টাকা চাহিয়া থাকি তখন রাজকোষে অর্থের অভাব হইয়া থাকে। কিন্তু এরূপ অন্যায় ও সম্পূর্ণ অনাবশ্যকীয় কার্য সম্পাদনের জন্য গভর্নমেন্টের অর্থের অভাব হয় না। নূতন প্রদেশ সৃষ্টি না করিয়া বঙ্গের জন্য সকৌন্সিল গভর্নরের ব্যবস্থা করিলে তো এত ব্যয় বহনের কোনই প্রয়োজন হয় না। দ্বিতীয়তঃ যিনি গভর্নর হইবেন তিনি সিভিল সার্বিসের লোক নহেন। তিনি একজন ইংলিস ষ্টেটস্‌ম্যান। ভারতের দূষিত বায়ু সংস্পর্শে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি মলিনতা প্রাপ্ত হয় নাই। স্বাধীন জাতির স্বাধীন সাম্রাজ্যের পবিত্রতা পুষ্ট প্রশান্ত প্রাণ এবং উদার হৃদয় লইয়া তিনি এ দেশে আসিবেন। সুতরাং তাঁহার নিকট সর্বপ্রকারেই সুশাসনের প্রত্যাশা করা যাইতে পারে। এই বঙ্গদেশের জন্য গভর্নর নিযুক্ত করা হইবে বলিয়া প্রথমতঃ ১৮৩৩ সালে এবং ১৮৫৩ সালে পার্লামেন্ট মহাসভা প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। আজ প্রায় শত বৎসর পরে এখন বলা হইতেছে, তোমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত নও। ১৮৩৩ বা ১৮৫৩ সনে যদি আমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইয়াছিলাম, তবে এখন আমরা অনুপযুক্ত হইলাম কিরূপে? একথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের এরূপ অযোগ্যতার জন্য তোমরাই তো একমাত্র দায়ী। তোমাদের সুশাসনগুণে আমাদের তবে এই হইয়াছে যে, পূর্বে যদিও আমরা গভর্নর পাইবার উপযুক্ত বিবেচিত হইতাম, এখন তন্নিমিত্ত অযোগ্য বিবেচিত হইতেছি! ইহাতে তোমাদের শাসন মাহাত্ম্য কীর্তিত হইতেছে না কি।

যাক এসব কথা। এখন মূল কথা হইতেছে কোন সভা সমিতি করিয়া আমরা আমাদের আবেদন গ্রহণ করাইতে পারিব না। আমরা যদি আপনার পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হই তবেই আমরা সম্মানিত হইব। তাই বলিতেছি, ভ্রাতৃগণ, এস আজ এ শুভমুহূর্তে সকলে বিধাতার দিকে চাহিয়া প্রতিজ্ঞা করি, "আমরা আপনার পায়েই দাঁড়াইতে শিখিব"। এখন হইতে আমরা একমাত্র স্বদেশোৎপন্ন দ্রব্যজাতই ব্যবহার করিব। সকলে যদি আমরা ঐ পবিত্র প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারি, তবে নিশ্চয়ই শুভফল লাভ হইবে। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া যাইতেছি, কলিকাতা যাইয়াই নিজের পরিধানার্থ দেশি মিলের মোটা মার্কিন কাপড় ক্রয় করিব। অনেকে বলেন আপততঃ দেশি কাপড় তেমন প্রচুর পরিমাণে মিলিবে কোথায়? একথা সত্য হইলেও ছয় মাসের মধ্যেই আমাদের প্রয়োজনানুরূপ দেশীয় কলাদির আমদানি হইতে পারিবে। এই সামান্য ছয়টা মাস কি আমরা কোন প্রকারে কাটাইয়া দিতে পারিব না? ছিন্নবস্ত্র পরিধান করিয়াও তো এই ছয়টা মাস কাটাইয়া দেওয়া যাইতে পারে। বিধাতার কৃপায় আজ সমগ্র বঙ্গে যে এক প্রাণতা পরিলক্ষিত হইতেছে ইতিপূর্বে আর কখনও তদ্রূপ দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আজি এ দুঃখের দিনে এই একপ্রাণতাই আমাদের একমাত্র সম্বল। ভাই বঙ্গ সন্তান! যদি স্বদেশের ও স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতে চাও, তবে প্রাণপণে তোমাদের এক একপ্রাণতা রক্ষা কর। এই একপ্রাণতার ভাব দেশে স্থায়ী হইলে নিশ্চয়ই জন্মভূমির মলিন মুখে হাসির রেখা দেখা দিবে।

চতুর্থ প্রস্তাব উত্থাপন করেন, জগন্নাথ কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়। বাবু যোগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী ও বাবু সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং শ্রীযুক্ত মৌলবী হেদায়েত বক্স এবং শ্রীযুক্ত জে. চৌধুরী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্দীপিত করিয়াছিলেন। আমরা উহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না। চতুর্থ প্রস্তাব এইরূপ :

বঙ্গবিভাগ প্রস্তাব প্রত্যাহৃত না হওয়া পর্যন্ত বিলাতি দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে বিরত থাকার নিমিত্ত টাউনহলের সভায় যে প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়াছে, ঐ প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত এ সভা স্থানীয় কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে লইয়া একটি ডিষ্ট্রিক্ট ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি গঠন করিতেছেন। উহারা

ডিষ্ট্রিক্ট, সাবডিভিসন্যাল এবং ভিলেজ কমিটি গঠন করিয়া ও জিলার বহুজনপূর্ণ স্থানসমূহে দেশীয় দ্রব্যাদি উপযুক্তরূপে সরবরাহের ব্যবস্থা করিয়া এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন।

বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা

সর্বশেষে বঙ্গমাতার শ্রেষ্ঠ সন্তান, উদ্যোগ ও উৎসাহের জীবন্ত-বিগ্রহ বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় জলগম্ভীরনাদে সভাস্থল বিকম্পিত করিয়া যেরূপ উদ্দীপনাপূর্ণ বাক্যে সমবেত সভ্যমণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করা সম্ভবপর নহে। পাঠকবর্গের অবগতির নিমিত্ত নিম্নে আমরা তাঁহার বক্তৃতার অতি সংক্ষিপ্ত মর্মানুবাদ প্রদান করিতেছি মাত্র। সহস্র সহস্র হস্তে নিনাদিত করতালির মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া সুরেন্দ্রবাবু বলিতে লাগিলেন : আমার সম্মুখে এই বিরাট জনসমুদ্র দেখিয়া আমি একান্তই উৎফুল্ল হইয়াছি। ঢাকার শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবৃন্দ এরূপ বিরাট সভায় সমবেত হইয়া লর্ড কার্জনের বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এ দৃশ্য বস্তুতই আশাপ্রদ। এই বিশাল জনমণ্ডলীকে দেখিয়া আমার বড়ই ইচ্ছা হইতেছে, এ সময় যদি কেহ লর্ড কার্জনের পক্ষ হইতে এখানে উপস্থিত থাকিয়া ঢাকাবাসীর মানসিক অবস্থার বিষয় জানিয়া যাইতেন, তাহা হইলে বড়লাট বুঝিতে পারিতেন, ঢাকার জনসাধারণ তাহার প্রস্তাব কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছে। ঢাকাবাসিগণ। আপনারা বঙ্গবিভাগ প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ করিতেছেন, এবং ঢাকানগরীকে রাজধানী করা রূপ যে প্রলোভন আপনাদিগকে দেখান হইয়াছে তাহাতে আপনারা মুগ্ধ হ'ন নাই দেখিয়া আমি একান্ত আনন্দিত হইয়াছি। আপনারা কখনও মনে করিবেন না যে ঢাকাতে নূতন প্রদেশের স্থায়ী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হইবে। প্রকৃতির অবস্থার দিকে চাহিলেও এরূপ ব্যাপার সম্ভবপর মনে হয় না। কারণ আপনাদের নদী দিন দিনই শুকাইয়া যাইতেছে। নদী না থাকিলে কখনই বাণিজ্যের সুবিধা হইতে পারে না। যদি ঢাকার সম্মুখস্থ নদীর এরূপ অবস্থা, তখন এক অতিমাত্রায় বাণিজ্যপ্রবণ জাতি এখানে রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করিবেন ইহাও কি কখনও সম্ভব? শিলং পাহাড়েই নূতন প্রদেশের প্রকৃত রাজধানী স্থাপিত হইবে এবং বাণিজ্যের জন্য চাটগাঁতেও রাজধানী থাকিবে। সুতরাং ঢাকাতে রাজধানী স্থাপনের যে প্রলোভন দেখান হইয়াছে, ঢাকাবাসীকে আন্দোলন হইতে নিরস্ত করাই তাহার উদ্দেশ্য।

যদি বা ঢাকায় রাজধানী হয় তাহা হইলেই বা আপনাদের কি সুবিধা হইবে? পরন্তু আসামের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে আপনাদিগকে বহু প্রকারের অসুবিধা ভোগ করিতে হইবে। আপনারা জানেন, আসাম ডেপুটি কমিশনারের দেশ। সেখানকার ডিষ্ট্রিক্ট অফিসারগণ আসামীকে সাত বৎসরের তরে জেলে পাঠাইতে পারেন। সংক্ষেপতঃ আসামকে যথেচ্ছাচার তন্ত্রের অধীন বলা যাইতে পারে। এমন প্রদেশের সহিত সম্মিলিত হইয়া লেফটেন্যান্ট গভর্নর পাইলেও আপনাদের কোনও সুবিধা হইবে না। বর্তমান সময়ে বঙ্গের এত উন্নতি হইয়াছে কিরূপে, জানেন কি? বঙ্গবাসীর সমৃদ্ধি বা শিক্ষা এই উন্নতির কারণ নহে, সংবাদপত্রের সৃষ্টিই এই উন্নতির মূলীভূত। বহু চেষ্টার পর বঙ্গের সংবাদপত্র দেশের এক বিশেষ শক্তিরূপে এখন দণ্ডায়মান হইয়াছে; ইহারই প্রভাবে এখন বঙ্গসন্তান আপনার স্বার্থ সুবিধা প্রভৃতি সম্যক উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া তৎসমূহের রক্ষণার্থ সমুচিত যত্ন করিতে শিক্ষা পাইয়াছে। শত বৎসরের চেষ্টায় আমরা এই সংবাদপত্রকে দেশের এক প্রবল শক্তিরূপে পরিণত করিয়াছি। এই সংবাদপত্রের অভ্যুদয় ও উন্নতির সহিত স্বর্গীয় হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পালের নাম চিরদিন কীর্তিত হইবে। আমাদের শত বৎসরের চেষ্টায় বঙ্গে যদি এ সংবাদপত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তবে নূতন প্রদেশে আপনারাও শত বৎসরের পরে এইরূপ সংবাদপত্রের সৃষ্টি করিতে পারিবেন না। কিন্তু এইরূপে সংবাদপত্রকে দেশের

শক্তিরূপে পরিণত করিবার পূর্বে, আপনাদের প্রতি যে সকল অত্যাচার ও অবিচার হইবে, তাহার প্রতিকারার্থ আপনারা কি করিতে পারিবেন? সুতরাং এই হিসাবে বঙ্গদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আপনাদের গুরুতর ক্ষতি হইবে।

এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার গবর্নমেন্টের "Divide and rule" নীতি হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে। গভর্নমেন্ট বলিতেছেন বর্তমান ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ হিন্দুপ্রদেশ এবং পূর্ববঙ্গে মুসলমান প্রদেশ গঠিত হইল। এইরূপ বিভাগনীতি কখনই প্রশংসনীয় নহে, হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বাঙালি, সুতরাং এক বঙ্গজননীর সন্তান হইয়া তাহারা এইরূপে বিচ্ছিন্নভাবে থাকিতে চাহিবে, এ কথা কখনই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না। অতএব একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে, হিন্দু ও মুসলমান কেহই এ বঙ্গবিভাগের পক্ষপাতী নহেন। তবে কাহার ইচ্ছায় এ বঙ্গবিভাগ হইতেছে? দেশের লোক ইহা চাহে না, সম্ভবতঃ রাজকর্মচারীরাও ইহা চাহেন না। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, কিন্তু ছোটলাট সে প্রশ্নের কোন উত্তর দেন নাই। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয় না, এক মাত্র লর্ড কার্জনের ইচ্ছাতেই এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপার সম্পন্ন হইতে চলিয়াছে? গভর্নমেন্ট বলিতেছেন, বঙ্গে ছোটলাটের কার্যভার অত্যধিক, পূর্বে যাহারা বঙ্গের শাসন কার্য পরিচালন করিয়াছেন, তাহাদিগের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখিলে গভর্নমেন্টের এই উক্তি নিতান্তই অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে। বিগত বৎসর বঙ্গের জনৈক ভূতপূর্ব ছোটলাটের মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৯০ বৎসর ছিল। ভূতপূর্ব ছোটলাটদিগের মধ্যে এখনও যাহারা জীবিত আছেন, তাহাদের বয়সও ৭০ বৎসরের উপরে উঠিয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া কি মনে হয়, কার্যভারে ছোটলাট একান্তই পীড়িত? আমাদের বর্তমান ছোটলাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার সভাসমিতিতে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বিতরণ করিতে পারেন, অট্টালিকাদির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে পারেন, রমণীয় জলযানে বসিয়া শীকরসিক্ত শীতল সমীরণ সেবনার্থ নদীবক্ষে বেড়াইতে অবসর পান। বঙ্গের শাসনকর্তা এইরূপে কাল কাটাইবার অবসর পাইলেও একাকী বঙ্গের শাসনকার্য নাকি তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে। স্যার এণ্ড্রুর এত অবসর থাকিলেও যদি তিনি বঙ্গের শাসনকার্য চালাইতে না পারেন, তবে তিনি এ কার্য হইতে একেবারে অবসর লইলেই পারেন? তাহার অপেক্ষা সর্বাংশে প্রসিদ্ধ বড়লাটই যদি পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পদত্যাগেও লোকের নিরানন্দের কোন কারণ হইবে না।

ভারতের বিষম বান্ধব স্যর মাঞ্চারজি ভবনাগরী বলিয়াছেন, "বঙ্গে গভর্নর নিয়োগ করিতে হইলে খরচ বেশি পড়িবে।" দুঃখের বিষয় ভবনাগরী বোধ হয় এ সম্বন্ধে এক মুহূর্তও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই, এইরূপ প্রলাপোক্তি দ্বারা তিনি বঙ্গবাসীর যে ক্ষতি করিয়াছেন, বঙ্গসন্তানগণ সেদিন কলেজ স্কোয়ারে সম্মিলিত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নিশিখায় তাঁহার প্রতিকৃতি নিক্ষেপ এই বিচিত্র বান্ধবের প্রতি সূচিত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছেন। গভর্নর ও লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্নরের খরচের পার্থক্য কিরূপ তাহা আজ আমি আপনাদিগকে বিস্তারিতরূপে বলিতে পারিলাম না। মাননীয় বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার এ বিষয়ে এক লিষ্ট তৈয়ার করিতেছেন, তাহার লিষ্ট প্রকাশিত হইলে আপনারা দেখিতে পারিবেন, এই অধিক খরচের অজুহাত সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। নূতন প্রদেশ গঠনের খরচ দুই কোটি টাকার কম হইবে না এবং এ নিমিত্ত বাৎসরিক খরচও ১২/১৩ লক্ষ টাকা হইবে। দুই প্রদেশের খরচের সহিত তুলনা করিলে গভর্নরের খরচ তদপেক্ষা নিশ্চয়ই কম হইবে।

বঙ্গের বহির্দেশ হইতে এ পর্যন্ত এদেশের নিমিত্ত ৪ জন লেফটেন্যান্টের গভর্নর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন জুরীপ্রথা রহিতের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির চেষ্টায় কর্পোরেশন একট্ জারি হইয়া হইয়াছে, তৃতীয় ব্যক্তি আজ বঙ্গবিভাগ করিতে বসিয়াছেন, ভাল. এইরূপ বিদেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া আমাদিগকে কতকাল জ্বালান হইবে? বিদেশীয় শাসনকর্তা

লাভের সুখসুবিধা আমরা যথেষ্ট ভুগিয়াছি। আর বিদেশীয় লোকদের দরকার নাই, যদি বিদেশ হইতে লোক আনিতে হয়, তবে খাস বিলাত হইতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হউক। দেশীয় ও ইংলণ্ডীয় পত্রিকা উভয়েই গভর্নর প্রস্তাব সমর্থন করিতেছেন। লর্ড কার্জনের আমলে জনসাধারণের মতামত যেরূপ ভাবে অবজ্ঞাত হইতেছে ব্রিটিশ রাজত্বের ইতিহাসে এরূপ আর কখনও পরিলক্ষিত হইবে না। বড়লাট বলিয়াছেন, তিনি এদেশে জনসাধারণের মতামত জানিতে আসিয়াছিলেন। এ কথা কিন্তু প্রকৃত নহে। ভীতি প্রদর্শনপূর্বক জনসাধারণকে স্বকীয় মত সমর্থনে আনয়ন করাই তাহার এ অঞ্চলে আগমন করার কারণ। কিন্তু তাহার এ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

১২ জানুয়ারি যখন আমাদের টাউনহলে সভা হয় তখন ভাবিয়াছিলাম গভর্নমেন্ট বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে বুঝি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। কিন্তু তখনই আমরা ভুল বুঝিয়াছি। কারণ ১৮ ফেব্রুয়ারি ভারত-সচিব ব্রডরিক এ সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেন্টের কাগজপত্র পাইয়াছেন। ১৩ তারিখে আমরা গভর্নমেন্টের নিকট ১২ তারিখে সভার resolution পাঠাই, ৩ সপ্তাহ পরে তাহার প্রাপ্তি সংবাদ পাইয়াছিলাম। গভর্নমেন্টের এ প্রকার নীতি নিতান্তই দূষণীয়। যাহা হউক, এই বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে ইতিমধ্যে নানাপ্রকার আশঙ্কার কারণ উপস্থিত হইয়া থাকিলেও এখন এ বিষয়ে আমাদের অনেক ভরসা হইয়াছে। যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে নিম্নলিখিত ৩টি বিষয় একরূপ নিশ্চিত বলিয়াই মনে হয় (১) আগামী বৎসরেই পূর্ববঙ্গ বিভাগ সম্পন্ন হইবে না (২) এ নিমিত্ত আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হইবে (৩) লর্ড মিন্টোর উপর এ কার্যের ভার অর্পিত হইবে। ৭ আগস্ট আমাদের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিল, সকলেই তখন নিরাশ হইয়াছিলেন কিন্তু এখন বঙ্গবিভাগ স্থগিত রহিয়াছে। ভ্রাতৃগণ। আমাদের সহিষ্ণুতার উপরেই কৃতকার্যতা নির্ভর করিতেছে। অস্থির হইলে, কোন কার্যই হইবে না। আয়র্লণ্ডের দিকে চাহিয়া দেখুন, আজ শত বৎসর যাবত পরাক্রান্ত আইরিশ জাতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিকট 'হোম্-রুল' চাহিতেছেন; কিন্তু এত চেষ্টাতেও তাহারা তাহাদের হোমরুল পাইয়াছেন কি? তথাপি কিন্তু তাহারা নিরস্ত হয় নাই। প্রত্যেকবারের অসাফল্য তাহাদের মধ্যে দ্বিগুণ উৎসাহ আনিয়াছে। আমাদিগকেও তদ্রূপ সহিষ্ণুতার সহিত কার্য করিতে হইবে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে সংসারে অমঙ্গল হইতেই বহু প্রকার কল্যাণের উদ্ভব হইয়া থাকে। বর্তমান স্বদেশি আন্দোলনই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। লর্ড কার্জন আমাদিগের জন্য এরূপ অমঙ্গলজনক ব্যবস্থা প্রবর্তিত করিতে বসিয়াছেন বলিয়াই, আজ এই অশেষ কল্যাণকর স্বদেশি আন্দোলনের আবির্ভাব। যদি আপনারা স্থির ও ধীর ভাবে স্বদেশিদ্রব্য ব্যবহাররূপ প্রতিজ্ঞাপালন করিতে পারেন তবে ভবিষ্যতে উহা নিশ্চয়ই অশেষ কল্যাণের আকর হইবে। যদি স্বদেশে আমাদের প্রয়োজনানুরূপ দ্রব্যাদি আমরা না পাই তবে প্রথমতঃ জাপান বা চীন হইতে, এবং সেখানেও না পাইলে, তৎপর জার্মানী বা আমেরিকা হইতে আমরা ঐ সকল জিনিষ লইব, তথাপি আমরা বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিব না। চীন ও জাপান আমাদেরই দেশীয়; সুতরাং বিদেশি জিনিষ ব্যবহার করিতে হইলে সর্বাগ্রে তাহাদের জিনিষ ব্যবহার করাই আমাদিগের কর্তব্য।

এই বঙ্গবিভাগ ব্যাপারের নিমিত্ত আমবা রাজশক্তির নিকট কত প্রকার প্রার্থনা করিলাম, সকলেরই নিকট আমরা কাঁদিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেহই আমাদের কান্নায় মনোযোগ দিলেন না; কাজেই আমাদিগকে এখন নিজের পায়ে দাঁড়াইবার নিমিত্ত যত্ন করিতে হইবে। আমরা যদি আপন পায়ে দাঁড়াইতে সমর্থ হই, তবেই আমরা এ দুর্দিনে কূল পাইব; নচেৎ আমাদেব গত্যন্তর নাই। অতএব ভ্রাতৃগণ। আপনারা যে পবিত্র প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইয়াছেন, প্রাণপণে তাহা প্রতিপালনে যত্নবান হউন। অনেকে বলেন পূজা আসিয়া পড়িয়াছে এ সময় বিলাতি জিনিষ ভিন্ন চলিবে কেন? আমি বলি, যে দেশের সর্বত্র এমন বিপদের ছায়া নিপতিত হইয়াছে, সে দেশে আবার পূজার আমোদ কিসের? অতএব কিছুতেই আপনারা এ প্রতিজ্ঞা হইতে স্খলিত হইবেন না। যদি আপনারা

এ প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থ হন তবে নিশ্চয়ই জানিবেন, এত দিনের যত্নে দেশে যে রাজনৈতিক আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া যাইবে। সে দিন চীনদেশ কি করিয়াছে? আমেরিকায় চীনদেশবাসির প্রতি দুর্ব্যবহার করা হইয়াছিল বলিয়া চীনদেশীয়েরা প্রতিজ্ঞা করিয়া আমেরিকার জিনিষ পরিত্যাগ করিয়াছিল। চীনেরা যাহা পারিল, আমরা কি তাহাও পারিব না? বঙ্গবিভাগ হয় হউক, কিন্তু আমাদিগের এই স্বদেশি আন্দোলন যদি সফল হয়, তবে দেশে এক নূতন যুগের আবির্ভাব হইবে। অতএব ভ্রাতৃবৃন্দ। সকলে মিলিয়া দেশ হইতে দেশান্তরে, এক জিলা হইতে অন্য জিলায় এবং এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে এই আন্দোলনস্রোত প্রবাহিত করিতে যত্নবান হউন। এই উপলক্ষে দেশে যে একপ্রাণতা দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় লর্ড কার্জন আমাদিগের সর্বনাশের সূচনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে উহা হইতে এক বিশেষ মঙ্গলের সূত্রপাত হইতেছে।

অদ্য দীর্ঘ বক্তৃতা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। উপসংহারে আমার এই মাত্র বক্তব্য, পূর্ববঙ্গের ভ্রাতৃবৃন্দ! সম্মিলিত বঙ্গের ইহাই বিশেষ সভা। আমরা যদি পরস্পর ভ্রাতায় ভ্রাতায় সম্মিলিত থাকি, তবে কাহার সাধ্য আমাদিগকে বিভক্ত করে? বঙ্গবিভাগ হয় হউক, আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা করি যে, আমরা চিরদিনই ভ্রাতৃভাবে একত্রিত রহিব। ভ্রাতৃগণ। গভর্নমেন্ট আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক করিলেও, অশ্রুপ্লাবিতনয়নে আপাততঃ আমাদিগকে তোমাদের নিকট বিদায় লইতে হইবে কিন্তু নিশ্চয়ই জানিও, অচিরকাল মধ্যেই আমাদের সহিত তোমাদের এবং তোমাদের সহিত আমাদের পুনরায় সম্মিলন সংঘটিত হইবে।

সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতার পর ৫ম ও ৬ষ্ঠ প্রস্তাব পরিগৃহীত হইয়াছিল। প্রস্তাব হয় এই রূপ :

দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রস্তাবের প্রতিলিপি এই সভার সভাপতি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইয়া ভারতসচিবের নিকট প্রেরিত হইবে।

THE STATESMAN*

THREATENED PARTITION OF BENGAL *December 30, 1903*

There was an informal conference at Belvedere on Saturday morning at which a large number of members of the Bengal Landholder's Association were present, and some others having an intimate connection with the districts the severance of which is the threatened. Among those present were the Hon. Nowab Bahadur of Dacca, Raj Bahadur of Dighapatiya, Mr. A. M. Bose, Rai Sita Nath Roy Bahadur, Mr. Janoki Nath Roy, Rai Parvatisankar Roy Chowdhury, Kumar Upendra Kumar Chowdhury of Golakpur, Nawab Abdus Subhan Chawdhuri, Mr. Gopal Das Chowdhuri, Mr. Dwaraka Nath Chakravarty, Mr. Shadhu Charan Roy, Mr. Jadu Nath Basak, Mr. H. Myers, Manager. Bhowal Estate, Mr. P.L Roy, Mr. G.L.Garth, Mr. A.Chawdhuri and Mr. Harendra Lal Roy. The conference lasted nearby two hours.

At the instance of the Bengal Landholder's Association a conference was held at the rooms of the Landholder's Association at 52/4 Park Street, on Monday, with a view to concerting requisite measures in Co-operation with the Indian Press to guard against the dismemberment of Bengal contemplated by the ruling authorities. Representatives of the native press and vernacular papers were present on the occasion. Suggestions were made for sending a delegate on behalf of the Landholders Association to England to enlighten British public opinion and the Downing Street authorities as to the magnitude of alarm and concentration created by the revolationary proposals of the Government of India and distributing numerous handbills and leaflets all over the land on the matter, and for carrying on systematic agitation by organising mass meetings....

THE SHADOW LENGTHENS *January 22, 1904.*

When the Government of India framed their proposals for the dismemberment of Bengal they could hardly have foreseen the full extent and strength of feeling they would provoke. For though it would perhaps be going too far to say that, had they done so, they would have desisted from their scheme, or even materially modified it, it is practically certain that in that case they would have recognised the inadvisability of publishing it without a much more convincing demonstration of its necessity. That there is an overwhelming case fortaking steps to relieve the over burdened Government of Bengal, no one acquainted with the state of the Province will dispute. On the other hand, no scheme of the character of that embodied in Mr. Rishy's letter is deserving of a moment's patient consideration merely as a means to that end, unless it is clearly shown that no

---

*The Statesman : An anthology- -1875 1975

*100 years of The Statesman

* আরও সংবাদ বর্তমান গ্রন্থের ৭৬২ পৃষ্ঠা

feasible alternative is available. So far, however, from this having been done, there is a consensus of opinion outside official circles that an alternative which is not merely feasible but would be far more effectual for the purpose in view is to be found in the adoption of a change in the constitution of the Government of Bengal which would be highly popular with all classes of the community. The requirement of the case, that is to say, would be much better met by giving the Lieutenant-Governor or Governor, of Bengal an Executive Council among when the charge of the different departments might be distributed.

Why an arrangement which is held to be proper and necessary for the Presidencies of Madras and Bombay with their greatly inferior areas and populations should be considered improper or superfluous for Bengal or why if it is neither improper nor superfluous in Bengal, it should be withheld from it is inconceivable. Yet the Government of India, in their letter brush this alternative aside as out of the question, for reasons which they either think it unnecessary or find it inconvenient to explain.

LORD CURZON'S FUTILE EFFORT *February 20, 1904*

Extract from an editorial :

We are quite certain what the object of His Excellency the Viceroy's present tour in Eastern Bengal is, but it may safely be predicted that if it is to convince the people of that part of the country of the beneficence of his scheme for the redistribution of the Province, it will be effort wasted. To nine-tenths or more of the population of the districts concerned it matters very little whether they are administered from Shillong or Calcutta. To one-tenth or some smaller proportion, on the other hand, it matters very much. If the object of Lord Curzon's tour is to disabuse latter section of the population of their objection to the proposed change, he might as well have stayed at home, because they are not open to conviction. If, on the other hand it is to persuade the remaining nine-tenths of the population to take their views on the subject from him instead of from their natural leaders, it will be equally futile. No tour on the other hand, was surely required to convince the Viceroy that in this, as in most similar matters the beliefs and opinions of the great mass of the population reflect more or less faithfully those of the authors of the recent memorials and the organisers of the public meetings which passed them. Turning to His Excellency's addresses on the subject and more particularly to that delivered at Dacca, we can find nothing that can be regarded even as an attempt to meet the objection that the scheme, while it will add considerably to the difficulty of administering Assam with efficiency will not materially facilitate the efficient administration of Bengal. The real cause of the existing inefficiency is not of course, so much that the eye of the Lieutenant-Governor cannot be at one and the same moment on every part of his vast jurisdiction as that the machinery at his command for the supervision of the administration is hopelessly inadequate. But this is a defect which no mere redistribution of the province will sensibly mitigate.

TOWN-HALL PROTEST AGAINST PARTITION SCHEME *March 20, 1904.*

Exract from an editorial :

The mass meeting held on Friday in the Calcutta Town Hall is an awkward

fact which the Government of India will find it very difficult to explain-away. In the first place, it was as a gathering almost or quite unequalled for volume. In the second place, it was not a frivolous or irresponsible concourse of units having no real interest in the question at issue, but a gathering, for the most part, of resolute and responsible men who had come from all parts of the threatened divisions of the Province with the definite purpose of recording a protest sufficiently emphatic to compel attention. Finally, it was the occasion of a great number of speeches, some of which doubtless were no better or more serious than the average of such performances, but others which were well informed and ably reasoned arguments by the strongest popular leaders in Bengal. These things must count for something in the counsels of the Government, and, although speaker after speaker gave way to the dismal foreboding that nothing which could be urged by the people or their representatives would avail to alter the Government policy, it can hardly be that the Viceroy and his advisers will allow the partition scheme to go forward as though it had been proved to the satisfaction of every unbiased person that the whole agitation rests upon nothing but a private circular and a piece of elementary wire pulling. ...

PROJECT PARTITION *November 9, 1904*

"The leaders of Bengali public opinion, so far as it exists, seem quite aware of this ; and judging from their recent action they are preparing well in advance for a campaign of agitation. Their difficulty is to know exactly what is contemplated, but they will doubtless be enlightened on this point in the course of the next fow months. They have attacked the original scheme with considerable success; but they have yet to meet the counter-attack that is sure to be delivered", says the Pioneer. This is frank enough, and it has, of course, been seized upon vigorously by the more energetic Bengali papers. Moreover, since the paragraph appeared the public has become acquainted with a few more definite facts in regard to the intentions of Government. It is affirmed that the sanction of the India Office to the amended scheme has been obtained, and that one of the principal reasons for Lord Curzon's return to India is to carry the project through. The amended scheme, presumably, coincides in the main with that ingenuously suggested as an alternative during Lord Curzon's visit to Dacca—namely, the separation of the Chittagong Dacca and Rajshahi Divisions and their amalgamation with Assam as a new province. It is not pretended which was abandoned in consequence of the united opposition of the public during the early months of the present year. In point of fact, there would appear to be certain important respects in which it is likely to excite even more serious opposition, and we may therefore anticipate that the first official intimation will be met by as strong and sustained on agitation as that which was carried out by the Calcutta Press and in the affected districts after the announce ment of the original plan.

THE FIRST PARTITION *July 7, 1905*

The partition of Bengal is to be carried out. For the first time almost since he became Secretary of State for India Mr. Brodrick has made a statement in the House that is at once unequivocal and true. For some time past the fact that

the partition scheme had been sanctioned has been public property in India, but it is not at present known what particular set of proposals has been adopted by the Imperial Government.

The choice of the capital rests between Dacca and Chittagong and we gather that the chances are in favour of the former, the historic centre of Eastern Bengal. In this matter of the partition the Government has shown a certain astuteness. The unexampled nature of the protest aroused by Mr. Risley's famous Memorandum and by the Viceroy's speeches at Dacca and Mymensingh— two of his least felicitous efforts—led to the more optimistic leaders of opinion in Bengal to infer that Lord Curzon would not add to the unpopularity of his second term of office by pressing the partition scheme, the most controversial of his measures so far as Bengal is concerned. Presumably, it will fall to Lord Curzon's successor to carry out the plan of the new province into effect. The present Viceroy's part of it is to all intents and purpose over, and so far as His Excellency is concerned it will have but one result —namely, to complete the estrangement between himself and the people of Bengal.

RESHAPING BENGAL *July 21, 1905*

Our objections, and we believe the objections of all reasonable opponents of the scheme (partition of Bengal), are directed against the way in which the scheme has been formulated and put through and against the objects of the Government which do not get stated in speeches and resolutions. These objects are briefly : first, to destroy the collective power of the Bengali people, secondly, to overthrow the political ascendency of Calcutta, and thirdly, to foster in East Bengal the growth of a Mahomedan power which it is hoped will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the educated Hindu community. It may be thought that if these are the real, though not usually the avowed, objects of the present administration, the scheme of partition now proclaimed has been devised with uncommon cleverness and foresight. Upon that point, we suggest, there are several things to be said. We quote the Resolution. "The Governor-General in Council, in directing that the necessary measures shall now be taken to introduce the scheme, looks forward to the day as not far distant when not merely will be new province of Eastern Bengal and Assam have amply vindicated its creation as an administrative reform of the first importance, but when it will have acquired a character and influence not inferior to those of any of the older Indian provinces, and will have attracted to itself the spontaneous and devoted loyalty of its sons." It is perfectly possible that these words may be literally fulfilled. But—and this is the point—it is equally possible that the fulfilment may be the virtual defeat of the policy to which, after so many delays and vicissitudes, the Government of India has now succeeded in giving shape.

PARTITION BLUES *July 25, 1905*

MYMENSING, July 23 – The partition Resolution has cast gloom all over the country, and the people now fully realise that they are under alien officials who do not feel any sympathy for them. The Government may divide territorially, but can't sever their social ties and the feelings of unity between East and West

Bengal. There is an immensely growing feeling not to recognise any division of the Bengal race.

PABNA, July 23 – A public meeting was held in a pandal erected in front of the Town Hall. Resolutions were passed protesting respectfully, but emphatically, against the partition of Bengal and the transferance of the Rajshahi division in particular. A Standing Committee was formed and delegates have been elected to the Calcutta Town Hall meeting to be held on 7th August.

BOGRA, July 23 – At a public meeting held today at the Bogra Theatre Hall, presided by Syed Hafizar Rahaman Choudhry Zemindar, resolutions were adopted against the Partition Resolution especially the inclusion of the Rajshahi division. A Standing Committee was formed to continue a constitutional agitation with a view to bring about a withdrawal of the orders of the Government.

CAPITAL VIEWS *August 4, 1905*

Writing in Capital "Max' says : I have every sympathy with my Aryan brothers in their grief at the partition of Bengal and can quite understand that, if they are to be parted from anything, they would prefer the loss of Lord Curzon or Sir Andrew Fraser ; but all the same I think that the partition will eventuate in the good of Eastern Bengal and Assam ; while so far as Chittagong is concerned I have always advocated the transfer. It seems to me that the outcry is mainly from the absentee landlords who want to live in Calcutta ; but absentee landlords are going out of fashion and are certainly not a class to be encouraged.

If the partition results in landlords living in or near their estates it will certainly justify the measure, but whether it will remains to be seen But what strikes one as the hollow part of the business in this : That while the Government are unable to find the funds to meet the increased expenditure which a separation of the judicial from the executive branch of the service would involve, they experience no difficulty in meeting the greatly increased expenditure which the partition of Bengal must mean. And yet there is not a single unbiased person, with the true interest of India at heart, who would not emphatically declare that the most urgent and pressing reform is the separation of the executive and judicial services. The partition of Bengal pales into insignificance before it.

FAREWELL TO CURZON *August 22, 1905*

A very large meeting was held last evening in College Square in consequence of the news that had arrived during the day of Lord Curzon's resignation. Patriotic speeches by certain well known Bengalis, songs by bands of students, with a display of chirag-illuminations and bomb firing were the prominent features of the meeting. The speeches all went to prove the fact that change in Government was popular, and the crowd expressed its feelings in an unmistakeably delighted fashion.

START OF SWADESHI *September 7, 1905*

We ask our readers to reconsider, in the light of plain facts and common sense, the Swadeshi movement and its accompaniments. There is, we take it, no longer any wish on the part of the public to deny that the so-called "boycott" of the

Englishmade goods, especially of Lancashire cotton cloth, is the outstanding feature of the present situation. Hitherto the European commercial community has taken the prudent course of treating with tolerant amusement a movement which in its earlier stages seemed merely absurd.

It will be noted with satisfaction that the Bengali papers are expressing regret and concern on account of the unfortunate incidents which during the past few days have accompanied the boycott. These incidents are calculated not only to complete the alienation of the European community from the party opposed to the Partition policy, but also to strengthen the feeling already expressed in sufficiently difinite terms the methods of repression, if not systematic reprisals, should be resorted to. The Amrita Bazar Patrika a day or two ago expressed its confidence that the students, who are, of course, responsible for the disturbances will "do nothing which is unconstitutional or of which they may be ashamed." It would be a pity if the impression should become general that the Swadeshi movement in any sense violent or seditious in character.

SUCCESS OF SWADESHI MOVEMENT

(Special for The Statesman) *September 15, 1905*

Press and other opinions on the vitality of the Swadeshi movement seem to care a good deal, though our Anglo-Indian contemporaries in common with the official section of the anglo-Indian community, have for some time past maintained a deliberate optimism, not withstanding many evidences that point to the continued resolve of the Bengalees to support indigenous goods. With a view to testing these opinions, a representative of The Statesman yesterday made a tour of the Paghiaputty Bazar and Parukjiki Koti—the centres of the Marwari piece-goods trade. At ordinary times both these quarters are thronged with dealers and brokers, buying and selling cloth, all of European and prinicipally of Manchester manufacture. The narrow lanes in the vicinity too are generally jammed with hackeries... This however has all been changed ... the bustling and keen Marwari man of business, who in happier days joined his brethren in maintaining a uniform bazar rate for his goods, is now prepared to haggle as keenly and is as ready to undersell his neighbour as the petty shopkeeper of Cotton Street or Chandney Chowk.

One very big merchant told our representative that he might then and there take away all his stock of imported goods at invoice prices, plus duty. He said he had no sale for them and his anxiety regarding goods which would be delivered in Calcutta in the course of the ensuing few months, might almost be described as pitiful. Dhoties, he said, could be sold only at a reduction and in very small quantities. For Manchester dhoties there was practically no demand. He showed a pair of foreign dhoties of coarse texture which had been imported for him and for which under normal circumstances he could obtain R. 1-5. Then taking a pair of country made articles, of practically the same quality, he said that whilst for the former there was no demand, he could sell as many of the latter as he could get at Rs. 1-4 a pair. Referring to his books he said his turnover in the month preceeding the last Durga Puja was approximately Rs. 1,50,000 ; from present indications he doubted whether this month his sale would approach even half that amount.

Another large dealer began by saying : "The bazaar is bad. Nobody wants to buy English clothing and I do not want to talk about it." With a little pressure this gentleman said that prices had gone down all round 12 per cent and further that where in the first half of September last year he had sold 500 bales of stuff, in the first thirteen days of the month he had only succeeded in clearing out 125 bales. A third merchant showed our representative some 6 or 7 telegrams and these were all in similar terms. They hailed from Barisal, Dacca, Serajgunge and Dinajpur.

A Marwari interviewed stated that his trade from the Barisal district had so far only just touched Rs. 10,000 against a figure usually many times that sum. The same man assured our representative that his outstandings in the mofussil amounted to a very substantial amount and he was beginning to despair of realising any appreciable portion thereof.

The foregoing facts and figures relate entirely to the trade in the moffussil, and have no bearing on the movement in this city. A visit to Cotton Street was, however, sufficient to prove that Calcutta Bengalees are not much behind their mofussil compatriots. One shopkeeper on being asked how trade was, simply opened his box and pointing to its contents (ten pice) said . "This is all I have taken today, and I have had worse days." In cotton street a number of shops were visited and the testimony was the same in every case. In the face of such a condition in the market that is generally bustling and bubbling over with commercial vitality it is very hard to believe that the Swadeshi movement is either weak or dying. The Marwaris controlling the supply say that the people who alone can create the demand for foreign manufactured cloths no longer want them. This is the only answer we are able to give to the question. "Is the Swadeshi movement spreading or not?" And it is, moreover, an answer whose truth can be tested by any one suficiently interested in the matter to find out for himself.

GOKHALE SPEAKS *December 28, 1905*

Mrs. Gokhale's appointment to the chair of the Congress raised high hopes, and it may at once be conceded that in the main these hopes have been fulfilled. The speech is a very able statement of the Congress position, and it will, we think, be read with no little admiration even by those who deny its assumptions and dissent from its arguments. In one respect, we regret to see, Mr. Gokhale has departed from the excellent precedent set last year by Sir Henry Cotton. His address can hardly be shorter than Lord Curzon's longest record, although it keeps closely to the salient aspects of the situation and to the outlines of the constructive programme upon which, in Mr. Gokhale's judgment, the National Congress should concentrate the whole of its effort. The criticism of Lord Curzon's administration is strong though, not perhaps more so than might have been expected from the Indian Member of Council who had led the attack upon the ex-Viceroy's policy of the last three years. It is significant, however, that on the present occasion, Mr. Gokhale should have found in the Partition policy the principal reason for his strictures. As regards the Swadeshi movement it was not to be expected that an essentially cautious public man, considering the subject with intimate knowledge of the industrial movement in Western India, would speak in a manner calculated to please the more heady enthusiasts of Bengal. He approached the

problem as essentially an economic problem, and the passage in which he stated the actual issue is worthy of the closest study by those on this side of India who aspire to be leaders of the people.

"PARTITION CIGARETTE" By SWADESHI CO *April 7, 1906.*

On Wednesday close upon midnight a fire broke out in the second storey in a building at Debnarain Dass Lane in Shambazaar, which was used by the Swadeshi Cigarette Co. for the manufacture of what was known as the "Partition Cigarette" Besides the cigarettes, there was a large stock of tobacco intended for the manufacture of the former.

BARISAL GUNS *May 5, 1906*

The movement which is on foot in the Bengalee community to induce all their leading men to resign their honorary official positions as Magistrates, Members of Council, Fellows of the University, or Municipal Commissioners, by way of protest against the series of acts of official repression that culminated some days ago in the Barisal affair cannot fail to command a large measure of public sympathy. It would be affection, in the circumstances, to express surprise at the news that Mr. Surendranath Banerjee feels it to be "impossible any longer for any self-respecting person to serve the Government in any honorary capacity", or that others of his countrymen,like him, are despondent at the seeming in effectiveness of their protests, as voiced at the many public meetings which have been held. There is, moreover, a not unnatural desire among the Bengalee leaders to show that they are capable of deeds as well as words. They are keenly conscious that in some quarters their gifts of oratory are regarded as a proof of their inability to do practical work for their country. Hence their eagerness for action. But, while we fully appreciate their motives and make due allowance for the irritating sense of helplessness which must often come over them, we venture to urge upon these gentlemen the need, in their own best interests, of very carefully considering any such step as that which they are now said to contemplate. According to Matthew Arnold, unconsidered action is worse than inaction, and it is necessary to look from all sides at a question of this kind.

DEMAND FOR SWADESHI MUSEUM *May 29, 1906*

Extract from an editorial :

We learn that a movement is on foot, among those interested in the exploitation of indigenous products and industries, for the establishment of a 'Swadeshi Museum' in Calcutta. The exhibition recently held in the Overtoun Hall for the purpose of displaying a collection of articles made in this country was considered so unqualified a success, that it is now proposed to secure a building for a permanent exhibition which will show the wonderful improvements made in Indian arts and industries within recent years, the idea of the promoters apparently being that, though many articles of dress and consumption are manufactured in the country, the public do not know where they can be had........

S N. BANERJEA'S CONVICTION QUASHED *July 10, 1906*

Extract from an editorial :

The vigorous and uncompromising judgment in which Mr. Justice Holmwood and Mr. Justice Mitter have quashed the conviction of Mr. Surendra Nath Banerjea for contempt of court will afford satisfaction not only to those who are in general sympathy with the Bengali leaders, but also to many who are merely concerned that the reputation of British justice in this country should remain untarnished. To all impartial persons it must have seemed most unfortunate that Mr. Emerson, the District Magistrate, should have deemed it proper to institute contempt proceedings when he was conducting what was virtually a private trial in his own house. It will often be difficult under such circumstances for a Magistrate to distinguish between intentional insult offered by the accused person and the imaginary offences created by his own sense of irritation. But happily as he Judges of the High Court have pointed out, the law has provided several precautions in order to ensure that a judicial officer shall deal in a calm and dispassionate manner with any conduct which he regards as derogatory to the dignity of the Court.

ALL-INDIA MOSLEM LEAGUE INAUGURATED

Extract from an editorial *January 22, 1907*

It is evidently still necessary to protest against the systematic attempts that are being made to set Hindus and Mussalmans at variance with each other. The most recent occasion that has been turned to this sinister purpose is the Educational Conference that was held at Dacca three weeks ago and was followed by a meeting at which an All-India Moslem League was inaugurated. In order to make sure of bringings its objects before the London Press the promoters of the League appear to have induced Reuter to send Home from Dacca a long telegraphic message relating to the speeches made and the resolutions adopted at the meeting. The papers to hand by the last Mail show that this expedient has, to some extent at any rate succeeded. They show further that many Home newspapers have been misled into concluding that the "All-India Moslem League"—Nawab Salimulla's organisation—is as important and as representative of the Moslem community throughout India as the Mahomedan Educational Conference itself.

Not only so, but it has been assumed that the resolutions relating to the formation of the League actually had a place on the official agenda of the Educational Conference which, of course, was not the case. The result of this misconception has been the appearance in the Conservative papers of leading articles emphasising the loyalty of the Mahomedan population and pointing the moral against the political activity of the Hindus. Curiously enough, The Times, which uses the new League as a weapon with which to tilt against the National Congress, is yet shrewd enough to see that an organisation so formed is not likely to make for peace. People in England, however, cannot be expected to know that there is an important difference between the awaking activities of the Indian Moslem community, educational and political, and sectarian organisations designed to carry on an anti-Hindu propaganda......

FALLS THE SHADOW *August 5, 1908*

Extract from an editorial :

We observe that the Bengalee, in the course of a courteous and argumentative reply to some observations which were made in these columns on the boycott, repeats its assurance that "the Swadeshi movement (which includes boycott) is based upon love of country and not hatred of foreigner." This declaration is satisfactory as an expression of the present intentions of the leaders of the agitation and of the spirit in which they now desire that it should be carried on. But the whole history of the boycott in actual working shows that it cannot sever itself from what we must hold to be its original idea. It was began as a protest against the partition of Bengal, and no one can seriously dispute this statement that the object of its authors was to call attention to the reality of the wrong inflicted on the people of Bengal by causing a commercial loss to Lancashire. They virtually said : "Let us stop the sale of Manchester goods and we shall convince England that we are in earnest." The boycott thus started as a punitive measure, designed less to promote Swadeshi than to discourage the sale of foreign goods ; and to this day its alleged success is provided not by giving figures showing the increase of Swadeshi manufactures but by citing reports of the depressed condition of the Manchester market. Its hostile motive was, more over, recognised at the National Congress in Calcutta, where the Moderates resisted a proposal for the extension of the boycott and carried a resolution declaring it to be justified in Bengal by the special circumstances arising out of the Partition.

Was it possible that a movement which was promoted by indignation against the Partition and is nourished by reports of the misfortunes of Lancashire, would be looked upon by hot-headed supporters as a propaganda of love, wholly free from hatred of the foreigner? Every reasonable man must admit that whatever the leaders thought or wished, the rank and file were certain to interpret their mission as one directed against the foreigner and his goods. This precisely what was happened. The positive aspect of the movement which favours the use of country-made goods, has been obliterated by the negative aspect, which is concerned wholly and solely with preventing the sale of foreign goods-cloth, sugar and English salt. The result is a painful story of persecution and intimidation.

NARROW ESCAPE FOR SIR ANDREW FRASER

Extract from an editorial, *November 8, 1908*

In the dastardly and abominable attempt which was made to take the life of Sir Andrew Fraser as he was entering the Overtoun Hall in College Street yesterday evening, the criminal **folly** of the Anarchists of Bengal had reached its culminating point. No such **villainy** has been perpetrated or essayed in Calcutta since 1871, when the Hon. John Paxton Norman, the officiating chief Justice, was stabbed on the steps of the Town Hall. In the capital Viceroys and Lieutenant-Governors have hitherto been able to go freely in and out among the people. Sir Andrew Fraser more especially has been seen in almost every part of the city and no one could have dreamed that on his way to preside over an academic lecture he would have a narrow escape from the revolver of an assassin, least of all that he would be murderously attacked before the eyes of a crowded audience...... . It is impossible to understand the motives or aims of this stupid and atrocious plot.

Whatever criticisms may have been passed upon Sir. Andrew Fraser, no one has accused him of harshness or want of sympathy with the people entrusted to his charge. He has not been in haste to resort to measures of repression, and it is well known that he would have been glad to dispense with them altogether. Yet he has been the victim of repeated attempts on his life, of which the latest has been the most audacious, determined and unscrupulous. It is conceivable that the would-be assassin was inspired by a desire to take vengeance on the Lieutenant Governor for his refusal to reprieve Satyendra Nath Bose, but there is some doubt whether Sir Andrew Fraser's decision we known when the conspirators arranged their plot. Failing this explanation we can only assume that the Extremists from whose ranks the assassins were drawn are childishly ignorant of the political situation in which they have rashly intervened and confused friend with foe, or that the object of these crimes is merely to put terror into British officials. In either case they are guilty of folly only equalled by their wickedness.

Even in Russia assasination has been an abject failure. The immediate effect of the crime last night will be to evoke keen sympathy with Sir Andrew Fraser from every part of Bengal, a sympathy which will be mingled with the admiration of the courage and coolness that he showed in presiding over the meeting in Overtoun Hall as if no untoward event had happened. The Lieutenant Governor had indeed proved himself worthy of the race to which he belong and of the service in which he has risen to such eminence. We earnestly hope that another result of the outrage will be to create a stronger revulsion than ever before from the sinister policy of violence and from all these forms of agitation which have stirred up in Bengal a homicidal mania wholly alien to the natural disposition of its people. The Anarchist propaganda has evidently spread deeper and wider than anyone supposed. The law will perform its part in ridding Society of the forces of disorder, but the only means of effecting their thorough eradication is the determination of right-thinking men to restore discipline among the young and to set themselves inflexibly against all that makes for morbid discontent and violence.

ANOTHER MURDEROUS OUTRAGE *November 10, 1908.*

Last night yet another murderous outrage was added to the black record of the Terrorists of Bengal. Nandolal Banerjee, a clever and energetic Police Sub-Inspector, who was so successful in tracking down Profulla Chaki, one of the Muzzuferpore assassins, was shot dead in a street of Bow Bazaar.... This cowardly anu atrocious act, perpetrated within a few hours after the desperate attempt to assassinate the Lieutenant-Governor points conclusively to the existence of a secret society which has for its object the infliction of violent death upon each and all of those who have been in any way concerned in bringing the Maniktolla conspirators to justice. Gossain, the informer, has met with his doom. Sir Andrew Fraser, who gave his sanction to the prosecution, had narrowly escaped assasination. And now a police officer, through whose detective efforts one of the desperados responsible for the Mazufferpore murders was brought to justice, has suffered the penalty of his devotion to duty.

It would seem that the Government and the police have to deal with fanatics who believe that by carrying on a bloody vendetta they can paralyse the administration of justice. The conspiracy will fail of its object. That goes without

saying. But the fact has to to faced that the authorities have to cope with a form of crime which is extremely difficult to prevent and which can be committed with a considerable chance of impunity. The problem of the hour is to discover a remedy. Alike upon the European and Indian communities the conviction is steadily forcing itself that our regular judicial procedure, however well adopted to ordinary conditions, is too complicated and cumbrons for the suppression of political crime, when the daring and cunning of the assassin creati new and unforseen dangers.

IN COLD BLOOD *February 11, 1909*

The belief generally entertained that the homicidal Anarchism which manifested itself in Bengal a few months ago had been stamped out has unhappily been falsified by the two fresh outrages which were committed yesterday, and which were doubtless intended by their almost simultaneous occurrence, to convey a dramatic impression of the strength and widespread activity of the Anarchist organisation. One of the outrages was fortunately unsuccessful. The bombs thrown at the train in which Mr. Hume, the Public Prosecutor in Calcutta, was travelling to Barrackpore, failed to effect their dastardly purpose. But the plot laid against the life of Babu Ashutosh Biswas, the Government pleader and Public Prosecutor, who has been assisting in the trial of the Manicktolla gang at Alipore, has resulted in the cold blooded murder of a valuable public servant whose sole offence was that he was doing his duty.

The persistence with which Mr. Hume's life has been attempted, the bomb outrage yesterday being the third directed against him, points to the same conclusion as does also the still unpunished murder of Inspector Banerjee. If this view be accepted, it follows that the police have now to deal, not with a political conspiracy, but with a certain number of persons in sympathy with and determined to avenge, those involved in recent sedition trials. It seems incredible that a confederacy which must be limited in its scope cannot be tracked down ; and the failure of the police to perform this work is a grave reflection on their detective skill. The murder in open day-light and in a public place of Babu Ashutosh Biswas appears to show that even in vigilance and determination they are inferior to those foes of society against whom they are, or ought to be, its guardians.

BOMBS GALORE *May 7, 1909*

The sentence inflicted by Mr. Beachcroft, the Sessions Judge of Alipore, upon those of the accused in the Bomb Conspiracy Case whom he has found guilty, will create a profound impression throughout the country, and will bring home possibly for the first time, to many who have toyed with treason the grave legal character of their proceedings and the drastic penalties which the law rightly provides for offences aimed at the safety and the very existence of lawful government. It is easy enough, when a conspiracy has been unearthed, to speak of it apologetically as the work of crack–brained youths who meddled with dangerous play things. But the Sessions Judge has refused to be diverted from the legal, and it may be added the practical aspect of this miserable plot, which though puny in comparison with its object and bungled in a manner that may well excite derision, was a serious effort on the part of the conspirators to dislodge the British Government.

Of the incredible stupidity and childishness with which the criminal operations of the gang were directed all the world is aware. An attempt was made on the life of the Mayor of Chandannagore who is not a British official, because he had prohibited a Nationalist meeting. Mr. Kingsford was marked out for murder by means of a bomb because he had ordered Sisir Kumar Sen to be birched. Sir Andrew Fraser was doomed to die apparently because he was Lieutenant Governor of Bengal at the time of Partition. It would be difficult to imagine an Anarchist programme drawn up with less judgment or executed with less skill. The conspirators must, however, be judged not by their mental calibre but by their intentions, as interpreted in the light of the ghastly results of their criminal folly. Their hatred against British rule, their desire to make war on the British Government, and their preparations for this purpose have been clearly proved.

Barindra Kumar Ghose as a collector of arms for a rebellion, might be dismissed with contempt, but having regard to the fact that he was cognisant of the attempt to assassinate Mr. Kingsford and was therefore, morally responsible for the horrible murder of Mrs. and Miss Kennedy, it will be felt that in passing a sentence of death upon him the Sessions Judge has inflicted a doom which has been earned in the full Ullaskar Dutta, by whom the fatal bomb was made, must be placed in the same category. Upon ten of the conspiratiors the Judge, influenced by considerations of humanity, and anxious to remove as many as possible from the operation of the more severe Sections of the Penal Code, has passed the sentence transportation for life. Three have been sentenced for ten years only and three for seven.

Among the acquitted the most conspicious is Arabindo Ghose. It has been obvious from the time when Mr. Norton elaborated his case against this prisoner that the evidence by which it was sought to connect him with the conspiracy was of a fragmentary and circumstantial nature, at variance with his character and aims, and the judge has no hesitation in accepting the view that the revolt against British rule which Arabindo Ghosh contemplated was in the form of passive resistance. He cannot however be wholly absolved of the undesigned consequences of the mystical teaching which has been so grievously misinterpreted by his enthusiastic disciples.

MURDER OF INSPECTOR IN HIGH COURT *January 25, 1910*

Extract from an editorial :

The cold-blooded and daring murder of the Inspector Shamsul Alum in the High Court differs from some of the crimes of the Anarchists in that its objects is clear and unmistakeable. The officer who was shot yesterday afternoon by a Bengali assassin had played a prominent part in tracing the ramifications of the Maniktolla Bomb Conspiracy. The zeal and capacity with which he carried out his duties exposed him to the special enmity of the gang for whose conviction he laboured so assiduously, and it is well known that even when the trial was proceeding in the Alipore Police Court, the prisoners threatened and predicted his death at the hand of some avenger. Not only was he hated for his past services, but he was feared as one who was likely to be equally successful in unravelling the organisation of political dacoities in which the activity of the Anarchists manifested itself some weeks ago. There was, therefore, a double motive for getting

rid of him by the revolver of an assassin and in spite of the precautions taken for his safety he has been successfully murdered.

As if to emphasise the power of the Anarchists to dispose of the victims whom they have marked down for vengeance Shamsul Alum was assassinated within the precincts of the High Court itself, in the very temple of justice.

MIRROR, MIRROR *July 28, 1910*

The sinister record of lawlessness and crime which has been the outcome of the boycott movement fully justifies the decision of the Government of Bengal to prohibit any celebrations of the inauguration of the movement on the 7th of August. The evils arising from the boycott are now fully admitted by many who at the outset did not realise what must necessarily follow from the mischievous expedient, adopted as a protest against the partition of Bengal. The effect of the movement as the Lieutenant Governor points out, is to inflame racial passions and to keep alive feelings of animosity which have been prejudical to the cause of good Governments and grave obstacle to progress. The specious arguments advanced in justification of the boycott find an irrefutable answer in the proceedings of the criminal courts. And in view of facts which are only too notorious, it is regrettable that there is not a frank and open repudiation of the movement by every responsible political leader in Bengal. This course is advocated by the Indian Mirror, which cogently observes that the boycott has no connection with true Swadeshi, and that it hampers instead of helping the industrial progress of the country.

SWADESHI MIXTURE *August 9, 1911*

Everyone will hope that Mr. Surendranath Banerjee was right when speaking at the (Swadeshi) Mela, he said : "Peace is our watchword. The Voice of controversy is hushed in this sacred temple of industrialism." Commerce and controversy go ill together. The characteristic feature of successful commerce is that, ignoring racial differences, it borrows ideas, capital and materials from whatever source they can be best obtained. Paradoxical as it may seem, if Swadeshi is to succeed it must be prepared to accept extraneous help and instruction. Prosperous businessmen such as Mr. R. N. Mookerjee freely recognise this necessity. They have not the least objection to foreign management or the use of foreign capital, and they are glad of the co-operation of European skill and knowledge. "In the present state of our commercial ignorance," said Mr. R.N. Mookerjee in his presidential address at the Indian Industrial Conference, "I venture to think that it is not only desirable but indispensible to secure the services of a fair proportion of commercial European gentlemen on our Boards." This remark was applied to joint-stock enterprises, but the problem of the successful establishment of small industries is not less difficult than the management of a joint-stock undertaking. The suggestion may be hazarded that in regard to these also European advice and assistance would probably be valuable.

SUCCESS OF SECOND SWADESHI MELA *October 8, 1912*

The closing ceremony of the second Calcutta Swadeshi Mela took place on Monday afternoon when a meeting was held under a pandal on the Mela grounds. Owing to inclement weather, the attendance was not large.

Babu Srikali Ghose, secretary of the Mela, gave some figures showing its success. Last year the number of visitors was 5,000 but this year it was 75,000. The number of lady visitors this year was 18,000 and the number of exhibits 234. He said that both in quantity and variety of exhibits this year were far better than those of last year. For want of space they could not receive all the exhibits, while some could not be properly exhibited.

Babu Krishna Kumar Mitter, another secretary to the Mela, said that this year all the branches of Swadeshi enterprise were represented and the number of visitors far exceeded their expectation.

Babu Surendra Nath Banerjee, addressing the meeting, said that in the absence of Sir R. N. Mukerjee, who could not attend the meeting on account of illness, it had devolved on him to declare the Mela closed. On the opening day he prophesied that Swadeshi was a living force. The result of the Mela showed that his prophecy had been fulfilled. He was told that the finances of the Mela were prosperous. They had a balance of Rs. 2,000 at their credit after meeting all the expenses, and that was a matter of national congratulation. But what were they to do in the future. They had already resolved at a meeting of manufacturers to appoint a committee to consider the permanent establishment of a Swadeshi Bazar. That committee had been formed and it was expected that within four or five months such a Bazar would be established in Calcutta with a view to bring together the purchaser and the manufacturer. Mr. Banerjee thanked the Government for its noble effort to revive technical education in Bengal.

ENTER ROWLATT *January 21, 1919*

The text has now been published of two Bills, the Indian Penal Code and Code of Criminal Procedure Amendment Bill and the Criminal Law (Emergency Powers) Bill, which have been framed in order to carry out the recommendations of the Rowlatt Committee. The special powers which the Government possess under the Defence of India Act will lapse six months after the conclusion of the war, and no reasonable person has ever doubted that similar means of protecting the community against sedition and anarchism must be available when the Defence of India Act comes to an end. Only two grounds could be accepted on which special powers might be dispensed with. One would be that the Anarchist movement has been completely and finally suppressed. On this point the Rowlatt Committee made an impressive pronouncement. They held that after the war the elements of danger would continue. "The persons interned under the Defence of India Act", they said, "will be due for release and the terms of imprisonment of many dangerous convicts will be coming to an end. Further, there will, especially in the Punjab, be a large number of disbanded soldiers, among whom it may be possible to stir up discontent. Nevertheless, if we thought it clear that the measures taken against the revolutionary movement under the Defence of India Act had so broken it that the possibility of the conspiracies being revived could be safely disregarded, we should say so. That is not our view, and it is on this footing that

we report. "This conclusion, it may be well to recall, was not simply that of Mr. Justice Rowlatt and Sir Basil Scott but also that of Mr. Justice Sastri and of the Hon. Mr. P. C. Mitter. The other reason for allowing the Defence of India Act to lapse without seeking to give permanence to its special powers would be that the ordinary law, skilfully and energetically applied, ought to be sufficient to enable Government to cope with criminal conspiracies. On this head also the Rowlatt Committee came to a notable conclusion. "What we do desire to lay stress upon", they said, "is that early in 1914 that is to say, before the war and before the theft of Messrs Rodda's arms, it was recognised that the forces of law and order working through the ordinary channels were beaten. We are convinced that was the state of affairs even at that date.

BANDE MATARAM*
Political Writings of
Sri AUROBINDO

LESSONS AT JAMALPUR *September 1, 1906*

The incidents at Jamalpur are in many ways a sign of the times. They reveal to us, first and foremost, as many incidents of the Swadeshi movement have revealed to us, the great reservoir of potential strength which the Congress movement has for so long a time left untapped. The true policy of the Congress movement should have been from the beginning to gather together under its flag all the elements of strength that exist in this huge country. The Brahman Pandit and the Mahomedan Maulavi, the caste organisation and the trade union, the labourer and the artisan, the coolie at his work and the peasant in his field, none of these should have been left out of the sphere of our activities. For each is a strength, a unit of force; and in politics the victory is to the side which can marshal the largest and most closely serried number of such units and handle them most skilfully, not to those who can bring forward the best arguments or talk the most eloquently.

But the Congress started from the beginning with a misconception of the most elementary facts of politics and with its eyes turned towards the British Government and away from the people. To flaunt its moderation and reasonableness before approving English eyes, to avoid giving offence to British sentiments, to do nothing that would provoke a real conflict, this was its chief pre-occupation. It concerned itself with such things as Simultaneous Examinations, Exchange Compensation, with the details of administration and the intricacies of finance; it presumed to give the Government advice on its military policy, and it passed omnibus resolutions covering the whole field of Indian affairs. All the time it had nothing behind it that could be called strength, no tangible reason why the British Government should respect and give form to its irresponsible criticisms. The Government on its side took the measure of the Congress and acted accordingly.

Under the stimulus of an intolerable wrong, Bengal in the fervour of the Swadeshi movement parted company with the old ideals and began to seek for its own strength. It has found it in the people. But the awakening of this strength immediately brought the whole movement into collision with British interests, and the true nature of the Englishman, when his interests are threatened, revealed itself. The Swadeshi threatened British trade and immediately an unholy alliance was formed between the magistracy, the non-officials and the pious missionaries of Christ, to crush the new movement by every form of prosecution and harassment. The Trade Union movement threatens the tyranny of British Capital over Indian

*Bande Mataram - Sri Aurobindo Ashram. Pondicherry

Labour, and at once British Capital responds by unprovoked lockouts, illegal dismissals and finally by volleys of gunshot. The struggle is bound to increase in its intensity and the prospect it opens, is one which only the most courageous can face. But for us there is no choice. The faith in British justice has crumbled into the dust. Nothing can again restore it Go back we cannot, halt we cannot, go on we must. It will be well for us if our leaders recognise the situation and instead of hesitation and timidity which will not help them, meet it with clear eyes and an undaunted spirit.

BY THE WAY

There is a limit to everything. There is also a limit to heroworship and to self-laudation. It seems to us that limit was passed in the extraodinary proceedings of the Pandit's meeting which deified Babu Surendranath Banerji, and in the undignified effusion of the report which appeared in Babu Surendranath's own paper the *Bengalee.* A regular *abhishek* ceremony seems to have been performed and the assembled Brahmins paid him regal honours as if he had been the just and truthful Yudishthira at the Rajasuya sacrifice. If Babu Surendranath wishes to be the king of independent Bengal, he should surely conquer his kingdom first and then enjoy it. Even Caesar refused the crown thrice; but Surendra Babu has no scruples. He accepted his coronation with effusive tearfulness in the touching language of the *Bengalee,* "his mighty voice shook and he got choky".

*

But the thing passes a joke. Whatever differences of opinion we may have with Babu Surendranath, we have always recognised him as the leader of Bengal, the one man among us whose name is a spell to sway the hearts of millions. We do not like to see him making himself publicly ridiculous, for, by doing so, he makes the whole of Bengal ridiculous. Such performances are rather likely to diminish his prestige than increase it. But ever since the rise of a party which questions his methods and ideals, Surendra Babu has shown an uneasy deisre to have his personal leadership proclaimed on the housetops and an almost hysteric tendency towards self-praise. The indecorous comparisons of himself with Christ and Gauranga, the tone of his Barisal speech and this coronation ceremony are indications which make us uneasy for our veteran leader. He should remember the last days of Keshab Chandra Sen and avoid a similar debacle.

It is time that public opinion should forbid this habit of self-laudation in our leaders. The Maratha leaders have a much keener sense of the decorum and seriousness which public life demands. Recently a movement was set on foot in the Deccan to celebrate Mr Tilak's birthday and pay to the great maratha leader almost the same honours as are paid to the memory of Shivaji in the Shivaji Utsav. The whole of Maharastra prepared to go mad with a frenzy of hero-worship when everything was brought to a sudden end by prompt and imperative prohibition from Mr. Tilak himself. This entire absence of self-seeking and self-advertisement is one of the most characteristic features of Mr. Tilak's public conduct. We hope it will become a more general standard if not of character, at least of public etiquette throughout India.

BY THE WAY *September 3, 1906*

The *Bengalee* publishes an apologetic explanation of the Kamboliatola ceremony on which we passed a few strictures more in sorrow than in anger the other day. The defence seems to be that Babu Surendranath Banerjee was bediademed neither with a crown of gems nor a crown of thorns, but only a harmless chaplet of flowers. Moreover, the ceremony was not in the nature of an *abhishek* or coronation, but a *Shanti-Sechan* or homage of hearts from Bengal's assembled Pandits. We do not think the explanation betters things in any way. In whatever way we look at it, the whole affair was a piece of childishness which could have no object but to minister to personal vanity

This same silly chaplet, it appears, represented the crown of success and might be likened to the laurel crown of the ancient Roman. Visions arise before us of our only leader wrapped majestically in an ancient toga and accepting on the Capitol the laurel crown that shall shield his head from the lightnings. But who is the hostile deity against whom the muttered Mantras of the Brahmins were invoked to shield the head of our Surendra Caeser? Sir Jupiter Fuller is gone and no other Thunderer takes his place. We repeat, the whole affair was silly in the extreme and we hope it will not be repeated.

*

Mr. A. K. Ghose has gone to Jamalpur. That is well. Such affairs as the sanguinary outrage at Jamalpur demand that our strongest man should be himself on the spot, and Mr. A. K. Ghose has proved himself a leader of men, the greater because, unaided by supreme powers of oratory, he has by mere honest work and organising power, become the voice and the head of thousands of men.

ENGLISH ENTERPRISE AND SWADESHI *September 4, 1906*

The Anglo-Indian papers are now-a-days repeatedly referring to the Jamalpur Railway workshop as a Swadeshi enterprise. The use of the word throws a good deal of light on the meaning of that Swadeshi which our benevolent Government so unctuously professes. The Jamalpur workshop does nothing for India beyond employing a number of coolies who are ill-paid and therefore underfed and a staff of Bengali clerks. It adds nothings appreciable to Indian wealth, on the contrary, it diminishes it. All that can be said is that instead of taking 100 per cent of the profits out of India, it takes 90 per cent. This is precisely the meaning of Government Swadeshi—to provide a field for English Capital, English skilled work in India and employ Indian labour, not out of desire for India's good, but because it is cheap. If the Government really desired India's good, it would provide for the training of educated Indians so that such work as is done in Jamalpur might be executed by Indian brains and with Indian capital, as well as by Indian hands. But we do not ask the Government to give us such training. It would be foolish to expect a foreign Government to injure the trade of its own nation in India. We must provide for our own training ourselves.

JAMALPUR

Our correspondent's report from Jamalpur gives the sober facts of the situation and clears away the mist of misrepresentation and wild rumour with which the

Anglo-Indian journals have sought to obscure the incident. From the beginning the English version has been an attempt to throw the whole blame on the workmen by charging them with rioting before the gunshots. Their version has varied from day to day. With the exception of one or two minor details, the opposite version has been throughout clear, consistent and rational. There will, of course, be the usual cases and counter-cases and diametrically opposite statements sworn to in evidence. But we have ceased to take any interest in this futile legal proceedings. An Englishman assaulting an Indian may be innocent on guilty, but, as he cannot be punished, it does not matter an atom whether he is innocent or guilty. The fight has to be fought out to the end and the resort to law is no more than a persistent superstition.

THE COMILLA INCIDENT *March 15, 1907*

The Comilla affair remains, after every-body has said his say, obscured by the usual tangle of contradictions. The Hindu version presents a number of allegations, --specific, detailed and categorical—of attacks on Hindus, making up in the mass a serious picture of a mofussil town given over for days to an outbreak of brutal lawlessness on the part of one section of the Mahomedan community, a Magistrate quiescent and sympathetically tolerant of the rioters, and the final resort by the Hindu community to drastic measures of self-defence on the continued refusal of British authority to do its duty as the guardian of law and order. A Mahomedan report belittled the accounts of Mahomedan violence and presented picturesque and vivid details of Hindu aggressiveness ; but as this version has since been repudiated we have to turn to the official account for the other side of the picture. But the official account—well, the value of official statements is an understood thing all the world over. Is it not a political byword in England itself that no rumour or irresponsible statement should be believed until it had been officialy denied? The official version of the Comilla incident published on the 9th March is hard to beat as a specimen of its class—it is a most amazingly unskilful production over which suppression of truth and suggestion of falsehood are written large and palpable ; but it presents a beautiful and artistic picture of wanton and murderous Hindu violence, comparative Mahomedan moderation, and fatherly British care brooding dove-eyed and maternal-winged over its irreconcilably quarrelsome step-children.

If anyone should think our characterisation of this historical document too sweeping, we invite him to a careful study both of what it says and what it does not say. It commences with the statement that "a series of anti-Partition meetings were recently held here *without incident* and on 6th March Nawab Salimullah arrived from Dacca to hold counter-meetings". The insertion of the words "without incident" is admirable. It implies that there was violent irritation between Hindus and Mahomedans on the Partition question and the latter might have been expected to show their irritation by "incidents",—especially when the "inflammatory" speeches of Babu Bepin Chandra Pal and other firebrands are taken into account,--but they very considerately refrained. Thus Mahomedan moderation is contrasted with the Hindu aggressiveness which is presently to be related, and the way paved for throwing the whole responsibility on the anti-Partition agitation and aggressive Swadeshism. Then we are informed as a positive fact that a brick was thrown

at the Nawab's procession and brooms held up in derision. "This led to some disturbance and a cloth shop was *entered* but not looted and two prostitutes' houses robbed" Let us pause over this delightful sentence. The outrageous assaults by the rioters which the Hindu accounts carefully specify, are all hidden away and glossed over under the mild and gentlemanly phrase "some disturbance"; the only specific instances which the Commissioner will acknowledge are the cloth-shop "incident" and the "incident" of the two prostitutes. But after all, what occurred in the cloth-shop? It was merely "entered",—admirable word! the rioters were far too polite, honourable and considerate to loot it. They simply entered for the sheer joy of entering and perhaps of gazing ecstatically on bales of Swadeshi cloth! They also "entered" the houses of two prostitutes, but in this instance, indentified themselves for their trouble; still, the people robbed were merely prostitutes! It is thus suggested that the disturbance was of the most trifling character and the only sufferers a shopkeeper and two prostitutes; in fact, the whole thing was little more than an amiable frolic. Of the violent maltreatment not only of students and shopkeepers but of pleaders and other respectable citizens, of the forcible invasion of private houses and the attempts to break into or, let us say, "enter" women's apartments, there is not a word.

After this day of "entries" there is a blank in the official record until the next evening when "the Nawab's Secretary, a Parsi was attacked *while walking alone* and severely beaten with lathis by some Hindus". The provocation alleged to have been given by Mr. Cursetji is carefully omitted, and we are asked to believe that an inoffensive Parsi gentleman out for an innocent and healthful evening walk was waylaid, when alone, and severely beaten because he happened to be the Nawab's Private Secretary. And the evening and the morning were the second day. On the third all was again quiet till that dangerous time, the evening, when an "unlicensed Mahomedan procession", greatly daring, took the air like Mr. Cursetji before them, apparently with the innocuous object of relieving their feelings and exercising their lungs shouting Allah-ho-Akbar. This explains a great deal ; evidently the bands of hooligans ranging the streets and attacking people and "entering" houses were in reality "no such matter" except in vivid Hindu imaginations ; they were merely "unlicensed Mahomedan processions" on innocent shouting intent. Some unknown person, however, fired upon this procession and killed a Mahomedan baker; and there, inexplicably enough, matters ended for the day. The shot, however, had a powerful effect upon the authorities; it seems to have stirred them up to some faint remembrance of the elementary duties of a civilised administration. Accordingly our martial Commissioner telegraphed, like Kuropatkin, for "reinforcements", and pending their arrival, sent for the Mahomedan Sardars and Mullahs and "enlisted" their influence to keep the peace. In the name of reason and logic, why? The account shows that all the violence and lawlessness, if we except the trifling affairs of the unlooted shop and the looted prostitutes, proceeded from the Hindus. The Mahomedans, it seems, kept perfectly quiet until the night of this third day, when the only incidents were again of a trifling character; a man riding on the step of a carriage was "struck"; a Hindu peon was "struck", nothing more. We are ourselves "struck" by the mildness of the methods employed by these rioters; they do not break into houses, they merely "enter" them; they do not severely beat any one as Mr. Cursetji was "severely beaten" by the Hindus;

they merely "strike" a man or two in playful sort. Under the circumstances it is surely the leaders of the Hindu community who should have been enlisted "to keep the peace"—say, as special constables. However, in the end, the reinforcements arrived and the Commissioner busied himself in the fatherly British way, "inquiring personally into all allegations and endeavouring to bring the leaders of both parties together". On this touching scene the official curtain falls. Who shall say after this that "divide and rule" is the policy of the British bureaucracy in India?

We have said enough to expose thoroughly this ridiculous account of a very serious affair. It is the production not of an impartial official keeping the peace between two communities, but of a partisan in a political fight who looks upon the anti-Swadesi Mahomedans as allies "enlisted" on the side of the bureaucracy. In order to understand the affair we have to read into the official account all that it carefully omits; and for this we must fall back on the Hindu version of the incident. What seems to have happened is clear enough in outline, whatever doubt there may be as to details. The popular cause was making immense strides in Comilla and the magnificent success of the District Conference had afforded a proof which could not be ignored. The redoubtable Nawab Salimullah of Dacca considered it his duty to his patron, the Assam Government, to stem the tide of nationalism in Tipperah. Accordingly he marched Comillawards with his lieutenants and entered the town in conquering pomp. That he ordered the sack of the conquered city is probably no more than the suspicion natural to excited imaginations; but it is certain that his coming was immediately responsible for the riots. His whole history, since he was shoved into prominence by his Anglo-Indian patrons, has been one long campaign against the Hindus with attempts to excite the passions and class selfishness of the Mahomedans and inflame them into permanent hostility to their Hindu fellow-countrymen. It is only within the territorial limits of the Nawab's influence that there has been any serious friction between Hindus and Mahomedans on the Swadeshi and Partition questions; but so far as it has gone, its immediate results have been not only friction but outbreaks of violence and lawlessness either on a small, as at Serajgunge or on a large scale as at Mymensingh. It is not therefore surprising that while the Conference at Comilla and the recent Swadeshi meetings came off without "incident", the Nawab should no sooner have set his foot in Comilla than a reign of violence and lawlessness began. At the same time it is probable that the suddenness of the outbreak was due to some immediate exciting cause. The brick story bears a suspicious resemblance to the incident which set Sir Bampfylde and his Gurkhas rioting officially at Barisal; but it is likely enough that a few individuals may have shown their feelings towards the Nawab in an offensive way. However that may be, it seems certain that the more rowdy elements of the Mahomedan population broke into lawless riot, attacked Hindus wherever they found them, broke into shops and private houses and brutally assaulted students, pleaders and other respectable Hindus, attempting even in some cases to enter the women's apartments.

Once begun, the afair followed familiar lines. As in Mymensingh, it commenced with an orgy of lawlessness on the part of ignorant low-class Mahomedans inflamed by the Nawab's anti-Hindu campaign. As a Mymensingh, local authorities

would not at first interfere, although appealed to by Hindu gentlemen, and confined themselves to academic arguments as to the genesis of the outrages. As in Mymensingh, the Hindus, taken by surprise and denied the protection of the law, fell first into a panic and only afterwards rallied and began to organise self-defence. At Comilla, however, they seemed to have acted with greater promptitude and energy. The disturbances continued for three days at least; but by that time the Hindus had picked themselves together, the women were removed to a safe place where they could be guarded by bands of volunteers and the whole community stood on the defensive. Two or three collisions seem to have taken place in one of which, possibly, Mr. Cursetji was roughly handled, in another a Mahomedan shot dead. By this time, the Commissioner had realised that the policy of non-interference adopted by the British authorities, was leading to serious results which they cannot have anticipated. The military police were telegraphed for and other measures taken which came at least three days too late, since the mischief had been thoroughly done.

Divested of exaggeration and rumour, we fancy the actual facts will be found to amount to something like the above. We do not for a moment believe that the Hindus took aggressive action without serious and even unbearable provocation, any more than we believe that the riot was planned or ordered beforehand by the anti-Swadeshi section of the Mahomedans. We trust that the usual mistake of instituting cases and counter cases will be avoided. If the Comilla nationalists wish the facts of the case to be known let them draw up a statement of their version with the evidence of the persons assaulted for the enlightenment of public opinion. The time ought to be now past, in Eastern Bengal at least, when appeal to the British courts could be either a remedy or a solace.

THE SITUATION IN EAST BENGAL *April 11, 1907*

While commenting on the proceedings of the Berhampur conference, we expressed our opinion that the leaders had been guilty of the most serious deficiency in statesmanship and courage in failing to understand and meet the situation created by the occurrences in Tipperah. Leadership in this country has hitherto gone with the fluent tongue, the sonorous voice, skill in dialectics and acute adroitness in legal draftsmanship. The leader has not been called upon to understand the great and urgent national needs or to meet the calls of a dangerous crisis. In the opposition-cum-cooperation theory these were functions of the alien Government and the only duty of the popular leaders was to advise or remonstrate and look on at the results. The present position in Bengal is full of the uncertainty and confusion of a transition period when circumstances have changed and demand new qualities, new ideas and a new spirit in the people's chiefs; but the leadership still remains in the hands of the old type of politicians. This would not have mattered if the old leaders had been men of genius gifted with the adaptability to suit themselves to the new circumstances,—the vision to grasp them and the courage to act. But none of these qualities seems to be possessed either by Babu Surendranath, the one man of genius among the older leaders, or by Mr. Gokhale, the one man of real political ability,—much less by the lesser heads. The country has still to seek for leaders who shall be worthy of the new age.

The Comilla affair has revealed beyond all possible doubt the heart of the new situation. It ought now to be plain to the meanest intelligence that a struggle has begun between two great forces which must go on till one or the other is crushed or driven to surrender. Any atempt to disguise the fact is the merest futility. Our Moderate leaders thought when Fuller had been driven out of the country and Morley had taken up the reins of Government, the struggle need no longer be a struggle and could again be reduced to the proportions of a public debate between the Congress and the Government. Now again, they thought, a pleasant reversion to the old opposition-cum-cooperation politics may be gradually engineered. But the forces of reaction, opposed to us, understand politics better; they have seen that the fire of the new spirit is not a momentary blaze to be kindled and quenched at the will of individuals, but the beginning of an immense conflgration. Their policy is as astute as might be expected in such past masters of the art of politics. It is evidently to isolate the struggle and fight it out in East Bengal; to oppose and put down the new spirit after it had taken hold of the whole nation would be a task so difficult as to be a practical impossibility; to meet it in a single part of the country and crush it before it had time to spread effectively over all India, is obviously the wisest course. It is part of the policy also to attack it by localities even in the affected area and not as a whole, to destroy it before the defence has organised itself; and to use as instruments the Sallimullahi sect of Mahomedans, while the Police confine themselves to keeping the ring.

The leaders may say that they thought the Comilla incident an unwelcome and deplorable outbreak which had happily been closed whether by the "secret" efforts of Babu Surendranath Banerji or by other less miraculous means. That they did think so, is probable and nothing could more damningly convict them of want of insight and even the smallest measure of political wisdom than such an inexcusable blunder. It was perfectly obvious that, as Comilla had not been the first incident of the kind, so also it would not be the last. Before the conference met the disturbance at Mogra Hat was already in full course; and that details, reported in Babu Surendranath Banerji's own paper, were of the most glaringly unmistakable character. At Comilla there had been an outbreak of anti-national hooliganism coincident with the Nawab's visit; the authorities had pactically refused to help the Hindus and had only interfered when the Hindus were getting the upper hand ; and even then, the arrest and punishment of a few rioters was so casually and lightly done as to be absolutely useless for any deterrent effect while the might of the bureaucracy was centred upon the prosecution of alleged Hindu culprits in the shooting case.

Nevertheless, the Comilla incident ended in a national victory. At Mogra Hat measures were taken to prevent a repetition of that victory. A Mahomedan Police official seems to have acted practically as the captain of the rioters; the Subdivisional Officer tried to deprive the Hindus of the means of self-defence; attempts were made to prevent organisation of defence by volunteers ; a Police force held the station to exclude help from outside for the Hindus, leaving the Mahomedan rioters a clear field for their operations. Finally when in spite of all these obstructions the Hindus were again getting the upper hand, the higher authorities appeared on the scene, the disturbance was quelled, and arrests and prosecutions of Hindus

are now in full swing. This is the substance of the account given by the correspondents of the *Bengalee* and the *Patrika*, and not yet denied. If after this the leaders are still unable to understand the situation, the sooner they give up their leadership and attend to their spiritual salvation, the better for themselves and the counry.

The situation in East Bengal puts three important questions to any intelligent leadership. Is East Bengal to be left alone to fight out the battle of nationalism while the rest of the country looks calmly on? Is reaction to be allowed to persecute local and disorganised forces of nationalism or is mutual defence to be organised? What measures are to be taken to prevent the efforts of the officials to give the matter the appearance of Hindu Mahomedan quarrel? What answer have the leaders to give to these questions? At Berhampur two measures only were taken,--an empty and halting Resolution of "sympathy" and a flamboyant call for a Defence Fund, to be utilised for we know not what purpose. It is not money that East Bengal needs, but practical assistance, guidance and leadership. These the leaders have proved themselves unable or unwilling to give. They will say perhaps that they have secured the "sympathy" of Lord Minto as well as of the Conference, and nothing further is necessary! It does not matter a jot whether the local officials are or are not acting on their own initiative in their singular attitude in East Bengal. The sympathy of Lord Minto has not prevented the repetition of the disturbances, and we have no confidence that it will prevent further repetitions which are now threatening. For effectiveness it seems to be on a par with the sympathy of the Berhampur Conference. The people can expect no protection from the alien bureaucracy which is inerested in the extinction of nationalism. They are left alone to find out their own salvation. Be it so, then. Ourselves we will protect ourselves : unled and unassisted pave for the country its hope and its future.

BUREAUCRACY AT JAMALPUR *April 25, 1907*

The most recent accounts of the Jamalpur outrage emphasise the sinister nature of the occurrence and the defects in our own organisation which we must labour to remove. The most disgraceful feature of the riots has been the conduct of the British local official who seems to have deceived and betrayed the Hindus into the hands of the Mahomedan Goondas. The nature of the attack, its suddenness and completeness, show beyond doubt that it had been carefully planned beforehand and was no casual outbreak either of fanaticism or rowdyism. It is impossible to believe that the Joint Magistrate, responsible for the peace of the country, was totally uninformed of the likelihood of an organised attack which was generally apprehended by the Hindus. Yet it is reported that the local official induced the Hindus to be present at the Mela by a distinct pledge that they had nothing to fear from the Mahomedans, and then, in violation of his pledge, left them utterly unprotected for brutality and sacrilege to work their will upon them. If he had any inkling of the outbreak which was then in preparation, his action amounted to cynical treachery. Even if he was so imbecile as to be unaware of what was going on in his own jurisdiction, his failure to provide against the possibility of his pledge coming to nothing lays him open to the worst constructions. At the very least he showed a light-hearted disregard for his official obligations and his personal honour. His subsequent action was equally extraordinary. All the accounts

agree in saying that the police were quite inactive until the anti-Swadeshists had their fill of plunder and violence and were making for the station. Even then, they confined themselves to depriving them of their lathis,—the mischief being done and further violence superfluous,—and with a paternal indulgence dismissed them to their homes unarrested. The only people arrested were a few of the Hindus who, if they were guilty of anything, can have only been guilty of self-defence. The accounts on which we base these comments are unanimous and have not up to the present moment met with any denial. We can only conclude therefore that, as at Comilla, the local officials looked with sympathy on the rioters as allies in the repression of Swadeshism, and acted accordingly. To stand by while the Mahomedans carry out that violent repression of Swadeshism which the sham Liberalism of the present Government policy forbids them to undertake themselves; to clinch this illegal repression by legal repression in the form of prosecution of respectable Hindus for the crime of self-defence; to strain every nerve to prevent outside help coming to the distressed and maltreated Swadeshists, and finally to save appearances by sending a few of the Mahomedan rioters to prison—a punishment which has no terrors for them, since they are all hooligans and some of them old jail birds :—such has been the consistent attitude of the local officials. The only new circumstance in the Jamalpur incident has been the assurance given by the local official which amounted to a promise of protection, and which alone made the outrage possible. For the last century the British have been dinning into our ears the legend of British justice, British honour, British truth. The belief in the justice of the British nation or of British Magistrates is dead. Generated by liberal professions it has been killed by reactionary practice. The belief in the personal honour and truth of individual Englishmen has somehow managed to survive; but it will not stand such shocks as the East Bengal bureaucrats have managed to administer to it. We would earnestly press upon the people of East Bengal the unwisdom of trusting to official promises or to anything but their own combination, organisation and the strong arm for their protection. We have already pointed out more than once what the Comilla officials took some pains to point out to those who applied to them for protection, that it is folly to raise the cry of Swadeshi and Swaraj and yet to expect protection from the bureaucrats whose monopoly of power the movement threatens.

Is This Your Lion of Bengal ?

It is painful to see how utterly helpless and at sea the "recognised leaders" of Bengal are showing themselves in face of the growing acuteness of the crisis in East Bengal. The *Bengalee's* comments on the Jamalpur outrage are, we are compelled to say, a model of cold timidity and heartless over-caution. The *Bengalee* declares that the whole Hindu community in Calcutta is intensely excited over the outrage done to their community in Jamalpur. It hints and insinuates that the connivance of the British officials is mainly responsible for these outrages; but even these vague insinuations it defends with a triple line of "*ifs*". It threatens dim and terrible consequences if the Government do not take proper measures. But in the meantime what does our contemporary, voicing as it does the mind of the most famous politician in Bengal, propose in order to meet the emergency? It proposes to hold a mass meeting in order to devise steps to minimise the evils of the situation, and, having held a meeting, it proposes to wait and do nothing.

Or at least, if anything is to be done, it is merely to boast of our superiority to "lowly passions" and to wait patiently to see what the Government *might* do! These superior and enlightened journals cannot be expected to yield to such "lowly passions" as indignation against oppression, active sympathy with our outraged fellow countrymen, and the desire to avenge their wrongs. We are sick to death of this false mealy-mouthed affectation of moral blamelessness which is merely an excuse for pusillanimity. Nero fiddled and Rome burned. Jamalpur is in a state of siege, the town held by Goorkhas, succour from outside excluded; one man lies dead and others wounded, some, it is said, fatally; the broken image of Durga, the outraged sanctity of religion, the blood of our kindred, the offended honour of our cause and country,—all cry out for succour and vindication. Yet the *Bengalee* finds time to fiddle about its superiority to "lowly passions". Such is the leading Bengal finds in the crisis of her destinies. Oh, the pity of it!

ANGLO-INDIAN BLUNDERERS

The *Englishman* has its own standing suggestion for the treatment of incidents like the Jamalpur disturbance. The theory is, the riots are the result of Mahomendan indignation at the Swadeshi Boycott ; therefore, Swadeshi is the cause of the whole trouble ; therefore, put down Swadeshi with the strong hand. No one knows better than the *Englishman* that the disturbances have been caused by the sinister alliance of Anglo-India with the Nawab of Dacca and his following contracted to put down Swadeshi by fair means or foul. For our part we should welcome open oppression by the bureaucracy ; it would be more honourable at least than local connivance at violence and brutal lawlessness, and it would be a pleasure to meet an open and straight forward opponent. But open or secret, direct or indirect, no measues whatsoever will succeed in crushing the insurgent national spirit. We wonder whether these complacent bureaucrats and exploiters have any idea of the growing mass of silent exasperation to which the present policy is rapidly giving shape and substance. Possibly, the idea is to force the exasperation to a head and crush it when it breaks into overt action, the old policy of the English in Ireland. But we would remind these blundering anglo-Saxon Machiavellis that India is not Ireland ; it is easier to unchain the tempest than to decreee to it what course it shall take and what it shall spare or what destroy.

THE EAST BENGAL DISTURBANCES *May 25, 1907*

We have said that the deportation of Lala Lajpat Rai brings no new element into the situation beyond hastening the processes of Nationalism and bringing us from a less to a more acute stage of our progress to independence. The second disturbing element has been the culmination of the alliance between Salimullah of Dacca and the bureáucracy in the anarchy and the outrages in the Mymensingh district. These disturbances are now almost over for the time being, though we must take full advantage of the Lull allowed to us, so as to put our house in order against a possible recrudescence after the jute season. We should now seriously consider how far these disturbances have altered the situation and what we should do in order to meet these new conditions. We must first notice that neither the disurbances themselves nor their cause are in their nature a new element in the situation. The Salimullahi campaign, the use of Mahomedan Badmashes

to terrorise Swadeshi Hindus, the official inactivity and sympathy with the lawbreakers, these have all been with us even before. The conclusions we arrived at the time, the warnings and exhortations we addressed to the people have been proved to the hilt, justified beyond dispute, enforced in red letters of rapine, bloodshed and outrage. Our reading of the situation then was that no serious apprehension of trouble between Hindus and Mahomedans need be entertained except within that tract of country immediately under the influence of Nawab Salimullah,—Mymensingh, Dacca, Tipperah and possibly parts of Pabna. This is precisely what has happened. In Comilla the trouble was stopped before it could do real mischief, by the resolute spirit of the Hindus ; in Dacca, in spite of small skirmishes, individual harassment and a minor outbreak or two, it never gathered to a head, because the great strength and early preparations of the Hindus overawed the prime movers and their instruments; Mymensingh alone felt the full force of the storm, while Pabna still hovers on the brink of it. It is not that the Nawab's campaign was not vigorously pursued in other parts. The Red Pamphlet has been ubiquitous throughout Eastern and Northern Bengal; the preachings of the nawab's Mullahs have been as persistent, as malignant in Barisal, in Calcutta, in every strong centre of Swadeshism. But though there have been alarms and excursions even as far west as Allahabad and Benares, the campaign has for the present signally failed outside the limits of Nawab Salimullah's kingdom. This is a fact to be noted. We do not say that Salimullahism carries no dangers with it of general disruption and disunion between the two communities; an unscrupulous agitation of this kind, aided by official backing is always dangerous. But in the rest of the country the blind faith in the Nawab and his Mullahs is absent and other conditions and forces exist which, if properly used by the Nationalists, will permanently counteract the promoters of disunion Even of themselves, they have been sufficient to prevent the Mahomedans from siding with the self-elected leader against the Swadeshists.

But however limited the area of the disturbances might be, we warned the country that Comilla was not the first and would not be the last of such outbreaks and we called upon it to be ready in time to follow the example of the Comilla Hindus Moderate politicians, blind leaders of the blind, were rejoicing over the end of the disturbances brought about, they said, by their mysterious efforts—and crying peace, peace where there was no peace. We pointed out that the Comilla affair was not an isolated outbreak, but part of a policy and we knew the men we had to deal with too well to suppose that they would be put off their machinations by a single defeat. Beaten at Comilla, they were certain to try their luck again in Mymensingh. We warned the country also that when the disturbances came, it would be idle to look for protection to the officials and the police. By announcing Swaraj as our ideal we had declared war against the existence of the bureaucracy and we could not expect the bureaucracy to help us by making our efforts to put it out of existence safe and easy. On the contrary, the Nawab and his hooligans were practically, if not avowedly, the allies of the bureaucracy in their war against Swadeshism and must therefore command sympathy and helpful inactivity if not actual assistance from their friends. In all these respects our reading of the situation has been proved correct beyond cavil or dispute. The extent to which the Nawab has succeeded in turning the baser passions of the mob to his

uses, the extent to which the anti-Swadeshi army has gone in its outrages, not scrupling even to desecrate temples and violate women, the extent to which the officials carried their connivance with the excesses, an European police official actually leading the mob and the looting being carried on under the eyes of the police : these things were new, but the Salimullahi campaign itself, the use of the hooligans (our Indian Black Hundred), and the sympathy of the officials are elements which are old, of which the country had been warned and against which the leaders of the movement should have provided.

Even the extent to which these things were carried was due entirely to a feature of the Mymensingh occurrences which we had already warned the country to avoid—the non-resistance of the Hindus of Jamalpur. There are some who say that the recent events in India are a proof of the impracticability of the Nationalist programme. We do not follow the reasoning of these logicians. The Jamalpur incidents and their sequel are a terrible proof of the soundness of the Nationalist ideas and the utter unsoundness of the Moderate theories of our relations with the bureaucracy and the best way of enforcing the Swadeshi propaganda. The people of Comilla followed the Nationalist programme with brilliantly successful results. They boycotted the courts, schools and every other element of the bureaucratic scheme of things and announced their inention of continuing the boycott so long as the Nawab of Dacca was allowed to remain in Comilla—and the Nawab was packed off without ceremony. They met force with force and the hooligan army of Anti-Swadeshism underwent a crushing defeat. On the other hand, the people of Jamalpur did everything which the Nationalist programme excludes; they trusted to the promises of the alien, they chose to go to the Mela unarmed, like defenceless sheep, relying not on their own strong arm but on the protection of the British shepherd. At the order of the alien they laid down the lathis they carried for self-defence, at the order of the alien they trooped to the Mela, from which they had resolved to absent themselves, to be thrashed by Mahomedan cudgels. Then, when their sheepish trustfulness had its reward, that one lesson was not enough; again they trusted to British protection and sent away the volunteers who stood between them and further outrage. And when the second storm came, they could think of nothing better than wholesale flight from the field of battle. Throughout we see the working of the old political superstitions, the old unworkable compromise which tried to oppose the bureaucracy and yet co-operate with it, to combine vigorous opposition with meek submission, to build up a nation under the most adverse circumstances and against the strongest opponents and yet be, first and foremost, docile, peaceful and law-abiding. These superstitions exploded in the explosions at Jamalpur and the conflagration that followed meant the collapse of a policy.

The hooligan disturbances in East Bengal bring therefore no new elements into the situation, but like the deportation of Lala Lajpat Rai, merely make it more acute and hasten the processes of Nationalism. They create no new conditions, but they have caused certain truths to be newly appreciated. The first is that the Pax Britannica is Maya and, if we mean to be Swadeshists and Swarajists, we must rely in future not on British protection but on self-protection. The second is that, as we have long insisted, our present means of self-defence are inadequate and better means and organisation are a pressing need The third is the seriousness

and true nature of the Mahomedan problem which our older politicians have always tried to belittle or ignore. Any one who wishes to deal successfuly with the crisis in the country, must recognise these three lessons of experience and shape his methods accordingly.

THE 7TH OF AUGUST *August 6, 1907*

The approaching celebration of the 7th of August has a double importance this year, for it has not only its general and permanent importance as the commemoration of our declaration of independence, but an occasional though none the less urgent importance as an opportunity of reaffirming our separate national existence against the arbitrary and futile attempt of the bureaucracy to reaffirm and perpetuate a vanishing despotism. The 7th of August will be recognised in the future as a far more important date to the building up of the nation than the 16th October. On the 16th October the threatened unity of Bengal was asserted against the disingenuous and dangerous attack engineered by Lord Curzon ; and since it is on the solidarity of its regional and race units that the greater Pan-Indian unity can alone be firmly founded, the 16th October must always be a holy day in the Indian Calendar. But on the 7th of August Bengal discovered for India the idea of Indian independence as a living reality and not a distant Utopia, on the 7th of August she consecrated herself to the realisation of that supreme ideal by the delcaration of the Boycott. The time has not come yet when the full meaning of that declaration can be understood, even the whole of Bengal has not yet understood, much less the whole of India. But the light is coming; partly by the efforts of the preachers of the light, still more by the efforts of the enemies of the light, it is coming : and in the dim wide glimmer of the mighty dawn we can see the vast slow surge of Indian life quickening under the breath of a stupendous wind, we can discern the angry fringes of the tide casting themselves far beyond the old low level, we can almost hear the roar of the surf hurling itself on the flimsy barriers it had once accepted as an iron and eternal boundary. The waters are at last alive with the breath of God, the flood which is to overwhelm the world has begun.

The 7th of August was India's Independence Day. A big word, it may be said, far too grandiose for the little that was accomplished. To those who judge only by the gross material event it may seem so, but to those who look beneath and watch the course of events as they shape themselves in the soul of a nation, the phrase will not seem one whit too excessive. It is the soul within us that decides, that makes our history, that determines Fate, and the material nature, material events only shape themselves under the limitations of Space and Time to give an outward body and realisation to the decisions of the soul. The day of a nation's independence is not the day when the administrative changes are made which complete the outward realisation of its independence but the day when it realises in its soul that is free and must be free. For it is the self-sufficing separateness of a nation that is its independence, and when that separateness is realised and recorded as a determined thing in ourselves, the outward realisation is only a question of time. **The seventh of August was the birthday of Indian Nationalism, and Indian Nationalism, as we pointed out the other day, means two things, the self-consecration to the gospel of national freedom and the practice of**

independence. Boycott is the practice of independence. When therefore we declared the Boycott on the seventh of August, it was not mere economical revolt we were instituting, but the practice of national independence ; for the attempt to be separate and self-sufficient economically must bring with it the attempt to be free in every other function of a nation's life; for these functions are all mutually interdependent. August 7th is therefore the day when Indian Nationalism was born, when India discovered to her soul her own freedom, when we set our feet irrevocably on the only path to unity, the only path to selfrealisation. On that day the foundation-stone of the new Indian nationaliy was laid.

Let us then celebrate the day in a spirit and after a fashion suitable to its great and glorious meaning. Let it be a reconsecration of the whole of Bengal to the new spirit and the new life, a purification of heart and mind to make it the undivided possession and the consecrated temple and habitation of the Mother. And, secondly, let it be a calm, brave and masculine reaffirmation of our independent existence. The bureaucracy has flung itself with savage fury on the new activities of our national life; it has attempted to trample on and break to pieces under its armed heel our economical boycott; it has made the service of the motherland penal in her young men; it has visited with the prison and deportation the preaching of Nationalism by the elder men. The 7th of August must be an emphatic answer to these persecutions and prohibitions. The Boycott must be reaffirmed and this time in its purity and simplicity as the national policy to which all are committed. The Risley Circular must be definitely and unmistakably challenged and negatived in action. Let there be a procession of students led by those venerable leaders of Bengal who are also professors of the Government University. And let us see afterwards what the bureaucracy can do and what it dare do to the men who refuse to give up their lifelong and sacred occupation at an alien bidding and to the youths who refuse to abstain from initiation in the same sacred service out of sordid hopes and fears.

But most of all the day should be a day of rejoicing and a day of consecration. The whole Indian part of the town should be illumined in honour of the divine birth which saw the light two years ago. And along with the outer illumination it should be a day of the illmination of herarts. It is the sacrament of our religion that can alone give the perfect and effective blesssing to our movement, and the celebration of this great day will not be complete until every Indian makes it a sacred observance, worshipping God in his own way, the Hindu in his temple, the Brahmo in his Mandir, the Mahomedan in his mosque, to consecrate himself anew on that day to the service of that single and omnipresent Deity through the task He has set to the whole nation, the upbuilding of Indian nationality by self-sacrifice for the Motherland.

TO ORGANISE *August 8, 1908*

Srijut Surendranath Banerji in his remarkable speech in College Square, the other day, observed that what the country now needed was not oratory but statesmanship, for the only effective answer to bureaucratic repression is the organisation of the whole strength of the country to carry out its natural ideal in spite of all repression. We think the veteran leader has gauged the situation

very accurately, but we confess we do not see at present where the statesmanship is to come from which is to carry out the difficult, arduous and delicate task before us. What we have done hitherto we have done without leadership, almost without clear purpose, under an inspiring and impelling force which we must necessarily think divine. Where that force has visibly guided us, we have done astonishing things; but at the same time there has been much confusion, one-sidedness and incoherence in our work. And now that a powerful and organised Government has set itself in grim earnest to destroy our movement it is imperative that we too should organise and make our whole potential strength effective for self-defence. The divine guidance will only be continued to us if we show ourselves in our strength and wisdom worthy of it. But it cannot be denied that the first effect of the repression has been to disorganise our work. Since it began, there has been no concerted and coherent action, every man has done what seemed good in his own eyes or else remained inactive. The result has been much weakness, supineness and ineffectiveness. Barisal fights for its own hand to maintain the boycott. **The *Yugantar* attacked carries on a heroic struggle with the bureaucracy with what stray assistance, individual generosity or patriotism may offer it. But organised resistance, organised persistence even there is none.**

This unsatisfactory condition of things is traceable to one main cause. All Bengal is heartily agreed in Swadeshi and professedly all are agreed on the necessity of industrial Boycott. But a majority of the order leaders, trained in another school of politics cannot adapt themselves to the new state of things, they cannot even throw themselves heartily into the only measures which can make the individual boycott crushingly effective, and they are out of sympathy with the wider developments of boycott which are becoming indispensable if we are to meet the bureaucratic attack with full success. They object personally to the new men and decline to work in co-operation with them. The new men, on the other hand, who have immensely increased their following and influence in the country are not in possession of the machinery of Congress and Conference, are, in fact, zealously excluded from it by the present possessors and have but small following among the richer men who might provide the sinews of war. They are moreover prevented, by a natural unwillingness to hopelessly divide the nation, from organising a machinery of their own. Yet to talk of organising the nation while excluding the new men is absurd. If the older party have the greater solidity and resources, the younger men have the lion's share of the energy and driving force, they divide the great middle class and are no longer there in a hopeless minority, but are gathering adherents all over the country (even in Madras they commanded one third of the votes at the last Conference) and they exercise an overwhelming empire over the minds of the rising generation. To organise the nation means to make all its elements of strength efficient for a single clear and well-understood work under the leadership of a recognised central force. To exclude such important forces as these we have described, simply means to leave the nation unorganised.

The country is in need of a statesman, yes ; but what kind of statesman? He must be a man thoroughly steeped in the gospel of Nationalism, with a clear and fearless recognition of the goal to which we are moving, with a dauntless courage to aim consciously, steadily, indomitably towards it, with a consummate

skill to mask his movements and aims when necessary and to move boldly and openly when necessary and, last but not least, with an overmastering magnetic power and tact to lead and use and combine men of all kinds and opinions. Such a leader might organise the nation to some purpose, but those who shrink from following where their hearts and intellects lead them or who form party feelings or personal dislike or jealously try to exclude powerful forces from the common national work cannot claim the name of statesman. It is an encouraging sign of the times that Surendranath is coming more and more into sympathy with thorough going Nationalism but will he have the courage and magnanimity to hold out his hand to the new men and if he does will he be able to retain the loyalty of his principal followers? If not, he will never be able to carry out the task he has declared to be the one and supreme need of the nation.

"BANDE MATARAM" PROSECUTION *September 25, 1907*

THE prosecution of the *Bande Mataram*, the most important of the numerous Press prosecutions recently instituted by the bureaucracy, commenced with a flourish of trumpets, eagerly watched by a hopeful Anglo-India Press, has ended in the most complete and dismal fiasco such as no Indian Government has ever had to experience before in a sedition case. The failure has not been the result of any lukewarmness or half-heartedness in the conduct of the prosecution or any unwillingness to convict on the part of the trying Magistate. The Police left no stone unturned to get a particular man convicted, the Standing Counsel did not hesitate to press every possible point and make the most of every stray scrap or faint shadow of evidence against the accused, the Magistrate was a Civilian Magistrate whose leanings have never been concealed, the same who gave two years to the *Yugantar* Printer, who sent Bepin Pal before a subservient Bengali Magistrate with a plain hint to give him a heavy punishment, who sentenced Sushil Kumar to fifteen stripes, who brushed aside the evidence of barristers in favour of Police testimony, and every paragraph of whose judgment in the present case shows that he would readily have dealt out a handsome term of hard labour if the evidence had afforded him the slightest justification for a conviction. All the winning cards in the game are in the hands of the bureaucracy in such a trial. They can command the best legal knowledge in the country, they have a detective and secret service system which for political purposes is popularly supposed to be second only in its elaborateness to the Russian, they have their own servants sitting on the bench to try a case in which they are deeply interested, there is no trouble about juries who might be unwilling to convict, the Police have unlimited powers of search and can even turn the Post Office into a branch of the detective department ; their methods of discovering witnesses are various and effective : yet with all this they were unable to bring forward a single scrap of convincing evidence to prove that the particular man they were bent on running down was the Editor. The Magistrate in his judgment and the affectionate Friend of India in Chowringhee in his comments have drawn from this failure the lesson that the laws against the freedom of the Press should be made more stringent An ordinary unilluminated intelligence would have come rather to the conclusion that the executive authorities would do well to reform their method of instituting proceedings in a political trial.

The one important lesson of the *Bande Mataram* Case is the light which it throws on the spirit in which the bureaucracy have been instituting the political prosecutions and persecutions which have laterly seemed to be their only reason of existence. This spirit has been exposed in a lurid and sensational manner in the Comilla case, when an innocent man with difficulty escaped the gallows to which a political prosecution had condemned him. But in the *Bande Mataram* Case also there has been a less sensational though sufficient exposure of the same sinister spirit. What has been the whole meaning and aim of this prosecution? Certainly not an honest impartial desire to vindicate outraged law and check without personal animus or any purely political aim a wanton tendency to disturb the public tranquillity, which would be the only excuse for a sedition prosecution. It has been an obvious attempt to crush a particular paper and a particular individual. The bureaucracy has sought to cripple or silence the *Bande Mataram* because it has been preaching with extraordinary success a political creed which was dangerous to the continuance of bureaucratic absolutism and was threatening to become a centre of strength round which many Nationalistic forces might gather.It has sought to single out and silence a particular individual because it chose to think that he was, as the Friend of India expresses it, the master mind behind the policy of the paper. If we are challenged to justify this assertion, it will be sufficient to point to the conduct of this case from its very inception. The *Bande Mataram* has been for over a year attacking without fear and without disguise the present system of Government and advocating a radical and revolutionary change. It has advocated that change on grounds of historical experience, the first principles of politics and the necessity of national self-preservation. It has not minced matters or sought to conceal revolutionary aspirations under the veil of moderate professions or ambiguous phraseology. It has not concealed its opinion that the bureaucracy cannot be expected to transform itself, that the people of India and not the people of England must save India, and that we cannot hope for any boons but must wrest what we desire by strong national combination from unwilling hands. Hundreds of articles have appeared in the paper in this vein and the bureaucrats had only to pick and choose. But they have not attacked one of these articles, nor did their counsel venture to cite even a single one of them to prove seditious intention. The fact is that, however dangerous such a propaganda may be to an absolutist handful desiring to perpetuate their irresponsible rule, no government pretending to call itself civilised can prosecute it as seditious without forfeiting all claim to the last vestige of the world's respect. But though the paper could not be characterised as seditious, it was highly inconvenient, and their was a growing clamour which extended even to the cloudy home of the Thunderer in London, for its prosecution and, if possible, suppression. And so watch is kept to find the paper tripping over some trifle, for which it can be hauled up and got into trouble on a side issue. What is the matter for which the *Bande Mataram* was prosecuted? A reprint of the official translations of certain articles from a vernacular paper, translations issued as part of a case in the law courts and reproduced as such,—that is the second and third; and there is no other. The *Yugantar* war prosecuted on articles expressing its essential policy; the *Sandhya* has been proceeded against on articles expressing its views on important matters; but it was sought to crush the *Bande Mataram* partly for a technical

offence and partly on a side issue. So eagerly, so carelessly is the casual chance given snatched at that the executive do not even trouble to know what is the article on which action is being taken; they give sanction to prosecute on an advertisement in the righthand corner of the paper, and but for the compassionate correction vouchsafed by an officer of the company the mistake would have had to be rectified in the course of the trial itself. Sanction is given to prosecute a nameless Editor and the Police at once proceed to ask for a warrant against Aurobindo Ghose. It is in evidence that they had nothing better to go on than hearsay. But they had no hesitation in immediately pouncing on one particular writer of the *Bande Mataram* without possessing the least scrap of evidence against him. Obviously they cannot have done this without instructions. It was popularly believed that Srijut Aurobindo Ghose was all in all on the *Bande Mataram* staff, that all the best articles were written by him, that he gave the tone of the paper and that it could not last without him. Why did the Police take a body-war-rant against Aurobindo Ghose to the office and why, having taken it, did they not arrest him? Obviously they took it because they thought that they would find plenty of evidence against him in the search, and they did not execute it because they found that not a scrap of proof rewarded their efforts. After that there was a pause till Anukul Mukherjee's testimony was secured, and on that flimsy evidence the trial was started. Had it been honestly intended to deal only with the Editor, whoever he might turn out to be, the proceedings against Aurobindo Ghose would have been given up, but the Police made no secret of the fact that it was this one man who was wanted and that no other, whatever the evidence against him, would be thought worth capture. Even when the case for the prosecution was complete without any evidence fit to raise more than a flimsy presumption, the Standing Counsel would not give up, but in an outrageous address in which he rode roughshod over the higher traditions of his office, pressed weak points and wrested ambiguous evidence to get the charge framed. And after Anukul had broken down in cross-examination and made admissions fatal to their case, still the prosecution struggled for a verdict. And with what result? Even a Civilian Magistrate willing to support the prestige of the Government had more sense of law and justice than the bureaucracy and its advisers and was able to see that a man could not be sent to two years rigorous imprisonment without any shadow of evidence. Their prey escaped them; the Manager who seems to have been arrested on spec and tried without even any pretence that there was any evidence against him was acquitted, and only an unfortunate Printer who knew no English and had no notion what all the pother was about, was sent to prison for a few months to vindicate the much-damaged majesty of the almighty bureaucracy.

THE FUTURE OF THE MOVEMENT *February 19, 1908*

When a great peoplé rises from the dust, what *mantra* is the *sanjivani mantra* or what power is the resurrecting force of its resurgence? In India there are two great *mantras*, the *mantra* of "Bande Mataram" which is the public and universal cry of awakened love of Motherland, and there is another more secret and mystic which is not yet revealed. The *mantra* of "Bande Mataram" is a *mantra* once before given to the world by the Sannyasins of the Vindhya hills. It was lost by the treachery of our own countrymen because the nation was not then ripe for

resurgence and a premature awakening would have brought about a speedy downfall. But when in the great earthquake of 1897 there was a voice heard by the Sannyasins, and they were conscious of the decree of God that India should rise again, the *mantra* was again revealed to the world. It was echoed in the hearts of the people, and when the cry had ripened in silence in a few great hearts, the whole nation became conscious of the revelation. Who imagined when the people of Bengal rose in 1905 against the Partition that that was the beginning of a great upheaval? It is a passing tempest, said the wise men of England, let it go over our heads and we will wait. But the tempest did not pass, nor the thunders cease. So there was a reconsideration of policy and the wise men said,--"The people of Bengal are easily cowed down, and we will try whether force cannot do what patience has failed to do". When Sir Bampfylde Fuller met Lord Curzon at Agra, this was the policy agreed on between them—to hammer the Bengalis into quietude. But Sir Bampfylde Fuller has gone and the movement remains. Hare too will go, and many will go, but the movement will reamain. The regulation lathi, the Police truncheon, the threat of the Goorkha rifle are as straws in the wind before the Divine breath of God. Human power is mere weakness when measured with the will of the Eternal. So the movement will continue. It is now time to look deeper into it and know its fountain sources. So long we were content with the superficial aspects, but the time has come for God to reveal Himself, and the powers of the world to look on in amazement at His wonderful workings. When we left Pabna we knew that He was at work to unite the Bengali race. We hope yet to see that He is at work to unite the Indian people. When the Convention Committee meets at Allahabad, it will be seen whether it is His will to unite the parties into a single whole or to separate them from each other, so that the work of salvation may be hastened by the energy of the Nationalist Party being separated from the steadiness of the Moderates. Whatever may hapen, it is His will. We look forward to the Easter meeting for light on what He intends. If the Moderate leaders of Bengal are wise, they will realise that Bengal at least is destined to become predominatingly Nationalist, that it is her mission to lead and force the rest of India to follow. Whoever tries to prevent her from fulfilling that mission, is setting himself against the decrees of God and will be blown away like stubble before the tempest.

TOMORROW'S MEETING *March 27, 1908*

The great opportunity of Srijut Bepin Chandra Pal's return has been utilised for a demonstration such as Calcutta has not yet witnessed, but the occasion will not be perfect unless the public complete their homage to the soul of Nationalism by coming in their thousands to hear him at the Federation Hall Ground on Saturday when the congratulations of the country will be given to him on his return to the great work he has yet to accomplish. He has returned with a double strength, a position of impregnable security in the hearts of his countrymen and a new conception of his work which is precisely what is needed for its fulfilment. On Saturday we expect to hear his first deliberate utterance after his imprisonment. As a leader of the Nationalist Party, he has spoken before, but he will speak now as a voice of prophecy, a thinker whose thoughts do not proceed from himself but are guided from within.

Tomorrow the life of Nationalism will resume its mighty current. Since Bepin Chandra went to prison, it has been half deprived of its old impetuous flow, wandering amid shoals and quicksands, distracted by cross-currents, uncertain whither its course was bound. The constant inspiration of his thoughts was wanting, the impetus of his presence ceased to move the springs of Nationalist endeavour. Tomorrow he resumes his place at the post of honour, the standard-bearer of the cause, the great voice of its heart, the beacon-light of its enthusiasm. We were in a semi-darkness while that light was absent, uncertain and bewildered as to our course while that voice was silent and the standard was held by weaker hands, the post of honour filled by untried champions.

When the Federation Hall Ground is filled and overflowing tomorrow, we shall realise how great was the loss of his presence, how weak we were in the absence of the man with a mission; for each of the men who stand before the country today has a work set for him to do and which he alone can do aright. It is the mission of Bepin Chandra to lead the thought of the movement, to inspire it with his utterances, to keep the fire of its enthusiasm burning, while others carry out the detail work, education, propaganda, Swadeshi, arbitration, self-defence or whatever other things may be given to their hands to do. From Bengal the ideas of the new age must proceed, from Bengal must come the life of the movement, its high sense of principle, its fearless courage, its broadness of view and keenness of vision. From Bengal the stream must flow, which will cleanse India of her impurities. If the work is to be well done, each man must recognise his proper work and do it. The clash of conflicting egoisms, the desire to monopolise, the pride of success must disappear from our midst, and be replaced by our intense self-effacement, an enthusiasm of sacrifice, an exalted conception of the high Power at work and the constant sense that we are only His instruments. It is for this reason that we have recently laid stress on this great truth; no advance can be made, no mighty success obtained unless we are able to perceive the divinity of the movement, realise the necessity of subordinating ourselves, overcome the tendency to break into cliques and cabals and apportion to each his allotted portion in the one united work. If anyone tries to outstep his sphere and appropriate the work of others, there will be confusion, disturbance of harmony and temporary failure. The only way to avoid it is for all to realise that the work is not theirs, that their right is only to a portion, that no man is indispensable and only so long as he acts within his own province and on the lines laid down for him by his capacities, his inspiration and his circumstances, is he even useful. This harmony is necessary for the rapid progress of the movement. If each man knows his place and keeps to it, the harmony is possible. All the discords, the quarrels, the failures which have marred our work have been due to the desire of leadership, the obstinacy of prepossessions, the arrogance of egoism which wishes to claim the ownership of God's work.

Bepin chandra's place has been marked out for him by his powers of oratory, his knowledge of politics, his enthusiasm and unconquerable vitality of hope and confidence, his unequalled power to excite and inspire. The awakening of Madras is the sign-manual of the almighty upon his mission. He has only to be true to himself and the cause to complete that stupendous beginning and send the same stream of life beating through the atrophied veins of all India, till one unanimous

voice, one tremendous impulse works from the Himalayas to Cape Comorin, from Assam to Bombay and the whole country, molten into a burning mass of enthusiasm, is finally fused in one and ready to be hardened into steel of perfect temper, beaten into shape and fined to perfect sharpness by the workmanship divine, so that it may be a weapon in the hands of the Most High to slay ignorance and barbarism throughout the world.

NEW CONDITIONS *April 29, 1908*

A great deal of the work done by us during the last three years has been of a purely preparatory character. The preparation of the national mind was the first necessity. All that the old schools of politics did was to prepare the way for the new thought by giving a full trial to the delusions that then possessed the people and demonstrating their complete futility. Since the awakening of the nation to the misdirection of its energies a fresh delusion has taken possession for a time of the national mind, and this is the idea that a great revolution can be worked out without the sacrifices of which history tells in the case of other nations. There is a general shrinking from the full danger of the struggle, a wish to try by how few sacrifices the work can be accomplished and at how cheap a cost the priceless boon of liberty can be purchased. This reluctance to enter on the real struggle was a necessary and salutary stage of the movement, because the nation, after the long pauperisation of its energies and enervation of its character by a hundred years of dependence and mendicancy, would have been unequal to the sacrifices the real struggle demands. A fresh stage is at hand in which this reluctance can no longer be indulged. A nation cannot afford to haggle with Providence or to buy liberty in the cheapest market from the Dispenser of human fate. The sooner the struggle now commences, the sooner the fate of India is fought out between the forces of progress and reaction, the better for India and for the world. Delay will only waste our strength and give opportunities to the enemy. A band of men is needed who can give up everything for their country, whose sole thought and occupation shall be the stimulation of the movement by whatever means the moment suggests or opportunity allows. If such a band can be got together, then only will real work as distinct from the work of preparation be possible ; for the salvation of a country cannot be the work of our leisure moments, the product of our superfluous energy or the result of a selfish life in which the country comes in only for the leavings. Devoted servants of India are needed who will ask for no reward, no ease, no superfluities, but only their bare maintenance and a roof over their heads to enable them to work for her. This attitude of utter self-abandonment is the first condition of success. *Sannyāsa,* utter and inexorable, *tyāga,* unreserved and pitiless, *mumuksutva,* burning and insatiable, must be the stamp of the true servant of India. Academical knowledge, power of debate, laborious study of problems, the habit of ease and luxury at home and slow and tentative work abroad, the attitude of patience and leisurely self preparation are not for this era or for this country. An immense and incalculable revolution is at hand and its instruments must be themselves immense in their aspiration, uncalculating in their self-immolation. A sacrifice of which the mightiest *yajña* of old can only be a feeble type and far-off shadow, has to be instituted and the victims of that sacrifice are ourselves, our lives, our property,

our hopes, our ambitions, all that is personal and not of God, all that is devoted to our own service and taken from the service of the country. The greatest must fall as victims before the God of the sacrifice is satisfied. Whoever is afraid for himself, afraid for his property, afraid for his kith and kin, afraid for his vanity, self-interest, glory, ease or liberty, had better stand aside from the sacrifice, for at any time the call may come to him to lay down all these upon the altar. If he then refuses, his fate will be worse than that of the fugitive who prefers safety to the struggle, for he will be a recusant doomed to suffer without reward and fall without glory.

The times are thickening already with the shadow of a great darkness. The destruction of the Congress, begun at Surat and accomplished at Allahabad, is the prelude for the outburst of the storm that has long been brewing. Great issues were involved in that historic struggle at Surat of which none of the actors were aware. Only posterity looking back with awe on the sequel, will date the commencement of the real world-shaking earthquake from that slight ruffling of the untroubled surface of the soil. The forces that sent that slight quiver of the earth to the surface are hidden as yet from the eye of contemporary politics or only dimly guessed by a few, but within a brief period they will have declared themselves to the amazement of those who thought that they were only playing a clever tactical game with the lifeless figures of a puppet show. The grim forces that have been moving under the surface will now find the field open to them by the shattering of the keystone of the old political edifice. The efforts of the two parties to replace the Congress by new bodies of a party character are not likely to prosper, for the Moderate Convention will fade into nothingness by its inherent want of vitality, while the Congress of the Nationalists, whatever its destiny, will not be the old Congress but a new and incalculable force, the product of a revolution and perhaps its plaything. The disappearance of the old Congress announces the end of the preparatory stage of the movement, the beginning of a clash of forces whose first full shock will produce chaos. The fair hopes of an orderly and peaceful evolution of self-government, which the first energies of the new movement had fostered, are gone for ever. Revolution, bare and grim,is preparing her battle-field, moving down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new-creation. We could have wished it otherwise, but God's will be done

রাখীসঙ্গীত

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক
পুণ্য হউক হে ভগবান —

বাংলার ঘর বাংলার হাট
বাংলার বন বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক
পূর্ণ হউক হে ভগবান —

বাঙালীর পণ বাঙালীর আশা,
বাঙালীর কাজ বাঙালীর ভাষা,
সত্য হউক সত্য হউক
সত্য হউক হে ভগবান —

বাঙালীর মন বাঙালীর প্রাণ
বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোন
এক হউক এক হউক
এক হউক হে ভগবান।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের স্বরাজনীতি

কলকাতার ১৯৩ কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (বর্তমান বিধান সরণি) থেকে প্রকাশিত হত *'স্বরাজ'* সাপ্তাহিক পত্রিকা এই ঠিকানা থেকেই প্রকাশিত হত *'সন্ধ্যা'*। *'স্বরাজ'* পত্রিকার কর্মকর্তা ছিলেন সারদাচরণ সেন। প্রতি সংখ্যার দাম ছিল এক আনা।

রাজা ও প্রজার সম্বন্ধে রাজনীতির উদ্ভব : রাজা না থাকিলে রাজনীতি থাকিতে পারে না। আমাদের এখন কোন রাজা নাই। তাই আমাদের রাজনীতিও নাই। কেন—ইংরেজ ত আমাদের রাজা। যাহারা অজ্ঞান তাহারাই ইংরেজকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে। যথাবিধি অভিষিক্ত না হইলে হিন্দুস্থানে কেহ কখনও রাজা বলিয়া স্বীকৃত হয় নাই। এই রূপই যদি হয় ত — দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা এই প্রবচনের অর্থ কি। ব্রাহ্মণরাও ঐ কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

অজ্ঞানের পক্ষে দিল্লিশ্বর ভারতের ঈশ্বর ছিলেন বটে—কিন্তু জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ প্রমুখ প্রজাবর্গ দিল্লিশ্বরকে রাজা বলিয়া কখনই অঙ্গীকার করেন নাই। বা শব্দের অর্থ হয় না। দিল্লিশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলিলে বুঝায়—হয় দিল্লিশ্বর—নয় জগদীশ্বর। এই দুইটি বস্তু এক হইতে পারে না। যদি দিল্লিশ্বরকে গ্রহণ কর ত জগদীশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে—আর যদি জগদীশ্বরকে গ্রহণ কর ত দিল্লিশ্বরকে বর্জন করিতে হইবে। দিল্লিশ্বর যদি ভারতেশ্বর বলিয়া অঙ্গীকৃত হইতেন তাহা হইলে মোগল শাসনের দুই শত বৎসর না যাইতে যাইতেই শিবাজী মহারাজ স্বরাজের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না।

এইরূপ যদি স্বীকার করা যায় ত ভেদবাদ আসিয়া পড়ে না কি! ভগবল্লীলার ভঙ্গদোষ আসে না কি! না।

যখন কর্মদোষে সমাজ দুষ্ট হয়—যখন ভোগৈশ্বর্যে প্রজাকুল অবসন্ন হইয়া পড়ে তখন রাজশ্রী অন্তর্হিত হন—ভগবানের অংশে আর প্রজারঞ্জন রাজা গঠিত হন না। তথাপি ঈশ্বরের লীলা প্রকাশের বিঘ্ন ঘটে না। ঈশ্বর তখন রাজা না হইয়া শাসনকর্তার রূপ ধরিয়া প্রকট হন—চামর ছাড়িয়া কেবল দণ্ড লইয়া কর্মদোষ দুষ্ট সমাজকে শাসন করেন—পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবার অবসর দেন। ঐ দুঃসময়ে শাস্তা থাকে দণ্ডদাতা থাকে কিন্তু দয়াদাক্ষিণ্যময়ী রাজলক্ষ্মী মায়ের লুক্কায়িত শ্রীচরণপল্লবে আবৃত থাকেন—বাহিরে কেবল অসি ঝক্ ঝক্ করে—লোলজিহ্বা লক্‌লক্ করে — মুণ্ডমালা ঝলমল করে! যদি তুমি কালীঘাটে যাও ত মায়ের এই মূর্তি দেখিতে পাইবে। মা—তাঁর লুকানো রাঙা চরণে স্বরাজশ্রী ঢাকিয়া রাখিয়াছেন—কালী-করালী রূপে বিরাজ করিতেছেন। সকল সময়ে সকল অবস্থাতে ঠাকুরের লীলা স্বীকার করিতে হইবে। কখনও তিনি প্রজাপালক রাজরাজেশ্বর—কখনও বা দণ্ডদায়ক চণ্ডেশ্বর।

আমরা তাঁহার লীলারঙ্গ বুঝিয়া — যেন তাঁহাকে স্বীকার করি। যদি তিনি তস্কররূপে আমার গৃহে লীলা করিতে আসেন ত আমি তস্কররূপেই তাঁহাকে গ্রহণ করিব—উদ্ধারকর্তা বলিয়া স্বীকাব করিব না—আর তাঁহার পূজার জন্য চপেটাঘাত ও তাড়নলীলার প্রকৃষ্ট আয়োজন করিব। সেইরূপ শাসনকর্তাকে অভিষিক্ত রাজা বলিয়া গ্রহণ করিও না। দিল্লিশ্বর রাজরাজেশ্বর নহেন—কেবল কর্মদোষের শাস্তি বিধান করিতে দণ্ডধর হইয়াছিলেন। দিল্লিশ্বর রাজা বলিয়া কখনই গৃহীত হন নাই—তাই ত স্বরাজ-মহারাষ্ট্রের অত শীঘ্র উদ্ভাবন হইয়াছিল।

ইংরেজ শাসনকে আমরা ঠিক ঐ ভাবে গ্রহণ করি। ইংরেজকে আমরা রাজা বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারি না—স্বীকার করিলে ধর্ম হানি হইবে। ইংরেজ যথাবিধি অভিষিক্ত রাজা নহে—রঞ্জন গুণের সমাবেশ উহার হৃদয়ে নাই—হইতেও পারে না। শাসন করিতে — দণ্ড দিতে কর্মদোষের প্রায়শ্চিত্ত করাইতেই বিধাতা ইংরেজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন।

জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখ—বুঝিতে পারিবে যে ইংরেজ তোমার রাজা নহে। যত তোমার এই বোধ গভীর হইবে ঘন হইবে—তত স্বরাজ প্রতিষ্ঠার সময় নিকটবর্তী হইবে।

এতদিন আমরা মোহমুগ্ধ ছিলাম—মনে করিতাম যে ইংরেজ আমাদের রাজা আমাদের উদ্ধার সাধন করিতে উহারা আসিয়াছে। এখন কিন্তু মোহ ঘুচিয়াছে—বুঝিতে পারিয়াছি যে ফিরিঙ্গি ইংরেজ শাসন দণ্ডের তীব্রতায় আমাদের উদ্বুদ্ধ করিতে—কর্মগত পাপের প্রায়শ্চিত্ত-বিধানে উন্মুক্ত করিতে—এই পুণ্য ভূমি ভারতে প্রবেশ করিয়াছে।

এস—এই গূঢ় ভাবে ভাবিত হইয়া আমরা স্বরাজের উদ্ভাবনা করিতে যত্ন করি। স্থানে স্থানে স্বদেশি আবাস স্বদেশি আস্থান প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তথায় আমাদের শিক্ষাদীক্ষা আমাদের শাসনতন্ত্র আমাদের বিধিব্যবস্থা আমাদের বাণিজ্য ব্যাপার চলিবে। আমাদের প্রহরী পাহারা সেই স্বরাজ-আবাস সকলকে রক্ষা করিবে। ইংরেজের শাসনদণ্ড অতিক্রম না করিয়া আমরা সেই পুণ্য আস্থানে স্বরাজ নীতি পালন করিব—ফিরিঙ্গি সংশ্রব দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিব। সেখানে ফিরিঙ্গি ও ফিরিঙ্গিয়ানাকে আসিতে দিব না— যদি আসে ত ঐ স্বরাজ গড়ের নাচদুয়ারে স্থান পাইবে।

ভগবান করুন যেন এই স্বরাজনীতি পালনে কোন বিঘ্ন না ঘটে। কিন্তু যদি কেহ বিঘ্ন ঘটায় ত বিঘ্ননাশিনী শক্তি জাগিয়া উঠিবে—মায়ের অসি ঝলসিবে—তাণ্ডব রণনৃত্যে স্বরাজ-আবাস মাতিয়া উঠিবে। মাগো—কবে তোর লুকানো চরণকমল দেখা যাইবে—আর সেই রাঙা চরণের জ্যোতিতে স্বরাজশ্রী ঝলসিয়া উঠিবে।

●

সুরেনবাবু অভ্যর্থনার জন্য একশত স্বদেশি ভলান্টিয়ার টাঙ্গাইল হইতে কূচ করিয়া সিরাজগঞ্জে আসিয়াছিল। ব্রিগেডিয়ার মেজর দত্ত ঐ দলের অধিনায়ক ছিলেন। ভলান্টিয়ারদের হাতে ভীষণ শক্তিশেল লাঠি ছিল। পুলিশ ত ভয়ে সারা। তাই লাঠি ছাড়াইয়া কাগজের ধ্বজা তাদের হাতে দেওয়া হয়। তখন রক্ষা। নহিলে ফিরিঙ্গি রাজ্য বোধ হয় পদ্মায় ভাসিয়া যাইত।

●

বরিশালের জ্যাক সাহেবের বিরুদ্ধে দেওয়ানি মামলা চলিতেছে। অশ্বিনীবাবু এক স্বদেশি ইস্তাহার বাহির করেন। জ্যাক সাহেব ঐ ইস্তাহারকে বিদ্রোহী বলিয়া ঘোষণা করেন। তাই অশ্বিনীবাবু জ্যাক সাহেবের নামে ১০০০০৲ টাকা খেসারতের দাবী দিয়া নালিশ করিয়াছে। যদি প্রমাণ হয় যে অশ্বিনীবাবু রাজদ্রোহী তাহা হইলেই মঙ্গল—একটা খুব ঘটা পড়িয়া যাইবে। উহা দশহাজার টাকার অপেক্ষা অনেক বেশি।

●

মথুরায় স্বদেশি

সেদিন মথুরা শহরে একটি বিরাট স্বদেশির সভা হইয়া গিয়াছে। সভায় অনেক হিন্দু ও মুসলমান যোগ দিয়াছে। বৃন্দাবনের শ্রীযুত রাধাচরণ গোস্বামী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। দিল্লির স্বদেশি প্রচারক শ্রীযুত মৌলবি সৈয়দ হায়িদার রাজা বক্তৃতা করিয়াছেন। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছিল। অনেক সওদাগর স্বদেশি ব্যবসায় খুলিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। মথুরা নগরীতেও জন্মভূমির সেবার জন্য হিন্দু মুসলমান একসঙ্গে কার্যক্ষেত্রে নামিয়াছেন।

●

বরিশালে বিপিনচন্দ্র

১ মার্চ তারিখ অপরাহ্ণ ৫ টার সময়ে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও ভোলা হইতে বরিশালে আসিয়াছিলেন। জনসাধারণ তাহাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বিরাজমোহন রায়চৌধুরী মহাশয় বিপিনবাবু ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাওকে লইয়া চকবাজারের পথে রাজা বাহাদুরের হাভেলিতে গমন করেন। বরিশালবাসিগণের পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাশগুপ্ত উকিল মহাশয় অতিথিদ্বয়কে সম্ভাষণ করেন।

ভোলার পত্র

ভোলার অধিবাসিগণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, মাদ্রাজ হইতে আগত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণরাও সহ গত ১৫ ফাল্গুন সন্ধ্যার সময় নোয়াখালি স্টিমারে উঠিয়া বেলা ৩টার সময় ইলশা স্টেশনে অবতরণ করেন। ঐ স্টেশন ভোলা মহকুমা হইতে ৭ মাইল দূর। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকেরা ঐ সাত মাইল পথ অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে গিয়াছিল। স্টিমার স্টেশনে বহু লোকের সমাবেশ হইয়াছিল। স্টিমার স্টেশন হইতে বহু দূরে থাকিতেই সমবেত লোকমণ্ডলী হইতে মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম ধ্বনি হইতেছিল। স্টিমার হইতে অবতরণ করিয়াই দেখিলাম স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বরহানদ্দীন চৌধুরীর দৌহিত্র স্বেচ্ছাসেবক শ্রীমান এলাহিবক্স শ্রেণীবদ্ধ স্বেচ্ছাসেবক দলের অগ্রভাগে অশ্বারোহণে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তাহার সম্মুখে দুইজন স্বেচ্ছাসেবকের হস্তে বৃহদাকরের লাল পতাকা। পতাকায় বড় বড় অক্ষরে লিখা রহিয়াছে **স্বাবলম্বন, স্বরাজ, বহিষ্করণ**। মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ রাও, স্টিমার হইতে অবতরণ করিলে স্থানীয় লোকেরা তাঁহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করেন। তাহাদের মহকুমায় পৌছান জন্য পূর্বেই নৌকার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। তিনি নৌকায় আরোহণ করিলে স্বেচ্ছাসেবকেরা সদলে মহকুমার দিকে চলিয়া গেল—কেবল জনকয়েক স্বেচ্ছাসেবকমাত্র তাঁহাদের সঙ্গে ছিল। মহকুমা হইতে দেড় মাইল দূরে বহুসংখ্যক লোক পাল মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। স্থানীয় বৃদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ কর, ভোলার লবণের মোকদ্দমায় রাজপুরুষ কর্তৃক লাঞ্ছিত উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতি অন্যান্য অনেক উকিল এবং স্থানীয় স্কুলের হেডপণ্ডিত, স্বদেশির একজন প্রধান উদ্যোগী শ্রীযুক্ত রামশরণ কাব্যতীর্থ প্রমুখ অনেক গণ্যমান্য লোক এবং বহু সংখ্যক স্থানীয় মুসলমান ভদ্রলোক এবং কৃষক তথায় উপস্থিত থাকিয়া গগনভেদী বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত করিয়াছিল। বিপিনবাবু তাঁহার সঙ্গীগণসহ সেখানে নৌকা হইতে অবতরণ করেন এবং সকলের সঙ্গে ঐ দেড় মাইল পথ হাঁটিয়া সভাস্থলে পৌছান। তিনি যখন রাস্তা দিয়া কতকদূর অগ্রসর হইলেন তখন গৃহস্থের মেয়েরা উলুধ্বনি করিয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়াছিল। পথিমধ্যে ক্রমেই চতুর্দিক হইতে লোকদল আসিয়া তাঁহাদের সঙ্গে

মিলিত হইয়াছিল। ভোলার লবণের মোকদ্দমায় লাঞ্ছিত অন্যতম উকিল শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র দাস পথিমধ্যে বহুসংখ্যক লোক সহ পালমহাশয়কে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইয়া লোকসমুদ্রে মিশ্রিত হইয়াছিলেন। পাল মহাশয় যখন যে রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন কোথাও বাজারের স্ত্রীলোকেরা উলুধ্বনিতে,কোথাও দোকানদার ও অন্যান্য অধিবাসিরা বন্দেমাতরম্ ধ্বনিতে, মুসলমান ভদ্রলোক ও কৃষকগণ "বন্দেমাতরম্ ও আলাহো আকবর" ধ্বনি করিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় নেতারা বার লাইব্রেরীর গৃহে পাল মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছিলেন। কিন্তু লোকসংখ্যা এত অধিক হইয়াছিল যে তাহারা স্থান পরিবর্তন করিয়া স্থানীয় উকিল শ্রীযুক্ত রজনীনাথ কর মহাশয়ের প্রাঙ্গণে সভাস্থান নির্দিষ্ট করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সমস্ত ভোলার অধিবাসী চারিসহস্রের অধিক হইবে না, কিন্তু পাল মহাশয়কে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দুই সহস্রের ও অধিক লোক সমবেত হইয়াছিল। ঐ স্থানে পূর্বেই মাতৃপূজার বন্দোবস্ত হইয়াছিল। গত পরস্ব এখানে মাতৃপূজা হইয়াছে। ঐ মাতৃপূজার স্থানে সিংহদরজা প্রস্তুত হইয়াছে। সিংহদরজায় দেখিলাম লেখা রহিয়াছে "**স্বাবলম্বন, স্বরাজ, বহিষ্করণ**"। পালমহাশয় সিংহদরজায় উপস্থিত হইলেই উপর হইতে নহবত বাজিয়া উঠিল। সভাস্থলে দুই সহস্রের অধিক লোক "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে, গৃহ মধ্যে মহিলাগণ উলুধ্বনিতে তাঁহার অভ্যর্থনা করেন। অতঃপর পাল মহাশয় প্রাণ উন্মাদিনী বক্তৃতায় সভাস্থ জনমণ্ডলীকে উৎসাহিত করিয়াছেন। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বরাহনদ্দীন চৌধুরীর বাড়িতে তাঁহার বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। অদ্য প্রাতে তিনি মহিলাদিগকে সম্বোধন করিয়া প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছেন। মহিলাদের পক্ষ হইতে একজন বৃদ্ধা পাল মহাশয় ও কৃষ্ণরাওকে ধান্যদূর্বা ও চন্দনের তিলক দ্বারা আশীর্বাদ করেন। অদ্য বৈকালে ৪টার সময় স্বরাজ সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন।



গত ২৭ মাঘ শনিবার বিক্রমপুরের অন্তর্গত কালীবাড়িতে এক বিরাট সামাজিক সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভায় মালখানগর, ইছাপুরা, জৈনসার মধ্যপাড়া, পারলদিয়া, বয়রাগাদি, রায়পুর, ফুল্লশাশী প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় ২০ খানা গ্রামের বহু অধিবাসী উপস্থিত ছিলেন। সর্বসম্মতিক্রমে মধ্যপাড়ানিবাসী পণ্ডিতকুলাগ্রগণ্য শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ শিরোমণি মহাশয় সভাপতিপদে বৃত হন। সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কয়েকজন যোগ্যবক্তা হৃদয়গ্রাহিণী বক্তৃতা করিলে পর, সামাজিক কার্যপ্রণালী নির্ধারণপূর্বক সভাপতি কর্তৃক এক প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিত হইয়া সর্বসমক্ষে উহা পঠিত হয়। সভায় উপরোক্ত ২০ খানা গ্রামের মধ্যে অধিকাংশ গ্রামেরই মাননীয় ব্যক্তিগণ, সমাজের নেতৃবৃন্দ, ডাক্তার, কবিরাজ, এবং সমাজের প্রধান অবলম্বন পুরোহিত সকল এবং ধোপা ও নাপিতগণ উপস্থিত ছিলেন। ইহারা সকলেই সাগ্রহে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, "আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারিগণ শ্রী শ্রী কালীমাতা ও শ্রীশ্রী নারায়ণচন্দ্রের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমরা জ্ঞানতঃ নূতন বিদেশি কাপড় বিলাতি লবণ ও চিনি ব্যবহার করিব না, অথবা কেহ দিলেও তাহা গ্রহণ করিব না। যদি ব্যবহার বা গ্রহণ করি, তবে প্রতিজ্ঞাভ্রংশজনিত পাপ ও সামাজিক দণ্ডের অধীন হইব। যিনি এই সকল বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন আমরা সর্বপ্রকারে তাঁহার সংস্রব পরিত্যাগ করিব। আমরা নৈতিক এবং স্বদেশের উন্নতির জনাও সাধ্যানুসারে যত্নবান থাকিব।"—ঢাকা প্রকাশ।

কিশোরগঞ্জে স্বদেশিসভা

গত বৃহস্পতিবারে কিশোরগঞ্জে একটা বিরাট স্বদেশি সভার অধিবেশন হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শশিকুমার চৌধুরী মহাশয় সভাপতি ছিলেন। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মোতাহের হোসেনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ পঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক ও সত্বাধিকারী মহাশয়দিগকে সহানুভূতি জানান হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় একটি

প্রাণস্পর্শী বক্তৃতা করিয়াছেন। তিনি লাহোরের জেল কর্তৃপক্ষদের ইচ্ছাকৃত জঘন্য দুর্ব্যবহারের কথা বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র নন্দী মহাশয় বলেন যে এখন সমস্ত ভারতেই অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছে। কর্তৃপক্ষ এক এক জনকে জেলে না পুরিয়া ভারতের চারিদিকে প্রস্তরের প্রাচীর নির্মাণ করিয়া ভারতবর্ষটাকে একটা জেলে পরিণত করুন, তাহাদের অনেক ঝঞ্ঝাট কমিয়া যাইবে।

ঢাকা জিলা সমিতি

২৩ ফেব্রুয়ারি শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায় মহাশয়ের ভবনে ঢাকা জেলার নানা স্থানের প্রতিনিধিগণের এক সভা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ বসু মহাশয় সভাপতি ছিলেন। প্রাতে ৮টা হইতে ১১টা এবং অপরাহ্নে ৪টা হইতে ৭টা দুইটি বৈঠক বসে। প্রত্যেক মহকুমা ও বড় বড় গ্রাম হইতেই প্রতিনিধি আসিয়াছিলেন। **মুসলমানের সংখ্যাও বেশ হইয়াছিল। নবাব পরিবারের প্রধান প্রধান ব্যক্তি এইসভায় উপস্থিত ছিলেন।** জিলা সমিতি ও উহার কয়েকটি প্রধান প্রধান শাখা সমিতি গঠন করা হইয়াছে। জাতীয় মহাসমিতির সকল প্রস্তাব কার্যে পরিণত করিবার জন্য এই সমিতিগুলি চেষ্টা করিবেন।

মজিলপুর-জয়নগর হিতৈষিণী সভা
স্বদেশি কৃষি ও শিল্প প্রদর্শনী
৩ চৈত্র রবিবার, ১৩১৩ সাল

এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে আগামী ১৫ হইতে ১৭ চৈত্র (২৯-৩১ মার্চ) এই মেলা হইবে। স্বদেশি উৎকৃষ্ট কৃষিজাত ও শিল্পজাত দ্রব্য সকল প্রদর্শিত হইবে এবং সর্বোৎকৃষ্ট প্রদর্শন জন্য পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। এ বিষয়ে সর্বসাধারণে সহায়তা করেন এই প্রার্থনা। যাহারা নিজে প্রদর্শন করিতে না পারেন, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর নিকট শিল্পাদি প্রেরণ করিলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে এবং জ্ঞাতব্য সকল বিষয় অবগত করা যাইবে। প্রদর্শনীর মহিলা-শিল্প-বিভাগের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইতেছে। অশ্রুকণার কবি শ্রীমতী গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী এবং শ্রীমতী বসন্তবালা হোম এই বিভাগের সম্পাদিকা মহিলাগণ রচিত শিল্প ইহাদিগের নামে ১নং ডফ লেন কলিকাতা ঠিকানায় প্রেরিত হইলে কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত ও প্রদর্শিত হইবে। প্রদর্শনান্তে দ্রব্য সকল যথাস্থানে প্রেরিত হইবে।

শ্রী উমেশচন্দ্র দত্ত—সভাপতি
শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ দত্ত—সম্পাদক
মজিলপুর ; জেলা-২৪ পরগণা - ১৩/৩/০৭



কুমিল্লার হিন্দু-মুসলমানে গোলমাল মিটিয়া গিয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ের নেতারা সরকার পক্ষের কোন সাহায্য না লইয়া আপনারাই সব মিটাইয়া ফেলিয়াছেন। সরকারি তারেও ইহা প্রকাশ করিতেছে। গত ১১ তারিখে ঢাকা হইতে সরকারি তারে জানান হইয়াছে—"হিন্দু ও মুসলমানেরা অদ্য প্রাতে সমবেত হইয়া বন্ধুভাবে সব মিটাইয়া ফেলিয়াছেন। ভবিষ্যতে রাস্তায় আর কোন হাঙ্গামা না ঘটে তাঁহারা ইহারও সুবন্দোবস্ত করিবেন। অনেকদিন ধরিয়া দিবা রাত্রে কোন অশান্তি দেখা যায় না।"

●

কুমিল্লার কথা

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা ঢাকায় ফিরিয়া গিয়াছেন—কুমিল্লায় আর হল্লা নাই; কিন্তু যাহা হইয়া গিয়াছে তাহারই জের চলিতেছে—এখন কেবল কোলাহল। কমিশনার লুজন এবং একজন মুসলমান ডিপুটি ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতেছেন।

সরকার পক্ষ হইতে যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহা লইয়া বিশেষ আন্দোলন চলিতেছে। সরকারি রিপোর্টে প্রকাশ, **নবাব সলিমুল্লা কুমিল্লায় স্বদেশিসভার পালটা সভা করিতে গিয়াছিলেন। এমন সময়ে পালটা সভা করিবার জন্য নবাবকে কুমিল্লায় যাইতে অনুমতি দেওয়া সরকারের সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে**। কুমিল্লায় যে এই শোচনীয় গোলযোগ হইল, হিন্দু-মুসলমানে যে এই সংঘর্ষ হইল, তাহার জন্য সরকারই দায়ী।

স্বদেশি সভা হইয়াছিল, কিন্তু তাহার জন্য হিন্দু-মুসলমানে কোন বিবাদ হয় নাই, কোন প্রকার মনোমালিন্য হয় নাই। এই যে ব্যাপার হইয়া গেল, ইহাতে কুমিল্লার সম্ভ্রান্ত হিন্দু-মুসলমানগণ বিশেষ দুঃখিত। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ যে কোন প্রকারেই প্রার্থনীয় নহে, তাহা কুমিল্লার হিন্দু-মুসলমান সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। তবে এমন হইল কেন?

হইল সরকারের অবিবেচনায়। নবাব সলিমুল্লার লোকেরা একটা গোলমাল বাধাইতেই আসিয়াছিল। নবাব আসিলেন, লোকজন লইয়া শহরের অনেক রাস্তা ঘুরিলেন। তাহারা যখন বাজারের মধ্যে যোগীরাম পালের দোকানের সম্মুখে উপস্থিত, সেই সময়ে যোগীরামের হিন্দুস্থানী চাকর ঘর ঝাঁট দিতেছিল; সে রাস্তায় লোকজন দেখিয়া ঝাঁটা হাতে করিয়াই হা করিয়া তামাশা দেখিতেছিল। নবাবের লোকেরা মনে করিল; লোকটা নবাবকে অপমান করিবার জন্য ঝাঁটা দেখাইতেছিল। তারপর রব উঠিল যে, কে যেন নবাবের গাড়িতে ঢিল মারিয়াছে। নবাবের লোকেরা বলিল এ সকলই হিন্দুর কার্য। তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিল—যোগীপালের দোকান লুঠ করিল-হল্লা করিল-একটা দাঙ্গা-হাঙ্গামার সৃষ্টি করিল।

তাহার পরের দুই দিনই ক্রমাগত নানা শোচনীয় ব্যাপার হইল। নবাবের প্রাইভেট সেক্রেটারি পার্সি প্রহৃত হইলেন। সরকার পক্ষের রিপোর্টে প্রকাশ যে লোকটা অকারণ প্রহার লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন দোষ ছিল না। অপরপক্ষ বলেন, সে হিন্দুদিগকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি দিয়াছিল, তাহারই ফলে সে প্রহার লাভ করিয়াছে।

এইবার খুনের কথা। পূর্বের ব্যাপারের পরদিন অপরাহ্নে নবাব যখন ফিরিঙ্গিদের আড্ডায় চা খাইতে গিয়াছিলেন, তখন শ্রীযুক্ত নাবালক মিঞার বাড়ী হইতে একদল লোক বাহির হয়; প্রথমে অল্প কয়েক জন—তাহার পর রাস্তায় ক্রমেই লোকের সমারোহ হইতে লাগিল। এই সময়ে যদি পুলিশ এই দলকে শহর প্রদক্ষিণ করিতে নিষেধ করিত, তাহাদিগকে আর অগ্রসর হইতে না দিত, তাহা হইলে এই শোচনীয় ব্যাপার হইত না। কি পুলিশ, কি শহরকোটাল, কি কাজি কেহই এদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন না। কেন, তাহারাই জানেন। কিন্তু ফল হইল এই যে, একটা ছোট গলির মধ্য হইতে একটা গুলি আসিয়া একজন মুসলমান রুটিওয়ালার গায়ে মুখে লাগিল; লোকটা মারা গেল। তখন সকলে ক্ষেপিয়া উঠিল। আবার জিজ্ঞাসা করি, ইহার জন্য দায়ী কে? সকলেই বলিবে কুমিল্লার সরকার পক্ষ দায়ী।

লোক মরিল সুতরাং খুনী ধরা চাই। তখন পুলিশ বাহির হইয়া একজন মোক্তারকে খুনী সন্দেহে ধরিয়াছে; মোক্তার মহাশয়ের অপরাধ এই যে তাঁহার ঘরে একটা বন্দুক ছিল; তিনি এই খুনের একটু পরেই সেই গলির মোড়ে দাঁড়াইয়াছিলেন।

পুলিশ বলিতেছে যে, তাহারা কি করিবে; তাহারা সামান্য কয়েকজন মানুষ, আর নবাবের দলে অনেক লোক, শহরের লোকও ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিল; পুলিশ এ অবস্থায় কেমন করিয়া শান্তি রক্ষা করিবে? সরকারের নিমকখোবদিগের উপযুক্ত কথাই বটে। কিন্তু আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে, এই ব্যাপারের আগাগোড়াই সরকারের দোষ। তাঁহারা সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন। লোকে ইহা দেখিয়া মনে করিল তাঁহারা এ বিষয়ে কিছুই করিবেন না--শুধু বসিয়া বসিয়া এই শোচনীয় কাণ্ড দেখিবেন। তাঁহাদের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিয়াও কেহ কোন রফার আশার কথা শুনিতে পায় নাই; কাজেই কুমিল্লার লোক ত্রস্ত ও ভীত হইয়া পড়িল। তাহার পর যে ব্যাপারের অভিনয় হইল, তাহা বাস্তবিকই শোচনীয়। সরকারের এই প্রকার অবিবেচনার ফলে, কুমিল্লার এই গোলযোগ হইল। আমরা হিন্দু-মুসলমান কাহাকেও দোষী করিব না, আমরা স্পষ্ট দেখিতেছি, দোষী ফিরিঙ্গি সরকার। তাঁহারাই স্বদেশির পাল্‌টা গাহিবার জন্য নবাবকে কুমিল্লায় আসিতে দিলেন; তাহারাই নবাবের লোকজনকে বাধা দিলেন না। তাহারাই বে-আইনী জন্‌তা নিবারণ করিলেন না; ফল হইল দোকান লুঠ, হিন্দুর মাথা ফাটা, একজন মুসলমান যুবকের দেহত্যাগ, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে এই গোলযোগ।

সরকারের মনে যাহাই থাকুক, আমরা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, কুমিল্লায় হিন্দু মুসলমানের একটি সভা হইয়া গিয়াছে। যাহাতে বিগত ব্যাপার ভুলিয়া কুমিল্লার হিন্দু-মুসলমান এক হইয়া কার্য করেন, তাহারই ব্যবস্থা করা এই সভার উদ্দেশ্য ছিল। তাহাদের এই সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। আমরা আবার বলিতেছি, এ বিরোধ কুমিল্লার হিন্দু বা মুসলমানে ঘটায় নাই; বাহির হইতে ইহা ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। বাহিরের জঞ্জাল বাহিরে গিয়াছে, এখন কুমিল্লায় শান্তি বিরাজ করুক।

●

কুমিল্লার সংবাদ

কুমিল্লার অশান্তি দূর হইয়াছে। দ্বারিকবাবু মোক্তার মহাশয়ের জামিনের দরখাস্ত গত পরশ্ব নামঞ্জুর হইয়াছে। খুনের মোকদ্দমা সংশ্লিষ্ট আছে বলিয়া রাইটার কনস্টেবল নবীনচন্দ্র এবং সাব ইনস্পেক্টর মোগল সিংহ এই দুইজনকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাদিগকেও জামিন দেওয়া হয় নাই। দ্বারিকবাবুর মাম্‌লার যে তদন্ত হইতেছে ঐ তদন্তে তাঁহার পক্ষীয় একজন উকিল থাকিতে পারিবেন কিনা—এই মর্মে একখানি আবেদন করা হয়। উহাও অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

ইষ্টিস্‌ম্যান পত্রের সংবাদদাতা জানাইয়াছেন; কমিশনার সাহেব কুমিল্লায় আছেন। তিনি লাগিয়া পড়িয়া তদন্ত করিতেছেন। স্থানান্তর হইতে অপর একজন সরকারি কর্মচারী তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য ১৩ মার্চ কুমিল্লায় পঁহুছিয়াছেন। পুলিসেরা বারটি মামলার তদন্ত করিতেছে। দুইটি তদন্ত শেষ হইয়াছে। মিঠাইয়ের দোকান লুঠ করা ও চুরির অপরাধে দুইজন মুসলমানকে বিচারের জন্য আদালতে পাঠান হইয়াছে। তদন্ত শেষ হইলে অপর মোকদ্দমাগুলির বিচার আগামী ১৫ মার্চ তারিখে হইবে। পুলিসের নিকট যে মোকদ্দমাগুলি অবস্থিত তদভিন্ন ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বহু মামলা দায়ের আছে। এই সকল ছাড়া যে সকল অভিযোগ সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে কমিশনার সেগুলিরও তদন্তের জন্য একজন কর্মচারী নিযুক্ত করিয়াছেন। মি. করসেচজির উপরে যে দৌরাত্ম্য করিয়াছিল উহার কোন খোঁজখবর পাওয়া যাইতেছে না। তিনি কুমিল্লার কাহাকেও চিনিতেন না, বিশেষ ঘটনার সময়ে অন্ধকার ছিল, তজ্জন্য কাহাকেও সনাক্ত করিতে পারিতেছেন না। এই জন্য পুলিস কিছু প্রতিকার করিতে পারিতেছে না। কুমিল্লার হিন্দু মুসলমান নেতৃবর্গের স্বাক্ষরিত নিম্নলিখিত সার্কুলার পত্রখানি প্রচারিত হইয়াছে—

"আমরা হিন্দু-মুসলমান বহুকাল হইতে সদ্ভাবে ও সুখশান্তিতে বসবাস করিতেছি। এক দেশে একই শাসনাধীনে বাস করি বলিয়া আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের স্বার্থ অভিন্ন। দেশে কোন গোলমাল

হইলে আমাদের উভয় সম্প্রদায়ের অনিষ্ট।

"সাধারণের মনে একটি কুসংস্কার জন্মিয়া গিয়াছে যে কুমিল্লার হাঙ্গামা জাতীয় বিদ্বেষ হইতে জন্মিয়াছে। কিন্তু এই ধারণাটি সত্য নহে। আমরা হিন্দু-মুসলমান এই স্থানে পুনরায় শান্তি স্থাপনের জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিব এবং যাহাতে ভবিষ্যতে এইরূপ শোচনীয় ঘটনা আর না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিব। আমরা উভয় সম্প্রদায় সমবেতভাবে জনসাধারণকে জানাইতেছি যে, এই হাঙ্গামা জাতীয় বিদ্বেষ হইতে জন্মে নাই এবং এই ঘটনা আমাদের মনে পরস্পরের প্রতি কোন বিদ্বেষ ভাব জন্মায় নাই। ইহা মনে রাখিয়া উভয় সম্প্রদায়ের লোক পূর্বের ন্যায় বন্ধুভাবে একস্থানে বাস করিতে থাকুন।"

ইষ্টিস্‌ম্যানের সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সভাটি আঞ্জুমান ইসলাম সভার সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে হইয়াছিল। তিনি ঐ প্রস্তাব করিলে হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতারা উহা আনন্দের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই প্রস্তাব নির্ধারিত হইয়া যাওয়ার পরে কমিশনার সাহেব হিন্দু নেতাদিগের নিকট সভার প্রস্তাব করিয়াছিলেন।

●

বহরমপুরের বৈঠক ও আত্মরক্ষা

১০ চৈত্র রবিবার ১৩১৩

বহরমপুরের বৈঠকে বঙ্গদেশের চারিদিক হইতে ভদ্র জন-সমাগম হইবে—বহরমপুর আনন্দপুরে পরিণত হইবে। ফিরিঙ্গি একটি কৃত্রিম দাগ কাটিয়া বঙ্গদেশকে দু'টুকরা করিতে চায়। কে বা ঐ দাগকে মানে। ঐ দাগকে পদদলিত করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ পবস্পরকে আলিঙ্গন করিবে—অপূর্ব মিলন সঙ্ঘটিত হইবে। ফিরিঙ্গির বঙ্গভঙ্গের পর প্রথম মিলন বরিশালে হয়। কিন্তু সে মিলন ফিরিঙ্গিরা বাধা দেয়। এইবার মিলন গাঢ় ও স্থায়ী হইবে—কার সাধ্য বিঘ্ন ঘটায়।

এই আনন্দের মিলনে একটি নূতন প্রস্তাবের অবতারণা করিতে হইবে। প্রস্তাবটি কেবল কথার নয়—কাজের। **এবার স্বদেশি থানার প্রতিষ্ঠার আয়োজন করা চাই?**

স্বদেশি থানার কী প্রয়োজন। ফিরিঙ্গিরা ত আমাদের রক্ষার ভার লইয়াছে। উহারাই ত আমাদের ধন প্রাণ মান রক্ষা করে। আর আমরা কেবল খাজনা দিয়াই খালাস। তবে আর থানা স্থাপনা করিয়া কি লাভ। সুবিধা ছাড়িয়া কুষ্ঠিয়ায় পড়িতে যাওয়া কেন।

মানব সমাজের প্রথম ও মুখ্য অধিকার—আত্মরক্ষা। যদি এই অধিকারের ব্যতিক্রম ঘটে তবে সমাজ বিনষ্ট হয়। আত্মা—প্রজাতে ব্যষ্টিরূপে ও রাজাতে সমষ্টিরূপে প্রকাশিত। তাই লোকরক্ষার ভার সমাজের আত্ম-সমষ্টি-স্বরূপ রাজার উপরই আরোপিত হয়। তথাপি ব্যক্তিগত ব্যষ্টি আত্মাতেও এই অধিকার ন্যস্ত থাকে। সমষ্টির অধিকার স্বভাবতঃই ব্যষ্টিতে বিরাজ করে। যে সমাজে রাজ-অধিকার প্রজা-সমষ্টিগত নহে — ব্যক্তি সূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন — সে সমাজের প্রতিষ্ঠা নাই—উহা অচিরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। রাজশক্তি যদি প্রজাশক্তিকে অন্তর্ভুক্ত না করিয়া স্থিতি করে তবে ঐ স্থিতি-ভঙ্গেরই কারণ হয়। রাজা যদি প্রজাকুলের আত্মরূপে প্রতিষ্ঠিত না হইয়া অনাত্ম হইয়া পড়েন, তাহা হইলে ব্যক্তিগত আত্মশক্তির ঐ অনাত্মের প্রাধান্য বিনষ্ট করিয়া নূতন এক আত্মীয় রাজশক্তি উদ্ভাবন করে ও অনাত্ম বিষয়ের উৎপীড়ন হইতে সমাজকে রক্ষা করে। মুখ্যতঃ—সমাজ-সমষ্টির আত্মরক্ষা ব্যক্তিগত অধিকারের দ্বারাই সাধিত হয়। রাজা স্বদেশি হইলেও এই অনাত্মতা দোষ আসিয়া লোকসমাজের হানি করিতে পারে।

এখন জিজ্ঞাস্য—আমাদের এই বিদেশি শাসনকর্তারা কী এই ভারতীয় লোকসমাজের আত্মস্বরূপ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। কখনই না। বিদেশি শাসনকর্তা রাজা বলিয়াই গ্রাহ্য হইতে পারে

না। রাজা প্রকৃতি-রজনাৎ। বিদেশীয় শক্তি প্রকৃতিরঞ্জন করিতে পারে না—কেবল কর্মদোষের দণ্ডবিধান করে—অনাত্ম বিষয়ের ন্যায় আত্মবস্তুকে আচ্ছন্ন ও অসাড় করিয়া রাখে। যাহা বাহ্য ও পর তাহা সমাজের আত্মসমষ্টি হইতে পারে না। বহিরাগত অনাত্মশক্তি সমাজনিহিত প্রজাশক্তিকে স্বীকার করিয়া—আত্মীয় করিয়া-প্রভুত্ব করিতে অসমর্থ।

রাজা স্বদেশি হইলেও প্রজাবর্গের আত্মরক্ষার অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা চাই—কারণ ঐ ব্যক্তিগত অধিকার লইয়াই রাজ-অধিকার গঠিত হয়। যখন স্বদেশি রাজ্যেই এই ব্যবস্থা তখন অনাত্ম সমাজ-বহির্ভূত বিদেশির শক্তির শাসনকালে এই ব্যক্তিগত অধিকারের অনুশীলন যে একান্ত অপরিহার্য তাহা আর যুক্তিতর্কের দ্বারা বুঝাইতে হইবে না। এইবারকার বহরমপুর বৈঠকে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করা উচিত যে, ফিরিঙ্গি শাসনশক্তি কখনই আমাদের আত্মীয় হইতে পারে না। তজ্জন্য ঐ আগন্তুকদের উপর লোকরক্ষার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত ও উদাসীন হইয়া থাকিলে সমাজভঙ্গের আশু সম্ভাবনা। আত্মাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখা ও ব্যস্ত বিপর্যস্ত করাই অনাত্মের স্বভাব। দেখ—অনাত্ম ফিরিঙ্গি শক্তি কেমন মায়াজাল বিস্তার করিয়া প্রথমে আমাদের ভুলাইয়া রাখিয়াছিল—পরে ধীরে ধীরে আমাদের সমাজকে বিপর্যস্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। কুমিল্লার ব্যাপারে ফিরিঙ্গি শক্তির প্রকৃতি অত্যন্ত মূর্খেরও নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে। এই রক্তারক্তি কাণ্ডে স্পষ্টই দেখা গিয়াছে যে, ফিরিঙ্গির প্রভুত্ব আমাদের সমাজকে তুচ্ছ করিয়াই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এখন যদি আমরা আত্মরক্ষার অধিকার শীঘ্র প্রতিষ্ঠা না করি তাহা হইলে সমাজের অস্তিত্ব লইয়া টানাটানি পড়িবে।

আমরা যতদূর পারিয়াছি তাহাতে মনে হয় যে গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে ছোট বড় ঘাঁটি ও থানা প্রতিষ্ঠা করা উচিত। একশত ঘর অধিবাসির হিসাবে পাঁচজন করিয়া পাইক ও এক জন করিয়া নায়ক ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে বাহাল রাখা উচিত। দশ দশটি ঘাঁটির উপর এক একটি করিয়া ছোট থানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই। ঐ ছোটখাট থানায় দশজন পাইক—একজন নায়ক ও একজন অধিনায়ক থাকিবে। আর প্রত্যেক জেলার সদরে একটি করিয়া বড় থানা স্থাপনা করিতে হইবে। বড় বড় থানায় পঁচিশ জন পাইক—একজন নায়ক—একজন অধিনায়ক ও একজন অধিপতি নিযুক্ত থাকিবেন। এই অধিপতির অধীনে জেলার ছোট ছোট থানা ও ঘাঁটিগুলি পরিচালিত হইবে। নিম্ন শ্রেণি হইতে পাইক সংগ্রহ করিতে হইবে, আর উচ্চশ্রেণির মধ্য হইতে নায়ক, অধিনায়ক ও অধিপতি নির্বাচিত হইবে। জেলায় জেলায় যে সমিতি গঠিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে সেই সমিতির দ্বারা ঐ থানা ও ঘাঁটিগুলি নিয়মিত প্রতিপালিত হইবে।

কেহ কেহ মনে করেন যে, এই আত্মরক্ষার আয়োজন লুকাইয়া করা উচিত। আমরা ত লুকাইবার কোন কারণ দেখি না। আইন বা বিধি ভাঙিবার জন্য এই সকল থানা প্রতিষ্ঠিত করা হইবে না। বে-আইনি অত্যাচার হইতে লোক রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যেই উহার আয়োজন। তাই ইহার লুক্কায়িত অনুষ্ঠানে কোন প্রয়োজন নাই। হইতে পারে যে ফিরিঙ্গিরা অন্যায় করিয়া এই উদ্যোগে বিঘ্ন ঘটাইবে। তাহা হইলে ত ভালই হয়। যত অন্যায় হয় ততই মঙ্গল—দেশের লোকের চৈতন্য হইবে--সাড় হইবে — শক্তি বাড়িবে।

বহরমপুরের বৈঠকে যেন এই আত্মরক্ষার বিষয় ভাল করিয়া আলোচনা হয় ও যাহাতে এই মুখ্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় তাহার জন্য একটি প্রণালী স্থির করা চাই। এই আত্মরক্ষার উদ্যোগ ব্যয়সাপেক্ষ ও শিক্ষাসাপেক্ষ। পাইক নায়ক অধিনায়ক ও অধিপতিদের বিশেষভাবে থানার কার্যে শিক্ষিত করা আবশ্যক। ঘাঁটি ও থানাগুলির প্রতিপালনের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হইবে। কি প্রকারে ঐ শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে অর্থ সংগ্রহ হইতে পারে — এই বৈঠকে তাহারও মীমাংসা হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন।

ঘোর সঙ্কটকাল উপস্থিত। এখন আর ভয় করিলে চলিবে না। উত্তিষ্ঠিত-জাগ্রত-আত্মানাত্মবিবেকে প্রবুদ্ধ হও। এখন সকল কাজ ফেলিয়া যাহা আত্মীয় তাহাকে অনাত্মের নিগ্রহ হইতে রক্ষা কর—তবে মুক্তিলাভ হইবে—স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইবে।

●

কুমিল্লার গুলি মারার মাম্‌লা

কুমিল্লায় গোলযোগের দরুন আদালতে যে মামলা উপস্থিত হইয়াছে তাহা আগামী ২৫ মার্চ পর্যন্ত মুলতুবী রহিল।

বিগত সোমবার ১৮ মার্চ গুলি মারা মামলার প্রথম শুনানী হইবার কথা ছিল। কুমিল্লার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপ সাহেবের আদালতে বিচার আরম্ভ হয়। আদালত বসিবার বহু পূর্বেই শত শত লোক আসিয়া আদালতের প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই আদালতে উপস্থিত হইয়াছিল।

বেলা একটার সময় মামলা আরম্ভ হয়। মোক্তার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দে, রাইটার কনস্টেবল নিবারণচন্দ্র রায় ও সব-ইনিস্পেক্টর মঙ্গল সিং—এই তিনজন আসামীর কাটরায় আসিয়া দাঁড়াইলেন। দ্বারকাবাবুর বয়স পঞ্চাশের উপর—তাঁহার চুল সমস্ত পাকিয়া গিয়াছে।

আসামীদের পক্ষে ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র রায়, শ্রীযুত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দাস ও স্থানীয় অনেকগুলি মোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার জন্য উপস্থিত ছিলেন। ফরিয়াদী মকুল আমেদের পক্ষে সরকারি উকিল শ্রীযুত শশাঙ্কমোহন ঘোষ, মিঃ আলি আকবর ও অনেকগুলি মুসলমান মোক্তার নিযুক্ত হইছিলেন।

শশাঙ্কবাবু পূর্বে মৈমনসিংহে ছিলেন। বদলী হইয়া কুমিল্লায় আসিয়া সবে একদিন মাত্র তিনি কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই গুলি মারার মামলা উপলক্ষে এই প্রথম তিনি কুমিল্লার ফৌজদারি আদালতে হাজিরা দেন। মামলা আরম্ভ হইবার আধঘন্টা পরে তিনি আদালতে উপস্থিত হন। তাহার জন্য ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে বসিয়া থাকিতে হইয়াছিল। শশাঙ্কবাবু আসিয়াই মামলা এক সপ্তাহের জন্য মুলতুবী রাখিবার প্রার্থনা করেন। তিনি বলেন—যথেষ্ট সময়ের অভাবে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শেষ করিতে পারে নাই।

আনন্দবাবু বলেন মোকদ্দমা মুলতুবী রাখিতে তাহার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তিনি জামিন দিয়া আসামীদের খালাস করিতে চাহেন। এই মামলার তদন্তের সময় আসামীদের পক্ষে কোন উকিলকে হাজির থাকিতে দেওয়া হয় নাই। তদন্তের ফলাফল সম্বন্ধে কাগজপত্রের নকলও পাওয়া যায় নাই। সুতরাং আসামীদের জামিনে খালাস দেওয়া হউক এবং কাগজপত্রের নকল দেওয়া হউক।

শশাঙ্কবাবু বলিলেন তদন্তে আসামীদের বিরুদ্ধে প্রমাণগুলি এখন অনেকটা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। আসামীরা বেশ সম্ভ্রান্ত লোক এবং সমাজে তাহাদের বিলক্ষণ প্রতিপত্তি আছে। বিশেষত এটা গুলি মারার মামলা। এরূপ স্থলে আসামীদের জামিনে খালাস দিলে তদন্তের পক্ষে অনেক বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে। অতএব আসামীদের জামিনে খালাস দিতে তাহার আপত্তি রহিয়াছে।

আনন্দবাবু বলিলেন, তদন্ত সম্বন্ধীয় কাগজপত্র এখনই দাখিল করা হউক এবং মামলা আগামী ২রা এপ্রিল পর্যন্ত মুলতুবী থাকুক। কেননা, আবার মোকদ্দমা উঠিবার অন্তত দশদিন পূর্বে তাহাদের কাগজপত্র পাওয়া চাই।

আসামীর পক্ষের উকিলের কথা দাঁড়াইল না। আসামীদের জামিনে খালাস দেওয়া হইল না। মোকদ্দমা আগামী ২৫ মার্চ সোমবার আবার উঠিবে।

●

ঢাকা হইতে গুর্খা আসিয়াছিল কেন জানেন? কুমিল্লায় শান্তি স্থাপনের জন্য নহে—কুমিল্লাবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য নহে—সে ভার যাহাদের তাহারাই তাহা করিয়াছিল। গুর্খা আসিয়াছিল ভীত চকিত ফিরিঙ্গি নরনারীগণের আতঙ্ক দূর করিবার জন্য। কুমিল্লায় যে সকল ফিরিঙ্গি ছিলেন, তাহারা হাঙ্গামার দিন নিজ নিজ জীবন বিপন্ন করিয়াছিলেন ; সন্ত্রস্ত প্রহরিগণ তাহাদের রক্ষার জন্য নিযুক্ত হইয়াছিল। এমন কি, আমরা জানিলাম সেই যে বন্দুকের শব্দ হইয়াছিল—সেই শব্দে জজ বাহাদুরের পত্নী মূর্ছিতা হইয়াছিলেন। তাহাদের এই ভয় দূর করিবার জন্যই গুর্খার আবির্ভাব।

●

বিগত ১৬ ফাল্গুন খুলনা জেলার অন্তর্গত নরনীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত গঙ্গাচরণ চক্রবর্তী মহাশয়ের বাটির বিস্তৃত প্রাঙ্গণে এক স্বদেশি সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এতদঞ্চলের বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ মণ্ডলী সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। **সর্বসম্মতিক্রমে স্থির হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণমণ্ডলী সকলেই স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিবেন এবং নিজ নিজ যজমানদিগের মধ্যে উহার প্রচলনের চেষ্টা করিবেন। বিবাহ বা শ্রাদ্ধাদিতে যে যজমান বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিবে, কেহই তাহার বাটিতে যাজন ক্রিয়া করিবেন না এবং ব্রাহ্মণগণ কন্যার বিবাহে ভবিষ্যতে আর পণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। যিনি বিদেশি দ্রব্য ব্যবহার বা ব্যবহারের সহায়তা এবং বিবাহে পণ গ্রহণ করিবেন তাহাকে সমাজচ্যুত হইতে হইবে।** সর্বস্থানে উল্লিখিত প্রথা প্রচলন জন্য বিশেষ চেষ্টা হইতেছে। বহুস্থানে এইরূপ সভাসমিতি হইবে। নরনীয়ার সভাটি হইতেছে ইহার ৫ম অধিবেশন। সত্যসত্যই দেশে সু-পবন প্রবাহিত হইয়াছে। ভগবান ব্রাহ্মণমণ্ডলীর মনোরথ পূর্ণ করুন।

কুমিল্লায় আবার হল্লা
দোকান বাজার লুঠ
১৭ চৈত্র রবিবার ১৩১৩ সাল

বেঙ্গলির সংবাদদাতা ২৭ মার্চ তারিখে কুমিল্লা হইতে জানাইয়াছেন যে ২৩ মার্চ অপরাহ্ণ পাঁচটার সময়ে একদল মুসলমান লাঠি ও নিশান হস্তে দক্ষিণ দিক দিয়া মগরা বাজারে প্রবেশ করে। তাহারা গান করিতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে আল্লা হো আকবর ধ্বনি তুলিতেছিল। তাহারা বাজারে প্রবেশ করিয়া ক্রমাগত হিন্দুদের দোকান লুঠ ও ঘরগুলি লাঠি দ্বারা আঘাত করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। নিকটবর্তী কয়েকখানি গ্রামের মুসলমান গুণ্ডারা এই দলভুক্ত ছিল। মগরার পঞ্চায়েত শ্রীযুত নন্দকুমার সরকারের ও শ্রীযুত রজনী শর্মার মাথা ভাঙিয়াছে। তাহাদিগকে রক্তাক্ত অবস্থায় দেখা গিয়াছিল; মিছিলটি অতঃপর জয়ধ্বনি করিতে করিতে চলিয়া গেল।

গত রবিবার ২৪ মার্চ মানিয়াদহ বাজারে মুসলমানদের একটা প্রকাণ্ড বৈঠক বসিয়াছিল। মানিয়াদহ, মগরার খুব নিকটবর্তী। বৈঠকে সাব্যস্ত হইল—২৬ মার্চ মঙ্গলবার হাটের দিন মগরার হিন্দু সাধারণকে আক্রমণ করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে **প্রত্যেক মুসলমান পরিবার হইতে অন্ততঃ একজন লোক ও একখানি লাঠি দিতে হইবে। যদি কোন মুসলমান পরিবার ইহা না করে তবে ঐ পরিবারকে মোল্লারা একঘরে করিয়া রাখিবে বলিয়া ভয় দেখান হইয়াছিল।**

ঘটনাটি যথারীতি পুলিসে জানান হইয়াছিল। গ্রামের মাতব্বরেরা পুলিসে খবর দিয়াছিলেন। মঙ্গলবার প্রাতে একদল পুলিস ও চৌকিদার মগরায় উপনীত হয়। ঐ দিন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট একজন মুসলমান দারোগাসহ বেলা একটার সময়ে মগরা বাজারে

পঁহুছেন। কশবার দারোগা কনস্টেবলে ও চৌকিদারে প্রায় ১০০ লোকসহ পূর্বাহ্নেই আসিয়াছিলেন। সমগ্র পুলিস ভাগ করিয়া বাজারের সবাংশে পাহারায় নিযুক্ত করা হইল। পরে বেলা দুইটা কি আড়াইটার সময় মুসলমানেরা দলবদ্ধ হইয়া দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইতেছিল। তাহাদের হস্তে লম্বা ও শক্ত লাঠি ছিল। সবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট এই মিছিলটির সংবাদ পাইলেন কিন্তু তিনি প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিলেন না! তিনি বাজারের পাহারার বন্দোবস্ত করিলেন কিন্তু গুণ্ডাদের দমনের কোনও চেষ্টা করিলেন না। হিন্দুদোকানী ও অন্যান্যের সংখ্যা নিতান্ত অল্প। তাহারা ঘরের বাহির হইতে সাহসী হইল না। খোলা ঘরে বসিয়া যে সকল দোকানী কেনাবেচা করেন তাহারা জিনিসপত্র বাহির করিতে সাহস করেন নাই। অল্প সংখ্যক হিন্দু বাজার করিতে আসিয়াছিলেন।

দুর্বৃত্তেরা এই ভীত হিন্দুদের একেবারে ছাড়িয়া দেয় নাই। তাহারা এই অসহায় হিন্দুদের অনুসরণ করিয়া তাহাদিগকে ঢিল মারিয়াছিল। কেহ কেহ সামান্য আঘাত পাইয়াছেন।

রাত্রি ৯টার সময়ে গুণ্ডারা দল ভাঙিয়া চলিয়া যায়। সবডিভিসনের ম্যাজিস্ট্রেট বাজারে আসিয়া অল্প কয়েকজন হিন্দুকে দেখিতে পান। তিনি তাহাদিগকে বাড়ি যাইতে অনুমতি করেন। হিন্দুরা বলিলেন—গুণ্ডারা আসিয়া সকলকে আক্রমণ করিয়া দোকান ভাঙে। তাহারা একাশ্যেই বলে যে পুলিশ তাহাদের পক্ষে। হিন্দুরা আরো বলিলেন যে তাহারা দোকানে পাহারা না দিয়া কি করিয়া চলিয়া যাইবে। ডিপুটি বলিলেন যে তিনিই তাহাদের দোকানের রক্ষার জন্য সেখানে থাকিবেন। হিন্দুরা তাহার উপর নির্ভর করিয়া চলিয়া যাইতে পারেন। তিনি হিন্দুদিগকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হইতে বলিলেন—কারণ মুসলমানের সংখ্যা তাহাদের দ্বিগুণ। তিনি বলেন যে তিনি উপস্থিত না থাকিলে হিন্দুদের রক্ষা পাওয়া শক্ত ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইত! সবডিভিসন্যাল ম্যাজিস্ট্রেট মহাশয় গোলমাল প্রত্যক্ষ করিয়াছেন ; মুসলমানেরা লাঠি হস্তে বাজারে প্রবেশ করিল তবু তিনি তাহাদিগকে শাসন করিতে চেষ্টা করেন নাই।

গতকল্য ২৭ মার্চ প্রাতে কুমিল্লার পুলিসের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মহাশয় একদল জঙ্গী পুলিস লইয়া নগরায় গিয়াছেন। মুসলমান গুণ্ডাদিগকে লাঠি হস্তে বেড়াইতে দেখিয়াছেন; হিন্দু গৃহ লুঠের সংবাদও তিনি পাইয়াছেন। উৎপীড়িতেরা তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইয়া আসিলে তিনি রূঢ়ভাবে বলিয়াছেন—"আমি কি দেশের সর্বস্থানে অস্ত্রধারী পুলিস পাহারা পাঠাইব?"

তিনি অচলভাবে আপনস্থানে বসিয়াই আছেন। এক ইঞ্চিও নড়িবেন না।

জেলার ম্যাজিস্ট্রেটকে সব জানান হইয়াছে। তিনি ঘটনাস্থলে যাইতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। ২৫ জন গুর্খা নগরায় গিয়াছে।

কুমিল্লায় খুনের মামলা

১৭ চৈত্র, ১৩১৩

গত সোমবার জয়েন্ট ম্যাজিস্ট্রেট ডানলপের এজলাসে কুমিল্লার খুনের মামলা উপস্থিত হইয়াছিল।

বাবু মদনমোহন ঘোষ মহাশয় মোক্তার দ্বারিকবাবুর পক্ষে শ্রীযুক্ত কুমুদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস সব্ ইন্স্পেক্টর জঙ্গল সিংহের পক্ষে, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত অখিলচন্দ্র দত্ত রাইটার কনস্টেবল নিবারণের পক্ষে ওকালতি করিয়াছিলেন।

মিঃ আন্টন ও শ্রীযুক্ত শশাঙ্ককুমার ঘোষ সরকার পক্ষে ওকালতি করেন। মিঃ রাইল্যান্ড সর্বদা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। বেলা ১টা ১৫ মিনিটের সময় মোকদ্দমার শুনানি আরম্ভ হয়।

আসামীদের পক্ষের উকিলগণ মোকদ্দমা "এ" ফরমে দেওয়া হইয়াছে কিনা জানিতে চাহিলে বলা হয় না দেওয়া হয় নাই। ১টা ২৫ মিনিটের সময় সরকারি : উকিলেরা ও মিঃ রাইল্যাণ্ড

আইসেন। মিঃ রাইল্যাণ্ড এই বিষয়ের তদারক করিয়াছেন। ইহারা "এ" ফরম লইয়া আসিয়াছিলেন।

মদনবাবু তখন সময় প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করেন। তিনি বলেন—"সরকারি উকিলদের নিকট হইতে এইমাত্র জানিতে পারিলাম শুনানি এখনই আরম্ভ হইবে। এক মিনিট হইল "এ" ফরম নথীভুক্ত করা হইয়াছে। আমরা পূর্ব তারিখে "এ" ফরমের নকল ও অপরাপর কাগজের নকল লইবার জন্য দরখাস্ত করিয়াছিলাম। আমরা জানাইয়া ছিলাম যে, ঐ সকল কাগজ না পাইলে আমরা মোকদ্দমা চালাইতে পারিতেছি না। মৃতদেহ পরীক্ষার ফলাফল পর্যন্ত আমরা পাই নাই। পুলিসের তদারকের সময় আমাদিগকে সঙ্গে লওয়া হয় নাই। আমাদের বিরুদ্ধে যে কি মামলা দায়ের আছে উহাই আমরা জানি না। এই জন্য আমি অবকাশ প্রার্থনা করিতেছি।

আর আসামীদের পক্ষ হইতেও ঐ রূপ আবেদন করা হইল!

মিঃ আন্‌টন বলিলেন যে মোকদ্দমা পর দিন করিলে তাহার কোন আপত্তি নাই।

কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য করা হইয়াছে। মদনবাবু বলেন আমরা এই মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার জন্য হাইকোর্টে আপিল করিতে চাই। তজ্জন্যে আমাদিগকে অবকাশ দেওয়া হউক।

মিঃ আন্‌টন—আমি এই প্রার্থনায়ও কোন আপত্তি করি না। আসামীরা যদি প্রকৃতই হাইকোর্টে আপিল করেন এবং মোকদ্দমা স্থানান্তরিত হইবে বলিয়া ভরসা করেন তাহাদের প্রার্থনা মঞ্জুর হইতে পারে। বিচারপতি মিত্র মহাশয় মাদারিপুরের মামলায় যে মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই মোকদ্দমায় সময় না দিলেও বে-আইনি হয় না। তবে অবকাশের দরখাস্ত বাঞ্ছনীয় নহে।

ম্যাজিস্ট্রেট (মিঃ আপটনের প্রতি)—আপনিও অবকাশ চাহিতেছেন?

মিঃ আপটন—না, তবে আসামীদের পক্ষীয় এই অবকাশের দরখাস্তে আমার কোন আপত্তি নাই। কিন্তু আপনি তৎপক্ষীয় উকিলদের জিজ্ঞাসা করিবেন যে তাহারা প্রকৃতপক্ষে হাইকোর্টে আপিল করিতে ইচ্ছুক কিনা।

মদনবাবু—মিঃ আপটন যে "অনেষ্টলি" শব্দটি ব্যবহার করিয়া হাইকোর্টে আপিল করা হইবে কিনা জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইহা বড়ই আপত্তিজনক। তাহার ঐ উক্তিতে আমি আপত্তি জানাইতেছি।

মিঃ আনটন দুঃখিত হইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

ম্যাজিস্ট্রেট—আপনারা পূর্বেই হাইকোর্টে আপিল করিলেন না কেন?

মদনবাবু—অদ্যকার পূর্বে কোন আদালতেই ত এ মামলা উঠে নাই। মোকদ্দমা এতদিন পুলিশের হাতে ছিল। "এ" ফরম এই মাত্র পেশ করা হইয়াছে। আদালত তখন এই শেষ হুকুম জারি করেন—

"আসামী পক্ষ মোকদ্দমা স্থানান্তর করিবার জন্য হাইকোর্টে আপিল করিবেন বলিয়া অবকাশ চাহেন। বড় বিলম্বে আবেদন করা হইয়াছে বলিয়া আমি উহা না-মঞ্জুর করিলাম। সরকারি কৌন্সিলি মাদারীপুরের বর্তমান মোকদ্দমার প্রতি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন, তদনুসারে অবকাশ না দিলেও কোন হানি দেখা যায় না। তথাপি আমি অবকাশ দিলাম। আজ হইতে চৌদ্দ দিন পরে মোকদ্দমার শুনানি হইবে। আসামীকে পূর্বের ন্যায় হাজতে থাকিতে হইবে।"

অবকাশ দেওয়ার কথাটা মি. আপটন উপস্থিত করেন।

এই সময়ে আর একখানি আবেদন করা হয়। উহার মর্ম এই যে—ইস্টার পর্ব প্রভৃতি ছুটি থাকায় দুই সপ্তাহ সময় যথেষ্ট নহে। ম্যাজিস্ট্রেট আর সময় দিলেন না। মদনবাবু জানাইয়াছেন যে পোস্টমর্টেমের রিপোর্ট এখনও নথীভুক্ত করা হয় নাই। তাহারা উহা দেখিতে চাহেন।

ম্যাজিস্ট্রেট—আমি কি জানি—আমি ইহার কোন ধার ধারি না।

জামিনের দরখাস্ত করা হয়—কিন্তু উহা অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

সাময়িক কথা

৮ বৈশাখ রবিবার, ১৩১৪

২৪ চৈত্রের তারের খবরে আমরা ফরিদপুরের একটা সংবাদ পাইয়া অবাক্ হইয়াছিলাম। প্রকাশ ফরিদপুরে নূতন আইন জারী হইয়াছে—বিনা পাশে কেহ রাস্তায় বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিতে পারিবে না। আমাদের শাসন কর্তাদের খেয়াল যেমন আজব তাহাতে বিশ্বাস না করিবার কোন হেতু ছিল না। ফরিদপুরবাসিরা মায়ের সুপুত্রের ন্যায় কার্য করিয়া দেশের সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। পুলিশ ঢেড়রা পিটাইয়া বন্দেমাতরম ধ্বনি বারণ করিবামাত্র তাহারা স্বেচ্ছাচারমূলক আদেশের প্রতিকূলে দাঁড়াইলেন। বিরাট মিছিলের আয়োজন হইল। রাস্তায় রাস্তায় বন্দেমাতরং ধ্বনিত হইল। পুলিসেরা কাজির কাছে খবর জানাইল। কাজি কথাটা কান পাতিয়া শুনিলেন না। পরে প্রকৃত সংবাদ প্রকাশ হইয়া পড়িল—পুলিসের নির্বুদ্ধিতার দৌড় দেখা গেল। শহর কোটাল মহাশয় তাঁহার ভৃত্যদিগকে প্রকাশ্যস্থানে বিনা পাশে সভা করিবার নিষেধের আদেশ প্রচার করিতে বলিয়াছিলেন; আর গোরেগুারা না বুঝিতে পারিয়া যাহা ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছে। শহরকোটাল মহাশয় ফরিদপুরে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনায় প্রকাশ্য স্থানে সভা করিতে দিতে নারাজ। তিনি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে কোথায় শান্তিভঙ্গের সূচনার আঘ্রাণ পাইলেন জানি না।

কুমিল্লার জের ত বহুদিন ধরিয়াই চলিতেছে। সে স্থানে স্বদেশসেবকগণের লাঞ্ছনার পুনরাভিয় আরম্ভ হইয়াছে। গেরেপ্তারের ধুম পড়িয়া গিয়াছে। উকিল শ্রীযুত উপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ ৯ জন হিন্দু ভদ্রলোককে গেরেপ্তার করা হইয়াছে, স্বদেশভক্ত নেতাদিগকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিয়া স্বদেশি আন্দোলনটি থামাইবার জন্য যথারীতি চেষ্টা চলিতেছে। স্বয়ং ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর বিলাতি লবণের দোকানের তদন্ত করিতেছেন। কর্তারা বিলাতি মালের কাট্‌তির বৃদ্ধির জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছেন। নির্যাতনের মাত্রাটা যত চড়িতেছে লোকের বিলাতি বহিষ্কারের দৃঢ়তা তত বাড়িয়া যাইতেছে। কুমিল্লার ফিরিঙ্গিদের কাণ্ডগুলিই বড় চমৎকার। স্বদেশির প্রতি তাহাদের বিষদৃষ্টি পতিত হওয়া অবধি জুজুর ভয়ে তাহারা ভীত হইয়া পড়িয়াছে। গুর্খা পাহারা না হইলে তাহাদের পথে ঘাটে চলাফেরা চলে না। গুর্খা পাহারাওয়াল সঙ্গে লইয়া মি. আপটন ও মি. রাইল্যান্ড ট্রেনে উঠিয়াছিলেন। গুলির মামলার রায় এখনও বাহির হয় নাই।

লুটপাট ও জুলুমের মামলাগুলির বিচারের জন্য আখউরায় একটা নূতন ফিরিঙ্গি আদালত বসিয়াছে। এই স্পেশাল আদালতের প্রসাদে হিন্দুরা যে সুবিচার লাভ করিবেন তাহা আমরা এখনও লিখিতে পারিতাম। লিখা নিষ্প্রয়োজন। পাঠকগণ ত কত বিচারের ফলই দেখিতেছেন। এই বিচারালয়ে একজন ফিরিঙ্গি কাজি কর্তা নিযুক্ত হইয়াছেন। কিছু টাকার শ্রাদ্ধ হইবে।

সংপ্রতি রাজসাহীতে স্বদেশি সভার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া সেখানে প্রচারে গিয়াছিলেন। জেলা সমিতিতে তিনি সভাপতির কার্য করিয়াছেন। তাঁহার অভ্যর্থনার বিবরণ পাঠ করিলে অবাক হইতে হয়। স্বাধীন রাজ্যের রণবিজয়ী সেনাপতিগণ এইরূপ অভ্যর্থনা পাইয়া থাকেন। অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন বিশেষতঃ বঙ্গগৌরব সুরেন্দ্রনাথের অভ্যর্থনা ইহার উপর কোন কথা বলা যায় না। তবে বাহুল্য বাহ্যাড়ম্বরে আসল ছাড়িয়া খোসার উপর নজর পড়ে। আমাদের এইরূপ আড়ম্বর করিবার দিন আইসে নাই। আমাদের নেতৃগণ যেদিন বিজয় মুকুটে ভূষিত হইবেন সে দিন এইরূপ আড়ম্বর শোভন হইবে। ভগবান সেই শুভদিন আনয়ন করুন। সকলে সেই গৌরবময় দিন সত্বর আনয়ন করিবার জন্য মাতৃমন্ত্রে দীক্ষিত হউন।

রাজসাহীর জেলা সমিতিতে অনেক কাজের কথা আলোচিত হইয়াছে। শালিশী বিচার, কৃষি

ও শিল্প ব্যাঙ্ক, স্বাস্থ্যরক্ষার বিধান, স্বদেশি ও বহিষ্কার আন্দোলন পরিচালনার জন্য স্থায়ী সমাজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বহুপ্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতায় সকলের প্রাণে স্বদেশিভাব সময়ের জন্য জাগিয়া উঠিয়াছে সন্দেহ নাই। এই জেলা সমিতির অধিবেশন হইতে রাজসাহী স্বদেশি আন্দোলনে অগ্রণী হইলে সুরেন্দ্রবাবুর অভ্যর্থনা ও বক্তৃতা সার্থক হইবে।

বরিশালের ছত্রভঙ্গের তারিখ ১লা বৈশাখ। আমরা মনে করিয়াছিলাম বঙ্গের প্রতিনগরে ঐ স্মরণীয় দিনে নানারূপ অনুষ্ঠান হইবে। ঢাকা বরিশাল দিনাজপুর ও কলিকাতা এই চারি স্থানে বরিশালের স্মৃতি আলোচিত হইয়াছে।

ব্যাপারটি নিতান্ত বিস্মৃত হইবার নহে। জেলার একজন নগণ্য ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুমে বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত উজ্জ্বল রত্নগণকে অবমানিত হইয়া সভা ভাঙ্গিয়া চলিয়া আসিতে হইল।

যে ব্যক্তি কি শিক্ষা, কি চরিত্রবল, কি জ্ঞান-গৌরব কোন বিষয়ে আমাদের নেতৃবর্গের পাদুকা স্পর্শেরও যোগ্য নহে; রাজশক্তির অপব্যবহার করিয়া পশুবলের সাহায্যে সে সভা ভাঙিয়া দিবার বড়াই করিল। আর আমরা অস্ত্রহীন ও অসহায় বলিয়া অধোবদনে সভা ভাঙিয়া চলিয়া আসিলাম। এ দিন স্মরণীয় নহে? পরাধীনতার তীব্র যাতনা মনে জাগরূক রাখিতে হইলে এ দৃশ্য কি ধ্যান করিবার যোগ্য নহে? আমরা কেন অক্ষম হইলাম; কেন কলঙ্কের ডালি মাথায় লইলাম এ কথা কি আলোচনার যোগ্য নহে? ভারতবর্ষ ভিন্ন অপর কোন দেশে কি এইরূপ প্রজা সাধারণের ন্যায়ানুমোদিত একটি আলোচনা সভা ভাঙিয়া দিতে পারিত? স্বেচ্ছামূলক অস্ত্ররাহিত্য আইনের সাহায্যে দুর্বলীকৃত বাঙালি ভিন্ন কে আর ঐ অত্যাচার সহ্য করিত? মনে হয় না কি বাঙালি দুর্বল নহে—কেবল রাজশক্তির অনুচিত পীড়নে অঙ্গহীন বলিয়া আত্মরক্ষায় অক্ষম। আপনাকে অস্ত্রবলে বলীয়ান মনে না করিলে কি কল্পিত কলেবর ক্যাম্পগুলির ভয় দেখাইতে সাহসী হইত?

এই দুঃখের স্মৃতি অবমাননার চিত্র হৃদয়ে অঙ্কিত রাখিবার জন্য বঙ্গের নগরে নগরে সভা সমিতির আয়োজন করা উচিত। পরাধীনতা অসহনীয় বলিয়া জ্বালা অনুভব না করিলে স্বাধীনতার জন্য পিপাসা জাগিতে পারে না। দীর্ঘকাল কারাগারে বাস করিয়া শেষে বুঝি আমাদের কারাগারের জন্য মায়া জন্মিল।

স্বরাজের পাঠকগণ বরিশালের ঐ স্মৃতি মনে করিয়া নূতন বর্ষ আরম্ভ করুন। একদিকে স্বদেশমহিমা অপরদিকে বৈদেশিক শাসনের চিত্র সম্মুখে রাখিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করুন।

৪ বৈশাখ পঞ্জাবী পত্রে স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদকের মামলার পুনর্বিচারের রায় বাহির হইয়াছে। চিফ জজ্ বিচার করিয়াছেন। ফল যাহা হইবার হইয়াছে। সব ঠিকঠাক। ছয় মাসের জেলটা সশ্রমের স্থলে, বিনাশ্রমে হইয়াছে। স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক মহাশয়দ্বয়কে যখন জেলে লইয়া যাওয়া হয় তখন তাঁহাদের গাড়ির পশ্চাতে দলে দলে লোক ছুটিয়াছিল। স্থানে স্থানে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল।

উত্তেজিত জনসাধারণের সঙ্গে ফিরিঙ্গি ও পুলিসের একটা হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী উভয়কে জেলে লইয়া যাওয়ার পর '; উত্তেজিত নগরবাসিরা মনের দুঃখে ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতার প্রতি দোষারোপ করিতেছিল। তাহারা বলিতেছিল "ব্রিটিশ ন্যায়পরায়ণতায় ধিক্"। কয়েকজন ফিরিঙ্গির উহা সহ্য হইল না। তাহারা বকাবকি আরম্ভ করিল। শেষটা পুলিসের সাহায্যে লড়াই আরম্ভ করিল। মাথা ভাঙিল, রক্ত ছুটিল, তিনজনকে গেরেপ্তার করিল। লাহোরে কি উত্তেজনাই হইয়াছে একবার পাঠকগণ চিন্তা করিয়া দেখিবেন। অপরাহ্নে বিরাট প্রতিবাদ সভা হইল। দশ সহস্র লোকের একটা প্রকাণ্ড মিছিল বাহির হইল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি লাহোরের আকাশমণ্ডল ভেদ করিয়া উত্থিত হইতে লাগিল। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এই জনসমুদ্র যশোবন্ত আঠাবোলের জয়ধ্বনি ও মাতৃনাম গান করিয়া মনের ক্ষোভ মিটাইল।

একটা কারণে আমরা অবাক হইয়াছি। বহুকাল ধরিয়া এই মোকদ্দমার বিচার চলিয়াছে কিন্তু

আজিও বিচারের সাধ মিটে নাই। এখনও প্রিভি কৌনসিলে কাঁদিবার সাধ আছে। কিমাশ্চর্যমতঃ পরম সিদিসান বা রাজদ্রোহের আইনটা একটা ব্রহ্মাস্ত্রের মত। এই দফাটা যখন যাহার উপর ইচ্ছা চড়াও করা যাইতে পারে।

বেশিদিন নয়; গত অক্টোবর মাসে মুম্বয়ের হিন্দু স্বরাজ্য পত্রের সম্পাদককে একবার এই অস্ত্রদ্বারা আক্রমণ করা হইয়াছিল। তখন বেচারাকে ছয় মাসের মুচলেকা নিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আবার না কি সম্পাদক মহাশয় রাজদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি তাঁহার কাগজে স্বরাজের কথা লিখিলেন। ইহাকে গেরেপ্তার না করিলেই নয় তাই সরকারি উকিলের প্রার্থনা মতে ওয়ারেন্ট জারি করিয়া ৩ বৈশাখ রাত্রি ১১টার সময়ে তাহাকে গেরেপ্তার করা হইয়াছে। রাজদ্রোহ অপরাধ, জামিন দেওয়া যায় না বলিয়া দারোগা আড় হইয়া দাঁড়াইলেন। বেচারা জেলে পচিতেছেন। মোকদ্দমা বিচারাধীন।

হরিপুরের স্বদেশি মামলা কিছুকাল ধরিয়া চলিতেছিল। স্বদেশভক্ত জমিদার শ্রীযুক্ত গোপীমোহন রায়চৌধুরী ও শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী অভিযুক্ত হইয়াছেন। এতদিন পরে এ মোকদ্দমায় রায় বাহির হইয়াছে। দুই সপ্তাহ বিনাশ্রম জেল ও প্রত্যেকের ১৫টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে হইবে।

জমিদার যুবকদ্বয় শাস্তির সংবাদ শ্রবণ করিয়া বিন্দুমাত্র বিচলিত হয়েন নাই। তাহারা কারাদণ্ড মায়ের আশীর্বাদ মনে করিয়া লইয়াছেন, জন্মভূমির চিরগৌরব কামনা করিতে করিতে প্রফুল্লচিত্তে জেলে গমন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মহাহুলুস্থুল পড়িয়া গিয়াছিল। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ এই সাহসী জমিদার যুবকদ্বয়ের অনুগমন করিয়াছিলেন। তাহাদিগকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া সংবর্ধনা করা হইয়াছে। প্রায় সহস্রলোক ইহাদের পশ্চাতে ছুটিয়াছিলেন।

রাজনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় নামক একজন ছোকরা হাকিম এই মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন। রাজনারায়ণ খুব বাহাদুরী দেখাইয়াছেন। আমরা সত্বরই তাঁহার পদোন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হইব। রাজনারায়ণ রায়ের মধ্যে তাহার হাকিমত্ব ফলাইয়াছেন। লিখিয়াছেন—"আমার ইহাদিগকে মাত্র ১ দিনের ও কিছু বেশি টাকা জরিমানা করার ইচ্ছা ছিল; কিন্তু আসামীদের উকিল গর্ব করিয়া বলিয়াছেন যে ইহাদের জেলে দিলে, বঙ্গের শত শত সন্তান ইহাদের পদানুসরণ করিবে। সুতরাং আমি তাহাদের বেশি শাস্তি না দিয়া থাকিতে পারিলাম না।" উকিলের এত বড় স্পর্ধার কথা শুনিয়া হাকিম না ক্ষেপিয়া পারে? তারপর রায় লিখিতে তাহার মেজাজ বুঝিবা কিছু আরও চড়িয়া থাকিবে—তিনি আবার লিখিয়াছেন—

"কেবলমাত্র জরিমানা করিয়া লাভ নাই, কারণ জরিমানা সাধারণের ফন্ড হইতে দেওয়া হয়।"

হাকিমের বুদ্ধির দৌড় দেখিয়া অনেকেই অবাক্ হইবেন।

জামালপুরের কাণ্ড

১৫ বৈশাখ, রবিবার, ১৩১৪

শান্তি রক্ষার জন্য যে সকল গুর্খা আমদানি করা হইল তাহারা দিব্য শান্তিরক্ষা করিতে লাগিল। ইহারা স্থানীয় নিম্ন শ্রেণির গুণ্ডার দলের লোকদের সহিত মিলিত হইয়া মদ খাইয়া স্বদেশি দোকান ও শহরের বেশ্যাগুলির উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করিল। ইহার প্রতিকার করিবার জন্য কাহাকেও অগ্রসর হইতে দেখা গেল না। এদিকে সংবাদ আসিয়াছে—ঢাকার নবাব মৈমনসিংহে আসিতেছেন। গফর গাঁয়ে ইস্কুল খুলিবার উদ্দেশ্যেই নাকি মৈমনসিংহ নবাবের পদরজে পবিত্র হইতে চলিয়াছে। নবাব সাহেবের কুমিল্লা গমনের সঙ্গে সঙ্গে কুমিল্লায় অশান্তির সূত্রপাত

হইয়াছে—একথা কেহই ভুলিতে পারিতেছেন না। আবার মৈমনসিংহে যে সময় জেলা সমিতির অধিবেশন বসিবে ঠিক সেই সময়েই যে ঢাকার নবাবের মৈমনসিংহের যাওয়া বিশেষ আবশ্যক হইয়া পড়িল এ কথাটাও লোকে বেশ সহজেই বুঝিতে পারিতেছে।

গোলযোগের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার জন্য পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট কয়েকজন ভদ্রলোককে থানায় ডাকিয়া পাঠান। শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী মহাশয়ের সুপারিনটেনডেন্ট শ্রীযুত পার্শ্বনাথ সেন, শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী চৌধুরানীর সুপারিনটেন্‌ডেন্ট শ্রীযুত সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুত যোগেন্দ্র কিশোর বাবুর নায়েব শ্রীযুত বিশ্বেশ্বর রায়, উকিল শ্রীযুত মহিমচন্দ্র ঘোষ ও জমিদার শ্রীযুত দ্বারিকানাথ সেন, উকিল শ্রীযুত মহিমচন্দ্র দে, উকিল শ্রীযুত যোগেন্দ্র চন্দ্র দত্ত, মোক্তার শ্রীযুত নিশিকান্ত মুখোপাধ্যায়, হোমিওপ্যাথ শ্রীযুত মন্মথনাথ মহান্ত, শ্রীযুত প্রকাশচন্দ্র দে ও শ্রীযুত নগেন্দ্রমোহন দে—এই কয়জন ভদ্রলোক পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের আহ্বানে থানায় তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। তাহারা থানায় প্রবেশ করিলে তাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়। প্রথম তিনজনের প্রত্যেকে পাঁচশত টাকার জামিন দিয়া খালাস পাইয়াছেন। দুর্গাবাড়ির প্রতিমাভঙ্গের মোকদ্দমা রজু হইয়াছে। কিন্তু কাহারও কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। ভগ্ন প্রতিমার ফটো তোলা হইয়াছে। আমরা উহার একখণ্ড প্রাপ্ত হইয়াছি। এই ফটোর এক এক খণ্ড বিশেষ বিবরণ সহ ভারতের প্রত্যেক হিন্দু দেবমন্দিরে ও প্রত্যেক স্বদেশি সমিতিতে প্রেরণ করিবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

প্রথম দফায় যখন কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক গ্রেপ্তার হন তখনই জনরব রটিয়াছিল যে আরও কয়েকজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করা হইবে। জনরব সত্য হইয়াছে। দ্বিতীয় দফায় তিনজন হিন্দু ভদ্রলোক গ্রেপ্তার হইয়াছেন। তাহাদের নাম যথাক্রমে (১) শ্রীযুত গৌরীশ্বর সান্যাল—ইনি নাটোর মহারাজের নায়েব। (২) শ্রীযুত বিপিন বিহারি মুখোপাধ্যায় ও (৩) শ্রীযুত মুন্সী মফিজদ্দীন—ইনিও একজন মোক্তার। ইনি আবার একজন খাঁটি স্বদেশি তাই মুসলমান হইয়াও এই স্বদেশ ভক্তের এই নিগ্রহ। নায়েব মহাশয়কে হাজার টাকার ও মোক্তারদ্বয়ের প্রত্যেককে পাঁচশত টাকার জামিনে খালাস দেওয়া হইয়াছে। প্রতিমা ভঙ্গের তদারকে চারিজন সাক্ষীর জবানবন্দি লওয়া হইয়াছে। ইহারা পাঁচ জন লোককে সনাক্ত করিয়াছেন। সকালে এই পর্যন্ত তদন্ত করিয়া পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সাহেব তদন্তে ক্ষান্ত হইয়াছেন। অপরাহ্নে হাকিম ও পুলিস সাহেব গুর্খাগণসহ শহর ত্যাগ করেন। তাঁহাদের গন্তব্য স্থানের কথা প্রকাশ নাই—তবে জনরবের মুখে অনেক কথা শুনা যাইতেছে। মৈমনসিংহে যাহাতে এবার জেলা সমিতি না হয়—এবং সুরেন্দ্রবাবু এ অঞ্চলে না আসেন তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্যই নাকি তাহারা মৈমনসিংহে গমন করিয়াছেন। গ্রেপ্তার এখনও চলিতেছে। উপরে লিখিত দ্বিতীয় দফায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করিবার পর শ্রীযুত হরিমোহন দে নামক একজন উকিলকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। ইনি মুন্সিপাল সভায় সহকারী সভাপতি এবং দুর্গাবাড়ি ও জামালপুর জনসাধারণ সভার সম্পাদক — পাঁচশত টাকার জামিনে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আরও জনরব সেরপুরেও নাকি অত্যাচার হইবে। সেখানে সুরেন্দ্রবাবুর যাইবার কথা আছে। সুরেন্দ্রবাবুকে জড়াইয়া এক হাঙ্গামা করিতে পারিলে ব্যাপারটা বেশ জমকালো গোছের হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

জামালপুরে মুসলমান গুণ্ডারা অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে। অত্যাচারের ফলে অনেকগুলি লোক হতাহত হইয়াছে। লাঠির আঘাতে একজন লোকের মৃত্যু হইয়াছে এবং ত্রয়োদশজন লোক গুরুতর আহত হইয়াছে। গুণ্ডাদের তাড়ায় দুইটি বালক প্রাণ ভয়ে নদীতে লাফাইয়া পড়ে। একজন সন্তরণ করিয়া নদী পার হয় অপর বালকটি পার হইতে না পারিয়া ডুবিয়া মারা পড়িয়াছে। পরদিন তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায়। গৌরীপুর অথবা নাটোর জমিদারির দুর্গাবাড়িতে বাসন্তী পূজা হইতেছিল—গুণ্ডারা লাঠির আঘাতে প্রতিমা চূর্ণ করিয়াছে। শুনা যাইতেছে একটি ব্রাহ্মণের

শালগ্রাম শিলা মুসলমানেরা কাড়িয়া লইয়াছে। গুণ্ডারা গৌরীপুরের কাছারি বাড়ির মালখানা লুণ্ঠন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই। তাহাদের দয়াময়ীর মন্দিরে প্রবেশের চেষ্টাও ব্যর্থ হইয়াছে। চারিজন হিন্দুকে গ্রেপ্তার করিয়া জামিনে খালাস দেওয়া হয়।

সোমবার প্রাতে জনরব উঠিল হিন্দুরা এই অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবে তাহারা মুসলমান কাজি ও মুসলমানদিগের মসজিদ আক্রমণ করিবে। এই জনরব উপলক্ষ্য করিয়া সহস্র সহস্র মুসলমান লাঠিহস্তে প্রস্তুত হইল। নদীতীরে মুসলমানগণের জনতা আরম্ভ হইল। হিন্দুরা স্ত্রী-পুত্র পরিবারবর্গকে অত্যাচারের ভয়ে স্থানান্তরিত করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিল। সমস্ত দিন গোলযোগে কাটিয়া গেল। হাকিমের তার পাইয়া সন্ধ্যার সময় কমিশনার গুর্খা সৈন্য লইয়া জামালপুরে পৌঁছিবার পর তিনি হিন্দু-মুসলমান নেতাদের ডাকাইয়া যাহাতে আবার গোলযোগ না হয় তাহার ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। অতঃপর ইনি দুর্গাবাড়িতে গিয়া প্রতিমা ভঙ্গের জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলেন ও গোলযোগের রীতিমত তদন্ত করিবার আশ্বাস দিলেন। সেই দিনই অপরাহ্নে সংবাদ আসিল জামালপুর হইতে চারি মাইল দূরে একটি গ্রামে মুসলমানেরা ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়াছে। হিন্দুর প্রতিমা গুণ্ডাদের লাঠির আঘাতে চূর্ণ হইল—হিন্দুর উপর অত্যাচারের চূড়ান্ত হইল—অথচ চারিজন হিন্দুই গ্রেপ্তার হইল। স্টেশনের কাছে মুসলমান গুণ্ডাদের তাড়া করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট তাহাদের হাতের লাঠি কাড়িয়া লইলেন কিন্তু একজনকেও গ্রেপ্তার করেন নাই।

●

সাময়িক কথা

২২ বৈশাখ, রবিবার, ১৩১৪

মৈমনসিংহে আগুন জ্বলিয়াছে। এই আগুনে জামালপুর ধ্বংসের মুখে চলিয়াছে। দৌরাত্ম্যের অবধি নাই। নিরপরাধ হিন্দু-তীর্থযাত্রীদের উপর মুসলমান গুণ্ডার লাঠি, দোকান লুঠ, কাছারি লুঠ অতি সামান্য অত্যাচার বলা যাইতে পারিত। এবার হিন্দুর দেব বিগ্রহ বাসন্তী মূর্তি চূর্ণ করা হইয়াছে, কুললক্ষ্মী সাধ্বীদের বিবসনা করিয়া অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হইয়াছে। দুর্বৃত্ত মুসলমান গুণ্ডার দল প্রকাশ করিতেছে যে সরকার বাহাদুর তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন। ফিরিঙ্গিদের আচরণ দেখিয়া জনসাধারণের মনে এ বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে। এত দিনে স্পষ্টই মনে হইতেছে—বোঝা তোর ভারী হ'ল ডুব্‌বে তরীখান।

জামালপুরে তদন্তের নামে অর্বাচীন বিধর্মী পুলিসেরা হিন্দুদের উপর যে অত্যাচার করিয়াছে উহা বর্ণনাতীত। ফিরিঙ্গিস্পর্শে পবিত্র ধর্মমন্দির এক্ষণে অপবিত্র হইয়াছে। তদন্তের অছিলায় জোরপূর্বক সম্ভ্রান্ত জমিদারদের বাক্স ও সিন্দুক ও মূল্যবান্ আসবাব নষ্ট করা হইয়াছে। দয়াময়ীর বাড়িতে ৩/৪টি ঘর তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া একখানি লাঠিও পাওয়া যায় নাই। রায় যোগেন্দ্রকিশোর বাহাদুরের তহশীল কাছারির ২০/২৫টা সিন্দুক অকারণে ভাঙা হইয়াছে। পুলিস সাহেব এই কাছারির অনেক মূল্যবান দ্রব্য স্বয়ং নষ্ট করিয়াছেন। গৌরীপুরের শ্রীযুত ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য বাহাদুরের কাছারিতেও ইহারা অনাবশ্যক জুলুম করিয়াছে। এখানে অল্প কয়েকখান লাঠি ছিল। ইহা একটা বিস্ময়ের কথা নহে। বিশ্বেশ্বরী দেবীর মালখানায়ও ফিরিঙ্গিরা প্রবেশ করিয়াছিল। সেখানে সেকালের একখানা তলোয়ার পাওয়া গিয়াছে। মুসলমান গুণ্ডাদের জুলুম হইতে এই সকল ফিরিঙ্গি গুণ্ডাদের জুলুম ভীষণ। শান্তি রক্ষার নামে তদন্তের অছিলায় ইহারা যেরূপ গুণ্ডামি আরম্ভ করিয়াছে ইহা অধিকতর অসহনীয়। ইহাদের কার্য আর গুণ্ডাদের কার্যে বিশেষ প্রভেদ দেখা যায় না। শাসনের নামে পেষণ আর তদন্তের নামে অত্যাচার করিয়া ইহারা শান্তিরক্ষার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে।

জামালপুরে উৎপীড়িত হিন্দুদিগকে নির্যাতন করিবার জন্য কাজি কোটাল দল উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। আর মুসলমান গুণ্ডারা তাহাদের চক্ষুর সামনে দিনে দুপুরে অত্যাচার করিতেছে। মালন্দারহাট জামালপুর হইতে দুই মাইল দূরে। গুণ্ডারা ঐ হাট লুট করিয়াছে। সীতানাথ যোগী এই অঞ্চলের একজন সঙ্গতিসম্পন্ন হিন্দু। তারের খবরে প্রকাশ, গুণ্ডারা ইহার বিধবা পুত্রবধূ ও বিবাহিতা কন্যাকে জোরপূর্বক লইয়া গিয়াছে। জামালপুরের হাঙ্গামায় পুলিস আইনের ১৪৭ ধারার বিধান অনুসারে তথাকার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। দীর্ঘ নামের তালিকা দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। এক কথায় বলিয়া রাখি স্বদেশি আন্দোলনে যে সকল হিন্দু ভদ্রলোক লিপ্ত ছিলেন তাহাদের নাম তালিকায় দেখা গিয়াছে। পরন্তু যদি আর কেহ বাদ পড়িয়া থাকেন, তাহাকেও গ্রেপ্তার করা হইবেই হইবে। পুলিস আশ্বাস দিয়াছে যে আরও কয়েকটি নাম তালিকাভুক্ত হইবে। তদন্ত অতি পাকা রকমের হইবে। কাহারও কোন আপশোস থাকিবে না। মুসলমানকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তবে যাহারা ধরা পড়িয়াছে হিন্দুদের সহিত তাহাদের সহানুভূতি আছে বলিয়া প্রকাশ।

১৫ বৈশাখ তারিখে মৈমনসিংহে জেলা সমিতির বৈঠক বসিয়াছিল। সভাপতি ছিলেন সঞ্জীবনী সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র মহাশয়। বেলা তিনটার সময় সভার কার্যারম্ভ হয়। সকলেই জামালপুরের দুর্ঘটনায় অতিমাত্র উৎকণ্ঠিত ছিলেন বলিয়া সভায় তেমন উদ্যম প্রকাশ পায় নাই। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মিঃ গজনবী হিন্দু ও মুসলমানের একতার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। সভাপতি মহাশয় বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশি, বিদেশি বর্জন ও হিন্দুমুসলমান সম্মিলনের কথা আলোচনা করিয়াছেন। তিনি সকলকে স্বর্গীয় আনন্দমোহনের ঘোষণার কথা স্মরণ করিয়া বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালাইতে আহ্বান করিয়াছেন।

শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁহার কয়েকজন সঙ্গী এই সভায় যোগদান করিয়াছেন। তিনি একটি প্রাণস্পর্শী বক্তৃতায় কুমিল্লা, মগরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও জামালপুরের অবস্থা বর্ণনা করিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করিয়াছেন যে এই সকল স্থানের বিরোধ হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ হইতে উৎপন্ন হয় নাই। সরকার পক্ষ রাজনীতির চাল চালিয়া এক পক্ষকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে লাগাইতেছেন। তিনি মুসলমানকে আহ্বান করিয়া বলিয়াছেন যে তাহারা যেন এই ফাঁদে পা দিয়া আপনাদের ও দেশের অনিষ্ট সাধন না করে।

সভায় স্বদেশি, স্বরাজ, বয়কট, জাতীয় শিক্ষা ও জেলা সমিতি সংস্থাপন প্রভৃতি নানা কথা আলোচিত হইয়াছে।

চারিদিকে অবাক্ কাণ্ড আরম্ভ হইয়াছে। ধর্মের গ্লানি, অধর্মের অভ্যুত্থান দেখা যাইতেছে। জামালপুরের বাসন্তী রতিমা চূর্ণ ও সতীর অবমাননার ন্যায় চন্দ্রনাথ তীর্থেও এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটিয়াছে। তথাকার উচ্চ পর্বতোপরি মন্দির মধ্যস্থ বিরূপাক্ষ চূর্ণীকৃত হইয়াছে। কোন হতভাগ্য কাহার প্ররোচনায় কি সাহসে যে এই কাণ্ড করিয়াছে উহা অদ্যাপি জানা যায় নাই। হায় ভারতীয় হিন্দু। কবে তোমরা পরমুখাপেক্ষী না হইয়া আপনাদের ধর্ম ও কুললক্ষ্মীদের সম্মান রক্ষা করিতে সক্ষম হইবে? শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় টাঙ্গাইলে স্বদেশি প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। তথায় মহিলাগণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে বিশেষ আড়ম্বর সহকারে অভ্যর্থনা কবিয়াছেন। মহিলারা সঙ্গীত ও স্তোত্র পাঠ করিয়া তাঁহাকে সম্মান দেখাইয়াছেন। তাঁহারা সুরেন্দ্রবাবুকে পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া রৌপ্যাধারে একটি সুবর্ণ বন্দেমাতরম্ স্মৃতি চিহ্ন প্রদান করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু মহিলাদিগকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে তাঁহাদিগের পুত্রদিগকে মনুষ্যত্ব ও স্বদেশপ্রীতি শিক্ষা দিয়া মাতার কর্তব্য সাধন করিতে অনুরোধ করিয়াছেন।

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বহুদিন ধরিয়া মান্দ্রাজ অঞ্চলে স্বরাজ প্রচার করিতেছেন। বিজয়

পট্টম, রাজমন্ত্রী, বিজয়ান গ্রাম, বেজওয়াড়া কোকোনদ প্রভৃতি স্থানে বক্তৃতা করিয়া তিনি মান্দ্রাজ নগরে পৌঁছিয়াছেন। শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রমুখ দেশহিতৈষী ব্যক্তিবর্গ তাঁহাকে বিশেষ আড়ম্বর সহকারে অভ্যর্থনা করিয়াছেন। তিনি গত মঙ্গলবার তথায় উপস্থিত হয়েন। বিরাট মিছিল করিয়া ইস্টেশান হইতে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া হয়। পথিমধ্যে স্বদেশি বস্ত্র প্রচারিণী সভা, ছাত্রসমাজ ও সাহিত্য সভা পালমহাশয়কে তিনখানি অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। পাল মহাশয় ও শ্রীযুত সুব্রহ্মণ্য আয়ার একই গাড়িতে যাইতেছিলেন। পুষ্পমাল্যে তাঁহাদের গাড়িখানি পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। বুধবার অপরাহ্লে পাল মহাশয় একটি বক্তৃতা প্রদান করিয়াছেন।

কুমিল্লার গুলির মামলা দায়বায় সোপর্দ হইয়াছে। ২৯ শে এপ্রিল শুনানি হইয়া গিয়াছে। ৩ জুন রায় দেওয়া হইবে।

লুটের মামলা আজব যুক্তিতে ডিস্‌মিস্‌ করা হইয়াছে। যাক একটা গোলযোগ যেনতেন প্রকারেন চুকিয়া গেল। স্পেশাল কোর্টে খুব মোকদ্দমা চলিতেছে। হিন্দু নেতারা অভিযুক্ত হইয়াছেন। তাহাদের কি বলিয়া দোষী সাব্যস্ত করা হইবে ম্যাজিস্ট্রেট বাহাদুর এই চিন্তায় ব্যস্ত হইয়াছেন। সরকারি উকিল ডিপুটি ও পুলিসের রিপোর্টের দোহাই দিয়া দেখাইয়াছেন যে ইহাদের ধরিবার কোন উপায় নাই। ম্যাজিস্ট্রেট সোমবার এ বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিবেন। মগরার লুটের সম্বন্ধে পুলিসের রিপোর্ট ও ডিপুটির রিপোর্টে প্রকাশ যে অভিযুক্ত উকিল উপেন্দ্র বাবু ঘটনাস্থলে ছিলেন না। তিনি ডিপুটির সহিত ছিলেন। প্রতি দিনই সব আজব খবর পাওয়া যাইতেছে।

এতদিন ফিরিঙ্গির গুলি নাকি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া নেটিভের জীবন নাশ করিত। এখন আবার ফিরিঙ্গিনীর গুলি ভুলে এদেশবাসীর প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মরাজ্যের একখানি কাগজে প্রকাশ যে ২৮ এপ্রিল একজন কুলি পথের পার্শ্বে একটা ঘরের ছায়ায় বিশ্রাম করিতেছিল। স্টুয়ার্ট নাম্নী এক ফিরিঙ্গিনী নিকটবর্তী ঘরের ছাদ হইতে গুলি চালাইয়া হতভাগ্যকে হত্যা করে। দিনে দুপুরে প্রকাশ্য স্থলে নিরপরাধী কুলিকে পশুভ্রমে হত্যা করা সম্ভব নহে। মুমূর্ষু মৃত্যুকালে ঘটনার যথাযথ বর্ণনা দিয়া গিয়াছে। কিন্তু উহাতে ফল নাই। বিচার একটা হইলেও হইতে পারে কিন্তু আদালতে সুবিচারের আশা করা বাতুলতা বই আর কি? প্রাণ রক্ষার জন্য আপনারা প্রস্তুত না হইলে এ কলঙ্ক আর দূর হইবার নহে। আর এদেশ কত শত নিরপরাধ ব্যক্তির পবিত্র শোণিতে সিক্ত হইবে কে বলিবে?

রাওলপিণ্ডিতে জনসাধারণ ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে। ২১ এপ্রিল শ্রীযুত অজিত সিংহ সেখানে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন উহাই গোলযোগের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ দিনের সভার সভাপতি সম্পাদক ও বক্তা শ্রীযুত হংসরাজ, গুরুদাশ্রম ও অমলকরাম এই তিন জনকে ১২৪ ও ৫০৫ ধারা অনুসারে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। ২ মে বিচারের তারিখ। ভয়ানক ব্যাপার আদালতে ১৫,০০০ হাজার লোক উপস্থিত হইল। তোপখানায় ও রেলওয়ের কারখানায় জনপ্রাণী ছিল না।

উত্তেজিত জনসাধারণ কয়েকজন ফিরিঙ্গির গৃহ, গির্জা কারখানা ও স্কুল ভাঙিয়া ফেলিয়াছে। ফিরিঙ্গিরা ভয়ে থরথরি কাঁপিতেছে—কি হয়, ভাবিয়া ব্যাকুল। ৩ তারিখের সভায় শ্রীযুত লালা লাজপৎ রায়কে বক্তৃতা করিতে দেওয়া হয় নাই। ইহাতে লোক আরও উত্তেজিত হইতেছে। সশস্ত্র গোরা ও জঙ্গী পুলিস রাস্তায় পাহারা দিতেছে। রাওলপিণ্ডি শহরটা যে কি উত্তেজনার ক্ষেত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা বর্ণনাতীত। লোকেরা দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে নাই। যাহারা অত্যাচার করিতেছে পুরুষবাচ্চার মত তাদের সঙ্গে বোঝাপড়া করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা সদর্পে দাঁড়াইয়াছে। শহরের অবস্থা দেখিয়া ফিরিঙ্গির আক্কেল গুড়ুম হইয়াছে। দোকানপাট বন্ধ। ফিরিঙ্গিরা তরকারি ও মাংস পাইতেছে না। চারিশত লোক ফিরিঙ্গি তোষাখানার কার্য ছাড়িয়া দিয়াছে। রেলের কারখানার লোকেরা হাত গুটাইয়া বসিয়াছে—কারখানা বন্ধ। ফিরিঙ্গিদের বাড়ি ঘর রক্ষার জন্য

কেল্লা হইতে ফৌজ আনিতে হইয়াছে। তিন চারিটা ফিরিঙ্গি বাড়িতে বড় রকমের চুরি হইয়াছে। জজ সাহেবের বাড়ি বাদ পড়ে নাই। ছোটখাট দাঙ্গা হরদম চলিতেছে। ফিরিঙ্গি এবার শক্তের হাতে পড়িয়াছে।

২ মে তারিখের তারের খবরে প্রকাশ যে জঙ্গি পুলিস ঝালকাঠিতে অকথ্য অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। দোকানদারদের জিনিস লইয়া উহার দাম দিতেছে না। জোরপূর্বক বারাঙ্গনাদের উপর অত্যাচার করিতেছে। নিকটবর্তী গ্রাম সমূহের চৌকিদারগণ লাঠি ও সড়কি লইয়া পুলিসের হুকুমে সমবেত হইয়াছে। ব্যাপারখানা কি? মগের মুল্লুক নাকি!



সাময়িক কথা

১২ জ্যৈষ্ঠ রবিবার ১৩১৪

ফিরিঙ্গি সরকার এখন চারিদিকে সিদিসানের স্বপ্ন দেখিতেছেন। পঞ্জাব ও মুম্বয়ের কয়েকখানি নামজাদা কাগজের সম্পাদককে সিদিসানের অপরাধে গ্রেপ্তার করিয়া জেলে দেওয়া হইয়াছে। এখন গুজরানওয়ালার বিংশতি বর্ষীয় একটি বালক সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই বালকটির নাম লালা পিণ্ডিদাস। "ইণ্ডিয়া" নামে ইঁহার একখানি উর্দু সাপ্তাহিক কাগজ আছে। এই কাগজে বিগত এপ্রিল মাসে আমেরিকা প্রবাসী একজন ভারতীয় সেনার একখানি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। সরকারের মতে ঐ পত্রখানি সিদিসানের উত্তেজক। শুনা যাইতেছে দেশীয় সেনা মহলে এই কাগজখানির বিলক্ষণ প্রচার। তাই সরকার হইতে তাড়াতাড়ি ইহার সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সম্পাদক পিণ্ডিদাস ভোরের বেলায় ঘুমাইতেছিলেন। এমন সময়ে পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ উইলকিন্স সদলবলে ইঁহাকে গ্রেপ্তার করেন। পরে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মিঃ ফিলিপসের সঙ্গে ইহাকে লাহোরে পাঠানো হয়। পঞ্জাবী পত্রের সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে যাঁহার নিকটে তাঁহাদের বিচার হইয়াছিল—লাহোরের সেই নামজাদা হাকিম মিঃ ম্যান্ট এই মোকদ্দমার বিচার করিবেন। আর পঞ্জাবীর মামলায় সরকারের তরফে যিনি মোকদ্দমা চালাইয়াছিলেন সেই মিঃ বিভান পেমান সাহেবই এবারও মোকদ্দমার তদ্বির করিবার জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে ভারতসচিব মিঃ মরলী আভাসে ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন—আর একখানি কাগজের নামেও শীঘ্রই রাজদ্রোহের মামলা উপস্থিত করা হইবে। সকলেই মনে করিতেছেন—এই "ইণ্ডিয়াই" বোধ হয় সেই 'আর একখানি' কাগজ। কেন না কিছু দিন হইতে এই কাগজখানার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিবার জল্পনা কল্পনা হইতেছিল এবং জনরবে এই কথা শুনিয়া শ্রীমান পিণ্ডিদাস নিজের কাগজে লিখিয়াছিলেন যে প্রতি তিন মাস অন্তর একজন করিয়া সম্পাদককে জেলে পাঠানো হইলেও বারো বৎসর কাগজ চলিতে পারে তিনি এমন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সাবাস পিণ্ডিদাস—তুমি শেরকা বাচ্চা বটে!

নেবা রোগ উপস্থিত হইলে ব্যাধির প্রকোপে রোগী সমস্ত জিনিসই হরিদ্রা বর্ণের দেখে। ফিরিঙ্গিরও দশা তাই ঘটিয়াছে। উহারা চারিদিকে সিদিসনের বীজানু দেখিতেছে দেশের সর্বত্র এতদিন ধরিয়া শিবাজী উৎসব প্রতাপাদিত্য উৎসব বেশ নির্বিবাদে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছিল, এ পর্যন্ত কোন কথা উঠে নাই। কিন্তু রোগের প্রবল তাড়নায় ফিরিঙ্গির চোখে এই সকল শান্তিপূর্ণ উৎসবগুলিও বিভীষিকাময়ী বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তাই স্থানে স্থানে পুলিসের সাহায্যে শিবাজী ও প্রতাপাদিত্য উৎসব বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে পুলিসও পূর্বাহ্নেই উৎসব বন্ধ করিয়া দেয়। বঙ্গের স্থানে স্থানে উৎসব হইয়াছে—আবার কোন কোন স্থলে মোটেই হইতে পারে নাই। ফিরিঙ্গির এই ভয় দেখিয়া দেশের লোকে মুখে কাপড় দিয়া কেবলই হাসিতেছে।

বরিশালের যুবকদল বরাবর বাঙ্গালাদেশের মর্যাদা রাখিয়া আসিয়াছেন—আজও রাখিতেছেন। তাঁহাদের হাতে বাংলার বাঁশের লাঠিজন্ম সার্থক হইয়াছে। এই সকল যুবকের লাঠির গুণে ফিরিঙ্গির চমক লাগিয়া গিয়াছে। বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট হুকুম দিয়াছেন—শহরের ভিতর কেহ সন্ধ্যার পর হইতে সূর্যোদয় পর্যন্ত লাঠি লইয়া রাস্তায় বাহির হইতে পারিবে না। কুমিল্লা, ত্রিপুরা, জামালপুর, দুর্গাবাড়ি, মৈমনসিংহ প্রভৃতি অঞ্চলে মুসলমান গুণ্ডারা হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। বরিশালেও এই রূপ আশঙ্কা যে হয় নাই এমন নহে। কিন্তু বরিশালের যুবকেরা বীরদর্পে প্রচার করিয়াছেন যে কুমিল্লা জামালপুরের হিন্দু গৃহস্থদের মত তাহারা ফিরিঙ্গির পুলিসের উপর বিশ্বস্তচিত্তে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিবেন না। গুণ্ডাদের অত্যাচার হইতে জীবন ও ধনসম্পত্তি, জননী ভগিনী স্ত্রীর সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার্থ তাহারা লাঠির সাহায্য গ্রহণে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ফিরিঙ্গি এখন রাত্রে লাঠি লইয়া পথে বাহির হইতে মানা করিতেছে—তবে এক ইঞ্চি মোটা ও সাড়ে তিন ফুট লম্বা ছড়ি ব্যবহারে ফিরিঙ্গির আপত্তি নাই। ফিরিঙ্গির অনুগ্রহ কত তা দেখ।

চট্টগ্রামের চকবাজার হইতে বিপিনবাবুর নামে একখানি চিঠি আসিয়াছে। উহাতে পত্র প্রেরকের নাম বা ঠিকানা কিছুই লেখা নাই। কিন্তু এদিকে চিঠিতে বিপিন বাবুকে খুন কবিবার ভয় দেখানো হইয়াছে। চিঠি পাইয়াই, শুনিলাম, বিপিনবাবু বাসায় গিয়া মরিয়া আছেন। চিঠিখানি বাংলায় লেখা—চিঠিতে লেখকের নাম নাই বটে, কিন্তু লেখক মুসলমান সায়েদ বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়াছে। লেখকের প্রতি কথায় তাহার হৃদয়ের অতি নিকৃষ্ট জিঘাংসা বৃত্তির পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কে এই লোকটি? ইংলণ্ডে ফুলটন নামক একটা লোক তত্রত্য রাজমন্ত্রী ডিউক অব বাকিংহামের প্রতি এইরূপ জিঘাংসার পরিচয় দিয়াছিল। লোকটা ঢাকার নবাব সালিমুল্লার কোন মোল্লা অনুচর নয় ত?

গত ৭ জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় বাগবাজার অঞ্চলে মহা হুলুস্থুল কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। ঐ দিন অপরাহ্ণে বিদন বাগানে একটি সভা হইয়াছিল। শ্রীযুত ললিতমোহন ঘোষাল মহাশয় ঐ সভায় বক্তৃতা করিয়া কার্যবশতঃ সভাভঙ্গ হইবার পূর্বেই সভাস্থল ত্যাগ করেন। তাঁহার পরে মৌলবী লিয়াকৎ হোসেন বক্তৃতা করিতে উঠেন। তিনি দুই চারি কথা বলিবার পর একজন যুবক দৌড়িয়া আসিয়া সভাস্থলে প্রচার করিল যে বাগবাজারে ললিতমোহন বাবুর বাড়ি লুঠ হইতেছে। এই সংবাদ প্রচারিত হইবামাত্র মোটা মোটা লাঠি হস্তে যুবকের দল বাগবাজারের দিকে ছুটিল। পথে অনেক লোক তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল। এইরূপে বিদন বাগান হইতে ললিত বাবুর বাড়িতে যাইবার পথে দুই হাজার লোক একত্র হইল। এই সকল লোক ঘোষাল মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বলিল আমরা আপনাকে ও আপনার বাড়ি রক্ষা করিতে আসিয়াছি। ললিত বাবু ত শুনিয়া অবাক! পরে দুই চারি কথায় যুবকেরা বুঝিতে পারিল তাহারা প্রতারিত হইয়াছে। তখন তাহারা অপ্রস্তুত হইয়া ফিরিয়া আসে। মোটের উপর সে দিন শহরের উত্তরাঞ্চলে একটা সোরগোল পড়িয়া গিয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় কোন হাঙ্গামা হয় নাই। কিন্তু কলিকাতার অস্থায়ী শহরকোটাল হালিদে সাহেব এই ব্যাপারটাকে ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি ললিত বাবুকে ভয় দেখাইয়া একখানি চিঠি লেখেন যে সেদিন শক্তি সমিতির যুবকগণের—ললিত বাবু শক্তি সমিতির সভাপতি—ব্যবহার দেখিয়া তাহার ধারণা হইয়াছে যে তখন বিলক্ষণ শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা ঘটিয়াছিল। এবারকার মত যাহা হইয়াছে তাহা হইয়াছে। অতঃপর শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা দেখিলে সভা সমিতি বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে। ললিত বাবু এই চিঠির জবাবে লেখেন মঙ্গলবার বিদন বাগানে যে সভা হইয়াছিল তাহার সহিত শক্তি সমিতির কোন সম্পর্ক ছিল না। এন্টি পার্টিশন প্রোসেসন পার্টির সভ্যগণের চেষ্টায় এই সভা আহূত হয়। আর তিনি নিজে ঐ সভায় যতক্ষণ উপস্থিত ছিলেন ততক্ষণের মধ্যে তিনি শান্তিভঙ্গের কোন রূপ সম্ভাবনা দেখেন নাই। ব্যাপারটা আপাততঃ এই পর্যন্ত। কিন্তু এখানেই এ ব্যাপারের শেষ হইবে বলিয়া বোধ হয় না।

দেশের ভাবভঙ্গী দেখিয়া ফিরিঙ্গি সরকার বড়ই ভয় পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হইতেছে। দেশের লোকের মুখ বন্ধ করিবার জন্য সিদিসানের আইন সরকারি গুপ্ত সংবাদ বিষয়ক আইন প্রভৃতি নানাবিধ আইনের নাগপাশে বাঁধিয়াও ফিরিঙ্গি সরকার নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেছেন না। সেই জন্য অস্থায়ী ভাবে আইন করিয়া পূর্ববঙ্গ ও পঞ্জাবে সভা সমিতির অধিবেশন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পঞ্জাবের কোন কোন স্থলে পাঁচজন লোক একত্র হইলেই তাহাদের গুলি করা হইবে বলিয়া হুকুম হইয়াছে—তাহার কথা সকলেই জানেন। এক্ষণে নূতন আইনে ব্যবস্থা হইয়াছে—স্থানীয় সরকারি কর্মচারীর অনুমতি না লইয়া কেহই সভাসমিতি আহ্বান করিতে পরিবেন না। পূর্ববঙ্গে ত্রিপুরা, কুমিল্লা, বরিশাল, পাবনা, ঢাকা, মৈমনসিংহ, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, রঙ্গপুর, হবিগঞ্জ ও সুধারামপুর থানার এলাকাধীন স্থান সমূহে এই মিন্টো রুবকারী জারি হইয়াছে। সরকারি গেজেটে এই সংবাদ ঘোষণা করা হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় এই আইনে দেশের উপকার হইয়াছে। সভা সমিতি অনেক হইয়া গিয়াছে—সভা সমিতির উদ্দেশ্য—লোক শিক্ষা তাহাও প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধ হইয়াছে। এখন কাজের সময় আসিয়াছে। এতদিন সভাসমিতিতে লোকের মন অনেকটা নিযুক্ত থাকিত—এখন আসল কাজ করিবার প্রচুর সময় পাওয়া যাইবে।

●

শ্রীযুত বিপিনচন্দ্র পাল মান্দ্রাজ অঞ্চলে প্রচার করিতে গিয়াছিলেন। মান্দ্রাজ প্রদেশের নানাস্থানে সভা-সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া তিনি স্বরাজ প্রচার করিয়া আসিয়াছেন। মান্দ্রাজে আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছে। লালা লাজপত রায় যখন অতর্কিতভাবে ধৃত হইয়া নির্বাসিত হন তখন বিপিনবাবু মান্দ্রাজ শহরে অবস্থিতি করিতেছিলেন। তারে এই সংবাদ পাইয়া লাজপতের বন্ধুত্ব স্মরণ করিয়া তিনি এতদূর বিচলিত হইয়া পড়েন যে আর একদণ্ডও সেখানে তিষ্ঠিতে পারেন নাই। মান্দ্রাজে সভার উদ্যোগ হইয়াছিল সেই সভায় বিপিনবাবুর বক্তৃতা করিবার কথা ছিল। সে সমস্তই বন্ধ করিতে হয়। বিপিনবাবুর এই কলিকাতা প্রত্যাগমনের ব্যাপার লইয়া দুষ্ট লোকের মুখে তাঁহার অনেক নিন্দাবাদ প্রচারিত হয়। কেহ কেহ বলেন যে পুলিশের তাড়নায় বিপিনবাবুকে মান্দ্রাজ ছাড়িয়া চলিয়া আসিতে হয়। এই কথা লইয়া বিপিনবাবুর একজন ব্যারিষ্টার বন্ধু তাঁহাকে একখানি চিঠি লিখেন। বিপিনবাবু তাহার জবাবে লিখেন মান্দ্রাজী পুলিশ গ্রেপ্তার বা চালানের ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে মান্দ্রাজ ত্যাগ করিতে বলিয়াছে এই জনরব সম্পূর্ণ অসত্য। বিপিনবাবু তাঁহার চিঠিখানি প্রকাশিত করিতে অনুমতি দেন। উভয় পত্রই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা বলি নিন্দুকের রসনা চিরকাল মিথ্যা প্রচার করিবে। তাহার প্রতিবাদ অনর্থক ও অনাবশ্যক।

●

ঢাকার নবাব সলিমুল্লা একদিকে বেতনভোগী মোল্লা প্রেরণ করিয়া দেশের চারিদিকে হিন্দু মুসলমানে গৃহবিবাদ পাকাইতে চেষ্টা করিতেছেন। আর এদিকে মুরশিদাবাদের দিকে চাহিয়া দেখ। মুরশিদাবাদের নবাব নাজিম এক রুবকারী প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে তিনি হিন্দু-মুসলমানকে তাহাদের চিরকালের রীতি অনুযায়ী সদ্ভাবে বসবাস করিতে উপদেশ দিয়াছেন। গুণ্ডাদের অত্যাচারের কাহিনীর উল্লেখ করিয়া ইনি যথেষ্ট দুঃখ প্রকাশও করিয়াছেন। নবাব সাহেব আরও বলেন—হিন্দু মুসলমানে বিবাদে উভয় পক্ষের বলক্ষয় ও ফলে দেশের পক্ষে ঘোর অমঙ্গল। আর এই উভয় সম্প্রদায়ের সদ্ভাবের উপর দেশের মঙ্গল নির্ভর করিতেছে। যে হিন্দু মুসলমানে বিবাদ বাধাইতে চায় সে দেশের শত্রু সমাজের শত্রু নিজের শত্রু।

এ সকল কথা মুরশিদাবাদের নবাব বংশধরের উপযুক্তই বটে। যাহারা পুরুষানুক্রমে নবাব তাহাদের নবাবী চাল আমিরী মেজাজ যাইবে কোথায়? মুরশিদাবাদ ও ঢাকার নবাব উভয়েই মুসলমান কিন্তু উভয়ের প্রভেদ কত দেখ—জমিন্ আসমান্ ফারাক।

AMRITA BAZAR PATRIKA

Bi-Weekly Edition

বঙ্গভঙ্গের সরকারি ঘোষণা হয় ১ সেপ্টেম্বর ১৯০৫

September 3, 1905

Partition Proclamation

Simla, 1 September, 1905.

(1) The following proclamations to which the sanction of His Majesty the King Emperor of India has been signified by the Secretary of State for India in Council is published :-

The Governmor-General is pleased to constitute the territories at present under the administration of the Chief Commissioner of Assam to be for the purposes of the Indian Councils Act 1861 (24 and 25 Vict 067) a province to which the provisions of that Act touching the making of laws and regulations for the peace and good order of the presidencies of Fort St. George and Bombay shall be applicable and to direct that the said province shall be called and known as the province of Eastern Bengal and Assam, and further to appoint the Honourable Mr. Joseph Bamfylde Fuller C.S.I., C.I.E. of the Indian Civil Service, now Chief Commissioner of Assam, to be the first Lieutenant-Governor of that province, with all powers and authority incident to such office.

(2) The Governor-General in Council is pleased to the sixteenth day of October, 1905, as the period at which the said provisions shall take effect and 15th or the number of councillors whom the Lieutenant-Governor may nominate for his assistance in making laws and regulations.

(3) The Governor-General in Concil is further pleased to declare and appoint that upon the constitution of the said province of Eastern Bengal and Assam the districts of Dacca, Mymensingh, Faridpur, Backergunge, Tippera, Noakhali, Chittagong and Chittagong Hill Tracts, Rajshahi, Dinajpur, Jalpaiguri, Rangpur, Bogra, Pabna and Malda which now form part of the Bengal Division of the Presidency of Fort William shall cease to be subject to or included within the limits of that Division, and shall thenceforth be subject to and included within the limits of the Lieutenant Governorship of the province of Eastern Bengal and Assam.

A Government NOTIFICATION

Simla, 1 September, 1905.

The following proclamation is also issued in exercise of the powers vested in him by Section 4 of the Government of India Act 1865 (28 and 29 Vict. C. 17) :-

The Governor-General in Council is pleased to declare and appoint that, with effect from the 16th day of October, 1905, the district of Sambalpur (except the Chandarpur Padampur Zamindari and the Phulghar Zamindari) which now forms

part of the Central Provinces and shall be subject to one included within the limits of the Bengal division of the Presidency of Fort William. It is notified in exercise of the power conferred by the Indian High Courts Act 1865 (28 and 29 Vict C 15) Section 3, the Governor-General in Council is pleased to authorise and Impower the High Court Judicature at Fort William in Bengal to exercise...........from the sixteenth day of October within that portion of his.............Dominions in India which is comprised within the limits of the Sambalpur disrict (except the Chandarpur – Padampur Zamindari and the Phulghar Zamindari) and is not included within the limits of the places for which the said High Court may from time to time exercise within the limits of the places for which the said High Court was established.

বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয় ১৯১১-র ডিসেম্বরে। কিন্তু তা কার্যকর হয় ১৯১২-র মার্চে। বঙ্গভঙ্গ রদের ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি ছিল এইরকম :

Announcement by His Imperial Majesty.

"We are pleased to announce to Our people that on the advice of Our Ministers, tendered after consultation with Our Governor General in Council we have decided upon the transfer of the seat of the Government of India from Calcutta to the ancient capital of Delhi, and simultaneously, and as a consequence of that transfer, the creation at as early a date as possible of a Governorship for the Presidency of Bengal, of a new Lieutenant-Governorship for the Presidency of Bengal, of a new Lieutenant-Governorship in Council administering the areas of Behar, Chota Nagpur, and Orissa and of a Chief Commissionership of Assam, with such administrative changes and redistribution of boundaries as Our Governor-General in Council, with the approval of Our Secretary of State for India in Council, may in due course determine.

"It is Our earnest desire that these changes may conduce to the better administration of India, and the greater prosperity and happiness of Our beloved people."

NOTIFICATION

Calcutta the 22nd March 1912.

No. 290.—The following Proclamation, to which the sanction of His Majesty the King, Emperor of India, has been signified by the Secretary of State for India in Council is hereby published :—

PROCLAMATION

In exercise of the power conferred by section 47 of the Indian Council Act., 1861 (24 and 25 Vict., c. 67) and of all other powers enabling him in this behalf, the Governor-General-in-Council is pleased to declare and appoint that, on and from the first day of April 1912, the territories specified in the Schedule hereto annexed shall be and continue subject to the Presidency of Fort William in Bengal.

SCHEDULE

Part I. Territories which are now administered by the Lieutenant-Governor of Eastern Bengal and Assam.

1. The Chittagong Division, comprising the districts of Chittagong, the Chittangon Hilltracts, Noakhali and Tippera.

2. The Dacca Division, comprising the districts of Bakarganj, Dacca, Faridpur and Mymensing.

3. The Rajshahi Division, comprising the districts of Bogra, Dinajpur, Jalpaiguri, Malda, Pabna, Rajshahi and Rangpur.

Part II. Territories which are now administered by the Lieutenant-Governor of Bengal in Council

4. The Burdwan Division, comprising the districts of Bankura, Birbhum, Burdwan, Hooghly, Howrah and Midnapur.

5. The Presidency Division, comprising the town of Calcutta and the district of Jessore, Khulna, Murshidabad, Nadia and the 24 Parganas.

6. The disrict of Darjeeling.

NOTIFICATION

Calcutta the 22nd March 1912.

No. 291—In exercise of the power conferred by section 3 of the Government of India Act, 1854 (17 and 18 Vict., c 77) and with the sanction and approbation of the Secretary of State for India, the Governor-General in Council is pleased to issue the following Proclamation :–

PROCLAMATION

The following territories, which are now included within the Province of Eastern Bengal and Assam, namely :—

the Assam Valley Districts Division, comprising the districts of Darrang, Garo Hills, Goalpara, Kamrup, Lakhimpur, Nowgong and Sibsagar, and the Surma Valley and Hill districts Division, comprising the districts of Cachar, Khasi and Jaintia Hills, Lushai Hills, Naga Hills and Sylhet,

shall, on and from the frist day of April 1912, be taken under the immediate authority and management of the Governor-General of India in Council and formed into a Chief Commissionership, to be called the Chief Commissionership of Assam; and Sir Archadale Earle, K.C.I.E. is hereby appointed to be the Chief Commissioner of Assam, with effect from that date.

H. WHEELER

Offg. Secretary to the Government of India.

16th February, 1905

CONVOCATION OF THE CALCUTTA UNIVERSITY

The annual Convocation of the Calcutta University was held on Saturday last at the Senate Hall at 3 P.M.

THE CHANCELLOR'S ADDRESS

His Excellency the Viceroy, who is also the Chancellor of the Calcutta University addressed the assembled graduates as follows :–

I do not propose to address you today upon purely educational topics. I have often inflicted them upon previous convocations. I would like to turn aside for half an hour those dusty fields and to talk to you about something which is even more personal to the undergraduate body, namely, yourselves and the work that

lies before you. The majority of you are about to do what I remember so well doing myself, though it is now rather a long time ago, namely; to gather up the advantage of such education as you have received and with this bundle on your back to start forth on the big road which we call life. What will it mean to you, and what are its lessons?

I do not pretend to know what lies in the mind of young India, or even of that small section of it which I am now addressing. Difference of race carries with it difference of ideas. The currents of the East and West may flow between the same banks, as I belive it is their destiny to do for long generations to come. But they never absolutely commengle; and I dare say when I try to put myself in your place and to see what is in your minds I altogether fail to succeed, I am confident sometimes that it is so when I have observed the obscure meanings attached by Indian commentators to what has seemed to me to be simple and true. Conversly I am quite sure that the Englishman often fails to understand what the Asiatic mind has been pondering over, and is led perhaps by exaggaration of language into thinking that there was corresponding extravagance of thought, whereas there may have been none at all. These are the dangers common to all of us who walk to and fro on the misty arch that spans the gulf between East and West. But there are certain ideals which are the common property of all humanity irrespective of country or race. These are of universal application, and among this class there are some that are peculiarly applicable to the Indian situation and the Indian character. In the contemplation of these we are on common ground, and it is to them that I wish to call your attention this afternoon.

I place in the front rank of these principles, truthfulness. The truth is not merely the opposite of lie. A dumb man would find it difficult to tell a lie, but he might be guilty of untruth everyday of his life. There are scores of people who pride themselves on never telling a falsehood, but who are yet habitually false-false to others, and, what is worse false to themselves. Untruthfulness consists in saying or doing anything that gives an erroneous impression either of one's own character or of other people's conduct or of the facts and incidents of life. We all succumb to this It is the most subtle of temptations. Men who make speeches, men who plead cases men who write articles in the newspaper, men who are engaged in business even the ordinary talker at a dinner table, each of us for the sake of some petty advantage or momentary triumph is tempted to transgress. The degree of non truth is so slight that it does not seem to amount to untruth. We salve our conscience by thinking that it was a pardonable exaggeration. But the habit grows. Deviation from truth slides by imperceipitble degrees into falsehood, and the man who begins by crediting himself with a fertile imagination merges by imperceptible degrees into a finished liar But an even commoner form of untruth is the unspoken untruth—the doing something which consicence condemns as not quite straight, but for which the reason is always finding something as an excuse. Those who encourage this tendency end by becoming two human being in the same form, like the Doctor Jekyll and Mr. Hyde of Stevenson's story. Perhaps the guilty man prides himself on being complex. He is really corrupt; and one day he wakes up to find that he can no longer resume the good habit, but must remain the base or distorted deformity for ever.

I hope, I am making no false or arrogant claim when I say that the highest ideal of truth is to a large extent a Western conception. I do not thereby mean to claim that Europeans are universally or even generally truthful, still less do I mean that Asiatics deliberately or habitually deviate from the truth. The one proposition would be absurd, and the other insulting. But undoubtedly truth took

a high place in the moral codes of the West before it had been similarly honoured in the East, where craftiness and diplomatic wile have always been held in much repute. We may prove it by the common inuendo that lurks in the words 'Oriental diplomacy', by which is meant something rather tortuous and hypersubtle. The same may be seen in Oriental literature. In your epics truth will often extolled as a virtue; but quite as often it is attended with some qualification, and very often praise is given to successful deception practised with honest aim. I remember reading in an Indian newspaper the following paragraph—"There is not a question but that lying is looked upon with much more disfavour by European than by native society. The English opinions on this subject are strong, distinct, and uncompromising in the abstract. Hindu and Mohamadan opinions are fluctuating, vague, and to a great extent dependent upon time, places and persons."

Now the commonest forms which are taken by untruth in this country seem to me to be the following. The first is exaggeration, particularly in language the tendency to speak or write things which the speaker or writer does not believe, or which are more than he believes, for the sake of colouring the picture or producing an effect. It is quite a common thing to see the most extravagant account of ordinary occurrences, or the most fanciful motives attributed to persons. Invention and imputation flourish in an unusual degree. There is a thing which we call in English a mare's-nest, by which we mean a pure figment of the imagination, something so preposterous as to be unthinkable. Yet I know no country where mare's-nests are more prolific than here. Some ridiculous concoction is publicly believed until it is officially denied. Very often a whole fabric of hypothesis is built out of nothing at all. Worthy people are extolled as heroes. Political opponents are branded as malefactors. Immoderate adjectives are flung about as though they had no significance. The writer no doubt did not mean to be. But the habit of exaggeration has laid such firm hold on him that he is like a man who has taken too much drink and who sees two things where there is only one or something where there is nothing. As he writes in hyperbole so he tends to think in hyperbole and he ends by becoming blind to the truth.

There are two particularly insideous manifestations of this tendency against which you ought to be on your guard. The first is flattery, and the second is vituperation. Flattery is much more than compliment in an extravagant form. It is often a deliberate attempt to deceive to get something out of someone else by playing upon the commonest foible of human nature. We all like to be praised and the majority like to be flattered. A common-place man enjoys being told that he is a great man, a fluent speaker that he is an orator, a petty agitator that he is a leader of men. The vice is actually encouraged by that which is one of the most attractive traits of Indian character, namely, its warmth of heart. A man has a natural inclination to please, and so he glides into flattery ; and flattery is only a few steps removed from sycophancy, which is a dangerous form of untruth. Flattery may be either honest or dishonest. Whichever it be, you should avoid it. If it is the former, it is nevertheless false ; if it is the latter, it is vile.

But I think that in India the danger of the opposite extreme is greater still. I speak of slander and vilification of those with whom you do not happen to agree. I do not wish to be tempted this afternoon into anything that might be thought to have a political bearing ; for it would not be proper to this convocation. I will only say, therefore, that to many true friends of India among whom I count myself, the most distressing symptom of the day is the degree to which abuse is entering into public controversy in this country. It is a bad thing for any State if difference of opinion cannot exist without inuendo and persecution, and if the

vocabulary of the nation is trained to invective. Authority will never be won by those who daily preach that authority exists only to be relieved. National happiness cannot spring from a root of bitterness, and national existence cannot grow in an atmosphere of strife. I would like to urge all you youngmen, when you go forth into the world, to avoid this most dangerous of all temptations. Respect your opponents and do not calumniate them. Believe in the good intentions of others rather than the bad, and remember that self government, to which you aspire, means not only the privilege of assisting to govern the community to which you belong, but the preliminary capacity of governing yourselves.

Therefore I come back to my original point. Do not exaggerate; do not flatter; do not slander; do not impute; but turn naturally to truth as the magnet flies to the pole. It is better to be belived by one human being for respect of the truth than to be applauded for successful falsehood by a thousand. By truth you will mount upwards as individuals and as a nation. In proportion as you depart from it you will stagnate or recede.

Then my second word of advice is this, try to form an independent judgement. The curse of our day is the dependence on ohers for thought and decision of every description, and the multiplication of machine for relieving a man of the necessity of independent opinion. The lowest and commonest of these machine is what school boys call a key, that is, a book in which they are saved the trouble of thinking for themselves by finding the work done for them by somebody else. The highest form is the article in the daily newspaper or the magazine which relieves you from thinking about the policies or events of the day by supplying you with the thoughts of another.

Advance in civilisation multiplies these instruments of selfish convenience. For an anna or less a man can purchase his opinions just as he purchases his food or his clothing. Of course books and the press do much more. They spread knowledge and stimulate intelligence, and without them we should sink back into brute beasts. I am only speaking of their questionable side. For the paradox is also a truth, that while they encourage intellectual activity they are also sometimes an indirect incentive to intellectual torpor. Of course this is truer of newspapers which represent an ephemeral form of literature, than it is of books, which are often immortal. We all of us get into the habit of reading our favourite journal, and cherish on the thoughts of the others. Sometimes our anonymous mentor is a very wiseman and we do not go far astray; sometimes he is reverse and we err in his company.

But the great danger of second-hand thought is not merely that it is not original but that its tendency is to be one-sided and therefore unfair. The common instinct of mankind is to take a side. It is the survival of the old-era of combat, when each man had to fight for himself and his family or clan. From young upwards we find ourselves taking a side in the rivalries of school and college life and in many ways these rivalries develop the keener instinct and the finer side of human nature. But the mind ought only to take a side as the result of a mental process. If we have examined the two sides of a case and are convinced that the one is right and the other wrong, or that one is more right than the other, by all means adopt and adhere to it; but to make your decision and to shape your conduct simply because a writer in a book or a newspaper has said it, whether it be right or wrong, is not thought, but very often abnegation of thought. It is putting the authority of the mind in commission and setting up some other authority, of which you perhaps know nothing, in the judgement-seat. So I say to you young men that the first duty of a student, that is of a man who has studied,

is mental independence. Strike out a line of thought for yourselves. Form your own judgement. Do not merely listen to the tinkling of the old bellweather who leads the flock, but stand on your own feet, walk on your own legs, look with your own eyes.

This does not mean, of course, that you can afford to be self-opinionated, or conceited, or obstinate. Nothing is more offensive than arrogance or licence in youth. You remember the famous sarcasm of the Cambridge tutor at the expense of a youthful colleague. "We are none of us infallible, not even the youngest." But the excess of a virtue merges easily into a vice and nowhere more easily than in the case of freedom. Freedom involves not only the absence of all restraint, but liberty-within limits of a reasonable self-restraint. Otherwise, as history teaches us, freedom usually degenerates into licence, licence into disorder, and disorder into chaos. Geothe, the German poet-philosopher, used to say that only in law can the spirit of a man be free. So it is ;and just as law is the condition of independence of spirit, so are moderation and respect for the others the condition of independence of judgement. This combination of qualities should come naturally to the philosophic Hindu. He should cultivate independence of mind and thought and action. But his great introspective power should save him from degenerating into intellectual self-sufficiency or insolence.

There is another tyranny which I think that you ought to avoid, and that is the absurd and purile tyranny of words. It is not the most fluent nations in the world who have done the most in history. Every nation and every time have their orators and they are the secular teacher and apostoles of their day. But when everybody talks, then as a rule few act, and when the talkers talk too much and too often, then finally nobody pays heed and the impression gets abroad that they are incapable of action. When I read the proceedings of the Conferences and Meetings that are always going on in all parts of India. I am far from deprecating the intellectual ferment to which this bears witness, and I am not sure that it is not a direct imitation of English practice. But I sometimes think that if fewer resolutions were passed and a little more resolution was shown—resolution to grapple with the facts of life, to toil and labour for your country instead of merely shouting for it–the progress of India would be more rapid. Eloquence on the platform is very like soda-water in a bottle. After the cork has been removed for a little time all the sparkle has gone. Moreover eloquence no more regenerates nations than soda-water gives fibre and strength to the constitution.

Now in India there are two sets of people, the reticent and the eloquent. I dare say you know to which class the people in this part of the country belong. I am sometimes lost in admiration at the facility with which they speak in a foreign language and I envy the accomplishment. All I say to you is, do not presume upon this talent. Do not belive that man who can make a speech is necessarily a statesman; do not let your fluency run away with your power of thought. Above all, do not think that speech is ever a substitute for action. The man who in his village or his town devotes himself to the interests of his fellow-countrymen, and by example and by effort improves their lot, is a greater benefactor than the hero of a hundred platforms.

There is further piece of adivice that I should like to give you. Strive to the best of your ability to create a healthy public opinion in your surroundings. Public opinion in India cannot for a long time be the opinion of the public, that is of the masses, because they are uneducated and have no opinion in political matters at all. In these circumstances public opinion tends to be the opinion of the educated minority. But if it is to have weight it must be coordinated with the necessities

and interest and desires of the community, who are perhaps hardly capable of formulating an opinion of their own. Nothing can be more unfortnate than a divorce or gulf between the two. If what is called public opinion is merely the opinion of a class, however genuine, it can never have the weight of the opinion of the masses, because, like all feelings, it is necessarily interested. Of course in India it is very difficult to create or to give utterence to a public opinion that is really representative because there are so many different classes whose interests do not always coincide, for instance the English and the Indians, the Hindus and the Mohamadans, the officials and the non-officials, the agriculturalists and the industrialists. But I think that the great work that lies before educated India in the near future is the creation of a public opinion that shall be as far as possible representative of all the interests that lie outside of Government. If we take the Native element alone, it would be an immense advantage to Government to have a public opinion that was representative of Native sentiment generally not of one section or fraction of it. For public opinion is both a stimulus to Government and a check. It encourages energy and it prevents mistakes. But if it is to have their vivifying and steading influence, then it must be public and not sectional temperate and not violent, suggestive and not merely hostile. Surely this must be patent to all. We have all of us frequently seen a manufactured public opinion in India, which was barren and ineffective because it merely represented the partisan views of a clique and was little more than noise and foam. In my view the real work that lies before Indian patriots is the suppression of the sectional and the elevation of the national in the life of people. And I think that any educated young man can contribute to that end by the exercise of personal influence and balance of judgement. It is always a bad symptom when there is one public opinion that is vocal and noisy and another that is subdued and silent. For the former assumes a prerogative that it does not deserve, while the latter does not exert the influence to which it is entitled. The true criteria of a public opinion that is to have weight are that it should be representive of many interests, that it should see two or more sides instead of only one, and that it should treat Government as a power to be influenced, not as an enemy to be abused. Someday I hope that this will come; and there is not one amongst you who cannot contribute to that consummation.

The last question that I put to myself and to you is this–What scope is there for you in the life of your country? In my opinion there is much. When I hear it said that, India is a conquered nation and that Indians are condemned to be hewers of wood and drawers of water, I smile at the extravagance, but I am also pained at the imputation. When I see High Court Judges–some of them in this hall—ministers of the Native States wielding immense powers, high executive and judicial officers in our own service, leaders of thought and ornaments of the Bar, professor, and men of science, poets and novelists, the nobility of birth and the nobility of learning. I do not say that every Indian corporal carries a Field Marshal's baton in his knapsack, for the prizes come to few, but I say that none need complain that the doors are shut. To all of you who have the ambition to rise I would say, use your student days to study the history and circumstances of your race. Study its literature and the literature of Europe, and particularly of the country whose fate is found up with your own. Compare the two ; see what are their lessons or their warnings. Then equip yourselves with a genuine and manly love for your own people. I do not mean the perfervid nationalism of the platform, but the self-sacrificing ardour of the true patriot. Make a careful diagonosis, not only of how you can get on yourselves, but how you can help your countrymen to

prosper. Avoid the tyranny of faction and the poison of racial bitterness. Do not arm yourselves against phantasms, but fight against the real enemies to the welfare of your people, which are backwardness and ignorance and antiquated social prescriptions. Look for your ideals not in the air of heaven but in the lives and duties of man. Learn that the true salvation of India will not come from without but must be created within. It will not be given you by enactment of the British Parliament or any Parliament at all. It will not be won by political controversy, and most certainly it will not be won by rhetoric. It will be achieved by the increase of the moral and social advantage of your people themselves, deserving that which they claim, and by their deserts making stronger the case far more. To you all therefore I say. Look up, not down. Look forward, not backward. Look to your own country first and foremost, and do not waste time in whistling for the moon. Be true Indian—that is the prompting of nationality. But while doing so strive also to be true citizens of the Empire; for circumstances have thrown you into a larger mould than that of race and have swept you into the tides that direct the world. As nationality is larger than the race, so is Empire larger than nationality. Race weakens and gets overload in the passage of time and gives place to broader conception. For instance in India I see the claim constantly made that man is not merely a Bengali or an Uriya or a Maratha or a Sikh but a member of the Indian Nation. I do not think it can yet be said that there is any Indian Nation though in the distant future some approach to it may be evolved. However that may be, the Indian is most certainly a citizen of the British Empire. To that larger unit he already belongs. How to adjust race to nationality, and how to reconcile nationality with Empire,—that is the work which occupy the British rulers of this country for many a long year to come. I am one of those who belive that it can be accomplished without detriment to race or nationality, and with safety to the Empire. I want the Indian people to play their part in this great achievement and to share the results. "(Loud Cheers)"

Mr. A. Pedder, Vice-chancellor of the University, then addressed the assembly in a lengthy speech. After which the meeting seperated.

October 5, 1905

A WARNING

By Sir Henry Cotton K.C.S.I.

I do not wish to enter into the details of the Project in which your readers would naturally feel interest, or to discuss the administrative reasons which are put forward in jurisdiction of the scheme for separating Bengal into two provinces. Those reasons admit of an easy answer, which I have given elsewhere. The burden of governing Bengal may or may not be too much for the shoulders of one man. The demand of the people of Bengal is that this "one man rule" should cease, and that in place of it a governor should be appointed from England, according to the system which already prevails in Madras and Bombay, and that he should be assisted in every branch of the administration by experienced members of an executive council. They object to the partition of their province I have used too mild an expression to give a proper idea of the bitter feelings which this partition measure has aroused. A personal of the Indian newspapers can have no room for doubt that there is an intensity of indignation kindle such as has never before been equalled in the country. I am inundated with letters and telegrams on the subject. My friends in India would seem to believe that I have power to influence public opinion in England on the matter. I have not that power, but, at least, I may claim to come forward as the mouthpiece and interpretor of Indian feeling.

The scheme of partition is not without its attraction to the members of an autocratic bureaucracy, who see before them the certain prospect of additional officers and emoluments. But it is repugnant in the last degree to the inhabitants of the country affected, in whom there is a sense of patriotic pride in their province, their ancestry, and their future. The idea of the division of their people into two arbitrary section has given a profound shock to the Bengali race. But it has done much more than this for it is realised that the sinister object of the measure is to shatter, if it be possible to do so, the unity and to undermine the feelings of solidarity which are at present so happily established among the members of a compact and national branch of the empire. The partition of Bengal is the culmination of a retrograde policy with which Lord Curzon's name always be identified in the memory of our Indian fellow-subjects. The retiring Viceroy has strained every link of the Government in order to officialise the administration. It is not administrative reason that lies at the road of this scheme. It is part and parcel of Lord Curzon's policy to enfeeble the growing political power and destroy the political possibilities of a nascent patriotism among the Indian people. Bengalis have been the leaders of political agitation in modern India. With all their faults, they are the principal section of the community who have inspired the new national patriotism, on which is centered the future hope and destiny of the people. Bengal is so to speak, the nursery of the coming Indian nation. This partition is designed to weaken Bengali influence. The details of the scheme are skilfully adopted for this purpose. And it is the consciousness and conviction that this disrupture is intended to impair the independence and power and influence of the most prosperous and advanced province in India that is the secret of the opposition to the measure.

Now, it is not necessary to agree with the grounds of this opposition. But there can be no doubt of their existence, and of the force and volume of popular opinion on the subject. The popular irritation has been greatly increased first by the secrecy with which the scheme has been gradually matured and the refusal to impart any information on it in reply to frequent question and memorials during the period of incubation, and secondly by the apparent trickery and breach of faith which have led to its being launched in India with immediate effect, when the impression left by Mr. Brodrick in the House of Commons was that action would not be taken until papers necessary to explain the House and a further opportunity to debate on them had been afforded. The popular irritation has now reached very serious dimensions. But the people have no vote or voice on question of public policy; when they protest they are ignored; they are powerless to compel the Government to act or to refrain from action. Their resources of agitation are, therefore, somewhat limited. They have had and are still holding, public meetings and demonstrations; their local Press is unanimous in denouncing the Government policy; they are sending by mail and cable representations to Secretary of State, of which he takes no heed; they are pressing their friends in England to move on their behalf, but this avails them a little at a time when Parliament is not sitting. They are a law-abiding flock, and have not yet, so far as I am aware, resorted to rioting. At last, however, they have fallen back on new methods, which they hope will operate on Englishmen through their pockets, and so induce Lancashire opinion to influence the Government to pay some regard to local opinion in Bengal. The idea is an ingenious one, and is encouraged,if not suggested, by successful experience of the Chinese in boycotting American goods in order to secure better treatment of the Chinese in America. So a movement has been set on foot to boycott Manchester cottons in Bengal. I see that the Manchester Chamber of Commerce effect to think very lightly of this departure. They may be right. I

have great respect for the judgement of Sir Frank Forbes Adam, whose name is still gratefully and affectionately remembered in Bombay. But they may be wrong, and my personal belief is that they are mistaken. The idea of discouraging the import of British goods in favour of locally made products has been in the air for a long time and has been freely advocated in Madras and Bombay–curiously enough, not so much in Calcutta. It is in Calcutta, however, where the idea is being put into practical operation, and my information is to the effect that it has caught on like wildfire. It is now merely a question of organisation and persistence. These are qualities which the people of Bengal are said to lack; but they are not deficient in a spirit of self-sacrifice when the occasion arises for its exercise. I therefore, venture to warn the Manchester merchants that they are at present willing to admit. If it maintains itself in Calcutta it will inevitably spread to the other Presidencies, where public opinion has long been in its favour. The cotton spinners in Manchester are in a better position than I am to judge of the commercial tendencies of the movement. But I can speak with a greater authority than they can of its reality and I have no doubt what-ever that the people of Bengal are in earnest in the matter, and will do their utmost to maintain it. Whether they will succeed or not remains to be seen, but the experiment will not have been tried in vain if it induces Englishman to give a little more of their attention to India affairs, and to insist on greater sympathy with and deference to popular aspirations and wishes – "*Manchester Guardian*."

October 19, 1905

CALCUTTA IN FERMENT

The sight which Calcutta presented on Monday was unprecedented. As we said, yesterday, it was a day of both mourning and rejoicing. From early in the morning up till 11 am. a Lakh of people or more, Hindus and Mussalmans, assembled on the bank of the Ganges, and then jumped into its sacred water, tens of thousands of throats uttering the words, "Banda Mataram", in one voice. After having washed themselves clean, they wore the Rakhi threads, round their wrists. The People of Eastern and Western Bengal as Hindus and Mussalmans then embraced and vowed eternal brotherhood to one another.

All shops in the meantime had locked their doors. No business practically was done almost everywhere the whole day. The Police came and tried their best to induced the shop-keeper to open their shops. They all refused and gave one and same reply. "No", said they, "we would do no business. Has not our motherland been vitally wounded today? It is a day of mourning with us, we shall mourn from morning till evening." The markets which daily through with people were absolutely empty! Even the Municipal Market was attended by a very few people.

But the two most remarkable incidents were the Organizations of the fishermen and the carters. A representative of the former saw us on Saturday last and said that they would not bring any fish in the market on the day of Partition. "And why would you adopt this course?" We enquired. "Why should we not?" said he. "Even Muchees (cobblers) are marking their disapprobation of the partition measure by refusing to mend English shoes. We are a superior caste to the Muchees, and we must also do our duty." He then said that about one lakh of fishermen supply Calcutta with fish, and the partition measure has brought them all together They have formed the resolution of giving up foreign cloths and are acting in concert. We suggested that, they should raise a fund among themselves for the good of their community, and the representative fisherman promised to carry out the idea.

As regards the carters we had also some conversation with a few of them. We asked what had led them to combine and cease all work on Monday. They said that, they had heard that, like Calcutta, another "Mokam" (port) had been created at Chittagong. They carry jute in their carts and in this way earn their bread. But, said they, if another port were created at Chittagong, most of the jute traffic would be diverted to the new port, and their earnings would thus be halved. They said that they laid their grievance before the Chamber of Commerce through their Chowdrees (headmen), but nothing was done. Hence they have struck work to show that the partition means ruin to them. Their grivance is too true.

Now the significance of these two indiderts cannot be overstated. The recognised leaders had nothing to do with the organization of the fishermen and the carter. So the feeling of discontent, which was evoked by the partition project has at last reached the lower strata of the society. If the authorities have eyes to see they cannot ignore the unparalleled demonstration of Monday. It was a sea of human heads almost all over the town, from morning till 10 or 11 p.m. Who or what collected them together, and made them demonstrate in this unique manner?

In the morning, for nearly two miles it was a regular block upon the bank of the Ganges, from the Howrah Bridge to the Baghbazar ghat. Then, there was scarcely a Hindu family in Calcutta which did not fast, or at least took cooked rice. Who or what made them observe this token of mourning? The fact is, the Bengalees have at least realized that they are a nation.

But, it is simply impossible to describe the scene which was witnessed from 2 p.m. to 9 p.m. Like rows of ants, people first wended their way to the place where the foundation stone of the Federation Hall was laid. They were all barefooted with "rakhies" tied round their hands. Perhaps two lakhs of people or more assembled. The presence of our distinguished countrymen,Mr. A. M. Bose, who presided at the ceremony imparted an enthusiasm to the audience which can not be described. His speech, published elsewhere was worthy of him and worthy of the occasion. Babu Ananda Mohan simply risked his life by agreeing to preside. Such a noble sacrifice is rare.

From there, crowds of men marched to the place of Rai Pashupati Nath Bose to Join the reunion function and also to take part in the ceremony of forming the nucleus of a "National Fund". Some two lakhs of people must have gathered there and thousands paid small donations from half a piece to one rupee or more. Unfortunately more boxes were not kept for small collections, and hence thousands went away without being able to contribute their mite. Still a considerable sum was raised. Those who could not pay their donation on Monday should remit the amount to Kumar Manmatha Nath Mitra and Rai Pashupati Nath Bose without delay. There was another collection on Tuesday.

The Police was ready to pounce upon the assembled public, if necessary. But they had absolutely no business to do. Indeed, the Police behaved wonderfully well. Even some European constable agreed to tie the "rakhi" round their wrists. We thank Mr. Halliday for his excellent police arrangement. If two or three lakhs of people had roamed about in the streets of London from morning till 9 p.m they would have consumed one thousand gallons of liquor, and broken at least one hundred heads and committed other excesses. But not a drop of liqueur was drunk by the crowds which assembled in various parts of the town on Monday and no one received a scratch in his body. And these gentle and law-abiding people have been goaded to a state of frenzy by the partition measure. What more evidence is needed to show that the measure is not a blessing but an unmitigated curse?

The following incidents will show how the spirit of nationality had powerfully affected even the lowest classes. Carters numbering about 11,000 struck work. twelve Jute Press Factories, one Sugar Factory, one Shell Lac Factory, one Gum Factory and about seventy local mills were closed. Male and female hands working in these manufactories refused to work, and consequently they had to be closed. The labourers in the Government Gun Factory had just commenced work when they heard the cry of "Bande Mataram" and at once they all left work and in a body came out and shouted "Bande Mataram" with thousands of others There was not a single cart or a coolie near any of the four goods termini of the C.B. State Railway. All the marts and bazars of Calcutta as well as of Ultadingi, Talla, Ballygange, Pattipukur, Belgachia, Hatkhola. Shyambazar etc., were closed.

All this showed distinctly that Bengal had been stirred to its innermost depths by an agitation unparalleled in the history of British rule. What grievous blunder was committed by the Government when it resolved to partition Bengal!

19 October, 1905

THE SIXTEENTH OF OCTOBER.

The national feeling roused by the Partition measure has thus not only taken root in the minds of the general masses of the people but apparently come to stay. For, let it be distinctly understood that the students or the recognized leaders of the agitation had very little hand in Monday's unprecedented demonstration. What was done was to circulate some thousands of hand-bills over the signature of some leading men. inventing the public to attend the two functions alluded to above, and people of every description, of their own accord, marked their sense of wrong–each class or community according to their light and propriety. For instance, the fishermen brought no fish in the market for sale; the carters and factory hands struck work; the shopkeepers closed their shops while respectable people by tens of thousands walked in the streets without shirts and barefooted, in the mourning garb. Indeed, the organization was so complete that it left no room for doubt that the people of Bengal, high and low, had at last realized the fact that they had a duty to do with regard to their mother country and that they must sink their private differences and act in concert for the common weal. This result ought to be gratifying to the government; but, we are surprised and pained to learn that there is a talk of repressive measures being adopted if our students take any part in the movement. But of this hereafter.

19 October, 1905

Monday's demonstration, not only in Calcutta but also in every part of Bengal, made certain points very clear. One of the reasons which led the Government to give effect to the Partition with such indecent haste was to kill the anti-partition agitation and along with it the Swadeshi movement. The ruling authorities laboured under the impression that the agitation was kept alive simply because the people entertained a hope that the partition might yet be withheld if they went on demonstrating. Their other notion was that the Swadeshi movement was the outcome of the partition measure and that, if partition agitation could be put a stop to, the "Swadeshi" would also cease to exist. The two functions performed on Monday, however, showed that the calculations of the authorities were utterly baseless At the meeting held in connection with the Federation Hall tens of

thousands of people declared in one voice that they would continue their agitation against the Partition of Bengal so long the gross wrong was not removed. Similarly, at the other meeting which was held purely in connection with the Swadeshi movement tens of thousands not only took a solemn vow over again that they would never use foreign articles but showed their practical sympathy with the movement by contributing their mite to the formation of the National Fund.

November 5, 1905

THE ANTI-SWADESHI CIRCULAR

It has at last pleased the Government of Bengal to give publicity under its authority to the anti-Swadeshi circular through the press. Before proceeding to discuss its terms, we publish below both the circulars, that is to say, the Government sent circular as well as the one published in the "Statesman" and reproduced in other papers. Here is the Government-sent circular :-

CONFIDENTIAL

No. 1679. P.D.

From R. W. Carlyle, C.I.E., I.C.S.,

affg. Chief Secretary to the Government of Bengal.

To the Magistrate and Collector of ....

Dated Darjeeling, the 10th Oct. 1905

POLITICAL

Sir,

The use which has recently been made of school boys and students for political purposes is absolutely subversive of discipline and in the highest degree injurious to the interests of the boys themselves. It is impossible to tolerate this in connection with institutions which Government-either assists or countenances.

2. I am therefore to request that, if any attempt is made by boys attending any school or college in your district to take any public action in connection with political question or in connection with boycotting, picketing and other abuses associated with the so-called "Swadeshi" movement, you will at once take congnizance of that action. You will inform the heads of the schools or colleges concerned, that, unless they prevent such action being taken by the boys attending their institutions, their grant-in-aid and the preveledge of compiting for scholarships and of receiving scholarshipholders will be withdrawn, and the University will be ask to disaffiliate their institution. Of course, if they are loyally desirous to prevent this, but are unable to do so, they will not be punished In that case, they must immediately report the matter, given a list of boys who have set a naught their authority, you will then be in a position to see that necessary diciplinary action is taken, or punishment awarded, by the educational authorities.

3. You ought also to inform the heads and teachers of institutions, and those connected with the management, that it may be necessary for you to call on them for assistance in keeping the peace by enrolling as special constables and you should not hesitate to enrol them should there by any reasonable apprehension of disturbance on the part of schoolboys or students. It is very important, in the event of any disturbance, to have the service of those, whom the boys are bound to respect, and who will be able to recognise and identify the boys who may offend. This should be explained to those in authority in the institutions.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
(Sd/- R.W.Carlyle)
Offg. Chief-Secretary. to the Govt. of Bengal.

And here is the one published in the "Statesman" :

1. The use which has been recently made of schoolboys and students for practical purposes is absolutely subversive of discipline and injurious to the interests of the boy themselves. It cannot be tolarated with in connection with educational institutions assisted or countenanced by Government.

2. I am therefore to state for your information and guidence that unless the School and College authorities and teachers prevent their pupils from taking public action in connection with political questions or in connection with boycotting, picketing, and other abuses associated with so called Swadeshi movement, the Schools or Colleges concerned will forfit their grants-in-aid and the priviledge of competing for scholarships and the University will be asked to dissaffiliate them. Where they loyally desire to prevent such conduct on the part of their pupils and are unable to do so, they must immediately submit a report to the District Magistrate, giving a list of boys who have disregarded their authority, and stating the disciplinary action taken to punish them.

3. I am also to point out that should there be any reasonable apprehensions of disturbance on the part of schoolboys or students, it will be necessary to call on the teachers and managers of the institutions concernd for assistance in keeping the peace, by enrolling them as special constables. Their services or such will be specially valuable as the boys are bound to respect them and they will be able to indentify those who may offend.

4. The gentleman to whom this circular letter is addressed are requested to explain the above to their subordinates. The District Superintendent of Police will please instruct his thana officers to report instances of misconduct on the part of boys the nature indicated in the first paragraph above.

It will be seen, the sentiments in the two circular, ...are practically the same, though the forms of expression differ here and there. We further said yesterday – and we find it to be correct – that para 4 in the "STATESMAN'S" circular was wanting in the Government sent document. How this hapened has it to be explained. Surely. The "Statesman" did not manufacture it. We believe, the paragraph was added by the Magistrate of the district whence a copy of the circular was sent to our contemporary. And what an addition! It was to the effect that the District Superintendent of Police must employ spies to dog the steps of the students and report their conduct!

The first thing that will strike everybody is the word, "CONFIDENTIAL" at the top of the circular. May we enquire of Mr. Carlyle – Why was the Government so anxious to keep the matter concealed, when it vitally affected the general public? Fancy the position! The Circular is meant for heads, teachers and managers of schools and colleges and also for schoolboys and students, whose number must be tens of thousands. Then, again, it touches the interests of the entire population of Bengal with regard to a question of supreme importance to them. Further, it interferes with the domestic affairs of the people as the object of the circular is to punish boys and meddle with their education for acts which, in the opinion

of their gurdians are perfectly legitimate and harmless. A Government order of such grave nature as marked "Confidential" and was secretly circulated to the district authorities to do its work of mischief and destruction, silently and clandestinely! Need anybody wonder after this why the people are gradually losing all faith in the good intentions of the Government?

Is it possible that, because the sentiments embodied in the circular are of such a silly and outragous character, the Government was ashmed of discloing them to the public? It is really a wonder that any responsible officer of Government can issue such a mischivious order? We have already criticised some of the terms; but the most monstrous of them is the threat held out of enrolling the heads, teachers and managers of educational institutions as special constables, as well as of the withdrawl of the grants-in-aid and of the priviledge of competing for scholarships from their schools and colleges for certain acts of the boys under their charge. And what are the acts? The students must not have anything to do with political questions. They must have no connection with boycotting, picketing and "other abuses associated with the so-called Swadeshi Movement". Whatever this might mean, they must not create a disturbance or do anything that might lead to one.

Let us examine the conditions imposed upon teachers and other educational authorities. How could it be possible for them to prevent a student from joining a political meeting? A teacher may control his pupils so long they are in the classroom. How can he know what they may have to do after school hours? Then, is it a crime on the part of a student to take public action in connection with political questions? Such, however is not the case in England. Why, then, should be here in India, where political education among youngstars in more needed than in the ruling country. In the circular, Mr. Carlyle aught to explain how a student, by taking part in the political agitation, commits a wicked act.

Then what are "boycotting, picketing and other associated with so-called movement?" Suppose, a number of boys assemble and resolve that it is their duty to boycott English boots and Manchester cloth. Do they commit an offence and make there teachers layable for punishment? If so, the whole body of students should be punished along with their teachers and professors; for they have already "boycotted" foreign manufacturers and asked thousands upon thousands do the same. The silly character of the circular is thus plain to the meanest comprehension. Then, again, what is "picketing"? Is it picketing if the students use no force whatever but only appeal to a buyer of foreign goods not to purchase them for the sake of country? If so, is this kind of picketing illegal? No one with a grain of sense in him will say so......

BENGALI LADIES AND NATIONAL FUND

November 2, 1905

We are glad to find that Bengali ladies have warmly responded to the appeal made by their brothers on the occasion of the last Vatridwitia ceremony. They are liberally contributing their quota to the National Fund for the good of the nation. As, however, it is supposed that many of the ladies do not know where to send their contribution, our readers are requested to explain to as many as they are in a position to speak to, that Kumar Monmatha Nath Mitra, 34, Shampukur Street would be gald to receive any and all amounts sent to him for the Fund.

স্মৃতিচারণ

সরলাদেবী চৌধুরাণী

রুদ্রবীণ*

বড়মামার হাতে আরম্ভে রবিমামা ভারতীর যে বীণাকে আবাহন করলেন—

শুধাই ঐ গো ভারতী তোমায়
তোমার ও বীণা নীরব কেন?
ভারতের এই গগন ভরিয়া
ও বীণা আর মা বাজে না কেন?

তার প্রায় পঁচিশোর্ধ্ব কয়েক বৎসর পরে দাক্ষিণাত্য থেকে ফেরা আমার অঙ্গুলির প্রথম সঞ্চালনে ভারতীর সেই বীণা রুদ্রবীণ হয়ে বেজে উঠল। শঙ্করের ভেরী নাদিত করে লেখনী আমার বাঙালিকে 'মৃত্যুচর্চায়' আহ্বান করলে। এবার আমার হাতে প্রথম প্রবন্ধই হল তাই। সেই আমার বীণের প্রথম ঝঙ্কার। যে বাঙালি পৈতৃক প্রাণটি বাঁচিয়ে রাখতেই সদা তৎপর, বীণা তাদের ডেকে বললে,—মৃত্যুকে যেচে বরণ করতে শেখ, অগত্যা তার কবলিত হয়ো না। তাকে স্পর্ধা কর, তার সম্মুখীন হও—খেলায় ধুলায়, আমোদে প্রমোদে, শিকারে বিহারে, বিজ্ঞানে সজ্ঞানে, প্লেগে জনসেবায়, আগুনে লোক-উদ্ধারে, জলেতে আত্মপ্রাণপণে পরপ্রাণ রক্ষায়। ভূগোল শেখ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণে—মানচিত্রে অঙ্গুলি সঞ্চারণে নয়। পাড়ি দাও সমুদ্রে, চলে যাও সাহারার মরুতে, চড় তুঙ্গে এভারেস্টের শৃঙ্গে,—সেকালের ভারতীয় সন্ন্যাসী পর্যটকদের লোটা-কম্বল-মাত্র-সহায় হয়ে কিংবা একালের শ্বেতপুঙ্গবদের অনেক তোড়জোড়ের মধ্যে প্রধান যেটি সেইটি সম্বল করে—সুস্থ ও সবল শরীর। মানুষের সবচেয়ে বড় পুঁজি সেইটি—বলিষ্ঠ ও সুস্থ শরীর। সে জন্যে চাই বাঙালির ভারতের অন্যান্য জাতির মত নিয়মিত ব্যায়াম-চর্চা। এই হল আমার রুদ্রবীণের দ্বিতীয় ঝঙ্কার।

দ্বিপুদাদার মেজভাই অরুদাদা উর্দুনবীশ ছিলেন। হিন্দুস্থানী বেশ বলতেন, আর উর্দু বইও পড়তেন উচ্চারণে ঠিক জোরদার দিয়ে। কুস্তি প্রভৃতি কসরতের দ্বারা প্রথম যৌবনে শরীরটাও বেশ কায়দায় রেখেছিলেন। তিনি দু-একবার বম্বে অঞ্চলে যান মেজমামার কাছে। গল্প করতেন বম্বে থেকে ফেরার পথে গাড়ি যখন পশ্চিম ও বেহারের স্টেশনে স্টেশনে থাকত, জোর গম্ভীর গলায় কুলিরা স্টেশনের নাম হাঁকত—জব্বল-পো-র, ইলাহা-বা-দ, বক্‌স-র পট-না-া-া!—

রাত্রে ঘুমন্ত অবস্থায় ভয় পেয়ে উঠতে হত, বুঝি ডাকাত পড়েছে। আর গাড়ি যেমন বাংলায় পৌঁছল, মিহিগলায় টক্ করে একটুখানি আওয়াজ বেরল—'কনু জংশন!' বদ্ধোমান!' আর যারা ডাকছে তারা দেখতে এমন ক্ষীণজীবী—যেন একটা টোকা মারলেই এখনি পড়ে যাবে। অরুদাদার বর্ণনা যে খাঁটি সত্য, তা বিদেশ থেকে প্রত্যাগমনকালে আমাদের সকলেরই অনুভব হত। বাঙালি কুলিরাও মানুষ, আর পশ্চিমের কুলিরাও মানুষ—কিন্তু দেখতে কত তফাত! এবার এই ভোজপুরী মারাঠা পঞ্জাবী সকলের সঙ্গে বাঙালির চেহারাগত দৌর্বল্যের পাহাড়কে সমভূমি করে দিতে হবে—এইতে পড়ল আমার প্রথম দৃষ্টি। সঙ্গে সঙ্গে চোখে লাগল শুধু শরীরগত দৌর্বল্য হটালে

* *জীবনের ঝরাপাতা। পৃ. ১২৫-১৫৬*

হবে না, বাঙালির মন থেকে ভীরুতা অপসারিত করতে হবে। দেখা যায়, পশ্চিম ও পঞ্জাবের বড় বড় পালোয়ানেরাও সাহেব-ভীতিতে ভরা। এই সাদা চামড়ার ভয় সরাতে হবে।

তাই ডমরুতে একটা ঘা দিয়ে রুদ্রের বীণা বাজল তৃতীয় তারে ঝঙ্কার দিয়ে আমার হাতে—'বিলিতি ঘুষি বনাম দেশী কিল' এই রাগে। ভারতীর পৃষ্ঠায় আমন্ত্রণ করলুম—রেলেতে স্টীমারে, পথে-ঘাটে, যেখানে সেখানে গোরা-সৈনিক বা সিভিলিয়ানদের হাতে স্ত্রী, ভগ্নী, কন্যা বা নিজের অপমানে মুহ্যমান হয়ে আদালতে নালিশের আশ্রয় না নিয়ে—অপমানিত ক্ষুব্ধ মানী ব্যক্তি স্বহস্তে তখনি তখনি অপমানের প্রতিকার নিয়েছে—সেই সকল ইতিবৃত্তের ধারাবাহিক বর্ণনা পাঠাতে। তাঁরা পাঠালেন ও তাঁদের ইতিবৃত্ত ভারতীতে বেরতে থাকল। পাঠকমণ্ডলীর মনে লুকান আগুন ধুঁকিয়ে ধুঁকিয়ে জ্বলে উঠল প্রবল তেজে। কোথা দিয়ে কোন্ হাওয়া বইছে, হঠাৎ যেন কেউ ঠাহর করে উঠতে পারে না। যে সাহিত্যের আঙ্গিনা ছিল কোমল আস্তরণ পাতা কমলালয়া সরস্বতীর নিকুঞ্জ, তা হল শ্মশানবাসী রুদ্রের ভীম নর্তনভূমি, আর তার তালে তালে সকলের পা আপনিই পড়ছে—ইচ্ছে করুক আর না করুক। দলে দলে স্কুল-কলেজের ছেলেরা আমার সঙ্গে দেখা করতে আরম্ভ করলে—বয়স্কেরাও পিছিয়ে রইলেন না—অনেকেই, যাঁরা পরে নামজাদা হয়েছিলেন। আমি তাঁদের থেকে বেছে বেছে একটি অন্তরঙ্গ দল গঠন করলুম। ভারতবর্ষের একখানি মানচিত্র তাদের সামনে রেখে সেটিকে প্রণাম করিয়ে শপথ করাতুম তনু মন ধন দিয়ে এই ভারতের সেবা করবে। শেষে তাদের হাতে একটি রাখি বেঁধে দিতুম, তাদের আত্মনিবেদনের সাক্ষী বা badge। হুমায়ুন যেমন এক রাজপুত কন্যার রাখি গ্রহণ করে তার হয়ে বিপদ বরণ স্বীকার করেছিলেন, ছেলেদের তেমনি আমার হাতে এ রাখি-গ্রহণ মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে বিপদ বরণের স্বীকৃতি। আমার রাখি-বাঁধা দলটি একটি গুপ্ত সমিতি নয়; তবু সঙ্কল্প মনে মনে রাখলেই উদ্‌যাপনের দৃঢ়তা হয় বলে মুখে মুখে রটান রাবণ ছিল।

তত্রাচ নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের কাছে খবরটা পৌছল। তিনি রঙ্গরসে, আমোদে-কৌতুকে অনেককে টানতেন।

আশু চৌধুরীর আমার প্রতি ভারি স্নেহ ও শ্রদ্ধা। তিনি আমায় একদিন বললেন—"সরলা সাবধান হয়ো। নাটোরের বৈঠকে বলাবলি চলছে—সরলা দেবী দেশের ছেলেদের বীর করে তুলবেন বলে তাদের হাতে একটা করে লাল সুতো বেঁধে বেঁধে দিচ্ছেন। এতে পুলিসের কান খাড়া হচ্ছে।"

বছর কত পরে বঙ্গভঙ্গের দিনে এই লাল সুতোর রাখিবন্ধন দেশময় ছড়াল—রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে নাটোরও তাতে বাঁধা পড়লেন।

যেসব ছেলেরা তখন আমার কাছে আসত তার মধ্যে মণিলাল গাঙ্গুলী বলে একটি ছেলে ছিল। সে Dawn পত্রিকার সম্পাদক সতীশ মুখুয্যের ভাগিনেয়। সতীশবাবুও মাঝে মাঝে এসেছেন। মণিলালের সাহিত্যের দিকে একটু ঝোঁক ছিল। তার পরিচালিত একটা সাহিত্য-সমিতি ছিল ভবানীপুরের ছেলেদের। সে একদিন আমায় অনুরোধ করলে তাদের সাম্বৎসরিক উৎসবের দিন আসছে আমি যেন তাতে সভানেত্রীত্ব করি! যদিও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছি—কিন্তু কলকাতা শহরে ছেলেদের সভায় উপস্থিত হওয়া ও সভানেত্রীত্ব করা তখন আমার কল্পনার বাইরে। আমি ইতস্ততঃ করতে লাগলুম। সে আবার পীড়াপীড়ি করাতে আমি একটু ভেবে তাকে বললুম—"আচ্ছা, তোমাদের সভায় সভানেত্রীত্ব করতে যাব—এটাকে যদি তোমাদের সাহিত্যালোচনার সাম্বৎসরিক না করে সেদিন তোমাদের সভা থেকে 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' কর, আর দিনটা আরও পিছিয়ে ১লা বৈশাখে ফেল, যেদিন প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। সভায় কোন বক্তৃতাদি রেখ না। সমস্ত কলকাতা ঘুরে খুঁজে বের কর কোথায় কোন্ বাঙালি ছেলে কুস্তি জানে, তলোয়ার খেলতে পারে, বক্সিং করে, লাঠি চালায়। তাদের খেলার প্রদর্শনী কর—আর

আমি তাদের এক-একটি বিষয়ে এক-একটি মেডেল দেব। একটিমাত্র প্রবন্ধ পাঠ হবে—সে তোমাদের সাহিত্য-সভার সাম্বৎসরিক রিপোর্ট নয়—প্রতাপাদিত্যের জীবনী। বই আনাও—পড় তাঁর জীবনী, তার সার শোনাও সভায়।"

মণিলাল রাজি হল। তলোয়ার খেলা দেখানোর জন্যে তাদের পাড়ার বাঙালি-হয়ে-যাওয়া রাজপুত ছেলে হরদয়ালকে যোগাড় করলে, কুস্তির জন্যে মসজিদবাড়ির গুহদের ছেলেরা এল, বক্সিংয়ের জন্যে ভূপেন বসুর ভাইপো শৈলেন বসুর দলবল এবং লাঠির জন্যে দু-চারজন লোক কোথা হতে সংগ্রহ হল। আমি যেভাবে বলেছিলুম, সেইভাবে সভার কার্যক্রম পরিচালিত হল। কেবল আরম্ভে মণিলালের অনুরোধে আমাকে দিয়ে প্রতাপাদিত্যের একটি উদ্বোধনের দ্বারা সভার 'atmosphere' তৈরি করে দেওয়া হল। তারপরে মণিলাল-লিখিত তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী পাঠের পরই নানা রকম খেলাধুলা চলল ও শেষে আমার হাতে মেডেল বিতরণ। সেই মেডেলের একদিকে খোদা ছিল—"দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"।

সভায় কলকাতার সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা প্রায় সবাই উপস্থিত ছিলেন। 'সঞ্জীবনী' লিখলেন—"কলিকাতার বুকের উপর যুবক-সভায় একটি মহিলা সভানেত্রীত্ব করিতেছেন দেখিয়া ধন্য হইলাম।" 'বঙ্গবাসী'র লেখার সার,—"মরি মরি কি দেখিলাম! এ কি সভা! বক্তিমে নয়, টেবিল চাপড়া-চাপড়ি নয়—শুধু বঙ্গবীরের স্মৃতি আবাহন, বঙ্গ-যুবকদের কঠিন হস্তে অস্ত্রধারণ ও তাদের নেত্রী এক বঙ্গললনা—ব্রাহ্মণ কুমারীর সুকোমল হস্তে পুরস্কার বিতরণ। দেবী দশভুজা কি আজ সশরীরে অবতীর্ণা হইলেন? ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যা জাগিয়াছে, বঙ্গের গৌরবের দিন ফিরিয়াছে।"

বিপিন পাল তাঁর Young India-তে টিপ্পনী করলেন—

"As necessity is the mother of invention, Sarala Devi is the mother of Pratapaditya to meet the necessity of a hero for Bengal!"

দেশের লোকে এ টিপ্পনীতে ভড়কালে না। বাঙালির নিবিড়তম মর্মদেশে প্রতাপাদিত্যের প্রবেশ হল। তার প্রথম বহির্বিকাশ দেখা দিলে প্রোফেসর ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদের প্রতাপাদিত্য নাটক রচনায় ও স্টার থিয়েটারে রাতের পর রাত তার অভিনয় পরিচালনায়। দেখাদেখি রেষারেষি মিনার্ভায় অমর দত্তের 'প্রতাপাদিত্য'রও আবির্ভাব হল।

তীর এসে বিঁধল আমার বুকে রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে—সাক্ষাতে নয়, দীনেশ সেনের মারফতে। দীনেশ সেন একদিন তাঁর দূত হয়ে এসে আমায় বললেন—"আপনার মামা ভীষণ চটে গেছেন আপনার উপর।"

"কেন?"

"আপনি তাঁর 'বৌঠাকুরাণীর হাটে' চিত্রিত প্রতাপাদিত্যের ঘৃণ্যতা অপলাপ করে আর এক প্রতাপাদিত্যকে দেশের মনে আধিপত্য করাচ্ছেন। তাঁর মতে, প্রতাপাদিত্য কখনো কোন জাতির hero-worship-এর যোগ্য হতে পারে না।"

আমি দীনেশবাবুকে বললুম—"আপনি তাঁকে বলবেন, আমি ত প্রতাপাদিত্যকে moral মানুষের আদর্শ বলে খাড়া করতে যাইনি—তাঁর পিতৃব্য-হনন প্রভৃতির সমর্থন করিনি। তিনি যে politically great ছিলেন, বাংলার শিবাজী ছিলেন, মোগল-বাদশার বিরুদ্ধে একলা এক হিন্দু জমিদার খাড়া হয়ে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন, নিজের নামের সিক্কা চালিয়েছিলেন—সেই পৌরুষ, সেই সাহসিকতার হিসেবে তিনি যে গৌরবার্হ, তাই প্রতিষ্ঠা করেছি। এতে যদি ইতিহাসগত কোন ভুল থাকে তিনি সংশোধন করে দিন, আমি মাথা পেতে স্বীকার করে নেব।" এর উত্তর নিয়ে দীনেশ সেন আর পুনরাগমন করেননি। বাঙালির বীরপূজা চলতে থাকল। অতঃপর আমি 'বঙ্গের বীর' সিরিজের ছোট ছোট পুস্তকাবলী বের করতে আরম্ভ করলুম। এবার প্রতাপাদিত্যের

পুত্র উদয়াদিত্যের উৎসবের আয়োজন করলুম। সেকালে সুরেন বাঁড়ুয্যের 'Bengalee' বাঙালি পরিচালিত মুখ্য ইংরেজি পত্র। 'Bengalee'-তে খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার আয়োজিত সব অনুষ্ঠানের রিপোর্ট বেরতে লাগল। উদয়াদিত্য-উৎসবের ঘোষণায় বেঙ্গলি এইভাবে লিখলেন—"সরলা দেবী দেশের উপর নতুন নতুন 'surprise spring' করছেন—আমরা তাঁর সঙ্গে দৌড়ে দৌড়ে হাঁফিয়ে পড়ছি। রোজ ভোরে উঠে মনে হয়—অতঃ কিম্?"

নজর পড়েছিল আমার যে রাজপুত বীরবালক বাদল প্রভৃতির কীর্তি পড়ে আমরা বাঙালিরা অভিভূত হই, তাদের গৌরবে গৌরবানুভব করি, কবিতা বানাই, কিন্তু বাঙালির ঘরের ছেলে উদয়াদিত্য যে মোগলদের বিরুদ্ধে বাঙালির স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সম্মুখ-সমরে দেহপাত করেছিলেন—তার খবর কিছুই রাখিনে। তার স্মৃতি বাঙালি যুবকের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত করে দেওয়ার দরকার। আমার কাছে তখন যেসব ছেলেরা আনাগোনা করতেন, তার মধ্যে অনেক বি-এ, এম-এ ছিলেন, কলেজের প্রোফেসরও ছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সেন তার মধ্যে একটি। ইনিই উদয়াদিত্য-উৎসব সম্পাদনের ভার নিলেন। আমি ইণ্ডিয়ান মিররের এডিটর ও এলবার্ট হলের অন্যতম ট্রাস্টি বৃদ্ধ নরেন্দ্রনাথ সেনকে লিখে, টাকা পাঠিয়ে হল ভাড়া করিয়া দিলুম উৎসবের জন্যে। উদয়াদিত্যের কোন ছবি ত নেই। উৎসবগৃহে তাঁর পরিচায়ক কি থাকতে পারে? ভেবে দেখলুম ক্ষত্রিয় বীরের আত্মার প্রতিরূপ তাঁর তরবারি। সুতরাং একখানি তরবারি স্টেজেব উপব থাকবে,—সভাসীনেরা উদয়াদিত্যকে স্মরণ করে তাতেই পুষ্পাঞ্জলি দেবে। সব আয়োজন সম্পূর্ণ হয়েছে, একজন হিন্দুস্থানী জমিদারের কাছ থেকে হীরা-জহরতের হাণ্ডিলওয়ালা সুন্দর ঝকঝকে একটি তলোয়ার যোগাড় হয়েছে, ক্ষীরোদ বিদ্যাবিনোদ প্রেসিডেন্টের আসন গ্রহণ করবেন স্থির হয়েছে, হ্যান্ডবিল প্রচুরভাবে ছড়ানো হয়েছে, বিকেল চারটেতে মিটিং, আয়োজনকারীরা বেলা দশটা থেকে সেখানে মোতায়েন—এমন সময় ঠিক বারটার সময় দৌড়তে দৌড়তে শ্রীশবাবু বালিগঞ্জে এসে হাজির—তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে বালিগঞ্জে উঠে এসেছি। এসে বললেন—"নরেন সেন লোকের হাতে চিঠি পাঠিয়েছেন এলবার্ট হলে মিটিং হতে পারবে না। কারণ, তিনি শুনেছেন, ছেলেরা নাকি তলোয়ার পূজা করবে। এসব ভয়াবহ রাজবিদ্রোহাত্মক কাজ—তাতে তিনি অনুমতি দিতে পারেন না।"

আমি শ্রীশবাবুকে বললুম—"যত টাকাই লাগুক, অন্য কোন স্থান,কোন থিয়েটারের স্টেজ হোক, যাই হোক, ভাড়া করে হাতে রাখুন। আমি ইতিমধ্যে নরেনবাবুকেও চিঠি লিখে দেখছি ফের এলবার্ট হলেই করাতে পারি কিনা।"

আমি বৃদ্ধকে লিখলুম—"আপনি পরম হিন্দু—ভাল করেই জানেন হিন্দুর পূজা তিন রকমের হয়—ঘটে পটে ও খড়্গে। পটের অভাবে এক বীর ক্ষত্রিয়ের আত্মার প্রতিনিধিস্বরূপ বাঙালি ছেলেরা খড়্গে তাঁর পূজার আয়োজন করেছে—এক হিন্দুস্থানী রাজা খুশী হয়ে সেজন্যে নিজের তলোয়ার তাদের পাঠিয়ে দিয়েছেন। আজ আপনি তাদের এ-পূজা যদি বন্ধ করেন, সংবাদপত্রের সূত্রে সমস্ত ভারতবর্ষে ঢিঢি পড়ে যাবে। সবাই বলবে বাঙালি যুবকেরা খড়্গপূজা করতে চেয়েছিল, একজন নেতৃস্থানীয় বাঙালি বৃদ্ধ হিন্দু তাতে বাধা দিয়েছেন, তাঁর অতিমাত্রার রাজভক্তি তাতে রাজদ্রোহিতার গন্ধ পেয়ে থরহরি কম্পমান হয়েছে, তাঁর তথাকথিত হিন্দুত্বের পরীক্ষায় আজ তিনি সম্পূর্ণভাবে fail করেছেন। এই ত একদিকে দেশের লোকের ধিক্কার—আর একদিকে মামলায় ফেঁসে যাবেন। আপনি উদয়াদিত্য-উৎসব হবে জেনে-শুনে আজ চারদিন থেকে টাকা গ্রহণ করে Albert Hall ভাড়া দিয়েছেন। টাকা এখনও ফেরাননি। এ অবস্থায় হঠাৎ শেষ মুহূর্তে ছেলেদের উৎসব বন্ধ করলে তারা আপনার নামে ক্ষতিপূরণের মকদ্দমা আনতে পারে। আইনতঃ আপনি দায়ী। অতএব সব দিক থেকেই আপনার পক্ষে বিজ্ঞোচিত কাজ হবে ছেলেদের উৎসব এখানে হতে দেওয়া।"

বৃদ্ধ আমার চিঠি পেয়ে লিখলেন—"তবে তাই হোক। ছেলেরা উৎসব করুক। কিন্তু এর জন্যে সব দায়িত্ব আপনার।" নিজের স্কন্ধের দৌর্বল্য স্বীকার করে তাঁর কন্যাসমা দেশের এক বালিকার স্কন্ধে দায়িত্বের বোঝা চাপিয়ে বৃদ্ধ হাত ধুয়ে বসলেন। ইতিমধ্যে আমার কাছে খবর এসে গেছে যে, শ্রীশবাবু দ্বিগুণ টাকা স্বীকার করে হ্যারিসন রোডের উপর এলবার্ট হলের অতি সন্নিকটেই এলফ্রেড থিয়েটারের স্টেজ ভাড়া নিয়েছেন। আমার কাছ থেকে ভাড়া নিয়ে গেল তাঁর দূত এসে। থিয়েটারের মাড়োয়ারী স্বত্বাধিকারীকে তাঁরা খুলে বলেছিলেন—"আমরা তলোয়ার পূজা করব জেনে রেখো।" মাড়োয়ারী বললে—"আপনারা পূজা করেন, নাচেন, কুঁদেন সে আপনারা জানেন। আমার কি? আমার ভাড়া পাওয়া নিয়ে কথা, সেটা হাতে হাতে পেলেই হল।" হাতে হাতেই পেলে। তারপর শ্রীশবাবুর কাছে যখন নরেন সেনের স্বীকৃতি পত্র পাঠালুম তখন আর তাঁরা এলবার্ট হলে ফিরে যেতে রাজী হলেন না। সভা এলফ্রেড থিয়েটারেই হল। এলবার্ট হলের সামনে ভলান্টিয়ার রেখে দেওয়া হল—হ্যান্ডবিল অনুসারে সেখানে যেমন যেমন লোক সমাগত হয় তাদের এলফ্রেড থিয়েটারে পাঠানো হয়।

উদয়াদিত্যের উদ্বোধন প্রথমে কৃত হল প্রেসিডেন্টের দ্বারা আমার পাঠানো লেখা পড়ে, আমি নিজে যাইনি। তারপর ক্ষীরোদবাবুর অভিভাষণ হল, সব শেষে তলোয়ারের সম্মুখে পুষ্পাঞ্জলি। ক্ষীরোদবাবুর অভিভাষণের সারমর্ম ছিল—মৎস্য পুরাণের সেই কাহিনী যাতে ঋষির হাতে আসা একটি ক্ষুদ্র কূপের মীনকে ঋষি এক সরোবরে ফেলে দিতে তার সরোবরব্যাপী বৃহৎ কায়া হল। সেখান থেকে তুলে সমুদ্রে ফেলতে তার কায়া বর্ধিত হতে হতে সে অনন্তব্যাপী হল। তখন ঋষির হাতে পড়া ক্ষুদ্র কূপের সেই ছোট্ট মৎস্যটি বলেন—"আমায় দেখ, আমি অনন্ত।" ক্ষীরোদবাবু ভবিষ্যৎ দৃষ্টি বিস্তার করে বললেন—"আজকের এই ক্ষুদ্র উৎসবের পরিকল্পনারূপী মৎস্যটি একদিন সমগ্র বাঙালি জাতির মধ্যে কায়াবিস্তার করে বাঙালিকে বীরত্বে বিপুল করে পরিদৃশ্যমান হবে।" তাঁর সে ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সত্য হয়েছে কি না, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়েছে কি না দেশ তার পরিচয় পেয়েছে।

বাংলার বাইরে এক বছর থেকে মহারাষ্ট্রীয় ও দাক্ষিণাত্যের লোকেদের সংস্পর্কে এসে আমার স্বদেশপ্রীতির পরিধিটা অনেক বড় হয়ে গিয়েছিল। শঙ্করাচার্য যে ভারতবর্ষকে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম এই চতুর্দিকে চারটি ধামের বা তীর্থক্ষেত্রের বন্ধনীতে ঐক্যডোরে বেঁধে ছিলেন সেই ভারতবর্ষ আমার বুকে আধিপত্য স্থাপন করেছিল। সেই সমগ্র ভারতের উপলব্ধিময় হয়েছিলুম—বঙ্গ যার পূর্ব প্রান্ত। বাংলাকে বাকি প্রান্তগুলির সঙ্গে সমান লাইনে মাথা খাড়া করে দাঁড় করাতে হবে বটে, কিন্তু বাকি প্রান্তগুলিকে ভুললে চলবে না। তাই ওয়াচার প্রেসিডেন্টশিপে সেবার বিডন স্ট্রীটে যখন কংগ্রেস বসল তাতে গাওয়ার জন্যে আমার সমস্ত সত্ত্বা মন্থন করে গান বেরল—

অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী
গাও আজি হিন্দুস্থান!

এর নতুনত্ব সকলেরই হৃদয়স্পর্শী হল। রবীন্দ্রনাথ নিজে এর সমজদার হয়ে গাওয়ানোর ভার নিলেন। সেবার কংগ্রেসে পাণ্ডালের বাইরে ও ভিতরে সবসুদ্ধ তিনশ ভলান্টিয়ার ছিল। সুরেন বাঁড়ুযোর বক্তৃতা যেদিন বিকেলে হবে সেদিন পাণ্ডালের বাইরের ভলন্টিয়াররা তাদের পোস্ট ছেড়ে নিয়ম ও শাসন ভঙ্গ করে সুরেন বাঁড়ুয্যের বাগ্মিতার ধারা শোনার আগ্রহে হুড়মুড় করে ঢুকে visitors' seats দখল করে বসে পড়ল। দিবাবসানে ভূপেন বোস তাদের একত্র করে এজন্যে খুব ধমক দিলেন। তারা চটে সবাই মিলে বিদ্রোহী হয়ে বললে—আগামী কালকের অধিবেশনে তারা কেউ আর ভলন্টিয়ারী করতে আসবে না। সেই সময় কেন জানিনে ভূপেন বসু আমায় ডেকে বললেন—"তুমি এদের একটু বুঝিয়ে বল।"

আমার মাথায় আর কোন বুদ্ধি যুটল না—আমি তাদের ডেকে শুধু বললুম—"দেখ তোমরা

সব ভলান্টিয়ারেরা কাল আরম্ভের গানটার কোরাসে যোগ দিও। পাণ্ডালের ভিতরে বাইরে যে দিকে যেখানে যে থাক দাঁড়িয়ে বা বসে সবাই এককণ্ঠে সমস্বরে কোরাস গেয়ে উঠবে। আগে সব গানটা শিখে নাও আজ এক্ষুনি আমার কাছে, তাহলে কাল গাইতে পারবে।" রাত ১০টা পর্যন্ত আমি তাদের গানটা গাইয়ে পাকা করিয়ে দিলুম। গানের রসে ভুলে তারা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। তুফানের জলে তেল ঢালা হল। তার পরদিন আর কোন গোলমাল হল না। যথাসময়ে পাণ্ডালের প্রত্যেক দিক থেকে একটা মহারব গুঞ্জিয়ে উঠল—

গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে
নমো হিন্দুস্থান!
হর হর হর—জয় হিন্দুস্থান!
সৎশ্রী অকাল হিন্দুস্থান!
আল্লা হো আকবর—হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!

সকলের ভিতর একটা পুলক সঞ্চারণ করলে।

সেদিনকার অভিজ্ঞতায় আমার মনে একটা কথার উদয় হল,—এই যে বছর বছর যেখানে কংগ্রেস হয় সেখানে সাময়িকভাবে একদল ভলান্টিয়ারদের কুচকাওয়াজ করিয়ে গড়ে তোলা হয়—তারপরে তারা ছোড়ভঙ্গ হয়ে যে যেখানে চলে যায়, আর শাসন নিয়মের ধার ধারে না, এ জিনিসগুলো তাদের মজ্জাগত হয় না—এতে অনেকটা অযথা শক্তিক্ষয় করা হয়। এর চেয়ে যদি স্থায়ী ভাবে একটা 'ভলান্টিয়ার কোর' গড়ে তাদের বারমাস হপ্তায় একদিন করে অন্তত drill ও discipline শিক্ষা দেওয়া হয় অনেক কাজ হয়। এবারকার কংগ্রেস ভলান্টিয়ারের কাপ্তেন যে ছিল সে আমাদের বেথুন কলেজের সংস্কৃত পণ্ডিত চন্দ্রকান্ত মশায়ের দৌহিত্র—পরে মোহিনীবাবুর জামাতা হয়। আমি তাকে ডেকে সেই প্রস্তাব করলুম,সে রাজী হল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হলে যখন একদিন সমস্ত ভলান্টিয়ারদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ানো হল আমাদের বাড়িতে, সেইদিন এই ভলান্টিয়ার কোরের গোড়াপত্তন হল।

ইতিমধ্যে আমার হাতে রুডিয়ার্ড কিপ্লিংয়ের একখানা ছোটগল্পের বই এসে পড়েছিল। তার একটা গল্পে আছে—ভারত সীমান্তে পাঠানদের মুলুকে একজন বাঙালি আই-সি-এস সাহেব ডেপুটি কমিশনার নিযুক্ত হয়েছেন। সমস্ত ডিস্ট্রিক্টের ভার তাঁর উপর। একবার যখন পাঠানরা হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে খুন-খারাপী ও লুটতরাজ আরম্ভ করলে তখন বাঙালি ডেপুটি কমিশনার সাহেব দুষ্কৃতের শাসন ও সুকৃত প্রজার পালনে রত না থেকে কোথায় পলাতক হলেন কেউ পাত্তা পেলে না। শেষে পাঠান চরেরা খুঁজে খুঁজে তাকে বের করলে যেখানে ভয়ে কম্পমান হয়ে লুকিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলেন। তাঁকে ধরে ফেলে এক কোপে তাঁর গলাটা কেটে মুণ্ডটা একটা শূলের উপর গেঁথে সারা শহরময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাতে লাগল—"বাঙালি গিদ্দর" (শৃগাল)। এই গল্পটা পড়তে পড়তে লজ্জায় ঘৃণায় অপমানে আমার রক্ত টগবগ করতে থাকল। কি করতে পারি আমি এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য? কিপ্লিংকে একখানা চিঠি লিখলুম, তার মর্ম—'আমার জাতিকে তুমি যে কলঙ্কিত করেছ সে কলঙ্ক ঘোচানোর জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি—আমার ভাইদের একজন কারও সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে। পাঁচ বৎসর সময় দিচ্ছি তোমায়। বন্দুক হোক, তলোয়ার হোক, যে কোন অস্ত্র তুমি ইচ্ছে কর নিজেকে তাতেই অভ্যস্ত করে নাও—আজ হতে পাঁচ বছর পরে সে তাতেই তোমাকে যুদ্ধদান করবে।'

ঠিকানা জানিনে কোথায় পাঠাব। সন্ধান করতে করতে বিলম্ব হতে লাগল। এর ভিতর কটকে যাওয়ার জন্যে একটা তাগাদা এল। সেখানে উড়িষ্যার দেশভক্ত মধুসূদন দাসের সঙ্গে পরিচয় হল, তিনি প্রায় বাঙালি। কথায় কথায় তাঁকে একদিন ঐ প্রেরিতব্য চিঠির কথা বললুম। চিঠিখানা

সঙ্গেই ছিল, তাঁকে পড়ে শোনালুম। তিনি বিজ্ঞ পুরুষ, পরামর্শ দিলেন—"ওকে যখন পাঁচ বছর সময় দিচ্ছেন, নিজেও পাঁচ বছর সময় নিয়ে অপেক্ষা করুন। এই পাঁচ বছরে বাঙালি ছেলেদের তৈরি করে নিন, সব রকম অস্ত্রচর্চায় পারদর্শী করে তুলুন। একটা নামডাক হোক তাদের। তারপর ক্লিপ্লিংকে challenge পাঠাবেন। সেইটেই সঙ্গত হবে।" আমি কথাটার যুক্তিযুক্ততা স্বীকার করলুম। কলকাতায় ফিরে এসে সন্ধান করে করে শ্রীরামপুরের উকিল মহেন্দ্র লাহিড়ির বাড়ির ছেলেদের কাছে তাদের তলোয়ার ও গৎকা প্রভৃতির শিক্ষক প্রোফেসার মার্তাজা বলে একজন মুসলমান ওস্তাদের খবর পেলুম। তাকে ডেকে আমাদের বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের একটা ব্যায়াম ক্লাব খুলে মোটা মাইনে দিয়ে তার শিক্ষক নিযুক্ত করলুম। তখন আমরা কাশিয়াবাগান থেকে উঠে ২৬ নং সার্কুলার রোডে এসেছি। এ বাড়িতে সামনে একটা বড় lawn আছে, আর পিছন দিকে পুকুর ধারে একটা ছোটখাট চৌকোনা জায়গা আছে, সেখানে ছেলেরা নানারকম অস্ত্র শিক্ষা করে। ক্লাবের সব খরচ—মার্তাজার মাইনে, বক্সিংয়ের দস্তানা, গৎকা, ঢাল, ছোরা, তলোয়ার, বড় লাঠি ও ছোট লাঠি প্রভৃতি সবেরই খরচ আমি দিই। ভবানীপুরের ছেলেরা আসে, শেখে। আমি বসে থাকি চেয়ারে একপাশে, সামনে টেবিল পেতে একটা খাতায় প্রতিদিন ছেলেদের হাজিরা লিখি। ক্রমে ক্রমে এই ক্লাবের খবর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, দূর দূর থেকেও ছেলেরা আসতে লাগল এবং কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এই রকম ক্লাব খুলে গেল। পুলিন দাস এলেন ঢাকা থেকে 'অনুশীলন সমিতি'র সর্দার হয়ে। অধিকাংশ ক্লাবই আমার কাছ থেকে কিছু না কিছু সাহায্য পেত, জিনিসে বা টাকায়—'অনুশীলন সমিতি'ও পেত, এবং সব ক্লাবরাই যে যখন পারে এক একবার করে মার্তাজাকে শিক্ষক করে নিয়ে যেতে লাগল।

২

ছেলেবেলা থেকে আমরা রবিমামার গান গাইতুম—

এ কি অন্ধকার এ ভারতভূমি,
বুঝি পিতা তারে ছেড়ে গেছ তুমি,
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে
কে তারে উদ্ধার করিবে।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া,
তোমারেও তাই গিয়েছে ভুলিয়া।
তুমি চাও পিতা তুমি চাও চাও,
এ দীনতা পাপ এ দুঃখ ঘুচাও,
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও
নহিলে এদেশ থাকে না।

বড় হয়ে দেখলুম বাঙলার ললাটে প্রধান কলঙ্ক হচ্ছে কাপুরুষতার — সেইটিই মুছতে হবে। হাতে অস্ত্র ধরলেই ভীরুতা যায় না। কিন্তু অস্ত্রচালনার বিদ্যা জানা থাকলে ভরসা থাকে আততায়ীর শরীরে ঠিক কোন জায়গাটি বাঁচিয়ে কোন জায়গায় মারলে সে মরবে না, শুধু ঘা খেয়ে হতবল হবে। হয়ত তাতে মারপিটের দায়ে ধরা পড়তে হতে পারে, কিন্তু খুনের দায়ে নয়। এই ভরসাই সাহস দেয় অস্ত্রবিৎকে অস্ত্র চালাতে। কুকুরেরও দাঁত আছে, বেড়ালেরও নখ আছে, আক্রমণ করলে একটি পোকামাকড়ও কামড়ায়—শুধু বাঙালিই কি সাত চড়েও রা কাড়বে না? এত মনুষ্যত্বের অভাব তার চিরকাল? এত হীনতা?

আর একটা জিনিস দেখলুম। হাতের ও মনের দুইয়ের একসঙ্গে ক্রিয়া চাই। লাঠি চালাতে

শিখলেও মনের muscles-এর অকর্মণ্যতা অনেক দিন ধরে পুরুষানুক্রমে বাঙালির চলে এসেছে, সেটাকে সরিয়ে ঠেলে ফেলে মনকে কর্মপ্রমুখ করে কাজে ঝাঁপ দেওয়ানর অভ্যেস না করলে মনের হুকুম বিনা দরকারের সময় লাঠিবিদের হাত উঠবে না। বীরেরা বলেছিলেন—"বলং বলং বাহুবলং।" সঙ্গে সঙ্গে ধীরেরা শিখিয়েছিলেন—"ব্রহ্মতেজো বলং বলং।" অর্থাৎ মন ও শরীর পরস্পর পরস্পরের উপর প্রতিক্রিয়া করে। আমি ঝোঁকের মাথায় দিগ্বিদিক-জ্ঞানশূন্য হয়েই আমার জাতিকে বলবীর্যে বলীয়ান করে গড়ে তোলার জন্যে তৎপর হইনি। এ বিষয়ে ইংলণ্ডের বড় বড় মনীষী Educationist-দের মতেরও যথেষ্ট অনুসন্ধানপরায়ণ হয়েছিলুম। তাঁদের একজনের পুস্তকে পেলুম :—

"Physical weakness is a crime – against yourself and those who depend on you. Weaklings ae despised and a weakling nation is doomed. The decline of ancient Greece and Rome which rapidly fell from the pinnacle of supreme civilization was due to physical neglect and abuse of the inflexible laws of Nature. A physically weak nation is drained out mentally, its feet are on the downward path and it will end upon the scrap-heap if it does not act before it is too late. To change from a weakling to a perfect man build yourself up, clear your befuddled brain and develop your muscles. The one great test of manliness is – courage, both mental and physical. Your mind alone is the maker of your physical future and your physical strength insures a high moral standard.

ইংরেজীতে প্রবাদ আছে—

"The battles of England are fought and won in the fields of Eton."

Eton-এ ফুটবল ক্রিকেট খেলতে খেলতে একদলের তার বিরুদ্ধ দলের সঙ্গে যে মারপিটের অভ্যাস হয়, সেই অভ্যাস ইংরেজকে স্বদেশরক্ষার্থ বা পরদেশ-বিজয়ার্থ যুদ্ধে তৎপর করে। কলকাতায় মোহনবাগান তখনো ময়দানে নামেনি। সেকালে মেডিক্যাল কলেজের ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে হিন্দু কলেজের ছেলেদেরই খেলা চলত এবং অনেক সময় দুদলে রক্তারক্তি খুনোখুনিও হত শোনা যায়—হিন্দু কলেজের ছেলেরা প্রতিবারই পরাস্ত প্রতিপন্ন হত। এবারে আমার ক্লাবের ছেলেদের কাছে গল্প শুনলুম আগের দিন মাঠেতে হিন্দু ছেলেরাই খেলায় জিতেছিল, Umpire-এর অপক্ষপাত নির্ধারণও তাই হয়েছিল, কিন্তু তার পরে ফিরিঙ্গি ছেলেরা আক্রোশে দল বেঁধে একপাল উন্মত্ত ষাঁড়ের মত যেমন তাদের তাড়া করলে তারা পালিয়ে প্রাণ বাঁচালে—"যঃ পলায়তি স জীবতি"—এই নীতির অনুসরণে। একটা হিন্দু ছেলেও তাদের সম্মুখীন হল না। আমি বর্ণনাকারীদের জিজ্ঞেস করলুম—"তোমরা কজন ছিলে? কি করলে?" তারা বললে—"আমরা দশবারজন ছিলুম। আমরা কি করতে পারি? আমরাও সরে পড়লুম।"

আমি তাদের ধিক্কার দিয়ে উঠলুম। বললুম—"বৃথা তোমাদের অস্ত্রবিদ্যা শেখা, বৃথা তোমাদের এখানে লাঠি ঘোরানো। কাল থেকে আর এসো না।" তারা লজ্জিত হয়ে অবনত-মস্তকে রইল। তারপরে মাঠে খেলায় জিতেও ফিরিঙ্গির তাড়নায় বাঙালিদের পলায়ন উপলক্ষে ভারতীতে আমার প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ বেরতে থাকল। মহাভারত থেকে সেই কাহিনী শোনালুম যাতে পাওয়া যায়—শ্রীকৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধ রাজা সাম্বর সঙ্গে যুদ্ধে আহত ও সংজ্ঞাশূন্য হলে তাঁর সারথি যখন তাঁকে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক হয়, তিনি সংজ্ঞালাভ করে জানতে পেরে তাকে ভর্ৎসনা করে বলেন—"এ কি করলে? আমার নাম চিরকালের জন্যে বীরসমাজ থেকে মুছে দিলে? যদুকুলবৃদ্ধেরা কি বলবেন? আমি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছি শুনে আমার পিতা-পিতৃব্যেরা কি মনে করবেন? যদুকুলললনারা কি আমায় কাপুরুষ কুলকলঙ্ক বলে ঘৃণা করবেন না? ফিরাও

ফিরাও রথ—আমায় যুদ্ধক্ষেত্রে নিয়ে চল, ফের সারথি।"

বাঙালি ছেলেদের বললুম—"তোমরা সেই ভারতের সন্তান, যাদের ধমনীতে আজও তোমাদের পূর্বগত ভারতবালক অনিরুদ্ধের রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। সে রক্ত কলঙ্কিত করো না, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিও না। যদি উদারভাবে বল, ক্ষমা করে এসেছ তাদের, তবে জেনো অক্ষমের ধর্ম নয় ক্ষমা। আগে ক্ষমা করবার অধিকারী হও, প্রবল হও, বলবত্তর হও, তবে তোমার চেয়ে যে হীনবল, তার প্রতি দয়া করো, তাকে ক্ষমা করো—তার আগে ক্ষমা করা ভীরুতার কাপুরুষতার নামান্তর।" দুতিন মাস পরে একটি ছেলে আগুয়ান হয়ে—চোরবাগানের বসু পরিবারের শৈলেন বসু—আর পাঁচ-দশটি ছেলের সঙ্গে আমাকে প্রণাম করে বল্লে—"মা চল্লুম—ছমাস পরে আবার আসব।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

তারা বললে—"কাল আবার মাঠে খেলা আছে। এবার আর ফিরিঙ্গিদের প্রহার-ভয়ে আমরা পলাতক হব না—উত্তম-মধ্যম না দিয়ে ছাড়ব না। তার দরুন যদি জেলে যেতে হয় যাব—আইনেতে ছ'মাসের বেশি সে ধারায় সাজা নেই—তাই বলছি ছমাস পরে আপনার শ্রীচরণে আবার আসব।"

তারা গেল, ফিরলেও সমুন্নত মস্তকে পরের দিন, ফিরিঙ্গিরাই এবার পলাতক হয়েছিল, কাউকে জেলে যেতে হয়নি।

সে সময় স্টেটসম্যানের এডিটর ছিলেন র‍্যাটক্লিফ সাহেব। তাঁর সঙ্গে ডিনারে, ইভনিং পার্টিতে মধ্যে মধ্যে দেখা হত, আমার কার্যকলাপ তাঁর অবিদিত ছিল না, কখনো কখনো সে সম্বন্ধে আমার সঙ্গে তাঁর খোলাখুলি আলোচনাও হত। মোহনবাগান যে বছর গোরাদের বিরুদ্ধে ফুটবল প্রথম জিতলে, সে বছর তিনি বিলাতে ও আমি পঞ্জাবে। "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান"-এর সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত তখন তিনি। গোরাদের বিরুদ্ধে বাঙালিদের অভূতপূর্ব জিতের খবরটা "ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে" দিয়ে তিনি সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন—"আমরা জানি এ ঘটনায় সবচেয়ে বেশি আনন্দিত যিনি হবেন তিনি হচ্ছেন—সরলা দেবী—বাংলার একটি নন্দিনী।"

বলেছি নানা জায়গা থেকে নানা ছেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত সে সময়। কেউ কেউ বলত তার মধ্যে পুলিসের গুপ্তচরও আছে। তাতে আমি ভয় পেতুম না, কারণ আমার লুকাবার কিছুই ছিল না। একদিন মৈমনসিং থেকে দুটি ছেলে এল—কেদার চক্রবর্তী ও তার সহচর ব্রজেন গাঙ্গুলি—পরে স্বদেশি গায়ক বলে যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। বললে সুহৃদ সমিতি নামে একটি দল বাঁধা তারা কয়েকটি ছেলে একটি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে যে গবর্নমেন্টের চাকরি খুঁজবে না, নিজেরা একটা বড় রকম জমি নিয়ে স্বহস্তে চাষবাস করে নিজেদের প্রতিপালন করবে। সে জন্যে তাদের পাঁচশ টাকা মূলধনের দরকার। সুরেন বাঁড়ুয্যে প্রভৃতি দেশের অনেক নেতাদের কাছে গিয়ে নিজেদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে ঐ পাঁচশ টাকা ধার চেয়েছে—বছর দুয়েকের মধ্যে টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে এই আশাও প্রকাশ করেছে। কিন্তু কেউ তাদের বিশ্বাস করে টাকা দেননি। শেষে আমার কাছে এসেছে, যদি আমি দেশের ছেলেদের প্রতি বিশ্বাস রাখি, টাকা দিই। জমি প্রায় যোগাড় হয়েছে—মৈমনসিং গৌরীপুরের জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অনুগ্রহে। তিনি আসাম প্রদেশের পাদতলস্থ তাঁর জমি থেকে প্রায় এক হাজার বিঘা তাদের lease দিতে প্রস্তুত আছেন যদি নিজেরা চাষবাস করে। কিন্তু হাল জোৎ গরু ও বীজ প্রভৃতির জন্যে পাঁচশ টাকা গোড়ায় সংগ্রহ না হলে জমি নেওয়া তাদের বৃথা, তাই এখনো নেয়নি। বড় আশা করে আমার কাছে এসেছে। আমি কি দেব তাদের টাকা? তাদের দলে বিশটি ছেলে আছে যারা এই কাজের জন্যে প্রস্তুত।

আমি স্থির জেনে নিয়েছিলুম দেশের ছেলেদের মানুষ করে তোলার যে কাজে আমি নেমেছি তাতে ফিরে পাবার আশা না রেখেই অনেক টাকা ঢালতে হবে। সেগুলো হিসেবের খাতাতে bad debts-এর ঘরেই ফেলতে হবে। আমরা অনেকেই অনেকদিন ধরে প্লাটফর্মে প্রেসে অনুযোগ

আনছি, চাকরি ছাড়া বাঙালি ছেলেদের কি গত্যন্তর নেই? স্বাধীন জীবিকার কোন পথই নেই? আমাদেরই সকলের অনুপ্রেরণায় এই ছেলেরা একটা পথ খুঁজে নিয়েছে। এখন যদি তাদের নিরুৎসাহ করি, প্রয়োজনকালে টাকার সাহায্য দিয়ে তাদের সেই পথে অগ্রসর করে না দিই, তবে আমাদের নিজেদের উক্তিতে নিজেদেরই অবিশ্বাস প্রমাণ করা হবে না কি? টাকাটা ঋণ বলেই দেব, কিন্তু ঋণ ফিরে পাবার আশা রাখব না—এই মনস্থ করলুম। হতে পারে এই ছেলেরা ঠগ, হতে পারে সরল মনে চেষ্টা করেও এরা কৃতকার্য হবে না—টাকাগুলি জলেই যাবে, তবু এইভাবে কোন কোন দিকে টাকা ডোবানোর জন্যে প্রস্তুত থাকতে হবে। আমি কেদার চক্রবর্তীকে বললুম—"দেব আমি টাকা, কিন্তু ব্রজেন রায়চৌধুরী যে তোমাদের জমি দিতে প্রস্তুত আছেন, সে বিষয়ে তোমাদের সঙ্গে তাঁর পত্র-ব্যবহার দেখতে চাই।"

এক সপ্তাহ পরে তারা ফিরে এসে বললে—"ব্রজেনবাবু এখন আমাদের নামে জমি দিতে অস্বীকার করছেন। আপনি আমাদের মাথার উপর দাঁড়িয়েছেন জেনে বলছেন আপনাকে দেবেন জমি, আমাদের নয়, সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে লেখাপড়া করতে প্রস্তুত আছেন।" তারপরে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক সেক্রেটারী মনোমোহন ভট্টাচার্যের সঙ্গে ব্রজেনবাবু স্বয়ং এসে আমার সঙ্গে দেখা করে সব ঠিক করলেন। জমি আমার নামেই লেখাপড়া হল। জোৎ হাল সব আমার টাকায় আমার নামেই কেনা হল। ছেলেরা চালাবে ও যে ফসল হবে তার দ্বারা নিজেদের প্রতিপালন করবে। দুই-এক বছরে যখন আমায় টাকাটা ফিরিয়ে দিতে পারবে তখন সব কিছুর মালিক তারাই হবে। এই থেকে সুহৃদ সমিতির সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ সংযোগ হল।

এবার আমার দৃষ্টি গেল বাংলায় একটি জাতীয় উৎসবের দিন নির্দিষ্ট করার দিকে। যেমন মহরমের দিন মুসলমানদের নানারকম অস্ত্রচালনার প্রদর্শনী চলে পথেঘাটে, তার জন্য সারা বৎসর ধরে নানা আখড়ায় নানা নেতার অধীনে নানা দল সেগুলি ভাঁজতে থাকে ; যেমন রামলীলা ও দশেরা বা বিজয়া দশমীর দিন বঙ্গেতর হিন্দু-ভারতে বীরোচিত নানা খেলাধুলা চলে, বাংলায় সেই রকম চালাতে হবে—কোন্ দিন? ওসব দেশের দশেরা আমাদের বিজয়া দশমীর মত নয়, তাতে প্রতিমার ভাসানের পর্ব নেই। আমাদের ভাসানের দিন সবাই তারই আয়োজনে ব্যস্ত, সেদিন খেলাধুলার বিশেষ অনুষ্ঠানের অবসর হবে না বাঙালিদের। অথচ ঐ শারদীয় ঋতুতে যে সময়ে শমীবৃক্ষ থেকে তাঁদের অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করে পাণ্ডবরা বীরভোগ্যা বসুন্ধরায় অভিযানে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিলেন, সেই সময়েই বাঙালিদের বলবীর্য সাধনার জাতীয় উৎসব না হলে বাকি সব হিন্দুদের সঙ্গে তারা ঐক্যসূত্রে বাঁধা হবে না। এইরূপ দ্বিধায় দোদুল্যমান যখন তখন বাঙালির পঞ্জিকা হলেন আমার সহায়। হঠাৎ একদিন এ বছর দুর্গাপূজার ছুটি কবে থেকে আরম্ভ হবে তাই জানার জন্যে পঞ্জিকার পাতা উল্টাতে উল্টাতে চোখে পড়ে গেল দুর্গা-পূজার অষ্টমীর আর একটি নাম "বীরাষ্টমী" এবং সেদিন "বীরাষ্টমী ব্রত" পালন করা ও ব্রতকথা শোনানোর বিধান। আমার আর নতুন করে কোন দিন উদ্ভাবন করতে হল না, যা চাচ্ছিলুম পেয়ে গেলুম। বহুকাল ধরে বাঙলা দেশের সংস্কারে যা রয়েছে কিন্তু বাঙালির ব্যবহার থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে তারই পুনরুদ্ধার করা। বাঙালি মায়েদের বীরমাতা হওয়ার লক্ষ্যপথে আবার নিয়ে আসা, সে বিষয়ে তাদের ব্রতের পুনঃপ্রচলন করা। ভীরু বাঙালি মায়ের হাত দিয়েই ছেলের রক্ষাবন্ধন করিয়ে মায়ের নিজমুখে "বীরোভব" বলে ছেলেকে বীরোচিত খেলাধূলা কাজেকর্মে প্রবৃত্তি দেওয়ানো। মাতায় পুত্রে মিলিত হয়ে দেশকে গৌরবশিখরে সমুন্নত রাখার প্রকৃষ্ট সাধনা যে দেশের ধর্মোৎসবের একটি অঙ্গ ছিল—সে দেশ আজ এত হীন এত পতিত হয়ে আছে কেমন করে? আমার প্রাণ কেঁদে উঠল। আজ আমায় দেশের অনেক ছেলে 'মা' বলে। না জেনে আগে থাকতেই আমি তাদের কারো কারো হাতে রক্ষাবন্ধন করেছিলুম। এখন যখন জানলুম ঐ দিনে এদেশের দেশাচারই ঐ, মায়ের কর্তব্যই ঐ, তখন ক্লাবে ক্লাবে সকল খেলোয়াড়ের হাতেই ঐ দিন রাখি বেঁধে তদের লোকসমক্ষে খেলায়

প্রবৃত্ত করানোই হল আমার ধর্ম—আমার প্রতি দেশমাতৃকার এইটিই আদেশ, নয়ত পঞ্জিকার ঐ পৃষ্ঠাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়ালেন কেন?

সেই থেকে আধুনিক বীরাষ্টমী উৎসবের সূচনা হল। সেই বছরই মহাষ্টমীর দিন ২৬নং বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের মাঠে ছেলেদের অস্ত্রবিদ্যা-প্রদর্শনী ঘোষণা করা হল। কলকাতায় যত ক্লাব আমার জানা ছিল সকলের কাছে আমন্ত্রণ গেল—তাঁরা যেন উৎসবে যোগদান করেন ও খেলার প্রতিযোগিতায় নামেন। মুর্শিদাবাদের Dowager নবাব-বেগম সাহেবার কন্যা সুজাতালি বেগের পত্নী আমার বন্ধু ছিলেন। লেসের পরদা-ঘেরা একটা প্ল্যাটফর্মের ভিতর আমার মা ও মাসিমাদের সঙ্গে তাঁকে বসিয়ে শেষে পরদার ভিতর থেকে বাড়ানো তাঁর হাত দিয়ে উৎসব-প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ করালুম—কাউকে মুষ্টিযুদ্ধের জন্যে দস্তানা, কাউকে ছোরা, কাউকে লাঠি এবং প্রত্যেককেই একটি করে 'বীরাষ্টমী পদক'—তার এক পিঠে লেখা "বীরোভব"-এক পিঠে "দেবাঃ দুর্বলঘাতকাঃ"। বীরাষ্টমী উৎসবের একটি অনুষ্ঠানপদ্ধতিও প্রস্তুত হল। তার প্রধানাঙ্গ হচ্ছে একটি ফুলের মালায় সজ্জিত তলোয়ারকে ঘিরে দাঁড়িয়ে দেশের পূর্ব পূর্ব বীরগণের বন্দনা-স্তোত্র ও তাঁদের নাম উচ্চারণ করে করে তরবারিতে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান। সে স্তোত্রটি এই ঃ—

বীরাষ্টম্যাং মহাতিথৌ পূর্ব পূর্বগতান্ বীরান্
নমস্কুর্য ভক্তিপূর্বং পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
বীরকুলাগ্রগণ্যং শ্রীকৃষ্ণ-নন্দননন্দনম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
সানুজং শ্রীরামচন্দ্রং রঘুকুলপতিশ্রেষ্ঠম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণার্জুন-ভীমান্ সর্বপিতামহান্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ইন্দ্রজয়ী মহাশূরং মেঘনাদারিপুত্রাসম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
রাজপুতকুলগর্বং প্রতাপমহাপ্রতাপম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ছত্রপতি মহাবীরম্ মহারাষ্ট্রকুলনায়কম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
পঞ্জাবকেশরীং বীরং রণজিৎ ইতি খ্যাতম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
বঙ্গাধিপং মহাশৌর্যং প্রতাপাদিত্য বীরেশম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
ক্ষত্রবংশসমুদ্ভূতং বঙ্গজং রায় সীতারামম্
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।
এতৎ সর্বেষান্ পূর্বগতান্ পদে পুষ্পাঞ্জলিং দত্বা
বীরাষ্টম্যাং নমস্কুর্য পুষ্পাঞ্জলিং দদাম্যহম্।।

যখন এক এক জনের নাম উচ্চারণ করে করে পুষ্পাঞ্জলি প্রক্ষেপ হত, একটা ভীষণ উত্তেজনায় সমস্ত সভামণ্ডলী জাগ্রত হত। এই স্তোত্রটির রচয়িতা খিদিরপুরের সেকালের প্রসিদ্ধ স্বদেশি আশুতোষ ঘোষ। বিভিন্ন খেলার মধ্যে মধ্যে এক একটি জাতীয় সঙ্গীতও সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত করে রাখত।

'বীরাষ্টমী'র উৎসব বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। যে সব দেশভক্তেরা কলকাতায় এসে যোগদান করতে পারতেন না, তাঁরা স্ব স্ব নিবাস স্থানে এর অনুষ্ঠান আরম্ভ করলেন। আমার উপদেশ ছিল—যে গ্রামে আর কিছু করার সুবিধে নেই, সেখানে এই 'বীরাষ্টমী'কে উপলক্ষ করে মহাষ্টমীর দিন ছেলেরা যেন গ্রামের পুকুরে শুধু সন্তরণেরই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন। মোট কথা এই তিথিটিতে কোন না কোন রকম শারীরিক বলবীর্যের অনুষ্ঠান চাই, আর মায়ের হাতের রাখি নেওয়া চাই।

সেই সময় একবার বরোদার গায়কোয়ার ও তাঁর রানী দার্জিলিং থেকে কলকাতা হয়ে বরোদায় প্রত্যাগমন করবেন শুনতে পেলুম। আমি তাঁদের একটি অপরাহ্ণে আমাদের বাড়িতে চায়ে নিমন্ত্রণ করলুম। তাঁরা যখন এলেন, আমার ক্লাবের ছেলেরা স্ব স্ব অস্ত্র হাতে তাঁদের guard of honour দিলে এবং চা-পানের পর মাঠে তাদের অস্ত্রখেলা প্রদর্শন করলুম। মহারাজাকে গল্প করলুম প্রায় ৭/৮ বছর আগে সোলাপুরে তাঁর সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্রীয় ক্লাবের খেলা দেখে আমার মনে এই ক্লাব খোলার প্রথম সূচনা হয়েছিল। বাড়ির ভিতরে উঠতে প্রথম ঘরেই জাপানী আর্টিস্টের হাতে আঁকা আমার ফরমাসী কালীর একটি অপূর্ব মূর্তি ছিল—সেখানি আজও আছে আমার বাড়িতে। ঘরের অন্যান্য দেওয়ালে আমার মা-বাবার ছবির সঙ্গে সঙ্গে আমারও একখানা বড় ছবি ছিল—খোলা চুলের প্রাচুর্যে বোধ হয় দৃষ্টি আকর্ষণ করা—সে ছবি অনেক জায়গায় বেরিয়েছে, বোধহয় যোগেন গুপ্ত মহাশয়ের "বঙ্গের মহিলা কবি" পুস্তকেও আছে। বরোদারাজকে আমি কালীর ছবির দিকে নিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখতে বললুম। তিনি আমার ছবির দিকে ফিরে হেসে বললেন—"কোন্ কালী দেখব? এই কালী না ঐ কালী?"

৩. জাতীয় দৈন্যের নানা দিক

নতুন মামার স্থাপিত সঙ্গীতসমাজে বরোদার রাজা নিমন্ত্রিত হয়ে গেলেন। সেটি সেকালের বনেদি ঘরের ধনী সৌখীন পুরুষদের গান-বাজনা ও থিয়েটারের আড্ডা। একবার "বাল্মীকি প্রতিভা" অভিনয় হচ্ছিল সেখানে। তাতে বৌবাজারের যোগেন মল্লিক মহাশয় বাল্মীকি সেজেছিলেন। তাঁর পার্টে যখন গান এল—

"যাও লক্ষ্মী অলকায়!
যাও লক্ষ্মী অমরায়!
এ বনে এসো না, এসো না,
এসো না এ 'দীনজন' কুটীরে—"

তিনি গাইতে গাইতে স্টেজের মধ্যিখানে বলে উঠলেন—"আমার দ্বারা এ হবে না। আমি মা লক্ষ্মীকে এ কথা বলতে পারব না, তাঁকে তাড়াতে পারব না। জন্ম জন্ম এসো মা, থেকো মা এই দীন অভাগ্যজনের কুটীরে।"—বলে স্টেজ ছেড়ে পালালেন।

সেই ধনী ও বিলাসীদের প্রমোদগৃহে বরোদার রাজা গেলেন যখন গান-বাজনার টুঁ শব্দটি শোনা গেল না। সেদিন গোবরডাঙার জমিদারপ্রমুখ বলশালী পুরুষগণের বলবীর্যের নানাপ্রকার নিদর্শন দেখানো হল শুধু। বরোদাকে আর কিছু দেখানো শুনানো যেন বাঙালির পক্ষে লজ্জাকর হবে, তাঁদেরও মনে তাই ঠেকল। সেদিন প্রমাণ হল দেশের ধাত বদলেছে।

আর এক ব্যাপার হতে থাকল। নানা স্থান থেকে আমার কাছে দরখাস্ত আসতে লাগল তাদের দেশে আমার ক্লাবের কতিপয় ছেলেকে পাঠাতে—তাদের ওখানে খেলাধূলা দেখানো ও শেখানোরও জন্যে। পূজার সময় বাংলা দেশে বড়লোকদের ঘরে বাইনাচ আনা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। বাঙালির জাতীয় চরিত্রের প্যাটার্ন বদলাতে থাকল।

এই সময় আমার নিজের সম্বন্ধে নানা গুজব আমার কানে ওঠাতে থাকলেন দুই-একটি গুজবী ব্যক্তি। সবই যে প্রীতিকর হত তা নয়। আমি চুপ করে সব শুনে যেতুম, কোন মন্তব্য করতুম না। শুনতে পেলুম আমার একটা নামকরণ হয়েছে বাংলার 'Joan of Arc'—'দেবী চৌধুরাণী' নামেও আখ্যাত হতে লাগলুম। একবার শুনলুম—রেলেতে একটা পার্সেল ধরা পড়েছে, ভিতরে বন্দুক ভরা, উপরে কারো নাম নেই। পুলিসের বিশ্বাস আমি নাকি সেগুলির আমদানি করিয়েছি—পুলিস কিন্তু তদন্ত করতে আসেনি আমাদের বাড়িতে। আর একবার সি আর দাস আমার সঙ্গে দেখা করতে এসে বলে গেলেন—"আপনি সাবধানে থাকবেন। সন্ধেবেলা বালিগঞ্জে এ বাড়ি ও বাড়ি হেঁটে বেড়াতে বেরোবেন না। পুলিস বলছে, আপনি বড্ড বাড়াবাড়ি করছেন, অথচ আপনাকে ধরবার, ছোঁবার কোন উপায় পাচ্ছে না। তাই তারা এবার পরামর্শ এঁটেছে কোনদিন সন্ধেবেলায় আপনি বাড়ির বাইরে বেরোলে তাদের গুণ্ডা দিয়ে আপনাকে আক্রমণ করিয়ে জাহির করে দেবে গুণ্ডারা আপনার ক্লাবেরই ছেলে—আপনিই এই সব গুণ্ডা তৈরি করেছেন।"

এইবার ভারতীতে আমার "আহিতাগ্নিকা" কবিতা বেরল। সেটি এই ঃ—

আহিতাগ্নিকা

সর্বদেব সাক্ষী করি একি ব্রত করিলে গ্রহণ!
পথ যে দুর্গম একায়ন!
সুতীব্র দিবস আর সুদীর্ঘ শর্বরী,
অপ্রকম্প্যচিতে
সর্ব ভয় পরিহরি
পারিবে কি যেতে?
হে সুখলালিতা!
দুরাশা-চালিতা!

২

দৃষ্টিবিষ সর্প সেথা জাগে অতি ভীষণ-আকার!
করে নিত্য গরল উদ্গার।
ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ক্রূর, হিংস্র পরাণী যতেক
ফিরিছে গোপনে,
আছে কণ্টক শতেক!
পারিবে সহিতে সব?
তুমি বিক্লববচনা
অশ্রু-আবিল-লোচনা!

৩

ঊর্দ্ধ্বজ্বল দ্বিজসম হইবে কি
সত্য-সঙ্গরা!
অতন্দ্রিতা, চিরলক্ষ্য-পরা!
পারিবে সাধিতে শক্তি
রিপুনিবর্হণা।
লোকহাস, ভয়, লজ্জা, মিথ্যা বিগর্হণা
সহিবে প্রশান্ত চিতে?

অয়ি আহিতাগ্নিকা!
অতি সাহিসিকা!

৪

যে অগ্নি জ্বালিলে আজি, চিরদীপ্ত
রহিবে কি তাহা?
উচ্চারিবে নিত্য স্তস্তি স্বাহা!
প্রাণাহুতি দিবে তায়! আত্মবিসর্জন
নিরত হইবে তার সমিধ ইন্ধন!
সঙ্কল্প অটল রবে!
হবে চিরধন্যা!
অরি বীরন্মন্যা!

৫

পুষ্পমাসে গন্ধ-বহ যদি আনে
মোহ অভিনব,
নিদাঘ সন্ধ্যায় উঠে বেণুবীণা রব,
ময়ূরবিরুতমধু বনভুবচ্ছায়,
পুলকসমুখ কম্প যদি শিহরায়,
রবে অকম্পিতা তুমি!
হে আত্ম-ঈশানা
চির অতৃষাণা!

৬

যদি ঝড়ঝঞ্ঝা উঠে, বক্ষ-মাঝে
অঞ্চল আবরি,
অগ্নি রাখি দিও, জাগি সারা বিভাবরী!
আর সব নারী ভবে প্রিয়-পরিজনা,
তুমি রহ শ্রেয়োনিষ্ঠ ব্রত-পরায়ণা!
অনাকুলা, অনলসা, সুকঠোরজপা!
দৃঢ়পরন্তপা!

এই সময় রুশের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধল। বাঙালিদের মনুষ্যত্বের পথে আর এক ডিগ্রি উঠানোর জন্যে এই সুযোগটা গ্রহণপরায়ণ হলুম। খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দিলুম, ইংরেজদের রেডক্রসের মত বাঙালিদেরও একটি রেডক্রস দল গঠনের জন্যে আমি সচেষ্ট—জাপানের যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে আহতদের সেবার জন্যে। যারা যোগ দিতে চান নিজেদের নাম ধাম আমার কাছে পাঠাবেন; এবং এর ব্যয় নির্বাহার্থে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন হবে, যারা অর্থ সাহায্য করতে চান তাদের সাহায্য সাদরে গৃহীত হবে। এর উত্তরে তিন শ-র অধিক লোকের আবেদন এল 'বেঙ্গলী রেডক্রস' দলভুক্ত হবার জন্যে; এবং অর্থের দিক থেকে সর্ব প্রথমে মৌরভঞ্জের মহারাজা শ্রীরামচন্দ্র ভঞ্জ অযাচিতভাবে একখানি এক হাজার টাকার চেক পাঠালেন। ময়নসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য এবং অনান্য বন্ধু-বান্ধবেরা জানালেন তারা প্রস্তুত আছেন, যখনি যত টাকার প্রয়োজন জানালে পাঠিয়ে দেবেন। দেখলুম দেশে প্রাণের অভাব নেই খালি জ্বালিয়ে দেবার দেশলাই কাঠি একটি চাই। এই সময় বেলুচিস্থান থেকে Colonel Yates নামে একজন ইংরেজ মিলিটারী অফিসারের একখানি চিঠি পেলুম। তিনি অনুযোগ করলেন, আমি বাঙালিদের একটা

স্বতন্ত্র Ambulance Corps ম্যাঞ্চুরিয়ায় পাঠাবার জন্যে কেন প্রয়াসী হয়েছি? লর্ড কার্জনের প্রচেষ্টায় ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট থেকে যে Corps পাঠান হবে তার সঙ্গে এইটে মিলিত কেন না করি? তাছাড়া আমার Corps কি St. John Ambulance Association-এর ট্রেনিং প্রাপ্ত? তা না হলে যাওয়া নিষ্ফল—তিনি আমায় সতর্ক করে দিলেন। হয়ত এ বিষয়ে বাঙালিদের কোন স্বাধীন প্রচেষ্টা ইংরেজদের মনঃপূত ছিল না, হয়ত ইন্ডিয়া গবর্নমেন্ট থেকেই এ চিঠির ইঙ্গিত গিয়েছিল, —যাই হোক এর থেকে আমি একটা মস্ত শিক্ষা পেলুম। ব্যাপারটার গুরুত্ব সম্বন্ধে একটা ধারণা এল। আমার 'বেঙ্গলী রেডক্রস' সংগঠন ও যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণের পরিকল্পনাটি শুধু ভাবের তোড়ে নির্গত একটি বস্তু। এর জন্যে নিজেদের তৈরি হওয়ার প্রধান উপকরণ কি কি তা ভাবিনি। দেশের লোকেরাও কেউ এদিকে মাথা ঘামাননি, আমায় সে সম্বন্ধে কেউ সচেতনও করেননি—একের উৎসাহেই খালি সকলের উৎসাহ প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শুধু শতাব্দীগত ভীরুতার শিক্ষাকে দলিত করে—'শতহস্তেন বাজিনঃ' প্রভৃতি বুলি প্রত্যাখ্যান করে ভয়াবহ যুদ্ধস্থলে গোলাবন্দুকের সন্নিকটে উপস্থিত হওয়ার সাহস অবলম্বনই যে যথেষ্ট নয়, যে উদ্দেশ্যে যাওয়া সে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে—আহত মুমূর্ষুদের প্রাথমিক চিকিৎসা ও সেবার জন্যে যারা ডাক্তার নয় তাদের সে বিষয়ে অধীতবিদ্য হয়ে যাওয়া যে কতদূর প্রয়োজন তা ভাবিনি। কর্নেল ইয়েট্‌সের চিঠি পেয়ে এ সম্বন্ধে জাগরণ এল। কিন্তু St. John Ambulance Association কি বাঙালিদের শেখাবে? সেটা British Red Cross-এর অঙ্গীভূত—তাতে ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি ছাড়া আর কেউ শিক্ষা পায়—বলে ত জানিনে। আমি তার বড়কর্তাকে একখানি চিঠি লিখে অনুরোধ করলুম আমার সঙ্গে এসে দেখা করতে, তিনি সৌজন্য করে এলেন। আমি তাঁকে সব অবস্থাটা খুলে বললুম। তিনি শুনে বললেন—"এ পর্যন্ত একটি বাঙালীও তাঁদের কাছে ট্রেনিংপ্রার্থী হয়ে কখন আসেনি। তাঁদের ক্লাস শুধু ইংরেজ ও ফিরিঙ্গিতেই ভরা। বাঙালিদের শেখানো হবে কিনা এ বিষয়ে কোন দিন কোন প্রশ্ন উঠবার অবসরই হয়নি। আমার অনুরোধ তিনি নিশ্চয়ই রক্ষা করবেন—বেঙ্গলী Ambulance Corps কে উপযুক্তভাবে শিক্ষিত করে দেবেন। সেজন্যে তাদের যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার পূর্বে অন্তত তিন মাস কলকাতায় অবস্থান করে শিক্ষা নেওয়ার দরকার।"

এই সকল পর্যালোচনা চলছে—ইতিমধ্যেই খবরের কাগজে হঠাৎ একদিন একটি খবর বেরল—জাপানী গবর্নমেন্ট ইস্তেহার দিয়েছেন—'বহু জাতি তাদের প্রতি সহৃদয়তা প্রকাশ করে তাদের আহতদের সেবার জন্যে স্ব-স্ব রেডক্রস-সেবকদের পাঠাবার অভিপ্রায় জানিয়েছেন। তাদের সকলকে জানানো হচ্ছে তাদের সাহায্য প্রস্তাবের জন্য জাপান কৃতজ্ঞ, কিন্তু এস্থলে কোন বিদেশীয় সাহায্য গ্রহণে তারা পরাঙ্মুখ।" জাপানের তীক্ষ্ণ রাজনীতি-বিচক্ষণতার ফলেই এইরূপ বিধান তাঁরা সাব্যস্ত করেছিলেন সন্দেহ নেই।

দেখা যায় সেদিনকার জাপান ও আজকেকার জাপানের প্রতি ভারতবর্ষে আমাদের দৃষ্টিকোণের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন তারা সবেমাত্র এক প্রচণ্ড বলশালী য়ুরোপীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে জয়লাভ করেছে—একমাত্র এশিয়াটিক জাতি তারা সমস্ত এশিয়ার মুখোজ্জ্বল করেছে এবং 'Asia is one' এই বাণীর দ্বারা সমগ্র এশিয়াকে জাগ্রত করেছে। আজ দেখি "এশিয়া এক" এই অভিনব বুলিটির ভিতর এক দারুণ গুলি লুকিয়ে রেখেছিল যেটা সুযোগ মত বেরিয়ে পড়ে তামাম এশিয়াকে বিব্রত করে তুলবে, সেটি হচ্ছে 'জাপানের অধীনতায়'। আজ কয়েক বৎসর ধরে চীন মহাদেশকে জাপানের ছত্রছায়ে আনবার আপ্রাণ প্রচেষ্টায় সেটা পদে পদে প্রমাণিত হচ্ছে। শ্যাম, বর্মা, মলয়দ্বীপ, কোরিয়া, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ—কোথাও তাদের এ অভিসন্ধি আর লুকান নেই। পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তের ক্ষুদ্র দ্বীপ জাপানও যে সাম্রাজ্য বিস্তারের সমান অধিকারী এ বিষয়ে আর তাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। ইংলন্ড যেমন 'white man's burden' বহন করার মহদুদ্দেশ্যে,

কেবলমাত্র পরোপকারার্থ, দেশ বিদেশে নিজেদের 'ঝান্ডা উচা' করছেন, জাপানও—ইংলন্ডের দক্ষতম শিষ্যটিও—তদ্রূপ 'yellow man's burden' কাঁধে ওঠানোর জন্যে, প্রতিবেশীদের অতিভার লাঘবের জন্যে, কেবলমাত্র তাদেরই কল্যাণের প্রতি দৃষ্টিবান হয়ে তাদের দিকে হস্তবিস্তার করছে। ইংলন্ডের লৌহপাশ থেকে মুক্ত হয়ে জাপানের বজ্রকুসুমের বলয় পরতে কিসের আপত্তি? এ যে এশিয়াটিক স্যাকরার হাতে গড়া স্বদেশি জিনিস! কিন্তু ভবী ভোলবার নয়! ন্যাড়া বেলতলায় দুবার যেতে নারাজ!

যুদ্ধের পর অনেক জাপানীর সমাগম হতে থাকল ভারতবর্ষে ও আমাদের পরিবারমণ্ডলে। তার মধ্যে তিন-চারটির সঙ্গে আমাদের বিশেষ পরিচয় হল। তাদের মধ্যে দুটি ইয়োকোআনা ও হিষিদা চিত্রকর, তখনি নিজেদের দেশে কিছু কিছু নামকরা, পরে ভারতবর্ষ থেকে ফিরে গিয়ে বিশেষরূপে প্রথিতনামা হন। তাঁরা পরিবারস্থ কারো কারো ফরমাসে ভারতীয় বিষয়ের অনেকগুলি চিত্র আঁকলেন। য়ুরোপীয়দের মত ক্যানভাসের উপরে নয়, রেশমের উপর আঁকেন জাপানীরা। তাতে ভারি একটি মোলায়েম ভাব হয়। আর তাদের তুলির স্পর্শ যে কি সুকোমল, রঙগুলি যে কি সুমোহন হয়ে ফোটে, তা চিত্রশিল্পী মাত্রে জানেন। আমার ফরমাসে একজন ইয়োকোআনা কালী ও একজন হিষিদা সরস্বতীর ছবি আঁকলেন। সে দুখানিই আমার ঘরে আজও বিরাজিত এবং দর্শকমাত্রের দৃষ্টি ও চিত্ত-আকর্ষক। যদি বোমা পড়ে, তবে রামের বোমাতেও যাবে, রাবণের বোমাতেও যাবে—এই ভয় মনে পোষণ করেও ছবি দুখানি রেখেছি সযত্নে যুদ্ধের আজ তিন-চার বছর ধরে নিজের বসবাস ঘরেই। এ দুখানির ফটো সে সময়কার প্রবাসীতে বেরিয়েছিল—তখন ভারতী সচিত্র ছিল না। 'কালীর' ছবিটি ঠিক সচরাচর দৃষ্ট কালীর ছবি নয়। তার কল্পনায় যে নূতনত্ব ছিল তার ব্যাখ্যান দিয়েছিলুম প্রবাসীতে।

সুরেন মহাভারতের 'গীতা' কথনের সময়কার ছবি আঁকিয়েছিলেন, তাঁর প্রণীত 'সংক্ষিপ্ত মহাভারত' পুস্তকের অন্তঃপৃষ্ঠায় তার ফটো সন্নিবিষ্ট আছে। শ্বেত অশ্বযুগলের রথে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণ দুজনে সমাসীন। সে ছবি শ্রীকৃষ্ণের তেজোময়তার একটি আদর্শ ছবি। গগনদাদা ও অবনদাদা রাসলীলা ও অন্যান্য হাল্কা রসাত্মক বিষয়ের ছবি আঁকিয়েছিলেন। সে রাসলীলার ছবিখানি একটু একটু মনে পড়ে—কি অপার্থিব চন্দ্রালোক, কি আকাশবৎ সূক্ষ্ম বায়বীয় উত্তরীয় গোপীদের, কি নৃত্যভঙ্গি! এগুলি প্রকাণ্ড বড় বড় ছবি। আমার পঞ্জাব অবস্থানকালে জাপান গবর্নমেন্টের দূত এসে তাদের আর্টিস্টের অঙ্কিত অমূল্য ছবিগুলি বহুমূল্যে ক্রয় করে নিয়ে গেল। আমার দুখানি আমার সঙ্গে পঞ্জাবেই ছিল—তাই বেঁচে গেছে, এখনও ভারতবর্ষেই রয়ে গেছে।

এই আর্টিস্টদের সমসাময়িককালে 'প্রিন্স হিতো' বলে জাপানী রাজবংশের একটি ছেলে আসেন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের তীর্থস্থান দেখে বেড়াচ্ছিলেন। এঁকে দেখতে অনেকটা ত্রিপুরার রাজবংশের একটি সুন্দর ছেলের মত—একটি ভারি সৌকুমার্য আছে শরীরে, মুখে ও মনে। তাঁর সরল, সাদাসিধে অথচ সবিনয় ভদ্রব্যবহারে সকলে মুগ্ধ হয়েছিলেন। যেন পথহারা পথিকের মত পৃথিবীতে ফিরতেন তিনি। তাঁকে দু-একটি তথাকথিত রসিক পুরুষ তাদের দেশের নর্তকীদের সম্বন্ধে নানা রকম প্রশ্ন করতেন, তিনি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকতেন। এরা ছাড়া স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্যা মিসেস ওলেবুলের—যাঁর টাকাতেই বেলুড় মঠের ভিত্তি স্থাপিত হয়—বন্ধু, আমেরিকায় কিছুকাল অবস্থিত ও ইংরেজী শিক্ষিত একজন বিশিষ্ট লেখক, আর্ট সমালোচক ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী ওকাকুরা এসেছিলেন। তিনি একজন আদর্শ সামুরাই জাপানী—চেহারায়, ধরন-ধারণে, পোশাক-পরিচ্ছদে, সর্বদিকে চৌকস, জাতীয়তায় ভরা, এশিয়ার ঐক্যবাদে অনুপ্রাণিত, এশিয়ার প্রতি অংশকে—শ্যাম, জাভাদি এবং ভারতবর্ষ থেকে আরম্ভ করে পারস্য পর্যন্ত প্রতি খণ্ডটিকে দেশাত্মবোধে কানায় কানায় ভরে দেওয়ায় আগ্রহবান।

তাঁর একখানি প্রসিদ্ধ বই কলিকাতায় বসেই লেখা, মিসেস ওলেবুল, মিস ম্যাকলয়েড প্রভৃতির তত্ত্বাবধানে এবং নিবেদিতার টাইপিংয়ে। তাঁর বইয়ের আরম্ভের সেন্টেন্স 'Asia is one', তার শেষ সেন্টেন্স—'Victory from within or Death from without'। তাঁর বইয়ের অন্তর্গত ভাব ও বাণী বাংলা থেকে পঞ্জাব পর্যন্ত মুখে মুখে প্রচার হতে থাকল, লাজপৎ রায় প্রমুখ প্রত্যেক দেশভক্তের লেখনীতে লেখনীতে প্রতিফলিত হতে লাগল।

এই সব জাপানীরাই সুরেনদার বাড়িতে অতিথি হয়ে বাস করতেন। আমাদের পরিবার ছাড়া আর এক বাঙালি পরিবারের কর্তার সঙ্গেও ওকাকুরার ভাব হল—তিনি ক্রীক রো-র সুবোধ মল্লিকের পিতৃব্য হেম মল্লিক। ওকাকুরা যখন জাপানে ফিরে যান, হেম মল্লিক মহাশয়ের পুত্র তাঁর সঙ্গে গেলেন।

রুশ-জাপানী যুদ্ধের পর থেকে জাপানের সঙ্গে ভারতবর্ষীয়দের বাণিজ্যের সংযোগ বেড়ে গেল এবং বাংলাদেশ থেকে অনেক ছাত্ররা গিয়ে নানাবিধ শিল্প শিক্ষা করতে লাগল। সিলেটের রমানাথ রায় সে সময়ে একজন প্রসিদ্ধ জাপান প্রত্যাগত সম্মানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফিরে এসেই আমার সঙ্গে দেখা করেন—জাপানের অনেকানেক অদ্ভুত অদ্ভুত ছোট ছোট শিল্পজাত উপহার নিয়ে এসেছিলেন মনে পড়ে, যা তৈরি করতে জাপানীদের বেশি খরচ হয় না, অথচ যার ভিতর শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা পাওয়া যায়। জাপানের আদর্শে নানা রকম ছোট ছোট কলকারখানা ব্যবসা-বাণিজ্য চালানো তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। অল্পদিনেই সকলকে মর্মাহত করে তাঁর অকাল-মৃত্যু হয়, দেশ একটি সুকর্মীকে হারায়। ছাত্রদের মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের উমেশ দত্ত মহাশয়ের দৌহিত্র সত্যসুন্দর দেব আমার কতকটা সাহায্যে একটি স্কলারশিপ পেয়ে জাপানে 'পটারি ওয়ার্কস' শিখতে যান এবং দেশে ফিরে 'বেঙ্গল পটারি' খোলেন। খুব ভাল চলছিল। নিজের দেশের পেয়ালা পিরিচে চা খেতে পেয়ে বাঙালি ধন্য বোধ করছিল। কিন্তু যতদূর জানি, ভিন্ন ভিন্ন স্বত্বাধিকারীর হাতে পড়ে পড়ে শেষে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সময় বোধহয় এটা ফেল করে। এখন একটি লিমিটেড কোম্পানী হয়ে পঞ্জাবী ও দিল্লিওয়ালাদের শেয়ার আধিক্যে তাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে; সত্যসুন্দর দেব এখন রূপনারায়ণপুরে 'Behar Pottery' নাম দিয়ে ও বেলিয়াঘাটায় তাঁর পুত্র সরল দেবের Bengal Porcelain Co. নামে স্বতন্ত্র পটারি ওয়ার্কস খুলেছেন। শুনতে পাই, এগুলির অবস্থাও খুব ভাল।

৪. বিদেশি-শোষণ, একতা-সাধন

যে সব জাপানীরা সুরেনদের বাড়ি এসে থাকতেন, তারা সকলেই তাদের প্রয়োজনীয় সব জিনিসই নিজের দেশ থেকে এনেছিলেন—এমনকি, বাড়িতে চিঠি লেখবার কাগজ পর্যন্ত। আমি জিজ্ঞেস করলুম—"এত কাগজ লগেজের ভিতর ঠেসে সঙ্গে বয়ে এনেছেন কেন?" তাদের একজন উত্তর দিলেন—"এ আমাদের বাড়ির মেয়েরা পুরে দিয়েছেন। তাঁরা জানেন, ভারতবর্ষে কিছুই পাওয়া যায় না; কাগজও নয়, সুতরাং কাগজের অভাবে তাদের চিঠি লেখা আমাদের বন্ধ হয়ে না যায়।" হায়রে! এরা সেই কবি হেমচন্দ্রের-'অসভ্য জাপান!'—যাদের চোখে পরাধীন ভারতবর্ষ এত বড় একটা অসভ্য দেশ— যেখানে কিছু নেই, যে দেশের লোকে কিছুই করতে জানে না, পারে না—একটুকরো কাগজ পর্যন্ত পাবার আশা নেই যেদেশে।

সত্যিই ত! আছে বটে সবই, কাগজও আছে—জাহাজে ভরে ভরে আসা বস্তা বস্তা বিদেশি কাগজ। তারই গর্বে ভারতবাসী গর্বিত—তাতে যে নিজের মুখে চুণ-কালি পড়েছে, তা ভাবি না। একটা ভারি ধাক্কা লাগল মনে। আমি এর পর থেকে ভারতীর মলাট আরম্ভ করলুম হলদে রঙের

তুলট কাগজে—যাতে আজ পর্যন্ত পাঁজিপুঁথি লেখা হয়—ভিতরের কাগজ বদলাবার সাধ্য নেই, তাহলে ভারতীই বন্ধ হয়ে যায়। তখনও টিটাগড়ের বিদেশীয় মূলধনে পরিচালিত তথাকথিত স্বদেশি কাগজও এদেশে সুপ্রাপ্য নয়। ভারতীয় তুলট কাগজের মলাটকে প্রথম প্রথম সকলে আমার উনপঞ্চাশ-বায়ুগ্রস্ততার আর একটি পরিচয়রূপে গ্রহণ করলে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে দেখতে পেলুম, দেশে সেই বায়ুটা সংক্রামক হতে থাকল। গোবিন্দচন্দ্র রায়ের গান আমার মন তোলপাড় করতে লাগল—

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখসাগর সাঁতারি পার হবে!
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ওকি শেষ নিবেশ রসাতল রে!
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পর দাসখতে সমুদায় দিলে!
পর হাতে দিয়ে, ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহবিনির্মিত হার বুকে!
পর ভাষণ আসন আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে!
পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস বলে!
তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
আনে বসনে গমনের তরে!
পর দীপ-মালা নগরে নগরে—
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!

এরই কাছাকাছি সময়ে নিজের খরচে কর্নওআলিস স্ট্রীটের উপর "লক্ষ্মীর ভান্ডার" খুললুম। সেটি বাঙলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে সংগ্রহ করা শুধু মেয়েদের জন্যে একটি স্বদেশি বস্ত্রের ও দ্রব্যের ভান্ডার। একজন বিধবা ব্রাহ্ম মেয়েকে মাইনে দিয়ে তার বিক্রেত্রী নিযুক্ত করলুম। আশুবাবুর ভাইদের মধ্যে যোগেশ চৌধুরী খুব স্বদেশি ছিলেন। তার রুচিও সুন্দর ছিল। তখন তিনি ব্যারিস্টার হয়ে এসেছেন, হাইকোর্টের কাছে 'চেম্বার্স' নিয়েছেন। একদিন তাঁর চেম্বার্সে আমাদের সকলকে চায়ের নিমন্ত্রণ করলেন। তার ঘরখানি আগাগোড়া স্বদেশি জিনিসে সাজানো। পরদাগুলি ভারতবর্ষের নানা প্রদেশের ছাপান কাপড়, ঘরের টেবিল, টি-পয়, চেয়ার, সোফা কিছুই ল্যাজারসের বাড়ির নয়, কিন্তু সবই মনোরম খাঁটি স্বদেশি জিনিস, দেখে সকলের চোখ তৃপ্ত হল। তারপরে অনেকে মিলে একটি লিমিটেড কোম্পানি করে যোগেশবাবুর পরিচালনায় বৌবাজারে 'স্বদেশি স্টোরস' নাম দিয়ে একটি দোকান খুলিয়ে দিলেন। আমার ও যোগেশবাবুর স্বদেশি-প্রচেষ্টা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের বহু পূর্বেই। এই সময় বম্বেতে কংগ্রেসের সঙ্গে সঙ্গে একটি বিরাট স্বদেশি একজিবিশন হয়। কোন কোন বম্বে বন্ধুর অনুরোধে আমি তাতে 'লক্ষ্মী-ভান্ডার' থেকে অনেকানেক জিনিস পাঠাই—তার দরুন একটি মেডেল পাই। সে মেডেলটিকে পিন লাগিয়ে আমি ব্রোচ করে পরতুম। প্রায় পনর বৎসর পরে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যখন পরিচয় হয়, তখনও আমার শাড়ি এই ব্রোচে আটকান থাকত। তাই দেখে তিনি চিনেছিলেন, তাঁর ভারতে অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব থেকেই আমি 'স্বদেশি'। তাঁর সঙ্গে অনেক সভাস্থলে যখন নিয়ে যেতেন, সেই পরিচয়ই আমার

দিতেন। সে সময় কলকাতায় ১১ই মাঘের রাত্রে বা বিবাহাদি উৎসবে এ-বাড়ি সে-বাড়িতে আমার আপাদমস্তক স্বদেশি বেশভূষার লালিত্যে লোকেদের চোখ খুলে গেল যে, কিছুমাত্র বিদেশি পরিধেয়ের সংস্রব না রেখে, কেবলমাত্র 'স্বদেশি'তেই যথেষ্ট সৌখীনতা ও ফ্যাশনের পরাকাষ্ঠা দেখানো যেতে পারে। মনে পড়ে আমাদের আত্মীয় মেয়েদের মধ্যেও কেউ কেউ তখনো পর্যন্ত আমার পায়ের দিশি নাগরা জুতোটা সইতে পারতেন না—বিদেশি গোড়ালিওয়ালা জুতোতে সকলেই এত অভ্যস্ত। যাঁরা গোড়ায় গোড়ায় বিমুখ ছিলেন—এমন একদিন এল যখন তারাই নামজাদা 'স্বদেশি' হয়ে পড়লেন, নাগরা ছাড়া আর কিছু তাদের শ্রীচরণে-শু হল না।

লাঠি গৎকার ক্লাবে যোগদানের উপলক্ষে নানা লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত ও নানা আলোচনা করত বলেছি। একদিন দুইজন সিলেটি ভদ্রলোক এসে চা-বাগানের কুলিদের উপর সাহেব প্ল্যান্টারদের অত্যাচারের কথা বললে। সাহেবদের এজেন্ট দিশি রঙরুটেরাই অজ্ঞ কুলিদের কি রকম মিথ্যা কথা বলে প্রলুব্ধ করে ভুলিয়ে ভালিয়ে কাগজে সই করিয়ে দাস্য-বৃত্তিতে ভর্তি করে, সেই সকল লোমহর্ষকর কাহিনী বর্ণনা করলে, ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস প্রমুখ একদল দেশভক্তেরা এ বিষয়ে নেতাদের সচেতন করবার জন্যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন শোনালে, এবং 'চা-পান না রক্তপান' এই ছাপানো প্লাকার্ড দেখালে সুন্দরীবাবুই তাদের আমার কাছে পাঠিয়েছেন জানালে। ছেলেবেলায় ইস্কুলে সুর করে করে পড়া কবিতা মনে পড়ল—

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিয়ে চায় হে,
কে বাঁচিয়ে চায়।
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে,
কে পরিবে পায়।

সে কবিতার গুনগুনানি আজ মনের ভিতর ঝনঝনানি হয়ে উঠল। স্বাধীনতার স্বপ্নে ভরপুর আমার দৃষ্টি পরাধীনতার সহস্রফণা সর্পের প্রতি পড়ল। ভীরুতা ও কাপুরুষতার কলঙ্ক অপনোদন করে জাতিকে আত্মসম্মানে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা স্বাধীনতার পথে আরোহণের প্রথম সোপান বটে। কিন্তু স্বাধীনতা একখানি হীরক-খণ্ডের মত, নানা facets দিয়ে নানা রঙের আলো প্রতিফলন করে। স্বাধীনতার ডায়মন্ডকাটে স্বায়ত্তশাসনই প্রধান কাট—তারই আলো প্রধান আলো। শাসন স্ব-আয়ত্তে থাকা চাই, নয়ত স্বাধীনতা কিসের? আইনকানুন গড়ার প্রতিষ্ঠান নিজেদের আয়ত্তে হওয়া চাই, তবেই ত একটা জাতি স্বাধীন। যে জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষিকার্য বিদেশিকৃত আইনের শাসনের দ্বারাই বিদেশির হস্তগত সে জাতি কোনক্রমেই স্বাধীনতার গৌরবে গৌরবান্বিত হতে পারে না। যে জাতি জাতি হিসাবে hewers of wood and drawers of water থাকতে চিরবাধ্য হবে, যে জাতিকে শাসনের নামে তার রক্ত অনায়াসে শোষণ করে পরজাতি সমৃদ্ধ হতে থাকবে, যে জাতির কৃষকরা সোনার ফসল উৎপাদন করেও দুবেলা দুমুঠো অন্ন পাবে না নিজের পেট ভরাতে বা স্ত্রী ছেলের মুখে তুলতে; ক্ষেতে বীজ বপন করতে না করতে বিদেশির দাদন এসে তাদের যা-কিছু সব পরের করে দেবে—সে জাতির স্বাধীনতা সুদূরপরাহত। পা থেকে মাথা পর্যন্ত নিয়ে একখানা শরীর, একটা জাতি। পায়ের, হাতের, মাঝার কষ্টে মাথা যদি টনটন না করে, মাথা কাটা বাকি সব অঙ্গ হয়—তবে মাথার ব্যথায় হাত-পা নড়বে না, কোমর নিজেকে বাঁধবে না। তাই স্বাধীনতার প্লাটফর্মে সবচেয়ে বড় তক্তা জাতির পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঐক্যবুদ্ধি। শুধু মাথাগুলো এককাট্টা হলে হবে না, পা হাত কোমরসমেত মাথাদের খাড়া হতে হবে। বুকখানা যে সকলের একই তা বুঝতে হবে—একই জায়গা থেকে সর্বদেহে রক্ত চলাচল হচ্ছে তার ধারণা করতে হবে। কুলিদের উপর অত্যাচারের কথা শুনতে শুনতে আমার মনে এতগুলো কথা খেলে গেল। আজ অনুভব করলুম আমরা যারা আরামে আয়েশে মানুষ তাদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা

একটা ভাবের বিলাস মাত্র। পরাধীনতার বা 'দাসত্ব-শৃঙ্খলের" প্রকৃত মর্ম আমরা কি জানি? হাড়ে হাড়ে জেনেছিল আমাদের এক পুরুষ আগে নীলকুঠির ক্রীতদাসেরা, যার ফলে নীল-বিদ্রোহ হয়েছিল; আর এখন জানছে এই 'indented' চা-বাগানের কুলিরা। উৎপীড়ক লুণ্ঠকদের পশ্চাতে আছে প্রথমত তাদের স্বজাতির বন্দুক ও কামান, দ্বিতীয়ত ইংলন্ডের প্রজারই হিতকল্পে ও ভারতীয় প্রজার ক্ষতিকল্পে গঠিত ভারত গবর্নমেন্টের আইন-কানুন। যতদিন না এই দুটোর উপরই আমাদের দখল আসবে, ততদিন 'নিজ বাসভূমে আমরা পরবাসী'। যতদিন 'অশনে বসনে গমনের তরে রবে নির্ভর নিত্য পরের করে'—ততদিন হে ভারত আমার, হে আমার মাতৃভূমি, যদিও 'পর দীপমালা নগরে নগরে তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে'।

এই ইংলন্ডের ইতিহাসই আমাদের গুরু হয়ে শেখাচ্ছে—একটা অত্যাচারী রাজের বিরুদ্ধেও দাঁড়াবার শক্তি আসে, একজন King John এর কাছ থেকেও Magna Charta আদায় করা যেতে পারে প্রজাশক্তি সংহত করতে পারলে, জাতির আপামর সাধারণের ছিন্নভিন্নতা দূর করে যৌথবল গড়ে তুলতে পারলে। ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে শিক্ষা পাওয়া যায়—কংস ও জরাসন্ধের মত অত্যাচারী রাজার হাত থেকে প্রজাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণের উদয়ের অপেক্ষা করতে হয়। ইংলন্ডের ইতিহাস শেখায়—দৈবলীলার অপেক্ষা না রেখে একজন স্বার্থপর, অত্যাচারী নিষ্ঠুর King Charles-এর মুণ্ডপাতের পাতকীবৎ বুদ্ধি ক্রমওয়েলের মত এক একটা মানুষের মত মানুষকেই পোষণ ও সাধন করতে হবে, তার জন্য দল সৃষ্টি করতে হবে। তারই নাম দৈবলীলা, মানুষের ভিতর দিয়েই দৈবশক্তির ক্রিয়া ইংলন্ডের ইতিহাস শেখায়। পার্লামেন্ট বা প্রজাদের প্রতিনিধি সভা যা, তা দেশের সর্বসাধারণের পঞ্চায়েৎ, House of Lords ও House of Commons এই দুই ভাগে বিভক্ত হলেও সাধারণী প্রজাবলই বলীয়ান হয়ে জমিদারদের কাছ থেকে সাধারণের স্বার্থ-বিরোধী Corn Law-র 'Repeal' করাতে সক্ষম হয়।

সব দাঁড়াচ্ছে গিয়ে একতা-সাধনায়। একতা কিসে হয়; স্বার্থ যদি এক হয়, তবে লক্ষ্যও এক হবে। যাতে তোমার অপকার তাতে আমারও অপকার যদি প্রত্যক্ষ করি, তোমার ঘর পুড়লে আমারও ঘর পোড়া যদি অবশ্যম্ভাবী জানি, তাহলে তোমার ঘরখানা নিরাপদ রাখার জন্যে আমারও চেষ্টা থাকবে। আমার লাভ হলে তুমিও যদি নিশ্চয়ই সে লাভের অংশীদার হবে জান, তবে সেটা সাধনের ভার তুমিও বহন করবে। নয়ত যে যার ছাড়াছাড়ি, ছিন্নভিন্ন থাকব। স্বার্থগত একতাবুদ্ধি তাই সকল ঐক্যের মূল। ইংলন্ডের প্রত্যেকের জাতি হিসাবে পরস্পরের সঙ্গে ঐক্য সেই স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। সেইটেই তাদের ঐক্য-ইমারতের ভিত্তি। দেশহিতৈষিতা শুধু সেন্টিমেন্টের উপর, শুধু ভাবের একটা ধোঁয়ার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। তার নজরে একটা স্পষ্ট solid বস্তুর ছবি ফুটে ওঠা চাই—

সর্বহিতে আত্মহিত, আত্মহিতে সর্বহিত।

কৃষ্ণকুমার মিত্র

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ*

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি রাজনীতিকুশল বলিয়া ইতঃপূর্বেই পরিচিত হইয়াছিলেন। রাজনীতিতে মিথ্যার যে প্রয়োজন আছে ইতঃপূর্বে সেইরূপ মত ব্যক্ত করাতে তিনি ভারতবাসীর অশ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন; তবুও ভারতবাসী তাঁহার বাক্যের চাতুরীতে ভুলিয়া গিয়াছিল। গবর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া তিনি ইংলণ্ডে যে বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে আমি খুব ভালবাসি। তাহাদের জীবনযাত্রা-প্রণালী, তাহাদের সভ্যতার বিচিত্রতা আমার খুব ভাল লাগে।" এই বাক্য শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভারতবাসীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। তিনি যখন কলিকাতায় আগমন করেন, প্রায় সেই সময়েই মান্দ্রাজে কংগ্রেসের অধিবেশন হইতেছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয় সেই কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। লর্ড কার্জনকে অভিনন্দন করিয়া এবং তাঁহার শাসনকালে ভারতবর্ষ অধিকতর স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করিবে এই আশা প্রকাশ করিয়া কংগ্রেস তাঁহার নিকটে তার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রয়ারী মাসে ভারতসভার কতিপয় সভ্য লর্ড কার্জনকে অভিনন্দন করিবার জন্য রাজপ্রাসাদে গমন করেন। তাঁহারা গভর্নমেন্ট প্রাসাদের সিংহাসন-কক্ষে উপবেশন করিবামাত্র লর্ড কার্জনের একজন এডিকং সেই কক্ষে প্রবেশপূর্বক সমাগত ভদ্রলোকদিগের পোষাক-পরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করেন। তখন স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহারের যুগ আসিয়াছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জামাতা ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী স্বদেশিবস্ত্র প্রচারের একজন প্রধান নেতা ছিলেন। তিনি এবং অপর একজন ভদ্রলোক নাগরা জুতা পরিয়া গিয়াছিলেন। সে নাগরা জুতা হিন্দুস্থানী বা পাঞ্জাবীদের নাগরা জুতার মত কদাকার বা লোহা বাঁধানো ছিল না, কিন্তু নূতন ধরনের সুগঠিত ও উৎকৃষ্ট চর্মের জুতা ছিল। তবু এডিকং-এর চক্ষে তাহা অসভ্য বলিয়া মনে হইল। তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "হয় জুতা খুলিয়া খালি পায়ে এস, না-হয় এস্থান হইতে চলিয়া যাও।" এমন রূঢ় ব্যবহার গবর্নমেন্ট রাজপ্রাসাদে ইতঃপূর্বে কেহ কখনও পায় নাই। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী ও তাঁহার বন্ধু এই অপমান সহিতে না পারিয়া রাজপ্রাসাদ হইতে চলিয়া যান। আরও কেহ কেহ তথা হইতে প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, এমন সময় কতিপয় বিজ্ঞজন তাঁহাদিগকে বলিলেন, "গবর্নর-জেনারেলকে অভিনন্দন করিতে আসিয়া যদি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া আমরা চলিয়া যাই, তবে আমাদের জাতীয় সৌজন্যের প্রতি দোষারোপ করা হইবে। অতএব অপমান সহিয়া অদ্যকার কার্য নির্বাহ করা উচিত।" তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে সকলেই এই অপমান নীরবে সহ্য করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে এমন কেহই ছিলেন না, যাঁহার চিত্ত ঘৃণা ও ক্ষোভে উদ্বেলিত না হইয়াছিল।

অভিনন্দন-পত্র পঠিত হইল। লর্ড কার্জন তাঁহার স্বভাবজাত দম্ভের সহিত সে অভিনন্দনের উত্তর প্রদান করিলেন। সকলেই মনে করিলেন দুর্দিন আসিতেছে। আমি এই অভিনন্দন-প্রদানকারী

*আত্মচরিত—কৃষ্ণকুমার মিত্র। পৃ. ১৮৬-২৩৮

দলের সহিত যাই নাই। "রাজনীতির চর্চায় মিথ্যার প্রয়োজন আছে"—লর্ড কার্জনের এই উক্তি পাঠ করিয়া তাঁহার প্রতি আমার অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। যাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা তাঁহার অভিনন্দন করা কপটতা ভিন্ন আর কিছুই নয়, ইহা মনে করিয়াই আমি অভিনন্দনকারীদের সহিত যাইতে পারি নাই। যদি যাইতাম, রাজপ্রাসাদে সেদিন যে নাগরাজুতাতঙ্ক হইয়াছিল ও ভারতবাসীর যে অপমান হইয়াছিল তাহা না সহিয়া রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিতাম, অথবা লর্ড কার্জনকে তাঁহার প্রতিকার করিতে বলিতাম।

ইহার বহুকাল পরে লর্ড রোনাল্ড্‌শে যখন বাংলার গবর্নর ছিলেন, তখন তাঁহার প্রাইভেট সেক্রেটারি আমাকে লর্ড রোনাল্ড্‌শের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। আমি জানিতাম যে কোট, প্যান্ট ও বিলাতি ধরনের জুতা না পরিয়া গেলে গবর্নমেন্ট প্রাসাদে প্রবেশ করা যায় না। তাই প্রাইভেট সেক্রেটারির পত্রোত্তরে আমি লিখিয়াছিলাম, "আমি কোট প্যান্ট পরি না, ধুতি, জামা ও চাদর পরিয়া সর্বত্র যাতায়াত করি, তাহাতে আপনাদের আপত্তি আছে কি না, আমাকে জানাইবেন।" প্রাইভেট সেক্রেটারি আমায় লিখিয়াছিলেন, আপনি যে পোষাক পরিয়া বন্ধুদের সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন, তাহা পরিয়াই আসিবেন। ইহাতে লর্ড রোনাল্ড্‌শে আনন্দিত হইবেন। বিংশতি বৎসরের মধ্যে গবর্নমেন্ট হাউসের আদবকায়দা এত পরিবর্তিত হইয়াছিল।

তৎকালে ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙালিই জ্ঞানে, ধর্মে, নীতিতে, স্বদেশপ্রেমে ও কার্যকুশলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই শ্রীযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গোখলে বলিয়াছিলেন—"বাঙালি আজ যাহা চিন্তা করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের লোক কাল তাঁহারই অনুসরণ করিয়া থাকে।" এই সময়ে -বাংলাদেশে নানা বিভাগে অনেক শ্রেষ্ঠ লোকের আবির্ভাব হইয়াছিল। এমন সুদিন বাংলায় আর কখনও হয় নাই। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি ধর্ম ও নীতির উচ্চ আদর্শ জীবনে প্রদর্শন করিয়া বহুলোকের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা জাগাইয়া দিয়াছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিতেছিলেন। ডব্লিউ. সি. ব্যানার্জি, তারকনাথ পালিত, মনোমোহন ঘোষ ও লর্ড এস. পি. সিংহ, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি ব্যারিস্টার ও উকিলগণ, ইংরাজ ব্যারিস্টারের গৌরব ম্লান করিয়া দিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লালমোহন ঘোষ, কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসুর বাগ্মিতা শিক্ষিত সমাজের প্রাণে নূতন শক্তি ও আশার সঞ্চার করিয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের কাব্য, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, অক্ষয়কুমার সরকার ও পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বাংলা সাহিত্য দেশে স্বদেশপ্রেমের উত্তেজনা সৃষ্টি করিয়া যুবকদের প্রাণ উচ্ছ্বসিত করিয়াছিল। বিদ্যাসাগর কলেজ, সিটি কলেজ, বঙ্গবাসী ও রিপন কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বাংলাদেশে বিদ্যাশিক্ষার স্রোত বিপুল বেগে প্রবাহিত হইতেছিল।

বাংলা নিদ্রিত ভারতকে জাগ্রত করিতেছে লর্ড কার্জনের ইহা সহ্য হয় নাই। বাংলা দেশকে শক্তিহীন করিতে পারিলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশ দুর্বল হইয়া থাকিবে, তখন যথেচ্ছভাবে ভারতবর্ষকে শাসন করা সহজ হইবে, ইহাই ছিল অনেকের মনের ভাব। লর্ড কার্জন বাংলার শিক্ষাস্রোত অবরুদ্ধ করিবার জন্য ইউনিভার্সিটি আইন প্রণয়ন করেন। কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিতে স্বাধীনতার বীজ অঙ্কুরিত হইতেছে ইহা দেখিয়া লর্ড কার্জন মিউনিসিপ্যালিটির স্বাধীনতা খর্ব করিবার নিমিত্ত এক আইন বিধিবদ্ধ করেন। ভারতবর্ষে বাংলাদেশ প্রচন্ড শক্তিশালী হইতেছে দেখিয়া ইহার অঙ্গভেদ করিবার জন্য ইচ্ছুক হন।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসাম বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে আসামকে বাংলা হইতে পৃথক করা হয়। ইহার পর প্রথমতঃ চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও নোয়াখালী আসামের অন্তর্ভুক্ত

করিবার চেষ্টা করা হয়, ইহার বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন হওয়াতে এ প্রস্তাব পরিহার করা হয়। লর্ড কার্জন কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি প্রস্তাব করিলেন, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্গত করা হইবে। ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন উপস্থিত হয়। তখন লর্ড কার্জন ভাবিয়াছিলেন, তিনি যদি একবার পূর্ববাংলায় যান, তবে পূর্ববাংলার লোকেরা ভয়ার্ত হইয়া তাঁহার প্রস্তাবে সম্মতি দিবে। তিনি পূর্ববাংলার লোকের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই।

তিনি ময়মনসিংহ গমন করিবেন এই সংবাদ শুনিয়া ময়মনসিংহের মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী তাঁহাকে নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিতে নিমন্ত্রণ করেন। মহারাজা অতি দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ছিলেন। ময়মনসিংহের লোকেরা তাঁহাকে খুব সম্মান করিত। লর্ড কার্জন ভাবিয়াছিলেন, তিনি যদি মহারাজার আতিথ্য গ্রহণ করেন, তবে মহারাজা কখনও তাঁহার বিরোধী হইতে সাহস করিবেন না। কিন্তু মহারাজা স্বদেশের অনিষ্ট করিয়া রাজপুরুষদের মনোরঞ্জন করিবার লোক ছিলেন না। তিনি লর্ড কার্জনকে চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানা প্রকার ভোজ্য দ্রব্যদ্বারা যথাসাধ্য আপ্যায়িত করিয়াছিলেন, কিন্তু চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হইবে লর্ড কার্জনের মুখে এই প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "**আমরা কিছুতেই আসামের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিব না। যদি আসামের অন্তর্ভুক্ত করিবার চেষ্টা করা হয় তবে সমস্ত বঙ্গদেশে এমন আগুন জ্বলিবে, যাহা বিরাট ব্রিটিশ শক্তি নির্বাণ করিতে সমর্থ হইবে না।**" লর্ড কার্জন ক্ষুব্ধচিত্তে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

লর্ড কার্জন অতি দাম্ভিক ব্যক্তি ছিলেন। বাঙালির মতের নিকটে মস্তক অবনত করা তিনি অতি ঘৃণার বিষয় বলিয়া মনে করিতেন। তিনি চট্টগ্রাম বিভাগ এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ আসামের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। বাঙালিরা তাঁহার প্রতিবাদ করাতে, চট্টগ্রাম বিভাগ, ঢাকা ও ময়মনসিংহ, পূর্ববাংলার বরিশাল ও ফরিদপুর এবং রাজশাহী বিভাগের সমস্ত জেলা আসামের সামিল করিয়া পূর্ববাংলা নামক এক স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এ প্রস্তাব প্রকাশ করিলেন না। অতি গোপনে ভারতসচিবের নিকটে এতদ্‌সম্বন্ধে পত্র লিখিলেন। ভারতসচিব গোপনে তাহাতে সম্মতি দিলেন।

বাঙালিরা মনে করিয়াছিলেন বহুদিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কথা শুনা যায় না। তবে বুঝি সে প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে। বাঙালিরা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। হঠাৎ ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ২০ শে জুলাই গবর্নমেন্টের এই ঘোষণা প্রচারিত হইল—"বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ হইবে এবং পূর্ববাংলা, উত্তর বাংলা, চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আসাম লইয়া পূর্ববাংলা নামক এক প্রদেশ গঠিত হইবে।" নির্মল আকাশ হইতে যথার্থই বজ্রপাত হইল।

পূর্ববাংলার লোকদিগকে এই স্তোকবাক্যে ভুলাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল যে পশ্চিম বাংলার লোকেরাই গবর্নমেন্টের অধিকাংশ চাকুরী দখল করিয়াছে। পূর্ববাংলার লোকদিগের উচ্চপদ পাইবার আশা নাই। পূর্ববাংলাার গবর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হইলে ঐ অঞ্চলের লোকেরাই গবর্নমেন্টের সমস্ত কর্ম পাইবে।

পূর্ব ও উত্তর বাংলার এবং চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ অধিবাসীই মুসলমান। মুসলমানদিগকে বলা হইয়াছিল, পূর্ববাংলায় স্বতন্ত্র গবর্নমেন্ট হইলে, মুসলমানদের প্রতিপত্তি তথায় প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহাতে ঢাকার নবাব এবং ধনবাড়ীর নবাব আলি চৌধুরী প্রভৃতি বঙ্গবিচ্ছেদে আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু টাঙ্গাইলের ওয়াজেদ আলি খাঁ পাণি ও মিঃ গজনবী প্রভৃতি মুসলমান জমিদারগণ অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। হিন্দুদের কথা আর কি বলিব। আপনার মাতাকে দ্বিখণ্ড করিলে সন্তানের প্রাণে যে গভীর উত্তেজনা হয়, জন্মভূমিকে দ্বিখণ্ড কবাতে, সকলের প্রাণে সেইরূপ উত্তেজনা হইয়াছিল।

পশ্চিমবাংলার কোন কোন সংবাদপত্র এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে পূর্ববাংলায় মুসলমান সংখ্যা অধিক হওয়াতে সমস্ত বঙ্গেই মুসলমান সংখ্যা অধিক হইয়া যাইবে। পূর্ববাংলায় যদি পৃথক গবর্নমেন্ট হয় তবে পশ্চিমবঙ্গে হিন্দুর সংখ্যাই বেশি হইবে। এরূপ স্বার্থপর লোকের সংখ্যা পশ্চিমবঙ্গে বেশি ছিল না, **পূর্ববঙ্গের সমস্ত হিন্দু এবং পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান একপ্রাণ হইয়া এই সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, যত দিন বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের আদেশ রহিত না হইবে, তত দিন প্রবল আন্দোলন করিবেন।**

কি উপায়ে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণ করা যাইতে পারে তাহা নির্ধারণ করিবার নিমিত্ত মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের বাড়িতে এক সভা হয়। সেই সভায় ইহা স্থির হয়, যদি একজন শাসনকর্তা বাংলা বিহার উড়িষ্যাকে শাসন করিতে না পারেন, তবে বরং বিহারকে বাংলা দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করা যাইতে পারে, কিন্তু পূর্ববাংলাকে পশ্চিমবাংলা হইতে কখনও পৃথক করা যাইতে পারে না। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর স্বয়ং গবর্নর জেনারেল লর্ড কার্জনকে এই সভার মত জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন ফল হইল না। লর্ড কার্জন বাঙালির শক্তি ধ্বংস করিবার জন্যই পূর্ব-বাংলাকে পশ্চিমবাংলা হইতে পৃথক করিয়াছিলেন। সুতরাং গবর্নমেন্ট মহারাজা যতীন্দ্রমোহনের প্রস্তাব অনুসারে কার্য করিতে সম্মত হইলেন না।

আবেদন নিবেদনে কোন ফল হইল না দেখিয়া বাঙালি জাতিকে জাগ্রত করিবার জন্য চতুর্দিকে সভা হইতে লাগিল। ঢাকার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ফরিদপুরের শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ মজুমদার, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, বরিশালের অশ্বিনীকুমার দত্ত, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লার উপেন্দ্রমোহন মিত্র, নোয়াখালির যশোদা ঘোষ, নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়, রাজসাহীর কিশোরীমোহন চৌধুরী, রংপুরের উমেশচন্দ্র গুপ্ত, দিনাজপুরের যোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বহরমপুরের বৈকুণ্ঠনাথ সেন ও কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, কৃষ্ণনগরের প্রসন্নকুমার বসু, যশোহরের রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার, খুলনার রায় বাহাদুর অমৃতলাল রাহা, আলীপুরের বিজয়চন্দ্র বসু, মেদিনীপুরের উপেন্দ্রনাথ মাইতি প্রভৃতি বহু ব্যক্তি বাঙালিকে স্বদেশপ্রেমিক করিয়া তুলিবার জন্য আত্মসমর্পণ করিলেন।

ভারতসভা, বেঙ্গলী কার্যালয়, ও মহারাজা সূর্যকান্তের সার্কুলার রোডের বাড়ি আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নায়ক ছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, স্যার আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি প্রায় প্রতিদিন মিলিত হইয়া বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের নিবারণের উপায় চিন্তা করিতেন। তাঁহারা এই নির্ধারণ করিলেন, কলিকাতা টাউনহলে বঙ্গের সমস্ত স্থলের প্রতিনিধিবর্গকে লইয়া এক প্রতিবাদ সভা করিবেন।

এই সঙ্গে প্রতিবাদ কার্যকরী করিবার জন্য "সঞ্জীবনী" এক নূতন আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। ইংলণ্ড হইতে যে সকল দ্রব্য ভারতে আমদানি হয় এবং তন্মধ্যে যাহা ভারতবর্ষে প্রাপ্ত হওয়া যায়, "সঞ্জীবনী" তাঁহার বিবরণ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। "সঞ্জীবনী" ইহা প্রদর্শন করিলেন **যে সকল দ্রব্য ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা ব্যবহার করিলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কত ক্ষতি হইবে; ইংরেজ বণিকদের যদি ব্যবসা বন্ধ করা যায় তবে ইংরেজ জাতি বাংলার অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের জন্য সচেষ্ট হইবে।** "সঞ্জীবনী" জনসাধারণকে দৃঢ় সঙ্কল্প করাইবার জন্য এই প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তাঁতি ও জোলার মোটা কাপড় বাঙালি পরিবে এবং বেশি মূল্য হইলেও বোম্বাই, আমেদাবাদ ও নাগপুরের কলের কাপড় পরিবে। বিলাতি চিনি বর্জন করিয়া বাঙালি খেজুর ও আখের গুড় খাইবে ; বিলাতি লবণ পরিত্যাগ করিয়া দেশি কালো করকচ লবণ ব্যবহার করিবে। "আমরা চিনি খাইব না, গুড় খাইব", "সঞ্জীবনী"তে এই প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়াতে, "বঙ্গবাসী" খুব উপহাস বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। "সঞ্জীবনী" বিদেশিদ্রব্য বর্জন আন্দোলনে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন। বিলাতিবর্জন প্রস্তাব গ্রহণ করিলে ইংরাজ জাতির চৈতন্য

হইবে এবং লর্ড কার্জনের দম্ভ চূর্ণ হইবে বাংলা ইহা বুঝিতে পারিয়াছিল।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ৭ আগস্ট টাউনহলে প্রতিবাদ সভা হইল। তথায় কি কি প্রস্তাব হইবে ইহা নির্ধারণের জন্য কতিপয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মিলিত হইয়াছিলেন। গবর্নমেন্টের কার্যের প্রতিবাদ করার সঙ্গে সঙ্গে টাউনহলের সভায় বিলাতিদ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করা হইবে, ইহা নির্ধারিত হয়।

বিলাতিদ্রব্য বর্জন করা হইবে ইহা শুনিয়া বাংলার যুবকগণ প্রমত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। ৭ আগস্ট দ্বিপ্রহরের সময় বহু সহস্র যুবক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়াছিল। তাঁহারা মস্তকে গেরুয়া রংয়ের উষ্ণীষ পরিধান করিয়া এবং বক্ষে "বঙ্গভঙ্গ রহিত করিতে হইবে" এই কথা অঙ্কিত উত্তরীয় বাঁধিয়া, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর নেতৃত্বে টাউনহল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। সেই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া কলিকাতাবাসী স্বদেশিভাবে মত্ত হইয়াছিল। টাউন হলের দোতলায় লোক ধরিল না। টাউন হলের একতলার বারান্দায় দ্বিতীয় সভা আরম্ভ হইল। সেখানেও লোক ধরিল না। টাউন হলের সম্মুখস্থ মাঠে তৃতীয় সভা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তিন সভাতেই বক্তৃতা করিলেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় প্রধান সভার সভাপতি হইয়াছিলেন।

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করিয়া বাঙালি জাতির যে অনিষ্ট করা হইয়াছে, তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ এবং পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে পুনরায় এক করিবার জন্য এক প্রস্তাব ধার্য করা হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রস্তাব উপস্থিত করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোককে স্বদেশপ্রেমে প্রমত্ত করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন বিলাতি বর্জন বিষয়ক প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই ইংরেজী প্রস্তাবটি এইখানে লিপিবদ্ধ করা হইল—

"That this meeting fully sympathises with the resolution adopted at many meetings held in the mofussil, to abstain from the purchase of British manufactures, so long as the Partition Resolution is not withdrawn, as a protest against the indifference of the British public in regard to Indian affairs and the consequent disregard of Indian Public opinion by the present government."

তাৎপর্য :—ভারতের প্রতি ব্রিটিশ জনসাধারণের উপেক্ষা ও তাঁহার ফলস্বরূপ ভারতের জনমতের প্রতি বর্তমান গভর্নমেন্টের অবজ্ঞার প্রতিবাদে, বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রস্তাব প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত, বিলাতি দ্রব্যাদি বর্জনের যে প্রস্তাব মফঃস্বলের বহু সভায় গৃহীত হইয়াছে,—এই সভা সেই প্রস্তাব পূর্ণ সমর্থন করিতেছেন।

সেদিন টাউন হল কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করিবার জন্য মিঃ হালিম গজনবী প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার উপরেই কার্যভার অর্পিত ছিল। প্রচুর পরিমাণ কালো রংয়ের কাপড় আর কোথাও না পাইয়া তিনি হোয়াইটয়্যাওয়ে লেডল'র দোকান হইতে ঐ বস্ত্র ক্রয় করিয়া আনিলেন এবং টাউন হল শোকবেশে আচ্ছাদিত করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া যুবকগণ ক্ষিপ্ত হইয়া বলিয়াছিল, তাঁহারা বিলাতি কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিবে এবং টাউন হলের সভা ভাঙিয়া দিবে, গড়ের মাঠে সভা করিবে। মিঃ গজনবী এই সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উপস্থিত হন। তাঁহার পরামর্শে কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র টাউনহল হইতে অপসারিত হইয়াছিল।

টাউনহলের সভার পর বিলাতিদ্রব্য-বর্জন আন্দোলন দ্রুতবেগে দেশময় বিস্তৃত হইয়াছিল। বিলাতি কাপড়, চিনি, লবণ, জুতা, দিয়াশলাই ও স্টিল ট্রাঙ্ক, সিগারেট, সাবান প্রভৃতি দ্রব্য বাঙালির গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হইল। কলেজ ও স্কুলের ছাত্রেরা চুরুট খাওয়া পরিত্যাগ করিল। দেশের মধ্য দিয়া পবিত্রতার হাওয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। স্কুল ও কলেজের প্রাচীরে ছাত্রেরা কত কুৎসিত কথা লিখিত, তাহা একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। বিলাতি চুরুট বন্ধ হওয়াতে বাংলা দেশের বিড়ির ব্যবসা আরম্ভ হইল। উচ্চশিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তিরা বিড়ি খাইতে আরম্ভ করিলেন। বাংলাদেশে বহু সংখ্যক স্টিল-ট্রাঙ্ক নির্মাণের কারখানা স্থাপিত হইল। জোন্সের সুবিখ্যাত

স্টিল-ট্রাঙ্ক আমদানি বন্ধ হইয়া গেল।

ডাক্তার নীলরতন সরকার প্রভৃতি 'ক্রোম' চর্ম প্রস্তুতের কারখানা স্থাপন করিলেন। আমাদের দেশের মুচিরা সেই চর্মদ্বারা উৎকৃষ্ট জুতা প্রস্তুত করিতে লাগিল; ডসন প্রভৃতি সুবিখ্যাত জুতা আমদানি রহিত হইল। বহু-সংখ্যক সাবানের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে বিলাতি সাবানের আমদানি হ্রাস হইল। ডাক্তার নীলরতন সরকার ন্যাশন্যাল সোপ ফ্যাক্টরী, সন্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরী, রায় বাহাদুর যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, স্যর রাসবিহারী ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রীকালী ঘোষ প্রভৃতি পেন্সিল ও দিয়াশলাইয়ের কারখানা এবং শান্তিপ্রিয় গুপ্ত, এফ. এন. গুপ্ত প্রভৃতি পেন্সিলের কারখানা, আর্য ফ্যাক্টরী প্রভৃতি স্টিল-ট্রাঙ্কের কারখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার কৃষকেরা আখের ও খেজুরের গুড় প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ব্যাপার হইয়াছিল বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কবিরাজ উপেন্দ্রনাথ সেন, অখিলবন্ধু গুহ, ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি বাংলার বস্ত্রের অভাব দূর করিবার জন্য 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল' স্থাপন করিয়াছিলেন। বাংলার যুবকগণ, বিশেষতঃ 'য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র যুবক সভ্যগণ, নগরে নগরে ও গ্রামে গ্রামে গমন করিয়া দরিদ্র লোকদিগের নিকটেও ইহার অংশ বিক্রয় করিয়াছিলেন। স্বদেশপ্রেমের এমন বন্যা বহিয়াছিল যে অতি দরিদ্র বিধবাও দশ টাকার একটি অংশ ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঙালি বিলাতি বস্ত্র ব্যবহার করিবে না এই প্রতিজ্ঞা করাতে, বোম্বাই ও আমেদাবাদ মিলের বস্ত্রবিক্রয় অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বোম্বাই ও আমেদাবাদের মিলওয়ালারা বাংলা দেশকে শোষণ করিয়া লক্ষপতি হইয়াছিল। তাহাদের দৌরাত্ম্য দমনের জন্য বাংলা দেশে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রথম সংস্থাপিত হয়। অর্থলাভের জন্য নয়, কিন্তু স্বদেশের বস্ত্রের অভাব দূর করা এবং বাঙালি বিলাতি দ্রব্য ব্যবহার করিবে না এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করার জন্য বাংলার নরনারী উৎসাহের সহিত বঙ্গলক্ষ্মীর অংশ ক্রয় করিয়াছিল। অল্পকাল মধ্যেই বার লক্ষ টাকার মূলধন সংগৃহীত হইয়াছিল।

কিন্তু জাতীয় ব্যাঙ্ক না থাকিলে ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সম্ভব হয় না, তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, রাজা জানকীনাথ রায় প্রভৃতির চেষ্টায় "ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক" স্থাপিত হইয়াছিল। স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করিবে বাঙালি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, কিন্তু স্বদেশি দ্রব্য সুলভ ছিল না; তাই শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর যত্নে "ইণ্ডিয়ান ষ্টোর" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বাংলা দেশে স্বদেশিদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য বাঙালির মন উন্মত্ত হইয়াছিল। যে তাঁতি ও জোলারা অন্নাভাবে পরের বাড়িতে ভৃত্যের কাজ করিতে বাধ্য হইয়াছিল, তাঁহারা আবার বস্ত্র-প্রস্তুত কার্যে মনোনিবেশ করিল। তাহাদের বস্ত্র বাঙালিরা আদরের সহিত ব্যবহার করিতে লাগিল।

রমাকান্ত রায় প্রমুখ 'য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই, দীন দুখিনি মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই," এই গান করিতে করিতে স্বদেশি বস্ত্রের মোট মাথায় করিয়া কলিকাতার বাড়িতে বাড়িতে তাহা বিক্রয় করিতেন। তাহা দেখিয়া বাংলার অন্যান্য নগরের যুবকগণও বিনা লাভে স্বদেশিবস্ত্র বিক্রয় করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মাড়োয়ারি সে সময়ে প্রধান বস্ত্র বিক্রেতা ছিল। বাংলার নেতৃবর্গ তাহাদিগকে অনুনয় বিনয় করিয়া বিলাতি বস্ত্রের আমদানি বন্ধ করিতে বলিয়াছিলেন। কিন্তু মাড়োয়ারিরা তাহাতে সম্মত হয় নাই। তখন যুবকগণ মাড়োয়ারির দোকান হইতে কেহ যাহাতে বস্ত্র ক্রয় না করে তাঁহার আয়োজন করিয়াছিলেন।

যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতি যুবকগণ ইহার প্রথম উদ্যোগী ছিলেন। পিকেটিং আন্দোলনের ইহাই প্রথম চেষ্টা। মাড়োয়ারির কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করাতে পুলিস যতীন্দ্রমোহন সিংহ

প্রভৃতি যুবকদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া বড়বাজার থানায় লইয়া যায়। কয়েকটি যুবক আসিয়া 'সঞ্জীবনী' আফিসে এই সংবাদ প্রদান করে। আমরা ভূপেন্দ্রনাথ বসু, এবং ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়কে লইয়া বড়বাজার থানায় যাই এবং ধৃত যুবকদিগকে জামিন দিয়া মুক্ত করি। পরদিন কয়েকটি যুবকের বে-আইনি জনতা করার অপরাধে অর্থদণ্ড হয়। চাঁদা সংগ্রহ করিয়া সেই অর্থদণ্ড প্রদান করা হইয়াছিল। পিকেটিং বন্ধ করিবার জন্য পুলিসের হস্তক্ষেপ এবং অর্থদণ্ডের দৃষ্টান্ত এই প্রথম।

বিলাতি কাপড়, লবণ, চিনি ইত্যাদি বিক্রয় পিকেটিং করা অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত বঙ্গদেশে বিস্তৃত হইয়াছিল; বাংলাদেশে তখন যে পুণ্যের হাওয়া বহিতেছিল তাহা সম্যক্ বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। যে সমুদয় শিক্ষিত লোক বিলাতি মদ খাইতেন তাঁহারাও বিলাতি মদ বর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে সম্পূর্ণরূপে মদ্যপান পরিত্যাগ করিতে না পারিয়া দেশি মদ খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

মফঃস্বলের হাটে বাজারে পিকেটিং উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়াছিল। যুবকগণ হাটে বাজারে যাইয়া বিলাতিদ্রব্য বিক্রেতাদিগকে তাহা আমদানি করিতে নিষেধ করিত। সেই নিষেধ অগ্রাহ্য করাতে তাঁহারা লবণ, চিনি রাস্তাতে ফেলিয়া দিতে লাগিল। পুলিস যুবকদিগকে বাধা দেওয়াতে পুলিসের সঙ্গে যুবকদের সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছিল। ইহাতে বহু যুবকের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড ও বেত্রদণ্ড হইয়াছিল।

বেঙ্গলী আপিস ও সঞ্জীবনী আপিস বিলাতিদ্রব্য বর্জন আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ সংগ্রহ করিতেন, আমরা প্রচারক সংগ্রহ করিতাম।

লিয়াকৎ হোসেন, আবুল হোসেন, দীন মহম্মদ, ডাক্তার আবদুল গফুর, দেদার বক্স, সিরাজগঞ্জের ইসমাইল সিরাজী প্রভৃতি মুসলমানগণ প্রবল উৎসাহের সহিত বঙ্গদেশকে পুনরায় অখণ্ড করা, ও বিলাতি বর্জন করিয়া স্বদেশি বস্ত্র ব্যবহার করার আন্দোলন, বঙ্গদেশের নানাস্থানে গমন করিয়া সভা ও বক্তৃতার সাহায্যে করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।

কলিকাতা ও মফঃস্বলের কত লোক যে নানাস্থানে বক্তৃতা করিতে যাইতেন তাঁহার সংখ্যা বলা দুষ্কর। মফঃস্বলের নেতৃবর্গ এবং কলিকাতার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র চৌধুরী, আশুতোষ চৌধুরী, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রাণকৃষ্ণ আচার্য, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকান্ত রায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রভৃতি বঙ্গদেশকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

বঙ্গভঙ্গের বিরাট আন্দোলনের পূর্বে লর্ড কার্জনের উগ্র শাসন প্রণালীর বিরুদ্ধে এক আন্দোলন হইয়াছিল। তাঁহার বিশিষ্টতা সম্বন্ধে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।

কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটি কিয়ৎ পরিমাণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছিল। লর্ড কার্জন এক আইন করিয়া কলিকাতার মিউনিসিপ্যালিটিকে নানা বিষয়ে গবর্নমেন্টের অধীন করিয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন প্রণয়ন করিয়া পাঠ্যপুস্তক হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস তুলিয়া দিয়াছিলেন। বে-সরকারি কলেজসমূহে যে আইন পড়ান হইত, লর্ড কার্জনের প্রভাবে রিপণ কলেজ ব্যতীত আর সমস্ত কলেজে আইন অধ্যয়ন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ভারতবর্ষের মধ্যে বাংলা দেশে হাইস্কুল ও কলেজ সংখ্যা বেশি হওয়াতে উচ্চশিক্ষিত লোকসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল। লর্ড কার্জনের পরামর্শে দ্বিতীয় শ্রেণির কলেজগুলি উঠাইয়া দিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। লর্ড কার্জন দেখিয়াছিলেন উকিলেরাই রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতা। উকিলের সংখ্যা হ্রাস করিতে পারিলে বাংলার রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসার কমিয়া যাইবে। তাই আইন কলেজের সংখ্যা কমাইয়া দিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিলে যুবকদের মনে স্বাধীনতার স্পৃহা জাগ্রত হয় এবং অত্যাচারী রাজপুরুষকে দমন করিবার ইচ্ছা প্রবল হয়, তাই ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ বন্ধ করিয়া

দেওয়া হয়। এইরূপ নানা কারণে লর্ড কার্জনের উপরে ভারতের শিক্ষিত সমাজ ক্রুদ্ধ হইয়াছিল।

ডেরাইসমাইল খাঁ ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রান্ত প্রদেশের একটি জেলা। শ্রীযুক্ত টহলরাম সেই জেলার একজন ক্ষুদ্র জমিদার। তিনি লর্ড কার্জনের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করিবার নিমিত্ত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত টহলরাম কলিকাতা আসিয়া ছাত্রদের প্রধান মিলনের স্থল কলেজ স্কোয়ারে লর্ড কার্জনের কার্যের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তৃতা আরম্ভ করেন। সেই বক্তৃতা শুনিয়া অনেকগুলি যুবক তাঁহার অনুগত হয়। তাহাদের মধ্যে হেমচন্দ্র সেনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হেমচন্দ্র প্রথম শ্রেণিতে পড়িত, সে হৃদয়-উন্মাদক গান করিতে পারিত। তাঁহার গান শুনিবার জন্য সহস্র লোক কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইত। **যে বন্দেমাতরম সঙ্গীত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দ মঠে' লিপিবদ্ধ ছিল, হেমচন্দ্রই প্রথমে সেই সঙ্গীত কলেজ স্কোয়ারে গান করিয়া সহস্র লোককে স্বদেশপ্রেমে মাতোয়ারা করিত।** ক্রমে দেখা গেল, কতকগুলি লোক টহলরামের বক্তৃতায় বাধা দিতে লাগিল।

টহলরাম যুবকদিগকে "God bless our Mother Ind" (আমাদের মাতৃভূমি ভারতকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন) এই সঙ্গীত শিখাইয়াছিলেন। যুবকগণ এই সঙ্গীত গান করিতে করিতে কলিকাতার রাজপথে ভ্রমণ করিত। কতগুলি অজ্ঞাত লোক ইহাদের উপরে প্রস্তরনিক্ষেপ করিত। টহলরামের প্রভাব ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহাকে দমন করিবার জন্য বিধিমত আয়োজনও হইতে লাগিল। একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, কয়েকজন বলবান লোক তাহাকে ধাক্কা দিয়া গোলদিঘির জলে ডুবাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। টহলরাম তবু বক্তৃতা বন্ধ করিলেন না।

একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন, কে একজন গোলদিঘির গাছের উপর হইতে বিষ্ঠার ভাণ্ড তাঁহার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার দেহ বিষ্ঠাতে আবৃত হইয়াছিল এবং তাঁহার মস্তক হইতে রক্তপাত হইতেছিল। তিনি সঞ্জীবনী আপিসে পুরীষপ্লাবিত দেহে আশ্রয় লইলেন। আমরা তাঁহার গাত্র হইতে পুরীষ প্রক্ষালন করিয়া এবং তাঁহার মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া তাঁহার বাসস্থানে পাঠাইয়া দিয়াছিলাম।

আর একদিন তিনি বক্তৃতা করিতেছিলেন একজন দুর্দান্ত লোক বৃহৎ লাঠি দ্বারা তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দেয়। রক্তে তাঁহার সমস্ত বস্ত্র লাল হইয়া গিয়াছিল। তিনি সঞ্জীবনী অফিসে প্রবেশ করেন, কয়েকজন দুর্দান্ত লোকও তাঁহার অনুসরণ করিয়া সঞ্জীবনী অফিসে প্রবেশ করে। আমি একখানা ভুজালি লইয়া দ্বারদেশে গমন করি এবং যে টহলরামকে প্রহার করিবে তাঁহারই দেহে ভুজালি বিদ্ধ করিব বলিয়া ভয় প্রদর্শন করি। তখন দুর্দান্ত লোকেরা দৌড়িয়া পলাইয়া যায়। টহলরামের মস্তক হইতে যে রক্তপাত হইতেছিল, বরফের দ্বারা তাহা বন্ধ করিয়া দিই। তিনি একটু সুস্থ হইলে তাঁহাকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠাইয়া দিই। সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতির পর তিনি আরোগ্য লাভ করেন। **যীশুর পূর্বে যেমন জনের আবির্ভাব হইয়াছিল, বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের পূর্বে তেমনি টহলরাম আসিয়াছিলেন।**

স্বদেশিবস্ত্র প্রচার আন্দোলনের প্রায় ২৫ বৎসর পূর্বে দু-একটি বিশেষ ঘটনা হইয়াছিল, এখানে তাঁহারও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আনন্দমোহন বসু ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বদেশপ্রেমের কথা বাংলাদেশে প্রচার করিয়াছিলেন। আনন্দমোহন বসু বাঙালি জাতির দরিদ্রতা দূর করিবার জন্য একটি ব্যাঙ্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। অনেক নিরাশ্রয় বাঙালি সেই ব্যাঙ্ক হইতে টাকা লইয়া নানা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের শ্বশুর, স্যর জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পিতা, ভগবানচন্দ্র বসু ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কার্য করিতেন। তিনি চিরদিনই ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহদাতা ছিলেন। রাজকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া তিনি এই ব্যাঙ্কের অনেক উন্নতি বিধান করিয়াছিলেন। অতঃপর চিত্তরঞ্জন দাশের পিতা এটর্নি শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন দাশ কিছুদিন এই ব্যাঙ্কের পরিচালক ছিলেন; কিন্তু যাহারা এই ব্যাঙ্কের নিকট হইতে টাকা ধার

করিয়া ব্যবসা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল তাহাদের অসদাচরণে ও ব্যাঙ্কের কতিপয় কর্মচারীর প্রতারণায় এই ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছিল। **বাঙালি পরিচালিত প্রথম ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন আনন্দমোহন বসু।**

তৎকালে চা-বাগানের সমস্ত মালিকই ছিলেন ইংরেজ। আনন্দমোহন বসু আসামের অন্তর্গত তেজপুর জেলায় এক চা-বাগান স্থাপন করিয়া অনেক বাঙালি যুবকের জীবিকা উপার্জনের উপায় করিয়া দিয়াছিলেন। বাঙালি চা-বাগান চালাইতে পারে না, এই ভয় তিনি দূর করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার চা-বাগান এখনও বিদ্যমান আছে। তিনি নিজের এক পুত্রকে কৃষি শিক্ষার জন্য বিলাতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, সেই পুত্র শ্রীযুক্ত সরোজমোহন বসু এই চা-বাগানের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন, আনন্দমোহন বসু যাহা চিন্তা করিতেন তাহা কার্যে পরিণত করিতেন; ব্যাঙ্ক ও চা-বাগান তাঁহার পরিচয় দিয়াছিল।

ইনসিওরেন্স কোম্পানিগুলি তৎকালে হয় ইংরেজ না-হয় বোম্বাইয়ের লোকের দ্বারা পরিচালিত হইত। স্বদেশি আন্দোলনের সময় বাঙালি জীবিকা উপার্জনের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল। হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানি স্থাপিত হওয়ার পর বাঙালি কর্তৃক অনেক ইনসিওরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বিদেশীয় এবং বোম্বাইয়ের লোকেরা বাংলা হইতে যে ধন লইয়া যাইত তাঁহার কিয়দংশ এখন বাঙালির ঘরেই যাইতেছে।

বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল ও বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক স্বদেশি আন্দোলনের জোয়ারের সময় স্বদেশপ্রেমিক লোকের দ্বারা পরিচালিত হওয়াতে খুব লাভবান হইতেছিল, কিন্তু নানা চক্রান্তের পর কতিপয় স্বার্থপর লোকের হস্তে ইহার কার্যভার পতিত হওয়াতে, বেঙ্গল ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক উঠিয়া গিয়াছে। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলও মৃতপ্রায় হইয়াছিল, কিন্তু টাঙ্গাইলের অন্তর্গত নাগরপুরনিবাসী রায় বাহাদুর সতীশচন্দ্র চৌধুরী নিজের স্কন্ধে ইহার ঋণভার গ্রহণ করাতে, বঙ্গলক্ষ্মী কাপড়ের কল আজও বাঁচিয়া আছে।

স্বদেশি আন্দোলন প্রবল হওয়াতে বিলাতি দ্রব্যের আমদানি অনেক হ্রাস হইয়াছিল। মাড়োয়ারিরাই বিদেশি বস্ত্রের প্রধান বিক্রেতা ছিল। বিদেশি বস্ত্রের কাটতি কম হওয়াতে দুর্গাপূজার দশমীর দিনে তাহারা বিলাতি কাপড়ের যে ফরমাইস দিত তাহা বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ব্রিটিশ বণিকগণ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছিল। মাড়োয়ারিরা অর্থ উপার্জন করিবার জন্যই বঙ্গদেশে আসিয়াছে। তাহারা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই প্রস্তাব করিল, তাহাদের দোকানে যে বিলাতি বস্ত্র মজুত আছে, তাহা ফুরাইয়া গেলে তাহারা আর বিলাতি বস্ত্র আমদানি করিবে না। মাড়োয়ারিরা এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে পারে নাই। তাহারা ভাবিয়াছিল, বাঙালির এই আন্দোলন খড়ের আগুনের মত; দুদিন পরেই নির্বাপিত হইবে।

মাড়োয়ারিরা বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ বা স্বদেশি আন্দোলনে বাঙালির বিশেষ শত্রুতা করিয়াছিল। এমন কি পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় বলিয়াছিলেন, "বাংলার অঙ্গচ্ছেদ হইয়াছে, ইহাতে ভারতের অন্য প্রদেশের লোকের মাথা ঘামাইবার কোন প্রয়োজন নাই।" কাশীর কংগ্রেসে যখন বাংলার অঙ্গচ্ছেদের বিরুদ্ধে প্রস্তাব উত্থাপনের কথা হয়, তখন তিনি এবং আরও কতিপয় লোক বলিয়াছিলেন, "প্রাদেশিক ব্যাপার কংগ্রেসের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয়।" মিঃ গোখলে কাশী কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন; তিনি বাংলার মর্যাদা জানিতেন। তিনি ইহা বিশ্বাস করিতেন, বাংলা যদি অবনত হয়, তবে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশই উন্নত হইতে পারিবে না। তাঁহার চেষ্টাতে এবং বাঙালির ভয়ে অন্যান্য প্রদেশের লোকেরা অবশেষে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইয়াছিল।

স্কুল কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য যুবকদের সহায়তায় স্বদেশি আন্দোলনের প্রভাব সর্বত্র বিস্তৃত

হইয়াছিল। এমন কি বালক-বালিকারা পর্যন্ত সুন্দর মনোহর বিদেশি বস্ত্র, জুতা, খেলনা পর্যন্ত বর্জন করিয়াছিল। বয়স্কা নারীগণ হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙিয়া ফেলিয়া দিয়া শাঁখার বালা পরিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের এক নাতনীকে পূজার সময় এক জোড়া সুন্দর বিলাতি জুতা উপহার দেওয়া হইয়াছিল; "আমি বিলাতি জুতা পরিব না" ইহা বলিয়া তাহার নাতনী সে জুতা ফিরাইয়া দিয়াছিল। একটি বালিকার জ্বর-বিকার হইয়াছিল; সে চীৎকার করিয়া বলিত, "আমি বিলাতি ঔষধ খাইব না।" বঙ্গের সর্বত্র পূজাতে, বিবাহে ও শ্রাদ্ধে নারীগণ বিদেশিবস্ত্র পরিধান করিতেন না।

এই স্বদেশি আন্দোলনের প্রধান প্রচারক ছিলেন স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ। তাহাদিগকে এই আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য বাংলা গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি মিঃ কার্লাইল এই সার্কুলার জারী করিয়াছিলেন, যদি স্কুল ও কলেজের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ ছাত্রদিগকে স্বদেশি আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত না করেন, তাহা হইলে গবর্নমেন্টের সাহায্য বন্ধ করা হইবে। সেই স্কুলের ছাত্রগণ গবর্নমেন্টের বৃত্তি পাইবে না এবং সে স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ যাহাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন পরীক্ষা না দিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করিতে বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা হইবে। এই সার্কুলারের পর বাংলার বহু ছাত্র স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল। **রঙ্গপুরের বহু ছাত্র স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে কলিকাতা হইতে শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু প্রভৃতি কয়েকজন রঙ্গপুরে গমন করেন এবং বহিষ্কৃত ছাত্রদের শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। বঙ্গদেশে এখানেই সর্বপ্রথমে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয়।**

নোয়াখালির শ্রীমান নগেন্দ্রকুমার গুহ রায় ও অন্যান্য স্থানের আরও কতিপয় ছাত্র স্কুল হইতে বহিষ্কৃত হওয়াতে কলিকাতায় আসে। শ্রীমতী লীলাবতী মিত্র তাহাদিগকে নিজ বাটিতে আশ্রয় দেন এবং 'য়্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র গৃহে তাহাদের পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। কুঞ্জলাল নাগ প্রভৃতি কতিপয় প্রসিদ্ধ অধ্যাপক তাহাদের শিক্ষার ভার গ্রহণ করেন।

বাংলা গবর্নমেন্ট ভাবিয়াছিলেন যে এই সার্কুলারের ভয়ে ছাত্রগণ স্বদেশি আন্দোলন হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইবে কিন্তু ফল হইল তাহার বিপরীত। গবর্নমেন্ট ছাত্রদের প্রকৃতি বুঝিতে পারেন নাই। তাহারা যাহা ভাল মনে করে বলপূর্বক তাহা হইতে তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তাহাদের প্রাণে সকল বাধা অগ্রাহ্য করিবার জন্য দুর্জয় সংকল্প জাগিয়া উঠে। এই সার্কুলার জারি করাতে বাংলার ছাত্রগণ স্বদেশি আন্দোলনে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল।

স্বদেশি আন্দোলন ক্রমেই যে কি ভীষণ আকার ধারণ করিবে লর্ড কার্জন তাহা বুঝিতে না পারিয়া ঘোষণা করিলেন, ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর ৩০ আশ্বিন পূর্ব-বাংলায় এক স্বতন্ত্র গবর্নমেন্ট স্থাপিত হইবে। বাংলার শহরে ও গ্রামে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সকলের প্রাণে এই সংকল্প জাগিয়া উঠিল—গবর্নমেন্ট যাহা করিবার করুন, আমরা বাংলাকে দ্বিখণ্ড করিতে দিব না।

বাংলা দেশ তেজোদীপ্ত হইয়া উঠিল। বাংলার কবিগণের হৃদয় হইতে স্বভাবতই এমন কবিতা ও সঙ্গীত বাহির হইল যে তাহা পাঠ করিয়া বাংলার শত শত নরনারী স্বদেশের জন্য সর্বত্যাগী হইতে সংকল্প করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হৃদয় ভেদিয়া,

"বাংলার মাটি, বাংলার জল,
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক, হে ভগবান।"
"বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে।"
"যে তোমারে ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা।"
"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, একলা চল রে।"

এইরূপ বহু সঙ্গীত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রজনীকান্ত সেনের, "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়

মাথায় তুলে নে রে ভাই"; সন্তোষের জমিদার শ্রীযুক্ত প্রমথ রায় চৌধুরীর, "মা-ই দেশের রাজা, মা-ই দেশের রাণী"; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ",—ইত্যাদি হৃদয়-উন্মাদক কত সঙ্গীত যে রচিত হইয়াছিল, তাঁহার ইয়ত্তা করা যায় না। সুলেখকগণ প্রবন্ধাবলী রচনা করিয়া সমস্ত দেশকে কাঁপাইয়া তুলিয়াছিলেন।

"সঞ্জীবনী"তে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের কুফল প্রতিপন্ন করিয়া এমন প্রবন্ধসকল প্রকাশিত হইয়াছিল যে বঙ্গের চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহা পাঠ করিয়া লর্ড কার্জন বাংলা গবর্নমেন্টকে ঐ পুস্তকের লেখকের নাম অবগত হইবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন। বাংলা গবর্নমেন্টের সেক্রেটারি তাহা জানিবার জন্য আমার নিকট আসিয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, "আমিই তাঁহার লেখক। ৫০,০০০ হাজার পুস্তক ছাপা হইয়াছে, কিন্তু কে উহার ব্যয়ভার বহন করিয়াছে, তাহা বলিব না।" মিঃ ম্যাক্‌ফারসন খুব ভদ্রলোক ছিলেন। কাহার অর্থে পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা জানিবার জন্য তিনি বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা জানিতে না পারিয়া তিনি যে ক্রুদ্ধ হইয়াছেন তাঁহার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ক্রমে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর নিকটবর্তী হইতে লাগিল। অঙ্গচ্ছেদের দিন যতই নিকটবর্তী হইতে লাগিল, বঙ্গদেশেকে অখণ্ড রাখিবার সংকল্প ততই দৃঢ় হইতে লাগিল। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রস্তাব করিলেন, গবর্নমেন্ট বাংলাদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারেন, কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা বাঙালির প্রীতির দুশ্ছেদ্য সূত্রে আরও নিকটবর্তী হইবে। তাঁহার চিহ্নস্বরূপ বাঙালি নরনারী ৩০ আশ্বিন রাখিবন্ধন করিবে।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি রাখিবন্ধন ব্যতীত এই নির্ধারণ করিলেন, "শোকচিহ্ন স্বরূপ ৩০ আশ্বিন, শিশু ও রোগী ব্যতীত, আর কেহই অন্নজল গ্রহণ করিবেন না এবং সকলেই সেদিন খালি পায়ে থাকিবে। কোন বাঙালির ঘরে চুলা জ্বলিবে না। ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ থাকিবে, রাস্তায় ঘোড়ার গাড়ি বা গরুর গাড়ি চলিবে না। দোকানপাট ও বাজার বন্ধ থাকিবে। সূর্যোদয়ের পূর্ব হইতে কলিকাতার উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্যন্ত, সমস্ত স্থানে যুবকগণ "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত করিতে করিতে, গঙ্গার ধারে সমবেত হইয়া তথায় স্নান করিয়া বীডন স্কোয়ার ও কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সেন্ট্রাল কলেজে সমবেত হইবে। প্রথমতঃ সেখানে রাখিবন্ধন ও বঙ্গবিচ্ছেদজনিত প্রাণের খেদ ও সঙ্কল্প প্রকাশ করা হইবে। দ্বিতীয়তঃ, আপার সার্কুলার রোডে অপরাহ্নকালে এক বিরাট সভা হইবে। গবর্নমেন্ট পূর্ব ও পশ্চিম বাঙলার বাঙালিদিগকে যে বিচ্ছিন্ন করিতে পারেন নাই, তাঁহার চিহ্নস্বরূপ ঐ সভাস্থল ক্রয় করা হইবে এবং তদুপরি অখণ্ডবঙ্গ-ভবন নির্মাণ করা হইবে। তৃতীয়তঃ বাগবাজার স্ট্রীটে পশুপতি বসুর বাটীতে সন্ধ্যাকালে আর এক সভা হইবে। সে স্থলে স্বদেশি বস্ত্র প্রস্তুতের সাহায্যার্থ অর্থ সংগ্রহ করা হইবে।"

৩০ আশ্বিনের বিরাট আয়োজন করিবার জন্য কলিকাতার বাজারে বাজারে যাইয়া যুবকগণ বাজারের মালিক, ক্রেতা ও বিক্রেতাদিগকে দোকান বন্ধ করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। স্বদেশকে দ্বিখণ্ড করাতে সকলের প্রাণই এমন ক্রুদ্ধ হইয়াছিল যে তাঁহারা বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও বাজার বন্ধ করিতে স্বীকার করিল। ব্যারিষ্টার অশ্বিনীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের চেষ্টাতে ঘোড়ার গাড়ির মালিকগণ স্বীকার করিলেন যে একখানি গাড়িও সেদিন রাস্তায় বাহির হইবে না। গরুর গাড়ির মালিক ও গাড়োয়ানগণ সকলেই হিন্দুস্থানী, তাঁহারা বঙ্গবিচ্ছেদের কথা কিছুই জানিত না। বঙ্গ দেশের সুখদুঃখের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধও ছিল না। চোরবাগানের নিবারণচন্দ্র দত্ত ও শিবনারায়ণ দাস লেনের বাবু চারুচন্দ্র মিত্র যুবকদের সঙ্গে সঙ্গে ২৯ আশ্বিন রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্যন্ত গাড়োয়ানদের আড্ডাসমূহে গমন করিয়া পরদিন গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখিতে স্বীকার করাইয়াছিলেন।

কলিকাতা শহরের বাঙালি-পরিচালিত সমস্ত দোকানগুলি বন্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, কিন্তু অনেক মাড়োয়ারি ও মুসলমান দোকানদাররা দোকান বন্ধ রাখিতে কিছুতেই স্বীকার করিল

না। রাখিবন্ধন ব্যাপার সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য যাহারা রাখি প্রস্তুত করে তাঁহাদিগকে লক্ষাধিক রাখি তৈয়ারি করিবার জন্য বলা হইল। হিন্দুস্থানীরাই রাখি প্রস্তুত করিত। স্বদেশপ্রেমে না হউক অর্থলোভে তাঁহারা যথেষ্ট রাখী প্রস্তুত করিল। যে স্থানে অখণ্ডবঙ্গ-ভবন নির্মাণ ও বিরাট সভার কথা হইয়াছিল, আর.জি. করের মেডিক্যাল স্কুল সে স্থানের স্বত্বাধিকারী ছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ জামাতা কর্নেল উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি এই জমির জামিন হওয়াতে তাহা ফেডারেসন হল-কমিটি কর্তৃক ক্রীত হইয়াছিল।

যুবকগণ প্রায় একপক্ষকাল দিন ও রাত্রের অধিকাংশ সময় পরিশ্রম করিয়া সকল আয়োজন পূর্ণ করিয়াছিলেন। ৩০ আশ্বিন রাত্রি প্রভাত না হইতেই যুবক বৃদ্ধ ও বালিকাগণ রবীন্দ্রনাথের রচিত,—"বাংলার মাটি বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান"—এই গান করিতে করিতে দলে দলে রাজপথে বহির্গত হইল। সকলে গঙ্গাতীরে সমবেত হইলেন। মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি হইতে লাগিল। এক এক স্থানে কেহ কেহ এমন চিত্ত-উন্মাদনকারী সঙ্গীত করিতে লাগিল যে তাহা শুনিয়া শত শত লোক কাঁদিতে লাগিল। এক স্থানে ললিতকুমার সরকার নামক একটি বালক শোকার্তচিত্তে স্বদেশের দুঃখবর্ণনা করিয়া এমন সঙ্গীত করিতেছিল যে তাহা শুনিয়া সেন্ট্রাল কলেজের প্রিন্সিপাল ক্ষুদিরাম বসু প্রভৃতি বৃদ্ধগণ কাঁদিয়া আকুল হইতেছিলেন।

গঙ্গাতীর হইতে সঙ্গীত করিতে করিতে বীডন স্কোয়ার ও সেন্ট্রাল কলেজে সকলে সমবেত হইলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি সকলেই খালি পায়ে সভায় আসিয়াছিলেন। তথায় পরস্পরের হস্তে রাখিবন্ধন করা হইল। সকলেই দৃঢ়তার সহিত বলিতে লাগিলেন—"আমাদিগকে কেহই পৃথক করিতে পারিবে না"। সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় একদিকে শোকের উচ্ছ্বাস অপর দিকে মাতৃভূমির জন্য মহাপ্রেম জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছিল।

অপরাহ্ণ ২৷৷০ টার সময় সার্কুলার রোডের মাঠে সভার আয়োজন হইয়াছিল। কাহাকে সভাপতি করা হইবে তাহা স্থির করিবার জন্য কয়েকজন লোক কয়েকদিন পূর্বে সমবেত হইয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—আনন্দমোহন বসুই সভাপতি হইবার যোগ্য। তিনি তখন সাংঘাতিক পীড়ায় শয্যাশায়ী ছিলেন; তাঁহার উত্থানশক্তি ছিল না। তবুও সকলে বলিলেন, "তাঁহাকেই সভাপতি করিতে হইবে।" তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে সে কথা বলা হইল। বসু মহাশয়কে জানান হইলে তিনি বলিলেন, "সভাস্থলে যদি মৃত্যুও হয়, তবু আমি এই কার্য করিয়া যদি ইহলোক হইতে যাইতে পারি তবে পরম আনন্দিত হইব।" বসু মহাশয়ের আত্মীয়গণ ডাঃ নীলরতন সরকার মহাশয়ের সঙ্গে পরামর্শ করিলেন। তাঁহারা ঔষধ লইয়া তাঁহার সহিত সভাস্থলে যাইতে প্রস্তুত হইলেন। বসু মহাশয়কে ইজিচেয়ারে শোয়াইয়া ডাক্তারগণ তাঁহাকে সভাক্ষেত্রে লইয়া গেলেন।

৫০,০০০ হাজার লোক ভক্তির সহিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে লাগিল, এবং তাঁহারা সকলে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। তখন দেখা গেল বসু মহাশয়ের রোগশীর্ণ মুখে বিদ্যুতের জ্যোতি ফুটিয়া উঠিল। তিনি আসন গ্রহণ করিলেন। সভাস্থ সকলে মৃত্তিকার উপরে উপবেশন করিল। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হাইকোর্টের জজ ছিলেন, কিয়ৎকাল পূর্বে কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের শরীর শীর্ণ, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ কিন্তু আত্মা চিরনবীন। তিনি যে অভিভাষণ রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার ভাষা যেমন অতুলনীয়, ভাবও তেমনি অসাধারণ। সে তেজ ও আশাপূর্ণ ভাষা পঞ্চাশ সহস্র লোককে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন, যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার চিরদিনের জন্য এক অখণ্ড বঙ্গভবনের ভিত্তি বসু মহাশয় স্থাপন করিলেন। অমনই আকাশ বিদীর্ণ করিয়া 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি উত্থিত হইল।

অভিভাষণ পাঠের পর আনন্দমোহন বসু রচিত নিম্নলিখিত ঘোষণা-পত্র পঠিত হইল।—

"Whereas the Government has thought fit to effectuate the Partition of Bengal in spite of the universal protest of the Bengalee Nation, we hereby pledge and proclaim that we as a people shall do everything in our power, to countreract the evil effects of the dismemberment of our province and to maintain the integrity of our race. So God help us." A. M. Bose.

তাৎপর্য:—যেহেতু বাঙালিজাতির সর্বজনীন প্রতিবাদ সত্ত্বেও গবর্নমেন্ট বঙ্গচ্ছেদ কার্যকরী করা স্থির করিয়াছেন, আমরা এতদ্দ্বারা সংকল্প গ্রহণ ও ঘোষণা করিতেছি যে, আমাদের দেশের অঙ্গহানির বিষময় ফল প্রতিরোধ করিতে এবং জাতীয় সংহতি অটুট রাখিতে আমরা সমবেত ভাবে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করিব। ঈশ্বর আমাদের সহায় হউন। এ. এম. বসু

ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী তাহা পাঠ করিলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাহা বাংলায় অনুবাদ করিয়া সকলকে শুনাইলেন। আনন্দমোহন বসু মহাশয়কে বাড়িতে পৌঁছাইয়া দিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভৃতি প্রায় ৫০,০০০ হাজার লোক খালি পায়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে পশুপতি বসুর ভবনে গমন করিলেন। ইতিপূর্বেই পশুপতি বসু মহাশয়ের প্রকাণ্ড বাটির সমুখস্থ সুবৃহৎ উদ্যানে ২০,০০০ হাজার লোক সমবেত হইয়াছিল।

অখণ্ডবঙ্গ-ভবনের মাঠ হইতে সমাগত ৫০,০০০ সহস্র লোকের কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি শুনিয়া পশুপতি বসুর উদ্যানে সমবেত কুড়ি সহস্র লোক "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে লাগিল। উভয় দলের উচ্চারিত "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে আকাশ নিনাদিত ও চতুর্দিকের বাটি হইতে তাঁহার প্রতিধ্বনি হইতে লাগিল। সকলের মন যে ভাবে বিভোর হইয়াছিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।

চন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য নামক এক প্রৌঢ় ব্যক্তি আমার সহপাঠী ছিলেন। তিনি ডায়মণ্ড হারবারে ওকালতি করিতেন। তিনি আমার নিকট আসিয়া বলিলেন "আজ ৩০ আশ্বিন যে তিথি ও নক্ষত্রের সংযোগ হইয়াছে তাহাতে বিপ্লবের সূচনা করিতেছে।" আমি তাঁহাকে বলিলাম—"ওসব কুসংস্কারের কথা বলিবেন না। তিথি নক্ষত্রের উপর নির্ভর করিলে মানুষের পৌরুষ নষ্ট হইয়া যায়।" তিনি বলিলেন—"সভার বহুলোক ঐ কথা বলিতেছে।" আমি বলিলাম, —"ওসব কথায় কান দিবেন না। ওসব কথায় বিশ্বাস করিলে জন্মভূমিকে অখণ্ড রাখিবার জন্য যে পবিত্র আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে তাহা নষ্ট হইয়া যাইবে।"

আমরা বিশাল উদ্যানে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের পৌত্র কুমার মন্মথনাথ মিত্র, বাবু চারুচন্দ্র প্রভৃতি কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইয়াছেন। সকলের মুখেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, বাঙালি বস্ত্রের অভাব দূর করিবে; বাঙালি বিলাতিবস্ত্র স্পর্শ করিবে না। বিরাট সভা হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তৃতা করিলেন। তখন টাকা বর্ষণ আরম্ভ হইল। কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি গাত্রবস্ত্র বিস্তারিত করিলেন—হাজার হাজার লোক তাঁহার মধ্যে টাকা, নোট, আংটি, ঘড়ি প্রভৃতি দিতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। অতঃপর কুমার মন্মথনাথ মিত্র প্রভৃতি খালি পায়ে কলিকাতার নানাস্থানে যাইয়া অল্পদিনের মধ্যে আরও কুড়ি হাজার টাকা সংগ্রহ করিলেন।

এই টাকা দ্বারা অবিলম্বে কার্য আরম্ভ হইল। ২০৯ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের সঙ্গীতসমাজ গৃহে এক সভা করিয়া স্থির করা হইল, সংগৃহীত টাকা দ্বারা সঙ্গীতসমাজের ভবনে চরকায় সূতা কাটা ও তাঁতে বস্ত্রবয়ন শিক্ষা দিবার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপন করা হইল। প্রসিদ্ধ ব্যারিস্টার মিঃ তারকনাথ পালিত প্রভৃতি এই কার্যে পরমোৎসাহে যোগদান করিলেন। তৎকালে চরকা পাওয়া যাইত না। অবিলম্বে প্রায় ৪০০ শত চরকা প্রস্তুত করা হইল। বহুসংখ্যক ঠক্‌ঠকি তাঁত ও কয়েকটা হ্যাটার্সলি তাঁত ক্রয় করা হইল। প্রায় ৪০০ শত ভদ্রবংশের যুবক চরকায় সূতা

কাটা ও বস্ত্রবয়ন শিক্ষার জন্য এই বয়ন বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। ছাত্রদের প্রাণে এই আশা উদ্দীপিত হইয়াছিল যে চরকায় সুতা কাটিয়া ও তাঁতে বস্ত্র বুনিয়া তাঁহারা প্রতিদিন অন্যূন ২/৩ টাকা উপার্জন করিতে পারিবে এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিলাতি বস্ত্রের আমদানি হ্রাস করিতে পারিবে।

চারি মাস পরীক্ষার পর দেখা গেল, চরকায় সুতা কাটিয়া কেহই প্রতিদিন ২ আনার বেশি উপার্জন করিতে পারে না। তাঁহারা যে সুতা কাটিয়াছিল, সে অসমান সুতা দ্বারা বস্ত্র বয়ন করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল। যাহারা বস্ত্র বয়নে সুদক্ষ হইয়াছিল তাঁহারাও প্রতিদিন ৮ আনার বেশি উপার্জন করিতে পারিত না। সুতরাং চারি পাঁচ মাস পরেই সমস্ত ছাত্র চলিয়া গেল। চরকা তাঁত পড়িয়া রহিল। ইহার পর গালিচা বুননের চেষ্টা হইয়াছিল কিন্তু তাহাও লাভজনক হইল না। সুতরাং বয়নবিদ্যালয় বন্ধ হইয়া গেল। এই বিদ্যালয়ের জন্য প্রায় ৩০,০০০ হাজার টাকা খরচ হইয়াছিল। চরকা ও তাঁত বিক্রয় করিয়া চারি-পাঁচ শত টাকার বেশি পাওয়া যায় নাই। আমরা প্রতিদিন সঙ্গীতসমাজে মিলিত হইয়া চরকা ও তাঁতের দ্বারা বিলাতি বস্ত্রের আমদানি বন্ধ করা এবং বাঙালির বস্ত্রের অভাব দূর করা অসম্ভব, এই শিক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। অতঃপর যখনই বঙ্গদেশে কাপড়ের কল স্থাপনের প্রতিবাদ করিয়া চরকা ব্যবহার দেশময় প্রচলিত করিবার চেষ্টা করা হইয়াছিল তখনই আমি তাঁহার প্রতিবাদ করিয়াছি। কার্যতঃ দেখা গিয়াছে চরকায় সুতা কাটিয়া কেহ জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে না। এখনও কেহ কেহ এই লোকসান দিয়া চরকা প্রচলন করিতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু এরূপ লোকসান দিয়া বহুদিন চরকা প্রচলন করা সম্ভব হইবে না।

বয়ন বিদ্যালয়ের জন্য ৩০,০০০ হাজার টাকা ক্ষতি হইয়াছিল, অবশিষ্ট ৪০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখা হইয়াছিল। সুদে আসলে তাহা প্রায় ৭০,০০০ হাজার টাকা হইয়াছিল। অতঃপর "ন্যাশনাল ফণ্ড কমিটি" পুনর্গঠিত হয়। এক্ষণে সেই টাকার সুদ হইতে বঙ্গের নানা স্থানের বয়ন বিদ্যালয় ও অন্যান্য শিল্পের উন্নতির জন্য সাহায্য করা হইয়া থাকে। বাংলার একদল লোক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিন্দা করিতে সর্বদাই উন্মুখ ছিলেন। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন, ন্যাশনাল ফণ্ডের সমস্ত টাকা উঁহারা আত্মসাৎ করিয়াছেন। প্রতিবৎসর ঐ ফণ্ডের হিসাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। ঐ ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ কলিকাতার সুবিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লনাথ ঠাকুর। তাঁহার নামে ঐ টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে, তবু নিন্দুকেরা এখনও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিন্দা করিতে নিবৃত্ত হইতেছে না। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আমি এই কমিটির সভাপতির কার্য করিতেছি। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ও নিবারণচন্দ্র রায় ইহার সহকারী সম্পাদক।

আর. জি. করের মেডিক্যাল স্কুলের চারি বিঘা জমি ক্রয় করা হইল বটে কিন্তু উহার মূল্য দেওয়া গেল না। কয়েক বৎসর পরে চারি বিঘা জমির মধ্যে দুই বিঘা জমি ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়, আনন্দমোহন বসু মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র সুধাংশুমোহন বসু এবং মধ্যম পুত্র সরোজমোহন বসুর নিকট বিক্রয় করিয়া সমস্ত ঋণ শোধ করা হইল। সুতরাং অখণ্ডবঙ্গ-ভবন কমিটি (Federation Hall Building Committee) বিনা ব্যয়ে দুই বিঘা জমি পাইল কিন্তু যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ না হওয়াতে অখণ্ড-ভবন অদ্যাপি নির্মিত হয় নাই। কিন্তু ঐ জমি ভাড়া দিয়া ১৯৩২ সন পর্যন্ত প্রায় ১৩,০০০ হাজার টাকা ব্যাঙ্কে জমা করা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু ও ব্যারিস্টার মিঃ জে. চৌধুরী ইহার সম্পাদক।

২. বরিশাল কনফারেন্স

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইল। আসামের চীফ্ কমিশনার স্যর ব্যামফীল্ড ফুলার নূতন প্রদেশের গবর্নর নিযুক্ত হইলেন। তিনি মুসলমানপ্রিয় ছিলেন। তিনি

বক্তৃতায় বলিলেন—"আমার দুই স্ত্রী, হিন্দু এক স্ত্রী, মুসলমান আর এক স্ত্রী।" মুসলমান স্ত্রীর প্রতিই যে তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল তাঁহার আর কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ববঙ্গের মুসলমানেরা স্যর ব্যামফীল্ডের অনুরাগের পাত্র হইয়া হিন্দুদের বিরুদ্ধে নানা স্থানে গাত্রোত্থান করিল। তাঁহার ফলে ঢাকা, জামালপুর ও কুমিল্লায় মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে নানাপ্রকারে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গের রাজপুরুষগণও গবর্নরের মতানুবর্তী হইয়া মুসলমানদের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন।

কুমিল্লার সুবিখ্যাত হিন্দুমুসলমান দাঙ্গার মোকদ্দমার বিচারের কালে সাক্ষীদিগকে হিন্দু ও মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া, কুমিল্লার জজ তাঁহার রায়ে লিখিয়াছিলেন—"হিন্দু সাক্ষীদিগকে বিশ্বাস করা যায় না, মুসলমান সাক্ষীরা সকলেই বিশ্বাসযোগ্য।" হাইকোর্টের জজেরা এই মোকদ্দমার বিচার করেন। কুমিল্লার জজকে তিরস্কার করিয়া লিখিয়াছিলেন—"এরা হিন্দু অতএব তাঁহাদিগকে বিশ্বাস করা যায় না, আর এরা মুসলমান অতএব তাহাদের কথা বিশ্বাস করা যায়, এইরূপ মত যিনি পোষণ করেন, তিনি বিচারকের যোগ্য নন।"

গবর্নর এবং রাজপুরুষদিগের মনোভাব অবগত হইয়া পূর্ববাংলার প্রা: সর্বত্রই, যেখানে হিন্দু-মুসলমানেরা ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইয়া বাস করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে ঘোরতর বিরোধ আরম্ভ হইল।

পূর্ববাংলাকে পশ্চিমবাংলা হইতে পৃথক করা হইয়াছে কিন্তু বাঙালি পৃথক হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন করিবার জন্যই বরিশালে কনফারেন্স করার প্রস্তাব ধার্য করা হইল। হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার আবদুল রসুলকে সভাপতি করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। আবদুল রসুলের নিকট হিন্দু-মুসলমান পৃথক ছিল না। তিনি অতি সজ্জন ছিলেন।

পূর্ববাংলা গবর্নমেন্ট এই অনুজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন, "কেহ রাজপথে কিম্বা অপর কোন প্রকাশ্য স্থানে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলে সে দন্ডনীয় হইবে।" ইহার বিরুদ্ধে দেশময় তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ছোট ছোট বালক-বালিকারাও দন্ডের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া "বন্দেমাতরম্" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশেষতঃ কোন ইংরাজ দেখিলে তাঁহারা উচ্চৈঃস্বরে "বন্দেমাতরম্" বলিত। ইহাতে ইংরেজ রাজপুরুষগণ ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে বালক-বালিকারা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিলে ইংরেজ রাজপুরুষগণ তাঁহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবমান হইতেন। তাঁহারা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে করিতে অদৃশ্য হইয়া যাইত। ইংরেজদিগকে ক্ষেপাইবার নিমিত্ত অনেকেই "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিত।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ ও ১৫ এপ্রিল বরিশালের কনফারেন্সের দিন ধার্য হইয়াছিল। অশ্বিনীকুমার দত্ত ও ব্রজমোহন কলেজের সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি জেলার নানাস্থানে গমন করিয়া সকলকে স্বদেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত করেন। কনফারেন্সে যোগ দিবার জন্য বরিশাল জেলার নানাস্থান হইতে বহুসহস্র লোক বরিশাল শহরে আসিয়াছিলেন। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার নানাস্থান হইতে যুবক বৃদ্ধ উৎসাহের সহিত বরিশাল অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কনফারেন্সের কয়েকদিন পূর্বে ঢাকায় গিয়াছিলেন। কনফারেন্সের পূর্বদিন তিনি ঢাকা হইতে পূর্ববাংলার নেতৃস্থানীয় ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন প্রমুখ ব্যক্তিগণকে লইয়া সন্ধ্যার সময় বরিশালে পৌঁছেন। পথে স্টীমার স্টেশনে তাঁহাদের বিরাট অভ্যর্থনা হয়। ভূপেন্দ্রনাথ বসু, টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মিঃ হালিম গজনভী প্রভৃতি ও আমরা, সভাপতি মিঃ আবদুল রসুলের সহিত কলিকাতা হইতে যাত্রা করি।

ইহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্য শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র সেন, চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা প্রভৃতি বুকে

"বন্দেমাতরম্" অঙ্কিত ব্যাজ পরিয়া এবং মস্তকে স্বদেশিবস্ত্র ও অন্যান্য স্বদেশি দ্রব্যের মোট বহিয়া শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সে সকল দ্রব্য লগেজ করা হইল। কিন্তু স্টেশনের লোকেরা সেদিন রেলগাড়িতে তাহা পাঠাইয়া দিল না।

১৩ এপ্রিল প্রাতঃকালে স্টীমার খুলনা হইতে ছাড়িবার পর প্রথমে যে স্টেশনে থামিল, তথায় দেখিলাম বহু শত লোক সমবেত হইয়াছে। স্টীমার হইতে সকলে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি করিতে লাগিলেন। তীরস্থ লোকেরাও মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম্" বলিতে লাগিল। স্টীমার ঘাটে লাগিবামাত্রই তীর হইতে বহু লোক স্টীমারে আসিয়া আবদুল রসুল ও অন্যান্য যাত্রীদের অভ্যর্থনা করিলেন। ইহার পরে দেখা গেল, প্রত্যেক স্টেশনেই বহু লোক "বন্দেমাতরম্" বলিতে বলিতে স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে। অনেকে স্টীমারে আসিয়া যাত্রীদের অভিনন্দন করিতেছে ও অনেকে বরিশালে যাইবার জন্য স্টীমারে উঠিতেছে।

দ্বিপ্রহরের পর স্টীমার এক স্টেশনে পৌঁছিল। তথাকার বিশ্বাসেরা বরিশালের প্রসিদ্ধ জমিদার। তাঁহারা প্রায় তিনশত যাত্রীর আহারসামগ্রী লইয়া স্টীমারে আসিলেন এবং সকলকে পরিতোষপূর্বক আহার করাইলেন। স্টীমার যখন ঝালকাঠি বন্দরে উপস্থিত হইল তখনকার অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখিয়া যাত্রীগণও উৎসাহে প্রমত্ত হইলেন। বহুসহস্র লোক "বন্দেমাতরম্" পতাকা লইয়া এবং "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত গাহিয়া সকলের প্রাণ মুগ্ধ করিতেছিলেন। স্টীমারের যাত্রীগণও "বন্দেমাতরম্" সঙ্গীত করিয়া তীরস্থ লোকদিগকে প্রমত্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

সন্ধ্যার সময় স্টীমার বরিশাল পৌঁছিল। স্টীমারের যাত্রীগণ মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম" বলিতে লাগিলেন। তীরে বহু লোক যাত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য সমবেত হইয়াছিলেন; কিন্তু একজনের কণ্ঠ হইতেও "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উচ্চারিত হইল না, ইহাতে আমরা অবাক হইলাম। তখনও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতিকে লইয়া ঢাকার স্টীমার পৌঁছে নাই। বরিশালের একজন প্রধান লোক স্টীমারে আসিয়া আমাদিগকে এই সংবাদ দিলেন যে, বরিশালের ম্যাজিস্টেট জননায়কদিগকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া বলিয়াছেন—স্টীমার স্টেশনে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিয়া কাহাকেও অভ্যর্থনা করিতে পারিবে না, এইরূপ খত লিখিয়া দিতে হইবে। এইরূপ খত লিখিয়া না দিলে পাছে কনফারেন্স বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এই ভয়ে অশ্বিনীকুমার দত্ত, রজনীকান্ত দাস প্রভৃতি সেই খতে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন। সুতরাং বরিশালবাসী "বন্দেমাতরম" বলিতে পারিল না। আমরা বলিলাম—"বন্দেমাতরম" বলিতে পারিব না, এইরূপ সর্তে যে কনফারেন্স করা হইবে তাহাতে আমরা যোগদান করিতে পারিব না।"

অল্পক্ষণ পরেই ঢাকার স্টীমার আসিয়া পৌঁছিল। বরিশালের নায়কগণ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি নেতৃবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন, বরিশালের নেতৃবর্গ যে কথা দিয়াছিলেন তাহা পালন করাই কর্তব্য। আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম না। আমরা বলিলাম, "বরিশালবাসীর আতিথ্য স্বীকার করিব না, কনফারেন্সে যাইব না।" অনেকেই যাত্রীদের বাসের জন্য নির্দিষ্ট স্থানে গমন করিলেন, আমরা বরিশালের নেতাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া ব্রজমোহন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুহের বাসায় বিনা নিমন্ত্রণে অকস্মাৎ উপস্থিত হইলাম। আমাদের দলে অনেক লোক ছিলেন। রজনীবাবু আমাদের সমাদরে গ্রহণ করিলেন। তখন রাত্রি ৯টা। তিনি অতি যত্নের সহিত আহারসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আমাদিগকে ভোজন করাইলেন।

বরিশালের নেতৃবৃন্দ রাত্রিকালে আসিয়া আমাদিগকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলাম। আমরা ও 'অ্যান্টিসার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ কনফারেন্সে যোগদান করিব না শুনিয়া বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। পরদিন উষাকালে উক্ত সোসাইটির সভ্যগণ "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত করিয়া নগরের রাজপথ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

ইহার পরেই সংবাদ আসিল নেতৃবর্গ বরিশালের জমিদার শ্রীযুক্ত বিহারীলাল রায়ের বাটিতে

সমবেত হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে তথায় যাইতে বলিতেছেন। তথায় ইহা নির্ধারিত হইল যে বেলা দ্বিপ্রহরের পর কনফারেন্সের প্রতিনিধিগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলী নামক বিখ্যাত স্থানে সমবেত হইবেন। তথায় "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করা হইবে এবং তথা হইতে প্রতিনিধিগণ "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিতে করিতে ব্রজমোহন কলেজের সন্নিকটবর্তী কনফারেন্স-মণ্ডপে যাইবেন। আমরা তখন কনফারেন্সে যোগ দিতে সম্মত হইলাম।

দ্বিপ্রহরের পর আমরা রজনীবাবুর বাসা হইতে শ্রেণিবদ্ধ হইয়া রাজাবাহাদুরের হাবেলী নামক স্থানের অভিমুখে যাত্রা করিলাম। পথে বহুসংখ্যক পুলিস লইয়া ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প আমাদিগকে বাধা দিলেন এবং একখানি যষ্টি দিয়া ফণীভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে আঘাত করিলেন। ফণী ও শচীন্দ্রপ্রাসাদ বসু সর্বাগ্রে যাইতেছিলেন। রজনীকান্ত গুহ, হাবড়াহিতৈষী সম্পাদক গীষ্পতি রায় চৌধুরী ও আমি সকলের পশ্চাতে ছিলাম। তাঁহারা ও আমি দৌড়িয়া সম্মুখে গেলাম ও দেখিলাম ফণীর আঙ্গুল হইতে রক্ত পড়িতেছে। ফণী আমাদের হাতে সেই রক্ত লেপন করিয়া দিয়া বলিল, "প্রাচীনদিগকে ইহা নবীনের উপহার"। আমরা মিঃ কেম্পকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনি অকারেণ ফণীভূষণকে মারিলেন কেন?"

"আমি কাহাকেও মিছিল করিয়া যাইতে দিব না।"

আমি বলিলাম, "শ্রেণিবদ্ধ হইয়া না গেলে আপনারা বলিবেন, সাধারণের অসুবিধা করিয়া তোমরা যাইতেছ, তাই ইঁহারা শ্রেণিবদ্ধ হইয়া যাইতেছিলেন। ইঁহাদের গতিরোধ করা হইল কেন? আর এক জনকে বেত্রাঘাত করিলেন কেন?" কেম্প তদুত্তরে বলিলেন, "ইঁহারা ডেলিগেট নহেন, ইঁহাদিগকে যাইতে দিব না।" আমি বলিলাম, "ইঁহারা ডেলিগেট, ইঁহাদের অবশ্য যাইতে দিতে হইবে।" অবশেষে কেম্প বলিলেন, "তবে ইঁহারা যাইতে পারেন।"

অতঃপর 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রবেশ করিয়া "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত করিলেন। "বন্দেমাতরম" সঙ্গীত আরম্ভ করিবামাত্র প্রায় তিন সহস্র লোক মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। ইহার পর তাঁহারা "মাগো, যায় যেন জীবন চ'লে, জগত মাঝে তোমার কাজে, 'বন্দেমাতরম' বলে" এই সঙ্গীত করিলেন। ইহা শুনিয়া সমস্ত লোকের প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

বেলা ২।।০ টার সময় মিঃ আবদুল রসুল তাঁহার ইংরেজ সহধর্মিণীসহ রাজাবাহাদুরের হাবেলীতে প্রবেশ করিলেন। তখন এই নির্ধারণ হইল যে মিঃ রসুল পত্নীসহ সর্বাগ্রে শকটারোহণে মণ্ডপের অভিমুখে যাত্রা করিবেন। তাঁহার পশ্চাতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতবাজারের সম্পাদক মতিলাল ঘোষ ও ভূপেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহাদের পশ্চাতে তিন তিন জন প্রতিনিধি একসারি বাঁধিয়া অগ্রসর হইবেন। ইহাদের পশ্চাতে 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ মস্তকে উষ্ণীষ এবং বক্ষে "বন্দেমাতরম" অঙ্কিত ব্যাজ পরিয়া বহির্গত হইবেন। সর্বপশ্চাতে ঢাকার শ্রীযুক্ত আনন্দচন্দ্র রায়, ময়মনসিংহের অনাথবন্ধু গুহ ও ব্যারিষ্টার মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী অগ্রসর হইবেন।

আমরা বাহির হইয়া দেখিলাম পুলিস সুপারিন্টেন্ডেন্ট মিঃ কেম্প বহুসংখ্যক কনস্টেবল ও রিজার্ভ পুলিস সহ হাবেলীর দ্বারদেশে উপস্থিত হইয়াছেন। সহকারী সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অশ্বপৃষ্ঠে ইতস্তত ঘুরিতেছেন। বহুসংখ্যক ইনস্পেক্টর ও সাবইনস্পেক্টর রাস্তায় ও হাবেলীর প্রাঙ্গণে গমনাগমন করিতেছিলেন। হাবেলীর নিকটে ঢাকার নবাব সলিমুল্লার কাছারীবাটিতে অনেক বন্দুকধারী পুলিস অবস্থিতি করিতেছিল। পুলিসের সুবাদারের হাতে লাঠি ও কোমরে তরবারি বাঁধা ছিল।

প্রতিনিধিগণ পুলিসের সমরসজ্জা দেখিয়া উৎসাহের সহিত "বন্দেমাতরম" বলিয়া রাজপথে বহির্গত হইলেন। 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ রাজপথে বহির্গত হইবামাত্র একদল

পুলিস তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। আর একদল পুলিস অগ্রগামী প্রতিনিধিগণ হইতে 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভাদিগকে পৃথক করিয়া ফেলিল। 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভাগণ পুলিস কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত হইলেন। মিঃ কেম্প বলিলেন, "তোমাদের ব্যাজ্ খুলিয়া ফেল।" তাঁহারা "বন্দেমাতরম" অঙ্কিত ব্যাজ খুলিয়া ফেলিতে অস্বীকার করিলেন। কেম্প বলপূর্বক ব্যাজ কাড়িয়া লইবার উদ্যোগ করিলেন। সভ্যগণ হস্তদ্বারা ব্যাজ চাপিয়া ধরিয়া তাহা রক্ষা করিতে লাগিলেন।

ব্যাজ ছিনাইয়া লইতে অসমর্থ হইয়া পুলিস তাঁহাদিগকে প্রহার করিতে লাগিল। ইহারা মুহুর্মুহু "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইলেন। বহুসংখ্যক পুলিস আসিয়া ইঁহাদের ব্যাজ কাড়িয়া লইতে লাগিল। অবিশ্রান্ত লাঠির আঘাত খাইয়াও ইহারা ছত্রভঙ্গ হইলেন না। "বন্দেমাতরম" ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। পুলিসের লাঠির আঘাতে বহু সভ্য আহত হইলেন, তবু তাঁহাদের মুখে "বন্দোমাতরম" ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছিল।

চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাই নিদারুণ আঘাত পাইয়াছিল। পুলিস তাহাকে প্রহার করিতে করিতে পথের পার্শ্বস্থ এক পুষ্করিণীতে ফেলিয়া দিয়াছিল। পাছে সে মারা যায় এই ভয়ে একজন হিন্দুস্থানী পুলিস তাহাকে জল হইতে তুলিয়া তীরে রাখিয়া দিয়াছিল। 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যদিগকেই নিদারুণ আঘাত করা হইতেছে, এই সংবাদ পূর্বভাগে যে সকল প্রতিনিধি যাইতেছিলেন তাঁহারা কিছুই জানিতে পারিলেন না। যে সকল প্রতিনিধি পশ্চাতে আসিতেছিলেন পাছে তাঁহারা আসিয়া 'অ্যান্টি-সার্কুলার-সোসাইটি'র সভ্যদিগকে সাহায্য করেন এই আশঙ্কায় আর একদল পুলিস তাঁহাদিগকে হাবেলীর মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার নিমিত্ত তাঁহাদের উপরে লাঠি চালাইতে থাকে। ফটকের সম্মুখে কতগুলি স্ফটিকের ঝাড় ছিল। পুলিসের লাঠির আঘাতে সেগুলি চূর্ণ হইয়া গেল। আমি দেখিলাম হাবেলীর বাহিরে পুলিস বহু লোককে প্রহার করিতেছে। প্রতিনিধিদিগের কাহারও হস্তে লাঠি ছিল না। আমার হস্তে ছোট একটি ছাতা ছিল। আমি সেই ছাতা হাতে হাবেলী হইতে রাজপথে গমন্ করিলাম। আমার পশ্চাতে কৃষ্ণনগরের উকিলবাবু বেচারাম লাহিড়ি ছিলেন।

আমার উপর পুলিসের লাঠি পতিত হয় নাই কিন্তু একজন বাঙালি কনস্টেবল বেচারামবাবুকে এমন জোরে প্রহার করিল যে তিনি মাটিতে পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। আমি তখন সেই কনস্টেবলকে ধরিয়া মিঃ কেম্পের নিকট আনিলাম; তাঁহার নাম শশিভূষণ দে। কেম্প আমাকে বলিলেন, "হ্যাঁ, আমি ইহাকে মারিতে দেখিয়াছি, আমি ইহাকে কয়েদ করিলাম।"

ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী একজন সুগায়ক ছিলেন। তিনি যখন হাবেলীর সিংহদ্বার হইতে বাহির হইতেছিলেন তখন পুলিসের সুবাদারের আদেশে ব্রজেন্দ্রলালকে গুরুতর প্রহার করা হইয়াছিল। তাঁহার হাত ভাঙিয়া গিয়াছিল ও মস্তক ফাটিয়া রক্ত পড়িতেছিল। আমি তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া তাঁহার নিকট গমন করিলাম এবং সুবাদারকে ধাক্কা দিয়া দূরে সরাইয়া দিলাম। যে সকল কনস্টেবল ব্রজেন্দ্রলালকে প্রহার করিতেছিল তাহাদের বলিলাম, "তোমরা আমাদের ভাই, ভাইকে তোমরা মারিতেছে!" এই কথা শুনিয়া কনস্টেবলেরা তথা হইতে চলিয়া গেল।

মিঃ কেম্প ঘটনাস্থল হইতে একটু দূরে ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার হাত ধরিয়া ব্রজেন্দ্রলালের নিকট আনিলাম, আমি কেম্পকে বলিলাম, "পুলিস গুণ্ডার ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। তাঁহাদিগকে এখনই দূর করিয়া দাও।"

আনন্দচন্দ্র রায়, অনাথবন্ধু গুহ ও জে. চৌধুরী প্রতিনিধিদিগের পশ্চাতে ছিলেন, তাঁহারা সিংহদ্বারে আসিবামাত্র একজন কনস্টেবল যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মাথায় লাঠিদ্বারা আঘাত করিল। যদি যোগেশচন্দ্র চৌধুরীর মাথায় টুপি না থাকিত তবে নিশ্চয়ই সে আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইত। তখন রাজাবাহাদুরের হাবেলী হইতে মণ্ডপ পর্যন্ত সমস্ত রাস্তা প্রতিনিধি ও দর্শকে পরিপূর্ণ

হইয়াছিল। সিংহদ্বারের নিকট "বন্দেমাতরম" ধ্বনি হওয়া মাত্র পুলিসের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট অশ্বারোহণে দ্রুতবেগে সেই দিকে ধাবিত হইলেন। পুলিস দলও লাঠি উত্তোলন করিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। তখন তাঁহাদের পশ্চাদ্দিক হইতে গভীর নিনাদে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি হইল। পুলিশ আবার পশ্চাদ্দিকে দৌড়িতে লাগিল। সম্মুখে ও পশ্চাতে সর্বত্র "বন্দেমাতরম" ধ্বনি হইতেছিল। আমি যখন কেম্পকে টানিয়া ব্রজেন্দ্রলালের নিকট লইয়া যাইতেছিলাম, ললিতমোহন ঘোষাল উর্ধ্বশ্বাসে সম্মুখের দিকে যাইয়া সুরেন্দ্রবাবু, মতিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "পুলিসের নিদারুণ লাঠির আঘাতে বহু প্রতিনিধি রক্তাক্ত হইতেছে।"

সুরেন্দ্রবাবু, মতিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু ঘটনাস্থলে ফিরিয়া আসিয়া কেম্পকে দেখিতে পাইলেন। সুরেন্দ্রবাবু তাহাকে বলিলেন, "তুমি কি করিতেছ? যদি কেহ কোন বে-আইনী কাজ করিয়া থাকে তুমি গ্রেপ্তার করিতে পার, কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিবার অধিকার তোমার নাই। আমি সমস্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছি কিন্তু কাহাকেও প্রহার করিও না।" কেম্প বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে গ্রেপ্তার করিলাম।" মতিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমাদিগকেও গ্রেপ্তার কর।" কেম্প বলিলেন, "আর কাহাকেও গ্রেপ্তার করিবার হুকুম নাই।" একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া কেম্প সুরেন্দ্রবাবুসহ ম্যাজিস্ট্রেটের গৃহাভিমুখে যাইবার উদ্যোগ করিলেন।

এদিকে বাবু আনন্দচন্দ্র রায় ও অনাথবন্ধু গুহ এবং আমি আহত চিত্তরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা, ব্রজেন্দ্রলাল গাঙ্গুলী ও হেমচন্দ্র সেনকে লইয়া থানায় ডায়েরী করিতে গমন করিলাম। পুলিস কর্মচারী নির্দিষ্ট পুস্তকে ঘটনার বিবরণ লিখিল না। একখণ্ড বালির কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিল। অতঃপর ডাক্তারের দ্বারা আহতদের যথাযোগ্য চিকিৎসার পর তাঁহাদিগকে লইয়া সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলাম।

প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বেই বাবু মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা এক টেবিলের উপরে দক্ষিণে ব্রজেন্দ্র এবং বামে চিত্তরঞ্জনকে দাঁড় করাইয়া স্বয়ং তাহাদের মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান হইলেন। সে দৃশ্য দেখিয়া অনেক নরনারী ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। বহুসংখ্যক লোকের মুখে কি যে দৃঢ় সঙ্কল্প ফুটিয়া উঠিল তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। সভামণ্ডপ মহোচ্ছ্বাসে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, "মেঘনাদবধ কাব্যে পাঠ করিয়াছিলাম পুত্রশোককাতর রাবণ বীরবাহুর মৃতদেহ মৃত্তিকায় লুণ্ঠিত দেখিয়া বলিয়াছিলেন—

"যে শয্যায় আজ তুমি শুয়েছ কুমার,
প্রিয়তম, বীরকুল-সাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদলবল দলিয়া সমরে
জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে?
যে ডরে ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক্ তারে।"

"আজ আমার রক্তাক্ত পুত্র ও নিগৃহীত বালকদিগকে দেখিয়া আমার মুখ হইতে সেই কথাই বাহির হইতেছে।" মনোরঞ্জনবাবু বলিলেন, "আমার পুত্র সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া আছে, এই সংবাদ শুনিয়া যখন আমি তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম তখন চিত্তরঞ্জন আমাকে বলিয়াছিল—"বাবা, শেষ পর্যন্ত আমি "বন্দেমাতরম" বলিয়াছি। লাঠির আঘাতে মাথা ঘুরিতেছিল, আমি অচেতন হইয়া পড়িয়াছিলাম। পুষ্করিণী হইতে না তুলিলে আমার নিশ্চয়ই মৃত্যু হইত।" আমি পুত্রকে বলিয়াছিলাম, "বাবা, দেশের জন্য যদি তুমি মরিতে তবে আমার বিন্দুমাত্র দুঃখ হইত না।" এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখিয়া বহু যুবকের প্রাণে যে সঙ্কল্প জাগিয়া উঠিয়াছিল অল্পদিন পরেই তাহা প্রকটিত হইয়া উঠিল।

লাখুটিয়ার জমিদার ও সুরেন্দ্রবাবুর বেহাই এবং বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে এক গাড়িতে উঠিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ গাড়িতে যায়গা না থাকাতে পশ্চাতে দণ্ডায়মান

হইলেন। সুরেন্দ্রবাবু ধৃত হওয়ার পর ভূপেন্দ্রনাথ বসুকে বলিলেন, "আপনারা মণ্ডপে যাইয়া কার্য নির্বাহ করুন।"

মিঃ কেম্প সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতিকে লইয়া ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমার্সনের কুঠির বারান্দায় প্রবেশ করিলেন। দু এক মিনিট পরে মিঃ এমার্সন তাঁহাদিগকে ঘরের ভিতর যাইতে আদেশ করিলেন। পণ্ডিত কাব্যবিশারদ ধুতি ও চাদর পরিয়া গিয়াছিলেন, তাহাকে দেখিয়া এমার্সন ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন, "এখান হইতে বেরিয়ে যাও।" কাব্যবিশারদ বারান্দায় চলিয়া গেলেন। ম্যাজিস্ট্রেট কাহাকেও বসিতে বলিলেন না। বাবু বিহারীলাল রায় ও অশ্বিনীকুমার দত্ত দুইখানা চেয়ারে বসিলেন। সুরেন্দ্রবাবু একখানা জীর্ণ চেয়ারে বসিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন চীৎকার করিয়া বলিলেন, "তুমি কয়েদী, তুমি বসিতে পার না। তোমায় দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"আপনার গৃহে আমি অপমানিত হইতে আসি নাই। আশা করি আপনি ভদ্র ব্যবহার করিবেন।"

মিঃ এমার্সন অত্যন্ত রাগান্বিত হইয়া সুরেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার চার্জ গঠন করিয়া তাঁহাকে আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে বলিলেন। সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি কোন অপরাধ করি নাই। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য কিছু সময় চাই।" মিঃ এমার্সনের পাশে নোয়াখালির ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ লিজ বসিয়াছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রবাবুকে বলিলেন, "আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন, তবেই গোল মিটিয়া যাইবে।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন, "আমি কি করিয়াছি, যাহার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিব?"

ম্যাজিস্ট্রেট আদালত অবমাননার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর ২০০ শত টাকা জরিমানা করিলেন। অতঃপর পুলিসের অনুমতি না লইয়া মিছিল করা এবং গবর্নমেন্টের আদেশ অগ্রাহ্য করিয়া "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করায় তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করা হইল। গবর্নমেন্ট পক্ষে মিঃ কেম্পই একমাত্র সাক্ষী ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি কোন দোষ করি নাই।" তিনি মিঃ কেম্পকে জেরা এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য সময় চাহিলেন। সুরেন্দ্রবাবুর আবেদন অগ্রাহ্য হইল। ম্যাজিস্ট্রেট এমার্সন তাঁহার দুই শত টাকা জরিমানা করিলেন। মিঃ কেম্প জরিমানা আদায় করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে গেলেন। সুরেন্দ্রবাবু জরিমানার টাকা দিয়া সভামণ্ডপ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সুরেন্দ্রবাবু সভামণ্ডপে উপনীত হইবার পূর্বেই তাঁহার নির্দেশ অনুসারে কনফারেন্সের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল। প্রথম প্রস্তাব উপস্থিত করিবার পূর্বেই ভূপেন্দ্রনাথ বসু সভাপতি নির্বাচনের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, "আজ যে ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহাতে মনে হয়, আজ ভারতে ইংরেজ শাসন শেষ হইল।" সে বক্তৃতা শুনিয়া নরনারী সকলের প্রাণ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। সহস্র কণ্ঠ হইতে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উত্থিত হইল। বাবু মতিলাল ঘোষ সেই প্রস্তাব সমর্থন করেন এবং সুরেন্দ্রবাবু তাঁহার অনুমোদন করেন। মিঃ রসুল সভাপতির আসনে উপবিষ্ট হইলেন কিন্তু অসুস্থতার জন্য তাঁহার সমগ্র অভিভাষণ পাঠ করিতে পারিলেন না। শেষাংশ মিঃ আবদুল হালিম গজনবী পাঠ করিয়াছিলেন।

অশ্বিনীকুমার দত্ত অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি ছিলেন, কিন্তু তিনি সুরেন্দ্রবাবুর সহিত ম্যাজিস্ট্রেটের কুঠিতে যাওয়াতে, কনফারেন্সের সহকারী সম্পাদক উকিল নিবারণচন্দ্র দাস অশ্বিনীবাবুর লিখিত অভিভাষণ পাঠ করিয়াছিলেন।

এই সময়ে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নরনারী সকলে যুগপৎ দণ্ডায়মান হইয়া বন্দেমাতরম ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সে ধ্বনি সাগরের গর্জনের ন্যায় শহরময় শুনা গিয়াছিল।

অতঃপর মতিলাল ঘোষ এই প্রস্তাব উপস্থিত করেন—

"যেহেতু আজ দিবালোকে সাধারণের সম্মুখে ডিস্ট্রিক্ট ও এসিষ্টান্ট পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্টের আদেশে সভাপতির অভ্যর্থনার জন্য সমবেত বহু প্রতিনিধিদিগকে পুলিস অবৈধভাবে লাঠির দ্বারা প্রহার করিয়াছে এবং দেশের নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে অকারণে কয়েদ করিয়াছে, তাহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে বরিশালে বৈধশাসন প্রণালী লুপ্ত হইয়াছে।"

"যেহেতু পূর্ববাংলা ও আসামের বহুলোক স্বদেশ সেবা করাতে প্রহৃত ও নিগৃহীত হইয়াছে তজ্জন্য এই সভা ঘোষণা করিতেছেন, এ দেশে আর আইনসঙ্গত শাসনপ্রণালী প্রচলিত নাই। সুতরাং আত্মশক্তির উপরে যে সকল কার্য নির্ভর করে বর্তমান কনফারেন্স সেই সকল কার্যের বিষয় আলোচনা করিবেন। বর্তমান দায়িত্বশূন্য গবর্নমেন্টের উপর যে সকল কার্য নির্ভর করে এই কনফারেন্স তাঁহার আলোচনা করিবেন না।"

সেদিন সভামধ্যে এমন উত্তেজনা হইয়াছিল যে সভার কার্য শীঘ্রই শেষ করিতে হইল।

'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ কলিকাতা হইতে যে সকল স্বদেশি দ্রব্য আনিয়াছিলেন তাহা ব্রজমোহন স্কুলের এক কক্ষে প্রদর্শনের আয়োজন করা হইয়াছিল। সভাভঙ্গের পর বহুলোক সে সকল দ্রব্য দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। পাছে বহু স্বদেশি দ্রব্য বিক্রয় হয়, কোন স্বদেশের শত্রু প্রচার করিয়া দিলেন—'এখানে অস্ত্র লুক্কায়িত আছে পুলিস তাহা ধরিবার জন্য আসিতেছে।' ইহা শুনিয়া দর্শকগণ তাড়াতাড়ি সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু 'অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র সভ্যগণ জানিতেন আইনভঙ্গ না করাই সমিতির এক প্রধান মত। তাঁহারা কোন অস্ত্র রাখেন না, সুতরাং তাঁহাদের ভয়ের কোন কারণ নাই। রাজপথে ও সভামণ্ডপে সহস্র লোক "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিয়াছে সুতরাং উক্ত সোসাইটির সভ্যদের কনফারেন্সের আতিথ্য গ্রহণ করিতে আর কোন আপত্তি ছিল না। সেদিন হইতে তাঁহারা কনফারেন্স হইতে প্রেরিত খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেছিল।

১৫ এপ্রিল প্রাতে ১১টার সময় কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। সেদিন প্রাতঃকাল হইতে এই জনরব হইয়াছিল যে রাস্তায় "বন্দেমাতরম" বলিলেই পুলিস গুলি চালাইবে। দ্বিতীয় দিন প্রথম দিন অপেক্ষা অধিকতর লোক সমাগত হইয়াছিল। প্রথম দিবস প্রায় দুইশত নারী উপস্থিত ছিলেন, দ্বিতীয় দিন প্রায় পাঁচশত নারী উপস্থিত হন। কবির বাক্য অতি সত্য—"বাঁধন যত শক্ত হবে, ততই বাঁধন টুটবে"।

"বন্দেমাতরম" সঙ্গীত আরম্ভ হইবামাত্র সভার সমস্ত লোক অবনত মস্তকে দণ্ডায়মান হইলেন। অতঃপর "মাগো, যায় যেন জীবন চলে, শুধু তোমার কাজে জগৎ মাঝে, বন্দেমাতরম বলে" সঙ্গীত শুনিবামাত্র সমস্ত লোক দেশের জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সভাস্থল নীরব হইলে অশ্বিনীকুমার দত্ত প্রস্তাব করিলেন—"গত কল্য যে স্থানে যুবকদের রক্তপাত হইয়াছে এবং সুরেন্দ্রবাবু বন্দি হইয়াছিলেন, সে স্থানে এক স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করা হউক।" উপস্থিত লোকদের সঙ্গে বেশি টাকা ছিল না তবুও অনেক টাকা সংগ্রহ হইল। অনেকে হাতের সোনার অঙ্গুরীয় খুলিয়া দিলেন। শ্রীমতী সরোজিনী বসুর হাতের সোনার বালা খুলিয়া দিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যত দিন 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি রহিত করিবার আদেশ প্রত্যাহৃত না হইবে ততদিন আমি হস্তে বালা পরিব না।" ইহাতে সভামধ্যে তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল।

ফরিদপুরের কামিনীকুমার মুখোপাধ্যায়, কুমিল্লার রজনীনাথ নন্দী, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, 'শ্রীহট্ট ক্রনিকেলে'র সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশীমোহন সিংহ, খুলনার ইন্দুভূষণ মজুমদার, বর্ধমানের মৌলবী আবুল হোসেন, কৃষ্ণনগরের বেচারাম লাহিড়ি, হুগলীর মথুরানাথ গাঙ্গুলী, চব্বিশ পরগণার ডাঃ গফুরের প্রস্তাবে ও অনুমোদনে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ নিবারণের প্রস্তাব গৃহীত হইল।

টাকির জমিদার রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উপস্থিত

করিলেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, ব্রজসুন্দর রায়, সুরেন্দ্রনাথ সেন, মৌলবী হেদায়েত বক্স সে প্রস্তাব সমর্থন করেন। অতঃপর ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরী দেবী এক লক্ষ, সুরেন্দ্রনাথ চৌধুরী তিন হাজার, অনাথবন্ধু গুহ দুই হাজার, সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু পাঁচ শত টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। সভাপতি মিঃ রসুল বিলাতি দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব উপস্থিত করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মৌলবী আবদুল হোসেন, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু ও কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ এই প্রস্তাব সমর্থন করেন।

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ যখন বক্তৃতা করিতেছিলেন তখন মিঃ কেম্প বহু অস্ত্রধারী পুলিসসহ মণ্ডপ দ্বারে উপস্থিত হন। তিনি সভায় প্রবেশ করিবার চেষ্টা করাতে দ্বারদেশস্থিত ভলান্টিয়ার তাঁহাকে বলে, "আমাদের কাপ্তেনের অনুমতি ভিন্ন কাহাকেও বিনা টিকিটে ভিতরে যাইতে দিতে পারিব না।" মিঃ কেম্প তখন একখানি পত্র লিখিয়া বাবু অশ্বিনীকুমার দত্ত ও কনফারেন্সের সম্পাদক বাবু রজনীকান্ত দাসকে বাহিরে আসিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। মিঃ কেম্প তাঁহাদের হস্তে ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ এমার্সনের স্বাক্ষরযুক্ত আদেশলিপি প্রদান করিলেন। সে আদেশের মর্ম এই— "কনফারেন্স-মণ্ডপে আপনারা অবৈধ কার্য করিতেছেন এবং নিষেধ সত্ত্বেও রাস্তায় অবৈধ মিছিল করিতেছেন, অতএব আমি এই আদেশ করিতেছি, আপনারা মণ্ডপেতে সভা করিতে এবং রাস্তায় সমবেত হইতে পারিবেন না। রাজা বাহাদুরের হাবেলীতেও কেহ একত্র হইতে পারিবেন না।"

অশ্বিনীবাবু এই হুকুম লইয়া সভাপতির নিকটে গমন করিলেন। ঐ আদেশ পালন করা হইবে কি না এতদ্‌সম্বন্ধে মন্ত্রণা আরম্ভ হইল। বিপিনচন্দ্র পাল বলিলেন—"ম্যাজিস্ট্রেটের নিষেধাজ্ঞা আমাদের পালন করা উচিত।" আমি বলিলাম—"কিছুতেই আমাদের সভাভঙ্গ করা কিংবা পুলিস গুলি চালাইলেও কাহারও এ স্থান ত্যাগ করা উচিত নয়।" সর্বসম্মতিক্রমে ইহা ধার্য হইল—"ম্যাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ কেহ পালন করিবে না। মিঃ কেম্প বলপূর্বক সভাভঙ্গ না করিলে আমরা এ সভা ভঙ্গ করিব না।"

মিঃ কেম্প এই সময়ে সভাপতির নিকট আসিয়া কিছু বলিবার অনুমতি চাহিলেন। মিঃ কেম্প সভাস্থ লোকদিগের ভয়ঙ্কর উত্তেজনা দেখিয়া কাঁপিতেছিলেন। তিনি সুরেন্দ্রবাবুর নিকটে যাইয়া বলিলেন—"আপনার সম্মুখে বোধহয় আমার কোন বিপদ হইবে না।" কেম্প দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "সভাভঙ্গের পর রাস্তায় কেহ "বন্দেমাতরম" বলিবে না, আপনারা যদি এইরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন তবেই সভার কার্য নির্বাহ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে।" সভাপতি ও অপর সকলে সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিলেন। তখন কেম্প বলিলেন, "আচ্ছা, রাস্তায় কেহ "বন্দেমাতরম' ধ্বনি করিতে পারিবে না, সভাপতি সকলকে এইরূপ অনুরোধ করুন।" সভাপতি সেরূপ অনুরোধ করিতে সম্মত হইলেন না। তখন কেম্প বলিলেন, "বলপূর্বক সভাভঙ্গ করিতে হইবে।" নেতৃবৃন্দ তখন সভাগৃহ ত্যাগ করাই কর্তব্য মনে করিলেন।

মিঃ যোগেশচন্দ্র চৌধুরী দণ্ডায়মান হইয়া বলিলেন, "এই কনফারেন্স ভাঙিল বটে, গ্রামে গ্রামে যাও, বিলাতি জিনিস নির্বাসন করিয়া স্বদেশি দ্রব্য নির্মাণ কর। আজ আমাদের আনন্দের দিন, যেদিন বিলাতি বর্জনের লাঠি ইংরেজদের পৃষ্ঠে পড়িবে সেদিন এ অপমানের প্রতিশোধ হইবে।" সকলেই সভা পরিত্যাগ করিলেন। এ অপমান সহ্য করা অপেক্ষা মৃত্যু ভাল, ইহা মনে করিয়া আমি বসিয়া রহিলাম। সুরেন্দ্রবাবু আসিয়া আমাকে সভা ত্যাগ করিতে বলিলেন; আমি নীরবে বসিয়া রহিলাম। সুরেন্দ্রবাবু এতদ্‌সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থ Nation in Making এ লিখিয়াছেন—

All left, save and except one and one alone. That was Mr. Krishna Kumar Mitra, Editor of The Sanjibani, to whom I have had occasion to refer more than once in these

pages. Like the senators of old when Bremmus was entering Rome with his barbarian horde, he remained in his seat and would not move.

Determination was painted upon his features, his face was red with indignation. He was prepared to face the consequences of the disobedience of authority. We argued, prayed and protested, and it was with the utmost difficulty that we persuaded him at last to leave the pandal.

তাৎপর্য :—একজন, মাত্র একজন ব্যতীত সকলেই চলিয়া গেলেন। তিনি সঞ্জীবনী'র সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্র, যাঁহার বিষয়ে এই পুস্তকে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি। ব্রেমাস্ তাঁহার বর্বর সেনাদল লইয়া রোম নগরীতে প্রবেশের সময়ে প্রাচীন সেনেটারদের ন্যায় তিনি স্থানত্যাগ না করিয়া স্বীয় আসনে অটল রহিলেন।

তাঁহার সর্বাঙ্গে দৃঢ়প্রতিজ্ঞার চিহ্ন সুস্পষ্ট এবং তাঁহার মুখমণ্ডল উত্তেজনায় রক্তিম। শাসকদের অমান্য করার ফল বহন করিতে তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। আমরা তর্কবিতর্ক করিলাম, অনুনয় ও প্রতিবাদ করিলাম; এবং শষ পর্যন্ত অতি কষ্টে তাঁহাকে মণ্ডপ ত্যাগ করিতে সম্মত করাইতে পারিলাম।

আমি বলিলাম, "আজ এই স্থানে প্রাণে দিব কিন্তু এই স্থান পরিত্যাগ করিব না, আপনারা সকলে প্রস্থান করুন।" অনাথবাবু আমার হাত ধরিয়া টানিতে লাগিলেন। তখন আমার মনে হইল আমি যেন একমাত্র সাহসী পুরুষ। এই ভাব মনে উদয় হওয়ামাত্র আপনাকে অবনত করিয়া অনাথবাবু সহিত বাহিরে চলিয়া গেলাম।

সভা ভাঙ্গিয়া গেল বটে, কিন্তু ইহার ফল অতি ভীষণ হইল। দেশময় ইহার প্রতিশোধ লইবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। আমরা আইনানুগত আন্দোলনের পক্ষাপাতী ছিলাম কিন্তু বহুসংখ্যক লোক অরাজকতা দ্বারা দেশকে স্বাধীন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

ম্যাজিস্ট্রেট রাস্তায় "বন্দেমাতরম" ধ্বনি নিষেধ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বহু সহস্র লোক সশস্ত্র পুলিসের সম্মুখে প্রাণ ভরিয়া "বন্দেমাতরম" বলিয়াছিল। পুলিস সেদিন আর লাঠি চালাইতে সাহস করে নাই।

পরদিন অধিকাংশ প্রতিনিধি বরিশাল হইতে প্রস্থান করিলেন। সেদিন সাহিত্য সম্মিলন হইবে এবং কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন এইরূপ বিজ্ঞাপন প্রচারিত হইয়াছিল; কিন্তু উহার প্রতি আর কাহারও মন গেল না। কি করিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিত করা যাইবে এবং বিলাতি দ্রব্য বর্জন করিয়া স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার করা হইবে সেই ভাবেই সকলের মন প্রাণ ভরপুর হইয়াছিল। রবিবাবু ও ভূপেন্দ্রবাবু প্রভৃতি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ঐ দিন বরিশালের আট মাইল দূরবর্তী রহমতপুরের চক্রবর্তী জমিদারগণ বিলাতিবর্জন, বঙ্গভঙ্গ নিবারণ সম্বন্ধে এক সভার আয়োজন করিয়াছিলেন। সুরেন্দ্রবাবু, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ, মৌলবী আবুল হোসেন সেখানে গমন করিয়া বিলাতিদ্রব্য বর্জন করিতে সকলকে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। চক্রবর্তী জমিদারগণ নিষ্ঠবান হিন্দু, তবু স্বদেশি আন্দোলন তাঁহাদিগকে এমন উদার করিয়াছিল যে তাঁহারা আমাদের সঙ্গে এক পংক্তিতে বসিয়া আহার করিয়াছিলেন। এদিকে বরিশালে রাষ্ট্র হইয়াছিল রহমতপুরের সভা ভাঙিবার জন্য বহুসংখ্যক সশস্ত্র পুলিস ঘোড়ার গাড়ি করিয়া সেই গ্রামে গিয়াছে। ইহা শুনিয়া বিহারীলাল রায় অতি ত্বরায় রহমতপুরের দিকে যাত্রা করিয়াছিলেন। রহমতপুরের সভাভঙ্গের পর পুলিস উপস্থিত হইয়াছিল, সুতরাং তথায় কোন গোলযোগ হয় নাই। ফিরিবার সময় পথে বিহারীবাবুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। তিনি আমাদিগকে তাঁহার লাখুটিয়ার বাড়িতে লইয়া যান।

লাখুটিয়া এক সময়ে ব্রাহ্মধর্ম আন্দোলনের একটি কেন্দ্র ছিল। বিহারীবাবু ভ্রাতা রাখালচন্দ্র রায়চৌধুরি ও তাঁহার পত্নী সৌদামিনী দেবী ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। সৌদামিনী দেবী খুব ভাল গান করিতে পারিতেন। তিনি কখনও কখনও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে সঙ্গীত করিয়া শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করিতেন।

১৭ এপ্রিল আমরা বরিশাল ত্যাগ করিলাম। বরিশাল হইতে খুলনা পর্যন্ত যত স্টীমার স্টেশন ছিল সর্বস্থানেই গভীর গর্জনে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি করিতে করিতে নানা শ্রেণীর লোক সুরেন্দ্রবাবুকে দেখিতে আসিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু সকল স্থানেই বক্তৃতা করিয়া সমবেত লোকদিগকে বঙ্গভঙ্গ নিবারণের জন্য দৃঢ়সংকল্প হইতে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। বক্তৃতা করিতে করিতে তাঁহার গলা ভাঙিয়া গিয়াছিল। ১৮ এপ্রিল প্রত্যুষে আমরা শিয়ালদহ পৌঁছিলাম।

বরিশালের ঘটনার সংবাদ শুনিয়া কলিকাতার লোক এমন উত্তেজিত হইয়াছিল যে প্রায় দশ হাজার লোক রাত্রি তিনটার সময়ে কলেজ স্কোয়ারে সমবেত হইয়া চারিটার পর শিয়ালদহ অভিমুখে যাত্রা করেন। ট্রেন শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত হইবামাত্র সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটি'র যুবকগণ এবং আমি ট্রেন হইতে নামিলাম। অমনি দশসহস্র কণ্ঠ হইতে "বন্দেমাতরম" ধ্বনি উত্থিত হইল। অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির সভ্যগণ স্বদেশি দ্রব্যসমূহ মস্তকে বহন করিয়া, "মাগো, যায় যাবে জীবন চলে, জগৎ মাঝে, তোমার কাজে, বন্দেমাতরম বলে",—গাহিতে গাহিতে স্টেশন হইতে বহির্গত হইলেন। তখন অভূতপূর্ব উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু প্রভৃতি যে গাড়িতে আরোহণ করিয়াছিলেন, বহুসংখ্যক যুবক তাঁহার ঘোড়া খুলিয়া দিয়া কলেজ স্কোয়ারে নিজেরা টানিয়া আনিল।

ব্যারিষ্টার মিঃ আশুতোষ চৌধুরী কলেজ স্কোয়ারের সভায় প্রতিনিধিদের অভ্যর্থনা করেন। তিনি অতি ধীর স্থির ব্যক্তি ছিলেন। বরিশালের ঘটনা তাঁহার মত লোককেও অত্যন্ত উত্তেজিত করিয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতার পর সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিয়া বঙ্গবঙ্গ খণ্ডন ও স্বদেশিব্রত গ্রহণ করিতে সকলকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করেন। মৌলবি মজিবর রহমান ও মৌলবি লিয়াকত হোসেন বরিশালের ব্যাপারে ঘৃণা প্রকাশ করিয়া তীব্র বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

অতঃপর অ্যান্টি-সার্কুলার সোসাইটির ৪নং কলেজ স্কোয়ার কার্যালয়ের সম্মুখে এক সভা হয়, তাহাতে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, গীষ্পতি কাব্যতীর্থ ও আমি বক্তৃতা করি। সমবেত জনসমুদ্র বরিশালের ঘটনার আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত শুনিবার জন্য ব্যগ্র হওয়াতে আমরা তাহা বিশদভাবে বর্ণন করিলাম।

বিপ্লবের সূচনা

বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেটের অবৈধ আদেশ, পুলিসের অমানুষিক অত্যাচার বাংলাদেশে দুই দল লোকের সৃষ্টি করিল। নিগ্রহ ও লাঞ্ছনা সত্ত্বেও একদল লোক আইনসঙ্গত আন্দোলন করিয়া স্বদেশে যে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা করা যায় এই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। আর **একদল লোক ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে হত্যা না করিলে ভারতবর্ষকে স্বাধীন করা যাইবে না এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন**। যাঁহারা আইনসঙ্গত আন্দোলনের পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা বরিশালের অত্যাচারের বিরুদ্ধে রায় পশুপতিনাথ বসুর বাটিতে এক বিরাট সভা করেন। রায় বাহাদুর নরেন্দ্রনাথ সেন সেই সভার সভাপতি হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন—"বরিশালের ঘটনার মত ঘটনা ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে আর কখনও দেখা যায় না। সংবাদপত্র ও সভা দ্বারাই জনসাধারণের অসন্তোষ প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্র ও সভা বন্ধ করিলে বিপ্লব স্বভাবতঃই আবির্ভূত হয়।" তাঁহার উক্তি যে সত্য তাহা অচিরেই প্রকাশিত হইল।

বরিশাল কনফারেন্সের অব্যবহিত পরে দুইজন অপরিচিত যুবক সুরেন্দ্রবাবুর সহিত তাঁহার ব্যারাকপুরের বাটিতে দেখা করিতে যাইয়া বলিয়াছিলেন—"আমরা ব্যামফীল্ড ফুলারকে হত্যা করিবার জন্য আজ রাত্রেই যাত্রা করিব।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ইহার ফল অতি মন্দ হইবে। আমরা যে উপায়ে বঙ্গভূমিকে অখণ্ড করিতে চেষ্টা করিতেছি সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে।" তাঁহার

উত্তরে তাঁহারা বলিল—"বানরীপাড়ার স্ত্রীলোকদিগকে গুর্খারা লাঞ্ছিত করিয়াছে, আমরা তাঁহার প্রতিশোধ লইব।" সুরেন্দ্রবাবু বলিলেন—"ব্যামফীল্ড ফুলার পদত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন।" তখন যুবকদ্বয় শান্ত হইল। তাঁহারা বলিল—"আমাদের কয়েকজন লোক ফুলারকে হত্যা করিতে গিয়াছে, তাঁহাদিগকে তবে ফিরাইয়া আনা দরকার। আমাদের সঙ্গে টাকা নাই, আপনি আমাদের রেলভাড়া দিন।" ইহারা আসামে যাইয়া আততায়ীদিগকে ফিরাইয়া আনিয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে যে টাকা দিয়াছিলেন, তাঁহারা মনিঅর্ডারে তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিল।

ইহার কিয়দ্দিন পরে বাংলার গবর্নর স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজার যে ট্রেনে যাইতেছিলেন, সেই ট্রেন মেদিনীপুরের অন্তর্গত নারায়ণগড় স্টেশনে ধ্বংস করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। কয়েকখানা গাড়ি ভাঙিয়াছিল কিন্তু স্যার এণ্ড্রু ফেজার রক্ষা পাইয়াছিলেন। পুলিস এই ঘটনার অনুসন্ধান করিয়া এই রিপোর্ট দিয়াছিল যে রেলওয়ের কতকগুলি কুলি কর্তৃপক্ষের কার্যে অসন্তুষ্ট হইয়া রেল ভাঙিবার চেষ্টা করিয়াছিল। আদালতের বিচারে কয়েকজন কুলি সাজা পাইয়াছিল। কয়েকজন বিপ্লবীর স্বীকারোক্তিতে পরে ইহা প্রকাশ পায় যে, তাঁহারাই স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যা করিবার জন্য রেলগাড়ি ভাঙিয়াছিল।

এস্থলে আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। স্যার ফ্রেজার একদিন কলেজ স্ট্রীটে খ্রীষ্টান যুবকদিগের সমিতিতে বক্তৃতা করিতে গিয়াছিলেন। যতীন্দ্রনাথ রায় নামক বারাসতনিবাসী এক যুবক তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য প্রকাশ্য সভামধ্যে তাঁহাকে রিভলভার দ্বারা বধ করিবার চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু রিভলভার হইতে গুলি বাহির হইল না। সে আবার গুলি করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, এমন সময় বর্ধমানের মহারাজা তাহাকে ধরিয়া ফেলেন।

নারায়ণগড়ে যে সময়ে স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেন ধ্বংস করিবার চেষ্টা হইয়াছিল, সেই সময়ে মেদিনীপুরে জেলা-কনফারেন্সের আয়োজন হইয়াছিল। ব্যারিস্টার মিঃ পি. কে. দত্ত তাঁহার সভাপতি ছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ আমরা বহুলোক কলিকাতা হইতে তদুপলক্ষে মেদিনীপুর গিয়াছিলাম।

সভা হইবার পূর্বে আমি শুনিয়াছিলাম কোন এক বাড়িতে গুপ্তসভা হইতেছে। কোন্ বাড়িতে সে সভা হইয়াছিল তাহা এখন মনে নাই। আমি সেই গুপ্তসভায় উপস্থিত হইবামাত্র যুবকগণ যে পরামর্শ করিতেছিল তাহা বন্ধ হইয়া গেল। আমি তাঁহাদিগকে আইনসঙ্গত উপায়ে স্বদেশের সেবায় প্রবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলাম। তাঁহারা আমার কথার কোন প্রতিবাদ করিল না, কিন্তু ইহা বুঝিতে পারিলাম, তাঁহারা যে জন্য মিলিত হইয়াছিল আমি তথায় উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের সে কার্যে বাধা পড়িল। আমি তথা হইতে চলিয়া আসিলাম। এখন মনে হয় ইহারা কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল।

মেদিনীপুর জেলা-কনফারেন্সের সভা আরম্ভ হইলে পর দেখা গেল কয়েকটি যুবক কনফারেন্স ভাঙিবার জন্য খুব উৎপাত করিতেছে। মিঃ কে. বি. দত্ত ও সুরেন্দ্রবাবু তাঁহাদিগকে থামাইবার চেষ্টা করিলেন। অবশেষে তাঁহারা নীরব হইলে সভার কার্য আরম্ভ হয়। আমি বক্তৃতা করিবার সময় বলিয়াছিলাম—"বৈধ উপায়ে দেশের কল্যাণ করা সম্ভব, না অবৈধ উপায়ে করা সম্ভব?" একটি যুবক বলিল—"রাজদ্রোহের দ্বারা সম্ভব।" তখন ইহা স্পষ্ট বুঝিলাম, মেদিনীপুরে একদল রাজদ্রোহীর আবির্ভাব হইয়াছে। সভাস্থলে যে তর্কবিতর্ক হইয়াছিল তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল যে, বাংলা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনে দুই দলের আবির্ভাব হইয়াছে—এক দল ধীরপন্থী, অপর দল উগ্রপন্থী।

ইহার কিয়দ্দিন পরে ১৯০৭ সালে ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের সময় সুরাটে কংগ্রেসের আয়োজন হয়। সে বৎসর নাগপুরে কংগ্রেস হইবার কথা ছিল; কিন্তু তথায় উগ্রপন্থী দলের

প্রাবল্য হওয়াতে সুরাটে কংগ্রেস করা ধার্য হয়। কলিকাতা হইতে আমরা বহুলোক সুরাট যাত্রা করি, পথে জব্বলপুর প্রভৃতি নানাস্থান হইতে বহুলোক সেই ট্রেনে সুরাট যাইবার জন্য আরোহণ করে। তাহাদের অধিকাংশই ইংরেজী জানে না। তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া অবগত হইলাম, ইহারা বালগঙ্গাধর তিলকের সমর্থনকারীগণ কর্তৃক সুরাট নীত হইতেছে। আরও অবগত হইলাম, ইহারা মিঃ তিলককে সভাপতি করিবার জন্য সুরাট যাইতেছে।

সে বৎসর ডঃ রাসবিহারী ঘোষের সভাপতি হইবার কথা ছিল। আমরা বলিলাম "এ বৎসর যে রাসবিহারী ঘোষ সভাপতি হইবেন। রাসবিহারী ঘোষের নাম শুনিয়াছ?" তাঁহারা বলিল—"না, আমাদিগকে তিলকের জন্য ভোট দিতে পাঠাইয়াছে, আমরা আর কাহাকেও ভোট দিব না।"

নির্দিষ্ট দিনে কংগ্রেসের অধিবেশন আরম্ভ হইল। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতি করিবার জন্য প্রস্তাব করিলেন। তখন একজন লোক কি সঙ্কেত করিল, আর অমনই অনেক লোকে চীৎকার করিতে করিতে সভাপতির আসনের দিকে অগ্রসর হইল; চেয়ার ছুঁড়িতে লাগিল, লাঠি ছুঁড়িতে লাগিল, জুতা ছুঁড়িতে লাগিল। একখানি প্রকাণ্ড মারহাট্টি চটি সুরেন্দ্রবাবুর দিকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সুরেন্দ্রবাবু তিলক-দলের কীর্তিচিহ্নস্বরূপ তাহা সযত্নে কুড়াইয়া লইয়া কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। অল্পসংখ্যক লাঠিধারী সবলকায় লোক বহু সংখ্যক লোকের মতের বিরুদ্ধে চীৎকার করিয়া ও প্রহার করিয়া সভা ভাঙিয়া দিল।

মেদিনীপুরে সর্বপ্রথমে অল্পসংখ্যক লোকের দ্বারা বহুসংখ্যক লোকের সমর্থিত সভা ভঙ্গের চেষ্টা হইয়াছিল। সুরাটে অল্পসংখ্যক লোকের চেষ্টা সফল হইয়াছিল। অতঃপর ভারতের নানা স্থানে অল্পসংখ্যক লোক চীৎকার করিয়া, অশ্রাব্য গালি দিয়া এবং প্রহার করিয়া সভা ভঙ্গ করে।

কংগ্রেস ভঙ্গের পর মণ্ডপের সংলগ্ন এক চন্দ্রাতপতলে ভারতের নানা প্রদেশের প্রতিনিধিগণ এক সভা করিলেন। সেই সভায় কংগ্রেসের নিয়মাবলী প্রণীত হইল। তাঁহার প্রধান নিয়মগুলি এই—ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষে স্বায়ত্তশাসন স্থাপন করাই কংগ্রেসের উদ্দেশ্য এবং বৈধ উপায়ে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইবে। দ্বিতীয় নিয়ম এই—যাহারা কংগ্রেসের সভ্য হইতে ইচ্ছুক তাঁহাদের এই নিয়ম পালন করিতে হইবে। ১৯০৮ হইতে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এই নিয়ম অনুসারে কংগ্রেসের কার্য চলিয়াছিল।

১৯১৬ সালের কংগ্রেসে বাবু অম্বিকাচরণ মজুমদার সভাপতি হইয়াছিলেন। সেই কংগ্রেসে সমস্ত দল আবার একত্র হন এবং হিন্দুমুসলমানের মধ্যে সন্ধি হয়। এই সন্ধি অনুসারে হিন্দু-মুসলমানকে ব্যবস্থাপক সভায় পৃথক নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং কোন্ প্রদেশে কতজন মুসলমান সভ্য হইবেন তাহা নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। **এই সন্ধি দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের আপাততঃ ঐক্য স্থাপন হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা দ্বারা যে অনৈক্যের বীজ বপিত হইয়াছিল তাহা ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে হিংসা ও বিদ্বেষ প্রবল করিয়া তুলিয়াছে।**

১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট টাউনহলে এক সভা হয়; তাহাতে এই সঙ্কল্প করা হয় যতদিন বঙ্গভঙ্গ রহিত না হইবে ততদিন বিলাতিপণ্য কেহ ব্যবহার করিবে না। বাংলা দেশের সমস্ত লোককে এই সঙ্কল্পে দৃঢ় রাখিবার জন্য কলিকাতা হইতে বহুলোক বাংলার সর্বত্র গমন করিয়া স্বদেশি আন্দোলন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। অন্যান্য লোকের সঙ্গে আমিও বাংলার নানা জেলায় এবং বিশেষতঃ পশ্চিম বাংলার বহু গ্রামে গমন করিয়া সকলকে স্বদেশিব্রত অবলম্বন করিতে উৎসাহিত করিয়াছিলাম।

ডাঃ প্রাণকৃষ্ণ আচার্য ইতঃপূর্বে প্রকাশ্য সভায় বক্তৃতা করিতে পারিতেন না, স্বদেশি সভায় তিনি প্রথম বক্তৃতা করেন। স্বদেশি সভায় বক্তৃতা করিতে করিতে তিনি একজন উৎকৃষ্ট বক্তা হইয়াছিলেন।

১৯০৬ সালে ৭ আগস্ট অখণ্ড-বঙ্গভবন মাঠে স্বদেশিব্রত দৃঢ় করিবার জন্য আর এক সভা হয়। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেন ইহার সভাপতি ছিলেন। এই সময়ে যে জাতীয় পতাকা প্রস্তুত করা হয়, সভাপতি তাহা উত্তোলন করেন।

১৯০৭ সালের ৭ আগস্ট বিলাতি পণ্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ করিবার জন্য যে সভা হয় তাহাতে আবদুল হালিম গজনবী সভাপতি হইয়াছিলেন। সভাস্থলে তিনি জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়াছিলেন।

১৯০৮ সালের ৭ আগস্ট অখণ্ড-বঙ্গভবনে সভা করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচারিত করা হইয়াছিল। কলিকাতার পুলিস সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় অখণ্ড-বঙ্গভবনের সভা বন্ধ করিবার জন্য সুরেন্দ্রবাবু ও আমার উপর নিষেধ-আজ্ঞা জারি করেন। আমরা পরামর্শ করিয়া ইটালীর এক মাঠে সভা করিব বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়াছিলাম। পুলিস সে সভা বন্ধ করিয়া দিল। অবশেষে আমরা এই নির্ধারণ করিয়াছিলাম যে প্রতি বৎসর ৭ আগস্ট তারিখে স্বদেশি মেলা করা হইবে। ১৯২১ সাল পর্যন্ত প্রতি বৎসর স্বদেশি মেলা হইয়াছিল।

বঙ্গের গবর্নর লর্ড কারমাইকেল একবার এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভারত গবর্নমেন্টের সদস্য ধুরন্ধর সিভিলিয়ান স্যার উইলিয়াম ভিনসেন্টও এই মেলা দেখিতে আসিয়াছিলেন। আমি এই মেলার একজন সম্পাদক ছিলাম। ১৯২১ সালের পর নানা স্থানে স্বদেশি মেলা আরম্ভ হইয়াছিল; সুতরাং আমাদের পরিচালিত মেলা বন্ধ করা হয়। এই মেলা-ফণ্ডে দেড় হাজার টাকা উদ্বৃত্ত ছিল। নিবারণচন্দ্র রায়ের নামে এই টাকা ব্যাঙ্কে জমা আছে। এই মেলাতে প্রতিবৎসর নানাস্থানের স্বদেশি দ্রব্য প্রদর্শিত ও বিক্রয় হইত। কোথায় কি স্বদেশি দ্রব্য পাওয়া যায় জনসাধারণ তাহা জানিতে পারিতেন।

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলের শেয়ার যাহাতে জনসাধারণ ক্রয় করে তজ্জন্য 'অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি'র যুবকগণ ও আমি বঙ্গের নানাস্থানে গমন করিয়াছিলাম। অতি অল্প দিনের মধ্যেই বঙ্গলক্ষ্মীর সমস্ত শেয়ার বিক্রয় হইয়াছিল। কিন্তু আমরা শেয়ার বিক্রয় করিয়া কমিশন গ্রহণ করি নাই। আমি স্বদেশি আন্দোলনে মন-প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছিলাম।

অনেকে মনে করিত আমি ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস করিবার পক্ষপাতী, সুতরাং বিপ্লবী দলের অনেকে আমার নিকটে আসিতেন। একদিন রাত্রিকালে এক যুবক আসিয়া আমাকে বলিলেন, "পুলিস বীডন স্ট্রীটের সভা ভাঙিয়া দিয়াছে, অনেক যুবককে প্রহার করিয়াছে, পার্শ্ববর্তী বহু দোকান লুট করিয়াছে, অতএব ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কিরূপে প্রতিশোধ লইবে?" যুবক বলিল, "রাত্রিকালে পুলিসেরা শহরের নানাস্থানে পাহারা দেয়, এক এক স্থানে একজনের বেশি থাকে না। একটা বৃহৎ আয়োজন হইলে এক রাত্রিতে আমরা সমস্ত পুলিসকে হত্যা করিতে পারি।" আমি বলিলাম, "এমন বৃহৎ আয়োজন করা সম্ভব নয়। সমস্ত পুলিস এক রাত্রে হত্যা করিলেও তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; পরদিনই নূতন পুলিস নিযুক্ত হইবে। বিশেষতঃ তোমাদের জানা উচিত এ জগতে একজন ন্যায়বান নিয়ন্তা আছেন, তাঁহার রাজ্যে অধর্ম কখনও জয়যুক্ত হয় না।" যুবকটি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া গেল।

১৯০৮ সালের ১ এপ্রিল কলিকাতায় এই সংবাদ রাষ্ট্র হইল যে তাঁহার পূর্বদিন সন্ধ্যার সময় দুইজন বাঙালি যুবক মজঃফরপুরের ডিষ্ট্রিক্ট জজ মিঃ কিংসফোর্ডকে হত্যা করিতে গিয়াছিল। কিন্তু ভ্রমক্রমে মজঃফরপুরের উকিল মিঃ কেনেডির স্ত্রী ও কন্যাকে বোমা নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করে। কিংসফোর্ড ইতঃপূর্বে কলিকাতার প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তখন স্বদেশি আন্দোলনে লিপ্ত অনেক যুবককে কারাদণ্ড ও বেত্রদণ্ড দিয়াছিলেন। বেত্রদণ্ড দেওয়াতে বহু যুবক তাঁহার উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিল। বৃদ্ধ লিয়াকত হোসেন অনেক যুবককে অর্থসাহায্য করিতেন; মিঃ

কিংসফোর্ড তাহাকেও কারাদণ্ড দিয়াছিলেন। ইহাতেও যুবকমহলে অত্যন্ত ক্রোধের সঞ্চার হয়। মিঃ কেনেডি কংগ্রেসের একজন সভ্য ছিলেন। এ হত্যাকাণ্ডের পর মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু ধৃত হয় এবং প্রফুল্ল চাকী আত্মহত্যা করে। বিচারে ক্ষুদিরাম বসুর ফাঁসি হয়।

ইহার পর কলিকাতার দুই এক স্থলে রাত্রিকালে পুলিসকে আক্রমণ করা হইয়াছিল এবং কয়েক জন পুলিস কর্মচারীকে হত্যা করাও হইয়াছিল। আমি তখন বুঝিলাম বাংলা দেশে পুলিস হত্যা করিবার জন্য একটি দল গঠিত হইয়াছে।

আর একদিন এক যুবক আসিয়া আমাকে বলিল, "ভারতবর্ষ হইতে ইংরেজদিগকে তাড়াইবার জন্য আমরা প্রস্তুত হইয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমাদের দলে কয়জন লোক আছে?" যুবক বলিল, "বাংলা দেশের নানা স্থানেই আমাদের দলের লোক আছে। কলিকাতায় আমরা বোমা তৈয়ার করিতেছি। অনেক বন্দুক ও রিভলভার সংগ্রহ করিয়াছি, কয়েকটা ঘোড়াও সংগ্রহ করিয়াছি।" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কয়টা ঘোড়া সংগ্রহ করিয়াছ?" সে বলিল, "দুইটা।" "কয়টা বন্দুক ও রিভলভার তোমাদের আছে?" সে বলিল, "কুড়িটা।" বোমার বিষয় প্রথম এই যুবকের কাছেই শুনিয়াছিলাম। বোমা যে কি তাহা আমি জানিতাম না। যুবক বলিল, "বোমার পরীক্ষা হইতেছে, যুবকেরা বন্দুক ও রিভলভার ব্যবহার করিতে শিখিতেছে।"

আমি তাহাকে বলিলাম, "এই আয়োজনে তোমরা ইংরেজ রাজ্য ধ্বংস করিবে? তোমরা টাকা পাইবে কোথায়?" যুবক বলিল, "ডাকাতি করিয়া।" আমি অত্যন্ত রুষ্ট হইয়া বলিলাম, "ধর্ম এব হতহোন্তি' যাহারা ধর্মকে পরিত্যাগ করে তাঁহারা বিনষ্ট হয়। তোমরা এ দুষ্কর্ম করিও না।" যুবকটি আমাকে তাহাদের দলভুক্ত করিতে না পারিয়া চলিয়া গেল।

ইহার বহুদিন পরে ইউরোপে মহাযুদ্ধের সময় কলিকাতার একজন মুসলমান একজন তুর্কিকে লইয়া আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। তুর্কির পোশাক পরিচ্ছদ ও চেহারা দেখিয়া মনে হইল তিনি একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনি বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলিলেন। তিনি প্রথমে মনে করিয়াছিলেন গবর্নমেন্ট আমাকে নির্বাসিত করিয়াছেন, সুতরাং আমি গবর্নমেন্টের ধ্বংস কামনা করি। তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন "ইংরেজ গবর্নমেন্টর দ্বারা ভারতবর্ষের অশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। এই সময়ে যদি ভারতবাসী ইংরেজ গবর্নমেন্টের বিরুদ্ধে দাঁড়ায় তাহা হইলে তুরস্ক এবং জার্মানী অনায়াসে ভারতবর্ষ হইতে ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারে। এ বিষয়ে আপনারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।" আমি তদুত্তরে বলিয়াছিলাম—"ইংরাজকে তাড়াইয়া দেওয়া যে অসম্ভব বর্তমান যুদ্ধই তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছে। যদি আপনারা তাড়াইতে পারেন তবে ভারতবর্ষ তুরস্কের অধীন হইবে। আমরা তুরস্কের অধীন হইতে চাই না।" ইহার পর তিনি আমাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন; আমি সর্বশেষে বলিলাম, "ভারতবর্ষ ইংলণ্ডের সঙ্গে যদি সহকারিতা করে তবেই ভারতবর্ষের মঙ্গল হইবে; নতুবা কেহ-না-কেহ ভারতবর্ষকে পদতলে রাখিবে।" অতঃপর তিনি চলিয়া গেলেন।

একজন মুসলমানের সঙ্গে একজন তুর্কির আগমনে আমি বুঝিতে পারিলাম তুরস্ক গবর্নমেন্ট ভারতের মুসলমানদিগকে হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যুদ্ধের অবসানে জার্মানী হইতে একজন বাঙালি ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "সমস্ত ভারতবর্ষকে বিদ্রোহী করিবার জন্য রুশিয়া বিরাট আয়োজন করিয়াছে। বিদ্রোহের জন্য রুশিয়া অজস্র অর্থ ব্যয় করিতে প্রস্তুত হইয়াছে।" আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রুশিয়ার গুপ্তচর হইয়া আসিয়াছ। তুমি কি জান না রুশ গবর্নমেন্ট ধর্ম মানে না, সতীত্ব মানে না, বিদ্বানের মর্যাদা মানে না, স্বাধীন ভাবে যে জীবিকা অর্জন করিতে চায় রুশ তাহাকে হত্যা করে, সুতরাং কোন ভারতবাসী রুশিয়াকে ভারতে ডাকিয়া আনিতে পারিবে না।" ইহার কিছুদিন পরে শুনিলাম সে পুলিস কর্তৃক ধৃত হইয়া কারারুদ্ধ হইয়াছে।

চট্টগ্রামের একটি যুবক কলিকাতায় পাঠ করিত। সে আমাকে বলিয়াছিল, "জার্মানী হইতে অস্ত্র আমদানি করা হইয়াছে, জার্মানী হইতে এক জাহাজ বোঝাই করিয়া অস্ত্র আনা হইতেছে। ইহার দ্বারা অনায়াসে আমরা ইংরাজদিগকে তাড়াইয়া দিতে পারিব।" আমি তাহাকে বলিলাম, "ভারতবর্ষে এমন কোন বন্দর নাই যাহা ইংরেজ কর্তৃক রক্ষিত হইতেছে না। তোমাদের জাহাজ কোন বন্দরে আসিবে?" সে বলিল, "চট্টগ্রামের অনতিদূরে সমুদ্রের মধ্যে জাহাজ অবস্থিতি করিবে, রাত্রিকালে জাহাজ হইতে অস্ত্রশস্ত্র নামাইয়া নৌকাযোগে কর্ণফুলী নদী দিয়া দুর্ভেদ্য পার্বতীয় প্রদেশে তাহা লইয়া যাওয়া হইবে।" আমি বলিলাম "তোমাদের অজ্ঞতার আর পার নাই; সত্য সত্যই যদি কোন জাহাজ অস্ত্র লইয়া আসে তবে তাহা নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে।"

ইহার কয়েক দিন পরে বাংলার তদানীন্তন গবর্নর লর্ড কারমাইকেল আমাকে বলেন, একখানি অস্ত্রশস্ত্রপূর্ণ জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগর পার হইয়া ভারতবর্ষ অভিমুখে আসিতেছিল। কিন্তু তাহা ভারতবর্ষে আসিবার পূর্বেই ধরা পড়িয়াছে। আমি সে কথা শুনিয়া ভাবিলাম—তবে ত সত্য সত্যই যুবকগণ মহা ষড়যন্ত্রের আয়োজন করিয়াছিল। আয়োজন যে করিয়াছিল তাহা মুরারীপুকুরের ষড়যন্ত্রের মামলায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলার নানাস্থান হইতে যুবকগণ কর্তৃক ডাকাতির সংবাদ আসিতেছিল। প্রথম সংবাদ আসে—রংপুরের কোন ধনশালিনী মহিলার বাড়িতে ডাকাতির আয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু ডাকাতরা সে বাড়ি লুট করিতে পারে নাই। ঢাকা জেলার অন্তর্গত ধামরাইয়ের নিকটবর্তী কোন স্থানে বড় একটা ডাকাতি হইয়াছিল। যুবকেরা একখানি নৌকায় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া ডাকাতি করিতে গিয়াছিল। তাঁহারা ডাকাতি করিয়া বহু অর্থ ও অলঙ্কার সহ গুণ টানিয়া নৌকো লইয়া যাইতেছিল। নদীতীরে যত গ্রাম ছিল তথাকার অধিবাসীরা ডাকাতদিগকে ধরিবার চেষ্টা করিয়াছিল কিন্তু ডাকাতগণ গুলি করিয়া তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেছিল। সারাদিন ডাকাতেরা গুণ টানিয়া নৌকা লইয়া গেল, শত শত লোক তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিল কিন্তু ডাকাতদের নিকট যাইতে পারিল না। এমন ভীষণ ডাকাতি বাংলা দেশে কেহ কখনও শুনে নাই। সন্ধ্যার পর ডাকাতেরা নৌকাখানি নদীতীরে ফেলিয়া অর্থ ও অলঙ্কারসহ পলাইয়া গিয়াছিল।

ঢাকার নিকটবর্তী ভাওয়ালের রাজেন্দ্রপুর স্টেশনের নিকট রেলগাড়িতে এক ভয়ঙ্কর ডাকাতি হইয়াছিল। তদবধি ১৯৩২ সাল পর্যন্ত সাল পর্যন্ত বাংলা দেশের বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তর বাংলায় ভদ্রলোক কর্তৃক অনেক ডাকাতি হইয়াছে। ভদ্রলোকের বাড়িতে এবং রেলগাড়িতে ডাকাতি আরম্ভ হইয়াছিল। মোটরগাড়িতে চড়িয়া ডাকাতি, তাঁহার পর ডাকলুট হইতে আরম্ভ হয় ও অস্ত্রশস্ত্র চুরি আরম্ভ হয়। চট্টগ্রামের ভলান্টিয়ার ও পুলিসের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন তন্মধ্যে এক প্রসিদ্ধ ঘটনা।

যুবকেরা মোটরকারে চড়িয়া অস্ত্রাগার আক্রমণ করে, কয়েকজন ইংরেজকে বধ করে। ম্যাজিস্ট্রেট ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন, তাহাকে বধ করিয়া জন্য গুলি করা হইয়াছিল, কিন্তু গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়াতে তিনি বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। লুণ্ঠনকারীগণ বহু অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চট্টগ্রামের পাহাড় অঞ্চলে পলায়ন করিয়াছিল; তাঁহার পর চট্টগ্রামের পাহাড়তলীতে ইংরেজদের যে ক্লাব আছে তথায় সমবেত ইংরেজ নরনারীদের হত্যা করিবার জন্য চেষ্টা হইয়াছিল। একজন ইংরেজ মহিলা হত এবং কয়েকজন ইংরেজ আহত হইয়াছিলেন। আততায়ীদের মধ্যে একজন বাঙালি যুবতী ছিল। তাঁহার মৃতদেহ পরে পাওয়া যায়। সে বোধ হয় আততায়ীদের সহিত পলাইতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল।

ভাঙা বঙ্গ জোড়া লাগিল

১৯০৫ হইতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে ৭ বৎসর কাল বঙ্গভঙ্গ নিবারণের জন্য আন্দোলন চলিয়াছিল। আন্দোলনকারীগণ লাঞ্ছিত, নিগৃহীত নির্বাসিত, কারাগারে অবরুদ্ধ, এবং বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইয়াছেন, তবু জন্মভূমির অঙ্গচ্ছেদে আত্মহারা হইয়া আন্দোলন হইতে নিবৃত্ত হন নাই।

১৯১০ সালে লর্ড মিন্টো ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থান করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্নর-জেনারেলের পদে নিযুক্ত হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। ভারতসভা তাঁহার অভিনন্দনের আয়োজন করেন। তাঁহার আগমনের অব্যবহিত পরেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সম্বন্ধে কলিকাতার টাউনহলে সভা করা হইবে বলিয়া বিজ্ঞাপন প্রচার করা হয়। দুই-এক দিন পরেই লর্ড হার্ডিঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে নিমন্ত্রণ করেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ জিজ্ঞাসা করেন টাউনহলের সভার উদ্দেশ্য কি? সুরেন্দ্রবাবু বলেন—"বঙ্গবিভাগ সম্বন্ধে বাঙালির মত কি তাহা আপনাকে জানাইবার জন্য সভা করা হইবে।" লর্ড হার্ডিঞ্জ বলেন, "সভা না করিয়া একখানি পত্রে আপনাদের মত জানাইতে পারেন।" সুরেন্দ্রবাবু বলেন, "আপনি স্বয়ং যদি সেই পত্র পাঠ করেন এবং বঙ্গের জননায়কদের ডাকিয়া তাঁহাদের মত অবগত হন, তবে সভা করার প্রয়োজন হইবে না।" "হ্যাঁ, তাহা আমি করিব। তৎসম্বন্ধে রাজকর্মচারীদেরও মত অবগত হইব।" সুরেন্দ্রবাবু বলেন, "রাজকর্মচারীরা তাঁহাদের মত অনেকবার বলিয়াছেন, বঙ্গের জননায়কদের মতই আপনার অবগত হওয়া প্রয়োজন।" লর্ড হার্ডিঞ্জ ইহাতে সম্মত হইলেন।

সুরেন্দ্রবাবু ও অম্বিকাচরণ মজুমদার একখানি পত্র রচনা করিলেন। বঙ্গের জননায়কগণের স্বাক্ষরিত সেই পত্র ১৯১১ সালের জুন মাসে লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট প্রেরিত হইল। লর্ড হার্ডিঞ্জ বঙ্গবিভাগের পরিবর্তন করা যে প্রয়োজন তাহা প্রতিপন্ন করিয়া আগস্ট মাসের ২৮ শে তারিখে ভারত সচিবের নিকট এক পত্র পাঠাইলেন। ইংলণ্ডরাজ পঞ্চম জর্জ ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ১২ ডিসেম্বর দিল্লিতে এক দরবার করেন। সেই দরবারে এই ঘোষণা করেন—"সমস্ত বঙ্গ অখণ্ড থাকিবে কিন্তু বিহার ও উড়িষ্যা একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হইবে এবং ভারতবর্ষের রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লিতে স্থানান্তরিত হইবে।"

রাজা কি ঘোষণা করেন তাহা জানিবার জন্য ১২ ডিসেম্বর মধ্যাহ্ন হইতে অপরাহ্ণ পর্যন্ত সমস্ত বাংলা উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল। দরবার আরম্ভ হইবার পর তিন চারি ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, তবু বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোন সংবাদ না আসাতে সকলে অধীর হইয়া বলিতেছিল—রাজা বুঝি বঙ্গদেশ সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই। যদি তাই হয় তবে আমরা নিরাশ হইব না; আরও তীব্র তেজে আন্দোলন করিব। সন্ধ্যার কিঞ্চিৎ পূর্বে বঙ্গভঙ্গ রহিত করা হইবে এই সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিল। তখন অন্ধকার হইয়াছে। তখন কলেজ স্কোয়ারে এক বিরাট সভা হইল। সুরেন্দ্রবাবু বক্তৃতা করিলেন। কেহ কেহ বলিলেন, "দিল্লিতে রাজধানী উঠিয়া গেল, বিহার ও উড়িষ্যা বাংলা দেশ হইতে পৃথক হইল, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় হইল। কিন্তু উত্তর, পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম বাংলা একত্র করিবার জন্য বাঙালি যে পণ করিয়াছিল সেই পণ পূর্ণ হইল, ইহা শুনিয়া সহস্র লোক "বন্দেমাতরম" বলিয়া জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল।

রাসবিহারী বসু

আত্মকথা*

কেন আমি ভারত ত্যাগ করিলাম

১৯১৫ সালের মার্চ মাস। আমি তখন বেনারসে আসিয়াছি। লাহোরের ব্যর্থ উদ্যমে ধাক্কাটা প্রথম বড় বেশি লাগিয়াছিল। কিন্তু এজন্য আমি তত দুঃখিত হই নাই। কিন্তু যখন সংবাদ পাইলাম যে আমার দক্ষিণহস্তস্বরূপ যারা কাজ করিতেছিল, এমন অনেকেই ধরা পড়িয়াছে, তখন বড়ই দুঃখ হইল। যতবার এই সমস্ত সংবাদ পড়ি, ততবার দরদর করিয়া চোখ থেকে জল পড়ে। লাহোরেতে ব্যর্থ হইলেও "Through failure, we mount to success" এটার উপর আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল বলিয়া, ততটা নিরাশ হই নাই। এবারের experienceটা ভবিষ্যতে কাজে লাগিবে। ভবিষ্যতে এবারের মত ভুল করিব না—এই রকম ভাবিতেছিলাম। কিন্তু পরম স্বার্থত্যাগী, দুঃসাহসিক, সকলপ্রকার বিপদে বিপর্যয়ে অচল অটল যারা, এমন সব লোকেরা যখন ধরা পড়িল, তখন মনে একটা বড়ই আঘাত বাজিল। যারা ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দিবে তাদের ত আর ফিরিয়া পাইব না—এই ভাবনায় বুকটা যেন ফাটিয়া যাইবার মতন হইল। তারপর যখন সংবাদ পাইলাম যে, পিঙ্গলেও মিরাটে ধরা পড়িয়াছে, তখন একেবারে প্রাণটা বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। একটি ছেলে 'পাইওনিয়ার' কাগজখানি আনিয়া দিলে, খুলিয়া দেখি যে মিরাট থেকে ১টি টেলিগ্রাম। তাতে পিঙ্গলে এবং আর কয়েকজন শিখ সৈনিক 'বোমা' সমেত ধরা পড়িয়াছে, এই কথা লেখা আছে। চোখের জল আর থামে না। কাগজ পাইবার পূর্ব পর্যন্ত এই স্থির করিয়াছিলাম, যে কোন রকমে এবার পিঙ্গলে ফিরিয়া আসিলে আর তাকে আমার কাছ-ছাড়া করিব না।

এর আগেকার কিছু ঘটনা বলি। লাহোরে যখন ধর-পাকড় আরম্ভ হইয়াছে, তখন আর লাহোরে থাকিয়া কোন লাভ নাই, এই ভাবিয়া বেনারস কিম্বা বাংলায় ফিরিয়া যাওয়া স্থির করিলাম। তখন একটি পুরাতন বন্ধু বলিলেন, এ সময়ে পুলিশ প্রত্যেক ট্রেন 'ওয়াচ' করিতেছে, আপনাকে এ সময়ে আমরা কখনই বিপদের মুখে যাইতে দিব না। তার উত্তরে আমি বলিলাম যে, পুলিশ নজর রাখিতেছে বলিয়াই এখন লাহোর থেকে বাহির হইয়া যাওয়া খুব সহজ। পূর্বেও দুইবার পুলিশ এই রকম দিল্লি স্টেশনে watch করিয়াছিল, তখন খুব সহজেই দিল্লি থেকে বাহির হইয়া যাইতে পারিয়াছিলাম। পুলিশদের বুদ্ধিটা একটু মোটা। এধার ওধার চাহিয়া কেহ follow করিতেছে কিনা, এই ভাবে গেলে পুলিশের হাত থেকে সরা মুস্কিল। কিন্তু ঠিক একজন ভদ্রলোক প্যাসেঞ্জারের মত গাড়ি করিয়া আসিয়া নামিয়া গাড়োয়ানকে চার আনার 'টিপ' (বক্সিস) দিয়া বরাবর সটান বুকিং অফিসে গিয়া, টিকিট কিনিয়া, ট্রেন আসা পর্যন্ত বেঞ্চে বসিয়া খবরের কাগজ কিম্বা কোন বই পড়, পুলিশের বাবাও কখনও সন্দেহ করিতে পারিবে না। তাছাড়া পুলিশ এখন অধিকাংশ প্যাসেঞ্জারের উপরেই নজর রাখিবে, সেইজন্য তাদের মনোযোগ একমুখি না হইয়া ছড়াইয়া পড়িবে। সেইটাই আমাদের পক্ষে মহাসুযোগ। এই ব্যাপারটা বন্ধুকে বুঝাইয়া দিয়া একটি মারাঠি ছেলেকে[১] সঙ্গে করিয়া ঠিক সন্ধ্যার সময় লাহোর স্টেশনে আসিলাম। পাঞ্জাবি পোশাক, মাথায়

---

* *রাসবিহারীর আত্মকথা ও দুষ্প্রাপ্য রচনা*—সংগ্রহ ও গ্রন্থনা—অমলকুমার মিত্র। পৃ. ১-১৩

১. বিনায়ক রাও।

একটা প্রকাণ্ড রকমের পাগড়ি ও সঙ্গে একটি গুলিভরা "মসার" পিস্তল। এক্কা থেকে নামিয়া সটান স্টেশন প্লাটফরমে আসিয়া হাজির হইলাম। টিকিট দুইখানা আগেতেই কিনাইয়া রাখিয়াছিলাম, দুই মিনিট অপেক্ষা না করিতেই দিল্লি পর্যন্ত যাইবার গাড়ি আসিল। আমরা দুইজন উঠিয়া বসিলাম। আমার সঙ্গী ছেলেটিকে ঘুমাইবার ভান করিবার জন্য বলিয়া, আমি নিজেও নাক ডাকাইয়া দিলাম। কিছুক্ষণ পরে গাড়ি ছাড়িল। ছাড়িবার সময় দেখিলাম, আমার পুরাতন বন্ধুটি প্লাটফর্মে দাঁড়াইয়া আছেন। আমি নিরাপদে লাহোর ছাড়িয়া চলিলাম দেখিয়া তিনি খুবই আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সকালে গাজিয়াবাদে নামিয়া পড়িয়া ট্রেন বদল করিলাম। গাজিয়াবাদে নামিয়া দেখি আমার পরিচিত দেরাদুনবাসী একজন বাঙালি ভদ্রলোক স্টেশনে বসিয়া আছেন, কিন্তু আমার পোশাকে তিনি চিনিতে পারিলেন না এবং চিনিতে পারিলেও কখনও আমায় ধরাইয়া দিতেন না। যাহা হউক, গাজিয়াবাদ হইতে ই. আই. রেলওয়েতে আসিয়া মোগলসরাই-এ গাড়ি বদল করিয়া বেনারসে পরের দিন সকালে পৌঁছিলাম। বেনারস স্টেশনে পুলিশ খুবই সতর্কতার সহিত পাহারা দিতেছিল। কিন্তু বুদ্ধিটা মোটা হওয়ার দরুন ঠিক উল্টা লোকদের সন্দেহ করিতেছিল। যাক, তখনও পর্যন্ত পিঙ্গলের কোনও সংবাদ পাই নাই। সে জন্যে একটু চিন্তিত ছিলাম। ঠিক দুইদিন পরে পিঙ্গলে আসিয়া হাজির। তাহাকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া যে কত আনন্দ হইল তা ভাষায় বলা যায় না। সে মিরাটের সিপাইদের সহিত পরামর্শ করিয়া আসিয়াছে। আমি হুকুম দিলেই সে মিরাটে গিয়া কাজ আরম্ভ করিতে পারে। আমার মায়ের পেটের ভাইয়ের চেয়েও যাকে আমি ভালবাসি এবং আপনার বলিয়া মনে করি, যার সাহসিকতা, স্বদেশপ্রেম এবং আত্মদানের ভাবে আমি মুগ্ধ, যার সাহায্য না হইলে আমি এক পদও অগ্রসর হইতে পারিতাম না, সেই প্রাণের ভাই শচীন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তখন শচী বাড়িতে থাকিত না। পুলিশ কখন শচীনের বাড়ি ঘেরাও করে, তাহার স্থিরতা নাই। কাজেই ইহাই স্থির হইয়াছিল যে, শচী বাড়িতে না থাকিয়া একটি বন্ধুর বাড়িতে থাকিবে। শচীর সহিত পরামর্শ করিলাম। একদিকে পিঙ্গলের প্রতি আমার ভালবাসা, অপরদিকে কর্তব্য। পিঙ্গলে আগুনের মুখে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে, তাহা আমি বেশ বুঝিতেছিলাম, কিন্তু অন্যদিকে কর্তব্য। শেষে পিঙ্গলকে পাঠানই স্থির হইল।

ঠিক সন্ধ্যার সময়। মা-গঙ্গার তীর, দশাশ্বমেধ ঘাটের পরের ঘাটটিতে আমরা বসিয়া আছি। মা গঙ্গা কুলকুল রবে বহিয়া যাইতেছেন। ২/৪ খানি নৌকা দেখা যাইতেছে। মন্দির সমূহে আরতি আরম্ভ হইয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া আমি পিঙ্গলকে বলিলাম।

"তুমি যে কাজে যাইতেছ, তাহাতে কত বিপদ তাহা জান বোধ হয়, একটু এধার ওধার হইলেই মৃত্যুকে বরণ করিতে হইবে, এটা মনে ভাবিয়াছ কি?"

পিঙ্গলে একগাল হাসিয়া বলিল, "মরা বাঁচা আমি কিছু জানি না যখন order (আদেশ) দিবেন তখন সেটা করিবই, তাতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয় হবে।"

ঠিক বীরের মতনই উত্তর দিয়াছিল। কিন্তু উত্তরটা শুনিয়া আমার প্রাণটা যেন কাঁপিয়া উঠিল। অনেককেই হারাইয়াছি, আবার পিঙ্গলকেও হারাইব কি? পিঙ্গলে তার পরের রাত্রে মিরাটে গেল। পিঙ্গলের সঙ্গে সেই শেষ সাক্ষাৎ। এখনও তার হাসিভরা মুখখানা হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া আছে! পিঙ্গলে তো মানুষ নয়, সে ছিল দেবতা। তার মত হাজার লোক থাকিলে আজ ভারত স্বাধীন।

এটা ১৯২৪ সাল।

আজও যখন আমির চাঁদ, আবদবিহারী, বসন্তকুমার, বালমুকুন্দ, পিঙ্গলে, কর্তার সিং, মথুর সিং, জগৎ সিং, নিধান সিং, ইত্যাদির কথা মনে পড়ে, তখন নয়ন ধারায় বুক ভাসিয়া যায়। এর কারণ কি? এরা ত আমার আত্মীয় নয়, তবে এদের জন্য এখনও কেন কাঁদি? এরা যে আমার আত্মীয়ের চেয়েও আপনার লোক, এরা যে আমার প্রাণের ভাই। সেইজন্য এদের জন্য এখনও

কাঁদি। এদের কথা মনে হইলে বুকটা যেন ফাটিয়া যাবার মতন হয়। বিপ্লবপন্থীদের মধ্যে একটা গাঢ় ভালবাসা আছে, তা সাধারণ লোকে বুঝিতে পারে না। নিজেদের বাপ, মা, ভাই, বন্ধুর চেয়েও এরা পরস্পরকে ভালবাসে। এ ভালবাসা না থাকিলে কেহ কখনও বিপ্লবপন্থী হইতে পারে না এবং বিপ্লবমূলক কার্যও করিতে পারে না।

পিঙ্গলে ধরা পড়িয়াছে সংবাদ পাইয়া শচীন এবং আর কয়েকজনের বেনারস থেকে বাংলায় গিয়া গা ঢাকা দিবার কথা স্থির হইল। ইহার ২/৪ দিন পরে সংবাদ আসিল, যে আমার আশৈশব এবং যৌবনের বন্ধু, অসাধারণ স্বার্থত্যাগী বীরকর্মী শ্রী—[২] কে হাওড়া স্টেশনে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গিয়াছে। তখন বাংলাতেই যাওয়া স্থির করিলাম। অতঃপর "বাঙাল"[৩] কে সঙ্গে করিয়া আমি কাশী থেকে চন্দননগর অভিমুখে রওনা হইবার বন্দোবস্ত করিলাম। চন্দননগরে খুব সকালে পৌঁছায়, এই রকম গাড়িতে যাওয়া স্থির হইল। মগরা স্টেশনে পশুপতিবাবু[৪] আসিয়া অপেক্ষা করিবে। সেখানে নামিয়া পশু, বাঙাল এবং আমি ত্রিবেণী থেকে নৌকা করিয়া চন্দননগরে যাইব, স্থির ছিল। বেনারস থেকে গাড়িতে উঠিয়া, মোগলসরাই-এ চেঞ্জ করিলাম। মগরায় গাড়িখানা ভোর ৪টার পৌঁছিল। নামিতেছি, এমন সময় আমাদের জন্য স্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল পশুপতি আসিয়া, ঝড়জলের জন্য নৌকা পাওয়া যায় নাই বলিয়া বরাবর চন্দননগর স্টেশনে গিয়াই নামা ছাড়া উপায় নাই, একথা জানাইল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চন্দননগর স্টেশনে সদাসর্বদা কতকগুলি 'টিকটিকি' (গোয়েন্দা) রাখিত কিন্তু এখন আর উপায় নাই, চন্দননগরেই নামিতে হইবে। স্থির করিলাম যে, নামিয়াই আমি প্রথমে যাইব এবং আমার পশ্চাতে ইহারা দুইজন আসিবে। চন্দননগর স্টেশনে নামিয়াই একটি হাত Loaded Pistol টি যেখানে আছে সেখানে রাখিয়া, অপর হাতে টিকিটখানি ধরিয়া আস্তে আস্তে 'Way out' এর দিকে আসিলাম। উড়ানিখানি ভাল করিয়া মাথা এবং মুখে জড়াইয়া রাখিয়াছিলাম। একজন গোয়েন্দা সটান স্টেশনের বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া নাক ডাকাইতেছে। আর কেহই স্টেশনে নাই। টিকিট কালেকটরটি আমার পরিচিত লোক। টিকিটখানি লইবার সময় একটু হাসিলেন বলিয়া বোধ হইল। তিনি বোধ হয় আমায় জানিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জানিলেও সে সময় তিনি কিছুই করেন নাই এবং করিতেও পারিতেন না। স্টেশন থেকে চলিয়া আসিয়া আমাদের বাড়ির কাছেই এক বন্ধুর বাড়িতে আশ্রয় লইলাম। পশুপতি এ বিষয়ে সমস্ত বন্দোবস্ত, একই খেলার সাথী,—এর[৫] সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ঠিক করিয়া রাখিয়াছিল। বন্ধুর বাড়িতে সেইদিন থাকিয়া সন্ধ্যার সময় সেখান থেকে হাঁটিয়া—এর[৬] বাড়িতে গিয়া হাজির হইলাম। সেখানে আর দুই ভায়েরা আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সমস্ত রাত কথাবার্তায় কাটিয়া গেল। এখন কি করা যায়, এই বিষয়েই আলোচনা হইল। শেষে এই স্থির করিলাম যে, ভারতের বাহিরে বিদেশে যাইব।

১৯১৪ সালেও একবার আমার বিদেশে যাইবার কথা উঠিয়াছিল। আমার বন্ধুদের মতে সেটাই আমার পক্ষে তখন শ্রেয়ঃ। সেবারে এমনকি জাহাজের টিকিট পর্যন্ত কেনা হইয়া গেল। অধিকাংশ সময়ে আমি 'ইন্টুইশেন' (Intuition) এর উপর নির্ভর করিয়া কার্য করিতাম। সেজন্য আমায় কখন কখন inconsistent হইতে হইত। একটি ছেলে সন্ধ্যার সময় স্টিমশিপের টিকিটখানি আনিয়া আমায় দিল। আমি তখন বাড়িটির ছাদে বসিয়াছিলাম। আমার বাল্যবন্ধু শ্রী—ও আমার কাছে ছিল। কি যেন মনে হইল। শ্রী—রদিকে চাহিয়া বলিলাম—"ভাই, আমি এখন বিদেশে যাইব না, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখিব। এই বলিয়া টিকিটখানি ছিঁড়িয়া ফেলিলাম। শ্রী—আমার নিরাপদের জন্য বড়ই উদ্বিগ্ন ছিল এবং সেই উদ্বেগ ও ভাবনার বশবর্তী হইয়া আমাকে বিদেশে যাইবার জন্য বুঝাইয়া ছিল এবং আমিও এরকম রাজী হইয়াছিলাম। সে সময়ে গভর্ণমেন্ট আমাকে

২. শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। ৩. নলিনীমোহন মুখোপাধ্যায়। ৪. জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ ৫. নরেশচন্দ্র সেন। ৬ মতিলাল রায়।

ধরিবার জন্য অনেক চেষ্টাই করিতেছিল। প্রত্যেক বড় বড় স্টেশনে আমার ছবি (ফটো) টাঙাইয়া দিয়াছিল এবং আমাকে ধরাইয়া দিলে পুরস্কার দিবে একথাও প্রকাশ করিয়াছিল। কাজেই হৃদয়ের বন্ধু শ্রী—আমার জন্য চিন্তিত হইবে তা আর বেশি আশ্চর্যের কথা নয়। শ্রী—আমার স্বভাব খুব ভাল করিয়াই জানিত। আমি যখন একবার স্থির করিয়াছি যে, বিদেশে যাইব না, তখন আমায় বুঝান বৃথা। শ্রী—ও কাজেই আমার কথায় সায় দিয়াছিল।

এবারে কিন্তু আমি নিজেই বিদেশে না গেলে নয়, এই স্থির করি। তার কারণ দুইটি। একটি এই যে—আমার নিজের 'experience' এ দেখিয়াছি যে কেবল দেশীয় সেনার দ্বারা তখন আর revolution হইতে পারে না। Civiliansরা অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে, কখনই Successful revolution আমরা আনিতে পারিব না। লাহোরে আমাদের (অর্থাৎ Civil population) হাতে যদি যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সব সরঞ্জাম থাকিত, তাহা হইলে সরকার আমাদের দলের সৈনিকগণকে ধরিলেও আমরা (Civilian) বিপ্লব আরম্ভ করিয়া দিতে পারিতাম। আমাদের জনবল এবং disciplined organisations ছিল, কিন্তু arms ছিল না। অস্ত্র সম্বন্ধে আমরা দেশীয় সৈনিকদের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। কাজেই তাহারা যখন ধরা পড়িল তখন আমরা আর কিছুই করিতে পারিলাম না। ভবিষ্যতে যাহাতে সৈন্যদের প্রত্যক্ষ সহায়তা না পাইলেও আমরা কার্য করিতে পারি, সেইজন্য arms and ammunition বিদেশ থেকে না আনিলে নয়। আমার এই ইচ্ছা ছিল যে, দ্বিতীয় প্রচেষ্টার পূর্বে দেশটাকে Small arms দ্বারা ছাইয়া ফেলিব। সেই উদ্দেশ্যে আমি বিদেশে যাওয়া স্থির করি।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য টাকার ব্যবস্থা করা। দেশেতে সে পর্যন্ত এই experience অনুভব করিয়াছি যে চুরি, ডাকাতি দ্বারা বিপ্লবের টাকা কখনও যোগাড় হইবে না। তা'ছাড়া ২/৪ জন লোক ছাড়া কোন ধনীই আমাদের কাজে টাকা দিবে না। সেইজন্য বিদেশ থেকে টাকার যোগাড় করা। এই দুই উদ্দেশ্য মাথায় করিয়া আমি বিদেশ যাওয়া ঠিক করিলাম।

এ প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, বিদেশিরা কেন আমাদের অস্ত্রশস্ত্র ও টাকা দিবে? এর উত্তর এই যে, তাহাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই তাহারা আমাদের সাহায্য করিবে। যুদ্ধকালে জার্মানরা ভারতীয়দিগকে টাকা এবং অস্ত্র দেয় নাই কি? আন্তর্জাতিক সম্বন্ধের এইটাই বড় রহস্যময় কথা যে, আজকের বন্ধুরা কাল পরম শত্রু হইয়া উঠেন এবং তাহাদের প্রত্যেক পদক্ষেপ ও আচরণ স্বার্থের উপর প্রতিষ্ঠিত। কয়েক বর্ষ পূর্বে ইংরাজ জার্মানকে তার ঘোরতম শত্রু মধ্যে গণনা করিত, আজ সেই ইংলণ্ডই আবার জার্মানীর সঙ্গে মৈত্রীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এটা আমাদের মনে রাখা উচিত যে, ইংরাজের অনেকেই শত্রু এবং তাহার পতন দেখিবার জন্য উদগ্রীব। কাজেই তাহারা যে ভারতীয়দের সাহায্য করিবে তা আর আশ্চর্য কি?

বিদেশে যাওয়া স্থির হইল, কিন্তু টাকা না হইলে ত আর যাওয়া যায় না। টাকার বন্দোবস্ত করিতে কিছু সময় লাগিবে। যোগাড় না হওয়া পর্যন্ত কোন নিরাপদ স্থানে না থাকিলেও নয়। নবদ্বীপ একটি তীর্থস্থান। অথচ সাধারণতঃ সেখানে তত বেশি লোক যাওয়া আসা করে না। কিছুদিন সেখানে থাকাই ঠিক হইল। তাছাড়া সেই সময়ে আমাদেরই একজন লোক সেখানে ছিল, তাহার মতে নবদ্বীপ খুব নিরাপদ স্থান। এই সমস্ত ঠিক করিয়া ভোর বেলা—এর' বাড়ি থেকে 'ক'এর' বাড়িতে গেলাম। তাহার কারণ———একজন Suspect, তাহার বাড়ি এবং চলাফেরা C.I.D. ত ওয়াচ' করে। আমার পক্ষে সেখানে থাকা নিরাপদ নয়।

'ক' বাড়িতে দুপুর বেলা 'ক'র একজন আত্মীয় আসিলেন। আমি সাধারণতঃ তখন একজন ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণের মতন ছিলাম। পৈতে ত ছিলই, তার উপর একটি টিকিও ছিল। ভদ্রলোক আমি

৭. মতিলাল রায়। ৮. সাগরকালী ঘোষ।

ব্রাহ্মণ দেখিয়া আমায় হাত জোড় করিয়া নমস্কার করিলেন, আমিও হাত জোড় করিয়া তাঁহাকে প্রতিনমস্কার করায় বেচারী একটু ফাঁপরে পড়িয়া গেল। পরে 'ক'কে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন। 'ক'র কাছ থেকে একথা শুনিয়া আমি ভাবিলাম, "অভ্যাস কি সহজে ছাড়িতে পারি!"

তার পরদিন সকালে একটি নৌকা ভাড়া করিয়া ৬/৭ জন ভাইকে সঙ্গে করিয়া ত্রিবেণীতে গেলাম। সেখানে আহার করিয়া পশুপতি ছাড়া আর সকলকে ফিরাইয়া দিলাম। পশুপতি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। ছেলেবেলা থেকেই ভয়ানক দুরন্ত। পরে বরাবর আমার সঙ্গে কাজ করিয়া আসিয়াছে। ভয় কাকে বলে পশুপতি তা জানে না। ওর অভিধানে ও-কথা নেই। পশুপতি আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিতে সদাই প্রস্তুত। পশুপতি না থাকিলে অনেক সময়েই আমায় বিপদে পড়িতে হইত। পশুপতি যেমন নির্ভিক, তেমনি বুদ্ধিমান। তাকে সঙ্গে করিয়া বরাবর ট্রেনে নবদ্বীপে গিয়া হাজির। "ঠাকুর"[৯] তখন সেখানে ছিল। সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া একটি বাড়ি ভাড়া করিবার জন্য খুঁজিতে বাহির হইলাম। নবদ্বীপের একপ্রান্তে এক বৈরাগির এক বাড়ি ছিল। ২টি ঘর। সেটি ভাড়া করিলাম। সেখানে প্রায় একমাসেরও উপর ছিলাম। বাড়ি ঠিক হইলেই 'ঠাকুর'কে সেখান থেকে টাকা যোগাড় করিবার জন্য ঢাকাতে পাঠাইয়া দিলাম। ইতিমধ্যে মারাঠি ছেলেটির আমার কাছে আসিয়া থাকা ঠিক হইল এবং পশু চন্দননগরে ফিরিয়া গেল।

মারাঠি ছেলেটি বাংলা বলিতে পারিত। কিন্তু কখন কখন উচ্চারণ ঠিক হইত না, কাজেই বাজার করিবার জন্য বাড়ির মালিক বৈরাগি মহাশয়ের আশ্রয় লইতে হইল। বৈরাগিকে একদিন মাছ কিনিয়া আনিবার জন্য বলায় সে ইহাতে রাজি নয়, ২/৪ বার অনুরোধ করার পর রাজি হইল, তারপর প্রত্যেক দিন গামছা করিয়া মাছ কিনিয়া আনিত। একদিন তাহাকে নিমন্ত্রণ করিলাম। মাছের ঝোল অম্লান বদনে খাইয়া গেলেন। অথচ ইনি প্রথমে মাছ কিনিয়া আনিতে রাজি হন নাই, কারণ তিনি বৈরাগি এবং মাছ ছোঁন না। এই ঘটনাতে আমাদের সমাজের অবস্থা বেশ বোঝা যায়।

আমাদের নবদ্বীপ বাসের সময় অনেক ভায়েরাই আমার কাছে যাতায়াত করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে প্রতাপ সিংহের কথাই এখানে একটু বলিব। প্রতাপের ঠাকুরদাদা, বাপ, খুড়ো সকলেই দেশের জন্য আত্মদান করিয়াছে, প্রতাপের সঙ্গে আমার অনেক পুরাতন সম্পর্ক। পণ্ডিত অর্জুনলাল শেঠজির recommendation লইয়া প্রতাপ, ওর ভগ্নীপতি এবং আরও দুইটি ছেলে দেশ সেবা করিবার জন্য দিল্লিতে মাষ্টার আমীর চাঁদজীর কাছে ১৯১৩ সালে আসিয়াছিল। আমি বাড়িতে গেলে তিনি হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন—"বাবুজি, আপকে লিয়ে ৪ বড়ে দেশপ্রেমিক ম্যায় ইঁহা লেয়ায়া হায়"—"বাবুজি আপনার জন্য ৪ জন খুব দেশভক্তকে এখানে আমি সঙ্গে করিয়া আনিয়াছি।" শ্রী আমির চাঁদজীর বাড়ির কাছেই একটি ভাড়াটে বাড়িতে এদের রাখা হইয়াছিল। আমি সেদিন দিল্লিতে আসিব একথা এরা জানিত বলিয়া আমার জন্য ভাল করিয়া রাজপুতানার ঢঙে রুটি এবং তরকারি করিয়া রাখিয়াছিল। বেলা ১১টার সময় সেই ভাড়াটে বাড়িতে আমি এবং মাষ্টারজি দুইজনে গেলাম। আবদ বিহারীকে একটা গুরুতর কাজ দিয়াছিলাম বলিয়া সে আসিতে পারিল না। সেখানে প্রতাপের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। চোখের দিকে চাহিয়া দেখি, যেন আগুন ঠিকরাইতেছে। প্রতাপ সিং প্রকৃতই সিংহ ছিল।

পশুপতি সংবাদ আনিল যে, প্রতাপ রাজপুতানা থেকে আমার সঙ্গে দেখা করিবার জন্য আসিয়া চন্দননগরে অপেক্ষা করিতেছে। আমি তাহাকে সঙ্গে করিয়া আনিবার জন্য পশুপতিকে বলিলাম। তার পরদিন পশুপতি প্রতাপকে সঙ্গে করিয়া আনিল। প্রতাপকে বুঝাইলাম যে, কেন আমি বিদেশে যাইতেছি। সমস্ত শুনিয়া সে কাঁদিয়া ফেলিল। আমাকে সে অনেকদিন দেখিতে পাইবে না, এইটা তার প্রাণে বড় বাজিল। সেই প্রতাপের সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাৎ। প্রতাপ আর ইহজগতে নাই।

৯. ত্রৈলোক্য মহারাজ।

জেলেতেই প্রতাপ পৃথিবী ছাড়িয়া স্বর্গে চলিয়া গিয়াছে। যেখানকার জিনিস সেইখানেই চলিয়া গিয়াছে।

'ঠাকুর' ঢাকায় গিয়া গিরিজাবাবুকে আমার কাছে পাঠাইল। গিরিজাবাবু এবং শচীন ও পশুপতির সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চন্দননগর হইয়া কলিকাতায় যাওয়া ঠিক হইল। পশুপতিকে সঙ্গে করিয়া নবদ্বীপ থেকে বরাবর আসিয়া চুঁচুড়া স্টেশনে নামিয়া একখানি ঘোড়ার গাড়ি করিয়া চন্দননগরের সীমান্তে আসিলাম। সেখান থেকে হাঁটিয়া—[১০]এ'র বাড়িতে আসিলাম।—[১০] এর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া পরের দিন সন্ধ্যার সময় শচীন এবং স্নেহের গিরিজাকে সঙ্গে করিয়া 'ক' এর নৌকাতে গঙ্গা পার হইয়া কাঁচড়াপাড়া স্টেশনে ট্রেনে চড়িয়া কলিকাতায় আসিলাম, গিরিজাবাবুর পরিচিত এক বন্ধুর বাসায় উঠিলাম।

গিরিজাবাবুর সঙ্গে আমার বেশি দিনের পরিচয় নয়। কিন্তু ২/৪ দিন আলাপ করিয়াই দেখিলাম যে তাঁর মতন মানুষ কম। তাঁর মতন স্বার্থত্যাগী দেশভক্ত লোক সহজে পাওয়া যায় না। আমার কপাল অনেক ভাল বলিয়াই গিরিজাবাবুর (আসল নাম নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী) মতন লোক পাইয়াছিলাম। সে গিরিজাবাবু আর ইহজগতে নাই।

কিরূপে ভারত ত্যাগ করিলাম?

এখন প্রথম কাজ হইল স্টিমার ঠিক করা এবং টিকিট কেনা। সেই সময়ে সংবাদ পত্রে দেখিলাম যে কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ জাপান যাইবেন স্থির করিয়াছেন। এই খবর পড়িয়াই মাথায় একটা বুদ্ধি যোগাইল। শচীকে বলিলাম যে পি. এন. টেগোর এই নামে একখানি জাপানের টিকিট কেন। দেরাদুনে প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের একটি Villa আছে। সেখানে থাকার সময় ইহার নাম শুনিয়াছিলাম। Poet Tagore এর দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় এই ভাবে পরিচয় দিলে ইংরেজ হঠাৎ সন্দেহ করিতে পারিবে না। কারণ কবি তখন জাপান যাইবেন এই কথা সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে। ইংরেজ মনে করিবে, ঠাকুর নিজে জাপান যাইবেন বলিয়া হয়ত একটু আগে জাপানে সমস্ত বন্দোবস্ত করিবার জন্য পাঠাইয়াছেন। আমি যেমন ভাবিয়াছিলাম, হইলও ঠিক তাই।

শচীন কলিকাতা হইতে কোবে যাইবার একখানি টিকিট কিনিয়া আনিল। ইতিমধ্যে গিরিজাবাবু ২টা সাহেবি সুট খরিদ করিয়া আনিলেন। স্টিমার ছাড়িতে তখনও কিছুদিন দেরি আছে। দুইদিন বাদে ২/৪টি ছেলেকে ডাকাইয়া, আমার অবর্তমানে তাহাদের সকলকে শচীন এবং গিরিজাবাবুর অধীনে কার্য করিবার জন্য বলিলাম। ইহার দুইদিন পরেই জাহাজ ছাড়িবার দিন।

১৯১৫ সালের মে মাস। ১২ তারিখ। এই দিন স্টিমার ছাড়িবে। খুব সকালে উঠিয়া জিনিসপত্র গুছাইয়া ট্রাঙ্ক বন্ধ করিয়া 'ম'[১১]কে একখানি চিঠি লিখিলাম। অনেক কিছু লিখিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তাহা হইয়া উঠিল না। "স্নেহের ভাই, আমি চলিলাম, তোমার সংসার তুমি দেখ"—এই কথাগুলি লিখিয়াছিলাম। পশুপতি আমার সুখ দুঃখের সহচর। পশুপতিকে আলিঙ্গন দিয়া বিদায় লইয়া তাহার মারফৎ পত্রখানি 'ম'র কাছে পাঠাইলাম।

ভাবনাকে মনটা একেবারে আকুল। তখন পর্যন্ত ভারতের বাহির যাই নাই। পাঁচ বছর পূর্বে অবশ্য একবার বর্মায় গিয়াছিলাম। কিন্তু বর্মাটা ভারতের বাহিরে বলিয়া মনে হয় নাই। এইবারই আমার প্রকৃত দেশের বাহিরে যাইতে হইবে। বাপ, মা, ভাই, বন্ধু সব ছাড়িয়া কোথায় এক অপরিচিত স্থানে অজ্ঞাত লোকের মধ্যে চলিলাম, এই ভাবনাটায় বড়ই অস্থির হইলাম। সকলের চেয়ে দেশটিকেই ছাড়িয়া যাইতে হইবে বলিয়া প্রাণে দারুণ আঘাত লাগিল। কিন্তু উপায় নাই।

১০. মতিলাল রায়। ১১. জ্যোতিষচন্দ্র সিংহ

কর্তব্য সম্মুখে, পালন করিতেই হইবে। একবার দুর্বলতা আসিয়া বলিল, "তুমি বন্ধু-বান্ধব ছাড়িয়া বিদেশে যাইও না।" পরমুহূর্তেই আমি এটা যে আমার দুর্বলতার স্বর, বুঝিয়া মনকে দৃঢ় করিলাম।

১২টা বাজিলে আস্তে আস্তে পোশাক পরিয়া একটার সময়ে দুখানি ফার্স্ট ক্লাস ঘোড়ার গাড়ি ডাকিবার জন্য বলিলাম। গাড়ি দুইখানি আসিলে একটিতে গিরিজাবাবু এবং অপরটিতে আমি এবং শচীন উঠিয়া বসিলাম।

গাড়ি দুইখানি গড়ের মাঠের ধার দিয়া খিদিরপুরের দিকে যাইতে লাগিল। তখন মনের অবস্থা ভীষণ। ছেলেবেলার কথা, যৌবনের কথা, বাপ, মা, ভাই, বন্ধু, খেলার সাথীদের কথা একে একে প্রাণে উদয় হইল। প্রাণটা যেন বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম হইল। চক্ষের জল ঝর ঝর করিয়া পড়িতে লাগিল। শচীকে জড়াইয়া ধরিয়া "ভাই আমি দেশ ছাড়িলাম, খুব সাবধানে থাকিয়া কার্য করিও"—এই কথাগুলি বলিলাম।

আমি যে স্টিমারে চড়িব—তাহার নাম "সানুকিমারু" (Sanukimaru) —নিপ্পন য়ুসেন কোম্পানির জাহাজ, ৭৫০০ টন। "সানুকি" জাপানের একটি শহরের নাম। 'মারু' এই শব্দের অর্থ গোল। ইংরাজিতে যেমন জাহাজের নামের পূর্বে S. S. অর্থাৎ Steamship এই কথা লেখা থাকে, জাপানে তেমনি জাহাজের নামের পরে মারু শব্দ লেখা থাকে। যে জাহাজের নামের সঙ্গে "মারু" এই কথাটি আছে, সেটি জাপানি জাহাজ তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়।

"সানুকিমারু" ছয় নম্বর খিদিরপুরে ডকে ছিল। ছয় নম্বর ডকের ফটকে পৌছিবার দুই মিনিট পূর্বেই শচীন আমার গাড়ি হইতে নামিয়া যায়। সেই সময়ে গিরিজবাবুও তাঁর গাড়িখানি ফিরাইয়া দিলেন। রহিল কেবল আমার গাড়ি এবং আমি তাহাতে একেলা। শচীন এবং গিরিজাবাবু একটু দূরে দাঁড়াইয়া আমার জাহাজে নিরাপদে চড়াটা পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিল।

আমাদের বাসা হইতে গাড়ি করিয়া আসিবার সময়, আমার কাছে এ পর্যন্ত সদা সর্বদা রাত্রে শুইবার সময়েও যে গুলিভরা "মসার" পিস্তলটা ছিল, তাহা শচীকে দিয়া আসি। গাড়িতে উঠিবার সময় দেখি, শচী এবং গিরিজাবাবু দুজনেই এক একটা পিস্তল লইয়াছে।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"পিস্তল লইয়াছ কেন?" শচী এবং গিরিজাবাবু উত্তর দিল—"যদি কোনও গোলযোগ হয়, তাহলে পিস্তল দুটি থাকলে আপনাকে রক্ষা করতে পারব।"

শচী এবং গিরিজাবাবু আমায় কত ভালবাসিত এই ঘটনার উল্লেখে তার পরিচয় দিলাম। নিজেদের বিপদে ফেলিয়াও আমায় রক্ষা করিবার জন্য ইহারা সদাই প্রস্তুত।

আমি বলিলাম, "বাপু যদি পুলিশ জানিতেই পারে তাহলে দুটা পিস্তলে আর কি হবে? আমার জীবনের চেয়ে পিস্তল দুটির আবশ্যক বেশি, ও দুটি কোন জায়গায় রেখে যাও।"

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমাদের নিষ্ফলতার একটি প্রধান কারণ যে, আমাদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে অস্ত্র ছিল না। আমি তখন আমার জীবনের চেয়ে পিস্তল দুটির বেশি দাম বলিয়াই জানিতাম। তা ছাড়া, পিস্তল ব্যবহার না করিলে হয়ত কেবলমাত্র আমি একলাই ধরা পড়িব। কিন্তু আমায় রক্ষা করিতে গিয়া ইহারা যদি পিস্তল চালায় তাহা হইলে আমার সঙ্গে ইহারাও ধরা পড়িবে। সেই কারণে পিস্তল লইয়া যাইবার আবশ্যক নাই বলিয়া অনেক বুঝাইলাম। কিন্তু দুইজনেই গোঁ ধরিল, যে পিস্তল না লইয়া গেলে আমাকে মৃত্যুর মুখে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অনেক বলাতেও যখন রাজি হইল না, তখন আর কি করি? উহারা পিস্তল দুটি লইয়াই চলিল।

৬নং খিদিরপুর ডকে আমার গাড়িখানা আসিয়া পৌছিল। তখন বেলা ২টা। দ্বাররক্ষক বলিল, যে আর কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিতে হইবে। গাড়িতে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, "সানুকিমারু" হইতে একজন জাপানি কর্মচারি আসিয়া আমাদের জাহাজে চড়িবার জন্য বলিল। আমার গাড়ি ঠিক জাহাজের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। আমি জাহাজে উঠিয়া নিজের কেবিনে আশ্রয় লইলাম। গাড়োয়ান আমার তোরঙ্গ মাথায় করিয়া কেবিনে আনিল।

কেবিনে আর ভারতীয় কেহই নাই। একটু হিন্দুস্থানী জানা একজন জাপানি এবং দুইজন ইউরেশিয়ান। পূর্বেই বলিয়াছি, আমার টিকিট দ্বিতীয় শ্রেণীর 'Without food'. গাড়োয়ানকে ভাড়া এবং বকশিস দিয়া Purser এর কাছে যাইলাম। তিনি বেশ ইংরাজি জানেন। রাস্তায় খাওয়া দাওয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম যে Steward এর সঙ্গে কোন রকম বন্দোবস্ত হইতে পারে কিনা। তিনি Steward কে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। Steward আসিয়া বলিল, যে খাবার জন্য প্রত্যেক দিন সাড়ে তিন টাকা খরচ পড়িবে। ভাবিয়া দেখিলাম যে কোবেতে পৌঁছিতে একমাস লাগে, তা'হলে খাবার জন্যই আমার একশত টাকার বেশি লাগিবে। অথচ "with food" প্রথম শ্রেণির টিকিটের দাম মোট ২১২ টাকা—কাজেই দ্বিতীয় শ্রেণির টিকিটখানি (এটি ৮০ টাকায় খরিদ করিয়াছিলাম) সহ আহার্য প্রথম শ্রেণি করিয়া বদল করিলাম। তারপর নিজের তোরঙ্গটি প্রথম শ্রেণির কেবিনে আনাইলাম।

এ জাহাজখানা প্যাসেঞ্জার বোট নয়। আধা লোকযাত্রী ও আধা মালবাহী জাহাজ, সেইজন্য বেশি কেবিন ছিল না। প্রথম শ্রেণিতে কেবলমাত্র তিনটি কামরা। একটিতে দুইজন জাপানি, একটিতে একজন জু মেয়ে এবং তৃতীয়টিতে আমি আর একজন সুরাটবাসি মুসলমান। তিনি কোবেতে একজন ভারতবাসীর দোকানের চাকর। তৃতীয় শ্রেণির অর্থাৎ নিচের ডেকে যাত্রীদের অধিকাংশ শিখ এবং দুইজন সীমান্ত পারের (Trans-Frontier) পাঠান ছিল। শিখেরা সব চায়না যাইতেছে, আর পাঠান দুটি জাপান হইয়া আমেরিকায় যাইবে। সিঙ্গাপুর যাত্রীও ৭/৮ জন up-country র লোক ছিল।

Purser কে আমি প্রথমেই বলিয়াছিলাম যে আমি একজন ছাত্র, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছি। আমার নাম 'Tagore' দেখিয়া সে আমায় জিজ্ঞাসা করিল, আমার সঙ্গে রবিবাবুর কোন সম্পর্ক আছে কি না। আমি বলিলাম যে দূর সম্পর্ক আছে তবে একই বংশ, এখন আলাদা আছে। আমি যে ঠাকুর বংশের লোক এটা জানিয়া Purser খুব আনন্দিত। Dr. Tagore সম্বন্ধে অনেক কথাই জিজ্ঞাসা করিল এবং আমি যথাযথ তার উত্তর দিলাম। তারপর আমি যে ছাত্র ও জাপানী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িবার জন্য যাইতেছি, এটা জানিয়া আমাকে জাপানের শিক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলিল। শেষে জাপান যে ভারতের মিত্র এবং ভারতকে স্বাধীন দেখিলে জাপান যে খুব আনন্দিত হইবে, তাহা বুঝাইল।

নিজের কেবিনে তোরঙ্গ রাখিয়া আসিয়া ডাইনিং রুমের সামনে ডেকের উপর পায়চারি করিতেছি, এমন সময় দেখি যে শচী দূরে দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ইসারা করিয়া বলিলাম, যে সমস্ত মঙ্গল এবং সে বাসায় ফিরিয়া যাউক। আমার ইসারা বুঝিয়া শচী আস্তে আস্তে ফটকের দিকে গেল। কিছুক্ষণ পরে দেখি যে শচী তখনও অপর দিকে দাঁড়াইয়া আছে। শচী যে আমার জন্য কত উদ্বিগ্ন তা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছিল। কিন্তু তবু আমি ইসারা করিয়া ফিরিয়া যাইবার জন্য বলিলাম।

ইতিমধ্যে ডাক্তারের পরীক্ষা আরম্ভ হইবে এই কথা শুনা গেল। আমি ডেকে একটা আরাম কেদারার উপরে বসিলাম। ডাক্তার একজন বাঙালি, কোট প্যান্ট পরিয়া হ্যাট মাথায় ডাক্তার সাহেব আসিলেন। তৎক্ষণাৎ Captain এবং Purser তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ডাইনিং রুমে লইয়া গিয়া ২/১টি হুইস্কি পেগ খাওয়াইলেন। তারপর Passenger list তাঁহাকে দেওয়া হইল। প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের তিনি আর দেখিলেন না। সাধারণতঃ সব স্থানেই প্রথম শ্রেণির যাত্রীদের ডাক্তারেরা পরীক্ষা করেন না। অবশ্য তাহাদের মধ্যে যদি কেহ পীড়িত থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র দেখে। আমাদের বেলায়ও তাহাই হইল। ভাবিলাম, যাক একটা বিপদ কাটিল। তারপর তিনি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণির যাত্রীদের দেখিলেন। তৃতীয় শ্রেণির আরোহীদের মধ্যে দুজনের ছোঁয়াচে রোগ ছিল বলিয়া নামাইয়া দেওয়া হইল।

ডাক্তারের পরীক্ষা শেষ হইবার পর, পুলিশ আসিয়া হাজির। দুইজন সাহেব এবং দশজন দেশীয় কনস্টেবল। ভাবিলাম ব্যাপার গুরুতর! অত পুলিশ কেন আসিতেছে? জাহাজে পুলিশের কি কাজ আছে? তবে কি উহারা খবর পাইয়াছে যে আমি এখানে আছি? দিনের বেলায় এত লোকের মধ্যে হইতে পালান সম্ভব নয়। এই রকম ভাবিতেছি, এমন দেখি যে কেবল মাত্র একজন সাহেব পুলিশ অফিসার আমাদের অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর কেবিনের দিকে আসিতেছে এবং অপর সকলে নিচে অপেক্ষা করিতেছে। সে ডেক দিয়া সোজা ডাইনিং রুমে গেল। আমি ঠিক ডাইনিং রুমের সামনে ডেকে আরাম কেদারায় বসিয়া আছি এবং সে সময় একটি 'Englishman' সংবাদপত্র পড়িতেছি, অর্থাৎ পড়িবার ভান করিতেছি।

সাহেবটি ডাইনিংরুমে আসিলেই Captain এবং Purser তাহাকে পূর্বের ডাক্তারের মতন হুইস্কি সিগার ইত্যাদি দিয়া অভ্যর্থনা করিল। তারপর তাহাকে যাত্রীদের একটা তালিকা দিল। প্রথম শ্রেণির আরোহীদের মধ্যে আমি এবং আর একজন ভারতবাসী। আমাদের সম্বন্ধে Purserকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিল যে একজন বণিক এবং অপরটি অর্থাৎ (আমি) Tagore Familyর লোক, জাপানে পড়িবার জন্য যাইতেছে। সাহেব এতেই একেবারে সন্তুষ্ট। আর কোনও কথা না বলিয়া Purserকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণির কেবিনে গিয়া প্যাসেঞ্জারদের দেখিয়া পরে ডেক যাত্রীদের পরীক্ষা আরম্ভ করিল। নাম, ধাম, কোথায় যাইবে ইত্যাদি অনেকে রকমের জেরা চলিল। তাহার ফলে এই হইল, যে দশ জন শিখকে জাহাজ হইতে নামাইয়া দেওয়া হইল এবং দুইজনকে পুলিশ ধরিয়া লইয়া গেল।

পুলিশ চলিয়া গেলে, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চেয়ার ছাড়িয়া খাবারের ঘরে গেলাম। কাপ্তেনকে দেখিয়া জাহাজ কখন ছাড়িবে জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি বলিলেন, রাত ১১টার সময়। জাহাজটি কলিকাতা ছাড়িয়া বাহির হইলেই নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু আরও ৭ ঘণ্টা এখানে থাকিতে হইবে। উপায় নাই।

কিছুক্ষণ পরেই খাবার ঘণ্টা বাজিল। ঠিক কাপ্তেনের দক্ষিণ পার্শ্বে আমার স্থান, তারপর Petty officers, কাপ্তেনের বাম ভাগে বড় ইঞ্জিনিয়ার, তার পার্শ্বে জাপানি যাত্রী দুটি, তারপর জু মেয়েটি, তারপর ডাক্তার এবং পেটি অফিসারেরা। অর্থাৎ আমাকে কাপ্তেনের দক্ষিণ দিকের প্রথমে বসাইয়া সম্মানের জায়গাটা দিয়াছিল। Menuতে দেখি ১০/১২ টা Course, সব বিলাতি ডিস, এত খাওয়া অভ্যাস নাই, খাইতে পারিব না। মাঝখানে দেখি Rice curry লেখা আছে। ছেলেবেলা অবধি এটা খাইতেছি, কাজেই এটাও তালিকার মধ্যে আছে জানিয়া খুব খুশি। 'বয়'কে বলিলাম, দেখ অন্য ডিস্‌গুলি আমার দরকার নাই তুমি আমায় ভাত তরকারি যথেষ্ট পরিমাণে আনিয়া দাও। সে তাই করিল। সেইদিন অবধি সকাল, দুপুর এবং সন্ধ্যা তিন বারই আমায় ভাত-তরকারি দিত। জাহাজে আমাদের ৫ বার খাইতে হইত। সকালে টোস্ট এবং কফি বা চা। ৯টার সময় regular খাবার (Break fast) ১টার সময় আবার regular খেঁট, (Lunch) ৩টার সময় বিস্কুট, কেক্ ও চা, ৫টার সময় regular খাবার (dinner)। ৯, ১, এবং ৫টার সময় প্রায় ১২টা করিয়া জিনিস দিত।

Dinner শেষ করিয়া ডেকে একটু পায়চারি করিবার পর সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তখন নিজের কেবিনে সাহেবি পোশাকটি ছাড়িয়া ধুতি পরিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলাম। সমস্ত দিনের উদ্বেগ চাঞ্চল্যে শরীরটা একটু ক্লান্ত হইয়াছিল। শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম। ঘুম যখন ভাঙিল তখন রাত্রি ১১টা। বোধ হইল জাহাজখানা একটু নড়িতেছে। দরজা খুলিয়া বাহিরে গিয়া দেখি যে জাহাজ নঙর উঠাইতেছে। নঙর উঠান হইলে জাহাজখানা আস্তে আস্তে গঙ্গার মধ্যে আসিয়া সাগরের অভিমুখে চলিল। ক্রমশঃ কলিকাতা অন্ধকারে বিলীন হইল গেল, কেবল তাহার Electric এবং Gas light দেখা যাইতে লাগিল। এইরূপে আমি আমার বড় সাধের জন্মভূমি ছাড়িয়া চলিলাম। অন্ধকার ডেকের উপর একলা দাঁড়াইয়া খুব কান্না পাইল।

কালীচরণ ঘোষ

বিপ্লবের উৎস*

কালপ্রবাহে এমন এক-একটা সন্ধিক্ষণ আসে যখন সব অসম্ভব ঘটনা একসঙ্গে ঘটে এবং সাধারণ বিচারবুদ্ধিতে তার কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। ভারতের ইতিহাসে ১৮৯৩ সাল সেইরকম একটি বছর যা ভবিষ্যৎ ইতিহাসে গভীর রেখাপাত করে রেখেছে।

বাংলার বিপ্লবযজ্ঞের হোতা অরবিন্দ ভারতবর্ষে পৌঁছলেন ১৮৯৩ সালে, আর আসার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কেবল বাংলার নয়, ভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে একটা বড়রকম সাড়া পড়ে গেল। গণ-আন্দোলনে বিপ্লবের রশ্মিপাত করেন তিলক গণপতি ও শিবাজী উৎসবের ভিতর দিয়ে। ঐ সালেই শিকাগোতে স্বামী বিবেকানন্দের যুগান্তকারী বক্তৃতা, আর অ্যানি বেশান্টের ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ। আরও ঘটে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সভ্যপদের জন্য দাদাভাই নওরোজির বিজয়।

এসকলের মধ্যে অরবিন্দর অভ্যুত্থান চিরস্মরণীয় ঘটনা। ইংলণ্ড পরিত্যাগের আগেই তিনি ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের গতি-প্রগতি অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছেন। ভারতে ফিরে তাঁকে শিক্ষানবিশী করতে হয়নি। 'ইন্দু প্রকাশ'-এ প্রথম প্রবন্ধ বেরোয় ১৮৯৩ আগস্ট ৭ই এবং অনিয়মিতভাবে হলেও সেটা চলে ১৮৯৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। (সব কয়টি প্রবন্ধর নকল শ্রদ্ধেয় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের নিকট টাইপ-করা অবস্থায় দেখার সুযোগ পেয়েছিলাম।)

'ইন্দু প্রকাশ' পত্রিকায় "পুরাতনের স্থলে নতুন বর্তিকা" প্রবন্ধাবলী কেমব্রিজের বন্ধু এবং পত্রিকা-সম্পাদক কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে লেখা। গোটা দুই প্রকাশিত হবার পর যখন সেগুলি জোঁদা, প্রবীণ রাজনীতিকদের চোখে পড়ল, তখন তাঁরা আঁতকে উঠলেন। বাংলায় বিপ্লবের পাকা ভিত সেদিন স্থাপিত হ'ল। কালক্রমে সেই বজ্রাগ্নি-লিখন সারা ভারতকে উদ্ভাসিত ক'রে, বিস্ফোরণের বিকট শব্দে বুঝিয়ে দিল—সুপ্তোত্থিত ভারত "রণং দেহি" বলে মেতে উঠছে।

কংগ্রেস তখন রাজনীতিক্ষেত্রে একাধিপত্য বিস্তার করছে ; ফিরোজ শা মেহ্‌টা প্রভৃতি ধুরন্ধরগণ কংগ্রেসের কর্ণধার। যারাই কিছুটা রাজনীতি চর্চা করেন, তারা সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের অন্তর্গত ; তাঁরা সরকারের বিপক্ষে উৎকট বিরুদ্ধ ভাব বা ভাষা কোথাও না থাকাতে বাৎসরিক সভায় নরম-গরম বক্তৃতা দিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেন।

সেই একটানা সুরে খাদ এসে পড়ল। তখনও অ-খ্যাত অরবিন্দ বলেছিলেন, "কংগ্রেস একটা ভ্রান্ত পথ ধরেছে এবং সে-পথে ভারতের মুক্তি নেই।" বলা বাহুল্য, সে-যুগে কংগ্রেস 'মুক্তি'র কথা চিন্তাই করতে পারেনি। কর্ণধারদের কাছে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনই তখন তার পরম ও চরম লক্ষ্য।

বলে চললেন অরবিন্দ—"কংগ্রেস পুরানো হয়ে গেছে, তাতে পচন আরম্ভ হয়েছে। নতুন করে ঢেলে সাজা প্রয়োজন। তাজা রক্ত না জন্মালে শক্তিহীন ক্ষীণ হয়ে কংগ্রেস নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেবল ধনী ও শিক্ষিতদের ছাড়া কংগ্রেস সমস্ত জাতিকে উদ্‌বুদ্ধ করতে পারেনি। বিরাট জনসংখ্যার সঙ্গে এর কোনও যোগাযোগ নেই, কাজেই এতে জনমানসের প্রতিচ্ছবি দেখতে পাওয়া

* জাগরণ ও বিস্ফোরণ। ১ম খণ্ড। পৃ. ৯২-১০৪

যায় না। আছে এতে 'বনার্জ্জি' (ডব্লু-সি), 'ব্যানার্জ্জি' (সুরেন্দ্রনাথ) ও 'ঘোষ'রা (লালমোহন ও মনোমোহন) এবং মাত্র মুষ্টিমেয় লোক সমগ্র ভারবাসীর প্রতিনিধিত্ব করছেন। তা দিয়ে আইনসভার ভারতীয় সভ্যসংখ্যা বাড়তে পারে, সমকালে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা ভারতে ও ইংলণ্ডে পরিচালিত হতে পারে, এখানে ওখানে দু-একটা বড় পদে ভারতীয় নিযুক্ত হতে পারে বা এই জাতীয় ভেক বা মেকি সংস্কার আসতে পারে, তার বেশি আর কিছু সম্ভব নয়। এইভাবে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আনতে আনতে ভারতের নামটাই বজায় থাকবে, প্রকৃতপক্ষে ইংরেজ রাষ্ট্রনায়কগণের অঙ্গুলি-হেলনে ভারতের সকল স্বার্থ উপেক্ষিত হয়ে যাবে। শত মৌখিক প্রতিবাদ এবং দীর্ঘ 'রেজলিউশন' ছেঁড়া কাগজের টুকরায় পর্যবসিত হবে।

"বিরাট মূক জনগণের প্রতিনিধি এই কংগ্রেস। কিন্তু তাদের সুখ-দুঃখের কথা, অনাহার, অর্ধাহার, নিরক্ষরতা, চিররুগ্নাবস্থা, শিল্পনাশ, লুণ্ঠনের দ্বারা দারিদ্র্য-সৃষ্টি প্রভৃতি অবাধে চলে যাচ্ছে, কংগ্রেস তাকে রোধ করতে পারছে না বলে তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ সে-বিষয়ে একটা বিধিবদ্ধ কর্মধারা পর্যন্ত নেই।

"নেতৃবৃন্দ মনে করেন এইরকম কোনও পথ অবলম্বন করতে গিয়ে জোর করে কিছু বলতে গেলে, শ্বেতাঙ্গ রাজপুরুষরা ক্ষিপ্ত হবে, তাদের পরিচালিত পত্র-পত্রিকা রাজদ্রোহী বলে গর্জন করে উঠবে, সর্বশক্তি দিয়ে ইংরেজ সকল দাবি দমন করে দেবে। মডরেট নেতাদের ভয়ে যতটুকু হচ্ছে তাও বন্ধ হয়ে যাবে।"

অরবিন্দ আরও লিখছেন—"কিছুই তো হচ্ছে না, দেশ ক্ষয়ের দিকে চলেছে অব্যাহত গতিতে। অসহায় দর্শকরূপে নেতৃবৃন্দ সেই সর্বনাশ দেখে যাচ্ছেন। কোথাও এক-আধটা বক্তৃতা দিয়ে, প্রবন্ধ বা বই ছাপিয়ে আসল চিত্র দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু জোর করে প্রকৃত অবস্থার কথা বলবার লোকও নেই। এই ধ্বনি সাধারণের কানে জোর করে আঘাত করলে, তারাই একদিন প্রতিকারের জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠবে এবং তাদের ন্যায্য দাবির প্রচণ্ডতা রোধ করার শক্তি কারও থাকবে না; ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

"এই বিরাট জনশক্তিকে বিপ্লবের পথে পরিচালিত করা ভারতের জননায়কদের কর্তব্য। সে কর্তব্যে দারুণ অবহেলা তো আছেই, বরং কংগ্রেসকে ভুলপথে চালিত করা হচ্ছে। নেতামাত্রেই স্বার্থদুষ্ট, এ কথা মনে করবার কারণ নেই, কিন্তু তাদের দূরদৃষ্টির অভাব আজ সব বানচাল করে দিতে বসেছে। এখন সময় এসেছে যখন আমাদের কর্মপ্রচেষ্টা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হয়; দাবি উত্তরোত্তর বিস্তৃতক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার শক্তি বৃদ্ধি পায়।

"বিদেশি শাসকবর্গের কাছে সুবিচার প্রার্থনা করা এবং তার ফললাভের জন্য নিশ্চেষ্ট বসে থাকা আত্মপ্রবঞ্চনার নামান্তর। নানা দুর্বলতা জাতির অন্তরে বাসা বেঁধে রয়েছে, তাকে দূর করতে শক্তিচর্চা করতে হবে। নিজে শক্তিহীন হয়ে পরের কাছে যাচ্ঞা করে কোনও জাত বড় হতে পারেনি। যার মেরুদণ্ড দুর্বল তাকে যত উৎসাহই দেওয়া যাক, সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। সমস্ত জাতির মধ্যে শক্তির তেজের প্রবাহ ছড়িয়ে দিতে হবে, মানুষ নিজেকে চিনে তার নিজের পথ বেছে নিয়ে সুদৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে ; তখন তার গতি দুর্বার হবে, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না, সাহসও করবে না। অন্ততঃ দু'পক্ষের একটা কঠোর শক্তিপরীক্ষা হবে; আর দৃঢ়চিত্ত জাতি পরাধীন হলেও যথাকালে স্বপ্রতিষ্ঠিত হবেই হবে।

"ভারতবাসীর শত্রু বাইরে যতটা, তার চেয়ে দেশের ভিতর অনেক বেশি। নানা দুর্বলতা দেশের সকল অস্থিসন্ধি ছেয়ে রয়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, মনের শক্তি, কাম্যবস্তুর প্রকৃত চিত্রের অভাব, আত্মকলহ, পরস্পর দ্বেষ, ভেদবুদ্ধি, স্বার্থপরতা, সাম্প্রদায়িক কলহ প্রভৃতি তো আছেই, সঙ্গে আছে বিদেশির উস্কানি। দেশের অভ্যন্তরের সকল দুর্বলতা দূর করতে না পারলে লক্ষ্যে পৌঁছুবার কোনও সম্ভাবনা নেই। পথের মাঝেই স্রোতের গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং সকল মোহ পরিত্যাগ

করে আত্মসম্বিৎ ফিরে পেতে হবে এবং তার জন্য সকল প্রকার চেষ্টা করে চলতে হবে।"

এসব কথা জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হিসাবে তিনি উচ্চারণ করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হবার নানা ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের নানা ত্রুটির কথা বলেও অরবিন্দ ক্ষান্ত হননি। বাংলায় এসে বিপ্লবাত্মক আন্দোলনের নেতৃত্ব করবার পূর্বে তিনি আসন্ন সংগ্রামের জন্য সশস্ত্র প্রস্তুতির কথা প্রকাশ্যে বলেছিলেন। হাতিয়ার নেই বলে নিরুৎসাহ হবার বা নিশ্চেষ্ট থাকবার কথা তিনি মনে স্থান দেননি।

তাঁর বক্তব্য : বিপ্লব (সশস্ত্র) আনতেই হবে, কিন্তু এটা কেবলমাত্র কয়েকজন সাহসী বিপ্লবীর বিপদবরণ বা ত্যাগের মধ্য দিয়ে হওয়া সম্ভব নয় ; এর পশ্চাতে প্রকাণ্ড জনসংখ্যার দেশপ্রেমজাত প্রচণ্ড বিক্ষোভের সমর্থন থাকা চাই। তা না হলে কয়েকজন কর্মী বেছে বেছে ধরে সাজা দিলে সমস্ত আন্দোলন বানচাল হয়ে যেতে পারে। সুতরাং বিপ্লবী মনোভাব গড়ে তোলার এবং তাতে শক্তি-সংযোজনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে রাখতে হবে।

অরবিন্দ সশস্ত্র হিংসাত্মক বিপ্লব সমর্থন করতেন না, এ কথার কোনও ভিত্তি নেই। **তিনি সংগ্রামী গুপ্ত-সমিতির সমর্থক ছিলেন** ("joined the secret society whose purpose was to prepare a national insurrection")। তিনি 'ব-কলমায়' বলেছেন,—"he had studied with interest the revolutions and rebellions which led to national liberation". যে-সকল বিপ্লব ও বিদ্রোহ পরাধীন দেশকে স্বাধীন করেছে, তিনি সে-সকলের ইতিহাস অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করেছিলেন ; এবং "the struggle against the English in mediaeval France and the revolts which liberated America and Italy"—ইংরেজের বিরুদ্ধে মধ্যযুগের ফ্রান্সের সংগ্রাম এবং সেই সকল বিদ্রোহ যার সাহায্যে আমেরিকা ও ইটালী পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তিলাভকে উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করেছেন। *(Aurobindo on Himself, P. 35)*

স্বাধীনতা-লাভের আন্দোলন কি পথ নেবে, তিনি সে-সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৮৯৩ সেপ্টেম্বর ১৮ তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের গুণগান করেন 'ইন্দু প্রকাশ'-এর প্রবন্ধে। ইংলণ্ডের শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে প্রজা বা সামন্তশক্তির বিরোধের কথা তুলে তিনি উদাহরণস্বরূপ বলেন যে, রণিমীড (Runnymede) থেকে হল্ (Kingston-on-Hull)-এর হাঙ্গামায় পৌছুতে ইংলণ্ডের সাত (?) শতাব্দী লেগেছিল, কিন্তু তার প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভিন্ন পথ ধরেছিল। এখানে উল্লেখ করা দরকার যে রণিমীড-এ ১২১৫ জুন ২-রা সম্রাট জন্‌কে দিয়ে ইংরাজ সামন্তশক্তি ম্যাগ্‌না-কার্টা সই করিয়ে নিয়েছিল। আর, হল্ সহরে ১৬৪৩ সালে সম্রাট চার্লস-এর সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বস্ত করেছিল স্থানীয় গণতন্ত্রীদলের নেতারা। তারা স্লুইস গেট ("কপাটে কল") খুলে দিয়ে সহরের ঘেরা পরিখা সাহায্যে জল এনে আশপাশ সমস্ত অঞ্চল ভাসিয়ে দিলে, সম্রাটের দলবল অবরোধ তুলে নিয়ে চলে যেতে বাধ্য হয়। অত্যাচারী সম্রাটদের বিরুদ্ধে যে বিরুদ্ধশক্তি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে, এই উদাহরণ অরবিন্দ পাঠকদের নিকট উপস্থাপিত করলেন।

কিন্তু ঐ প্রবন্ধেই আরও গুরুতর ঘটনার উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রনীতির আমূল পরিবর্তন অমন সহজ সরল পথে এবং সুচারুরূপে হয়নি। বরং সেখানে তারা রক্ত ও অগ্নিপরীক্ষায় পাপমুক্ত হয়েছিল ("the first step of that fortunate country towards progress was not through any decent or orderly expansion, but by a purification of blood and fire")। ইংলণ্ডের সঙ্গে তুলনায় ফ্রান্সের রক্তবিপ্লবকে তিনি অভিনন্দন জানালেন। তিনি বললেন—"এখানে সম্ভ্রান্ত শান্তশিষ্ট নাগরিকের সভা এই পরিবর্তন সাধন করেনি ("It was not a convocation of respectable citizens but the vast and ignorant proletariate .... that blotted out in five terrible years the accumulated oppression of seven centuries") : করেছিল অজ্ঞ বিশাল জনতা এবং তারা ভয়াবহ পাঁচ বছরে সাত শতাব্দীর সঞ্চিত

অত্যাচার, অনাচার ধুয়ে মুছে ফেলেছিল।

এরপর অরবিন্দর নির্দিষ্ট পন্থার কথা নিয়ে আর আলোচনার অবকাশ নেই। তিনি বিপ্লবী দলের কর্ণধার হয়ে বাংলায় বসেন ১৯০৬-এ, আর প্রবন্ধটি লেখা ১৮৯৩ সালে, অর্থাৎ অন্ততঃ বারো বছর আগে।

তিনি ব্যাপক বিক্ষোভ গড়ে তোলার জন্য দেশকে প্রস্তুত হবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। **গভর্নমেন্টের মতে, অরবিন্দ সারা ভারতবর্ষকে ইংরেজ বিদ্বেষের ক্ষেত্রে একসূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন, যাতে একস্থানে বিদ্রোহ দমিত হলে আর-একস্থানে প্রচণ্ডভাবে ফেটে পড়তে পারে।**

বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টায় তিনি নূতন ধারার প্রবর্তন করেন। আরাম-কেদারায় বসে, গায়ে একটিও আঁচড় লাগতে না দিয়ে, কেবল ফতোয়া ঝাড়া আর বাৎসরিক বক্তৃতা দিয়ে দেশের স্বার্থরক্ষার কিছুই হবে না ; তার ওপর তিনি নিজ আচরণে দেখালেন, স্বার্থত্যাগ করে দেশের সেবা করতে হবে, ক্ষয়-ক্ষতি সহ্য করতে হবে। নিজ স্বার্থ অপেক্ষা দেশের কল্যাণ যে ঢের বেশি বাঞ্ছনীয়, সে-কথা তিনি প্রত্যক্ষ প্রমাণ করেছিলেন।

তাঁর সহকর্মীরা বুঝতে পেরেছিল, এর পরের স্তর নির্যাতন, যেখানে জেল, জরিমানা ভোগ করা থেকে ফাঁসিকাষ্ঠে প্রাণ দান করতে হবে। সাহসী মন চাই, যা অকাতরে সকল বিপদ-আপদ উপেক্ষা করে লক্ষ্যস্থলে নিয়ে পৌঁছে দেবে। হয়ত নিজ জীবনে পূর্ণ না-হবার সম্ভাবনা খুবই কম, কিন্তু বর্তমানের আদর্শে ভবিষ্যৎ "সন্তানদল" গড়ে উঠবে, যারা ত্যাগ, শৌর্য, নিষ্ঠা, সেবা দ্বারা নিজেদের যশ ও দেশমাতৃকার গৌরব বৃদ্ধি করবে।

অরবিন্দর নিজের ভাষায়—**"আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই। বিদেশির আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই** আমাদের রাজনীতির **লক্ষ্য।"**

অরবিন্দই সর্বপ্রথম প্রকাশ করে বলেন—**"পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া 'স্বরাজ' কথার অন্য অর্থ নেই।"** সখারাম গণেশ দেউস্কর "স্বরাজ" শব্দটি সর্বপ্রথমে ব্যবহার করেন এবং ১৯০৬ সালের কংগ্রেসে দাদাভাই নওরোজি সভাপতিরূপে সেটি গ্রহণ করেন ; কিন্তু তার প্রকৃত অর্থ তখন সাহস করে কেউ বলেনি। এটা অরবিন্দর জন্য তোলা ছিল ; "বন্দে মাতরম্" পত্রিকা সে-বাণী প্রচার করে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূর্তি ও মন্ত্রদান করলেন ; বিবেকানন্দ তাতে করলেন প্রাণপ্রতিষ্ঠা; অরবিন্দ তাঁকে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে আবির্ভূত করলেন দেশের সামনে।

সমসাময়িক কালে অপর যাঁরা এ-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন অগ্রদূত। প্রকৃতপক্ষে গোড়ার দিকে ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার ও বন্ধু যতীন্দ্রনাথ অরবিন্দর দুই বাহুস্বরূপ মনে করা যেতে পারে। যতীন্দ্রনাথ বাংলার মাটিতে বিপ্লব-মন্ত্র কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের জন্য বরোদা থেকে প্রেরিত হয়েছিলেন, এটা পরম গৌরবের বিষয়।

যতীন্দ্রনাথের মনে দুটি ভাব অতি প্রবল এবং সামন্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয়েছিল। যদি তাঁকে আনন্দমঠের সন্তানদলের সঙ্গে তুলনা করা যায়, তা হলে খুব ভুল হবে না। একদিকে সাংসারিক জীবনে বৈরাগ্য, সন্ন্যাসের প্রতি আসক্তি ; আবার দেশপ্রীতি, দেশের পরাধীনতায় বেদনাবোধ—তাঁর জীবনের আর একটা দিক।

তদানীন্তন ভারত সরকারের নির্দেশ ছিল বাঙালিকে কোনও স্থানে সামরিকবিভাগে স্থান না-দেওয়া। নানা স্থানে চেষ্টা করে তিনি বিফল হন, অথচ তাঁর বিশ্বাস, ইংরেজের সঙ্গে লড়াই করে তাকে তাড়াতে না পারলে সে বিদায় হবে না। সুতরাং যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্য যে উপায়েই হোক সৈন্যবিভাগে প্রবেশলাভ করতেই হবে। তাঁর মানসিক প্রস্তুতির পরিচয় কিছুটা মেলে যখন দেখা যায় তিনি সে-যুগেই একখানা ব্লক্ (bloch)-লিখিত *Modern Warfare* (আধুনিক যুদ্ধপ্রকরণ) সংগ্রহ করেছিলেন, যেটা থেকে বারীন্দ্র কর্তৃক 'বর্ত্তমান রণনীতি' বইখানা লেখা হয়। আলিপুর বোমার মামলায় তাঁকে ব্লক্-লিখিত বইখানা কাছে রাখার জন্য জবাবদিহি

করতে হয়েছিল। তিনি সেনাবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং বইখানি তাঁর অধিকারে রাখা তত দোষাবহ মনে না হওয়ায় তিনি নিষ্কৃতি পান।

বাঁকিপুর ও এলাহাবাদে (রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত "কায়স্থ পাঠশালা"য়) শিক্ষা সমাপনান্তে তিনি উপযুক্ত কাজের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। কোথায় এবং কি উপায়ে সেনাবিভাগে ঢুকতে পারেন, তার অনুসন্ধান হ'ল তাঁর সর্বপ্রধান প্রচেষ্টা। বরোদায় এক প্রভাবশালী বাঙালি আছেন, তার দ্বারা কিছু সুবিধা হতে পারে, এই মনে করে ১৮৯৯ সালে সেখানে এসে উপনীত হন। তিনি যার সন্ধানে এলেন, তিনি অরবিন্দ ঘোষ। সামরিক বিভাগে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যে যতীন্দ্রনাথ আশ্বারোহী (trooper) শ্রেণিতে নিযুক্ত হন।

বরোদায় আসবার পর থেকেই আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা আহরণের জন্য তিনি বিশেষ উৎসুক হয়ে ওঠেন। বুদ্ধি, শারীরিক শক্তি এবং আগ্রহের পরিচয় পেয়ে, মাধব রাও যাদব নামে অশ্বারোহী বিভাগের একজন উর্ধ্বতন পর্যায়ের নায়ক তাঁকে বিশেষভাবে শিক্ষাদান করেন।

বরোদায় অরবিন্দর সান্নিধ্য ও ঘনিষ্ঠ আলোচনার সুযোগে তিনি ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা করে নিয়েছিলেন। অরবিন্দ তাঁকে "exceedingly energetic and capable" বলে মনে করলেন, এবং ১৯০০ সালে বাংলায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রধান উদ্দেশ্য, বাংলায় ছোট ছোট বিপ্লবী কেন্দ্র গড়ে তোলার চেষ্টা করা এবং খুঁজে খুঁজে তার সভ্য যোগাড় করা।

কলিকাতায় এসে তিনি সুরেন্দ্রনাথ, পি. মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সরলা দেবী, চিত্তরঞ্জন প্রমুখ কয়েকজন দেশপ্রেমিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পি. মিত্র প্রথম হতেই দোস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এ সময় "একলা চল রে" নীতি গ্রহণ করে যতীন্দ্রনাথ বন্ধুর পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়েছেন। বারীন কলিকাতা এলে তাঁর পূর্বপরিচিত একজন সহকর্মী পেয়েছিলেন। **যতীন্দ্রনাথই বাংলায় বিপ্লবী ভাবধারা বহন করে এনে কলিকাতায় সর্বপ্রথম বিপ্লবীসঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন**, এ কথা স্মরণ করলে হৃদয় কৃতজ্ঞতায় ভরে ওঠে।

১৯০২ সালে বারীন্দ্র এলেন কলিকাতার হাল-চাল দেখতে ; মফঃস্বলেও সামান্য ঘোরাঘুরি করে তিনি বরোদায় ফিরে যান। এরই পরে বারীন (১৯০৪) কলিকাতায় আসেন এবং অল্পকালের মধ্যে পি. মিত্র, যতীন ও বারীনের মধ্যে মতান্তর হয়। যতীন্দ্রনাথ তিক্ততা এড়াবার জন্য কলিকাতা ছেড়ে চলে যান। প্রকৃতপক্ষে এর পর অনুশীলন বা যুগান্তর—কোনও দলেরই সঙ্গে তাঁর কোনও যোগাযোগ ছিল না।

সাধারণতঃ যতীন্দ্রের এই পর্যন্ত পরিচয় হয়ত বিপ্লবের পথে যথেষ্ট বলে মনে করা যেত। মনটা তাঁর ত্যাগের দিকে ঝুঁকেছিল বেশি, সুতরাং তিনি সন্ন্যাস নিয়ে কার্যক্ষেত্র থেকে বিদায় নিলে বিশেষ বলবার কিছু ছিল না। কিন্তু বিধাতা তাঁকে ভিন্ন ধাতুতে গড়েছিলেন। কলিকাতায় কর্মক্ষেত্রের বাইরে বিপ্লবের কাজের জন্য সারা ভারত, বিশেষতঃ উত্তর ভারত পড়ে রয়েছে; সে কথা তাঁর বিপ্লবী মন একবারও ভোলেনি। আরও একটা বিষয় ছিল তাঁর বিশেষ প্রিয়। বরোদায় তিনি লক্ষ্য করেছিলেন, অরবিন্দর পরামর্শদাতা ঠাকুরসাহেব ইংরেজের বেতনভুক্ ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে ইংরেজ-বিদ্বেষ প্রচার করতে মনোনিবেশ করেছেন। যতীন্দ্রনাথ মনে করলেন, তাঁর যাযাবর জীবনে তিনি এ-কাজ নিপুণভাবে সম্পন্ন করতে পারবেন। তাই লোকে যখন জানলো তিনি কুটিল কর্মপন্থা ত্যাগ করে বিবাগী হয়ে গেলেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সে-সময় দেশের মঙ্গলে এই নতুন বিপদসঙ্কুল পথ বেছে নিয়েছিলেন।

১৯০৩ সালে তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অরবিন্দ ও বারীনের উপস্থিতিতে গ্রামের ভিটা চান্নায় শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন করে তিনি প্রায় নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। তিনি চলেছেন, আর কেউ সংবাদ না রাখুক, বাংলার পুলিশ তাঁর পিছন ছাড়েনি ; দূর থেকে তাঁর কার্যকলাপ লক্ষ্য করে চলেছে। তাদের কথায় জানা যায়, তিনি কলকাতা ছেড়ে বেরিয়ে প্রথম বছরটা দার্জিলিং ও নেপালের

তরাই অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। এইখানে বৈপ্লবিক কার্যের কোনো প্রচেষ্টা করেছেন বলে সন্ধান পাওয়া যায় না।

পর বৎসর তিনি চলতে শুরু করে প্রথমে যান তিব্বত এবং সেখানে মনে হল যেন জীবনের খেই হারিয়ে যাচ্ছে। শক্ত করে মন বেঁধে নিয়ে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের দিকে যাত্রা শুরু করলেন। পথে যেখানে সামরিক ছাউনি পেয়েছেন, সেখানে তিনি আলাপ জমাতে চেষ্টা করেছেন। এইভাবে তিনি গাড়োয়াল এবং হরদৈ জেলার নয়াশরণ অরণ্যে কিছুদিন কাটিয়ে দেন। এতে এক বৎসর অতিবাহিত হয়ে যায়।

তৃতীয় বৎসরে, ১৯০৬ সাল নাগাদ তিনি আলমোড়া আসেন এবং সেখান থেকে পঞ্চনদের বিভিন্ন অঞ্চলে পরিক্রমা চালিয়ে যান। এখানে উগ্রপন্থী বলে পরে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন এরকম বেশ কয়েকজন যুবকের মনে বিপ্লবের বীজ রোপণ করেন। কিন্তু মন অশান্ত ; বিশেষ কাজ হচ্ছে না। ইতিমধ্যে বাংলায় আগুন জ্বলে উঠেছে, তার সঙ্গেও যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না। মনের দিক থেকেও বিশেষ উৎসাহ পাচ্ছেন না, কারণ কতকটা তিক্ততা নিয়ে তাঁকে বাংলা ছাড়তে হয়েছিল। যাই হোক, ১৯০৭ সালে পুলিশ তাঁকে পেশোয়ারে আবিষ্কার করেন। তিন দিন মাত্র উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে অবস্থান করার সঙ্গে সরকারি আদেশে তাঁকে ঐ অঞ্চল পরিত্যাগ করে চলে আসতে হয়। সৈন্যদের মধ্যে আনুগত্য-ভঙ্গের প্রচেষ্টা হল তাঁর বিপক্ষে বড় অভিযোগ।

অসুবিধায় পড়লেও তিনি বিশেষ দমে পড়েছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। পেশোয়ার থেকে ক্যাম্পবেলপুর জেলায় পাঞ্জাসাহেব যান। চলার পথ; কাজের সুযোগ না পেলেই আবার চলতে আরম্ভ করেন। এর পর এ্যাবোটাবাদ। সেখান থেকে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শনের জন্য তিনি সেখানে চলে যান। এর মধ্যে কোনও বৈপ্লবিক উদ্দেশ্য ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। কিছুদিন কাশ্মীর বাস করবার পর তাঁর পর্যটনের এবং হয়তো দেশসেবার নেশা স্তিমিত হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে তিনি কলিকাতা অভিমুখে রওনা হন এবং অধিকাংশ সময়ই নিজ গ্রামের (চান্না, বর্ধমান) আশ্রমে, কলিকাতা বা তার উপকণ্ঠে বন্ধু, ভক্ত শিষ্যদের আশ্রয়ে কালযাপন করতেন।

যে কোলাহলময় পথ তিনি পরিত্যাগ করেছেন, তারপর তাঁকে আর সেই আবর্তের মধ্যে দেখা যায়নি। শান্তিময় পরিবেশে তাঁর শেষজীবন অতিবাহিত হয়েছে।

নিবেদিতা

রর্ম্যা রল্যাঁ অরবিন্দকে স্বামীজির "young friend" (যুবা-বন্ধু) ও "intellectual heir" (ধীঃ-জগতের উত্তরাধিকারী) বলেছেন। কার্যক্ষেত্রেও তাই দেখতে পাওয়া যায়। বিবেকানন্দর প্রভাব অরবিন্দর ওপর বহুলাংশে যে পড়েছিল, তার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যায়। স্বামীজির রাজনীতিভক্ত প্রিয় শিষ্যার সঙ্গে অরবিন্দর গভীর যোগাযোগ হয়েছিল এবং মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন হবার পর দুজনে একই পথে চলেছেন সম্পূর্ণ পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রেখে। এমনকি, অরবিন্দ কলিকাতা ছেড়ে যাবার সময় "কর্ম্মযোগিন্"-এর সম্পাদনার ভার নিবেদিতার ওপর নিশ্চিন্তমনে দিয়ে যান।

অরবিন্দ যখন বরোদায় ধীরে-সুস্থে বসে, সাধারণের অজ্ঞাতে বললেও চলে, কর্মক্ষেত্রে রাজনৈতিক অন্দোলনের ফসল ফলাবার জন্যে মাটি তৈরি করছিলেন, তখন নিবেদিতা পুরোদমে বাংলায় রাজনীতিক্ষেত্রে নেমে পড়েছেন। তাঁর গুরু তাঁকে কর্মের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, আর সেই শক্তিতে তিনি আপন পথে চলেন। বিরোধ বেধেছিল রামকৃষ্ণ মিশনের কর্ণধারগণের সঙ্গে এবং সেটা খুব অস্বাভাবিক নয়। নিবেদিতা রাজনৈতিক যে দলের সঙ্গে ঘোরাফেরা করছিলেন, তাতে কেবল অধ্যাত্ম বিষয় এবং কতকটা সেবাধর্মে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারি বিষ

নজর পড়ার সম্ভাবনা।

বাংলার রাজনীতিক্ষেত্রে জাপানী ওকাকুরার দান অসামান। নিজেদের দেশের জাতীয় অভ্যুত্থানের পরিচয় দিয়ে তিনি বাঙালিকে জেগে ওঠবার জন্যে ঘরোয়া আলোচনা, পরামর্শ বা প্রকাশ্য বক্তৃতায় উৎসাহ দিতে ছাড়তেন না। ১৯০০-১৯০১ সালে ওকাকুরা ভারতে আসেন। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হবার পর ধীরে ধীরে ভারতে তাঁর কর্মপন্থা ঠিক করে নেন। জানুয়ারি মাসে নিবেদিতা গিয়ে তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এধারে ওকাকুরা আবার পি. (প্রমথ) মিত্র ও সরলা দেবীর সঙ্গেও আলাপ-আলোচনা শুরু করেছেন। তার ফলাফল অন্য সময় আলোচনা করার প্রয়োজন হবে।

নিবেদিতার মনে ক্রমে রাজনীতি প্রাধান্য লাভ করলেও, তিনি তাঁর ধর্মমত ও পথ থেকে বিযুক্ত হননি। স্বামীজির বিরাট ব্যক্তিত্বে বেদ-উপনিষদ পুরাণের ধর্ম, জাতীয় চেতনা ও স্বাধীনতার চেষ্টার জন্য দেশবাসীকে উদ্‌বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রচার, সমাজ-সংস্কার ও সেবার পরামর্শ ও ব্যবস্থা, সমগ্র জাতির মনে দেশপ্রেম, মানবপ্রেমের সামঞ্জস্য রক্ষা করার আদর্শ-স্থাপন হয়েছিল। নিবেদিতা মিশন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন ১৯০২ জুলাই ১৮ (স্বামীজি দেহরক্ষা করেন ৪ঠা জুলাই)। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মত দেশকে মূর্তিমতী "মাতৃদেবী" বলে গ্রহণ করেন এবং নানাভাবে ভারতবাসীকে আগামী দিনের সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করা তাঁর ধর্মজীবনের অংশ বলে কাজে নেমে পড়েন। তিনি "অজ্ঞেয়" ব্রহ্মের সন্ধানে কালক্ষেপ করার চেয়ে "প্রত্যক্ষ দেশমাতৃকার সেবা"র পরামর্শ দিলেন তাঁর সহকর্মী সমধর্মী, অনুরাগী, অনুচরদের মধ্যে।

স্বামীজির মতের অনুকরণে তিনি শিক্ষাদীক্ষা, চরিত্রবত্তা অনুশীলনের সঙ্গে কলকারখানা, শিল্পবাণিজ্যের সাহায্যে আত্মনির্ভরশীল হবার জন্য উৎসাহ দান করলেন ; ঠাকুরঘরে দেবদেবীপূজা ও আরাধনা পরে এলে তত ক্ষতি নেই। দেবপূজা ও তাঁদের উদ্দেশ্যে ভোজ্য উৎসর্গ করা অপেক্ষা মানুষের সেবা অধিক বাঞ্ছনীয়। দেশাত্মবোধের উন্মেষ যাতে যুবকদের মনে সর্বপ্রকারে সম্ভব হয়, তার জন্যে কোনও চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তাঁর। ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশ স্বাধীনতা-লাভের জন্য কি করেছে, সেটা বাংলার যুবকদের জানাবার জন্যে তিনি তৎসংক্রান্ত নানা বই সংগ্রহ করে দিতেন। সে সময় যুবচরিত্র গঠন করবার পক্ষে এসকল পুস্তকের মূল্য ছিল প্রচুর।

জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, গোখেল প্রভৃতি তদানীন্তন দেশবরেণ্য নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাতে নিবেদিতার এক বিশিষ্ট স্থান হয়েছিল তাঁর পরিবেশের মধ্যে। সেই সময় যখন অরবিন্দর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হ'ল, তখন নিবেদিতা সম্পূর্ণ নিজস্ব ধ্যানধারণা, কর্মপদ্ধতিকে রূপ দেবার সুযোগ পেয়েছিলেন। গাইকোয়াড়ের আমন্ত্রণে তিনি বরোদায় যান এবং সেখানে অরবিন্দর সঙ্গে রাজনীতি নিয়ে তাঁর আলোচনার সুযোগ ঘটে। তিনি অরবিন্দর 'ইন্দু প্রকাশ'-এ মুদ্রিত প্রবন্ধাবলীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বামীজির তিরোধানের পর একজন প্রগতিপন্থী সৎসাহসী উগ্রজাতীয়তাভাবাপন্ন নেতার সঙ্গে পরিচয় উভয়ের জীবনে কল্যাণপ্রদ হয়েছিল। ১৯০২ অক্টোবরের ২১, ২২ ও ২৩ তারিখে বরোদায় উভয়ের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা চলে।

একটা প্রচলিত মত আছে, নিবেদিতা অরবিন্দকে প্রভাবিত করেছিলেন বাংলায় এসে সংগ্রামী মনোভাবাপন্ন কর্মীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করবার জন্য। হয়তো কিছু সত্য এর মধ্যে আছে; কিন্তু তা নিয়ে বিতণ্ডার প্রয়োজন নেই। বরোদায় বসেই স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রগতি বদল করবার চিন্তা যে তাঁর মনে জেগে উঠেছিল, এ কথা অরবিন্দ নিজেই বলেছেন।

নিবেদিতার দান যে কত বিরাট, তার কিছুটা ধীরে ধীরে প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি কায়মনোবাক্যে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি, তাঁর সন্ন্যাসিনী-জীবন সে-সময় বহুল পরিমাণে দূরে সরে গিয়েছিল। যোগাযোগ স্থাপন, আলোচনা-সভায় অংশ গ্রহণ, সভা-সমিতিতে যোগদান, বক্তৃতা ও প্রবন্ধ সাহায্যে যুব-সমাজের মধ্যে জাতীয় চেতনা উদ্বুদ্ধ করতে

আপ্রাণ চেষ্টা—সবই তাঁর কর্ম তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

অরবিন্দ এসে বিপ্লবের আগ্নেয়গিরিতে অগ্ন্যুৎপাত ঘটাবার আগে নিবেদিতার চেষ্টা সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি কথা বলেছেন। ১৯০৭ জুলাই সংখ্যা "পুরোধা" পত্রিকায় ('স্বপ্ন') যে তথ্য প্রকাশিত হয়, তাই থেকে আমরা পাই : ১৯০২ অক্টোবরে নিবেদিতার অনুরোধ তিনি উপেক্ষা করেছিলেন, কারণ অরবিন্দ মনে করছিলেন "এখনও সময় হয়নি।" নিবেদিতা প্রকাশ্যভাবেই বলেন, "আমি আপনার দলে"। তিনি নিঃশঙ্কচিত্তে বিপ্লবের বার্তা প্রচার করতেন। নানা কথার পর অরবিন্দ বলেন যে, বিদেশি, বিশেষতঃ আইরিশ মহিলা এবং বহু গণ্যমান্য নামকরা লোকের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকায় গবর্নমেন্ট তাঁকে একটু সমীহ করে চলত। তাঁর কাজ সম্বন্ধে সব কথা এই স্বল্প পরিসরের মধ্যে লেখা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ আশীর্বাণী দিয়েছিলেন তাঁকে :

"Be thou to India's future son
Mistress, servant, friend in one."

আর তিনি বিপ্লবের কাজে তার পরিচয় রেখে গেছেন। উঁচু মহলে, এমনকি, করদ-নৃপতিদের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ রক্ষা করতেন এবং যাঁকে দিয়ে যতটা কাজ পাওয়া যায় তা আদায় করে নিতেন। "বিপ্লবী ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা, তাদের বিপদে-আপদে সাহায্য করা, টাকা দিয়ে, অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে, আবার বোমা তৈরি শিখবার জন্যে বিদেশে ছেলে-পাঠানো, ইত্যাদি কত কি!" কিন্তু নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করে বিপজ্জনক কাজের ঝুঁকি ঘাড়ে নিতে তাঁর মত খুব বেশি লোক তখন পাওয়া যায়নি। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, "এক কথায় বলা যায়, বিপ্লবীদের সাফল্যের মূলে তাঁর দান অপরিসীম।"

সাগ্নিক পূজারী

অরবিন্দ ভারতের রাজনীতির আকাশে উল্কার মত এসে বছর পাঁচ-ছয়ের মধ্যে আশ্রমের স্নিগ্ধ আধ্যাত্মিক পরিবেশে অন্তর্হিত হয়েছিলেন। না পেরেছিল ইংরেজ রাজশক্তি তাঁকে কারাগৃহে বন্ধ রাখতে, না-পেরেছিলেন ধরে রাখতে তাঁর সহকর্মীরা, যাঁরা আত্মবিসর্জন দিয়ে দেশোদ্ধার কার্যে নিজেদের সঁপে দিয়েছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ (১৯০৭) বলেছিলেন—

"দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে
সেই রুদ্র দূতে, বলো, কোন্ রাজা কবে
পারে শাস্তি দিতে। বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি', করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা।"

তাঁর মতের ধারক ও বাহক ছিলেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে কয়েকজন সব ব্যাপারই জানতেন, ত্যাগের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, বিপ্লবের হবিঃ সমিধ যুগিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তী মৃত্যুঞ্জয়ী বীরের দলের সঙ্গে যুক্ত থাকার সাহস রাখতেন না। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর (১৮৬৯-১৯১২), চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫), সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯-১৯২০), সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭২-১৯৪০)। সংশ্লিষ্ট না হলেও, সরলা দেবী (১৮৭২-১৯৪৫)-র নাম এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়। আরও কয়েকটি নাম এসে পড়ে, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে ছেড়ে দিতে হয়েছে।

রাজনীতি-ক্ষেত্রে নরম দল যখন তাদের আবেদন, নিবেদন, প্রবন্ধ, বিবৃতি, বক্তৃতামালার ভাষায় কিছু তেজ, কিছু উষ্মা-প্রকাশ বৃদ্ধি করেছেন, তখন অপরদিকে রাজনীতির মোড় ফিরিয়েছিলেন যারা, তারা দুটো দিকে বৈশিষ্ট্য অর্জন করলেন। প্রথমতঃ, তারা নিলেন দারিদ্র্য, উপেক্ষা নির্যাতন, কৃচ্ছ্রসাধন, চরম ত্যাগের পথ ; আর দ্বিতীয়ত নিলেন দুর্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য নতুন আয়ুধ—বারুদ বোমা, রিভলভার, পিস্তল, রাইফেল প্রভৃতি আগ্নেয়াস্ত্র।

এখন রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের কবিতা রূপ নিতে চলেছে। "দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই

হে" আর "এ সব দৈত্য নহে তেমন" ; এদের সঙ্গে যুঝতে হলে "অস্ত্রপরাক্রমে হও বিশারদ"। এসব সুপ্ত মন্ত্র এখন মূর্তি ধারণ করে ভক্তহৃদয়ে ও বাহুতে অমিত শক্তি সংযোজন করেছিল। এঁরা জীবন দিয়ে রচনা করলেন নতুন কাব্য, নতুন গাথা, জীবনের নতুন ধারা। জাতির হতাশ্বাসের মধ্যে এঁরা এনে দিলেন হুতাশনের তেজ, বজ্রের বিক্রম।

এসব নাম বারে বারে আসবে। এঁদের এবং এঁদের শিক্ষায় উদ্দীপিত হয়ে এলেন আত্মত্যাগ-মহিমায় ভাস্বর দধীচি, দশানন-বিজয়ী রঘুপতি রাঘব, কংস-নিসূদন সুদর্শনধারী মুরারি, গাণ্ডীবী সব্যসাচী, ভীমকর্মা বৃকোদর, আর কুরুক্ষেত্র সমরের অপরাপর বীরবৃন্দ—অমিততেজা ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, সাত্যকি, অশ্বত্থামা প্রভৃতি।

অরবিন্দর সখা ও সচিব রূপে যতীন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩০)-এর কথা বলা হয়েছে। তারপর যাঁরা এলেন, তাঁদের কেবলমাত্র নামগুলি উল্লেখ করা যাক। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯৫০), যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৯-১৯১৫), বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৮০-১৯৫৯), ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০-১৯৬১), অবিনাশ ভট্টাচার্য (১৮৮২-১৯৬৫), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০২), উল্লাসকর দত্ত (১৮৮৫-১৯৬৫), রাসবিহারী বসু (১৮৮৬-১৯৪৫), কানাইলাল দত্ত (১৮৮৮-১৯০৮), প্রফুল্ল চাকী (১৮৮৮-১৯০৮), ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮) প্রভৃতি। এঁদের কাহিনীতে বাংলার স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসের পৃষ্ঠা ভরে থাকবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আবার, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় এঁদের প্রত্যেকের সম্বন্ধে বলা চলে ঃ

.... তোমা লাগি নহে মান
নহে ধন, নহে সুখ ; ....
*　　　　*　　　　*
................................মহাবীর সবে
গিয়াছেন সঙ্কট যাত্রায়, যার কাছে
আরাম লজ্জিত শির নত করিয়াছে
মৃত্যু ভুলিয়াছে ভয়........................

আর কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার পর অবস্থাটা দাঁড়াচ্ছে

................................"তাই শুনি আজ
কোথা হ'তে ঝঞ্ঝা সাথে সিন্ধুর গর্জন,
অন্ধবেগে নির্ঝরের উন্মত্ত নর্তন
পাষাণ পিঞ্জর টুটি, বজ্রগর্জরবে
ভেরিমন্দ্রে মেঘপুঞ্জ জাগায় ভৈরব।"

নরমপন্থীদের মধ্যেও যাঁরা বিপ্লবীদের অন্ততঃ মনে মনে সমর্থক ছিলেন, তারা প্রকৃতরূপের কল্পনাতেই বলে উঠলেন—

"অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্টা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।"

—তোমার রূপ দেখে আমি হৃষ্ট হচ্ছি, অথচ ভয়ে অন্তর কেঁপে উঠছে।

অতএব এই বিপদসঙ্কুল পথ ছেড়ে তারা "তদেব রূপং" অর্থাৎ শান্ত পথে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। এই দলের মধ্যে তদানীন্তন কালের বহু প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন যারা উত্তরকালে কর্মক্ষেত্রে নিজেদের বিশেষ পরিচয় রেখে গেছেন।

"বায়ু, উল্কাপাত, বজ্রশিখা" মাথায় করে নব্যদলটি "বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে দিয়ে" বন্ধুর পথে যাত্রা আরম্ভ করলেন, তাই থেকে বিস্ফোরণের পূর্বাভাস পাওয়া যেতে লাগলো।

অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

বোমার যুগের এক অধ্যায়

(মানিকতলা বোমার মামলায় দ্বীপান্তর দণ্ড প্রাপ্ত হন। পরে দণ্ডাদেশ হ্রাস হয়ে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয়েছিল।)

বহুদিনের পরাধীনতার ফলে ভারতবাসী তখন দুর্বল হয়ে পড়েছে, আর তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাজরোষভীতি ও গোলামির নানা ব্যাধি, কুৎসিত ও কদর্য ব্যাধি ছড়াইয়া পড়িয়াছে প্রায় তার সর্বাঙ্গে — তাহারা তখন ত্যাগ করতে বা প্রাণ বলি দিতে ভয় পায়—এমন কি বিপ্লবের চিন্তাতেও তারা শিহরিয়া উঠে। কিন্তু বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী শাসকের দমন নীতি, শোষণনীতি ও আরও বহুবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে মরণভীতি জাতিকে স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে জীবন বিসর্জনের মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করার জন্য বৈপ্লবিক পদ্ধতির একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে, আর সেই জন্যেই শ্রীঅরবিন্দ ১৯০২ সালের ১৫ আগস্ট ভারতের মুক্তি কামনায় বরদা হইতে বাংলায় আগমন করিয়া কলিকাতা ও মেদিনীপুরে দুইটি গুপ্ত সমিতি স্থাপন করেন। সশস্ত্র বিদ্রোহের কথা দূরে থাক, ইংরাজ রাজ্য ধ্বংস করিয়া ভারতীয় রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা বাতুলের চেষ্টা বলিয়াই গণ্য হইত। স্বাধীনতার বিষয় চিন্তা করিতে লোকে ভয় পাইত, "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ করিলে রাজদ্বারে বিশেষ শাস্তি পাইবে হইত। সেইজন্যই "গুপ্ত সমিতি" স্থাপনের প্রয়োজন হয়। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন বরদা মহারাজের কলেজের অধ্যক্ষ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছিলেন বরদার সৈনিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। শ্রীঅরবিন্দ যতীনবাবুকে সঙ্গে লইয়াই কলিকাতায় আসেন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্বন্ধে সম্যকরূপে বুঝাইয়া দিয়া বরদায় ফিরিয়া যান। এই সময় শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বারীন ঘোষ যতীনবাবুর সহিত মিলিত হন। আমি কোনও রূপে শ্রীঅরবিন্দের আগমনবার্তা পাইয়া তাঁহার দর্শনমানসে আসিয়া শুনি তিনি চলিয়া গিয়াছেন। এই স্থানেই যতীনবাবু ও বারীনবাবুর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। বারীনবাবুর সহিত আলাপে মুগ্ধ হইয়া এবং প্রাণের মধ্যে পরাধীনতার তীব্র গ্লানি অহরহঃ অনুভব করিয়া সেইদিন সেইস্থানে এবং সেইমুহূর্তে দেশ মাতৃকার বন্ধনশৃঙ্খল ছিন্ন করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আমার বয়স তখন ১৭/১৮ বৎসর হইবে। এই তিনজনে কলিকাতার আপার সারকুলার রোডে একটি বাড়িভাড়া লইয়া দেশ মুক্তির উপায় নির্ধারণে ঝাঁপাইয়া পড়ি। শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার ভ্রাতা স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র দাসের (কানুনগো) নেতৃত্বে মেদিনীপুরে একটি শাখা স্থাপিত হয়।

প্রথমত বিদ্যালয় ও কলেজের অল্পবয়সী যুবক ও বালকদের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশিয়া ধীরে ধীরে তাহাদিগকে নীতি শিক্ষা ও শারীরিক চর্চার জন্য ঐক্যবদ্ধ করাই হয় আমাদের কাজ। মরণভীত জাতির যুবশক্তিকে স্বদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে জীবন বিসর্জন মহামন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা—অত্যাচার উৎপীড়ন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রাণপণে রুখে দাঁড়াইবার জন্য তাহাদের উদ্বুদ্ধ করাই হয় কাজ—তাহাদের অন্তরে বিপ্লবের মহামন্ত্রবীজ বপন করাই হয় আমাদের কাজ। বেশির ভাগ ছেলেই আমাদের এরূপ আলোচনায় রাজরোষ ভয়ে এতই ভীত হইত যে, আমাদের ছায়া পুনরায় মাড়াইতে

* দৈনিক যুগান্তর ১৯৪৭ আগস্ট ১৫।

সাহস করিত না। কতক যুবক, যদিও তাহাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য—আমাদের এই আলোচনায় উৎসাহের সহিতই যোগদান করিতেন। এইরূপে বহু কষ্টে আমরা গুটিকয়েক যুবক একত্রিত করিতে সমর্থ হই। শারীরিক ব্যায়াম চর্চার জন্য স্থানে স্থানে ভাদকা (ছোট লাঠি) লাঠি খেলা, ঘোড়ায় চড়া, সাইকেল চড়া শিক্ষা দেওয়া সুরু করি। এই সমস্ত কাজের জন্য অর্থের প্রয়োজনে কয়েকটি স্বদেশভক্ত ধনীর দ্বারস্থ হই। এই সমস্ত ধনীর সাহায্য কেবলমাত্র অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তাঁহাদের অদম্য উৎসাহও আমাদের উৎসাহিত করিত। এই সময় বিখ্যাত ব্যারিস্টার পি. মিত্র ও বিখ্যাত লাঠিয়াল শ্রীযুক্ত পুলিন দাস মহাশয়ের চেষ্টায় ও উৎসাহে ঢাকা প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে 'অনুশীলনী সমিতি' গঠিত হয়। শ্রীযুক্ত পুলিন দাস এই সমিতির স্থাপন, গঠন ও উন্নয়ন ভার গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত সুশৃঙ্খলার সহিত পরিচালনা করিতেন। শ্রীযুক্ত সরলা দেবী চৌধুরাণীর সাহায্যে আমরা আমাদের মধ্যে পাই বিখ্যাত তলোয়ার খেলোয়াড় অধ্যাপক মুত্তাজাকে। তিনি ছেলেদের অতি যত্নের সহিত তলোয়ার ও ছোরাখেলা শিক্ষা দিতেন। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সাল এইরূপ খেলাধূলা নীতিশিক্ষা ও শারীরিক চর্চাদির মধ্য দিয়াই কাটিয়া যায়। আমাদের শাখার সংখ্যাও প্রসার লাভ করিতে থাকে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শ্রীযুক্ত সি. আর. দাশ, "হিতবাদী"র সহকারী সম্পাদক পণ্ডিত সখারাম গণেশ দেউস্কর ইত্যাদি ব্যক্তিগণ আমাদের সঙ্গে যোগদান করেন। এই "অনুশীলন সমিতিগুলি" আমাদের অর্থাৎ বিপ্লববাদীদের বিরাট সংগঠনের পরিচায়ক। গীতাপাঠ, রাজদ্রোহাত্মক সাহিত্যপাঠ ও আলোচনা, বর্তমান রণনীতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ, তরবারি, ছোরা ও বন্দুক প্রভৃতির ব্যবহার—এই সমস্ত শিক্ষাদান সমিতিগুলির প্রধান কাজ ছিল। কেন্দ্র ও শাখাগুলির মধ্যে যাহাদের বিশেষ যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করা হইত, তাহাদের জন্য সপ্তাহে ৪ দিন করিয়া বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পণ্ডিত সখারাম বাবু ও পি. মিত্র মহাশয় বিপ্লববাদ সম্বন্ধীয় পুস্তকাদি পড়াইতেন ও বুঝাইয়া দিতেন। শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত দেবব্রত বাবু মহাশয়ও এই সময় আমাদের সহিত যোগদান করেন।

১৯০৪, ১৯০৫ সাল—এই সময় শ্রীঅরবিন্দ বরদার চাকুরি ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আমাদের মধ্যে ফিরিয়া আসেন। বরদার মহারাজা তাঁহাকে খুব ভাল বাসিতেন। যখন শ্রীঅরবিন্দকে পুনঃ পুনঃ ফিরিয়া যাইবার অনুরোধ করিয়া বিফল হন, তখন নিজে শ্রীঅরবিন্দকে লইয়া যাইবার জন্য কলিকাতায় আসেন। কত অনুরোধ, কত উপরোধ—কিন্তু শ্রীঅরবিন্দ অচল, অটল—তাহার প্রাণ তখন স্বদেশের মুক্তি কামনায় উৎসর্গীকৃত। ঠিক এই সময় রাজা সুবোধ মল্লিক ও শ্রীযুক্ত সি. সি. বিশ্বাস আই.সি.এস. মহোদয়গণকে আমাদের মাঝে পাই। আরও বহু স্বদেশের কৃতী সন্তান আমাদের দলকে পুষ্ট করেন ; কিন্তু সে আজ বহুদিনের কথা—সকলের নাম মনেও নাই এবং এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে তাহার পূর্ণ বিবরণ দেওয়াও সম্ভব নয়।

বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া আমাদের কার্য ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছিল। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গ ঘোষিত হওয়ায় বাংলার জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন পত্রপত্রিকাগুলি মারফত অবিরাম বিপ্লবের বাণী প্রচার ও বয়কট আন্দোলন এবং বিপ্লববাদ প্রচার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সরকারি দমননীতির পরিণতিতে বাংলার যুবকদের মনে বিপ্লবের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়। **ইতিহাসের ধারা অনুসরণ করিলে দেখা যায়, অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণই বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বীজ বপন করে। তাই এই বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে আমাদের কাজ—যাহা এতদিন প্রেরণার অভাবে প্রকাশ পাইতে ছিল না—স্বতঃস্ফূর্তি লাভ করে।** শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার পুত্র চিত্তরঞ্জন গুহঠাকুরতাকে বরিশালে এক সভাতে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি করার জন্য পুলিশ লাঠির আঘাত করিতে করিতে তাঁহাকে পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ করে। চিত্তরঞ্জনবাবু তখনও ধীরস্থির প্রশান্ত চিত্তে গাহিতে থাকেন —

"যায় যাক্ জীবন চলে
বন্দে মাতরম বলে।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই দমননীতি সেই সময় আমাদের যত উৎপীড়িত, নির্যাতিত এবং শতধা ব্যথিত করেছিল, তার চেয়েও বেশি আমরা মরণের উদ্দীপনা পেয়েছিলাম, আমাদের গুপ্ত সমিতির পরিধিও বহু বিস্তৃত হয়। এতদিন ধরে আমরা সংগঠন ও উন্নয়ন প্রণালীতেই আবদ্ধ ছিলাম, এ সময় আমাদের সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার সুযোগ হয় এবং আমরাও কালমাত্র বিলম্ব না করিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে জীবন বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হই। হেমদাই ছিলেন আমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ, তাঁহার যেমন প্রতিভা ছিল বিভিন্নমুখী, তেমনি প্রাণের মধ্যে ছিল পরাধীন ভারতকে বিদেশি শাসকের হাত হইতে রক্ষা করিবার আকুল বাসনা। হেমদা ছিলেন মেদিনীপুরের অধিবাসী। নিজের সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ফ্রান্সে গিয়া অতিকষ্টে ও কৌশলে বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখিয়া আসেন এবং পরে নিজ প্রতিভাবলে বোমা প্রস্তুত প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতিসাধন করিয়া থাকেন।

এই সময় আমাদের সমিতিতে দলে দলে যুবক এমন কি বৃদ্ধেরাও যোগদান করিতে আরম্ভ করেন। সেজন্যও বটে এবং কাজের সুবিধা ও সাবধানতা অবলম্বনের জন্যও বটে, দলটিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। Innercircle অর্থাৎ যাহারা মরণ মহামন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীগণকে কর্মপ্রেরণা, কর্মপন্থা ও মন্ত্রণা দিতেন। Outercircle অর্থাৎ সংবাদ আদান-প্রদান, দলের মধ্যে নবাগতদের অতীত ইতিহাস অন্বেষণ করা এবং তাহাদের উপর কড়া নজর রাখা। Sympathiser অর্থাৎ যাহারা আমাদের কর্ম সম্বন্ধে সম্যকরূপে জানিতেন না, কিন্তু আমাদের মতে ও পথে সম্পূর্ণ আস্থা ও সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। দলের মধ্যে আসিলেই কাহাকেও বিপ্লবমন্ত্র দেওয়া হইত না, ইহার মধ্যে নানাস্তর ছিল। সকলকে ভীষণ গোপনীয়তা রক্ষা করিতে হইত। সুতরাং বাহিরের কোন নূতন যুবক কোন সংবাদ পাইত না, অনেক পরীক্ষা, শপথ ও দীক্ষার মধ্য দিয়া গিয়াই তবে তাহারা বিপ্লবের দীক্ষা লাভ করিত।

এই সময় আমাদের কার্যের সুবিধার জন্য এবং আরও বহু যারা আমাদের মত ও পথ সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন তাহাদের এবং জনসাধারণের সাহায্য ও সহানুভূতি অর্জনের জন্য নিজস্ব একটি সংবাদপত্রের বিশেষ অভাব অনুভূত হয়। আলোচনার পর বারীনবাবুর পরিকল্পনামত সাপ্তাহিক "যুগান্তর" পত্রিকা বাহির করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু পত্রিকা বাহির করিতে অর্থের যথেষ্ট প্রয়োজন। আর আমাদের সম্বলমাত্র ৫০ টাকা, এদিকে বিলম্ব করার সময় নাই। মাত্র এই কয়টি টাকা লইয়াই কাজ শুরু হয়। মনের মধ্যে তখন অদম্য উৎসাহ, এতগুলি স্বদেশভক্ত প্রাণীর জীবন স্বদেশের স্বাধীনতাকল্পে উৎসর্গীকৃত, সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য কি তাহাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হইতে পারে। কাগজ বাহির হইবার প্রথম যুগে শ্রীহরিশ ঘোষ, শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও শ্রীযুক্ত কেশব সেনগুপ্ত মহাশয় বিশেষ সাহায্য করেন। কেশববাবুর মামার কুমারটুলিতে এক ছাপাখানা ছিল। প্রথম ২/৩ সপ্তাহ "যুগান্তর" বাহির হইতে থাকে এবং "যুগান্তর" অফিস ২৭ নং কানাইলাল ধর লেনে স্থাপিত হয়। সেখানে নানাবিধ অসুবিধা হওয়ার জন্যে ধার করিয়া একটি ছাপার মেশিন, ছাপার সরঞ্জাম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া নিজেরাই ছাপার কাজ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। আমার উপরই "যুগান্তর" পরিচালনার সম্পূর্ণ ভার অর্পিত হয়। এই সময় আমরা আরও একটি সহৃদয় বন্ধুর সাক্ষাৎ পাই। তিনি হইতেছেন, মনুসেফ শ্রীঅবিনাশ চক্রবর্তী—তিনি আমাদের সর্ব বিষয়ে ও সব সময়ে সাহায্য করিতেন। আমাদের সংস্পর্শে আসাব জন্য তিনি চাকুরি হইতে বরখাস্ত হন এবং তাঁহার শেষ জীবন প্রায় অনাহারেই কাটে।

যাই হোক, কোনরূপে কায়ক্লেশে ২/৩ মাস কাটাইয়া কলেজ স্ট্রিটে "যুগান্তর" ছাপাখানা ও কার্যালয় উঠাইয়া লইয়া আসি। কলেজ স্ট্রিটে আসার সঙ্গে সঙ্গে "যুগান্তরে"র চাহিদাও অসম্ভব রূপে বৃদ্ধি পায়। Statesman পত্রিকা "যুগান্তরের" এইরূপ চাহিদা দেখিয়া মন্তব্য করেন "Jugantar is selling like hot cakes." ইহার পর হইতেই Statesman প্রায়ই "যুগান্তর" হইতে মন্তব্য করিতে থাকেন। Statesman পত্রিকার মন্তব্যের জন্যই "যুগান্তরের" উপর পুলিশের

কোপদৃষ্টি পতিত এবং তাহার পর হইতেই প্রায় "যুগান্তর" অফিস তল্লাসী হইতে থাকে। যুগান্তরের উপর পুলিশের কোপদৃষ্টি — যতই প্রখর হইতে লাগিল যুগান্তরের চাহিদাও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। যুগান্তরের বার্ষিক চাঁদার হার হইতে ৮/১০ গুণ বেশি চাঁদা বাৎসরিক চাঁদা হিসাবে পাঠাইতে থাকেন, এমন কি অনেকে যাহারা বাংলা ভাষা পড়িতে পারিতেন না, তাহারাও চাঁদা পাঠাইতে থাকেন। কিন্তু অর্থের এই সচ্ছলতা সত্ত্বেও আমাদের ব্যয়ের কোনও বৃদ্ধি হয় নাই। উদ্‌বৃত্ত অর্থ দিয়া বোমা তৈয়ারি মেশিন, বন্দুক ও রিভলবার ইত্যাদিরই ক্রয় বাড়িতে থাকে। যুগান্তরের যে ছেঁড়া মাদুর সেই ছেঁড়া মাদুরই রহিল। আমরা নিজেরাই কাগজের সম্পাদনা, ছাপা, প্যাক করা, পোস্ট অফিসে মাথায় করিয়া লইয়া যাওয়া এবং রাস্তায় বিক্রয় করিতাম। কলিকাতা কর্পোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষকুমার বসু মহাশয়ও এই সমস্ত কার্য অত্যন্ত আনন্দ ও উৎসাহের সহিত করিতেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা বাহির হইবার কিছুদিন পর সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ ডাকযোগে প্রাপ্ত হই। প্রবন্ধটি এতই সুন্দর ও কালোপযোগী হইয়াছিল যে আমরা অতি যত্নের সহিত ছাপি। উপেনবাবুর প্রবন্ধ পাইবার জন্য প্রত্যেক ডাকেই অনুরোধ করিতাম। উপেনবাবুর যেমন ইংরাজী তেমনি বাংলা লেখার দক্ষতা ছিল। ইহার পর "বন্দেমাতরম্" পত্রিকা শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের হাত হইতে শ্রী অরবিন্দের কর্তৃত্বাধীনে আসে। রাজা সুবোধ মল্লিক ইহার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, শ্রীঅরবিন্দের সহকারী হন। উপেনবাবুর একটি ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করিয়া উপেনবাবুকে চন্দননগর হইতে কলিকাতায় লইয়া আসেন এবং নিজের সহকারী করিয়া লন। একদিন হঠাৎ খবর পাইলাম উপেনবাবু বন্দেমাতরম্ কাগজে যোগদান করিয়া কলিকাতায় অবস্থান করিতেছেন, তৎক্ষণাৎ উপেনবাবুকে তাঁহার ভ্রাতা দেবেনবাবুর বাসা হইতে আনিয়া আমাদের "যুগান্তর" কাগজের ছেঁড়া মাদুরের এক কোণ লইতে বাধ্য করি। আন্দামানে থাকা কালে উপেনবাবু একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন "অবি তুই'ই আমাকে শেষ পর্যন্ত আন্দামানে টেনে নিয়ে এলি, জানি না এ জীবনে হয়ত আর মাতৃভূমি বা মায়ের চরণ দর্শন করা হবে না।"

কাজের বিভাগ হেতু বারীনবাবু বোমা বিভাগের সম্পূর্ণ ভার গ্রহণ করেন। শ্রীযুক্ত উল্লাসকর দত্তকে সহকারী করিয়া হেমদা, বারনীবাবুদের মুরারি পুকুর বাগানে বোমা প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত করেন। বাহির হইতে ইহার কিছুই প্রকাশ পাইত না, উপরন্তু উপেনবাবু গেরুয়া ইত্যাদি পরিধান করিয়া এই বাগানে গীতাপাঠ শাস্ত্রচর্চা প্রভৃতির আচরণের এরূপ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিতেন যে, জনসাধারণ বাহির হইতে ইহাকে একটি সাধুর আশ্রম বলিয়া মনে করিত। মানিকতলার একটি পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর প্রায়ই এই সাধুর আশ্রমে যাওয়া-আসা করিতেন ও অত্যন্ত ভক্তির সহিত উপেনবাবুর গীতার ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া পরলোকের পাথেয় সংগ্রহ করিতেন। পরে মোকদ্দমার সময় সরকার পক্ষে সাক্ষ্যদান কালে বলেন, তিনি এই বাগানে যাওয়া আসা করিতেন এবং এটিকে একটি সৎ সাধুর আশ্রম বলিয়াই জানিতেন। 'যুগান্তর' ও 'বন্দেমাতরমের' আদর তখন ঘরে ঘরে। আর এদিকে বারীনবাবু ও হেমদা বোমা প্রস্তুত করিবার যন্ত্রপাতি ক্রয় ও স্থাপনের চেষ্টায় ফিরিতেছিলেন। **এক একটি মেশিন যাহা অন্তত ৫০০ বোমা প্রস্তুত করিতে পারে, এইরূপ মেশিনই বাংলা দেশের প্রত্যেক জেলায় স্থাপনের আয়োজন হইতে লাগিল।** আমাদের প্রতিপক্ষ দুর্দান্ত, অতএব আমাদের প্রস্তুতিও সেই অনুপাতে হওয়া প্রয়োজন। পূর্ববঙ্গের আর আর কোথায় বোমা ও সেলের কারখানা স্থাপিত করা যায়, তাহার সন্ধানে বাহির হইলেন বারীনবাবু। বোমার পরীক্ষায় প্রথম বলি রঙপুরের প্রফুল্ল চক্রবর্তী। ডিনামাইট দিয়া ট্রেন ধ্বংস, লাটসাহেবের ট্রেনের আংশিক ধ্বংস ইত্যাদি ধ্বংসমূলক কার্য দ্রুতগতিতে বাড়িতে লাগিল এবং নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হইতে লাগিল। বহু রাজকর্মচারী যাহারা বিদেশি শাসকের অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শোষণ নীতির সহিত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা করিয়া আসিতেছিলেন, তাহাদের কর্মজীবনের চিরতরে অবসান

করিবার জন্য আমরা বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা বিলম্ব করি নাই। এক একটি দুর্দান্ত সরকারি কর্মচারির জীবন অবসান করা হয়, আর ডাকযোগে সেই সংবাদ তাহাদেরই উর্ধ্বতন পৃষ্ঠপোষকগণকে আমাদের সফলতার বার্তা পাঠাইতে থাকি এবং সেই সঙ্গে ইহাও জানাইতে থাকি, ... সন্ন্যাসী ব্রহ্মবান্ধব পরিচালিত দৈনিক 'সন্ধ্যা', শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা পরিচালিত দৈনিক 'নবশক্তি' ইত্যাদি আরও অনেক সংবাদপত্রাদি আমাদের মতাবলম্বী হইয়াছিলেন, আমাদের মত ও পথ তাঁহাদের মত ও পথ হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা তাঁহার সর্বস্ব দিয়া শেষ পর্যন্ত নবশক্তি পরিচালনা করেন। শেষে সর্বস্বান্ত হইয়া আমার হাতে নবশক্তির সমস্ত ভার অর্পণ করেন। যদিও এই সময় আমাদের কাজ দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছিল, তথাপি সময় সময় আমাদের আলোচনা হইতে বুঝা যাইত না যে, আমাদের স্কন্ধে এতবড় এক গুরুদায়িত্বভার রহিয়াছে।

একদিন আমি অন্যান্য সহকর্মী সহ 'যুগান্তর' অফিসে বসিয়া আছি; এমন সময় হঠাৎ কথা উঠিল—বিদেশির হাত হইতে দেশ মুক্ত হইলে সেই মুহূর্ত হইতে কি কি করা হইবে। বহুক্ষণ আলোচনার পর স্থির হয় যে, দেশ মুক্ত হইলে প্রথম ২৪ ঘণ্টা কেবল আমরা হো হো করিয়া চীৎকার করিব, পরবর্তী ২৪ ঘণ্টা কেবল আলুর দম ও চপ কাটলেট খাইব, তারপর ২৪ ঘণ্টা নিদ্রা দিব এবং নিদ্রা হইতে উঠিয়া লাট প্রাসাদে 'যুগান্তর' অফিস স্থানান্তরিত করিব।

আমি, শ্রীঅরবিন্দ ও আমার সহকারী শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ বসু গ্রে স্ট্রিট নবশক্তি কার্যালয় হইতে গ্রেপ্তার হই, একই সময় বারীনবাবু, উপেনবাবু দলবল সহ মুরারিপুকুর বাগানবাটি হইতে গ্রেপ্তার হন এবং আমাদের অন্যান্য সহকর্মিগণ কলিকাতার বিভিন্ন বাটি হইতে গ্রেপ্তার হন। সেই সময় কলিকাতার প্রায় ৪০টি বিভিন্ন বাটি অধিকার করিয়া আমাদের ছেলেরা থাকিত। আমাদেরই মধ্যে একজন ছিল যে বাঁকুড়ার রজনী—তাহারই বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আমরা গ্রেপ্তার হই। জেলে আমাদের দলের যে কয়েকজন বাহিরে ছিলেন তাহাদের মধ্যে যে এই রজনীকে চিনিতেন তিনি শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। তাহাকে রজনীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বলি। দু'চার দিন বাদে সে খবর দেয় প্রতিশোধ গ্রহণ করা হইয়াছে। রজনী আর ইহজীবনে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সুযোগ পাইবে না।

গ্রেপ্তারের পর আমরা সবাই আলিপুর জেলে প্রেরিত হই। নরেন গোঁসাই কয়েকটি পার্থিব প্রলোভনে ভুলিয়া শেষ মুহূর্তে রাজসাক্ষী হইতে সম্মত হয় এবং একজন সমর্থকের জন্য আমাদেরই মধ্য হইতে একজনকে তাহার দলে টানিবার বিশেষ চেষ্টা করে। নরেন গোঁসাইর নিরাপত্তার জন্য সরকার তাহাকে ইউরোপীয়ান কয়েদি বিভাগে বদলি করে। এই সময় সরকার পক্ষ আর একটি প্রশ্ন তুলেন যে বারীনবাবুর জন্ম বিলাতে এবং তিনি যদি তাঁহার সেই জন্মস্বত্ব দাবি করেন, তাহা হইলে আমাদের বিচার ইউরোপীয়ান জুরি ও জজদের দ্বারা হইবে। কিন্তু বারীনবাবু জন্মস্বত্ব দাবি করিলে আমাদের নরেন গোঁসাইকে ছাড়িয়া যাইতে হয়, তাহাতে তাহার পাপের পূর্ণ শাস্তি দেওয়া হয় না। সেই জন্য আমরা স্থির করি, বারীনবাবুর জন্মস্বত্ব দাবি করা হইবে না। সত্যেন বসু অসুস্থ হওয়ায় নরেন গোঁসাই প্রায়ই হাসপাতালে তাহার সহিত দেখা করিবার ফলে তাহাকে সমর্থক হইবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিত ও লোভ দেখাইত। আমরাও এই সুযোগে তাহার প্রাপ্য পাওনা দিবার জন্য প্রস্তুত হই। জেলের ভিতরই বাহির হইতে রিভলবার আনয়ন করা হয় এবং কানাইবাবু ও সত্যেনবাবু নরেন গোঁসাইর ইহলীলা শেষ করেন। কানাইবাবু ও সত্যেনবাবুর ফাঁসি হয়।

আমরা ধরা পড়িবার পর মজঃফরপুরে মিঃ কিংসফোর্ডকে মারিতে গিয়া ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি মিসেস ও মিস কেনেডিকে ভ্রমক্রমে হত্যা করে। ধরা পড়িবার আগেই প্রফুল্ল চাকি রিভলবারের গুলিতে আত্মহত্যা করে এবং বিচারে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়। ক্ষুদিরাম হাসিতে হাসিতে ফাঁসির দড়িতে মাথা গলায়। বিচারে আমাদের কাহারও ফাঁসি এবং অধিকাংশের দ্বীপান্তর হয়। আমার ও যদি প্রয়োজন হয় জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য পুনরায় এই পথ গ্রহণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করিয়া আন্দামানের দিকে পা বাড়াই।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

নারায়ণগড়-লাটের স্পেশালে অগ্ন্যুৎপাতের আয়োজন*

৬ ডিসেম্বর ১৯০৭ সাল। সন্ধ্যার অন্ধকার। সবেমাত্র বিহঙ্গক জনমুখর ধরিত্রীর বুকে ঘনাইয়া আসিতেছে। উষা ও সন্ধ্যা—উদয় ও অস্তকালে দিবা ও রাত্রের সংযোগস্থল—এক প্রাণ-মন উদাস করা মোহময় সন্ধিক্ষণ। পূর্ব পাণ্ডুর আকাশে পঞ্চমীর চাঁদ ম্লান আলোর মায়ায় পথঘাট, বন-বাদাড়, উচ্চ রেল লাইন ঢাকিয়া আনিতেছে। নিজ নিজ ক্ষুদ্র চিন্তায় সদা ব্যতিব্যস্ত ছন্নছাড়া মানুষের সেদিকে লক্ষ্য নাই। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র-খচিত নীলাকাশ, ধরিত্রীর শ্যামল রস-হরিত বক্ষস্থল, সে সকল জুড়িয়া বিশাল বিপুলের নিঃশব্দ আয়োজন ও সমারোহ চাহিয়া চাহিয়া দেখিবার কয়জনের আছে অবসর? সেই ঐতিহাসিক উজ্জ্বল দীপ্ত যুগসন্ধিক্ষণটিতে রেলপথ বাহিয়া অলস মন্থরগতিতে নারায়ণগড়ের অভিমুখে গতিশীল তিনটি মানুষের সে সান্ধ্য শোভা দেখিবার অবসর ছিল না। তাহারা নূতন জীবন্ত অগ্নিমুখ ভারতের ইতিহাস রচনায় ছিল ব্যস্ত। তাহাদের যুবসুলভ উদ্দাম বে-হিসাবী গতিবিধিতে যে এক নূতন ভারতের ইতিহাস রচিত হইতেছে তাহার সুস্পষ্ট জ্ঞান এই তিনটি মানুষের ছিল না। প্রাণের কি এক আবেগে দেশমাতার বন্ধন মুক্তির প্রেরণায় তাহারা চলিতেছে এক বিস্ময়কর কাণ্ড ঘটাইতে।

মেদিনীপুরের নারায়ণগড়? খড়্গপুর রেল স্টেশনটির পরে ঐ নারায়ণগড় ছিল এই ত্রি-মূর্তির লক্ষ্য। এর কিছু আগে কলিকাতা হইতে আগত এক আপ ট্রেনে এই অপরিচিত তিন মূর্তি আসিয়া বালতি বোঁচকা কাঁধে খড়্গপুর জংশনে নামিয়াছে। কেহ লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইত স্টেশনের বাহিরে রেল লাইন হইতে অদূরে এক গাছের তলায় খবরের কাগজ পাতিয়া তাহারা পুরি, তরকারি মিষ্টান্নের সদ্‌গতি করিতেছে। তখন সবেমাত্র ঘনায়মান সন্ধ্যা। তাহাদের কাজ নিশীথ রাত্রের গভীর অন্ধকারে। কাজেই এখন সবেমাত্র সন্ধ্যা বলিয়া কোন তাড়া নাই ; বোঁচকা, বালতি, লাঠি, শাবল, খন্তা হাতে তাহারা নিম্নস্বরে আলাপ করিতে করিতে চলিয়াছিল নারায়ণগড় অভিমুখে। একজন রোগা ছিপছিপে, বয়স সাতাশ বৎসর, মাথায় বাবরী চুল, পায়ে সাদা কটকি নাগরা, চোখে চশমা। সে চলিয়াছে আগাইয়া, চাপা গলায় কথা বলিতে বলিতে পথ দেখাইয়া।

দ্বিতীয় মূর্তি বেঁটে, গৌরবর্ণ, ১৭/১৮ বৎসর বয়স, নাম নিরাপদ রায়, মৌন মানুষটি, বেশি কথা বলে না, নির্বাক মুখে একটি স্নিগ্ধ হাসি লাগিয়াই আছে। কাঁধে করিয়া সে লইয়া যাইতেছে র‍্যাপারে জড়ানো ঢাকা একটি বড় ড্রাম।

তৃতীয় যুবকটির কিশোর বয়স, শ্যামবর্ণ, বলিষ্ঠ, হাসি হাসি মুখ, কেমন যেন আধো আধো ভাষায় কথা বলে। বাঁকুড়ায় বাড়ি, নাম বিভূতি সরকার। তাহার হাতে ছিল চটের থলে, পুঁটলি, একটা বেশ বড় লম্বা টর্চ, একটি ছোট দূরবীন। চাপা গলায় অনুচ্চ স্বরে কথা বলিতে বলিতে ইহারা উচ্চ রেল লাইন ধরিয়া চলিতেছে নারায়ণগড়ের দিকে। রেল লাইন কোথাও উচ্চ হইয়া ক্রমশঃ নামিয়া ঢালু হইয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে ঝাউ, খেজুর, তুঁত কত আজানা গাছের মেলা, কাঁটা গাছের ঝোপ, শুষ্ক খাদ, ঝরনা লালমাটির খানা গর্ত। কোথায়ও কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি কয়েকটি মাটির ঘর, আশেপাশে ছাগল চরিতেছে, দাওয়ায় কুকুর ঘুমাইতেছে, উলঙ্গ কৃষ্ণকায় ধূলি-মলিন

---

* দৈনিক যুগান্তর ১৯৫৮ জুন ৮

শিশুর দল কৌতূহলী হইয়া এই তিনজন পথিকের দিকে চাহিয়া আছে।

চলিতে চলিতে শ্যামায়মান সন্ধ্যা ঘনাইয়া নিশায় গা ঢাকা দিল। পথিকত্রয়ের আকার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিতে পরিণত হইল। আকাশের মলিন অঙ্গনে জোনাকির ন্যায় অসংখ্য তারা জ্বলিতে লাগিল। প্রায় এমনিভাবে কয়েক ঘণ্টার পথ অতিবাহিত হইলে যেখানে রেল লাইন ত্রিতল অট্টালিকার মত উচ্চ হইয়া একটি পার্বত্য ঝরনার উপর নির্মিত সেতুর মুখে খাড়া হইয়া মিলিয়াছে সেইখানে এই ত্রিমূর্তি থামিল। কাঁধের ঝোলা বালতি শাবল টর্চ নামাইয়া পার্শ্বে ঢালু ঝোপের মাঝে লুকাইয়া রাখিল। তিনজন একবার সমস্ত স্থানটা ঘুরিয়া পরীক্ষা করিল। তাহার পর চশমাধারী ছিপছিপে নাগরাধারী লোকটি রেল লাইনের উপর সেতুর মুখে সতর্ক পাহারায় রহিল এবং অন্য দুইজন সঙ্গী সেই রেল লাইনের পাথর সরাইয়া রেলের তলায় গর্ত খুঁড়িতে লাগিয়া গেল। তাহাদের খনন কৌশল অভিনব, খননের সঞ্চিত মাটি তাহারা ওখানে রাখে না, দূরে ঝরনার মাঝে বহিয়া লইয়া ফেলিয়া আসে। রেল লাইন ধরিয়া দু-চারজন রেলের কুলি গ্রামের পথিক ভজন গাহিতে গাহিতে আসিয়া পড়িলে তিনজনই ঝোপে-ঝাড়ে গা ঢাকা দেয়, অদৃশ্য হইয়া যায়। আবার মানুষ-জন চলিয়া গেলে স্বস্থানে আসিয়া স্বকার্যে নিযুক্ত হয়। তখন লাইনের নিচের খনিত গর্তটি কৌশলে একটি তক্তায় ঢাকা অবস্থায় মাটির ঢেলার নিচে আত্মগোপন করে।

দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, শুষ্ক ধানের ক্ষেত্রে অড়হরের বনে শিয়াল দল বাঁধিয়া মাঝে মাঝে ডাকিয়া উঠিতেছে। কোমর প্রমাণ গর্ত কাটা হইলে তাহারা দু'জন ভারী ড্রামটি সন্তর্পণে তাহাতে নামাইয়া দিল, নামাইয়া তক্তায় মাটির স্তূপে ও পাথরের নুড়িতে স্থানটি রেল লাইনের সহিত মিশ খাওয়াইয়া লইল। কোন আগন্তুক বা রেল কুলি কিংবা ট্রলি বাহিত পরিদর্শক সে পথে আসিলেও পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে নজর দিয়াও বুঝিতে পারিবে না যে, সেখানকার রেলপথে কোন বিপজ্জনক বস্তু ট্রেন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে লুকানো বা প্রোথিত আছে। তখন রাত মাত্র দশটা, আরও দুই ঘণ্টা পরে এই পথে আশিজন উচ্চপদস্থ শাসক দলসহ বাংলার ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার সাহেবকে লইয়া স্পেশাল ট্রেনটি যাইবে। যাহারা এইসব প্রয়োজনীয় গুপ্ত সংবাদ বিপ্লবী অগ্নি-শিশুদের সরবরাহ করিত তাহার মধ্যে ছিল খুরদা রোডের কবি মণি; সেদিনও সে বহুকাল পরে তাহার বর্তমান ঠিকানা হইতে সাড়া দিয়া পত্র দিয়াছে। মণি এখনও রেলের ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগের অফিসার। আমাদের ভারত সরকার ও রেল সচিব এই অগ্নিযুগের গুপ্ত নির্লোভ কর্মীকে ও দেশসেবককে উপযুক্ত পদোন্নতির দ্বারা পুরস্কৃত করুন। মণির ন্যায় দু'চার জন তার ও রেল বিভাগে ছিল, তাহারা ছিল দুর্বার ধ্বংসের কাজে ও বৃটিশ শাসক বধের যজ্ঞের উদ্যোগে আমাদের গোপন সতর্ক চক্ষু। মণি গাঙ্গুলীর শেষ চিঠি সরদার শঙ্কর রোড হইতে লিখিত চিঠি যথাস্থানে উদ্ধৃত করিব।

আমরা তিনজনে যখন নিস্তব্ধ রেল লাইনের ছোট সেতুটির মুখে দশ পাউণ্ড ডিনামাইটপূর্ণ ল্যাণ্ডমাইনটি ভূগর্ভে কোমর প্রমাণ মাটির নিচে পুঁতিয়া ঘর্মাক্ত দেহে নিঃশ্বাস লইতেছিলাম তখন ১৯০৭ সালের ৬ ডিসেম্বরের সেই স্মরণীয় দিনটির রাত্রি যাহা সুপ্ত পরাধীন ভারতের স্নায়ুতে স্নায়ুতে জ্বলন্ত অগ্নিধারার ন্যায়—নিস্তব্ধ রণাঙ্গনে সহসা উত্থিত তূর্য নিনাদের ন্যায় এই অভাবনীয় অভূতপূর্ব সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেল যে, ভারত ও বিপ্লবী বাংলা জাগিয়াছে, আর সে তামস নিদ্রায় ঢলিয়া পড়িবে না। আমি বার বার আসিয়া নারায়ণগড় স্টেশনে ছোটলাটের স্পেশালটির ও তাহার ঠিক পূর্ববর্তী কলিকাতা যাত্রার ডাউন ট্রেনটির সন্ধান লইতেছিলাম। স্থির হইল ঐ ল্যাণ্ডমাইনের উপর দিয়া আমি ঠিক পূর্ববর্তী ট্রেনে কলিকাতা যাত্রা করিব, বিভূতি সরকার ও নিরাপদ রায় স্পেশাল আসিবার পূর্বক্ষণে বারুদের পলতেটি লাইনের উপর তুলিয়া ল্যাণ্ডমাইনের সহিত যোগ করিয়া দিবে। তাহার পর দু'জনে ছুটিয়া দূরে গাছ-পালার মধ্যে গিয়া আশ্রয় লইয়া ভীম নিনাদে সেই বিস্ফোরণ দেখিবে এবং তাহার পর মাঠ-ঘাট, ধান-ক্ষেত দিয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া

মেদিনীপুরে উপস্থিত হইবে।

মানুষ পরিকল্পনা করে, বিধাতা তাহার পরিণতি সাজায়—Man proposes, God disposes! এ ক্ষেত্রে ঘটিল তাহাই! যথাসময়ে স্পেশাল সশব্দে দিগন্ত কাঁপাইয়া আসিয়া পড়িল। আমি তাহার পূর্বের ডাউন ট্রেনে অকুস্থল দিয়া চলিয়া গিয়াছি; গাছ-পালার ঝোপে দাঁড়াইয়া বিভূতি ও নিরাপদ রুমাল নাড়িয়া All O.K. সঙ্কেত দিয়াছে। আমাদের আশা ও পরিকল্পনা ছিল যে, মাইনটি ট্রেনের মাঝামাঝি ফাটিয়া যাত্রীসহ সমস্ত স্পেশালটিকে লাইনচ্যুত করিয়া নদী * গর্ভে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে সাহায্য করিবে। আমরা পিক্রিক বিস্ফোরক না ব্যবহার করিয়া দশ পাউণ্ড ডাইনামাইটে ল্যাণ্ডমাইনটি প্রস্তুত করিয়া ভুল করিলাম। ডাইনামাইট বিস্ফোরিত দ্রব্যকে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত করে না, মাটির তলের দিকে হয় তাহার গতি। ল্যাণ্ডমাইনটি তীব্র চোখ ধাঁধানো জ্যোতি সহ দশ দিক কাঁপাইয়া ফাটিল ঠিকই, কিন্তু রেলের তলায় পাঁচ ফুট ব্যাসের পাঁচ ফুট গভীর খাত সৃষ্টি করিয়া রেল লাইনকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া দিল। ফলে স্পেশালটি সেই ধনুকের বাঁকে আটকাইয়া থামিয়া গেল, নদী গর্ভে নিক্ষিপ্ত হইল না। যদি তাহা হইত, তবে বৃটিশ বাংলার শাসককুলের আশীজন হয়তো সিংহাসন শূন্য করিয়া প্রাণ হারাইতেন ও জখম হইতেন।

বলা-বাহুল্য পত্রপাঠ দুই যুবক বন-বাদাড়, ধান-ক্ষেত, জলা, খাল-বিল ভাঙিয়া মেদিনীপুর অভিমুখে ছুটিল। আধ ঘণ্টার মধ্যে ঐ স্থান পুলিশ অফিসারে ও মিলিটারিতে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বৃটিশ পদানত বাংলায় সে এক অভাবনীয় কাণ্ড! সেই ট্রেন ধ্বংস প্রয়াসের টুকরাগুলি উচ্চ মূল্যে পর দিবস স্মরণীয় পদার্থ হিসাবে ইংরাজরা ক্রয় করিয়াছিলেন। কে যে এই কাণ্ড ঘটাইল তাহার হদিশ আমরা মুরারিপুকুর বোমার মামলায় ধরা পড়া অবধি পুলিশ ও ব্রিটিশ সরকার পান নাই। সরকারি তাড়নার বশে পুলিশ একটি সাজানো মোকদ্দমার জোরে চৌদ্দ জন রেল কুলিকে চালান দিল, বিশ বৎসর কালাপানি সাজা দিয়া। আমি ধরা পড়াব সময় আমার স্বীকারোক্তিতে প্রমাণ করিয়া দিলাম তাহারা একেবারে নির্দোষ।

স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ছিলেন বড় সাধু প্রকৃতির সদাশিব ন্যায়বান রাজপুরুষ। তিনি ফোনে বাংলার পুলিশকে জিজ্ঞাসায় নাজেহাল করিলেন, "বারীনের কথা সত্য, না, পুলিশের কথা সত্য"? তদানীন্তন বাংলার পুলিশ হইলেন লজ্জায় হেঁটবদন, আন্দামানের উদর হইতে চৌদ্দ জন নির্দোষ কুলি মুক্তি পাইল, কোন খেসারত পাইল কিনা জানি না। গরিবের প্রাণটা বাঁচিল এই যথেষ্ট, কে তাহাদের হইয়া খেসারত আদায় করিবে? নারায়ণগড় বিপ্লবী ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল, আর একবার জীবনে প্রমাণ হইল, "রাখে কৃষ্ণ মারে কে, মারে কৃষ্ণ রাখে কে?" আমাকে পুলিশ এবং সি. আই. ডি. নারায়ণগড় ও চন্দননগরে টানাটানি করিয়া প্রমাণ চাহিল এই কীর্তির। আমি আরও দুই এক স্থানে অর্ধ খনিত গর্ত ও গর্তের মধ্যে প্রোথিত কাপড় ও খবরের কাগজ দেখাইয়া দিলাম। ইহার পূর্বে হেমচন্দ্র ও আমি চন্দননগরে আর একবার ট্রেন উড়াইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছিলাম তাহারও স্থানটি সি. আই. ডি. বিভাগ দেখিল। সেবার যে ডাইনামাইট লাট স্পেশালের নিচে ফাটিয়াছে তাহা কেহ বিন্দুবিসর্গ টের পায় নাই, নৈশ নিস্তব্ধতার বুকে সে কীর্তি অলক্ষে মিলাইয়া গিয়াছে। কারণ সেবার এত যত্নে গড়া ফালমিনেট অব মার্কারীর পলিতা ও ডিটোনেটার-যুক্ত বিরাট ল্যাণ্ড মাইন তৈয়ারি করিয়া ট্রেন ধ্বংসের কাজে নামি নাই। শুধু একটি পার্শেলে কিছু ডিনামাইট রাখিয়া ফাটাইয়াছিলাম।

এই সব বিস্ফোরণ ও ট্রেন ধ্বংসের কাজের জন্য ডিনামাইট যোগাইত মাইকা ব্যবসায়ী শ্রীমনোরঞ্জন গুহ মহাশয়ের অভ্র-খনি। মনোরঞ্জনবাবু ছিলেন আমাদের গুপ্তচক্রের একজন মাথা। তিনি এক সময়ে অর্থ দিয়া আমাদের দুর্গম পার্বত্য পথে ডিব্রুগড় ও সাইদা কেল্লার পথে বিদেশের

* আসলে উহা নদী নহে, বিরাট খাল বিশেষ। ডহরপুর মৌজায় মুণ্ডা পাড়ায় অবস্থিত।

সহিত অস্ত্রাদি সংগ্রহের পথ খুলিবার জন্য লোক পাঠাইয়াছিলেন। সে আয়োজন আমাদের আলিপুর বোমার মামলায় হঠাৎ সংঘটনে ব্যর্থ হইয়া গেল। মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা মহাশয় বদনামী হইয়া বাহিরে সি. আই. ডি'র কড়া নজরে পড়িয়া রহিলেন। আমরা রাজদ্রোহের বিচারে কালাপানির যাবজ্জীবন দণ্ড পাইয়া আন্দামান ও বিভিন্ন জেলে আয়ুক্ষয় করিতে চলিলাম। 'না হইতে মাগো বোধন তোমার, ভাঙিল রাক্ষস মঙ্গল ঘট।'

আমাদের নানা ধ্বংসাত্মক কাণ্ডের শ্যেনচক্ষু খুরদা রোডের মণি এতদিন হারাইয়া গিয়াছিল। গত সাতান্ন সালের ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে মণি গাঙ্গুলীর পত্র পাইলাম।

Mani Ganguly
Sardar Sankar Road
Calcutta-29
9.9.57

প্রিয় বারীন দা,

দীর্ঘদিন পরে অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার চিঠি পেয়ে খুবই আশ্চর্য হয়ে যাবেন। আর চিনতেই পারবেন কি-না জানি না!

খুরদা রোড ছাড়বার পর থেকেই আপনার সঙ্গে যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। তারপরে কত জায়গায় বদলী হলুম—অবশেষে কলকাতা এলুম। তাও অনেক দিন হয়ে গেল। গত কয়েক মাস থেকে আপনার কথা কেবলই মনে হচ্ছে—তাই আজ আপনাকে চিঠি লিখলুম। আপনি বিরক্ত হবেন কিনা জানি না। যদি আমাকে আজও মনে রেখে থাকেন—জবাব দেবেন। আমি ওপরের ঠিকানায় এক ভদ্রলোকের বাড়িতে পেইং গেস্ট হিসাবে আছি, চিঠি দিলে খামে দেবেন—তা' না হলে চিঠি হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা।

আপনার বাড়ির ঠিকানা জানি না। তাই বসুমতী অফিসেই চিঠি দিলুম। আপনার চিঠি পেলে আমার খবর জানাবো। আপনি ও বৌদি আমার প্রণাম নেবেন।

আপনার স্নেহের ভাই
মণি

অতীত কথার স্মারক মাত্র এই চিঠিখানির পর দু'একবার পত্র লেখালেখি হয়েছে কিন্তু আমার ঝড়ো জীবনের ঘটনার আবর্তে মণির সঙ্গে দেখাশোনা হয় নাই। ক্রমশ সেই ইতিহাস রচনার আবর্ত-সংকুল দীপ্ত দিনগুলির সংগীরা স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে দূরে বিস্মৃতির অন্তরালে চলিয়া যাইতেছে। এই এক মণি! আরও এক মণি—রংপুর হইতে যুগান্তর কাগজখানি সৃষ্টির রসদ যোগাইবার "মণি লাহিড়ী—বোমা পিস্তল হাতে স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারকে তাড়া করিয়া শিলঙে ভূপাল বসুর বাসায় পিস্তলের গুলিতে আহতকারী মণি লাহিড়ী পর্যন্ত সকলেই যাইতেছে আমার জীবনের সূত্র হইতে হারাইয়া। এই সূত্রে মণি গনা ইব" কত উজ্জ্বল মণি মুক্তাই না আজ পর্যন্ত আসিল গেল, সাহিত্যিক পরিচ্ছেদে, রাজনীতিক পর্যায়ে পারমার্থিক যোগ সাধনার খণ্ডে আমার বিচিত্র জীবনটিকে সমৃদ্ধ ও মনোজ্ঞ মধুর করিয়া চলিয়া গেল। এই শেষ পর্যায়ে অতীন্দ্রিয় শক্তি জ্ঞান আনন্দের রহস্যময় পর্যায়ে এখনও এই জীবন প্রাঙ্গণে তাহারা আনাগোনা এবং চিত্তাকর্ষক অভিনয় করিয়া চলিতেছে— দেশ ও জাতি গঠনের অমূল্য উপাদানরূপে। বাস্তব জীবনের রূপালি পর্দায় প্রতিফলিত এই চিত্রমালা ভবিষ্যতের জন্য গুছাইয়া রাখিবার কখনও কখনও সাধ যায় কিন্তু তরঙ্গসংকুল আবর্তের ঘাত-প্রতিঘাতে সে সুযোগ আসিয়া আসিয়া চলিয়া যায়। অবিচ্ছিন্ন অবসর মিলে না সেগুলি স্মৃতি হইতে সংগ্রহ করিয়া মণিহার রচনার। আজ বসুমতীর কাজ হইতে ছুটির সুযোগে খুরদা রোডের কবি ও আমাদের সন্ত্রাসবাদী দিনের সন্ধানী মণির কথা একটি চিত্রে আঁকিয়া

রাখিলাম। এখনও বহু আবর্ত ও ঝড় ঝঞ্ঝার কুটিল আবর্তে এই দীর্ণ-বিদীর্ণ মাতৃভূমি আমাদের উঠিবে পড়িবে....ভরিবে জাগিবে বিশ্ব মহারাষ্ট্র রচনার উপকরণ যোগাইবে এবং কত না নব নব যুগ পাল্টাইতে সহায়তা করিবে। দেশবন্ধু, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষ, অরবিন্দ বিরহিত বিশ্বের সৃষ্টির কখনও সম্ভব হইবে না। অগণ্য সাধকের জ্বলন্ত ধুনীও যোগাসনে বেষ্টিত হইয়া জ্বলিতেছে এই মহা যজ্ঞকুণ্ডে—কি নূতন বিশ্বরচনার উদ্দেশ্যে কে জানে।

মানুষের স্মৃতির সূত্র এক চন্দ্রলোকের চরকা-কাটুনী বুড়ির খাম-খেয়ালি রচনা! স্মৃতির ঠাকুর প্রয়োজনীয় অনেক কিছুই কালের খরস্রোতে ভাসাইয়া দেয় আমরা অপ্রয়োজনীয় অনেক খুঁটিনাটি ঝুড়ির মধ্যে সঞ্চয় করিয়া কুড়াইয়া রাখি। নারায়ণগড়ের পথে যাত্রার সেই দিন-রাত্রিটির কত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন স্মৃতির রঙিন টুকরা এখনও অন্তত স্মৃতিপটে জ্বলজ্বল করিতেছে। ভুলি নাই খড়্গাপুরের মাঠে গাছের তলায় বসিয়া পুরি, তরকারি, হালুয়া খাওয়ার সেই কাগজ ও শালপাতার স্মৃতি, ভুলি নাই সন্ধ্যার ধূসর আবেশে ও নিশার গাছপালা ঢাকা রেল লাইনে উদ্বিগ্ন ব্যগ্র দৃষ্টির মুহুর্মুহু সঞ্চালন, ভুলি নাই দুইটি তরুণ সঙ্গীর মধুর সাহচর্য ও মৃত্যু তুচ্ছ করা ঐকান্তিক সহযোগিতা। কল্পনা ও মানস-পূজার দেশমাতা ও বঙ্গ-জননীর বাস্তবতা ছিল এই সব অন্তরঙ্গ তরুণ সাথী ও সক্রিয় আত্মবিসর্জনের মুহূর্তগুলির সঞ্চয়ে।

বহুদিন—পঞ্চাশ বৎসরের অধিক পার হইয়া গিয়াছে কালচক্র, তথাপি অপূর্ব অরুণিমায় রাঙা করিয়া রাখিয়াছে ইতিহাস ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির অতীতের অস্তাচল কি এক মনোমুগ্ধকর বর্ণচ্ছটা ও গরিমায়। নূতন এক পুরুষের পর আর এক পুরুষ আসিতেছে যাইতেছে জীবনের রঙ্গমঞ্চ হইতে অপসৃত হইতেছে তথাপি সকলেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ হইয়া আছে সেই কালের অস্তাচল চূড়ায়। অনন্ত বিহঙ্গমের মুগ্ধ কাকলি থামিতেছে না সেই বর্ণসুলভ অস্তাচল চূড়া ঘিরিয়া। যতদিন কালচক্রের আবর্তনে মানুষ আসিবে যাইবে অন্তত নিরন্তর ধারায় ততদিন জাগিয়া থাকিবে মানব ইতিহাস ও কৃষ্টির এই বর্ণগরিমা। অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, প্রতাপাদিত্য, পৃথ্বীরাজ মুছিয়া গিয়াছে আজ নশ্বর জীবনের যবনিকা হইতে—তথাপি গৌতমের ত্যাগ, শঙ্করের ক্ষণজন্মা জীবনের ভারত বিজয়ী জ্ঞানচ্ছটা, চৈতন্যের অপরাজয়ী প্রেম, রাজপুতনার অসির ঝলক ও মৃত্যুঞ্জয়ী নারীর জহরব্রত আজও যুদ্ধ করিয়া রাখিয়া নূতন বঙ্গে ও ভারতের জীবনের চক্রে গতি যোগাইতেছে, জন্ম দিয়া, হাতছানি দিয়া ডাকিয়া আনিয়াছে আত্মত্যাগের ও মানব দিগ্বিজয়ের নব নব অফুরন্ত অভিজাত আজ লজ্জিত জীর্ণ দুর্নীতি-লিপ্ত বঙ্গে ও এই দুস্তর কলঙ্কসাগরে পড়িয়াও মরিয়া দুরাশা-দগ্ধ মানুষ—বাঙালি চাহিয়া আছে ঐ অস্তাচল চূড়ারই দ্রুত বিলীয়মান রক্তিমতার দিকে। এ কি শুধু দুরাশা, না অফুরন্ত কালজয়ী মানব অভিযানের অমর আহ্বান? ইহা যদি মরে তবে থাকিবে কি?

এই ছোট লাট স্যার এণ্ড্রু ফ্রেজারের ন্যায় ন্যায়নিষ্ঠ সাধু প্রকৃতির ব্যক্তি সে সময়ে দর্পান্ধ ইংরাজ শাসকের মধ্যে দুর্লভ ছিলেন। তথাপি তাহার বধের আদেশ শ্রীঅরবিন্দ প্রতিম 'বিগ জি' দিয়াছিলেন। রাজপুরুষদিগের মধ্যে কে ভাল কে মন্দ তাহা বিচার করিয়া চলিবার কাজ আমাদের ছিল না। আমরা ব্রিটিশ শাসকের উচ্চাসনগুলি পারিলে নিঃশেষে শূন্য করিবার কাজে লাগিয়াছিলাম ভারতের মুক্তি সংগ্রামের নীতি হিসাবে। যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ, সুতরাং লঙ্কাপুরীকে রাবণ শূন্য করিতে হইবে। বিদেশির শাসন সুশাসন হইলেও নিন্দনীয় ও বর্জনীয়, স্বদেশি শাসন কুশাসন ও দুর্নীতিপূর্ণ হইলেও তাহাই শ্রেয় এই ছিল সে যুগে আমাদের মুক্তি-যোদ্ধাদের নীতি। আজ দুর্নীতিপূর্ণ বলিয়া কংগ্রেসি রাজ্যের উচ্ছেদ অনেকে হয়তো চাহেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে কোন নিখুঁত বৈদেশিক শাসনচক্র ভারতবাসী কামনা করে না।

ঠিক এইরূপ ভাবেই ইহার পরবর্তীকালে বঙ্গভঙ্গের পর স্যর ব্যামফিল্ড ফুলারের প্রাণনাশের জন্য তাহাকে বরিশাল হইতে অনুসরণ করিয়া আমরা বোমা ও পিস্তল হস্তে তাহাকে নৈহাটি পার করিয়া দিই—সে অপূর্ব কাহিনীও সবিস্তারে বলিবার আছে। জর্জ কিংসফোর্ডকেও এমন

ভাবেই কলিকাতা হইতে মজঃফরপুর অবধি আমরা অনুসরণ করিয়াছিলাম তাঁহাকে নির্দয়ভাবে ইহলোক হইতে অপসারণের মানসে। সে যুগের বিপ্লবচক্রের মূল কেন্দ্র "বগড়ির রাজা সুবোধ মল্লিক, আই. সি. এস. চারু দত্ত ও অরবিন্দ যে রাজপুরুষের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেন তাহার আর রক্ষা ছিল না। ভাগ্য যাহাকে রক্ষা করিত প্রফুল্ল চাকী প্রভৃতি বিপ্লবীর হাত হইতে, হাউণ্ডের হাত হইতে, কেবল দৈব কৃপায় তিনি রক্ষা পাইতেন। কালীকার নিকট শ্বেত ছাগলই ছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠ বলি। দিল্লি দরবারে প্রবেশমুখে ভাইসরয়ের হস্তী হাওদায় বোমা পড়ে, বড়লাট হার্ডিঞ্জ্ ভীষণ ভাবে আহত হন। তাহার স্কন্ধের সে বৃহৎ ক্ষতে একটি বদ্ধমুষ্টির স্থান হইত, এতবড় আঘাতের পরও সুচিকিৎসার গুণে তাহার প্রাণ রক্ষা সম্ভব হইয়াছিল। বল বল দৈববল, রাখে কৃষ্ণ মারে কে?

তখন ভারতে বিশেষত বাংলা দেশে অনুশীলন সমিতি, আত্মোন্নতি সমিতি, সুহৃদ সমিতি ও আমাদের দলের ন্যায় বহু দল নানাভাবে বিপ্লবের আয়োজনে রত ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ-বারীন্দ্র পরিচালিত দলই ছিল কেন্দ্রীয় দল। পরবর্তী যুগে তাহার নাম যুগান্তর পার্টি দেওয়া হয় তাহাদের বিপ্লববাদী যুগান্তর পত্রিকার নামানুসারে। আসলে এই কেন্দ্রীয় সুনিয়ন্ত্রিত দল কোন বিশেষ নামে পরিচিত ছিল না। আমরা ধরা পড়িয়া আলিপুর বোমার মামলায় কালাপানিতে যাত্রার পরও রাসবিহারী, বাঘা যতীন সকলেই এই মূল বিপ্লবীচক্রের নামেই কাজ করিতেন, মুক্তি সংগ্রামী বাংলার অভিযান চালাইয়া যাইতেন। দেশ মাতৃকার দীক্ষিত সমর্পিত সন্তানদিগের সে ছিল অবিচ্ছন্ন অখণ্ড এক অভিযান।

মতিলাল রায়

স্বদেশিযুগের কথা*

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে স্বদেশি আন্দোলন ভীমমূর্তি পরিগ্রহ করিল। দেশনেতৃগণ তাড়াতাড়ি গভর্নমেন্টের সহিত কোনরূপ চুক্তি করিয়া আত্মসম্মান রক্ষায় উদ্যোগী হইলেন। দ্বিধা-বিভক্ত জাতীয় দল ছন্নছাড়া হইয়া পড়িল। মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভা ভঙ্গ হওয়ার সূত্র ধরিয়া, বাংলার জাতীয় পক্ষ নিখিল ভারতের রাষ্ট্র-যজ্ঞ পণ্ড করিলেন। সুরাটে স্বজাতি বিরোধের প্রলয়ানল জ্বলিয়া উঠিল। বাংলায় এই বৎসর হইতে শাসনদণ্ডের কঠোর নিষ্পেষণ আরব্ধ হয়।

"বন্দেমাতরম্" মকদ্দমায় বিপিনচন্দ্র যখন গভর্নমেন্টের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন—"I honestly believe that prosecution like that of Bande Mataram are calculated to stifle freedom of thought and speech in the country and interfere with the civil advancement of the people. Nor are they likely to promote the interests of public peace. I have therefore, conscientious objections to take any part in such prosecutions. This is why I declined to be sworn in and confirmed as a witness for the prosecution in the Bande Mataram case."

বিপিনচন্দ্র সাক্ষ্য দিতে এইরূপে অস্বীকার করায় ম্যাজিস্ট্রেট তাঁহার ছয়মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করা মাত্র, রাজপথে বাংলার তরুণ ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া তুলিল। শান্তিরক্ষার জন্য শ্বেতাঙ্গ সার্জেন্টের ব্যবস্থা হইয়াছিল। কিন্তু শান্তিরক্ষার্থ শ্বেতাঙ্গ পুলিস জনতার মধ্যে পৌঁছিবামাত্র উন্মত্ত জনসঙ্ঘ তাহাদের অঙ্গে হস্তক্ষেপ করিল। রাজপুরুষেরা সেদিন বুঝিলেন—বাংলার তরুণকে কেবল হুম্‌কি দেখাইয়া শাসনে রাখা আর সম্ভব হইবে না, কেবল সার্কুলার জারি করিয়া এ আবেগ, এ উত্তেজনা প্রবাহ রুদ্ধ হইবার নহে, প্রচণ্ড শাসনদণ্ড উদ্যত করিতে হইবে। ধীরে ধীরে রাজশক্তি রুদ্র মূর্তি ধরিল। ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে শ্রীমান জানকীনাথ দত্ত নামে এক যুবক স্বদেশি আন্দোলনের আবর্তে আইনের সীমা উল্লঙ্ঘন করায়, তাহার প্রতি কারাদণ্ডের সহিত বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। এই ঘটনা লইয়া দেশনেতৃগণ তুমুল আন্দোলন আরম্ভ করেন। কিন্তু লালবাজারে পুলিস আদালতের সম্মুখে বাঙালি যুবকগণের পুলিশের উপর হস্তক্ষেপ করার ভরসা দেখিয়া একে একে কঠোর শাসননীতি প্রবর্তিত হয়; এবং স্বদেশি আন্দোলনের মূলোৎপাটনে কর্তৃপক্ষগণ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। প্রথমেই অপরাধী যুবক ও বালকগণের উপর নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতের ব্যবস্থা হয়। লালবাজারের শ্বেতাঙ্গ পুলিসের সহিত যে দাঙ্গা হয়, তাহাতে সুশীলকুমার অপরাধী বলিয়া ধৃত হয়; বিচারকালে এই বালক নির্ভীক কণ্ঠেই নিজের অপরাধ স্বীকার করে। সে স্বর্গের পারিজাত অঙ্কুরেই শুকাইয়াছে, দেশপ্রীতির অমৃতনির্ঝর মরুপথে হারাইয়া গেল। স্বদেশিযুগের ইতিহাসে সুশীলের পুণ্যজীবন কাহিনীটুকু যেন বাদ পড়িয়া না যায়, তাই এই কয়েক ছত্র উল্লেখ করিয়া রাখিলাম। সুশীলের উপর বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়—প্রেসিডেন্সী জেলে এই নৃশংস কার্য সাধিত হয়। প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে তার কণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" মন্ত্র উচ্চারিত হইয়াছিল। সন্তানের ব্যথায় বঙ্গজননীর চক্ষে অশ্রুবিন্দু ঝরিয়া পড়িয়াছিল। সত্যই সেদিন শুধু সুশীলের জননীই ব্যথা অনুভব করেন নাই, বাংলার প্রত্যেক সন্তান-জননীর চক্ষে বসুধারা ঝরিয়াছিল। সুশীলের বেত্রাঘাত সে যুগে খুব বড় ঘটনা বলিয়াই আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অন্তরে অঙ্কিত হইয়াছিল। বাংলায় ইহা লইয়া যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়,

* *শতবর্ষের বাংলা*—সঙ্ঘগুরু শ্রীমতিলাল পৃ. ২১২-২২৯। শিরোনাম আমাদের দেওয়া।

তাহার ধুয়া ধরিয়া বিলাতের 'নেশন' কাগজে যে মন্তব্য প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাতে বুঝা যায় যে, এই বর্বর প্রথা ইংরাজ-চরিত্রের আদর্শানুযায়ী হয় নাই; কিন্তু রাজ্যরক্ষার জন্য ব্রিটিশ শক্তি আদর্শের দায় কোন কালেও ভ্রূক্ষেপ করেন না। 'নেশনে' লেখা হইয়াছিল—

"Public flogging carried out at the triangle placed outside every magistrate's court is still the rule in most Indian provinces, but the flogging of an educated man for a political offence is surely a novel infamy, the flogging of "politicals" is rare even in Austria."

কিন্তু গবর্নমেন্টের রুদ্রমূর্তি সেদিন শান্ত হয় নাই। সুশীলকে প্রেসিডেন্সী জেলে লইয়া গিয়া বেত্রদণ্ড দেওয়া হয়; কিন্তু ইহার পর শ্রীমান্ পান্নালাল শেঠ ও শ্রীমান্ পঞ্চানন দাসকে আদালত প্রাঙ্গণেই বেত্রাঘাত করা হয়। উপর্যুপরি বেত্রাঘাত চলিতে থাকে। শ্রীমান্ কালীপ্রসন্ন সাহা নিষ্ঠুর বেত্রাঘাতে অবসন্ন হইয়া পড়ে। শ্রীমান্ তিনকড়ি দে নামক এক পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের উপর পনের ঘা বেত্রদণ্ডের আদেশ হয়। দেশের দিক্ হইতে প্রতিবাদের কলরব তুলিলে কি হইবে—বাংলার রাজকর্তৃপক্ষ ইহাতে সন্তুষ্ট হন; কলিকাতার পুলিস ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ড সাহেবের মাসিক ৫০০্ শত টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেন।

অন্যপক্ষে জাতীয় দলের সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করার আয়োজন হয়। "যুগান্তরের" দ্বিতীয়বার রাজবিদ্রোহ অভিযোগে বসন্তকুমার ভট্টাচার্য নামক এক ব্যক্তি দুই বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ও এক হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। "বন্দেমাতরমে"র মুদ্রাকর অপূর্বকৃষ্ণ ঘোষের তিন মাস কারাদণ্ড হয়। "সন্ধ্যায়" "এবার ঠেকে গেছি প্রেমের দায়ে" বাহির হওয়ায়, সম্পাদক ব্রহ্মবান্ধব আবার ধৃত হন। এই সময়ে তাঁর অন্ত্রবৃদ্ধি রোগ ছিল; ম্যাজিস্ট্রেটের এজ্‌লাসে দুই দিন তাঁকে ঠায় দাঁড়াইয়া থাকিতে বাধ্য করায়, তাঁর এই রোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি জেল খাটিতে হইবে বলিয়া অন্ত্ররোগ হইতে মুক্তির জন্য ক্যাম্বেল হাসপাতালে অস্ত্রোপচার করাইতে গিয়াছিলেন। হাসপাতালেই তিনি শুনিলেন যে, সম্পাদক হিসাবে তিনি পত্রিকার সকল দায়িত্ব নিজের উপর গ্রহণ করিলেও "সন্ধ্যার" কর্মকর্তা ও মুদ্রাকরকেও গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সংবাদ-শ্রবণমাত্র তাঁর সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তিনি "সন্ধ্যার" কর্মচারীকে সন্তানের তুল্য স্নেহ করিতেন। ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের কঠিন শাস্তি সহিবার মত শক্তি তাহার হইবে না, এই ভাবিয়া সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজের উপর গ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রাণপ্রতিম কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত হইতে দেখিয়া তিনি এক প্রকার স্বেচ্ছা-মৃত্যু বরণ করিলেন। অন্ত্র হইতে শোণিত প্রবাহ ছুটিল। সেইদিন অপরাহ্ণে তিনি জনৈক বন্ধুকে বলিলেন—"আমি ফিরিঙ্গির জেলে বেগার খাটিব না। আমার ডাক আসিয়াছে। আমাকে কারাগারে রাখে, এমন সাধ্য ফিরিঙ্গির নাই।"—হায় কে জানিত, তাহার পরদিনে বীরযোগীর তেজোগর্বিত স্পর্ধাবাণী এমন অক্ষরে অক্ষরে সত্যে পরিণত হইবে? চিরকুমার মুক্তিব্রতী সন্ন্যাসী প্রিয় জন্মভূমির মুক্তি ধ্যান করিতে করিতে সকল বন্ধনকে উপহাস করিয়া হাসিতে হাসিতে মহাপ্রস্থান করিলেন। হাসপাতাল তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইল। মরণের একমাস পূর্বে কালীঘাটের নাটমন্দিরে দাঁড়াইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "মা, আবার ব্রাহ্মণদেহ দিও—কুড়ি বৎসর পরে আবার এদেশে জন্মিয়া ফিরিয়া তোমার কার্যে আসিব—তোমার মুক্তিব্রতের উদ্‌যাপনে আমার দেহ লুটাইব।" বিদায়কালে তাঁহার কথা — "দেশের জন্য আমার ক্ষুদ্রশক্তি খুব সামান্য কাজ করিল। আমি চলিলাম। দেশমাতৃকার মুক্তির ভার ভগবানের উপর রহিল।" যাও ধর্মবীর জন্মে জন্মে তুমি এমনি বীরগর্ব লইয়া আসিও, লক্ষ্যভ্রষ্ট ভারতবাসীকে স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত রাখিও। উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মৃত্যুসংবাদ কলিকাতা শহরে আগুনের মত ছড়াইয়া পড়িল। রাজপথ লোকে-লোকারণ্য হইল। তাঁর পবিত্র শবদেহ বহনে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। পুষ্পমাল্য শোভিত চিতা-শয্যায় দেশপ্রেমিকের বীর-বপু দেখিয়া অনেকেই সেদিন অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন নাই। ডাঃ সুন্দরীমোহনের পত্নী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে উপাধ্যায়ের পুণ্য কথা উচ্চারণ করিয়া উৎসাহের সহিত শোকাশ্রুসাগরে সমবেত জনমণ্ডলীর হৃদয় ভাসাইয়া দিয়াছিলেন; তাঁর কণ্ঠের অশ্রুসিক্ত জ্বলন্তবাণী এখনও কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর ব্রহ্মবান্ধবের পুণ্যদেহ ভস্মমুষ্টিতে শেষ হইল। উপাধ্যায় বাঙালির প্রাণে

হাহাকারের ঢেউ তুলিয়া গেলেন। এমনই আঘাতে আঘাতে বাংলার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল।

১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে আর একজন মহাপ্রাণ দেশপ্রেমিক অন্তর্ধান করেন। স্বদেশযজ্ঞের মহাঋত্বিক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ স্বাস্থ্যলাভের জন্য সমুদ্রযাত্রা করেন। জাহাজেই তাঁর মৃত্যু হয়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর দৃঢ় চরিত্র সম্বন্ধে যেটুকু অভিমত প্রকাশ করেন, তাহার কয়েকছত্র উদ্ধৃত করিলাম। তাহা পাঠ করিলেই তিনি কি প্রকৃতির লোক ছিলেন, বুঝা যাইবে —

"A devoted patriot, he never spared himself in the service of the motherland........he was reckless of health and life, strong willed, and even obstinate, above all advice and remonstrance."

তাঁর জ্বালাময়ী লেখনি স্বদেশপ্রেমের অগ্নি বর্ষণ করিত। তাঁর সঙ্গীতের ঝরনায় অভিষিক্ত হইয়া জাতি নূতন প্রাণ পাইত। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেসে "ভেইয়া, দেশকা এ কেয়া হল" এই গানটি সমগ্র ভারতবাসীর প্রাণে দেশ-মমতার প্লাবন তুলিয়াছিল। তিনি "ব্রাইটস্ রোগে" অবসন্ন হইয়া পড়িতেছিলেন; কিন্তু দেশের ডাকে স্বাস্থ্য রক্ষায় উদাসীন থাকিতেন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তাঁহাকে আমাদের এক সভায় আহ্বান করিয়া লইয়া আসা হইয়াছিল। বৈশাখের প্রখর রৌদ্র উপেক্ষা করিয়া সৌম্যমূর্তি দেশপ্রেমিক গরদের যোড় পরিধান করিয়া স্বদেশি মন্ত্র প্রচার করিলেন। সে স্মৃতি ভুলিবার নয়। মাথার মধ্যে কখনও কখনও তিনি অতিশয় জ্বালা অনুভব করিতেন, তখন বরফের চাঙড় মাথায় দিয়া বাংলার এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মেও দেশময় স্বদেশমন্ত্র প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। জুলাই মাসের ১ তারিখে তাঁর মৃত্যুসংবাদ দেশে পৌঁছিলে, বাঙালি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়াছিল। তিনি নবোদিত স্বাধীন জাপানের পবিত্র ভূমি লক্ষ্য করিয়া প্রশান্ত সমুদ্রে নিজের দেহ ভাসাইয়া স্বাধীনতাব জয় দিয়াছিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দে এই দুই দেশনেতাকে হারাইয়া বাঙালি সত্যই সেদিন বেদনা অনুভব করিয়াছিল।

জাতীয় জীবনে এই দৈব দুর্ঘটনার সহিত রাজরোষ চতুর্দিকে অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল। কলিকাতায় সভা বন্ধ করার পুলিস আইন সারা দেশের আইনে পরিণত হইল। সিমলা শৈলে ডাঃ রাসবিহারী ঘোষ ও মিঃ গোখ্‌লে ইহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করিয়া অনেক যুক্তি প্রদর্শন করিলেন; কিন্তু কর্তৃপক্ষের যাহা করিতে ইচ্ছা; তাহা কোনদিন যেমন রুদ্ধ হয় না, সেদিনও তাহাই হইয়াছিল। তিন বৎসরের জন্য সভা-বন্ধ আইন পাস হইয়া গেল। লিয়াকৎ হোসেন এই আইন ভঙ্গ করিয়া বহুবার নির্যাতিত হইয়াছেন; মানুষের যথার্থ অধিকার রক্ষার দায় এমন সরল ও নির্ভীক ভাবে সেদিন আর কেহই মাথা তুলিয়া লইতে ভরসা করেন নাই। ব্যারিস্টার এ. সি. ব্যানার্জি সেদিন স্বদেশীয় আগুন লইয়া খেলিতেন; সিডিশন মিটিং বিল পাস হওয়ার পর, তিনিও ইহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ করিতে গিয়া অভিযুক্ত হন। তখন রাজদণ্ড মাথায় বহিয়া আইনভঙ্গ করার স্পর্ধা দেখাইতে পারিলে উত্তেজনার আগুনে ইন্ধন পড়িত, আইনভঙ্গনীতির স্পর্ধা সেদিন হইতে আজ পর্যন্ত সম্পূর্ণ সফল হয় নাই। মিঃ এ. সি. ব্যানার্জির অগ্নিময়ী বাণীর সঙ্গে তাঁর নির্ভীক আচরণ সকলে আশা করিয়াছিল, কিন্তু তিনি মুচলেকা দিয়া অব্যাহতি লাভ করেন। "সন্ধ্যার" কর্মকর্তাও ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া মুক্তি পাইয়াছিলেন। একদিকে বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়কগণ সুর বদলাইয়া দেশকে প্রকৃতিস্থ করায় উদ্যোগী হইলেন; অন্যদিকে যে জমিদারবর্গ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াইয়া দেশের প্রাণ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই রাজভক্তিমূলক ইস্তাহার বিলি করিলেন। "বন্দেমাতরম্"—পত্রে এ সম্বন্ধে লেখা হয় —

"It is no indication of treachery in the camp, but only proves that the metal of the nation has all this time been in the crucible, and has at last thrown up its dress." অপর দিকে এক তরুণ জাতীয় পক্ষ দেশের ভগ্ন মনে উত্তেজনা রক্ষার জন্য জ্বালাময়ী লেখনী ধরিয়া কাজে লাগিয়া গেলেন। আবার গোপনে বিপ্লব প্রচেষ্টাও চলিতে থাকিল। দেশ নেতৃগণের পশ্চাৎ কোনরূপ সংহতিশক্তি রহিল না, চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল—দলাদলি, পরস্পরের মতামত লইয়া ব্যক্তিগত বিদ্বেষপ্রচার নেতৃদের অনিবার্য কর্ম হইল। তাঁহাদের কথায় কেহ কর্ণপাত করিতে চাহিল না। দমননীতি যে জাতীয় মুক্তির পথে আসিবে, তাহা না জানিয়া

দেশনেতৃগণ দেশের প্রাণ কেন নাচাইলেন, এইরূপ অভিযোগের সুর উঠিল। শাসনদণ্ডের সম্মুখে জাতীয় সম্মান বলি দিয়া ঘরে ফিরিবার ইচ্ছা একদল লোকের আদৌ ছিল না। যাঁহারা ফিরিবার ইচ্ছাটুকু আশ্রয় করিয়া কাজে নামিয়াছিলেন, তাঁহারা রাজরোষের আঁচ পাইয়া সরিয়া পড়িলেন—যাঁহারা ইহার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই তির্যক পথ ধরিয়া গোপন ষড়যন্ত্রে দেশে বিপ্লব দল গড়িয়া তুলিলেন। ১৯০৭ খৃস্টাব্দে রাজশক্তির প্রবল শাসন উপেক্ষা করিয়া, বিপ্লবপন্থীদের যে কয়টি কার্য রাউলাট রিপোর্টে বাহির হইয়াছে, তাহাই ইহার যথেষ্ট পরিচয় দিবে।

বিপ্লব পন্থিগণ প্রথম আশা করিয়াছিলেন—ইংরাজশক্তি সমগ্র জাতির মতবিরুদ্ধ কাজ করায় দেশের মনে যে অসন্তোষ ও রাজবিদ্বেষের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাতে ইংরাজরাজ্যের ভিত্তিনাশের প্রচেষ্টায় দেশের লোকই অর্থসাহায্য করিবে; তাঁহাদের এই আশার আংশিকভাবে পূরণ হইলেও, কাজের অনুপাতে তাহা যথেষ্ট হয় নাই এবং এই আশা কোন কালে সফল হওয়ার সম্ভব হইবে না বুঝিয়াই বিপ্লবপন্থিগণ দস্যুবৃত্তি করিয়া অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

স্বদেশি যুগের সূত্রপাত হইতেই, একদল বুদ্ধিমান লোক বুঝিয়াছিলেন—বিনা বিপ্লবে মুক্তি সম্ভব হইবে না; ইঁহারা ইহা যথাসাধ্য দেশের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে প্রচারও করিয়াছিলেন। স্বদেশিযুগের আন্দোলন সম্মুখে রাখিয়া বিপ্লব পন্থীদের গোপন ষড়যন্ত্র চলিয়াছিল। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে মাঝে মাঝে অর্থ সঞ্চয়ের জন্য, রাজনীতিক ডাকাতির ব্যর্থ প্রয়াসের কথা শুনা যাইত। কিন্তু ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের ৬ ডিসেম্বর নারায়ণগড়ে ছোটলাট বাহাদুরের গাড়ি উল্টাইয়া দিবার প্রয়াস হইয়াছে, এই সংবাদ যখন বাহির হইল ; তখন দেশের প্রাণস্রোত একেবারে ভিন্নমুখী হইয়া পড়িল। "যুগান্তর", "বন্দেমাতরম্" "নবশক্তি", "সন্ধ্যা" প্রভৃতিতে যে অগ্নিময়ী লেখা বাহির হইত, তাহাতেই তরুণের প্রাণ উত্তেজনায় শিহরিয়া উঠিত। বোমা দিয়া লাট সাহেবের গাড়ি উল্টাইবার প্রয়াস যেন স্বপ্নজগতের কথা বলিয়া প্রাণে নূতন চমক লাগাইয়া দিল। ইহার পূর্বে জামালপুরের দাঙ্গায় বাঙালির কৃতিত্বের কথা বেশ ঘোরাল করিয়াই সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। পুলিসের দমননীতির আতঙ্ক নেতৃদের কথার জোরে দূর হইত না ; কিন্তু এই একটা ঘটনায় বাংলার প্রাণে নূতন উৎসাহ দেখা দিল। বাংলার তরুণ প্রাণ দেওয়ার সাধনায় অধিকতর উদ্বুদ্ধ হইল।

এই অবস্থার মেদিনীপুরের রাষ্ট্রসভায় নূতন ও পুরাতন শক্তির দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিয়া যায়। সুরেন্দ্রনাথের কণ্ঠ তখন প্রায় নীরব হইবার উপক্রম করিয়াছে। তিনি রাজনীতিক চালবাজিতেই কর্মোদ্ধার করার তখন পক্ষপাতী, তাঁর বুদ্ধির মাপকাঠিতে দেশের শক্তি নির্ধারিত হইত এবং তদনুসারে চলিয়া দেশের উন্নতি লাভ তিনি শ্রেয় মনে করিতেন। কিন্তু নবযুগের ঋষি তখন অগ্নিবীণায় ঝঙ্কার দিয়াছেন, তখনকার এই লেখা পড়িলেই ইহার উপলব্ধি হইবে —

"Revolutions are incalculable in their doings and absolutely uncontrollable. The sea flows and who shall tell it how it is to flow? The wind blows and what human wisdom can regulate its motions? The will of divine wisdom is the sole law of revolutions and we have no right to consider ourselves as anything but mere agents - chosen by that wisdom."

বাংলার এই তন্ত্রই সুরাটে দক্ষযজ্ঞ বাধাইল। দেশে মুক্তিসাধনায় হিসাব রাখিয়া চলার যে সকল নীতি সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ প্রবর্তন করিতে চেষ্টা করিলেন, অন্যপক্ষ তৎপরিবর্তে অন্তরের অগ্নিপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া ছুটিলেন। পঞ্জাবসিংহ লাজপত নভেম্বর মাসে মুক্তি পাইলেন। দেশভক্ত লাজপতকে জাতীয় সম্মান প্রদান করার জন্য বাংলার জাতীয় পক্ষ সুরাটের কংগ্রেসে তাঁহাকে সভাপতি করার ধুয়া ধরিলেন। ভারতে তখন একদল অগ্নিহোতা গড়িয়া উঠিয়াছিল, বাংলার নির্দেশ সেদিন সমগ্র ভারতে তাঁহাদের মাথা পাতিয়া লইতে হইত। অন্যপক্ষ ডাঃ রাসবিহারী ঘোষকে কংগ্রেসের নেতৃত্বদানে ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। লাজপত এই রাষ্ট্রসংগ্রাম হইতে দূরে থাকিতে চাহিলেন; তখন ভারতের তাৎকালীন জাতীয় পক্ষ মহারাষ্ট্রকুলগৌরব লোকমান্য তিলককে এই

রাষ্ট্রগৌরবের জয়টিকা দিবার উদ্যোগ করিলেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের কংগ্রেস নাগপুরে হওয়ার কথা ছিল; অবস্থা বুঝিয়া মধ্যপন্থিগণ উহা সুরাটে স্থানান্তরিত করিলেন। যে প্রাণশক্তি জাতীয় সম্মানরক্ষায় জাগরিত হইয়াছিল, তাহা স্বজাতিদ্রোহের সমস্যায় আবর্তিত হইল। যে শক্তি দেশের মুক্তি আনয়ন করে, তাহা সকল দেশেই আত্মবিদ্রোহে জয়ী না হইয়া কোথাও সাফল্যের স্বর্ণকিরীট লাভ করে নাই। ভারতে সেদিনের সুরাট দক্ষযজ্ঞে যে অন্তর্বিরোধের হলাহল উত্থিত হইয়াছে তাহা যে নিঃশেষ হয় নাই—ইহা বলাই বাহুল্য এবং ইহা শেষ হওয়া যে কত বড় প্রলয়সৃষ্টির উপর নির্ভর করে, তাহা চিন্তাশীল মাত্রেই বুঝিবেন। সুরাটের স্বজাতিবিরোধ শক্তিপরীক্ষার অবাধ ক্ষেত্র না পাইয়া, ধূমায়িত বহ্নির ন্যায় জাতির শ্বাস রুদ্ধ করিয়া দেয়। আমাদের এই বিশাল জাতির মধ্যে যত সহজে ঐক্যবদ্ধ জীবনের প্রত্যাশা করি, আসলে সে বস্তু তত সহজসাধ্য নহে।

সুরাটের কংগ্রেস লইয়া দেশে যখন ঝড় বহিতেছে, তখনই বিপ্লবপন্থীর অগ্নিনালিকা সর্বপ্রথম গর্জন তুলিল। গোয়ালন্দ স্টেশনে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট এলেন সাহেবকে এক ব্যক্তি গুলি করিয়া অনায়াসে আত্মগোপন করিল। এ সংবাদ তখন যুগান্তকারী ছিল। বাংলার বিপ্লবপন্থীর দল ক্রমেই যে প্রবল হইয়া উঠিতেছে—ইহা জাতীয় শক্তির পরিচয় বলিয়া তখন গর্বের বস্তু বলিয়া গণ্য হইত।

বাংলায় মুক্তিকামনা অগ্নিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়াছিল। সুরাটের রাষ্ট্রসভা মূলত বাঙালির চক্রান্তেই। অন্তিমশয্যা গ্রহণ করে। যদিও এই ঘটনা জাতীয় গ্লানিরূপে অনেকের নিকট প্রতিভাত হয়, কিন্তু জাতীয় জাগরণ যদি কোনদিন সত্য আকারে দেখা দেয়, তাহা হইলে ইহাপেক্ষা অন্তর্বিদ্রোহের নির্মম দৃশ্য আমাদের চক্ষে পড়িবে। ঐক্যের আদর্শবাদে পরিতুষ্টি যেখানে, সেখানে হয়তো ইহাতে জীবন শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু সত্যকে বড় নিষ্ঠুর মূর্তিতেই বরণ করিয়া লইতে হয়।

সুরাটের কংগ্রেস মণ্ডপে, স্যার রাসবিহারীকে সভাপতিরূপে বরণ করার ভার সুরেন্দ্রনাথের উপর ছিল। তিনি এ প্রস্তাব উত্থাপন করা মাত্র, লোকমান্য তিলক ইহাতে আপত্তি তুলিলেন। আর যায় কোথা? একদল লোকমান্য তিলকের জামা ধরিয়া তাঁহাকে বসাইয়া দিবার উদ্যোগ করিল। অপর পক্ষ রাসবিহারী ঘোষকে সভাপতির আসন পরিগ্রহে উদ্যত দেখিয়া ভীষণ কোলাহল তুলিল। সে দৃশ্য সুরেন্দ্রনাথ স্বয়ং বর্ণনা করিয়াছেন—

"Chairs and shoes and slippers were flung at the leaders, the platform was rushed—I remained on the platform with some of my friends forming a gurard around me."

কংগ্রেস-সভায় পুলিস আসিয়া শান্তি রক্ষা করিল। তিলক, খাপার্দে, অরবিন্দ এবং জাতীয় পক্ষের নেতারা পুলিসের সাহায্যে সভাক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। ভারতের কংগ্রেস ইহার পর দশ বৎসর আর জোড়া লাগে নাই। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দের লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে আবার সর্বদল যোগদান করেন। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের এই ঘটনা কংগ্রেসের ইতিহাসে সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

সুরাটের কংগ্রেস ভঙ্গ হওয়ার পর, ভারতের নিখিল রাষ্ট্রসভা অন্য মূর্তি পরিগ্রহ করিল। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান নেতা সুরেন্দ্রনাথ চরমপন্থীদলের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া ইংরাজ রাষ্ট্রবিৎ পণ্ডিতগণের সহিত আপোষে বঙ্গভঙ্গরোধের প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলেন। সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার আসন তিনি হারাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁর প্রতিভা ও দূরদৃষ্টি দেশের প্রকৃত কল্যাণসাধনের জন্য একদিনও ম্লান হয় নাই। ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে মর্লি-মিন্টো সংস্কার প্রবর্তনের সময়েও তিনি বঙ্গভঙ্গরোধের সঙ্কল্প-পূরণের জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করেন ; কিন্তু 'settled fact' আর নাকচ হয় না, এই উত্তর তাৎকালীন দেশের বড়লাট বাহাদুর মিন্টো মহোদয়ের নিকট পাইয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়াছিলেন।

কিন্তু লর্ড মিন্টোর অবসর গ্রহণের পরই, লর্ড হার্ডিঞ্জ এ দেশের সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হইয়া আসেন। তিনি ভারত নেতৃগণের একপ্রকার অপরিচিত ব্যক্তি ছিলেন। এইজন্য বাংলার এই সঙ্কটযুগে তাঁর শাসনকার্য কি প্রকার হইবে, ইহা লইয়া অনেক ক্ষেত্রে চিন্তার কারণ হইয়াছিল; কিন্তু এক বৎসরের মধ্যেই তাঁর গুণগ্রাম প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তিনি চতুর রাষ্ট্রবিৎ হইলেও,

তাঁর সদ্ব্যবহারে ভারতের নেতৃবৃন্দ বিমোহিত হইলেন; জাতীয়তার ঋষি সুরেন্দ্রনাথ লর্ড হার্ডিঞ্জকে লর্ড বেন্টিঙ্ক, ক্যানিং ও রিপনের সমতুল্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে, বঙ্গভঙ্গজনিত ব্যথার কথা লর্ড হার্ডিঞ্জ বাহাদুরকে বিদিত করার জন্য, কলিকাতার টাউনহলে এক রাক্ষসী সভার আয়োজন হয়। এই সভার কথা শুনিবামাত্র বড়লাট বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া পাঠান। সুরেন্দ্রনাথ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎকার করিলে, লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রকাশ্য সভার অপেক্ষা বঙ্গভঙ্গ রোধ করার উপায়স্বরূপ দেশনেতৃগণের স্বাক্ষরিত এক মেমোরিয়াল প্রদানের সঙ্কেত প্রদান করেন। বলা বাহুল্য, সুরেন্দ্রনাথ তখন সঙ্কল্প পূরণ করিতে পারিলে দায়মুক্ত হন; এই অবস্থায় লর্ড হার্ডিঞ্জের নির্দেশানুসারে, তিনি সাধারণ সভা বন্ধ করিয়া দেন। তারপর গোপনে গোপনে বাংলার পঁচিশটি জিলার মধ্যে আঠারটি জিলার প্রতিনিধিবর্গের সহি লইয়া তিনি এই মেমোরিয়াল লর্ড হার্ডিঞ্জের নিকট দাখিল করেন।

বাংলার আন্দোলনকারীগণকে এ কথা জানান হয় নাই; এমন কি সেই সময়ে গভর্নমেন্টের দক্ষিণহস্তস্বরূপ ঢাকার নবাব সলিমুল্লা পর্যন্ত এই ব্যাপারের বিন্দু-বিসর্গ বুঝিতে পারেন নাই। "বেঙ্গলী"র লেখার ভঙ্গি দেখিয়া অনেকে ভিতরে ভিতরে একটা আপোষের ব্যাপার চলিতেছে, ইহা অনুমান করিতেন, কিন্তু এ বিষয়ে সুরেন্দ্রনাথ এমনই গোপন রাখিয়াছিলেন যে, কোন পক্ষই ইহার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করার সুযোগ পান নাই।

অনেকে সুরেন্দ্রনাথকে ইহার জন্য দায়ী করেন; কিন্তু তিনি ছিলেন বৈধী আন্দোলনের সাহায্যে ভারতে শনৈঃ শনৈঃ স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের প্রবর্তক। তিনি যে রাজনীতিক জীবন আশ্রয় করিয়াছিলেন, তাহা হইতে কোনদিন বিচলিত হয় নাই—সঙ্কল্প পূরণের জন্য তাঁর ছিল জ্বলন্ত বিশ্বাস—দেশের দিক্ হইতে বিপ্লবের অশান্তি সৃষ্টিতে এবং রাজ্যশাসননীতির কঠোর পীড়নেও তিনি বিচলিত হন নাই। বরিশালের পুলিশের লাঠিও তিনি যেমন অকাতরে সহ্য করিয়াছেন, আবার দেশবাসীর পক্ষ হইতে তাঁহাকে অপদস্থ করার জন্য তাঁহার মাথা লইয়া গেণ্ডুয়া খেলার চিত্রও যখন বাহির হইয়াছে—তখনও তিনি ছিলেন অটল, নিথর হিমালয়; পরিশেষে তাঁরই চেষ্টায়, দ্বিখণ্ড বাংলা অখণ্ড মূর্তিতে আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

১৯১১ খ্রিস্টাব্দের ১২ ডিসেম্বরে দিল্লির দরবারে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরের মুখ দিয়া, বঙ্গভঙ্গরহিত হওয়ার ঘোষণা বাহির হওয়া মাত্র, দেশে উৎসাহের আগুন ছড়াইয়া পড়িল। বাঙালির পণ-রক্ষা হইল বলিয়া সেদিন স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়িয়াছিল। "বেঙ্গলী" অফিস হইতে সুরেন্দ্রনাথকে বিপুল জনতা স্কন্ধে চাপাইয়া কলেজ স্কোয়ারে লইয়া আসে। তুমুল "বন্দেমাতরম্" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস ঘন ঘন কম্পিত হইতে থাকে। বঙ্গভঙ্গ রহিত হইল; কিন্তু বাঙালির প্রাণে স্বাধীনতার যে আগুন ধরিয়াছিল, তাহা নিভিল না। বঙ্গভঙ্গ সেদিন উপলক্ষ হইয়া আসিয়াছিল, তাহার রোধ হইয়াছে। বাঙালির প্রাণের আগুন নিভিবে কবে? এই জটিল সমস্যা মানুষের আপোষে নিষ্পত্তি হওয়ার নহে; স্বয়ং বিধাতাই বাঙালিকে চরম শান্তি প্রদান করুন—আমাদের ইহাই প্রার্থনা।

বাংলার তরুণ বুকের রুধির ঢালিয়া যে হোরীখেলায় প্রবৃত্ত হইল, সে রক্তরঙ্গে মাতিয়া, জাতির জীবনের শুদ্ধ-শুভ্র যে আত্ম প্রকাশ, তাহা আর ঘটিয়া উঠার সম্ভব হইল না। বাংলার রাষ্ট্র সাধনায়, এই স্বচ্ছ আত্মপ্রকাশ কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা টানিয়া ফুটিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাঙালি চাহিয়াছে স্বরাজ, চাহিয়াছে স্বদেশি শিল্প ও বাণিজ্যের প্রবর্তন, চাহিয়াছে জাতীয় শিক্ষা—স্বদেশীর সাহায্য কল্পে চাহিয়াছে বহিষ্কার—বিদেশির সাহচর্য, বিশেষ বিদেশি পণ্যবাণিজ্যের বয়কট—এই চতুরঙ্গ প্রেরণা ধরিয়াই বাংলার স্বদেশি যুগের সাধনা গোড়া হইতে আত্মনিয়ন্ত্রিত করিতে চাহিয়াছে। এই প্রেরণার বশেই বাঙালি চরমপন্থী মারাঠি চরমপন্থীর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া কলিকাতা কংগ্রেসে ভারতের রাজনৈতিক পিতামহ দাদাভাই নৌরজির মুখে 'স্বরাজ'-মন্ত্র বলাইয়া লইয়াছে, গতানুগতিক ভিক্ষা-নীতির দুর্গাধিকার করিবার উৎসাহে, সুরাটের দক্ষযজ্ঞে কংগ্রেস ভাঙিয়াছে, নূতন জাতীয় দল গঠন করিতে শেষ পর্যন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। ১৯০৫ হইতে ১৯১২ এই স্বল্প পরিসর কয়েক বর্ষ কাল, অথচ তাহারই মধ্যে যে বিচিত্র যৌগিক ক্রমে জাতি-জীবনের অদ্ভুত বিবর্তন, তাহার সকল কথা গুছাইয়া বলিতে গেলে এক মহাপুরাণ রচনা করিতে হয়।...

বাঙালির ইহা জীবন বেদ, তার কতটুকু স্মৃতি উদ্ধার করিতে পারিলাম? সেই পার্টিশন হুকুম অবধি তাহার রদ হওয়া পর্যন্ত, বাঙালি দৃঢ়পণে "settled·fact unsettled" করা, ইহারই মধ্যে কত ঘটনা ছাড় পড়িয়া গেল। সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখের মৌলিক তপঃশক্তি জাতীয় সঙ্কল্পকে উক্ত বিশেষ ঘটনায় জয়যুক্ত করিয়াছে, কিন্তু জাতীয় দল যে ভবিষ্যতের নবস্বপ্নের প্রেরণাদৃষ্টি লইয়া কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছিল, তাহার সার্থকতার সুযোগাভাবে জাতীয় জীবনে এই নূতন তপঃশক্তি অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা লইয়া ধীরে ধীরে ধ্যান-গুহায় অবগাহন করিয়া, কেন আত্মগোপন করিল—তার নিগূঢ় কারণের উন্মেষ কিছুই করা হইল না। লর্ড মিন্টোর 'honest swadeshi' র কথা, ফুলারের পত্যাগের কথা, বৈকুণ্ঠ সেনের 'impatient idealists' অভিধান দেওয়া পর্যন্ত নরম-গরম দলের ঘটনাঘটনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ-কথা, বোমার আবির্ভাবে কলিকাতা ব্যাপী প্লাকার্ড "Beware the Nunia is coming" তাহার কথা—সবই ত বলা বাকি রহিল। একদিকে রক্তপন্থী বিপ্লবতন্ত্রী; অন্যদিকে দমনোৎসুক রাজশক্তির মুখোমুখি সংগ্রাম, আইনের নখদন্তবিকাশের সঙ্গে অগ্নিনালিকার ধস্তাধস্তি, ৩ নং রেগুলেশনে বাংলার নবরথীর নির্বাসনদণ্ড, সূর্যাস্ত-বিধি, কণ্ঠরোধ আইন, প্রেস আইন, সমিতি আইনের প্রয়োগ প্রভৃতি সকল কথা—সেই সঙ্গে শ্রী অরবিন্দের বাংলার রাষ্ট্রক্ষেত্রে প্রবেশ, তাঁর কারাসাধনা ও মুক্তি, তাঁর "ধর্ম" ও "কর্মযোগিনের" মধ্য দিয়া নব দিব্য জাতীয়তার মন্ত্রপ্রচার, তাঁর "Open letter to may countrymen" ও সিস্টার নিবেদিতার পরামর্শ, পরিশেষে চন্দননগরে ঐতিহাসিক অজ্ঞাতবাস—স্বদেশি যুগের বিকাশ ও পরিণতির মর্ম সবই ইহার মধ্যে নিহিত — সে সব অবর্ণিত রহিল। জাতীয়ভাবের আত্মপ্রকাশের আজ সময় নহে বলিয়া, শ্রী অরবিন্দ যে শেষ কথাটি আমাদের নিকট রাখিয়া নবযুগের সৃষ্টিসাধনায় মহাডুব দিলেন, এখানে শুধু তাহারই গুটিকয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিয়া সংক্ষেপে উপসংহার করি—

"We have worshipped the Country, the National Mother as God. That was well that carried us far. But it was only a stage to bring the Europeanised mind back to spirituality. It was the worship of a *Rupa*, and *Ishta* by which to rise to the worship of God in His fullness. We used the mantra, "Bandemataram", with all our heart and soul and so long as we used and lived it, relied upon its strength to overbear all difficulties, we prospered. But suddenly the faith and the courage failed us, the cry of the mantra began to sink and as it rang less feebly, the strength began to fade out of the country. It was God who made it fade and falter, for it had done its work. A greater Mantra than "Bandemataram" has to come. Bankim was not the ultimate seer of Indian awakening. He gave only the term of initial and public worship, not the form and the ritual of the inner secret *Upasana*..........when the mantra is practised even by two or three, then the closed Hand will begin to open; when the *Upasana* is numerousely followed, the closed Hand will open absolutely."

সেই গূঢ় উপাসনা কী? ঋষির কণ্ঠেই বাঙালির অন্তরাত্মা উহা শুনিয়া লইয়াছে, নবীন মাতৃমন্দিরে সেই অনাহত ঋক্‌মন্ত্রই আজ সুরে লয়ে ঝঙ্কৃত হইতেছে—

—"It is a national *Atmasamarpana*-self-surrender that God demands of us and it must be complete."

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।"

Then the promise will come true.

"অহং ত্বাম্ সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

স্বদেশি যুগের এক যুগের অবসান অর্থাৎ ১৯০৮ হইতে ১৯১৯ পর্যন্ত বাঙালি রক্তের আঁচড়ে টানিয়া... নূতন ইতিহাস রচনা করিয়াছে..........।

স্বদেশি গান

চৈত্র মেলা বা হিন্দু মেলা — এই জাতীয় মেলা থেকে স্বদেশভাবনা গভীরতর রূপ নিতে থাকে। দেশের সামগ্রিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক ভাবনায়ও যুগান্তর সৃষ্টি হয়। এর অন্যতম অবদান জাতীয় সঙ্গীত। ছন্দ ও সুরে দেশমাতার বন্দনা প্রশস্তি শুরু হয়। যে কোনো প্রকার জনজাগরণের অন্যতম হাতিয়ার হল সঙ্গীত। বক্তৃতা, অপেক্ষা, যুক্তিপূর্ণ তথ্যনির্ভর ভাষণের তুলনায় সঙ্গীতের আবেদন অনেক বেশি। সঙ্গীতে মানসিক প্রতিক্রিয়া ঘটে দ্রুত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অনেক আগেই স্বদেশপ্রেমের গান ছড়িয়ে পড়ছিল। বঙ্গভঙ্গের সূচনাকাল থেকে স্বদেশি গানের জোয়ার আসে। সে সময়কার কিছু গান এখানে সংগ্রহ করে দেওয়া হল। বঙ্গভঙ্গ সময়কালে ও তার পূর্বে রচিত জনপ্রিয় কয়েকটি গানও এখানে সংকলিত হল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্, —
ফুল্লকুসুমিত-দ্রুমদলশোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।
সপ্তকোটিকণ্ঠ-কলকল-নিনাদকরালে,
দ্বিসপ্তকোটীভুজৈর্ধৃতখর করবালে,
অবলা কেন মা এত বলে!
বহুবলধারিণীং নমামি তারিণীং;
রিপুদলবারিণীং মাতরম্।
তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম
তুমি হৃদি তুমি মর্ম
ত্বং হি প্রাণাঃ শরীরে।
বাহুতে তুমি মা শক্তি,
হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি,
তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে।
ত্বং হি দুর্গা দশপ্রহরণধারিণী
কমলা কমল দলবিহারিণী
বাণী বিদ্যাদায়িনী নমামি ত্বাং
নমামি কমলাম্ অমলাং অতুলাম,
সুজলাং সুফলাং মাতরম্।

বন্দে মাতরম্
শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাম্
ধরণীং ভরণীম্ মাতরম্।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন-প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভূমির তুল্য আছে কোন স্থান?
কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতঃস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কী ভয় কী ভয়,
গাও ভারতের জয়।।

রূপবতী সাধ্বী সতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?
শর্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিব্রতা,
অতুলনা ভারত-ললনা।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কী ভয় কী ভয়,
গাও ভারতের জয়।।
বশিষ্ঠ-গৌতম-অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র, ভৃগু তপোবন।
বাল্মীকি-বেদব্যাস, ভবভূতি-কালিদাস
কবিকুল ভারতভূষণ।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কী ভয় কী ভয়
গাও ভারতের জয়।।

বীরযোনি এই ভূমি বীরের জননী;
অধীনতা আনিল রজনী;
সুগভীর সে তিমির, ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি।।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়, কী ভয় কী ভয়
গাও ভারতের জয়।।

ভীষ্ম-দ্রোণ-ভীমার্জুন নাহি কি স্মরণ
পৃথুরাজ আদি বীরগণ?

ভারতের ছিল সেতু, যবনের ধূমকেতু,
আর্তবন্ধু দুষ্টের দমন।।
হোক ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয়,
গাও ভারতের জয়।।

কেন ডর, ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
যতো ধর্ম স্ততো জয়।।
ছিন্ন ভিন্ন হীনবল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কী ভয়?
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভাবতের জয়, কী ভয় কী ভয়,
গাও ভারতের জয়।।
রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া ঠৈক

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?

কোটিকল্প দাস থাকা নরকের প্রায় হে
নরকের প্রায় ;
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে
স্বর্গ সুখ তায়।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে
বাহুবল তার ;
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে
দেশের উদ্ধার।

কৃতান্ত কোমল কোলে আমাদের স্থান হে
আমাদের স্থান ;
এসো তায় সুখে সবে হইব শয়ান হে
হইব শয়ান।।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

আর ঘুমাইও না, দেখ চক্ষু মেলি,
দেখ দেখ চেয়ে অবনীমণ্ডলী
কিবা সুসজ্জিত কিবা কুতুহলী
বিবিধ মানব-জাতিরে লয়ে।

মনের উল্লাসে, প্রবল আশ্বাসে,
প্রচণ্ড বেগেতে, গভীর বিশ্বাসে,
বিজয়ী পতাকা উড়ায়ে আকাশে,
দেখহে ধাইছে অকুতোভয়ে।

হোথা আমেরিকা-নব অভ্যুদয়,
পৃথিবী গ্রাসিতে করেছে আশ্রয়,
হয়েছে অধৈর্য নিজ বীর্যবলে,
ছাড়ে হুহুঙ্কার ভূমণ্ডল টলে,
যেন বা টানিয়া ছিঁড়িয়া ভূতলে
নূতন করিয়া গড়িতে চায়।

মধ্যস্থলে হেতা আজন্ম পূজিতা
চির-বীর্যবতী বীর-প্রসবিতা
অনন্ত যৌবনা য়ুনামীমণ্ডলী
মহিমা-ছড়াতে জগত উজলি,
সাগর ছেঁচিয়া, মরু-গিরিদলি,
কৌতুকে ভাসিয়া চলিয়া যায়।

আরব, মিশর, পারসী, তুরকী,
তাতার তিব্বত, অন্য কব কি?
চীন, ব্রহ্মদেশ, অসভ্য জাপান,
তারাও স্বাধীন, তারাও প্রধান,
দাসত্ব করিতে করে হেয় জ্ঞান,
ভারত শুধু ঘুমায়ে রয়।

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
সবাই স্বাধীনএ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে,
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে।
লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে।।
সাধিলে রতন পাই, তাহাতে যতন নাই।
হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করে।।
দেশান্তর-জনগণ, ভুঞ্জে ভারতের ধন,
এ দেশের ধন হায়, বিদেশীর তরে।।
আমরা সকলে হেথা, হেলা করি নিজ মাতা,

মায়ের কোলের ধন নিয়ে যায় পরে।।

রাগিণী বাহার — তাল জৎ

অজ্ঞাত

একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি
হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।।
ও'মা, কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে
মাগো, বড়লাটকে মারতে গিয়ে
মারলাম ভারতবাসী।।
শনিবারের দিন দু'টোর সময়
হাইকোর্টেতে লোক ধরে না,
মা'গো, জজ-ম্যাজিস্ট্রেট বিচার করলো
হুকুম হল ফাঁসি।
মঙ্গলবার দিন ভোর বেলাতে
ফাঁসি কাঠে তুলে দিবে।
মা'গো, অভিরামের দ্বীপচালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।।
দশ মাস দশ দিন পরে
তোর ক্ষুদিরাম আসবে ফিরে,
চিনতে যদি না পারিস মা,
দেখবি গলায় ফাঁসি।।
কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি
পরো না মা বিলাতী শাড়ী
ও মা, মনের দুঃখ মনেই রইল
হল না আমার স্বদেশী।।

ভিন্ন পাঠ—

একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি।
(আমি) হাসি হাসি পরবো ফাঁসি
দেখবে ভারতবাসী।।
কলের বোমা তৈরি করে
দাঁড়িয়ে ছিলাম রাস্তার ধারে (মাগো)
বড়লাটকে মারতে গিয়ে মারলাম
আর এক ইংলণ্ডবাসী।।
শনিবারের বেলা দশটার পরে
জর্জ কোর্টেতে লোক না ধরে (মাগো)
হ'ল অভিরামের দ্বীপচালান মা
ক্ষুদিরামের ফাঁসি।।

বারো লক্ষ তেত্রিশ কোটি
রইল মা তোর ব্যাটা-বেটি।
তাদের নিয়ে ঘর করিস্ মা
বৌদের করিস দাসী।
দশমাস দশদিন পরে
জন্ম নিব মাসীর ঘরে (মাগো)
(ও'মা) তখন যদি না চিনতে পারিস
দেখবি গলায় ফাঁসি।।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১.

আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি
ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে,
মরি হায়, হায় রে —
ও মা, অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি।।

কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ কী মায়া গো —
কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে।
মা, তোব মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধাব মতো,
মরি হায়, হায় রে —

মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি।।
তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে,
তোমারি ধূলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি।
তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে,
মরি হায়, হায় রে —

তখন খেলাধূলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি।
ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়া ঘাটে,
সারাদিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে।
তোমাব ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে,
মরি হায়, হায় রে —

ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ওমা, তোমার রাখাল তোমার চাষি,
ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে —
দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে।
ওমা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে,
মরি হায়, হায় রে —
আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি।।

২.

ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচলপাতা
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে,
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে,
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা।।
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার, মরণ তোমার বুকে।
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে।
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে,
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে,
তুমি যে সকল-সহা সকল বহা মাতার মাতা।।
ওমা অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা—
তবু জানি নে-যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা!
আমার জনম-গেল বৃথা কাজে,
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে—
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে শক্তিদাতা।।

৩.

যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে।।
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়—
তবে পরাণ খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে।।
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহনপথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়—
তবে পথের কাঁটা
ও তুই ——রক্তমাখা চরণতলে একলা দলোরে।।
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে—
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে।।

৪.

তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না।।
আসবে পথে আঁধার নেমে, তাই বলেই কি রইবি থেমে—
ও তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি,
হয়তো বাতি জ্বলবে না।।
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী—
হয়তো তোমার আপন ঘরে

পাষাণ হিয়া গলবে না।
বন্ধ দুয়ার দেখলি ব'লে অমনি কি তুই আসবি চলে—
তোরে বারে বারে ঠেলতে হবে,
হয়তো দুয়ার টলবে না।

৫.

এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, 'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী।।
ওবে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই, ডাক দে আজি—
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে, খুলে ফেল্ সব দড়াদড়ি।।
দিনে দিনে বাড়ল দেনা, ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা—
হাতে নাই রে কড়াকড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন ক'রে—
ওরে, দে খুলে দে, পাল তুলে দে, যা হয় হবে বাঁচি মরি।।

৬.

বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল —
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।।
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার মন, বাংলার মাঠ —
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান।।
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা—
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।।
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন—
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।।

৭.

আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুন বরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জমেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে।
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে, দুখের বুঝি নাই কো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ, কোথা সে তোর মলিন হাসি—
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ওই চরণের দীপ্তিরাশি।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী—

তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।।
ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে।।
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময় তো নাই—
এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই, তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে।।
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু—
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে।।

৮.

বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান—
তুমি কি এমনি শক্তিমান।।
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান।।
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নিচে—
এত বল নাইরে তোমার, সবে না সেই টান।।
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।।

৯.

নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস, সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে॥
পাষাণ সমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে॥
সময় হল, সময় হল যে যার আপন বোঝা তোলো রে—
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে—
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে।

১০.

আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না।।
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে—
তাই বলে হল ছেড়ে দিয়ে ধরব না, কান্নাকাটি ধরব না।।

শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে—
সহজপথে চলব ভেবে পড়ব না, পাঁকের 'পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে—
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না, ঘরের কোণে সরব না॥

১১.

আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে।।
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়, আপনাকে তুই করে নে জয়—
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি, তুই যারে।।
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে—
অভয়চরণ শরণ ক'রে বাহির হয়ে যা রে॥

১২.

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে।।
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রাণীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে।।
কোন্ বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন্ গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে।।

১৩.

যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ—
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ, আর কারো ধার ধারব না মা
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর, হৃদয়ে তোর রতনরাশি—
আমি জানি গো তার মূল্য জানি, পরের আদর কাড়ব না মা।।
মানের আশে দেশবিদেশে যে মরে সে মরুক ঘুরে—
তোমার ছেঁড়াকাঁথা আছে পাতা, ভুলতে সে যে পারব না মা।।
ধনে মানে লোকের টানে ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়—
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে, কারো কাছেই হারব না মা।।

১৪.

ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী।।
মরিস মিথ্যে ব'কে ঝ'কে, দেখে কেবল হাসে লোকে,
না হয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি।।
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে,
না হয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি।।
কাজ থাকে তো কর্ গে না কাজ, লাজ থাকে তো ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি।।

১৫.

মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।।
করেছি মাথা নিচু,
চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে—
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে?
কিছু মোর নেই ক্ষমতা
সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয় নি মরণ শক্তিশেলে—
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেখ মেলে।।
নেব গো মেগে-পেতে
যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে—
আমাদের সেইখেনে মান,
সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে।।

১৬.

ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি—
জোরে বক্ষোদুয়ার আঁটি।।
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে, রে ভাই, পথে ঢেলে
মিথ্যে অকাজে—
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি,
পথের কতই বাধা কাটি।।
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যারা
তারা চারদিকে—
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস,
যায় না কি বুক ফাটি,
লাজে যায় না কি বুক ফাটি?
দিনের বেলা জগৎ-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে আপন গরবে—
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি—
কেবল করিস ঘাঁটাঘাঁটি।।

১৭.

আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে।।
বলব 'জননীকে কে দিবি দান,
কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ'—
'তোদের মা ডেকেছে' কব বারে বারে।।
তোমার নামে প্রাণে সকল সুর
আপনি উঠবে বেজে সুধামধুর

মোদের হৃদয়যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে
এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে
তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভারে।।

১৮.

আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে—
এবার যার খুশি সে বাঁধন কাটুক, আমরা বাঁধব মাকে।
আমরা পরান দিয়ে আপন করে বাঁধব তাঁরে সত্যডোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে।
আজ ধনী গরিব সবাই সমান। আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান—
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক্, আয় রে লাখে লাখে।
আজ দাও গো সবার দুয়ার খুলে, যাও গো সকল ভাবনা ভুলে—
সকল ডাকের উপরে আজ—মা আমাদের ডাকে।।

১৯.

আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর—
তোমারে করি নমস্কার।।
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার—
তোমারে করি নমস্কার।
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার—
তোমারে করি নমস্কার
মোদের কেবা আপন, কে বা অপর, কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর
ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার—
তোমারে করি নমস্কার।।

আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল তুমি এখন ধরো গো হাল
ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার—
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে পরের দ্বারে ফিরব না আর বারে বারে
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার—
তোমারে করি নমস্কার।।

অমৃতলাল বসু

ওরা জোর করে দেয়, দিক না বঙ্গ বলিদান।
আমরা রব অন্তরঙ্গ, এক অঙ্গে মনের সঙ্গে মিশিয়ে প্রাণ।
আমরা জাত বাঙ্গালী প্রেম-কাঙ্গালী—
ভাবছিস্ তোরা মন ভাঙ্গালি,
তা নয়, জ্বালিয়ে আগুন, করে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিলি প্রাণের টান।
আমাদের চোখ ফিরেছে মায়ের কুঁড়েতে,
বিদেশী চিনির চেয়ে দেশের গুড়েতে,
আবার কর্কচেতে হয়েছে রুচি, চাইনে তোদের লবণ দান।
আমাদের ভাতের সঙ্গে তাঁত বজায় থাক্।
নাই বা দেখাই সাজের জাঁক
তোদের এই চক্‌চকানি মধুর চাকে, করবো না আর বিষপান।
তোদের কাঁচের বাসন কাঁচের চুড়ি,
ফেলবো ভেঙে মেরে তুড়ি,
করে দেবতা সাক্ষী, ঘরের লক্ষ্মী শাঁখার আবার রাখবে মান।
তোদের শাপে হল আশীর্বাদ
দৃঢ় হল মনের বাঁধ,
এই বিসংবাদে, বঙ্গ ভেদ আমরা হলুম আবার তেজীয়ান্।
পেয়ে মর্মে আঘাত, কর্মে হাত, বাক্যি ছেড়ে দেবে বুদ্ধিমান্।

স্বর্ণকুমারী দেবী

শতকণ্ঠে কর গান জননীর পূত নাম,
মায়ের রাখিব মান—লয়েছি এ মহাব্রত।
আর না করিব ভিক্ষা, স্বনির্ভর এই শিক্ষা,
এই মন্ত্র, এই দীক্ষা, এই জপ অবিরত।
সাক্ষী তুমি মহাশূন্য, না লব বিদেশীপণ্য
ঘুচাব মায়ের দৈন্য—করিলাম এ শপথ।
পরি ছিন্ন দেশী সাজ মানি ধন্য ধন্য আজ,
মায়ের দীনতা লাজ হবে দূর-পরাহত।
এই আমাদের ধর্ম এই জীবনের কর্ম,
এই মন্ত্র এই ধর্ম—এই আমাদের মুক্তিপথ।
নমো নমো বঙ্গভূমি — মোদের জননী তুমি
তোমার চরণে নমি, নরনারী মোরা যত।।

অতুলপ্রসাদ সেন

দেখ্ মা,এবার দুয়ার খুলে!
গলে গলে এনু মা, তোর
হিন্দু মুসলমান দু ছেলে।

এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে ;
যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।

অনুগ্রহে নাই মুকতি,
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে —
থাকব না আর স্বার্থে ভুলে।

থাকবে না আর রেষারেষি—
কাহার অল্প, কাহার বেশি ;
দু ভাইয়ের যা আছে জমা
সঁপিব তোর চরণতলে।

দু জনেই বুঝেছি এবার —
তোর মতো কেউ নেই আপনার ;
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুঁদব আঁখি তোরই কোলে।*

২

উঠ গো, ভারত-লক্ষ্মী! উঠ আজি জগত-জন-পূজ্যা!
দুঃখ-দৈন্য সব নাশি', কর দূরিত ভারত-লজ্জা
ছাড় গো, ছাড় শোক-শয্যা, কর সজ্জা
পুনঃ কমল-কনক-ধন-ধান্যে!
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে চক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণ তলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
কাণ্ডারী নাহিক কমলা! দুঃখ-লাঞ্ছিত ভারতবর্ষে,
শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী, কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে,
তোমার অভয় পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে,
পুনঃ চলিবে তরণী শুভ-লক্ষ্যে।
জননী গো, লহ তুলে বক্ষে,
সান্ত্বনা-বাস দেহ তুলে বক্ষে ;
কাঁদিছে তব চরণতলে
ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো।
ভারত-শ্মশান কর পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে,
দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ, কর পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে,
দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে, তপঃ-তুঞ্জে,
পুনঃ বিমল কর ভারত পুণ্যে।

* বঙ্গভঙ্গের অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে হিন্দু-মুসলমান সম্মিলিত শোভাযাত্রায় রাখিবন্ধনের দিন গানটি গাওয়া হয়।

রজনীকান্ত সেন

১

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই ;
দীন-দুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সূতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাচ, সাবান, মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব্ ভাই ;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

মূলতান-গড় খেম্‌টা

২

তাই ভালো, মোদের
মায়ের ঘরের শুধু ভাত ;
মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব,
মার বাগানের কলার পাত।
ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান ;
মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান।
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।
মিহি কাপড় প'র্‌ব না আর যেচে পরের কাছে;
মায়ের ঘরে মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে ;
দেখ্ তো প'র্‌লে কেমন সাজে!
ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত ;
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত।
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত!

জংলা-কাহারোয়া

৩

আমরা, নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোট ;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান ;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান ;

আমরা, মোটা খাব, ভাইরে প'র্‌ব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা, রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমন সুদিন ;
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটো।
ঘরের দিয়ে, আমরা পরের মেঙ্গে,
কিন্‌বো না ঠুন্‌কো কাচ, যায় যে ভেঙ্গে ;
থাক্‌লে, গরিব হ'য়ে ভাই রে, গরিব চালে,
তাতে হবে নাকো মান খাটো।
মিশ্র বাঁরোয়া — কাওয়ালী

৪

রে তাঁতি ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস্‌।
ঘরে তাঁত যে ক'টা আছে রে,
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্‌।
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে, ক'সে মাকু চালা ;
কলের কাপড় বিশ হবে রে,
না হয় তোদের হবে উনিশ !
তোদের সেই পুরানো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাব রে,
টাকা ঘরে ব'সে গুনিস্‌।
'রে গঙ্গামাই — প্রাতে দরশন দে'—সুর কাহারোয়া

৫

আর কি ভাবিস্‌ মাঝি ব'সে?
এই বাতাসে পা'ল তুলে দিয়ে,
হাল ধ'রে থাক্‌ ক'সে।
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মর্‌বি যে মনের আপসোসে।
মিছে বকিস্‌ আনাড়ি, এই বেলা ধর্‌ রে পাড়ি,
"পাঁচপীর বদর" ব'লে, পুরো মনের খোসে ;
এমন বাতাস আর র'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না।
মরণ-সিন্ধু মাঝে গিয়ে, পড়বি রে নিজে কর্ম্মদোষে।
বাউলের সুর — খেমটা

৬

আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!
ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান
আজ, এক ক'রে সে সন্ধ্যা-নমাজ,

মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ!
(জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে) (হিংসাবিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে)
(এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে)
(একই ভাতে একই রক্ত ব'য়ে যায়)
এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ?
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে)
(এমন কঠিন কেবা আছে রে)
বিলেত ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান।
(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না)
(তার কাছে তো সবাই সমান রে)

সংকীর্তন — গড় খেমটা

৭

জয় জয় জনমভূমি, জননী!
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী ;
কীর্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী!
উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্তা—
মণিময় হার-বিভূষণ-যুক্তা ;
শ্যামল-শস্য পুষ্প-ফল পূরিত,
সকল-দেশ-জয়-মুকুটমণি!
সর্ব শৈল-জিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে,
মধুর-গীত-চির-মুখরিত ভৃঙ্গে,
সাহস-বিক্রম-বীর্য-বিমণ্ডিত,
সঞ্চিত-পরিণত-জ্ঞান-খনি!
জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে?
কোটি কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে!"
দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি
দেহ পদে, তবে ধন্য গণি!

মিশ্র পরোজ — কাওয়ালী

৮

নমো নমো নমো জননীবঙ্গ
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি অলঙ্ঘ্য।

দক্ষিণে সুবিশাল জলধি
চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল
 ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র-সঙ্ঘ
বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে
ফল-ভার নত শাখি-বৃন্দে
 নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ।
 সুরট মল্লার—একতালা

৯

এমন সোনার বাংলা ভাগ করে ভাই
 কল্লে রে দুখান।
এত ঝগড়া-ঝাটি কান্নাকাটি রে
 সবই বিফল হলো গললোনা পাষান।

এদের একই ভাষা, একই রীতিনীতি
একই রুচি, একই স্বভাব, প্রাণে এক প্রীতি
এরা একই-ঘরে বসত করে রে,
 এদের পরস্পরের সুখ সমান।

দু সীমানা কল্লে কি হবে?
 হাত বাঁধিবে, পা বাঁধিবে, মন বাঁধিবে কে?
আমরা একই ছিলাম একই আছিরে, —
 ওকে উড়িয়ে দিতে পারে প্রাণের টান?

জ্ঞানী লোকে দেখে বুঝে লয়
যে মেঘেতে বৃষ্টি থাকে তাতেই বৃষ্টি হয়
দেখ নিরেট মন্দ নাই এ সংসারে,
 অতি মন্দ যেটা, সেটাও সুবিধান।

মুকুন্দ দাস

১

মা মা বলে ডাক দেখি ভাই
 ডাক দেখি ভাই সা[illegible] রে।
মা মা বলে কাঁদলে ছেলে
 মা কি পারে রইতে রে।।

জাগিবে জননী কুল কুণ্ডলিনী
জাগিবে শান্তি জাগিবে রে,
খুলে যাবে প্রাণ, দিতে পারবি প্রাণ
দেশের কল্যাণ তরে রে।।
মায়ের শ্রীচরণ তরী ভরসা করি
ভাসাও দেহ তরী রে!
তবে মা হবেন কাণ্ডারী, সুখে দেবে পাড়ি
ভয় কি অকূল পাথারে।।
দেখ ভারতবাসীর ঐ এলোকেশীর
মায়ের হাতে অসি কেঁপেছে রে।।
দাস মুকুন্দ কয় আর কারে ভয়
জয় জয় ডঙ্কা বাজা রে।।

২

(হায় রে) বান এসেছে মরা গাঙে, খুলতে হবে নাও
তোমরা এখনও ঘুমাও!
কত যুগ গেছে কেটে, দেখেছ কত স্বপন,
বদর ব'লে ধর বৈঠা জীবন মরণ পণ,
দমকা হাওয়ার কাল গিয়েছে, ফাগুন বইছে পাল খাটাও।।
অবহেলে থাকলে ব'সে, কাঁদতে হবে সারা জীবন,
যুগ যুগান্তের তপস্যাতে, মিলেছে এমন লগন,
পারের মাঝি হাল ধরেছে, মিছে পরের মুখ তাকাও।

৩

সাবধান সাবধান সাবধান!
আসিছে নামিয়া ন্যায়ের দণ্ড
রুদ্রদীপ্ত মূর্তিমান!
ওই শোন তাঁর গরজে কম্বু অম্বুধি যথা উছলে।
প্রলয়-ঝঞ্ঝা ইরম্মদে মৃত্যু ভীষণ কল্লোলে।
হুঙ্কারে তার গভীর মন্দ্র কাঁপায় মেদিনী, তারকা, সূর্য, চন্দ্র,
বিদরে আকাশ স্তব্ধ বাতাস শিহরি উঠিছে জগৎখানি,
ভ্রূকুটি-কুটিল-রক্ত নেত্রে চিত্র ভানু উছলে,
উঠিছে কিরীটি গরিমা দীপ্ত ভেদিয়া সূর্যমণ্ডলে।
অগণিত করে ঝলসে কৃপাণ
তপ্ত রক্ত করিয়া পান।।
বল-দর্পী, চরণ আঘাতে আজ ত্রিভুবন ভীত কম্পমান,
ত্রিভুবন জুড়ি বিরাট দেহ ভেবেছ কি আর পালাইবে কেহ
এখনো চরণে শরণ লহ, নতুবা নাহিরে পরিত্রাণ।।*

৪

ছেড়ে দাও রেশমী চুড়ি, বঙ্গনারী ;
কভু হাতে আর প'রো না।

---

* *গানটির রচয়িতা কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু মুকুন্দ দাসের কণ্ঠেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।*

জাগো গো ও জননী ও ভগিনী,
মোহের ঘুমে আর থেকো না ;
কাঁচের মায়াতে ভুলে, শঙ্খ ফেলে,
কলঙ্ক হাতে প'রো না।।
তোমরা যে গৃহলক্ষ্মী, ধর্মসাক্ষী;
জগৎ ভরে আছে জানা ;
চটকদার কাঁচের বালা, ফুলের মালা,
তোমাদের অঙ্গে শোভে না।।
বলিতে লজ্জা করে, প্রাণ বিদরে,
কোটি টাকার কম হবে না;
পুঁতি কাঁচ ঝুটা মুক্তায়, এই বাংলায়,
নেয় বিদেশে কেউ জানে না।।
ঐ শোন্ বঙ্গমাতা, শুধান কথা,
জাগ আমার যত কন্যা ;
তোরা সব করিলে পণ, মায়ের এ ধন,
বিদেশে উড়ে যাবে না।।
আমি যে অভাগিনী, কাঙ্গালিনী,
দু'বেলা অন্ন জোটে না,
কি ছিলেম, কি হইলেম, কোথায় এলেম,
মা যে তোরা চিনিল না।

৫

আয় না রে ভাই আপনি হাঁটি ;
কেন পা থাকিতে নিবি লাঠি?
দেশী জিনিস থাকতে কেন,
বিদেশীতে মন মজাও ভাই ;
মোটা ভাত, মোটা কাপড়ে,
চলে না কি মোটামুটি।
বিটের চিনি, কলের ময়দা,
কাজ কি রে আর খেয়ে তারে ;
আখী গুড় আর জাঁতার আটা,
খাবো খানা পরিপাটি।
ছেড়ে দাও বিদেশী কাপড়,
বাঁচুক মোদের দেশী তাঁতি,
তামা কাঁসা থাকতে দেশে,
ছেড়ে দে মা রেশমী চুড়ী,
শাঁখার কি আর অভাব দেশে ;
মুকুন্দের কথা ধর ভাই-বোন সব হয়ে খাঁটি।

৬

করমেরি যুগ এসেছে ;
সবাই কাজে লেগে গেছে,

মোরাই শুধু রবো কি শয়ান?
চিরদিনই রবো নীচে,
চলবো সবার পিছে পিছে,
সহিব শত অপমান।।
জেগেছে জগৎ সবে,
বসে নাই কেউ নীরবে,
একই সুরে ধরিয়াছে গান।
নিজেরে ভেব না হীন,
ধনী মানী দুঃখী দীন,
রাজা-প্রজা সকলি সমান।।
সে সুরে সুর মিলাইয়ে,
করম-পতাকা নিয়ে,
দলে দলে হও আগুয়ান।
দ্বেষ-হিংসা পায়ে দলে,
আয় ছুটে আয় চলে,
ত্রিশ কোটী হিন্দু-মুসলমান।।
মরণ-সাগর পার,
হতে হবে সবাকার,
দিন গেল বেলা অবসান।
তরী বুঝি ছেড়ে যায়,
উঠে পড় খেয়া নায়,
ভয় নাই মাঝি ভগবান।।

৭

কি আনন্দধ্বনি উঠলো বঙ্গভূমে,
বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে, বঙ্গভূমে,
ভারতভূমে।।
আনন্দে আনন্দধামে,
হচ্ছে বেচা-কিনি,
দেশী-ধুতি, দেশী চিনি,
এইমাত্র শুনি,
বিদেশী আর কি কিনি।।
জেগেছে ভারতবাসী,
আর কি মানা শোনে,
লেগেছে আপন কাজে,
যার যা নিচ্ছে মনে,
মায়ের নামের গুণে।।

মায়ের কৃপায় পেলেম ফিরে,
চরকা হেন ধনে,
তাই দিদি রেখেছি আমি
অতি সযতনে,

আমার চরকা ধনে।।
চরকা আমার পিতামাতা,
চরকা বন্ধু সখা,
চরকায় ভাত কাপড় পরি,
জোড়ায় জোড়ায় শাঁখা,
চরকা প্রাণের সখা।।
হাতের কঙ্কন নাকের বেসর
পরি ঢাকাই শাড়ি,
সুতো কেটে পরেছি এবার,
হাতির দাঁতের চুঁড়ি,
চরকা আর কি ছাড়ি।।
মুকুন্দদাসে বলে,
ভাল সুযোগ পেলে,
দিদিরা সব ধর চরকা,
মাতরম বলে,
হবে সুখ কপালে।।

৮

এমন দিন কি আসবে মোদের
আমরা আবার মানুষ হবো।।
ভুলো যাবো দলাদলি,
প্রাণে প্রাণে মিলিয়ে দেবো।।
ছোট-বড় যাবো ভুলে,
প্রাণের কপাট দেবো খুলে;
'বাবু' এই দুটি আখর,
নামের পেছন থেকে উঠিয়ে দেবো।।
মেয়েলী ঢং দেবো ছেড়ে,
ফেশন দেবো ঝেঁটিয়ে দূরে ;
গোঁফ রেখে চুল সমান কেটে
বীরের মত কাজ করিব।।
ঘুচে যাবে তম-রাশি,
মায়ের মুখে দেখবো হাসি ;
আমরা আবার সকল ভুলে,
মায়ের লাগি পাগল হবো।।

৯

আমরা নেহাৎ গরিব,
আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু আছি ত্রিশ কোটি,
জেগে ওঠ।
জুড়ে দে ঘরে তাঁত।
সাজা দোকান,

বিদেশে না যায় ভাই
গোলারি ধান ;
মোটা খাবো,
ভাইরে পরবো মোটা,
আমরা মাখবো না লেভেণ্ডার,
চাই না অটো।
নিয়ে খায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
উপোসী রব কি ঘরে শুয়ে,
শোন্ বিদেশী আমরা বুঝেছি সব,
খেলনা দিয়ে মোদের সোনা লোটো।

১০

স্বরাজ স্বরাজ করিস তোরা?
স্বরাজ কি রে গাছের ফল?
অবহেলে তায় পেড়ে খাবি তোরা,
পর পদলেহি ভীরুর দল।।
ধনীর দুয়ার ধন্না দিয়ে স্বরাজ তোরা ভিক্ষা চাস,
কপট বৈরাগ্যের মুখোস পরিয়া,
ভাইয়ের কাছে ভাই করিস ছল—
কি করে স্বরাজ মিলিবে বল্।।
পারিস্ যদি রে হতে বীরাচারী,
সোমরস আবার করিতে পান ;
রক্ত গঙ্গার পুণ্য সলিলে, পূজিতে মায়ের মূরতি খান।
রুধিরাসক্তা পানেতে মত্তা,
মা আজ ছেলের রক্ত চান —
দিতে হবে তাই মনে রাখিস্ ভাই,
স্বরাজ পথের যাত্রীদল ;
মরণ দিয়েই বরণ করিতে,
হইবে তোদের মুক্তি ফল।।

গোবিন্দচন্দ্র রায়

কত কাল পরে, বল ভারত রে!
দুখ সাগর সাঁতারি পার হবে!
অবসাদ হিমে, ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতলে রে!
নিজ বাসভূমে পরবাসী হলে,
পরদাসখতে সমুদায় দিলে!
পর হাতে দিয়ে ধনরত্ন সুখে,
বহ লৌহ বিনির্মিত হার বুকে!
পর ভাষণ আসন আনন রে,
পর পণ্যে ভরা তনু আপন রে!

পর বেশ নিলে, পর দেশ গেলে,
তবু ঠাঁই নাহি মিলে দাস বলে!
তব নির্ভর নিত্য পরের করে,
অশনে বসনে গমনের তরে!
পর দীপ-মালা নগরে নগরে—
তুমি যে তিমিরে তুমি সে তিমিরে!

বিপিনচন্দ্র পাল

বাজায়ো না আর মোহন বাঁশি
আজি রুদ্ররূপে ভীমবেশে প্রকাশ 'পরানে আসি।।
বন্ধ কর সব কুসুম গন্ধ,
রুদ্ধ কর মলয় মন্দ,
স্তব্ধ কর যত ললিত সুছন্দ, প্রকাশি অট্টহাসি।
জীবন মায়া আজি কর হে ভিন্ন,
দয়াবন্ধন কর হে ছিন্ন,
জাগাও সংহার জগতপূর্ণ প্রলয় পয়োধি-রাশি।।
দলি কর হে চরণ তলে,
সকল ভীরুতা সব দুর্বলে,
ভীম অসি ধরে, শ্মশানে মশানে, ভীষণ সাজাও আসি।।

অশ্বিনীকুমার দত্ত

শ্মশান তো ভালোবাসিস মাগো,
তবে কেন ছেড়ে গেলি?
এত বড় বিকট শ্মশান এ জগতে কোথা পেলি?
দেখ্ সে হেথা কি হয়েছে
ত্রিশ কোটি শব পড়ে আছে
কত ভূত-বেতাল নাচে, রঙ্গে ভঙ্গে করে কেলি।
ভূত পিশাচ—তাল-বেতাল,
নাচে আর বাজায় গাল,
সঙ্গে ধায় ফেরুপাল এটা ধরি ওটা ফেলি।
আয় না হেথা নাচবি শ্যামা
শব হব শিব পা ছুঁয়ে মা
জগত জুড়ে বাজবে দামা, দেখবে জগৎ নয়ন মেলি।

দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়

না জাগিলে সব ভারত ললনা
এ ভারত আর জাগেনা জাগেনা।
অতএব মাগো, জাগো গো ভগিনী,
হও "বীরজায়া, বীর প্রসবিনী।"

শুনাও সন্তানে, শুনাও তখনি,
বীরগুণ গাথা, বিক্রম কাহিনী
স্তন্য দুগ্ধ যবে পিয়া, জননী,
বীর গর্বে তার নাচুক ধমনী।
তোরা না করিলে এ মহান সাধনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

এস সোনার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
এস মা লক্ষ্মী, বস মা লক্ষ্মী, থাক মা লক্ষ্মী ঘরে।।
গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছ ধান।
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা, দুধের নদীতে তুলেছ বান।।
টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা।
তোমারই যতনে সাজান রতনে পরিছ ডিঙ্গার মালা।।

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ওরে ক্ষ্যাপা, যদি প্রাণ দিতে চাস্,
এই বেলা তুই দিয়ে দে না!
ওরে, মানের তরে প্রাণটি দিবার,
এমন সুযোগ আর হবে না।
যখন দু'দিন আগে, দু'দিন পরে,
তফাৎ মাত্র এই ;—
তখন অমূল্য এই মানব-জনম
বৃথা দিতে নেই,—
ওরে ক্ষ্যাপা!
মায়ের দেওয়া এ ছার জীবন
দে রে মায়ের তরে ;
অমর জীবন পাবি রে ভাই!
জগৎ-মায়ের ঘরে।
কি দিয়েছিস্, লিখবে যখন
পরকালের খাতা,—
(তখন) তোরই দানে হবে আলো
বইয়ের প্রথম পাতা,—
ওরে ক্ষ্যাপা!

বাউল

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

আয় আজি আয় মরিবি কে?
পিষিতে অস্থি শুষিতে রুধির নিঃশীতে শ্মশানে পিশাচ অধীর?

থাকিতে তন্ত্র সাধনমন্ত্র প্রেতভয়ে ছিছি ডরিবি কে?
মরার মতন না লভি মরণ, সাধকের মত মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
অসুর নিধনে কিসের তরাস্ পশুর নিধনে তোরা কি ডরাস?
না গণি বিজন কানন ভীষণ বিপদ তরিবি কে?
নিষ্ঠুর অরি সংহার করি বীরের মতন মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
উঠিয়া সিন্ধু মথিয়া তুফান ছুটিছে ঊর্মি পরশি বিমান
সাহসেতে ভর করি সে সাগর হাসিমুখে তোরা তরিবি কে?
হউক ভগ্ন, জলধি মগ্ন, তবু তরী বাহি মরিবি কে?
লভিতে তূর্ণ-ত্রিদিব-পূণ্য অর্ঘের মতো মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
চরণের তলে দলি রিপুগণ লভিত নির্বাণে অমর জীবন,
তাদেরই অংশে তাদেরই বংশে জনম, সেকথা স্মরিবি কে?
লভিতে তূর্ণত্রিদিব-পূণ্য আর্যের মতো মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?
মাতি সৌরভে যশ গৌরবে অমর হইয়া মরিবি কে?
আয় আজি আয় মরিবি কে?

প্রমথনাথ রায়চৌধুরী

নমঃ বঙ্গভূমি শ্যামাঙ্গিনী
যুগে যুগে জননী, লোকপালিনী!
সুঁদূর নীলাম্বর প্রান্ত সঙ্গে
নীলিমা তব মিশিতেছে রঙ্গে,
চুমি পদধূলি বহে নদীগুলি ;
রূপসী শ্রেয়সী হিতকারিণী!
তালতমালদল নীরবে বন্দে,
বিহঙ্গ স্তুতি করে ললিত সুছন্দে ;
আনন্দে জাগ, অয়ি কাঙ্গালিনী?
কিসের দুঃখ, মাগো, কেন এ দৈন্য,
শূন্য শিল্প তব, বিচূর্ণ পণ্য?-
হা অন্ন, হা অন্ন, কাঁদে পুত্রগণ?
ডাক মেঘমন্ত্রে সুষুপ্ত সবে,
চাহ দেখি সেবা জননী গরবে,
জাগিবে শক্তি, উঠিবে ভক্তি ;
জান না আপনায় সন্তানশালিনী!

দেবেন্দ্রনাথ সেন

হিন্দু মুসলমান, হয়ে এক প্রাণ এস পূজি মার চরণ দুখানি
মর্মে বাজে ব্যথা, জন্মভূমি মাতা আমাদের আজ দোষে কাঙ্গালিনী।

মাতৃসেবা মহাপুণ্যেরই অভাবে কি দুর্গতি আজ দেখ ভাই ভেবে ;
মাতা অন্নপূর্ণা, একি বিড়ম্বনা—অন্নাভাবে মরে লক্ষ লক্ষ প্রাণী।
বর্ষে বর্ষে তায় দুর্ভিক্ষ পীড়ন, বর্ষশস্যে হয় ত্রিবর্ষ যাপন
কারে বা বলিব, কে বুঝে বেদনা, কেহ নাই আর বিনা কাত্যায়নী।
ওঠ ওঠ ভাই, থেক না অলসে, মাতৃসেবা ব্রত লহ রে হরষে ;
মার আশীর্বাদে, রব নিরাপদে, সম্পদে বিপদে কর মা-মা ধ্বনি।
ব্রতের নিয়ম শুন দিয়া মন—'একতা' 'সংযম' অতি প্রয়োজন,
স্বদেশ বাণিজ্যে উন্নতি সাধন ভুল না একথা মূলমন্ত্র জানি।
স্বদেশী দ্রব্যেতে জীবন যাপন, প্রতিজনে কর প্রতিজ্ঞা এখন,
প্রতি ঘরে ঘরে লহ সমাদরে স্বদেশীয় দ্রব্য উপাদেয় মানি।
"হুজুগে বাঙালি" বলে সবজন, এ কলঙ্ক ভাই করহ মোচন;
"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন" কার্যে পরিণত কর সিদ্ধাবাণী।
শক্তিরূপা মাতা শক্তির আকর পূজ ভক্তিভরে জুড়ি দুই কর;
মা প্রসন্না হলে কিসে আর ডর আদ্যাশক্তি মাতা অসুরঘাতিনী।।

কায়কোবাদ

ক্ষমা কর মা বঙ্গ ভূমি
ক্ষমা কর মা হৃদয় খুলে।
আমি যে তোর অবোধ ছেলে
লবিনে মা কোলে তুলে?
অদৃষ্টের ঘোর নিষ্পীড়নে
কতই দুঃখ রইল মনে,
তোরি স্নেহ—তোরি আদর
সবই যে মা গেছে ভুলে।
তোর কথা মোর মনে হলে
আমি ভাসি নয়ন জলে,
পাগল হয়ে ঘুরে বেড়াই
পথে ঘাটে নদীর কূলে

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

(আস্থায়ী) ছিন্ন হল বঙ্গ কেন ভাব অমঙ্গল
রাজরঙ্গে আশাভঙ্গে কেন হব হীনবল?
(অন্তরা) কি ফল বিফলে কাঁদি
হৃদয়ে হৃদয় বাঁধি
দাঁড়ালে এ ব্যবচ্ছেদে
কি ভেদ হইবে বল।
(সঞ্চারী) খণ্ড খণ্ড করি রাখুক এদেশ
হউক ভূধরে সিন্ধু-সন্নিবেশ
কীর্তিনাশা জলে কিম্বা রসাতলে
সমগ্র ভূখণ্ড করুক প্রবেশ,

(আভোগ) মিলাইতে পারি যদি মন
কে খুলিবে সেই মিলন-বন্ধন?
পরম করুণার আশায় আশায়
জীবন যাপনে ফলিবে কি ফল?

(সঞ্চারী ফেরতা)
বলিব বদনে -- জয় জন্মভূমি
শুনিব স্বপনে—জয় জন্মভূমি
আশায় ভাষায় ভক্তি করুণায়
অন্তরের স্তরে আগ্নেয় অক্ষরে
রাখিব লিখিয়া জয় জন্মভূমি।

আশাবরী : ধামার

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা,
তাহার মাঝে আছে দেশ এক—সকল দেশের সেরা;—
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা ;

(কোরাস) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা!
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে;

(কোরাস) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি!

এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!

(কোরাস) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাহে পাখি;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে—
তারা ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে;

(কোরাস) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি।

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
—ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম—যেন এই দেশেতে মরি—

(কোরাস্) এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি
সকল দেশের রাণী সে যে—আমার জন্মভূমি।

মিশ্র কেদারা—ত্রিমাত্রিক

কামিনী রায়

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা;
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে,
তবুও প্রাণের ঘুচেছে ব্যথা।

এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে,
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহন বলে,
ঘুমায়ে ক্ষণেক পড়িনু হেথা।

আমি শুনিনু জাহ্নবী-যমুনার তীরে,
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী
পঞ্চনদকূলে একই প্রথা।

আর দেখিনু যতেক ভারতসন্তান,
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান,
আসিছে যেন গো তেজো মূর্তিমান,
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারতরমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা
গাইছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

রামচন্দ্র দাশগুপ্ত

আমরা সবাই মায়ের ছেলে, মাকে পেলে কাকে ডরাই?
আকাশেতে মনের সাধে মায়ের নামে নিশান উড়াই।
বঙ্গভূমি আমাদের মা, জগতে তাঁর নাই তুলনা,
লোকে করে ধনের গর্ব, আমরা করি মায়ের বড়াই!

মায়ের শস্যে জীবন ধরি, মায়ের জলে তৃষ্ণা হরি,
মায়ের নামে মায়ের প্রেমে মায়ের কোলে নেচে বেড়াই
মায়ের কোলে যবে থাকি, কিছুতে ভয় নাহি রাখি
মা মা বলে অবহেলে বিপদবাধা সকল এড়াই।
মা আমাদের অগ্নিময়ী, মায়ের নামে বিশ্বজয়ী,
আমরা সবে মিলে মিশে দেশে দেশে আগুন ছাড়াই।

সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

ওঠরে ওঠরে ওঠরে তোরা হিন্দু মুসলমান সকলে ভাই।
হিন্দু-মুসলমান, ব্রাহ্ম-খৃষ্টিয়ান আয়রে আয়রে বঙ্গের সন্তান,
ঐ শোন মার কাতর আহবান জননী তোদের ডাকিছে ভাই।
ঐ যে দুর্জন করিছে গর্জন, বঙ্গমাতারে করিবে ছেদন
করি খণ্ড খণ্ড বঙ্গের অঙ্গ, জাতির জীবন নাশিবে তাই।

(আজ) উড়িছে আকাশে রক্তনিশান,
ঘনঘন ঐ বাজিছে বিষাণ,
স্বদেশের রণে, কে রবে পিছনে,
চল চল সবে ছুটিয়া যাই।
নগরে নগরে জ্বাল রে আগুন, হৃদয়ে হৃদয়ে প্রতিজ্ঞা দারুণ,
রুখিব আমরা, যুঝিব আমরা, (এই) দুঃশাসনের ধ্বংস চাই
বিলাতী বস্ত্রে লাগাও আগুন,
দেও জলে ফেলে বিলাতের নুন,
বৃটিশ বাণিজ্যে কর পদাঘাত, বণিকের ঘরে জমুক ছাই।
(ওরে) হবে না হবে না বলিদান বিনা,
ঝরিবে শোণিত জাগিবে চেতনা,
(হবে) জাগ্রত বাঙ্গালী, জাগ্রত ভারত কে রোধে?
কারও সাধ্য নাই।
বল বন্দে মাতরম্, বল বন্দে মাতরম্
বল দুঃশাসনের ধ্বংস চাই।

চন্দ্রনাথ দাস

নিয়েছ যে ব্রত, পালনে বিরত থেক না বঙ্গবাসিগণ,
ব্রতভঙ্গ হলে হাসিবে সকলে, দেশের কলঙ্ক ছাইবে ভুবন।
কঠিন আঘাতে না হলে চৈতন্য ঘুচিবে না আর দেশের দুঃখ দৈন্য,
খাট প্রাণপণে স্বদেশের জন্য, জাগিয়া উঠুক জাতীয় জীবন।
সবাই মোরা হুজুগেতে মাতি, ঘুচাও এ কলঙ্ক জাতীয় অখ্যাতি,
কার্যে দেখাও সবে মোরা আর্য জাতি দেশহিতে দাও আত্মবিসর্জন।
এত অপমান না জাগিলে প্রাণ, জাগিবে না কভু ভারত সন্তান
জলাঞ্জলি দিয়ে জাতি-কুল-মান, কি সুখে করিছ জীবন ধারণ?
পরাধীন জাতি প্রাণ সঁপেছে পরে, লালায়িত সদা গোলামীর তরে,
দেশের দশা হেরি হৃদয় বিদরে, করিতেছ শিরে পাদুকা বহন।

না হলে এ জাতি অসারের আসর
সোনার বাঙ্গালা কেন হবে ছার খার
না জানি কি কোন বঙ্গে বিধাতার
(বুঝি) দেব অভিশাপে দেশের পতন
বিশকোটি ছেলে যে মায়ের ঘরে
তার এ দুর্দশা দেখিস কেমন করে?
কামার কুমার তাঁতি অন্নাভাবে মরে
মড়ার মতন আছিস ঘুমে অচেতন।

মনোমোহন বসু

দিনের দিন সবে দীন ভারত হয়ে পরাধীন।
অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তাজ্বরে জীর্ণ,
অনশনে তনুক্ষীণ।
সে সাহস বীর্য নাহি আর্যভূমে,
পূর্ব গর্ব সর্ব খর্ব হ'ল ক্রমে,
চন্দ্র-সূর্য বংশ অগৌরবে ভ্রমে,
লজ্জা রাহু মুখে লীন।
অতুলিত ধনরত্ন দেশে ছিল,
যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল,
কেমনে হরিল কেহ না জানিল,
এম্নি কৈল দৃষ্টিহীন।
তুঙ্গ দ্বীপ হতে পঙ্গপাল এসে
সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে,
দেশের লোকের ভাগে খোসা ভুষি শেষে
হায় গো, রাজা কি কঠিন!
তাঁতি কর্ম্মকার, করে হাহাকার,
সূতা, জাঁতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার,
দেশী বস্ত্রসস্ত্র বিকায় নাকো আর,
হলো কি দেশের দুর্দিন।
আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ,
কলের বসন বিনা কিসে রবে লাজ
ধরবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ,
বাকল টেনা ডোর কপিন্।
ছুঁচ সূতা পর্যন্ত আসে তুঙ্গ হতে,
দিয়াশলাই কাঠি তাও আসে পোতে
প্রদীপটি জ্বালিতে, খেতে, শুতে যেতে
কিছুতে লোক নয় স্বাধীন।

গোবিন্দচন্দ্র দাস

স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়;
এ যমুনা গঙ্গানদী, তোমার ইহা হ'ত যদি?

পরের পণ্যে, গোরা সৈন্যে জাহাজ কেন বয়?
গোলকুণ্ডা হীরার খনি, বর্মাভরা চুনি-মণি,
সাগর সেঁচে মুক্তা বেছে পরে কেন লয়?
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে—এদেশ তোমার নয়।

এই যে ক্ষেতে শস্যভরা তোমার ত নয় একটি ছড়া
তোমার হলে তাদের দেশে চালান কেন হয়?
তুমি পাও না একটি মুষ্টি, মরছে তোমার সপ্তগোষ্ঠী,
তাদের কেমন কান্তি পুষ্টি—জগৎ ভরা জয়।
তুমি কেবল চাষের মালিক, গ্রাসের মালিক নয়!
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়।

এই যে জাহাজ, এই যে গাড়ী, এই যে পেলেস, এই যে বাড়ী
এই যে থানা, জেহেলখানা—এই যে বিচারালায়,
লাট, ছোটলাট, তারাই সবে, জজ ম্যজিষ্টর তারাই হবে,
চাবুক খাবার বাবু কেবল তোমরা সমুদয়—
বাবুর্চি, খানসামা, আয়া, মেথর মহাশয়!
স্বদেশ স্বদেশ কর্চ্ছ কারে? এদেশ তোমার নয়!

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোমার নয়?
যে দেশ যাদের অধিকারে, তারাই তাদের বল্‌তে পারে
কুকুর, মেকুর, ছাগল কবে দেশের মালিক হয়?
যে সব বাবু বিলাত গিয়ে বাবুনীদের সঙ্গে নিয়ে,
প্রসবিয়ে আসছে তাদের শাবক সমুদয়,
ব্রিটিশ-বরণ বলে দাবী, কল্লে নাকি বিলাত পাবি?
লজ্জাহীনের গোষ্ঠী তোরা নাই কি লজ্জা-ভয়,
এই যদি রে ব্রিটিশ-বরণ মরণ কারে কয়?
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।

কার স্বদেশ কাদের মেয়ে এমনতর পথে পেয়ে
জোর জবরে গাড়ির ভিতর শাড়ি কেড়ে লয়?
নপুংসকের গোষ্ঠী তোরা, জন্ম-অন্ধ, কানা-খোঁড়া,
ভিস্তিয়ালা, পাঙ্খাকুলী—পীলা ফাটার ভয়।
কার স্বদেশে সর্বনেশে এমন অভিনয়?
স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোদের নয়।

স্বদেশ স্বদেশ করিস কারে? এদেশ তোমার নয়।
সোনার বাংলা সোনার-ভূমি, হীরার ভারত বল্লে তুমি,
ভারত তোমার আস্‌বে কোলে এই কি মনে লয়?
'সোনা' 'যাদু' মিঠিভাষে ছেলে মেয়ে কোলে আসে,
স্বরাজ তাহে নারাজ, চাহে কাজের পরিচয়।
কবির কথায় তুষ্ট নাহে 'ভবি' মহাশয়।

স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এ দেশ তোদের নয়।

তাদের রাজ্যে তোদের থাকা, তাদের ব্যাংকে তোদের টাকা
তাদের নোটে ভারত ঢাকা বিশাল হিমালয়।
তাদের কলে তোরাই কুলী তারাই নিচ্ছে টাকাগুলি।
তোদের কেবল ভিক্ষার ঝুলি—ক্ষুধায় মৃত্যু হয়।
তারাই রাজা, তারাই বণিক, তারাই সমুদয়।
স্বদেশ স্বদেশ করিস্ কারে? এদেশ তোদের নয়।

সরলা দেবী

(১)

নমোহিন্দুস্থান

অতীত গৌরববাহিনী মমবাণী, গাহ আজি হিন্দুস্থান
মহাসভা উন্মাদিনী মমবাণী, গাহ আজি, গাহ আজি হিন্দুস্থান
কর বিক্রম-বিভব-যশঃ সৌরভ-পূরিত সেইনাম গান।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মাদ্রাজ
মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান!
গাও সকল কণ্ঠে, সকলভাষে নমো হিন্দুস্থান।
(হিন্দু) হর হর জয় হিন্দুস্থান!
(শিখ) সৎ শ্রী অকাল হিন্দুস্থান!
(মুসলমান) আল্লাহো আকবর হিন্দুস্থান
নমো হিন্দুস্থান!
ভেদ-রিপুবিনাশিনী মম বাণী গাও আজি ঐক্যগান।
মহাবলবিধায়িনি মমবাণী গাহ আজি, গাহ আজি ঐক্যগান।
মিলাও দুঃখে সৌখ্যে সখ্যে লক্ষ্যে কায়মনঃ প্রাণ
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মান্দ্রাজ,
মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান.
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই শিখ, মুসলমান!
গাও সকলকণ্ঠে সকল ভাষে নমো-হিন্দুস্থান!
(হিন্দু) হরে মুরারে হিন্দুস্থান।
(পার্সি) দাদরহোর মজদ হিন্দুস্থান!
(মুসলমান) আল্লা হো আকবর হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!
সকল জন-উৎসাহিনী মম বাণী, গাহ আজি নূতন তান।
মহাজাতি, সংগঠনি মমবাণী, গাহ আজি, গাহ আজি নূতন তান।
উঠাও কর্ম-নিশান, ধর্ম-বিষাণ, বাজাও চেতায়ে প্রাণ।
বঙ্গ, বিহার, অযোধ্যা, উৎকল, মাদ্রাজ,
মারাঠা, গুর্জর, নেপাল, পঞ্জাব, রাজপুতান!
হিন্দু, পার্সি, জৈন, ইসাই, শিখ, মুসলমান।
গাও সকল কণ্ঠে সকল ভাষে নমো হিন্দুস্থান।

(হিন্দু) জয় জয় ব্রাহ্মণ হিন্দুস্থান।
(ইসাই) জয় জিহোহ্বা হিন্দুস্থান!
(মুসলমান) আল্লাহো আকবর হিন্দুস্থান!
নমো হিন্দুস্থান!

(২)

বন্দি তোমায় ভারত জননী বিদ্যা-মুকুট-ধারিণী!
বরপুত্রের তপ অর্জিত গৌরব মণিমালিনী
কোটি সন্তান আঁখি তর্পণ হৃদি আনন্দ কারিণী।
মরি বিদ্যা মুকুটধারিণী
যুগ-যুগান্ত-তিমির অন্তে হাস মা কমলবরণী।
আশার আলোকে ফুল্ল হৃদয়ে আবার শোভিছে ধরণী
নবজীবনের পসরা বহিয়া আসিছে কালের তরণী
হাস, মা, কমলবরণী!
এসেছে বিদ্যা এসেছে ঋদ্ধি, শৌর্যবীর্যশালিনী
আবার তোমায় দেখিব মাগো সুখে দশদিক-পালিনী
অপমান-ক্ষত জুড়াইবি মাতঃ খর্পর করবালিনী।
শৌর্যবীর্যশালিনী!

হরিদাস হালদার

স্বদেশের ধূলি স্বর্ণরেণু বলি, রেখে. হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান;
যাহার সলিলে মন্দাকিনী চলে. অনিলে মলয় সদা বহমান।
নন্দন কাননে কিবা শোভাহার বনরাজিকান্তি অতুল তাহার
ফল-শস্য তার সুধার আধার,
স্বর্গ হতে সে যে মহাগরীয়ান।
এ দেহ তোমার তাঁরি মাটি হতে
হয়েছে সৃজিত পোষিত তাহাতে
মাটি হয়ে পুনঃ মিশিবে তাহাতে,
ভবলীলা যবে হবে অবসান।
পিতা মহদেব অস্থিমজ্জা যত,
ধূলিরূপে তাহে আছে যে মিশ্রিত,
এই মাটি হতে হবে যে উত্থিত
ভাবীকালের তব ভবিষ্য সন্তান।
কংস কারাগারে দেবকীর মতো বক্ষেতে পাষাণ-লৌহ শৃঙ্খলিত
মাতৃভূমি তব রয়েছে পতিত পরিচয় তুমি তাহারই সন্তান।
প্রকৃত সন্তান যেন সেই জন, নিজ দেহ প্রাণ দিয়ে বিসর্জন,
যে করিবে মার দুঃখ বিমোচন, হবে তার মাতৃ ঋণ প্রতিদান।

কামিনীকুমার ভট্টাচার্য

শাসন সংযত-কণ্ঠ জননী! গাহিতে পারি না গান
তাই মরম বেদনা লুকাই মরমে, আঁধারে ঢাকি মা প্রাণ।।
সহি প্রতিদিন কোটি অত্যাচার,

কোটি পদাঘাত, কোটি অবিচার,
তবু হাসি মুখে বলি বার বার,
“সুখী কেবা আর মোদের সমান?”
বিনা অপরাধে অস্ত্রহীন কর,
অন্নাভাবে অতি শীর্ণ কলেবর,
তবু আশেপাশে শত গুপ্তচর,
প্রতিপদে লয় মোদের সন্ধান।।
শোষণে শূন্য কমলা ভাণ্ডার,
গৃহে গৃহে মর্মভেদী হাহাকার,
যে বলে এ কথা অপরাধ তার,
হায় হায় এ কি কঠোর বিধান!
না জানি জননী! কতদিন আর
নীরবে সহিবে হেন অত্যাচার,
উঠিবে কি কভু বাজিয়ে আবার,
স্বাধীন ভারতে বিজয়-বিষাণ?

সরোজিনী দেবী

মা তোমারি তরে এসেছি এ ঘরে
পতিত সন্তান রাখ চরণে
আমরা দুর্বল বিদেশী প্রবল
আশীষে সবল কর এ সন্তানে।
এ হৃদয়বীণা ধরিবে মা তান,
গাহিবে তোমারি জয় গুণগান,
ভারতবর্ষে যত হিন্দু-মুসলমান,
মাতিয়া উঠিবে সে গভীর তানে।
আমরা অক্ষম কলঙ্ক মলিন
জেগেছে জাপান, জাগিয়াছে চীন,
নিজদোষে আছি হয়ে দীনহীন।
অবশ অলস না দেখি নয়নে।
অ্যামেরিকা আদি আর অস্ট্রেলিয়া,
আরো কত দেশ উঠিল জাগিয়া,
আমারই শুধু অলসে ঘুমিয়া,
সুখের শয্যায় এখনো শয়নে।
ভারত জননী মাতা গরীয়সী
পরের অধীনে কাঁদিছেন বসি
মায়ে প্রবোধিয়ে ধর ত্যাগ অসি
মাতৃ-আশীর্বাদ ধার্য করি মনে।

রাইচরণ বিশ্বাস

একবার জাগো, জাগো, জাগো, যত ভারত-সন্তান রে!
লোহিত বরণে পূরব গগনে, উদিত তরুণ তপন রে!

জাগিছে চীন, জেগেছে জাপান, নবীন আলোকে রে!
কাল-ঘুমঘোর ভাঙ্গিবে না তোর, অলস ভারত রে!
(আজি) পর-পদাঘাতে দলিতা লাঞ্ছিতা, দীনা কাঙ্গালিনী সে।
নিজ বাসভূমে পরবাসী হ'লে সোনার ভারত রে!
তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, তোমার কিছু নয় রে
নবীন প্রভাতে নবীন প্রাণে নবীন তপন রে!
কোটি কণ্ঠ স্বরে গাও উচ্চৈঃস্বরে বন্দেমাতরম্ রে!
শুনিয়া সে ধ্বনি স্বরগে অমনি হবে প্রতিধ্বনি রে!
শত বরষের অলস পরাণ, জাগিবে জাগিবে রে!

আনন্দচন্দ্র মিত্র

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তানগণ।
থেকোনা থেকোনা আর মোহনিদ্রায় অচেতন।।
পোহাইল দুঃখ নিশি, সূর্য-সুখ ঐ রে
পথিক বলে হাসিতেছে দেখারে মেলে নয়ন।
ঘোরতর অন্ধকার, পাপ নিশাচর আর,
ঐ দেখ পোহাইল আর দুঃখ রবে না।
জ্ঞানালোক প্রকাশিল, সুপবন বহিল,
ভারত-কাননে ডাকে আশা-বিহঙ্গিনীগণ।।
সুপ্রভাতে শুভক্ষণে চলে সবে সযতনে
আলস্য ঔদাস্য বশে আর কেহ থেকো না ;
প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে
ভাসাও জীবনতরী কর শীঘ্র আয়োজন।।

গিরিশচন্দ্র সেন

বাধাবিঘ্ন কত শত শত করিতে মা তোর চরণ বন্দন।
চাহিমা! গাহিতে তব গুণগান,
কিন্তু তাহে রাজ শাসন ভীষণ।
বন্দেমাতরম্ ধ্বনি যে বা করে,
রাজদ্রোহী নাকি হয় সে বিচারে
বাঁধে তারে চরে, রাখে কারাগারে,
পলে পলে করে কত নির্যাতন।
কহিতে ভারত-জননী জয়, শ্বেতাঙ্গের হয় অশান্তির উদয়,
যে কহে, তাহার যাতনা অপার, মা বলিতে কার এ বিড়ম্বন!
কে আছে মা তোর ভকত-সন্তান
কি সঁপিছে তব পদে মনপ্রাণ,
শত গুপ্তচরে করে তার সন্ধান,
কত অপরাধী যেন সেই জন!
বুক ফেটে যায়, মুখ ফুটে তাই,
বলিতে ভারতে কারো সাধ্য নাই,
নিত্য নীরবে সহিতেছে সবে, মলিন বদনে মরম বেদন।

ঘটনাক্রম



১৭৫৭-১৯১৯

ঘটনাক্রমে ১৭৫৭ - ১৯১৯

মনীষী বিনয় সরকার বলেছিলেন 'বঙ্গ বিপ্লবে'র কাল ১৯০৫ থেকে ১৯১৯। কিন্তু আমাদের বক্তব্য আরও পিছন ফিরে দেখা। ১৮৫৭ সালের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ, স্বাদেশিকতার উন্মেষ, গুপ্ত সমিতি প্রতিষ্ঠা, দেশীয় ভাষায় সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রকাশ, এবং ভারতব্যাপী বিদ্রোহের একটি কালানুক্রমিক পঞ্জী রচনা করা হয়েছে। আর আছে দুর্ভিক্ষের খতিয়ান। ইংরেজ শাসন শুরুর পর থেকেই ভারতের প্রায় সর্বত্রই দুর্ভিক্ষ বাড়তে থাকে। রাজনীতি সচেতন স্বদেশপ্রেমিক মানুষের সংখ্যাও বাড়ছিল। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর থেকেই মানুষের যুক্তি ও চেতনা ক্রমশ ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হতে থাকে। 'আনন্দমঠ' গুপ্ত আন্দোলনে অন্যতম প্রেরণাস্বরূপ হয়ে ওঠে।

১৭৫৭	:	জুন ২৩-পলাশির যুদ্ধ। সিরাজদৌলার পতন।
		জুন ২৯-মীরজাফর বাংলা, বিহার, ওড়িশার নবাব ঘোষণা।
		—ইংরেজদের বিরুদ্ধে সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহ শুরু।
১৭৬৩ - ১৮০০	:	বঙ্গদেশ ও বিহার প্রদেশে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।
১৭৬৩	:	ঢাকা শহরে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের আক্রমণ। পরাস্ত ইংরেজ।
১৭৬৪	:	রামপুর-বোয়ালিয়ায় বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা ইংরেজ কুঠি লুঠ করে।
		—ভারতীয় সৈন্যরা পাটনায় উচ্চ বেতনের দাবিতে বিদ্রোহ করে।
১৭৬৫	:	ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলা বিহার, ওড়িশার দেওয়ানি লাভ।
১৭৬৭	:	বিহারের সরণ জেলায় বিদ্রোহী সন্ন্যাসীদের আক্রমণ।
	:	'জঙ্গলমহলে' প্রথম চুয়াড় বিদ্রোহ।
	:	ত্রিপুরা জেলার রোশনাবাদ পরগণায় সমশের গাজির নেতৃত্বে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।
	:	ধলভূমের রাজা ইংরেজদের তার দেশে প্রবেশে বাধা দেওয়ায়, ইংরেজরা তাকে স্বভূমি থেকে বিতাড়িত করে।
১৭৬৯	:	নেপালের সারঙ্গ অঞ্চলে ইংরেজ সেনা ও সন্ন্যাসীদের লড়াই। ইংরেজবাহিনী পরাস্ত।
	:	রঙ্পুরে সন্ন্যাসীদের আক্রমণে ইংরেজ সেনাপতিগণের মৃত্যু।
	:	সন্দ্বীপে বিদ্রোহ।
১৭৭০ -৭১	:	বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা পরাস্ত।
১৭৭০	:	মহাদুর্ভিক্ষ। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর। তিন কোটির মধ্যে এক কোটি লোকের মৃত্যু। খাজনা আদায় সমানই থাকে।
	:	মেদিনীপুর জেলা সীমান্তে ঘাটশিলার পার্বত্য অঞ্চলে চুয়াড়দের বিদ্রোহ।
১৭৭১	:	ঢাকা রাজসাহীর উত্তরাংশে সন্ন্যাসী আক্রমণ। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ব্যাপক রূপ নিতে থাকে। অন্যতম নায়ক মজনুশাহের বাহিনী পরাস্ত হলে, মজনু মহাস্থানগড়ের দুর্গে আশ্রয় নেয়।

১৭৭২ : রঙপুরে ভয়াবহ সন্ন্যাসী আক্রমণ। শ্যামগঞ্জে ইংরেজ সেনাপতি ক্যাপ্টেন টমাস নিহত।
: নাটোর অঞ্চলে মজনু শাহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ।

১৭৭৩ : মেদিনীপুর জেলার বলরামপুরের আদিবাসী ঘড়ুইদেব বিদ্রোহ দমন। ঘাটাল মহকুমার ক্ষীরপাই-এ সন্ন্যাসী অভ্যুত্থান। ক্যাপ্টেন এডওয়ার্ডস শোচনীয়ভাবে পরাস্ত।
: ধলভূমের রাজা জগন্নাথ ঢালের নেতৃত্বে চুয়াড়দের অভিযান।
: ভারত-নিয়ন্ত্রণ আইনের অনুমোদন।

১৭৭৪ : ভারতে কোম্পানি অধিকৃত অঞ্চলের প্রথম গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস।

১৭৭৫ : মে-৬ — মহারাজ নন্দকুমার গ্রেপ্তার।
: জুন ৬ — নন্দকুমারের বিচার শুরু।
: জুন ১৬ — নন্দকুমারের ফাঁসির আদেশ।
: আগস্ট ৫ — কলকাতা রেসকোর্সের মাঠের কাছে টালি নালার পাশে কুলি বাজারে ফাঁসি দেওয়া হয় নন্দকুমারকে।

১৭৭৬ - ৮৬ : পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ।
: চুয়াড়দের সঙ্গে যুদ্ধে মেজর রেনেল নিহত।

১৭৮০-১৮০৪ : মালঙ্গীদের ইংরেজ বিরোধী সংগ্রাম।

১৭৮০ - ১৮০০ : রেশম চাষীদের লড়াই।

১৭৮০ - ৯৩ : আফিং চাষীদের প্রতিরোধ আন্দোলন।

১৭৮১ : রঙপুরের অত্যাচারিত হিন্দু মুসলমান কৃষকরা কুখ্যাত ইংরেজ তাঁবেদার দেবী সিংহের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

১৭৮৩ : রঙপুর ও দিনাজপুরের কৃষক বিদ্রোহ নৃশংসভাবে দমন করা হয়। বহু বিদ্রোহীকে ফাঁসি দেওয়া হয়।
: যশোহরে রাজস্ববহনকারীরা আক্রান্ত।
: গারো ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ে খাসিয়া বিদ্রোহ।

১৭৮৪ : যশোহর খুলনায় প্রজাবিদ্রোহ।
: রাজমহলে প্রথম সাঁওতাল বিদ্রোহ — ভাগলপুরে কালেক্টর ক্লিভল্যান্ড নিহত।

১৭৮৫ : সাঁওতাল বিদ্রোহের নায়ক তিলকা মর্মুর ফাঁসি।

১৭৮৫ - ৮৬ : বীরভূমে গণবিদ্রোহ।

১৭৮৬ : মাখনপুরে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক আহত মজনুশাহের মৃত্যু।
: বগুড়ায় সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।
: গভর্নর জেনারেল কর্নওয়ালিশ।

১৭৮৭ : বাকরগঞ্জে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
: সিলেটে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ।
: ময়মনসিংহ এবং বগুড়া অঞ্চলে ভবানী পাঠক ও দেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে ইংরেজ নৌযান আক্রান্ত।

১৭৮৮ : লাউর অঞ্চলে উপজাতি বিদ্রোহ।

১৭৮৯ - ৯৬	:	বীরভূম-বাঁকুড়ায় পাহাড়িয়া বিদ্রোহ।
১৭৯২	:	বাকরগঞ্জে সুবান্দিয়া বিদ্রোহ।
	:	মালাবার অঞ্চলের রাজারা ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
১৭৯৩	:	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। রাজস্ব পরিমাণ ৩৪,০০,০০০ পাউন্ড।
১৭৯৪	:	ভিজিয়ানাগ্রামের রাজা বিজয়রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিহত হন।
১৭৯৫	:	আসামে খাসিয়া বিদ্রোহ।
১৭৯৬	:	যশোহর খুলনায় প্রজা বিদ্রোহ।
১৭৯৮	:	ইংরেজ ষড়যন্ত্রে অযোধ্যার সিংহাসন থেকে ওয়াজিদ আলি অপসারিত।
	:	গভর্নর জেনারেল ওয়েলেসলি।
১৭৯৮ - ৯৯	:	বাঁকুড়া-বীরভূম-মেদিনীপুরে চুয়াড় বিদ্রোহ। অন্যতম কারণ, পাইক চুয়াড়দের জায়গির জমি বাজেয়াপ্ত করে ইংরেজশাসক।
১৭৯৯	:	ওয়াজিদ আলির অনুচররা বেনারসের রেসিডেন্ট কমিশনার মিঃ কেরিকে হত্যা করে।
	:	ওয়াজিদ আলির বিদ্রোহ এবং কলকাতায় নির্বাসন।
	:	ফেব্রুয়ারি ২২ — ইংরেজ ও নিজামবাহিনীর মহীশূর আক্রমণ।
	:	মার্চ ৫ — টিপু সুলতান পরাস্ত হন বোদালীর যুদ্ধে।
	:	মার্চ ১৪ — মেদিনীপুরে চুয়াড় বিদ্রোহ প্রবল হয়ে ওঠে।
	:	মার্চ ২৭ — টিপু সুলতান মালভেলির যুদ্ধে আবার পরাস্ত হন।
	:	এপ্রিল ৬ — চুয়াড় বিদ্রোহে নেতৃত্বদানের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি এবং নাড়াজোলের জমিদার চুনিলাল খানকে। —সিলেটে আগা মহম্মদ রেজার বিদ্রোহ এবং ইংরেজ সৈন্যদের কাছে পরাস্ত।
	:	মে ৪ — টিপু সুলতান ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত।
	:	তামিলনাড়ু টিনেভেলিতে পোলিগার বিদ্রোহ।
১৮০০	:	কাঁথির কোম্পানি কুঠিতে মালঙ্গীরা দাবিদাওয়া পেশ করে।
	:	সেপ্টেম্বর ১০ — বেদনোরের বিদ্রোহী জমিদার ইংরেজদের কাছে পরাজিত ও নিহত।
১৮০১	:	গঞ্জাম জেলায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।
১৮০২	:	দুর্ভিক্ষে বোম্বাই অঞ্চলে অগণিত মানুষের মৃত্যু।
	:	ইংরেজদের কর বৃদ্ধির বিরুদ্ধে মালাবার অঞ্চলের মানুষ এবং বিদ্রোহীরা পানামরম দুর্গ দখল করে।
১৮০৩	:	ইংরেজদের বিরুদ্ধে কর্ণাটের পোলিগারদের বিদ্রোহ।
১৮০৩ - ০৪	:	উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও রাজপুতানায় দুর্ভিক্ষ।
১৮০৪	:	উড়িষ্যায় খুড়দা বিদ্রোহ।
	:	কাঁথির ক্ষুব্ধ মলঙ্গিরা ইংরেজ লবণ এজেন্টদের কাছারি ঘেরাও করে।
	:	ইংরেজদের বিরোধিতা করায় উড়িষ্যার খুড়দার রাজার জমিদারি কেড়ে নিয়ে তাকে বরবাটি দুর্গে বন্দি করা হয়।
	:	ত্রিবাঙ্কুরে নায়ার বিদ্রোহ প্রথমে রাজার বিরুদ্ধে পরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে।

১৮০৫	:	মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলকে জেলা থেকে বের করে নেওয়া হয়।
	:	বুন্দেলখণ্ডে বিদ্রোহ।
	:	অজয়গড় ও কালিঞ্জরে কেল্লাদারদের বিদ্রোহ।
১৮০৫ - ০৭	:	মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
১৮০৬	:	ভেলোর দুর্গে দেশীয় সিপাহিরা অস্ত্রাগার দখল করে এবং ইংরেজ অফিসার ও সৈন্যদের আক্রমণ করে। —ভারতে প্রথম সিপাহী বিদ্রোহ।
	:	গড়বেতায় নায়েকদের জমি বাজেয়াপ্ত করায় তারা বিদ্রোহ করে।
	:	এ বছর খাজনা আদায় হয় এক হাজার ২৫ কোটি টাকা।
১৮০৮	:	ত্রিবাঙ্কুরে জনগণ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।
	:	দিল্লি অঞ্চলে কৃষক অভ্যুত্থান।
১৮১১ - ১৪	:	মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
১৮১২	:	ময়মনসিংহ পরগণায় কৃষক বিদ্রোহ।
১৮১২ - ১৩	:	রাজপুতানা ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ ; ২০ লক্ষ মানুষের মৃত্যু।
১৮১৩	:	ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া ব্যবসা বন্ধ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট।
	:	পাদরিরা এদেশে অবাধে যাতায়াতের অনুমতি পায়।
	:	সাহারানপুরে গুর্জরদের বিদ্রোহ।
	:	ইংরেজ-নেপাল যুদ্ধ।
	:	দুবছর যুদ্ধ চলাবার পর গোর্খা নেতা অমর সিং নিহত।
	:	ভারত নিয়ন্ত্রণ আইনবিধি।
১৮১৫	:	রামমোহন রায় কলকাতায় স্থায়ী বসবাস শুরু করেন।
	:	আর্যসভা প্রতিষ্ঠা।
		—কাথিয়াবাড় অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন রাও ভর্মল।
১৮১৬	:	নায়েক বিদ্রোহের নেতা অচল সিংহকে ইংরেজরা হত্যা করে, দুশ বিদ্রোহীর ফাঁসি।
	:	ফেব্রুয়ারি-২৭ মাকাওয়ানপুরে গোর্খারা ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত।
১৮১৭ - ১৯	:	উড়িষ্যায় পাইক বিদ্রোহ ও খোন্দা জাতির বিদ্রোহ। পাইকদের জমি কেড়ে নেওয়ায়, তারা বিদ্রোহ করে।
১৮১৮	:	ফরিদপুরে মৌলবি হাজিশরিয়তুল্লাহের নেতৃত্বে ফরাজি বিদ্রোহ।
১৮১৯ ও ১৮৩০	:	নীল আইন বিধিবদ্ধ। ধানের জমিতে নীল চাষে বাধ্য করা হয় চাষীদের।
১৮১৯	:	সন্দ্বীপে বিদ্রোহ।
১৮২০	:	রাজস্থানে মের বিদ্রোহ।
	:	ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ।
১৮২৩	:	মুদ্রণযন্ত্রের স্বাধীনতা সংকোচনে সরকারি আইন। ইংরেজরা প্রেস অর্ডিন্যান্স জারি করলে রামমোহন রায় তার প্রতিবাদ করেন।
	:	মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
১৮২৪	:	বিজাপুরের কাছে সিন্দগিতে দিবাকর দীক্ষিত বিশ্বস্ত অনুচরদের নিয়ে সরকার গঠন করেন।
	:	হরিয়ানা অঞ্চলে জাঠ, মেওয়াট ও ভট্টিরা বিদ্রোহ করে।

	: ইংরেজের ব্রহ্মদেশ আক্রমণ।
	: কর্ণাটকে কিট্টুর রাজ্যের রাণী চেন্নামা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে, ইংরেজরা তাকে বন্দি করে। অক্টোবর ৩০—বারাকপুরে দ্বিতীয় সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮২৪ - ২৫	: বোম্বাই ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষ।
১৮২৪ - ৭০	: মুসলমানদের ওয়াহাবি ও ফরাজি আন্দোলন।
১৮২৫ - ২৬	: ময়মনসিংহে পাগলাপন্থী টিপুর নেতৃত্বে প্রথম গারো বিদ্রোহ।
	: আসামে সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮২৬	: ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্রে রামেশিসদের বিদ্রোহ।
১৮২৭	: জুরি অ্যাক্টের বিরুদ্ধে রামমোহনের আন্দোলন।
	: পাগলাপন্থী টিপু গ্রেপ্তার ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
১৮২৮	: বাংলায় নিষ্করভূমি বাজেয়াপ্ত করার প্রতিবাদে ভূম্যধিকারী সভার জন্ম।
	: রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা।
১৮২৯	: সতীদাহ প্রথা রদ।
	: আসামে খালিয়া বিদ্রোহ।
১৮৩০	: ডিসেম্বর ২৫ — কলকাতা ময়দানে অক্টোরলনি মনুমেন্টের ওপর ডিরোজিও এবং তাঁর অনুগামীরা ফরাসি বিপ্লবের ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করেন।
	: আসামে সাদিয়া অঞ্চলে বিদ্রোহ।
	: কর্নাটকের সাম্পাগাঁও-এ বিদ্রোহ।
১৮৩০ - ৩৮	: নীল চাষীদের সংগ্রাম।
১৮৩১	: বাংলায় ওয়াহাবি আন্দোলন।
	: ছোটনাগপুরে কোলবিদ্রোহ।
	: বালাকোটের যুদ্ধে ওয়াহবি নেতা সৈয়দ আহম্মদ ব্রেলভি নিহত।
	: অক্টোবর — জমিদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিতুমিরের বিদ্রোহ।
	: নভেম্বর — ইংরেজদের আক্রমণে তিতুমিরের বাঁশের কেল্লা ধ্বংস এবং তিতুমির নিহত। তিতুমিরের ৩৫০ জন সঙ্গীকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।
১৮৩২	: মুণ্ডা বিদ্রোহ সাময়িকভাবে দমন। মুণ্ডা নেতা ভগৎ সিং নিহত।
	: দিনাজপুরের সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতা জিতু ও ছোটকা সাঁওতাল নিহত।
১৮৩২ - ৩৩	: ময়মনসিংহে দ্বিতীয় পাগলাপন্থী (গারো) বিদ্রোহ।
১৮৩৩	: ফেব্রুয়ারি ১০ — কলকাতায় কিশোরীচাঁদ মিত্রের সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী "বিশ্ব প্রমোদ্দীপনা সভা" স্থাপিত।
	: ইংরেজরা এদেশে জমির মালিকানা পায়।
	: বিহারে ভূমিজ বিদ্রোহ।
	: কোম্পানির নতুন সনদ লাভ।
	: ভারত-নিয়ন্ত্রণ আইন বিধি।
১৮৩৩ - ৩৫	: মাদ্রাজের উত্তরাঞ্চল ও বোম্বাই অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ।
১৮৩৪	: সংবাদপত্রের স্বাধীনতার দাবিতে রসিককৃষ্ণ মল্লিকের বক্তৃতা।
১৮৩৫	: জানুয়ারি ১ — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঋণের বোঝা ভারতীয়দের ওপর

চাপাবার প্রতিবাদে কলকাতার টাউন হলে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সভা।

: ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে মেদিনীপুরে জমিদার ধর্মঘট।

: ফারসির বদলে ইংরেজি সরকারি ভাষা।

১৮৩৬ : বঙ্গ-ভাষা প্রকাশিকা সভার জন্ম। ভারতবাসীদের পরিচালিত ঐ সভায় স্বদেশের ভালোমন্দ সম্পর্কে আলোচনা হত।

: নিষ্কর জমিতে কর বসাবার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো হয়।

: ফেব্রুয়ারি ৬ — ১৮২৩ সালের ব্ল্যাক প্রেস অ্যাক্ট বাতিলের জন্য গভর্নর বেন্টিঙ্ক-এর নিকট চিঠি পাঠান উইলিয়াম অ্যাডাম, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রসিকলাল মল্লিক, ই. এস. গর্ডন এবং জে. সাদারল্যান্ড।

১৮৩৭ - ৩৮ : উত্তর ভারতে দুর্ভিক্ষ।

১৮৩৭ - ৮২ : ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ।

১৮৩৭ : নভেম্বর ১২ — দেশীয় জমিদারদের স্বার্থরক্ষার জন্য কলকাতায় জমিদার সভা স্থাপিত। জমি সংক্রান্ত নতুন ব্যবস্থায় ইংরেজদের অধিকার স্বীকৃতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হয়। রাধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামকমল সেন প্রমুখ ছিলেন প্রধান উদ্যোগী। পরে এই সংগঠনের নাম হয় ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন।

১৮৩৮ : পূর্ববঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চলে দুদু মিঞার নেতৃত্বে জমিদার ও নীলকর বিরোধী বিদ্রোহ।

: বেতন না পাওয়ার প্রতিবাদে শোলাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ।

: ফেব্রুয়ারি ১০ — কলকাতায় ডিরোজিও শিষ্যরা গঠন করে Society for the Acquisition of General Knowledge বা জ্ঞানার্জনী সভা। সভাপতি ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তী। সম্পাদক প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী।

১৮৩৮ - ৪৭ : ফরিদপুরে ফরাজি বিদ্রোহ।

১৮৩৯ : অসমের সাদিয়া অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ।

: ইংলন্ডে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি স্থাপিত।

: দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত।

১৮৪০ - ৪২ : ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ—বিক্ষোভ জব্বলপুর, হায়দরাবাদ, কোলাপুর, সেকেন্দ্রাবাদ, মালিগাঁও, কুপ্পা, বাদামির কোথাও কোথাও কোষাগার লুন্ঠন।

১৮৪২ : জ্ঞানার্জন সভার মুখপত্র The Bengal Spectetor প্রকাশিত হয়।

১৮৪৩ : এপ্রিল—কলকাতায় "বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি" স্থাপিত। এই প্রথম রাজনৈতিক সংগঠনের আবির্ভাব।

১৮৪৪ : সুরাটে লবণ বিদ্রোহ।

: রোমান ক্যাথলিক ফতেউল্লাহ আসরফের বাগানবাড়িতে সেন্ট জনস্ কলেজ স্থাপিত।

১৮৪৪ - ৯০ : ত্রিপুরায় কৃষক বিদ্রোহ।

: ত্রিপুরায় কুকি বিদ্রোহ।

১৮৪৫ : রাজস্থানে ভীল বিদ্রোহ।

	:	ডিসেম্বর ১৩ — প্রথম শিখযুদ্ধ আরম্ভ।
১৮৪৬	:	প্রথম শিখ যুদ্ধে শিখরা পরাস্ত।
	:	খান্দেলের ভীলদের ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ।
	:	ওড়িশার খণ্ড উপজাতিদের ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ।
১৮৪৭	:	ওয়াহবিদের ইংরেজ বিরোধী যুদ্ধ সিতারার দুর্গ থেকে।
	:	পঞ্জাবে স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু—ভাই মহারাজ সিংহের নেতৃত্বে।
	:	ফরিদপুরের দুদু মিঞা এবং সঙ্গীদের ইংরেজরা গ্রেপ্তার করে।
১৮৪৮	:	ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ।
	:	দ্বিতীয় শিখযুদ্ধ সমাপ্ত। ইংরেজ দখলে পঞ্জাব।
১৮৪৯	:	বীটন আইন।—এই আইনকে ইংরেজরা বলত কালা আইন। কারণ, এতদিন ইংরেজদের বিরুদ্ধে কোন ফৌজদারি মামলা মফস্বল আদালতে গ্রাহ্য হত না। তার জন্য কলকাতার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হত। বীটন আইনে মফস্বল আদালতে ইংরেজদের বিচারের ভার অর্পণ করা হয়েছিল। কিন্তু ইংরেজদের প্রবল প্রতিবাদে এই আইন কার্যকরী না হওয়ায় দেশীয়রা ক্ষুব্ধ হয়। এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূরপ্রসারী।
	:	অসমে ইংরেজ বিরোধী নাগা যুদ্ধ।
১৮৫০	:	তিপ্রা বিদ্রোহ (ত্রিপুরা)।
১৮৫১	:	জমিদার সভা এবং বেঙ্গল ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি মিলে গঠিত হয় "ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন"। নেতা ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রমুখ। ক্রমে এই সংস্থা জমিদারদের কুক্ষিগত হয়। প্রথম সম্পাদক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
	:	সদো এবং চোপদায় (খান্দেল) ইংরেজ বিরোধী কৃষক বিদ্রোহ।
১৮৫৩	:	জানুয়ারি ৪ — হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের The Hindu Patriot পত্রিকা প্রকাশ।
	:	গঞ্জামে শবর বিদ্রোহ।
১৮৫৪	:	মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ।
	:	বোম্বাই-এ প্রথম বস্ত্র কারখানা নির্মাণ।
১৮৫৫	:	মেদিনীপুর, হুগলি, বর্ধমান এবং নদীয়া জেলায় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ২০টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।
১৮৫৫ - ৫৭	:	বীরভূম, রাণীগঞ্জ, ভাগলপুর, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে সশস্ত্র সাঁওতাল বিদ্রোহ, নেতা ছিলেন সিধু ও কানু। স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সিধু এবং কানুর নেতৃত্বে ১০ হাজার সাঁওতালের শপথ গ্রহণ—সাঁওতাল বিদ্রোহ (হুল) সূচনা থেকেই ব্যাপক আকার নেয়। কুখ্যাত মহাজন কেশরাম ভগত এবং দিঘি থানার দারোগা মহেশলাল দত্ত খুন হওয়ার পর ব্যাপক ইংরেজ সেনা পাঠানো হতে থাকে। পাকুড় রাজবাড়ি দখল করে সিধু এবং কানুর সেনাদল। ইংরেজ বাহিনী পরাজিত হয় পিয়ালপুরের যুদ্ধে। একটার পর একটা সাঁওতাল গ্রাম ধ্বংস করে ইংরেজ সৈন্য।
	:	নভেম্বর ১০ — মুর্শিদাবাদ, বীরভূম থেকে বিহারের ভাগলপুর পর্যন্ত

সামরিক আইন জারি। বহু সাঁওতালের মৃত্যু হয়। বিদ্রোহের অন্যতম নায়ক কানু মাঝি নিহত (১৮৫৬ ফেব্রুয়ারি ২৩)। সিধু মাঝিও নিহত হয়েছিল।

১৮৫৬ : জানুয়ারি ২ — ফটোগ্রাফিক অ্যাসোসিয়েশন অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত। প্রথম অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

: হিন্দু বিধবা আইন প্রবর্তন।

: অযোধ্যা দখল।

১৮৫৭ : ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ। ১৭৫৭ সাল পলাশী যুদ্ধ পরবর্তী কালে নির্মম শোষণ ও শাসনের পরিণতি।

সেনাবাহিনীর মধ্যে একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ে গরু ও শুয়োরের চর্বি মেশানো টোটা ব্যবহার করা হচ্ছে রাইফেলে। এই টোটা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিতে হত। এই টোটা ব্যবহার নিয়ে দেশীয় সিপাহীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। বহরমপুরে নেটিভ ইনফ্যান্ট্রি প্যারেডে যোগ দিতে অস্বীকার করে। বারাকপুরের সেনা নিবাসে ৩৪ নং নেটিভ ইনফ্যান্ট্রির সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহের ডাক দিলে সেনানিবাসে এক বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেপ্তার করে ফাঁসি দেওয়া হয় (এপ্রিল ৮)। মঙ্গল পাণ্ডের মৃত্যুর খবর মীরাটে পৌঁছবার পর সেখানে বেশ কিছু সিপাহী টোটা স্পর্শ করতে অস্বীকার করে। লখনউয়ে বিদ্রোহ শুরু হয় মে ৩ তারিখে। মীরাটে বিদ্রোহী সেনাদের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ ঘোষণার পর বিদ্রোহ ব্যাপক আকার নেয় এবং য়ুরোপীয়দের ওপর আক্রমণ শুরু হয়ে যায়। লালকেল্লায় বন্দি বাহাদুর শাহকে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ঘোষণা করা হয় এবং তিনি বিদ্রোহে নেতৃত্ব দানে সম্মত হন। ক্রমশ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে ফিরোজপুর, মুজাফরনগর, আলিগড়, নওশেরা এবং হোতি (পঞ্জাব), উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, রুরকি, এটা, নাসিরাবাদ (রাজস্থান), মথুরা, বেরিলি, শাজাহানপুর, মোরাদাবাদ, বদায়ুন, মালাওন, মোহমদি, বারাণসী, কানপুর, ঝাঁসি, ফৈজাবাদ, দরিয়াবাদ, ফতেপুর, ফতেগড়, হাতরাস প্রভৃতি অঞ্চলে। লখনউয়ে সাধারণ মানুষ বিদ্রোহে সিপাহীদের সমর্থনে এগিয়ে আসে। নানাসাহেব নিজেকে স্বাধীন পেশোয়া ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরেজ সেনানায়ক হ্যাভেলকের কাছে পরাস্ত হয়ে তিনি পালিয়ে যান। নানা সাহেবের অন্যতম অনুচর তাঁতিয়া টোপিও হ্যাভেলকের সঙ্গে যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে গোয়ালিয়র চলে যান। সেপ্টেম্বর ২০ ইংরেজরা দিল্লি দখল করে। বন্দি হন বাহাদুর শাহ। তার দুই পুত্র এবং এক পৌত্রকে গুলি করে মারা হয়। ইংরেজদের পরাস্ত করে কানপুর শহব দখল করেন তাঁতিয়া টোপি (নভেম্বর ২৭)। কিন্তু ডিসেম্বর ৬ ইংরেজরা কানপুর দখন করলে তাঁতিয়া টোপি পালিয়ে কাল্পিতে চলে যান। উত্তেজিত সিপাহীদের বিক্ষোভ ক্রমশ বাড়তে থাকে। বোম্বাই-এ নায়িকদাসরা বিদ্রোহ করে। ১৮৫৮ সালের শুরু থেকেই বিদ্রোহ নতুন রূপ নেয়। প্রথমে ২০০ জন (মার্চ ৪) এবং পরে ৫১ জন (এপ্রিল) সিপাহিকে আন্দামানে নির্বাসনে পাঠান হয়। ইংরেজ বাহিনী লখনউ দখল করে (মার্চ ২১) এবং ঝাঁসি আক্রমণ করে (মার্চ ২২)।

রানি লক্ষ্মীবাঈ প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। রানি লক্ষ্মীবাঈ-এর সাহায্যে এগিয়ে আসেন তাঁতিয়া টোপি। কিন্তু পরাস্ত হয়ে (মার্চ ৩১) আশ্রয় নেন কাল্পিতে। রানি লক্ষ্মীবাঈ পরাজয় অনিবার্য জেনে দুর্গ ত্যাগ করে (এপ্রিল ৪) কাল্পিতে উপস্থিত হন। কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে লক্ষ্মীবাঈ যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারান (জুন ১৭)। তাঁতিয়া টোপি পরাস্ত হয়ে প্রথমে সেরেঙ্গীর জঙ্গলে, পরে পেরোইনের জঙ্গলে আশ্রয় নেন। এক বিশ্বাসঘাতক সঙ্গী মান সিংহ ধরিয়ে দেয় তাঁকে। তাঁতিয়া টোপির ফাঁসি দেওয়া হয় (এপ্রিল ১৮)। তার আগে ডিসেম্বর মাসেই অযোধ্যায় ইংরেজ প্রভুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

: মুম্বাই, মাদ্রাজ ও কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

: বাংলার সমাজ জীবনে নতুন এক পর্বের সূচনা। উচ্চতর শিক্ষার প্রসারে দেশের মানুষের চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। একদিকে ইংরেজের অনুগৃহীত আমলা এবং সামন্তপ্রভুরা, অপরদিকে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ শিক্ষিতসমাজ।

১৮৫৭ - ১৯৯৯ : ছোটনাগপুরে কোল বিদ্রোহ।

১৮৫৭ - ৭০ : ওয়াহবি বিদ্রোহ।

১৮৫৮ : আগস্ট ২ — ভারতে সুশাসন প্রবর্তনের আইন।

: নভেম্বর ১ — ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিলোপ সাধন। ইংলন্ডের রানির ভারতের শাসনভার গ্রহণ।

১৮৫৯ : ভারতের প্রথম প্রজাস্বত্ব আইন।

১৮৫৯ - ৬২ : নীলচাষীদের সংগ্রাম। ৫০ লক্ষ কৃষক একজোট হয়ে নীলচাষ বন্ধ করে দেয়। চরম নির্যাতন চালিয়েও কৃষকদের নীলচাষে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয় নি। সরকার বাধ্য হয় নীল চাষে নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

১৮৬০ : নীল কমিশন গঠিত।

: দীনবন্ধু মিত্রের *নীলদর্পণ* প্রকাশিত হয় ঢাকা থেকে।

: দুদু মিঞার জীবনাবসান।

১৮৬০ - ৬১ : উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও পঞ্জাবে দুর্ভিক্ষ।

: কুকি বিদ্রোহ (ত্রিপুরা)

১৮৬১ : মে-দীনবন্ধু মিত্রের '*নীলদর্পণ*' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ। অনুবাদ করেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত। '*নীলদর্পণে*'র ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশের জন্য রেভারেন্ড জেমস লঙের একমাস কারাদণ্ড এবং এক হাজার টাকা জরিমানা। জরিমানার টাকা আদালতে জমা দেন কালীপ্রসন্ন সিংহ।

: জুন ১৪ — হিন্দু পেট্রিয়ট সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

: ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট বিধিবদ্ধ।

: মেদিনীপুরে রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরবদায়িনী সভা' স্থাপিত।

: আহমেদাবাদে বস্ত্রকল নির্মাণ।

: ময়মনসিংহে গারো বিদ্রোহ।

: সুন্দরবন অঞ্চলে বিদ্রোহ।

: আসামের ফুলগুড়ি বিদ্রোহ।

: নওগাঁ জেলায় কৃষক বিদ্রোহ। কৃষক নেতাদের প্রাণদণ্ড।

	:	কোম্পানি শাসনের অবসান।
	:	প্রেসিডেন্সি শহরগুলিতে হাইকোর্ট স্থাপিত। সদর আদালত ও নিজমত আদালতের অবসান।
১৮৬২	:	ভারতীয় দণ্ডবিধি কার্যকর।
	:	পুলিশি নির্যাতনের বিরুদ্ধে গরুর গাড়ির গাড়োয়ানের ধর্মঘট।
১৮৬৩	:	ইংরেজ-বিরোধী ওয়াহাবি আন্দোলন।
১৮৬৪	:	ওয়াহাবীদের বিরুদ্ধে 'আম্বালা মামলা' শুরু।
১৮৬৫	:	পঞ্জাবে কুকা আন্দোলন। আন্দোলনের চরিত্র ছিল অসহযোগ।
	:	দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আর্থিক সহযোগিতায় সাপ্তাহিক 'ন্যাশনাল পেপার' প্রকাশিত।
১৮৬৬	:	ভারতীয়দের সংগঠন "ইস্ট ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন" গঠিত।
১৮৬৫ - ৬৬	:	ওড়িশার ছয়টি জেলা— বিহার, উত্তরবঙ্গ ও মাদ্রাজে বিদ্রোহ।
১৮৬৭	:	এপ্রিল ১২ —প্রথম চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার সূচনা। সম্পাদক গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সহকারী সম্পাদক নবগোপাল মিত্র।
	:	লন্ডনে 'ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' গঠিত।
১৮৬৮	:	ওড়িশার কেওঞ্ঝরে বিদ্রোহ।
১৮৬৮ - ৬৯	:	রাজপুতানা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, মুম্বাই ও মধ্যভারতে দুর্ভিক্ষ।
১৮৭০	:	পুণা সার্বজনিক সভা গঠিত (আগেকার পুণা অ্যাসোসিয়েশন)।
	:	শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে 'শ্রমজীবী সমিতি' গঠিত।
১৮৭১	:	খাজনাহীন জমির দাবিতে সাঁওতাল বিদ্রোহ।
১৮৭১ - ৭৫	:	বাংলায় সুরেন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমের যুগ।
	:	শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্মযুবকদের নিয়ে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন। সঙ্গী ছিলেন দ্বারকানাথ চট্টোপাধ্যায়, দুর্গামোহন দাস ও সুন্দরীমোহন দাস। পরে যোগ দেন আনন্দমোহন বসু, মনমোহন ঘোষ এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
	:	সাঁওতাল বিদ্রোহ —নেতা ভগীরথ।
	:	কলকাতায় টাউন হলের সামনে বিচারপতি নর্মানকে ছুরিকাঘাত। এই অপরাধে ওয়াহাবি যুবক মহম্মদ আব্রদুল্লার ফাঁসি হয়।
	:	সুরেন্দ্রনাথ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর, সারা ভারত পরিক্রমায় বিদেশি শাসন সম্পর্কে দেশের মানুষকে সচেতন করে তোলেন।
	:	বঙ্কিমচন্দ্র বহরমপুর আদালত থেকে ফেরার সময় মিলিটারি অফিসার কর্নেল ডফিন কর্তৃক প্রহৃত হন। তিনি নিয়মতান্ত্রিকভাবে এর প্রতিবাদ করেন। এই ঘটনার পর তাঁরও মানসিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি দেশের কৃষকদের অবস্থা নিয়ে লেখা শুরু করেন।
	:	মুম্বাই প্রদেশের পুণা ও থানা জেলার পার্বত্য অঞ্চলে কোলি-বিদ্রোহ।
১৮৭২	:	আন্দামানে লর্ড মেও ছুরিকাঘাতে নিহত হন ওয়াহাবি-বন্দি শের আলির হাতে। পরে শের আলির ফাঁসি হয়।

: পঞ্জাবে নামধারী বিদ্রোহ।

১৮৭২ - ৭৩ : অতিরিক্ত করের চাপে পাবনায় প্রজাবিদ্রোহ। একদিনে প্রায় ৯০টি কাছারি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই বিদ্রোহের ফলেই Bengal Tenancy Act পাশ হয়।
সিরাজগঞ্জে বিদ্রোহ।
কলকাতায় ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপন করেন মনোমোহন বসু।

১৮৭৩ : পাবনা, বগুড়া, ঢাকা, বাকরগঞ্জে সহিংস কৃষক বিদ্রোহ।

: কলকাতায় ঘোড়ার গাড়ির গাড়োয়ান ধর্মঘট।

১৮৭৩ - ১৯২১ : দাক্ষিণাত্যে মোপলা বিদ্রোহ।

১৮৭৩ -৭৪ : মুম্বাই, বঙ্গদেশ, বিহার, অযোধ্যা ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে দুর্ভিক্ষ।

১৮৭৪ : **প্রথম বিলাতি-দ্রব্য বর্জনের প্রস্তাব করেছিলেন ভোলানাথ চন্দ্র।**

: 'ভারত শ্রমজীবী' পত্রিকা প্রকাশিত।

১৮৭৪ - ৭৫ : মহারাষ্ট্রে মহাজনদের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ।

১৮৭৫ : জানুয়ারি ১৫ — রবার্ট নাইটের সম্পাদনায় *'দি ইন্ডিয়ান স্টেটসম্যান'* প্রকাশিত।

: আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলেত থেকে ফিরে এসে ছাত্র আন্দোলন শুরু করেন। গঠিত হয় ছাত্রসভা।

: মহাজনী শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পুণা ও আহমেদনগরে।

: সেপ্টেম্বর ২৫ — সব শ্রেণির মানুষের জন্য শিশিরকুমার ঘোষ প্রতিষ্ঠা করেন ইন্ডিয়া লিগ।

১৮৭৬ : জানুয়ারি ১৩—ভারতীয়দের প্রথম গবেষণাগার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-যাদবপুরে স্থাপিত।

: জুলাই ২৬ — ইন্ডিয়া লিগের ভূমিকা যথোপযুক্ত না হওয়ায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু স্থাপন করেন ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (ভারত সভা)।

: বঙ্কিমচন্দ্রের *'বন্দেমাতরম'* সঙ্গীত রচনা।

: রঙ্গমঞ্চে স্বাদেশিকতা প্রচার বন্ধ করতে "রঙ্গমঞ্চ নিয়ন্ত্রণ আইন" জারি হয়। এই অনুসারে রসরাজ অমৃতলাল বসু ও উপেন দাসের এক মাস করে কারাদণ্ড হলেও, হাইকোর্টে আপিল করায় তারা মুক্ত হন।

: রাজনারায়ণ বসু ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্থাপন করেন স্বদেশি গুপ্ত সমিতি 'সঞ্জীবনী সভা'।

১৮৭৬ - ৭৭ : মুম্বাই, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা ও মহীশূরে দুর্ভিক্ষ।

১৮৭৭ : ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে অগণিত মানুষের মৃত্যু হলেও ভিক্টোরিয়াকে (১ জানুয়ারি) সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করে দিল্লিতে দরবার। মহা আড়ম্বরে উৎসব।

: নাগপুরে বস্ত্রকলে প্রথম ধর্মঘট। ভারতে প্রথম।

: ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সুরেন্দ্রনাথ সারা ভারত ভ্রমণ করেন।

: কলকাতায় জাতীয় মুসলিম অ্যাসোসিয়েশন গঠিত। (ন্যাশনাল মহমেডান

অ্যাসোসিয়েশন)।

১৮৭৮ : দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করে নতুন আইন জারি (ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট)।
—বড়লাট লিটন। এই আইনের বিরুদ্ধে সুরেন্দ্রনাথের আন্দোলন।
—বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকা রাতারাতি ইংরেজি ভাষায় প্রকাশ শুরু হলেও, বহু সংবাদপত্র প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

: এপ্রিল ১৭—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা।

১৮৭৮ - ৭৯ : মাদ্রাজে মহা-দুর্ভিক্ষ।

: মাদ্রাজের গোদাবরী তীরে রুম্পা অঞ্চলে করবৃদ্ধি ও ভূস্বামীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। গোদাবরী ও ভিজাগাপত্তনম অঞ্চলে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

১৮৭৯ : জানুয়ারি — 'দি বেঙ্গলি' সংবাদপত্রের মালিক ও সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

: "অস্ত্র আইন" চালু হয়। আইন অনুসারে বিনা সরকারি অনুমতিতে ভারতীয়রা কোনো অস্ত্র রাখতে পারবে না।

১৮৮০ : দাক্ষিণাত্য, মুম্বাই-এর দক্ষিণ অঞ্চল, মধ্যপ্রদেশ, হায়দরাবাদ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ।

: বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে-কে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁকে আটক রাখা হয় এডেন জেলে। ফালকে হলেন ভারতের প্রথম রাজনৈতিক বন্দি।

: দাক্ষিণাত্যে তাম্পা ডোরার নেতৃত্বে বিদ্রোহ। তাম্পাকে গ্রেপ্তারের পর গুলি করে হত্যা করা হয়।

: মাদ্রাজের রুম্পা অঞ্চলে কৃষক বিদ্রোহ।

: অক্টোবর — জেল থেকে পলাতক ফাড়কে-কে আবার গ্রেপ্তার।

: ইস্ট ইন্ডিয়া রেলপথের পয়েন্টসম্যানরা ধর্মঘট করে। এই ধর্মঘট ছিল ইংরেজ কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের প্রতিবাদে এবং তাদের অপসারণের দাবিতে। ধর্মঘট দীর্ঘদিন চলেছিল। ইংরেজ কর্তৃপক্ষের আচরণ — ভবিষ্যতে সংযত থাকবে, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

১৮৮১ : মাদ্রাজে 'মহাজনসভা'র জন্ম।

: সর্দাব বিদ্রোহ দমন।

১৮৮২ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *'আনন্দমঠ'* প্রকাশিত।

: বিলাতি বস্ত্র আমদানির ওপর থেকে শুল্ক কর প্রত্যাহার।

: ময়নসিংহে গারো বিদ্রোহ।

: বড়লাট লিটন ভার্নাকুলার প্রেস অ্যাক্ট বাতিল করেন।

১৮৮২ - ৮৪ : ৮ ঘণ্টা কাজ ও মজুরির দাবিতে মুম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলায় ধর্মঘট।

১৮৮৩ : ব্যবস্থা সচিব ইলবার্ট একটি বিল প্রণয়ন করেন। বিলে বলা হয়েছিল, দেশি ম্যাজিস্ট্রেটরা ইংরেজদের বিচার করতে পারবে। হাইকোর্টের

একজন বিচারপতি এবং বাংলার ছোটলাটের মদতে এক শ্রেণির ইংরেজ প্রবল বিরোধিতা করায় আইনটি কার্যকর হয়নি।

: কলকাতায় স্থাপিত হয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন। সভাপতি আনন্দমোহন বসু বলেছিলেন : This is the beginning of a Parliament.

: মে — হাইকোর্ট অবমাননার অভিযোগে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দু'মাস কারাদণ্ড। শুরু হয় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ। এই বিক্ষোভের নেতা ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

: জুলাই ৪—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুক্তিলাভ।

: ভারতে শ্রমিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ কৃষ্ণকুমার মিত্রের '*সঞ্জীবনী*' পত্রিকা প্রকাশ।

: ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ কলকাতায় অ্যালবার্ট হলে ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের প্রথম সর্বভারতীয় সম্মেলন।

১৮৮৪ : মাদ্রাজে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল ইউনিয়ন গঠিত।

: মুম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদের প্রথম জনসভা ও লোখাণ্ডে কর্তৃক প্রথম ভারতীয় শ্রমিক ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠা।

১৮৮৫ : ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ 'ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে'র জন্ম। অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বড়লাট ডাফরিন। জবরদস্ত আই. সি. এস. অ্যালান অক্টোভিয়ান হিউম-এর নেতৃত্বে 'কংগ্রেস' গড়ে ওঠে। মুম্বাই-এর সংস্কৃত কলেজ হলে প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আনন্দমোহন বসু ছিলেন আমন্ত্রিত। প্রতিনিধি সংখ্যা ৭১।

১৮৮৬ : ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ কলকাতায় দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন। প্রতিনিধি সংখ্যা ৪৩৪।

১৮৮৬ - ৮৭ : মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষ।

১৮৮৭ : মাদ্রাজে বদরুদ্দিন তায়েবজির সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন। প্রতিনিধি সংখ্যা ৬০৭।

১৮৮৮ : ডিসেম্বর ২৬ - ২৯ : এলাহাবাদ জর্জ ইউলের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের চতুর্থ অধিবেশন।

১৮৮৮ - ৯০ : বিহার, উড়িষ্যা, গঞ্জাম, মাদ্রাজ, কুমায়ুন ও গাড়োয়ালে দুর্ভিক্ষ।

১৮৮৯ : রাঁচি জেলায় কোল বিদ্রোহ।

: যশোহরে নীল বিদ্রোহ।

: ছোটনাগপুরে মুণ্ডা বিদ্রোহ।

: ডিসেম্বর ২৫ - ২৮ : মুম্বাই শহরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন। প্রতিনিধি সংখ্যা ১৮৮৯ জন। প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদের যোগদান।

১৮৯০ - ৯১ : মণিপুরে ইংরেজ বিরোধী বিদ্রোহ। রাজার আদেশে মন্ত্রী টিকেন্দ্রজিৎ চিফ কমিশনার ও অন্যান্য ইংরেজদের হত্যা করেন। তারপর ইংরেজ সেনাবাহিনী মণিপুর দখল করে রাজাকে আন্দামানে নির্বাসন দেয়। নাবালক রাজাপুত্রকে রাজপদে বসানো হয়। সেনাপতি ও মন্ত্রীকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। এই

		ঘটনা সমগ্র ভারতে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।
১৮৯০	:	ডিসেম্বর ২৬ - ৩০ : স্যর ফিরোজ শাহ মেহতার সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষষ্ঠ অধিবেশন।
১৮৯১	:	ফেব্রুয়ারি ১৯ : অমৃতবাজার পত্রিকা দৈনিক হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সম্পাদক : মতিলাল ঘোষ।
	:	আগস্ট ১৩ : ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার অপরাধে টিকেন্দ্রজিৎ সহ জেনারেল থেঙ্গাল ও আগনেসথেনার ফাঁসি।
	:	ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ : নাগপুরে পি. আনন্দচার্লুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তম অধিবেশন।
১৮৯১ - ৯২	:	মাদ্রাজ-বোম্বাই, দাক্ষিণাত্য ও বঙ্গদেশে দুর্ভিক্ষ।
১৮৯২	:	দাদাভাই নৌরজি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য মনোনীত।
	:	ভারতীয় কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রবর্তন।
	:	ডিসেম্বর ২৮-৩০ এলাহাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টম অধিবেশন-সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
১৮৯৩	:	মহারাষ্ট্রে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত।
	:	চিকাগো বিশ্বধর্মসভায় স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বজয়।
	:	মিসেস অ্যানি বেশান্তের প্রথম ভারতে পদার্পণ।
	:	ভারতে ফিরে অরবিন্দ ঘোষের বরোদা মহারাজার দরবারে কর্ম গ্রহণ। —সে সময়ে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর রাজনৈতিক নিবন্ধ প্রকাশিত হত এবং বাংলায় গুপ্ত সমিতি স্থাপনে উদ্যোগী হন।
	:	বাল গঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে 'গণপতি উৎসবে'র সূচনা।
	:	বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলে সুরেন্দ্রনাথ মনোনীত।
	:	ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ : দাদাভাই নৌরজির সভাপতিত্বে লাহোরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নবম অধিবেশন।
১৮৯৪	:	ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যে ইংরেজ সরকার বিশেষ উৎপাদন শুল্ক বসায়।
	:	মজুরি বৃদ্ধি ও ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিতে মুম্বাইয়ের বস্ত্রশিল্প শ্রমিকদের ধর্মঘট।
	:	সরকার 'পিটুনি কর' চালু করে।
	:	আগস্ট ২৬ - ২৯-এ ওয়েবের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নবম অধিবেশন।
১৮৯৪ - ৯৫	:	লছিলামার বিদ্রোহ।
	:	পাথারুঘাটের বিদ্রোহ।
১৮৯৫	:	বালগঙ্গাধর তিলকের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে 'শিবাজী উৎসবে'র সূচনা।
	:	চাপেকার ভাইদের গুপ্ত সমিতি স্থাপিত।
	:	ইংরেজ বিরোধী মুণ্ডা বিদ্রোহ শুরু বীরসা মুণ্ডার নেতৃত্বে।
	:	বীরসা মুণ্ডা গ্রেপ্তার এবং দু-বছর সশ্রম কারাদণ্ড।
	:	আমেদাবাদে সকল মিলের তাঁতিদের ধর্মঘট।
	:	বজবজে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট।
	:	ডিসেম্বর ১২ — কামরূপে রঙ্গিয়া বিদ্রোহ।

	:	ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ — সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে পুণায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একাদশ অধিবেশন।
১৮৯৫ - ৯৭	:	বুন্দেলখণ্ড, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, অযোধ্যা, বঙ্গদেশে ও মধ্য ভারতে দুর্ভিক্ষ।
১৮৯৬	:	কলকাতায় স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনী।
	:	দক্ষিণ ভারতে মোপলা বিদ্রোহ।
	:	বজবজে চটকল শ্রমিকদের আবার ধর্মঘট।
	:	শিবপুরে চটকল শ্রমিকদের ধর্মঘট।
	:	ডিসেম্বর ২৮ - ৩১ — রহিমতুল্লা সাহানির সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বাদশ অধিবেশন।
১৮৯৭	:	রাজদ্রোহিতার অভিযোগে লোকমান্য তিলকের একবছর কারাদণ্ড।
	:	স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা।
	:	বীরসা মুণ্ডার মুক্তিলাভ।
	:	মাদ্রাজ সরকারের প্রেস শ্রমিকদের ধর্মঘট।
	:	বেতন বৃদ্ধি ও ছুটির দাবিতে জি. আই. পি. রেলপথের গার্ডদের ধর্মঘট।
	:	ডিসেম্বর ২৭ - ২৯ — সি. শঙ্করনায়ারের সভাপতিত্বে অমরাবতীতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন।
১৮৯৮	:	মহারাষ্ট্রের ফরবেশ সেন্ট্রাল জেলে দামোদর হরি চাপেকারকে প্রেস কমিশনার র‍্যান্ড এবং প্রেস বিভাগের অফিসার আয়ার্স্টকে হত্যার অভিযোগে হত্যা।
	:	মুণ্ডা নেতা বীরসার নেতৃত্বে মুণ্ডা বিদ্রোহ অব্যাহত।
	:	রাজদ্রোহ আইন জারি।
	:	কার্জনের ভারত আগমন।
	:	ডিসেম্বর ২৯ - ৩১ — মাদ্রাজে আনন্দমোহন বসুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ত্রয়োদশ অধিবেশন।
১৮৯৯	:	ভারতের সর্বত্র দুর্ভিক্ষ।
	:	মে ৮ —পুলিশের দুই গুপ্তচরকে হত্যার অভিযোগে মহারাষ্ট্রের ধারবেদা সেন্ট্রাল জেলে ফাঁসি দেওয়া হয় বাসুদেব হরি চাপেকারকে।
	:	মে-১০ — একই অভিযোগে ঐ জেলেই ফাঁসি হয় মহাদেও রাণাডের।
	:	মে-১২ —বালকৃষ্ণ হরি চাপেকারকে ফাঁসি দেওয়া হয় মহারাষ্ট্রের ধারবেদা সেন্ট্রাল জেলে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল র‍্যান্ড ও আয়ার্স্টকে হত্যা।
	:	ডিসেম্বর ২৭ - ৩০ — লখনউতে রমেশচন্দ্র দত্তর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পঞ্চদশ অধিবেশন।
১৮৯৯ - ০৫	:	কার্জন গভর্নর জেনারেল।
১৯০০	:	জানুয়ারি ১৩ — বীরসা মুণ্ডা গ্রেপ্তার।
	:	জানুয়ারি ২৬ — রাঁচি জেলে বীরসা মুণ্ডার মৃত্যু।
	:	ডিসেম্বর ২৭ - ১৯ — এন. জি. চন্দভারকরের সভাপতিত্বে লাহোরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ষোড়শ অধিবেশন।
১৯০০ - ০১	:	*'দি বেঙ্গলি'* দৈনিকে রূপান্তরিত।

১৯০১ : তিন জন মুণ্ডা নেতার ফাঁসি এবং ৪৪ জন মুণ্ডার দ্বীপান্তর।
: বিপিনচন্দ্র পাল সাপ্তাহিক '*নিউইন্ডিয়া*' প্রকাশ করেন। ১৯০৭ সালে পত্রিকা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।
: গুজরাট, দাক্ষিণাত্য, বোম্বাই, কর্ণাটক, মাদ্রাজ ও পঞ্জাবের দক্ষিণাঞ্চলে দুর্ভিক্ষ।
: ডিসেম্বর ২২ : বোম্বাই শহরে মহাত্মা গান্ধীর পদার্পণ।
: ডিসেম্বর ১৯ : শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্য আশ্রম প্রতিষ্ঠা।
: ডিসেম্বর ২৬ - ২৮ — কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন হয় দিনশা এদুলজি ওয়াচার সভাপতিত্বে।

১৯০২ : ভারতীয় মহিলা বিপ্লবী মাদাম ভিকাজী রুস্তম কামা প্যারিসে উপস্থিত হন।
: মার্চ ২৪ — কলকাতায় ব্যারিস্টার প্রমথনাথ মিত্রের সভাপতিত্বে অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠা। সহ-সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাস এবং অরবিন্দ ঘোষ। কোষাধ্যক্ষ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
: জুলাই — সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি স্থাপিত।
: জুলাই-৪ —স্বামী বিবেকানন্দের জীবনাবসান।
: অক্টোবর ১০—বরোদায় অরবিন্দ-নিবেদিতা সাক্ষাৎকার।
: মেদিনীপুরে বিপ্লব সমিতি স্থাপিত।
: ডিসেম্বর ২৩ - ২৬ — আমেদাবাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অষ্টাদশ অধিবেশন।

১৯০৩ : বাংলার গভর্নর স্যার অ্যান্ড্রু ফ্রেজারের বাংলা বিভাগের প্রস্তাবে সম্মত হন কার্জন।
: সমগ্র চট্টগ্রাম ও ঢাকা-মনময়সিংহের অংশ বিশেষ আসামের সঙ্গে সংযুক্তিকরণ প্রস্তাবের বিপক্ষে বাংলায় জনবিক্ষোভ।
: রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে যোগ দেন সিস্টার নিবেদিতা।
: জানুয়ারি ১৪—বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ময়মনসিংহে প্রতিবাদ সভা।
: এপ্রিল—কলকাতায় সরলাদেবীর 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' শুরু।
: জুন—ছাত্রদের উদ্যোগে 'স্বদেশি ভাণ্ডার' গঠিত।
: আগস্ট ২২ — পুণার ছাত্র সভায় ব্রিটিশ পণ্য বয়কটের ডাক দেন বাল গঙ্গাধর তিলক।
: ডিসেম্বর ২৮ - ৩০ — মাদ্রাজে লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ঊনিশতম অধিবেশন।

১৯০৪ : রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনা চক্র 'আত্মোন্নতি সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন ভূপেন্দ্রকুমার বসু, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ।
: 'অভিনব ভারত' বিপ্লবী সংস্থা স্থাপন করেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
: জে. এম. চ্যাটার্জি প্রমুখ পঞ্জাবে সাহারানপুরে একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন।

১৯০৪ : ফেব্রুয়ারি—বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের পক্ষে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লর্ড

কার্জনের পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ। ঢাকার নবাব সলিমুল্লাকে টাকা ধারের ব্যবস্থা করে দিয়ে তাকে এবং অন্যান্য কিছু প্রভাবশালী মুসলমান নেতাকে দলে টানেন।

: নভেম্বর ২৬—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সান্ধ্যকালীন দৈনিক *'সন্ধ্যা'* পত্রিকা প্রকাশিত।

: নভেম্বর ২৬ - ২৮ — স্যর হেনরি কটনের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের বিশতম অধিবেশনে বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আলোচনা ছিল সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

১৯০৫ : ফেব্রুয়ারি ৩ — ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে সরকারি নিয়ন্ত্রণে আনার কার্জনের বিল পরিষদে ১০ ফেব্রুয়ারি গৃহীত হয়।

: লন্ডনে 'ইন্ডিয়া হোমরুল সোসাইটি' স্থাপন করেন শ্যামাজী কৃষ্ণবর্মা।

: অরবিন্দ ঘোষের 'ভবানী মন্দির' প্রকাশিত হয়। যা ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম প্রেরণা।

: জুলাই-৫ — বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব প্রকাশিত।

: জুলাই-১৩-কৃষ্ণকুমার মিত্র সঞ্জীবনী পত্রিকায় বিদেশি পণ্য বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের ইঙ্গিত দেন।

: জুলাই-১৭ — রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে ছাত্র সমাবেশ।

: জুলাই-১৯ — বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা চট্টগ্রাম, ঢাকা, রাজসাহী ডিভিশন, পার্বত্য ত্রিপুরা, মালদহ ও আসাম নিয়ে নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশ গঠিত হবে। —পূর্ববঙ্গের জন্ম।

: আগস্ট-৭ — কলকাতা টাউন হলে এক বিশাল সমাবেশে বিদেশি দ্রব্য বয়কটের ডাক দেওয়া হয়। সভাপতিত্ব করেন কাশিমবাজারের মহারাজা।

: আগস্ট-২১ — বড়লাট পদে কার্জনের পদত্যাগ। (ভারত ত্যাগ করেন ১৭ নভেম্বর)।

: আগস্ট-২৫ — বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবেব বিরোধিতা করে টাউন হলে আয়োজিত সভায় রবীন্দ্রনাথের 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' প্রবন্ধ পাঠ।

: সেপ্টেম্বর-১ — সরকারিভাবে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা।

: সেপ্টেম্বর ২ — সারা বাংলা দেশে শোকদিবস পালন।

: সেপ্টেম্বর ১০ — 'বন্দেমাতরম' পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখার অপরাধে বিপিনচন্দ্র পালের ছয়মাস কারাদন্ড।

: সেপ্টেম্বর ২০ — বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে মেদিনীপুরের সর্বত্র বিক্ষোভ ও সভানুষ্ঠান।

: সেপ্টেম্বর-২২ — বঙ্গভঙ্গ বিরোধী ও স্বদেশি আন্দোলনের সপক্ষে টাউন হলের জনসভায় সভাপতিত্ব করেন লালমোহন ঘোষ। সভায় ৪ হাজার লোক যোগ দেয়।

: সেপ্টেম্বর ২৩—বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে ও বিদেশি পণ্য বর্জনের সমর্থনে মুসলমানদের জনসভা।

: ২৫ সেপ্টেম্বর—বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে কলকাতা ময়দানে জনসভা বা

সমাবেশ নিষিদ্ধ।

: সেপ্টেম্বর ২৮—কালিঘাটের মন্দিরে দুর্গাপূজার সময় ৫০ হাজার মানুষ শপথ নেয় তারা বিলেতি দ্রব্য বর্জন করবে।

: সেপ্টেম্বর ২৯ — সিমলায় সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপক পরিষদে বঙ্গভঙ্গ বিল আইন হিসাবে গৃহীত।

: বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা—বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ব্যাপক আকার নেয়। বাংলার বিপ্লবীরা স্বদেশি মণ্ডলী গঠন করেন। যার সঙ্গে চিত্তরঞ্জন দাসের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যোগাযোগ ছিল।

: 'পাবনা সম্মিলনী' নামে একটি গুপ্ত সমিতি গঠিত।

: অক্টোবর ৮ —বয়কটের কারণে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ীরা ম্যাঞ্চেস্টার থেকে সূতীবস্ত্র আমদানি করতে অস্বীকার করে।

: অক্টোবর ১০—কার্লাইল সার্কুলার জারি।

: অক্টোবর ১৬ — সরকারি নির্দেশানুসারে ঢাকা হয় পূর্ব বাংলার রাজধানী। কলকাতায় অরন্ধন এবং হরতাল পালিত হয় সরকারি নির্দেশের বিরোধিতায়। ফেডারেশন হলের সভায় উপস্থিত হন রবীন্দ্রনাথ। দুই বাংলার মিলনের প্রতীক হিসাবে ফেডারেশন হল বা মিশন মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন আনন্দমোহন বসু। বাংলা জুড়ে পালিত হয় রাখিবন্ধন উৎসব।

: অক্টোবর ২১—বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে সরকারি প্রেসকর্মীদের ধর্মঘট।

: অক্টোবর ২২ — একই ব্যানে দ্বিতীয় কার্লাইল সার্কুলার।

: অক্টোবর ২৪—কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন আবদুল রসুল। বক্তব্য পেশ করেন বিপিনচন্দ্র পাল।

: অক্টোবর ২৭—কার্লাইল সার্কুলারের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ বক্তব্য পেশ করেন চারুচন্দ্র মল্লিকের বাড়ির সভায়।

: ময়মনসিংহ জেলায় গুপ্ত সমিতি 'সুহৃদ সমিতি' গঠিত। উদ্যোগী পরেশ লাহিড়ি।

: নভেম্বর-১ —পান্তির মাঠের জনসভায় সুবোধচন্দ্র মল্লিক জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনকল্পে ১ লক্ষ টাকা দানের প্রতিশ্রুতি দেন। জনতা তাঁকে রাজা উপাধিতে ভূষিত করে।

: নভেম্বর-৪ —অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটি স্থাপিত। সম্পাদক ছাত্রনেতা শচীন্দ্রনাথ বসু।

: নভেম্বর-৮ —রঙ্পুরে প্রথম জাতীয় বিদ্যালয় (ন্যাশনাল স্কুল) স্থাপন করেন কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত এবং ব্রজসুন্দর রায়।

: নভেম্বর-৮ —প্রকাশ্য রাস্তায় ও পার্কে 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ নিষিদ্ধ।

: নভেম্বর ১২—জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবির সমর্থনে অনুষ্ঠিত সভায় নিবেদিতার বক্তৃতা।

: নভেম্বর ১৬ —আশুতোষ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন গঠিত।

: ডিসেম্বর ২৭-৩০ —গোপালকৃষ্ণ গোখলের সভাপতিত্বে বেনারসে

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২১তম অধিবেশন। অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

১৯০৬ : জানুয়ারি ৪ — প্রিন্স অফ ওয়েলস ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন।

: তিন আইন জারি—অশ্বিনীকুমার দত্ত, কৃষ্ণকুমার মিত্র, সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রমুখ ৮ জন নেতা বিনা বিচারে আটক।

: এপ্রিল ১৫ — বরিশালের বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলন পুলিশের অত্যাচারে ছত্রভঙ্গ।

: এপ্রিল—রাজদ্রোহের অভিযোগে ক্ষুদিরাম বসুর বিচার।

: এপ্রিল ১৮—বরিশালে পুলিশের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কলকাতায় প্রতিবাদ সভা।

: মে ১৬—অল্পবয়স্ক হওয়ায় ক্ষুদিরামের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার।

: জুন ৪-৮—কলকাতায় পান্তির মাঠে শিবাজী উৎসব।

: বিডন স্কোয়ারে আয়োজিত সভায় যোগ দেন বাল গঙ্গাধর তিলক, খাপার্দে এবং লালা লাজপত রায়।

: আগস্ট ৬—বিপিনচন্দ্র পাল (প্রথমে সাপ্তাহিক পরে দৈনিক) ইংরেজি '*বন্দেমাতরম্*' প্রকাশ করেন।

: জুলাই —ইস্ট ইন্ডিয়া রেলে অধিকাংশ ভারতীয় কর্মচারীর ধর্মঘট।

: জুলাই ২৭—সন্ধ্যা পত্রিকার অফিসে রেলওয়ে মেনস ইউনিয়ন স্থাপিত হয়।

: আগস্ট ১৭—মুম্বাই-এ ডাকবিভাগের ৫০০ কর্মীর বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ধর্মঘট।

: অক্টোবর ১০—বঙ্গভঙ্গ ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন চিত্তরঞ্জন দাস।

: অক্টোবর ১৮ — '*বন্দেমাতরম*' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষ।

: অক্টোবর ২৭—ময়মনসিংহে কয়েকজন ছাত্র ও ভদ্রলোককে পুলিশ অকারণে প্রহার করে।

: ডিসেম্বর ২৬-২৯ —কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাইশতম অধিবেশন হয়, দাদাভাই নৌরজীর সভাপতিত্বে। এই সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে ছিল 'স্বরাজ'-এর দাবি। বিদেশি দ্রব্য বয়কট এবং জাতীয় শিক্ষার প্রতি সমর্থন। এই সম্মেলনে প্রথম ত্রিবর্ণরঞ্জিত পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল।

: দুই ভারতীয় প্রতিনিধি গোপালকৃষ্ণ গোখলে এবং লালা লাজপত রায়ের ইংল্যান্ড যাত্রা।

: কংগ্রেস প্রদর্শনী বয়কটের আহ্বান জানান কৃষ্ণকুমার মিত্র এবং বিপিনচন্দ্র পাল। কারণ এই প্রদর্শনীতে দেশি দ্রব্যের সঙ্গে বিদেশি দ্রব্য প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়েছিল। সতীশ বোসের নির্দেশ ছিল সমিতির কোন সদস্যই এই প্রদর্শনীতে যেতে পারবে না।

: কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনের সময় রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে

নিখিল বঙ্গ বিপ্লবীদের অধিবেশন হয়।

: ডিসেম্বর ৩০—ঢাকায় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের সময়, ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহের প্রাসাদে মুসলিম লিগের জন্ম। মুসলিম লিগ প্রতিষ্ঠার দেড় মাস পরে ময়মনসিংহের জামালপুরে এবং দুমাস পরে কুমিল্লায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।

১৯০৭ : জানুয়ারি ১ — কলকাতা ময়দানে ভিক্টোরিয়ার মূর্তি বিকৃতকরণ ও আলকাতরা নিক্ষেপ।

: রাজদ্রোহ আইন বলবত হয়। তিন বছরের জন্য সভাসমিতি নিষিদ্ধ।

: আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ায় ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স লিগ প্রতিষ্ঠা করেন পাণ্ডুরং খানখোজে, খগেন্দ্রনাথ দাস, তারকচন্দ্র দাস এবং অধরচন্দ্র লস্কর।

: অজিত সিং-এর 'ভারতীয় দেশভক্তদের সঙ্ঘ' প্রতিষ্ঠা।

: মার্চ ১০—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের সাপ্তাহিক *স্বরাজ* পত্রিকা প্রকাশ।

: মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার *নবশক্তি* পত্রিকা প্রকাশ।

: বৈপ্লবিক সংগ্রামের লক্ষ্য নিয়ে '*কেশরী*' (হিন্দি) পত্রিকা প্রকাশ।

: মে-৯ —লালা লাজপত রায়কে লাহোরে গ্রেপ্তার।

: মে-১৬—ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেলে পাঠানো হয় লালা লাজপত রায়কে।

: জুলাই ২০ —'*যুগান্তর*' পত্রিকার সম্পাদক ভূপেন্দ্রনাথ দত্তকে গ্রেপ্তার করা হয় পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক রচনা প্রকাশের অভিযোগে এবং ২৪ জুলাই তাঁকে একবৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়।

: আগস্ট ১৬ — অরবিন্দ ঘোষ গ্রেপ্তার।

: আগস্ট ২৬ — বন্দেমাতরম পত্রিকার বিরুদ্ধে সরকারের মামলা।

: সেপ্টেম্বর ৩ — 'সন্ধ্যা' পত্রিকার অফিসে তল্লাসী এবং ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় গ্রেপ্তার।

: অক্টোবর-২ — কলকাতার বিডন স্কোয়ারে স্বদেশি সভা ভেঙে দেওয়ায় পুলিশের সঙ্গে অনুশীলন সমিতির সদস্যদের সংঘর্ষ।

: অক্টোবর-১০ — গ্রীয়ার পার্ক বাদে কলকাতার অন্য সব পার্কে জনসভা নিষিদ্ধ।

: অক্টোবর—ঢাকার নিতাইগঞ্জে রাজনৈতিক ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা।

: অক্টোবর ২৭—বিচারাধীন বন্দি ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের জীবনাবসান।

. অক্টোবর-১৮ — ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে শ্রমিকদের ১০ দিন ধর্মঘট।

: নভেম্বর ১—রাজদ্রোহমূলক জনসভা বিল আইন হিসাবে গৃহীত।

: নভেম্বর ১—Seditious Meeting Act কোন সভা করার ৭দিন আগে পুলিশকে জানাতে হবে। এমন কী কারো বাড়িতে ২০ জন মিলিত হলে এই আইনে শাস্তিযোগ্য।

: নভেম্বর ১৮—ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ে শ্রমিকদের ১০দিন ধর্মঘট।

: ডিসেম্বর—পূর্ব বাংলার ছোটলাট ব্যামফিল্ড ফুলারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা।

: ডিসেম্বর-৬— মেদিনীপুরের নারায়ণগড় স্টেশনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে

ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার ব্যর্থ চেষ্টা। এই প্রচেষ্টার আড়ালে ছিলেন উল্লাস দত্ত, প্রফুল্ল চাকী, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবং বিভূতিভূষণ সরকার।

: ডিসেম্বর ২৩ — ঢাকার প্রাক্তন ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালেন গুলিবিদ্ধ হন গোয়ালন্দে।

: ডিসেম্বর ২৬-২৭ — রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে সুরাটে ২৩তম কংগ্রেস অধিবেশন। কংগ্রেসে প্রথম ভাঙন।

: বিপিনচন্দ্র পালের ছয় মাস কারাদণ্ড।

: নভেম্বর ১১—লাজপৎ রায় এবং অজিত সিং-এর মুক্তিলাভ।

১৯০৭-০৯ : গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য নিবেদিতা দু-বছর দেশের বাইরে য়ুরোপ ও আমেরিকায় ছিলেন।

১৯০৮ : ফেব্রুয়ারি-৩ — ময়মনসিংহকে তিন ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব।

: *'সন্ধ্যা'*, *'যুগান্তর'*, *'বন্দেমাতরম'* প্রকাশ বন্ধ।

: বিপিনচন্দ্র পাল কারামুক্ত।

: লালা হরদয়াল বিদেশ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর পঞ্জাবের বিপ্লবী সংগঠনগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে।

: বিহারের একাধিক বিপ্লবী সংগঠন সক্রিয়।

: মহারাষ্ট্রে কোলাপুর বোমা মামলা শুরু।

: কাশীতে অনুশীলন সমিতি গঠিত—পরে নাম হয় ইয়ং মেনস অ্যাসোসিয়েশন।

: বিদেশ থেকে বোমা তৈরির পদ্ধতি শিখে স্বদেশে ফিরে আসেন হেমচন্দ্র কানুনগো।

: দক্ষিণ ভারতে সহিংস আন্দোলন ব্যাপক রূপ নেয়।

: নাগপুরে মহারানী ভিক্টোরিয়ার পাথরের মূর্তি ভেঙে আলকাতরা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

: এপ্রিল ১০ — আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলা।

মজঃফরপুরে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকির বোমা নিক্ষেপের পর পুলিশ ব্যাপক ধরাপকড় শুরু করে। ২ মে ৩২ মুরারীপুকুর রোডের বাগানবাড়িতে পুলিশ একটি বোমার কারখানা আবিষ্কার করে। সেখানে প্রচুর পরিমাণ বোমা তৈরির মাল মশলা, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিপ্লবীদের গোপন কাগজপত্র উদ্ধার করে। বাড়িটি ছিল অরবিন্দ ঘোষ ও বারীন্দ্রকুমার ঘোষের পিতা ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষের।

৩২ মুরারীপুকুর রোড থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে—বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, হেমচন্দ্র কানুনগো, উল্লাসকর দত্ত, দেবব্রত বসু, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষিকেশ কাঞ্জিলাল, নলিনী গুপ্ত, পূর্ণ সেন, বিভূতি সরকার, ইন্দুভূষণ রায়, পরেশ মৌলিক, বিজয় নাগ, শচীন সেন, শিশির ঘোষ, নরেন বক্সী ও কুঞ্জলাল সাহাকে।

১৫ গোপীমোহন দত্ত লেন থেকে গ্রেপ্তার করে কানাইলাল দত্ত ও নিরাপদ রায়কে।

. ১৩৪ হ্যারিসন রোড (বর্তমান মহাত্মা গান্ধী রোড) থেকে নরেন গুপ্ত, ধরণী গুপ্ত ও অশোক নন্দীকে গ্রেপ্তার করে।

৪৮ গ্রে স্ট্রিট থেকে অরবিন্দ ঘোষ, অবিনাশ ভট্টাচার্য এবং শৈলেন বসুকে গ্রেপ্তার করে।

৩০/৫ রাজা নবকৃষ্ণ স্ট্রিট থেকে হেমচন্দ্র ঘোষকে গ্রেপ্তার করে।

তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে গ্রেপ্তার করা হয় নরেন গোস্বামী (শ্রীরামপুর) সুধীরকুমার সরকার (খুলনা), কৃষ্ণজীবন সান্যাল (কানসাট—মালদহ), বীরেন্দ্রনাথ ঘোষ, বিজয়রত্ন সেনগুপ্ত, মতিলাল বসু, সুশীল বসু, বীরেন সেন, হেম সেন (বানিয়াচঙ সেনপাড়া), ইন্দ্রনাথ নন্দী (কর্নেল মহেন্দ্র নন্দীর পুত্র), নিখিলেশ্বর রায় মৌলিক, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র ভট্টাচার্য, বালকৃষ্ণ হরিকানে, প্রভাসচন্দ্র দেব, হরিদাস দত্ত, প্রফেসর চারুচন্দ্র দত্ত (চন্দননগর)

মামলা শুরু হয় ১৯০৮ সালের জুন মাসে। রায় বেরোয় ১৯০৯ সালের ৬ মে।

: এপ্রিল ১৮-১৯ — জাতীয় কংগ্রেসের এলাহাবাদ কনভেনশনে গঠনতন্ত্র গৃহীত।

: এপ্রিল ৩০—মজঃফরপুরে বোমা বিস্ফোরণ।

: মানিকতলা বোমা ষড়যন্ত্রকারীরা গ্রেপ্তার

: মে-২—গ্রেপ্তার অরবিন্দ ঘোষ, শৈলেন্দ্র নাথ বসু, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত এবং আরো দশজন গ্রেপ্তার।

: মে ৩ — মোকামাঘাটে প্রফুল্ল চাকির আত্মহত্যা।

: ক্ষুদিরাম বসু গ্রেপ্তার।

: মে-১৫—গ্রে স্ট্রিটে ট্রাম লাইনে বোমা বিস্ফোরণ।

: মে ৩০ — যুগান্তর পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ শুরু।

: জুন-২—ঢাকার বারহাতে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতি। ২৫,৮৩৭ টাকা লুঠ। ৪ জন নিহত। বহু আহত। গ্রামবাসী ও পুলিশ কতৃক বিপ্লবীরা আক্রান্ত। ১ জন বিপ্লবী নিহত।

: জুন-৮—এক্সপ্লোসিভ সাবস্ট্যান্সেস অ্যাক্ট ও 'নিউজ পেপার অ্যাক্ট' অনুমোদিত।

: জুন-১৩—ক্ষুদিরামের ফাঁসির হুকুম।

: জুন-২১—কাঁকিনাড়ায় দ্বিতীয় শ্রেণির কামরায় বোমা বিস্ফোরণ।

: জুলাই-২৩—সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘট।

: আগস্ট-১১—মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি।

: আগস্ট-১২—চন্দননগর রেলস্টেশনেব কাছে বোমা বিস্ফোরণ।

: আগস্ট-২৮—মেদিনীপুর জেলার সমস্ত য়ুরোপীয় কর্মচারীকে হত্যার ষড়যন্ত্র করার অভিযোগে নাড়াজোলের রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ সহ ৮ জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি গ্রেপ্তার। ১৮ সেপ্টেম্বর তারা জামিনে মুক্ত হন এবং ৯ ডিসেম্বর মামলা প্রত্যাহার।

: আগস্ট-৩০ — নাঙ্গলা (খুলনা) ষড়যন্ত্র মামলা।

: সেপ্টেম্বর-১—আলিপুর ষড়যন্ত্র মামলার রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে জেলেই হত্যা করে দুই বিপ্লবী কানাই দত্ত ও সত্যেন বসু।

: সেপ্টেম্বর-৭—মেদিনীপুর বোমা মামলা শুরু।

: ২০ সেপ্টেম্বর—লোকমান্য তিলক ছয় বছরের জন্য মান্দালয়ে কারারুদ্ধ। প্রতিবাদে বোম্বাই-এ শ্রমিকরা ৬ দিন কাজ বন্ধ রাখে। লেনিন অভিনন্দন জানান।

: অক্টোবর ১৯ —আলিপুর বোমা মামলা শুরু।

: অক্টোবর-২১—জেল হাসপাতালে বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে হত্যার অপরাধে সত্যেন বসু এবং কানাইলাল দত্তর ফাঁসির আদেশ।

: অক্টোবর-২৩—'বন্দেমাতরম' পত্রিকা বন্ধের নির্দেশ।

: নাগপুরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার পাথরের মূর্তি ভেঙে আলকাতরা লাগিয়ে দেওয়া হয়।

: নভেম্বর-৭ — কলকাতার ওভারটুন হলে গভর্নর স্যার এন্ড্রু ফ্রেজারকে হত্যার ব্যর্থ প্রয়াস। গুলি বর্ষণ করে জিতেন রায়। সেখানেই সে ধরা পড়ে। বিচারে ১০ বছর কারাদণ্ড।

: নভেম্বর-৭ — গোয়েন্দা নন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত।

: নভেম্বর-১০ — বর্তমান প্রেসিডেন্সি জেলে কানাইলাল দত্তর ফাঁসি।

: নভেম্বর-২৩—আলিপুর জেলে সত্যেন বসুর ফাঁসি।

: নভেম্বর ৩০—লন্ডনে নিউ রিফর্ম ক্লাবে গোখলে বলেন, বঙ্গভঙ্গ রদ ও সমস্ত রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি না দিলে বাংলার পরিবেশ শান্ত হবে না।

: ডিসেম্বর ১১ — কৃষ্ণকুমার মিত্র গ্রেপ্তার।

: ডিসেম্বর-১৩—১৮১৮ সালের তিন আইনে অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুবোধচন্দ্র মল্লিক ও আরো পাঁচজনের নির্বাসন।

: ডিসেম্বর ২৮-৩০—রাসবিহারী ঘোষের সভাপতিত্বে মাদ্রাজে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশন।

১৯০৯ : জানুয়ারি ৬—ঢাকার অনুশীলন সমিতি বাকরগঞ্জের স্বদেশবান্ধব বা বান্ধব সমিতি, ফরিদপুরের ব্রতী সমিতি, ময়মনসিংহের সুহৃদ সমিতি ও সাধনা সমিতি নিষিদ্ধ।

: বিভিন্ন জেলার যুব সংগঠন বে-আইনি ঘোষণা করা হয়।

: গণেশ দামোদর সাভারকরের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আদেশ।

: ভারতের সর্বত্র বিপ্লবীদের ডাকাতি সাহায্যে অর্থসংগ্রহ।

: এপ্রিল ১৪—আলিপুর বোমা মামলার রায়।

: আগস্ট ১৬—খুলনা জেলার নাঙ্গালে ১০৭০ টাকা ডাকাতি।

: আগস্ট ৩০—নাঙ্গাল ষড়যন্ত্র মামলা শুরু।

: অক্টোবর ১২—কলকাতার অনুশীলন সমিতি নিষিদ্ধ।

: অক্টোবর ১৬—ফরিদপুরের দরিয়াপুরে ২,৬০০ টাকা ডাকাতি।

: নভেম্বর ১০—ঢাকা জেলার রাজনগরে ২৭,৮২৭ ডাকাতি।

: ডিসেম্বর ২৭-২৯ — মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে লাহোরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৪তম অধিবেশন।

: ১৯০৯-১০—মর্লি-মিন্টো সংস্কার।

১৯১০ : জানুয়ারি-৬—অপরাধ আইন অনুসারে পূর্ববঙ্গের বহু সমিতি নিষিদ্ধ।

: জানুয়ারি ২৪—কলকাতা হাইকোর্টে ডেপুটি পুলিশ সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল আলমকে হত্যা করেন বীরেন্দ্র দত্তগুপ্ত।

: জানুয়ারি ২৬—বাঘাযতীন, অনাথবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, ললিতকুমার চট্টোপাধ্যায় ও নিবারণ মজুমদার গ্রেপ্তার।

: ফেব্রুয়ারি ৯—নতুন প্রেস অ্যাক্ট জারি।

: ফেব্রুয়ারি ১০—আলিপুর ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত প্রাঙ্গণে সরকারি উকিল ও ২৪ পরগনার পাবলিক প্রসিকিউটর আশুতোষ বিশ্বাসকে গুলি করে হত্যা।

: ফেব্রুয়ারি ২১—কলকাতা পুলিশের সি-আই-ডি বিভাগের হেড কনস্টেবল শ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে হত্যা করে অনুশীলন সমিতির জনৈক সদস্য।

: ফেব্রুয়ারি ১৪—গ্রেপ্তার হওয়ার আশঙ্কায় অরবিন্দ ঘোষের চনন্দনগরে আত্মগোপন।

: মার্চ-এপ্রিল-২১—হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলা।

: মার্চ—হাওড়া ষড়যন্ত্র মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি (বাঘাযতীন)।

: মার্চ-১৩—লণ্ডনে বিনায়ক দামোদর সাভারকার গ্রেপ্তার।

: নাসিক ষড়যন্ত্র মামলা শুরু।

: এপ্রিল-১৯—কৃষ্ণগোপাল কার্ভে, বিনায়ক নারায়ণ দেশপাণ্ডে এবং অনন্ত লক্ষ্মণ কানহেরীর ফাঁসি হয় থানে স্পেশাল জেলে ম্যাজিস্ট্রেট জ্যাকসনকে হত্যার অপরাধে।

: মে—মাদাম কামা প্যারী নগরী থেকে 'বন্দেমাতরম' সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

: জুলাই-২—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু।

পুলিনবিহারী দাস অক্লান্ত পরিশ্রমে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঢাকা অনুশীলন সমিতির ৬০০ শাখা স্থাপন করেছিলেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে এই সংঘের ৪৫ জন ধৃত হন। ১০ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। নিম্ন আদালতে এক বছর মামলা চলেছিল। অনুশীলন সমিতির সদস্যদের পক্ষে আদালতে আইনজীবী ছিলেন ব্যারিস্টার চিত্তরঞ্জন দাস, উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, প্যারীমোহন ঘোষ, শশাঙ্ক বসু, বিভু গুহঠাকুরতা, নিবারণচন্দ্র মুস্তফী এবং বীরেন্দ্রনাথ মজুমদার। আর সরকার পক্ষে ছিলেন ব্যারিস্টার মি. গার্থ, আপ্টন এবং নলিনী গুপ্ত।

ধৃতদের মধ্যে ছিলেন :—

১. পুলিনবিহারী দাস— লোন সিং—ফরিদপুর।

২. ললিতমোহন রায় — জমিদার ও উকিল—সাটিরপাড়া-ঢাকা।

৩. অমরেন্দ্র নাথ ঘোষ — মোক্তার - টাঙাইল-ময়মনসিংহ।
৪. আশুতোষ দাশগুপ্ত —গাড়ুরগা-বিক্রমপুর-ঢাকা।
৫. জ্যোতির্ময় রায়—মৈশুণ্ডী—ঢাকা।
৬. প্রফুল্ল সেন—মধ্যপাড়া।
৭. রাধিকাভূষণ রায়—মানিকগঞ্জ।
৮. ক্ষীরোদ গুহ, ৯. শান্তিপদ মুখার্জি, ১০. ভূপতি সেনগুপ্ত—মধ্যপাড়া, বিক্রমপুর।
১১. নিশিকান্ত মিত্র। ১২. নৃপেন্দ্র সেন। ১৩. গোবিন্দচন্দ্র সেন—মধ্যপাড়া।
১৪. দীনেশচন্দ্র গুহ মুস্তফি — স্বামী তুরীয়ানন্দ।
১৫. বঙ্কিমচন্দ্র রায়—সিরাজগঞ্জ। ১৬. যোগেশচন্দ্র রায়—ঢাকা।
১৭. শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—পাঁচগা, বিক্রমপুর। ১৮. নলিনী কিশোর গুহ—ব্রজযোগিনী, ঢাকা।
১৯. যদুনাথ দাস—মানিকদী, মহেশ্বরদী ঢাকা।
২০. বিনোদবিহারী চক্রবর্তী—গড়বাড়ি, মহেশ্বরদী-ঢাকা।
২১. গুরুদয়াল দাস—সোনারগাঁ। ২২. অক্ষয়কুমার দত্ত — (শান্তিনাথ)।
২৩. মানিকচন্দ্র গুহ মুস্তফি। ২৪. প্রমোদবিহারী দাশগুপ্ত।
২৫. হেমচন্দ্র সেন—মধ্যপাড়া, বিক্রমপুর। ২৬. রজনীকান্ত সেন—কার্তিকপুর, ফরিদপুর।
২৭. বিজয়চন্দ্র রাহা। ২৮. নিতাইচাঁদ বণিক — ঢাকা। ২৯. অবনী গাঙ্গুলি—আদাবাড়ি।
৩০. যোগেন্দ্র দাশগুপ্ত (কমলা)। ৩১. নিশিকান্ত রায়চৌধুরী—উলপুর, ফরিদপুর।
৩২. শশী সরকার। ৩৩. গোপীবল্লভ চক্রবর্তী। ৩৪. গোপাল ঘোষ—ধীপুর।
৩৫. সুরেশ চন্দ্র সেন—মধ্যপাড়া, বিক্রমপুর। ৩৬. সুরেন রায়—কুণ্ডা।

এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীকে পুলিশ ধরতে পারেনি। বিচারে ৩৬ জনের বিভিন্ন মেয়াদে দণ্ড হলেও, আপিলে ১৪ জন দণ্ডিত হন। পুলিনবিহারী দাসের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর এবং আশুতোষ দাশগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়ের ৬ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল।

: জুলাই ১৮—খুলনা ষড়যন্ত্র মামলা শুরু—অপরাধ যশোহর ও খুলনা জেলার ষোলগাঁতি, ধূলগ্রাম, নন্দনপুর মহিশায় ডাকাতি। যুগান্তর সমিতির সদস্যদের ১৭ জনকে এই ডাকাতির অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়।

: আগস্ট ৩০—নাঙ্গাল ষড়যন্ত্র মামলার অভিযুক্তদের বিভিন্ন মেয়াদের সাজা হয়।

: সেপ্টেম্বর—ঢাকার মুন্সিগঞ্জে বোমা রাখার অপরাধে একজনের দ্বীপান্তর।

: নভেম্বর—ফরিদপুরের ভেদরগঞ্জ থানার কলারগাঁও-এ ১২,৬৬০ ডাকাতি।

: সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভার জন্ম।

: ডিসেম্বর-২৪—নাসিক ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত বিনায়ক সাভারকর, গণেশ সাভারকর ও বামন যোশীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

: ডিসেম্বর ২৫—'মর্লেমিন্টো শাসন সংস্কার' প্রবর্তন।
: ডিসেম্বর ২৬-২৯—স্যর উইলিয়ম ওয়েডারবার্ণের সভাপতিত্বে এলাহাবাদে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৫ তম অধিবেশন।

১৯১১ : পঞ্চম জর্জের ভারত আগমন ও দিল্লি দরবার।
: 'রাজদ্রোহমূলক জনসভা-নিবারক আইন' জারি।
: বাংলার সর্বত্র রাজনৈতিক ডাকাতি এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি।
: জানুয়ারি-৩—ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত পুলিনবিহারী দাস। আরও ৪৩ জন অভিযুক্ত ছিল।
: ফেব্রুয়ারি-৯—নতুন প্রেস আইন জারি।
: জামশেদপুরে প্রথম ভারতীয় ধাতুশিল্প কারখানা নির্মাণ।
: জ্যাকসন হত্যায় জড়িত থাকার অপরাধে বিনায়ক সাভারকরকে দ্বিতীয়বার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।
: মার্চ ২৭—ডালহৌসি স্কোয়ার বোমা মামলায় ননীগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ১৪ বছর সাজা।
: এপ্রিল ১০—ঢাকার রাউত ভোগে গোয়েন্দাকর্মী মনোমোহন দে-কে হত্যা করে অনুশীলন সমিতির সভ্যরা, ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা ও মুন্সিগঞ্জ বোমা মামলায় সাক্ষ্য দেওয়ার অপরাধে।
: এপ্রিল ২২—বাকরগঞ্জের লক্ষ্মণকোটিতে ১০ হাজার টাকা রাজনৈতিক ডাকাতি।
: জুন ১৯—ময়মনসিংহ শহরে পুলিশ সাব-ইনসপেক্টর রাজকুমার রায় বিপ্লবীদের হাতে নিহত।
: জুলাই ৪—আন্দামান সেলুলার জেলে নির্বাসিত বিনায়ক দামোদর সাভারকর।
: জুলাই ১১—ঢাকায় পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার অভিযোগে ৩ জনকে হত্যা করে বিপ্লবীরা।
: ডিসেম্বর ১১—বরিশালে পুলিশ ইনসপেক্টর মনোমোহন ঘোষকে হত্যা করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। মনোমোহন ছিল ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম সাক্ষী।
: ডিসেম্বর ১২—দিল্লি দরবারে সম্রাট পঞ্চম জর্জ বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করেন।
: ডিসেম্বর ২৬-২৮ — পণ্ডিত বিষাণ নারায়ণ ধরের সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৬তম অধিবেশনে প্রথম 'জনগণমন অধিনায়ক' গাওয়া হয়।
: বঙ্গভঙ্গ রদ।
: নরেন সেনের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গে অনুশীলন সমিতির পুনর্জন্ম — দলের মুখপত্র *স্বাধীন ভারত*।

THE KING EMPEROR'S ANNOUNCEMENTS
SEAT OF GOVERNMENT TRANSFERRED TO DELHI.
GOVERNOR FOR THE TWO BENGALS.
CREATION OF NEW PROVINCE.

The following is the text of the announcement by His Imperial Majesty at the conclusion of the Durbar:

> We are pleased to announce to Our people that on the advice of Our Ministers and after consultation with Our Governor General in Council, We have decided upon the transfer of the seat of the Government of India from Calcutta to the ancient capital of Delhi, and simultaneously, and as a consequence of that transfer, the creation at as early a date as possible of a Governorship for the Presidency of Bengal, of a new Lieutenant Governorship in Council administering the areas of Behar, Chota Nagpur, and Orissa, and of a Chief Commissionership of Assam, with such administrative changes and redistribution of boundaries as Our Governor General-in-Council, with the approval of Our Secretary of State for India in Council, may, in due course, determine.
>
> It is our earnest desire that these changes may conduce to the better administration of India and the greater prosperity and happiness of Our beloved people.

দিল্লি দরবারে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বরের এই ঘোষণা কলকাতার
দি স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয় ১৩ ডিসেম্বর

১৯১২ : ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরে গঠিত হয় 'মাদারিপুর সমিতি'—ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতি অনুসরণ এবং অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক ডাকাতি শুরু করে।

: দেশব্যাপী বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ব্যাগক রূপ নিতে থাকে।

: জানুয়ারী ২৩—ঢাকা জেলার বাইগুন তেওয়ারিতে ৩,৪৭০ টাকা ডাকাতি করে মাদারিপুর সমিতির সদস্য।

: ফেব্রুয়ারি ২১—ঢাকা জেলার ঘিওর থানার আয়নপুরে ৭,৫৯৩ টাকা ডাকাতি করে মাদারিপুর সমিতির সদস্যরা।

: এপ্রিল ১—কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত।

: এপ্রিল ১৭—বাকরগঞ্জের কুশঙ্গলে রাজনৈতিক ডাকাতি।

: সেপ্টেম্বর ২৪—ঢাকার গোয়ালনগরে পুলিশের হেড কনস্টেবল রতিলাল রায়কে হত্যা করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা। পরে গ্রেপ্তার হন ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী।

: ডিসেম্বর ২৩—দিল্লিতে নতুন রাজধানী স্থাপনের উৎসবে হাতির পিঠে লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রবেশের সময় বোমা দ্বারা আক্রান্ত হন। তাঁর আঘাত ছিল গুরুতর। এই বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন বসন্তকুমার বিশ্বাস।

: ডিসেম্বর ২৬-২৮ — আর. এন. মুধেলকারের সভাপতিত্বে পাটনায়

বাঁকিপুরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৭তম অধিবেশন।

১৯১৩ : আমেরিকায় স্বদেশপ্রেমিক ভারতীয় বিপ্লবীদের গদর পার্টি প্রতিষ্ঠা। —প্রথমে নাম ছিল ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন।

: রাসবিহারী বসুকে গ্রেপ্তারের পুরস্কার এক লক্ষ টাকা—সরকারি ঘোষণা।

: কয়েকজন বিপ্লবী কর্মীকে বিপ্লবীরা হত্যা করে।

: ফেব্রুয়ারি ৪—ঢাকা জেলার ভরাকরে ৩,৪০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের ২ বৎসর সাজা হয়।

: গোয়েন্দা বিভাগের হেডকনস্টেবল হরিপদ দেব নিহত।

: ময়মনসিংহে পুলিশের গোয়েন্দা বঙ্কিমচন্দ্র চৌধুরী নিহত।

: মে ১২—সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধোদ্যোগের অভিযোগে ৪৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা শুরু।

— মৌলবীবাজারের ঘটনা

শ্রীহট্ট জেলার অরুণাচল আশ্রমে (জগৎসী) মহকুমা হাকিম গর্ডনের নির্দেশে সাধুদের ওপর বীভৎস অত্যাচার হয়। অনুশীলন সমিতির সদস্যরা এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে গর্ডনকে শাস্তি দানের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। দায়িত্ব পড়ে ডিয়ারার (নেত্রকোণা) যোগেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী, নাগরপাড়ার (টাঙাইল) তারাপ্রসন্ন বল ও অমৃত সরকারের ওপর। যোগেন্দ্রের কাছে বোমা ও পিস্তল ছিল। কাঁটাতারের বেড়া পেরোবার সময় যোগেন্দ্র হোঁচট খেয়ে পড়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে বোমা ফেটে যোগেন্দ্র নিহত হয় এবং অন্য দু'জন আহত হলেও দলীয় কর্মীর সাহায্যে ঢাকায় পালিয়ে আসে। যোগেন্দ্রচন্দ্রের দেহ সনাক্তকরণের জন্য সরকার ১৫ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। আশ্রমবাসীদের ওপর পুলিশ গুলি চালালে আশ্রমের সভ্য ক্যাপটেন মহেন্দ্র দে আই. এম. এস. নিহত হয়েছিলেন।

: নভেম্বর ১—সানফ্রান্সিসকো শহর থেকে *গদর* পত্রিকা প্রকাশ।

: নভেম্বর-২৪—রাজাবাজারে বিপ্লবীদের বোমা কারখানা আবিষ্কার।

: রাজাবাজার বোমা মামলা।

: ডিসেম্বর ২৬-২৮ — নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুরের সভাপতিত্বে করাচিতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৮তম অধিবেশনে।

১৯১৪ : জানুয়ারি ১৩—গোয়েন্দা ইনসপেক্টর নৃপেন্দ্রনাথ ঘোষ নিহত।

: জানুয়ারি ২২—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলার রায় প্রকাশ।

"রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র"র অভিযোগে এই মামলার যে ৪৪ জনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হয়, তারা সকলেই ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য। এদের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ ছিল সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ এবং ডাকাতি করে অর্থ সংগ্রহ। অভিযুক্তরা ছিলেন :—

১. নরেন্দ্রমোহন সেন — সোনারগাঁ, আমিনপুর, ঢাকা।
২. রমেশচন্দ্র আচার্য — বানরীপাড়া, বিক্রমপুর, ঢাকা।
৩. দেবেন্দ্রনাথ ঘোষ — কাউনিয়া, নাজিরবাড়ি, বরিশাল।
৪. যতীন্দ্রনাথ রায় — কুশঙ্গল, বরিশাল, ওরফে ফেগু

৫. যতীন ঘোষ। ৬. মণীন্দ্র ভূষণ রায়। ৭. বীরেন্দ্র বসু।
৮. হেমেন্দ্র মুখুটি। ৯. রোহিনী গুহ। ১০. নিবারণ কর।
১১. কুমুদ নাগ। ১২. দেবেন্দ্র বণিক। ১৩। গোপাল মিত্র।
১৪. নিশাকান্ত ঘোষ। ১৫. চণ্ডী বসু। ১৬. গোপাল মুখার্জী।
১৭. চণ্ডী কর। ১৮. শশাঙ্ক ঘোষ। ১৯. নিশিকান্ত গুপ্ত।
২০. নলিনী দাশগুপ্ত। ২১. রজনী দাস। ২২. নরেন সেন কবিরাজ।
২৩. জ্ঞান দাশগুপ্ত—প্রমুখ।

বিচারে ১২ জন দণ্ডিত হয়েছিলেন।

—বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলা—২য় দফা।

এই মামলায় অভিযুক্তদের মধ্যে ছিলেন :—

১. ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী ওরফে কালীচরণ, ওরফে বিরজা, ওরফে হরেন্দ্র, ওরফে মহারাজ।
২. প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি। ৩. মদনমোহন ভৌমিক, ওরফে কুলদাপ্রসাদ রায়।
৪. রমেশচন্দ্র চৌধুরী, ওরফে পরিতোষ।
৫. খগেন্দ্র চৌধুরী, ওরফে সুরেশ চক্রবর্তী।

—বিচারে ত্রৈলোক্যনাথের ১৫ বৎসর, এবং অন্যান্যদের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। আপিলে ত্রৈলোক্যনাথের ১০ বৎসর, মদন ভৌমিকের ১০ বৎসর, খগেন চৌধুরীর ৭ বৎসর দ্বীপান্তর হয়। প্রতুল গাঙ্গুলি এবং রমেশ চৌধুরীকে জেলে আটক রাখা হয়।

: মার্চ ১৬—গদর পার্টির নেতা হরদয়ালকে গ্রেপ্তার করে মার্কিন সরকার।

: মে-২৪ — দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্তদেব বিচার শুরু।

—দিল্লি ষড়যন্ত্র মামলা

মানিকতলা বোমা মামলায় দণ্ডিত অমৃত (শশাঙ্ক) হাজরার বাড়ি তল্লাসির সময় পুলিশ একটি সাঙ্কেতিক চিঠিতে দিল্লির আমিরচাঁদ ও প্রফেসর অবাধ বিহারীর ঠিকানা পায়। এই সূত্রে অনুসরণ করে পুলিশ একটি ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করে, যার নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু। বিভিন্ন স্থানে যখন খানাতল্লাসী ও ধরপাকড় চলছে, রাসবিহারী তখন বিভিন্ন বেশে দিল্লি, লাহোর, অমৃতসর, কলকাতা, রাঁচী প্রভৃতি স্থানে দল গঠনে ব্যস্ত। পুলিশ তাকে ধরতে পারে নি। রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে অবাধ বহারী দিল্লির সেন্ট জোসেফ স্কুলের শিক্ষক আমিরচাঁদ, যোধপুর রাজকুমারের গৃহশিক্ষক বাল মুকুন্দ ও বসন্ত বিশ্বাসের ফাঁসি এবং লাহোর কলেজের ছাত্র বলরাজের যাবজ্জীবন দণ্ড হয়েছিল।

: জুন-৯—রাজাবাজার বোমা মামলার অভিযুক্তদের দ্বীপান্তরের নির্দেশ।

: জুন-১৬—বালগঙ্গাধর তিলক ৬ বছর পর মান্দালয় জেল থেকে মুক্তি পান।

: জুন-১৯—পুলিশের চর সন্দেহে চট্টগ্রামে সত্যেন্দ্র সেন নিহত।

: আগস্ট—বালগঙ্গাধর তিলক বোম্বাই-এ ন্যাশনাল লিগ প্রতিষ্ঠা করেন।

: আগস্ট-২৬—কলকাতার রডা অ্যান্ড কোম্পানির ৫০টি মসার পিস্তল এবং ৪৬ হাজার কার্তুজ বিপ্লবীরা হস্তগত করে।

: সেপ্টেম্বর ৩—বার্লিনে বন্ধুভাবাপন্ন জার্মান সমিতি গঠিত। সম্পাদক ধীরেন সরকার।

: সেপ্টেম্বর ২৯—'কামাগাতামারু' জাহাজ বজবজে পৌঁছায়, তার আরোহীদের গদর পার্টির সদস্য সন্দেহে বন্দরে নামতে না দেওয়ায়, সংঘর্ষে ১৮ জন শিখ নিহত।

: 'তোসামারু' জাহাজ ১৭৩ জন শিখ যাত্রী কলকাতা পৌঁছায়। তারা ছিল গদর পার্টির সদস্য। এদের পঞ্জাবে স্থানান্তরিত করা হয়।

: ডিসেম্বর—মার্সাইতে মাদাম কামা গ্রেপ্তার ও বন্দি।

: ডিসেম্বর ২৮-৩০—ভূপেন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ২৯তম অধিবেশন মাদ্রাজে।

১৯১৪-১৮ : প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

১৯১৫ : বার্লিনে ভারত স্বাধীনতা কমিটি গঠিত।

: গান্ধীর ভারত প্রত্যাবর্তন।

: জানুয়ারি ১১—জার্মান অস্ত্র সাহায্যে ভারতব্যাপী সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যতীন মুখার্জির (বাঘাযতীন) নেতৃত্বে।

—সিঙ্গাপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা

২১ ফেব্রুয়ারি স্বাধীনতা ঘোষণার দিন পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে গদর পার্টি ও অনুশীলন সমিতি। নির্দিষ্ট দিনে সিঙ্গাপুরে একদল সিপাহী স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজ সৈন্যদের পরাস্ত করে, দু সপ্তাহ সিঙ্গাপুর রাখে নিজেদের দখলে। কিন্তু ভারতের অন্য কোথাও বিদ্রোহ না ঘটায় সিঙ্গাপুরের ভারতীয় সৈন্যরা অবশেষে পরাস্ত হয়। সিঙ্গাপুর দখল করে ব্রিটিশ রণতরী এবং তাদের মিত্র জাপানের নৌবহর। বিপ্লবী সৈন্যরা বেশির ভাগ নিহত হয়, অনেককে ফাঁসি দেওয়া হয়। কেউ কেউ পালিয়ে চলে যায় শ্যামদেশ ও ব্রহ্মদেশে।

: ফেব্রুয়ারি—একজন গুপ্তচর কৃপাল সিংহের বিশ্বাসঘাতকতায় রাসবিহারী বসুর ২১ ফেব্রুয়ারি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়। দেশব্যাপী গ্রেপ্তার।

: ফেব্রুয়ারি-১৯—গোপালকৃষ্ণ গোখলের জীবনাবসান।

: ফেব্রুয়ারি ২২—কলকাতার গার্ডেনরীচে বার্ড কোম্পানির ১৮ হাজার টাকা লুঠ করে অনুশীলন সমিতির সদস্যরা।

: ফেব্রুয়ারি ২৪—পাথুরিয়া ঘাটায় গোয়েন্দা নীরেন্দ্র হালদারকে হত্যা করেন বাঘা যতীন।

: ফেব্রুয়ারি ২৮—কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে পুলিশ ইন্সপেক্টর সুরেশ মুখার্জি বিপ্লবীদের গুলিতে নিহত।

: এপ্রিল—নরেন ভট্টাচার্য (পরবর্তীকালে এম. এন.রায় নামে পরিচিত) দেশত্যাগ করে বাটাভিয়া যান এবং জার্মানদের সঙ্গে অস্ত্র সাহায্যের ব্যাপারে আলোচনা শুরু করেন।

: এপ্রিল ২৭— লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বিচার শুরু।

: মে-১২—পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে রাসবিহারী বসু জাহাজে জাপানে চলে যান।

: জুন—বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা শুরু।

- বেনারস ষড়যন্ত্র মামলা

এই মামলার আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল :

১. বিভিন্ন সেনা ব্যারাকে অসন্তোষ সৃষ্টি,

২. সৈন্যদের বিদ্রোহে উত্তেজিত করা,

৩. বোমা তৈরি,

৪. রাজদ্রোহমূলক পুস্তক প্রচার।

এই ষড়যন্ত্রের প্রধান নেতা ছিলেন রাসবিহারী বসু এবং তাঁর প্রধান সহকারী ছিলেন ঢাকা অনুশীলন সমিতির শচীন্দ্রনাথ সান্যাল। এরা ভারতব্যাপী বিদ্রোহের উদ্যোগ নিয়েছিল। "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" মামলায় শচীন্দ্রনাথ সান্যালের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। আন্দামানে জেল কর্তৃপক্ষের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জন্য তাঁকে আরো কঠোর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন দণ্ড ভোগ করেন শ্রীদামোদর স্বরূপ, গণেশলাল, নলিনী মুখার্জি, প্রতাপ সিং, লছমি নারায়ণ, আনন্দ ভট্টাচার্য, বঙ্কিম মিত্র, নরেন্দ্র ব্যানার্জী, কালীপদ, জিতেন্দ্রনাথ সান্যাল। মুক্তি পেয়েছিলেন রবীন্দ্র সান্যাল ও সুরেন্দ্র মুখার্জি। জিতেন্দ্র সান্যাল ও রবীন্দ্র সান্যাল দু'জন ছিলেন শচীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

: আগস্ট-৭ কলকাতার বিপ্লবীদের গুপ্ত মিলন কেন্দ্র হ্যারি অ্যান্ড সন্সে পুলিশের হানা ও গ্রেপ্তার।

: সেপ্টেম্বর-৯—বুড়ি বালামের তীরে যতীন মুখার্জি (বাঘা-যতীন) এবং তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে পুলিশের লড়াই। ঘটনাস্থলে মারা যান চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী।

: সেপ্টেম্বর-১০—আহত যতীন মুখার্জি মারা যান বালেশ্বর হাসপাতালে।

: সেপ্টেম্বর-১৩—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার রায়ে ২৪ জনের ফাঁসি এবং ২৩ জনের দ্বীপান্তরের আদেশ।

—বার্মা ষড়যন্ত্র মামলা

১৩০ নং বেলুচ রেজিমেন্ট রেঙ্গুনে অবস্থান করছিল। তাদের মধ্যেও স্বাধীনতার আগুন জ্বলে ওঠে। বিপ্লবীরাও তাদের মধ্যে সক্রিয় ছিল। অন্যতম দুই বিপ্লবী সোহনলাল পাঠক এবং মুস্তাফা হোসেন। সোহনলাল মেইমোতে ধরা পড়ে। তারপর সরকার ষড়যন্ত্রের কথা জানতে পারে এবং মান্দালয় স্পেশাল ট্রাইবুনালে ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। লালা হরদয়াল, রাসবিহারী বসু, বরকাতুল্লা ও আরও অনেকের নাম রাজসাক্ষী প্রকাশ করে। বিচারে ফাঁসি হয় সোহনলাল, কৃপারাম, হরনাম সিং, কালা সিং এবং বাসুদেব সিং-এর। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে দণ্ডিত হন—চৈৎরাম, কাপুর সিং, হরদিৎ সিং, বদন সিং, গুজুর সিং, রামরক্ষার। এই মামলায় দণ্ডিত সৈনিকের সংখ্যা ছিল প্রায় দুশো।

—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা

ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় পাঞ্জাবিদের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। পঞ্জাব থেকে ব্যাপকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা হলেও, তাদের মর্যাদাকে কখনও ব্রিটিশ প্রভুরা স্বীকার করেনি। ফলে পঞ্জাবীদের ক্ষোভ ব্যাপকভাবে দানা বাঁধতে থাকে। তাদের বিপ্লবী দলে যোগদানের সংবাদে ইংরেজ শাসকরা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। বহু ক্যান্টনমেন্টে পঞ্জাবীদের নির্বিচারে হত্যা করা হয়। অবশিষ্ট সেনানীদের বিরুদ্ধে শুরু হয় "রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র" মামলা। যা ইতিহাসে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা নামে খ্যাত। মামলার তিন পর্যায়ে ৯০ জনের ফাঁসি এবং ৮০০ জনের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের আদেশ হয়। রাজ সাক্ষীরা জবানবন্দিতে বলেছিল, মীরাট, আগ্রা, কানপুর, এলাহাবাদ, বেনারস, ফিরোজপুর, আম্বালা প্রভৃতি স্থানে বিপ্লবীরা ছিল সক্রিয়। প্রথম দফার যাদের ফাঁসির হুকুম হয়েছিল, তাদের মধ্যে ছিলেন—শ্রীগণেশ বিষ্ণু পিংলে, সর্দার সুরণ সিং, সর্দার সুরণ সিং (২), সর্দার হরনাম সিং—প্রমুখ।

যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন :

১। বলবন্ত সিং। ২। হরনাম সিং তুন্দ্রা। ৩। কেদার সিং। ৪। খুসল সিং। ৫। নন্দ সিং। ৬। পৃথ্বী সিং। ৭। রুলা সিং। ৮। সেওয়ান সিং। ৯। মোহন সিং। ১০। ওয়াসন সিং। ১১। ভাই পরমানন্দ। ১২। পণ্ডিত পরমানন্দ। ১৩। হিরদে রাম। ১৪। রামসরণ দাস। ১৫। জত্রিৎ রাও। ১৬। গুরুমুখ সিং। ১৭। জোয়ালা সিং, ১৮। শের সিং। ১৯। পণ্ডিত জগৎরাম। ২০। নিধান সিং। ২১। কেশর সিং। ২২। বিশাখ সিং। ২৩। রুর সিং। ২৪। ভাগ সিং। ২৫। কেহের সিং। ২৬। উদম সিং। ২৭। প্যারা সিং। ২৮। কৃপাল সিং। ২৯। ইন্দ্র সিং। ৩০। লাল সিং। ৩১। কালা সিং। ৩২। নাথা সিং। ৩৩। শিব সিং। ৩৪। সজ্জন সিং।

এই মামলার ফেরারী আসামী ছিলেন রাসবিহারী বসু।

সেপ্টেম্বর-১৪—লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ২৪ জনের মধ্যে ১৭ জনের ফাঁসির আদেশ রহিত হলেও ৭ জনের ফাঁসি হয় ১৭ নভেম্বর লাহোর সেন্ট্রাল জেলে।

নভেম্বর—সিঙ্গাপুরে সিপাহী বিদ্রোহ।

নভেম্বর ২২—বাঘাযতীনের দুই সঙ্গী মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ও নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর ফাঁসি।

গান্ধীর নেতৃত্বে প্রথম সত্যাগ্রহ আন্দোলন।

ডিসেম্বর-১—কাবুলে নির্বাসিত অস্থায়ী ভারত সরকার গঠিত।

ডিসেম্বর ২৭-২৯ — সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিন্‌হার সভাপতিত্বে বোম্বাই-এ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩০তম অধিবেশন। মডারেটদের নিয়ন্ত্রণে কংগ্রেস।

গান্ধীর 'সত্যাগ্রহ আশ্রমে'র পত্তন।

- প্রাগপুর ডাকাতি মামলা

উত্তরবঙ্গের বিপ্লবীরা নদীয়া জেলার প্রাগপুরে এক ধনী গৃহে ডাকাতি

করে। ডাকাতির সময় গ্রামবাসী ও পুলিসের সঙ্গে বিপ্লবীদের সংঘর্ষে বিপ্লবী সুশীল সেন নিহত হন। ডাকাতির পর বিপ্লবীরা সুনীল সেনের মৃতদেহ নদীতে ফেলে পালিয়ে যায়। মামলায় বিচারে আশুতোষ লাহিড়ী (উধুনিয়া-পাবনা), ক্ষিতীশচন্দ্র সান্যাল (নদীয়া), ফণিভূষণ রায়ের (কুষ্ঠিয়া) ১০ বছরের জন্য দ্বীপান্তর হয় এবং তাদের আন্দামান পাঠানো হয়েছিল।

- শিবপুর ডাকাতি মামলা

বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের বিপ্লবী সভ্যরা নদীয়া জেলার শিবপুর গ্রামের এক ধনীগৃহে ডাকাতি করে। এই দলের নেতা ছিলেন নোয়াখালি জেলার দত্তপাড়া গ্রামের নরেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ চৌধুরী। ডাকাতির সময় গ্রামবাসী ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। সেই সুযোগে বিপ্লবীরা পালিয়ে যায়। তারপর পুলিশ শিবপুর ডাকাতি মামলায় অভিযুক্ত করে নরেন্দ্রনাথ চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন নন্দী (ময়মনসিংহ), সত্যরঞ্জন বোস (বরিশাল), নিখিলরঞ্জন গুহ রায় (ইদিলপুর-ফরিদপুর), হরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (ফরিদপুর) এবং ভূপেন্দ্রনাথ ঘোষকে (শ্যামপুকুর লেন-কলকাতা)।

১৯১৬ : জানুয়ারি-১১—প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ওটেনের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ছাত্ররা সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ধর্মঘট করে।

: ফেব্রুয়ারি ১৫—অধ্যাপক প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ওটেন ছাত্রদের হাতে নিগৃহীত।

: ফেব্রুয়ারি-১৬ — প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সুভাষচন্দ্র বসু এবং অনঙ্গমোহন দাসকে কলেজ থেকে বহিষ্কার করেন।

: স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেস—লিগের সন্ধিচুক্তি।

: সেপ্টেম্বর ৩—'নিখিল ভারত হোমরুল লিগ' গঠিত।

: ডিসেম্বর ২৬-৩০ —অম্বিকাচরণ মজুমদারের সভাপতিত্বে লখনউয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশন। এই অধিবেশনে গান্ধী-নেহরু প্রথম সাক্ষাৎকার।

: বিপ্লবীদের হাতে নিহত হন বিজিতপুর শশী চক্রবর্তী, কলকাতার পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য, পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় এবং সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ।

১৯১৭ : জানুয়ারি ৩—অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ গ্রেপ্তার।

: জানুয়ারি ৮—বিপ্লবী দুকড়িবালা দেবী ৭টি মসার পিস্তল রাখার অভিযোগে গ্রেপ্তার এবং দুবছর সশ্রম কারাদন্ড।

: মার্চ ৬—চন্দ্র চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করা হয় নিউইয়র্কে।

: এপ্রিল ৭—সানফ্রান্সিকোয় রামচন্দ্র সহ ১৭ জন গ্রেপ্তার।

: জুন ৩০—দাদাভাই নৌরজির জীবনাবসান

: জুলাই-৭ —আমেরিকায় ১০৫ জন ভারতীয় বিপ্লবীকে গ্রেপ্তার করা হয়।

: আগস্ট ২৮—দৌলতপুর জলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল মণীন্দ্রনাথ শেঠকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে এবং ১৯১৮ জানুয়ারি জেলখানায় তার মৃত্যু হয়।

: নভেম্বর-২০—সানফ্রানসিসকো মামলার সূচনা।

: ডিসেম্বর ২৬-২৯ —অ্যানি বেশান্তের সভাপতিত্বে কলকাতায় আয়োজিত

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩২তম অধিবেশনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি গৃহীত হয়।

১৯১৮ : এপ্রিল ২৭-২৯—দিল্লিতে ভাইসরয়ের যুদ্ধ সম্মেলনে যোগ দেন মদন মোহন মালব্য এবং গান্ধী।

: জুলাই-৮ —মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার প্রস্তাব প্রকাশিত হয় রিপোর্ট আকারে।

: জুলাই-১৯ — রাওলাট কমিটি রিপোর্ট প্রকাশিত।

: আগস্ট—জাতীয় কংগ্রেসের ভাঙন—লিবারেল ফেডারেশনের পত্তন।

: মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বোম্বাই-এ আয়োজিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (আগস্ট ২৯ সেপ্টেম্বর-১) আলোচনা।

: অক্টোবর—বেনারস জেলে সুশীল লাহিড়ির ফাঁসি।

: ইন্ডিয়া ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের প্রতিষ্ঠা—উদ্যোগী ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্তামণি, শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, স্যর দীনশা ওয়াচা, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রমুখ নরমপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ—এরা মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টকে স্বাগত জানিয়েছিলেন।

: মাদ্রাজে প্রথম ট্রেড ইউনিয়ন গঠিত।

: ডিসেম্বর ২৬-৩১—দিল্লিতে ৩৩তম জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশন—সভাপতি মদনমোহন মালব্য-অধিবেশনে মন্টেগু চেমসফোর্ড রিপোর্টের কঠোর সমালোচনা।

১৯১৯ : সূর্যসেন চট্টগ্রামে বিপ্লবী দল গঠন করেন।

: জানুয়ারি ১—সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলনের উদ্বোধন করেন অ্যানি বেশান্ত।

: রাওলাট বিল প্রকাশ।

: আন্দামান সেলুলার জেলে তিন মাস অনশনের পর পণ্ডিত রামরক্ষার মৃত্যু।

: ফেব্রুয়ারি ২১—রাওলাট কমিটির সুপারিশ আইন হিসাবে গৃহীত।

: মার্চ ১৮—প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় আইন সভায় রাওলাট বিল গৃহীত হওয়ায়, আইনসভা থেকে পদত্যাগ করেন মদনমোহন মালব্য, মহম্মদ আলি জিন্না এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদত্ত শুক্ল।

: মার্চ ২৪—রাওলাট আইন জারির-প্রতিবাদে গান্ধীর ২৪ ঘন্টা অনশন।

: এপ্রিল ৬—রাওলাট আইনের প্রতিবাদে গান্ধীর আহ্বানে সারা ভারতে হরতাল পালিত।

: এপ্রিল-১২ — জেনারেল ও'ডায়ার অমৃতসরের শাসনভার গ্রহণ।

: এপ্রিল-১৩—অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ড। সৈফুদ্দিন কিচলু ও সত্যপালের গ্রেপ্তার ও বহিষ্কারের প্রতিবাদে বিক্ষোভরত নিরস্ত্র জনগণের ওপর নির্মমভাবে গুলি চালনা। গুলিতে নিহতের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আহত দু'হাজার। এই বীভৎস ও নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গে জেনারেল ও'ডায়ার কার্ফ্যু জারি করে, যাতে কোনরকম সাহায্য না এসে পৌছয়। আহতদের চিকিৎসার সুযোগ না ঘটে। সামরিক

আইন জারি করে ব্যাপক গ্রেপ্তার শুরু হয়ে যায়। অমৃতসরের ঘটনা সরকারি কঠোরতা সত্ত্বেও চারদিকে লোকমুখে ছড়িয়ে পড়ে। মুম্বাই কলকাতা, মাদ্রাজ, কানপুর—এই সব শিল্পশহরগুলিতে ব্রিটিশ বিরোধী বিক্ষোভ ও শোভাযাত্রা ভয়ঙ্কর রূপ পায়। অমৃতসর, লাহোর ও গুজরানওয়ালায় পরিস্থিতি অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই বিক্ষোভ ও হরতালে শ্রমিক শ্রেণি বিশেষ ভূমিকা নেয়। কংগ্রেস আত্মমর্যাদা উদ্ধারে এগিয়ে আসে—গঠন করে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস।

: এপ্রিল ১৪—সমগ্র পঞ্জাবে আগুন জ্বলে ওঠে। বিক্ষুব্ধ জনগণ গুজরানওয়ালা রেলস্টেশন ও সরকারি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেয়।

: এপ্রিল ১৫—লাহোরে সামরিক আইন জারি।

: এপ্রিল ২১—বোম্বাই-এ বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশন।

: এপ্রিল ২৬—বেঞ্জামিন হর্নিম্যান ইংলন্ডে নির্বাসিত। তিনি ছিলেন বোম্বাই ক্রনিকালের সম্পাদক।

: মে ১১—হোমরুল সভাপতি পদ থেকে অ্যানি বেশান্তের পদত্যাগ।

: মে-২৭—জালিয়ানওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথের নাইট উপাধি ত্যাগ।

: অক্টোবর ১৭ — দেশজুড়ে খিলাফত দিবস পালিত।

: ডিসেম্বর ২৭-৩০ — মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে অমৃতসরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ৩৪তম অধিবেশন।

TAGORE RENOUNCES KNIGHTHOOD

Sir Rabindranath Tagore informs us that he has sent the following letter to the Viceroy :

Your Excellency,—The enormity of the measures taken by the Government in the Punjab for quelling some local disturbances has with a rude shock revealed to our minds the helplessness of our position as British subjects in India. The disproportionate severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out, we are convinced, are without parallel in the history of civilised governments, barring some conspicuous exceptions, recent and remote. Considering that such treatment has been meted out to a population disarmed and resourceless, by a power which has the most terribly efficient organisation for destruction of human lives, we must strongly assert that it can claim no political expediency, far less moral justification. The accounts of insults and sufferings undergone by our brothers in the Punjab have trickled through the gagged silence reaching through to every corner in India, and the universal agony of indignation roused in the hearts of our people has been ignored by our rulers – possibly congratulating themselves for imparting what they imagine as salutary lessons. This callousness has been praised by most of the Anglo-Indian papers, which have in some cases gone to the brutal length of making fun of our sufferings, without receiving the least check from the same authority, relent-lessly careful in smothering every cry of pain and expression of judgement from the organs representing the sufferers. Knowing that our appeals have

been in vain and that the passion of vengeance is blinding the noble vision of statesmanship in our Government, which could so easily afford to be magnanimous, as befitting its physical strength and moral tradition, the very least that I can do for my country is to take all consequences upon myself in giving voice to the protest of the millions of my countrymen surprised into a dumb anguish of terror. The time has come when badges of honour make our shame glaring in their incongruous context of humiliation, and I for my part wish to stand shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance are liable to suffer a degradation not fit for human beings. And these are the reasons which have painfully compelled me to ask Your Excellency, with due deference and regret, to relieve me of my title of Knighthood, which I had the honour to accept from His Majesty the King at the hands of your predecessor, for whose nobleness of heart I still entertain great admiration,–Yours faithfully,
RABINDRANATH TAGORE.

The Statesman, June 3, 1919

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট-১

রা জ না রা য় ণ ব সু র চি ত

এই অনুষ্ঠান পত্রখানির ভিত্তিতে জাতীয় মেলার প্রতিষ্ঠিত হয় :

A Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal

Now the European ideas have penetrated Bengal, the Bengalee mind has been moved from the sleep of ages. A restless fermentation is going on in Bengalee Society. A desire for change and progress is everywhere visible. People discontented with old customs and institutions are panting for reform. Already a band of young men have expessed a desire to sever themselves at once from Hindu Society and renounce even the Hindu name. It is to be feared that the tide of revolution may sweep away whatever good we have inherited from our ancestors. To prevent this catastrophe and to give a national shape to reforms, it is proposed that a Society be established by the influential members of native society for the promotion of national feeling among the educated natives of Bengal. Without due cultivation of national feeling, no nation can be eventually great. This is a fact testified to by all history.

The Nationality Promotion Society shall first of all use their best endeavours to revive the national gymnastic exercises. Half a century ago, there was a gymnasium in almost every village. This old practice should be again brought into life. The remark, lately made by our Excellency the Governor General on seeing the boys of a Vernacular School at Ooterparah, to the effect, that the rising generation of Bengalees is not so strong and able-bodied as the previous one, is quite true. The cause of it is the too great importance attached now-a-days to bookish education in neglect of physical. The consequences are want of energy, a sickly habit of body, and premature old age and death. Many a young man after shining at college has broken down early and proved a regular incapable in after life. The Nationality Promotion Society shall publish tracts in Bengalee on the importance of physical education with special reference to its prevalence in ancient times, quoting passages from Sanskrit books in proof of such prevalence, and shall afford pecuniary aid to gymnasia established in the most important places in Bengal, where Hindu gymnastics will be taught. The Society will also publish tracts in Bengalee, giving, by instances quoted from the ancient history of the country, proofs of the military prowess of the ancient Bengalees, and mentioning isolated instances of the existence of such prowess in modern Bengalees also, such as the celebrated "fighting Moonsiff" who figured in the late Sepoy Rebellion on behalf of the English. The Nationality Promotion Society shall take into consideration in connection with this subject that of the best means of improving the present very weak and innutritious diet of the Bengalee, which has in fact deteriorated from that of former generations.

The Nationality Promotion Society shall establish a Model School for instruction in Hindu music. Every nation has its music. It is to be regretted that the majority of the educated natives of India neither cultivate European nor native music. If they have any taste for music they have a little for the rude one of Jattras. The writer of this article recollects the cultivation of Hindu Music having been general in his infancy. Now little attention is paid to it by the general mass of educated natives. It will be the duty of the Society to establish a Hindu Musical School and cause such songs to be sung by its students as have a moral scope and have a tendency to infuse partriotism and martial enthusiasm into the heart.

The Nationality Promotion Society shall also establish a school of Hindu Medicine, where Hindu Materia Medica, and practice of physic will be taught freed from the error and absurdities that disfigure them. There are many excellent Hindu medicines which have been found to be very efficacious in some severe disorders. It is to be highly regretted that the knowledge of such medicines is being lost. It would have indicated want of foresight on the part of Providence, if India, so rich in every other thing, could not have produced medicinal herbs calculated to heal the diseases of its inhabitants. The hopes, that were formed of the graduates of the Medical College enriching English Pharmacopoea with Hindu Medicines, after due trial and experiment have proved vain. The Nationality Promotion Society shall endeavour to fulfil such expectations. The teacher of the proposed Hindu School of Medicine should be one who is acquainted with both English and Hindu medical sciences.

The Nationality Promotion Society will publish in the Bengalee the results of the researches of the Sanskrit scholars of Europe in the department of Indian Antiquities giving special prominence to their descriptions of prosperity and glory of ancient India, physical, intellectual, moral, social, political, literary and scientific. It will collect and publish both in English and Bengalee testimonies in favour of native character. It will publish in those languages tracts containing the panegyrics pronounced by European writers on the merits of the people of ancient and modern India. It will also publish in the Bengalee, biographies of the illustrious men of Ancient and Modern India, especially of Bengal, containing translations of the eulogiums pronounced upon them by European writers.

The Nationality Promotion Society shall afford every encouragement in their power to the cultivation of Sanskrit. It shall patronize the publication of important Sanskrit works, co-operating with the Asiatic Society of Bengal in this respect and shall offer pecuniary rewards or panegyrical addresses to the best Sanskrit scholars of Bengal.

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon it members to ground the knowledge of their sons in their mother-tongue before giving them an English education. Education both in Bengalee and English, if carried on simultaneously, does great injury to the Bengalee education of a student, as he pays greater attention to the English than to the Bengalee language Even for the sake of English education, we should ground our children's knowledge in their mother-tongue, before setting them to learn English. If a boy, after studying the Bengalee for six or seven years, study English, he makes rapid progress in the last mentiond language, and gets clearer ideas of what he reads in it than he would otherwise have done. Vernacular Scholarship-holders are found by experience to

be the best boys in an English school. Any man who has the least patriotic feeling will not neglect to ground his sons in their mother-tongue first of all before giving them an English education.

The Nationality Promotion Society shall try its best to prevent the daily increasing corruption of the colloquial language of the educated natives who mix, in common conversation, English words with Bengalee in the most ridiculous manner imaginable. An idea which can be easily expessed in the Bengalee, they express by an English word. Southey says in his essay on style : "Ours is a noble language, a beautiful language. I can tolerate a Germanism for family sake; but he who uses a Latin or a French phrase where a pure old English word does as well, ought to be hung, drawn and quartered for high treason against his mother-tongue." If our educated natives had a tittle of such patriotic love for their mother-tongue, they would not commit such gross violations of propriety and taste in their common conversation as they are at present observed to do. The poverty of the Bengalee is no excuse as such poverty is not real but imaginary. The Bengalee language has of late been much enriched by the exertions of some of the educated natives whose names will be held in grateful remembrance by posterity. Even if the Bengalee were really a poor unfurnished language, it would be the duty of every patriot to improve it by constant use of it in a pure form in conversation. It must be admitted that it is impossible to avoid using English words to express particular scientific ideas, particular posts and offices, certain public buildings, particular furniture, etc., etc., for which there are no equivalents to the Bengalee language. We would be quite unintelligible if we use new coined Bengalee equivalents or such as have not come into common use in order to express the above ideas,* but it is quite unpardonable on the part of an educated native to express in English what he can easily do in the Bengalee. He should speak either pure Bengalee or pure English, but he should not jumble up both the languages. At present the colloquial language of the educated natives is a *lingua franca,* a most corrupt jargon, shocking, though we are unconscious of the same, to men of sense and good taste and reflecting great disgrace on us as a nation. An European gentleman would laugh to hear our conversation. Our written language is receiving daily improvements, but it is to be regretted that our colloquial language is so much neglected. No nation can make rapid strides in the path of progress unless they possess a highly developed language fit to answer all the requirements of conversation or writing. The Revd. Mr. Richards in his address to the University of Madras, says : "Gentlemen let me say there is but little hope of a nation, until it has some sense of nationality ; and nationality without a national language, which is the free spontaneous outcome of the national mind, is a delusion. Probably, the best index to the growth of a people is growth and development of its language. Moreover, there is an interchange of cause and effect; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism. I appeal to you on behalf of your mother-toungue; it is well worthy your regard."

* Persian words that have been naturalized into the Bengalee language and for which common unpedantic pure Bengalee words cannot be substituted should of course be considered as Bengalee words.

The Nationality Promotion Society shall make it binding upon its members to correspond with each other in the Bengalee. The Members of no nation correspond with each other in a foreign language. No English man for instance would correspond with another in French or German. Why should educated natives then insult their mother-tongue by writing letters to each other in English? Is our language so poor as to render it too difficult for one to write a common letter in it? It is excusable, nay more, it is proper, on the part of youths studying English, or even those who have recently left College to correspond with each other in English for the sake of acquiring proficiency in English writing ; but it is not at all proper on the part of elderly people to do so. Business letters that require to be written in English should of course be written in that language.

The Nationality Promotion Society shall endeavour to prevail upon their countrymen to hold in the Bengalee language the proceedings of such societies as do not require the co-operation of Englishmen, and are exclusively composed of Bengalees, or have note as their object the improvement of youth in English speaking or writing. If it be necessary to publish such proceedings for the information of Government and the European public, they can be translaed into English for the purpose. Although the time is not yet ripe for the change, the Nationality Promotion Society shall from this time endeavour to impress upon the minds of their countrymen, the impropriety on the part of an educated native of delivering at public meetings, speeches addressed to his countrymen in English or of writing pamphlets so addressed in that language. An Englishman, for instance, would not address his countrymen in French and German.[1] It must be submitted that reformers and public agitators are obliged to address their educated countrymen in English, or else they do not obtain a hearing from the majority of them, such is their fondness for everything English and aversion towards everything Bengalee ; but it is expected that the good sense of our educated countrymen would gradually allow this practice to fall into disuse. The writer of this article regrets the prevalence of Anglo-Mania in his time which has obliged him to initiate a movement in favour of his mother-tongue by addressing his educated countrymen in English.

No reform is accepted by nation unless it comes in a national shape. The Nationality Promotion Society will not initiate or take an active part in social reformation—as such reformation is not its principal end or aim—but will aid it by rousing national feelings in its favour. Men naturally look to the past for sanction for their acts and nothing aids reformation so much as a former national precedent. The Nationality Promotion Society shall therefore publish tracts in the Bengalee containing proofs of the existence of liberal and enlightened customs in Ancient India, such as female education, personal liberty of females, marriage by election of the bride, marriage at adult age, widow-marriage, inter-marriage, and voyage to distant countries. It will try to introduce such foreign customs into educated society as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members such as that of holding festivities in honour of men of genius as is done amongst European nations. The Nationality Promotion Society will not

1. Periodicals for the discussion of political subject and pamphlets intended for the perusal of both Europeans and natives, or of the natives of the different presidencies should of course be written in English.

resist the introduction of good foreign customs into educated native society, as that would be a bar to all improvement; but will try to give if possible to foreign customs already introduced a national shape. It has for instance become almost a custom among the educated natives to congratulate each other on the occasion of the New Year's day. The Nationality Promotion Society will endeavour to induce them to offer such congratulation to each other on the occasion of our New Year's day, the 1st of Bysakh. It will use its best endeavours to prevent the introduction of pernicious foreign customs such as that of drunkenness. It will attempt to prevent the falling into abeyance of the good old customs of our country. There is for instance a custom prevalent in our country of sisters making affectionate presents to brothers on a certain day of the year. It would be a great loss if the tie of revolution sweep away such beautiful customs as the our above-mentioned. No one can object to the Bhratriditya if freed from the superstitious observances that accompany it. The Nationality Promotion Society shall, in a few words, try firstly, to prevent the introduction of evil foreign customs into educated native community; secondly, to introduce such foregin customs as have a tendency to infuse national feeling into the minds of its members; thirdly, to give, if possible, to foreign customs already introduced a national shape, fourthly, to aid social reformation by acting old precedents in its favour ; and fifthly, to prevent the abolition of such old customs of the country as are beneficial in their nature.[1]

The Nationality Promotion Society will not overlook even such trifling points as the regulation of etiquette, with a view to give a national shape to the same. It would be impossible to abolish all foreign modes of etiquette that have crept into educated native society, nor is it desirable to do so. Such cordial usages as the hearty hand-shake, some thing similar to which has, by the by, prevailed among our countrymen of the North-West, from a remote antiquity, as is evidenced by the Sanskrit plays, but the members of the Nationality Promotion Society shall give the preference to our national *namuskar* and *pranam* on all occasions on which it is practicable to do so.

With regard to dress, the Nationality Promotion Society need not direct its attention to that subject, as the educated natives have already adopted a mode which is not strictly European. This has been as required by the demands of nationality. If we at all imitate other nations, we should not do so slavishly. We should chalk out a path of our own. We should follow the same principle in the improvement of the dress of our women.

With regard to diet, the educated natives belonging to the higher classes of Society have adopted a mode of living that cannot be called *exclusively* European. It cannot be oherwise. The European mode of living is quite unsuited to the people of this country. Those educated natives who adopted an exclusively European mode of living were obliged by ill health in the course of a few years to resume the native or to modify the former. Those who have adoped a partly European mode of living will find it beneficial to Indianize it still further. The Nationality Promotion Society will direct their attention to this point, as well as to the diet of the majority of the educated natives which is in fact deteriorated as has been

1. There would be no hindrance on the part of a Member of the Nationality Promotion Society, to be a Member of a Social Reformation Society, the rullers of which do not require him to surrender his nationality.

observed before from that of our ancestors. Anent this subject, we may observe that it would be the duty of the Nationality Promotion Society to reprobate the practice of frequenting European hotels so common among our educated countrymen. This practice shows a greedy hankering after European food, and demeans us in the eyes of foreigners. It must appear ridiculous in the eyes of all Europeans, except hotel-keepers.

With regard to dramatic entertainments the Nationality Promotion Society need not direct its attention to the same, as the educated natives of Bengal are already adopting a national plan of such amusements. They do not, like the Parsees of Bombay, act English plays, but do so Bengalee dramatic compositions on the English plan. This is as it should be. For carving out our nationality, we should adopt the principle of adaptation in other things as we have done in this.

An attempt to shew that the religion of our ancestors contains much that is worthy of respect as well as union to represent political grievances to Government are calculated to promote national feeling ; but the Nationality Promotion Society will not take measures for the same as there are separate associations, namely, the Brahmo Somaj and the British Indian Association, established solely for the purposes above-mentioned. It will abstain from the agitation of religious and political subjects.

The above Scheme of a Society for the promotion of National feelings among the educated natives of Bengal is of course subject to modifications by the public.

It would be unreasonable to expect that such a Society would prove to be the cause of every national feeling. Its main object would be to promote and foster national feelings which would lead to the formation of a national character and thereby to the eventual promotion of the prosperity of the nation.

Such movements as the establishment of a Society like the one proposed should originate in the metropolis. People of the Mofussil as is the case in every country follow suit in everything with those of the metropolis.

It is intended to publish a translation of this article in Bengalee in the form of a pamphlet[1] and circulate it among the mass of our countrymen.

১. উমেশচন্দ্র দত্ত বাংলা ভাষায় এই অনুষ্ঠান-পত্রখানির অনুবাদ করেন।

শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব

"........ আমি ইংরাজী ১৮৬৬ সালে "Prospectus of a Society for the Promotion of National Feeling among the Educated Natives of Bengal." আখ্যা দিয়া ইংরাজিতে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করি। তাহার অনুবাদ "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব" নামে এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। উক্ত অনুবাদ কার্য আমার পরমপ্রিয় আত্মীয় ও সম্পর্কীয় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। এই প্রস্তাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়া বান্ধববর শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহাশয় হিন্দুমেলা ও জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন।"— দেওঘর, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ব্রাহ্ম সম্বৎ। রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ প্রথম খণ্ড।

অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চির নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। নব্য-সম্প্রদায় প্রাচীন রীতি-পদ্ধতিতে বীতরাগ হইয়া সমাজ সংস্করণার্থ একান্ত উৎসুক হইতেছেন। ইতিমধ্যেই একদল যুবক হিন্দুসমাজ হইতে এককালে বিচ্ছিন্ন হইতে এবং হিন্দু নাম পর্যন্ত পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজ সংস্কার সকল জাতীয় আকার ধারণ করে, তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভা সংস্থাপন করুন। জাতীয় গৌরবেচ্ছার উন্মেষণ ব্যতীত কোন জাতি মহত্ত্ব লাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

জাতীয় ব্যায়াম চর্চার পুনরুদ্দীপনার্থ সর্বতোভাবে চেষ্টা করা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সর্বপ্রথম কার্য হইবে। অর্ধ শতাব্দীর পূর্বে প্রায় প্রতি গ্রামে এক একটি ব্যায়ামশালা ছিল। এই প্রাচীন প্রথাটি পুনঃ প্রবর্তিত করা কর্তব্য। কিয়দ্দিন গত হইল, আমাদিগের ভূতপূর্ব মহিমান্বিত গবর্ণর জেনারেল স্যর্ জন লরেন্স্ বাহাদুর উত্তরপাড়ার বঙ্গবিদ্যালয়ের বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া বলেন 'নবীন বঙ্গসন্তানেরা প্রাচীনদিগের ন্যায় বলিষ্ঠ ও দৃঢ়কায় নহে" বস্তুতঃ এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। আজি কালি ব্যায়ামের প্রতি বিরাগ এবং পুস্তকাধ্যয়নের প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগই ইহার কারণ। নির্বীর্যতা, চিররুগ্ণতা, অকালবার্ধক্য এবং অকাল-মৃত্যু ইহার ফল। অনেক যুবক বিদ্যালয়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ হইয়া অচিরাৎ ভগ্নশরীর হইয়াছেন এবং চিরজীবনের জন্য অকর্মন্য হইয়া পড়িয়াছেন। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, প্রাচীন কালে ব্যায়ামচর্চার কতদূর প্রাদুর্ভাব ছিল বিশেষরূপে উল্লেখ করিয়া ও তৎপ্রমাণার্থ সংস্কৃত শাস্ত্র হইতে বচন সকল উদ্ধৃত করিয়া ব্যায়াম চর্চার আবশ্যকতা বিষয়ক পুস্তকসকল, বঙ্গভাষায় প্রচার করিবেন এবং হিন্দুব্যায়াম শিক্ষার্থ বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান স্থানে যে সকল ব্যায়ামশালা স্থাপিত হইবে তাহাতে অর্থ সাহায্য প্রদান করিবেন। এই সভা প্রাচীন বাঙালিদিগের সামরিক প্রভাবের দৃষ্টান্তসকলও দেশের প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতে সঙ্কলন করিয়া বাংলা পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন এবং বর্তমানকালীন বঙ্গবাসিদিগের মধ্যে যে এরূপ উদাহরণের অসদ্ভাব নাই তৎপ্রমাণার্থ গত সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের প্রসিদ্ধ সমরোৎসাহী মুন্‌সেফের দৃষ্টান্তের ন্যায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শন করিবেন। এই প্রসঙ্গে বাঙালিদিগের বর্তমান খাদ্য পূর্বাপেক্ষা কতদূর নিকৃষ্ট হইয়াছে, তাহা পূর্বকার বাঙালিদিগের আহার অপেক্ষা কত অসার এবং অপুষ্টিকর ও তাহার উৎকর্ষ সাধনের প্রকৃষ্ট উপায় কি, তাহাও আলোচনা করা আবশ্যক।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা হিন্দু তৌর্যত্রিক বিদ্যাশিক্ষার্থ একটি আদর্শ বিদ্যালয় সংস্থাপন করিবেন। প্রত্যেক জাতিরই তৌর্যত্রিক আছে। এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের অধিকাংশ দেশীয় বা ইউরোপীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের আলোচনা করেন না ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়। তাহাদিগের যে-কিছু সঙ্গীতানুরাগ, অসভ্য যাত্রাদিতে প্রদর্শিত হয়। এতদ্দেশে সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল, আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। এ বিষয়ে বর্তমান কৃতবিদ্যগণ অত্যল্প মনোযোগী। এই সভা একটি হিন্দু তৌর্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ছাত্রগণকে এরূপ সঙ্গীত শিক্ষা দিবেনে যদ্দ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং অন্তঃকরণে দেশহিতৈষিতা ও সমরানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা একটি হিন্দু চিকিৎসা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিবেন। সেখানে ভারতবর্ষ জাত ভৈষজ্য দ্রব্যের গুণ ও ভেষজ প্রস্তুতকরণ বিদ্যা অধীত হইবে। এমত অনেক হিন্দু ঔষধ আছে যদ্দ্বারা দুরারোগ্য রোগ সকল আরোগ্য হইয়াছে। ভারতবর্ষ সকল বিষয়ে রত্নগর্ভা হইয়া ইহার সন্তানদিগের রোগনিবারণোপযোগী ঔষধ উৎপাদন করিতে পারেন না, এরূপ হইলে সর্বজ্ঞ পরমেশ্বরের প্রতি অদূরদর্শিতা-দোষস্পর্শ হয়। মেডিকেল কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্রেরা বিশেষ আলোচনা ও পরীক্ষা করিয়া হিন্দু-ঔষধ দ্বারায় ইংরাজি চিকিৎসাশাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিবেন বলিয়া আমাদিগের যে আশা ছিল তাহা বিফল হইয়াছে। এই আশা পূরণ করিবার নিমিত্ত বর্তমান সভা সচেষ্ট হইবেন। যে ব্যক্তি ইংরাজি ও হিন্দু উভয়বিধ চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী, তিনি প্রস্তাবিত বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা পদে নিযুক্ত হইবেন।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত বিষয়ে ইউরোপীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদিগের অনুসন্ধানলব্ধ সত্যসকল বাংলা ভাষায় প্রচার করিবেন এবং ঐ সকল পণ্ডিতদিগের গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক, সামাজিক এবং রাজনীতি, সাহিত্য ও বিজ্ঞান বিষয়ক উন্নতির যে কিছু বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা বিশেষ সমাদরের সহিত স্বীয় প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকে প্রকটন করিবেন। সভা এতদ্দেশীয়দিগের সদ্গুণের প্রমাণ সকল ইংরাজি ও বাংলা ভাষায় সংগ্রহ ও প্রচার করিবেন ; প্রাচীন ও অধুনাতন ভারতবর্ষীয়দিগের সুখ্যাতি যাহা কিছু ইউরোপীয় গ্রন্থকারদিগের লেখনী হইতে বহির্গত হইয়াছে তাহা পুস্তকবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিবেন। এই সভা হইতে ভারতবর্ষের বিশেষতঃ বঙ্গদেশের প্রাচীন ও বর্তমান প্রসিদ্ধ মহাত্মাদিগের জীবনচরিত বাংলো ভাষায় প্রকাশিত হইবে।

সংস্কৃত ভাষার অনুশীলনার্থ জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা যতদূর সাধ্য উৎসাহ দান করিবেন। ইহার সভ্যেরা উৎকৃষ্ট সংস্কৃত পুস্তক সকলের প্রচার বিষয়ে সহায়তা করিবেন। এ বিষয়ে তাঁহারা বঙ্গদেশীয় আসিয়াটিক সোসাইটির সহকারিতা করিবেন এবং এতদ্দেশীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতদিগকে অর্থ পারিতোষিক এবং প্রশংসামূলক পত্রাদি প্রদান করিবেন।

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে এই নিয়ম প্রচলিত থাকিবে যে তাহাদিগের সন্তানগণের ইংরাজি শিখাইবার পূর্বে বঙ্গভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। বাংলা ও ইংরাজি যুগপৎ শিক্ষা দিলে ইংরাজির প্রতি সমধিক মনোযোগ আবশ্যক হয় সুতরাং বাংলা পাঠের ব্যাঘাত ঘটিয়া উঠে। ইংরাজি পাঠের সৌকর্যার্থেও বাংলা ভাষার প্রথম শিক্ষা আবশ্যক। যদি কোন বালক ছয় সাত বৎসর বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী শিখিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে সে অতি সত্বরে শেষোক্ত ভাষায় উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় এবং যাহা কিছু অধ্যয়ন করে, তাহার সুস্পষ্ট ভাব গ্রহণ করিতে পারে—অন্য উপায়ে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। ইংরাজি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে বাংলা ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত বালকেরা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, ইহা পরীক্ষাদ্বারা সপ্রমাণ হইয়াছে। যাহার মনে কিছুমাত্র স্বদেশানুরাগের ভাব আছে, তিনি স্বীয় সন্তানগণকে ইংরাজি

শিখাইবার পূর্বে মাতৃভাষা একটুকু ভাল করিয়া শিক্ষা না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।

এতদ্দেশীয় কৃতবিদ্যগণ কথোপকথন কালে বাংলার সহিত ইংরাজি শব্দ সকল মিশ্রিত করিয়া হাস্যাস্পদ হইয়া থাকেন, দিন দিন এইরূপ ভাষা বিকৃতি বৃদ্ধি হইতেছে, জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা ইহার নিবারণার্থ সাধ্যমত চেষ্টা করিবেন। যে ভাব বাংলা ভাষায় সহজে ব্যক্ত হয় তাহা তাহারা ইংরাজিতে প্রকাশ করেন। সদি নামক ইংরাজি গ্রন্থকর্তা রচনা-প্রণালী বিষয়ে একটি প্রস্তাব লেখেন তাহাতে বলিয়াছেন, আমাদের ভাষা অতি উৎকৃষ্ট—অতিসুন্দর ভাষা। ইংরাজির সহিত জর্মন ভাষার অতি নিকট সম্বন্ধ অনুরোধে দুই একটি জর্মন শব্দ ব্যবহার সহ্য করিতে পারি, কিন্তু যেখানে বিশুদ্ধ সহজ ইংরাজি শব্দের দ্বারায় মনের ভাব ব্যক্ত হইতে পারে, সেখানে যিনি লাটিন বা ফরাসিয় কথা ব্যবহার করেন, মাতৃভাষার বিষম বিদ্রোহী বলিয়া তাহাকে প্রথমে ফাঁসি দিয়া তাহার পর তাহার শরীর খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলা উচিত।" এতদ্দেশীয় শিক্ষিতদিগের মধ্যে যদি এ প্রকার স্বদেশ-ভাষানুরাগের অণুমাত্র ভাব থাকিত, তাহা হইলে তাহারা এক্ষণে কথোপকথন সময় যে প্রকার ভয়ানক অসঙ্গত ও সভ্যরুচি-বিরুদ্ধ আচরণ করেন তাহা কখনই করিতেন না। "বাংলা ভাষায় শব্দের অনটন" কোন কাজের কথা নহে, সে অনটন বাস্তবিক নহে—তাহা কাল্পনিক। কিছুদিন হইল কতকগুলি দেশীয় কৃতবিদ্য মহাত্মাদিগের যত্নে বাংলা ভাষার যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছে ; ভাবী বংশীয়দিগের নিকট ইহারা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। যদি বাংলা ভাষা সত্য সত্যই হীন ও অসম্পূর্ণ অবস্থায় থাকে, সর্বদা বিশুদ্ধ প্রয়োগ সহকারে কথোপকথন দ্বারায় তাহার উন্নতিসাধন করা প্রত্যেক দেশহিতৈষী ব্যক্তির কর্তব্য। কোন কোন বৈজ্ঞানিক ভাব, বিশেষ বিশেষ পদ ও কার্যালয়ের নাম ও কোন কোন গৃহোপকরণ প্রভৃতির নামোল্লেখ করিতে হইলে ইংরাজি শব্দ অপরিহার্য, কারণ তাহাদের বাংলা নাম কিছুই নাই। এরূপস্থলে স্ব-কপোল-কল্পিত নূতন বাংলা শব্দ অথবা অপ্রচলিত শব্দ ব্যবহার করিলে কেহ আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন না।[১] কিন্তু যেখানে বাংলা ভাষায় মনের ভাব সহজে ব্যক্ত হয়, সেখানে ইংরাজি ভাষা ব্যবহার করা শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে অমার্জনীয় দোষ। হয় তিনি বিশুদ্ধ ইংরাজি নয় বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করুন, কিন্তু এই উভয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া যেন গোলযোগ না করেন। শিক্ষিতদিগের বর্তমান কথোপকথনের ভাষা অতি বিকলাঙ্গ ভাষা—অতি বিকৃত অপভাষা এবং আমরা অনুধাবন করি আর না করি, ইহা জ্ঞানী ও সুরুচিসম্পন্ন সভ্যদেশের লোকদিগের নিকট নিতান্ত ঘৃণার্হ ও আমাদিগের জাতি সাধারণ লজ্জাসূচক। আমাদিগের কথাবার্তা শুনিলে ইউরোপীয় কোন ভদ্রলোক হাস্য না করিয়া থাকিতে পারেন না; আমাদিগের লিখিত ভাষা দৈনন্দিন উন্নতিলাভ করিতেছে, কিন্তু কথোপকথনের ভাষার প্রতি আমাদিগের নিতান্ত অনাদর ইহা অত্যন্ত ক্ষোভের বিষয় বলিতে হইবে। যতদিন কোন জাতি কথোপকথন ও রচনার সম্পূর্ণরূপে উপযোগী উন্নত ভাষার অধিকারী না হন, ততদিন সে জাতি উন্নতির পথে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারে না। রেবরেণ্ড রিচার্ড সাহেব মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতাকালে বলিয়াছিলেন "মহোদয়গণ! যে পর্যন্ত জাতীয় গৌরবেচ্ছার সঞ্চার না হয়, সে পর্যন্ত কোন জাতির, জাতি-প্রতিষ্ঠালাভ করিবার আশা নাই; জাতীয় ভাষা জাতীয় মনোবৃত্তির স্বাভাবিক নিদর্শন, তাহার উন্নতি ব্যতীত জাতীয় গৌরবসাধন মনের ভ্রান্তি মাত্র। কোন জাতির উন্নতি পরীক্ষা করিতে হইলে তদীয় ভাষা তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। অধিকন্তু কার্যকারণের পরস্পর সহকারিতা আছে, কোন জাতির স্বাভাবিক নিয়মে ভাষোন্নতির উপায় করিয়া দাও, তাহা হইলেই তাহার স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ হইবে এবং

---

১. যে সকল পারস্য শব্দ বাংলা ভাষার অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে ও যাহার অর্থ কঠিন সাধুভাষা শব্দ ব্যতীত সহজ শব্দে প্রকাশ করা যায় না, সে সকল শব্দ ব্যবহার করিতে হানি নাই।

ক্রমে জাতীয় চরিত্র নির্মাণোপযোগী অন্যান্য গুণও সমুৎপন্ন হইবে। হে কৃতবিদ্যগণ! প্রকৃত স্বদেশ হিতৈষিতা প্রদর্শন করুন। আপনাদিগের মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থ আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, এ বিষয়ে সমুচিত মনোযোগ প্রদান করা আপনাদিগের কর্তব্য।[১]

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার সভ্যগণের মধ্যে আর একটি বিষয় প্রচলিত থাকিবে। সে নিয়ম এই যে তাহারা বাংলা ভাষায় পরস্পরকে পত্রাদি লেখেন। কোন জাতির লোকে পরস্পরকে বিজাতীয় ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। ইংরাজেরা পরস্পর পরস্পরকে ফরাসি বা জর্মন্ ভাষায় পত্রাদি লেখেন না। তবে এতদ্দেশীয় শিক্ষিতগণ পরস্পর পরস্পরকে ইংরাজি ভাষায় পত্র লিখিয়া কেন মাতৃভাষায় অবমাননা করেন? আমাদিগের ভাষা কি এত দীন যে তাহাতে কোন ব্যক্তি একখানি সামান্য পত্রও লিখিতে পারেন না? যে সকল যুবক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন অথবা সম্প্রতি বিদ্যালয় ছাড়িয়াছেন ইংরাজি লিখনে নৈপুণ্য লাভের নিমিত্ত পরস্পরের সহিত ইংরাজিতে পত্রাদি লেখা তাহাদিগের পক্ষে নিন্দনীয় নহে বরং তাহা আবশ্যকও বলা যায়, কিন্তু বয়স্ক ব্যক্তিদিগের পক্ষে এরূপ করা উচিত নহে। বিষয়কর্ম ঘটিত যে সকল লিপি ইংরাজিতে লেখা আবশ্যক, তাহাই কেবল ইংরাজিতে লেখা কর্তব্য।

যে সকল সভায় ইংরাজদিগের সহকারিতার আবশ্যকতা নাই এবং যাহার সকল সভ্য বাঙালি, অথবা যুবকদিগের ইংরাজি লিখন ও কথনে নৈপুণ্যলাভ যাহার উদ্দেশ্য নয়, তাহার কার্য বাংলা ভাষায় সম্পন্ন করিবার জন্য এই সভার সভ্যেরা দেশিয় লোকদিগের প্রবৃত্ত করিতে যত্নশীল হইবেন। যদি তাহার কার্যবিবরণ গবর্ণমেন্ট বা ইউরোপীয় সমাজকে অবগত করা আবশ্যক হয়, প্রয়োজনমত ইংরাজিতে তাহা অনুবাদিত হইতে পারে।

কোন শিক্ষিত ব্যক্তির পক্ষে স্বদেশিয় লোকদিগের সমক্ষে ইংরাজিতে বক্তৃতা করা অথবা তাহাদিগকে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য ইংরাজিতে লিখিয়া প্রকাশ করা যে অসঙ্গত, এই সভার সভ্যেরা তাহা স্বদেশীয় লোকদিগকে হৃদয়ঙ্গম কবিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন। একজন ইংরাজ কি ফরাসি কি জর্মন ভাষার বক্তৃতা অথবা ঐ ভাষায় লিখিত পুস্তক দ্বারা স্বদেশীয় লোকদিগকে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন না।[২] দেশিয় শিক্ষিতগণের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তির ইংরাজি ভাষার প্রতি এরূপ অনুরাগ এবং বাংলার প্রতি এরূপ বিরাগ যে, সমাজ সংস্কারক এবং সাধারণ হিতকর বিষয়ের আন্দোলনকারিগণ ইংরাজিতে বক্তৃতা করিতে বাধিত হন, নতুবা অধিকসংখ্যক শ্রোতা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু আমাদিগের দেশীয় শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ সদ্বিবেচনা লাভ করিয়া ক্রমশঃ ঐ অনুরাগ পরিত্যাগ করিবেন আশা হইতেছে। এই প্রস্তাব-লেখক তাহার সময়ে ইংরেজানুকরণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া দুঃখিত হইতেছেন এবং মাতৃভাষায় উন্নতি সাধনের জন্য আন্দোলন করিতে গিয়াও শিক্ষিতদিগকে ইংরাজিতে এই প্রবন্ধ লিখিয়া আপনার অভিপ্রায় জ্ঞাপন

১. Genglemen let me say there is but little hope of a nation until it has some sense of nationality and nationality without a national language, which is the free spontaneous outcome of national mind, is a delusion. Probably, the best index to the growth of a people is the growth and development of its Language, Moreover there is an interchange of cause and effect ; help a people to develop their language in accordance with its own laws and you help them to acquire freedom of thought, and so gradually the other habits which are necessary to the formation of national character. I appeal then to your patriotism. I appeal to you on behalf of your mother tongue ; it is well worthy your regrad.

২. রাজকার্য আলোচনা জন্য সম্বাদপত্র অথবা যে সকল পুস্তক উভয় ইংরাজ ও এতদ্দেশীয় লোক অথবা ভারতবর্ষস্থ ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় লোকের পাঠের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ইংরাজিতে লেখা কর্তব্য।

করিতে বাধ্য হইতেছেন।

কোন সমাজ সংস্কার জাতীয় আকারে পরিণত না হইলে কোন জাতি তাহা অবলম্বন করেন না। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা কোন সমাজ সংস্কারের প্রবর্তক বা বিশেষ সহযোগী হইবেন না—তাহা ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য নহে—কিন্তু তাহার অনুকূলে জাতীয়ভাব রক্ষা করিয়া সাহায্য দানে বিরত হইবে না। মনুষ্যেরা স্বভাবতঃ আপনাদিগের কার্যে পোষকতা পাইবার জন্য ভূতকালের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, সুতরাং গতকালের উদাহরণ দ্বারা সমাজ সংস্কারের যেরূপ সাহায্য হয়, এরূপ অন্য কিছুতেই নহে। গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা বাংলা ভাষার এরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন যাহাতে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, স্বয়ম্বর বিবাহ, পূর্ণবয়সে বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি উদার ও সভ্য প্রথা প্রচলিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

যে সকল বিজাতীয় প্রথাদ্বারা সভ্যগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সমুত্তেজিত হয়, তৎপ্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইউরোপীয়েরা যেমন পরলোকপ্রাপ্ত অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিগণের স্মরণার্থ উৎসব করেন, এতদ্দেশীয়দিগকে সেইরূপ করিতে সভা প্রবৃত্তি দিবেন, এ সভা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন বিদেশি উৎকৃষ্ট প্রথা প্রবর্তিত দেখিলে তাহাতে বাধা দিয়া উন্নতির ব্যাঘাত করিবেন না, কিন্তু সেই প্রবর্তিত প্রথা স্বজাতীয় আকারে পরিণত করিতে চেষ্টা করিবেন। ইংরাজি নববর্ষ উপলক্ষে পরস্পরে আনন্দ প্রকাশ করা নববর্ষে যাহাতে পরস্পরের কুশল হয় এমত বাসনা প্রকাশ করা শিক্ষিতদিগের মধ্যে একটা প্রথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা স্বজাতীয় নববর্ষের প্রথম দিন অর্থাৎ ১লা বৈশাখে সেই আনন্দ সম্ভাষণের প্রথা প্রবর্তিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। সুরাপানের ন্যায় বিষময় বিজাতীয় প্রথাসকল নিবারণার্থ সর্বতোভাবে চেষ্টা করিতে হইবে; এবং স্বজাতীয় প্রাচীন সুপ্রথাসকল অনাদৃত না হয় তাহারও উপায় করিতে হইবে। আমাদিগের একটি দেশাচার আছে, ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনে ভগিনীরা ভ্রাতাদিগকে স্নেহসূচক উপঢৌকন দিয়া থাকেন। পরিবর্তন-স্রোতে এরূপ মনোহর প্রথাসকল যদি ভাসিয়া যায়, যারপরনাই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-রীতি যদি তাহার আনুষঙ্গিক কুসংস্কারসূচক ক্রিয়াসকল বর্জিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে কেহ তাহাতে আপত্তি করিতে পারে না। এতদ্রূপ প্রথা সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য। স্থূলকথা এই, সভা প্রথমতঃ শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিজাতীয় কুপ্রথা যাহাতে প্রবর্তিত না হয়, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবেন; দ্বিতীয়তঃ যে সকল বিজাতীয় প্রথা দ্বারা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে পারে তাহার প্রবর্তন চেষ্টা করিবেন; তৃতীয়তঃ প্রবর্তিত বিজাতীয় প্রথাসকল জাতীয় আকারে পরিণত করিতে যত্নশীল হইবেন; চতুর্থতঃ পুরাকালে প্রচলিত প্রথার উদাহরণ দিয়া সমাজ সংস্কারের সাহায্য করিবেন; পঞ্চমতঃ কল্যাণকর প্রাচীন আচার ব্যবহার যাহাতে বিলুপ্ত না হয়, তাহার উপায় অবলম্বন করিবেন।[১]

জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভা, শিষ্টাচার অকিঞ্চিৎকর বিষয় বলিয়া তাহা জাতীয় আকারে পরিণত করিতে উপেক্ষা করিবেন না। শিক্ষিত সমাজে যে সকল বিদেশীয় শিষ্টাচার প্রবর্তিত হইয়াছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া সহজসাধ্য এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে। প্রণয়সূচক কর-স্পর্শ-প্রথা ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলস্থ লোকদিগের মধ্যে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে, ইহা সংস্কৃত নাটক দ্বারা সপ্রমাণ হয়। এ প্রকার প্রথা পরিত্যাজ্য নহে, কিন্তু সভা যতদূর পারেন জাতীয় প্রচলিত নমস্কার ও প্রণাম প্রথা রক্ষা করিবেন।

১. কোন সমাজ সংস্কারিণী সভার সভ্য হইতে হইলে যদি জাতীয় ভাব পরিত্যাগ করিতে না হয় ; জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কোন সভ্য সেরূপ সভার সভ্য হইতে পারেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় যে প্রকার পরিচ্ছদ অবলম্বন করিয়াছেন তাহা ঠিক ইউরোপীয় নহে, অতএব তদ্বিষয়ে গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভাকে চিন্তিত হইতে হইবে না। ইহা জাতীয় অভাব পূরণোপযোগী হইয়াছে। যদি আমাদিগকে অন্যজাতির অনুকরণ করিতে হয়, আমরা দাসবৎ করিব না। আমরা নিজে আপনাদিগের পথ নিরূপণ করিব। পরিচ্ছদ বিষয়ে আমরা এইরূপ করিয়াছি। আমাদিগের স্ত্রীজাতির পরিচ্ছদের উন্নতিসাধনেও আমরা এই নিয়মের অনুসরণ করিব। তাহা ঠিক বিলাতি রকম করিলে হইবে না।

খাদ্যের বিষয়ে উচ্চশ্রেণিস্থ বাঙালিরা যে প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন,তাহা সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নহে। এ বিষয়ে যেরূপ হওয়া উচিত তাহাই হইয়াছে। ইউরোপীয় খাদ্য এদেশীয়দিগের পক্ষে সহ্য হইবার নহে। যে সকল ব্যক্তি সম্যক্‌রূপে ইউরোপীয়-খাদ্য ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাদিগকে অনতিকাল মধ্যে পীড়াবশতঃ দেশীয় খাদ্য পুনঃসেবন করিতে অথবা অবলম্বিত খাদ্যপ্রণালীর পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। যাহারা কতক পরিমাণে ইউরোপীয় আহার প্রণালী অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাদিগের জানা কর্তব্য যে তাহা আরও জাতীয় আকারে পরিণত করা উপকারজনক। সভা এ বিষয়ে মনোযোগী হইবেন এবং এতদ্দেশীয়দিগের বর্তমান আহার অনেক পরিমাণে তাহাদিগের পূর্বপুরুষদিগের আহার অপেক্ষা কেন নিকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে ইহার কারণ নির্দেশ ও ইহার প্রতিকারের চেষ্টা করিবেন।

শিক্ষিত সম্প্রদায় নাটকাভিনয় বিষয়ে জাতীয় প্রথা অবলম্বন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন অতএব বর্তমান সভার তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করা অনাবশ্যক। বোম্বাইয়ের পারসিকদিগের ন্যায় ইহারা কেবল ইংরাজি নাটকের অভিনয় করেন না, কিন্তু ইহারা ইংরাজি প্রণালী অনুসারে বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়া থাকেন। এইরূপ হওয়াই বিধেয়। জাতীয় উন্নতিসাধন করিবার জন্য এ বিষয়ে যেমন আমরা জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া উন্নতি লাভ করিয়াছি অন্যান্য বিষয়েও সেরূপ চেষ্টা করা কর্তব্য।

আমাদিগের পূর্বপুরুষদিগের ধর্মে অনেক সারবান্‌ বিষয় আছে ইহা প্রদর্শন করিবার জন্য এবং গবর্নমেণ্টের নিকট রাজ্যশাসন সংক্রান্ত অত্যাচার জ্ঞাপন জন্য সকলে একমত হইলে জাতীয় গৌরবেচ্ছা বর্ধিত হইতে পারে, কিন্তু যখন এই বিশেষ অভিপ্রায়দ্বয় সংসাধন জন্য ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় সভা বর্তমান রহিয়াছে, তখন তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র চেষ্টা অনাবশ্যক। ধর্ম এবং রাজনীতি সংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।

উপরে যাহা লিখিত হইল তাহা পরিবর্তিত হইবে না এমত নহে; বঙ্গদেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে এ প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার কার্যপ্রণালী সাধারণের বিবেচনা মতে জাতীয় ভাব রক্ষা করিয়া মধ্যে মধ্যে পরিবর্তিত হইতে পারিবে।

এ প্রকার সভা দ্বারা যে সর্বপ্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা পূর্ণ হইবে এরূপ আশা করা যাইতে পারে না; যে প্রকার জাতীয় গৌরবেচ্ছা দ্বারা জাতীয় চরিত্রের উন্নতি হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা ভবিষ্যতে জাতীয় সৌভাগ্যের অভ্যুদয় হইতে পারে তাহাই সংবর্ধন ও পোষণ করা এই সভার প্রধান লক্ষ্য।

প্রস্তাবিত সভা সংস্থাপনের আন্দোলন প্রথমতঃ রাজধানীতে হওয়া আবশ্যক। সর্বদেশীয় মফঃস্বলস্থ লোকেরা সকল বিষয়ে রাজধানীবাসীদিগের অনুবর্তী হইয়া থাকেন।

পরিশিষ্ট-২

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

হিন্দুমেলায় উপহার

১

হিমাদ্রি শিখরে শিলাসনপরি,
গান ব্যাস-ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন,
কাঁপায়ে নীহার-শীতল বায়।

২

স্তব্ধ শিখর স্তব্ধ তরুলতা,
স্তব্ধ মহীরুহ নড়ে নাক পাতা।
বিহগ নিচয় নিস্তব্ধ অচল ;
নীরবে নির্ঝর বহিয়া যায়।

৩

পূরণিমা রাত—চাঁদের কিরণ—
রজত ধারায় শিখর, কানন,
সাগর-উরমি, হরিত-প্রান্তর,
প্লাবিত করিয়া গড়ায়ে যায়।।

৪

ঝঙ্কারিয়া বীণা কবিবর গায়,
"কেন রে ভারত কেন তুই, হায়,
আবার হাসিস্! হাসিবার দিন
আছে কি এখনো এ ঘোর দুঃখে!

৫

দেখিতাম যবে যমুনার তীরে,
পূর্ণিমা নিশীথে নিদাঘ সমীরে,
বিশ্রামের তরে রাজা যুধিষ্ঠির;
কাটাতেন সুখে নিদাঘ নিশি।

৬

তখন ও হাসি লেগেছিলো ভাল,
তখন ও বেশ লেগেছিলো ভাল,
শ্মশান লাগিত স্বরগ সমান,
মরু উরবরা ক্ষেতের মত।

৭

তখন পূর্ণিমা বিতরিত সুখ,
মধুর উষার হাস্য দিত সুখ,
প্রকৃতির শোভা সুখ বিতরিত
পাখীর কূজন লাগিত ভাল।

৮

এখন তা নয়, এখন তা নয়,
এখন গেছে সে সুখের সময়।
বিষাদ আঁধার ঘেরেছে এখন,
হাসি খুসি আর লাগে না ভাল।

৯

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক্ মেঘে নিমগন
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

১০

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক্ ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১১

চাই না দেখিতে ভারতেরে আয়,
চাই না দেখিতে ভারতেরে আর,
সুখ-জন্ম-ভূমি চির বাসস্থান,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

১২

দেখেছি সে দিন যবে পৃথ্বিরাজ,
সমরে সাধিয়া ক্ষত্রিয়ের কাজ,
সমরে সাধিয়া পুরুষের কাজ,
আশ্রয় নিলেন কৃতান্ত কোলে।

১৩

দেখেছি সে দিন দুর্গাবতী যবে,
বীরপত্নীসম মরিল আহবে
বীর বালাদের চিতার আগুন,
দেখেছি বিস্ময়ে পুলকে শোকে।

১৪

তাদের স্মরিলে বিদরে হৃদয়,
স্তব্ধ করি দেয় অন্তরে বিস্ময় ;

যদিও তাদের চিতা ভস্মরাশি,
মাটির সহিত মিশায়ে গেছে!

১৫

আবার সে দিন(ও) দেখিয়াছি আমি,
স্বাধীন যখন এ ভারত ভূমি,
কি সুখের দিন! কি সুখের দিন!
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে?

১৬

রাজা যুধিষ্ঠির (দেখেছি নয়নে,)
স্বাধীন নৃপতি আর্য সিংহাসনে,
কবিতার শ্লোকে বীণার তারেতে,
সে সব কেবল রয়েছে গাঁথা!

১৭

শুনেছি আবার, শুনেছি আবার,
রাম রঘুপতি লয়ে রাজ্যভার,
শাসিতেন হায় এ ভারত ভূমি,
আর কি সে দিন আসিবে ফিরে!

১৮

ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায়রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বলিয়া,
আর কি কখন দিবেরে জ্যোতি।

১৯

তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবিরে পুনঃ,
সে দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?

২০

অমার আঁধার আসুক এখন,
মরু হয়ে যাক্ ভারত কানন,
চন্দ্র সূর্য হোক্ মেঘে নিগমন,
প্রকৃতি-শৃঙ্খলা ছিঁড়িয়া যাক্।

২১

যাক্ ভাগীরথী অগ্নিকুণ্ড হয়ে,
প্রলয়ে উপাড়ি পাড়ি হিমালয়ে,
ডুবাক ভারতে সাগরের জলে,
ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ভাসিয়া যাক্।

২২

মুছে যাক্ মোর স্মৃতির অক্ষর,
শূন্যে হোক্ লয় এ শূন্য অন্তর,
ডুবুক আমার অমর জীবন,
অনন্ত গভীর কালের জলে।*

দিল্লির দরবার

দেখিছ না অয়ি ভারত সাগর, অয়ি গো হিমাদ্রি দেখিছ চেয়ে,
প্রলয়-কালের নিবিড় আঁধার, ভারতের ভাল ফেলেছে ছেয়ে।
অনন্ত সমুদ্র তোমারই বুকে, সমুচ্চ হিমাদ্রি তোমারি সম্মুখে,
নিবিড় আঁধারে, এ ঘোর দুর্দিনে, ভারত কাঁপিছে হরষ-রবে!
শুনিতেছি নাকি শত কোটি দাস, মুছি অশ্রুজল নিবারিয়া শ্বাস,
সোনার শৃঙ্খল পরিতে গলায় হরষে মাতিয়া উঠেছে সবে?
শুধাই তোমারে হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিয়াছ হে গিরি-অমর, অর্জুনের ঘোর কোদণ্ডের স্বর,
তুমি দেখিয়াছ সুবর্ণ আসনে, যুধিষ্ঠির রাজা ভারত শাসনে,
তুমি শুনিয়াছ সরস্বতি-কূলে, আর্য কবি গায় মন প্রাণ খুলে,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি—ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তুমি শুনিতেছ ওগো হিমালয়, ভারত গাইছে ব্রিটিশের জয়,
বিষণ্ণ নয়নে দেখিতেছ তুমি — কোথাকার এক শূন্য মরুভূমি—
সেথা হতে আসি ভারত-আসন লয়েছে কাড়িয়া, করিছে শাসন,
তোমারে শুধাই হিমালয়-গিরি, ভারতে আজি কি সুখের দিন?
তবে এই সব দাসের দাসেরা, কিসের হরষে গাইছে গান?
পৃথিবী কাঁপায়ে অযুত উচ্ছ্বাসে কিসের তরে গো উঠায় তান?
কিসের তরে গো ভারতের আজি, সহস্র হৃদয় উঠেছে বাজি?
যত দিন বিষ করিয়াছে পান, কিছুতে জাগেনি এ মহা-শ্মশান,
বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি?
কুমারিকা হতে হিমালয়-গিরি
এক তারে কভু ছিল না গাঁথা,
আজিকে একটি চরণ আঘাতে, সমস্ত ভারত তুলেছে মাথা!
এসেছিল যবে মহম্মদ-ঘোরী, স্বর্গ রসাতল জয়নাদে ভরি
রোপিতে ভারতে বিজয় ধ্বজা,
তখনো একত্রে ভারত জাগেনি, তখনো একত্রে ভারত মেলেনি,
আজ জাগিয়াছে, আজ মিলিয়াছে—
বন্ধন-শৃঙ্খলে করিতে পূজা!

* ১৮৭৫, ফেব্রুয়ারি ২৫ অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত।

ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ওই আসিছে ধাইয়া
রতনে রতনে মুকুট ছাইয়া ব্রিটিশ চরণে লোটাতে শির—
অই আসিতেছে জয়পুররাজ, ওই যোধপুর আসিতেছে আজ
ছাড়ি অভিমান তেয়াগিয়া লাজ, আসিছে ছুটিয়া অযুত বীর!
হারে হতভাগ্য ভারত-ভূমি,
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কেব হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে?
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ-আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে?
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক্ আমরা গাব না
আমরা গাব না হরষ গান,
এস গো আমরা যে ক-জন আছি, আমরা ধরিব আরেক তান।*

* হিন্দুমেলায় পঠিত

পরিশিষ্ট-৩

ঢাকায় লর্ড কার্জনের বক্তৃতা

...I now turn to the more momentous subject of the proposed territorial changes in these parts of Bengal, which is so greately agitating the public mind. In the first place, let me say that this seems to me to be a matter on which the local communities or representative bodies are entirely entitled to express their opinions, and that addresses would not be worth receiving if subjects on which the public were thinking more strongly than any other were excluded from them, simply on the ground that the public view happened not to be in complete accord with that of the Government. It is always possible to couch such allusions in a respectful and non-contentious form and I have never found any refusal or reluctance on the part of a local body to do so. Indeed, since I have been in India I have never been disposed to treat addresses as a mere ceremonial compliment, offered to the Viceroy as repcesentative of the Sovereign. I have always regarded them rather as an opportunity of presenting within reasonable limits, the views of the comminity to the head of the Government, whom they do not in the nature of things see very often ; and it is in that spirit that I have always replied to them with perfect frankness, as I shall do on the present occasion. First let me clear the air a little. I said in my speech at Chittagong three days ago that I had not come to these parts in order to announce the final and irrefutable decision of Government, for the best of reasons, namely, that we are not yet in possession of material upon which alone such a decision can be based. I have come rather to ascertain from enquiry the trend of local opinion—although as a matter of fact my visit to Dacca was promised a year ago before the question had come up at all, and also to give you certain explanations about the point of view of the Government, which, owing to the fact that their proposals have been put forward in a necessarily condensed fashion in a single official letter dealing with questions of vast complexity covering an immense range, has inevitably been left in some obscurity and has given rise to misconceptions or alarms which in a large number of cases it should not be difficult to dispel. I propose to act upon this plan both here, and in my answer to the addresses at Mymensingh. and perhaps if the people at both places will do me the favour of reading both replies the second of which will be consecutive to the first, they will possess a clearer conception of what it is, that the Government have in view, and of the possible methods of attaining it, than they have get been in position to form.

There are certain preliminary considerations which govern the whole case, but which, owing to the natural tendency of each community or area to regard the proposal in the manner in which it will directly affect itself, and the absence of the wider knowledge which the Government of India can alone possess, have been almost entirely ignored. The first of these is the imperative necessity of finding a remedy for the present situation. It is beyond dispute that Bengal must be relieved. No one Government and no one Administration can possibly devote

to nearly 80 millions of people the personal supervision, care, and control which are the objects for which local Governments exist. The interests of the people must suffer, and they do suffer. Those of you who are only familiar with your own area may not know it; but we whose duty it is to keep an eye upon the whole of India, and to compare the standards in the respective administrations, know it very well, and have known it for years. I may add also that it has been known to and acknowledged by almost every recent Lieutenant-Governor of Bengal. No other local Government in India administers much more than half the number of people that there are in Bengal, and there is nothing in the circumstances of Bengal which renders Government easier or an exception more defensible here. On the contrary, the reverse is, if anything, the case. Now it is no answer to say that as one Viceroy supervises 300 millions, one Lieutenant-Governor can perfectly well govern 80 millions ; for there is not the remotest analogy between the work or the duties of the two. You might as well say that because there is one Commander-in-Chief for the 2,20,000 men in the Indian Army, it is unnecessary to fix any numerical limit for the minor speration into divisions or brigades. Do not let us argue the point in such a transparently fallacious manner. No argument indeed can possibly get over the fact that the charge is too heavy, and those who are pleading most strongly for the essential unity of the Bengal nation as they call it, and the cruelty and hardship of ever sundering it, do not see that they are doing the worst possible service to their cause; for they compel us to look ahead to a time when he numbers must have swollen by the laws of nature to a figure which would produce a complete administrative breakdown, and when the partition which they now decry will be forced upon Bengal in circumstances of infinitely greater pain and hardship than any that are now in contemplation.

But even if you hve followed me thus far, there will be many who will fall back upon two classes of argument to which I next turn. The first what I may call the selfish argument. If anythin or anybody must be severed, at least let it be some one else. Sever Behar, Sever Orissa, Sever Chota Nagpur but leave us alone. Perhaps it does not occur to you that they may be saying the same thing about you : and indeed it would not be surprising, for we all of us naturally look at these matters through our own spectacles, and we are all averse from the change until we understand that we are going to profit by it. It is only those who can impartially survey the claims and interests of all, and weigh them against each other, who are in a position to decide where the balance of advantage lies. On the present occasion I need not do more than say that even were the whole of these districts which you are so anxious to submit to the fate that you deprecate for yourselves, cut off, we should have gone no distance at all towards solving the problem : for whereas one of the chief factors in the present situation is the existence of what you described as the small and backward province of Assam on the frontiers of Bengal, we should merely reproduce this feature instead of removing it, and should surround Bengal by a fringe of petty provinces, administred by borrowed officers, and presenting most of the anomalies that are so freely denounced in the case of Assam.

The second argument is of a different character, but equally admits of reply. It is said, instead of splitting up Bengal why not leave it alone and assist the

Lieutenant-Governor by an Executive Council such as exists in Madras and Bombay? Now I wonder how many persons there are among those who use this argument who have the least conception how that system works or who have ever studied it in operation. In the first place, the system has been specially devised for two Provinces where the Governor is almost invariably a stranger brought out from England, who requires a body of local experts to guide him ; and even there, as anyone who knows the inner history of India could tell you, it has been far from a smooth or perfect machine. Moreover, it is applied in Madras to a population of only 38 millions and in Bombay to one of 18½ millions. Sr. John Lawrence, who knew India as well as any English man who ever served in this country, said after 40 years of Indian experience, that the most efficient Governments that he had ever known were those of Lieutenant Governors, or heads of Administrations, whithout a council, and that where such men as Sir Thomas Munro. Sir, John Malcolm, and Lord Elphinstone had attained success with Executive Councils in Madras or Bombay, it had only been achieved by them in despite, and not in consequence, of those conditions. The Government of India have most carefully considered this matter, and they could not with any due regard to the future interests of the people of Bengal, recommend such a mode of Government for this province. In their opinion the Government of a Lieutenant-Governor and an Executive Council would be a Government of divided and therefore weakened authority, of diffused and therefore diminished responsibility, and, at any rate in the case, as often happens, of a Lieutenant-Governor brought from the outside and finding himself confronted with a Council of superior numbers, a Government, should he be able to overrule them, of perpetual scope for dissension, should be unable to overrule them, one of importance and standstill. I would further add that an Executive Council in Bengal could only, in my opinion, lead to further centralisation and Secretariat Government, which are the very evils that we desire to avoid. I pray you therefore to dismiss from your minds, as in the least degree likely under present conditions, the idea of an Executive Council for Bengal. It is my firm conviction that I could not bequeath to this province a worse boon than that which has been thus innocently suggested.

Gentleman, I hope that I have now carried you to the point of realising, firstly, that the case for the relief of Bengal is overwhelming, secondly, that Bengal cannot be relieved by snipping off outside fragments, thirdly, that it cannot be left as it is, with an Executive Council thrown in as a palliative. I now pass to the manner in which these propositions affect yourselves.

One of your addresses speaks of the universal feeling of apprehension that has been argued by your proposals, and an effort has been made to impress me at each stage of my journey with the degree to which the public feeling has been quite stirred. Gentlemen. I am quite willing to concede the utmost range that is consistent with the facts to the existence of the feeling, and I really am not surprised that it should have been argued, when I read the extraordinary tales with which the public have been frightened, and about which I shall have something to say later on. But when you ask me to believe that the feeling is universal, I am unable to follow you. In the first place, how many of the poor people—the rayots, the shop-keepers, the petty traders-know what our proposals are or have ever been informed of the reasoning upon which they are based? I find that in the Dacca

and Mymensingh districts alone, out of an adult male population of 1,870,000, there are only 225,000, or 12 percent, who can either speak or write any language at all, and only 1 percent. who understands English. What do the remainder know except that they have been told that an unfeeling and despotic Government is going to deprive them of their rights and liberties, and that it is their duty to attend public meetings and pass resolutions of protest? If you have any doubts on this matter I am in a position to remove them, for I have had placed in my hands a copy of the instructions issued by the Mymensing Association—a body which has been actively bestirring itself in getting up the agitation in this part of the country, and which I know to be in close connection with more important organizations in Calcutta. I need do no more than read to you a few extracts from this document.

> "All of you should within a week gather together to hold a large meeting, and in it express your views. Specimens are given below of the resolutions that should be adopted and of letters that should be sent to different places. The language may be altered as desired. A petition is to be sent to the Lieutenant-Governor. It is necessary that it should be signed by more than a lakh of people. After the meeting telegrams should be sent on the very day to the Calcutta newspapers."

Then follows a series of forms of the resolutions to be adopted, the telegrams to be sent, and the names of the newspapers, with instructions to proceed as economically as possible. The paper goes on to say :

> 'You may slightly modify the specimens of telegrams and resolutions given above, keeping their substance intact. Such modifications are indeed to be desired. In the case of telegrams in particular, you should try your best to do this. Memorials may be written in English or Bengali. Those from the villages ought to be writen in Bengali. You should soon collect subscriptions and send them in. It is quite impossible to carry on an agitation without money. The people in Mymensingh have not been able fully to realize the danger that they may be in. All classes of people in Dacca, lettered of unlettered, have become well nigh mad.

Now, gentlemen, I have not read out these extracts with the idea of passing any censure upon them, for it is no news to any of us to learn how agitations are engineered, but simply to confute the claim that the masses of the people are profoundly or universally stirred. If they were, it would not be necessary to adopt such tactics to rally them, and if these tactics have been found necessary, then their authors must not be surprised if the Government do not attach so much importance to their demonstrations as they themselves would wish. For my own part I earnestly deprecate the attempt that is being made to seduce the ignorant cultivators and towns people into an agitation which I venture to say that not one in a thousand of them in the least degree understands, or if he does at all understand it, only does so upon a perverted and misleading repesentation of what has been actually proposed.

Do not imagine, however, even if I show the agitation to be a hollow and unreal one, in so far as it is supposed to emanate from the masses, that therefore I doubt for a moment that the feelings of which I am speaking are generally entertained by many educated and thoughtful men. On the contrary, I believe,

this to be emphatically the case, and I think I know also quite well why they entertain them, and upon what they rest. It is to this class, therefore that, I now turn, with a few words as to the nature of the beliefs upon which they are acting.

I shall not, I think, be far wrong if I say that almost the whole of the suspicion or opposition rests upon two apprehensions. The first is that a part of Bengal is about to be handed over to a backward and inefficient administration. The second is that the people are going to be deprived of valuable rights and privileges which they at present enjoy.

The first of these impressions is reflected in one of your addresses, which describes the Government proposal as one "to make our prosperous and enlightened district the appanage of a backward province", and I have seen the same sort of idea reproduced in much cruder form in pamphlets circulated among the people, from which one might imagine that Assam was an abode of outer darkness, inhabited by nothing but planters and tea garden coolies and savage hillmen, who speak strange languages, are sunk in ignorance and superstition, and require to be governed by primitive methods : and that the enlightened districts of Eastern Bengal were about to be handed over in perpetual bondage to these sons of Ishmael. I have even seen in papers or addresses the phrase that you are about to be ceded or annexed to Assam. Again, I wonder how many of the people who affect this sort of language have ever travelled one mile in Assam, or have any idea of its administration or the people. For my own part I have seen both, and I have observed within a few hours, journey of this very place Bengal people living contentedly in Sylhet and Cachar under the Assam Adminstration are quite unconscious that they were the appanage of a backward province, or that they had been ceded of annexed to anyone at all. I have also spoken to Bengal officers who have served both in Assam and Bengal, and who have told me that the administration is brought much nearer home to the people in Assam than in Eastern Bengal. But even supposing that the fear were well grounded. Does it not argue the most extraordinary lack of self confidence to urge that these enlightened districts priding themselves as they do on their culture, their education, and their advancement, and counting millions of people, are going to be annexed by a province which is like an infant to them in respect of development and stature? Gentlemen, the population of the entire area in Bengal which it has been proposed to transfer amounts to $11\frac{1}{2}$ millions of people. The entire population of Assam is only 6 millions as it is, and of these nearly 3 millions are Bengalis already. Do you mean to tell me that these $14\frac{1}{2}$ millions of Bengalis, representing as you tell me the flower of the race, are going to be absorbed, obliterated, and destroyed because it is proposed to amalgamate with them, for administrative purposes only, less than $1\frac{1}{2}$ millions of a race *i.e*. the Assamese whom you declare to be in every way inferior to your own? Such an apprehension would be the most lamentable confession of weakness in the future of the Bengal race which it is possible to conceive. If I were an Assamese I could understand his saying that he dreaded being annexed and swamped by Bengal, but why Bengal should say that it is about to be swallowed up by Assam I am wholly at a loss to imagine. It is a part of the same unreasoning fear that is responsible for the argument that the Bengalis will cease to be Bengalis and become Assamese, or that they will cease to speak the Bengali language. Gentlemen. as I travelled in the railway train

yesterday, I saw batches of well organized school boys holding up placards on which was written, "Do not turn us into Assamese." Surely I need not point out to an intelligent audience that no administrative rearrangement can possibly turn one people into another, or make $14\frac{1}{2}$ millions of people speak any language but their own ; and really the alarms that I am describing seem almost too childish to deserve notice were it not that I have found them to be seriously stated, and apparently genuinely entertained. Let me put before you for a moment another aspect of the case. Much use has been made in this controversy of history, and of all that it is supposed to teach. I also in a small way am a student of history : and if it has taught me anything of these parts, the lesson has been that under the present system of administration, Dacca, which was once the capital of Bengal, has steadily declined in numbers and influence, and that not until the jute trade was introduced some thirty years ago did it begin to revive.

In 1800 Dacca was a city of 200,000 people. In 1870 it had sunk to 69,000. Since then it has risen, owing to the circumstances that I have mentioned, to 90,000 in the last census; but whereas the increase was 10,000 between 1870 and 1880, it has only been 11,000 in the ensuing 20 years. Will anyone here pretend that, even after this advance, Dacca it anything but a shadow of its former self? Is it not notorious that for years it has been lamenting its downfall, as compared with the past?

When then a proposal is put forward which would make Dacca the centre, and possibly the capital of a new and self-suffering administration, which must give to the people of these districts, by reason of their numerical strength and their superior culture, the preponderating voice in the province so created, which would invest the Mohamedans in Eastern Bengal with a unity which they have not enjoyed since the days of the old Mussulman Viceroys and Kings, which must develop local interests and trade to a degree that is impossible so long as you remain, to use your own words, "the appanage of another administration", and which would go far to revive the traditions which the historical students assure us once attached to the Kingdom of Eastern Bengal—can it be that the people of these districts are to be advised by their leaders to sacrifice all these great and incontestable advantages, from fear of being tied on to the tail of the humble and backward Assam? Is it not transparent, Gentlemen, that you must be the head and heart of any such new oganism, instead of the extremities, and do you really mean to be so blind to your own future as to repudiate the offer?

That these considerations have been apparent to many of your number is evident from the suggestion which finds a place in two of the Addresses, namely, that if some re-arrangement of existing conditions is inevitable, you would urge the institution of a Lieutenant-Governorship with a Legislative Council and a Board of Revenue, under which the people of this part of Bengal would retain at the rights and privileges to which they attach so much weight. I need not pause to discuss what proportion of the leading persons of Dacca or of the population at large reflect these sentiments. I merely regard the suggestion on its merit. The Mohamedans in their address have gone further; for they say explicitly that they do not share in the recent vehement agitation, and they definitely recommend the constitution of a new province, whose districts and boundaries they proceed to name. Now, gentlemen, it would be premature for me to discuss any such

suggestion at the present stage, because, it has never yet been placed officially, and I have no knowledge whether it will be so placed, before the Government of India; nor have I heard fully expounded, or declared the arguments by which it may be supported. I will merely observe to-day that many of the objectors to the present scheme have themselves furnished the strongest reasons for a more ambitious one, by insisting that the relief which we proposed to give to Bengal will be swallowed up in a few more censues, and that the evil which we desire to redress will then be as bad as before. Further, if we find upon examination that the other territorial re-arrangements which were proposed in our original scheme, and which relate to Orissa and Chota Nagpur, call for any modification, and if such modification leaves Bengal much as it is, or does not substantially reduce its administrative burden, then it is clear that the case for a larger re-adjustment in the east of Bengal will be greatly enhanced. I must admit, too, that there are certain objections taken, not without considerable plausibility, to the present more restricted scheme from which the larger one would be exempt. I think, therefore, that such a seheme, if put forward will be deserving of attentive consideration.

Now as regards the objections that are entertained to the present proposal. I said just now that some were plausible, further, I think that some are reasonable. I have not time this afternoon to examine all these objections, though I propose to continue the task in my reply at Mymensingh, which I dare say that you will be good enough to read in continuation of this. I will here deal only with three which are among the most popular. The first of these is plausible but fallacious. The second is reasonable. The third is entirely mistaken.

The first objection is as follows, it is apprehended that if a new province is formed the people will lose the Board of Revenue, in which they place great reliance as the final Court of appeal in revenue matters. Now the Board in Revenue cases does not sit as a Board. Ever since Sir George Campbell's day, one member has taken the revenue cases, and it is before him that the cases come and that Counsel plead. I cannot see therefore, that there is much difference between this officer, sitting as a Board, whereas he is really an individual and a Chief Commissioner sitting and hearing counsel, as the present Chief Commissioner of Assam does, except that the Chief commissioner has many other duties to perform and that when he is not a Bengal officer, he may not start with a full acquaintance with the revenue system of Bengal. However, it is unnecessary to pursue this point, because, whether a Chief Commissionership or a Lieutenant-Governorship be created, I think that he should certainly have a financial or Revenue Commissioner, as, already exists in other provinces, who will play exactly the same part as is now filled in Bengal, by the Revenue Member of the Board. This objection, therefore, has no foundation.

The second objection is that the people of this part of Bengal would lose their representation such as it is in the local Legislative Council, their power of asking questions and making speeches there and of discussing the legislation affecting the province that is passed in Writers' Buildings at Calcutta. It should of course, be remembered, that this representation is only enjoyed by the District Boards once in every eight years, and by the Municipalities once in ten years. But I understand the answer to this point to be that though it is quite true, yet

local interests, if not directly represented by local members, are fairly represented by the provincial members in general, who take an interest in each others districts; while if the further point be made that the new province, though not endowed with a local Legislative Council would probably possess the higher distinction of representation in the Imperial Legislative Council, I learn that the answer to this is made that highly as that distinction would no doubt be esteemed representation on a local Council is of even greater practical moment, I think that there is some force in these objections though not as great force as appears to be believed by those who have raised them. It is to be observed, however, that they would disappear entirely if, instead of being placed under a Chief Commissioner, the new province were held to be entitle to a Lieutenant-Governor an appointment which would naturally carry with it the creation of a Legislative Council.

The third objection, on which I find that great stress has been laid, is the fear that the transferred districts will become scheduled districts for which the Governor General in Council can legislate by regulation, and that the Chief Commissioner will substitute the laws at present in force in certain parts of Assam for the laws force in Eastern Bengal. I may say at once that there is not a word of truth in this apprehension. The areas that have hitherto been dealt with by legislation in the Imperial Legislative Council will continue to be so treated and the extraordinary suggestion that has found expression in so many quarters of a sort of conspiracy for the issue of regulations between the Viceroy and the Chief Commissioner, is purely fanciful.

I may go further and say that is no advantage of law, Government or administration, which these districts at present enjoy, of which there is any desire to deprive them; and that the whole of the argument to the contrary upon which this agitation has in the main been built up, is without basis or justification. Indeed, the truth is in the other directions, for it cannot be disputed that the nearer the adminisntration is brought to the people, and that would be the first and most immediate result of the projected change, the greater would be the regard for their inerests that they could claim and the closer the protection that they would enjoy.

I must now, Gentlemen, bring these remarks to a close. The further branches of the subject I will pursue at Mymensingh. I have at any rate, I hope, said enough to convince you that the proposals of Government are a very different thing from what has been widely represented, and that they have been seriously put forward, not with the object of injuring the people of any district or division or class of the community, but rather with one idea of promoting their security and development in the future. I am sure that you will give as much attention to what I have said as I have done to the views and criticisms of other parties ; and I am confident that you will join with me in desiring that the solution should depend not upon ignorant agitation of unworthy prejudice, but upon a careful and dispassionate scrutiny or the real merits of the case.*

* Papers Relating to the Reconstitution of the Province of Bengal and Assam (Reprint), New Delhi, 1984, pp. 244-251.

পরিশিষ্ট-৪

G. K. GOKHALE
PARTITION OF BENGAL AND THE SWADESH MOVEMENT

...Gentlemen, the question that is uppermost in the minds of us all at this moment is the Partition of Bengal. A cruel wrong has been inflicted on our Bengalee brethren, and the whole country has been stirred to its deepest depths in sorrow and resentment, as had never been the case before. The scheme of partition, concocted in the dark and carried out in the face of the fiercest opposition that any Government measure has encountered during the last half-a-century, will always stand as a complete illustration of the worst features of the present system of bureaucractic rule—its utter contempt for public opinion, its arrogant pretensions to superior wisdom, its reckless disregard of the most cherished feelings of the people, the mockery of an appeal to its sense of justice, its cool preference of Service interests to those of the governed. Lord Curzon and his advisers--if he ever had any advisers–could never allege that they had no means of judging of the depth of public feeling in the matter. All that could possibly have been done by way of a respectful representation of the views of the people had been done. As soon as it was known that a partition of some sort was contemplated, meeting after meeting of protest was held, till over five hundred public meetings in all parts of the province had proclaimed in no uncertain voice that the attempt to dismember a compact and homogeneous province, to which the people were passionately attached and of which they were justly proud, was deeply resented and would be resisted to the uttermost. Memorials to the same effect poured in upon the Viceroy. The Secretary of State for India was implored to withhold his sanction to the proposed measure. The intervention of the British House of Commons was sought first by a monster petition, signed by sixty thousand people, and later by means of a debate on the subject raised in the House by our ever-watchful friend, Mr. Herbert Roberts. All proved unavailing. The Viceroy had made up his mind. The officials under him had expressed approval. What business had the people to have an opinion of their own and to stand in the way? To add insult to injury, Lord Curzon described the opposition to his measure as "manufactured"—an opposition in which all classes of Indians, high and low, uneducated and educated, Hindus and Mahomedans had joined, an opposition than which nothing more intense, nothing more wide-spread, nothing more spontaneous had been seen in this country in the whole course of our political agitation. Let it be remembered that when the late Viceroy cast this stigma on those who were ranged against his proposals, not a single public pronouncement in favour of those proposals had been made by any section of the community ; and that foremost among opponents of the proposals were men like Sir Jotindra Mohan Tagore and Sir Gurudas Banerji, Raja Peary Mohan Mukherji and Dr. Rash Behary Ghose, the Maharajas of Mymensingh and Kassimbazar,—men who keep themselves aloof from ordinary political agitation and never say a word calculated in any way to

embarass the authorities, and who came forward to oppose publicly the Partition project only from an overpowering sense of the necessity of their doing what they could to avert a dreaded calamity. If the opinions of even such men are to be brushed aside with contempt, if all Indians are to be treated as no better than dumb-driven cattle, if men, whom any other country would delight to honour, are to be thus made to realize the utter humiliation and helplessness of their position in their own land, then all I can say is "Good-bye to all hope of co-operating in any way with the bureaucracy in the interests of the people". I can conceive of no graver indictment of British Rule than that such a state of things should be possible after a hundred years of that rule.

Gentlemen, I have carefully gone through all the papers which have been published by the Government on this subject of Partition. Three have struck me forcibly—determination to dismember Bengal at all costs, an anxiety to promote the interests of Assam at the expense of Bengal, and a desire to suit everything to the interests and convenience of the Civil Service. It is not merely that a number of new prizes have been thrown into the lap of that Service—one Lieutenant-Governorship, two Memberships of the Board of Revenue, one Commissionership of a Division, several Secretaryships and Under Secretaryships — but alternative schemes of readjustment have been rejected on the express ground that their adoption would be unpopular with members of the Service. Thus even if a reduction of the charge of the Lieutenant-Governor of Bengal had really become inevitable—a contention, which the greatest living authority on the subject, Sir Henry Cotton, who was Secretary to the Bengal Governmet under seven Lieutenant-Governors, does not admit — one would have thought that the most natural course to take was to separate Behar, Orissa and Chota Nagpur from Bengal and form them into a separate Province. This would have made the Western Province one of 30 millions in place of the Eastern. But this, says the Government of India, "would take from Bengal all its best districts and would make the Province universally unpopular". This was of course a fatal objection, for compared with the displeasure of the Civil Service, the trampling under foot of public opinion and the outraging of the deepest feelings of a whole people was a smaller matter. But one can see that administrative considerations wre really only secondary in the determination of this question. The dismemberment of Bengal had become necessary, because in the view of the Government of India,

> "It cannot be for the lasting good of any country of any people that public opinion or what passes for it should be manufactured by a comparatively small number of people at a single centre and should be disseminated thence for universal adoption, all other view being discouraged or suppressed". "From every point of views," the Government further states, "it appears to us desirable to encourage the growth of centres of independent opinion, local aspiration ideals and to preserve the growing intelligence and enterprise of Bengal from being cramped and stunted by the process of forcing it prematurely into a mould of rigid and sterile uniformity."

You will see that this is only a paraphrase in Lord Curzon's most approved style, of the complaint of the people of Bengal that their fair Province has been dismembered to destroy their growing solidarity, check their national aspirations and weaken their power of co-operating for national ends, lessen the influence

of their educated classes with their countrymen, and reduce the political importance of Calcutta. After this let no apologist of the late Viceroy pretend that the object of the partition was administrative convenience and not political repression.

Gentlemen, it is difficult to speak in terms of due restraint of Lord Curzon's conduct throughout this affair. Having published his earlier and smaller scheme for public criticism, it was his clear duty to publish similarly the later and larger scheme, which he afterwards substituted for it. But in consequence of the opposition which the first scheme encountered, he abandoned the idea of taking the public any more into his confidence and proceeded to work in the matter in the dark. For more than a year nothing further was heard of his intentions, and while he was silently elaborating the details of his measure, he allowed the impression to prevail that the Government had abandoned the Partition project. And in the end, when he had succeeded in securing the Secretary of State's sanction to the scheme, it was from Simla, where he and his official colleagues were beyond the reach of public opinion, that he sprang the final orders of Government upon an unprepared people. Then suddently his resignation. And the people permitted themselves for a while to hope that it would bring them at least a brief respite, especially as Mr. Brodrick had promised shortly before to present further papers on the subject to Parliament and that was understood to mean that the scheme could not be brought into operation till Parliament reassembled at the beginning of next year. Of course, after Lord Curzon's resignation, the only proper, the only dignified course for him was to take no step, which it was difficult to revoke and the consequence of which would have to be faced, not by him, but by his successor ; he owed it to Lord Minto to give him an opportunity to examine the question for himself ; he owed it to the Royal visitors not to plunge the largest Province of India into violent agitation and grief on the eve of their visit to it. But Lord Curzon was determined to partition Bengal before he left India and so he rushed the necessary legislation through the Legislative Council at Simla, which only the official members could attend, and enforced his orders on 16th October last—a day observed as one of universal mourning by all classes of people in Bengal. And now,while he himself has gone from India what a sea of troubles he has bequeathed to his successor. Fortunately there are grounds to believe that Lord Minto will deal with the situation with tact, firmness, and sympathy, and it seems he has already pulled up to some extent. Lord Curzon's favourite Lieutenant, the first ruler of the new Eastern Province Mr. Fuller has evidently cast to the winds all prudence, all restraints, all sense of responsibility. Even if a fraction of what the papers have been reporting be true, his extraordinary doing must receive the attention of the new Secretary of State for India and the House of Commons. There is no surer method of goading a docile people into a state of dangerous despair than the kind of hectoring and repression he has been attempting.

But, Gentlemen, as has been well said, even in things evil there is a soul of goodness, and the dark times, through which Bengal has passed and is passing, have not been without a message of bright hope for the future. The tremendous upheaval of popular feeling, which has taken place in Bengal in consequence of the partition, will constitute a landmark in the history of our national progress. For the first time since British rule began, all sections of the Indian community,

without distinction of caste or creed, have been moved by a common impulse and without the stimulus of external pressure to act together in offering resistance to a common wrong. A wave of true national consciousness has swept over the Province, and at its touch old barriers have for the time, at any rate, been thrown down, personal jealousies have vanished, other controversies have been hushed. Bengal's heroic stand against the oppression of a harsh and uncontrolled bureaucracy has astonished and gratified all India, and her sufferings have not been endured in vain, when they have helped to draw closer all parts of the country in sympathy and in aspiration. A great rush and uprising of the waters, such as has been recently witnessed in Bengal, cannot take place without a little inundation over the banks here and there. These little excesses are inevitable, when large masses of men move spontaneously—especially when the movement is from darkness unto light, from bondage towards freedom—and they must not be allowed to disconcert us too much. **The most outstanding fact of the situation is that the public life of this country has received an accession of strength of great importance, and for this all India owes a deep debt of gratitude to Bengal.** Of course, the dificulties which confront the leaders of Bengal are enormous and perhaps they have only just begun. But I know there is no disposition to shrink from any responsibilities, and I have no doubt that whatever sacrifices are necessary will be cheerfully made. All India is at their back, and they will receive in the work that lies before them the cordial sympathy and assistance of the other Provinces. Any discredit, that is allowed to fall on them, affects us all. They on their side must not forget that the honour of all India is at present in their keeping.

THE SWADESHI MOVEMENT

Gentlemen, I will now say a few words on a movement which has spread so rapidly and has been hailed with so much enthusiasm all over the country during the last few months—The Swadeshi movement. It is necessary at the outset to distinguish it from another movement, started in Bengal, which has really given it such immense impetus—the boycott of British goods. We all know that when our Bengali brethren found that nothing would turn the late Viceroy from his purpose of partitioning Bengal, that all their protests in the Press and on the Platform, all their memorials to him, to the Secretary of State and to Parliament were unavailing, that the Government exercised its despotic strength to trample on their most cherished feelings and injure their dearest interests and that no protection against this of any kind was forthcoming from any quarter, they in their extremity resolved to have recourse to this boycott movement. This they did with a twofold object—first as a demonstration of their deep resentment at the treatment they were receiving ; and, secondly, to attract the attention of the people in England to their grievances, so that those who were in a position to call the Government of India to account might understand what was taking place in India. It was thus as a political weapon, used for a definite political purpose, that they had recourse to the boycott ; and in the circumstances of their position every justification for the step they took. And I can tell you from personal experience that their action has proved immensely effective in drawing the attention of English people to the state of things in our country. But a weapon like this must be reserved only for extreme occasions. There are obvious risks involved in its failure, and

it cannot be used with sufficient effectiveness unless there is an extraordinary upheaval of popular feeling behind it. It is bound to rouse angry passions on the other side, and no true well wisher of his country will be responsible for provoking such passions, except under an over powering sense of necessity. On an extreme occasion, of course, a boycotting demonstration is perfectly legitimate, but that occasion must be one to drive all classes, as in Bengal, to act with one impulse, and make all leaders sink their personal differences in the presence of a common danger. It is well to remember that the term "boycott" owing to its origin, has got unsavoury associations, and it conveys to the mind before everything else a vindictive desire to injure another. Such a desire on our part, as normal feature of our relations with England, is of course out of the question. Moreover, if the boycott is confined to British goods only, it leaves us free to purchase the goods of other foreign countries and this does not help the Swadeshi movement in any way.

Gentlemen, the true Swadeshi movement is both a patriotic and an economic movement. The idea of Swadeshi or "one's own country" is one of the noblest conceptions that have ever stirred the heart of humanity. As the poet asks—

Breathes there the man with soul so dead
Who never to himself hath said,—
This is my own, my native land.

The devotion to Motherland, which is enshrined in the highest Swadeshi, is an influence so profound and so passionate that its very thought thrills and its actual touch lifts one out of oneself. India needs to-day above everything else that the gospel of this devotion should be preached to high and low, to prince and to peasant, in town and in hamlet, till the service of Motherland becomes with us as overmastering a passion as it is in Japan. The Swadeshi movement, as it is ordinarily understood, presents one part of this gospel to the mass of our people in a form, which brings it within their comprehension. It turns their thoughts to their country, accustoms them to the idea of voluntarily making some sacrifice for her sake, enables them to take an intelligent interest in her economic development and teaches them the important lesson of co-operating with one another for a national end. All this is most valuable work, and those who undertake it are entitled to feel that they are engaged in a highly patriotic mission. But the movement on its material side is an economic one ; and though self-denying ordinances, extensively entered into, must serve a valuable economic purpose, namely, to ensure a ready consumption of such articles as are produced in the country and to furnish a perpetual stimulus to production by keeping the demand for indigenous things largely in excess of the supply, the dificulties that surround the question economically are so great that they require the co-operation of every available agency to surmount them. The problem is indeed one of the first magnitude. Twelve years ago, the late Mr. Ranade remarked at an Industrial Conference held at Poona :

> The political domination of one country by another attracts far more attention than the more formidable, though unfelt domination, which the capital enterprise and skill of one country exercise over the trade and manufactures of another. This latter domination has an insidious influence, which paralize the springs of all the varied activities which together make up the life of a nation.

The question of production is a question of capital, enterprize and skill and

all these factors, our deficiency at present is very great. Whoever can help in any one of these fields is, therefore, a worker in the Swadeshi cause and should be welcomed as such. Not by methods of exclusion but by those of comprehension, not by insisting on everyone working in the same part of the field but by leaving each one free to select his own corner, by attracting to the cause all who are likely to help and not alienating any who are already with us, are the difficulties of the problem likely to be overcome. Above all, let us see to it that there are not fresh divisions in the country in the name of Swadeshi. No greater perversion of its true spirit could be imagined than that.

Take the question of cotton piece-goods, of which we import at present over 22 millions sterling worth a year. This is by far the heaviest item among our imports and our present Swadeshi agitation is directed mainly towards producing as much of these goods in our own country as possible. I have consulted three of the best experts available in India on this subject Mr. Bezanji of Nagpur, the right hand man of the late Mr. Tata in mill matters, the Hon. Mr. Vithaldas Damodardas, who has written an admirable paper on the cotton industry for the Industrial Conference and has kindly placed a copy of it at my disposal, and our friend Mr. Wacha. They are all agreed about the requirements and the difficulties of the situations. So far as cotton fabrics are concerned, even strict Free Traders should have nothing to say against the encouragement which the Swadeshi movement seeks to give to their manufacture in India. In the first place, many of the usual objections that may be urged against a system of State protection do not apply to helpful voluntary action on the part of consumers, such as the Swadeshi movement endeavours to promote. Moreover, the essence of Free Trade is that a commodity should be produced where the comparative cost of its production is the least and that it should be consumed where its relative value is the highest ; and if accidental circumstances have thwarted such an adjustment in a given case, any agency which seeks to overcome the impediment works in the end in the interests of true Free Trade. Now everyone will admit that with cheap labour and cotton at her own door, India enjoys exceptional advantages for the manufacture of cotton goods ; and if the Swadeshi movement helps her to regain her natural position in this respect–a position which she once occupied but out of which she has been driven by an extraordinary combination of circumstances—the movement works not against but in furtherance of true Free Trade. Even at present the cotton industry in India is an important one. It is the largest industry after agriculture in the country ; it is also the only one—agriculture excepted–in which the Indians themselves have a substantial share. It is represented by a paid up capital of about 17 crores of rupees or a little over 11 millions sterling, the number of mills being about 200, with five million spindles and fifty thousand power-looms. In addition to this, there are, according to the census of 1901, about a quarter of a million persons engaged in hand-loom weaving in the country. Our mills consume nearly 60 per cent of the cotton produce of India and produce 58 crore lbs. of yarn. Of this quantity, Mr. Vithaldas tells us, about 23.5 crore lbs. is exported to China and other foreign countries, about 13.5 crores is used in our weaving mills, and about 19 crores is woven by hand-loom weavers, the remaining 2 crores going to the manufacture of rope and twine In addition to this, 3 crore lbs. of yarn is imported from the United Kingdom and is consumed

by the hand-looms. The hand-loom industry of the country thus absorbs, in spite of its hard struggles, about 22 crore lbs. of yarn, of nearly double the quantity woven by power-looms, and this is a most interesting and significant fact. The yarn used by the weaving mills produces about 55 crores of yards of cloth, of which about 14 crores yards is exported to foreign countries and about 41 crores is left for consumption in the country. If we put down the production of the hand-looms at about 90 crore yards, we have about 130 crore yards as the quantity of Swadeshi cloth consumed at present in India.

The quantity of piece-goods imported from the United Kingdom and retained for use in the country is about 205 crore yards a year. Of the total cloth consumed, therefore, over one third is at present Swadeshi. This is an encouraging feature of the situation. But the imported cloth is almost all superior in quality.

"While our mills," Mr. Vithaldas says, "produce the coarser cloth say, from yarn up to 30's count and in a few cases up to 40's, the bulk of the imported cloth is of the finer quality, using yarn over 30's count. The Indian weaving mills are obliged to restrict themselves for the most part to weaving coarser cloth owing to the inferior quality of cotton now grown in the country."

It may be noted that even from existing cotton, hand-looms can, owing to their greater delicacy of handling the yarn, produce finer cloth than the power-looms. Fortunately owing to the exertions of the Agricultural Department of the Bombay Government—exertions for which it is entitled to the best thanks of the whole country—Egyptian cotton has just been successfully introduced into Sind, and this year a thousand bales of a quality equal to very good Egyptian have been produced. A much heavier crop is expected next year, and there is no doubt that its cultivation will rapidly extend. The main difficulty in the way of our manufacturing the quality of cloth that is at present imported is one of capital. Mr. Wacha estimates that if the whole quantity of 205 crore yards is to be produced by mills, the industry requires an aditional capital of about 30 crores of rupees. Even if we propose to spread this over ten years, we should require an addition of 3 crores of rupees every year. Now if we turn to the Statistical Abstract of British India, we shall find that the total increase in the capital invested in cotton mills during the last ten years has been only about 3 crores—an amount that Mr. Wacha wants every year for ten years. The normal development of the mill industry is thus plainly unequal to the requirements of the situation. Moreover it is well to remember what Mr. Bezanji says—that the present mill owners must not be expected to be very keen about the production of finer cloth, because its manufacture is much less paying than that of the coarser cloth. This is due to various causes the principal one among them being that English capital, similarly invested, is satisfied with a smaller range of profits. Capital from other quarters must, therefore, be induced to come forward and undertake this business. If we again turn to the Statistical Abstract, we shall find that our people hold about 50 crores of rupees in Government Securities and about 11 crores in Postal Savings Banks. The private deposits stand at about 33 crores of rupees, but there are no means of ascertaining how much of the amount is held by Indians. Considering the extent of the country and the numbers of the population, these resources are, of course, extremely meagre. Still they might furnish some part of the capital needed. In this connection may I say that a special responsibility now rests in

the matter on the Aristocracy of Bengal. And this not merely because the Swadeshi movement is being so vigorously advocated in their Province, but also because owing to the Permanent Settlement of Bengal they are enabled to enjoy resources, which in other parts of India are swept into the coffers of the State. If sufficient capital is forthcoming, Mr. Bezanji's patriotism may, I am sure, be relied on to secure for the undertaking whatever assistance his great capacity and unrivalled knowledge can give. It must, however, be admitted that capital will come forward only cautiously for this branch of the bussiness. But the hand-looms are likely to prove of greater immediate service. Mr. Vithaldas looks forward to a great revival of the hand-loom industry in the country, and I cannot do better than quote what he says on this point in his paper :

This village industry, he says, gives means of livelihood not only to an immense number of the weaver class but affords means of supplementing their income to agriculturists—the backbone of India—who usually employ themselves on hand-looms, when field work is unnecessary and also when, owing to famine, drought or excessive rains, aricultural operations are not possible. Now the apparatus with which they work is nearly two centuries behind the times. Mr. Havell, Principal of the Calcutta School of Arts, Mr. Chatterton of the Madras School of Arts, and Mr. Churchill of Bangalore, along with many others, are doing yeoman's service by taking keen interest in the question of supplying economical and improved apparatus to the hand-loom weavers. Mr. Havell has pointed out that in preparing the warp our hand-loom weavers are incapable of winding more than two threads at a time, though the simplest mechanical device would enable them to treat 50 or 100 threads simultaneously. The latest European hand-loom, which successfully competes with the power-loom in Cairo and in many places in Europe, can turn out a maximum of 48 yards of common cloth in a day. Mr. Havell is satisfied that the greater portion of the imported cotton cloth can be made in the Indian hand-looms with great profit to the whole community. The question of the immediate revival of the hand-loom weaving industry on a commercial basis demands the most earnest attention of every well-wisher of India, and evidence gives promise of a successful issue to efforts put forward in this direction.

The outlook here is thus hopeful and cheering ; only we must not fail to realise that the co-operation of all who can help—including the Government—is needed to overcome the difficulties that lie in the path.*

From G. K. Gokhale's Presidential speech.

* Congress Pressdintial speches-collection Published by West Bengal Pradesh Congress Committee. 1972

পরিশিষ্ট-৫

DADABHAI NAOROJI
PARTION OF BENGAL

In the Bengal Partition, the Bengalees have a just and great grievance. It is a bad blunder for England. I do not despair but that this blunder, I hope, may yet be rectified. This subject is being so well threshed out by the Bengalees themselves that I need not say anything more about it. But in connection with it we hear a great deal about agitators and agitation. Agitation is the life and soul of the whole political, social and industrial history of England. It is by agitation the English have accomplished their most glorious achievements, their prosperity, their liberties, and in short their first-place among the Nations of the World.

The whole life of England, every day, is all agitation. You do not open your paper in the morning but read from beginning to end it is all agitation—Congresses and Conferences—Meetings and Resolutions — without end, for a thousand and one movements, local and national. From the Prime Minister to the humblest politician his occupation is agitation for everything he wants to accomplish. The whole Parliament, Press and Platform, is simply all agitation. Agitation is the civilized peaceful weapon, the moral force, and infinitely preferable to brute physical force when possible. The subject is very tempting. But I shall not say more than the Indian journalists are mere Matriculators while the Anglo-Indian journalists are Masters of Arts in the University of British Agitators. The former are only the pupils of the latter, and the anglo-Indian journalists ought to feel proud that their pupils are doing credit to them. Perhaps a few words from an English statesman will be more sedative and satisfactory.

Macaulay has said in one of his speeches :

> "I hold that we have owed to agitation a long series of beneficent reforms which would have been effected in no other way. .....the truth is that agitation is inseparable from popular government ....Would the slave trade ever have been abolished without agitation? Would slavery ever have been abolished without agitation?"

For every movement in England—local and national—the cheap weapons are agitation by meetings, demonstrations and petitions to Parliament. These petitions are not any begging for any favours any more than that the conventional "Your obedient servant" in letters makes a man an obedient servant. It is the conventional way of approaching higher authorities. The petitions are claims for rights or for justice or for reforms, —to influence and put pressure on Parliament by showing how the public regard any particular matter. The fact that we have more or less failed hitherto, is not because we have petitioned too much but that we have petitioned too little. One of the factors that carries weight in Parliament is the evidence that the people interested in any question are really in earnest. Only the other day Mr. Asquith urged as one of his reasons against women's franchise

that he did not see sufficient evidence to show that the majority of the women themselves were earnest to acquire the franchise. We hve not petitioned or agitated at all in our demands. In every important matter we must petition Parliament with hundreds and thousand of petitions—with hundreds of thousands of signatures from all parts of India. Taking one present instance in England, the Church party has held till the beginning of October 1,400 meetings known, and many more unknown, against the Education Bill, and petitioned with three-quarters of a million signatures and many demonstrations. Since then they have been possibly more and more active. Agitate, agitate over the whole length and breadth of India in every nook and corner—peacefully, of course—if we really mean to get justice from John Bull. Satisfy him that we are in earnest. The Bengalis, I am glad, have learnt the lesson and have led the march. All India must learn the lesson—of sacrifice of money and of earnest personal work.

Agitate, to agitate means inform. Inform the Indian people what their rights are and why and how they should obtain them, and inform the British people of the rights of the Indian people and why they should grant them. If we do not speak, they say we are satisfied. If we speak, we become agitators. The Indian people are properly asked to act constitutionally while the government remains unconstitutional and despotic.

Next about the "settled fact". Every Bill defeated in Parliament is a "settled fact". Is it not? And the next year it makes its appearance again. The Education Act of 1902 was a settled fact. An Act of Parliament, was it not? And now within a short time what a turmoil is it in! And what an agitation and excitement has going on about it and is till in prospects. It may lead to a clash between the two Houses of Parliament. There is nothing as an eternal "settled fact". Times change, circumstances are misunderstood or change, better light and understanding, or new forces come into play, and what is settled to-day may become obsolete to-morrow.

The organization which I suggest, and which I may call a band of political missionaries in all the Provinces, will serve many purposes at once—to inform the people of their rights, as British citizens, to prepare them to claim those rights by petitions, and when the rights are obtained as sooner or latter they must be obtained, to exercise and enjoy them.

"Swadeshi" is not a thing of to-day. It has existed in Bombay as far as I know for many years past. I am a free-trader, I am a Member, and in the Executive Committee of the Cobden Club for 20 years, and yet I say that "Swadeshi" is a forced necessity for India in its unnatural economic muddle. As long as the economic condition remains unnatural and impoverishing, by the necessity of supplying every year some Rs. 200,000,000 for the salary, pensions, &c. of the children of a foreign country at the expense and impoverishment of the children of India, to talk of applying economic laws to the condition of India is adding insult to injury. I have said so much about this over and over again that I would not say more about it here—I refer to my book. I ask any Englishman whether Englishmen would submit to this unnatural economic muddle of India for a single day in England, leave alone 150 years? No, never. No, Ladies and Gentlemen, England will never submit to it. It is, what I have already quoted in Mr. Morley's words, it is "the meddling wrongly with economic things that is going to the

very life, to the very heart, to the very core of our national existence."

Among the duties which I have said are incumbent upon the Indians, there is one which thought I mention last, is not the least. I mean a thorough political union among the Indian people of all creeds and classes. I make an appeal to all—call it mendicant, if you like—I am not ashamed of being a mendicant in any good cause and under necessity for any good cause. I appeal to the Indian people for this, because it is in their own hands only, just as I appeal to the British people for things that are entirely in their hands. In this appeal for a thorough union for political purposes among all the people, I make a particular one to my friends the Mahomedans. They are manly people. They have been rulers both in and out of India. They are rulers this day both in and out of India. They have the highest Indian Prince ruling over the largest of Native States, viz., H.H. the Nizam. Among other Mahomedan Princes they have Junagad, Badhanpur, Bhopal and others.

Notwithstanding their backward education they have the pride of having had in all India the first Indian Barrister in Mr. Budrudin Tyabji and first Solicitor in Mr. Kamrudin Tyabji, two Mahomedan brothers. What a large share of Bombay commerce is in the hands of Mahomedans is well-known. Their chief purpose and effort at present must be to spread education among themselves. In this matter, among their best friends have been Sir Syed Ahmed and Justice Tyabji, in doing their utmost to promote education among them. Once they bring themselves in education in a line with the Hindus they have nothing to fear. They have in them the capacity, energy and intellect to hold their own and to get their due share in all the walks of life—of which the State services are but a small part. State services are not everything.

Whatever voice I can have, I wish Government would give every possible help to promote education among the Mahomedans. Once self-government is attained, then will there be prosperity enough for all, but not till then. The thorough union, therefore, of all the people for their emancipation is an absolute necessity.

All the people in their political position are in one boat. They must sink or swim together, without this union all efforts will be vain. There is the common saying–but also the best commonsense—"United we stand–divided we fall."

There is one other circumstance, I may mention here. If I am right, I am under the impression that the bulk of the Bengali Mahomedans were Hindus by race and blood only a few generations ago. They have the tie of blood and kinship. Even now a great mass of the Bengali Mahomedans are not to be easily distinguished from their Hindu brothers. In many places they join together in their social joys and sorrows. They cannot divest themselves from the natural afinity of common blood. On the Bombay side the Hindus and Mahomedans of Gujarat all speak the same language, Gujarati, and are of the same stock, and all the Hindus and Mahomedans of Maharashtra Annan—all speak the same language, Marathi, and are of the same stock—and so I think it is all over India, excepting in North India, where there are the descendants of the original Mahomedan invaders, but they are now also the people of India.

Sir Syed Ahmed was a nationalist to the backbone. I will mention an incident that happened to myself with him. On his first visit to England, we happened to meet together in the house of Sir C. Wingfield. He and his friends were waiting,

and I was shown into the same room. One of his friends recognising me introduced me to him. As soon as he heard my name he at once held me in a strong embrace and expressed himself very much pleased. In various ways I knew that his heart was in the welfare of all India as one nation. He was a large and liberal-minded patriot. When I read his life some time ago, I was inspired with respect and admiration for him. As I cannot find my copy of his life I take the opportunity of repeating some of his utterances, which Sir Henry Cotton has given in *India* of 12th October last.

Mahomedans and Hindus were, he said, the two eyes of India. Injure the one and you injure the other. "We should try to become one in heart and soul and act in unison; if united, we can support each other; if not the effect of one against the other will tend to the destruction and downfall of both."*

*Presidential address 1906, Calcutta Congress Presidential Speeches—West Bengal Pradesh Congress Committee.

পরিশিষ্ট-৬

ভারতের বিপ্লবী চেতনা বিকাশে ও বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলায় অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল শ্রীঅরবিন্দের এই রচনাটি। সুদীর্ঘকাল রচনাটির কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় সরকার এটি উদ্ধার করেন।*

ভবানী মন্দির

শ্রীঅরবিন্দ

ওঁ

নমঃ চণ্ডীকায়ৈ

মা ভবানীর জন্য গিরিগর্ভে এক মন্দির নির্মাণ করিতে হইবে। মায়ের সকল সন্তানকে এই পুণ্যকার্যে সাহায্যের জন্য আহ্বান করা হইতেছে।

ভবানী কে?

মা ভবানী কে? কেনই বা তাঁহার জন্য আমরা মন্দির নির্মাণ করিব?

ভবানী অসীমা শক্তি

শাশ্বতের চক্র মহাবলে তার পথে আবর্তিত হইয়া চলে—বিশ্বের অন্তহীন বিপ্লব শ্রেণির মধ্যে অসীমা শক্তি শাশ্বতের মধ্য হইতে উৎসারিত হইয়া চক্রকে পরিচালিত করে, মানুষের দৃষ্টিপথে তাহা নানা আকৃতি নানা রূপ লইয়া আবির্ভূত। এক একটি রূপ এক একটি যুগ চিহ্নিত বা সৃষ্টি করে। কখনো তিনি প্রেম, কখনো জ্ঞান, কখনো তিনি বৈরাগ্য, কখনো কারুণ্য। এই অসীমা শক্তিই ভবানী, তিনি দুর্গা, তিনি কালী, তিনি প্রেমময়ী রাধা, তিনি লক্ষ্মী, তিনিই আমাদের মা এবং সকলের

ভবানী শক্তি

বর্তমান যুগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছেন শক্তিরূপিণী জননীরূপে। তিনি বিশুদ্ধা শক্তি।

শক্তিরূপিণী জননীর বিশ্ব ব্যাপিয়া প্রকাশ

এস, চক্ষু তুলিয়া দৃষ্টি দেই আমাদের চারিপার্শ্বের পৃথিবীর উপর। যেখানেই দৃষ্টিপাত করি, সেখানেই উত্থিত হইতেছে দেখি বিপুলায়তন শক্তি, প্রচণ্ড খরগতি দুর্নিবার শক্তিরাজি, বলের নানা বিশাল মূর্তি, শক্তির দারুণ সর্বগ্রাসী সব স্রোতঃপ্রবাহ। সকল জিনিস বৃহৎ ও বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে। রণ-শক্তি, ধন-শক্তি, বিজ্ঞান-শক্তি দশগুণ দুর্ধর্ষ ও অতিকায়, সহস্রগুণ রুদ্রতর, দ্রুততর কর্মব্যাপৃত, অতীতের ইতিহাসে উল্লিখিত সকলের চেয়ে বেশি অজস্র সম্বলে অস্ত্রশস্ত্রে যন্ত্রে সমৃদ্ধ। মা সর্বত্র কর্মে রত; তাঁর রূপদাতৃ অজেয় হস্তে সৃষ্ট বিশাল রাক্ষস, অসুর, দেববাহিনী বিশ্বরণাঙ্গনে সবেগে অবতীর্ণ। পশ্চিমে মহাসাম্রাজ্যগুলির ধীর অথচ ক্রমে প্রচণ্ড আবির্ভাব দেখিলাম, দেখিলাম

* সুকুমার দত্ত সম্পাদিত "নবজীবন"

জাপানের দ্রুত অদম্য অধীর বেগভরে এক নবজীবন লাভ। কতকগুলি ম্লেচ্ছশক্তি—শক্তি অশুদ্ধ তমঃ অথবা রজঃভাবে আচ্ছন্ন কৃষ্ণ অথবা ঘোর রক্তবর্ণ; আর কতকগুলি আর্যশক্তি—বৈরাগ্য ও পূর্ণ আত্মত্যাগের পবিত্র শিখায় স্নাতঃ কিন্তু এ সবই নবরূপে মা—মা নবরূপদায়িনী, সৃষ্টিকারিণী। পুরাতনের মধ্যে তিনি ঢালিয়া দিতেছেন তাঁর শক্তি ; নূতনকে মন্থন করিয়া জাগাইয়া তুলিতেছেন তিনি।

আমরা ভারতে শক্তির অভাবে সর্বত্র বিফল

ভারতবর্ষে শ্বাস বহে ধীরে, অনুপ্রেরণার গতি বিলম্বিত। প্রাচীন জননী ভারতী, আবার জন্মিতে চাহিতেছেন, অশ্রু ও যন্ত্রণার মধ্যে অপরিসীম তাঁর প্রয়াস, কিন্তু মনে হয় বৃথাই এ প্রয়াস। কোথায় তাঁর দুঃখ যিনি প্রকৃতই এত বিরাট, যিনি হইতে পারেন পরম শক্তিশালিনী? কোথাও নিশ্চয়ই কোনো দারুণ ত্রুটি, কোনো প্রাণদ জিনিসের অভাব আছে আমাদের ; সে ত্রুটি নির্দেশ করা কঠিন কিছু নয়। অন্য সব জিনিস আমাদের আছে, শুধু নাই শক্তি, উদ্যম।

আমরা শক্তিকে ত্যাগ করিয়াছি, শক্তিও আমাদের ত্যাগ করিয়াছেন। আমাদের হৃদয়ে, মস্তিষ্কে, বাহুতে মা নাই।

নবজন্মের ইচ্ছা আমাদের প্রচুর, সেদিকে অভাব নাই। ধর্ম, সমাজ ও রাজনীতি লইয়া এ যাবৎ কত না চেষ্টা, কত না আন্দোলনের আরম্ভ হইল! অথচ এক নিয়তি তাহাদের গ্রাস করিয়াছে, কিম্বা করিতে উদ্যত। তারা ক্ষণকালের জন্য স্ফূর্ত হয়, তারপর উদ্যম হ্রাস পায়, আগুন নিভিয়া যায়, আর যদি একান্তই বাঁচিয়া থাকে তবে শূন্য খোসা হিসাবে, সে বস্তুর ভিতর হইতে ব্রহ্ম অন্তর্হিত কিম্বা তাহার মধ্যে তমঃ দ্বারা আবিষ্ট, নিষ্ক্রিয়। আমাদের আরম্ভ বিপুল, কিন্তু তাহার না আছে পরিণাম-ধারা না ফল।

বর্তমানে আর এক দিকে আমরা আরম্ভ করিয়াছি; দরিদ্র দেশকে সমৃদ্ধ ও পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে আমরা যন্ত্র-শিল্প বিষয়ে এক মহা আন্দোলন শুরু করিয়াছি। অনভিজ্ঞ আমরা বুঝিতেছি না যে প্রথমে যদি আসল জিনিসটি না চাই, শক্তিসঞ্চয় না করি, তবে এই আন্দোলনও অন্যগুলির মতই দশা প্রাপ্ত হইবে।

শক্তির অভাবে আমাদের জ্ঞান মৃত বস্তু

কিসের অভাব? জ্ঞানের? যে-দেশে মানুষের আবির্ভাবের দিন হইতে জ্ঞান সঞ্চিত ও বর্ধিত হইয়াছে সে দেশে জন্মিয়া ও পালিত হইয়া আমরা নিজের ভিতরে বহন করিতেছি শত সহস্র বৎসরের উত্তরাধিকার। এখনও আমাদের মধ্যে মহাজ্ঞানীরা জন্মিয়া সেই সম্পদ বৃদ্ধি করিতেছেন—আমাদের যোগ্যতা সঙ্কুচিত হয় নাই, আমাদের বুদ্ধির ধার নিষ্প্রভ বা স্থূল হয় নাই, তাহার গ্রহণসামর্থ্য ও সুনম্যতা পূর্বের মতই বিচিত্র। কিন্তু পায়ের জন্য আশ্রয়দণ্ড কিংবা হাতের অস্ত্র না হইয়া এ যেন কি একটা প্রাণহীন জ্ঞান, স্কন্ধের উপর দুর্ভার একটা অন্তঃক্ষয়কারী বিষ ; কারণ সকল মহৎ জিনিসের প্রকৃতিই এই যে, তাহার অব্যবহার বা অপব্যবহার করিলে সে অধিকারীর উপর নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহাকেই ধ্বংস করে।

তবে দেখিতেছি আমাদের জ্ঞান বিপুল তমোভারে পিষ্ট হইয়া অসামর্থ্য ও আলস্যের অভিশপ্ত রূপ নিয়াছে। আজকাল আমরা স্বপ্ন দেখি যে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিলেই সর্বসিদ্ধি। প্রথমে নিজেকে জিজ্ঞাসা করা যাক্, যে-জ্ঞান ইতিমধ্যেই আমরা পাইয়াছি তাহার কি করিয়াছি, কিংবা যাঁহারা ইতিমধ্যে বিজ্ঞান আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহারা ভারতবর্ষের জন্য কি করিতে পারিয়াছেন? পরানুকরণপ্রিয় নিরুদ্যোগী আমরা চেষ্টা করিলাম ইংলণ্ডের ধারা অনুকরণ করিতে, কিন্তু শক্তি পাইলাম না; এখন আরো উদ্যমশীল জাপানের অনুকরণ করিতে চাই ; বেশি সফলতা লাভের আশা আছে কি? য়ুরোপের বিজ্ঞান যে বিদ্যার দারুণ শক্তি তাহা রাক্ষসের হাতের উপযুক্ত অস্ত্র, তাহা ভীমের গদা;

দুর্বলে তাহা ঘুরাইবার চেষ্টা করিলে তাহার ভারে নিজেই পিষ্ট হইবে।

শক্তি ছাড়া আমাদের ভক্তি মৃত ও নিষ্ক্রিয়

আমাদের কি তবে প্রেম, উৎসাহ, ভক্তির অভাব? এসব ভারতীয় প্রকৃতির মজ্জাগত, কিন্তু শক্তির অবর্তমানে আমরা মনঃসংযোগ করিতে পারি না, তাহাকে নিয়ন্ত্রণ এবং সংরক্ষণও করিতে পারি না। ভক্তি লেলিহান শিখা, শক্তি সমিধ। আগুনে সমিধ না দিলে তা কতক্ষণ জ্বলে?

জ্ঞানে উদ্ভাসিত কর্মের দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত এবং অসীম শক্তিসমৃদ্ধ এক দৃঢ় সত্তা প্রেম ও শ্রদ্ধাভরে নিজেকে ভগবানের দিকে তুলিয়া ধরে যখন তাহাই ভক্তি, সে-ভক্তি স্থায়ী হয় ও আত্মাকে ভগবানের সঙ্গে চিরতরে যুক্ত করিয়া রাখে। কিন্তু দুর্বল প্রকৃতি আদর্শ ভক্তির মত এরূপ প্রবল জিনিসের বেগ ধারণ করিতে পারে না ; ক্ষণিকের জন্য ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় সে, তখন শিখা স্বর্গের দিকে উঠিয়া চলে, তারপরেই আবার সে পড়িয়া থাকে পূর্বাপেক্ষা বেশি অবসন্ন বেশি দুর্বল হইয়া। যে আন্দোলনের প্রাণ কেবল উৎসাহ ও আকুলতা তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য, যে মানুষী আধার হইতে তাহার জন্ম তাহা যদি ভঙ্গুর অসার হয় তবে সে শীঘ্র জ্বলিয়া নিঃশেষ হইয়া যায়।

ভারতের একমাত্র প্রয়োজন শক্তি

যত গভীরভাবে দেখি ততই উপলব্ধি করি যে আমাদের যা নাই, যা আমাদের সর্বাগ্রে অর্জন করা উচিত তা শক্তি—শারীরিক শক্তি, মানসিক শক্তি, নৈতিক শক্তি এবং সবার উপরে সকল জিনিসের অন্তহীন ও অবিনশ্বর উৎস, আধ্যাত্মিক শক্তি। যদি শক্তি পাই তবে অন্য সব জিনিস সহজে আপনিই আসিবে। শক্তি না থাকিলে আমরা স্বপ্নাবিষ্ট মানুষের মত—হাত আছে কিন্তু ধরিতে পারি না, পা আছে কিন্তু দৌড়াইতে পারি না।

মনোবলে জরা ও জীর্ণতাগ্রস্ত ভারতের পুনর্জন্ম আবশ্যক

যখন আমরা কিছু করিতে যাই তখন দেখি উৎসাহের প্রথম ঝোঁক কাটিতেই এই অসহায়তার পক্ষাঘাত আমাদের ধরিয়া বসে। দীর্ঘজীবী বহু-অভিজ্ঞ বৃদ্ধদের ক্ষেত্রে দেখা যায় জ্ঞানের আধিক্যই যেন তাঁহাদের কর্মশক্তি ও ইচ্ছাশক্তিকে অচল করিয়া ফেলে। যখন কোনো প্রবল আবেগ অথবা মহৎ প্রয়োজন তাঁহাদের আশ্রয় করে, সে প্রেরণা কর্মে পরিণত করিবার প্রয়োজন হয়, তখন তাঁহারা ইতঃস্তত করেন, চিন্তা ও বিচার-বিতর্ক করিতে বসেন, একটু আধটু চেষ্টা করিয়া ছাড়িয়া দেন, স্পষ্ট সোজা রাস্তা ছাড়িয়া সহজ ও নিরাপদ পথের আশায় বসিয়া থাকেন। এইরূপে কাজের সময় ও সুযোগ চলিয়া যায়। জাতি হিসাবেও আমরা এই বৃদ্ধের মত জ্ঞানসমৃদ্ধ, আকাঙ্ক্ষা ও অনুভূতি-সমর্থ, কিন্তু বার্ধক্যের জড়তা, ভীরুতা ও দুর্বলতার দ্বারা পক্ষাঘাতগ্রস্ত। ভারতবর্ষকে বাঁচিতে হইলে আবার যৌবন পাইতে হইবে। প্রখর তরঙ্গিত-শক্তির বহু স্রোত তাহার মধ্যে ঢালিয়া দিতে হইবে। ; তাহার অন্তরাত্মাকে আবার পূর্বেকার মত হইতে হইবে—বিশাল বলীয়ান, ইচ্ছামত শান্ত অথবা রুদ্র এক কর্মের ও শক্তির ঊর্মিমালা।

ভারতের পুনর্জন্ম সম্ভব

আমাদের মধ্যে অনেকে একান্ত তমোগ্রস্ত হইয়া ঘোরকায় স্থূলভার আলস্য-অসুরের কবলিত হইয়া আজকাল বলিতেছেন—ইহা অসম্ভব, ভারতবর্ষ জরাজীর্ণ রক্তশূন্য ও প্রাণশূন্য, এত দুর্বল যে আর কখনো উঠিতে পারে না, জাতি হিসাবে আমাদের নিয়তি মৃত্যু। ইহা অর্থহীন প্রলাপ। নিজে ইচ্ছা না করিলে কোন মানুষ বা জাতি দুর্বল হইতে পারে না, নিজে স্বেচ্ছায় না চাহিলে কোনো মানুষ বা জাতির মৃত্যু হয় না।

নেশন বা জাতি কি?—তার লক্ষ লক্ষ লোকের শক্তি

কারণ দেশ বা জাতি কি? আমাদের মাতৃভূমি কি? তা শুধু একখণ্ড ভূমি নয়, একটা ভাষার অলঙ্কার নয়, মনের কল্পনা নয়। তা এক মহাশক্তি, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যত ব্যষ্টি দিয়া দেশ গঠিত তাদের সকলের মিলিত শক্তি, যেমন মহিষমর্দিনী ভবানী আবির্ভূত হইয়াছিলেন একতাবদ্ধ অগণিত দেবতাদের অভিন্ন বিশাল শক্তি-সংহতি হইতে। যে শক্তিকে বলি ভারতবর্ষ, ভারতী ভবানী, তাহা ত্রিশ কোটি লোকের একত্রবদ্ধ জীবন্ত শক্তি; কিন্তু তিনি নিষ্ক্রিয়, তমের কুহকে বন্দি, সন্তানদের নিজকৃত জড়ত্বে অজ্ঞানে আচ্ছন্ন; তম দূর করিতে হইলে ভিতরের ব্রহ্মকে শুধু জাগাইতে হইবে।

আমরা ইচ্ছামত দেশকে গড়িতে বা ধ্বংস করিতে পারি

শত সহস্র সাধু সন্ন্যাসী তাদের জীবন দিয়া নীরবে কি শিক্ষা দিতেছেন আমাদের? ভগবান রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের উজ্জ্বল মূর্তি কোন বাণী বহন করিতেছে? পুরুষসিংহ বিবেকানন্দের যে ভাষণ জগৎ কম্পিত করিয়াছিল তার মূল কথাটি কি? তাহা এই যে. আমাদের ত্রিশ কোটি মানুষের—সিংহাসনে আসীন রাজা হইতে কর্মবত কুলি সন্ধ্যাপূজায় নিবিষ্ট ব্রাহ্মণ হইতে সর্বজন অস্পৃশ্য 'পারিয়া' সকলেরই অন্তরে রহিয়াছেন ভগবান। আমরা প্রত্যেকেই দেবতা ও স্রষ্টা, কারণ ভগবানের শক্তি আমাদের মধ্যে, আর সারা জীবনই তো সৃষ্টি; নূতন রূপ গড়াকেই কেবল সৃষ্টি বলে না, স্থিতিও সৃষ্টি, লয়ও সৃষ্টি। কি সৃষ্টি করিব তাহা আমাদেরই উপর নির্ভর করে; যেহেতু স্বেচ্ছায় না হইলে আমরা অদৃষ্ট বা মায়ার হাতে পুতুল নই; পরমা শক্তির নানা দিক নানা প্রকাশ আমরা।

ভারতকে পুনর্জন্ম লইতে হইবে, বিশ্বের ভবিষ্যৎ তার পুনর্জন্ম চাহিতেছে

ভারত ধ্বংস পাইতে পারে না, আমাদের জাতি লুপ্ত হইতে পারে না, কারণ মানবগোষ্ঠী সমূহের মধ্যে ভারতের জন্যই নির্দিষ্ট রহিয়াছে সমগ্র মানবজাতির ভবিষ্যৎ হিতার্থে অপরিহার্য এক উজ্জ্বলতম মহত্তম সিদ্ধি। নিজের ভিতর হইতে তাহাকেই সমস্ত জগতের ভাবী ধর্ম তুলিয়া ধরিতে হইবে, সেই সনাতন ধর্ম যাহাতে সকল ধর্ম, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সামঞ্জস্য ও সমন্বয়, যাহা সমগ্র মানবজাতিকে একাত্ম করে। তেমনি নৈতিক ক্ষেত্রে তার লক্ষ্য মনুষ্যের মধ্য হইতে বর্বরতা (ম্লেচ্ছতা) দূর করা, বিশ্বকে আর্যধর্মে দীক্ষিত করা। সে জন্য প্রথমে তাহাকেই আবার আর্য হইতে হইবে।

যে কোনো জাতির পক্ষে এই অতি মহৎ চিত্তচমৎকারী কাজ, একাজের সূচনা করিতেই ভগবান রামকৃষ্ণের আবির্ভাব এবং বিবেকানন্দের প্রচার। এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য যদি না ঘটিয়া থাকে তবে তার কারণ আমরা আমাদের অন্তরাত্মাকে আবার এক ভীষণ তমো মেঘ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছি—ভয়, সন্দেহ, দ্বিধা, আলস্যে একজন ঢালিয়া দিয়াছেন যে ভক্তি তাহা আমরা কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছি, আর একজন দিয়াছেন জ্ঞান তাহাও লইয়াছি; কিন্তু শক্তির অভাবে, কর্মের অভাবে, আমাদের ভক্তিকে জাগ্রত জীবন্ত করিয়া তুলিতে পারি নাই। আমরা যেন স্মরণে রাখি—যে শক্তিরূপিণী মায়ের পূজা করিতেন রামকৃষ্ণ, যাঁর সঙ্গে তিনি যুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি কালী, ভবানী।

কিন্তু ব্যক্তিগত দোষত্রুটির জন্য ভারতের নিয়তি ব্যাহত হইবে না; মা চান মানুষ জাগিবে, তাঁহার পূজা স্থাপনা করিবে ও বিশ্বে ছড়াইয়া দিবে।

শক্তি পাইতে হইলে শক্তিময়ীর পূজা করিতে হইবে।

শক্তি, আরো শক্তি, আরো আরো শক্তি—আমাদের জাতির প্রয়োজন ইহাই। কিন্তু যদি শক্তি চাই তবে শক্তিময়ী মায়ের পূজা না করিলে তাহা কিরূপে পাইব? তিনি নিজের জন্য পূজা চান না, চান যাহাতে আমাদের সাহায্য করিতে পারেন, নিজেকে আমাদের কাছে ধরিয়া দিতে পারেন। ইহা কোনো অসম্ভব কল্পনা নয়, কোনো কুসংস্কার নয়, বরং বিশ্বের সাধারণ নিয়ম। দেবতাদের কাছে না চাহিয়া পাওয়া যায় না—তাঁদের ইচ্ছা সত্ত্বেও। এমন কি পরম শাশ্বতও হঠাৎ মানুষের কাছে আবির্ভূত হন না। সকল ভক্তই নিজের উপলব্ধি দিয়া জানে যে তাঁহার দিকে ফিরিতে হয়; তাঁহাকে চাহিতে হয়, উপাসনা করিতে হয়, তবেই ভাগবতী শক্তি জীবের মধ্যে ঢালিয়া দেন তাঁর অনির্বচনীয় সৌন্দর্য ও আনন্দ। শাশ্বতের সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাঁহা হইতে উদ্ভূত যে শক্তি তার সম্বন্ধেও তাহা সত্য।

সত্য পথ—ধর্ম

পাশ্চাত্যভাবে কবলিত যাঁহারা শক্তির এই প্রাচীর উৎস-সমূহের দিকে পুনরাবর্তনকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন তাঁহারা কয়েকটি অকাট্য বাস্তব সত্য অনুধাবনের চেষ্টা করিতে পারেন।

জাপানের দৃষ্টান্ত

১। এক আধুনিক জাপানে ছাড়া আর কোনো দেশের ইতিহাসে শক্তির এমন বিস্ময়কর আকস্মিক উন্মেষের দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যার জন্য অনেক মতবাদ তৈরি হইয়াছে, কিন্তু জাপানের মনীষীরাই এখন বলিতেছেন তাদের মহাজাগরণের উৎস কোথায়, তাদের অফুরন্ত শক্তির মূল কোনখানে। উৎস ধর্ম। অর্জুন যেমন অনায়াসে তাঁর অজেয় গাণ্ডীবে শর যোজনা করিতেন এই ক্ষুদ্র দ্বীপসাম্রাজ্যটি তেমনই দক্ষতার সহিত পাশ্চাত্য জ্ঞান ও বিজ্ঞানের মারাত্মক অস্ত্র সব ব্যবহার করিয়াছে—তাহার মূলে ওইয়োমেই-র (Oyomei) বৈদান্তিক শিক্ষা, শিন্তো-ধর্মের (Shintoism) পুনরুত্থান এবং জাতীয় শক্তির জীবন্ত বিগ্রহ হিসাবে সম্রাটের, মিকাডোর, পূজা।

ভারতের আধ্যাত্মিক জাগরণের বৃহত্তর প্রয়োজন

২। জাপানের অপেক্ষাও ভারতের অনেক বেশি প্রয়োজন ধর্ম-উৎস হইতে শক্তি সংগ্রহ করা; কারণ জাপানের পক্ষে যে শক্তি পূর্বেই ছিল তাহাকে কেবল পুনরুজ্জীবিত ও পরিপূর্ণ করিতে হইয়াছিল। আমাদের পক্ষে যেখানে শক্তি ছিলই না সেখানে শক্তি সৃষ্টি করিতে হইবে; নিজস্ব স্বভাবের পরিবর্তন করিতে হইবে, নূতন হৃদয় লইয়া নূতন মানুষ হইতে হইবে, নবজন্মই লাভ করিতে হইবে। তাহার জন্য বৈজ্ঞানিক কোনো প্রক্রিয়া নাই, কোনো যন্ত্রপাতিও কিছু নাই। শক্তি সৃষ্টি করা যায় আধ্যাত্মসত্তার আভ্যন্তরীণ অফুরন্ত ভাণ্ডার হইতে, সকল নবসৃষ্টির মূল যে ভগবানের আদ্যাশক্তি তাহা হইতে সঞ্চয় করিয়া। পুনর্জন্ম আর কিছুই নহে, তাহা অন্তরস্থ ব্রহ্মকে জাগরিত করা, সেটি আধ্যাত্মিক সাধনাসাপেক্ষ, শারীরিক বা মানসিক প্রয়াসের সাধ্যায়ত্ত নয়।

জাতির মন স্বভাবতঃ চলে ধর্মের পথে

৩। ভারতের সকল মহাজাগরণ, তাহার সর্বাপেক্ষা শক্তিময় সর্বাপেক্ষা বৈচিত্র্যময় সামর্থ্যের যুগ সব কোনো না কোনো ধর্মাশ্রিত মহাজাগরণের উৎসধারা হইতে তাহাদের প্রাণশক্তি আহরণ করিয়াছে। যেখানে এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ জাগরণ সম্পূর্ণ ও মহৎ হইতে পারিয়াছে সেখানে তাহা যে জাতীয় শক্তির সৃষ্টি করিয়াছে তাহাও হইয়াছে বিপুল ও প্রবল; যেখানে এই ধর্মপ্রতিষ্ঠ জাগরণ

সংকীর্ণ ও অসম্পূর্ণ সেখানে জাতীয় আন্দোলন হইয়াছে দুর্বল, অসম্পূর্ণ ক্ষণস্থায়ী। এই ধর্ম বস্তুটি যে এখনো টিকিয়া আছে তাহার অর্থ জাতির স্বভাবগত সে। অন্য বিদেশি পন্থা লইলে আমরা লক্ষ্যে পৌছিব হয়ত পীড়াদায়ক অতি মন্থরগতিতে, দুঃখযন্ত্রণার মধ্য দিয়া, আংশিকভাবে, কিংবা হয়ত লক্ষ্যে আদৌ পৌছিতেই পারিব না। ভগবান এবং মা তোমাদের জন্য যে সরল পথ নির্দেশ করিয়াছেন, তাহা ত্যাগ করিয়া নিজের সৃষ্ট ক্ষীণ কুটিল পথ কেন বরণ কর?

অন্তরের আত্মাই সকল শক্তির মূল

অন্তরস্থ ব্রহ্ম, আধ্যাত্মবলের এক অদ্বিতীয় শক্তি-সমুদ্র হইতে জড় ও মানস জীবন উৎসারিত। প্রাচীন কালে প্রাচ্যে যেমন, এখন প্রতীচ্যেও তেমনি এই তথ্যটি সকল চিন্তাশীল লোকেরা স্বীকার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাই যদি হয় তবে আধ্যাত্ম বলই অন্য আর সকল শক্তিরই উৎস। এখানেই অতল উৎস, গভীর ও অফুরন্ত ধারা সব। অগভীর বাহিরের ফোয়ারা সহজলভ্য, কিন্তু তা শীঘ্র শুকাইয়া যায়। তবে উপর-উপর না আঁচড়াইয়া গভীরে যাইতে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল নিশ্চয় পাইব।

তিনটি জিনিস প্রয়োজন

তিনটি মূল বিধির অনুসঙ্গী তিনটি জিনিস আমাদের প্রয়োজন।

১। ভক্তি—মায়ের মন্দির

শক্তিরূপিণী জননীর পূজা না করিলে আমরা শক্তি পাইব না। তাই আমরা মন্দির নির্মাণ করিব শ্বেতভুজা ভবানী, শক্তিরূপিণী জননী, ভারতমাতার জন্য; সে মন্দির নির্মাণ করিব বিষস্বরূপ আধুনিক সহরমালার সংসর্গ হইতে দূরে, জনপদ-চিহ্নমুক্ত নির্জনে, শান্ত ও শক্তিগর্ভ উচ্চাকাশের পবিত্রতার মধ্যে। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া তাঁহার পূজা সমস্ত দেশ ছাইয়া যাইবে; পর্বতের কোলে পূজিত তিনি তখন আগুনের মতো তাঁহার ভক্তদের অন্তরে অন্তরে ছড়াইয়া পড়িবেন। মায়ের আদেশও তাই।

২। কর্ম—নূতন ব্রহ্মচারী সঙ্ঘ

যে ভক্তি কর্মে প্রতিষ্ঠিত হয় না তাহা মৃত, নিরর্থক। মন্দির-সংলগ্ন মঠে থাকিবে মায়ের কাজের জন্য সর্বত্যাগী নূতন কর্মযোগীর দল। যাহারা ইচ্ছা করে তারা সম্পূর্ণ সন্ন্যাসী হইয়া থাকিতে পারে; অধিকাংশই হইবে ব্রহ্মচারী—তাহারা নির্দিষ্ট কর্ম শেষ করিয়া গৃহস্থাশ্রমে ফিরিয়া যাইবে। কিন্তু সকলকেই নিষ্কাম ত্যাগী হইতে হইবে।

কি জন্য?—দুইটি কারণ ঃ—

১। কারণ, যত আমরা শারীরিক বাসনা ও আসক্তি হইতে মুক্ত হই, যত কাম, লোভ, মোহ ও স্থূল জগতের তামসিকতা হইতে মুক্ত হই, ততই আমাদের ভিতরকার আধ্যাত্মিক শক্তি সমুদ্রের কাছে ফিরিয়া যাই।

২। কারণ, শক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজন একান্ত একাগ্রতা; বর্ষা যেমন নিক্ষিপ্ত হইয়া তাহার লক্ষ্যের দিকে ছুটিয়া চলে, মনকেও তেমনি তার লক্ষ্যের উপর সম্পূর্ণ তদ্‌গত হইতে হইবে; অন্য চিন্তা, অন্য ইচ্ছা যদি মনকে বিক্ষিপ্ত করে তবে বর্ষা পথভ্রষ্ট ও লক্ষ্যচ্যুত হইবে। আমরা এমন কয়েকজন লোক লইয়া একটি মূলকেন্দ্র গড়িতে চাই যাহাদের মধ্যে শক্তি চরম পূর্ণতা লাভ করিবে, ব্যক্তিসত্তার প্রতি অঙ্গ পরিপ্লাবিত করিয়া ছাপাইয়া গিয়া পৃথিবীকে উর্বরা করিবে। বুদ্ধিতে

ও হৃদয়ে অগ্নিময়ী ভবানীকে ধারণ করিয়া তাহারা আমাদের দেশের দূর দূরান্তরে বিচরণ করিবে, সে শিখা ছড়াইয়া দিবে।

৩। জ্ঞান—মহাবাণী

জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে ভক্তি ও কর্ম সম্পূর্ণ বা স্থায়ী হয় না। মঠের ব্রহ্মচারীরা তাহাদের অন্তরাত্মা জ্ঞানে ভরিয়া তুলিবে, অচলগিরিস্বরূপ তাহাকেই কর্মের ভিত্তি করিবে। আর তাহাদের জ্ঞানের ভিত্তি হইবে কি? ভিত্তি হইবে 'সোঽহং' এর উদাত্ত বাণী, বেদান্তের সেই মহামন্ত্র, সেই সনাতন উদ্‌গীথ সমস্ত জাতির অন্তরে যা এখনো পৌঁছায় নাই, সেই জ্ঞান যাহা কর্ম ও ভক্তির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া মানুষকে সর্বভয়মুক্ত সর্বদৌর্বল্যমুক্ত করিবে।

মায়ের বাণী

তোমরা জিজ্ঞাসা কর, মা ভবানী কে? তিনিই তাহার উত্তর দিতেছেন, "বিশ্বের ও তোমাদের মধ্যে যিনি শাশ্বত তাঁহা হইতে উদ্ভূত অনন্ত শক্তি আমি। আমি বিশ্বজননী, সর্বলোকের মাতা, আর তোমাদের—তোমরা যাহারা এই পুণ্যস্থান আর্যভূমির মৃত্তিকায় গঠিত, তাহার সূর্যালোকে ও বাতাসে পুষ্ট—তোমাদের কাছে আমি ভবানী ভারতী, ভারত-মাতা।"

আবার তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ভবানীর জন্য, মায়ের জন্য কেন মন্দির গড়িব? তার উত্তরে তিনিই বলিতেছেন, "কারণ, তাহাই আমার আদেশ, কারণ ভবিষ্যৎ ধর্মের জন্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়া ভগবানের আশু ইচ্ছা পালন করিলে, পুণ্য অর্জন করিলে, এ জন্মে হইবে সবল, পরজন্মে মহান। এইরূপে একটি দেশ সৃষ্টি করিতে, একটি যুগের প্রতিষ্ঠা করিতে, জগৎকে আর্যধর্মাশ্রয়ী করিতে সাহায্য করা হইবে। সে দেশ তোমার নিজের, সে যুগ তোমার এবং তোমার সন্তানদের, সে জগৎ গিরি-সাগরবেষ্টিত একখণ্ড ভূমি মাত্র নয়,—কোটি কোটি লোক পূর্ণ সমগ্র পৃথিবী।"

তবে এস, মায়ের আহ্বান শুন। আমাদের অন্তরেই তিনি আছেন—এখন নিজেকে প্রকাশ করিতে উৎসুক, পূজা গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক,—তবে নিষ্ক্রিয়, কারণ আমাদের অন্তরস্থ ভগবান তম দ্বারা আবৃত, এই নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা মা নিজেও বিব্রত, তিনি দুঃখিত কারণ তাঁর সন্তানরা সাহায্যের জন্য তাঁহাকে ডাকে না। তবে তোমরা যারা অন্তরে তাঁর আহ্বান শুনিতেছ, তোমরা অহংয়ের কালো পর্দাখানি দূরে ফেলিয়া দাও, আলস্যের কারাপ্রাচীর চূর্ণ কর, স্বতঃপ্রেরণায় যে যেমন পার তাঁর সেবা কর—কায় মন বাক্যের সাহায্যে, বিত্ত দিয়া, অর্চনা দিয়া, পূজা দিয়া, প্রত্যেকে আপন অপন সামর্থ্য অনুসারে। দূরে সরিয়া থাকিও না, কারণ যাহারা তাঁহার ডাক শুনিয়া তাহাতে কর্ণপাত করে নাই তাঁহার আবির্ভাবের দিনে তাঁহার রুদ্রমুখ দর্শনই সম্ভব তাহাদের; আর যাহারা তাঁহার আগমণের পথ এতটুকুও সুগম করে তাহাদের প্রতি জননী তিনি ফিরিবেন তাঁহার জ্যোতিরুদ্ভাসিত সস্মিত আননে।

পরিশিষ্ট-৭

DEBAJYOTI BURMAN

SISTER NIVEDITA AND INDIAN REVOLUTION*

November 15, 1895 is a landmark in the history of Indian Revolution. On that day Miss Margaret Noble met Swami Vivekananda in London. Miss Noble was a child and a product of the Irish Revolution. Her father was an active member in the Irish Sein Finn movement.

A number of Irish revolutionary centres had been developed in Ireland and England, particularly in London. Miss Noble was directing the London centres when she met Swami Vivekananda there. She was greatly influenced by Parnell and Kropotkin before she met her Master. Her mental make up was a synthesis of the Irish Sein Finn and Russian Nihilist revolutionary thought. She came into direct contact with Kropotkin for four years from 1891 to 1895 and received a complete training in the technique of terrorism and armed revolution.

The revolutionaries of all the three countries, Russia, Ireland, and India, were passing through a grim struggle. Russian revolutionaries were fighting for emancipation from Czarist oppression and those in Ireland and India were struggling hard for winning their motherland's freedom. Miss Noble accepted Swami Vivekananda as her Master and adopted his land of birth as her own motherland. She had gained experience in co-ordinating and directing the activities of the Irish revolutionary societies. She now transferred her activity to India.

Miss Noble came to India and became Sister Nivedita in 1898. She went with Swamiji to Almora and took her first charge on Indian Nationalism from him. In his heart of hearts Swamiji was a revolutionary. After the Chapekar brothers were convicted and sentenced to death for murdering Plague Officer Rand and Lt. Ayrst., at Poona, he had burst out and said that golden statues of these martyrs should be erected at the India Gate in Bombay.

In 1900, Swamiji went to Paris and visited the exhibition there. Nivedita accompanied him. In 1902 Nivedita returned to Calcutta. Meanwhile Okakura, a well known art critic and revolutionary of Japan, came to Swamiji. Okakura came into contact with Nivedita. On July 4 that Year, Swamiji died. In front of the burning funeral pyre Nivedita stood motionless. After the flames had consumed Swamiji's mortal remains, she left muttering : Swamiji has given me a charge, I must do it.

Soon after Swamiji's death, Nivedita went out to tour Western and Southern India. At Poona, she met the mother of the Chapekar brothers, saluted her in Indian fashion and stood silent before her. Everywhere she went she delivered speeches supporting Indian cause for freedom. After her return to Calcutta, she was summoned to the Belur Math. Swami Brahmananda gave her two choices and said : "Either you give up politics or leave Belur Math." She replied : "I can't

* Nivedita Commemoration Volume. 1968.

leave politics". It was possible for Swami Vivekananda alone to accommodate Nivedita. Brahmananda advised her to publish an open letter in some newspaper that she was leaving the Math voluntarily. Her friend Ratcliffe was then the Editor of the *Statesman*. The letter desired by Brahmananda was published in it.

About two weeks after Swamiji's death, the *Amrita Bazar Patrika* published a news on July 19, 1902, in which it was stated that "it has been decided between the members of the order at Belur Math and Sister Nivedita that her work shall henceforth he regarded as free and entirely independent of their sanction or authority." After Nivedita's South and West Indian tour and the publication of reports of her speeches in the newspapers, particularly the report of her Madras speeches in the *Hindu*, the Sannyasis of the Math got alarmed. The news in the *Amrita Bazar Patrika* was just a declaration that Nivedita's political activities had no sanction of the Math but this time a complete separation between the two was publicly announced. Nivedita was asked to make this announcement and she obeyed.

When Nivedita went to Baroda, R.C. Dutta, I.C.S. came to receive her at the railway station and Aurobindo Ghosh, the future revolutionary leader of India, accompanied him. Nivedita and Aurovindo first met at the station.

By that time, a secret revolutionary society had been formed in Gujrat and Thakore Saheb was its President. When Thakore Saheb went to Japan Aurobindo acted as President. He was making secret visits to Calcutta and trying to form revolutionary societies in Bengal. Aurobindo went to Midnapore and ceremonially initiated Hem Kanungo in revolutionary doctrine.

Nivedita and Aurobindo planned the future course of revolutionary action in the country. Until then, Aurobindo had only theoretical knowledge of a revolutionary movement. Nivedita had practical experience of it. Aurobindo had only heard of the Sein Finns, Nivedita intimately worked with them. Aurobindo had just started formation of revolutionary societies, Nivedita had experience in their co-ordination and direction. Aurobindo was then thirty, Nivedita five years older. Both promised to work together for winning freedom for Mother India.

In Calcutta, Nivedita took charge of the secret societies set up by Aurobindo. By that time she had acquired a number of good books. She made a gift of her library to the secret society. It contained books like *Prosperous British India?* by William Digby, *Economic History of India* by R. C. Dutt, *Poverty and un-British Rule in India* by Naoraji etc. Both Aurobindo and Nivedita felt that the boys of the secret society needed a thorough training not only in revolver-shooting but also good knowledge of the economic exploitation of the country. Nivedita played with a revolver when, she talked with these young people so that their timidity in the handling of arms might be removed.

Nivedita could not tolerate any reflection on Indian tradition and culture. She was present at tne Calcutta University Convocation when Lord Curzon in his Chancellor's address insinuated that Eastern people were fond of exaggerations and did not always adhere to truth.

After the meeting was over, Nivedita dragged Sir Gooroodas Banerjee to the Imperial Library, showed him Lord Curzon's book *The Problem of the East* and proved that the Viceroy himself was guilty of exaggeration. This happened six months before the Partition of Bengal. Lord Curzon's uncalled for and uncharitable

remark opened up the floodgate of public protest and Nivedita was the first to open the gate.

After the Partition of Bengal, the entire province was in flames. In this difficult and critical situation, Nivedita kept her head cool and participated equally in the secret revolutionary movement as well as in the open extremist protest movement. She acted as a bridge not only between the revolutionaries and the extremists but also between the former two and the moderator. She was intimate with Aurobindo the revolutionary, Bepin Pal the extremist and Gokhale the moderate.

Dawn Society, founded by Satish Mukherjee, played a distinctive role in the Swadeshi movement. This society undertook to impart complete political training to the young people. Nivedita joined it. She spoke there, she regularly contributed to the *Dawn Magazine*. The *Dawn Magazine* had a wide circulation in the U.K. and U.S.A. This magazine has been considered as the exponent of the political philosophy of Swadeshi movement which went hand in hand with the revolutionary struggle and many of its articles came from the pen of Nivedita. In a speech at the Dawn Society Nivedita said : "When will arise the veritable fighter for the good cause again, with the Geeta in the one hand and the sword in the other?" Both Aurobindo and Nivedita agreed that in the Indian Revolution Geeta and Sword, soul force and physical force, must go together.

Hemchandra Kanungo was sent to Paris for learning the technique of bomb manufacture. Before his return Ullaskar Datta had discovered a formula and wanted a suitable place to test it. Nivedita requested Sir. J. C. Bose to ask Sir P. C. Ray to permit his laboratory to be so used. The great chemist agreed. He began to be forgetful about his keys when he left the laboratory. Barindra Kumar Ghosh, Ullaskar Datta and some others came there in the evening and worked on their formula. In the early hours of the morning, when the youths had left, Sir P. C. Ray came, examined the laboratory and found that most of the explosive chemicals and acids had vanished. He cleaned all the apparatus, set the laboratory in order for the day and left. This was something which Nivedita alone could do. The Criminal Intelligence police started suspecting her and she noticed that she was being watched.

In August 1905, Nivedita fell seriously ill suffering from typhoid fever. Her small Baghbazar residence was found very unsuitable for her treatment. The doctors advised removal to a hospital but she refused to be treated in a British hospital. She was then removed to a commodious house near Sir J. C. Bose's residence. Dr. Nilratan Sircar undertook her treatment. At times it was felt that there was no hope for her life. But she recovered. She was removed to Darjeeling for convalescence. The secret police had meanwhile become inactive about her.

In December 1905, Nivedita went to Banaras Congress. She opened an office in a narrow lane at Tilbhandeswar. Extremists and moderates all came there. Maharaja of Baroda came there with R. C. Dutt. Gokhale came regularly. He was the President of that session and had difference of opinion with extremists like Bipin Pal over the Boycott resolution from Bengal. Nivedita never came out, she worked from behind and the entire Congress may be said to have been a Nivedita show. At the insistence of Nivedita, Gokhale in his Presidential address supported the Boycott movement of Bengal. Everyday Nivedita sent report of the Congress session to her friend Ratcliffe, editor of the *Statesman*, in one of which she asserted

that Congress politics was not party politics, it was part of a national movement.

In 1907, police again became very active. Nivedita had to be cautious and virtually went underground. She actively supported Aurobindo's ideal, namely, complete freedom without any tie with the British, won through a series of terrorist actions, guerilla war and finally after winning over the army, open armed revolt.

Nivedita's idea about secret societies was that they must be away from the cities and extablished in the villages. All such societies must be so organised that they could rise in an all India armed revolt all at once. Even the village women must render their share of help by sheltering the absconders, feeding them and hiding their arms. This method, in her opinion, would provide more effective protection against a search for the revolutionaries in the countryside. Tagore had warned her but she did not listen to him.

After the arrest of Lala Lajpat Rai and Sardar Ajit Singh, a protest meeting was held in the Calcutta Town Hall. Nivedita spoke on Dynamic Religion. The great orator Bepin Pal commented : It was not Dynamic Religion, it was Dynamite.

When Bhupendra Nath Datta was arrested for writing two inflammatory articles in the *Jugantar*, the revolutionary weekly, Nivedita appeared at the Police court and offered to stand bail for him. The magistrate demanded a bail of Rs. 1000 and Nivedita agreed to pay that amount. It was a matter of serious concern for the Government. The *Englishman* called her a traitor. High police officials considered a proposal to deport her from India. The nationalist leaders advised her to leave for England and said that it would be possible to continue her work from there but if she was put in prison she would be lost to her cause.

In August 1907, Nivedita left for London Prince Kropotkin had also fled from Russia and came to London. Both the revolutionaries met again. Nivedita went to the Russian Embassy in London and told them what was happening in India. She had herself seen Orissa famine before she left India. She narrated her experience to the Russians to show how India was suffering under British rule. House of Commons was then debating Indian affairs. Nivedita was a daily visitor there. Under the Pseudo-name of the Nealus, she contributed articles on Indian topics to British Newspapers and informed newspapers in Bengal about British reaction to Indian revolutionary movement. Startling news from India began to pour into England. News of the murder of Mrs. and Miss Kennedy mistaking then for Kingsford, murder of approver Gossian in Calcutta Presidency Jail, arrest of Aurobindo, imprisonment of Tilak, suicide of Prafulla Chaki, death penalty for Khudiram, Satyen and Kanai sent a wave of consternation through British Public life. House of Commons was having storms over these events. In preparing her reports for both British and Bengal magazines, Nivedita obtained assistance from two of the greatest journalists then living, namely, Stead and Ratcliffe.

Nivedita received an information that after the series of murders, the Government had suppressed all revolutionary and extremist newspapers and magazines. *Jaguantar, Sandhya, Bande Mataram* and *Navasakti* could not be published. Nivedita decided that they should be printed in Europe and sent secretly to Bengal. She felt the need for sending money to the revolutionaries and started collecting funds.

Mrs. Ole Bull, a rich Norwegian lady had become a disciple of Swami Vivekananda. She knew everything about Nivedita and helped her to the best of

her ability. A few days after Nivedita reached London, Sir J. C. Bose and Lady Bose joined her there. Ratcliffe was already in London. She fully utilised the services of Ratcliffe.

In September 1908, Nivedita went to her home in Ireland. Mrs. Ole Bull, Miss MacLeod, another disciple of Swamiji, Sir J. C. Bose and Lady Bose accompanied her. Nivedita's brother agreed to send secretly Irish revolutionary periodicals to Bengal and to receive such magazines from Bengal in return.

Mrs. Ole Bull had a house at Cambridge near Boston in U.S.A. At the request of Nivedita she permitted the use of that house as a shelter by Indian revolutionaries. Nivedita reached there in October 1908 and found that a number of revolutionary absconders had taken shelter there. After his release from prison, Bhupen Dutt went there to join the other revolutionaries.

Nivedita stayed there for three months. She felt the need for having a permanent shelter for revolutionary absconders somewhere out of British India. This meant pretty heavy finance. She started raising funds by lecturing in Boston, New York and Baltimore. Tickets were all sold out. In less than three months she collected substantial sums. She felt that gold was flowing into the coffers of Indian revolutionaries.

At this time she heard that her mother was in death bed and wanted to see her. Immediately she left for home and saw her mother die with a smile on her face.

Some revolutionary periodicals had started publication from London, Paris and Berlin. Swamiji Krishna Verma was patronising them but such publication was part of Nivedita's plan. *Bande Mataram* was being published from Geneva. Nivedita went there and it was at the Bande Mataram office that she received the news of murder of Curzon Willie by Dhingra. Who inspired Dhingra for this murder and consequent self-immolation, Krishna Verma or Nivedita, is still an open question but Nivedita's biographer says that both were playing with revolutionary fire.

Nivedita now felt that London was no longer a safe place. She decided to return to India, come what might. She changed her dress and adopted the false name of Mrs. Margot. She left London accompanied by Sir J. C. Bose and Lady Bose.

After the ship reached Bombay, Sir J. C. and Lady Bose left the ship first. Nivedita followed a litle later in order to show that she was not known to them, and that she was not Sister Nivedita. Instead of coming to Calcutta direct she first went to Madras and took a round about route to reach Calcutta. She stayed at her Baghbazar residence and did not come out for three weeks She came out only when she was sure that police watch had been withdrawn.

After her return to Calcutta was known, a second declaration came out from the Belur Math that it had no connection with Sister Nivedita.

Nivedita found that the revolutionary movement had been crushed and there was no other way than to lie low for the time being and wait patiently for the next opportunity to strike. She knew that a revolutionary movement is never a continuous uninterrupted process. Interruptions must come and have to be suffered. Jugantar party had already broken up. Now Anushilan party was suppressed. Aurobindo wrote : Government is determined not to allow growth of organisations among Bengalees.

The Alipore Bomb case came to an end and Aurobindo was acquitted. Barrister Norton led the prosecution and C. R. Das defended the accused. When Nivedita met C. R. Das in Darjeeling, she smiled and planted a large red rose in his button hole and said—I knew you are great but did not know you are so great.

On January 24, 1910, detective officer Shamsul Alam was murdered on the corridor of the Calcuta High Court. Aurobndo described it as the most daring act and commented that our revolutionaries chose public places for the execution of national traitors.

After this murder, a warrant of arrest for Aurobindo was issued. This news was leaked out by one of the C.I.D. men. It was verified and found correct. Aurobindo was then editing his *Karmayogin* and was in his office. He was requested to avoid arrest and leave for French Chandernagore at once. He said : I can leave only if Nivedita agrees to take charge of *Karmayogin*. Nivedita readily agreed and Aurobindo left for Chandernagore and finally reached French Pondicherry. When news reached Nivedita that Aurobindo had reached there safely, she was so glad that she burst into tears.

Now Nivedita felt completely lonely. Soon after she came to India, she had started a girls' school at Baghbazar, Calcutta. During her serious illness when she was down with typhoid, the school remained closed but this information was withheld from her. The Belur Math authorities, thereafter, took it out of her hands. Abanindra Nath Tagore paid frequent visits to her Baghbazar residence to reduce the monotony of her life.

Nivedita learnt that Mrs. Ole Bull was in death bed in the U.S.A. and desired to see her. She left and reached there just in time.

She came back and again fell ill. Sir J. C. Bose removed her to Darje· ling. Dr. Nilratan Sircar diagonised malignant dysentery and said there was no hope for her life. She died on October 13, 1911.

J.F.Blair, editor of *Empire*, wrote after her death : Nivedita's influence over young Bengal was greater than most people suspected. She probably did more to create an atmosphere of unrest than all the newspapers of the world.

পরিশিষ্ট-৮

শিবাজী উৎসবের প্রচারপত্র

বন্দে মাতরম

শিবাজী মহোৎসব

আজ সে কথা মনে হইলে হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিয়া উঠে—যেন কোন ভুলে যাওয়া সুখের স্বপন চিত্তপটে আধ আধ ফুটে। অনেক দিনের পুরাণ কথা নয়। সেই দক্ষিণ দেশে পশ্চিমঘাটের পর্বতমালার মাঝে রায়গড়ে রাজাধিরাজ শিবাজীর যে অভিষেক হইয়াছিল—তাহা বড় জোর দশ পুরুষের কথা। তবুও যেন উহা রূপকথার মত মনের মাঝে জাগে। সব কথা মনে পড়ে না—কেমন এলোমেলো গোলমাল। ভাবিয়া ফুটাইতে গেলে ঐ পোড়ো ফিরিঙ্গিদের বেলিংটন বা নেলসনের বাজে কথায় সব চাপা পড়িয়া যায়। ফিরিঙ্গিরাই ত নষ্টামি করিয়া যত মিথ্যা পুঁথি লিখিয়া আমাদিগকে ছেলেবেলা হইতে শিখাইয়াছে যে আমরা গোলামের জাতি—গোলামিই আমাদের কুলধর্ম। আমাদের শূরবীরদিগের কথা যদি আমরা তুলি ত অমনি ঐ ফিরিঙ্গিরা তাহাদের বড় বড় পুঁথি বাহির করে ও ফিরিঙ্গি বীরত্বের কুলটি আমাদিগকে টিয়া পাখির মত মুখস্থ করাইয়া দেয়। কে একজন ফিরিঙ্গিস্থানের কোন গাঁয়ে দু-দশজনকে খুন করিয়াছিল ও তাহাদের রাজার মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিল—তার খুটিনাটি চৌদ্দ পুরুষের বিবরণ কণ্ঠস্থ করাইয়া তবে ছাড়ে। কিন্তু বীরকেশরী শিবাজীর কথা তাহারা এক নিশ্বাসে সারিয়া ফেলে। তিনি একজন পাহাড়ে দস্যুর মত লুকাচুরি যুদ্ধ খেলিয়া মোগলদিগকে জব্দ করিয়াছিলেন—এইমাত্র।

এস—আজ ঐ ফিরিঙ্গির মায়াজাল ছিঁড়িয়া—নূতন ভাবের ভাবুক হইয়া—নূতন শক্তিতে শক্তিমান হইয়া—সেই বীরসিংহ শিবাজীর চরিত্রের কথা ভাবনা করি।

চিতোর যে দিন হইতে বিদেশির অধীনতা স্বীকার করে সেই দিন হইতেই হিন্দুজাতি অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু কার সাধ্য যে ক্ষাত্রবীর্যকে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে! দুই শত বৎসর যাইতে না যাইতেই সেই চিতোর রাজবংশে রুদ্রাবতার পুরুষকেশরী শিবাজী জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রুদ্রতেজে ক্ষাত্রশক্তি আবার জাগরিত হইয়া আর্যগৌরবকে নূতনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। শিবাজী মহারাজের কথা স্মরণ কর আর বিশ্বাস কর যে আর্যজাতি—জ্ঞানে প্রেমে সভ্যতায় শৌর্যে বীর্যে—মানবকুলের শিরোমণি হইবার জন্যই পৃথিবীতে আসিয়াছে। আর্যজাতি সেই জন্যই সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বাঁচিয়া আছে—সেই জন্যই শিবাজীর ন্যায় পুরুষসিংহ সকল—ভারতে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

দেখাও কোন দেশে শিবাজীর ন্যায় বীরচূড়ামণি অবতরণ করিয়াছেন। তিনি জন কয়েক পাহাড়িয়া লোক লইয়া সাগরতুল্য বিক্রমশালী মোগল রাজ্যকে মথিত করিয়াছিলেন। এরূপ দৃশ্য পৃথিবীর ইতিহাসে অতি বিরল।

ক্ষাত্রশক্তি দুর্দমনীয়—হিন্দুজাতি অমর। কেন?—উহা ধর্মের উপরে—নিবৃত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত। তাই উহার বিনাশ নাই।

শিবাজী মহারাজ সাধারণ রণবীরদিগের মত শত্রু মারিয়া রক্তপাত করিতে আগুয়ান হন নাই। ধর্মরক্ষাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। তাঁহার গুরু—স্বামী রামদাস—ধর্মরক্ষা করিবার জন্যই তাহাকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

আর্যসমাজের সকল বিভাগই ধর্মের দ্বারা চালিত ও শাসিত। হিন্দুদিগের ধ্যান-জ্ঞান আচার-ব্যবহার আদান-প্রদান রীতি-নীতিশীল-সভ্যতা—সমস্তই ধর্মের উপরে সংস্থাপিত। বিধাতা এই ধর্মপ্রাণ আর্যসমাজকে মানব পরিবারের নেতা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি এই সমাজের মৃত্যু হয় ত পৃথিবী বিধবা হইবে। এই বিশ্বাসে বলীয়ান হইয়া শিবাজী মহারাজ তাঁহার বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন।

কি অপূর্ব দৃশ্য। শিবাজী মহারাজ যে যুগপ্রলয় ঘটাইয়াছিলেন তাহা পৃথিবীর ইতিহাসে অতুলনীয়। নেতা একজন সন্ন্যাসী—স্বামী রামদাস। শিবাজীর পতাকারাজি গৈরিক বসনে নির্মিত। আর শিবাজীকে মা স্বয়ং দেখা দিয়েছিলেন। প্রবৃত্তির চালনায় তিনি যুদ্ধ করেন নাই। শক্তিরূপিণী ভবানী তাঁহাকে দর্শন দিয়া সনাতন ধর্ম রক্ষা করিবার জন্য প্রেরণ করেন। শিবাজীর রণরঙ্গের মূলে ধর্মই বিরাজ করিতেন। মা রুদ্রাণী শিবাজীকে রুদ্রশক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। শিবাজীর অসি শিবাজীকে বল প্রদান করে নাই। মা সিংহবাহিনীর প্রতি অচল বিশ্বাস—অটুট গুরুভক্তি ও মাতৃভক্তি—তিন অস্ত্র তাঁহাকে শত্রু-বিজয়ী করিয়াছিল।

আসুন সকলে—স্বদেশি মণ্ডলীর সহিত আমরা এই শিবাজী মহোৎসবে মাতি। সময় আসিতেছে—যখন আর্য-গৌরব সমস্ত পৃথিবীকে আলোকিত করিবে—যখন আর্যজ্ঞান সকল দেশের বিদ্যাকে অনুপ্রাণিত করিবে—যখন আর্যজাতি সকল জাতিকে তাহার উদার ক্রোড়ে স্থান দিয়া এক সুবিশাল মানব-পরিবার গঠন করিবে। তোমার যদি চক্ষু থাকে ত দেখ—ঐ আর্য-গৌরবরবির অভ্যুদয় সমস্ত মানবকুলকে আর্যজ্ঞানে আলোকিত করিতেছে। মহারাজ শিবাজীই ঐ আর্য-বিজয়ের সূচনা করিয়া গিয়াছেন।

এই শিবাজী মহোৎসবে ঐ উচ্চ আদর্শ সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইবে। আর্যজাতির জয় হইবেই হইবে—আর্যজাতির নিবৃত্তিমুখীন তন্ত্রের অধীনে আসিয়া সকল জাতির সমাজতন্ত্র পুষ্টি লাভ করিবে।

স্বদেশি মণ্ডলী এই মহোৎসব উপলক্ষে সঙ্গীত সমাজের সম্মুখবর্তী সুবৃ(হ)ৎ মাঠে (১৬নং কর্ণওয়ালিস রাস্তায়) এক মেলা বসাইবেন। ঐ মেলায় মা সিংহবাহিনীর মূর্তি বিরাজ করিবে। মায়ের পদতলে শিবাজী মহারাজের আলীড় (ঢ়) মূর্তি। আর দূরে কৃত্রিম পর্বতকন্দরে স্বামী রামদাস ব্যাঘ্রচর্মোপরি সমাসীন। কি মনোহর দৃশ্য—প্রাণমন পুলকিত হইয়া যাইবে ; আবার যখন মহারাজের অভিষেক হইবে তখন সকলেরই চিত্তপটে সেই ভাবী আর্য-বিজয় দৃশ্য অঙ্কিত হইবে।

ঐ মেলা ২১-এ ২২-এ ২৩-এ জ্যৈষ্ঠ—সোম, মঙ্গল, বুধ—তিনদিন ধরিয়া থাকিবে। এবার কেবল বচন বক্তৃতা নয়। শিবাজীর পুণ্যচরিত্র কথকেরা কীর্তন করিবেন। পুতুল নাচে মাওলী সেনার সমররঙ্গ দেখানো হইবে। কালীকীর্তন হরিসঙ্কীর্তন-বাউল গানে শহর মুখরিত হইবে। লাঠিবাজির ভীষণ শব্দে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কদম্বিত হইবে। এবার প্রকৃত শিবাজী-তত্ত্ব হৃদয়ে হৃদয়ে উদঘাটিত হইবে।

শিবাজী মহোৎসব

স্বদেশিমণ্ডলীর উদ্যোগে ২১-এ, ২২-এ, ২৩-এ জ্যৈষ্ঠ (১৩১৩) সোম, মঙ্গল, বুধ তিনদিন ধরিয়া সঙ্গীত সমাজের সম্মুখস্থ মাঠে (১৬নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রিটে) শিবাজী মহোৎসব হইবে। এই মহোৎসব সুচারুরূপে নির্বাহ করিবার জন্য একটি সমিতি গঠিত হইয়াছে।

শিবাজী মহোৎসব-সমিতি।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মিত্র, কৌসিলি

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাস, কৌসিলি

শ্রীযুক্ত অপূর্বকুমার ঘোষ, কৌসিলি

ডাক্তার শ্রীসুন্দরীমোহন দাস
ডাক্তার বারিদবরণ মুখোপাধ্যায়।
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বি. এ.।
শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ শেঠ, বি. এল.।
রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক—কোষাধ্যক্ষ।
শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল—সম্পাদক।

অমৃতবাজার সম্পাদক দেশপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় মহোৎসবে সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

এই মহোৎসব জাতীয় প্রথানুসারে নূতনভাবে অনুষ্ঠিত হইবে। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী শক্তিরূপিণী মা সিংহবাহিনী তথায় বিরাজ করিবেন। সে রূপ দেখিলে প্রাণমন আনন্দে ও উৎসাহে মাতিয়া উঠিবে। মায়ের পদতলে ছত্রপতি মহারাজ শিবাজীর আলীঢ় মূর্তি মহোৎসব-সভাকে আলোকিত করিবে। আর কিছু দূরে পর্বত কন্দরে ব্যাঘ্রচর্মোপরি সমাসীন স্বামী রামদাসের গুরুগম্ভীর মূর্তি দেখিয়া হৃদয়ে তেজের সঞ্চার হইবে। মহোৎসবে অনেক প্রকার অনুষ্ঠান হইবে। কালীকীর্তন—হরিসঙ্কীর্তন—বাউল গানে রাজধানী মুখরিত হইবে। শিবাজী মহারাজের পুণ্যকীর্তি কথক ঠাকুরেরা কীর্তন করিবেন। নূতন ধরনের পুতুলনাচ হইবে। মাওলী সেনার রণরঙ্গ প্রদর্শিত হইবে। লাঠিখেলা প্রভৃতি বীররস-রঙ্গেরও অভাব থাকিবে না। স্বদেশি দোকানপাটও বসানো হইবে।

আসুন সকলে—এই শিবাজী মহোৎসবে যোগদান করি। এই শুভদিনে মায়ের পূজা করিয়া—মায়ের পুত্ররত্ন শিবাজীকে বন্দনা করিয়া বাঙালি জাতি ধন্য হউক।

এই মহোৎসবের বিশেষ বিবরণ আগামী সপ্তাহে প্রকাশিত হইবে। ঐ মহোৎসব ব্যাপার বহুলব্যয়সাপেক্ষ। সাধারণের আনুকূল্য প্রার্থনীয়।

রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক—শিবাজী মহোৎসবের কোষাধ্যক্ষ। তাঁহার নামে ১২নং ওয়েলিংটন স্কোয়ারে, অথবা সম্পাদকের নামে কলিকাতা ১৯৩নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের ঠিকানার যাঁহারা যাহা কিছু দে (য়?) তাহা পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

বিশেষ দ্রষ্টব্য

শহর ও মফঃস্বলের যে সমুদায় দোকানদার বা স্বদেশি শিল্পদ্রব্য-প্রস্তুতকারক শিবাজী মেলায় স্বদেশি শিল্পদ্রব্য প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা ৮২নং সীতারাম ঘোষের স্ট্রীটে কমিটির অন্যতম মেম্বর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র (হেমেন্দ্রপ্রসাদ) ঘোষের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইয়া কিম্বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিবেন।

নথিপত্রে স্বদেশী আন্দোলন—সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায় পৃ. ৩৫-৩৯

পরিশিষ্ট-৯

সকারাম গণেশ দেউস্কর

হিন্দু ও মুসলমান

ওয়াল্টার হ্যামিল্টন সাহেবের প্রণীত East India Gazetteer নামক একখানি পুস্তক ১৮২৪ খ্রিস্টাব্দে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল। লেখক পুস্তকখানি কোম্পানির ডিরেক্টারদিগের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আমরা উহা হইতে কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। সেকালে হিন্দু-মুসলমানে কিরূপ প্রীতি ছিল,—আফগানিস্থান, কাবুল, কান্দাহার ও বেলুচিস্থানের রাজধানীতে হিন্দুর প্রতি কিরূপ সদ্ব্যবহার করা হইত, উদ্ধৃত অংশে মনোযোগ করিলে পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

Hindustan : Open violence produced little effect on so patient a people, and although the Mahomedans subsequently lived for centuries intermixed with Hindus no radical change was produced in the manners or tenets of the latter ; on the contrary, for almost a century past, the Mahomedans have evinced much difference to the prejudices of their Hindu neighbours, and a strong predilection towards many of their ceremonies (Vol. I. P. 648).

Rungpoor : The two religions, however, are on the most friendly terms, and mutually apply to the deities or saints of the other, when they imagine that application to their own will prove ineffectual, (Vol. II p. 478).

Malabar : When the Portuguese discovered India, the dominions of the Zamorin, although ruled by a superstitious Hindu prince, swarmed with Mahomedans, and this class of the population is now considered greatly to exceed, in number all other description of people in the British Districts of South Malabar. This extraordinary progress of the Arabian religion does not appear (with the exception of Hyder and Tipoo) to have been either assisted by the countenance of the government or obstructed by the jealousy of the Hindus, and its rapid progress under a series of Hindu princes demonstrates the toleration or rather the indifference manifested by the Hindoos to the peaceable diffusion of religious practices and opinions at variance with their own. (Vol. II, p. 181).

Deccan : There is a considerable Mahomedan population in the countries subject to the Nizam, but those of the lower classes, who are cultivators have nearly adopted all the manners and customs of the Hindoos (Vol. I. p. 484).

Khelat : [The capital of Beluchistan] The Hindus are principally mercantile speculators from Mooltan and Shikerpoor, who occupy about 400 of the best houses, and are not only tolerated in their religion, but also allowed to levy a duty on goods entering the city for the support of their pagoda (Vol. II, p. 81).

Afganistan : Brahminical Hindus are found all over Cabul, specially in the towns, where they carry on the trade of brokers, merchants, bankers, goldsmiths and grain-sellers, (Vol. I. p. 12).

Cabul : Many Hindus frequent in Cabul, mostly from Peshwar; and as by their industry they contribute greatly to its prosperity, they are carefully cherished

by the Afgan Government (p. 307).

Candahar : Among the inhabitants he (Syed Mustapha) reckons a considerable number of Hindus (partly Konouj Brahman) both settled in the town as traffickers and cultivating the fields and gardens in vicinity with respect to religion ; a great majority of the inhabitants are Mahomedans of the Sooni persuation, and the country abounds with mosques, in which Syed Mustapha asserts both Hindoos and Mahomedans worship and in other respects nearly assimilate. (Vol. p. 341).

লেখক বলিতেছেন, প্রকাশ্য অত্যাচারে এই সহিষ্ণু জাতির (হিন্দুদের) অতি অল্পই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মুসলমানেরা কয়েক শতাব্দী এদেশে বাস করিয়া হিন্দুদিগের সহিত মিশিয়াছে, তথাপি তাহাদিগের আচার ব্যবহার বা ধর্মবিশ্বাসের সবিশেষ পরিবর্তন ঘটে নাই। পক্ষান্তরে বিগত প্রায় এক-শতাব্দী কাল মুসলমানেরা প্রতিবেশী হিন্দুদিগের কুসংস্কার-সমূহের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধা এবং তাহাদের ধর্মানুষ্ঠানাদির প্রতি প্রগাঢ় সহানুভূতি বা অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছে।

রংপুরে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা পরস্পর মিত্রভাবে, বাস করিতেছে। এবং পরস্পরে পরস্পরের দেবতা ও সাধু-সন্ন্যাসীর নিকট ইষ্ট-লাভের জন্য মানৎ করে।

মালাবার অঞ্চলে পর্তুগীজেরা পদার্পণ করিয়া দেখে যে, সেখানকার জামোরিণের রাজ্যে যদিও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হিন্দু রাজার শাসন প্রচলিত, তথাপি তথায় মুসলমানের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। দক্ষিণ মালাবারের ব্রিটিশ শাসিত জেলাসমূহে অন্য সকল জাতির লোকের সংখ্যা যত, হিন্দু-শাসিত মালাবারে মুসলমানের সংখ্যা তদপেক্ষা অনেক অধিক। এই অঞ্চলে মুসলমানদিগের দীর্ঘকাল হইতে এইরূপ প্রতিপত্তি ও সংখ্যাধিক্য দেখিয়া মনে হয়, যে হিন্দু রাজারা ধর্ম-বিষয়ে অত্যন্ত উদার বা উদাসীন। বিধর্মীরা শান্ত ভাবে স্বধর্মের অনুষ্ঠান করিলে, হিন্দুরা তাহাতে কখনও বাধা দেয় না।

দক্ষিণাপথে নিজাম রাজ্যে অনেক মুসলমানের বাস, কিন্তু সেখানকার নিম্নশ্রেণির কৃষিজীবী মুসলমানেরা হিন্দুদিগের প্রায় সমস্ত আচার-ব্যবহারের অনুকরণ করিয়া থাকে।

বেলুচিস্থানের রাজধানী খেলাত নগরে প্রায় চারি শত ঘর হিন্দু-বণিকের বাস। ইহারা প্রধানতঃ মূলতান ও শিকারপুর হইতে গিয়া তথায় বাস করিয়াছেন। এই সকল হিন্দু বণিক্ যে সেখানে কেবল স্বেচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠান করিবারই অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা নহে ; তাহাদের অত্রত্য ধর্মমন্দিরের ব্যয়নির্বাহের জন্য তাহারা ঐ নগরের আমদানি মালের উপর একটি কর বসাইবার পর্যন্ত অধিকার লাভ করিয়াছেন।

আফগানিস্থানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ রাজধানীতে এবং অন্যান্য শহরে বহুসংখ্যায় বাস করিয়া থাকেন। তাহারা দালালি, মহাজনী, দোকানদারী ও স্বর্ণকারের কাজ করিয়া জীবিকা-নির্বাহ করেন। বহুসংখ্যক হিন্দু পেশোয়ার হইতে কাবুলে গিয়া বাস করিতেছেন। ইহাদের শ্রমশীলতার গুণে কাবুলের শ্রীবৃদ্ধি বহু পরিমাণে সম্পাদিত হইতেছে বলিয়া আফ্গান গবর্নমেন্ট যত্ন-পূর্বক ইহাদিগের পালন করিয়া থাকেন।

কান্দাহারে সৈয়দ মুস্তাফার রাজ্যে বহুসংখ্যক হিন্দুর বাস। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণদিগেরও এখানে বসতি আছে। হিন্দুরা অনেকেই চাষবাস ও বাণিজ্য ব্যবসায় করেন। কান্দাহারে সুন্নি সম্প্রদায়-ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা অধিক। সর্বত্র অসংখ্য মসজিদ বিদ্যমান ; কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফার শাসন-গুণে হিন্দু ও মুসলমানেরা নির্বিঘ্নে স্বেচ্ছামত ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকে। এবং অন্যান্য বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট সদ্ভাব দৃষ্ট হয়।*

দেশের কথা। পৃ. ১৯-২১

পরিশিষ্ট-১০

BRAJENDRA KISHORE ROY CHOWDHURY

MY REMINISCENCES

I HAD been a sportsman in my younger days—and a protagonist of out-door games. While championing the cause of games, I noticed with great disappointment that the Bengalees were no equeals of foreigners in the field. I do not exactly remember the time—but it is likely to be round about 1900 A.D., that I found myself set in seriously searching for the cause of this inferiority of the Bengalees. I pondered till I discovered that the Bengalees were not only backward in games but they had also been noticeably deteriorating as a nation for several decades past in many spheres of life—physical, mental, intellectual and even moral. This I attributed to the lack of proper training of boys in schools and colleges. The form of education introduced in the country by the British rulers was considered to be mainly responsible for this deteriortation. It was sapping the moral foundation of life—the special feature of Indian culture. It was designed more to serve the imperialistic interest of the Britishers than to give any beneficial education to the children of the soil—it was rather designed to demoralise the nation as a whole. This thought haunted me long and I craved for a solution. At last I struck upon an idea. It was like this—Education should be free from the control of a foreign Government and should exclusively be under the control of the nation and it should be imparted on national lines. It should conform to the Indian tradition and culture with special strees on formation of character. Educational Institutions should be located in healthy places, far away from the din of cities and the tentacles of artificial environments, comprising large areas of land to be utilized for various purposes and preferably by the side of a flowing river providing ample scope for bathing, swimming, rowing etc. They should be housed in modest huts and not in palatial buildings in order to instill the principle of plain living and high thingking in the tender minds of boys. These Institutions should be purely residential, where students would live along with their teachers who will give them constant company in every sphere of life. The teachers would live there with their families—their wives taking charge of the boys by batches of 20 or 25 each, with all affectionate motherly care for them in feeding, nursing and looking after their comforts and welfare. Along with literary education, physical and vocational training would also be imparted. There should be arrangements for giving training in agriculture, horticulture, small crafts like weaving, carpentry, smithy, book-binding etc. and other suitable home industries which the students might profitably learn according to their individual inclinations. Trainings in Music, Art and games of different descriptions to suit different tastes should also be provided for. The students were to be kept fully engaged in pleasant, attractive and educative occupations throughout the day and night so that they could not

get any time and opportunity for entertaining evil thoughts in their minds. This, in short, was my dream at the time. After thus getting a picture of the whole thing in my mind, I confided the idea to my Manager, Late Manomohan Bhattacherjee, M.A., who had been my private tutor and guardian during my boyhood and asked him to consider if it could be possible for us to give it a practical shape in our own humble way. He received the idea sympathetically and promised to think over the matter in all seriousness. Some time after this Manomohan Babu got ill and was medically advised to go to Calcutta for treatment. On the eve of his departure from Gouripur, he asked me if I entertained the idea even then and in case I did, he assured me that he would, while in Calcutta, consult eminent educationists there over the matter. He kept his promise and held consultations with Principal N.N. Ghose, Sir Gooroodas Banerjee, Hirendra Nath Datta, Ramendra Sundar Tribedi and others on the subject. They told him that they had never given any thought to such an idea and eventually took time to think over it.

Soon after came the partition of Bengal by Lord Curzon in 1905, followed by the famous Swadeshi movement, the whole Province being agog with cries of boycottt of foreign goods. The students caught the cue and started boycott of the University, which they termed as "Golamkhana" or a place for manufacture of slaves. I had been at Deoghar at this time for a change. Many eminent sons of Bengal had also gathered there at the time for recouping their health. They were Rabindranath Tagoe, Akshaya Kumar Maitreya, Ambika Ch. Majumder, Sisir Kumar Ghosh, Matilal Ghose, Debaprasad Sarbadhikary, Dr. Suresh Prasad Sarbadhikary, Satya Prasad Sarbadhikary and others. We utilized this opportunity and organised meetings at different places in Deoghar for days together and the whole town was astir with boycott movement.

Boycott of the Calcutta University by the students put the leading sons of Bengal to serious thinking and they held many sittings in different places of the city for discussion of the problem in all its aspects. Later a public meeting was organised at "Pantir Math" behind the Metropolitan Institution in which Raja Subodh Ch. Mallik declared a donation of one lac of rupees for establishment of a National College in Calcutta. This news reached us at Deoghar. Manomohan Babu contacted me at the time and pointed out that here was the opportunity of fulfilment of my dream and that we might join this venture with a donation of Rupees five lacs or so. I gladly consented to the proposal and Manomohan Babu made the declaration of my offer to the cause immediately thereafter. Gradually promises of donations from many generous sons of Bengal came— including those from Maharaja Suryya Kanta Acharyya Choudhury of Mymensingh, Dr. Rash Behari Ghose, Gopal Ch. Singha of Bhowanipur, Rai Jatindra Nath Choudhury of Taki and othes. The pressure of the moment, particularly from the student community, was so great that before many of these donations were promised, the leading sons of Bengal, assembled in a meeting held in the Office of the Bengal land-holder's Association, had to decide upon immediately organising a system of education on national lines and a provisional Committee to take steps for furthering the object, was formed forthwith. In pursuance of the report of this Committee, the National Council of Education was formed early in 1906 for the purpose of organising a system of education–literary, scientific and

technical on national lines and under national control. The prominent members of the Council, so far as I remember, were Dr. Rash Behari Ghose, Debaprasad Sarbadikary, Pandit Panchanan Tarkaratna, Sakharam Ganes Deoskar, A. Rasul, Bar-at-law, Satish Ch. Mukherjee, Raja Subodh Ch. Mallik, Maharaja Suryya Kanta Acharyya Choudhury of Mymensingh, Sir Gooroodas Banerjee and others. Rai Jatindra Nath Choudhury of Taki became the Treasurer, A. Choudhury and Hirendra Nath Datta the Joint Secretaries and Sir Rash Behari Ghose the Pesident. Aurobinda Ghose came over from Baroda and was made the Principal.

The College was first started at Bowbazar in the house wherein the present "Basumati" office is located. It was later shifted for better accommodation to Muraripukur in the house of Nalini Sett of Burrabazar. At the start the teaching staff consisted of eminent Educationists like Satish Ch. Mukherjee of Dawn Society, Benoy Kumar Sarkar, Radhakumud Mukherjee, Pramatha Nath Mukherjee (now—Pratyagatmananda Swami), Pandit Kedar Nath Sankhyatirtha, Kshirode Prasad Bidyabinode, Chandrakanta Nyayalankar, Amulya Chandra Bidyabhusan, Rabindra Narayan Ghose, Kishori Mohan Gupta, Dr. Bepin Behari Chakraberty, Aurobinda Ghose No. II, Nagendra Nath Rakshit and others. Later Sir Tarak Nath Palit joined us and his "Bengal Technical Institute" was amalgamated with our College. We now got a great opportunity of giving mechanical training to our students. In pursuance of our basic idea of imparting education on national lines, we started schools in different parts of Bengal viz. at Dacca, Mymensingh, Rangpur, Khulna, Comilla, Dinajpur, Chandpur, Noakhali, Jessore, Sylhet, Jalpaiguri and other places. There was provision for religious education as well in our institutions and I set apart a portion of my donation particularly for this purpose, while giving the rest for general and technical eduation.

Sir Rash Behari Ghose's princely donation by his 'Will' of his properties worth about 12 lacs of rupees to the National Council of Education placed us in a comfortable economic position and it was with this money that we were able to procure the present site of the College at Jadavpur and construct our own building there. Later the College was shifted to our own building at Jadavpur where we naturally got greater scope for realisation of our ambitious scheme.

The history of gradual progress of this Institution may be gathered from its records and I need not enter into the same. It must, however, be said that it was through the Grace of the Almighty that the Institution which had been established and fostered with paternal care by the-then illustrious sons of Bengal in the face of stupendous political and economic difficulties, had been moving progressively from strength to strength even during the British regime. After the attainment of our independence, it gradually drew more and more attention and help from the Government and it has now ultimately been converted into a University. This is indeed a great step forward. But I must here remind my countrymen that all these achievements of the Institution will be utterly in vain if the ideal with which the Institution was first started, is lost sight of. The human factor has now been more than ever, the most perplexing problem in the present structure of society. The last two devastating world wars have left a legacy of corruption, nepotism, bribery, chicanery and all kinds of moral debasements over the whole world. Moral and spiritual values of life have been cast to the wind and money making by any means, fair or foul, has sprung up to be the *summum bonum* of life. We must

guard our young boys against this vitiating atmosphere and educate them in a manner as will form in them a strong character and personality that will never yield to temptations. We wanted to shape our boys into real men with high moral character and spiritual outlook and train them up for plain living and high thinking. If we can now turn out hundreds of such boys from our University, I am confident all other problems of the country staring us in the face today, will be solved in no time. Education in whatever form and sphere, general scientific, technical or vocational, will lead us nowhere if the human factor, the receptacle of education is tainted and corrupt and is devoid of character. That will be like building an edifice on sandy base. Character must be formed first and we must always be alert that it is not lost sight of or neglected in any course of education however useful and profitable it might appear to be. Indian culture has always given the first place to the moral and spiritual values of life and rightly so, as that is the bed-rock on which the superstructure is to be built. If, however, we ever neglect to give proper attention to this aspect of education in the University that has been presently formed, I am confident our Institution will prove to be of incomparable service to the country by producing sterling assets to the Indian nation. May the Divinity that shapes our ends, guide us in the right direction.*

* The National Council of Education, Bengal Jadavpur Calcutta 1906-1956.

পরিশিষ্ট-১১

স্বদেশি প্রসঙ্গ

কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, এ বৎসর আমাদের দেশে সর্বপ্রধান স্বদেশি ঘটনা কি ঘটিয়াছে, তাহা হইলে আমরা কি উত্তর দিব? চুড়ি ভাঙা নয়, বিলাতি কাপড় পোড়ান নয়, জাতীয় দলের সহিত মোকদ্দমায় পূর্ববঙ্গের গবর্নমেন্টের পরাজয়ও নয়, এমন কি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়াদি স্থাপনও নয়; —সর্বপ্রধান স্বদেশি ঘটনা বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর "উদ্ভিদের সাড়া" (Plant Response) নামক গ্রন্থ প্রকাশ। আমাদের পরাধীনতা নানাবিধ, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, শৈল্পিক ইত্যাদি, কিন্তু তন্মধ্যে আমাদের মানসিক পরাধীনতাই সর্বাপেক্ষা শোচনীয়। আমাদের সর্বপ্রকার মানসিক শক্তি ইংরাজের চেয়ে কম, এই ধারণা যত বদ্ধমূল হইবে, আমরা ততই রসাতলে যাইব। জ্ঞানে, মানসিক শক্তিতে আমরা যত স্বাধীন হইব, সেই পরিমাণে আমাদের সর্বপ্রকার অন্যবিধ পরাধীনতা কমিয়া আসিবে। দেহ ত মনের দাস; বিশাল বলশালী হস্তী ক্ষীণকায় দুর্বল মুহূর্তের অধীন; কেন না, হাতি-জ্ঞানে, মানসিক তেজে মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। তাই বলি, যাহাতে আমাদের কোনও স্বদেশবাসির মানসিক শক্তির অসাধারণতা প্রমাণ করে, তাহাই গুরুতর স্বদেশি ঘটনা। আচার্য বসুর গ্রন্থকে কোন কোন ইংরাজ সমালোচক বিজ্ঞানজগতে বিপ্লব বা যুগান্তর সংঘটক বলিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের দেশের বড় বড় কাগজে ইহার অপূর্ব আবিষ্ক্রিয়াগুলির আলোচনা দূরে থাক্, সংবাদ পর্যন্ত বাহির হয় নাই। একমাত্র প্রবাসীতেই তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াগুলিকে সংক্ষেপে বাঙালির বোধগম্য করিবার চেষ্টা হইতেছে। আমাদের দেশে বিজ্ঞানের চর্চা এত কম, যে, সন্দেহ হয়, যে কেহ কেহ হয়ত প্রবাসীর প্রবন্ধগুলিকে আচার্য বসুর ৫ বৎসর পূর্বের আবিষ্ক্রিয়ার চর্বিত চর্বণ মনে করিয়া থাকিবেন।

এবার শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজন্ নামক এক মাদ্রাজী যুবক কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম র‍্যাংলার হইয়াছেন, এ খবরটি ছোট বড় সকল কাগজেই বাহির হইয়াছে। কেমব্রিজের এই গণিত পরীক্ষা খুব কঠিন ; তাহাতে ইংরাজ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাস্ত করায় খুব বাহাদুরী আছে। কিন্তু গণিতে ইহা অপেক্ষাও খুব কঠিন পরীক্ষা আছে। আর যদি ইহাই কঠিনতম হইত, তাহা হইলেও ইহাতে, পূর্ব হইতে পরিজ্ঞাত গণিত বিদ্যায় পাণ্ডিত্যের পরিচয়কে সকলের চেয়ে ভাল করিয়া দিতে পারিয়াছে, তাহাই জানা যায়; ইহাতে শিক্ষা করিবার শক্তি জানা যায় বটে, কিন্তু প্রতিভার নূতন তথ্য বাহির করিবার ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায় না। আশ্চর্যের বিষয় এই, বড় বড় সম্পাদকেরা শ্রীযুক্ত ত্যাগরাজনের বাহাদুরীতে ভারতবাসির মানসিক শক্তির বড়াই করিবার সুযোগ হইয়াছে মনে করিয়া কিছু না কিছু লিখিলেন ; কিন্তু সমস্ত পৃথিবীর পণ্ডিতমণ্ডলীর অজ্ঞাত নূতন তথ্য বাহির করায় জগদীশচন্দ্র অন্ততঃ ভারতে অতুলনীয় যে মানসিক শক্তির পরিচয় দিলেন, তৎসম্বন্ধে নির্বাক হইয়া রহিলেন। এমন কি আচার্য বসু যে ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাঁহাদেরও ইংরাজি ও বাংলা খবরের কাগজগুলিতে এ খবরটা পর্যন্ত বাহির হইল না।



আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের শিক্ষালয় এবং বঙ্গীয় শিল্প-শিক্ষাগার (Bengal Technical Institute) উভয়েরই কার্য আরম্ভ হইয়াছে। যাহাদের বদান্যতায় এই দুই মহৎ কার্যের সূত্রপাত হইল, তাঁহারা ধন্য। বঙ্গীয় শিল্প-শিক্ষাগারের আয় কিরূপ ঠিক জানি না;

কিন্তু ৭ আষাঢ়ের "সঞ্জীবনী"তে দেখিলাম ইহার প্রাথমিক বিভাগে ২৫ রকম কারিগরি এবং উচ্চতর বিভাগে ৬ প্রকার প্রধান প্রধান যন্ত্রশিল্প, বয়নবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন প্রভৃতি শিক্ষা দেওয়া হইবে। এতগুলি বিষয় ভাল করিয়া শিখাইতে হইলে প্রথমেই সাজসরঞ্জাম ও যন্ত্রাদিতে কত মূলধন লাগিবে এবং বার্ষিক ব্যয়ই বা কত হইবে, তদ্বিষয়ে আমাদের অভিজ্ঞতা নাই। তবে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল কন্‌ফারেন্সের সাধারণ সম্পাদক শ্রীযুক্ত মুধোলকর প্রাদেশিক কমিটির সভ্যগণকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহাতে দেখিলাম যে বোম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেক্‌নিক্যাল ইনস্টিটিউটের মত একটি শিল্প শিক্ষাগার স্থাপন করিতে অন্ততঃ সাড়ে আট লক্ষ টাকা চাই। এবং উহা চালাইতে আরও সাড়ে এগার লক্ষ টাকার দরকার। অথচ এই বোম্বাই শিক্ষালয়ে যন্ত্রনির্মাণ বিদ্যা (Mechanical Engineering) বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বয়ন বিদ্যা, প্রধানতঃ এই তিনটি বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়।[১]

সুতরাং আমাদের কলিকাতার শিক্ষাগারে ২০ লক্ষ অপেক্ষা অনেক বেশি টাকার দরকার। এত টাকা উঠিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্য আমাদের বোধ হয় প্রথম প্রথম অল্পসংখ্যক বিষয় খুব ভাল করিয়া শিখাইবার বন্দোবস্ত করিলে ভাল হইত। খবরের কাগজে দেখিলাম জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরও একটি শিল্প-শিক্ষালয় খোলা হইয়াছে। যাহারা এই উভয় শিল্প-শিক্ষালয়ের পরিচালক, তাহারা বিদ্যাবুদ্ধি ও স্বদেশপ্রেমে বঞ্চিত নহেন। তাহারা দুটিকে এক করিয়া দিতে পারিলে একটি কাজের মত কাজ হয়।

●

বিদেশি চিনি ও বিলাতি নুন খাওয়া হইতে লোককে নিবৃত্ত করিবার জন্য প্রধানতঃ এই যুক্তি দেখান হয় যে ঐ চিনি ও নুন পরিষ্কার করিবার জন্য গোরক্ত, এবং গোরু, শূকর প্রভৃতির হাড়ের কয়লার চূর্ণ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়। যাহারা গোঁড়া হিন্দু ও মুসলমান, তাহারা এই যুক্তি প্রয়োগ করিতে পারেন বটে; কিন্তু ইহার দোষ এই যে সর্altবিধ বিদেশি চিনি বা বিলাতি নুন এই উপায়ে পরিষ্কার করা হয় না। তদ্ভিন্ন বিজ্ঞানের নানা পথ আছে। হিন্দু মুসলমান যাহাকে অশুচি মনে করেন না, এরূপ উপায়ে প্রস্তুত বিদেশি ও বিলাতি চিনি, নুন পাইলে কি তাহারা খাইবেন? তাহা ত খাওয়া উচিত নয়। আসল কথা এই যে, যে উপায়েই প্রস্তুত হউক না, আমরা বিলাতি নুন ও বিদেশি চিনি খাইব না, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা চাই।

●

আমাদের স্বদেশিতে প্রাণপণ করিয়া লাগিয়া থাকা উচিত। ইউরোপের লোকেরা জাতিবিশেষের সামরিক শক্তি অপেক্ষাও শিল্প-বাণিজ্য শক্তিকে অধিক ভয় করেন। পিয়ার্সন তাঁহার "জাতীয় জীবন ও চরিত্র" নামক পুস্তকে চীনদিগের সম্বন্ধে ঠিক্ এই কথা লিখিয়াছেন।[২]

---

১. The Victoria Technical Institute of Bombay has applied itself mainly to these three courses (mechanical and electrical engineering and textile manufacture). There was for some years provision made for teaching enamelling ; but this course had to be abandoned owing to certain difficulties. The capital expenditure for establishing an institute like the Bombay one-and it is not very lavishly or sumptuously equipped - would not fall bellow 8.5 lakhs. The maintenance and the recurring charges would not be less than Rs. 50,000 a year. ... Twenty lakhs of rupees would be required before a technical college which goes no further than the Bombay Institute can be extablished."

২. "The military aggrandisement of the (Chinese) Empire, which would provoke general resistance, is, in fact, less to be dreaded than its industrial growth, which other nations will be, to some extent, interested in maintaining."

National Life and Character. P. 141.

অনেকে মনে করেন, ভারতবাসীরা শিল্পবাণিজ্যে কখন বড় হইতে পারে না। কিন্তু সেটা ভুল। ভারতবাসীদিগকে পদদলিত করিবার একটা প্রধান কারণ এই যে, এতদ্দেশীয়েরা কোনরূপ রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাইলেই বিলাতি বাণিজ্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবে ও করিতে সমর্থ। ইহা আমাদের কথা নয়। India for sale ; Kashmir sold নামক পুস্তিকায় ইংরাজ গ্রন্থকার কি লিখিয়াছেন দেখুন—

"We do not appear to realise the fact that the loss of India will assuredly deprive us of all our Eastern trade, and yet it is easy to see that it will be so; for not only will be marts of India be closed against us if we lose it,—as firmly closed against us as are those of Central Asia now,—but besides this India, with its raw produce and its people skilled in manufactures from of old, will soon, under a system of protection, become a great manufacturing nation,—will soon with its cheap labour and abundant supply of raw material supplant us, throughout the East". (Page 4 of India for sale : Kashmir sold. By W. Sedgwick, Major R.E. Calcutta W. Newman and Co., Ld., 1886. Price 12 annas).

উপরে উল্লিখিত বাণিজ্য রক্ষণনীতি (Protection) কাহাকে বলে তাহা শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই জানেন। অন্যদেশ হইতে আমদানি সস্তা জিনিস স্বদেশি শিল্পের ক্ষতি ও উচ্ছেদ যাহাতে না করিতে পারে, এইজন্য নানাদেশে বিদেশি আমদানি জিনিসের উপর ট্যাক্স বসাইয়া তাহার দাম বাড়াইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু আমাদের বিদেশি গবর্নমেন্ট বিলাতি শিল্পের ক্ষতিকারক এই রক্ষণনীতি কখনই অবলম্বন করিবেন না। সুতরাং আমাদের স্বদেশিভাব, বিদেশি জিনিস আপাততঃ সস্তা ও ভাল হইলেও লইব না, এই যে ভাব, ইহাকেই রক্ষণনীতির কাজ করিতে হইবে। বিলাতের এক প্রধান অর্থনীতিজ্ঞ মিল্ দেশের শিল্পের শৈশবাবস্থায় রক্ষণনীতিকে কার্যকারী মনে করেন। তদ্রূপ জার্মেন অর্থনীতিজ্ঞ লিষ্ট রক্ষণনীতির সমর্থক। আর ইহার ফল ত হাতে হাতে দেখা যাইতেছে। বিলাতি শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি ও আমাদের শিল্পবাণিজ্যের অধোগতির মধ্যে এই নীতির কার্য দেখা যায়। সে কথা বিস্তৃতভাবে বলিবার ইচ্ছা আছে। আমেরিকার লোকেরা এই নীতি অবলম্বন করিয়া ধনশালী হইয়াছে। লেকী সাহেব তাঁহার এক গ্রন্থে একথার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] ভারতের মত যে দেশের লোককে খাদ্য-দ্রব্য অন্য দেশ হইতে আনিতে হয় না, তথায় এই নীতি খুব নির্ভয়ে চালান যায়। তবে শুধু এই নীতিতে কাজ হয় না। ক্রমাগত শিল্পের উন্নতির চেষ্টা চাই।



ইংরাজদের কোন কোন কাগজে স্বজাতির গুমর রক্ষায় লেখা হয় যে, "ভারতবর্ষের লোক বিলাতি জিনিস না লইলে আমাদের এমন কি ক্ষতি হইবে? সমস্ত পৃথিবীতে আমাদের কাটতি।" এটা কেবল ছেলে ভুলান কথা। আমরা এতে ভুলি না। ১৮৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৩০ অক্টোবর তারিখে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ভারতের ভূতপূর্ব লাট ডফারিন সাহেব বলেন যে ভারতের সঙ্গে বিলাতের রাজনৈতিক সম্বন্ধ আংশিক ভাবেও বিচ্ছিন্ন হইলে বিলাতের কুটীরে কুটীরে এই দুর্ঘটনার ফল অনুভূত হইবে।[৪]

---

৩. "The payment of the debt after the American war was due to the system of severe protection. Manufacturers by such protection made colossal fortunes. The working classes in America seen to have very generally adopted the opinion that a protective system, by raising the price of the articles they make and excluding.

৪. "Indeed, it would not be too much to say that if any serious disaster ever overtook our Indian Empire, or if our political relations with the peninsula of Hindostan were to be even partially disturbed, there is not a cottage in great Britain - at all events in the manufacturing districts - which would not be made to feel the disastrous consequences of such an intolerable calamity. —Cheers.

Lord Dufferin's "Speeches in India," John Murray, P. 284.

●

ভারতলুণ্ঠন করিয়া ইংরাজ কিরূপ ধনবান হইয়াছেন, তাহা এই পরোক্ষ প্রমাণ হইতে বুঝুন। কিন্তু বিলাতের "পৌষমাসে" আমাদের "সর্বনাশ" হইয়াছে।

●

আমাদের দেশের কতকগুলি অজ্ঞ বা তোষামোদকারী ভণ্ড লোকে বলে যে ইংরাজ আমাদের দেশের শিল্প রক্ষা ও উন্নতির জন্য খুব চেষ্টা করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাহারা বুঝে না, প্রতিকূল সমালোচনার জবাব দিবার জন্য ওরূপ দু-একটা সরকারি ঠাট্ বজায় রাখিতে হয়। আসল কথা এই যে, সরকারের আমাদের প্রকৃত উপকার করিবার ইচ্ছা থাকিলে, জাপান ৫০ বৎসরে যাহা করিয়াছে, আমরা ইংরাজ শাসনের ১৫০ বৎসরে তাহার সিকিও করিতে পারিতাম না কি? সত্য বটে, জাপানীদের মত স্বার্থত্যাগ ও স্বদেশপ্রেম আমাদের নাই। কিন্তু বুদ্ধিতে আমরা কম নই, এবং সময়ও ৫০ বৎসরের পরিবর্তে ১৫০ বৎসর আমরা পাইয়াছি। তাহাতেও আমরা কিছুই করিতে পারিলাম না কেন? এক হিসাবে অবশ্য সমস্ত দোষই ভারতবাসির। নতুবা তাহারা পর পদানত, লুণ্ঠিত সর্বস্ব, আজন্ম অর্ধাশনে মৃতপ্রায় হইবে কেন? সুতরাং আমাদের সম্পূর্ণ দোষ মানিয়া লইলাম। কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে ইংরাজ আমাদের শিল্পোন্নতি চান না। বড় বড় রাজপুরুষ যখন বলেন যে, তাহারা "প্রকৃত" স্বদেশিয় পক্ষপাতী, বয়কট বা বর্জনের পক্ষপাতী নহেন, তখনই বুঝিতে হইবে যে তাহাদের স্বদেশীর মানে এই যাহাতে বিলাতি মালের কাট্‌তি না কমে। বিলাতি বর্জন না করিলে স্বদেশীয় জায়গা হয় কেমন করিয়া? আর আমরা, বিলাতি বর্জন না করিয়া, বিলাতির মত সুন্দর ও সস্তা জিনিষ তৈয়ার করিয়া তাহার পর স্বদেশি চালাইব, ইহা মনে করা বাতুলতা মাত্র। বাস্তবিক পক্ষে কি কোম্পানির আমলে কি ভিক্টোরিয়া ও এডওয়ার্ডের আমলে, আমাদের শিল্পোন্নতির আন্তরিক চেষ্টা সরকারের তরফ হইতে হয় নাই।

●

অনেকে জানেন যে ইংরাজ জোর করিয়া আমাদের কারিগরদিগের নিকট হইতে তাহাদের অনেক গোপনীয় শিল্প প্রক্রিয়া জানিয়া লইয়া আমাদেরই টাকায় ঐ সকল তথ্যে পূর্ণ পুস্তক প্রস্তুত করিয়া ম্যাঞ্চেস্টরের কলওয়ালাদিগকে উহা বিনামূল্যে বিতরণ করেন। 'তোমার শিল, তোমার নোড়া, তোমারই ভাঙি দাঁতের গোড়া।' প্রমাণ নিচে দিলাম—

Every one knows how zealously trade secrets are guarded. If you went over Messrs Doulton's Pottery works, you would be politely overlooked, yet under the force of compulsion the Indian workman had to divulge the manner of his bleaching and other trade secrets to Manchester. A costly work was prepared by the India House Department to enable Manchester to take 20 millions a year from the poor of India ; copies were gratuitously presented to Chambers of Commerce and the Indian ryot had to pay for them. This may be political economy, but it is marvellously like something else.

—Major J. B. Keith in the Pioneer Sept. 7, 1898.

আমরা বাধ্য হইয়া বাংলা কাগজে এত ইংরাজি দিতেছি। অনুবাদ দিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।

●

আমরা যদি আত্মহত্যা করিতে প্রস্তুত হই, তাহা হইলে আমাদের কোন উপায় উদ্ভাবন করিবার আবশ্যক নাই। কিন্তু যখন আমাদের রাজারা ভারতের হিতের জন্য কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক, তখন যাহাতে আমাদের নিজের উন্নতি সাধন হইতে পারে, নিজের উপর নির্ভর করিয়া

তাহার উপায় আমাদের অবলম্বন করা উচিত। এই স্বদেশি-আন্দোলন ভালরূপে প্রচলিত হইলে, স্বদেশি বস্তুর প্রচার হইলে ভারতের উন্নতি সাধিত হইবে। সব দেশবাসিরাই স্বদেশি বস্তু ব্যবহার করা কর্তব্য জ্ঞান করেন। এমন কি ইংলণ্ড দেশে যেখানে অবাধ বাণিজ্য এত প্রচলিত সেখানে এখন পর্যন্ত স্বদেশ নির্মিত সামগ্রীকে তাহারা বিদেশি হইতে বেশি ভালবাসেন ও আগ্রহের সহিত ব্যবহার করেন। প্রায় দশ বৎসর হইল পার্লিয়ামেন্টের সভ্যদিগের বসিবার জন্য কিছু বিদেশি চেয়ার ক্রয় করা হইয়াছিল। তাহাতে একজন সভ্য যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া যেরূপ প্রশ্ন করেন, এবং রাজমন্ত্রী তাহার যাহা উত্তর দেন, তাহা স্মরণ রাখিবার যোগ্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে—

Foreign made goods. In the house of Commons on August 11, 1836.

Mr. Meclure asked the first commissioner of works whether the chairs in the Reporters Gallery and furniture in other parts of the House were of foreign manufacture, and why preference was given of foreign over British and Irish trade.

Mr. Akers Douglas. The only furniture of foreign manufacture in the House of Commons is limited to a number of chairs supplied to the press gallery and this was done some years ago. With this exception, all the articles in use are of British manufacture.



স্বদেশের কল্যাণের জন্য বিদেশি জিনিষ বর্জন কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা মার্কিনগণ, ইংরাজ দাসত্ব হইতে স্বাধীন হইবার জন্য যুদ্ধের পূর্বে দেখাইয়াছিল। তাহারা তখন বিলাতি জিনিস বর্জন করিবে বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। তাহাতে একবৎসরের মধ্যে মার্কিনদের দেশে বিলাতি জিনিসের আমদানি ১৯৯৫০০০০ টাকার হইতে ৬০০০০০০ টাকার হইয়া যায়, অর্থাৎ এক বৎসরেই এক তৃতীয়াংশের ও কম।[৫] বাঙালি, এমনি করিয়া বিলাতি বর্জন কর। সমুদয় অনাবশ্যক বিলাতি বিলাসদ্রব্য ত্যাগ কর। দরকারি জিনিষ দেশি ক্রয় কর। মিহি মোটার বিচার করিও না। বিলাসের ক্রোড়ে লালিতা ধনবতী-মার্কিন মহিলারা কম্বলের মত কাপড়ের পোষাক পরিয়াছিলেন, তবু বিলাতি মোলায়েম পশমী কাপড় কিনেন নাই।

প্রবাসী ১৩১৩ *ভাদ্র*

বিবিধপ্রসঙ্গ

জামালপুরের কাণ্ডকে হিন্দুমুসলমানের ঝগড়া মনে করা উচিত নয়। কিন্তু সরকারি কোন কোন কর্মচারী এবং কোন মুসলমান এইটাকে জাতিবিবাদে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিতেছে। এখন হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের প্রবীণ লোকেরা চেষ্টা করুন যাহাতে ঝগড়ার কারণ সকল অন্তর্হিত হয়। প্রকৃত জ্ঞান ও ধর্মভাবের বিস্তার না হইলে সকল কারণ দূরীভূত হইবে না। ইহা অত্যন্ত কঠিন সমস্যা। কিন্তু হিন্দুমুসলমানের প্রীতির উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নির্ভর করিতেছে। এই জন্য এই বিষয়ে যথাসাধ্য মন দেওয়া সকলেরই কর্তব্য। কিন্তু ইহা সকলে মনে রাখিবেন। যে কোন পক্ষেই অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা পোষণ করিলে চলিবে না। কোন পক্ষই এরূপ মনে করিলে চলিবে না যে অপরপক্ষ আমাদের প্রভুত্ব বা শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিবে। প্রীতি সমানে সমানে হয়, ছোট ও বড়র মধ্যে অনুগ্রাহক অনুগৃহীতের ভাব মাত্র আসিতে পারে। সুতরাং প্রীতি স্থাপন করিতে

৫. "Already the commercial prosperity of the western country was grievonsly impaired The colonists had met Charles Fownshend's policy by an agreement not to consume British goods ; and the value of such goods exported to New England, New Yok, and Pennsylvania fell in a single year from $ 1,330,000 to 400,000"

The American Revolution by Trevelyan, Part I.P. 114.

হইলে কাহাকেও খাট হইতে হইবে, এরূপ আশঙ্কা করিবার কোন কারণ নাই। কেবল এইটুকু চাই যে কেহ কাহারও ন্যায়সংগত অধিকারে হাত দিবেন না, বরং প্রয়োজন হইলে অপরের মনে কষ্ট না দিবার জন্য, নিজ ন্যায়সঙ্গত অধিকার অনুসারে কার্য করিতে স্থলবিশেষে ক্ষান্ত থাকিবেন।

প্রবাসী ১৩১৪ জ্যৈষ্ঠ

সন্ধ্যা

১৩১২ সালের ৩০ আশ্বিন

শুনিবার কথা

(১)

মাননীয় আনন্দমোহন বসু মহাশয় কাল পার্শিবাগানের মাঠে মিলন-মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। বসু মহাশয় মৃত্যুশয্যা হতে উঠিয়া এই নবজীবনাগ্নিতে ব্যজন করিতে গিয়াছিলেন। আহা! তাঁহার কি উৎসাহ, কি একাগ্রতা, কি স্বদেশভক্তি। তাঁহার বসিবার শক্তি নাই, দাঁড়াইবার শক্তি নাই, ভাবিবার শক্তি নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, অথচ স্বদেশের এই নবীন জীবনের সঞ্চারের সহায়তা করিবেন বলিয়া কেদারায় সত্য সত্যই আট-দশজনের স্কন্ধে ভর করিয়া সেই ভিত্তি স্থাপন ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কখন কি হয় এই আশঙ্কায় ডাক্তার নীলরতন সরকার ও ডাক্তার প্রাণকৃষ্ণ আচার্য মহাশয়দ্বয় দুইপার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন। তিনি যখন ভাবে গদগদ হইয়া সুরেন্দ্রবাবুকে আলিঙ্গন করেন তখন সভাস্থ সকলের চোখেই জল আসিয়াছিল। এমন পবিত্র দৃশ্য বহুদিন আমাদের নয়নগোচর হয় নাই। কোন বঙ্গীয় চিত্রকর এই সকল সম্মোহন চিত্র যথাযথরূপে সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারেন না কি?

যাচিয়া কুটুম্বিতা

আমরা নিজেরাও বড় উদার এবং সকলকেই উদারতার অবতার বলিয়া মনে করি। এতদিন আমরা ইংরেজ জাতিকে এইরূপ উদার মনে করিয়া তাহাদিগকে নমস্তস্মৈ নমস্তস্মৈ করিয়াছি। এখনও তাহাদের উদারতার প্রতি বিশ্বাসটা যোল আনা না হউক বার আনা রকম আছে। কোন দিন কোন ফিরিঙ্গি কাগজ একটু সুর বদলাইলেই আমরা অমনি আনন্দে আটখানা হই, স্বভাব শীঘ্র যাইবে না। গোলামীর ভাবটা যাইতে কিছু দিন বিলম্ব হইবে। এদিকে আবার অন্যরূপ উদারতা দেখা দিয়াছে। সমগ্র এশিয়ার প্রতি আমাদের মমতা জাগিয়া উঠিয়াছে। এতদিন ভারতবর্ষ লইয়া ব্যস্ত ছিলাম। বাঙালি, মারাঠি, পাঞ্জাবি, প্রভৃতিকে এক করিবার চেষ্টায় ছিলাম, এখন সমগ্র এশিয়াবাসীকে ভ্রাতৃভাবে বিভোর করিবার চেষ্টা হইতেছে। তা কিছু মন্দ নয় তবে অত বড় বড় মতলব আঁটিলেই কাজের বেলায় অশ্বডিম্ব লাভের সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলিতেছেন সমস্ত এশিয়ার শিল্পজাত সংগ্রহ করিয়া একটা খুব বড় রকম দোকান করিতে হইবে। সকল বুদ্ধি একেবারে খরচ করিয়া ফেলিলে পরে কি করা যাইবে। এখনকার সমস্যা কিসে দেশি কাপড় চোপড়ের সরবরাহ হয়। দেশি কাপড় চোপড় যথেষ্ট পরিমাণে উৎপন্ন করিতে না পারিলে এই স্বদেশি দ্রব্য ব্যবহার কল্পনা যখন কিছুতেই টিকিবে না তখন সর্বাগ্রে যাহাতে সেই দিকে আমাদের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হয় তাহার উপায় করিতে হইবে। লোককে আর নূতন মতলবে না নাচাইয়া কেবল তাহাদিগকে ঐ স্বদেশি শিল্পজাত উৎপাদনে নিযুক্ত রাখিতে হইবে। চীন জাপানের সহিত সখ্যস্থাপন খুব ভাল কথা কিন্তু আপাততঃ যখন দেশের লোক অন্ন বিনা মারা যাইতেছে, তখন আর আমাদের চীন

জাপানের কথা ভাবিবার অবসর নাই। সকল কাজে এক সঙ্গে হাত দিলে আমাদের সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে।

দেশে যে জাতীয় শক্তির অঙ্কুরমাত্র দেখা দিয়াছে তাহার ঘাড়ে এত বড় ভার চাপাইলে চলিবে না। আপনি বাঁচিলে ত বাপের নাম। দেশীয় শিল্পের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া আগে আপনাদের সমাজের সকল শ্রেণির লোকের অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা করিয়া লইয়া—তারপর আত্মীয় কুটুম্বের কথা ভাবিব। এখনই চীন জাপান বলিয়া এত উতলা হইলে চলিবে না। দেশের সমস্ত লুপ্তপ্রায় শিল্পের পুনরুজ্জীবন আমাদিগের প্রধান ও প্রথম কর্তব্য। এখন যাহারা দেশে অন্নের চিন্তায় ছটফট করিয়া বেড়াইতেছে—তাহাদিগের সেই চিন্তা দূর করিয়া দিতে না পারিলে তাহাদিগের নিকট হইতে লৌকিকতা, সৌজন্য, আত্মীয়তা কিছুই আশা করা যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে যদি আমরা শিল্পের উন্নতি করিয়া ধনধান্যে শ্রী সম্পন্ন হইয়া উঠিতে পারি তখন এশিয়ার অন্যান্য দেশকে তাহার সহিত বাণিজ্য ব্যাপারে আপনা হইতেই সংশ্লিষ্ট হইতে হইবে। পূর্বে যে দেশের শিল্প সম্পদ পাশ্চাত্য দেশবাসিগণেরও স্পৃহার সামগ্রী ছিল,সেই দেশের শিল্পজাত আবার প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইলে তাহা যে এশিয়ার সর্বত্র প্রবেশ লাভ করিতে পারিত সে বিষয়ে আর অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না। আগে আমরা, আপনারা আপনাদের পায়ে ভর করিয়া দাঁড়াই তারপর অপরের সহিত সম্বন্ধের কথা ভাবিব। এই জাপান এখন উন্নত হইয়াছে, কিন্তু জাপানীরা ত সমগ্র এশিয়াবাসীর সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার জন্য পূর্ব হইতেই এত ব্যস্ত হয় নাই। উহারা আপনাদের চেষ্টায় আপনারা বড় হইয়াছে, তারপর আপনাদের ঘর সামলাইয়া লইবার পর দম্ভের সহিত ঘোষণা করিয়াছে যে এখন এশিয়াবাসীদের মধ্যে যে আমাদের সাহায্য প্রার্থনা করিবে তাহাদিগকেই আমরা সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইব। যাচিয়া আত্মীয়তা করাটা কিছুতেই ভাল নয়। আমাদের তেমন অবস্থা হইলে অপরে আমাদের সহিত আত্মীয়তা করিতে আপনা হইতেই উৎসুক হইবে।

ক্ষুদে লাট

স্যর আন্দরু ফেরেজার ছিলেন রাম—হইলেন এখন ক্ষুদিরাম—ছিলেন সমস্ত বাংলার লাট—হইলেন এখন আধা বাংলার ক্ষুদে লাট। কেহ কেহ খোসামদে বলিতেছে যে তিনি প্রজার হিতের জন্যই এতটা মান মর্যাদা খোয়াইলেন। ইংরেজের আবার মান মর্যাদা। দুদিনের জন্য চাকরি করতে এসেছে—দুদিন পরে চলিয়া যাইবে। আর বিলাতে ফিরিয়া গিয়া যে মুষিক সেই মুষিক হইয়া যায়। বাংলার লাট ক্ষুদে লাট হইয়া তার ষোল আনাই লাভ। কাজকর্ম যতদূর হতে পারে কমিয়া গেল কিন্তু মজুরি সেই লাখ টাকার এক কাণা কড়িও কম নয়। ইংরেজ আবার আমাদের হিতের জন্য স্বার্থত্যাগ করিবে। মার চেয়ে ভালবাসে সে বড় ডাইন। যখন কুবুদ্ধি ধরে তখন এই রকমই ঘটে। বাংলা দেশ ভাঙিতে গিয়া নিজেরাই দুটুকরা হইয়া গেল। ক্ষুদিরাম ক্ষুদে লাটের খাতির কতই না খেলো হইয়া গিয়াছে। এই ভাঙা মান লইয়া ইংরেজরাজ লোকের চোখে বড়ই ছোট হইয়া গেল। কিন্তু ইংরেজ ও সব দেখেও না বুঝেও না। তাহারা টাকা হইলেই হইল। একটা দেশকে দুটা করিলে দেশটাকে ডবল করিয়া লেখা যাইবে। এই ক্ষুদে লাটের ক্ষুদে পরিষদগুলিরও দুর্দশা বড়। তাহাদের বক্তৃতায় কেবল আজ দেশের লোক তালি বাজাবে। তাহাদের ইংরেজের কাছে আদর আবদারের মূল্য আধকড়া কড়ি হইয়া যাইবে। তাহারা এখন ইংরেজের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়া নিজেরাই মোটা তাজা হইবেন আর সেই উচ্ছিষ্ট ছড়াইয়া লোকভ্রষ্ট করিতে পারিবেন না। আমাদের দেশি পরিষদগুলা আর কেন গড্ডালিকা সাজিয়া লোক হাসান। কেহ কি নাই যে এই গড্ডালিকাগুলির চক্ষুকর্ণ ফুটাইয়া দেয়। আর কেন আধা মুলুকে আধা মজলিশে ক্ষুদে লাটের

খোসামোদ বা তাহার সঙ্গে আবদারের ঝগড়া করিয়া কি হইবে। সরিয়া পড় না। আরও একটু কানমোচড়ানি জুতার ঠোক্কর না খাইলে ইহাদের চেতনা হইবে না। কি হইতে কি হইয়া গেল। ইংরেজ ভাঙিতে গিয়া নিজে ভাঙিয়া পড়িল। আর ভাঙিয়া গেল ইংরেজের ভিক্ষাপুত্রেরা। কিন্তু বাঙালি জাতির ভিতরকার একতা সজোরে বাহির হইয়া পড়িল।

সুরেন্দ্রনাথের যেমন অসামান্য মানসিক শক্তি তেমনই অনন্যসাধারণ শারীরিক শক্তি। ঐ ত পলিত কেশ বৃদ্ধদেহে জরার প্রাদুর্ভাব বেশ দেখা দিয়াছে। কিন্তু কাল যখন তিনি নগ্নপদে এক বিশাল জনতার অধিনায়কভাবে পার্শিবাগান হইতে পশুপতিবাবুর বাড়ির দিকে ছুটিয়া যাইলেন তখন তাঁহার শক্তি দেখিয়া সকলেই অবাক হইয়াছিল।

৩

কাল নিমতলা-ঘাটে একজন শিশু সমস্ত ভিখারীর হাতে রাখি বাঁধিয়া দিয়াছে ও তাহাদিগকে প্রীতি সম্ভাষণ করিয়াছে।

৪

কাল নাটোরের মহারাজাকে সকলের অনুরোধক্রমে মটরকার হইতে নামিয়া পদব্রজে পশুপতিবাবুর বাড়িতে যাইতে হইয়াছিল। আরও অনেক সম্ভ্রান্ত লোককে কাল গাড়ি হইতে নামিতে হইয়াছিল।

৫

কাল পশুপতিবাবুর বাড়িতে ভিখারী, মুটে গাড়োয়ান প্রভৃতি যেমন ভক্তি ও আগ্রহের সহিত মায়ের প্রণামী লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে যে বঙ্গের শুভদিন সমুপস্থিত সে বিষয়ে আর তিলমাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই। পশুপতিবাবু, মন্মথবাবু, গগনবাবু প্রভৃতি যাঁহারা ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেছিলেন তাঁহাদের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে মিষ্ট ব্যবহারও লক্ষ্য করিবার বিষয়।

৬

কাল পশুপতিবাবুর বাড়ির বাহিরের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে বিশাল জনতার মধ্যে একজন ইংরাজ উন্মত্তের ন্যায় মুহুর্মুহু বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করিয়া টুপি ছুড়িতেছিল ও নাচিতেছিল। সকলে বলিল ঐ মহাপ্রাণ ইংরেজ নাকি স্টেট্সম্যান সম্পাদক র‍্যাট্‌ক্লিফ সাহেব।

৭

কাল মিলন মন্দিরের ভিত্তি স্থাপনের সময়ে ইংলিশম্যানের সহকারী সম্পাদক নিউম্যান সাহেব উপস্থিত হইয়াছিলেন। দুই একজন বাঙালি ভদ্রলোক তাহার হাতে রাখি বাঁধিতে গিয়াছিলেন, সাহেব প্রথমে রাখি বাঁধিতে স্বীকার করেন নাই, তার পরে নাকি উপরোধে ঢোঁক গিলিয়াছিলেন।

৮

ইংলিশম্যানের সম্পাদক পশুপতিবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হইতে চাহিয়াছিলেন। ইংলিশম্যানের সম্পাদককে দেখিলে সাধারণের মনে বিদ্বেষের ভাব আসিতে পারে আশঙ্কা করিয়া কর্তৃপক্ষ নাকি পূর্ব হইতেই তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন।

৯

কাল কেটওয়েল বুলেন কোম্পানির সাহেবেরা বাঙালি কেরাণিদিগকে বেলা দুইটার সময় ছুটি দিয়াছিলেন। জিনিসপত্র না পাওয়ায় কাল তাহাদের ভাল খাওয়া-দাওয়া হয় নাই একথাও তাহারা অফিসে ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

১০

কাল যখন প্রাতে গঙ্গাস্নানান্তে মাড়োয়ারীরা কাজকর্ম বন্ধ করিয়া আপন আপন দোকানে বসিয়াছিল, তখন বহু পুলিশ প্রহরীবেষ্টিত সহর কোটাল হালিদে তাহাদিগকে দোকান খুলিতে অনুরোধ করিতেছিলেন। কিন্তু যখন অনেক মাড়োয়ারী একত্রিত হইয়া তাহার কথায় প্রতিবাদ করিতে লাগিল তখন তিনি পুলিস প্রহীদিগকে তথা হইতে চম্পট দিতে উপদেশ দিয়া আপনিও সরিয়া পড়িলেন।

১১

কাল যখন প্রাতে শুনা গেল যে কাশীপুর রেলীর বাড়িতে লোকজন একটু আধটু কাজকর্ম আরম্ভ করিয়াছে, তখন একদল লোক যাইয়া সেখানে বন্দে মাতরম্ গাহিতে আরম্ভ করে। তখন সেখান হইতে এমন কি গান্ ফাউণ্ডারী হইতেও কুলীমজুর বাহির হইয়া চলিয়া আসিল। সাহেবরা হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অমর বঙ্কিমের "বন্দেমাতরম্" গানের কি মন্ত্রশক্তি!



The Statesman

INDUSTRIAL IMPULSE IN NATIONAL LIFE

The speech of Mr. Surendra Nath Banerjee, at the opening of the Tangail Industrial and Agricultural Exhibition the other day, reads almost like a commentary on the Viceroy's recent appeal to wealthy natives of India to put their capital into Indian industrial enterprises. The most hopeful feature of the present economic situation, said Mr. Banerjee, is to be found in the industrial impulse which is vibrating through the national life, shaping its ends and determining its purposes. In Ahmedabad an association has been formed for the protection, and in Calcutta a store has been opened for the sale of indigenous goods. Mr. Banerjee declared that he had been most forcibly struck of late by the skill and the power of organization displayed by the Guzeratis. The mills of Ahmedabad—and the place is studded with them are owned and controlled by Guzeratis. The capital is Indian, labour is Indian, the controlling agency is Indian, the profits go into the pockets of Indians.

On the other hand, Bengal, like Guzerat, is studded with mills but the capital and enterprise are English and the profits are drained out of the country. Mr. Banerjee's wholesome exhortation to his countrymen, however, was strongly flavoured with Protectionist notions. An indigenous Government, he affirmed, would infallibly have been Protectionist. Any Government that was responsible to the intimations of Indian opinion would doubtless favour protection : but, although Government protection is out of the question, it is possible for the people of India to extend all kinds of fruitful encouragement to their nascent industries. It is interesting to note that, having admitted that there was no chance for protection, Mr. Banerjee should declare for the removal of all restrictions in regard to a social matter closely connected with industrial progress, namely the question of foreign travel. He pointed out that the Brahmin convict who goes to the Andamans does not lose his caste. The fate is reserved for the Brahmin graduate who goes to England, stands as the first man of his year in a competitive examination, and beings honour upon his family and country. A more insensate and anomalous restriction, it would be impossible to find "Adaptation to our

environment", added Mr. Banerjea, "is the great law of life and progress. Our fathers preached this law and they were great and that Hindoo system still endures.

Extract from an editorial, February 28, 1903.

RESHAPING BENGAL

Our objections, and we believe the objections of all reasonable opponents of the scheme (partition of Bengal), are directed against the way in which the scheme has been formulated and put through, and against the objections of the Government which do not get stated in speeches and resolutions. These objections are briefly : first, to destroy the collective power of the Bengali people ; secondly, to overthrow the political ascendency of Calcutta, and thirdly, to foster in East Bengal the growth of all Mahomedan power which it is hoped will have the effect of keeping in check the rapidly growing strength of the educated Hindu community. It may be thought that if these are the real, though not usually the avowed, objects of the present administration, the scheme of partition now proclaimed has been devised with uncommon cleverness and foresight. Upon that point, we suggest, there are several thing to be said. We quote the Resolution ; "The Governor-General in Council is directing that the necessary measures shall now be taken to introduce the scheme, looks forward to the day as not far distant when not merely will the new province of Eastern Bengal and Assam have amply vindicated its creation as character and influence not inferior to those of any of the older Indian provinces and will have attracted to itself the spontaneous and devoted loyalty of its sons." It is perfectly possible that these words may be literally fulfilled. But—and this is the point—it is equally possible that the fulfilment may be the virtual defeat of the policy to which, after so many delays and vicissitudes, the Government of India has now succeedded in giving shape.

July 21, 1905

UNANSWERABLE EVIDENCE OF POPULAR FEELING

The demonstration against the partition of Bengal of which this city was the scene yesterday was notable among gatherings of its kind. During the last few years mass meetings in connection with matters of public have been frequent in Calcutta, but it would be true to say that in point of numbers and of earnestness yesterday's immense gathering was more remarkable than any within recent memory. A part from the student procession—a picturesque accessory upon which, we suspect, even the organizers of the demonastration would not wish to lay much stress—the crowd was enormous. It filled every available foot of space on the two floors of the Town Hall itself, and overflowing on to the maidan was sufficient to form a third meeting which was addressed by several of the speakers while the resolutions were being passed inside. The titled aristocracy of Bengal was represented by a number of its prominent members, several of whom were among the speakers. The polititcal leaders, of course, were present, though not obtrusively to the fore and the audience itself–if the word is admissible in this connexion was representative of every section of the population–large numbers of Marwaris and Mahomedans being visible among the packed masses of Bengali Hindus. In a word the meeting besides being extraordinary large, if not actually unparalleled in numbers provided unanswerable evidence of strong popular feeling and of the

genuine popular movement.

Comment, August 8, 1905

START OF SWADESHI

We ask our readers to reconsider, in the light of plain facts and common sense, the Swadeshi movement and its accompaniments. There is, we take it, no longer any wish on the part of the public to deny that so-called "boycott" of English made goods, especially of Lancashire cotton cloth is the outstanding feature of the present situation. Hither to the European commercial community has taken the prudent course of treating with tolerant amusement a movement which in its earlier stages seemed merely absurd.

It will be noted with satisfaction that the Bengali papers are expressing regret and concern on account of the unfortunate incidents which during the past fewdays have accompanied the boycott. These incidents are calculated not only to cmplete the alienation of the European community from the party opposed to the Partition policy, but also to strengthen of feeling already expressed in sufficiently deffinite terms that methods of repression, if not systematic reprisals, should be resorted to. The Amrita Bazar Patrika a day or two ago expressed its confidence that the students who are, of course, responsible for the disturbances will "do nothing which is unconstitutional or of which they may be ashmed." It would be a pity if the impression should become general that the Swadeshi movement is in any sense violent or seditious in character.

September 7, 1905

VICEROY'S MIRACULOUS ESCAPE FROM DEATH

All the available details go to show that Their Excellencies the Viceroy and Lady Hardinge had a miraculous escape from the violent death which had been planned for them. The fact that the Jemadar standing close behind them was killed plainly indicated that but for a delay of two or three seconds on the part of the assassin the plot might have been wholly successful. Happily, Lady Hardinge has escaped without injury and though the wound which the Viceroy sustained on the shoulder connot be regarded as a slight one, the reports give reason to hope that His Excellency will make a speedy recovery. Universal satisfaction will be felt therefore, that apart from the lamentable death of an unoffending Indian soldier, and an unfortunate boy spectator, the crime has been as ineffectual as other dastardly attempts of the same kind. It is however, only too evident that the Anarchist peril has not yet been stamped out in this country. No one can suppose for a moment that the attempt upon Lord Hardinge's life was inspired by anything in the nature of a rational political grievance. It belongs to the category of meaningless crime which must apparently be accounted for by an incurable tendency in certain individuals to homicidal mania. If any Viceroy could be regarded as secure from the designs of political malcontents Lord Hardinge might have been so considered before the event of yestenday. Whatever views may be formed of his policy, it cannot be denied that it has been such as to give widespread satisfaction to the educated Indian community. No offence to Indian sentiment can be laid to his charge. On all sides he has been recognised as friendly to Indian interests, and indeed has been consistently so. No motive then could be suggested

for the plot aginst his life. We are accordingly driven to the conclusion that we have still to reckon in India with the machinations of a crazy Anarchism, which are the more dangerous because they have no reasonable purpose and the more difficult to cope with because they are so incalculable in their scope and erratic in their aims.

Extract from an editorial, December 24, 1912

ভারতী—১৩১৫ জ্যৈষ্ঠ

লর্ড কার্জন ও বর্তমান অরাজকতা

১৮৯৯ হইতে ১৯০৮

লর্ড কার্জন আগে লর্ডও ছিলেন না, ধনশালীও ছিলেন না। তিনি পারস্য দেশে গমন করিয়া তথাকার রীতিনীতি ও অধিবাসীদের সম্বন্ধে একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। এই পুস্তকই তাঁহার সৌভাগ্যের মূল কারণ। ইহা পাঠে বৃটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কোন রাজকার্য উপলক্ষে আমেরিকায় প্রেরণ করেন। সেখানে ওয়াশিংটন নগরে তৎকালের প্রেসিডেন্ট ক্লিভল্যাণ্ডের হোয়াইটহাউস প্রাসাদে সেদেশের কোন ক্রোড়পতির কন্যা মিস লাইটারের সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হয় এবং পরে ইঁহার পাণিগ্রহণে "রাজকন্যা ও অর্ধেক রাজত্ব" একসঙ্গে লাভ করিয়া তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। সৌভাগ্য দ্বারাই সৌভাগ্য বর্ধিত হয়। এই বিবাহের ফলে দেশে আসিয়া তিনি ভারতের শাসনকর্তৃত্ব পদে বরিত ও লর্ড উপাধিরূপে সম্মানিত হইয়া ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ভারতে আগমন করিলেন। ধনী-কন্যাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে তদুপযোগী সমাদর, মর্যাদায় ভূষিত করিতে কার্জনের কিরূপ প্রবল আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছিল—দিল্লির দরবার হইতে তাহা অনুমান করা যায়।

তিব্বতে সৈন্যপ্রেরণ

তিব্বতে সৈন্যপ্রেরণ লর্ড কার্জনের একটি বিশেষ দুর্নীতি। তিব্বত দমন অভিপ্রায়ে কত অর্থ কত প্রাণ ধ্বংস হইল তাহার ঠিক নাই ; কিন্তু শেষে ফললাভ হইল কি? কার্জন বুঝিলেন, তিব্বতগ্রাস অসাধ্য, এবং সেই দুর্গম্য হিমপ্রদেশে বসবাস বা বাণিজ্যের আশাও দুরাশা মাত্র। তখন পণ্ডশ্রম বুঝিয়া মানে মানে সৈন্যগণ তিব্বত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। তিব্বত চীনের অধীনেই রহিয়া গেল।

কার্জনকে বা ইংরাজনায়কদিগকে ধর্তব্যরূপে এ নীতির ফলভোগ করিতে হইল না। গরিব ভারতবাসীই অকারণ ধনেপ্রাণে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এই দুর্নীতির পীড়ন সহ্য করিল। কিন্তু ইহাতে কি কার্জনের চক্ষু ফুটিয়াছিল?

দিল্লির দরবার

১৯০৩

এমন জাঁকজমক সমারোহে ইতিপূর্বে কখনও কোন বাদসাহ দরবারমসনদে বসেন নাই। কুইন ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে, যুবরাজের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে, লর্ড কার্জন আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত অভিনয় করিতে অবসর পাইয়া, জীবনের প্রধানতম ও প্রবলতম আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি করিয়া লইলেন। তখন রাজপুত্র ডিউক অফ্ কনোট সপত্নীক এখানে আসিয়াছিলেন। দিল্লিতে দরবার উপলক্ষে বহুব্যয়ে নির্মিত রাজপ্রসাদে কার্জন সপরিবারে বাস করিতে লাগিলেন, আর রাজপুত্রের জন্য শিবির ব্যবস্থা হইল। দরবারে কার্জন সস্ত্রীক স্বর্ণ সিংহাসনে আর ডিউক ও ডিউকপত্নী রৌপ্য

সিংহাসনে বসিলেন। শাসনকর্তা মণিময় অপূর্বদর্শন ময়ুরপরিচ্ছেদে সজ্জিত হইয়া, সস্ত্রীক সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতবর্ষের রাজন্যবর্গের পূজা গ্রহণ করিলেন—আর রাজপুত্র ও রাজপুত্রবধূ তাঁহাদের পশ্চাতে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহার অধিক সম্মান গর্ব তাঁহার পক্ষে আর কি হইতে পারে? রাজপুত্রের প্রতি তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে রাজভক্ত ইংরাজ ও ভারতবাসী সকলেই সমভাবে ক্রোধে ক্ষোভে জ্বলিতে লাগিল।

তাঁহার এই গর্ব পরিতৃপ্তির জন্য, খেয়াল পূর্ণ করিবার জন্য ভারতেব রক্ত শোষিত হইল। রাজন্যবর্গ ঋণগ্রস্ত হইয়া প্রজাপীড়নে বাধ্য হইয়া পরস্পরকে জাঁকজমকে হারাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেশের টাকা জলের মত জলে গিয়া পড়িল।

ইহার পর ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি চিহ্ন স্থাপনের জন্যও যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। মহারাণীকে দেশের লোক আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করে : তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই প্রকৃত শোকমগ্ন, তাঁহার স্মৃতির জন্য কি রাজা কি প্রজা মুক্তহস্তে সাধ্যাতীত দান করিতে লাগিলেন। কিন্তু লর্ড কার্জন ইহার সদ্ব্যবহার করিলেন না। যদি ভিক্টোরিয়া হলের পরিবর্তে এই অর্থ, দেশের যথার্থ কোন উপকারকার্যে— দুর্ভিক্ষের জন্য বা শিক্ষার জন্য ব্যয় হইত তবেই ভিক্টোরিয়ার স্মৃতি সার্থক হইত, লর্ড কার্জন সকলেরই ধন্যবাদের পাত্র হইতেন।

ইউনিভার্সিটির আইন

এই আইনের দ্বারা উচ্চ বিদ্যাশিক্ষার মূল্য তিনি এত বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন যে সর্বসাধারণের পক্ষে শিক্ষালাভ এখন দুরূহ। দেশের লোকে প্রাণপণে ইহার বিরুদ্ধে চীৎকার করিল, কিন্তু প্রভু তাহাতে কর্ণপাতও করিলেন না। আইন পাশ হইয়া গেল।

এই সঙ্গে রাজকীয় সংবাদপ্রচারনিবারণী আইন পাশ করিয়া রাজকার্যের যথাযথ সমালোচনা পর্যন্ত তিনি বন্ধ করিয়া দিলেন। অধিকন্তু এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে বক্তৃতা প্রদান করেন—তাহাতে প্রাচ্যজাতির প্রতি যেরূপ অযথা নিন্দা-বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাহার তীব্র জ্বালাও ভারতবাসী এখনো বিস্মৃত হয় নাই!

বঙ্গবিভাগ

১৯০৪

বঙ্গবিভাগ কার্জনের সর্বপ্রধান ও সর্বশেষ অমরকীর্তি। দেশের লক্ষ লক্ষ লোক মিটিং করিয়া সমস্বরে এ সম্বন্ধে তাহাদের অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিল। তিনি সে আবেদনে, সে ক্রন্দনে ভ্রূক্ষেপহীন হইয়া এই দুর্নীতি কার্যে পরিণত করিলেন। বঙ্গবিভাগ হইয়া গেল। দেশের লোক বজ্রাহত হইল। ইংরাজের ন্যায়বিচারে এতদিন যে দৃঢ়বিশ্বাস ছিল সে বিশ্বাস টলিল। ইংরাজজাতির শাসনের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল তাহা ভ্রান্তি বলিয়া সকলের ভ্রম হইতে লাগিল। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল লর্ড কার্জনের শাসনে এইরূপে বঙ্গে সমূহ দুর্দিন আনয়ন করিল।

বন্দেমাতরম্

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ১৬ অক্টোবরে বঙ্গবিভাগ হইল। সেদিন জাতীয় শোকপর্বে নব উৎসবের সৃষ্টি। সেদিন বঙ্গের প্রতি বাজার, প্রতি দোকান বন্ধ, প্রতিগৃহে অরন্ধন ; সকলে শোকউৎসবে এক হইয়া, ভ্রাতায় ভ্রাতায় রাখি বাঁধিয়া, সমস্বরে মহামন্ত্র উচ্চারণ করিল "বন্দেমাতরম্"। লর্ড কার্জন তাহার দুর্নীতিতে ভারতে একতামন্ত্র জাগাইয়া দিলেন।

এই মন্ত্র উচ্চারণে বিদ্রোহিতা ছিল না, তাহার অভিপ্রায়ও ছিল না; ছিল কেবল, সমস্বরে এই দুর্নীতির প্রতিবাদ, ইহাতে অসন্তুষ্টি ও অশ্রদ্ধা প্রকাশ, সকলে এক হইয়া দেশের হিতকল্পে

কার্য করিবার এবং বিলাতি দ্রব্যের স্থলে দেশের দ্রব্য ব্যবহার করিবার সঙ্কল্প।

অস্ত্রহীন শস্ত্রহীন এবং প্রধানতঃ ভারতের স্বল্পবুদ্ধি বালককণ্ঠে উচ্চারিত এই মন্ত্রে প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভীত কম্পিত হইয়া উঠিলেন। কেন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। ভীরু বাঙালির এই মন্ত্র উচ্চারণ সহ্য করিতে না পারিয়া কার্জন বোম্বাই হইতেই ইংলণ্ডে গমন করিলেন। সিমলা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিতে তাহার সাহস হইল না। আসল কথা তাহাব অন্তরাত্মা তাহাকে ভীত করিয়া তুলিল। তিনি যে অন্যায় কার্য করিয়াছেন, লক্ষ কোটি প্রজার অন্তর্দাহ করিয়াছেন এই বোধই তাহাকে বঙ্গে মুখ দেখাইতে দিল না।

বরিশাল কন্‌ফারেন্স

১৯০৫

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে নভেম্বর মাসে লর্ড কার্জন চলিয়া গেলেন কিন্তু তাহার রাজনীতি ভারতে স্থায়ী হইয়া গেল। তাহার ফলে, দেশের অসন্তুষ্টি, স্বদেশি আন্দোলন, ছাত্রগণের পথে ঘাটে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রোচ্চারণ বাড়িতে লাগিল। গভর্নমেণ্ট ইহাতে ভীত হইলেন। শাসনকারী এবং শাসিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রকৃত পরিচয় থাকিলে গভর্নমেণ্টের এরূপ ভয়ের সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তাহারা দেশের অবস্থা, দেশের লোককে প্রকৃত ভাবে জানেন না। অতএব এদেশের সহিত পাশ্চাত্য দেশেব তুলনা করিয়া বন্দেমাতরম্ উচ্চারণকারীদিগকে সামান্য অপরাধে গুরুদণ্ড দিতে লাগিলেন। বালকের কার্যে, কারণে অকারণে তাহারা বৃদ্ধের কার্যগুরুত্ব অর্পণ করিয়া বিষম শাসন আরম্ভ করিলেন। বিষময় ফল ফলিল। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বৈশাখ মাসে বরিশাল কন্‌ফারেন্স পুলিসের অন্যায় বাধাতে বন্ধ হইয়া গেল। নিরস্ত্র বালকগণ পুলিসের ভীষণ লগুড়াঘাতে ক্ষত বিক্ষত রক্তাক্ত হইয়া উঠিল। সেই সময় সেই অন্যায় পীড়নে একান্ত পীড়িত বালক মনোমোহন সর্বান্তঃকরণে অভিশাপ দিয়াছিল, গভর্নমেন্ট অন্যায় করিয়া আজ যে রক্তপাত করিলেন, এই রক্ত আমার ভবিষ্যৎ ভ্রাতৃগণের দেহে একদিন প্রবল শক্তিতে সঞ্চারিত হইয়া উঠিবে।

তখন একথা পীড়িতের আর্তনাদ, পাগলের প্রলাপোক্তি বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আজ দেখিতেছি এইরূপ অত্যাচাব অবিচার শান্তিপ্রিয়, ধর্মভীরু বঙ্গবালকগণকেও পাশ্চাত্য অরাজকতার মন্ত্রে দীক্ষা দিয়াছে। বাহুবলহীন, পাঠানুরাগী, নিরীহ রাজভক্ত জাতিকেও জঘন্য বিদ্রোহিতা পাপে লিপ্ত কবিয়া তুলিযাছে। ইংরাজশাসন যে আমাদের পক্ষে প্রকৃত মঙ্গলকর, ইংরাজ রাজ্যলোপ কল্পনা কবাও যে আমাদের পক্ষে অহিতজনক, এই ক্ষণিক অত্যাচারে তাহা পর্যন্ত ভুলিয়া গিয়া অবোধ বালকগণ হত্যারূপ পাপকার্য দ্বারা নিজের এবং দেশের সর্বনাশ করিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই! হায়! ইহা অপেক্ষা দেশের শোচনীয় অবস্থা আর কি হইতে পারে।

গভর্নমেন্টের প্রতি নিবেদন

অন্যায় করিলে শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, পাপ করিলে দণ্ডভোগ অনিবার্য। গভর্নমেণ্ট এই পাপলিপ্ত বালকগণকে শাস্তি দান করুন, সে বিষয়ে আমাদেব বলিবাব কিছুই নাই। অপরাধীগণ অকাতরে অকুতোভয়ে তাহাদের স্বোপার্জিত প্রাপ্যশাস্তি শিরোধার্য করুক, তাহাতেই দেশের মঙ্গল।

আমাদের কেবল গভর্নমেণ্টের প্রতি এইমাত্র নিবেদন, যাহারা এই রাজবিদ্রোহিতা-অপরাধে লিপ্ত, তাহারাই কি একমাত্র সর্বতোভাবে, সম্পূর্ণরূপে এই কার্যের জন্য দায়ী? লর্ড কার্জন প্রমুখ শাসনকর্তাদিগেব শাসননীতি কি এই কার্যের জন্য তাহাদিগকে যথেষ্ট উত্তেজিত কবে নাই? গভর্নমেণ্ট আপনাকে বালকদিগের স্থলে একবার কল্পনা করিয়া দেখুন। দেখিয়া,যাহাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলুন, ইহাই মাত্র আমাদের নিবেন, আমাদের প্রার্থনা।

বাঙালি স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, কৃতজ্ঞ, ইংরাজ শাসনে শ্রদ্ধাশীল। যে কারণে তাহাদের মধ্যে কিয়দংশেরও এই আজন্মসংস্কার স্খলিত হইয়াছে, গভর্নমেণ্ট সেই কারণগুলির অনুসন্ধান করিয়া তাহার প্রতিবিধান করুন; তাহা হইলেই রাজায় প্রজায় পুনরায় বিশ্বাস স্থাপন হইবে, অনুরাগের সম্পর্ক বর্ধিত হইবে, অকারণ অমঙ্গল সমস্তই দূর হইয়া যাইবে।

ইংরাজ গভর্নমেণ্ট প্রকৃত পক্ষে আমাদের কিরূপ হিতকারী তাহা যাহাদের কিছুমাত্র স্থির বুদ্ধি আছে তাহারাই বুঝেন। আজ যদি ইংরাজ চলিয়া যান, আমরা কত বিপদে পড়িব কে বলিতে পারে? আমাদের চারিদিকে শত্রু ; আজ আমরা যাহাদিগকে মিত্র মনে করিতেছি তখন তাহারাও শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা আপনারাই হয়ত তখন পরস্পরে খুনোখুনি করিয়া মরিব। কিন্তু আহত হইলে লোকের জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না। মুহূর্তের উত্তেজনায় লোক যুগযুগান্ত-আরাধনার বিজ্ঞতা, স্থৈর্য বিসর্জন দিয়া থাকে। ইহাই সাধারণতঃ মনুষ্য স্বভাব। তবে সন্তান হইতে পিতার দায়িত্ব যেমন অধিক, প্রজা হইতে রাজার দায়িত্বও সেইরূপ গুরুতর প্রতি কার্যে, প্রতি শাসনে সুনীতি সাম্যনীতি প্রকাশ দ্বারা রাজার প্রতি প্রজার বিশ্বাস স্থাপনের চেষ্টাই প্রকৃত রাজনীতি। রামচন্দ্র প্রজারঞ্জনের জন্য প্রাণাধিক সীতাকেও বিসর্জন দিয়াছিলেন। ইহাই আমাদের আদর্শ রাজধর্ম।

লর্ড কার্জনের যথেচ্ছাচার নীতির পরিবর্তে গভর্নমেণ্ট এই দিকে একটু লক্ষ্য রাখিয়া চলিলেই অচিরে শান্তি স্থাপন হইবে।

পরিশিষ্ট-১২

কিরণেন্দু বাগচি

বহ্নিবিপ্লব*

ঐ ১৯০৫-এর ১ সেপ্টেম্বরেই ধুরন্ধর প্রতিনিধি ভারতের গবর্নর জেনারেল লর্ড কার্জন সিমলা শৈলশিখরে ব'সে সরকারি ফতোয়া জারি করলেন—'বাঙলাদেশ দ্বিখণ্ডিত।'

প্রথম খণ্ডে—ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রাজসাহী বিভাগ আর তার সঙ্গে যুক্ত হ'বে আসাম, যা এতদিন চিফ কমিশনারের অধীনে আছে। এই কয়টি একত্রে হবে পূর্ববঙ্গ প্রদেশ। শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, একজন লেফট্‌টেন্যান্ট গবর্নর, ঢাকা রাজধানী থেকে।

অবশিষ্ট বাংলার যেটুকু থাকল তা বিহার, উড়িষ্যার সঙ্গে একত্র হয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ নামে অভিহিত হল ; রাজধানী কলকাতা। এখানেও একজন লেফট্‌টেন্যান্ট গভর্নর থাকবেন রাজকার্য পরিচালনার জন্যে।

পাকাপাকিভাবে বাংলা দু'ভাগ হয়ে গেল।

ভারতীয় সংবাদপত্র এই দুঃসংবাদ পৌঁছে দিল বাংলার ঘরে ঘরে। খবরটা ঠিক শেলের মত এসে বিঁধল বাঙালির বুকে।

২ সেপ্টেম্বর বাঙালি, অশৌচের দিন হিসাবে পালন করল।

ভোর হতেই দলে দলে কলকাতাবাসী সকলে চলল নগ্নপদে গঙ্গাস্নানে। পুরোভাগে রবীন্দ্রনাথ এবং বিশিষ্টেরা নগ্নপদে। গঙ্গার পবিত্র বারি স্পর্শ করে বাঙালি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল। সমবেত সকলে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে একই সুরে, সুর মিলিয়ে গাইল—

> "বাঙালীর প্রাণ, বাঙালীর মন, বাঙালীর ঘরে যত ভাই বোন
> এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।"

গঙ্গার স্নান সেরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল—

> "বাঙালীর পণ, বাঙালীর আশা, বাঙালীর কাজ, বাঙালীর ভাষা,
> সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান।"

পুনরায় একত্রে ধ্বনি দিয়ে উঠল—

> "এক জাতি এক ভগবান্, এক দেশ এক মন প্রাণ।'
> পুনঃ পুনঃ উচ্চকণ্ঠে নিনাদিত হতে থাকল—
> বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্, বন্দেমাতরম্।

গর্জনে গর্জনে গঙ্গাবক্ষ প্রকম্পিত প্রতিধ্বনিত। বাতাসের ঢেউয়ে যেন তা উদ্ধত।

রক্তরাগে রাঙিয়ে নতুন সুতোর গুচ্ছ বেঁধে দিল একে অপরের হাতে। এই 'রাখিবন্ধন' হল প্রতিটি বাঙালি তথা ভারতবাসীর একের সঙ্গে দ্বিতীয়ের অচ্ছেদ্য বন্ধন।

স্বদেশি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সরলা দেবী সূচনা করলেন রাখিবন্ধনের। এই উৎসবের পরিকল্পনা ছিল রবীন্দ্রনাথ এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর।

---

* *বহ্নিবিপ্লব।* পৃ. ৮৭ - ৯৭

হিন্দু, মুসলমান, খ্রিস্টান, বৌদ্ধ, জৈন, শিখ সকলেরই এক মন্ত্র। সকলেই এক সূত্রে বাঁধা।

লোহিত সূত্রের এই রাখি গ্রহণ, মাতৃভূমির সেবা গ্রহণের জন্যে বিপদ বরণের স্বীকৃতি।

কানাইলাল এবং মতিলাল সহকর্মীদের নিয়ে ছুটে এসেছিল চন্দননগর থেকে, অশৌচের দিন পালন করে এই পবিত্র বন্ধনে নিজেদের বাঁধতে।

২২ সেপ্টেম্বর টাউন হলের আর এক মহতী সভায় কর্ম নির্ধারিত হল লালমোহন ঘোষের সভাপতিত্বে। বাংলার সর্বত্রই প্রতিবাদ সভা আহুত হ'ল।

সভায় সভায়, বিলাতি বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব সুরু হয়ে গেল।

বরিশালে বিরাট শোভা-যাত্রার আয়োজন করলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। পুরোভাগে চলেছেন শ্রীঅরবিন্দ। স্বাধীনতা সংগ্রামে এমন সুন্দর শোভাযাত্রা ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ এই প্রথম। দুঃখের বিষয় পুলিস লাঠি চালিয়ে শোভাযাত্রীদের বেশি দূর অগ্রসর হতে দেয়নি।

এই মাসেরই ২৫, কলকাতা ময়দানে স্কুল-কলেজের ছাত্ররা প্রতিবাদ সভায় সরকারি নীতিকে ধিক্কার দিতে থাকে। অনেক ছাত্রই স্কুল-কলেজ বয়কট করে সভায় এসে উপস্থিত হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে লালবাজার থেকে একদল পুলিস লেলিয়ে দেওয়া হল ছাত্রদের পেছনে। পুলিস নির্দয়ভাবে লাঠি চালিয়ে বহু ছাত্রকে গুরুতররূপে আহত করে, তাদের স্তব্ধ করতে চেয়েছিল। এরপর থেকেই জনসাধারণের ওপর সরকারি উৎপীড়ন সুরু হয়ে গেল।

এই প্রচণ্ড ভুলের মাশুল ইংরেজ শাসককে ভালভাবেই দিতে হয়েছিল উত্তরকালে। লাঠি চালানোর ফল হয়েছিল উল্টো।

নিরীহ নিরস্ত্র ছাত্রদের প্রতি নির্মম বর্বরের ন্যায় পুলিসী অত্যাচারে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কের লোকও অগ্নিমূর্তি ধারণ করল।

প্রতিটি স্তরের ভারতবাসী জেহাদ ঘোষণা করল ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে। এরপ'র কোন আপোষই হতে পারে না ও জাতের সঙ্গে!

এদের মনে সাহস যোগাতে সামনে এসে দাঁড়ালেন তখনকার রাজ্যপরিষদের মূর্ত প্রতীক সুরেন্দ্রনাথ। উপেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ রামেন্দ্রসুন্দর, ভূপেন্দ্রনাথও এসে যোগ দিলেন। বিপিন পাল তো ছিলেনই।

কে বলে বাঙালি দুর্বল? ভগ্নচিত্ত? নিরুপায়? পরাধীন?

গুলিবিদ্ধ শার্দুলের ন্যায় বাঙালি জাতি প্রবল গর্জনে দশদিক প্রকম্পিত করে তুলল। দিকে দিকে জনসভার মাধ্যমে শাসক গোষ্ঠীকে হঁসিয়ার করে দিল—'আমরা আর সহ্য করব না এই অত্যাচার, উপযুক্ত উত্তর আমরা দেবই। নিরস্ত্র বাঙালি আর নীরবে মার খাবে না। হাতে না পারি, ভাতে মারব। বেনিয়াদের ব্যবসা বন্ধ করব। ইংরেজের পেটে হাত পড়লেই বেশ বুঝতে পারবে বাঙালি আর যথেচ্ছাচার সহ্য করবে না। বুঝিয়ে দেবে রাজশক্তিকে প্রজাশক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয় কি না। বিলিতি দ্রব্য আমরা আর কোনদিনই স্পর্শ করব না। স্বদেশিই আমাদের মূলমন্ত্র। স্বদেশি আমাদের ধ্যান, স্বদেশি আমাদের জ্ঞান, স্বদেশি আমাদের প্রাণ।'

ঢাকায় নেতৃত্ব দিলেন আনন্দ রায়। ফরিদপুরে অম্বিকা মজুমদার আর বরিশালে দিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। বাঙালির কণ্ঠস্বরে কণ্ঠ মিলিয়ে আসমুদ্র হিমাচল গর্জে উঠল 'বন্দেমাতরম্'।

মহালয়ার দিন অতি প্রত্যুষ থেকে দলে দলে পঞ্চাশ হাজারের ওপর ইতর ভদ্র এসে কালীঘাটের মা কালীর সামনে শপথ নিল—

"আমি আন্তরিকভাবে তোমার সামনে প্রতিজ্ঞা করছি মা। জীবনে আমি বিদেশি দ্রব্য স্পর্শ করব না। বিদেশি পণ্যশালা থেকে এমন কোন দ্রব্য ক্রয় করব না যা ভারতীয় কারিগরের দ্বারা

নির্মিত হতে পারে। যে কাজ ভারতবাসীর দ্বারা সম্ভব, এমন কোন কাজে কোন বিদেশিকে নিয়োগ করব না।"

জাগরণের নতুন প্রভাতে বিপ্লবের নবানুরাগ কানাইলাল এবং বেশ কিছু যুবকের অন্তঃরাজ্য আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত করল। কলকাতা—চন্দননগর একই আলোর স্পর্শে রাঙা হয়ে উঠল।

স্বদেশির বন্যা কলকাতাকে ভাসিয়ে দিয়ে চন্দননগরকে প্লাবিত করল।

কানাই ভাসল।

শুধু কি কানাই?

কানাইলালের সঙ্গে ভাসল মতিলাল, নরেন, সাগরকালী, ননীলাল, শ্রীশ ঘোষ, বিশ্বনাথ সিংহ, নগেন্দ্রনাথ ঘোষ আর বিশ্বনাথ সরকার—ভেসেছিল আরও কত কে।

জাগরণের এই প্রবল বন্যায় বাংলার দিকে দিকে কত শত ভাসল, হাবুডুবু খেল, উঠল। কেউ বা ভয়ে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে দূরে পালাল। কতজন এর ধাক্কায় চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে রক্তাক্ত কলেবরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। যারা এই বন্যাতে বুক বেঁধে যুঝে চলল তারাই কূলে এসে আলোক বর্তিকা হাতে নিয়ে এগিয়ে চলল। কেউ বা বাংলার বাইরে সরে গিয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিল।

রবীন্দ্রনাথ বাঙালিদের ডেকে বললেন—"আত্মশক্তির দ্বারা ভেতরের দিক্ থেকে দেশকে সৃষ্টি কর। কারণ, সৃষ্টি দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়। বিশ্বকর্মা আপন সৃষ্টিতে আপনাকেই লাভ করেন। দেশকে পাওয়ার মানে হচ্ছে, দেশের মধ্যে আপনার আত্মাকে ব্যাপক করে উপলব্ধি করা। আপনার চিন্তার দ্বারা, কর্মের দ্বারা, সেবার দ্বারা দেশকে যখন নিজে গড়ে তুলতে থাকি, তখনই আত্মাকে দেশের মধ্যে সত্য করে দেখতে পাই। মানুষের দেশ মানুষের চিত্তের সৃষ্টি এই জন্যেই দেশের মধ্যে মানুষের আত্মার ব্যাপ্তি—আত্মার প্রকাশ।"

—কংগ্রেসকে কটাক্ষ ক'রে বললেন—"ইংরেজ রাজ,—সরকারের কীর্তি আমাদের কীর্তি নয়। এই জন্যই বাহিরের দিক থেকে সেই কীর্তিতে আমাদের যতই উপকার হোক, ভিতরের দিক থেকে তার দ্বারা আমাদের দেশকে হারাই...... দেশের সম্বন্ধে এই কথাই খাটে। দেশ আমারই আত্মা, এই জন্যেই দেশ আমার প্রিয় এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টি কার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি কানাইলাল এবং তার সহকর্মীদের অন্তরে বজ্রের মত গিয়ে আঘাত হানল। তার প্রতিটি সহকর্মী এই বাণীর পূর্ণ মর্যাদা দান করল।

দেশব্যাপী 'রাখিবন্ধন' উৎসব পালনের জন্যে ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ (বাঙলা ১৩১২র ৩০ আশ্বিন) রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের স্বাক্ষরিত ইস্তাহার প্রকাশিত হল।

এই ১৬ অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারি ভাবে বিভক্ত হয়ে যাওয়ায় বাঙালিরা অপমানিত হয়ে, সারা বাংলাদেশ জুড়ে এই দিনটিতে অরন্ধন পালন করল। একটি লোকেরও বাড়িতে সেদিন হাঁড়ি উঠল না উনুনে।

রাখিবন্ধনের অর্থ বড় সুন্দর, উদ্দেশ্যও চমকপ্রদ—কোন সুতীক্ষ্ণ রাজতরবারি এই অচ্ছেদ্য বন্ধনকে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে না কোন দিনই।

বাংলায় যখন পথে ঘাটে ভদ্র ঘরের নারীদের মুখ কেউ বড় একটা দেখতে পেত না, সেই আবরুআনার নাগ-পাশকে ছিন্ন করে আজকের এই পবিত্র ৩০ আশ্বিনকে সর্বতোভাবে প্রাণবন্ত করে তুলতে মুর্শিদাবাদের মা-বোন-কুলবধূরা একজোটে অন্দরমহলের অবগুণ্ঠনকে দুহাতে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সর্বপ্রথম বাইরে বেরিয়ে এলেন এই ব্রত উদ্‌যাপনে। দলে দলে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন রাস্তায়। পাঁচ শ'রও ওপর ভদ্রপরিবারের মা-মেয়েরা এসে জড় হলেন আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর বাসভবনে।

পরস্পর পরস্পরের হাতে রাখি বেঁধে দিলেন তাঁরা, মনোনিবেশ সহকারে। সকলেই স্তব্ধ হয়ে শুনলেন, রামেন্দ্রসুন্দর রচিত 'বঙ্গলক্ষীর ব্রতকথা' তাঁরই মুখ থেকে। পালন করলেন, এই দিনটিতে অরন্ধন এবং জনে জনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন, স্বদেশি গ্রহণে—বিশেষ করে বিলাতি বস্ত্র বর্জনে। এঁরাই, মুর্শিদাবাদের (কান্দীর) মা বোনেরা চোখ খুলে দিলেন সমগ্র বাংলার স্ত্রীজাতির।

এরপর কলকাতা এবং বাংলার বিভিন্ন জেলার নারীরা পুরুষের সঙ্গে সমবেত হয়ে স্বদেশি ব্রত পালনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলেন। বিদেশি দ্রব্য-বিশেষ করে ইংরেজের তৈরি প্রতিটি বস্তু বর্জনের জন্যে সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। 'বঙ্গ-ভঙ্গই' নারীজাগরণের একটা বিশেষ দিক বলা যেতে পারে। বাংলার বাইরেও এর প্রতিক্রিয়া সুরু হল। দেখতে দেখতে চারদিকে অভূতপূর্ব সাড়া পড়ে গেল।

প্রবল উদ্দীপনা ও উত্তেজনার মধ্যে এই পবিত্র দিনটি পালিত হল কলকাতাতে। পূর্ণ হরতাল পালিত হল দিনটিতে। দিগন্ত প্রসারী বন্দেমাতরম্ ধ্বনি ইংরেজ শাসকের কানে তালা ধরিয়ে দিল।

দলে দলে নগরবাসী সেদিনও গঙ্গাস্নানান্তে পবিত্র মনে 'রাখিবন্ধন' দ্বারা একে অপরকে অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রন্থি যুক্ত করল।

সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের উদ্যোগে দুই মাইল প্রসারী অন্যূন পঞ্চাশ হাজার শোভাযাত্রী নগ্নপদে কলকাতার বিশেষ বিশেষ রাজপথ পরিক্রমা শেষে এক মহতী সভায় এসে যোগদান করল। এই সভাতেও সকলে বিদেশি বর্জন আর স্বদেশি গ্রহণে প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হল। জীবনের বিনিময়ে এই ব্রত উৎযাপনে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

স্বদেশি বিপ্লবের পুষ্টিসাধনে এই সভাতেই সত্তর হাজার টাকা সংগৃহীত হল।

প্রথমে যদিও সভার সকলের উদ্দেশ্য ছিল না বিদেশি বর্জন এবং স্বদেশি গ্রহণ, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি এমনই দাঁড়াল যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্যে এই দুটিকেই উপযুক্ত অস্ত্র হিসেবে বেছে নিতে হল সকলকে এক জোটে।

বিদেশি বর্জন দেখতে দেখতে এমনই অলৌকিক শক্তিতে এগিয়ে চলল যা দেখে ইংরেজ বাহাদুরের হৃতকম্প উপস্থিত হল।

ম্যানচেস্টারের বস্ত্র ব্যবসা বাংলার বাজারে প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ১৯০৪ সালে সেপ্টেম্বরের ৭৭,০০০ টাকার বিক্রি, ১৯০৫ এর সেপ্টেম্বরে নেমে এসে দাঁড়াল ১০,০০০ টাকায়।

মাড়োয়াড়ি চেম্বার অব কমার্স, ম্যানচেস্টার চেম্বার অব কমার্সের কাছে এই ভীতিপ্রদ খবর পাঠাল।

স্টেটস্‌ম্যানের কাছে সঠিক খবর জানতে চাওয়া হল। স্টেটস্‌ম্যান জানাল, বাংলাদেশের মাত্র আটটি জেলা মিলিয়ে এই ঘাটতির সৃষ্টি হয়েছে। সব একত্র করলে কি দাঁড়াবে বলা কঠিন।

২.

রাখিবন্ধনের ইস্তাহার প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কানাইলাল এবং তাঁর সহকর্মীদের উদ্যোগে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে চন্দননগরে এক প্রতিবাদ অনুষ্ঠান বিশেষ ভাবে পালিত হল। কর্মসূচী দেশব্যাপী সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্যে কানাইলালের অদম্য প্রচেষ্টা চন্দননগরকে এক নতুন আলোয় উদ্ভাসিত করল। অতি প্রত্যুষে ছেলে বুড়োর দল নগ্নপদে শোভাযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল। সামনের সারিতে কানাইলাল, মতিলাল আর তাদের সহকর্মীরা। নগর পরিক্রমার পর গঙ্গাস্নান শেষ করে দ্বৈতকণ্ঠে সেই মন মাতানো গান সুরু করল শোভাযাত্রীরা—

"বাঙালির প্রাণ বাঙালির মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
.............এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান।

গান শেষে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হল—

এক জাতি—এক ভগবান, এক দেশ—এক মনপ্রাণ।

বন্দেমাতরম্ ধ্বনির মধ্যে 'রাখিবন্ধন' পর্ব শেষ হল।

কানাইলাল, মতিলাল, শ্রীশচন্দ্র, বিশ্বনাথ সিং, নগেন ঘোষ, বিশ্বনাথ সরকার, ননীলাল, সাগরকালী প্রভৃতি একশ' দেশভক্ত দিনান্তে সামান্য কিছু ফল খেয়ে থেকে এই পবিত্র দিনের মর্যাদা রক্ষা করল।

এই সময় কীর্তন করে নগর প্রদক্ষিণের সময় মতিলাল এবং শ্রীশচন্দ্র ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে। এর আগে মতিলাল এবং শ্রীশের প্রত্যক্ষ পরিচয় ছিল না।

সন্ধের পর জনসভায় স্বদেশি গ্রহণ ও বিদেশি বর্জন সম্বন্ধে কয়েকজন বক্তা দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন।

কানাইলাল স্বচ্ছ সরল ভাষায় অথচ দৃঢ় প্রত্যয়ে জানিয়ে দিল, "স্বদেশি আমাদের বাঁচবার একমাত্র পথ। ইংরেজের সঙ্গে কোন আপোষ নেই। ও জাতকে ভাতে না মারলে সায়েস্তা হবে না। এ সংগ্রামের জন্যে প্রাণ দিতে হয় তাও স্বীকার। বাঙালি যে কী, আমরা তা কার্জনকে হাড়ে হাড়ে বুঝিয়ে দেব।"

যে শান্তশিষ্ট ছেলেটির মুখ থেকে কোনদিন উঁচু গলায় কথা শোনেনি, তার কণ্ঠে একি অগ্নিময়ী ভাষা? সভার সকলে স্তম্ভিত।

শরীর চর্চার সঙ্গে কানাই স্বদেশি যুগের খবরের কাগজগুলো মন দিয়ে পড়ে। এর মধ্যে বাছাই করা কয়েকখানার সে বেশ ভক্ত—'সন্ধ্যা', 'বঙ্গদর্শন', 'সঞ্জীবনী', 'হিতবাদী', 'ডন', বিপিন পালের 'নিউ ইণ্ডিয়া' প্রভৃতির। নতুন কোন পত্রিকা বেরুলেই কানাই সেখানি জোগাড় করে আনে।

এইসব লেখা নিয়ে মনের মত সহপাঠী ও বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আলোচনায় বসলে কোথা দিয়ে যে দিনরাত কেটে যায় সিদ্ধান্তে না পৌঁছানো পর্যন্ত, আর খেয়াল থাকে না।

দেশের চিন্তায় কানাইলালের রাত্রিতে ঘুম নেই। মুক্তিপথের সন্ধান সে করতে থাকে গোপনে। কার সহযোগিতায়, কি উপায়ে এই দাসত্ব শৃঙ্খল মোচন করা যায় অহর্নিশি এই চিন্তা তাকে ঘিরে থাকে। মাঝে মাঝে সে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে ওঠে। লম্বা ছিপ্‌ছিপে দেহে মাথার লম্বা চুলগুলো তখন তার খাড়া হয়ে ওঠে। বড় বড় চোখ দুটোতে রক্ত জমাট বেঁধে যায়। চোখের মোটা কাচের চশমাখানা খুলে সে, বারবার মুছতে থাকে; সবই যেন তার চোখে ঘোলাটে হয়ে যায়। উন্নত গ্রীবার শিরা উপশিরাগুলো যেন চামড়ার ভেতর থেকে ফেটে বেরোতে চায়। এই উত্তেজনা প্রশমনে মাথায় ঘটি ঘটি জল ঢেলে, চোখে জলের ঝাপটা দিয়েও সে, নিজেকে সামলাতে পারে না।

মুক্তির সন্ধানে সে ঘোরে ফেরে। কোথায় গেলে প্রশ্নের জবাব সঠিক মিলবে? পৃথিবীতে এসে পঙ্গু বাঙালির ভূমিকা নিয়ে জীবনটাকে জিইয়ে রাখা বৃথা। এমন একটা কাজ তাকে করতে হবে যাতে সে, স্বদেশের কিছুটা কাজে লাগে। এই মহাযজ্ঞের সে তো কবেই নিজেকে উৎসর্গ করবে বলে স্থির করেছে, কিন্তু কোথায় বাধা তার? সে বড্ড চাপা। বাইরে শান্তশিষ্ট। মনের অভিপ্রায় সে এখনও কাউকে জানায়নি।

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, অকুতোভয়, নিরহঙ্কার দুষ্টদমনে সিদ্ধহস্ত কানাইলাল, দেশের সামান্য কাজে লাগতে পারলে নিজেকে ধন্য মনে করে।

একদিন সত্য সত্যই সকল বাঁধন ছিন্ন করে কানাইলাল ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই কাজে।

দেশের লোকও এখন অনেকটা সংঘবদ্ধ। ১৯০৫-এ বার্ন কোম্পানিতে স্ট্রাইক হল। ভারতীয় কর্মচারীরা এক জোটে বাইরে বেরিয়ে এল। সাহেবদের গোলামী ছাড়তে তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কয়েকদিন যেতে না যেতেই ছা-পোষা কর্মীরা অন্নকষ্টে দিশেহারা হয়ে পড়ল।

চারুবাবু ডাকলেন কানাইকে।—"সাহায্য ভাণ্ডার গড়ে না উঠলে লোকগুলো তো খেতে না পেয়ে মারা যায়। ব্যবস্থা কী করেছ?"

গুরুজীর হুকুম। কানাই বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে লেগে গেল অর্থসংগ্রহে।

অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তারা ক্ষুধার্তের মুখে অন্ন তুলে দিল।

পরেই এল চন্দননগরে স্বদেশি সভার অধিবেশন। কানাইলালের সক্রিয় ভূমিকা সকলকেই মুগ্ধ করল। পাল-পার্বণে, খেলার মাঠে, গঙ্গাপুজোর ভিড়ে যেখানেই বহু লোকের সমাগম, সেইখানেই স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তুলে কানাই সাহায্য দিতে এগিয়ে গেছে।

সেবার ম্যালেরিয়া জ্বর কানাইকে বেশ কাবু করে দিয়েছে। রোজই ১০৫° জ্বর উঠছে। ভীষণ আগুন লাগল চন্দননগরে একটা পাড়ায়। যেই সে কথা কানাইয়ের কানে পৌঁছেছে, কোথায় গেল তার জ্বর, ঐ অবস্থায় তেড়েফুঁড়ে গিয়ে খড়ের চালের ওপর উঠে, কলসি কলসি জল ঢালতে লেগে পড়ল আগুনের মধ্যে। আগুন আয়ত্তে এলে, সে ক্লান্ত শরীর নিয়ে নেতিয়ে পড়ল।

জ্বরটা একটু বাগে আসতেই সুরু করে দিল বিদেশি বর্জনের সংগ্রাম। মতিলাল, কানাইলাল, শ্রীশচন্দ্র, নগেন্দ্রনাথ, বিশ্বনাথ, সাগরকালী প্রভৃতি দলবল নিয়ে দোকানে দোকানে আরম্ভ করল পিকেটিং। কার সাধ্য এক টুকরো বিলিতি জিনিস কেনে।

পরিশিষ্ট-১৩

রাজনৈতিক ডাকাতি ও প্রাসঙ্গিক ঘটনা*

১৯০৬ - ১৯১৮

১৯০৬ : রঙ্‌পুরের মহিপুর ও ঢাকার শেখরনগর গ্রামে ডাকাতির ব্যর্থ চেষ্টা।

১৯০৭ : চন্দননগরে গাড়ি উল্টাবার ব্যর্থ চেষ্টা।

১৯০৮ : হাওড়া জেলার শিবপুর থানার হবিপুরে ডাকাতি।

: চন্দননগরে মেয়রের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ।

: আগস্ট ১৪—ঢাকা সাটিরপাড়ায় নৌকা চুরি মামলায় ৩ জন বিপ্লবীর শাস্তি। —নলিনীকিশোর বলেছেন মিথ্যা মামলা।

: ময়মনসিংহের বাজিতপুরে ১৫০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের দেড় বছর এবং ১ জনের ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড।

: সেপ্টেম্বর ১৬—হুগলি জেলার ভদ্রেশ্বর থানার বিঘাতিতে ৫৬৩ টাকা ডাকাতির অপরাধে পণ্ডিত মোক্ষদা সামধ্যায়ীসহ ৩ জনের শাস্তি।

: অক্টোবর ৩০—ফরিদপুর জেলার পালং থানার নরিয়ায় একটি হাট লুঠে ৬৭০ টাকা সংগ্রহ করে বিপ্লবীরা—ক্ষতি ৬৪০ টাকা। খুন হয় ২ জন। কেউ ধরা পড়েনি।

: নভেম্বর ১৪—ঢাকার রমনায় পুলিশের চর সন্দেহে সুকুমার চক্রবর্তীকে খুন করা হয়।

: নভেম্বর—ঢাকার রমনায় অন্নদা ঘোষ এবং হাওড়ায় কেশবচন্দ্র দে-কে পুলিশের চর সন্দেহে খুন করা হয়।

: ডিসেম্বর ২—হুগলি জেলার মোরিহালে ১৩০ টাকা লুণ্ঠিত। ১ জন গুরুতর আহত হয়। ১ জনের ৭ বছর শাস্তি।

: ডিসেম্বর ১১—Criminal Law Amendment Act XI, 1908 পাশ। এই আইনে জুরি বাদ দিয়ে হাইকোর্টের তিনজন বিচারক নিয়ে গঠিত স্পেশাল বেঞ্চের মাধ্যমে বিচারের ব্যবস্থা।

১৯০৯ : জানুয়ারি ১—কুমিল্লায় অস্ত্র অপহরণ।

: ঢাকার নবাবের ৩টি রাইফেল চুরি।

: ফেব্রুয়ারি ১০—নরেন গোঁসাই খুনের মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর আশু ঘোষ বিশ্বাস খুন—হত্যাকারী চারুচন্দ্র বসুকে ফাঁসি দেওয়া হয়। চারুচন্দ্রের ডান হাত ছিল পক্ষাঘাতগ্রস্ত। সেই হাতে ছিল রিভলবার বাঁধা। আর বাম হাতে সে রিভলভারের ঘোড়া টানে।

: ফেব্রুয়ারি ১০—বেলঘরিয়ায় বোমা বিস্ফোরণ।

: ফেব্রুয়ারি ২৭—হুগলি জেলার হরিপাল থানার মাশুপুর গ্রামে ৫০০ টাকা ডাকাতি। কেউ ধরা পড়েনি।

সূত্র : নলিনীকিশোর গুহ।

: এপ্রিল ৫—আগরপাড়ায় বোমা বিস্ফোরণ।
: এপ্রিল ২৩—২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবার থানার নেত্রা গ্রামে ২৪০০ টাকা ডাকাতি।
: জুন ৩—ফরিদপুর জেলার ফতেজঙপুরের প্রিয়নাথ চ্যাটার্জি পিস্তলের গুলিতে নিহত। হত্যার লক্ষ্য ছিল প্রিয়নাথের ভাই গণেশ। কিন্তু ভুল করে প্রিয়নাথকে মারা হয়।
: আগস্ট ৩০—নাঙ্গাল ষড়যন্ত্র মামলার রায়। ৬ জনের ৭ বৎসর দ্বীপান্তর, ৩ জনের ৫ বৎসর এবং ২ জনের ৩ বৎসর কারাদণ্ড।
: সেপ্টেম্বর ২৪—খুলনা জেলার হোগুলবুনিয়ায় ৫০ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত।
: অক্টোবর ১১—পাট ব্যবসায়ী সাহেব কোম্পানির ২৩ হাজার টাকা নিয়ে যাওয়ার সময় দারোয়ান ট্রেনে আক্রান্ত হয় ঢাকার রাজেন্দ্রপুরে। ১ জন দারোয়ান নিহত, ১ জন আহত এবং ১ জনের দ্বীপান্তর। ১১,৮৬৪ টাকা রাস্তায় পড়ে যায়।
: অক্টোবর ২৮—নদীয়া জেলার হলুদবাড়িতে ১,৪০০ টাকা ডাকাতির অপরাধে ৫ জনের ৮ বৎসর, ১ জনের ৭ বৎসর, এবং ১ জনের ৫ বৎসর কারাদণ্ড হয়।
: নভেম্বর ১১—ত্রিপুরা জেলার মতলব থানার মোহনপুরে ১৬,৪০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত।
: ডিসেম্বর ২৭—যশোহরের বাইকারায় ৮১৪ টাকা ডাকাতি।

১৯১০ : ফেব্রুয়ারি ৭—খুলনা জেলার সোলগাঁতিতে ২০০ টাকা ডাকাতি।
: ফেব্রুয়ারি ১১—যশোহর জেলার ধুলগ্রামে ৬,১৭৫ টাকা ডাকাতি।
: জুলাই ৫—য়শোহর জেলার মহম্মদপুর থানার মহিষায় ২,২০৪ টাকা ডাকাতি। ধৃতদের ১জনের ৬ বৎসর, ১ জনের ৫ বৎসর, ৩ জনের ৩ বৎসর কারাদণ্ড।
: জুলাই ২১—ময়মনসিংহ জেলার গোলকপুরে বন্দুক অপহৃত।
: সেপ্টেম্বর ৫—ঢাকা জেলার লোহাজং থানার হলদিয়াহাটে ১৫০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন নিহত এবং বহু আহত হলেও কেউ ধরা পড়ে নি।
: নভেম্বর ৭—ফরিদপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার কালারগাঁয় ১২,৬৬০ টাকা ডাকাতি।
: নভেম্বর ৩০—বাকরগঞ্জ জেলার মেহেদিগঞ্জ থানার দাদপুরে ৪৯,৩৬৮ টাকা ডাকাতির সময় ৫ জন আহত হয়। এই টাকা ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলা চালাতে ব্যয় হয়েছিল—সিডিসন কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ আছে।

১৯১১ : জানুয়ারি ২১—ঢাকার সোনারঙে স্কুল পিয়নকে আঘাতের অপরাধে ৬ জন ছাত্রের সাজা।
: ফেব্রুয়ারি ৫—ফরিদপুর জেলার পণ্ডিতচরে ৫,৫০০ টাকা ডাকাতি।
: ফেব্রুয়ারি ২০—ঢাকার লোহাজং থানার গাঁওদিয়ায় ৭,৪৫৭ টাকা ডাকাতি।
: মার্চ ৩১—ময়মনসিংহের সুরাকৈরে ১,২০০ টাকা ডাকাতি।
: ত্রিপুরার বারকাণ্ডায় ২৬০ টাকা ডাকাতি।
: জুলাই ২৭—ময়মনসিংহের সারাচরে ডাকাতি হলেও টাকা অপহৃত হয়নি। কিন্তু সাজা হয় জিতেন লাহিড়ির।

: সেপ্টেম্বর ৫—ঢাকার সিঙ্গইর বাজার লুণ্ঠিত।
: অক্টোবর ৩—কুলিয়াচর বাজারে ৩,১২০ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত।
: নভেম্বর ৬—রঙপুরের বালিয়া গ্রামে ১,২১৮ টাকা ডাকাতি।
: ডিসেম্বর ৩১—নোয়াখালির চাউলপট্টিতে ১,৯৭৭ টাকা ডাকাতি।

১৯১২ : জানুয়ারি ২৩—ঢাকার বাইগুন তেওয়ারিতে ৩,৪৭০ টাকা ডাকাতি।
: এপ্রিল ১৯—কাকুরিয়ায় ডাকাতি।
: জুন—ফেনীতে সারদা চক্রবর্তী নিহত।
: জুলাই ১১—ঢাকার পানামে ২০,০০০ টাকা ডাকাতির সময় গ্রামবাসীর গুলিতে একজন আহত।
: জুলাই ১৫—বাকরগঞ্জ জেলার প্রতাপপুরে ৭,৫৯৫ টাকা ডাকাতি।
: অক্টোবর ২৭—কুমিল্লায় ডাকাতির উদ্যোগ—শাস্তি হয় রমেশ দাশগুপ্ত, রমেশ ব্যানার্জি, দেবেন বণিক, হরিদাস দাশ প্রমুখ ১০ জনের।
: নভেম্বর ১৪—ঢাকার লাঙলবন্দে ১৬,০০০ টাকা ডাকাতি।
: নভেম্বর ২৮—ঢাকার ওয়ারীতে গিরীন্দ্র দাস বাক্সে বন্দুক, রিভলবার ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র রেখেছিলেন। ম্যাজিস্ট্রেট পিতা তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। অস্ত্র আইনে ১৮ মাস সাজা হয়।
: ডিসেম্বর ১৬—মেদিনীপুর বোমা মামলার সাক্ষী আবদার রহিমের বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ। কোন প্রাণহানি ঘটেনি।

১৯১৩ : ফেব্রুয়ারি ৪—ময়মনসিংহ জেলার কৈঠাদি থানার ধুলদিয়ায় ৯,০৪৬ টাকা ডাকাতি। ১ জন নিহত, ৩ জন আহত।
: মার্চ ২৭—সিলেটের মৌলবীবাজারে গর্ডন সাহেবকে হত্যার উদ্দেশ্যে দুজন বিপ্লবী সমবেত হলেও, একজন বিপ্লবী যোগেন্দ্র বোমা ফেটে সেখানেই মারা যায়।
: এপ্রিল ৩—গোপালপুরে ৬,০৪৫ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত।
: মে ১৯—ফরিদপুরের মাদারিপুর থানার কাওয়াকুরীতে ৫,১৩০ টাকা ডাকাতি।
: আগস্ট ১৬—ময়মনসিংহের কেদারপুরে ১৯,৮০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন নিহত এবং ৫ জন আহত।
: সেপ্টেম্বর ২৯—কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে হেড কনস্টেবল হরিপদ দেব নিহত।
: সেপ্টেম্বর ৩০—ময়মনসিংহে পুলিশ ইনস্পেকটর বঙ্কিম চৌধুরী বোমার আঘাতে নিহত।
: নভেম্বর ৭—২৪ পরগণার ছত্রবাড়িয়ায় ৮৬৮ টাকা ডাকাতি।
: নভেম্বর ২৪—ময়মনসিংহের সারাচরে ৪,৩৯০ টাকা ডাকাতি।
: নভেম্বর ৩০—ত্রিপুরার খরোমপুরে ৬,০০০ টাকা ডাকাতি।
: ডিসেম্বর ১৯—কুমিল্লার পশ্চিমসিংহে ৩,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন আহত।
: ডিসেম্বর ৩০—ভদ্রেশ্বরে বোমা নিক্ষেপ।

১৯১৪ : মে ৮—ত্রিপুরা জেলার নবীনগর থানার গোঁসাইপুরে ৫,৫০০ টাকা ডাকাতি।
: মে ১৯—পুলিশের চর সন্দেহে চট্টগ্রাম শহরে সত্যেন সেনকে গুলি করে হত্যা।
: জুলাই ১৯—ঢাকা শহরে বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে কাজ করায় উমেশ দে নিহত।

: আগস্ট ২৮—ময়মনসিংহের নেত্রকোনা থানার বিতাই-এ ১৭,৭০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন নিহত, ১ জন আহত।

: নভেম্বর ৭—২৪ পরগণার মামুদাবাদে ১,৭০০ টাকা ডাকাতি।

: নভেম্বর ১৩—ময়মনসিংহের উকারাশালে ৪,৮০০ টাকা ডাকাতি।

: ডিসেম্বর ২৫—ময়মনসিংহের দারিকপুরে ২৩,০০০ টাকা ডাকাতি।

১৯১৫ : জানুয়ারি ২২—ত্রিপুরা জেলার বাঘমারীতে ৪,১৭০ টাকা ডাকাতি।

: জানুয়ারি ২৩—রঙ্‌পুরের কুরাল গ্রামে ৫,০০০ টাকা ডাকাতি।

: ফেব্রুয়ারি ১৩—কলকাতার গার্ডেনরীচে ১৮,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের ৭ বছর কারাদণ্ড। প্রথম ট্যাক্সি ডাকাতি।

: ফেব্রুয়ারি ২০—রাজসাহি জেলার নাটোরের ধরাইল গ্রামে ২৫,০০০ টাকা ডাকাতি।

: ফেব্রুয়ারি ২২—কলকাতার বেলিয়াঘাটায় ২০,০০০ টাকা ডাকাতি।

: ফেব্রুয়ারি ২২—কলকাতার পাথুরিয়াঘাট স্ট্রিটে নীরদ হালদার গুলিতে নিহত।

: ফেব্রুয়ারি ২৮—কলকাতার কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ইনসপেকটর সুরেশ মুখার্জি গুলিতে নিহত।

: মার্চ ৩—কুমিল্লা জেলা স্কুলের হেডমাস্টার নিহত।

: মার্চ ৩—হাওড়ার দয়ারপুরে ২,০০০ টাকা ডাকাতি।

: মার্চ ১১—ত্রিপুরা জেলার বলদায় ৪,০০০ টাকা ডাকাতি।

: এপ্রিল ৬—আড়িয়াদহে ৫০০ টাকা ডাকাতি।

: এপ্রিল ৩০—নদীয়ার প্রাগ্‌পুরে ২,৭০০ টাকা ডাকাতি। ভুল করে একজন বিপ্লবীর হাতে বিপ্লবী সুশীল সেন নিহত।

: মে ২৫—ত্রিপুরার আউরাইলে ৪,২৫০ টাকা ডাকাতি।

: জুন ৫—বাকরগঞ্জের গাজিপুরে ১৫,০০০ টাকা ডাকাতি।

: আগস্ট ২—আগরপাড়ায় পিস্তলসহ বিপিন গাঙ্গুলি ধৃত। তাঁর ৫ বছর শাস্তি।

: আগস্ট ৭—হ্যারি অ্যাণ্ড সন্সে তল্লাসির পর পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে।

: আগস্ট ১৪—ত্রিপুরার হবিপুরে ১৮,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন গুলিতে নিহত।

: আগস্ট ২৫—আগরপাড়ায় পুলিশের সাহায্যকারী মুরারী মিত্র গুলিতে নিহত।

: সেপ্টেম্বর ৩০—নদীয়ার শিবপুরে ২০,৭০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন কনস্টেবল ও ১ জন গ্রামবাসী নিহত। ৯ জন বিপ্লবী ধৃত। ৮ জনের যাবজ্জীবন ও ১ জনের ১০ বৎসর দ্বীপান্তর।

: সেপ্টেম্বর ৭—ময়মনসিংহের চন্দ্রকোণায় ২১,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জন গুলিতে নিহত।

: অক্টোবর ২১—কলকাতার মসজিদবাড়িতে পুলিশ সাব-ইনসপেকটর গিরীন্দ্র ব্যানার্জি নিহত।

: নভেম্বর ১৭ —কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিটে ৮০০ টাকা ডাকাতি।

: নভেম্বর ২৬—ময়মনসিংহের রসুলপুরে ৪৬০ টাকা ডাকাতি। ১ জন গুলিতে নিহত।

: নভেম্বর ৩০—কলকাতার সারপেনটাইন লেনে একজন পুলিশ কনস্টেবল নিহত।

: ডিসেম্বর ২—কলকাতায় কর্পোরেশন স্ট্রিটে ২৫,০০০ টাকা ডাকাতি। ১ জনের ১৩ বৎসর, ১ জনের ২ বৎসর এবং ১ জনের ১ বৎসর সাজা হয়।

: ডিসেম্বর ১৪—কলকাতায় শেঠবাগানে ৬,১০০ টাকা ডাকাতি।

: ডিসেম্বর ১৯—ময়মনসিংহের যশেরদিঘিতে পুলিশের চর ধীরেন্দ্র বিশ্বাস গুলিতে নিহত।

: ডিসেম্বর ২২—ময়মনসিংহের কালিয়াচাপড়ায় ডাকাতি।

: ডিসেম্বর ২৭—কলকাতায় চাউলপট্টি রোডে একজনের ৭৫০ টাকা ছিনতাই।

: ডিসেম্বর ২৯—ত্রিপুরার করকলায় ১৫,০০০ টাকা ডাকাতি। গুলিতে ২ জন নিহত।

১৯১৬ : জানুয়ারি ১৫—বাজিতপুরে শশী চক্রবর্তী নিহত।

: জানুয়ারি ১৬—কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনে সাব ইন্সপেক্টর মধুসূদন ভট্টাচার্য গুলিতে নিহত। ধৃত ৫ জনের মধ্যে ১ জনের কাছে পিস্তল ছিল।

: ফেব্রুয়ারি ২৭—পাবনা জেলার কাদিমপুরে ডাকাতি।

: মার্চ ৬—ত্রিপুরায় মুরাদনগরে গান্দোরায় ১৪,৬৯০ টাকা ডাকাতি।

: এপ্রিল ৩০—ত্রিপুরার নাটঘরে ১৭,৫০০ টাকা ডাকাতি।

: জুন ১—পুলিশের ডেপুটি সুপারিটেনডেন্ট বসন্ত চট্টোপাধ্যায় পি. জি. হাসপাতালের সামনে নিহত।

: জুন ৯—ফরিদপুরের ধানকাটিতে ৪৩,০০০ টাকার হুণ্ডি ডাকাতি।

: সেপ্টেম্বর ২—ত্রিপুরার ললিতেশ্বরে ৫৩০ টাকা ডাকাতি।

: অক্টোবর ১৭—ময়মনসিংহের সাহিল দেওয়ে ৯০,০০০ টাকা ডাকাতি। বাড়ির মালিক গুলিতে নিহত।

: সেপ্টেম্বর ৩০—ঢাকার রামদিনালীতে ৬৫৫ টাকা ডাকাতি।

: —ময়মনসিংহের ধারাইলে ডাকাতি।

১৯১৭ : জানুয়ারি—সিরাজগঞ্জে রেবতী নাগ নিহত।

: ফেব্রুয়ারি ২৪—ঢাকার পাইকারচরে ১,৩০০ টাকা ডাকাতি।

: এপ্রিল ১৫—রাজসাহীর জামনগরে ২৬,৫৬৭ টাকা ডাকাতি।

: মে ৭—কলকাতার আর্মেনিয়ান স্ট্রিটে সোনার দোকানে ৫,৪৫৯ টাকা ডাকাতি। ১ জন বিপ্লবী, ২ জন দোকানকর্মী নিহত। ২ জন আহত।

: জুন ২০—রঙ্পুরের রাখাল বুরুজে ৩১,৪৮৬ টাকা ডাকাতি।

: জুলাই ২৩—ঢাকায় ১ জন বিপ্লবীর ৮ বৎসর কারাদণ্ড।

: অক্টোবর ২৭—ঢাকার আবদুল্লাপুরে একজনের বাড়িতে যাত্রাগান চলাকালে ২৪,৮৩০ টাকা ডাকাতি।

: নভেম্বর ৩—ত্রিপুরার মাঝিয়ারায় ৩৩,০০০ টাকা ডাকাতি।

পরিশিষ্ট-১৪

না না ক থা

স্বদেশি শিল্প

রমেশচন্দ্র দত্ত

...বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই শিল্পোন্নতি বিষয়ে জয়লাভ করিবার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবে বদ্ধপরিকর হইয়াছি। আজ এই সভায় সমবেত সকলেরই বদনমণ্ডলে এইরূপ সঙ্কল্পের লক্ষণ দেখিতেছি যে, প্রত্যেক বিধিসঙ্গত উপায় অবলম্বনে ভারতের শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতে হইবে, যাহাতে ভারতবাসী আপামর সাধারণ ভারতজাত দ্রব্য ব্যবহার করে, তাহার উপায় করিতে হইবে। স্বদেশি আন্দোলন সম্বন্ধে নানাজনে নানাপ্রকার বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছে। কিন্তু আমি মানি যে, বঙ্গের অগ্রণীরা এ বিষয়ে যথাসাধ্য বিধিসঙ্গত উপায়ের অবলম্বন করিয়াছেন। দুই এক স্থানে সামান্য একটু হাঙ্গামা যদি হইয়া থাকে, আমরা সকলেই সেজন্য দুঃখিত। পক্ষান্তরে, গবর্নমেন্ট যদি অযথা আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হইয়া অবৈধভাবে এই আন্দোলন দমনের প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাহা হইলে সে কার্য অধিকতর নিন্দনীয়।

সে যাহা হউক স্বদেশি আন্দোলনের মূলমন্ত্র ভারতবাসীকে স্বদেশীয় শিল্পের ব্যবহারে প্রবর্তিত করা। এ উদ্দেশ্য অতীব সাধু; আমি সর্বান্তঃকরণে এই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছি এবং যথাশক্তি এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে সহায়তা করিব। পৃথিবী:: কোন্ জাতি স্বদেশি আন্দোলনে বিমুখ? বিলাতে মিঃ চেম্বারলেন প্রভৃতিও স্বদেশীয়, তাহারা আপনাদিগের সাম্রাজ্য জাত শিল্পের উপর পক্ষপাতমূলক কর প্রবর্তন করিয়া শিল্পোন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। ফ্রান্স, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাজ্য প্রভৃতি বৈদেশিক দ্রব্যের উপর অত্যধিক কর নির্দেশ করিয়া দেশীয় শিল্প রক্ষায় মনোযোগী হইয়াছেন। আমাদিগের ঐরূপ কর প্রবর্তন করিবার অধিকার নাই; কাজেই আমরা স্বদেশজাত দ্রব্য ব্যবহার করিব, এই সংকল্প অবিচলিত রাখিয়া দেশীয় শিল্পের উন্নতির চেষ্টা করিতেছি। ইহাতে দোষের বিষয় কিছুই নাই, বরং প্রশংসার বিষয় ইহাতে যথেষ্ট আছে। ভারত গবর্নমেন্ট মুখে ভারতশিল্পের উন্নতির প্রয়াসী বলিয়া চিরকাল ব্যক্ত করিতেছেন। এই আন্দোলনে গবর্নমেন্টের সেই উদ্দেশ্য অতি সহজ সফল হইবে।

এতদ্ব্যতীত এই আন্দোলনের ফলে লক্ষ লক্ষ তন্তুবায় ও অন্যান্য শিল্পী অর্ধাশন হইতে রক্ষা পাইবে। ভারতে দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাও বহুল পরিমাণে প্রশমিত হইবে। ভারতের শিল্পিকুল উৎসাহ পাইবে, দেশের লোককে নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য অপরের মুখাপেক্ষী হইতে হইবে না। ফলতঃ এই আন্দোলন আমাদিগের শিল্পিদিগের হৃদয়ে নবজীবনের সঞ্চার করিবে। ভারতীয় শিল্পের উন্নতি ও শিল্পিদিগের সুখবৃদ্ধি রাজাপ্রজা সকলেরই অভিপ্রেত, ইহা কে না স্বীকার করিবেন? সেইজন্য আমি আশা করি, ভারতের সকল প্রদেশে গ্রামে গ্রামে এই আন্দোলনের বিস্তার ঘটিবে। জেলায় জেলায় স্থায়ী সভাসমিতির প্রতিষ্ঠা করিয়া আন্দোলন রক্ষা করিতে হইবে। শত্রুদিগের টিটকারী ভ্রূকুটি প্রভৃতি অগ্রাহ্য করিয়া এই সকল সভাসমিতি ধীরভাবে অধ্যবসায় সহকারে কর্তব্য পথে অগ্রসর হইবেন। এ বিষয়ে অধিক হৈচৈ হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে, আমাদিগকে যে মহৎ কার্য সাধন করিতে হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া সতর্কতা, সংযম ও ধীরতা অবলম্বন করা উচিত।

এই সাধু চেষ্টায় যদি আমরা সফলকাম হই, তাহা হইলে জগৎকে আমরা যে দৃষ্টান্ত দেখাইব, ইতিহাসে তাহার তুলনা থাকিবে না; কিন্তু যদি অমনোযোগবশতঃ আমরা সঙ্কল্পচ্যুত হই, তাহা হইলে আমাদিগকে শিল্প বিষয়ে চিরকাল অপরের দাসত্ব স্বীকার করিয়া থাকিতে হইবে।*

●

দেশীয় শিল্প

"ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতে অনুষ্ঠিত হাজার হাজার জনসভার মাধ্যমে 'স্বদেশি' ও বয়কটের ডাক এই সময় সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ল। প্রকাশ্যভাবে শুরু হল ব্রিটিশ পণ্যের বহ্ন্যুৎসব : যে-সব দোকানে বিদেশি দ্রব্য বিক্রি হত সেগুলিতে পিকেটিং শুরু করলেন রাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবীরা। তার সঙ্গে স্বদেশি জিনিস উৎপাদন ও বিক্রিকে কেন্দ্র করে দেখা দিল তুমুল উৎসাহ। ময়রারা স্থির করল বিদেশি চিনি আর ব্যবহার করবে না। ধোপা প্রতিজ্ঞা করল বিদেশি কাপড় আর কাচবে না। বিদেশি উপকরণ দিয়ে পুজো করতে পুরোহিত হল নারাজ। দাক্ষিণাত্য ও বাংলার মেয়েরা ভেঙে ফেলল বিদেশি চুড়ি আর কাচের বাসন। ছাত্রেরা বিদেশি কাগজের ব্যবহার ছেড়ে দিল। বিদেশি পণ্যের ব্যবসা করে এমন লোকের সংস্রব ত্যাগ করলেন ডাক্তার ও উকিলেরা। পিকেটিং এর সঙ্গে সঙ্গে কাজে লাগানো হল সমাজচ্যুত করার পুরনো প্রথাকেও। বরিশালের মতো কিছু কিছু জায়গায় পুলিশের শাস্তির ভয় আগ্রহী করে ব্যবসায়ীরা স্বেচ্ছায় খুলে দিলেন বিদেশী লবণ ও বিদেশী কাপড়ের ভাণ্ডার ; সেগুলি ধ্বংস করা হ'ল।

"এ আন্দোলন কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে তো বটেই, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগের ক্ষেত্রেও নিয়ে এল এক নতুন প্রেরণা। অসংখ্য স্বদেশি কাপড়ের মিল, দেশলাই ও সাবান, চীনা-মাটি ও চামড়া ইত্যাদি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হল চারদিকে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এই সময় যে বেঙ্গল কেমিক্যাল স্বদেশি ভাণ্ডার স্থাপন করলেন তা অচিরেই জনপ্রিয় হয়ে উঠল। একটি স্বদেশি ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। সবরকম সরকারি ও বৈদেশিক সাহায্য প্রত্যাখ্যান করে শুধুমাত্র স্বদেশি চাঁদার ভিত্তিতে টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি শিল্পমূলধন গড়ে তুললেন। রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড়োবড়ো জমিদার ও ব্যবসায়ীরা প্রতিষ্ঠা করলেন একাধিক ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানি। স্বদেশি উদ্যোগে স্টিমার পরিবহন পর্যন্ত চালু হল।

"সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও স্বদেশি আন্দোলন আনল এক নতুন প্রাণের জোয়ার। জন্ম নিল জাতীয়তাবোধের আবেগ-আদর্শে সিক্ত নতুন কবিতা, নতুন গদ্য, নতুন ধরনের সাংবাদিক রচনা। রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, মুকুন্দদাস স্বদেশ প্রেমের যে গানগুলি রচনা করলেন, সাহিত্যের দরবারে তাদের চিরদিনের আসন পাতা রইল। আজও বাংলাদেশ সে গানে মুখরিত। রাজনৈতিক সাংবাদিকতার যে ঐতিহ্য স্বদেশি আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠল তার ফসল হল মুক্তি, স্বাধীনতা ও আত্মনির্ভরতার আদর্শ।"**

●

কয়েকটি স্বদেশি শিল্প সংগঠন***

১৮৬৭ খ্রিঃ শিবপুর আয়রন ওয়ার্কস
হাওড়া

* বারাণসী শিল্প-সমিতিতে প্রদত্ত ভাষণের অংশ। ভাণ্ডার ১৩১২ ফাল্গুন

** স্বাধীনতা সংগ্রাম—বিপানচন্দ্র-অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে। পৃ. ১১৩-১১৪

*** বর্তমান গ্রন্থে রামপ্রাণ গুপ্তর 'স্বদেশি' লেখাটি দেখুন। পৃ. ২৮৯

কিশোরীলাল মুখার্জি প্রতিষ্ঠিত

১৮৯৩ খ্রিঃ বেঙ্গল কেমিক্যাল
প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রতিষ্ঠিত

●

ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস

●

বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস

●

মোহিনী মিলস
কুষ্ঠিয়া

ক্যালকাটা উইভিং কোম্পানি
হাওড়া

১৯০৫ খ্রিঃ পাবনা শিল্প সঞ্জীবনী কোম্পানি
১৯০৫ খ্রিঃ ন্যাশনাল ট্যানারি
ড. নীলরতন সরকার স্থাপিত

ন্যাশনাল সোপ ফ্যাক্টরি
ড নীলরতন সরকার স্থাপিত

বেঙ্গল সোপ কোম্পানি

ওরিয়েন্টাল সোপ ফ্যাক্টরি

বুলবুল সোপ ফ্যাক্টরি, গণ্ডারিয়া, ঢাকা।

১৯০৬ খ্রিঃ ইণ্ডিয়ান স্পিনিং অ্যাণ্ড উইভিং কোম্পানি
১৯০৬ ওরিয়েন্টাল ম্যাচ ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি
গ্লোব সিগারেট কোম্পানি
ইস্ট ইণ্ডিয়া সিগারেট কোম্পানি
বেঙ্গল সিগারেট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি
১৯০৭ বন্দেমাতরম ম্যাচ ফ্যাক্টরি
রাসবিহারী ঘোষ স্থাপিত
১৯০৭ রঙ্পুর ট্যোবাকো কোম্পানি
১৯০৭ খ্রিঃ ত্রিপুরা কোম্পানি
চট্টগ্রাম
১৯০৭ খ্রিঃ জলপাইগুড়ি পাইওনিয়র স্পিনিং মিল
১৯০৮ খ্রিঃ বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি
বগুড়ার জমিদার আবদুল সোভান ও টাঙাইলের জমিদার
এ. এইচ. গজনভি স্থাপিত।

স্বদেশি আবশ্যকীয় দ্রব্য

বিদেশীয় দ্রব্যের ব্যবহার ভারতবর্ষে এতদূর প্রচলিত হইয়াছে যে, এই সকল দ্রব্যের পরিবর্জন সকলের পক্ষে সহসা সম্ভবপর নহে। তবে ক্রমশঃ আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন ও দেশবাসিগণ কিছুদিন ক্ষতি ও ত্যাগ স্বীকার করিতে পারিলে ইহা অসম্ভব হইবে না। বর্তমান কালেই আমাদের আবশ্যকীয় অনেক জিনিসই দেশে প্রস্তুত হইয়া থাকে; বিদেশীয় জিনিস অপেক্ষা ইহার কতকগুলি কিছু অধিক মূল্যবান হইলেও, অধিক দিন স্থায়ী হয়; সুতরাং অনেকেই বিনা আপত্তিতে উহা ব্যবহার করিতে পারেন।

অন্নের পর পরিধেয় বস্ত্রই আমাদের সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য। পূর্বে এখানে প্রচুর সূতা ও বস্ত্র উৎপন্ন হইত। এখন আবার তুলার চাষ যাহাতে অধিক পরিমাণে হয় তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা আবশ্যক। যদি জমিদারগণ আপন আপন প্রজাদিগকে তুলার চাষ করিবার জন্য উপদেশ ও আবশ্যক হইলে বীজ খরিদ করিয়া দেন, তাহা হইলে সত্বর তুলার চাষের বিস্তৃতি হইতে পারে। দেশের আবশ্যক মত সূতা পূর্বের ন্যায় চরকায় প্রস্তুত হওয়া এখন সম্ভব নহে; কারণ এখন লোকসংখ্যা ও বিলাসিতার পরিমাণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে ও আজকাল অনেক স্থানের স্ত্রীলোকেই চরকার কাজ জানে না। চরকায় সূতা প্রস্তুত করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিতে হইবে; এই চেষ্টা কতদিনে ও কিরূপে কার্যকর হইবে, তাহা বলা যায় না; সুতরাং সূতার জন্য কলেরও আবশ্যক। কলিকাতা ও ঢাকা প্রভৃতি স্থানে এক একটি সূতার কল স্থাপিত হইলে ভাল হয়।... আমাদের দেশে এখন অনেক তাঁতির বাস; কাপড়ের কল হইলে এই বহু সংখ্যক লোকের দুরবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্তন হইবে না। বিনষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধার ও নূতন শিল্পের প্রতিষ্ঠা করিয়া শিল্পিগণের দুরবস্থার অপনোদনই স্বদেশি আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য; কাপড়ের কল স্থাপনে এ উদ্দেশ্য সফল হইবে না, ইহা যেন আমাদের নেতৃগণ সর্বদা মনে রাখেন। বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে কাপড়ের কল আছে; আপাততঃ আমরা সেই কাপড়ও ব্যবহার করিতে পারি; পরে কেবলমাত্র তাঁতের কাপড়ই ব্যবহার করিতে হইবে ইহাই যেন আমাদের লক্ষ্য হয়। তাঁতে যাহাতে ব্যবহার্য জামার কাপড়ও প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। স্থানে স্থানে তাঁতিরা জামার কাপড় প্রস্তুত করিতেছে; সেগুলিও সুদৃশ্য ও মজবুত এবং মহার্ঘ নহে; সুতরাং বেশ ব্যবহার্য। তাঁতিরা যাহাতে নানাপ্রকার জামার কাপড় তৈয়ার করিতে পারে, সে বিষয়ের উপদেশ দিবার জন্য লোকের আবশ্যক। অমৃতসর, লুধিয়ানা, কানপুর প্রভৃতি স্থানে উত্তম উত্তম পশমী শীতবস্ত্র প্রস্তুত হইতেছে; সে সকলই কলে প্রস্তুত হয়। তাঁতিরা যাহাতে তাঁতে শীতবস্ত্র তৈয়ার করিতে শিক্ষা পাইতে পারে, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পরিধেয় বস্ত্রের ন্যায় জুতাও একটি আবশ্যকীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের দেশে মুচির সংখ্যা কম নহে এবং তাহারা উত্তম উত্তম জুতা প্রস্তুত করিতে জানে। কলিকাতায় সাহেবদের যে সকল জুতার দোকান আছে সেখানে দেশীয় মুচিরাই জুতা তৈয়ার করিয়া থাকে। তবে এদেশে চামড়া পাইট করিবার কারখানার আবশ্যক। কানপুরে একটিমাত্র কারখানা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে। বাংলার স্থানে স্থানে এক একটি ট্যানারি কারখানা হওয়া আবশ্যক। প্রতি বৎসর এখান হইতে কত জাহাজ চামড়া ইংলণ্ড প্রভৃতি স্থানে রপ্তানি হয় এবং সেই সকল স্থানের কলে আবশ্যক মত পরিষ্কৃত হইয়া এখানে আমদানি হয়। দুইবার জাহাজ ভাড়ায় চামড়ার দর বাড়িয়া যায় ও জুতা দুর্মূল্য হয়। এদেশের আবশ্যকীয় চামড়ার এখানে পাইট হইলে দেশের অনেক লোক কাজ পায় ও চামড়ার দর সস্তা হয়।

গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালের জন্য ছাতা একটি অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য। অধিকাংশ ছাতাই বিদেশ হইতে আমদানি হয়। এদেশে অনেক ছাতা প্রস্তুত হইতেছে বটে, কিন্তু সেগুলি অপকৃষ্ট ও অল্পস্থায়ী। ছাতার শিক ও কাপড় প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এখানে ছাতার বাঁটের উপযোগী বাঁশ ও কাঠের অভাব নাই। ছাতার ব্যবসায়ের জন্য একটি কোম্পানি হইলে ভাল হয়।

আমাদের দেশে কাঁসারির সংখ্যা অল্প নহে। পূর্বে তাহারা বেশ অবস্থাপন্ন ছিল। কিন্তু বিদেশি কাচ ও এনামেল বাসনের প্রচলন অত্যধিক হওয়াতে কাঁসারিরা অবস্থাহীন হইয়া পড়িয়াছে। কাচ ও এনামেলের বাসন অল্পমূল্য বটে, কিন্তু ভঙ্গপ্রবণ ও অল্পস্থায়ী। একটি পিত্তল বা কাঁসার বাসন পুত্র পৌত্রাদিও ভোগ করিতে পারে এবং ভাঙিলেও অর্ধমূল্যে বিক্রীত হয়। সেই জন্য যতদূর সম্ভব, কাচ ও এনামেলের বাসনের পরিবর্তে পিতল কাঁসার বাসনের ব্যবহার করিতে পারিলে ভাল হয় এবং কাঁসারিরা যাহাতে এই সকল দ্রব্য অল্পব্যয়ে প্রস্তুত ও অল্পলাভে বিক্রয় করিতে পারে সেইরূপ উপদেশ দিবার লোকের আবশ্যক। মান্দ্রাজে যে এলুমিনিয়মের বাসন প্রস্তুত হইতেছে, সেগুলিও মূল্যবান; সাধারণ লোক তাহা ব্যবহার করিতে অসমর্থ। কোন কোন কাঁসারি আজকাল জার্মান সিলভারের (রূপদস্তা) বাসন তৈয়ার করিতেছে; সেগুলি সুদৃশ্য ও বেশ ব্যবহার্য এবং অধিক মূল্যবান নহে।

ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রভৃতি আবশ্যকীয় অস্ত্র সকল এদেশে অনেক স্থানে প্রস্তুত হয়। বর্ধমান জেলার কাঞ্চননগরের প্রসিদ্ধ কর্মকার প্রেমচাঁদ এইসকল দ্রব্য যেরূপ সুন্দর তৈয়ার করে, সেগুলি বিলাতি অস্ত্র হইতে কিছুতেই অপকৃষ্ট নহে। কাঞ্চননগরে আরও ভাল ভাল কারিকর আছে। মানভূম জেলার জালদা গ্রামের কর্মকারেরা কাটারি, গুপ্তি, বলুয়া, তলোয়ার প্রভৃতি উৎকৃষ্ট হাতিয়ার তৈয়ার করে। মুঙ্গেরের ও আরা জেলার জগদীশপুর গ্রামের কামারেরা বন্দুক প্রস্তুত করিবার জন্য বিখ্যাত। ফলতঃ এদেশে আমাদের আবশ্যকীয় লৌহজাত দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লোকের অভাব নাই। বিদেশীয় অস্ত্রাদির আমদানি হওয়ায় তাহাদের ব্যবসা ভালরূপ না চলাতে তাহার অতিকষ্টে দিনপাত করিতেছে।

স্বর্ণকারগণও দুর্দশাপন্ন হইয়া অর্ধাশনে আছে। প্রায় সকল জেলাতেই স্বর্ণকারের বাস। কটক, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের স্বর্ণকারের কারুকার্য চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আমাদের ধনী মহাশয়েরা তাহাদের ত্যাগ করিয়া সাহেবদের দোকান হইতে অলঙ্কার খরিদ করিতে পসন্দ করেন।

লোহার পেরেক, কব্জা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য এখানে তৈয়ার হয়, কিন্তু স্ক্রুপ তৈয়ার হয় না। আজকাল স্ক্রুপ একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় দ্রব্য হইয়া উঠিয়াছে; ইহা তৈয়ার করিবার জন্য একটি কলের আবশ্যক। একটি কোম্পানি টাকা তুলিয়া কলিকাতার নিকটবর্তী কোন স্থানে পেরেক, স্ক্রুপ প্রভৃতি লোহার জিনিস তৈয়ার করিবার একটি কারখানা খুলিতে পারিলে বড়ই ভাল হয়। এ ব্যবসায়টি বিশেষ লাভজনক হইতে পারে।

ছোটনাগপুর পাহাড়ে ও বর্ধমান জেলার রাণীগঞ্জের স্থানে স্থানে ও ময়ূরভঞ্জের পাহাড়ে প্রচুর লৌহ পাওয়া যায়। বেঙ্গল আইরন স্টিল কোম্পানি নামে একটি ইংরাজ কোম্পানি বরাকরের নিকট কেন্দুয়া নামক স্থানে একটি কারখানা স্থাপন করিয়া লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত করাইতেছেন। আমাদেরও ঐরূপ একটি কারখানা করা নিতান্ত আবশ্যক।

এখানে দিয়াশলাই ও সাবানের কল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেগুলি যাহাতে স্থায়ী হয়, তাহার জন্য সকলের চেষ্টা করা কর্তব্য। অর্থাৎ আমরা যদি দেশীয় কলের দেশালাই ও সাবান ব্যবহার করি তাহা হইলে ঐ সকল লাভজনক ও স্থায়ী হইতে পারে। কতকগুলি দেশি দেশলাই বিদেশি দেশালাই অপেক্ষা কিছু নিকৃষ্ট হইলেও অনেকগুলিই বেশ ব্যবহার্য। বেঙ্গল সোপ ফ্যাক্টরির সাবান অতি উৎকৃষ্ট ও বিলাতি সাবান হইতে কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; তবে কেন আমরা

দেশি সাবান ব্যবহার না করিব? ভারতের গোলাপজল ও আতর জগতে বিখ্যাত; তবে বিদেশি সুগন্ধির ব্যবহার কেন? জামা, কোট, পেন্টুলন প্রভৃতির জন্য কতকপ্রকারের বোতাম এদেশে প্রস্তুত হইতেছে কিন্তু সর্বপ্রকারের প্রয়োজনীয় বোতাম এদেশে প্রস্তুত হয় না। যতদিন না হয়, ততদিন বিদেশীয় বোতামের ব্যবহার নিবারিত হইবে না। এদেশে হস্তিদন্ত, মহিষশৃঙ্গ, ঝিনুক প্রভৃতি বোতামের উপাদানের অভাব নাই এবং শিল্পীও যথেষ্ট আছে; তবে কেন স্থানে স্থানে বোতাম তৈয়ার করিবার বন্দোবস্ত না হইবে? দেশীয় শিল্পীগণ প্রায় সকলেই অর্থ-হীন; আমাদের স্বদেশি আন্দোলনকারীগণ তাহাদিগকে অর্থ সাহায্যে উৎসাহিত করিলে ভাল হয়।

সিগারেট খাওয়া বন্ধ হওয়াতে আমাদের দেশের বিশেষ মঙ্গল হইয়াছিল। স্কুলের ছোট ছোট ছেলেরাও সিগারেটে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিল; যখন সকলেই বিদেশি জিনিসের ব্যবহার ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, ছেলেরাও সর্বাগ্রে সিগারেটের ধূম পান অভ্যাস ত্যাগ করিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে শীঘ্রই আবার কলিকাতায় ও বোম্বায়ে সিগারেট তৈয়ার আরম্ভ হইল ও সকলেই পরিত্যক্ত অভ্যাস আবার আরম্ভ করিতেছে। সিগারেট দেশ হইতে একেবারে উঠিয়া গেলে যে বড়ই ভাল হইত, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহার ব্যবহারে অপকার ভিন্ন উপকার হয় না।

পাঞ্জাব সদর বাজার, লাহোর আম্বালা, আলোয়ার ষ্টেট ও রাজপুর ডেরাডুনে বিবিধ কাচদ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু বাংলাদেশে এখনও কাচ প্রস্তুতের কারখানা নাই। এদেশে যে সকল লণ্ঠন প্রভৃতি প্রস্তুত হয় সেগুলি বড় ভাল হয় না। শীঘ্রই অকর্মণ্য হইয়া যায়। যে যে উপায়ে সেগুলির উন্নতি হয় সে বিষয়ে শিল্পীদিগকে উপদেশ দেওয়া কর্তব্য।

স্বদেশি ১২১২ ফাল্গুন

●

স্বদেশি শিল্পপ্রসঙ্গ

রেশমি এবং পশমি কাপড় ঃ— লুধিয়ানা আসাউসা কোং, লুধিয়ানা, পাঞ্জাব। ইহারা বিবিধ শ্রেণির সাধারণ ব্যবহারোপযোগী উৎকৃষ্ট বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

আব. সি. বি. এণ্ড কোম্পানি, উজান বাজার, গৌহাটী-আসাম। —ইহারা নানাপ্রকার এণ্ডি এবং মুগা ধুতি, সাটী এবং চাদর মফস্বল হইতে প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

কানপুর উলেন মিলস্ কোং। —নানাবিধ পশমী বস্ত্র, গেঞ্জি, মোজা, কম্বল, লুই প্রভৃতি প্রস্তুত করিযা থাকেন।

সামেদ সা এণ্ড সন্‌স, শ্রীনগর, কাশ্মীর। —ইহারা নানাপ্রকার পশমী গাত্রবস্ত্র প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকেন।

শম্ভুনাথ ও রঘুনাথ দাস, গোল্ডেন টেম্পল, অমৃতসর। —ইহারা কার্পেট, মলিদা, পট্টু, কাশ্মিরী এবং নানাবিধ কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যও প্রস্তুত করিয়া খুচরা এবং পাইকারি বিক্রয় করিয়া থাকেন।

বেঙ্গল সিল্ক কোং, বহরমপুর। —ইহারা নানাবিধ রেশমি বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

খেলিবার ফুটবল ঃ— নন্দী এবং বিশ্বাস, ৬৮ নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। ইহারা দেশি কারিকর দ্বারা দেশীয় ফুটবল তৈয়ার করাইতেছেন। মূল্যও সুলভ। যদি ফুটবল খেলিতেই হয়, আশা করি, ছাত্রবৃন্দ ইহাদের ফুটবল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন।

ছুরি, কাঁচি ঃ— প্রেমচাঁদ মিস্ত্রী, কাঞ্চননগর, বর্ধমান। —ইনি বহুদিন হইতে ছুরি, কাঁচি প্রস্তুত

করিতেছেন। ইহার প্রস্তুত ছুরি, কাঁচি এবং ডাক্তারি যন্ত্রাদি বিলাতি অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে; অথচ বিলাতী অপেক্ষা সুলভ। কিন্তু ইহারা কারখানা উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ অতি অল্প। আশা করি, প্রেমচাঁদ বাবু কার্য বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশের মঙ্গল সাধন করিবেন।

ইণ্ডিয়া নাইফ কোং, সাঁশপুর, পোঃ—বর্ধমান। —ইহারা ছুরি, কাঁচি, ক্ষুর প্রস্তুত করিয়া বেশ সুখ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। দ্রব্যের মূল্য বিলাতির সহিত তুলনায় সুলভ, অথচ কার্যকারিতা এবং দৃশ্যও মন্দ নহে। দেশের লোকের ইহাদিগের উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য।

অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ঃ— বেঙ্গল কেমিক্যাল এণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড্, ৯১ নং অপার সারকিউলার রোড, কলিকাতা। —ইহারা অতি প্রশংসার সহিত পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতানুযায়ী যন্ত্রাদির সাহায্যে নানাপ্রকার অ্যালোপ্যাথিক ঔষধ ও এসিড প্রস্তুত করিতেছেন। সাধারণের ইহাদিগকে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য।

সুগন্ধি দ্রব্যাদি ঃ— এইচ বসু, পারফিউমার, ৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। —ইহারা বহুদিন হইতে নানাপ্রকার এসেন্স প্রস্তুত করিয়া সুখ্যাতির সহিত বিক্রয় করিতেছেন।

পি. এম. বাগচি এণ্ড কোং, কেমিকেল ওয়ার্কস, ৩৮ নং মসজিদবাড়ি স্ট্রীট, কলিকাতা। —ইহারা নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন।

মতিলাল বসু এণ্ড কোং, ১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার স্ট্রীট। —ইহারা বিবিধ গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

লিখিবার এবং ছাপিবার কালি ঃ— এ. এল. রায়, হেড অফিস ও কারখানা, বারোয়ারিতলা রোড, বেলিয়াঘাটা। —ইহারা লিখিবার ও ছাপিবার কালি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

পি. এম. বাগচি এণ্ড কোং, ৩৮ নং মসজিদবাড়ী স্ট্রীট। —ইহারা লিখিবার কালি প্রস্তুতকারক বলিয়া খ্যাত।

পারিজাত এজেন্সি, ১৮ নং নয়ানচাঁদ দত্তের স্ট্রীট। —ইহাদের সারস মার্কা লিখিবার কালি বাজারে বেশ কাট্তি হইয়াছে।

জুতার কালি, ব্ল্যাক্কো, ব্রক্কো ঃ— সেন ব্রাদার্স, তাঁতিবাজার, ঢাকা। —ক্যোরেশ্বর সেন নামক একটি ছাত্র, সেন ব্রাদার্স নাম দিয়া জুতার কালি, ব্রক্কো, ব্ল্যাক্কো প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিতেছেন। আশাকরি, সাধারণে বিশেষতঃ ছাত্রসমাজ ইহাকে উৎসাহ দানে কুণ্ঠিত হইবেন না। ইনি কনডেন্স মিল্ক ও গাটাপার্চার চিরুণি প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

এইচ. কে. বসু, সিকদার বাগান স্ট্রিট, কলিকাতা। —ইনিও ইম্পিরিয়াল ক্রিম ও ইম্পিরিয়াল ব্ল্যাক্কো প্রস্তুত করিয়াছেন।

তালাচাবি ঃ— দাস কোং, চিৎপুর লক্ওয়ার্কস টাউন অফিস, ৯৬ নং ক্লাইভ স্ট্রীট, কলিকাতা। ইহাদের নির্মিত তালাচাবি বিলাতের সমকক্ষ।

ঘোষ দাস কোং, ৪২/১ লকগেট রোড, কলিকাতা। ইহাদের তালাচাবিরও বেশ সুখ্যাতি আছে।

বেহারী লাল ঘোষ, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। ইহার প্রস্তুত তালাচাবিও অনেকের নিকট পরিচিত।

দিয়াশলাই ঃ— বাবু ডি. এন. কর্মকার, ৬ নং হলধর বর্ধনের লেন, কলিকাতা। —পেস্ট বোর্ড কাগজের দিয়াশলাই প্রস্তুত করিয়াছেন ও ইহার প্রণালী শিক্ষা দিতে প্রস্তুত আছেন।

শঙ্খ নির্মিত দ্রব্য ঃ— ঢাকায় নানাবিধ সুন্দর শঙ্খ নির্মিত দ্রব্য প্রস্তুত হয়। মেদিনীপুর, সুজাগঞ্জেও শাঁখার বালা, বোতাম প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

বিবিধ শিল্প ঃ— কটকের মিস্টার এম্. এস্. দাস পরিচালিত কারখানায় হস্তী দন্ত, শৃঙ্গ, এলুমিনিয়ম প্রভৃতি নির্মিত নানাবিধ সুন্দর সুন্দর দ্রব্য প্রস্তুত হয়।

দেশি সিমেন্ট ঃ— দি গ্রেট ইস্টার্ন ট্রেডিং কোং, সিমেন্ট বিক্রয় করিতেছেন। মূল্য সুলভ, সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

হস্তীদন্ত নির্মিত দ্রব্য ঃ— হরেকৃষ্ণ ভাস্কর, খাগড়া, পোঃ—বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। ইনি নানাবিধ খেলনা, দেবদেবীর মূর্তি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

দুর্গাদাস ভাস্কর, বহরমপুর, কালীতলা, খাগড়া, পোঃ—মুর্শিদাবাদ। নানাপ্রকার বোতাম, পুতুল, খেলনা প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

শ্যামাচরণ দে, সোমপাড়া, ব্রজযোগিনী। ইনিও নানাপ্রকার ঝিনুকের বোতাম প্রস্তুত করিয়াছেন, মূল্য সুলভ।

লিখিবার নিব ঃ— হরিচরণ কর্মকার, রহমতপুর, বরিশাল। ইনি নিজ হস্তে নিব কাটা কল প্রস্তুত করিয়া নিব প্রস্তুত করিতেছেন।

সাবান ঃ— বেঙ্গল সোপ ফেক্টরি, ৬৪/১ মেছুয়াবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।

দি বুলবুল সোপ ফেক্টরি, ঢাকা। ইহাদের কারখানাতে ভদ্রলোকের ব্যবহারোপযুক্ত সাবান প্রস্তুত হইতেছে।

স্টিল ট্রাঙ্ক ঃ— শ্রী জঙ্গলী সাহা স্বদেশি স্টিল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, কারখানা, জিয়াগঞ্জ, পোঃ, মুর্শিদাবাদ। স্টিল ট্রাঙ্ক প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য প্রস্তুত করিতেছেন। ইণ্ডিয়ান স্টিল ট্রাঙ্ক ম্যানুফ্যাক্চারিং কোং, জিয়াগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ। ইহারা ইস্পাতের নানা প্রকার বাক্স, ট্রাঙ্ক প্রস্তুত করাইয়া বিক্রয় করেন।

খাগড়ার বাসন ঃ— ঋষিকেশ কুণ্ড, পোঃ খাগড়া, মুর্শিদাবাদ। আইস্ প্রুফ গেলাস প্রভৃতি উত্তম উত্তম বাসন তৈয়ার করিয়া থাকেন।

বাতি ঃ— আসাম অয়েল কোং লিমিটেড। দিগবই পোঃ, আসাম। ইহারা নানাপ্রকার বাতি প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

বিস্কুট ঃ— কে. সি. বসু, শ্যামবাজার, কলিকাতা। ভি. এস. ব্রাদার্স, ৪১/৪২ চাষাধোপা পাড়া, কলিকাতা।

হিন্দু বিস্কুট ফ্যাক্টরি, কৈসারবাগ, লক্ষ্ণৌ। ইহারা বিস্কুট প্রস্তুত করিয়া থাকেন।

দেশি কাপড়ের হাট ঃ— হাওড়ার হাট, উত্তরপাড়া, রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের হাট। চেতলা, রাখাল দাস আঢ্যের হাট।

কলিকাতা, বৌবাজারের হাট।

দেশিবস্ত্র ও অন্যান্য বিবিধ দ্রব্য প্রাপ্তির স্থান ঃ— ইণ্ডিয়ান স্টোরস লিমিটেড, ৬২ নং বৌবাজার স্ট্রীট। কে. বি. সেন এণ্ড কোং, মনোহর দাসের স্ট্রীট।

স্বদেশি বস্ত্রালয়, ৩৭২ নং চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা।

ন্যাশানাল এজেন্সী, বরিশাল।

দি বেহার স্বদেশি কোং লিমিটেড, ভাগলপুর।

বিশ্বম্ভর এজেন্সী, ৬৪ নং কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বদেশি বাজার, ১২৯/১/২ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট।

পাঁড়ে ব্রাদার্স, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা।

দেশি তুলট কাগজ ঃ— বৈদ্যনাথ সাহা, ৪৪ নং মনোহর দাসের স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্বদেশি ১৩১৩ আশ্বিন

●

স্বদেশি আন্দোলন—বাংলার বাইরে

মুক্তি-স্বাধীনতা—আত্মনির্ভরতার পথ দেখেছিল বাঙালি বিশ শতকের সূচনায়। মানসিকতার মুক্তি ঘটেছিল সেদিন। সেই আলোর দ্যুতি ছড়িয়ে পড়েছিল, কেবল বাংলায় নয়, বাংলার বাইরেও।

> "'বয়কট' ও 'স্বদেশী' ভাবধারাকে পশ্চিমভারতে বহন করে নিয়ে গেলেন তিলক। তাঁর পরিচালনায় পুনায় বিদেশি কাপড়ের এক বিরাট বহ্ন্যুৎসব হল। স্বদেশি বস্ত্র প্রচারিণী সভার প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে একাধিক কোঅপারেটিভ ভাণ্ডার তিনি চালু করলেন। বোম্বাই-এর মিল মালিকদের কাছে তিনি আবেদন জানালেন সস্তায় ধুতি সরবরাহ করার জন্য। তাঁরই উদ্যোগে পুনায় স্থাপিত হল স্বদেশি উইভিং কোম্পানি। সুদূর পঞ্জাবেও ছড়িয়ে পড়ল স্বদেশি আন্দোলনের তরঙ্গ। অন্যান্য অঞ্চলের মতো পঞ্জাবও ছিল সবকারি আমদানি নীতির বলি। বিদেশ থেকে আনা চিনির পরিমাণ এখানে এত বেশি ছিল যে তার নিজস্ব ইক্ষু ও চিনি উৎপাদন প্রভূত পরিমাণে হ্রাস পেয়েছিল। বিদেশি চিনির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ এখন তাই তীব্র হয়ে উঠল। রাওয়ালপিণ্ডির ব্যবসায়ীরা প্রতিবাদ করল, তারা আর বিদেশি চিনির ব্যবসা করবেন না; মূলতানে মন্দিরের পূজারীরা সংকল্প নিল বিদেশি চিনিতে দেবতার নৈবেদ্য আর সাজানো হবে না। আস্তে আস্তে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল হরিদ্বার, দিল্লি, কাংড়া ও জম্মুতে। দিল্লিতে স্বদেশি আন্দোলনের প্রাণপুরুষ ছিলেন সৈয়দ হায়দর রেজা। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছল সুদূর দক্ষিণেও। মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূলে তুতিকোরিণ-এ স্বদেশি স্টীম নেভিগেশন কোম্পানি স্থাপন করলেন চিদাম্বরণ পিল্লাই।"*

*স্বাধীনতা সংগ্রাম—বিপানচন্দ্র, অমলেশ ত্রিপাঠী ও বরুণ দে।

●

চিত্রকলার বিকাশ

অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া থেকে একটু দীর্ঘ হলেও, প্রাসঙ্গিক বিবেচনায়, উদ্ধৃতিটিতে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন ঃ "এমন সময়ে সব মাটি হলো, যখন একদল নেতা বললেন, বিলিতি জিনিস বয়কট করো। দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে ধন্না দেওয়ালেন, যেন কেউ না গিয়ে বিলিতি জিনিস কিনতে পারে। রবিকাকা বললেন, এ কী, যার ইচ্ছে হয় বিলিতি জিনিস ব্যবহার করবে, যার ইচ্ছে হয় করবে না। আমাদের কাজ ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢুকিয়ে দেওয়া—জোর জবরদস্তি করা নয়। ...নেতারা সুপরামর্শে কর্ণপাত করলেন না। বিলিতি বর্জন শুরু হলো, বিলিতি কাপড় পোড়ানো হতে লাগল, পুলিশও ক্রমে নিজ মূর্তি ধরল। টাউন হলে পাবলিক মিটিঙে যেদিন সুরেন বাড়ুজ্যে বয়কট ডিক্রেয়ার করলেন, রবিকাকা সেই মিটিঙেই দাঁড়িয়ে স্পষ্টই বললেন, আমি এর মধ্যে নেই।

"গেল আমাদের স্বদেশিযুগ ভেঙে। কিন্তু এই যে স্বদেশি যুগে ভাবতে শিখেছিলুম, দেশের জন্য নিজস্ব কিছু দিতে হবে, সেই ভাবটিই ফুটে বের হলো আমার ছবির জগতে। তখন বাজনা করি, ছবিও আঁকি—গানবাজনাটা আমার ভিতরে ছিল না, সেটা গেল—ছবিটা রইল।"

"ছবি দেশি মতে ভাবতে হবে, দেশি মতে দেখতে হবে। রবিবর্মাও দেশি মতে ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু বিদেশি ভাব কাটাতে পারেন নি, সীতা দাঁড়িয়ে আছে ভিনাসের ভঙ্গীতে। সেইখানে হলো আমার পালা। বিলিতি পোর্টেট আঁকতুম, ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে পটপটুয়া জোগাড় করলুম। যে-দেশে যা-কিছু নিজের—নিজের শিল্প আছে, সব জোগাড় করলুম। যতরকম পট আছে সব স্টাডি করলুম, সেই খাতাটি এখনও আমার কাছে।"

"তারপর দেশি মতে দেশি ছবি আঁকতে শুরু করলুম। এক এক সময়ে এক-একটা হাওয়া আসে, ধীরে ধীরে আপনিই চালিয়ে নিয়ে যায়। দড়িদড়া ছিঁড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লুম, নৌকো দিলুম খুলে স্রোতের মুখে। বিলিতি আর্ট দূর করে দিয়ে, দেশি আর্ট ধরলুম। তারপর স্বদেশি যুগ, দেশের আবহাওয়া, এ-সব হচ্ছে সুবাতাস। সেই সুবাতাস ধীরে ধীরে নৌকো এগিয়ে নিয়ে চলল।"*

এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার, ১৯০৭ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অফ ওরিয়েন্টাল আর্ট।"

●

নাটক ও মঞ্চ

বঙ্গভঙ্গ বাংলার নাট্যকার ও কলা কুশলীদের প্রভাবিত করেছিল। সমকালের বিখ্যাত নাট্যকারদের প্রায় সকলেই বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে নাটক রচনা করেন এবং সেইসব নাটক সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হয়েছিল স্টার, কোহিনুর, মিনার্ভা, গ্রাণ্ড, ক্লাসিক প্রভৃতি মঞ্চে। যার প্রতিক্রিয়া ঘটে জনমানসে বিপুলভাবে। কোন কোন নাটকের বিষয়বস্তু ছিল স্বদেশি আন্দোলন, আবার কোন কোন নাটকের বিষয় ছিল ইতিহাসের চরিত্র ও গৌরব গাথা যা স্বদেশপ্রেম প্রজ্বলিত করেছিল।

সাবাস বাঙালি	১৯০৫	অমৃতলাল বসু
বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ	১৯০৫	অমরেন্দ্রনাথ দত্ত

* ঘরোয়া—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রাণী চন্দ। পৃ: ২১-২২

বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ	১৯১০	কুমুদরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়
পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত	১৯০৭	ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
নন্দকুমার	১৯০৮	ঐ
বাংলার মসনদ	১৯১০	ঐ
পদ্মিনী	১৯০৬	ঐ
চাঁদবিবি	১৯০৭	ঐ
সিরাজদৌলা	১৯০৫	গিরিশচন্দ্র ঘোষ
মীরকাসিম	১৯০৬	ঐ
প্রতাপসিংহ	১৯০৫	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
দুর্গাদাস	১৯০৬	ঐ
মেবার পতন	১৯০৮	ঐ
জাগরণ	১৯০৫	হরনাথ বসু

জনজাগরণে সঙ্গীত ও কবিতার মতই এইসব নাটকের ছিল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭) ছিলেন প্রত্যক্ষভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। তাছাড়া গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২), অমৃতলাল বসু, (১৮৫৩-১৯২৯), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯৬৬)—এঁরা ছিলেন বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় নট ও নাট্যকার। এঁরা ছাড়াও বহু অখ্যাত নাট্যকার মহান জাতীয় কর্তব্য পালন করেছিলেন। অনেকের নাটকেই হিন্দুমুসলমান ঐক্যের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছিল। যা ছিল কালোপযোগী।

নাট্যকার মন্মথ রায় স্বদেশিযুগের বাংলা নাটক প্রসঙ্গে লিখেছেন :

...নাট্যশালা যে জাতির দর্পণ তা আবার নতুন করে প্রমাণিত হলো ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদের (১৮৬৩-১৯২৭) প্রসিদ্ধ নাটক 'প্রতাপাদিত্য'তে। ১৯০৩ সালের ১৫ই আগস্ট স্টার থিয়েটারে 'প্রতাপাদিত্য' নাটকের অভিনয় শুরু হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রবাহে সেই নাটক কোনও একটি থিয়েটারে আবদ্ধ না থেকে দেশের সর্বত্র অভিনীত হয়ে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে। এই জনপ্রিয়তার মূলে ছিল প্রথমত নাটকের বিষয়বস্তু। বাংলার প্রতাপাদিত্য হিন্দু মুসলমানের মিলিত শক্তিতে মোঘলের আধিপত্য অস্বীকার করতে গিয়ে শহীদ হয়েছিলেন, নাট্যোক্ত এই ঘটনা বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করলো—যুগোপযোগী হওয়ায়। দ্বিতীয়তঃ ক্ষীরোদপ্রসাদের সংলাপ ছিল কাব্যিক এবং নাটকীয়। নিপুণ লেখনীতে ক্ষীরোদপ্রসাদ দর্শকদের হৃদয়-দুয়ারে ঘা দিলেন। তাঁর আবেগময় সংলাপ মুখে মুখে ছড়াতে লাগলো। দেশমাতৃকা যে কত বরেণ্যা, তা এই নাটকের নিম্নোক্ত সংলাপেই সুপ্রকাশ।

> 'সম্মুখ সমরে, দেহত্যাগে যে স্বর্গ, আমি সেই স্বর্গ চাই না। সে কার্যে যদি নরকও অদৃষ্টে থাকে, যদি বুঝতে পারি—মা আমার বেঁচেছে—তাহলে হাসিমুখে নরকেও প্রবেশ করতে পারি।'

এই সময়েই যে বাঙালিরা ভারত থেকে ইংরেজ বিতাড়নের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন, এবং তা কেবল বিলাতি বর্জনের প্রতিরোধ দিয়ে নয়, বাহুবল ও অস্ত্রের কথাও তাঁরা ভাবছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে শক্তিহীনতার অপবাদ বাঙালিকে সহ্য করতে হয়েছে। এবার বাঙালির সশস্ত্র শক্তির প্রস্তুতি শুরু হলো।

...এখানে স্মরণযোগ্য, ১৯০৮ সালে ক্ষীরোদপ্রসাদের রূপক নাটক 'দাদা ও দিদি' দেশপ্রেমের

স্পর্শ দোষেই রাজরোষে নিষিদ্ধ হয়।...

সমসাময়িক অন্য যে নাট্যকার বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে যুগসূর্যরূপে প্রতিভাত হয়েছিলেন, তাঁর নাম গিরিশচন্দ্র ঘোষ। বাংলা নাটক ও নাট্যশালার যে কোনও ইতিবৃত্তে গিরিশচন্দ্র একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর রচনার বৈচিত্র্য ও প্রতিভার বিশালতা সম্বন্ধে অধিক বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে মাত্র এই টুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বাংলার নাট্যশালার প্রাণ পুরুষ হিসাবে গিরিশচন্দ্র আজ পর্যন্ত স্বীকৃতি পেয়ে এসেছেন। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহ নির্দেশধন্য গিরিশচন্দ্র নাটক লিখেছেন শুধু আনন্দ বিতরণের জন্য নয়, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল লোকশিক্ষা। তাই পৌরাণিক ও সামাজিক নাটকের দিকে তাঁর দৃষ্টি ছিল বেশি। কিন্তু যুগন্ধর গিরিশচন্দ্র তৎকালীন রাজনৈতিক চিন্তাধারারও ধারক এবং বাহক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ পর্বের যুগমানস তাঁর যে চারিখানি নাটকে প্রতিফলিত হয়েছে, সেগুলি যথাক্রমে ১৯০৪ সালে লেখা 'সৎনাম,' ১৯০৫ সালে রচিত 'সিরাজদ্দৌলা, 'মীরকাশিম' এবং ১৯০৭ সালে 'ছত্রপতি শিবাজী'। 'সৎনাম' নাটকটি বঙ্কিমের আনন্দমঠের আদর্শে সন্ন্যাসী বিদ্রোহের পটভূমিকায় রচিত, এবং আনন্দমঠের ঘটনা ও চিন্তার অনুগামী ঘটনা ও চিন্তায় সমৃদ্ধ। বঙ্গভঙ্গের পরে একই বছরে 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' প্রভূত আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং নাট্যশালায় পুলিশী অত্যাচার আবার দেখা দেয়। মঞ্চস্থ হবার পর অনতিবিলম্বেই সরকার 'সিরাজদ্দৌলা', 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটক তিনটি বাজেয়াপ্ত করে এই নাট্যত্রয়ের দেশাত্মবোধের তীব্রতা প্রমাণ করলেন, এবং এগুলি রাজরোষে দগ্ধ হয়ে গৌরবোজ্জ্বল হলো। ১৯০৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত 'সিরাজদ্দৌলা' বাংলার স্বাধীনতা সূর্যের রাহুগ্রাস রূপায়িত করলো—সঙ্গে সঙ্গে স্বেচ্ছাচারী ইংরেজকে শুনিয়ে দিলো :

'রাজকার্য নহে স্বেচ্ছাচার
নবাব রাজার ভৃত্য প্রভু প্রজাগণ।
প্রজার মঙ্গল কার্য সতত সাধন
নবাবের উদ্দেশ্য জীবনে।'

ইংরেজ যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছিল, বাঙালি সেদিন তাকে অগ্রাহ্য করেছিল। সিরাজদ্দৌলায় গিরিশচন্দ্র বাঙালীদের ঐক্যের আহ্বান জানালেন :

আবেগব্যাকুল কণ্ঠে সিরাজ বলছেন :

'শত্রুজ্ঞানে ফিরিঙ্গিরে কর পরিহার ;
বিদেশী ফিরিঙ্গি কভু নহে আপনার
স্বার্থপর চাহে মাত্র রাজ্য অধিকার।
হও সবে যুদ্ধার্থে প্রস্তুত।'
'সিংহাসনে হয় যদি সৌকত স্থাপিত,
বাংলার ক্ষতি নাহি তাহে।
হয় যদি বিদ্রোহ সফল,
বাঙ্গলায় বঙ্গবাসী—হইবে নবাব।।
কিন্তু সাবধান!
ফিরিঙ্গিরে নাহি দিও সূচাগ্র স্থান।।'

১৯০৩ থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ঐতিহাসিক নাটকের জোয়ার এসেছিল। নাট্যকাররা যে প্রায় সকলেই দেশাত্মবোধক নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তার পেছনে নাট্যশালাগুলির মালিক ও অধ্যক্ষদের দানও কম ছিল না। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নাট্য প্রযোজনা

করলেও মালিক বা লেসীরা সাধারণের দাবীকেও প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তাঁদের এই কাজ দুঃসাহসিক ছিল এই জন্য যে, যে কোনো সময়েই তাঁরা রাজরোষে পড়ে দণ্ডিত হতে পারতেন; ব্যবসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও ছিল। তৎসত্ত্বেও রঙ্গালয়গুলিতে এই দশকে দেশাত্ম-বোধক ঐতিহাসিক নাটকের অভিনয়ই হয়েছে সব চেয়ে বেশি। মিনার্ভা, স্টার, ক্লাসিক, গ্র্যাণ্ড, কোহিনূর প্রভৃতি থিয়েটারে সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম, ছত্রপতি শিবাজী, প্রতাপাদিত্য; দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রাণাপ্রতাপ, দুর্গাদাস, মেবার পতন, সাজাহান (অন্যান্য নাট্যকারের চাঁদবিবি, পলাশীর প্রায়শ্চিত্ত, নন্দকুমার) অমরেন্দ্র দত্তের 'বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ' প্রভৃতি পুনঃ পুনঃ অভিনীত হতে থাকে। প্রহসন রচনার মধ্যেও এই জাতীয়তাবোধের ধারা প্রবাহিত হয়েছিল। অমৃতলাল বসুর 'সাবাস্ বাঙ্গালী'তে চরকা, বিলাতি বর্জন, স্বদেশি প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাব বাংলার নাট্য জগতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। নাট্যগ্রন্থনে, সংলাপের কাব্যিক আবেগে, সঙ্গীতের মাধুর্যে ও বলিষ্ঠতায়, বক্তব্যের অভিনবত্ব এবং বিশ্লেষণের বাস্তবমুখীতায় তিনি এক নবযুগের সূচনা করলেন। পরবর্তীকালের বাংলা মঞ্চ এই অসাধারণ প্রতিভাধর নাট্যকারের নাটকগুলি সগৌরবে দীর্ঘদিন অভিনয় করেছে। চরিত্র চিত্রণে তাঁর পারদর্শিতা ছিল অসাধারণ এবং তাঁর নাটকগুলির বহু চরিত্র অভিনেয়তা গুণে অভিনেতাদের চিরকাম্য হয়ে উঠেছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির মধ্যে রাণাপ্রতাপ সিংহ (১৯০০), দুর্গাদাস (১৯০৬), মেবার পতন (১৯০৮) ও সাজাহান (১৯০৯) জনপ্রিয়তায় অনন্যতা লাভ করেছিল। এই কবি-নাট্যকারের অনেকগুলি গান লোকের মুখে মুখে ফিরতো, সভা-সমিতিতে গীত হতো—এমন কি দেশব্যাপী আন্দোলনের সময়ে মিছিলের জনতার মুখে ধ্বনিত হত তাঁর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতমালা 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', 'ধনধান্য পুষ্প ভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'ভারত আমার' প্রভৃতি নাট্যসঙ্গীত নাটকের বন্ধন উত্তীর্ণ হয়ে চিরায়ত হবার গৌরব অর্জন করেছে। গিরিশের পর বাংলা নাট্যশালায় দেশপ্রেমের ভাগীরথী বহন করে আনেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দেশাত্মবোধক ঐতিহাসিক নাটকের এই নব ভগীরথ সম্পর্কে এক কথায় বলা যায়, সমগ্র দেশ সঞ্জীবিত হবার জন্য যেন তাঁরই অপেক্ষায় ছিল, অথচ এই দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন একজন রাজকর্মচারী ; কিন্তু তাতেই প্রমাণিত হয় তাঁর দুঃসাহসিক অনিবার্য দেশপ্রেম। অবশ্য বৃত্তি বিরুদ্ধ দেশ-প্রেম আরো কয়েকজন রাজকর্মচারীর মধ্যেও পূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি—তাঁরা হলেন দীনবন্ধু মিত্র, মাইকেল, বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র সেন।...

এমন একটি কাল এসেছিল যখন সুযোগ পেলেই প্রতিটি নাট্যকার তঁদের নাটকের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ প্রচারে ব্যগ্রতা দেখিয়েছেন। হরিপদ মুখার্জির রাণী দুর্গাবতী, হরনাথ বসুর ময়ূর সিংহাসন, গুরুগোবিন্দ মহারাষ্ট্র গৌরব, মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাজীরাও, প্রমথনাথ রায়চৌধুরীর হাম্বির, চিতোরোদ্ধার, জয় পরাজয়, অতুলানন্দ রায়ের পাণিপথ, নিশিকান্ত বসুরায়ের দেবলাদেবী ও বঙ্গে বর্গী, বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্তের মিশর কুমারী, অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অযোধ্যার বেগম, ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পেলারামের স্বাদেশিকতা ও বাঙালী এদিক দিয়ে সমধিক উল্লেখযোগ্য।...

●

বিপ্লবী থেকে সন্ন্যাসী

বিপ্লবীকর্মীদের বেশ কয়েকজন সন্ন্যাসী হয়ে যান। তাঁদের কয়েকজন ঃ**

শান্তিনাথ—গম্ভীরনাথের গদিতে।

স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা-নাটক ও নাট্যশালা-মন্মথ রায়। পৃ. ২১-২৮

* নলিনীকিশোর গুহ

সূর্যকুমার সেন—নির্বাণানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন।
রাধিকা অধিকারী—স্বামী সুন্দরানন্দ—উদ্বোধন সম্পাদক।
শান্তি মুখার্জি—দীনানন্দ।
যতীন বন্দ্যোপাধ্যায়—নিরালম্ব স্বামী।
শিশির গুহরায়—
প্রিয়নাথ দাশগুপ্ত—আত্মপ্রকাশানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন।
সতীশ দাশগুপ্ত—স্বামী সত্যানন্দ।
প্রফুল্লকুমার সেন—সত্যানন্দ পুরী।
নগেন্দ্রনাথ সরকার—সহজানন্দ—রামকৃষ্ণ মিশন।
আকালু (ময়মনসিং)—নিবৃত্তিনাথ-গম্ভীরনাথের আশ্রম।
দীনেশ—নিখিলানন্দ।
সতীশ মুখার্জি—স্বামী প্রজ্ঞানন্দ।
দেবব্রত বসু—প্রজ্ঞানন্দ।
নরেন সেন—নরেন মহারাজ—রামকৃষ্ণ মিশন।
পরেশ লাহিড়ি—স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি—ভোলাগিরি আশ্রমের প্রধান মহান্ত।



উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের মুক্তি

আজি এই মহাদুর্দিনে বাংলার আবার একটি উজ্জ্বল স্বর্গীয় জ্যোতিষ্ক সহসা দীপ্তিহীন হইল। স্বল্পকাল হইল, বিশারদ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। সে শোক শমিত না হইতেই উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব এই পথের পথিক হইলেন। যাহা গেল, তাহা বহু মূল্যবান; ক্ষতিপূরণের আশা অল্প।

তেজস্বী, কর্মবীর, 'সন্ধ্যা'র সর্বস্ব, নব ভাবের পুরোহিত উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব রবিবার ১০ কার্তিক পূর্বাহ্নে নয় ঘটিকার সময় ইহলীলা সম্বরণ করিয়াছেন।

মৃত্যুর পূর্বদিনে উপাধ্যায় "রোগ শুষ্ক নয়নযুগল অপূর্ব দীপ্তিময় করিয়া" তাঁহার কোনও বন্ধুকে বলিয়াছিলেন,—"আমি ফিরিঙ্গির জেলে গিয়া কয়েদির মত খাটিব না। চিরজীবন একভাবে কাটাইয়াছি। আজ আইনের দোহাই দিয়া আমাকে জেলে রাখিবে, আর আমি বেগার খাটিব? আমি ফিরিঙ্গির জেলে যাইব না। আমার ডাক আসিয়াছে।" পরদিন প্রত্যুষে তাহাই হইল। তিনি যেন ভীষ্মের মত স্বেচ্ছায় মৃত্যুদেবতাকে বরণ করিয়া লইলেন! তাই 'সন্ধ্যা'র লেখক লিখিয়াছেন, —'ইহাই সশরীরে স্বর্গারোহণ,—ইহাই তেজস্বীর ইচ্ছামৃত্যু,—ইহাই কর্মবীরের অবসান।" আজ বঙ্গবাসী মর্মে মর্মে সেই মহাপ্রাণ সাধকের অভাব অনুভব করিতে পারিয়াছে, তাই হাহাকার! আমরা কিন্তু দুর্বল হৃদয়ে আজ তাঁহার জন্য শোক করিব না। তাঁহাকে যে ফিরিঙ্গির কারাগারে দেখিতে হইল না—তাহাই আমাদের সান্ত্বনা। তাঁহাকে হারাইয়াছি বটে, কিন্তু তাঁহার মন্ত্র যাহা বাঙালির কর্ণে কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে তাহা কে ভুলিবে? তিনি বাঙালির প্রাণে স্বীয় প্রাণরশ্মির যে উজ্জ্বল কণা বিকীর্ণ করিয়া গিয়াছেন—তাহা নির্বাপিত করে কাহার সাধ্য! তবে দুঃখ কেন? ফিরিঙ্গির কারাগার—তাহাই মৃত্যু। এও মৃত্যু নয়, এ যে জীবন। তাই বলিতেছি, এস বঙ্গবাসী! আনন্দাশ্রু ধারায় শোকের চিতা নির্বাপিত করি। আর প্রতি হৃদয়ে সেই মহাপুরুষের আদর্শ প্রতিজ্ঞা করি। তাহা হইলেই স্বাধীন আত্মার তৃপ্তিসাধন হইবে। আর তাহাই প্রকৃত তর্পণ।*

* অর্চনা ১৩১৪ কার্তিক

●

স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ

আমরা গভীর শোক-সন্তপ্ত চিত্তে প্রকাশ করিতেছি যে, বিগত ২০ আষাঢ় জাপান হইতে প্রত্যাবর্তনকালীন হংকং ও সিঙ্গাপুরের মধ্যে প্রশান্ত মহাসাগর বক্ষে, বঙ্গমাতার কৃতীপুত্র প্রসিদ্ধ বাগ্মী ও স্বদেশসেবক হিতবাদী সম্পাদক পণ্ডিতপ্রবর কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহোদয় ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া দিব্যধামে গমন করিয়াছেন।

তিনি দুই বৎসরকাল রোগে ভুগিতেছিলেন এবং চিকিৎসকের পরামর্শে বায়ুপরিবর্তনের নিমিত্ত জাপানে গমন করেন। কিন্তু আর তাঁহাকে দেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল না! মৃত্যুর পূর্বদিবসেও জন্মভূমির উদ্দেশে কাব্যবিশারদ মহাশয় এই কবিতাটি লিখিতেছিলেন—

"এই কি জীবন শেষ? জীবন-রঞ্জিনি!
কোথা প্রিয় জন্মভূমি?
কোথা আমি? কোথা তুমি?
পড়িল কি যবনিকা সহসা এখনি?
উচ্চ আশা উপদেশ,
সকলেরি এই শেষ?
শীর্ণ ক্লিষ্ট চিন্তাকুল রোগীর শয্যায়
সমুদ্রে বাষ্পীয় পোতে-বারিচর প্রায়।
তোমার মহিমা গান, ওমা বঙ্গভূমি!
লাঞ্ছিত তোমার নাম,
দেখে তবু বলিলাম,
এ দীর্ঘ জীবনবৃথা—দেখিবে ত তুমি!
এ দুঃখ রহিল মনে,
তোমার সন্তানগণে,
না দেখিয়া সমাদৃত,—শমন সদনে
যেতে হলো—মন সাধ রহিল না মনে!"

('হিতবাদী' হইতে উদ্ধৃত)

যিনি মাতৃসেবায় আপনাকে পূর্ণরূপে নিয়োজিত করিয়াছিলেন—যিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বদেশের কথা ভাবিয়াছিলেন, সেই মাতৃভক্ত আত্মীয়স্বজন বিরহিত হইয়া, সুদূর প্রশান্ত মহাসাগরের বক্ষে জগতের কাছে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার নশ্বর দেহখানিও মহাসাগরের অতলতলে নিমজ্জিত হইল, মাতৃকোলে—মাতৃভূমিতে স্থান পাইল না, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়!

বিশারদ মহাশয় একজন উপযুক্ত সম্পাদক ছিলেন। তাঁহারই পরিচালনে "হিতবাদী" বঙ্গদেশের সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাহার সুতীক্ষ্ণ বিরূপবাদ, কঠোর সমালোচনা ও তীব্রভাষা উন্মার্গগামী ও কর্তব্য ভ্রষ্ট ব্যক্তির চৈতন্য সম্পাদন করিতে বড়ই তৎপর ছিল। তাঁহার নির্ভীকতা, স্পষ্টবাদিতা ও তেজস্বিতা সর্বথা প্রশংসাযোগ্য। দেশের কল্যাণকর সকল প্রকার কার্যেই বিশারদকে অগ্রণী হইতে দেখা যাইত। বিশারদ মহাশয়ের পরলোক গমনে ভারতের যে ক্ষতি হইল, তাহা সহজে পূর্ণ হইবার নহে।

"হিতবাদী" তাঁহার প্রদর্শিত প্রথাবলম্বনে পরিচালিত হইয়া তাঁহার স্মৃতি ও কীর্তি চিরকাল

অটুট রাখুক—তাঁহার পুত্রগণ পিতৃআদর্শ অবলম্বনে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হউন--ইহাই আমাদের ঐকান্তিক ইচ্ছা।

কৃপাময় জগদীশ্বরের রাজত্বে তাঁহার মুক্ত আত্মা চির শান্তিতে বিরাজমান থাকুক, ভগবান, তাঁহার শোকসন্তপ্ত পরিবার বর্গকে শান্তিবারি প্রদান করুন, আমরা ইহাই প্রার্থনা করি।*

●

বঙ্গভঙ্গ : ফরিদপুরে প্রতিক্রিয়া

... গবর্নমেন্টের যে বিভাগ-নীতি এদেশের উন্নতির নব-যুগ (?) আনয়ন করিয়াছে, সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে, আমরা কখনও সেই বিভাগনীতির পোষকতা করিব না। এক ভাষা, এক ধর্ম, এক জাতি, এক চরিত্র, এক নীতি, এক দেশ এবং এক সমাজ—আমরা ইহাই চাই। একতাই আমাদের লক্ষ্য। একতা সাধনের পথ—কার্যকরী বিভাগ। কর্মব্রত ধরিয়া আমরা একতার রাজ্যে চলিয়া যাইব। আমাদের লক্ষ্য একতামূলক "স্বরাজ"। "একতা" ভিন্ন স্বরাজের আর কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা নাই। আমাদের রাজা "সমবেত শক্তি" এবং দুর্ধর্ষ "জাতীয় একতা"।

তাহারা আমাদিগকে ছলেবলে কৌশলে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিতে চাহেন। "Utkal for the Oriyas, Behar for the Beharis, Assam for the Aasamese."—এই মোহকর কথা প্রচার করিয়া ও ভাষাবিভাগ করিয়া তাহারা কত অনিষ্ট করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গকে বিভাগ করিয়া কত অনিষ্টের সূত্রপাত করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যের মধ্যে বিবাদ তুলিয়া কত অনাত্মীয়তা জাগাইয়া তুলিবার আয়োজন করিতেছেন। সে সব চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে;—এখন হিন্দু ও মুসলমানকে এবং নিম্নশ্রেণি ও উচ্চশ্রেণিকে অনাত্মীয়তার পথে চালিত করিবার আয়োজন করিতেছেন। কেবল তাহা নয় আমাদের স্বদেশের সকল হিতৈষীকে আবার দুই দলে বিভক্ত করিবার চেষ্টায় আছেন। আমরা না বুঝিয়া কতরূপে সম্মোহিত হই। এই অনাত্মীয়তা রূপ মহাশত্রু ভিন্ন আমাদের "স্বরাজ" সাধনের অন্তরায় নাই। সত্যই বলিতেছি, ইংরাজ আমাদের অন্তরায় নয়,—অন্তরায় কেবল "অনাত্মীয়তা"। আমরা এই মহাশত্রুকে বিনাশ করিবার জন্য সর্বপ্রযত্নে, আসুন চেষ্টায় নিযুক্ত হই।

এই ফরিদপুরে নমঃশূদ্রের সংখ্যা ৩২৪১.৩৫। ইহাদিগকে বিপথে চালিত করিবার যে আয়োজন হইতেছে, সর্বপ্রযত্নে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে। তাহারা আমাদের ভাই--তাহাদিগকে আমাদিগের সহিত সংযুক্ত না করিলে কিছুতেই আমাদের মঙ্গল নাই। আমাদের দেশে কেরামত আলীর দল দুর্ধর্ষ—তাহাদিগকে আমাদের সহিত সংযুক্ত রাখিতে হইবে। দুর্ভিক্ষের সময় দেখিয়াছি,—অগণ্য হিন্দুমুসলমান ভাই ভাই হইয়া গিয়াছি। আর এই স্বদেশের সর্বপ্রকার উন্নতিতে এক হইতে পারিব না? আমরা দেখাইব, অন্যদেশে যাহা অসম্ভব এই ফরিদপুরে তাহা সম্ভব। এখানে আমরা "ভাই ভাই এক ঠাই" হইয়া হাড়ে হাড়ে মিলিত হইয়া যাইব। পরাধীন জাতির রাজনীতি আর কি? আমাদের একমাত্র নীতি এই—"আমরা সকল ভাই এক ঠাই।" ভারতবর্ষে যে দলাদলি চলিতেছে আমরা সামান্য ফরিদপুরবাসী, সে দলাদলি হইতে সর্বপ্রযত্নে দূরে থাকিয়া কেবল একতা সাধন করিতে থাকিব। মনে জপমালার ন্যায় জপিব—পূর্ববর্তী নেতাগণ যেমন আমাদের, আধুনিক নেতাগণও তেমনি আমাদের। আমাদের সুরেন্দ্রনাথ, আমাদের কৃষ্ণকুমার, আমাদের অশ্বিনীকুমার, আমাদের বিপিনচন্দ্র, আমাদের তিলক, আমাদের লাজপত রায়—সকলেই আমাদের নেতা, কর্মবীর, সহায় এবং আশ্রয়। পরিত্যাগের শাস্ত্র, পর-তন্ত্র আমরা সর্বদা বর্জন করিব। আমাদের ফরিদপুরে জেলাসমিতির মূলমন্ত্র হউক—মহাত্মা বুথের "Love"। বাস্তবিক

* অর্চনা ১৩১৪ শ্রাবণ

এক অঙ্গের কোন্ প্রত্যঙ্গকে বর্জন করা যায়? সকলেরই আপন আপন কার্য সাধনের জন্য অত্যাবশ্যক। তোমার কাজ আমার দ্বারা হয় না, আমার কাজও তোমার দ্বারা হয় না। বিধাতার বৈচিত্র্যের এক মহাশিক্ষা এই—এ জগতের সকলেরই প্রয়োজন আছে। ধনী দরিদ্র, মূর্খ জ্ঞানী, সকলেরই প্রয়োজন আছে। রাজা রাজকার্য সাধনের জন্য বড়, প্রজা কৃষিকার্য সাধনের জন্য বড়;—আপন আপন বিশেষত্ব সকলেই বড়,—স্ব স্ব প্রধান। একজনকে পরিত্যাগ করিলেও বিধাতার বিধানকে অস্বীকার করা হয়। বড় ছোট আমরা সকলেই ভাই ভাই;—এক মায়ের সন্তান। ভ্রাতৃত্ব সাধনই মাতৃত্ব সাধনের মূল মন্ত্র। "বন্দেমাতরম মন্ত্র" ততদিন আমাদের রক্তমাংসের সহিত জড়িত হইবে না, যতদিন আমরা ভাই ভাই পর পর থাকিব। অতএব সকলে ভ্রাতৃত্ব সাধনে অগ্রে বদ্ধপরিকর হউন। মাতা ও সন্তান যখন একস্থানে মিলিত—মাতাপুত্র যখন একাকার—তখনই জাতীয় একতা, অথবা "স্বরাজ" প্রতিষ্ঠিত। অন্য যে স্বরাজের কথা, তাহা এ যুগের অযোগ্য জল্পনা এবং কল্পনামাত্র।

আমি বলিয়াছি, একতা সাধনের উপায়-কর্তব্য সাধন। কার্যক্ষেত্র ভিন্ন একতা-সাধনের দ্বিতীয় উপায় নাই। প্রকৃত সেবক যে সে-ই অন্য সেবকের মহত্ত্ব বুঝে। সেবাক্ষেত্রে বড় ছোট, জ্ঞানী মূর্খ, হিন্দু মুসলমান, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল ভেদ নাই। সেতুবন্ধনের সময় অতি সামান্য কাঠবিড়ালের সাহায্যও উপেক্ষিত হয় নাই। বাড়িতে আগুন লাগিলে সকলে নিজ নিজ বিশেষত্ব ভুলিয়া প্রাণপণে অগ্নি নির্বাণ করিতে ধাবিত হয়। যে দাবাগ্নি এই দেশে প্রজ্বলিত হইয়াছে, ইহা নির্বাপিত না হইলে অচিরে দেশ মহাভস্মে পরিণত হইবে। এখন যাহার যে শক্তি থাকে এই কাজে তাহা নিয়োগ করিতে হইবে। দেশ পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় ভাই, তুমি ভেদাভেদের তর্ক তুলিয়া তাহা ভুলিয়া যাইতেছ? ছি, আর সময় নাই—সতর্ক হও। আপন কাজে মনোনিবেশ কর। কত কত ভাই জেলে নিগৃহীত হইতেছেন।* স্মরণ কর, কত কত ভাই স্বদেশের জন্য কত নির্যাতন মস্তক পাতিয়া লইতেছেন; স্মরণ কর। কত ভাই স্বদেশের জন্য প্রাণ দিয়াছেন স্মরণ কর। স্মরণ কর—কাব্যবিশারদের কথা, উপাধ্যায়ের কথা, রমাকান্তের কথা, সর্বোপরি আনন্দমোহনের কথা। এ হেন শোকের দিনেও আমরা প্রেম-মন্ত্র জপ করিতে শিখিব না? এহেন দুর্দিনেও বৃথা আমোদে প্রমত্ত হইব?

১. কটেল (Cattell) নামক এক সাহেব অনন্তমোহন দাস নামক মাদারিপুর ইংরেজি স্কুলের ৫ম শ্রেণির ছাত্রের নামে নালিশ করে যে তাহাকে মারিয়াছে, ১৪৭ ধারা অনুসারে তাহার ৬ সপ্তাহের কঠিন পরিশ্রম সহিত জেল হয়। সাং চরমুগরিয়া, মাদারিপুর।

২. এক মুসলমান—রাজকুমার দে এবং কুমুদিনীকান্ত দে নামক ২টি ভদ্রলোকের নামে বিলাতি কাপড় কাড়িয়া নেওয়া ও তাহা পোড়ানোর নালিশ করে। ৩৭৯ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত রাজকুমার দের ১ মাস ও কুমুদিনীকান্ত দের ১৫ দিনের সপরিশ্রম জেলের হুকুম হয়। আদালতে হুকুম বহাল থাকে।

উভয়ের বাড়ি—সাজনপুর। থানা—পালং।

৩. ব্রজবাসী কাপুড়িয়া নামক এক কাপড় বিক্রেতা শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র মুখটির নামে নালিশ করে যে, সে তাহার বিলাতি কাপড় লইয়া গিয়াছে। ৩৭৯ ধারার বিধান অনুযায়ী ৩ মাস সপরিশ্রম জেল ও ৫০ টাকা জরিমানা হয়। আপিলে জরিমানা বহাল ও যে ৪ দিন জেল খাটিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট বলিয়া খালাস পায়।

* ফরিদপুরে যাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছেন, শুধু তাহাদের নাম এস্থলে তুলিয়া দিলাম।

৪. শ্রীযুক্ত যদুনাথ পাল, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটি, শ্রীযুক্ত মুনসি মজাফর হোসেন বিলাতি কাপড় ও বিলাতি লবণ বিক্রয় বাধা দেওয়ায় ১০৭ ধারার বিধান মতে শ্রীযুক্ত যদুনাথের ৫০০ টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকা, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাবুর ৩০০ টাকার জামিন ৩০০ টাকার মুচলিকা, মুনসি মজাফর হোসেনের ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকা হয়। প্রত্যেকেরই জামিন ও মুচলিকা ৬ মাসের জন্য হয়। সকলেরই নিবাস পালং।

৫. শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র মুখটির উক্ত জামিনের ৬ মাস অতীত হওয়া মাত্র পুনরায় তাহাকে বিলাতি লবণ বিক্রয় হইতে বাধা দেওয়ার অপরাধে ১০৭ ধারা অনুযায়ী পুলিশ চালান দেয়—৫০০ টাকার জামিন ও ৫০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। (১ বৎসরের জন্য)।

ঐ মোকর্দমায় মহেন্দ্রবাবুর সহিত মৈজদ্দিন নামক পালংহাটের ইজারদারকেও চালান দেওয়া হয়। তাহারও ২০০ টাকার জামিন ও ২০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। সকলের নিবাস পালং।

৬. শ্রীযুক্ত যদুনাথ দে ও শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র দে হাটুরিয়ার বাজারে বিলাতি লবণ বিক্রয় করিতে বাধা দেওয়ায় ১০৭ ধারা মতে প্রত্যেকের ১০০ টাকার জামিন ও ১০০ টাকার মুচলিকার আদেশ হইয়াছে। নিবাস পাঁচকাটি পো: হাটুরিয়া।

৭. বাজিতপুর স্বদেশি মোকদ্দমা

উমেশচন্দ্র বাগচি নামক এক ব্যক্তির নালিশে—

১. শ্রীযুক্ত রসিকচন্দ্র বাগচি (বি.এ. পর্যন্ত পড়িয়াছেন)—বাজিতপুর ইংরেজি স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্টের ৩ মাস সপরিশ্রম কারাগার, ১০০ টাকা জরিমানা এবং উক্ত স্কুলের ১ম শ্রেণির অপর ৩টি ছাত্র।

২. শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ ঘোষ ২ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা।

৩. শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চৌধুরী ১ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা।

৪. শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২ মাস সপরিশ্রম ও ৫০ টাকা জরিমানা।

অভিযোগ ঃ কলেজ হইতে শ্রীযুক্ত রসিকবাবুর আদেশে উমেশ বাগচির দোকান হইতে বিলাতি চিনির প্রস্তুতীয় সোয়া পাঁচসের বাতাসা মূল্য অনুমান ১ টাকা, জোর করিয়া লইয়া গিয়াছে এবং তাহাকে মারিয়াছে।

১৪৭ ও ৩৭৯ ধারা মতে সাজা হয়। জরিমানার টাকা হইতে ১ টাকার বাতাসা নষ্ট করার জন্য বাদীকে ৩০ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আদেশ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত রসিকবাবু আজ ৩/৪ দিন হয় জেল হইতে মুক্ত হইয়াছেন—বালকগণ পূর্বেই মুক্ত হইয়াছে। *



বঙ্গভঙ্গ ঃ মালদহে প্রতিক্রিয়া

মালদার মানুষের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের স্ফুরণ ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গের সময়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাদেশ দুভাগে বিভক্ত করেন এবং Eastern Bengal and Asssam নামে একটি নতুন প্রদেশ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেন। বলা হয় যে নতুন প্রদেশের

* নব্যভারত ১৩১৪ চৈত্র ফরিদপুর জেলা সমিতির প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণের অংশ—৬ চৈত্র, বৃহস্পতিবার ১৩১৪

অন্তর্ভুক্ত হবে আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, ঢাকা ও মালদা সহ রাজসাহী বিভাগের যাবতীয় জেলা। এই বিভাজনের সমর্থনে কার্জনের বক্তব্য ছিল—বাংলাদেশকে কিঞ্চিৎ ভারমুক্ত করা এবং আসামের উন্নয়ন সাধন। কিন্তু তার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে দুর্বল করার জন্য হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মানুষকে পৃথক করে রাখা। বাংলার মানুষ কার্জনের এই অশুভ উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলন গড়ে তুললো। এই আন্দোলন মালদাকেও স্পর্শ করেছিল।

১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে Sir Andrew Fraser (তৎকালীন লেফটেন্যান্ট গভর্নর) মালদায় এসে বঙ্গভঙ্গের সুফল ব্যাখ্যা করে একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশেষ লাভ হয় নি। সেই সময়েই মালদার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মালদার ছাত্রদের কোনরকম সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ না দেওয়ার জন্য একটি পরোয়ানা জারি করেছিলেন। তা সত্ত্বেও জেলার যুবছাত্ররা বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগদান করেছিল। সরকারি নথিপত্রে নুর বক্স নামে একজনের কথা জানা যায়, যিনি অনেকগুলো বঙ্গভঙ্গ বিরোধী সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। বিপিন পাল প্রমুখ নেতারা আন্দোলনের যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিলেন সেগুলোকে সমর্থন করার জন্য এ ধরনের সভার আয়োজন করা হতো। অধ্যাপক সুমিত সরকারের "The Swadeshi Movement in Bengal" নামে বই থেকে জানা যায় যে এই সময়ে মালদা জেলায় স্বদেশিদের উদ্যোগে একটি জাতীয় স্কুল তৈরি হয়েছিল। এই স্কুলে সরাসরি রাজনীতি শিক্ষা দেওয়া হতো। ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে অর্থনীতিবিদ বিনয় সরকার, মালদা পৌরসভার তৎকালীন সভাপতি বিপিনবিহারী ঘোষ এবং নুর বক্সের প্রচেষ্টায় মালদা জাতীয় শিক্ষাসমিতি গড়ে উঠেছিল। এই জাতীয় শিক্ষা সমিতির অধীনে গড়ে উঠেছিল মালদা জাতীয় আদর্শ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হতো। এর ছাত্রসংখ্যা ছিল ৯২। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে জেলায় আটটি জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে তিনটি ছিল প্রাথমিক। আটটি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৭৪৮ জন। মালদা জেলা জাতীয় শিক্ষাসমিতি কোলকাতার শিক্ষাসমিতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ না করে, এক নতুন ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছিল। মালদার শিক্ষাসমিতির উদ্যোক্তারা ছাত্রদের দিয়ে জেলার পুরনো গাঁথা, লোকসঙ্গীত প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়ে তাদের জাতীয়তাবাদী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন।

এই সময়েই মালদা জেলায় অনুশীলন সমিতি ও ব্রতী সমিতির শাখা খোলা হয়েছিল। অনুশীলন সমিতির মালদা জেলা শাখা তৈরির ব্যাপারে উদ্যোগ নিয়েছিলেন মহেন্দ্র দে, দক্ষিণা লাহিড়ী এবং কংসগোপাল আগরওয়ালা। স্বদেশ পাকড়াশী নামে এক ব্যক্তি রাজাবাজার বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন। পুলিশের হাত থেকে পালিয়ে তিনি মালদা জেলায় আশ্রয় নেন ও সেখানে ব্রিটিশ বিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত হন। মালদা জাতীয় বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র এই স্বদেশ পাকড়াশীর অনুপ্রেরণায় সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। আলিপুর বোমা মামলায় ধরা পড়েছিলেন মালদার এক ছাত্র কৃষ্ণজীবন সান্যাল। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে মালদা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক নবীনচন্দ্র বসু সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতেন।"*

* মালদা –সিদ্ধার্থ গুহরায়। পৃ: ৫৭-৫৮

পরিশিষ্ট-১৫

সরকারি প্রতিবেদন

THE

ADMINISTRATION OF BENGAL

UNDER

SIR ANDREW FRASER, K. C. S. I.

1903 - 1908*

SIR ANDREW HENDERSON LEITH FRASER, K. C. S. I., was appointed to the Indian Civil Service after the examination of 1869, and on arriving in India in 1871, was posted to the Central Provinces. After holding various subordinate offices, he was appointed Commissioner of Excise in 1881, Director of Agriculture in 1882, and Secretary to the Chief Commissioner in 1890. In 1891 he was made a Commissioner ; and in 1893-94 he served as a member of the Hems Drugs Commission. The value of his services was recognized by the bestowal of the decoration of a companion of the Order of the Star of India in 1897. In 1898 he was appointed to officiate as Secretary to the Government of India in the Home Department ; and next year he returned to the Central Provinces as Chief Commissioner, an office which he held till 1902, when he was appointed President of the Police Commission. The Lieutenant-Governor of Bengal at that time was Sir John Woodburn, K.C. S. I.; and on his death in November 1902 Sir Andrew Fraser, who was created a Knight Commander of the Star of India in January 1903, was appointed to be Lieutenant-Governor. Mr. (now Sir James) Bourdillon was appointed to officiate, until the work of the Police Commissioner was completed ; and Sir Andrew assumed charge of the office on the 2nd November 1903. In 1906 he went to England on six months' leave, when Mr. (now Sir Lancelot) Hare was appointed to officiate. Consequent on the resignation by Sir Bamfylde Fuller of the Lieutenant-Governorship of Eastern Bengal and Assam, Mr. Hare was appointed to that office, and Mr. F. A. Slacke, C.S.I., officiated as Lieutenant-Governor of Bengal till the return of Sir Andrew Fraser in October 1906.

When Sir Andrew Fraser became Lieutenant-Governor, the Province of Bengal extended over an area of 196,408 square miles and contained a population of 78,493,410 souls : an area but little less than that of France or of the German Empire, and a population exceeding that of the United States. It had been felt that the administration of this vast area and teeming population was beyond the powers of a single individual. This statement does not mean merely that no Lieutenant-Governor could cope satisfactorily with the work of this enormous Province. It means much more than that. It means that no head of a Department

* The Bengal Secretariat Book Depot, Calcutta. 1908

could grapple with the mass of business with which he had to deal or become acquainted with the area of his charge. There was no department that was not overburdened, and that did not show in some part of the Province the natural results of attempting too much.

In 1853, before the creation of a Lieutenant-Governorship, Lord Dalhousie had expressed his conviction that the Government of Bengal alone imposed upon the Governor-General "a burden which in its present mass is more than mortal man can fitly bear"; and twenty years later Sir George Campbell, then Lieutenant-Governor of Bengal, wrote :—"It is totally impossible that any man can properly perform single-handed the work of this great Government." Since 1873, however, the population of the Province had increased by over 26 millions ; the increase of population had been accompanied by a remarkable development of the resources of the country ; while the spread of English education and the wider diffusion of the native press had tended to demand more precise methods of administration, and in every way to place a heavier strain upon the head of the Government and upon all ranks of his subordinates. It was felt that the burden was excessive, and there was accumulating evidence of a consequent deterioration in the standards of government, notably in portions of Eastern Bengal. The Government of India accordingly came to the conclusion that the relief of the Bengal Government was an administative necessity of the first order, and that relief could only be effected by reducing the territory under the Lieutenant-Governor and not by organic changes in the form of Government. At the same time, they were impressed with the importance of making Assam a self-contained and independent administration with a service of its own, and of providing for its future commercial and industrial expansion.

Accodingly, in December 1903, they formulated proposals for the reconstitution of the Province, of which the main features were :—(1) The transfer from Bengal to Assam of the Chitagong Division, the districts of Dacca and Mymensingh, and the State of Hill Tippera; (2) the transfer from Bengal to the Central Provinces of the greater part of Chota Nagpur; (3) the transfer to Bengal from the Central Provinces of the Sambalpur district and of five Feudatory States, viz, Patna, Bamra, Sonpur, Kalahandi and Rairakhol; and (4) the transfer to Bengal from Madras of the Ganjam district and the Ganjam and Vizagapatam Agency Tracts. The object of the first two of these four proposals was to reduce the area of Bengal; and the object of the last two was to bring into the Orissa Division fragments of the Uriya country too small to be governed properly in the Provinces to which they belonged. It soon became clear that these proposals,so far as they affected Eastern Bengal, were not large enough, and in February 1904 the Viceroy, Lord Curzon, in a series of speeches delivered in Eastern Bengal, foreshadowed the willingness of Government to consider a wider scheme, involving the creation of a Lieutenant-Governorship, with a Legislative Council and an independent revenue authority, and the transfer of as much territory as would be required to justify this larger project. Sir Andrew Fraser had held several large conferences with representatives of all sections of the community, so as to ascertain public opinion as to the principal features required in a sound scheme of redistribution ; and Lord Curzon's tour, made with the same object, resulted in the wider scheme. The scheme emanated from public discussion and public opinion rather than from the Government itself.

In considering these proposals, Sir Andrew Fraser kept two considerations steadily in view. He agreed that, under the altered circumstances of the country, the territory under his control was too large for a Local Government to administer properly, and he held that the primary object to be aimed at was to improve administration in Bengal by reducing its aea. The next object, he urged, was to select the districts to be transferred in such a manner as to secure the best interests of the people and efficiency of administration. Holding these views, he was unable to accept the proposals of the Government of India in their entirety. He was opposed to the transfer of Ganjam and the Agency Tracts from Madras, because the Uriya element in these tracts was comparatively insignificant, because strong ties of interest and administrative expediency bound them to Madras, and because he was assured that their transfer was not only unnecessary, but would throw an additional burden on the already overburdened administration of Bengal—a burden that would be all the greater because of their peculiar linguistic and racial conditions. He was also opposed to the transfer of any of the districts of Chota Nagpur to the Central Provinces. He pointed out that they were practically inaccessible from the Central Provinces, whereas they were already connected by railway with Bengal and Bihar ; that it was desirable that the Bengal Government should carry out and complete the measures already initiated by it for improving the administration in this part of the country ; and that the mining and industrial interests involved demanded their retention as part of Bengal. This last consideration was also urged by the Bengal Chamber of Commerce.

At the same time, Sir Andrew was of opinion that it was desirable for the five Hindi-speaking Feudatory States of Chota Nagpur, viz., Jashpur, Sirguja, Udaipur, Korea and Changbhakar, to be transferred to Chhattisgarh in the Central Provinces, and for the five Uriya-speaking States of the Central Provinces to be transferred to Orissa in Bengal. This exchange he advocated on grounds of administrative convenience, as securing the consolidation of the Feudatory States into two large groups, each speaking one language : the Hindi group to belong to the Central Provinces and the Uriya group to Bengal. His Honour also agreed to the proposal that Sambalpur—a district of which he had special knowledge — should be transferred to Bengal. The administration of that district had long presented grave difficulties, owing to its being the only part of the Central Provinces in which Uriya was spoken. In 1901, when Chief Commissioner of the Central Provinces, he had recommended its transfer to the Orissa Division; and the same reasons now actuated him to urge this measure on the Government of India.

As regards Eastern Bengal, Sir Andrew Fraser held that the main objects to be pursued were to secure both substantial and permanent relief to the overburdened administration of Bengal and to arrange for the transfer of a homogeneous area. The original proposal of the Government of India, he pointed out, did not go far enough. It would be better to constitute a new Province, comprising Assam, the Chittagong and Dacca Divisions, and the districts of Pabna, Bogra and Rangpur. The new Province should be given both a Legislative council and a Board of revenue, and should have a complete administration of its own. It should be of sufficient size and importance to justify such an organization ; and this was all the more necessary because the districts of Eastern Bengal had suffered from

neglect in the past, and had been under-officered to such an extent, that it was a matter for wonder, not that the administration had failed to be as efficient as it should be, but that it had been as efficient as it was.

Subsequently, the Government of India suggested that the main object of the scheme of reconstruction would be more certainly attained, and the scheme itself placed on a more permanent footing, if the area transferred were to be enlarged by adding to it the districts of Rajshahi, Dinajpur, Malda and the State of Cooch Behar. Sir Andrew Fraser discussed these enlarged proposals fully with the members of the Board of Revenue and the most senior officers in the Province; and, with the exception of one officer, who was inclined to advocate the retention in Bengal of the district of Jalpaiguri, there was complete unanimity in accepting them. His Honour himself was also in favour of the enlarged scheme. He had already recommened that the well-defined and clearly recognized area of Eastern Bengal should be handed over, and the addition of the closely connected area of Northern Bengal appeared equally desirable. Its effect would be to bring within the new Province all the districts in which the Muhammadans were in a majority. Their power and influence would thus enable them much more easily to attract attention to their necessities and their rights. Not only was the population of the transferred area homogeneous, but the transfer of such a large area would also tend to mitigate the feeling of severance and to reconcile the people to the change. On these grounds, Sir Andrew Fraser supported the proposals of the Government of India.

Eventually, in July 1905, the Government of India announced the decision arrived at, viz., that the Divisions of Dacca, Chittagong and Rajshahi (except Darjeeling), the district of Malda and the State of Hill Tippera should be transferred to the newly-formed Province of Eastern Bengal and Assam, the area under the jurisdiction of the Bengal Government being thus reduced by 50,000 square miles and its population by 25,000,000. The five Hindi-speaking Native States of Jashpur, Sirguja, Udaipur, Korea and Changbhakar were at the same time to be transferred to the Central Provinces ; and the district of Sambalpur (with the exception of two Hindi-speaking zamindaris) and the Uriya speaking States of Patna, Kalahandi, Sonpur, Bamra and Rairakhol were to be attached to Bengal. This decision was carried into effect on the 16th October 1905, the result of these transfers of territory being that the Province of Bengal comprised an area of 1,48,592 square miles with a population of 54,662,529 persons.

After the announcement of the first proposals of the Government of India, His Honour soon found that the leaders of Bengali opinion had formed the mistaken impression that the transferred districts were to lose their own identity by being merged in Assam, which was represented as a backward tract—a land of hobgoblins—and that they would lose the benefit of the laws and privileges they had hitherto enjoyed. Sir Andrew Fraser promptly reassured those who held this view, and obtained an authoritative assurance from the Government of India that the transfer would not affect the laws in force. This view, however, formed the basis of the first agitation ; and those interested in fomenting that agitation did their best, by exaggerated reiterations of it, to affect the popular mind Subsequently, when it was made clear that the real design was to create a new Province in which Eastern Bengal would have an influential and prominent part,

the attitude of the public was greatly altered. Many supported the enlarged scheme, and there were many others who would have given it their support openly, if they had not been pledged to the opposition already organized. Strong pressure was brought to bear on those who favoured the scheme. or were lukewarm, to join in the opposition ; while those who had given it their outspoken support were so treated that many who shared their views kept silence. This opposition was evoked and organized by certain influential Bengali Hindus, especially members of the legal profession, who were influenced, in part at least, by the consideration that their personal interests were at stake. Most of them were not residents of the districts concerned, but had their headquarters and interests in Calcutta.

The common people took no interest in the proposed reconstitution of the Province until its opponents made strenuous efforts to enlist their sympathies. As regards the educated classes, there can be no doubt that the expanded proposal would have been accepted by many of those who opposed the original scheme, had it not been for the tactics of those were interested in keeping up the connection with Calcutta. This was no matter for wonder, considering the manner in which men of influence, who either publicly favoured, or even professed indifference to, the scheme, were attacked in the Press and subjected to annoyance in society. Several gentlemen of high position, while expressing to the Lieutenant-Governor in private their thorough acceptance of the scheme as likely to be most advantageous to the districts concerned, asked him to excuse their desire not to make their views public ; while the opinion of certain large landholders in Eastern Bengal in favour of the redistribution of districts only came to notice incidentally through a reference in a letter from the Bengal Chamber of Commerce. The whole agitation, in fact, showed clearly the tyranny of the professional wire-puller : the organization of a system under which a particular set of opinions expressed practically in the same words was sent out with a mandate from Calcutta to be echoed in the form of telegraphic protests and formal memorials from a number of different places in Bengal. In this movement the Muhammadans took no part, for they were convinced of the advantages of the creation of the new Province.

An account will be given later of the agitation which followed the announcement of that measure, and for which it was the occasion rather than the cause. It is referred to as the Partition of Bengal, that being a common and well-understood term for what was not a dismemberment of one Province, but rather the reconstruction of the two Provinces of Bengal and Assam by a readjustment of administrative boundaries and a duplication of administrative machinery.

Another important administrative change was the reconstitution of the Patna Division, which was sanctioned with the approval of its inhabitants. This measure affected a tract with nearly half the area of Eastern Bengal, while the population was over three-fifths of that of the transferred districts. In other words, the Patna Division had an area of 23,748 square miles and a popultion, according to the census of 1901, of over 15.5 million souls. It was almost co-extensive in area with Belgium and Holland combined, and it had more inhabitants than Spain and Portugal combined. It had long been recognized that this charge was an impossible one for a single Commissioner, and for many years past that officer, while remaining responsible for its administration, had been assisted by an Additional Commissioner. This arrangement, however, was not satisfactory, for the Commissioner could not hold in his hands all the threads of work and had not that complete control of the Division which is essential for efficient administration. The

Additional Commissioner was a colleague to whom certain branches of work were allotted; and the result was that, so far at least as those branches were concerned, the Commissioner himself lost grasp of his charge. He thus became unacquainted with work not only important in itself, but also most important from the light it might throw on the general administration of the different districts.

Sir Andew Fraser accordingly agreed with his predecessor that, while the work of the Division was too heavy for one man to cope with and two officers were necessary for its administration, that administration could not be effective under the system of dual control. The Division, he felt, would never be administered with real efficiency until each officer had his own charge to administer for himself. On these grounds His Honour was convinced that it was a matter of administrative necessity to divide the Patna Division into two charges. He proposed therefore to form the South Gangetic districts of Patna, Gaya and Shahabad into a Commissionership to be known as the Patna Division, while the districts of Saran, Champaran, Muzaffarpur and Darbhanga, north of the Ganges, would be formed into a separate Commissionership wih headquarters at Muzaffarpur, to be known as the Tirhut Division. The population of the northern portion is very much larger than that of the southern portion. On the other hand, as regards area, the two portions are not unequal; while the work of each of the three southern districts is individually heavier than that of any of the districts to the north, and the southern districts include the very important municipality of Patna. The result is that the work of the three southern districts is very nearly equal to that of the four northern districts.

Sir Andrew found that public opinion was also in favour of the reconstitution of the Division ; but, as the matter was an important one affecting the interests Bihar, it was decided to publish the scheme formally, to explain its purpose, and afford the people concerned an opportunity to criticize it and offer suggestions. The result showed that public feeling had been rightly interpreted ; for with only one dissentient voice the people of the Division apporved the scheme. The proposals of His Honour were accordingly sanctioned in June 1908.

Shortly after Sir Andrew Fraser assumed charge of his office, the Tibetan expedition took place. It was then decided, as a matter of political expediency, that the Political Officer of Sikkim should be subject to the Government of India in matters affecting Tibet, but should continue to be under the control of the Government of Bengal in matters concerning the internal administration of Sikkim and its relations with British India. Sir Andrew Fraser considered that this system of dual control was not altogether satisfactory. It was, in his opinion, desirable that the complete political charge of this frontier State should be transferred permanently to the Government of India, because, situated as Sikkim is on the borders of Tibet, Bhutan and Nepal, political questions connected with it are of more than provincial importance. These views were accepted by the Government of India, and the control of Sikkim was taken over by that Government with effect from 1st April 1906.

The area under the administration of the Lieutenant Governor, as constituted after this change, is 146,774 square miles with a population of 54,603,515. Altogether 115,819 squae miles, with a population of 50,772,067, are in British territory, and 29,955 square miles, with a population of 3,931,448, are comprised in Native States.

POLITICAL MOVEMENTS

The quinquennium during which Sir Andrew Fraser was Lieutenant-Governor of Bengal was a period of unrest and political agitation. There had long been much latent discontent among the educated classes in Bengal,* especially among those who had received their education in England or America, where they had become imbued with ideas of liberty and equality. The discontent had found expression in an organized but constitutional agitation, of which the main object was to secure for Indians a larger share in the government of the country. With this object the National Congress had been established some twenty years ago, but there was a growing feeling that that institution had failed to produce any substantial change in the system of administration. Some Bengalis, indeed, went further and set up complete self-government as their aim. They refused to admit that in having such an aspiration they were 'a people crying for the moon,' and they were induced to think that they had 'rulers mothering them with promises.' Unfortunately, too, the discontent of the educated classes had been to some extent aggravated by want of sympathy between them and the official classes, by thoughtless and inconsiderate behaviour of a few Europeans in their intercourse with them, and by the constant and gross exaggeration in certain papers of every incident that might be regarded as indicating of likely to cause ill-feeling.

When first established, the vernacular papers—and they were few—devoted but small space to the discussion of political questions or large administrative measures, and items of news and speculations on religious and social subjects constituted the major portion of their contents, Political questions received very meagre treatment : the writers offered their opinions with diffidence, and their tone was respectful. A change was soon noticeable; and as early as 1878 the then Lieutenant-Governor, Sir Ashley Eden, complained in no uncertain terms of the sedition and gross disloalty of some of the vernacular papers, and of their attempts to sow the seeds of disaffection to the British rule in the minds of ignorant people. "They habitually attack and misrepresent the Government in terms intended to weaken the authority of Government, and with a reckless disregard of truth and fact which would not be tolerated in any country in the world. The personal abuse, the falsehoods, the scurrility and the exaggerations which are applied to individual officers may well, as heretofore, be left to the ordinary action of the law courts, or be treated with the contempt they deserve. What I do recognize, and long have recognized, as a fact, is, that the licentiousness of the Press has, under false ideas of freedom and independence, been allowed to reach a stage which promptly calls, in the interests of the public at large, for the interference of the Legislature." To check the evil, the Vernacular Press Act, IX of 1878, was passed, its main object being to place newspapers published in the vernacular languages of India under better control, and to furnish the Government with more effective means than the existing law provided of punishing and repressing seditious writings which were calculated to produce disaffection towards the Government in the minds of

*The census statistics of 1901 show that in Bengal as then constituted i.e., the present Bengal and Eastern Bengal, $4^{1}/_{4}$ million persons or 55 percent of the population were literate, i.e., could read and with some language, while 89 males and 6 females out of every 10,000 of each sex could read and write English.

an ignorant population. In 1880 a Liberal Government came into power in England under Mr. Gladstone, who had denounced the. Act. It was therefoe repealed in 1882, but its repeal was generally attributed to the agitation which had been maintained.

For some time after the enactment of this Act, the tone of the Native Press improved, subjects of public interest being discussed in more temperate language; but when Sir Andrew Fraser assumed charge of the Province, its principal characteristics were the increasing prominence given to political and administrative questions, and a reckless, exaggerated and occasionally disloyal tone. Though good was sometimes done by bringing to light a case of oppression or abuse, or by giving indication of the trend of public opinion among the Indian educated community, the general attitude of a considerable section of the Press was merely one of hostility to Government and its measures. There were some notable exceptions; but in too many cases the motives of Government were misrepresented and its officers attacked, while the more virulent papers lost no opportunity of fostering racial hatred. They, represented that the law was not administered justly between Indians and Europeans, they denounced the latter as monopolizing the offices of State and draining the country of its wealth, and they drew imaginary pictures of the hardships and misery of the Indian people. These attacks were not without effect in stimulating discontent among the educated classes.

The vernacular paper also laid stress on the success of the Japanese in the Russo-Japanese war, and drew the moral that other Asiatics might have similar success in maintaining themselves against Europeans. Their insinuations were not lost on their readers, who began to feel the effervescence of the spirit of nationalization fermenting in Asia. Further, the disconent among the educated middle classes was aggravated by economic causes. For years past the *bhadralok*, as they are called in Bengal, have been hard hit by the steady rise in the price of food and other necessaries of life. Those having small fixed salaries have felt this most severely for they do not easily alter their traditional style of living or take up new and more lucrative methods of earning their livelihood. This state of things was attributed in some vague way to the system of Government and, by the disaffected, to the British exploiting the country.

In this connection, the readiness with which extravagant statements or wild rumours are accepted by a credulous people must be noted. Two instances of their proneness to believe such statements and rumours may be mentioned. The first was what was known as the "Head Scare," which occurred a few years ago. It was the result of a rumour that a sacrifice of human heads was required for the construction of a bridge near Howrah and that any one found in the streets after 9 p.m. would be carried away and have his head cut off. This wild rumour was believed in, and a number of natives employed in the mills near Howrah fled away to their homes. Some features of this panic are not without significance. The rumour was spread by means of a Bengali pamphlet distributed in Calcutta It was spread at the same time as another rumour that the Russians threatened to invade India. The educated classes made no efforts to expose its falsity. And it was believed by at least one thoughtful observer to have been an attempt to work on the superstition of the lower classes and stir up in them a hatred of Europeans.

The second panic, which was due to an equally absurd rumour, gave rise in August 1906 to what was commonly called the "Kidnapping Scare;" because there was a general belief that a number of men were going about trying to kidnap any young Bengali boys they could catch and carrying them off to the tea gardens in Assam, the Mauritius, and elsewhere. It arouse out of a trumped-up story that he had been kidnapped, told by a youth to his father, in order to conceal the fact that he had got into bad company and suffered in consequence. The story was accepted by certain Indian newspapes, and a panic ensued among the Bengali population in Calcutta, leading to unprovoked assaults on various innocent persons on the suspicion that they were kidnappers. Some Punjabi football players, a European Assistant to a firm, a Bengali gentleman in his carriage, a Punjabi traveller, and others were attacked and beaten as kidnappers by mobs of educated as well as uneducated Bengalis. Two hackney carriages also were overturned and set fire to in different parts of the town. This scare showed the extreme eagerness with which even the wildest rumour may be seized upon and believed by the Indian population in Calcutta, and the degree of excitement that can be produced on the slenderest grounds among the lower classes of the people. It is only fair to add, however, that considerable help in allaying the panic was afforded by a number of Indian gentlemen, including the editor of an influential newspaper.

The discontent engendered by the influences mentioned above remained more or less latent until the announcement of the Partition of Bengal. There had been an organized opposition to that measure, emanating from Calcutta and supported by the legal profession, which in Bengal is composed mainly of Bengali Hindus and forms an influential though numerically small body. The paucity of the numbers of those opposed to the Partition was, however, made up by their activity and powers of organization ; and a widespread but constitutional agitation was started. When the Partition of Bengal was announced in July 1905, the failure of this agitation enabled the malcontents to persuade others that constitutional agitation was a failure, and that moe vigorous measures should be taken.

The first effort of the agitators was to inaugurate a boycott movement, *i.e.*, a movement to boycott European goods, and in particular Manchester piece-goods, sugar and salt. These tactics were designed to attract attention to the alleged grievances of the Bengali Hindus, for it was hoped that the stoppage of the sale of Manchester goods would so affect the interests of the English mercantile community, that they would bring pressure to bear on the Home Government to annul the Partition. In this the agitators appear to have imitated the Chinese, who, in May 1905, had started a boycott of American goods as a protest against an Exclusion Treaty proposed by the United States. Closely connected with this movement was another called the *swadeshi* movement, the object of which was to encourage indigenous industries by starting new ones and reviving extinct or moribund handicrafts and manufactures :—generally to develop the resources of the country by and through the people, and in particular to substitute home-made for imported goods. The two movements were really distinct, though an effort was made to work them as part of one movement. For the *swadeshi* movement aimed at developing Indian industries for the supply of the home market, in competition with all other countries; while the boycott was intended to enforce a prohibition of the produce of certain European countries and especially British goods.

The swadeshi movement undoubtedly appealed to the better classes, whose interest in politics was not great ; but though it obtained much sympathy, it made little headway, because the industries it sought to develop were nearly all in their infancy. The main eforts of the agitators, therefore, were directed not to the slow and laborious work of building up home industries, but to enforcing the boycott. In this they met at first with some success, for the Marwari merchants – one of the most important sections of the mercantile community—were induced by commercial considerations to suspend orders for a short time. The agitators also sought to enlist the sympathy of Muhammadans; but here their efforts ended in failure, for the Muhammadans refused to make common cause with the Bengali Hindus in the matter. Recourse was also had to other and more unscrupulous methods. The interest of some landlords was enlisted, and the boycott was enforced on their tenants, many of whom were coerced into buying no imported goods. The services of school-boys were also enlisted. They were induced to picket shops and prevent, by force, if necessary, the purchase of any but *swadeshi* goods.

Another and more dangerous expedient was an atempt to give a religious sanction to the movement. In some places the ban of religious and social ostracism was laid on those Hindus who stood aloof. Reports were circulated that the blood and bones of cows and pigs were used to purify English salt and sugar, and that their fat formed part of the starch used for sizing piece-goods. Meetings were held in Hindu temples, and vows to boycott foreign goods were sworn in the name of Kali.

The Partition took effect on the 16th October 1905, and it cannot be denied that the measure was most unpopular with a section of the Bengali Hindus. It was stated that the measure had been decided upon without full opportunities for public criticism, though there had probably hardly ever been a measure more fully discussed before its adoption. Strenuous efforts were made to create an impression that the Bengali race was being divided in some way which has never been clearly stated. The more highly educated classes realized that their interests were affected, because the Muhammadans were now likely to exercise more influence on the administration and to obtain a fairer number of appointments. Lastly, but not least, there was a sentimental objection to the change; and the Bengali Hindu is an emotional person, with emotions easily roused and as easily played upon. Their sentiments and credulity had been taken advantage of by the agitators, and on the 16th October there was a remarkable demonstration. In Calcutta a large part of the Bengali Hindu population fasted throughout the day, shops were closed, the the fish-supply was stopped. The foundation-stone of a building called the National Federal Hall was laid ; a fund was started for building the Hall—an abortive project—and for developing home industries and industrial education. The Hindus tied *rakhis* or yellow threads on heir arms as a symbol of unity ; and a vow was taken to continue the opposition to the Partition.

Though the Partition had been carried into effect, the agitation did not cease. In December 1905 a Liberal Ministry was formed, Mr. (now Lord) Morley being Secretary of State for India. The leaders of the movement thought that, if the opposition was persistent and vociferous enough, the Liberal Party might be induced to annul the measure. Meetings of protest were accordingly held ; memorials were drawn up ; the *swadeshi* and boycott movements were vigorously

pushed. Various illegalities and acts of oppression were committed by students, who were taught to resist force by force; and a general spirit of lawlessness was engendered. Government issued a circular instructing District Magistrates to utilize the services of the educational authorities in supressing this abuse. They were to appoint, if necessary, schoolmasters as special constables, so as to strengthen their authority over the students, and to warn the managing bodies and teachers of the danger of disaffiliation of their schools if they failed to stop the employment of the students in political agitation. Briefly, the object of these orders was to deal firmly but kindly with those school-boys and students who were being induced to leave their studies and betake themselves to political work, which, in some cases, had led to breaches of the peace and acts of violence. It was desired that they should not be dealt with by the police, so as to be carried to the jail or to the whipping triangle, but by the educational authorities themselves, who should exercise proper discipline in the institutions under their control. The orders were, in fact, designed to secure the public peace, as against school-boys and students, by school discipline rather than by the police; but their tenor was grossly misrepresented. Other action taken by the authorities to maintain law and order was similarly misconstrued, being represented as an atack on home industries inspired by a desire to bolster up English trade; and the Magistrates were held up to opprobrium.

Reference may suitably be made here to the manner in which young men and school-boys were organized to promote the propaganda of the movement. It had for some time past been the custom for young Bengali men and college students, who were known collectively as *swadeshi* volunteers, to perform various services at political meetings, *e.g.,* in forming escorts for the speakers, seeing ticket-holders to their seats, and keeping order. After the celebration of the Sivaji festival at Calcutta in 1902, a desire for physical development set in among educated Bengali Hindus, and the young men began to practise fencing, *lathi*-play, etc. So far the student took no active part in politics.But when the anti-Partition movement was in progress, its leaders began to make use of bands of students, in order to swell the number of persons attending their meetings and processions, and also in order to enforce the boycott by picketting. A number of *samitis* or *akhras*, (*i.e.*, practically, athletic clubs), now sprung up in Calcutta and some places in the adjoining districts of Bengal. In these clubs youngmen and boys went through a course of physical training, drill and discipline, and set to work to train themselves in *lathi* exercises and wrestling. The members of these clubs were called National Volunteers ; and the idea seems to have been that they would form a trained body able to resist force with force, and available for purposes of offence and defence. They were also used for other purposes, some being sent as messengers between those inerested in keeping up the movement, others to collect funds, and others as emissaries to spread their propaganda. The National Volunters were, however, neither so numerous, nor so active and mischievous as in Eastern Bengal. And the body of Volunteers organized in connection with the *Ardhodeya Yoga* in February 1908 worked cordially with the police and rendered good service in assisting the many thousands of pilgrims, who came to Calcutta during that festival.

Strenuous efforts were made to give the movement an air of national unity,

and a watchword was found in the expression *Bande Mataram*. This was the refrain of a song in a Bengali novel *Ananda-math* written by one of the best Bengal novelist Bankim Chandra Chatterjee, and published in 1883. The name of the novel means "the monastery of happiness," and its subject was the revolt of a number of *sanyasis* or Hindu ascetics against the Muhammadans. The former were represented as having, in the course of their revolt, defeated some sepoys under an English commander, and after the action the *Bande mataram* Song was sung by their leader. The meaning of the expression has formed the subject of considerable speculation, some maintaining that it is an invocation of Kali, meaning "Hail Mother," others that it merely means "Hail Motherland," and that it is an invocation of *Bharatmata, i.e.*, Mother India. There is no doubt that while many, accepting the latter meaning, used the phrase quite innocently as an expression of their love of country, it also came to be used in an aggressive and turbulent manner in processions and meetings. It became a common practice in certain localities to shout it in an offensive manner at Europeans–the *Firinghis*, as they were now called—much in the same way as "foreign devil" by the Chinese. And in several instances it was so shouted when assults were committed on Europeans or those who did not fall in with the agitators.

Another expression which became common was *swaraj*, as a definition of the system of government demanded by the agitators. The meaning of this expression also was open to more than one interpretation. In one case it was held by the High Court that "the word *swaraj* does not necessarily mean government of the country to the exclusion of the present government, but its ordinary acceptance is 'Home Rule' under the Government. The vernacular word, if literally translated, would mean self-government, but self government would not necessarily mean the exclusion of the present Government or independence. It may mean, as it is now well understood, government by the people themselves under the King and under British sovereignty." This ruling was given in August 1907 ; but subsequent events clearly showed that the ideal of a section of the Bengali Hindus was complete independence and subversion of the British rule ; and the word was used almost exclusively by that section.

Generally speaking, the Bengali Hindus became divided into two classes with different aims. One section called Extremists believed that the Indians should work out their own salvation and attain independence. The other section, known as Moderates, put forward as their aim the attainment of a system of government similar to that enjoyed by the self-governing members of the British Empire. This object was to be pursued by constitutional means, by gradually bringing about a change in the existing system of administration, and by promoting national unity.

In the meantime, the tone of the speeches which various agitators delivered in the public squares in the north of Calcutta became more and more violent and inflammatory. They were known to be seditious ; but it was impossible to institute prosecutions with any hope of success, owing to the difficulty of securing satisfactory evidence of the actual words used in each case. Similar speeches in the districts outside Calcutta led to the institution of proceedings under section 108, Criminal Procedure Code, but in only one case was any one bound down to keep the peace ; and then the Magistrate's order was set aside by the High Court. After the institution of that case, orders were passed by the Lieutenant-

Governor that no further proceedings under the section quoted should be taken without the permission of the Local Government. This order was passed on the analogy of section 196, Criminal Procedure Code, which requires the sanction of the Local Government to be given to prosecutions for sedition. Sir Andrew Fraser felt that there was a great difference between offences of a political nature and ordinary criminal offences, and that it was not the intention of the law that prosecution in connection with the former should be left to the initiative of local officers. They were to be dealt with in accordance with the general policy of Government and the advice of the law officers of the Crown, and not to depend on the idiosyncracies of individual officers.

The danger of the inflammatory speeches and writing, which had been freely indulged in by agitators, became apparent in October 1907, when there were serious riots for two nights in Calcutta. These riots arose out of the action of the police in breaking up a meeting in Beadon Square, and led to a wholesale condemnation of the Calcutta Police in the Vernacular and anglo-Vernacular Press. It was alleged that the meeting was dispersed without any adequate reason, that the police afterwards got entirely out of hand, assaulting innocent passers-by, attacking tram-cars, and looting shops, or at least encouraging or permitting *gundas, i.e.*, professional rogues, to loot them. These charges were so serious that the Lieutenant-Governor at once directed the Commissioner of the Presidency Division to enquire into them. This enquiry being in some respects incomplete, His Honour directed a sifting enquiry to be held by an officer specially deputed for the purpose. The result was to establish clearly the facts that the police were justified in breaking up the meeting, that Bengali Hindus of the respectable classes took a prominent part in the disturbances, and that a determined attack was made by them upon the police. Though the latter, as a whole, behaved remarkably well, some of the rank-and-file got out of hand and roughly handled some innocent persons. But the main fact remained that the disturbances took origin in the riotous conduct of a class which is usually orderly and well behaved. His Honour's conclusion was that this was the direct outcome of the violent writing and speaking which had been indulged in for months past by irresponsible agitators. He pointed out the danger attendant on all incitements to race-hatred and violence ; and urged the more respectable and law-abiding sections of the community to use their influence, and support the Government in taking suitable measures to preserve the peace.

As it was known that these riots were the direct result of seditious speeches, an application was made to the Chief Presidency Magistrate under section 144, Criminal Procedure Code, and an order was obtained authorizing the closure of the squares to meetings for a period of two months. Immediately after the expiry of that period fresh speeches of a similar character were delivered. A second application was therefore made to the Magistrate by the Commissioner of Police, and a fresh order was passed closing the squares for a further period of two months. Since the expiry of that period few seditious speeches have been delivered in public in Calcutta.

For some time past, however, the malcontents had not confined themselves to seditious speeches. Immediately after the announcement of the Partition a seditious pamphlet had been circulated urging the Bengalis to rise *en masse* fearing

neither guns nor beyonets, nor—the police! Some of the newspapers also adopted a frankly disloyal tone, and several were started with the express object of spreading a spirit of disaffection, and propagating revolutionary ideas. The Bihari and Uriya papers, and the organs of the Muhammadan community, with two exceptions, continued to be loyal and moderate. But the majority of the Bengali papers, particularly those written in the vernacular, assumed a more violent tone, and some of them openly aimed at the complete subversion of the authority of Government. Of those written in English ; two — the *Indian Mirror* and the *Indian Nation* — continued to show sobriety, and to maintain a loyal and moderate attitude. One or two more occasionally gave a sober review of politics, and made genuine suggestions for reform, but also took every opportunity to declaim upon and magnify alleged abuses or acts of injustice. Others were less restrained ; and, generally speaking, the most prominent characteristics of the Bengali Press were destructive criticism and open hostility to Government. Among these papers several came into special prominence from their seditious tone ; the the *Bande Mataram*, established in 1906, and written in English, consistently advocated *swaraj* in the form of complete independence — "the absolute right of self-taxation, self-legislation and self-administration for the people of India." Certain vernacular papers went further. They urged the adoption of revolutionary methods as the means of securing complete political independence. Their tone was generally bitter and violent, scurrilous and abusive, and it was uniformly seditious. Their object was to stir up disaffection and incite to acts of violence regardless of consequences. They inculcated a feeling of hatred for the English, and a spirit of aggressive nationalism ; and they endeavoured to arouse the religious prejudices and passions of the Hindus.

For some time the violent writing in the newspapers was ignored. It was hoped that their virulence would gradually die away when it became apparent that the Partition was a settled fact, and the feeling of bitterness regarding it wore itself out. This hope was disappointed ; for experience showed that immunity from prosecution merely led to more and more violent writing. The Lieutenant-Governor, at last, reluctantly came to the conclusion that legal proceedings must be taken under section 124A of the Indian Penal code against the worst of the newspapers. Before this was done, a warning was given, but the warning proved ineffectual. Prosecutions were accordingly instituted against the *Yugantar, Bande Mataram, Sandhya* and *Navasakti*.

These prosecutions were on the whole successful in as much as convictions were obtained and without much excitement ; but it cannot be pretended that they succeeded in checking the mischief. The *Yugantar* openly declared that no number of prosecutions would prevent it from publishing inflammatory articles. Those who were convicted were held up to public admiration as martyrs ; and a fresh printer was registered after each conviction. This attitude of persistent contumacy and the essential failure of the prosecutions to secure their object were due to inherent defects in the law ; for the provisions of the Press and Registration of Books Act (XXV of 1867) required only the printer to be registered. It was not possible to discover the authors of the offending articles, for editors and managers divested themselves of their functions. The only person against whom evidence could be given was the printer, and this was generally some youthful enthusiast,

only too glad to assume the role of a patriot and martyr, who was merely a tool used by others who remained in the back ground.

A further development in the campaign of sedition took place at the end of 1907 and in the first half of 1908. Early in November 1907, two unsuccessful attempts were made between Chandernagore and Mankundu to wreck, by means of explosives, trains in which the Lieutenant-Governor was travelling. A third attempt to blow up His Honour's train was made on the 6th December at Narayangarh in the Midnapore district ; but the explosion only caused some slight damage to the engine and line. On the 11th April 1908, a bomb was thrown at M. Tardivel, the Maire at Chandernagoroe, while he was at dinner, but fortunately no damage was done. the *Maire*, it may be explained, had incurred the displeasure of the conspirators by prohibiting some so-called *swadeshi* meetings.

On the night of the 30th April, there was another dastardly outrage at Muzaffarpur. A bomb was thrown into a carriage in which Mrs. and Miss Kennedy, the wife and daughter of an esteemed member of the local Bar, were returning home. It exploded with deadly effect causing frightful injuries to the two ladies, the yonger of whom died within an hour, and the other next morning. One of the murderers was arested within fourteen hours and was eventually sentenced to death. The other shot himself to escape arrest. They were two young Bengali Hindus, whose object was to kill the district Judge of Muzaffarpur, Mr. D. H. Kingsford, I.C.S., who had till recently been Chief Presidency Magistrate at Calcutta, and in that capacity had convicted several printers of seditious newspapers. They mistook, however, the carriage of Mrs. and Miss Kennedy for that of Mr. Kingsford. It may or may not be a coincidence that the murder was committed on Amabasya night, which is an auspicious night for the worship of Kali. It is, however, noticeable that the murderers had waited twenty days in Muzaffarpur before throwing the bomb; and that some time before a speech had been delivered advocating the sacrifice to Kali of white goats—a thinly veiled allusion to Europeans. As is well known, Kali is the principal goddess worshipped by the Saktas, a pominent sect among Bengali Hindus, and one of their Tantras recommends the sacrifice of human beings as an offering pleasing in her sight. However this may be, it is at least certain that this was the first day of the new (Hindi) year; and it is most probable that the conspirators waited for it in order that the murder might usher in the year.

Scarcely had the news of this outrage been received, when a number of conspirators were arrested in Calcutta. After the attempt to blow up the Lieutenant-Governor's train in Midnapore, the police had been busily investigating clues, and obtained evidence of the existence of a secret society engaged in making bombs and explosives intended for the murder of Europeans. They discovered a regular factory for bomb-making and a number of infernal machines of a very destructive type, varying in size from small assassination bombs to large shells intended for crowds and street fighting. They were copies of bombs well known in Anarchist history ; and in some respects the arrangements for their manufacture were as complete as in a Government explosive factory. It was soon clear that all the bombs had not been seized ; for on the 15th May, a bomb, laid on the tram line in Grey Street, Calcutta, and evidently intended for the destruction of a tram car, was exploded by a municipal cart, and injured a few persons close by. Two days later

another bomb of great power was found on the steps of St. Andrew's Church in Circulai Road, Calcutta, a church chiefly frequented by native christians.

Enquiry showed that young Bengali Hindus had been incited to these outrages and inspired with a fanatical hatred of Europeans not only by the violent writings in the Bengali newspapers, but also by influences with which they had come in contact in Europe and America. It was found that a conspiracy had been organized with a definite scheme for the assassination of Europeans. There were regular seminaries of sedition and schools for the study of anarchical principles and the preparation of anarchical instruments. Funds were raised by subscription, and were supplemented or sought to be supplemented by dacoities. To deal with this situation, two Acts—the Explosive Substances Act and the Newspapers (Incitement of Offences) Act—were passed in June 1908 by the Governor-General's Council.

The former Act was designed to remedy the inadequacy of the existing law to deal with crimes committed by means of explosive substances, and was framed on the lines of the English Explosive Substances Act. 1883, which was enacted for the express purpose of dealing with anarchist crimes. It provides for the punishment of any person who causes an explosion likely to endanger life or property, or who attempts to cause such an explosion, or makes or has in his possession any explosive substance with intent to endanger life or property. It further makes the manufacture or possession of explosive substances for any other than a lawful object a substantive offence, and it throws on the person who makes or is in possession of any explosive substance the onus of providing the making or possession is lawful. It also provides adequately for the punishment both of principals and accessories.

The later Act was passed expressly because of the close connexion which had been shown to exist between the perpetrators of criminal outrages and the newspapers which publsibed criminal incitements ; and because experience had shown that prosecution under the existing law was inadequate to prevent the publication of such incitements. Its scope is confined to incitements to murder, to offences under the Explosive Substances Act, and to acts of violence. It gives power in such cases to confiscate the printing press used in the production of the newspaper, and to stop the lawful issue of the newspaper. In this Act a newspaper was defined as "any periodical, work containing public news or comments on public news." It was soon clear that this definition afforded a loophole to the conspirators ; for within a fortnight after the Act was passed, a leaflet was published in Calcutta bearing the name of a newspaper which had been most virulent and most prominent in the campaign of sedition. This leaflet contained passages inciting to wholesale murder and assassination, and gave instructions as to the manufacture of explosives.

Another bomb outrage occurred on the 22nd June, when a bomb was thrown at Kankinara on the Eastern Bengal State Railway into a railway carriage in which three European mill assistants were travelling. Two of them were slightly injured, and the third seriously, one arm being so shattered that it had to be amputated. On the 12th August, on the day after the execution of the murderer of Mrs. and Miss Kennedy, a bomb was thrown at a train on the Eastern Bengal State Railway between Shamnagar and Kankinara, but fell short and burst harmlessly. Two more exploded on the East Indian Railway near Chandernagore, where they were found

by some railway workmen.

Two bombs were also discovered at Midnapore, which had for some time been notorious as a centre of the extremists, and evidence was obtained of a conspiracy to murder European officials there. On the 31st August two of the prisoners under trial in connection with the conspiracy in Calcutta murdered the approver in the Alipore jail. In November the Chief Presidency Magistrate passed orders under the Newspapers (Incitement to Offences) Act confiscating the printing press of the *Bande Matarum*, holding that an article commenting on this murder was an incitement to murder or other acts of violence.

In conclusion, it may be pointed out that so far as Bengal is concerned the agitation has been practically confined to Calcutta and to the Presidency and Burdwan Divisions, *i.e.*, to Lower Bengal proper. In Bihar, Chota Nagpur and Orissa it was noticeable only in places where there were Bengali Hindu settlements; and it may be added that in these large sub-Provinces there is no love lost between the native, whether Hindu, Muhammadan, or Animist, and the Bengali immigrant. Calcutta was the centre of the agitation. It was from Calcutta that the leaders of the agitation took their clue, and in most places where it had any strength, it was kept up by visits from Bengali agitators. It was moreover confined to Bengali Hindus, to retain whose adherence appeals to religious sentiment were constantly made. Though individual Muhammadans—some of them, it is believed, paid agents—joined in the agitation, they were not representative of the Islamic community, which almost to a man kept aloof from and condemned the agitation.

It is not at present possible to give an account of the policy pursued by Sir Andrew Fraser in dealing with the movements, briefly sketched above. The measures of which he urged the adoption, in order to put a stop to seditious propaganda, have formed the subject of prolonged discussion with the government of India, the nature of which it is not permissible to disclose. It may, however, be stated generally that the main features of the line of policy which commended itself to His Honour were :—(1) a conciliatory policy towards all who are well affected and a consistent endeavour to remove all genuine grievances; and (2) the rigorous repression of all outward manifestations of disloyalty. To quote from a reply made by His Honour in July 1908 to an assurance of Loyalty on the part of an influential body of Bengali Hindus :—"There is no intention of the part of Government to make concessions to disorder ; but there is a determination not to allow the crimes of a few to divert it from its policy of just and progressive administration. For my own part, I feel that the police must be called on to take special precautions for the pevention of crimes contemplated by a certain section of the community, and that every effort must be made by the Government, in the interests of sound administration and in the interests of the people themselves, to crush and punish these efforts to disturb the public peace and to incite to, or to commit, acts of lawlessness and wicked violence. But, at the same time, I cannot admit that my opinion of, or my regard for, the people of India, as a whole, has undergone any very serious change from the events which have occurred. I do not attribute these events to the people generally; and I decline to condemn the whole population for the crimes of a few."

স্মরণীয় কয়েকজন

অতীন্দ্রমোহন রায় ১৮৯৬-১৯৭৯

ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। অনুশীলন সমিতির সদস্য হন ১৯১৩ সালে। কুমিল্লা জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছাত্রদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অপরাধে ছাত্ররা তাকে খুন করে (১৯১৫)। এই ঘটনায় অতীন্দ্রমোহন জড়িত ছিলেন। ৩ আইনে ১৯১৬ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর আটক ছিলেন মেদিনীপুর জেলে; মুক্তি পান ১৯২১ সালে। তারপর ১৯২৫-২৮ এবং ১৯৩০-৩৮ তাঁকে কারারুদ্ধ থাকতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী ছিলেন। আর.এস.পি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হলেও, আত্মগোপন করেছিলেন। ধরা পড়েন ১৯৪১ সালের শেষে। মুক্তি পান ১৯৪৬ সালে। দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) থেকে যান।

* জন্ম বাংলাদেশের কুমিল্লায়।

অতুলপ্রসাদ সেন ১৮৭১-১৯৩৪

ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ। স্বদেশি ও অন্যান্য সঙ্গীতের রচয়িতা ও সুরকার। লখ্‌নউ ছিল কর্মক্ষেত্র। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং সংগঠনের মুখপত্র "উত্তরার' সম্পাদক। তাঁর সঙ্গীতসম্ভার মুগ্ধ করেছিল বাঙালি জনসাধারণকে, যা আজও ম্লান হয়ে যায়নি।

* ঢাকায় পৈতৃক আবাস হলেও, জন্ম ফরিদপুরে।

অবনীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮৯১-১৯৩৭

দেশে বিদেশে বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডে ব্রিটিশ সরকারের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিলেন। ছাত্রাবস্থায় বিপিনচন্দ্র পাল এবং সখারাম গণেশ দেউস্করের দ্বারা প্রভাবিত। রাসবিহারী বসু এবং বাঘাযতীন, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ এবং সুরেন করের সঙ্গে পরিচিত হন। বাঘাযতীনের সহকারী হিসাবে জাপানে যান অস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে। জার্মান দূতের সঙ্গে সাক্ষাতের পর দেশে ফেরার পথে পেণাঙ-এ ধরা পড়েন। তাঁর সঙ্গে ছিল বিপ্লবীদের নাম ও ঠিকানা লেখা নোটবই। সেটিও চলে যায় পুলিশের হাতে। মৃত্যুদণ্ড হলেও ১৯১৭ সালে সমুদ্র স্নানের সময় পালিয়ে যান। নানাপথ ঘুরে জার্মানি পৌঁছান। সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, বীরেন চ্যাটার্জি, ক্ষিতীশপ্রসাদ প্রমুখের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। তাসখন্দে ১৯২০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ছিলেন অবনীনাথ। তারপর মস্কো গিয়ে সোভিয়েত পররাষ্ট্র মন্ত্রীর সঙ্গে ভারত সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনার পর গোপনে ভারতে প্রবেশ করে বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন।

* আদি নিবাস বাংলাদেশের খুলনায় হলেও, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুরে জন্ম।

ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১৮৮৮-১৯৬৩

প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের অন্যতম ডঃ অবিনাশ ভট্টাচার্য কলকাতায় জাতীয় বিদ্যালয়ের

ছাত্র ছিলেন। জার্মানিতে গিয়ে রসায়নশাস্ত্রে ডক্টরেট হন। জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি এবং ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যুক্ত ছিলেন। জার্মানিতে বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বার্লিন কমিটির** সদস্য ছিলেন। বার্লিন বিখ্যাত বই 'ইউরোপে ভারতের বিপ্লব সাধনা'।

* জন্ম বাংলাদেশের কুমিল্লায়।

অবিনাশ ভট্টাচার্য ১৮৮২-১৯৬২

বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। বাঘাযতীনের সংস্পর্শে তাঁর বৈপ্লবিক আন্দোলনে পদক্ষেপ। সাপ্তাহিক 'যুগান্তর' পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন। মুরারীপুকুর বোম মামলায় গ্রেপ্তারের পর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয় (১৯০৯)। কিন্তু দণ্ড হ্রাস হওয়ায় মুক্তি পান (১৯১৫)। দেশবন্ধুর স্বরাজ্যপার্টিতে যোগদান করেন (১৯২০)। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

*জন্ম ২৪ পরগণার আড়বালিয়া।

অমর বসু ১৮৯১-১৯৭৫

স্বদেশসেবার অনুপ্রেরণা পিতা অতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে। পিতাও ছিলেন স্বদেশি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। যুগান্তর বিপ্লবী দলের কর্মী অমর বসু বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় কলকাতার পথে পথে 'বন্দেমাতরম' গান করে ঘুরতেন। পিতা-প্রতিষ্ঠিত সিমলা ব্যায়াম সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯১৬ সালে দুজনেরই ৫ বছর কারাদণ্ড হয়। ফরওয়ার্ড ব্লক প্রতিষ্ঠায় সুভাষচন্দ্রের সহযোগী ছিলেন। দেশভাগের পর কংগ্রেস ত্যাগ করে মিলিত হন বামপন্থীদের সঙ্গে। শ্রমিক নেতা হিসাবে পরিচিত। কয়েকবার বিধানসভায়ও নির্বাচিত হয়েছিলেন।

* জন্ম কলকাতায়।

অমরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮০-১৯৫৭

ছাত্রাবস্থায় বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ, বাঘাযতীন, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হৃষীকেশ কাঞ্জিলাল প্রমুখ তাঁর জীবনস্রোতকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করেছিল। বহুবাজার-কলেজস্ট্রিট অঞ্চলে 'শ্রমজীবী সমবায়' নামে একটি স্বদেশি পণ্যের দোকান ছিল বিপ্লবীদের মিলনকেন্দ্র। সেই সূত্রে পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়। মামলা প্রত্যাহৃত হলে সাত বছর পরে আত্মপ্রকাশ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। ভারতরক্ষা আইনে বন্দি ছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত। তারপর আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। পরে এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট দলে যুক্ত হন।

* জন্ম হুগলি জেলার উত্তরপাড়ায়।

অম্বিকাচরণ মজুমদার ১৮৫১-১৯২২

সমকালীন রাজনীতিক্ষেত্রের স্বনামধন্য পুরুষ। সুরেন্দ্রনাথপন্থী অম্বিকাচরণ ১৮৮১ সালে যে পিপলস অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন, সেটি পরে ভারত সভার সঙ্গে মিশে যায়। ১৯১৩ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত এই সভার সভাপতি ছিলেন। ফরিদপুরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজে

**বার্লিনে গঠিত ইণ্ডিয়ান ইন্ডিপেনডেন্স কমিটিকে বলা হত বার্লিন কমিটি।

তাঁর অবদান উল্লেখযোগ্য। কংগ্রেস কর্মী হিসাবে পূর্ববাংলায় ছিল অপ্রতিহত প্রভাব।

* জন্ম ফরিদপুরে।

অরবিন্দ ঘোষ ১৮৭২-১৯৫০

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম পর্বের অন্যতম পুরোধা অরবিন্দের শিক্ষা বিলেতে। কেম্ব্রিজের ট্রাইপস অরবিন্দ ১৮৯৩ সালে বরোদা কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেন। পরে অধ্যক্ষ হন। সেই সময়ে গুপ্ত বিপ্লবী সংগঠনের নেতা ঠাকুর সাহেবের কাছে দীক্ষা গ্রহণ এবং গুজরাট গুপ্ত সমিতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ভাই বারীন্দ্রকুমার ঘোষের সহযোগিতায় বাংলায় বিপ্লবীদল গঠন (১৯০২)। চাকরি ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন। অনুশীলন সমিতির সহ-সভাপতি হন। 'বন্দেমাতরম', 'সন্ধ্যা', 'যুগান্তর' পত্রিকার সম্পাদনা করেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন (১৯০৬)। আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন। পরে মুক্তি পান। ১৯১০ সালে ইংরেজ সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নিলে পণ্ডিচেরী চলে যান। সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠার পর ধর্মাচরণে আত্মনিবেদন করেন।

*অরবিন্দের জন্ম কলকাতায়।

অরুণ গুহ ১৮৯২-১৯৮৩

অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরুণ গুহর বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে রাজনৈতিক জীবন শুরু। ভারত-জার্মান অস্ত্র সংগ্রহে তাঁর যোগাযোগ থাকায় পুলিশ গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নিলে তিনি আত্মগোপন করেন। ১৯১৬ সালে ধরা দিলে ৩ আইনে তাঁকে ২ বছর আটক করা হয়। বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অ্যাক্টে আটক ছিলেন ১৯২৩ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত। আবার আটক ছিলেন ১৯৩০ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত। মুক্তির পর কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৯৪৬ সালে ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। তিনবার স্বাধীন ভারতের লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন।

* জন্ম বরিশালে।

অশ্বিনীকুমার দত্ত ১৮৫৬-১৯২৩

স্বদেশি আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে সমগ্র বরিশাল জেলা অন্যতম রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল। সমাজসেবা কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে পিতার নামে বরিশালে ব্রজমোহন স্কুল এবং ১৮৮৯ সালে ব্রজমোহন কলেজ স্থাপন করেন। বরিশাল মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ও চেয়ারম্যান ছিলেন কিছুকাল। রাজনীতিক্ষেত্রে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। বহু কৃতী যুবক তাঁর অনুপ্রেরণায় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিতও হয়েছিল। আজও বরিশালের মানুষ তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

* জন্ম বরিশাল জেলার পটুয়াখালি।

আনন্দকিশোর মজুমদার ১৮৮২-১৯৪০

ময়মনসিংহের "সাধনাসমাজ" প্রতিষ্ঠায় অন্যতম উদ্যোগী। সঙ্গী ছিলেন হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য এবং মোহিনীশঙ্কর রায়। এরা সশস্ত্র বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাঁরই চেষ্টায় ময়মনসিংহে সুহৃদ সমিতি ও অনুশীলন সমিতি মিলে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী সংগঠন গড়ে

ওঠে। পুলিশের গুপ্তচর ও দারোগাদের হত্যা, রাজনৈতিক ডাকাতিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে ১৯১৬ গ্রেপ্তার হন। ১৯১৯ সালে মুক্তির পর আবার ১৯২৪ সালে ৩ আইনে আটক হয়ে বহরমপুর জেলে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত ছিলেন। তারপর থেকে জাতীয় কংগ্রেসের কাজে জড়িয়ে পড়েন গভীরভাবে।

* জন্ম ময়মনসিংহে।

আনন্দমোহন বসু ১৮৪৭-১৯০৬

ব্যারিস্টার আনন্দমোহন বসু ছিলেন সমাজ সংস্কারক, শিক্ষানুরাগী ও জাতীয়তাবাদী নেতা। গণিতশাস্ত্রে এম.এ. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো ও সেনেট সদস্য আনন্দমোহন বসু ব্রাহ্ম সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সভাপতিত্বে ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়েছিল 'স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন'। উদ্দেশ্য ছিল ছাত্রদের মধ্যে স্বাদেশিকতা জাগ্রত করা। ১৯০৩ সালে অসুস্থ আনন্দমোহন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের একটি সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন। তাঁর রচিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ।

* জন্ম ময়মনসিংহে।

আনন্দচন্দ্র রায় ১৮৪৪-১৯৩৫

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সমগ্র পূর্ববাংলা জুড়ে উত্তাল উন্মাদনা সৃষ্টির অন্যতম নায়ক। অপ্রতিহত ছিল তাঁর প্রভাব। খ্যাতনামা জমিদার আনন্দচন্দ্র পেশায় ছিলেন আইন ব্যবসায়ী। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে নেতৃত্ব এবং ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহের বিরোধিতা করায় তাঁকে একটি হত্যা মামলায় অভিযুক্ত করা হলেও সসম্মানে মুক্তি পান। পরে জাতীয় কংগ্রেসের বিবিধকর্মে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ঢাকার বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন।

* জন্ম ফরিদপুরে।

আশুতোষ কালী ১৮৯১-১৯৬৫

ছাত্রাবস্থায় অনুশীলন সমিতির সভ্য হন। তারপর ঢাকার অনুশীলন সমিতির পুলিন দাসের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে। নানাবিধ বৈপ্লবিক কাজকর্মে গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। রাজনৈতিক ডাকাতি, ভারত-জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ কার্যক্রম থেকে শুরু করে বৈপ্লবিক দল সংগঠন কার্যে তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। জীবনের ২৯ বছর তাঁর জেলে কেটেছে। পরে কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন। সহায়হীন বিপ্লবীদের জন্য কলকাতার টালিগঞ্জে চণ্ডী ঘোষ রোডে অনুশীলনভবন প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি।

* জন্ম বাংলাদেশের ফরিদপুরে।

আশুতোষ চৌধুরী ১৮৬০-১৯২৪

ব্যারিস্টার আশুতোষ চৌধুরী সমকালীন রাজনীতি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি কংগ্রেসের ইংরেজ অনুগ্রহ লাভের মানসিকতার চরম বিরোধী ছিলেন। তবুও বিভিন্ন জেলায় কংগ্রেস সংগঠনকে শক্তিশালী করতে চেষ্টা করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। শিল্প শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্থাপন করেন বেঙ্গল টেকনিক্যাল স্কুল। ১৯১২ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন। বিখ্যাত শিকারি কুমুদনাথ চৌধুরী এবং সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী ছিলেন

তাঁর ভাই।

* জন্ম পাবনায়।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮২০-১৮৯১

বাঙালিকে আত্মপরিচয়ে যাঁরা উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তাঁদের একজন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আবির্ভাব সময়ে সমগ্র বাংলার যে জীবনধারা আমরা অনুভব করি, তাঁর অন্তিমকালে তা সম্পূর্ণ রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই সময়কালের মধ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে অনির্বাণ দীপশিখা জ্বালিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর। সামাজিক ব্যাধি আরোগ্য করতে এক তীব্র সংঘর্ষে লিপ্ত ছিলেন স্বার্থান্বেষী হিন্দু সমাজপতিদের সঙ্গে। জাতির দুরারোগ্য ব্যাধি নির্মূল করতে তাঁর উদ্যম বাঙালিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিশিষ্টতায় চিহ্নিত করে। মানবতাবাদী বিদ্যাসাগরকে আজও আমরা সঠিকভাবে পরিমাপ করতে পারি না। শতাব্দী শেষের কর্মকাণ্ডের ভিত্তিমূলে ছিল বিদ্যাসাগরের শিক্ষার বীজবপন। যার অঙ্কুর উদ্‌গম হয়ে সবল বলিষ্ঠ মেরুদণ্ডযুক্ত বাঙালি সন্তানের জন্ম দিয়েছিল।

* জন্ম মেদিনীপুরের বীরসিংহ গ্রামে।

উল্লাসকর দত্ত ১৮৮৫-১৯৬৫

বাঙালি বিপ্লবীদের মধ্যে ভিন্ন ধাতুতে গড়া একটি মানুষ। ছাত্র ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। একজন ইংরেজ অধ্যাপক ভারত সম্পর্কে কটূক্তি করায় কলেজ ত্যাগ করেন। তারপর যুগান্তর দলের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে রাজনৈতিক জীবনের শুরু। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। মুরারিপুকুর বাগানে ধরা পড়েন ১৯০৮ সালের ২ মে। তারপর আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হন এবং বিচারে তাঁর ফাঁসির আদেশ হয়। আপিলে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে আন্দামানে নির্বাসিত হন (১৯০৯)। মুক্তিপান ১৯২০ সালে। তারপর আর সক্রিয় রাজনীতি করেন নি।

* জন্ম ত্রিপুরার কালিকচ্ছে।

কালীচরণ ঘোষ ১৮৯৫-১৯৮৪

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এই মানুষটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া হয়নি। সাংবাদিক ও আইনজীবী কালীচরণ প্রত্যক্ষভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে কয়েকখানি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। সেইসব গ্রন্থের আলোচিত তথ্যাবলী আজও প্রামান্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। 'স্বদেশি বাজার' পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক কালীচরণ ছিলেন চন্দননগর যুবসমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বিপ্লবীদলের সঙ্গে নিবিড় সংযোগ থাকায় দেউলি, হিজলি ও বক্সা জেলে দীর্ঘদিন আটক থেকেছেন। পরে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন।

*জন্ম চন্দননগরের পালপাড়ায়।

কৃষ্ণকুমার মিত্র ১৮৫২-১৯৩৬

খ্যাতনামা অধ্যাপক, সাংবাদিক ও রাজনৈতিক নেতা। তাঁর সম্পাদিত সাপ্তাহিক 'সঞ্জীবনী' পত্রিকা সমকালীন ইতিহাসের অসাধারণ দলিল। শ্রমিক আন্দোলনে ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কংগ্রেসী কৃষ্ণকুমার কিন্তু মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আন্দোলনে কোন আস্থা রাখতে পারেন নি।

*জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল মহকুমায়।

ক্ষুদিরাম বসু ১৮৮৯-১৯০৮

এই কিশোর বিপ্লবীকে ঘিরে ছড়িয়ে আছে অন্তহীন কিংবদন্তী। ডানপিটে ক্ষুদিরাম ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন বেপরোয়া। অল্প বয়সেই রাজনারায়ণ বসু ও বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সান্নিধ্য আসেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার সময়ে ১৯০৬ সালে মেদিনীপুর শহরের এক বিপ্লবী দলে যোগ দেন। তারপর থেকে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় এসে থাকতেন এবং মুরারীপুকুর বাগানের বিপ্লবী দলের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মজঃফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন এবং পরে পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। ১৯০৮ সালের ১১ আগস্ট মজঃফরপুর জেলে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়।

* জন্ম মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানার মৌবনী বা মেহবনী গ্রামে।

ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ১৮৬৩-১৯২৭। পৃ. ৭৯০ দেখুন।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬৭-১৯৩৮

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির বহুগুণ সমন্বিত সুসন্তান গগনেন্দ্রনাথ। চিত্রশিল্পে অসাধারণ কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। শিল্পক্ষেত্রে নানান পরীক্ষা নিরীক্ষায় উল্লিখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। ব্যঙ্গচিত্রে অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। স্বদেশি আন্দোলনে ছিল গভীর সংযোগ। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে গোপন যোগাযোগ। আর্থিক সহযোগিতা জানা থাকলেও, পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে কিছু করতে পারে নি।

* জন্ম কলকাতায়।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪১-১৮৬৯

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির অন্যতম কৃতী সন্তান। গণেন্দ্রনাথ এবং নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে ১২৭৩ সালের ৩১ চৈত্র শুরু হয়েছিল 'হিন্দুমেলা'। গণেন্দ্রনাথ ছিলেন সম্পাদক। জনপ্রিয় স্বদেশি সঙ্গীত 'লজ্জায় ভারত যশ গাইব কি করে?' তাঁরই রচনা। সঙ্গীত, শিল্প ও নাট্যানুরাগী গণেন্দ্রনাথ সংস্কৃতি চর্চায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন।

* জন্ম কলকাতায়।

চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী ১৮৯৪-১৯১৫

ফরিদপুরের বিপ্লবী পূর্ণদাসের সহকর্মী। চিত্তপ্রিয় ১৯১৩ সালে ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ৬ মাস জেল খাটেন। সেই তাঁর প্রথম কারাবাস। তারপর উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কলকাতার রাস্তায় কর্তব্যরত পুলিশ ইনস্পেক্টর সুরেশ মুখার্জিকে সহকর্মীদের সাহায্যে হত্যা। বাঘা যতীনের সহযোগী হিসাবে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের উদ্যোগে অংশগ্রহণ করেন। পুলিশের গুলিতে নিহত হন বুড়িবালামের তীরে।

* জন্ম ফরিদপুর জেলার মাদারিপুরের খালিয়া-য়।

চিত্তরঞ্জন দাশ ১৮৭০-১৯২৫

অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হয় ১৯০২ সালে। চিত্তরঞ্জন ছিলেন সহ-সভাপতি। ১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করেন। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেপ্তার হন

অরবিন্দ। চিত্তরঞ্জনের দক্ষ আইনী লড়াইয়ে তিনি বেকসুর খালাস পান।

সক্রিয় রাজনীতিতে অনুপ্রবেশ ১৯১৭ সাল থেকে। ১৯২০ সালে বিপুল পসার সত্ত্বেও, ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২০ সালে গান্ধীর আইনসভা বর্জনের সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেন এবং ১৯২২ সালে গঠন করেন স্বরাজ্য দল। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন ১৯২৪ সালে। তাঁর স্থাপিত মাসিক 'নারায়ণ' পত্রিকা সেকালে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

* জন্ম কলকাতায়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৯-১৯২৫

জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির এই অসাধারণ মানুষটি ইতিহাসের পাতায় উপেক্ষিতই থেকে গেছেন। ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য প্রতিভাবান সন্তানদের মত এই মানুষটিও ছিলেন সমকালে উজ্জ্বল। রাজনারায়ণ বসুর সভাপতিত্বে 'সঞ্জীবনী' নামে যে গুপ্ত সমিতি স্থাপিত হয়েছিল, তার অন্যতম উদ্যোগী ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ। 'ভারতী' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এই মানুষটি ছিলেন নারীশিক্ষা প্রসার ও নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম কর্ণধার। ১৮৮২ সালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে স্থাপিত সারস্বত সমাজের সভাপতি ছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

*জন্ম কলকাতায়।

জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৩-১৯৭১

অরবিন্দ ঘোষের ঘনিষ্ঠ জ্যোতিষচন্দ্র ঘোষের রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ অনেক আগেই। তিনি ছাত্রদের রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ সরকারের রিজলে সার্কুলারের বিরোধিতা করেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ। মান্দালয়ে সুভাষচন্দ্রের কারাসঙ্গী জ্যোতিষ ঘোষ পরবর্তীকালে প্রাদেশিক ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি হন। জীবনের ২০ বছর তাঁর জেলে কেটেছিল। ১৯৩০ সালে বাংলাদেশে বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তিনি সর্বজনে 'মাস্টার মশায়' নামে পরিচিত ছিলেন।

* জন্ম বর্ধমান জেলার দত্তপাড়ায়।

তারকনাথ পালিত ১৮৩১-১৯১৪

স্বদেশপ্রেমে ও দানে বিখ্যাত হয়ে আছেন। জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনে তাঁর শ্রম ও অর্থদান ছিল অতুলনীয়। শিক্ষা পরিষদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হলেও, মতভেদের কারণে সেখান থেকে পদত্যাগ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষার জন্য ১৫ লক্ষ টাকা দান করেছিলেন। তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষের দানে কলকাতায় সায়েন্স কলেজ স্থাপিত। কলকাতার ক্রোড়পতি কালীশঙ্করের পুত্র তারকনাথও আইন ব্যবসায়ে প্রভূত উপার্জন করেন। ১৯১২ সালে তারকনাথ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা শিক্ষার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি দান করে যান। তারকনাথের পুত্র লোকেন্দ্রনাথ জাতীয় শিক্ষাপরিষদে ১০ হাজার টাকা দান করেছিলেন।

* জন্ম কলকাতায়।

নবগোপাল মিত্র ১৮৪০-১৮৯৪

বাঙালি বাবুসমাজকে বেঁচে ওঠার নতুন পথ দেখিয়েছিলেন নবগোপাল। তাঁর চিন্তাধারার

মধ্যে বিশেষভাবে ফুটে উঠেছিল বাহুবলে ইংরেজ বিতাড়নের স্বপ্ন। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির ঘনিষ্ঠ এই জাতীয়তাবাদী নেতা চৈত্র মেলা বা হিন্দুমেলার পত্তন করেছিলেন। তত্ত্ববোধিনী সভার অন্যতম সদস্য নবগোপাল 'ন্যাশনাল পেপার'-এর পরিচালক ছিলেন। তিনি ন্যাশনাল সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন। তাঁর চিন্তাধারা সবসময় ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হত। বাঙালির সামরিক শিক্ষায় তিনি গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যেজন্য ১৮৭২ সালের ১ এপ্রিল স্থাপিত ন্যাশনাল স্কুলের শিক্ষাক্রমে ছিল ব্যায়াম, বন্দুক চালানো এবং কারিগরি বিদ্যা। তাঁর এই শিক্ষাক্ষেত্রে সেকালের বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদী নেতাদের পদার্পণ ঘটত। তাছাড়া স্বদেশিপণ্য ও শিল্পের উন্নতি সাধনে তাঁর উদ্যোগ ছিল অন্তহীন। তাঁর সমস্ত সংগঠন ও উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত থাকত "ন্যাশনাল" শব্দটি। যে কারণে লোকে তাকে বলত ন্যাশনাল নবগোপাল। তিনি একটি সার্কাসের দলও খুলেছিলেন। নাম ছিল ন্যাশনাল সার্কাস।

নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ১৮৯২-১৯১৫

ফরিদপুর ষড়যন্ত্র মামলায় ১৯১৩ সালে অভিযুক্ত হন। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পরেই গোয়েন্দা অফিসার নীরদ হালদারকে গুলি করে হত্যা করেন। বুড়িবালানের তীরে বাঘাযতীনের সঙ্গী হিসাবে ইংরেজ পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে আহত হন। ১৯১৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর তাঁকে জেলে ফাঁসি দেওয়া হয়।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুরের খেয়ারডাঙায়।

পুলিনবিহারী দাস ১৮৭৭-১৯৪৯

বাংলায় বৈপ্লবিক আন্দোলনের সূচনাপর্বের অন্যতম কৃতী সংগঠক। যুবসমাজের শরীর গঠনের জন্য ঢাকার টিকাটুলিতে একটি আখড়া স্থাপন করেন। ব্যারিস্টার পি. মিত্রের অনুপ্রেরণায় ঢাকা অনুশীলন সমিতি গঠন করেন এবং ১৯০৭-১০ সাল পর্যন্ত ছিলেন তাঁর সর্বাধিনায়ক। গোটা উত্তর ও পূর্ব বাংলা জুড়ে সমিতির ৮০০ শাখা গড়ে তোলেন। ১৯০৮ সালে অনুশীলন সমিতি বেআইনী ঘোষণার পর বৈপ্লবিক কাজকর্মের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয়ের জন্য কয়েকটি রাজনৈতিক ডাকাতির কারণে গ্রেপ্তার হন। ১৯১০ সালে মুক্তি পান। ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত হয়ে ১৯১২ সালে ৭ বছরের জন্য আন্দামানে অবরুদ্ধ ছিলেন। ১৯২০ সালে গঠন করেন ভারত সেবক সংঘ। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে মতভেদ ঘটে। সমিতি ভেঙে দিয়ে রাজনীতি থেকে দূরে সরে যান।

* জন্ম ফরিদপুরে।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩২

সাহিত্যিক হিসাবে আজও সুপরিচিত। ব্যবহারজীবী প্রভাতকুমার 'প্রদীপ', 'প্রবাসী' ও 'ভারতী' পত্রিকার নিয়মিত লেখক। প্রধানত ঔপন্যাসিক ও গল্পকার হিসাবে চিহ্নিত হলেও সমকালীন দেশ ভাবনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন নি। এক সময় 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক ছিলেন।

*জন্ম হুগলি জেলার গুরুপে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৩৮-১৮৯৪

'গীতা', 'আনন্দমঠ' আর 'বন্দেমাতরম' বাঙালির জীবনকে যে কীভাবে বদলে দিয়েছিল,

জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনায় তা সহজেই উপলব্ধি সম্ভব। বাঙালি যুবককে বিদেশি শাসকের রক্তচক্ষু অগ্রাহ্য করার মানসিক দৃঢ়তা এনে দিয়েছিল 'বন্দেমাতরম'। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় বাংলার শহর, শহরতলী জেগে উঠেছিল 'বন্দেমাতরম' ধ্বনিতে। বঙ্কিমের "বঙ্গদেশের কৃষক" এবং "কমলাকান্তের দপ্তর" পড়লে তাঁর স্বদেশ চিন্তার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

* জন্ম ২৪ পরগনার কাঁঠালপাড়ায়।

বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ১৮৮০-১৯৫৯

দাদা অরবিন্দ ঘোষের প্রভাবে বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত হন। গুপ্ত সমিতি গঠন ও বিপ্লবী কার্যকলাপে যুক্ত ছিলেন। নেতৃত্ব নিয়ে মতবিরোধ ঘটে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) সঙ্গে। 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। মানিকতলার পৈতৃক বাগানবাড়িতে বোমা তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছিল। এখান থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। তিনি স্বীকারোক্তি দেন। প্রথমে প্রাণদণ্ডাদেশ, পরে আপিলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও, মুক্তি পান ১৯২০ সালে। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শের অনেক পরিবর্তন ঘটে এবং সরকারি উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীদের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক দেশের মানুষ সুনজরে নেয় নি।

*জন্ম লণ্ডনে।

বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৮-১৯৩২)

প্রখ্যাত নেতা, বাগ্মী ও চিন্তাবিদ বিপিনচন্দ্র পাল ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেন শ্রীহট্টের প্রতিনিধি হিসাবে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তিনি একাধিকবার কারাবরণ করেছিলেন। একবার সরকার তাঁকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করে আগ্রায় অন্তরীণ করেছিল। ১৯১৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের হোমরুল লিগে যোগদান করেন। তিনি ছিলেন চরমপন্থী। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতা (১৯২১) করেছিলেন। তারপর প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে সরে আসেন।

*জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের শ্রীহট্টে।

বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি ১৮৮৭-১৯৫৪

এই অসাধারণ বিপ্লবীর জীবনের প্রথম পর্ব কেটেছে মান্দালয়, রেঙ্গুন ও আলিপুর জেলে। কখনও আত্মগোপন করে থেকেছেন। ছাত্রাবস্থায় বিখ্যাত-বিপ্লবী কর্মী ও জাতীয়তাবাদী নেতাদের সান্নিধ্যে আসেন। ১৮৯৭ সালে স্থাপিত আত্মোন্নতি সমিতি তাঁরই সুযোগ্য পরিচালনায় সুশৃংখল বিপ্লবী দলে পরিণত হয়। ১৯১৪ সালে রডা কোম্পানির 'মশার' পিস্তল অপহরণ ও বন্টনে নেতৃত্ব দেন। কয়েকটি ডাকাতির পর ভারতব্যাপী বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। ১৯২১ জাতীয় কংগ্রেসের আন্দোলনে যোগ দেন। ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হালিশহরে।

বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ১৮৮০-১৯৪৩

বিলেতে পড়াশুনা করতে গিয়ে বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষিত হন। তুরস্কের নবীন রূপকার কামাল আতাতুর্কের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তাঁর কাছে স্বাধীনতা আন্দোলনে সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন

(১৯০৬)। লণ্ডনে, ইণ্ডিয়ান সোস্যালিস্ট পত্রিকার পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। য়ুরোপে ব্রিটিশ বিরোধী পত্রিকা 'তলোয়ারে'র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৯ সালে তাঁর ব্যারিস্টার সনদ বাতিল করা হয় এবং গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য প্যারিস চলে যান। ফরাসি সোস্যালিস্ট পার্টির সদস্য হন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় জার্মানিতে ভারতীয়দের বিপ্লবী সংগঠন ইণ্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স কমিটি (বার্লিন কমিটি) গঠন করেন। ১৯১৭ সালে শান্তিসম্মেলনে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে যোগ দেন। ১৯২০ সালে মস্কো যান। তারপর আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। ১৯২০ সালে লেনিন ইনস্টিটিউট অফ এথনোগ্রাফির ভারতীয় বিভাগের প্রধান নিযুক্ত হন। ১৯৩৭ সালে স্ট্যালিনের আদেশে বীরেন্দ্রনাথ নিহত হন।

* আদি নিবাস বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা হলেও, পিতার কর্মস্থল হায়দরাবাদে জন্ম।

ব্যোমকেশ চক্রবর্তী ১৮৫৫-১৯২৯

ব্যারিস্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী রাজনীতিতে এগিয়ে আসেন ১৯০৫ সালে। বিদেশি পণ্য বর্জন আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। ১৯০৬ সালে স্থাপিত বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল তাঁরই কীর্তি। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ছিলেন ১৯১৪-১৬ সালে। রাজনৈতিক বন্দিদের দ্বীপান্তরিত করার বিরুদ্ধে সরব হয়ে ওঠেন ১৯১৮ সালে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেও গান্ধীর অনুগামী ছিলেন না। পরে স্বরাজ্য দলে যোগ দেন।

* জন্ম বাংলাদেশের যশোহরে।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ১৮৬১-১৯০৭

আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে। তারপর ব্রাহ্মধর্ম প্রচারে সিন্ধুপ্রদেশে যান। সেখানে প্রথমে প্রটেস্ট্যান্ট ও পরে ক্যাথলিক সম্প্রদায় ভুক্ত হন। বিদেশি ধর্মকে তিনি স্বদেশের স্বরূপে পেতে চেয়েছিলেন। যে কারণে নর্মদা তীরে ক্যাথলিক মঠ স্থাপন করেন। ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত করাচীতে 'সোফিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। হিন্দুধর্মে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯০১ সালে স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাবে। তখন নাম হয় ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে ভাষণ দিয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে 'ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয়' (১৯০১) স্থাপনকালে তাঁর সাহায্য পান। তারপর ব্রহ্মবান্ধব রাজনীতি ক্ষেত্রে এক সংগ্রামী নেতা স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। অগ্নিযুগের এই অসম সাহসী মানুষটি "সন্ধ্যা" দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করে আপসহীন সংগ্রাম চালিয়ে যান ইংরেজশক্তির বিরুদ্ধে। ১৯০৭ সালে সরকার 'সন্ধ্যা' প্রকাশ বন্ধ করে দেয় এবং তাঁকে ও মুদ্রাকরকে গ্রেপ্তার করে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের বিচারালয়ে বিচার শুরুর আগেই তিনি হাসপাতালে মারা যান।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার খন্যানে।

ভগিনী নিবেদিতা ১৮৬৭-১৯১১

স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্য ভগিনী নিবেদিতা কলকাতায় বসবাস শুরুর প্রথমেই নারী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নেন। ক্রমশ ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। অনুশীলন দলের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন নিবেদিতা। সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করায় তাকে রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিন্ন করতে হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর বক্তৃতা ও নিবন্ধাদি যুব সমাজকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের বারাণসী অধিবেশনে (১৯০৫) বিদেশি পণ্য বর্জনের পক্ষে ভাষণ দেন। তাঁর অন্যতম দুই সুহৃদ ছিলেন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও জগদীশচন্দ্র বসু।

* জন্ম আয়ারল্যাণ্ডে।

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ১৮৯৪-১৯৭৯

কিশোর বয়সে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হন। 'যুগান্তর' দলের ঘনিষ্ঠ কর্মী ভূপেন্দ্রকুমার বাঘাযতীনের সান্নিধ্য লাভ করেন। জার্মান অস্ত্র সংগ্রহ এবং ভারতের মুক্তিযুদ্ধে তাঁর কর্মতৎপরতা ছিল উল্লেখযোগ্য। দুঃসাহসিক যুদ্ধে বাঘাযতীন ও তার সহকর্মীদের মৃত্যু হলে, আত্মগোপন অবস্থায় ভূপেন্দ্রকুমার সংগঠনের কাজ চালিয়ে যেতে থাকেন। ১৯১৭ সালে গ্রেপ্তার হন ৩ আইনে। ১৯২০ সালে মুক্তির পর কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্বরাজ্যদল গঠনেও সক্রিয় ছিলেন। ১৯২৩, ১৯২৮, ১৯৩০ সালে তিনবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। কারামুক্তির পর 'ফরোয়ার্ড' পত্রিকা সম্পাদনা করেন। দেশভাগের পর পার্লামেন্টের সদস্য হন এবং বিভিন্ন গণআন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন।

* জন্ম যশোহরের ঠাকুরপুরে।

ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ১৮৮০-১৯৬১

স্বামী বিবেকানন্দ অনুজ বহুভাষাবিদ ভূপেন্দ্রনাথ যথার্থ অর্থে ছিলেন একজন পণ্ডিত মানুষ। নানান বিষয়ে ছিল অগাধ জ্ঞান। ১৯০২ সালে ব্যারিস্টার পি. মিত্রের বৈপ্লবিক সংগঠনের সংসর্গে আসেন। অরবিন্দ ঘোষ, ভগিনী নিবেদিতা ও যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (নিরালম্ব স্বামী) আদর্শে উদ্দীপ্ত ভূপেন্দ্রনাথ ১৯০৬ সালে সাপ্তাহিক 'যুগান্তরে'র সম্পাদক হন। প্রচার পুস্তিকা 'সোনার বাংলা' প্রকাশের জন্য ১৯০৭ সালে কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পব আমেরিকা যান ছদ্মবেশে। সেখানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সময় গদরপার্টি ও সোস্যালিস্ট ক্লাবের সান্নিধ্য তাঁকে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারায় উদ্দীপ্ত করে। ১৯১৪ সালে বার্লিনে অন্যান্য ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে মিলিত হন। ১৯১৬-১৮ সালে বার্লিন কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৯২১ সালে মস্কো যান কমিউনিস্টদের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের আহ্বানে। এই সময়ে ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে একটি থিসিস তুলে দেন লেনিনের হাতে। ১৯২৯ সালে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য হন। আইন অমান্য আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

* জন্ম কলকাতায়।

ভূপেন্দ্রনাথ বসু ১৮৫৯-১৯২৪

সফল আইন ব্যবসায়ী ভূপেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক কর্মজীবনের শুরু সুরেন্দ্রনাথের অনুগামী হিসাবে। কলকাতা কর্পোরেশনের কমিশনার ও সভাপতি হন। কিন্তু ১৮৯৮ সালে সরকারি ব্যবস্থাপনার প্রতিবাদে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কর্পোরেশনের কাজে ইস্তফা দেন। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বক্তব্য রাখেন ১৯০৬ সালে বরিশালে বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনে। তারপর বেশ কয়েক বছর কংগ্রেস রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। ১৯১৫ সালে ব্যবস্থা পরিষদে যোগ দেবার পর বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদে কাজ করে, অবশেষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার হন। দেশীয় শিল্পবিকাশে তাঁর ছিল আন্তরিক অনুরাগ। বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল, বেঙ্গল হোসিয়ারি কোম্পানি, বেঙ্গল পটারি ওয়ার্কস এরকম সংস্থার সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল।

* জন্ম কলকাতায়।

ভূপেশচন্দ্র নাগ ১৮৮২-১৯৩৮

বহুভাষাবিদ ভূপেশচন্দ্র নাগ ছিলেন বহরমপুর কমার্স কলেজের অধ্যাপক। বিপ্লবী পুলিন দাসের সহকর্মী ছিলেন। প্রথম জীবনে ঢাকার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে বিনা বেতনে অধ্যাপনা করেন। জীবনের শেষ ৫০ বছর তিনি মুর্শিদাবাদেই ছিলেন। তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা ১৮১৮ সালের আইনে সর্বপ্রথম যে ৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়, তার মধ্যে ছিলেন ভূপেশচন্দ্র। অন্য ৮ জন হলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত, পুলিন দাস, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা, শচীন্দ্রকুমার বসু, সতীশচন্দ্র চ্যাটার্জি, সুবোধ মল্লিক, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও কৃষ্ণকুমার মিত্র।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বারদি গ্রামে।

মতিলাল রায় ১৮৮৩-১৯৫৯

চন্দননগরের এই বিপ্লবী ছিলেন বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের প্রথম যুগের অন্যতম সংগঠক। চন্দননগরকে কেন্দ্র করেই ছিল তাঁর কর্মকাণ্ড। বহু পলাতক বিপ্লবী তাঁর আবাসে নিরাপদ আশ্রয় পেত অথবা নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন। ১৯১০ সালে আত্মগোপন করে অরবিন্দ ঘোষ তাঁর আশ্রয়ে উঠেছিলেন। সেখান থেকে অরবিন্দ চলে যান পণ্ডিচেরি। ১৯১৪ সালে চন্দননগরে তাঁর স্থাপিত প্রবর্তক সঙ্ঘ বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

*জন্ম চন্দননগরে।

মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা ১৮৫৮-১৯১৯

স্বদেশি যুগের এক অসাধারণ মানুষ। বিভিন্ন বিপ্লবী দলকে অর্থ সাহায্য করতেন। স্বদেশি ডাকাতির অভিযোগে তাঁকে রেঙ্গুনের কাছে ইনসিন জেলে ২ বছর আটক রাখা হয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কলকাতা অধিবেশনে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা ভাষায় বক্তৃতা করেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যোগ দেন ১৯০৫ সালে কলকাতায়। ১৯০৬ সালের ১৪ এপ্রিল তাঁর ছেলে চিত্তরঞ্জন 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি দেওয়ায় পুলিশের লাঠিতে মর্মান্তিক ভাবে আহত হলে, তাঁকে মঞ্চে উপস্থিত করে জ্বালাময়ী ভাষায় ভাষণ দেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে বরিশালের বানরিপাড়ায়।

মনোরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৮৯৮-১৯১৫

বালেশ্বরে বিপ্লবী বাঘাযতীনের অন্যতম সহযোদ্ধা। দলনেতার নির্দেশে আত্মসমর্পণ করেন। পরে ফাঁসি হয়।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুরের খেয়ারডাঙা।

মানবেন্দ্রনাথ রায় ১৮৮৭-১৯৫৪

প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। কর্মবহুল বৈচিত্রময় বৈপ্লবিক জীবন। নানা নামে বিভিন্ন দেশে পরিচিত ছিলেন। যুগান্তর দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হলেও, মজঃফরপুর ও মুরারীপুকুর বোমা মামলায় যখন বেশির ভাগ বিপ্লবী ধরা পড়েন, তখন বাঘাযতীনের সহকর্মী হিসাবে স্বতন্ত্র বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন। জার্মান অস্ত্র সাহায্যে দেশকে স্বাধীন করার পরিকল্পনায় তাঁর মুখ্যভূমিকা ছিল। ১৯১৫ সালে ভারত ত্যাগের পর প্রথম জাপানে রাসবিহারী বসু এবং নতুন চীনের সান ইয়াৎসেনের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমেরিকা যান। সেখান থেকে মেক্সিকো। ১৯২০ সালে লেনিনের আমন্ত্রণে মস্কো যান। তাসখন্দে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠনে অন্যতম

উদ্যোগী ছিলেন। ১৯২২ সালের তৃতীয় আন্তর্জাতিকের অন্যতম সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯২৩ সালের মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম অভিযুক্ত হলেও, তাকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। কমিউনিস্ট আন্দোলনের সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিন্ন হয় ১৯২৯ সালে। তারপর ১৯৩০ সালে ড. মুহম্মদ ছদ্মনামে ভারতে প্রবেশ করে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত কারাগারে ছিলেন। মুক্ত হওয়ার পর প্রথমে কংগ্রেস অধিবেশনে সম্মানিত অতিথি হিসাবে যোগ দেন। ১৯৩৯ সালে Radical Humanist পত্রিকা এবং ১৯৪৩ সালে Radical Humanist Party গঠন করেছিলেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরের খেপুতে।

মুকুন্দ দাস ১৮৭৮-১৯৩৪

বিদেশি দ্রব্য বর্জনে মুখ্যভূমিকা নিয়েছিলেন চারণকবি মুকুন্দ দাস। পিতার কর্মক্ষেত্র বরিশালেই তিনি মানুষ। স্থানীয় রাজনীতির প্রাণপুরুষ। তাঁকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। গ্রামে গ্রামে দেশাত্মবোধক সঙ্গীত পরিবেশন এবং স্বদেশি যাত্রা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সারা দেশকে জাগিয়ে তোলেন। সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর সঙ্গীতের অনুরাগী। একাধিকবার কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালের অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় তাঁর যাত্রাপালা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়।

মৌলবি লিয়াকত হোসেন (?)

জাতীয়তাবাদী এই মুসলিম নেতা স্বদেশি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি ও সমন্বয়ের অগ্রদূত। কোনরকম সরকারি রক্তচক্ষু, আইনের ভয় তাঁর ছিল না। যুবকদের নিয়ে 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিসহ শোভাযাত্রা করতেন অকুতোভয়ে। সরকারি আইন অমান্য করে সভাসমিতি অনুষ্ঠান ও ভাষণ দেন তাঁর কাছে ছিল সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার। ফলে সাধারণ মানুষের মনে পুলিশের আতঙ্ক দানা বাঁধতে পারেনি।

যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (নিরালম্ব স্বামী) ১৮৭৭-১৯৩০

দুঃসাহসিক এই বিপ্লবী যতীন্দর উপাধ্যায় নামে অরবিন্দের সহযোগিতায় বরোদার সেনাবিভাগে যোগ দেন। সেখানে সামরিক শিক্ষা গ্রহণের পর বাংলায় ফিরে ১৯০২ সালে কলকাতার ১০৮ সার্কুলার রোডে যে বিপ্লবীকেন্দ্র গড়ে তোলেন, তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। ঐ বছর অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। বারীন ঘোষের সঙ্গে মতান্তর ঘটায় যুগান্তর দল পুনর্গঠিত করেন। ১৯০৬ সালে বিপ্লব সংগঠনের কাজে সারাভারত ভ্রমণ করার সময়ে সোহম স্বামীর সংস্পর্শে আসেন। তিব্বতী বাবার কাছে দীক্ষাগ্রহণের পর তিনি 'নিরালম্ব স্বামী' নামে পরিচিত হন। ১৯০৭ সালে 'সন্ধ্যা' পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯০৮ সালে আলিপুর বোমা মামলায় অভিযুক্ত হলেও মুক্তি পান। বিপ্লবী বাঘাযতীনের অন্যতম পরামর্শদাতা ছিলেন। জীবনের শেষপর্বে স্বগ্রামে ফিরে এসে সেখানে একটি আশ্রম নির্মাণ করেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানে।

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাযতীন) ১৮৭৯-১৯১৫

এই অসমসাহসী বিপ্লবী ছোরা হাতে একটি বাঘ মারার জন্য বাঘাযতীন নামে পরিচিত হন। ১৯০৬ সালে গুপ্ত বিপ্লবীদল যুগান্তরে যোগ দেন। আলিপুর বোমা মামলার পর বারীন ঘোষ প্রমুখ বিপ্লবী আন্দোলন থেকে সরে যেতে চাইলে, বাঘাযতীন যুগান্তর দলের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। জার্মান সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে রাসবিহারী বসু, যদুগোপাল মুখার্জি প্রভৃতির সহযোদ্ধা ছিলেন। জার্মান জাহাজ থেকে অস্ত্র নামাবার জন্য যতীন্দ্রনাথ বালেশ্বর যান। পুলিশ তাদের অনুসরণ করে। ১৯১৫ সালের ৯ আগস্ট বাঘাযতীন ও তাঁর ৪ সহযোগীর সঙ্গে পুলিশের গুলির লড়াই শুরু হলে, বাঘাযতীন গুরুতর আহত হয়ে পরদিন মারা যান। ঘটনাস্থলেই মারা যান চিত্তপ্রিয়। নীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মনোরঞ্জন সেনগুপ্তের ফাঁসি হয়। আর একজন সহযোগী যতীন্দ্রচন্দ্র পালের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। কিন্তু নিদারুণ অত্যাচারে উন্মাদ হয়ে বহরমপুর জেলে ১৯২৪ সালের ৪ ডিসেম্বর মারা যান। বাঘাযতীনের মৃত্যুর পর দুর্ধর্ষ পুলিশ কমিশনার টেগার্ট অবনত মস্তকে বীর বিপ্লবীর প্রতি শ্রদ্ধা জানান।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলায়।

যতীন্দ্রমোহন রায় ১৮৮৩-১৯৫১

রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণের জন্য রাজসাহী সরকারি কলেজ থেকে বহিষ্কৃত হলেও, ঐ কলেজ থেকেই ১৯০৭ সালে বি.এ. পাশ করেন। বগুড়ায় শিক্ষকতা করার সময় 'গণমঙ্গল' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা, কুটির শিল্পের এবং শিক্ষার বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে। বাঘাযতীনের সংস্পর্শে বিপ্লবী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েছিলেন। বালেশ্বর যুদ্ধের পর অন্তরীণ হন। পরে কংগ্রেস রাজনীতিতে সক্রিয় হয়ে কয়েকবার কারারুদ্ধ থাকেন। তিনি সাধারণ জীবনযাপন করতেন, চরকায় সুতো কাটতেন এবং খদ্দরের পোশাক পরতেন।

* জন্ম ফরিদপুরে গোয়ালন্দে।

যতীন্দ্রলোচন মিত্র ১৮৯৫-১৯৬৮

প্রথম জীবনে অনুশীলন সমিতির সদস্য। বাঘাযতীনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে জড়িত ছিলেন। স্বাধীন ভারতের যে প্রতীক বিপ্লবীরা নির্বাচিত করেছিলেন, যতীন্দ্রলোচন সেই প্রতীকের পরিকল্পক। এই বিশ্বস্ত বিপ্লবী ছিলেন তাঁদের অস্ত্রাগারের রক্ষক ও অস্ত্র মেরামত কারখানার পরিচালক। রডা কোম্পানির অপহৃত দুটি পিস্তল তাঁর কাছে পাওয়া৷ পর পুলিশ তাঁকে আটক করে। তখন তিনি শি:পুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্র। মেদিনীপুর জেলে বন্দি থাকাকালে, জেল কর্তৃপক্ষের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘটে অংশ নেন। ১৯২০ সালে মুক্তি পেয়ে বেশ কয়েক বছর অন্তরীণ থাকার পর গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

* জন্ম কলকাতায়।

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৮৮৬-১৯৭৬

প্রখ্যাত চিকিৎসক যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৯০৫ সালে অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। জার্মান অস্ত্র সাহায্যে ভারতে সশস্ত্র বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯১৫ সালে। যাদুগোপাল ছিলেন তার বৈদেশিক দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত। বাঘাযতীনের মৃত্যুর পর যুগান্তর দলের দায়িত্ব পড়ে তাঁর ওপর। তাঁকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ২০ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করে সরকার। জেলে আটক ছিলেন ১৯২৩-২৭। মুক্তির পর বাংলা থেকে বহিষ্কৃত হন। ১৯৪২-৪৫

পর্যন্ত আবার আটক ছিলেন হাজারিবাগ জেলে। এই সময়ে জয়প্রকাশ নারায়ণ ছিলেন তাঁর কারা সঙ্গী। তাঁদের জেল থেকে পালাবার ব্যবস্থা করে দেন। যুগান্তর দলের কর্ণধার হিসাবে সংগঠন বন্ধ করে, কংগ্রেসের মাধ্যমে গণআন্দোলনের নির্দেশ দিয়েছিলেন বিপ্লবী কর্মীদের।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের তমলুকে।

যোগেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৯৫-১৯৬৯

সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী যোগেশচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের শুরু অনেক আগেই। বিপ্লবী পূর্ণ চক্রবর্তীর প্রভাবে কুমিল্লায় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। তারপর যোগেশচন্দ্র সারাভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মী হিসাবে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি ও ত্রিপুরা অঞ্চলের দায়িত্ব পান। ১৯১৬ সালের ৯ অক্টোবর কলকাতায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর মুক্তি পান ১৯২০ সালে এবং কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেন। যোগেশচন্দ্রর কর্মক্ষেত্র ছিল বাংলার বাইরে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। উত্তরপ্রদেশে তাঁর দলে যুক্ত হয়েছিলেন ভগৎ সিং, বটুকেশ্বর দত্ত এবং অজয় ঘোষ। ১৯২৪ সালের ১৮ অক্টোবর আবার গ্রেপ্তার হন। যোগেশচন্দ্র হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেন এবং পরে নাম হয় "হিন্দুস্থান সোস্যালিস্ট আর্মি"। পরে এই সংগঠন দুঃসাহসিক বৈপ্লবিক কার্যে ব্রিটিশ সরকারের আতঙ্কের কারণ হয়ে ওঠে। ১৯২৭ সালে কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলায় তাঁর দ্বীপান্তর হয়। আগ্রা জেলে থাকাকালে ১৯৩৪ সালের ১১ জুলাই থেকে ২৯ নভেম্বর পর্যন্ত অনশন করেন। ১৯৩৫ সালে অনশন করেন ১১১ দিন। বাংলা সরকার ১৯৩৭ সালে তাঁকে বাংলা থেকে বহিষ্কার করে। ১৯৪০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন আর.এস.পি.। ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ১৯৩৪ সালে একজন সাব ইন্সপেক্টর হত্যার অপরাধে। ১৯৫৩ সালে আর.এস.পি.র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং ১৯৫৮ সালে কংগ্রেস যোগ দেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকার গাওদিয়ায়।

রজনীকান্ত গুহ ১৮৬৭-১৯৪৫

স্বদেশ প্রেমিক, বহুভাষাবিদ, ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক রজনীকান্তর দীর্ঘ শিক্ষকতা জীবন নানা টানাপোড়েনে অতিবাহিত হয়েছিল। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে (১৮৯০), ভবানীপুর এল. এম. এস কলেজ (১৮৯৪), সিটি কলেজ (১৮৯৪-৯৬), রামমোহন রায় সেমিনারি (১৮৯৭-১৯০১), ব্রজমোহন কলেজ (১৯০১-১৯১১), ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজ (১৯১১-১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৩-১৪) এবং সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। একাধিকবার সরকারি নির্দেশে তাঁর চাকরি যায়। তিনি ব্রজমোহন কলেজ ও সিটি কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

*জন্ম ময়মনসিংহের জামুরিয়ায়।

রজনীকান্ত সেন ১৮৬৫-১৯১০

প্রধানত দেশাত্মবোধক ও ধর্মমূলক গান রচনার জন্য বিখ্যাত। আইনজীবী রজনীকান্ত রাজসাহীতে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়র সঙ্গে পরিচিত হন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের পাবনা জেলার ভাঙাবাড়ি।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১-১৯৪১

বিশ শতকের মানুষই কেবল নয়, বিগত পাঁচশ বছরের মধ্যে তুলনাযোগ্য অপর কোন বাঙালি

মনীষীর সন্ধান পাওয়া কঠিন। সাহিত্য, শিল্প, শিক্ষাক্ষেত্র, রাজনীতি থেকে সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে আজও তাঁর প্রভাব অতুলনীয়। বাঙালির আত্মোপলব্ধি ও আত্মবিশ্বাসের সাধনায় তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। বাঙালির মজ্জায় আজও রবীন্দ্র সঙ্গীতের অনুপ্রেরণা। ভারত ও বাংলাদেশ দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত তাঁর লেখা গান। বাঙালি যতদিন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল থাকবে, ততদিন রবীন্দ্র উপস্থিতি থাকবে ধ্রুবতারার মত।

*জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়।

রবীন্দ্রমোহন সেন ১৮৯২-১৯৭২

আর.এস.পি. দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রমোহন সেন ১৯০৮ সালে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। রাজনৈতিক সহকর্মীদের মধ্যে ছিলেন ত্রৈলোক্য মহারাজ, রমেশ আচার্য এবং প্রতুল গাঙ্গুলি। তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ রাষ্ট্রশক্তির পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত, তারপর ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত এবং ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত জেলে আটক ছিলেন। ১৯২৮ সালে মুক্তির পর সুভাষচন্দ্রের সান্নিধ্যে আসেন। ১৯৪০ সালের রামগড় কংগ্রেসে রবীন্দ্রমোহনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ভারতরক্ষা আইনে আটক ছিলেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকার বজ্রযোগিনী।

রমেশ আচার্য ১৮৮৭-১৯৬৫

রাজনীতিতে হাতেখড়ি শিক্ষক ও পিতামাতার অনুপ্রেরণায়। ১৯০৭ পুলিন দাসের পরামর্শে অনুশীলন সমিতির সদস্য হন। সমিতির ময়মনসিংহ জেলার দায়িত্বভার তাঁর ওপর অর্পণ করা হয় ১৯১০ সালে। বি.এ. ক্লাসে ভর্তির সমস্ত টাকা সোনারং জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করেন। পরে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন (১৯১০-১১)। ১৯১১ সালে প্রথম গ্রেপ্তার হন এবং মুক্তি পাওয়ার পর বিপ্লবী কাজকর্মে জড়িয়ে পড়েন আরও গভীর ভাবে। সংগঠনকে মজবুত করা এবং অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ প্রধান দায়িত্ব হয়ে ওঠে। ১৯১৩ সালে বরিশাল ষড়যন্ত্র মামলায় ১২ বছর জেল হয়। মুক্তির পর কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে যোগ দেন। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত জেলে ছিলেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর আরও ৮ বছর জেলে ছিলেন। ১৯৪০ সালে রামগড় কংগ্রেসে যোগ দেন। ঘাটশিলার যুবসম্মেলনে ভাষণ দেওয়ার পর আবার গ্রেপ্তার হন। ১৯৪৬ সালে মুক্তি পান। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর রাজনৈতিক সংশ্রব ত্যাগ করেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকায়।

রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৪৮-১৯০৯

ব্যারিস্টার, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত ১৮৮৩ সালে প্রথম ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৯৭ সালে ঐ পদ ত্যাগ করে ১৮৯৮ সালে দাদাভাই নৌরজি ও উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দেন। ১৮৯৯ সালে কংগ্রেসের লখ্‌নউ অধিবেশনে সভাপতি, ১৯০৭ সালে সুরাটে ভারতীয় শিল্প সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভাপতি ও আজীবন সদস্য ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারের ভারত শোষণের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন।

* জন্ম কলকাতায়।

রাজনারায়ণ বসু ১৮২৬-১৮৯৯

১৯০৫ সালে বাঙালির যে মানসিক জাগরণ, তার অন্যতম পুরোধা ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজের এই কৃতী ছাত্র ছিলেন ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী। ১৮৫৮ সালে মেদিনীপুর জেলা স্কুলের প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব থেকে অবসর নেওয়ার পর শ্রমিক-কৃষকদের জন্য রাত্রিকালীন বিদ্যালয় এবং বালিকাদের শিক্ষার জন্য একটি নারী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। নবগোপাল মিত্রের হিন্দুমেলা সৃষ্টির পিছনে ছিল রাজনারায়ণের পরিকল্পনা। 'সঞ্জীবনী সভা' নামে একটি গুপ্ত সংগঠনেরও ছিলেন অন্যতম উদ্যোগী ও সভাপতি। বাংলার যুব সমাজকে বিপ্লবমন্ত্রের উদ্বুদ্ধ করার পিছনেও এই সভার অবদান রয়েছে। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের সভ্যও হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের পরমলাভ এই মানুষটিকে পেয়েছিলেন গৃহশিক্ষক হিসাবে।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণার বোড়ালে।

রাধাচরণ পাল ১৮৯২-১৯১৪

বিপ্লবী দলের এই সাহসী যোদ্ধা শিয়ালদহ ডাকাতি মামলায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মারা যান।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ফরিদপুরের ভোজেশ্বরে।

রাধাচরণ প্রামাণিক ১৮৮৫-১৯১৭

বিপ্লবীদলে যুক্ত হন পূর্ণদাসের প্রেরণায়। বাঘাযতীনের দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একটি পিস্তল ও কয়েক রাউণ্ড গুলি সহ পুলিশ তাঁকে গ্রেপ্তার করে। একাধিক মামলায় অভিযুক্ত করা হয়। গার্ডেনরীচ ডাকাতির পিছনে ছিলেন নরেন ভট্টাচার্য (মানবেন্দ্রনাথ রায়), পরীক্ষিৎ মুখোপাধ্যায়, হীরালাল দাস এবং সরোজভূষণ দাস। এঁদের সঙ্গে রাধাচরণকে যুক্ত করে পুলিশ গার্ডেনরীচ ডাকাতি মামলা খাড়া করে। দলনেতার নির্দেশে রাধাচরণ স্বীকারোক্তি দেন তিনি এই ডাকাতি করেছেন। ফলে মূল অভিযুক্তরা ছাড়া পেয়ে যায়। রাধাচরণের ৭ বছর জেল হয়। জেলে রোগাক্রান্ত হয়ে বিনা চিকিৎসায় মারা যান।

রামপ্রাণ গুপ্ত ১৮৬৯-১৯২৭

ইতিহাস গ্রন্থের লেখক ও গ্রন্থকার হিসাবে রামপ্রাণ গুপ্ত সুনাম অর্জন করেছিলেন। প্রকাশিত গ্রন্থ-সংখ্যা কম হলেও, সাময়িক পত্রিকার পাতায় ছড়িয়ে আছে অসংখ্য মূল্যবান রচনা। তাঁর মত অসাম্প্রদায়িক মানুষ সেকালেও ছিল দুর্লভ। ইসলামধর্ম ও ধর্মীয় নেতাদের সম্পর্কে কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থ লিখেছিলেন। স্বদেশ প্রেমিক রামপ্রাণ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে যোগ দেন সক্রিয় ভাবে। গ্রামীণ ও কুটির শিল্প প্রসারে নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাছাড়া গান্ধীর আন্দোলনের অন্যতম সমর্থক।

*জন্ম ময়মনসিংহের কেদারপুর।

রামমোহন রায় ১৭৭২-১৮৩৩

যাঁদের সঞ্জীবনী মন্ত্রে বাঙালির নবজীবনের দীক্ষার সূচনা, তাঁদের অন্যতম রামমোহন রায়। সমাজ জীবনের রুদ্ধ দুয়ারকে অর্গলমুক্ত করে, নতুন বিশ্বের চিন্তাধারার আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবকালকে মনে রেখে আমরা ভাবতেও পারি না, কি দুঃসহ প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়েছিল। 'জবরদস্ত মৌলবি' যৌবন শুরুর আগেই হিন্দু ও মুসলিম

ধর্মের সারসত্যকে জেনে নিয়ে মূর্তিপূজা বিরোধী একেশ্বরবাদী হয়ে ওঠেন। জাতিভেদ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, অস্পৃশ্যতা, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ যাবতীয় সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও সাফল্য, ইংরেজি শিক্ষার প্রসার, প্রেস আইন বিরোধিতা, শাসনব্যবস্থার সংস্কার, কৃষকের রাজস্ব পরিমাণ নির্ধারণ এরকম অসংখ্য বৃহৎ যজ্ঞের তিনি ছিলেন পুরোহিত। বিলেতের পার্লামেন্টে ভারতবাসীর দাবি জানাতে ওদেশে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। রামমোহনের জীবন ও কর্ম শিক্ষিত বাঙালির চোখের সামনে যে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা প্রদীপ্ত করেছিল, তা স্বল্পকালের মধ্যেই একটি মানসিক রোগাক্রান্ত জাতিকে সবল ও সচল করে তোলে। তাঁর 'আত্মীয় সভা' গঠন এবং ব্রাহ্মসমাজ গঠন বাংলার ইতিহাসের গতিধারাকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেছিল।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে হুগলি জেলার রাধানগরে।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৩

প্রখ্যাত সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন অন্যতম শিক্ষাবিদ। 'ধর্মসিন্ধু', 'দাসী', 'প্রদীপ', 'প্রবাসী', 'মডার্ন রিভিউ'-ছিল তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা। এই দৃঢ়চেতা সাংবাদিক বারবার সরকারি জরিমানার কোপে পড়েও নিজস্ব পথ থেকে সরে আসেন নি। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সঙ্গে রামানন্দর ছিল নিবিড় সংযোগ। আজও 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউ' সমকালীন সাংস্কৃতিক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক জীবনধারার অন্যতম দর্পণ।

*জন্ম বাঁকুড়ার পাইকপাড়ায়।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১৮৬৪-১৯১৯

একনিষ্ঠ দেশপ্রেমিক বিজ্ঞানী, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ। রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) পদার্থবিদ্যা ও রাসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। পরে অধ্যক্ষ হন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রতিবাদে তাঁর বিখ্যাত রচনা 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। রামেন্দ্রসুন্দরের অন্যতম কর্মক্ষেত্র ছিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ।

*জন্ম মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকান্দি গ্রামে।

রাসবিহারী ঘোষ ১৮৪৫-১৯২১

১৯০৫ সালে জাতীয় শিক্ষা পরিবদ গঠনে যাঁরা উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁদের অন্যতম ছিলেন খ্যাতনামা আইনজীবী রাসবিহারী ঘোষ। দেশীয় শিল্প বিকাশের লক্ষ্য নিয়ে কলকাতার কাছেই একটি ম্যাচ ফ্যাক্টরি স্থাপন করেন। ১৯০৬ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ছিলেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সভাপতি। কারিগরি বিদ্যা সম্প্রসারণে এককালীন ২ লক্ষ টানা দান ছাড়াও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু লক্ষ টাকা দান করেন। তার দানের ক্ষেত্র ছিল আরও বহু বিস্তৃত। বড়লাটের শাযন পরিষদের সভাপতি (১৮৯১) এবং সুরাটে (১৯০৭) ও মাদ্রাজে (১৯০৮) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে বর্ধমানের খণ্ডঘোষে।

রাসবিহারী বসু ১৮৮৫-১৯৪৫

ভারতে বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা। দেশে ও বিদেশে তাঁর কর্মকাণ্ড নানান বিস্ময়কর ঘটনায় পূর্ণ। সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। সরকার বিপুল পরিমাণ

অর্থ পুরস্কার ঘোষণা করলেও তাঁকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। জাপান পালিয়ে যান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পূর্ব ভারতের ভারতীয়দের নিয়ে আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ বা ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেন্ডেন্স লিগ অফ ইস্ট এশিয়া গঠন করে। পরে এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন সুভাষচন্দ্র বসু।

রেবতীচরণ নাগ ?-১৯১৭

ঢাকা অনুশীলন সমিতির সভ্য রেবতীচরণ নাগ থাকতেন ভাগলপুরে। সেখানে কিছু ছাত্রকে সঙ্গী করে ১৯১৬ সালে যে বিপ্লবী সংগঠন গড়ে তোলেন, বিভিন্ন স্থানে তার শাখা ছড়িয়ে পড়ে। বাংলার পলাতক বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থলও ছিল সেখানে। ১৯১৬ সালে গ্রেপ্তার এড়াতে পালিয়ে যান। পরের বছর তিনি মারা যান। কিন্তু মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি।

* জন্ম ত্রিপুরার উপালতা।

ললিতচন্দ্র চৌধুরী ?-১৯১৭

মুন্সিগঞ্জে নানা মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত ললিতচন্দ্র চৌধুরীর ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয় ১৯১৯ সালে। তাঁকে পঞ্জাবের মন্টগোমারী জেলে পাঠান হয়। জেলেই মারা যান।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে কুমিল্লার বাগবাড়ি।

ললিতমোহন দাস ১৮৬৮-১৯৩২

কৃতী ছাত্র ললিতমোহন দর্শনশাস্ত্রে এম.এ. পাশ করেন প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে। তারপর শিক্ষকতা ও অধ্যাপনা শুরু। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। শিক্ষকদের রাজনৈতিক আন্দোলন নিষিদ্ধ করে রিজলি সার্কুলার জারি হলে, সিটি কলেজের অধ্যাপনার চাকরি ছেড়ে দেন। জীবিকার্জনে আজীবন গৃহশিক্ষকতা করেছেন। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সংযোগ ছিল আমৃত্যু।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে বরিশাল জেলায়।

শচীন বসু ?-১৩৪৭ ব.

অ্যান্টি সার্কুলার সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ছাত্র-নেতা হিসাবে সেকালে সর্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। রিপন কলেজের (বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) ৪র্থ বার্ষিক ছাত্র থাকার সময় 'বন্দেমাতরম্' সম্প্রদায় গড়ে তোলেন। ৩নং আইনে বন্দি অবস্থায় রাওয়ালপিণ্ডি জেলে ছিলেন ১৯০৮ সালে। পরবর্তীকালে 'ব্যবসা ও বাণিজ্য' পত্রিকা সম্পাদনা করতেন।

শচীন্দ্রনাথ সান্যাল ১৮৯৩-১৯৪৫

এই বাঙালি বিপ্লবীর কর্মক্ষেত্র ছিল উত্তরপ্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে। কলকাতার বিপ্লবী দলে যোগ দেন ১৯০৭ সালে। তারপর বারাণসী ফিরে গিয়ে বিপ্লবীদের সংগঠন 'ইয়ং ম্যানস্ অ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন। রাসবিহারী বসুর বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য সহকর্মী হয়ে ওঠেন। ব্রিটিশ সরকার উচ্ছেদের জন্য ৭ম রাজপুত রেজিমেন্টে গোপন কার্যকলাপ চালান। ১৯১৫ সালে লাহোর ও বেনারস ষড়যন্ত্র মামালায় অভিযুক্ত হয়ে আন্দামানে দ্বীপান্তরিত হন এবং মুক্তি পান ১৯২০ সালে। উত্তর প্রদেশে হিন্দুস্থান রিপাবলিকান অ্যাসোসিয়েশন গঠন করেছিলেন। বিদেশি অস্ত্র আমদানির অভিযোগে ১৯২৫ সালে এবং কাকোরি ষড়যন্ত্র মামলার অভিযোগে ১৯৪১ সালে দুবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গোরখপুরে অন্তরীণ থাকা

কালে তাঁর মৃত্যু হয়।

* জন্ম উত্তরপ্রদেশের বারাণসীতে।

শম্ভু মুখোপাধ্যায় ১৮৯১-১৯৭৭

অল্প বয়সেই জাতীয় আন্দোলনে যুক্ত হন। বিপ্লবীদের সঙ্গে ছিল ঘনিষ্ঠতা। দক্ষিণেশ্বর বোমা মামলায় অরবিন্দের সহকারী হিসাবে অভিযুক্ত হন। পরে গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে যোগ দেন।

শশাঙ্কশেখর (অমৃতলাল) হাজরা ১৮৮৬-১৯৬৩

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনুশীলন সমিতিতে যোগ দেন। যুবকদের লাঠি খেলা, ছোরা ও তলোয়ার খেলা শেখাতেন। ১৯০৮ সালের জুন মাসে ঢাকার বাহ্রাগ্রামে যে ডাকাতি হয়, তার নেতা ছিলেন শশাঙ্কশেখর। ঢাকা অনুশীলন সমিতির সঙ্গে চন্দননগরের মতিলাল রায়ের দলের মধ্যে সংযোগ সেতু তৈরিও তাঁর অবদান। গর্ডন হত্যার প্রচেষ্টা এবং মৌলবিবাজার বোমার ঘটনায় অভিযুক্ত শশাঙ্কশেখর এবং তাঁর তিন সঙ্গীকে রাজাবাজারের একটি বাড়ি থেকে বোমার মশলাসহ পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে ১৫ বছর কারাদণ্ড হয়।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়।

শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৯৭-১৯৮২

শ্রমিক নেতা হিসাবে পরিচিত হলেও, স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থায় যুগান্তর দলে যোগ দিয়েছিলেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সোভিয়েতের সাহায্য লাভের আশায় হাঁটাপথে আফগানিস্থান হয়ে মস্কো যাত্রা করেন। কাবুলে রাজা আমানুল্লার মাধ্যমে রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সে সময়ে কাবুলে অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকার গঠিত হয়। মস্কোয় বলশেভিক নেতাদের সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর লণ্ডন যান। কিন্তু ভারতে যাবার পাশপোর্ট না পাওয়ায় এক জটিলতার মধ্যে পড়েন। অবশেষে ১৯২৫ সালে ভারতে ফিরে শ্রমিক আন্দোলনে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। মোট ১০ বছর তাঁকে জেলে কাটাতে হয়েছিল। ১৯৩৫ সালে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠিত হলে, শিবনাথ সেই পার্টিতে যোগ দেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে খুলনা জেলার ব্রাহ্মণরাংদিয়ায়।

শিবনাথ শাস্ত্রী ১৮৪৭-১৯১৯

অসাধারণ মানুষ ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। সমাজ সংস্কারক, শিক্ষাবিদ শিবনাথ ১৮৭৭ সালে যে বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তোলেন, তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার, জাতীয়বোধের উন্মেষ এবং রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার উদ্যোগ। এক্ষেত্রে সহযোগী ছিলেন আনন্দমোহন বসু এবং সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁদেব দুজনের সহযোগিতায় ১৮৭৯ সালে 'সিটি স্কুল' স্থাপন করে। ভাবতবাসীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম পুরোহিত ছিলেন শিবনাথ। তিনি ছিলেন নারী স্বাধীনতার স্বপক্ষে। শিবনাথের 'যুগান্তর' উপন্যাসের অনুসরণে ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'যুগান্তর' পত্রিকা। তাঁর 'আত্মচরিত' এবং 'রামতনুলাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' আজও উনিশ শতকের বাঙালি জীবনের অন্যতম আকর গ্রন্থ।

*জন্ম চব্বিশ পরগণার মজিলপুর।

শিশিরকুমার গুহ ?

১৯০৭ সালের ২৩ ডিসেম্বর ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অ্যালানকে হত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে আত্মগোপন করেন। পুলিশ তাঁকে ৭ বছরেও খুঁজে পায়নি। তারপর অন্য এক অভিযোগে ১ বছর কারাদণ্ড হয়। মুক্ত হওয়ার পর স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকেন।

শিশিরকুমার ঘোষ ১৮৪০-১৯১১

১৮৬৮ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যশোহরে স্বগ্রাম থেকে সাপ্তাহিক "অমৃতবাজার পত্রিকা" প্রকাশ করেছিলেন। তার আগে ১৮৫৯-৬০ সালে হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকায় নীলকর বিরোধী সংবাদ প্রেরণ করে আলোড়ন তোলেন। যার ফলে জনগণের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। স্বদেশপ্রেমিক নির্ভীক সাংবাদিক শিশিরকুমার সেকালেই সাংবাদিকতায় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। নীল বিদ্রোহকে বাংলার প্রথম বিপ্লব হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। সেকালে যাবতীয় দমনমূলক সরকারি আইনের বিরোধিতায় অমৃতবাজার পত্রিকার কণ্ঠস্বর ছিল সরব। শিশিরকুমার ১৮৭৮ সালে পত্রিকার দায়িত্বভার ত্যাগ করেন এবং রাজনীতি থেকেও দূরে সরে যান।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর।

শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৮৯১-১৯৪৯

বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথের কর্মক্ষেত্র ছিল বিদেশে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের শেষে ১৯১৭ সালে রাজনীতিতে যোগ দেন। ঐ বছর তিনি পালিয়ে চলে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বার্লিন কমিটির কাজকর্মে সক্রিয় হন। তারকনাথ দাসের সহযোগিতায় 'ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ' গঠিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কাছে ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষে প্রচার চালাতে থাকলে, মার্কিন সরকার তাঁকে গ্রেপ্তারের উদ্যোগ নেয়। গ্রেপ্তারের আগেই পালিয়ে যান মেক্সিকো। কিন্তু সেখান থেকে মানবেন্দ্রনাথ তাঁকে বিতাড়িত করেন। নদী সাঁতরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করার পর চারবছর কারাদণ্ড ভোগ করেছিলেন। ১৯৪৭ সালে লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনের ডেপুটি সেক্রেটারির কাজে যোগ দেন। সেখানেই মারা যান।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার কৃষ্ণনগরে।

শৈলেশ্বর বসু ১৮৮৬-১৯২৮

সে বছর হরিনাভি স্কুলের ছাত্ররা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিল। স্কুলের কর্তৃপক্ষ সম্বর্ধনা জানাবার অপরাধে কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করে। তাদের মধ্যে ছিলেন পরবর্তীকালের বিখ্যাত এম. এন. রায় এবং শৈলেশ্বর বসুও। শৈলেশ্বর পরে যোগ দেন অনুশীলন সমিতিতে। বাঘাযতীনের বিশ্বস্ত এবং সহকারী হিসাবে বৈপ্লবিক কাজকর্মে গভীরভাবে জড়িয়ে পড়েন। জার্মানি থেকে অস্ত্র আমদানি ও বালেশ্বর মামলায় কারারুদ্ধ হন। মুক্তির পর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণায়।

শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ১৮৬৯-১৯৩২

নিষ্ঠাবান সাংবাদিক শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী প্রথম জীবনে ছিলেন অনুশীলন সমিতির সঙ্গে যুক্ত। পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাদের ঘনিষ্ঠ হন। একসময় 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। ১৯০৮ সালে ৮ জন সহকারীর সঙ্গে তাকে মান্দালয়ে নির্বাসিত

করা হয়েছিল। ১৯০৭ থেকে ১৯২০ সাল অন্তরীণ ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ৬ মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। একসময়ে সুরেন্দ্রনাথের 'বেঙ্গলী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক হন। পরে নিজে 'সার্ভেন্ট' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে পাবনা জেলায়।

শ্রীশচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৭-১৯৪১

বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের মধ্যে হত্যার জন্য আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে যে যুবক বিপ্লবী কানাইলাল দত্তকে রিভলবার পৌঁছে দিয়েছিল, তাঁর নাম শ্রীশচন্দ্র ঘোষ। এরকম দুঃসাহসিক কাজে ছিল তাঁর অসীম আগ্রহ। বিভিন্ন বিপ্লবীর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের দায়িত্ব পালন করতেন। ডেনহাম হত্যা উদ্যোগে ছিলেন নির্ভরযোগ্য সহায়তাকারী। চন্দননগর দুপ্লে স্কুলে পড়বার সময় অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র রায়ের অনুপ্রেরণায় রাজনীতিতে হাতেখড়ি। সখারাম গণেশ দেউস্করের 'হিতবাদী' পত্রিকায় কর্মসঙ্গী ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষের বাংলা ত্যাগের সময় ১৯১০ সালে আত্মগোপনের নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা করে দেন। পরবর্তীকালে ১৯৩৩ সালে দীনেশ মজুমদারও সেই সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৯১৫ সালে ইংরেজ পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে এবং ৫ বছর আটক রাখে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুক্তি পান। তারপর 'প্রবর্তক আশ্রমে'র কাজে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছিলেন। নিদারুণ দারিদ্র যন্ত্রণায় আফিং খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে।

শ্রীশচন্দ্র পাল ১৮৮৭-১৯৩৯

সুভাষচন্দ্র বসুর সহযোগী ও অনুরাগী শ্রীশচন্দ্র পাল রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই গুপ্ত বিপ্লবীদলের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ছিলেন বি.ভি.র সদস্য। নিজের বিশ্বস্ততায় নেতৃবৃন্দের আস্থা অর্জন করে গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব পান। পুলিশ অফিসার নন্দলাল ব্যানার্জী হত্যা, মুরারি হত্যা, ওয়ারেন হত্যা, রডা কোম্পানির অস্ত্র অপহরণ সব ব্যাপারেই ছিল মুখ্য ভূমিকা। দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ১৯১৬ সালে ধরা পড়েন। অসুস্থ অবস্থায় ১৯১৯ সালে মুক্তি পান।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়।

সখারাম গণেশ দেউস্কর ১৮৬৯-১৯২২

উনিশ শতকের বাংলায় সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন এই মারাঠী সন্তান। হিতবাদী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। পরে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের বিদ্যালয়ে বাংলা ও ভারতীয় ইতিহাসে শিক্ষকতা করেন। তার 'দেশের কথা' (১৯০৫) গ্রন্থে ব্রিটিশ শোষণের চিত্র ধরা আছে। সেকালে স্বদেশ প্রেম উদ্বোধনে এই বইটির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সখারামের অপর একখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মুক্তি কোন পথে?'

*জন্ম বৈদ্যনাথধামের কাছে করোঁগ্রামে।

সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ১৮৯১-১৯৬৮

বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষিত হন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, যখন কলকাতায় এসেছিলেন এম.এ. পড়তে। ইন্দোজার্মান অস্ত্র সরবরাহ উদ্যোগে জড়িত ছিলেন। বাঘাযতীন নিহত হওয়ার পর যে কয়েকজন বিপ্লবী আত্মগোপন করেন সতীশচন্দ্র ছিলেন তাঁদের একজন। কিন্তু পুলিশের ঘেরাও থেকে

বেরোতে না পেরে, পটাসিয়াম সায়নাইড খান। মৃত্যু না হলেও স্বাস্থ্য ভেঙে পড়ে। নানা জায়গায় পালিয়ে বেড়াবার পর ১৯২৪ সালে ৩ আইনে গ্রেপ্তার হন এবং ১৯২৮ সালে ব্রহ্মের জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর কংগ্রেসের কাজে যোগ দেন। সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সতীশচন্দ্র তাঁকে কংগ্রেস নেতৃপদে বসাবার নানাভাবে প্রয়াস চালান। সতীশচন্দ্রের অসামান্য কীর্তির অন্যতম হল ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের আগে সারা ভারতের মধ্যে গোপন যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন। যার ফলে আইন অমান্য শুরু হলে, কংগ্রেস সংগঠনকে সরকার বেআইনী ঘোষণা করলেও, নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা সম্ভব হয়েছিল। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে আসেন। যখন এই বিপ্লবীর মৃত্যু হয়, তখন ছিলেন পূর্ববঙ্গাগত একজন সাধারণ উদ্বাস্তু।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশের খুলনা জেলার রাড়ুলি।

সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৩-১৯৩৮

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপনাকালে (১৯০১) অশ্বিনীকুমার দত্তের সংস্পর্শে স্বদেশ হিতব্রতে এগিয়ে আসেন। অশ্বিনীকুমারের স্বদেশ বান্ধব সমিতির সম্পাদক ছিলেন এবং জেলার সর্বত্র সমিতির ১৫৯টি শাখা স্থাপন করেন। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশি আন্দোলনের সময় অশ্বিনীকুমারের অন্যতম সহযোগী। ১৯০৮ সালে ৩ আইনে যে ৯ জনকে বিনাবিচারে আটক করা হয়, তাঁদের মধ্যে ছিলেন সতীশচন্দ্র। ১৯১০ সালে মুক্তিলাভের পর ব্রজমোহন কলেজে কাজে যোগ দিলেও, সরকারি নির্দেশে অন্যান্য ৬ জনের সঙ্গে তাঁকেও ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করতে হয়েছিল। তারপর কলকাতার রিপন কলেজ ও সিটি কলেজে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু ১৯২৪ সালে ব্রজমোহন কলেজে অধ্যক্ষরূপে যোগ দেন এবং আমৃত্যু ঐপদে ছিলেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকার বাহেরক।

সতীন্দ্রনাথ সেন ১৮৯৪-১৯৫৫

স্বাধীন বাংলাদেশের জেলখানায় রহস্যজনকভাবে ১৯৫৫ সালে মৃত্যু হয় এই রাজনৈতিক কর্মীর। স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত এবং মুকুন্দ দাসের অনুপ্রেরণায়। পরে যুগান্তর বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হন। কৃষ্ণনগরে একটি রাজনৈতিক ডাকাতির জন্য ৪ বছর জেল হয় ১৯১৫ সালে। ১৯২০ সালে গড়ে তোলেন একটি যুব বাহিনী। আবার কারাদণ্ড হয়। কিন্তু জেল কর্মীদের দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদে ৬১ দিন অনশন করেছিলেন বরিশাল জেলে। ১৯২৩ সালে মুক্তি পান। কর বন্ধ আন্দোলন ও পটুয়াখালিতে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেন ১৯২৬ সালে। ১৯২৯ সালে গ্রেপ্তার হওয়ার পর জেলে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন এবং সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে ১০৮ দিন পর অনশন ভঙ্গ করেন। ১৯৩১-এর মার্চে মুক্তি পেলেও বরিশাল থেকে বহিষ্কারের আদেশ হয়। ১৯৩৭ সালে ছিলেন দেউলি জেলে। ভারতরক্ষা আইনে তিন মাসের কারাদণ্ড হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়। কলকাতায় আবার গ্রেপ্তার হন ১৯৪২ সালের ১৩ আগস্ট এবং মুক্তি পান ১৯৪৫ সালে। যুক্তবঙ্গের বিধানসভায় বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে নির্বাচিত হন ১৯৪৬ সালে। দেশ ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যান। ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৯৪৮ সালে কারারুদ্ধ হন। ১৯৫৪ সালের ১ জুলাই পূর্ব পাকিস্তান নিবর্তনমূলক আটক আইনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

* জন্ম বাংলাদেশে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ায়।

সতীশচন্দ্র পাকড়াশী ১৮৯৩-১৯৭৩

অনুশীলন সমিতিতে যখন যোগ দেন তখন বয়সমাত্র ১৪। রাজনীতিক্ষেত্রে আত্মনিয়োগের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তীর সান্নিধ্যে। পরপর কয়েকবার গ্রেপ্তার ও কারা ভোগের পর ১৯২৯ সালে মেজুয়াবাজার বোমা মামলায় গ্রেপ্তার হন। ১৯৩০ সালে আন্দামান জেলে ৬ বছরের জন্য আটক রাখা হয়। ১৯৩৮ সালে মুক্তির পর ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। বিপ্লবী জীবনের ৩২ বছর কারাগারে কেটেছে। আর ১১ বছর ছিলেন আত্মগোপন করে।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়।

সতীশচন্দ্র বসু ১৮৭৬-১৯৪৮

অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসু। এই সমিতি স্থাপিত হয়েছিল ১৯০৯ সালের ২৪ মার্চ। সতীশচন্দ্র সম্পাদক ছিলেন।

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬৫-১৯৪৮

স্বাদেশিকতার উন্মেষ, স্বদেশি শিল্পের বিকাশ এবং বিদেশি দ্রব্য বর্জন সর্বক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটি। আইনজীবী সতীশচন্দ্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৭ সালে তাঁর প্রতিষ্ঠিত ডন সোসাইটি বাংলার যুবসমাজের সামনে নতুন জীবনাদর্শ উপস্থিত করেছিল, যা জাতীয়তাবাদের উন্মেষে ইন্ধন সঞ্চার করে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্টের প্রতিবাদে ১৯০২ সালে স্থাপন করেছিলেন ডন সোসাইটি। দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। জাতীয় শিক্ষাপরিষদ গঠনের পর সমগ্র কর্মধারা রূপায়ণের দায়িত্ব ছিল তাঁর ওপর। অরবিন্দের পর জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন (১৯০৭-০৮)। ১৯১৪ সালে কাশী চলে যান। সেখানেই বাকি জীবন কাটান। ১৯২২ সালে গান্ধী গ্রেপ্তার হওয়ার পর সবরমতী আশ্রমে যান এবং Young India পত্রিকা প্রকাশে সহযোগিতা করেছিলেন।

* জন্ম হুগলি জেলার বন্দিপুর।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪২-১৯২৩

রবীন্দ্রাগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার অভিপ্রায়ে কলকাতার বেলগাছিয়ায় 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তন করেছিলেন। মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনের সময় রচিত হয়েছিল তাঁর বিখ্যাত গান 'মিলে সবে ভারত সন্তান'। সত্যেন্দ্রনাথ ১৮৬৪ সালে আই.সি.এস. হয়ে দেশে ফিরে এসেছিলেন।

* জন্ম কলকাতার জোড়াসাঁকোয়।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ১৮৮২-১৯০৮

১৯০২ সালে মেদিনীপুরে একটি বিপ্লবী সংঘ গড়ে ওঠে। বিখ্যাত রাজনারায়ণ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ঐ সংঘের অন্যতম সদস্য। ১৯০৫ সালে সত্যেন্দ্রনাথ গড়ে তোলেন 'ছাত্রভাণ্ডার'। যেখানে ব্যায়ামচর্চা ছাড়াও তাঁতবোনা শেখান। তারই আড়ালে চলত বিপ্লবীদের কাজকর্ম। সত্যেন্দ্রনাথ ক্ষুদিরামকে বিপ্লবী দলে এনেছিলেন। হেমচন্দ্র দাস কানুনগো বোমা প্রস্তুত প্রণালী শিখতে প্যারিস যান। তখন থেকে সত্যেন্দ্রনাথের ওপর সংগঠনের দায়িত্ব পড়ে। কিন্তু

১৯০৮ সালে বন্দুক রাখার অপরাধে মেদিনীপুর জেলে আটক করা হয়। তারপর আলীপুর বোমা মামলার অভিযুক্ত হিসাবে কলকাতায় আনা হয়। সেখানে সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের গুলিতে রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাই নিহত হয়। সত্যেন্দ্রনাথ ও কানাইলালের ফাঁসি হয়।

* জন্ম মেদিনীপুরে।

সরলাদেবী চৌধুরানী ১৮৭২-১৯৪৫

রবীন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। উচ্চ শিক্ষিত, ফারসি, সংস্কৃত ও ফরাসি ভাষা জানতেন। ১৯০৩ সালে কলকাতায় 'প্রতাপাদিত্য উৎসব' শুরু করেন। তারপর 'বীরাষ্টমী' ব্রত। এইভাবে স্বাজাত্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেন স্বদেশবাসীকে। বিপ্লবীদল গঠনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বিবাহ হয় পাঞ্জাবে। সেখানেও মহিলাদের স্বদেশ সচেতন করে তুলেছিলেন। প্রতিষ্ঠা করেন স্বদেশিদ্রব্য সংগ্রহ কেন্দ্র 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। সমকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার বিভিন্ন বিপ্লব সংগঠনের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিল নিবিড়।

সাতকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৮৯-১৯৩৭

'যুগান্তর' দলের অন্যতম সংগঠক। অল্প বয়সেই বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। ১৯০৫ সালে সুরেন্দ্রনাথের সংবর্ধনার শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়ায় মানবেন্দ্রনাথ ও অন্য ৪ জন ছাত্রের সঙ্গে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। আমেরিকা থেকে আগত 'কোমাগাতামারু' জাহাজের বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিলেন। ১৯১৫ সালে জার্মান অস্ত্রবাহী জাহাজের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য বাঘাযতীন তাঁকে হ্যালিডে দ্বীপে পাঠিয়েছিলেন। এই বছরই যুগান্তর দলের বৈদেশিক দপ্তরের দায়িত্ব পান। ১৯১৬ সালের ৪ মার্চ গ্রেপ্তার হওয়ার পর নৈনী জেলে আটক রাখা হয়েছিল। সেখানে রাজবন্দিদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহারের প্রতিবাদে ৬৭ দিন অনশন করেন। মুক্তিপান ১৯২০ সালে। আবার আটক ছিলেন ১৯২৪-২৭ পর্যন্ত। কলকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টকে হত্যার পরিকল্পনা করে দেন দলের কর্মীদের (১৯৩০)। এ বছরে গ্রেপ্তারের পর স্বগৃহে অন্তরীণ থাকেন। ১৯৩২ সালে দেউলি বন্দিশিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই মারা যান অর্শরোগে।

* জন্ম ২৪ পরগণার বেহালায়।

সুন্দরীমোহন দাস ১৮৫৭-১৯৫০

এই খ্যাতনামা স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ সুন্দরীমোহন দাসের বাড়িটি ছিল বিপ্লবীদের অন্যতম আশ্রয়স্থল। সেখানে বোমা তৈরি হত। সক্রিয়ভাবে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও স্বদেশি আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। দেশবাসীর চিকিৎসার জন্য ১৯২১ সালে ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট এবং চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন। পরে স্বরাজ্য দলের সঙ্গে যুক্ত হন।

* জন্ম শ্রীহট্ট জেলার ডিগালিতে।

সুবোধচন্দ্র মল্লিক ১৮৭৯-১৯২০

স্বদেশহিতব্রতী সুবোধচন্দ্র কেম্ব্রিজের পড়া অসম্পূর্ণ রেখে স্বদেশে চলে আসেন এবং স্বদেশ সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে বিপ্লবীদলের নেতৃস্থানীয় হয়ে ওঠেন। তাঁর ওয়েলিংটন স্ট্রিটের বাড়ি ছিল জাতীয় আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র। ১৯০৬ সালে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গঠনে ১ লক্ষ টাকা দান করেন। এই দানের জন্য তিনি জনগণের কাছ থেকে 'রাজা' উপাধি পান। ১৯০৭

সালে বরিশালের রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেন। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের বাড়ি দান করেছিলেন। ৩ আইনে যে ৮ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাদের মধ্যে সুবোধচন্দ্রও ছিলেন। ১৯০৬ সাল থেকে আমৃত্যু জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ট্রাস্টি থাকাকালেও নানাবিধ স্বদেশ সেবার কাজ করে গেছেন।

* জন্ম কলকাতায় পটলডাঙায়।

সুরেন্দ্রমোহন ঘোষ ১৮৯৩-১৯৭৬

স্বদেশি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন মাত্র ১৪ বছর বয়সে। যুগান্তর দলের অন্যতম কর্ণধার সুরেন্দ্রমোহন যখন আনন্দমোহন কলেজের ছাত্র তখন, বেআইনী অস্ত্র রাখার অপরাধে এক বছর কারাদণ্ড হয়। জীবনে ২৩ বছর তাঁকে কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়েছিল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগ দেন। তিনি ছিলেন সুভাষ অনুরাগী।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহ জেলায়।

স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৫৫-১৯৩২

দেবেন্দ্রনাথের মেয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের দিদি স্বর্ণকুমারীর অন্যতম কীর্তি 'ভারতী' (১৮৮৭) পত্রিকা সম্পাদনা। 'বালক' পত্রিকাও তাঁর সৃষ্টি। ১৮৮৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁর ইংরেজি ভাষায় গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ প্রতিনিধিদের বিস্মিত করেছিল। নিয়মিত কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল সুবিস্তৃত। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'জগত্তারিণী' স্বর্ণপদক প্রদান করেছিল।

*জন্ম কলকাতায়।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৬১-১৯০২

স্বামী বিবেকানন্দ রাজনীতি জগতের মানুষ ছিলেন না। কিন্তু তাঁর বক্তৃতা ও রচনাবলী বাংলার যুবসমাজকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে নিয়ে যায় বিপ্লবের পথে। তিনি সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে, যাবতীয় সংস্কারমুক্ত এক নতুন মানবতার বাণী শুনিয়েছিলেন। এমন একটি সমাজব্যবস্থা তিনি চেয়েছিলেন যে সমাজ গড়ে তুলবে সংস্কারমুক্ত যুবসমাজ। কংগ্রেসের আপোষমূলক নীতির বিরোধিতা করেছিলেন বিবেকানন্দ। তিনি বলেছিলেন, "ব্রিটিশ শাসনতন্ত্র একটি যন্ত্র, যন্ত্রের হৃদয় নেই। এর কাছে কোন সুবিধার প্রার্থনা, বিড়ম্বনামাত্র।

* জন্ম কলকাতায়।

হরিদাস দত্ত ১৮৯০-১৯৭৬

বিপ্লবীকর্মের প্রেরণা পেয়েছিলেন 'মুক্তি সংঘে'র প্রতিষ্ঠাতা হেমচন্দ্র ঘোষের কাছ থেকে। বি.ভি.র অ্যাকশান স্কোয়াডের প্রবীণতম সদস্য হেমচন্দ্র। বিপ্লবী আন্দোলনের সময় ৮ বছর বিভিন্ন জেলে কাটান। ২৪ পরগণার আলেকজাণ্ডার জুট মিলের অত্যাচারী ইংরেজ ম্যানেজারকে হত্যার উদ্দেশ্যে তিনি ও খগেন দাস চটকলে তিনমাস কুলির কাজ করেন। কিন্তু পরিকল্পনা প্রকাশ হয়ে পড়ায়, জাহাজ চেপে বিদেশে পাড়ি দেন। তারপর দেশে ফিরে রডা কোম্পানির অস্ত্র অপহরণ অভিযানে গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেন। এজন্য ৪ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজবন্দি হিসাবে আটক ছিলেন হাজারিবাগ জেলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মুক্তি পেলেও ১৯৩০-৩৪ সালে ঢাকা, কলকাতা, মেদিনীপুর, কুমিল্লা, দার্জিলিং অঞ্চলে বিপ্লবীকর্মে সক্রিয় ছিলেন। ঢাকার পুলিশ

অফিসারকে হত্যার পর বিনয় বসু কলকাতায় এসে তাঁর আশ্রয়ে ছিলেন। ১৯৩০ সালে রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানেও তাঁর ভূমিকা ছিল।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ঢাকায়।

হীরালাল দাশগুপ্ত ১৮৯০-১৯৭৯

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে হীরালাল দাশগুপ্ত বিদেশি দ্রব্য বয়কটে দোকানে দোকানে পিকেটিং করতেন। বরিশালের মাহিলাড়া গ্রামে একটি বিপ্লবী দল গঠন করেন। কলকাতার ওয়াই.এম.সি.এ. হোস্টেল থেকে একটি রিভলবার অপহরণের অভিযোগে তাঁকে বর্ধমানের অন্তরীণ করে রাখা হয়। সেখান থেকে মুক্তি পান ১৯১৮ সালে। চাবাগিচার শ্রমিকদের ওপর অত্যাচারের প্রতিবাদে বরিশালে একটি স্টিমার ধর্মঘট পরিচালনা করেন ১৯২১ সালের ২০ মে।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে বরিশালে।

হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী ১৮৮১-১৯৩৮

ময়মনসিংহ মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ির সন্তান বিপ্লবী হেমেন্দ্রকিশোর আচার্য চৌধুরী বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন অরবিন্দ ঘোষের কাছে। তিনি ময়মনসিংহ 'সাধনা সমাজ' প্রতিষ্ঠা করে, বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। তাঁরা কলকাতার 'যুগান্তর' দলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলতেন। মুক্তাগাছা জমিদার বাড়ি ছিল বিপ্লবীদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। ১৯১৫ সালে জার্মান অস্ত্র সাহায্যে যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল, পূর্ববাংলায় তার দায়িত্ব ছিল হেমেন্দ্রকিশোরের ওপর। কিন্তু হেমেন্দ্রকিশোরকে গ্রেপ্তার করে খুলনায় অন্তরীণে থাকেন। দীর্ঘদিন কারারুদ্ধ থাকার সময় হাঁপানিরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায়।

হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ১৮৭৬-১৯৬২

সাংবাদিক হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। অরবিন্দ ঘোষ, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী ও বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা সম্পাদনা ও পরিচালনা করতেন। মূলত সাংবাদিকতায় তাঁর যাবতীয় কর্ম সীমাবদ্ধ ছিল।

* জন্ম বর্তমান বাংলাদেশে যশোহর জেলার চৌগাছায়।

হেমচন্দ্র দাস কানুনগো ১৮৭১-১৯৫০

ইংরেজ বিরোধী সংগ্রামে আজও হেমচন্দ্র দাস কানুনগোর নাম উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্যারিসে গিয়ে ফরাসি সোস্যালিস্টদের কাছে বোমা তৈরি শিখে আসেন। শ্যামজী কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তারই অনুরোধে প্রথম জাতীয় পতাকা তৈরি করেন। ১৯০৭ সালে দেশে ফিরে আসেন এবং দেশের কাজে নেমে পড়েন। তাঁর তৈরি বোমা প্রথম চন্দননগরের মেয়রের ওপর নিক্ষিপ্ত হলেও, তা ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় স্প্রিং যুক্ত বইবোমা কিংসফোর্ডকে পাঠান হলেও, সেটিও ব্যর্থ হয়। কারণ বইটি খোলা হয়নি। তৃতীয় বোমাটি কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে নিক্ষেপ করে ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকি। ১৯০৮ সালে মুরারীপুকুর বাগান থেকে গ্রেপ্তারের পর দ্বীপান্তরিত হন। ১৯২১ সালে মুক্তির পর ছবি এঁকে জীবন ধারণ করতেন।

* জন্ম পশ্চিমবঙ্গে মেদিনীপুরে।

নির্বাচিত গ্রন্থ-তালিকা

অক্ষয়কুমার দত্ত	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙালি	১৯৬৩
অক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য	স্বদেশী গান	১৩২২
অঞ্জন গোস্বামী	ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-মুসলমান	
অনাদিনাথ পাল	ভারতের মুক্তিসংগ্রাম ১ম খণ্ড	
অনিলবরণ রায়	স্বরাজের পথে	১৩২৮
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ঘরোয়া	১৩৪৮
অমলেশ ত্রিপাঠি, বিপানচন্দ্র এবং বরুণ দে	স্বাধীনতা সংগ্রাম	১৯৭২
অমিত ভট্টাচার্য	স্বদেশি শিল্প ও প্রযুক্তি বিজ্ঞান (১৮৮৩-১৯৪৭)	
অমিতা রায়	বিপ্লবী অবনীনাথ মুখার্জি, ২য় সংস্করণ	১৯৬৯
অযোধ্যা সিং	ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস (কমলেশ সেন-আশা সেন কর্তৃক হিন্দি থেকে অনূদিত)	১৯৭৪
অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়	হুগলী জেলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ইতিহাস	২০০২
অজিত রায়চৌধুরী	শ্রী অরবিন্দের রাজনীতি	১৯৭২
ডঃ অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	বহির্ভারতে ভারতের মুক্তিপ্রয়াস	১৯৬২
অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য	ইউরোপে ভারতীয় বিপ্লবের সাধনা	১৩৬৫
ঐ	মুক্তি কোন পথে	—
অরবিন্দ ঘোষ	কারাকাহিনী	১৩২৮
ঐ	ধর্ম ও জাতীয়তা	১৩২৭
ঐ	ভারতের নবজন্ম	১৩৩২
অরুণচন্দ্র গুহ	অর্ঘ (বিভিন্ন লেখকের দেশাত্মবোধক সংগীত সংগ্রহ)	১৩২৮
ঐ	দেশ পরিচয় (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৬)	--
ঐ	বিদ্রোহী প্রাচ্য (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৪২)	—
অশোক গুহ	আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম (পরিবর্ধিত সংস্করণ)	১৯৫৮
আবদুল মনসুর আহমদ	আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর (ঢাকা)	১৯৯৫
ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ক্ষুদিরাম	—
ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদ	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ৩ খণ্ড	
ঈশানচন্দ্র মহাপাত্র	শহীদ ক্ষুদিরাম	১৩৪৮
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	আমার এলোমেলো জীবনের কয়েকটি অধ্যায়	১৩৬৯
উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	নির্বাসিতের আত্মকথা (শেষ সংস্করণ)	১৯৭৬
উমাকান্ত হাজরা	বঙ্গজাগরণ ও স্বদেশের নানাকথা	১৯০৬
উমা মুখোপাধ্যায়	"বন্দেমাতরম" ও যুবক বাংলা	—

উমা মুখোধ্যায় ও হরিদাস মুখোপাধ্যায়	জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনে সতীশচন্দ্র ও অরবিন্দ	১৯৫৩
ঐ	ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে "যুগান্তর" পত্রিকার দান বা শ্রী অরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ	১৯৭২
ঐ	স্বদেশি আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ (শেষ সংস্করণ)	২০০৪
ঐ	উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদ	১৯৬১
ঐ	জাতীয় আন্দোলনে সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৬০
উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ভারতের স্বাধীনতা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস	১৯৪৭
ঐ	মুক্তি সাধনায় বাঙালি	১৩৫৬
ঐ	বঙ্গের বীর সন্তান (২য় সংস্করণ)	১৯৩২
উল্লাসকর দত্ত	আমার কারাজীবন	১৩৫৫
ঐ	দ্বীপান্তরের কথা	
কল্পনা দত্ত	ক্ষুদিরাম	১৯২৫
কালীদাস মুখোপাধ্যায়	মুক্তি আন্দোলনে অভেদানন্দ	১৩৫৫
কালীচরণ ঘোষ	জাগরণ ও বিস্ফোরণ (২ খণ্ড)	—
কিরণেন্দু বাগচী	বহ্নিবিপ্লব	—
কুঞ্জবিহারী চট্টোপাধ্যায়	স্বরাজচিন্তা	১৯২৫
কৃষ্ণ ধর সম্পাদিত	স্বদেশ আমার স্বদেশ	—
কৃষ্ণকুমার মিত্র	আত্মচরিত	১৩৪৩
কৃষ্ণানন্দ দাশগুপ্ত	সংগ্রামী ভারত	১৯৭৩
ক্ষীরোদনাথ দত্ত	অনুশীলন সমিতির পি. মিত্তির	—
ঐ	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অনুশীলন সমিতি	১৯৭৭
ঐ	বহির্ভারতে ভারতীয় বিপ্লব প্রচেষ্টা	১৩৪৩
ঐ	বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার	১৩৭৯
গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী	শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বিপ্লববাদ	—
ঐ	ভগিনী নিবেদিতা ও বাংলায় বিপ্লববাদ	—
গোকুলেশ্বর ভট্টাচার্য	স্বাধীনতার রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম (২ খণ্ড)	১৯৪৯
গোপাল ভৌমিক	বিপ্লবী বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকী	১৩৫৪
গৌতম চট্টোপাধ্যায়	রুশবিপ্লব ও বাংলার মুক্তি আন্দোলন	১৯৬৭
ঐ	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ	১৯৮০
চারুচন্দ্র বসু মজুমদার	বর্তমান সমস্যা ও স্বদেশী আন্দোলন	১৯০৫
চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী	বাংলার নায়ক যতীন্দ্রকুমার	—
চিন্মোহন সেহানবিশ	রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ	—
জয়গুরু গোস্বামী	চারণকবি মুকুন্দ দাস	
জীবনতারা হালদার	বন্দেমাতরম : অনুশীলন সমিতির ইতিহাস	১৯৭৭
জীবন মুখোপাধ্যায়	নিবেদিতা ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম	১৩৮৩
জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগী	বিপ্লবী বাংলা (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৬)	—
তারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী	বিপ্লবী বাংলা : ১৮৫৭ - ১৯১২	—

ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী	জীবনস্মৃতি	১৩৭৬
ঐ	জেলে ত্রিশ বছর ও ভারতের বিপ্লব সংগ্রাম	১৯৬২
ঐ	জেলে ত্রিশ বছর	১৩৪৫
দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য	স্বাধীনতার বাণী	১৯০৭
দেবকুমার রায়চৌধুরী	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	—
দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	মুক্তিযুদ্ধে বাঙালি	১৯৫০
দুর্গাদাস লাহিড়ী	স্বাধীনতার ইতিহাস	১৯২৩
দ্বিজদাস দত্ত	স্বরাজের সিঁড়ি	১৯২৪
দেবজ্যোতি বর্মণ	বাংলার রাষ্ট্রীয় সাধনা	১৩৬৪
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায়	তখন আমি জেলে	১৩৬৩
ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	অরবিন্দ	১৯৩৪
নগেন্দ্রনাথ রায়	শহীদ যুগল (ক্ষুদিরাম ও প্রফুল্ল চাকীর কথা)	১৩৫৫
নলিনীকান্ত গুপ্ত	স্বরাজের পথে	১৯২৩
ঐ	স্মৃতির পাতা ২ খণ্ড	১৩৭৪
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত	কান্তকবি রজনীকান্ত	—
নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়	বিপ্লবের সন্ধানে	১৯৬৭
ঐ	স্বাধীনতার পথ	১৯৩০
নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ভারতের বাণী ও যুগবার্তা	১৩২৯
নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়	উনিশ শ পাঁচ	১৩৪৯
নগেন্দ্রকুমার গুপ্ত	স্বাধীনতার কথা	১৩৩২
নগেন্দ্রকুমার গুহরায়	সঙ্ঘগুরু মতিলাল	১৯৬৫
ঐ	স্বরাজ সাধনায় বাঙালি	১৯২৩
ঐ	শহীদ যুগল	—
নরহরি কবিরাজ	স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলা (৪র্থ সংস্করণ)	১৯৭৮
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস	১৩৪১
নরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়	স্বদেশী সঙ্গীত	১৯০৭
নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	বড় বিপ্লবের এক অধ্যায়	—৩৬১
ঐ	স্বাধীনতার পূজারী শ্রী শ্রীশচন্দ্র মিত্র ও স্বাধীনতা সংগ্রামে কলকাতার পিস্তল লুঠ	১৯১৪
নলিনীকিশোর গুহ	বাংলায় বিপ্লববাদ (দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৯৩০
নেপাল মজুমদার	ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা ও রবীন্দ্রনাথ ১ম ও ২য় খণ্ড	
নরেশচন্দ্র ঘোষ	চিত্তজয়ী চিত্তরঞ্জন	১৩৭৮
পুলকেশ দে সরকার	বিপ্লব পথে ভারত (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৬)	
ঐ	ফাঁসির আশীর্বাদ	১৩৫৬
ঐ	বাঙালির বিপ্লব সাধনা	১৯৭৭
প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলি	বিপ্লবীর জীবনদর্শন	১৩৮৩
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	ভারতের জাতীয় আন্দোলন (২য় সংস্করণ)	১৩৬৭
প্রফুল্লকুমার সরকার	জাতীয় আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ (২য় সংস্করণ)	১৩৫৪

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	জাতীয় শিক্ষাপরিষদের দিনগুলি	১৯৭৯
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	বিপ্লবী যুগের কথা	১৩৫৫
ঐ	ভারতের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া ২য় (সংস্করণ)	১৯৮১
প্রভাতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	মুক্তিপথে (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত-১৩৩৭)	
প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী	বিপ্লবী জীবন	১৩৬১
প্রিয়নাথ গঙ্গোপাধ্যায়	বিপ্লবী ও ছাত্রসমাজ (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩১)	
ঐ	বঙ্গবিভাগ	—
ঐ	বাঘাযতীন	—
প্রিয়নাথ গুহ	যজ্ঞভঙ্গ বা বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির ইতিহাস	১৩১৪
পূর্ণেন্দু পত্রী	বঙ্গভঙ্গ	—
বদরুদ্দিন ওমর	বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি	১৯৮৭
বলাই দেবশর্মা	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	১৯৬১
বাংলা আকাদেমি (ঢাকা)	বাংলাদেশের ইতিহাস (১ম খণ্ড)	
বাসুদেব	সখারাম গণেশ দেউস্কর ও ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ—	—
বিজনকুমার বসু	কর্মবীর রাসবিহারী	১৯৬৩
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	কালের ভেরী (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৭)	
ঐ	বিদ্রোহীর স্বপ্ন	১৩৪৬
ঐ	স্বরাজ সাধন (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩২৯)	
বিপিনচন্দ্র চক্রবর্তী	স্বদেশী সঙ্গীত	১৯২১
বিপিনচন্দ্র পাল	সত্তর বৎসর	১৯৬২
ঐ	বাংলার নবযুগ	—
ঐ	স্বর্গীয় অশ্বিনীকুমার দত্ত	—
বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত	রজনীকান্ত কাব্যগুচ্ছ	—
বীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় (সংকলন)	বাঘাযতীন ও বালেশ্বর সংগ্রাম বৎসর পূর্তি উপলক্ষে হীরক জয়ন্তী স্মারকগ্রন্থ	১৯৭৫
বারীন্দ্রকুমার ঘোষ	মানুষগড়া	১৩৬৫
ঐ	পথের ইঙ্গিত	১৩৩৭
ঐ	দ্বীপান্তরের কথা	—
ঐ	মায়ের কথা	১৩৫৫
ঐ	অগ্নিযুগ ১ম খণ্ড	১৩৩৮
ঐ	আমার আত্মকথা	১৩৬৩
ঐ	নূতন সমাজের ইঙ্গিত	১৯৩১
ঐ	বারীন্দ্রের আত্মকথা	১৩৭৯
ব্রজবিহারী বর্মণরায়	ক্ষুদিরাম (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৯)	
ব্রজেন্দ্রচন্দ্র দাস	অনুশীলন সমিতির বিপ্লব প্রয়াস	১৯৭৭
ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	আমার ভারত উদ্ধার	—
ঐ	রচনাসংগ্রহ	১৯৮৭

ভবতোষ রায়	বিপ্লবী পুলিন দাস	১৯৬৫
ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়	সবার অলক্ষ্যে ২ খণ্ড	১৩৭৩
ঐ	ভারতে সশস্ত্র বিপ্লব	১৯৭০
ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত	বিপ্লবের পদচিহ্ন	১৯৭৮
ঐ	যুগসমস্যা	১৯৩৩
ঐ	ভারতের দ্বিতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস	—
ঐ	স্বাধীনতার সংগ্রাম	—
ঐ	স্বামী বিবেকানন্দ	১৩৮৩
ভূপেন্দ্রনাথ বসু	ঋষি অরবিন্দ	১৩৪৭
মণি বাগচী	দেশবন্ধু	—
ঐ	নিবেদিতা	—
ঐ	সুরেন্দ্রনাথ	—
ঐ	বক্তৃতা শতক	—
মতিলাল রায়	স্বদেশী যুগের স্মৃতি	১৯৩১
ঐ	আমার দেখা বিপ্লবী	১৩৬৪
ঐ	কানাইলাল (সচিত্র) ৩য় সংস্করণ	১৯৬৫
ঐ	শতবর্ষের বাংলা (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩২)	
ঐ	শতবর্ষের বাংলা (পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ)	১৩৭৬
মনোরঞ্জন গুহ	ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়	—
মুরারীমোহন ঘোষ	বন্দীর ব্যথা (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩২৯)	
মৃণালকান্তি দাশগুপ্ত	বিপ্লবসাধনায় নিবেদিতা	
যোগেশচন্দ্র বাগল	উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা :	
	ভারতবর্ষীয় স্বাধীনতা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ (১ম খন্ড)	১৩৫৪
ঐ	জাতীয় আন্দোলনে বঙ্গনারী	১৯৫৪
ঐ	মুক্তির সন্ধানে ভারত (নতুন সংস্করণ)	১৩৭৯
ঐ	ভারতের মুক্তিসন্ধানী	
যোগেন্দ্রনাথ শর্মা (সংকলক)	স্বদেশী সঙ্গীত	১৩১২
যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়	বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি	১৩৬৩
রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর	পিতৃস্মৃতি	১৩৭৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	জীবনস্মৃতি	১৯১২
রমেশচন্দ্র মজুমদার	বাংলা দেশের ইতিহাস (৪র্থ খণ্ড)	১৯৭৫
রাখাল ঘোষ	বিপ্লবী অবনী মুখার্জি	১৩৩৬
রাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রমেশচন্দ্র দত্ত	—
রাজেন্দ্রলাল আচার্য	বিপ্লবী বাংলা ও স্বাধীনতার ইতিহাস	১৩৫৬
রাতুল রায়চৌধুরী	ভারতবর্ষে বিপ্লব আন্দোলন	১৩৭১
রাসবিহারী বসু	বিপ্লবীর আহ্বান	—
লিস্ট, ফ্রেডরিচ	স্বদেশী আন্দোলন ও সংরক্ষণ নীতি	১৯৩২
শচীন্দ্রনাথ সান্যাল	বন্দীজীবন (২ খণ্ড)	১৯২২
শরৎকুমার রায়	মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত	—

শান্তিকুমার মিত্র	বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বসু	১৯৬৮
শিবদাস চক্রবর্তী	বিপিনচন্দ্র পাল	—
শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	স্মৃতিবিস্মৃতি	—
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	রাষ্ট্রসংগ্রামের এক অধ্যায়	১৩৫৩
সখারাম গণেশ দেউস্কর	দেশের কথা	১৩৯১
সতীশচন্দ্র পাকড়াশী	অগ্নিদিনের কথা	—
সত্যানন্দ ভারতী	স্বরাজসাধনা	১৯২৩
ঐ	স্বরাজ সঙ্গীত (দেশাত্মবোধক গানের সংকলন)	১৯১১
সত্যেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়	মলঙ্গার হাবু ও রডাকোম্পানির অস্ত্র লুঠ (১ম খণ্ড)	১৯৭৮
সত্যেন্দ্র বসু	বিপ্লবী রাসবিহারী	—
সরল চট্টোপাধ্যায়	ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্রমবিকাশ	—
সরলা দেবীচৌধুরাণী	জীবনের ঝরাপাতা	—
সুধা দেব	স্বরাজ সঙ্গীত	১৯২১
সুধীরকুমার মিত্র	মহাবিপ্লবী রাসবিহারী	১৯৪৮
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	অগ্নিযুগে বাংলায় বিপ্লবী মানস	—
ঐ	নথিপথে স্বদেশী আন্দোলন	—
সান্ত্বনা গুহ	অগ্নিমন্ত্রে নারী (সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ১৩৩৯)	—
সাফি. এম.	স্বরাজ পথে হিন্দু-মুসলমান	১৯২১
সিদ্ধার্থ ঘোষ	কারিগরি কল্পনা ও বাঙালি উদ্যোগ	১৯৮৮
সুকুমার রায়	ভারতবর্ষের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস	১৩৫৬
সুধীরচন্দ্র মৈত্র	পরাধীন ভারতের মুক্তিসংগ্রাম	১৯৬৯
সুনীলময় ঘোষ	অতুলপ্রসাদ সমগ্র	—
ঐ	বঙ্গনন্দিত রজনীকান্ত	—
সুনীলকুমার বসু	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৯৮৪
সুপ্রকাশ রায়	ভারতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের ইতিহাস (১ম খন্ড)	১৯৭০
ঐ	ভারতের কৃষক বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম	১৯৬৬
ঐ	বিদ্রোহী ভারত (নূতন সংস্করণ)	১৯৮৯
সুবোধকুমার দে	গ্রাম্য স্বরাজ	১৯২৫
সুজিত সরকার	আধুনিক ভারত (১৮৮৫-১৯৪৭)	১৯৯৩
সুরথকুমার বসু	স্বদেশির কারাবাস	১৯০৬
সুরেন্দ্রনাথ সেন	অশ্বিনীকুমার দত্ত	১৩৩৮
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের স্মৃতিকথা	—
সুশোভন সরকার	ইতিহাসের দৃষ্টিতে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ	১৯৭৯
সূর্যকুমার ঘোষাল	কর্মবীর সুরেন্দ্রনাথ	—
সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়	বাঙালীর রাষ্ট্রচিন্তা	১৯৬৮
স্বদেশরঞ্জন দাস	স্বরাজ সঙ্গীত (দেশাত্মবোধক গানের সংকলন)	১৯১১
হরিদাস মুখোপাধ্যায়	শ্রীঅরবিন্দ ও বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন	১৯৯৮
ঐ	যুগপ্রবর্তক সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৯৯৮
হেমচন্দ্র কানুনগো	বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা	১৯২৮

হেমন্তকুমার সরকার	বন্দীর ডায়েরী	১৩২৯
ঐ	স্বরাজ কোন পথে?	১৯২২
হেমন্ত চাকী	অগ্নিযুগের প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চাকী	১৩৫৯
হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ	১৯৭০
ঐ	ভারতের বিপ্লব কাহিনী	—
হীরেন মুখোপাধ্যায়	ভারতের জাতীয় আন্দোলন	১৯৪৩
হীরালাল দাশগুপ্ত	স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশাল	—
ঐ	জননায়ক অশ্বিনীকুমার	
—	১৯০৫ সালে বাংলা	১৯৩০
হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	কংগ্রেস ও বাংলা	
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	তরী হতে তীর	—
ঐ	ভারতবর্ষের ইতিহাস (২য় খণ্ড)	—

Ambika Charan Mazumder–	Indian National Evolution	
Amit Bhattacharya–	Swadeshi Enterprise in Bengal 1900-1920	1986
–	Swadeshi Enterprise in Bengal 1921-1947 The Second Phase	1995
–	The Profile of a A National Enterprise in Bengal 1883-1947	2003
Surendra Nath Banerjee –	A Nation in Making	
Biman Behari Majumder –	Millitant Nationalism in India.	
Sumit Sarkar –	Swadeshi Movement in Bengal.	
Uma and Haridas Mukherjee	Bipin Chandra Pal and Indias Struggle for Swaraj.	
.	The Origins of the National Education Movement	2000
	Bande Mataram and Indian Nationalism.	—
Uma Mukherjee	Two great Indian Revolutionaries	—
Sankari Prasad Basu –	Swadeshi Movement in Bengal and Freedom Strugle of India.	
K. C. Ghosh –	Role of Honour	—
Arun Chandra Guha –	First Spark of Revolution.	—
C. F. Andrews –	The Renaissance in India.	—

Maharastra Information Centre : The Select Gokhale —

W.B.P.C.C.-Congress Presidential Speeches —

Jagesh Chandra Chatterjee – In Search of Freedom —

The Statesman – An Anthology-1975 —

100 Years of the Statesman. —

Humayan Kabir : Muslim Politics 1906-1946 1966

Sukhbir Chowdury : Peasants and workers Movement in India 1905-29 1971

M. M. Iman : Role of Muslims in the National Movement 1987

Pradip Kumar Lahiri : Bengali Muslim Thought 1818-1947 1991

সম্প্রতি প্রকাশিত

Partition of Bengal : Significant Signposts 1905-1911
Edited by Nityapriya Ghosh : Ashoke Mukhopadhyaya

সমকালীন সাহিত্যে বঙ্গভঙ্গ : বারিদবরণ ঘোষ সম্পাদিত

বজ্রশিখায় বাংলা : গণশক্তি প্রকাশিত।

থির বিজুরি (মাঘ ১৪১১)—সমসাময়িকের চোখে বঙ্গভঙ্গ—অপূর্ব সাহা সম্পাদিত।

পরিকথা : বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধের শতবর্ষ ২০০৫।

পরিচয় : স্বদেশি আন্দোলন বাংলা ও বাঙালি। ১৩২১। সম্পাদক অমিতাভ দাশগুপ্ত

সাহিত্য ও সংস্কৃতি (কার্তিক-চৈত্র ১৪১১)—বঙ্গভঙ্গ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম।
সঞ্জীবকুমার বসু

নির্ঘণ্ট

সন্ধ্যার বেদপ্রচার।

হিন্দুর অমূল্যধন বেদগ্রন্থাবলী

সন্ধ্যার গ্রাহকগণ বিনামূল্যে পাইবেন।

[illegible]

বিনা মূল্যে বেদপ্রচার

[illegible]

ঈশ কেন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য

[illegible]

গৌড়পাদাচার্য্যকৃত কারিকা

[illegible]



[illegible]

শুভ-সূচনা

কাল পশুপতি বাবুর বাড়ীতে গরিব দুঃখী কুলি মজুর মুটে গাড়োয়ান ভিখারীর দুই এক পয়সা দানে ২৫ হাজার টাকা জড় হইয়াছে। ভদ্রলোকেরা ভিড়ে ভিতরে ঢুকিতে পারেন নাই। আজ আবার ৪টা হইতে ৭টা পর্য্যন্ত ঐ স্থানে কুমার মন্মথনাথ মিত্র মহাশয় ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। দীনদুঃখীর উৎসাহ ত্যাগস্বীকার দেখিয়া অবাক হইয়াছি। দেখি ভদ্রলোকেরা কি করেন।

৩০শে আশ্বিনে কলিকাতা।

অপূর্ব্ব দৃশ্য। বিপুল জনতা

[illegible]

[illegible]